সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড

আষাঢ় ১৩৩৫—অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা,

৪৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্

বিষয়-সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

বিচিত্রা

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক-সূচী

লেখক-সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

বিচিত্রা

ষাণ্মাষিক সূচী

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ)

নববর্ষ

প্রসাধন

আষাঢ়, ১৩৩৫

শিল্পী—শ্রীবীরেশ্বর সেন

চিত্রাধিকারী—শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে—

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৩৫ | প্রথম সংখ্যা

সুসময়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যা-সোনার ভাণ্ডার দ্বার পানে,
দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবী
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন সঘন অবগুণ্ঠন টানে ॥

"খোলো, খোলো মুখ" বনলক্ষ্মীরে ডাকে,
নিবিড় ধূলায় আপনি তাহারে ঢাকে।
"আলো দাও" হাঁকে, পায়না কাহারো সাড়া,
আঁধার বাড়ায়ে বেড়ায় লক্ষ্মীছাড়া,
পথ সে হারায় আপন ঘূর্ণিপাকে ॥

তারপরে যবে শিউলি ফুলের বাসে
শরৎ লক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দ-কলির স্নিগ্ধ শীতল কথা,
মৃদু উচ্ছ্বাস মর্ম্মরে ঘাসে ঘাসে ;

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ ক্ষেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোক ছায়ায় মিশে,
গগন সীমায় কাশের কাঁপন লাগে,

হঠাৎ তখন সূর্য্য ডোবার কালে
দীপ্তি লাগায় দিক্‌ললনার ভালে ;
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দ্দা আঁধার কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গ-লোকের আলো,
চরমখনের পরম প্রদীপ জ্বালে ॥

—উপন্যাস—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০
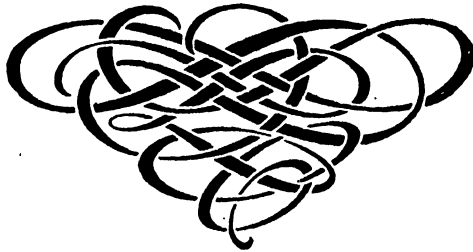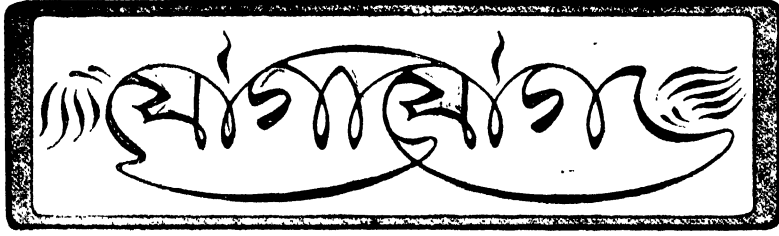
মধুসূদন চ'লে যেতেই কুমু খাট থেকে নেমে মেজের উপর ব'সে পড়ল। চিরজীবন ধ'রে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই? মধুসূদন ঠিকই বলেচে ওদের সঙ্গে তার চাল তফাৎ। আর সকল রকম তফাতের চেয়ে এইটেই দুঃসহ। কী উপায় আছে এর?

এক সময়ে হঠাৎ কি মনে পড়ল, কুমু চল্‌ল নীচের তলায় মোতির মার ঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখে শ্যামাসুন্দরী উপরে উঠে আস্‌চে।

"কি বউ, চলেচ কোথায়? আমি যাচ্ছিলুম তোমার ঘরেই।"

"কোনো কথা আছে?"

"এমন কিছু নয়। দেখ্‌লুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে জানি, নতুন প্রণয়ে খট্‌কা বাধ্‌ল কোন্‌খানটাতে,। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কি রকম ক'রে বনিয়ে চলতে হয় সে পরামর্শ আমরাই দিতে পারি। বকুল ফুলের ঘর চলেচ বুঝি? তা যাও, মনটা খোলসা ক'রে এসোগে।"

আজ হঠাৎ কুমুর মনে হ'ল শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে গড়া এক কুমোরের চাকে। কেন এ কথা মাথায় এল বলা শক্ত। চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে কিছু বুঝেচে তা' নয়, আকারে-প্রকারে বিশেষ যে মিল তাও নয়, তবু দু'জনের ভাবগতিকের একটা অনুপ্রাস আছে যেন, শ্যামাসুন্দরীর জগতের আর মধুসূদনের জগতের সঙ্গে তার একই হাওয়া। শ্যামাসুন্দরী যখন বন্ধুত্ব করতে আসে তাও কুমুকে উল্টো দিকে ঠেলা দেয়, গা কেমন ক'রে ওঠে।

মোতির মার শোবার ঘরে ঢুকেই কুমু দেখলে নবীনে তাতে মিলে কি একটা নিয়ে হাতকাড়াকাড়ি চল্‌চে। ফিরে যাবে যাবে মনে করচে, এমন সময় নবীন ব'লে উঠ্‌ল, "বৌদিদি, যেয়োনা যেয়োনা। তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম; নালিশ আছে।"

"কিসের নালিশ?"

"একটু বোসো, দুঃখের কথা বলি।"

তক্তপোষের উপর কুমু বস্‌ল।

নবীন বল্‌লে, "বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্রমহিলা আমার বই রেখেচেন লুকিয়ে।"

"এমন শাসন কেন?"

"ঈর্ষা,—যেহেতু নিজে ইংরেজী পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু উনি স্বামী-জাতির এড্‌কেশনের বিরোধী। আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্চে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হওয়াতে ওঁর আক্রোশ। অনেক ক'রে বোঝালেম যে, এতবড় যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের পিছনে পিছনেই চলতেন; বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি যে তোমার চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে এগিয়ে চল্‌চি এতে বাধা দিও না।"

"তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই করতে এসোনা বল্‌চি।"

নবীনের মহা বিপদের ভাণ করা মুখভঙ্গী দেখে কুমু খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। এ বাড়িতে এসে অবধি এমন মন খুলে হাসি এই ওর প্রথম। এই হাসি নবীনের বড়ো মিষ্টি লাগল। সে মনে মনে বললে, "এই আমার কাজ হোলো, আমি বউরাণীকে হাসাব।"

কুমু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ভাই, ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেচ?"

"দেখ ত দিদি! শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালার গুরুমশায় ব'সে আছেন? খেটেখুটে রাত্তিরে ঘরে এসে দেখি একটা পিদ্দিম জ্বলচে, তার সঙ্গে আর একটা বাতির সেজ, মহাপণ্ডিত পড়তে ব'সে গেছেন। খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁস নেই।"

"সত্যি ঠাকুরপো?"

"বৌরাণী, খাবার ভালোবাসিনে এতবড় তপস্বী নই, কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেই জন্যেই ইচ্ছে ক'রে খেতে দেরী হ'য়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে।"

"ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।"

"আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।"

"তাও কখনো ঘটে নাকি ঠাকুরপো?"

"দুটো একটা খুব তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হ'লে। অশ্রুজলের উজ্জ্বল অক্ষরে মনে লেখা রয়েচে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায় বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেচেন।"

"ঘরের লোকের নামে তো পুলিশ কেস্ করতে পারিনে, তাই চোরকে চুরি দিয়ে শাসন করতে হয়। আগে দাও আমার বই।"

"তোমাকে দেব না, দিদিকে দিচ্চি।" ঘরের কোণে একটা ঝুড়িতে রেশম পশম, টুকরা কাপড়, ছেঁড়া মোজা জ'মে ছিল; তারি তলা থেকে একখানা ইংরেজি সংক্ষিপ্ত এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ড বের ক'রে মোতির মা কুমুর কোলের উপর রেখে বললে, "তোমার ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ওঁকে দিয়োনা; দেখি তোমার সঙ্গে কি রকম রাগারাগি করেন।"

নবীন মশারির চালের উপর থেকে চাবি তুলে নিয়ে কুমুর হাতে দিয়ে বললে, "আর কাউকে দিয়োনা বউদিদি, দেখবো আর কেউ তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেন।"

কুমু বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে, "এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর সখ?"

"ওঁর সখ নেই এমন বই নেই। সেদিন দেখি কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে পড়তে ব'সে গেছেন।"

"নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়িনে, অতএব এতে লজ্জার কারণ কিছু নেই।"

"দিদি, তোমার কি একটা কথা বলবার আছে। চাও ত, এই বাচালটিকে এখনি বিদায় ক'রে দিই।"

"না, তার দরকার নেই। আমার দাদা দুই এক-দিনের মধ্যে আসবেন শুনেচি।"

নবীন বললে, "হাঁ, তিনি কালই আসবেন।"

"কাল!" বিস্মিত হ'য়ে কুমু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। নিশ্বাস ফেলে বললে, "কি ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি বড়ঠাকুরকে কিছু বলনি?"

কুমু মাথা নেড়ে জানালে যে, না।

নবীন বললে, "একবার ব'লে দেখবে না?"

কুমু চুপ ক'রে রইল। মধুসূদনের কাছে দাদার কথা বলা বড়ো কঠিন। দাদার প্রতি অপমান ওর ঘরের মধ্যে উদ্যত; তাকে একটুও নাড়া দিতে ওর অসহ্য সঙ্কোচ।

কুমুর মুখের ভাব দেখে নবীনের মন ব্যথিত হ'য়ে উঠল। বললে, "ভাবনা কোরো না বৌদিদি, আমরা সব ঠিক ক'রে দেব, তোমাকে কিছু বলতে কইতে হবে না।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদার কাছে নবীনের শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একটা ভীরুতা আছে। বৌদিদি এসে আজ সেই ভয়টা ওর মন থেকে ভাঙালে বুঝি!

কুমু চ'লে গেলে মোতির মা নবীনকে বললে, "কি উপায় করবে বলো দেখি? সেদিন রাত্রে তোমার দাদা যখন আমাদের ডেকে নিয়ে এসে বৌয়ের কাছে নিজেকে খাটো করলেন তখনি বুঝেছিলুম সুবিধে হ'ল না। তারপর থেকে তোমাকে দেখলেই ত মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান।"

"দাদা বুঝেচেন যে, ঠকা হোলো; ঝোঁকের মাথায় থলি উজাড় ক'রে আগাম দাম দেওয়া হ'য়ে গেছে, এদিকে ওজন-মত জিনিষ মিলল না। আমরা ওঁর বোকামির সাক্ষী ছিলুম তাই আমাদের সইতে পারচেন না।"

মোতির মা বল্‌লে, "তা হোক, কিন্তু বিপ্রদাস বাবুর উপরে রাগটা ওঁকে যেন পাগলামির মতো পেয়ে বসেচে, দিনে দিনে বেড়েই চল্‌ল। একি অনাছিষ্টি বলো দিকি!"

নবীন বল্‌লে, "ও মানুষের ভক্তির প্রকাশ ঐ রকমই। এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জানে বাইরে তাকে মারে। কেউ কেউ বলে রামের প্রতি রাবণের অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাই বিশ হাত দিয়ে নৈবেদ্য চালাতো। আমি তোমাকে ব'লে দিচ্চি দাদার সঙ্গে বৌরাণীর দেখা সাক্ষাৎ সহজে হবে না।"

"তা' বললে চলবে না, কিছু উপায় করতেই হবে।"

"উপায় মাথায় এসেচে।"

"কি বলো দেখি।"

"বল্‌তে পারব না।"

"কেন বলো ত?"

"লজ্জা বোধ কর্‌চি।"

"আমাকেও লজ্জা?"

"তোমাকেই লজ্জা।"

"কারণটা শুনি?"

"দাদাকে ঠকাতে হবে। সে তোমার শুনে কাজ নেই।"

"যাকে ভালোবাসি তার জন্যে ঠকাতে একটুও সঙ্কোচ করিনে।"

"ঠকানো বিদ্যেয় আমার উপর দিয়েই হাত পাকিয়েচ বুঝি?"

"ও বিদ্যে সহজে খাটাবার উপযুক্ত এমন মানুষ পাব কোথায়?"

"ঠাকরুণ, রাজিনামা লিখে প'ড়ে দিচ্চি, যখন খুসি ঠকিয়ো।"

"এত ফূর্ত্তি কেন শুনি?"

"বলব? বিধাতা তোমাদের হাতে ঠকাবার যে সব উপায় দিয়েচেন তাতে মধু দিয়েচেন ঢেলে। সেই মধুময় ঠকানো-কেই বলে মায়া।"

"সেটা তো কাটানোই ভালো।"

"সর্ব্বনাশ! মায়া গেলে সংসারে রইল কি? মূর্ত্তির রং খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড় মাটি। দেবী, অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও, মনে নেশা জাগাও, যা খুসি করো।"

এর পরে যা কথাবার্ত্তা চল্‌ল সে একেবারেই কাজের কথা নয়, এ গল্পের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

৪১

মীটিঙে এইবার মধুসূদনের প্রথম হার। এ পর্য্যন্ত ওর কোনো প্রস্তাব কোনো ব্যবস্থা কেউ কখনো টলায়নি। নিজের পরে ওর বিশ্বাস যেমন, ওর প্রতি ওর সহযোগী-দেরও তেমনি বিশ্বাস। এই ভরসাতেই মীটিঙে কোনো জরুরি প্রস্তাব পাকা ক'রে নেবার আগেই কাজ অনেকদূর এগিয়ে রাখে। এবারে পুরোনো নীলকুঠিওয়ালা একটা পত্তনী তালুক ওদের নীলের কারবারের সামিল কিনে নেবার বন্দোবস্ত করছিল। এ নিয়ে খরচপত্রও হ'য়ে গেছে। প্রায় সমস্তই ঠিকঠাক; দলিল ষ্টাম্পে চড়িয়ে রেজেষ্টারী ক'রে দাম চুকিয়ে দেবার অপেক্ষা; যে সব লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক তাদের আশা দিয়ে রাখা হয়েছে; এমন সময় এই বাধা। সম্প্রতি ওদের কোনো ট্রেজারারের পদ খালি হওয়াতে সম্পর্কীয় একটি জামাতার জন্য উমেদারী চলেছিল, অযোগ্য উদ্ধারণে উৎসাহ না থাকাতে মধুসূদন কান দেয়নি। সেই ব্যাপারটা বীজের মতো মাটি চাপা থেকে হঠাৎ বিরুদ্ধতার আকারে অঙ্কুরিত

হ'য়ে উঠ্‌ল। একটু ছিদ্রও ছিল। তালুকের মালেক মধুসূদনের দূর সম্পর্কীয় পিসির ভাসুরপো। পিসি যখন হাতে পায়ে এসে ধরে তখন ও হিসেব ক'রে দেখ্‌লে নেহাৎ সস্তায় পাওয়া যাবে, মুনফাও আছে, তার উপরে আত্মীয়দের কাছে মুরুব্বিয়ানা করবার গৌরব। যাঁর অযোগ্য জামাই ট্রেজারার পদ থেকে বঞ্চিত, তিনিই মধুসূদনের স্বজন-বাৎসল্যের প্রমাণ বহু সন্ধানে আবিষ্কার ও যথাস্থানে প্রচার করেচেন। তাছাড়া কোম্পানির সকল রকম কেনা বেচায় মধুসূদন যে গোপনে কমিশন নিয়ে থাকেন, এই মিথ্যা সন্দেহ কানে কানে সঞ্চারিত করবার ভারও তিনিই নিয়েছিলেন। এ সকল নিন্দার প্রমাণ অধিকাংশ লোক দাবী করেনা, কারণ তাদের নিজের ভিতরে যে লোভ আছে সেই হচ্চে অন্তরতম ও প্রবলতম সাক্ষী। লোকের মনকে বিগড়িয়ে দেওয়া একটা কারণে সহজ ছিল, সে কারণ হচ্চে মধুসূদনের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি, এবং তার খাঁটি চরিত্রের অসহ্য সুখ্যাতি। মধুসূদনও ডুবে ডুবে জল খায় এই অপবাদে সেই লোলুপরা পরম শান্তি পেল, গভীর জলে ডুব দেবার আকাঙ্ক্ষায় যাদের মনটা পানকৌড়ি বিশেষ, অথচ হাতের কাছে যাদের জলাশয় নেই।

মালেককে মধুসূদন পাকা কথা দিয়েছিল। ক্ষতির আশঙ্কায় কথা খেলাপ করবার লোক সে নয়। তাই নিজে কিনবে ঠিক করেচে, আর পণ করেচে কোম্পানিকে দেখিয়ে দেবে, না কিনে তারা ঠক্‌ল।

মধুসূদন বিলম্বে বাড়ি ফিরে এল। নিজের ভাগ্যের প্রতি মধুসূদনের অন্ধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আজ তার ভয় লাগল যে জীবনযাত্রার গাড়িটাকে অদৃষ্ট এক পর্য্যায়ের লাইন থেকে আর এক পর্য্যায়ের লাইনে চালান ক'রে দিচ্চে বা। প্রথম ঝাঁকানিতেই বুকটা ধড়াস ক'রে উঠ্‌ল। মীটিঙ থেকে ফিরে এসে আপিস ঘরে কেদারা হেলান দিয়ে গুড়গুড়ির ধূম-কুণ্ডলের সঙ্গে নিজের কালো রঙের চিন্তাকে কুণ্ডলায়িত করতে লাগল।

নবীন এসে খবর দিলে বিপ্রদাসের বাড়ি থেকে লোক এসেচে দেখা করতে। মধুসূদন ঝেঁকে উঠে বললে, "যেতে বলে দাও, আমার এখন সময় নেই।"

নবীন মধুসূদনের ভাবগতিক দেখে বুঝলে মীটিঙে একটা অপঘাত ঘটেচে। বুঝলে দাদার মন এখন দুর্ব্বল। দৌর্ব্বল্য স্বভাবত অনুদার, দুর্ব্বলের আত্মগরিমা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার রূপ ধরে। দাদার আহত মন বৌরাণীকে কঠিন ভাবে আঘাত করতে চাইবে এতে নবীনের সন্দেহ মাত্র ছিল না। এ আঘাত যে ক'রেই হোক্ ঠেকাতেই হবে। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওর মনে দ্বিধা ছিল, সে দ্বিধা সম্পূর্ণ গেল কেটে। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে এসে দেখলে ওর দাদা ঠিকানাওয়ালা নামের ফর্দ্দের খাতা নিয়ে পাতা ওলটাচ্চে। নবীন এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন মুখ তুলে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কিসের দরকার। তোমাদের বিপ্রদাস বাবুর মোক্তারি করতে এসেচ বুঝি?"

নবীন বললে, "না, দাদা, সে ভয় নেই। ওঁদের লোকটা এমন তাড়া খেয়ে গেছে যে তুমি নিজেও যদি ডেকে পাঠাও তবু সে এ বাড়িমুখো হবে না।"

এ কথাটাও মধুসূদনের সহ্য হ'ল্ না। ব'লে উঠ্‌ল, "কড়ে আঙ্গুলটা নাড়লেই পায়ের কাছে এসে পড়তে হবে। লোকটা এসেছিল কি করতে?"

"তোমাকে খবর দিতে যে, বিপ্রদাস বাবুর কলকাতা আসা দুদিন পিছিয়ে গেল। শরীর আর একটু সেরে তবে আসবেন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা সে জন্যে আমার তাড়া নেই।"

নবীন বল্‌লে "দাদা, কাল সকালে ঘণ্টা দুয়ের জন্যে ছুটি চাই।"

"কেন?"

"শুনলে তুমি রাগ করবে।"

"না শুন্‌লে আরো রাগ করব।"

"কুম্ভকোনাম্ থেকে এক জ্যোতিষী এসেচেন তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করাতে চাই।"

মধুসূদনের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল, ইচ্ছে করল এখনি ছুটে তার কাছে যায়। মুখে তর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, "তুমি বিশ্বাস করো?"

"সহজ অবস্থায় করিনে, ভয় লাগলেই করি।"

"ভয়টা কিসের শুনি?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীন কোনো জবাব না ক'রে মাথা চুল্‌কতে লাগল।

"ভয়টা কাকে বলই না।"

"এ সংসারে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করিনে। কিছুদিন থেকে তোমার ভাবগতিক দেখে মন সুস্থির হচ্চে না।"

সংসারের লোক মধুসূদনকে বাঘের মতো ভয় করে এইটেতে তার ভারি তৃপ্তি। নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে সে গুড়্গুড়ি টান্‌তে টান্‌তে নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করতে লাগল।

নবীন বল্‌লে, "তাই একবার স্পষ্ট ক'রে জানতে চাই গ্রহ কি করতে চান আমাকে নিয়ে। আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন নাগাত।"

"তোমার মতো নাস্তিক, তুমি কিছু বিশ্বাস করো না, শেষকালে———"

"দেবতার পরে বিশ্বাস থাকলে গ্রহকে বিশ্বাস করতুম না দাদা। ডাক্তারকে যে মানেনা হাতুড়েকে মানতে তার বাধে না।"

নিজের গ্রহকে যাচাই ক'রে নেবার জন্যে মধুসূদনের যে পরিমাণ আগ্রহ হ'ল, সেই পরিমাণ ঝাঁজের সঙ্গে বললে, "লেখাপড়া শিখে বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে? যে যা বলে তাই বিশ্বাস কর?"

"লোকটার কাছে যে ভৃগুসংহিতা রয়েচে—যেখানে যে-কেউ যে-কোনো কালে জন্মেচে, জন্মাবে, সকলের কুষ্টি একেবারে তৈরী, সংস্কৃত ভাষায় লেখা, এর উপর তো আর কথা চলে না। হাতে হাতে পরীক্ষা ক'রে দেখে নাও।"

"বোকা ভুলিয়ে যারা খায়, বিধাতা তাদের পেট ভরাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে তোমাদের মতো বোকাও সৃষ্টি ক'রে রাখেন।"

"আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে তোমাদের মতো বুদ্ধিমানও সৃষ্টি করেন। যে মারে তার উপরে তাঁর যেমন দয়া, যাকে মারে তার উপরেও তেমনি। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চালিয়ে দেখই না।"

"আচ্ছা, বেশ, কাল সকালেই আমাকে নিয়ে যেয়ো, দেখব তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।"

"তোমার যেরকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় গোল হ'য়ে যেতে পারে। সংসারে দেখা যায় মানুষকে বিশ্বাস করলে মানুষ বিশ্বাসী হ'য়ে ওঠে। গ্রহদেরও ঠিক সেই দশা, দেখনা কেন সাহেবগুলো গ্রহ মানে না ব'লে গ্রহের ফল ওদের উপর খাটে না। সেদিন তেরোস্পর্শে বেরিয়ে তোমাদের ছোট সায়েব ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতে এলো—আমি হ'লে বাজি জেতা দূরস্থা‌ং ঘোড়াটা ছিট্‌কে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেতো। দাদা, এই সব গ্রহ নক্ষত্রের হিসেবের উপর তোমাদের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না, একটু বিশ্বাস মনে রেখো।"

মধুসূদন খুসি হ'য়ে স্মিত হাস্যে গুড়গুড়িতে মনোযোগ দিলে।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে মধুসূদন নবীনের সঙ্গে এক সরু গলির আবর্জ্জনার ভিতর দিয়ে বেঙ্কট শাস্ত্রীর বাসায় গিয়ে উপস্থিত। অন্ধকার একতলার ভাপ্‌সা ঘর; লোনাধরা দেয়াল ক্ষতবিক্ষত, যেন সাংঘাতিক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত, তক্তপোষের উপর ছিন্ন মলিন একখানা শতরঞ্চ, এক প্রান্তে কতকগুলো পুঁথি এলোমেলো জড়ো করা, দেওয়ালের গায়ে শিব-পার্ব্বতীর এক পট। নবীন হাঁক দিলে "শাস্ত্রীজি"। ময়লা ছিটের বালাপোষ গায়ে সামনের মাথা-কামানো, ঝুঁটিওয়ালা, কালো, বেঁটে, রোগা এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুক্‌লো; নবীন তাকে ঘটা ক'রে প্রণাম করলে। চেহারা দেখে মধুসূদনের একটুও ভক্তি হয়নি—কিন্তু দৈবের সঙ্গে দৈবজ্ঞের কোনো রকম ঘনিষ্ঠতা আছে জেনে ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা আধাআধি রকম অভিবাদন সেরে নিলে। নবীন মধুসূদনের এক ঠিকুজি জ্যোতিষীর সামনে ধরতেই সেটা অগ্রাহ্য ক'রে শাস্ত্রী মধুসূদনের হাত দেখ্‌তে চাইলে। কাঠের বাক্স থেকে কাগজ কলম বের ক'রে নিজে একটা চক্র তৈরি ক'রে নিলে। মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "পঞ্চম বর্গ।" মধুসূদন কিছুই বুঝলে না। জ্যোতিষী আঙুলের পর্ব্ব গুণতে গুণতে আউড়ে গেল, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এতেও মধুসূদনের বুদ্ধি খোলষা হোলো না। জ্যোতিষী বল্‌লে, "পঞ্চম বর্গ।" মধুসূদন ধৈর্য্য ধ'রে চুপ ক'রে রইল। জ্যোতিষী আওড়ালো,

প, ফ, ব, ভ, ম,। মধুসূদন এর থেকে এইটুকু বুঝলে যে ভৃগুমুনি ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় থেকেই তার সংহিতা সুরু করেচেন। এমন সময় বেঙ্কট শাস্ত্রী ব'লে উঠ্‌লো, "পঞ্চাক্ষরকং।"

নবীন চকিত হ'য়ে মধুসূদনের কানের কাছে চুপি চুপি বল্‌লে, "বুঝেছি দাদা।"

"কী বুঝলে।"

"পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তার পরে পঞ্চ অক্ষর ম-ধু-সূ-দ-ন। জন্ম গ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় মিলেচে।"

মধুসূদন স্তম্ভিত। বাপ মায়ে নাম রাখবার কত হাজার বছর আগেই নামকরণ ভৃগুমুনির খাতায়! নক্ষত্রদের এ কী কাণ্ড! তারপরে হতবুদ্ধি হ'য়ে শুনে গেল ওর জীবনের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভাষা যত কম বুঝ্‌লে, ভক্তি ততই বেড়ে উঠ্‌ল। জীবনটা আগাগোড়া ঋষিবাক্য মূর্ত্তিমান। নিজের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেখলে, দেহটা অনুস্বার, বিসর্গ তদ্ধিত, প্রত্যয়ের মসলা দিয়ে তৈরি কোন্ তপোবনে লেখা একটা পুঁথির মতো। তার পর দৈবজ্ঞের শেষ কথাটা এই যে মধুসূদনের ঘরে একদা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে ব'লে পূর্ব্ব হ'তেই ঘরে অভাবনীয় সৌভাগ্যের সূচনা। অল্পদিন হ'ল তিনি এসেচেন নববধূকে আশ্রয় ক'রে। এখন থেকে সাবধান। কেননা ইনি যদি মনঃপীড়া পান, ভাগ্য কুপিত হবে।

বেঙ্কট শাস্ত্রী বল্‌লে কোপের লক্ষণ দেখা দিয়েচে। জাতক যদি এখনো সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চলবে। মধুসূদন স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইল। মনে প'ড়ে গেল বিবাহের দিনেই প্রকাণ্ড সেই মুনফার খবর; আর তার কয়দিনের মধ্যেই এই পরাভব। লক্ষ্মী স্বয়ং ঘরে আসেন সেটা সৌভাগ্য, কিন্তু তার দায়িত্বটা কম ভয়ঙ্কর নয়।

ফেরবার সময় মধুসূদন গাড়িতে স্তব্ধ হ'য়েই ব'সে রইল। এক সময় নবীন ব'লে উঠ্‌ল, "ঐ বেঙ্কট শাস্ত্রীর কথা একটুও বিশ্বাস করিনে; নিশ্চয় ও কারো কাছ থেকে তোমার সমস্ত খবর পে‥চ।"

"ভারি বুদ্ধি তোমার! যেখানে যত মানুষ আছে আগে ভাগে তার খবর নিয়ে রেখে দিচ্চে; সোজা কথা কিনা!"

"মানুষ জন্মাবার আগেই তার কোটি কোটি কুষ্ঠি লেখার চেয়ে এটা অনেক সোজা। ভৃগুমুনি এত কাগজ পাবেন কোথায়, আর বেঙ্কট স্বামীর ঐ ঘরে এত জায়গা হবে কেমন্ ক'রে?"

"এক আঁচড়ে হাজারটা কথা লিখতে জানতেন তাঁরা।"

"অসম্ভব।"

"যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়ান্স্! এখন তর্ক রেখে দাও, সেদিন ওদের বাড়ি থেকে যে সরকার এসেছিল, তাকে তুমি নিজে গিয়ে ডেকে এনো। আজই, দেরী কোরোনা।"

দাদাকে ঠকিয়ে নবীনের মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। ফন্দীটা এত সহজ, এর সফলতাটা দাদার পক্ষে এত হাস্যকর যে, তারি অমর্য্যাদায় ওকে লজ্জা ও কষ্ট দিলে। দাদাকে উপস্থিত মতো ছোট খাটো অনেক ফাঁকি অনেকবার দিতে হয়েচে, কিছু মনে হয়নি; কিন্তু এত ক'রে সাজিয়ে এত বড়ো ফাঁকি গ'ড়ে তোলার গ্লানি ওর চিত্তকে অশুচি ক'রে রেখে দিলে।

(ক্রমশঃ)

তেল আর আলো

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রদীপের তেল খরচ হ'য়ে যায়, তার আলো জ্বলে। তার একদিকের ক্ষতির সঙ্গে আরেকদিকের লাভের তুলনা হয় না। তেলকে হিসাবের মধ্যে আনা যায়, আলোকে তেমন ক'রে ধরা যায় না।

যেটা জমাচ্চি সেটা ব্যবহারমাত্র করচি সেইটেতেই মানুষের চরম মূল্য নয়। কারণ মানুষ দ্বিজ, তার দ্বিতীয় জীবনের মধ্যে তার প্রথম জীবন সার্থক হলে তবেই তার সফলতা। এই প্রথম জীবনের সঙ্গে দ্বিতীয় জীবনের কত তফাৎ? তেলের সঙ্গে শিখার যত তফাৎ। অর্থাৎ এটির সঙ্গে অন্যটির তুলনাই হয় না।

যেহেতু মানুষের মধ্যে এই দুইটি স্তর আছে, যেহেতু মানুষের একটা স্তর নীচে, আর একটা স্তর উপরে, সেইজন্যে সকল কাজের মধ্যেই মানুষের একটা পরিচয়ের ঊর্দ্ধে আরো একটা পরিচয় চাই। সেই আরো একটার পরিচয় দিতে না পারলে মানুষ লজ্জিত হয়।

পেট-ভরানো কাজটা শরীররক্ষার জন্যে—এখানে আহার ব্যাপারে জন্তুর সঙ্গে যদি তার প্রভেদ না থাকৃত তাহলে ক্ষতি কি ছিল? কেননা শরীররক্ষার চেষ্টায় মানুষ জন্তুর সমশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু পেট ভরাবার উদ্দেশ্যে কোনোমতে গিলে খেতে মানুষ লজ্জা পায়। এইজন্যে শুধুমাত্র খাওয়ার স্তরের উপরেও সে আর একটা স্তর রচনা করে। সে আহার ব্যাপারে শুধুমাত্র ক্ষুধাকে যথাসম্ভব চাপা দেয়। ভোজের আকারে রঙে গন্ধে পাত্রসজ্জায় এবং ভোজনের নিয়মে সংযমে সে আহারটাকে শোভন ক'রে তোলে। এতে ক'রে ভোজনব্যাপারে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনের অংশ অনেক বেড়ে যায়। এই অপ্রয়োজনের বিভাগটিই হচ্চে মানুষের চরমস্তরের বিভাগ—বাঘ ভালুক কুকুর বেড়ালের এই অপ্রয়োজনের বালাই একেবারে নেই।

শুধুমাত্র পেট ভরাবার জন্যে ক্ষুধার তাড়নায় খাওয়াটা হচ্চে প্রদীপের তেলের দিক্, কিন্তু সমগ্র আহারব্যাপারে যে সামাজিকতা, যে নিয়ম সংযম, যে শোভনতা সেইটেই হল আলোর দিক। খাওয়ার ব্যাপারেও মানুষকে এই আলো জ্বালতে হয়েচে, নইলে তার বড় লজ্জা। বস্তুত সেইখানেই বর্ব্বরতা, যেখানে মানুষের কেবল নীচের একটা তলাই আছে, উপরের তলাটা অনারব্ধ বা অসমাপ্ত।

যেমন আহারকে, তেমনি স্ত্রীপুরুষের ভালবাসাকে মানুষ শুধু তেলের কোঠায় স্থূল ক'রে রাখেনি—তা'কে আলো ক'রে তুলেচে—সৌন্দর্য্যে সংযমে নিষ্ঠায় ত্যাগে সেই আলোর শিখা স্বর্গলোককে উদ্ভাসিত করচে। এই আলোটি যেখানে জ্বলল না সেখানে মানুষের লজ্জার শেষ নেই।

মানুষ যাকে সভ্যতা বলচে সেটা আর কিছুই নয় তার সকল জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম ও ভোগের উপরকার দ্বিতীয় তলার চূড়াকে অভ্রভেদী ক'রে তোলা। যেটা কেবলমাত্র প্রয়োজন অর্থাৎ অভাব, সেটাকে নীচে ফেলে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে তার উপরে ভাবের সৃষ্টিকে বিস্তার করা।

হৃদয়ের আবেগকে বাইরে আশু প্রকাশ করায় মানুষের একটা গরজ আছে। সেই প্রকাশের মধ্যে যতক্ষণ কেবলমাত্র সেই গরজটুকু দেখা দেয় ততক্ষণ সেটা মানুষের পক্ষে বড় জিনিস নয়; এমন কি, সেটা আমাদের পক্ষে বিরক্তিকর

ও ক্ষতিকর হ'তে পারে। কিন্তু যখনি মানুষ এই সমস্ত হৃদয়াবেগকে তেলের মত ক'রে নিয়ে তাকে ছন্দে সুরে রূপে রেখায় আলো ক'রে জ্বালিয়েচে, তখনি সেটা গরজের ক্ষুধাতুর গহ্বরকে নীচে ফেলে সঙ্গীত হ'’স শিল্প হ'য়ে সাহিত্য হ'য়ে অমৃতত্ব লাভ করেচে।

মানুষের এই যে দুটি বিভাগ, এর মধ্যে একটি হচ্চে উপকরণ বিভাগ, আরেকটি হচ্চে সৃষ্টি বিভাগ। উপকরণের বিভাগটা হচ্চে অভাবের বিভাগ—সেখানে আহরণ করতে হয়, জমাতে হয়, মাপতে হয়, ওজন করতে হয়। সৃজন বিভাগে খরচ করতে হয়, মিলিয়ে দিতে হয়; হিসাবে যা পাওয়া যায় সেখানে তার চেয়ে বেশি ঘটিয়ে দেওয়া চাই।

বিশ্বেও আমরা তাই দেখচি। যে বস্তুপুঞ্জকে ওজন করা যায় মাপা যায় সৃজন তার চেয়ে অপরিসীম বেশি। ফুলের বস্তুপিণ্ডের হিসাবকে ফুল কোথায় ছাড়িয়ে গেছে তার ঠিক নেই। এমন কি, ফুলের যে উদ্দেশ্য ফল ফলানো সেও ফুলের মধ্যে প্রকাশ নয়। ফুলের এম্‌নি চেহারা যেন ফুল হওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই।

মানুষের দেহটাকে দেখ। এই দেহের কলটার উপরে সৃজনকর্ত্তা পর্দ্দা টেনে দিয়েচেন। দেহটা যে হজম করবার রক্তচালনা করবার মাংসপেশী স্নায়ু প্রভৃতির দড়ি সুতো সমস্ত টেনে টেনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গতি দেবার একটা উপসর্গ, এ কথাটা প্রচ্ছন্ন ও তুচ্ছ হয়ে গেছে—দেহ আপন দেহ-যাত্রাকে লুকিয়ে ফেলে কাকে প্রকাশ করচে? ব্যক্তিকে। এই ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয়। দৈহিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি দিয়েও এই ব্যক্তিটির সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। এই ব্যক্তিটি হচ্চে আলো, এব উপকরণপুঞ্জের সঙ্গে এর কোনো উপমাই হতে পারে না—এর মস্তিষ্কের সঙ্গে এর চিন্তার, এর চক্ষুর সঙ্গে এর দৃষ্টির, এর মাংসপেশীর সঙ্গে এর নৃত্যের একেবারেই কোনো হিসাবের মিল নেই। সৃজন হচ্চে সকল হিসাবের এই বাড়তি জিনিষ, সেইজন্যে তাকে মায়া বললে দোষ হয় না—কিন্তু এই মায়াটিই হচ্চে চরম সত্য, বস্তুতন্ত্রটা নয়। অর্থাৎ সৃজন ব্যাপারে বস্তুটাই হচ্চে মায়া, আর যে যাদু বস্তুর উপরে নিজেকে প্রকাশ করচে সেই হচ্চে সত্য—যেটাকে ধরতে পারা যায় সেইটেই ফাঁকি, যেটাকে ধরা যায় না সেইটেই আসল জিনিষ।

মানুষও স্বভাবত সৃজনকর্ত্তা। এইজন্যে তার যে-কোনো ব্যাপারেই যেখানে অভাব ভাবকে অতিক্রম করে সেইখানেই সে পর্দ্দা টেনে দিতে চায়। মানুষের সত্যকার আব্রু হচ্চে তার সৃজন দ্বারা বস্তুকে ঢেকে দেওয়া।

মানুষের সেই আব্রু কখন্ চ'লে যায়? যখন তার গরজ অত্যন্ত বেশি হয়। তখনি তার ধর্ম্ম থাকে না, লজ্জা থাকে না, শোভনতা থাকে না; তখনি তার মনুষ্যত্ব চ'লে যায়। আজকালকার দিনে তার একটা লক্ষণ খুব দেখতে পাওয়া যায়। একদিন ছিল যখন বাণিজ্য সমাজের আর সমস্তকে ছাড়িয়ে অত্যুগ্র হয়ে ওঠেনি। বাণিজ্য তখন নম্রভাবে সমাজে আপন স্থানটুকু স্বীকার করত। তাছাড়া বিপুল বিশ্বগ্রাসী লোভের দ্বারা অত্যন্ত উৎকট হ'য়ে কদর্য্য রূপ ধারণ ক'রে পণ্য-উৎপাদন মানুষের জীবনকে দলিত করত না; জীবনের সঙ্গে তার মেলামেশা থাকাতে তার শোভনতা যায়নি।

আজকালকার দিনে বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতি মানুষের অনেক-খানি স্থান জুড়েচে। কিন্তু বাণিজ্যের কিছুমাত্র লজ্জা নেই। উদ্ধত আকারে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সে আপনার বীভৎসতা প্রকাশ করচে। কেননা তার লাভের আশা অপরিমিত বেশি হওয়াতে তার লোভ অতি ভয়ঙ্কর। লোভ যখন পরিমাণে ছোট থাকে তখন সে নিজেকে লজ্জায় সম্বৃত করে—যখন সে বিপুলাকার হয়ে ওঠে তখন আপন আয়তনের গর্ব্বেই তার লজ্জা চ'লে যায়। তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে কলুষিত করার জন্যে তার কৈফিয়তের দরকার হয় না—প্রকাণ্ড লাভের অঙ্কই তার কৈফিয়ৎ। আজ যে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাণিজ্য মানবসমাজে এত প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেচে সেখানে মানুষ আপন যন্ত্রকেই উপকরণকেই বড় ক'রে তুল্‌লে, সেখানে সে আলো জ্বাল্‌লে না, সেখানে সে আপন উপরের চূড়াকে স্বর্গের দিকে তুল্‌লে না, সেখানে সৃজনকে সে অপমান করলে ;—সৃজনকর্ত্তার বিরুদ্ধে দেশে দেশে কদর্য্য বিদ্রোহ বিস্তার ক'রে দিলে। নীচতা নিষ্ঠুরতা প্রবঞ্চনা মিথ্যারও আর অন্ত নেই।

পলিটিক্সও আজকাল প্রচণ্ড লোভের বিষয়। পুরাকালে পৃথিবী এত বড় হ'য়ে উঠে মানুষকে এমন লুব্ধ করে নি। এই লোভের প্রকাণ্ড পরিমাণই লোভের অগৌরব দূর ক'রে দিয়েচে। এই লোভ স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড় বড় নামের দ্বারা নিজের সমস্ত অবিচার অত্যাচার প্রবঞ্চনা চৌর্য্যবৃত্তি গুপ্তচরবৃত্তিকে গৌরবের ছদ্মবেশ পরিয়েচে। এই নাম ত সৃজনের স্থান নিতে পারে না। তাই আজকাল মানুষ আপনার রাষ্ট্রনীতিতে ও বাণিজ্যে আলো জ্বালতে পারলে না, সৃজন দেখাতে পারলে না, পদে পদে সৃজনকে নষ্টই করতে লাগল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

সেদিন রজনী ছিল মুখরিত গানে,
বুকে ছিল কবেকার অকথিত বাণী ;
শুধানু 'আছত ভাল ?'—দৃপ্ত অভিমানে
কেন যে উঠিল রাঙি সুন্দর মুখানি !
সরমে মরিয়া গেনু মৌন সভা মাঝে—
পাংশু মুখে দেখেছিলে নীরব বিস্ময় ?
তাই কি চাহিলে ক্ষুব্ধ পিছু ফিরে লাজে—
দৃষ্টি আড়ালেতে তাই দৃষ্টি বিনিময় !

আমিতো চাহিনি কিছু—যবে একদিন
এসেছিলে হৃদয়ের বড় কাছাকাছি—
শুধু তাই মনে ক'রে আজি বাক্যহীন
দূর হ'তে অন্তরের পরসাদ যাচি।
যেকথা বলিতে গেনু হয়নিকো বলা,
সে ভাষা হারায়ে আজি হ'য়েছি উতলা।

সুরা দেবের কুণ্ড (Basin of Bacchus)

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক
নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত
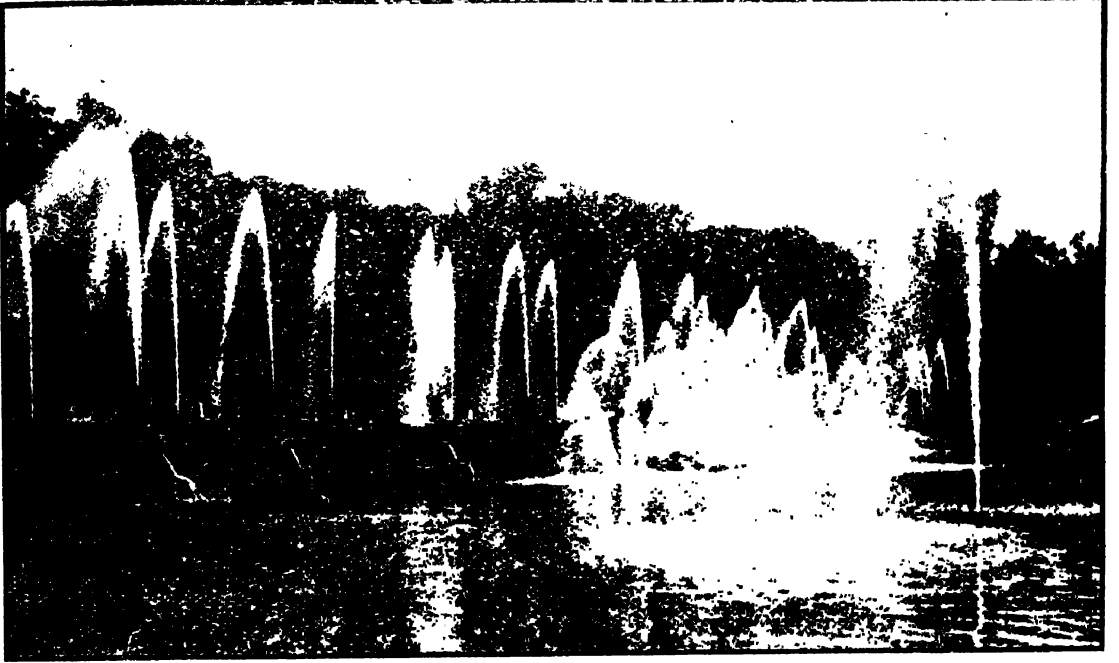
বরুণ (Neptune) কুণ্ড

এপোলো কুণ্ড

এপোলোর স্নানাধার
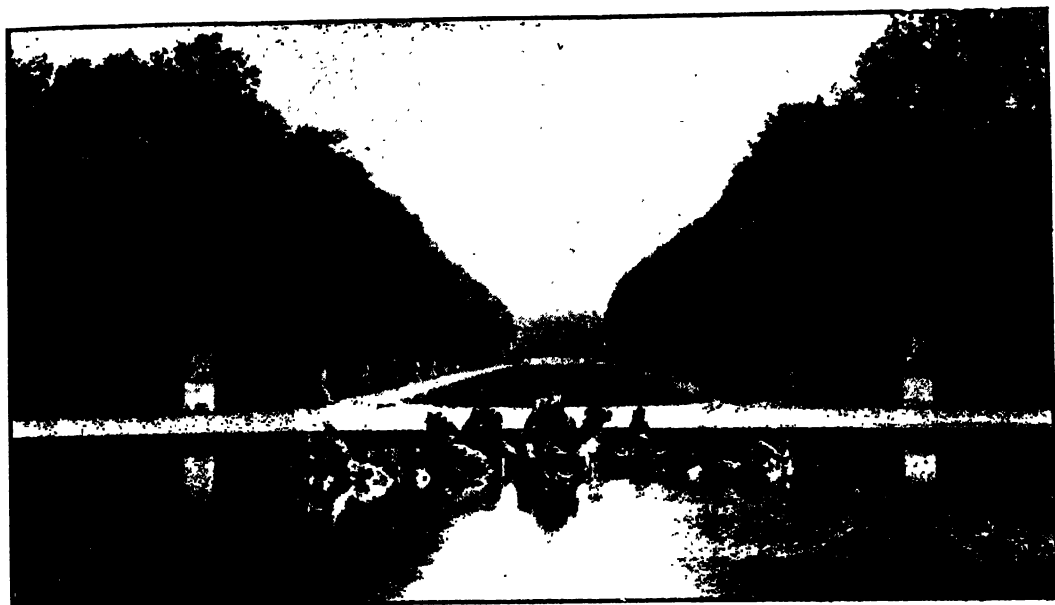
নিদাঘ-বীথি ও মালঞ্চ

এপোলো কুণ্ড এবং রাজ-বীথি
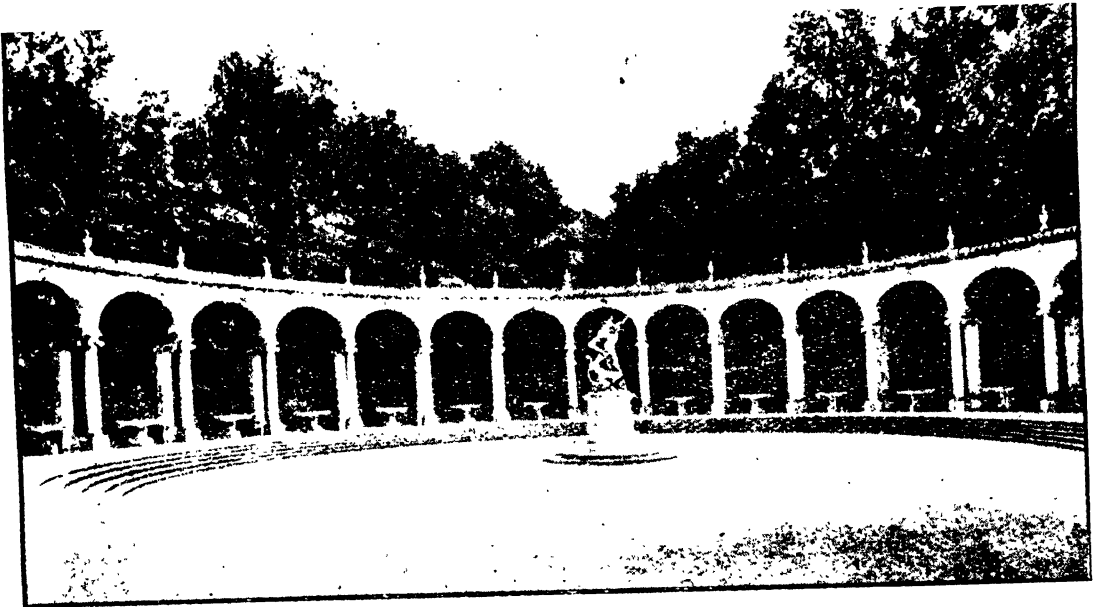
লাতোঁ উৎস

স্তম্ভ-মালা

মর্ম্মর-চত্বর

নগরোদ্যানের দিকে হর্ম্ম্যমুখ

প্রাসাদ ও ভজনালয়

ভানুসিংহের পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯
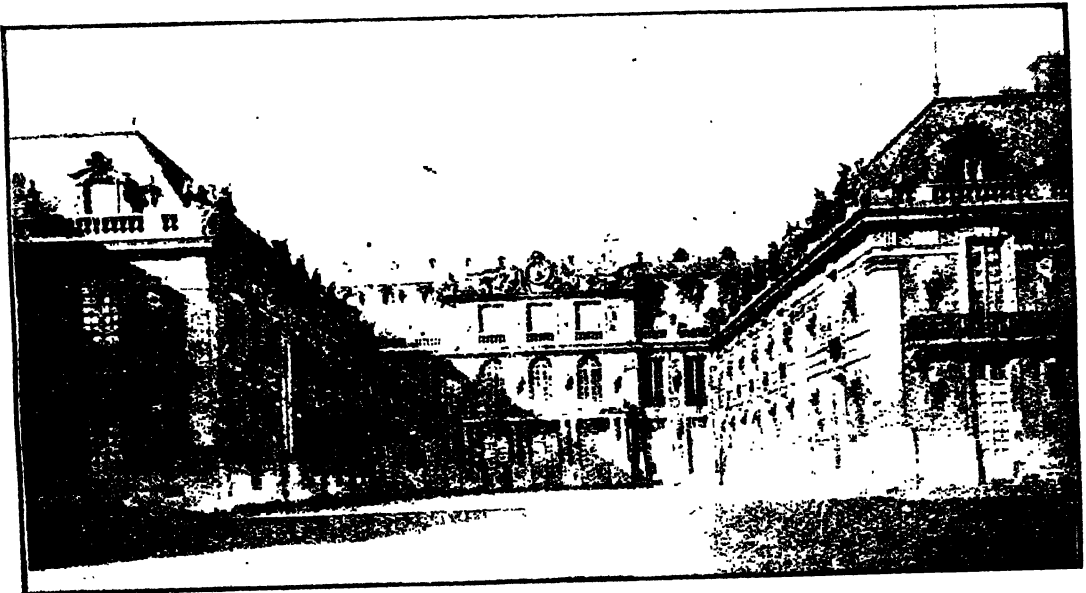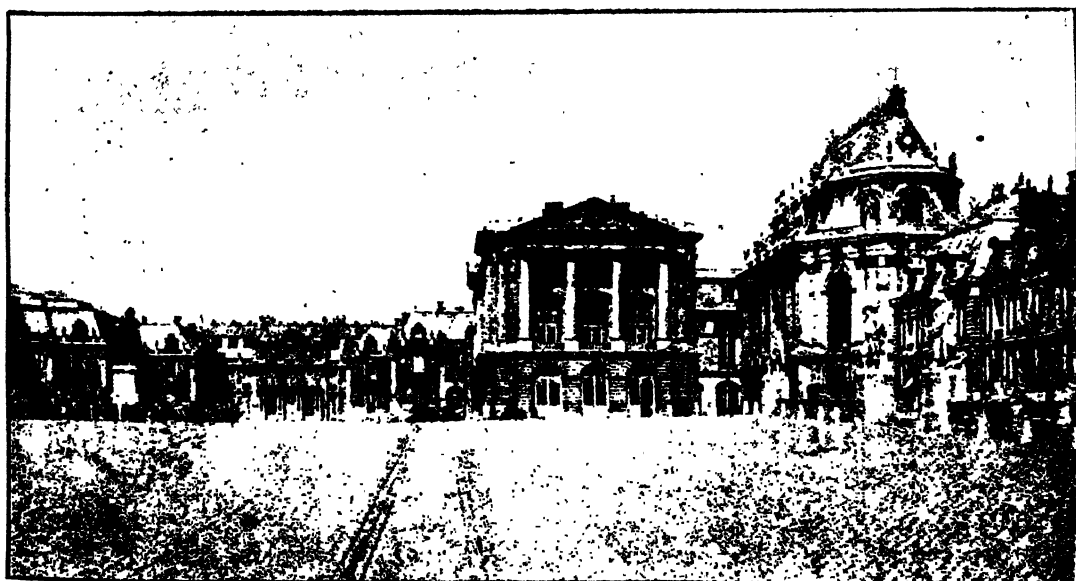
শান্তিনিকেতন

পৃথিবীতে অধিকাংশ বড় বড় জ্ঞানী লোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্য্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য্য গবেষণা এবং যুক্তি-নৈপুণ্য প্রয়োগ করে বলেচেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে আমাদের দর্শন মনন শক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হ'লে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হ'য়ে আসে?

গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, কাজেই পরাস্ত হ'য়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তার সব ভাষ্য ঘেঁটে বলেচেন যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা, ঘুম হ'লে অনিদ্রা ব'লে জগতে কোনো পদার্থ থাক্‌তই না। এতবড় কথার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝতেই পারি না, আমাদের ত দিব্যদৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন করিনি, সেই জন্যে সংশয়-কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক ক'রে থাকি যে, রাত্রে কয়েক ঘণ্টা না ঘুমোলেই সেটাকে লোকে অনিদ্রা ব'লে নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্তত বারো ঘণ্টাই যে কেউ ঘুমোইনে সেটাকে ডাক্তারী শাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই ত অনিদ্রা বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্ব্বাচীন ব'লে হাস্য করেন; বলেন আজকালকার ছেলেরা দুচার পাতা ইংরেজি প'ড়ে তর্ক করতে আসে, জানেনা যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে নিদ্রা, তর্কে বহু দূর।"

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বারবার পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, তর্ক যতই করতে থাকি নিদ্রা ততই চ'ড়ে যায়, বিনা তর্কে তার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব আজকের মত চিঠি বন্ধ করে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তা' হ'লে কাল সকালে চিঠি লিখব।

চিঠি বন্ধ করা যাক, কেরোসিন প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক্, ঝপ ক'রে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক্। শীত,—বেশ একটু রীতিমত শীত,—উত্তর-পশ্চিমের দিক থেকে হিমের হাওয়া বইচে। দেহটা ব'লে উঠ্‌চে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ ক'রে মোটা কম্বলটা মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো, অনন্যগতি আমি তোমার আজন্ম-কালের অনুগত, আর আমরণ কালের সহচর, তাই ব'লেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে? দেখ্‌চ না, পা দুটো কি রকম ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেচে, আর মাথাটা হয়েচে গরম? বুঝচ না কি এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের লক্ষণ,—এ সময়ে মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দ্দূল-বিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম্ম?" কায়ার এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন ব'লে উঠ্‌চে, "ঠিক্ ঠিক্! একটুও অত্যুক্তি নেই।" ক্লান্ত দেহ এবং উদ্‌ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা করতে পারিনে, অতএব চল্লুম শুতে।

প্রভাত হয়েচে। তুমি আমাকে বড় চিঠি লিখ্‌তে অনুরোধ করেচ। সে অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাব-সঙ্গত নয়, পল্লবিত ক'রে পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখিনি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব'লে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা ক'রে থাকেন,—মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখ্‌তে পারিনে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী, এবং তখন আমার চিঠি অগত্যা যথেষ্ট বিরল হ'য়ে আস্‌বে, সেই জন্যে আগামী অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে বড় চিঠি লিখ্‌চি। সে অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব, এবং সেটা পূরণ করবার আর কোনো উপায় নেই, এটা কল্পনা করচি নিছক অহঙ্কারের জোরে। আসল কথাটা এই .য, এবার তুমি যে চিঠিটা লিখেচ সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়, সেই জন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্ব্বে বড় চিঠি লিখ্‌চি। তুমি নামতায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার কর্ম্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তার বিদ্যায় কিছুতেই আমাকে পেরে উঠ্‌বে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিৎ আছে, সেইখানে তোমার অহঙ্কার খর্ব্ব করবার ইচ্ছা আমার মনেএল। ইতি ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০।

সমাপ্ত

পয়োকুম্ভ
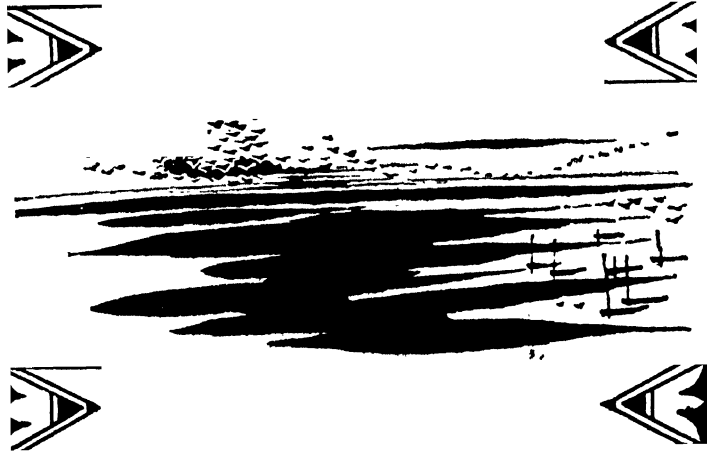
—গল্প—

—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

১

কিছু আগে বেশ একটু ঝড় ঝাপ্টা হইয়া গিয়াছিল।

এ সংসারে ইহা আকস্মিকও নয়—আশ্চর্য্যেরও নয়,—ইহা প্রায় নিত্যকার ঘটনা। আজ পাঁচ-সাত বৎসরের ক্রমাগত অভ্যাসে হরিপদর এ সমস্ত যেন গা-সহা হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং, ইহাতে বৈচিত্র্যও যেমন ছিল না, বিস্ময়েরও কিছু ছিল না। ঝগড়া-বিবাদ, রাগা-রাগি, খিটিমিটি হরিপদর অভ্যস্ত মনের উপর বিশেষ কোন দাগ বসাইতেই পারিত না। তথাপি আজ নির্জ্জন সন্ধ্যায় বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে বসিয়া হরিপদ বাহিরের অন্ধকারের সঙ্গে নিজের অন্তরের অন্ধকার মিশাইয়া একান্তমনে এই সব কথারই চিন্তা করিতেছিল। এই অশান্তির বহ্নি কি তাহাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমানই ভোগ করিতে হইবে? ইহার কি আর শেষ নাই, অন্ত নাই, নিবৃত্তি নাই? এ-জন্মের পাপের বোঝা ত জ্ঞানতঃ তাহার এমন বিশেষ কিছু জমে নাই, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সে-বোঝা কি তাহার এতই ভারি যে তাহার ভোগ এমন মর্ম্মান্তিক ভাবে তাহার সকল দিক এমন করিয়া তিক্ত-বিষাক্ত করিয়া তুলিবে! জীবনভোর এই অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যেই কি তাহার শেষের দিনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে?

খানিক চুপ করিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে তাহার শ্রান্ত অন্তস্থল হইতে একটা গভীর শ্বাস বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে গলির দিকের দরজা ঠেলিয়া একটা কুড়ি একুশ বৎসরের ছেলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ও অন্ধকারের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত দাড়াইয়া থাকিয়া, হরিপদর অস্পষ্ট অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মামাবাবু, মামীমা ঝগড়া করেচেন বুঝি?"

ইহার কোন জবাব না দিয়া ধীরে ধীরে হরিপদ শুধু কহিল,—"সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল?"

সুরজিৎ তক্তাপোষের উপর হরিপদর পাশে বসিয়া কহিল,—"হাঁা, মামাবাবু।—তা'হলে এখনো বোধ হয় আপনার চা খাওয়া হয় নি?"

নৈরাশ্য জড়িত কণ্ঠে হরিপদ কহিল,—"তা'তে কোন ক্ষতি হ'বে না রে সুরো! অসুখের প্রাণে সখের চা না হ'লেও চল্‌তে পারবে। তবে ডাল ভাত দু'বেলা দু'টা চাই-ই,—খালি দু'টী ডাল-ভাত—আর কিছু নয়। হয় ত, তা'ও না হ'লে হ'তে পারতো, কিন্তু এই শাস্তির ওপর অনাহারে থেকে আত্মহত্যার পাপটা আর অর্জ্জন কত্তে ইচ্ছে হয় না।"

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া সুরজিৎ দেওয়ালের গায়ের কেরোসিন-ল্যাম্পটা জ্বালাইয়া মাতুলের ব্যথিত ক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বোধ হয় কিছু একটা সমবেদনার কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল—হঠাৎ ছোট মামীমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া।

অন্দরের দিকের দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া, চায়ের কেট্‌লিটাকে ঘরের মধ্যে একটু ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইতে নন্দরাণী কহিল,—"এই চা রইল গো, ঘরের বাবুরা! চায়ের কথাটাই হচ্ছিল বুঝি? তা একটু দেরী হ'য়ে গেছে বটে,—অপ্‌রাধ যেন মার্জ্জনা হয়!" মিনিটখানেক দরজার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল,—"এ-বেলা আর রান্না-বান্না পেরে উঠ্‌বো না। খেতে হ'লে বাজার থেকে খাবার দাবার আনিয়ে খেতে হ'বে। বাড়ীর রাঁধুনির আজ শরীর খারাপ।"

হরিপদ ইহার উত্তরে কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, সুরজিৎ তাহাকে থামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—"কথা আর বাড়্‌তে দেবেন না মামাবাবু; জানেন ত, মামী-মার মাথাই ঐ রকম খারাপ।"

অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থা হইতে হরিপদ সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"মাথা খারাপ কি রে স্নুয়ো? জগতে এ রকম ভালো মাথা খুব কমলোকেরই আছে তা জানিস? হাঁ কোর্ত্তেই পেটের কথা অনুমান করে নেয়, আর ত'ার সূক্ষ্ম অর্থ বার করে নিতেও যা'র তিলমাত্র দেরী হয় না, তা'র মাথার মত মাথা কা'র আছে রে? তোর আছে? আমার আছে?"

"চুপ করুন, মামাবাবু।—আপনার চায়ে আর চিনি লাগবে কি? ভাল কথা,—সাহেব বল্লে, সুতোর দর শীগ্‌গীরই চড়ে উঠবে।"

চা খাইয়া সুরজিৎ রান্নাঘরের দাওয়াতে, যেখানে নন্দরাণী মেজেয় আঁচল পাতিয়া অন্ধকারের মধ্যে শুইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া খুঁটী ধরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"কি ভয়ানক ব্যাপার মামীমা গো! জীবনে কখনো এ রকম আর দেখি নি।

নন্দরাণী 'হুঁ'ও নয়—'হাঁ'ও নয়,—যেমন শুইয়াছিল, তেমনি শুইয়া রহিল।

সুরজিৎ খুঁটীর ধারে উবু হইয়া বসিয়া পুনরায় কহিল,—এমন মার মারলে যে নেপালীটার মাথাই আর খুঁজে পাওয়া গেল না, খালি ধড়টা রক্তে ভাসতে লাগ্‌লো।"

তবুও নন্দরাণী নীরব রহিল দেখিয়া মিনিট খানেক পরে সুরজিৎ আবার কহিল,—"কিন্তু, বলিহারী মামীমা, সেই কোন্ মহারাষ্ট্রী ডাক্তারের আঠারো উনিশ বছরের মেয়েটীকে! একলা লাঠি হাতে বেরিয়ে এসে এত লোকের মাঝখানে সেই চোদ্দজন গুণ্ডাকে কি রকম ভাবে যে ঠেঙ্গাতে আরম্ভ কল্লে, আর পাছু তাড়া করে একেবারে মানিকতলার পোল পার করে দিয়ে তবে ছাড়লে! আশ্চর্য্য মামীমা—আশ্চর্য্য! পুলিশের বড় সাহেব মেয়েটিকে 'য়্যারেষ্ট' করে নিয়ে গিয়েছিল; লাট সাহেব আবার না কি নিজে গিয়ে খালাস করে দিয়ে, তাকে 'রিওয়ার্ড' দেবার ব্যবস্থা——

নন্দরাণী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় রে?"

"তবে বলি শোন মামী মা," বলিয়া সুরজিৎ তাহার সেই চমকপ্রদ ঘটনার ইতিবৃত্ত বলিতে সুরু করিল। দীর্ঘ রোমহর্ষণকারী কাহিনী শেষ করিয়া সে কহিল,—"ঘুরে ঘুরে এত ক্ষিদে পেয়ে গেছে মামী মা যে আর বলবার নয়।"

নন্দরাণী কহিল,—"খিদে পেয়ে থাকে খাবার আনিয়ে খাওগে। আজ ত তোমাদের দোকানের খাবার খেয়েই থাকতে হবে।"

"না মামীমা, দোকানের খাবার আর খাব না। তার চেয়ে খিদে চেপে শুয়ে থাকি গে।"

"তা' কি কর্ব্ব বল? রান্না-বাড়ীর দাওয়ানীগিরীতেও ত শরীরের ভালমন্দ আছে। কল ত আর নয় যে বারমাস তিরিশ দিন সমানে চলবে! কলও মাঝে মাঝে খারাপ হয়।"

"আচ্ছা, মামীমা, চালটা ডালটা একটু দেখিয়ে ঠিক করে দেবে? ষ্টোভটা জ্বালিয়ে আমিই না হয় চারটি খিচুড়ী—

খানিক নীরবে থাকিবার পর একটু ঝাঁজের সহিত নন্দরাণী কহিল,—ষ্টোভ্ জ্বালিয়ে আর খিচুড়ী রাঁধতে হবে না। দেখি, বুকের ব্যথাটা যদি একটু কমে ত দু'টী 'ভাতে-ভাত্'-এর ব্যবস্থা কর্ব্ব এখন।—নিমতলার ঘাটে না শুলে ত আর এ পেড়ারের আমার নিবৃত্তি নেই! দু'বেলা বাকি-যন্ত্রণাও সহ্য কত্তে হবে, আবার ভাত-হাঁড়ির ভাতও যোগাতে হ'বে। কি তপিস্যিই যে আর জন্মে বসে বসে করেছিলুম, নইলে আর এমন হাতে পড়ি!" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিতে লাগিল,—"গরীবের ঘরের মেয়ে বলেই এতটা খেটে গেল। নইলে আ'রও একজন ত রয়েচে; সেখানে বাবা টাঁ্যা-ফো চল্‌বে না। সে যে পয়সা-ওলা বাপের মেয়ে! সখের ওপর তায় যাওয়া আসা। সেই হ'ল পেয়ারের পরিবার,—রাণী ভিক্টোরিয়া! অমন মিহি সুরে কথাও কইতে পার্ব্ব না, অমন ন্যাকামী আদিখ্যেতা ও দেখাতে পার্ব্ব না। আমি হলুম গিয়ে ঘোর ঝগড়াটে মনিষ্যি; বিয়ে হ'য়ে পর্য্যন্ত খালি অশান্তির আগুনই আমি জ্বেলে বেড়াচ্চি। তা' আমাকে নিয়ে ঘর না কল্লেই ত হয়। বলে——

চাই না তোমার ক্ষীরের স্বর—চাই না তোমার দুধের চাঁচি,
গায়ের জ্বালায় মলুম যে গো—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি

সুরো, এই বলে রাখচি, কাল সক্কালেই একখানা গাড়ী এনে দিবি, আমি বেনেটোলায় চলে যাবো। এখান থেকে চলে গেলে আমিও বাঁচবো—তোরাও বাঁচবি? কিন্তু এও বলে রাখি,—এই

নটে পটে দুচার দিন—
সজ্‌নে বার মাস।

তা' যা'ক, কাল সক্কালেই কিন্তু আমায় গাড়ী এনে দিবি, এই বলে রাখলুম,—বুঝেছিস্?"

সুরজিৎ বলিল,—"আচ্ছা গো, সেত কাল—আজ ত আর নয়।"

"আজ এই রাত্রেই হ'লে তোদের পক্ষে সেটা ভাল হয় বটে।" বলিতে বলিতে নন্দরাণী উঠিয়া বোধ হয় দুটী ভাতে-ভাত্-এর জোগাড়েই ভাঁড়ারের দিকে চলিয়া গেল।

২

বিধির বিধানে হরিপদর দুই বিবাহ; এবং এই দুই বিবাহ, বছর দশেক পূর্ব্বে, মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই ঘটিয়াছিল।

গ্রামের স্কুল হইতে হরিপদর ম্যাট্রিক পাশ করিবার সময়ই গ্রামের জমীদার দীনদয়াল সরকারের দৃষ্টি তাহার উপর প্রথম পতিত হয়। তারপর যখন সে কলিকাতা হইতে আই, এ, পাশ করে, তখনই সরকার মশায় কলিকাতা আসিয়া হরিপদর পিতার নিকট প্রস্তাব করিয়া মাতৃহীন হরিপদর সহিত কন্যা নয়নমঞ্জরীর বিবাহ দেন।

সরকার মশায় পাকা জমীদার। নিজের প্রখর বুদ্ধি ও বিবেচনার বলে পৈতৃক জমীদারীর হাজার দশেক টাকার আয়কে তিনি চব্বিশ হাজারে দাঁড় করাইয়াছিলেন। হরিপদর পিতা সখানাথ বসুর বিষয় বৈভব তেমন কিছু না থাকিলেও, বিষয়-বুদ্ধিতে তিনিও সরকার মশা'য়ের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। সুতরাং, এই বিবাহের সূত্র করিয়া উভয় বেহাই পরস্পর মনে মনে যে হিসাব আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে রং ফলাইতে কাহারও কোন ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু গোলও বাঁধিল এই হিসাব লইয়া মাস দুতিন যাইতে না যাইতে। উভয়ের মন-গড়া হিসাবের মধ্যে পরস্পর বিরোধী এমন একটা ভয়ানক রকম গরমিল প্রকাশ হইয়া দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল যে তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা সাংঘাতিক রকম সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল এবং সখানাথ সামনে যে মাসে বিয়ের দিন পাইলেন সেই মাসেই তাল ঠুকিয়া আবার অন্যত্র পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং সরকার মশায়ও বেহাইকে সদর্পে বলিয়া পাঠাইলেন যে, নয়ন তাঁহার মেয়ে নয়, ছেলে। চব্বিশ হাজারের মধ্যে আট হাজারের মালিক হইয়া সে আর দুই ছেলের মতই চিরকাল তাঁহার ঘরে থাকিবে। তখন সখানাথ বলিলেন, আচ্ছা, দেখা যাবে, সরকার মশায়ও কহিলেন, আচ্ছা দেখা যাবে। কিন্তু এই দেখা-দেখির পালাটা হঠাৎ সূচনাতেই বন্ধ করিয়া দিলেন স্বয়ং ভগবান,—সখানাথকে পর বৎসর কাছে টানিয়া লইয়া।

মাতৃহীন হরিপদ পিতৃহীন হইয়া লেখা পড়া ছাড়িয়া দিল এবং পৈতৃক সূতার কারবারের তত্ত্বাবধানের জন্য কলিকাতার বাসাতেই স্থায়ীভাবে থাকিবার বন্দোবস্ত করিল।

সরকার মশায় দেখিলেন ঝগড়া বিবাদ আর নিষ্প্রয়োজন। তিনি হরিপদকে বুঝাইলেন, হরিপদও বুঝিল, কিন্তু শ্বশুরের ইচ্ছানুযায়ী পৈতৃক সূতার কারবার উঠাইয়া দিয়া গ্রামের স্কুলে হেড মাষ্টারি চাকুরী করিতে নারাজ হইল।

তখন হইতে হরিপদর সংসারে বার মাসের জন্য আসিয়া রহিল—নন্দরাণী। আর নয়নমঞ্জরী মধ্যে মধ্যে, কখনো পনর দিন, কখন বা এক মাস আসিয়া থাকিয়া যাইত। কলিকাতা'য় স্বামীর সংসারে বারমাস আসিয়া থাকিবার পক্ষে অন্তরায় ছিল তাহার স্বাস্থ্য। সরকার মশায় বলিতেন কলিকাতার জলহাওয়া তাহার কিছুতেই সহ্য হয় না এবং হইবেও না। বেশীদিন কলিকাতায় থাকিলেই তাহার নাকি 'নোনা' লাগিত। তাই নয়নমঞ্জরীর বা'রমাস এখানে থাকা চলিত না।

তবুও বারমাস ধরিয়া নন্দরাণী ঝগড়া-ঝাটি করিয়া যে বিষের পাথর হরিপদর মনের উপর চাপাইয়া রাখিত, অল্প কয়েক দিন থাকিয়াই নয়ন তাহা সরাইয়া দিয়া যাইত। তাই এক একবার বড় দুঃখেই হরিপদ ভাবিত যে নয়ন যদি নন্দ হইত, আর নন্দ হইত নয়ন!

কিন্তু তাহা হইবার নহে বলিয়াই হয় নাই। সুতরাং এইরূপ পনর আনা তিন পাই অশান্তির সহিত একপাই

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

শান্তি মিশিয়া হরিপদর দিন এইভাবেই কাটিয়া আসিতেছিল।

৩

মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর হইতে হরিপদর কয়েকজন পুরাতন সুতার খরিদ্দার প্রতিমাসেই সুতা কিনিতে কলিকাতায় আসিত। একখানি ভাল মটকার সাড়ী আনিবার জন্য গতবারে হরিপদ তাহাদের বলিয়া দিয়াছিল। আজ সকালে সেই সাড়ী লইয়া তাহারা হরিপদর বাসায় আসিয়া বসিয়া বসিয়া নানারূপ গল্প গুজব করিতেছিল।

সাড়ীখানি হাতে করিয়া সুরজিৎ নন্দরাণীর সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"মামীমা, কেমন সুন্দর সাড়ী এল তোমার দেখ। চাঁপা ফুলের জমির ওপর লাল-সবুজের পাড়টি;—পরলে পরে কী সুন্দরই যে দেখাবে তোমায় মামীমা, ঠিক লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত দেখাবে। একবার পর মামী-মা। আমি দেখি—আর তোমার পায়ে একটা গড় করে নি।"

তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া শ্লেষের স্বরে নন্দরাণী কহিল,—"লক্ষ্মী ঠাকরুণ? আমি? কি বলচিস্ তুই রে ছোঁড়া? আমি হলুম ঘোর অলক্ষ্মী। আমার মত অলক্ষ্মী, ঝগ্‌ড়াটে, যাচ্ছেতাই, পাজী, নচ্ছার, বদ্‌মাইস, নেমকহারাম——

সেই লোকগুলি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈঠকখানা ঘরে বসিয়াছিল। তাহারা চলিয়া গেলে, হরিপদ ভিতরে আসিয়া কহিল,—"আক্কেল বলে জিনিসটা যে তোমার কম তা আমি জানি, কিন্তু সেই কমের মাত্রাটা যে কতখানি, সেইটে এখনো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। ভদ্রলোকেরা বাইরে বসে, আর তুমি যেরকম থিয়েটারের পার্ট প্লে কচ্ছিলে-----

"কি কর্ব্ব বল? থিয়েটারের পাট ত আজ নতুন কচ্চি না, চিরকাল ধরেই যে করে আসচি! ভগবান কোকিল কণ্ঠী করে ত আর তৈরী করেন নি, তা মিহি সুর বার করব কোত্থেকে বল? সেই কে না বলছিল—'অ বউ, তোর ছেলে কাঁদ্‌চে কেন?'—না—'কাঁদবে কেন মা, ওর মুখই ঐ রকম।' আমারও ঠিক তাই কি না। আমার মুখই ঐ রকম। তবে, চেষ্টা চরিত্তির করে দেখি, দুটো একটা কোকিল টোকিল যদি এ জন্মে পুড়িয়ে খেতে পারি।"

"কোকিল পুড়িয়ে আর তোমার খেতে হবে না। গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে এ জন্মে স্বামী ভক্তিটা যে রকম চূড়ন্ত দেখিয়ে গেলে, এর ফলে, আর তোমার জন্মই হবে না—একেবারে অক্ষয় স্বর্গবাস।"

"তাই না কি? তবু ভাল,—যা' হোক একটু আশা হল।"

শয়ন ঘরের দিকে যাইতে যাইতে হরিপদ বলিল—"হ্যাঁ। তার ওপর, আমার তরফ থেকেও আশীর্ব্বাদের একটু জোর আছে। জ্বলন্ত প্রাণটাকে আজ সাত বছর ধরে যেরকম শীতল করে রেখেছে,——

খানিক পরে ঘরের ভিতর হইতে হরিপদ হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, বালিসের তলায় একখানা কাগজ ছিল, কি হল?"

একটু বিলম্বে নন্দরাণী দালান হইতে উত্তর করিল,—"বিছানা কত্তে গিয়ে কি একখানা কাগজ মেজেয় উড়ে এসে পড়েছিল, সে আমি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছি।"

হরিপদ বাহিরে আসিয়া কহিল,—ঝাঁট দিয়ে ত ফেলে দিয়েছ, কিন্তু ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেবার কাগজ সেটা ছিল না।"

"তা, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, কি করে জানবো যে—

চোক মুখ রাঙ্গা করিয়া হরিপদ কহিল,—"সুতরাং সেটা ফেলে না দিয়ে রেখে দেওয়াই উচিৎ ছিল। দু'ঘণ্টা বসে বসে কাল জগবন্ধু ডাক্তারের কাছ থেকে তোমার বুকের ব্যথার প্রেসকৃপসান্‌টা লিখে এনেছিলুম কি না! সেই জন্যে—

নন্দরাণী বিদ্রুপের হাসি হাসিতে হাসিতে ছড়া বলিবার সুরে বলিল,—

"যাদ্দিনের পরে আমার কপাল ফিরেচে।
'বাড়ীর গিন্নীটি' 'গিন্নীটি' বলে বৌমা ডেকেচে।
—ওরে, অ সুরো, আর বাঁচব না রে আমি, আমার কপাল ফিরেচে! আমার জন্যে ওষুধের পেস্‌কিপসান্ হ'য়েছে!"

ধীরে ধীরে চিবাইয়া চিবাইয়া হরিপদ বলিল,—"এ ব্যঙ্গের মানে?"

"মানে, যে—কখ্খনো হয় না, হঠাৎ হোলো—তাই বলচি।"

"কখ্খনো হয় না?"

"হয়ই না ত। আর হবারও ত দরকার নেই। ওষুধ-পত্তর আনলে আমিত সে খাবও না,—ঠিক ফেলে দোবো।"

"সুতরাং আমি তা নিশ্চয়ই আনবো না। তবে তার সঙ্গে খোকার ওষুধটাও লেখা ছিল কি না।"

"খোকার ওষুধও আনতে হবে না। জ্বর হোয়েচে, পড়ে পড়ে ভুগবে—তারপর আপনি সেরে যাবে। ওষুধ।—ওরে বাপরে! কি সর্ব্বনাশ! খোকার ওষুধ আনলে, সেও আমি ফেলে দোবো——হ্যাঁ রে, অ মুখপোড়া ছেলে, এই জ্বরে সারা হচ্চিস্, আর উঠোনে বসে ঐ জল ঘাঁট্‌ছিস? হতছাড়া ছেলে, মরে গেলে, দেখবে কে তোকে রা?"

হরিপদর তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রটি উঠানে বসিয়া বালতিতে হাত ডুবাইয়া জল ঘাঁটিতেছিল।

বিষম গর্জ্জাইয়া উঠিয়া নন্দরাণী হাঁক পাড়িল,—"যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছে হ'য়েছে, তাই অমন করে জল ঘাঁট্‌চিস্? দাঁড়া, মুখপোড়া ছেলে, এই জ্বরের ওপরেই তোর পিঠের চামড়া আমি তুলচি" বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া তাহার দিকে যাইতেই, সুরজিৎ রোয়াকের উপর মটকার সাড়ীখানি রাখিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

বৈকালে হরিপদ দোকানে চলিয়া যাইলে নন্দরাণী মটকার সাড়ীখানি হাতে করিয়া সুরজিতের পড়িবার ঘরে আসিয়া বলিল,—"সুরো, সাড়ীখানা সত্যিই বড় চমৎকার, না?"

সুরজিৎ কহিল,—"হাঁ, মামীমা,—পর না একবার।"

"দূর পাগল! কা'র জিনিস পরব? এ তোর বড় মামীমার, না?"

"না গো না, এ বড় মামীমার নয়; মামাবাবু এ তোমার জন্যে আনিয়েচেন। কত দাম বল দেখি?"

"কত?"

"বত্রিশ। কোলকাতা হলে আরও বেশী হোত।"

সাড়ীখানির পাট খুলিয়া নন্দরাণী প্রশংসার চক্ষে দেখিতে লাগিল।

রাত্রে হরিপদ দোকান হইতে যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার হাতে একখানা পত্র ছিল। পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া নন্দরাণীর উদ্দেশে কহিল,—"নন্টুর বিয়ে। নেমন্তন্নর চিঠি দিয়েচে। অনেক করে তোমাকে নিয়ে যেতে লিখেচে, যেতে হবে। সুরো না হয় ক'টা দিন কোন রকমে এখানে থাকবে এখন।"

নন্দরাণী কহিল,—"বনপুর? গলায় দড়ি আমার। আমি যাব বনপুরে বড়রাণীর ভাইয়ের বিয়েতে খাটা খাট্‌তে? সে আমি প্রাণ থাকতে যাব না। তুমি যাও—তোমার হ'ল গিয়ে——

"গেলে যে খাটা খাট্‌তেই হবে, তা বুঝলে কি করে। বলিহারী যাই তোমার বোঝবার ক্ষমতাকে। এমন সাফ মাথা——

"তা যাই হোক্, বনপুর আমি প্রাণ গেলেও যাব না।"

সে রাত্রে এই যাওয়া না-যাওয়া লইয়া তুমুল একটা ঝগড়া হইয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়াই নন্দরাণী জোর করিয়া সুরজিৎকে দিয়া গাড়ী আনাইয়া বেনেটোলায় চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল,——"ঝাঁটা খাই, লাথি খাই, এইখেনেই খাব। তা' বলে, সতীনের দোরে গিয়ে মাথা গলাব, প্রাণ থাকতে তা' হ'বে না।"

তবুও রাত্রে দোকান হইতে ফিরিবার পথে, হরিপদ বেনেটোলায় যাইয়া নন্দরাণীকে অনেক করিয়া বুঝাইল এবং অনেক উপদেশ দিল। এমন কি শেষে মিনতি পর্য্যন্ত করিল যে, না গেলে নয়নমঞ্জরী বিশেষ দুঃখিত হইবে। কিন্তু নন্দরাণীর একই কথা, প্রাণ থাকিতে সে বনপুরের মাটি কিছুতেই মাড়াইবে না।

অগত্যা সুরজিৎকে কলিকাতার বাসায় রাখিয়া হরিপদ একাকীই বনপুর চলিয়া গেল।

৪

হরিপদ বনপুর আসিয়াছে। বিবাহের উৎসবাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয় কুটুম্ব যারা আসিয়াছিল, অধিকাংশই প্রায় চলিয়া গিয়াছে। হরিপদরও আজ যাইবার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কথা ছিল, কিন্তু কর্ম্মবাড়ীর এই কয়দিনের নানারূপ অনিয়মে তাহার শরীরের উপর একটু অত্যাচার ঘটিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে, আজ সকালে অনেক বেলা করিয়া যখন শয্যা ত্যাগ করিল, তখন বেশ একটু জ্বর লইয়াই উঠিয়াছিল।

দুপুরবেলা আহারান্তে নয়নমঞ্জরী তাহার রাঁচির মামীর সহিত রাঁচি যাইবে বলিয়া ট্রাঙ্ক সাজাইতে বসিল এবং নানা প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় ও দ্রব্যাদিতে ট্রাঙ্কটী সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার পর, হরিপদর জন্য একবাটি দুধ ও এক গ্লাস জল লইয়া উপরের ঘরে আসিয়া কহিল,—"কেমন যে বরাত, ভাবনা ছাড়া আর আমাকে ভগবান থাকতে দেবেন না। বারমাসই ত ভেবে মরি। ক'টা দিন এসে আছ, মনটা তব একটু নিশ্চিন্ত ছিল। তা, ভগবান ত আর আমাকে নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকতে দেবেন না!——জ্বরটা কি এখনো তেম্‌নিই রয়েছে?" বলিয়া নয়নমঞ্জরী হরিপদর কপালে হাত দিয়া দেখিল।

হরিপদও নিজের হাতটা কপালে রাখিয়া বলিল,—"জ্বর একটু রয়েছে বলেই বোধ হচ্চে। সামান্যই জ্বর, এ বোধ হয় কাল আর থাকবে না। রসের জ্বর,—আজকে উপোস দিলেই যাবে'খন।"

"কি জানি বল!—যে বরাত আমার! এদিকে মামীমা মামাবাবু ত কিছুতেই ছাড়চেন না, আমাকে নিয়ে যাবেনই। আমি ত এখন কিছুতেই যেতে পার্ব্ব না।"

দুধের খালি বাটিটী নয়নমঞ্জরীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া হরিপদ কহিল,—"কোথায়?"

"রাঁচি। অনেকদিন ধরেই বলে আস্‌চেন। এবার একেবারে নাছোড়বন্দা হয়েছেন। অবিশ্যি না-যাওয়াটাও ভাল দেখায় না বটে। তা, তা'র আর উপায় কি?"

"তা, এত পেড়াপিড়ি করে যখন বলচেন, তখন না যাওয়াটা———আমার এ সামান্য জ্বর, এর জন্যে———

"তা হ'লে কি তুমি যেতে বল?"

"দোষ কি?—এত করে যখন———

"তোমার জ্বর দেখে, আমার কিন্তু কিছুতেই যেতে ইচ্ছে কচ্চে না। অথচ, এটাও বুঝচি যে এত করে যখন বলচেন তখন না-যাওয়াটা ভাল হবে না। তা তুমি বলচ যখন—যাই। কিন্তু আমার একটী দরবার আছে তোমার কাছে।"

"কি?"

"রাঁচি থেকে ফিরে এলে জষ্টিমাসে আমায় নিয়ে দারজিলিং বেড়িয়ে আসতে হবে। বল, আস্‌বে?"

"আচ্ছা, তা'র জন্যে আর কি;——যাওয়া যাবে।"

সেই দিনই মাতুল-মাতুলানীর সহিত নয়নমঞ্জরী রাঁচি চলিয়া গেল এবং পরদিন হইতে হরিপদর সামান্য রসের জ্বর প্রবল হইয়া দেখা দিল।

তখন ফাগুনের শেষ। বনপুরে এই পাড়াটার মধ্যে বসন্ত হইতেছিল। সুতরাং হরিপদর এই প্রবল জ্বরের সম্পর্কে সকলে যে একটা শঙ্কা করিতে লাগিল, চারি পাঁচ দিন পরেই সেই শঙ্কা সত্য হইয়া প্রকাশ হইল।

জমাদার গিন্নী সরকার মশায়কে জিজ্ঞাসা করিল,— "হাঁ গা, কি করবে এখন?"

সরকার মশায় কহিলেন,—"করা করির ত কিছু নেই। এখন খুব সাবধান, ছেলেপুলেরা কেউ যেন না কাছে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করে ফেলে। আজই আমি বাগানের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা কচ্চি।"

"সেটা ভাল হবে কি?—জামাই!"

"জামাই বলে ত আর গুষ্টিশুদ্ধু মরতে পার্ব্ব না" বলিয়া সরকার মশায় হরিপদর কাছে গিয়া কহিল,—"কোন ভয় নেই বাবাজী। আমি নলদাঁড়ার ঈশেন কোবরেজকে ডাক্‌তে লোক পাঠিয়েছি। ঈশেন কোবরেজ বল্লেও হয়, ধন্বন্তরী বল্লেও হয়। আমি ত আর টাকার দিকে দেখবো না।" তারপর, যে গোয়ালার মেয়েটীর উপর সরকার মশায় হরিপদর শুশ্রূষার ভার দিয়াছিলেন, তাহাকে বলিলেন,— "পাঁচুর মা, দেখো বাপু, কোন ত্রুটী যেন না হয়! তুমি হ'লে এসব রোগে ওস্তাদ, তোমায় আর বেশী করে কি বলবো বল। তবে দেখো, বাবাজীকে কেউ না বিরক্ত করে; সদা সর্ব্বদা খিল দিয়ে রাখবে। কারুকেই এখানে আসতে দেবে না, এমন কি গিন্নী এলেও না,—বলবে, আমার হুকুম। যদিও বুঝচি—না আসতে পাল্লে তাদের খুবই

কষ্ট হবে, কিন্তু তা বল্লে কি হয়, এ সব রোগে কি জান—রুগীকে একটু স্থির থাকতে দিতে হয়, গোলমাল মোটেই ভাল নয়।" পুনরায় হরিপদর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ বাবা কোলকাতায় কি একখানা পত্র দিতে বল ? নয়নকে ত আজ একখানা চিঠি দেওয়া গেল। সে এখন আসতে পাল্লে হয়। কালই ত চিঠি পেলুম, পাহাড়ে উঠতে গিয়ে না কি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলেচে, তার ওপর খুব জ্বর। কি হয়—এখন—ভগবানই জানেন! কি সময় যে আমার পড়লো! এদিকে এটি—সেদিকে সেটি!"

হরিপদ পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কহিল,—"চিঠি লেখবার কথা বলছিলেন,—তা' সুরজিৎকে লিখে দিন, সে যেন শুধু একলা এখানে আসে একবার।"

"তাই দোবো বাবা। দোবো কেন,—আমি এখনই লিখে দরোয়ানকে দিয়ে ডাকে দেওয়াচ্চি। পাঁচুর মা, বাবাজীকে আমার ঝেড়ে তুলে দাও, তারপর বকসিসের বিবেচনা, সে যা' মনে আছে তাই করব—এখন আর তা বলব না। তবে, ঐ যা' বললুম, গোলমাল কিছুতেই কত্তে দেবে না। এমন কি, আমিই যদি মনের বেঠিকে ভুলে গিয়ে দু'বারের জায়গায় তিনবার এসে পড়ি ত আমাকেও সেটা মনে করিয়ে দেবে। আর এ হট্টগোলের মধ্যে বাবাজীকে আমি রাখবোও না। বাগানের ঘরেই আজ ব্যবস্থা করে দিচ্চি" বলিয়া জামাতাকে আরও দু'একটা আশ্বাস এবং উপদেশের বাণী শুনাইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

৫

এইমাত্র বোধ হয় সন্ধ্যা হইয়াছিল। কখন যে সূর্য্যের আলো ধীরে ধীরে পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়া গাছের মাথায় উঠিয়া ক্রমে আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোর সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল, তাহা জানাও যায় নাই। তখনো সরকার মশায়ের গৃহের 'রাধা-কৃষ্ণে'র আরতি সুরু হয় নাই। একটা 'বসন্ত-বাউরী' পাখী তখনো বাসায়-যাওয়া ভুলিয়া, বাগানের একটা কৃষ্ণ-চূড়া গাছ হইতে অবিশ্রান্ত ডাকিতেছিল,—'কৃষ্ণ গোকুলে—কৃষ্ণ গো-কুলে।'

হরিপদর শরীরের যন্ত্রণা আজ যেন বড়ই বেশী।

নলদাঁড়ীর ঈশান কবিরাজ প্রত্যহই আসিতেছে। কিন্তু রোগের কিছুই সুরাহা দেখা যাইতেছে না। ঈশান বলিতেছে, শুশ্রূষা ভাল হইতেছে না।

হরিপদ ডাকিল,—"পাঁচুর মা ?"

পাঁচুর মা বাহিরের বারান্দায় গিয়াছিল। কাছে আসিয়া বলিল,—"ডাকচো দাদাবাবু ?"

"হ্যাঁ। বড় যন্ত্রণা!—কোথায় গিয়েছিলে ?"

"কারা ফটকে ঢুকলো তা'ই দেখতে গিয়েছিলুম।"

"কারা ?"

"দিদিমণি।"

"এসেচে ? পাঁচুর মা, নয়ন এসেছে!"

"না, নয়নদিদি নয়, বোধ হয় কোলকেতার দিদিমণি।"

কথা শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দরাণী সুরজিৎকে পিছু করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্রুতপদে হরিপদর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বালিস হইতে তাহার মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল।

হরিপদ নন্দরাণীর একখানা হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর ব্যথিত মৃদুস্বরে বলিল, "চললুম বোধ হয় নন্দ!"

নন্দরাণী তাহার অপর হাত দিয়া হরিপদর আবদ্ধ হাত খানা একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কখনই না।"

হরিপদর অধর প্রান্তে অতি ক্ষীণ হাস্য দেখা দিল; বলিল, "যম যে শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝগড়া করে তাকেও তাড়াবে না কি ?"

নন্দরাণী বলিল "তাড়াব।" ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বলিল, "বড় তেজ ক'রে বলেছিলুম,—বনপুরের মাটী কিছুতেই মাড়াব না,'—সে তেজ এম্নি ক'রেই আজ—

কথা শেষ হইল না; হরিপদর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নন্দরাণী অবিরল অশ্রুধারায় তাহার বুক মুখ ভাসাইয়া দিল।

৬

"বল হরি—হরি বোল্!"

পয়োকুম্ভ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জমীদার দীনদয়াল সরকারের বাগানের ঘর হইতে একটী শব বাহির হইল। কোন জাঁক-জমক নাই, ক্রন্দন-কোলাহল নাই, শোক-সন্তাপ নাই। বসন্তের রুগী বলিয়া ভয়ে পাড়ার বেশী কেহ আসিয়াও জমে নাই। জমীদার বাড়ী না হইলে হয়ত শব-বহনের জন্য লোকাভাব ঘটিত।

"বল হরি—হরি বোল্!"—বাহকেরা শব স্কন্ধে বাগান ছাড়িয়া সরকারি পথে আসিয়া পড়িল এবং ক্রমে পল্লীপথ বাহিয়া গ্রাম-প্রান্তের নদী তীরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

শব নন্দরাণীর। সাত বৎসর স্বামীর সহিত ক্রমাগত ঝগড়া-বিসম্বাদ করিয়া, আজ এইভাবে সে তাহার ঝগড়া করার শেষ করিল।

এক নগণ্য নাম-গোত্রহীন শুষ্ক নদী তীরের ততোধিক নগণ্য একরত্তি নির্জ্জন শ্মশানের শুষ্ক মাটির উপর নন্দরাণীর দেহ আগুনে ছাই হইয়া গেল। বনপুরের মাটিতেই তাহার দেহ মিশিল। স্নানান্তে, হরিপদ জমীদার বাড়ীর পরিবর্ত্তে তাহার বহুকাল-পরিত্যক্ত পৈতৃক গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে কাল-কাসুন্দে গাছের বন হইতে অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক তখন কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যার অন্ধকারকে যেন আরও বেশী নিবিড় করিয়া তুলিতেছিল।

হরিপদ অভিভূতের ন্যায় প্রাঙ্গণের বাতাবী লেবু গাছের তলায় আসিয়া বসিয়া পড়িতেই, সুরজিৎ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মামাবাবু, কি ভাবচেন অমন করে?"

হরিপদ চমকিয়া উঠিয়া কহিল,—"অ্যা?—ভাবচি?—না—হাঁ—ভাবিনি ত কিছু বাবা! শুধু ভাবচি, সে এমন করে সকলকে হারিয়ে দিয়ে নিজে চলে যাবে, এ ত—একদিনের জন্যেও মনে করি নি।—কা'রা গা?"

অন্ধকারের মধ্যে কাহারা যেন প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরজিৎ দুই পা আগাইয়া যাইয়া বলিয়া উঠিল,—"কে? বড় মামী মা?"

হরিপদ ত্রস্তে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—"কে, নয়ন? রাঁচি থেকে ফিরে এলে?—এস—এস—ঠিক সময়েই যে এসেছ তুমি! আমি সেরে উঠিচি নয়ন; চল—এইবার যে তোমাকে আমায় দারজিলিং নিয়ে যেতে হবে।"

মনীষী

১

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোটা বাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমি জমার আয় ও দু চারি ঘর শিষ্য সেবকের বার্ষিক প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাধাসিধা ভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্ব্ব দিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূর সম্পর্কীয়া দিদি ইন্দির ঠাক্‌রুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চাল ভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বছরের মেয়েটা চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতি-মুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটীর দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাক্‌রুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দিলাম না?—ওই দ্যাখো।" মেয়েটী করুণ চোখে বলিল, "তা হোক্ পিতি, তুই খা—"

দুটা পাকা বড় বীচে কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙ্গিয়া ইন্দির ঠাক্‌রুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, "আবার ওখানে গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে?"

ইন্দির ঠাক্‌রুণ বলিল, "থাক্ বৌ—আমার কাছে ব'সে আছে ও কিছু করচে না; থাক্ বসে—"

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, "না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম ব'সে থাক্‌বে? ওসব আমি পছন্দ করিনে চলে আয় বল্‌চি উঠে—"

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাক্‌রুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের ও খুব পেঁচো। মামার বাড়ী সম্পর্কে কি রকমের বোন্। হরিহর রায়ের পূর্ব্বপুরুষের আদি বাড়ী ছিল পাশের গ্রাম যশড়া বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্পবয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিলেন যেন তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার দিকে পিতৃদেবের কোনো লক্ষ্যই নাই। বছর খানেক কোনও রকমে চক্ষুলজ্জায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোনও উদ্যম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ মরিয়া হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। দুপুর বেলা কোথাও কিছু নাই, সহজ মানুষ রামচাঁদ আহারাদি করিয়া বিছানায় ছট্‌ফট্

শ্রীবিভূতিভূষণ বান্দ্যোপাধ্যায়

করিতেছেন—কেহ নিকটে বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ সুর ধরিতেন—তাঁহার আর কে আছে, কেই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি, আর শরীর অসুখ করিলেই বা কি, কাহার দায় পড়িয়াছে তাঁহার অসুস্থতার জন্য ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয়, এবং বিবাহের অল্পদিন মধ্যে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে খশড়া বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস সুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্পবয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পরে শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোনো বিষয়কর্ম্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, করার উপযুক্ত ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাঁহার স্ত্রীপুত্র শ্বশুর বাড়ীতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ায় পতিরাম মুখুয্যের পাশার আড্ডায় অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শ্বশুর বাড়ী হাজির হইতেন মাত্র। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—পণ্ডিত মশায়! বৌটা ছেলেটা আছে, আখেরটা তো দেখতে হবে? রামচাঁদ বলিতেন—কোনো ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাইএর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দুপুরুষ হেসে খেলে কাটবে। পরে তিনি আড়ি ও পঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে বিপক্ষের ঘর ভাঙ্গিতে পারিবেন, তাহাই এক মনে ভাবিতেন।

তাঁহার শ্বশুর ব্রজ চক্রবর্ত্তী সেকালের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন—কিন্তু শ্বশুরের ধানের মরাইএর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা যে কতটা বেআন্দাজী ধরণের হইয়াছিল, তাহা শ্বশুরের মৃত্যুর পরেই রামচাঁদ বুঝিতে পারেন। এ গ্রামে তাঁহার জমি জমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটী শিষ্য সেবক এদিকে ওদিকে জুটিয়াছিল—তাহাদেরই দ্বারা কোন রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটীকে মানুষ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতেই হয়; তাহারাও এখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিশরিয়েটে চাক্‌রী করিতেন, কিন্তু কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধামাতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে আর কেহ নাই।

রামচাঁদ এ ভিটায় বাড়ী করিবার পূর্ব্বে বুড়ীর ভাই গোলক চক্রবর্ত্তী এ ভিটাতেই বাস করিতেন। সুতরাং বুড়ী আজন্ম এখানেই মানুষ। ইন্দির ঠাকরুণ সে কালের কুলীনের মেয়ে। শোনা যায় পূর্ব্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দির ঠাকরুণ সেকালের কুলীন মেয়েদের মত বাপের বাড়ীতেই মানুষ। তাহার স্বামী বিবাহের পর দু একবার মাত্র এ গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এক আধ রাত্রি কাটাইয়া, পাথেয় খরচ ও কৌলীন্য সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্ত্তী নম্বরের শ্বশুর বাড়ী অভিমুখে তলপীবাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকরুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপ মায়ের মৃত্যুর পর ভাইএর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন ও একখানি বস্ত্র পাইয়া আসিতেছিল। কপালক্রমে সে ভাইও অল্প বয়সে মারা গেল। তখন অবশ্য ইন্দির ঠাকরুণের বয়সও খুব অল্প। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ী তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাকরুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারী পুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্ত্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল। কত গোলক চক্রবর্ত্তী, ব্রজ চক্রবর্ত্তী মরিয়া হাজিয়া গেল। ইচ্ছামতীর চলোর্ম্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জল-ধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত গ্রামের নীলকুঠীর কত জন্‌সন্ টম্‌সন্

সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

সুধু ইন্দির ঠাক্‌রুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে ; পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল্ তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙ্গিয়া শরীর সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে "কে আসে! নবীন! বেহারী! না, ও তুমি রাজু!..."

এই ভিটারই কি কম পরিবর্ত্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুণের চোখের উপর ঘটিয়া গেল! ঐ ব্রজ চক্রবর্ত্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন গ্রাম শুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে! তখন কি ছিল ঐ রকম বাঁশবন! পৌষ পার্ব্বণের দিন ওই ঢেঁকীশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ পিঠার জন্য—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাক্‌রুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ঐ রায় বাড়ীর মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকীতে দমাদম পাড় পড়িতেছে,—সোনার বাউটী রাঙা হাতে একবার সাম্‌নে সরিয়া আসিতেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমনি স্বভাব চরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাক্‌রুণ বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে! সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখ,দুঃখের দুটা কথা কয়।

তার পর এ সংসারে আশ্রয়দাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন। ঘাটের পথে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইত, মুখুযোদের তেঁতুল গাছে ডাঁশা তেঁতুল খাইতে গিয়া পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়া দুই তিন মাস শয্যাগত ছিল। সেদিনের কথা। ধুমধাম করিয়া অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হইল—পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসরের নববিবাহিত পত্নীকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট দশ বছর প্রায় কোনো খোঁজ খবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো দু পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ী আগুলিয়া কত কষ্টে কতদিন না খাইয়া, প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে। মানুষ অভাবে যে বাড়ীতে জঙ্গল গজাইবে, বুড়ীর খবরদারিতে তাহার উপায় ছিল না—খুঁটিয়া খুঁটিয়া সারা উঠানের ঘাস, আগাছা তুলিয়া ফেলিত; ঝাঁট দিয়া উঠান তক্‌তকে রাখিত। এই তাহার বাপের ভিটা, ভাইএর ভিটা, আজ মানুষ অভাবে জঙ্গল হইয়া যাইবে,—কেহ না থাকিলেও সে তো এখনও বাঁচিয়া আছে!

তাহার পর অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর সংসার পাতিয়াছে, তাহার একটী মেয়ে হইয়াছে—সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটী হইতে চলিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল এতদিনে আবার সব পুরাণো দিনের মত হইল; সেই ছেলে বেলার ঘর সংসার আবার বজায় রহিল। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনে সে অন্য সুখ চাহে নাই, অন্য প্রকার সুখ দুঃখের ধারণাও সে করিতে অক্ষম—আশৈশব অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলেই সে খুসি, তাহার কাছে সেইটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে এক দণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই তার বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়েতে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, আধো চোখের হাসিতে একমুহূর্ত্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া ওঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে টুক্‌টুকে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারী ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে। দুবেলা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

না খাইলে কি হয়, এক বেলার বহরে দুই বেলার অধিক পোষাইয়া লয়। উপায় নাই, তার নিজের বিবাহ তো দূরের কথা, স্বামীর জন্ম গ্রহণের বহুপূর্ব্ব হইতেই বুড়ী এই সংসার আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে, এখন সরানোও তো মহা মুস্কিল।

সরানো ব্যাপারটা আপাততঃ একটু কঠিন মনে হইলেও এজন্য সর্ব্বজয়ার অধ্যবসায়ের ত্রুটী নাই। খুঁটিনাটী লইয়া সে বুড়ীর সঙ্গে দুবেলা ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটা পিতলের ঘটী কাঁকে ও ডানহাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি ঝুলাইয়া বলিত "চল্লাম নতুন বৌ—আর যদি কথনো এ বাড়ীর মাটী মাড়াই তবে আমার—।" বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট্ট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—"ওঠ্ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্ তোকে বক্‌বে না, আয় পিতিমা।" কোন কোন দিন খুকী কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত। সর্ব্বজয়া মুখ ফিরাইয়া বলিত, "ঐ এলেন! যাবেন আর কোথায়? যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া?… তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা!" এরকম উহারা বাড়ী আসার বৎসর খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে—বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পূবের ভিটায় খড়ের ঘর অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ী থাকে। চালের খড় সব জায়গায় সমান অবস্থা ছিল না, বর্ষায় নানাস্থানে জল পড়ে, শীতকালে হিম ঢোকে। ঘরের মেজেতে এখানে ওখানে ইঁদুরে মাটী খুঁড়িয়া রাশীকৃত করিয়াছে; বুড়ী আজ এখানে গোবর মাটী লেপিয়া গর্ত্ত বুজাইয়া দেয় তো কাল আবার ওখানে মাটী ওঠায়। একটা বাঁশের আন্‌লায় খান দুই ময়লা ছেঁড়া থান। ছেঁড়া জায়গাটার দু প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ী নিজে আজকাল সূঁচে সূতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, কাজেই ছেঁড়া কাপড় অল্প ছিঁড়িয়া গেলে সেই অবস্থাতেই পরিতে হয়, বেশী ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁটুলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্ত্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্রমাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ী সেগুলো খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে ফেলিয়া দেয়। বেতের পেঁট্‌রাটার মধ্যে একটা পুঁটুলি বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লাল পাড় শাড়ী —সেগুলি তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর, একটা পিতলের চাদরের ঘটি, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটীর ভাঁড়। পিতলের ঘটিতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামান দিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটীর ভাঁড়গুলোর কোনোটাতে একটুখানি তেল, কোনোটাতে একটু নুন, কোনোটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়। সর্ব্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার থেকে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁট্‌রার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়। মাটীর ছোবাটা অনেক কালের, সরাটী-চাঁদা মারির কুমারেরা এই রকম রঙ্গ-করা ছোবা বিজয়া দশমী কি রাসের মেলায় বিক্রয় করিতে আনিত। আজকাল এ রকমের গড়নের ছোবা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোবাটার মধ্যে গোটা চার পাঁচ পয়সা ও গোটাকতক আধ্‌লা পড়িয়া থাকে। নানা উপায়ে এই তহবিল অনেক দিন হইতেই দুর্দ্দিনের জন্য সংগ্রহ করা আছে।

সর্ব্বজয়া এ ঘরে আসে কচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়াকাঁথা পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এগল্প ওগল্প শুনিবার পর খুকী বলে, পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্ তো!… গ্রামের একঘর গৃহস্থের বাড়ীতে ৫০ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শুনিত।

সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকরুণের মুখস্থ ছিল, অল্প বয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাক্‌রুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন সে এরকম ধৈর্য্যশীল শ্রোতা পায় নাই, পাছে মরিচা পড়িয়া যায় এই জন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতিসন্ধ্যায় একবার করিয়া ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁদ কলিতে একটা কথা শুন্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেচে—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে হাসি হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চুলো বাঁধা এক—মিন্‌সে!—'মি' শব্দটার উপর অকারণ জোর দিয়া ছোট্ট মাথাটা সাম্‌নে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারী আমোদ লাগে খুকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপুরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনেরো দিন বলা হয় নাই; কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

২

হরিহর রায় শিষ্য বাড়ী হইতে কয়েকদিন বাড়ী আসিয়াছে। বাহিরের রোয়াকে বসিয়া সে একটা বাক্স খুলিয়া হিসাব পত্র লিখিতেছিল। অনেকগুলি বালির কাগজে বাঁধা খাতা পাশে বাহির করা আছে, হিসাব মেলা শেষ হইলে একখানা ছোট বাঁধা-খাতা বাহির করিয়া সে পড়িতে লাগিল।

একথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই যে, হরিহর একজন লেখক। অর্থাৎ নামজাদা না হইলেও উক্ত বাতিকগ্রস্ত বটে। কাশীতে থাকিবার সময় গীত-গোবিন্দ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়াছিল। এক কাপিও বিক্রয় হয় নাই, বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে বিতরণ সাঙ্গ হইয়া গেলে বাকি বই গুলি কাশী হইতে আসিবার সময় যে কাঠের বাক্সটা আনিয়াছিল উহার মধ্যে কাগজ-কাটা পোকার আহার্য্য রূপে সঞ্চিত আছে।

ছোট খাতা খানি তাহার ভ্রমণ-কাহিনীর ছোট ছোট বর্ণনা ও নোটে ভর্ত্তি।

"এই যতদিন পশ্চিমে বেড়াইতেছি ও ইহার একবৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেহ সদাই অপটু; কখনো দুদিন, কখনো একদিন অন্তর জ্বর হয়। কখনো বা একজ্বরী অবস্থাতে দিন যাইতেছে—বিশেষতঃ মানসিক চিন্তাও খুব বেশী—এই সব কারণেই পশ্চিমে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসা।" পরে,—"শুক্রবার, ১১ই ভাদ্র কানপুর হইতে রওনা হইয়া ইটোয়াতে বন্ধু ত্রৈলোক্য নাথ শীলের বাড়ী আসিয়া ১২ই সন্ধ্যার গাড়ীতে বৃন্দাবন রওনা হইলাম। ইটোয়াতে জল বায়ু উত্তম। বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প। যমুনার প্রায় উপরেই এই সহর, এখানে একটী দুর্গ ও যমুনার তীরে বশিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত একটী শিবালয় আছে।" ইত্যাদি

আজ প্রায় ১৬ বৎসর আগেকার লেখা। দশ বৎসর ধরিয়া ভবঘুরে হরিহর কি সোজা ঘোরাটা ঘুরিয়াছে। আগ্রা, কানপুর, কাশী, মথুরা, বদরীনাথ সবস্থানেই কিছুদিন ধরিয়া বাস করিয়াছে, ধীরে ধীরে পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিল এক রকম বলিতে গেলে। সেই আষাঢ়ু স্কুলে প্রথম যৌবনে ১৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী করা, তারপর পিতা রামচাঁদ তর্কালঙ্কার মারা গেলেন—পিতার মৃত্যুর পর দিন কতক কি কষ্টে গিয়াছিল। পিতা ছিলেন নিরীহ পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ—পুঁথি চর্চ্চা ও পাশা খেলায় সেকালের দ্বন্দ্বহীন শান্তিপূর্ণ জীবন-যাত্রা সহজেই চলিয়া যাইত। ঘরের উঠানে পূজার দো-পাটি ফুলের, দুর্ব্বা, তুলসীর অভাব ছিল না; ঘরের গরু দুধ দিত; শ্বশুর বাড়ী হইতে বাকী সাহায্য হইত। দূর দেশের যে টান আশৈশব তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পিতার নিকট হইতে তাহা আসে নাই নিশ্চয়। হয়তো আসিয়াছিল মাতৃকুল হইতে, নয়তো কোন্ অজ্ঞাতনামা পূর্ব্বপুরুষের রক্ত হইতে কে জানে? কিন্তু মোটের উপর পিতার মৃত্যুর পরই সেই অদম্য পিপাসা তাহাকে ঘর ছাড়া

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

করিল। আষাঢ়ু স্কুলের মাষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া এক কার্ত্তিক মাসের সকালে পুঁটুলি বাঁধিয়া রওনা হইল—টিকিট কাটিয়া একেবারে কাশী। সেখানে কিছুদিন সংস্কৃত পড়িল, কিছুদিন গান শিখিল, কিছুদিন সে সব ছাড়িয়া দিয়া শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কুসঙ্গ জুটিল, কত কি হইল। হরিহরের বয়স ৩৬।৩৭ হইবে। বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, দোহারা চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, পরিধানে লাল পাড় ঠেঁটী ধুতি, বাম হাতেতে একটা তামার মাদুলী। এই মাদুলিটীর একটা ইতিহাস আছে।

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান খশড়া বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনীবংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমিদান করিয়া যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন, হরিহরের পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

বিষ্ণুরাম রায় অতিশয় বলবান ব্যক্তি ছিলেন, আহারও বিলক্ষণ করিতে পারিতেন। রাত্রিতে যদি ক্ষুধা পায় এজন্য দুই সের ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ তাঁহার শিয়রে ঢাকা থাকিত। পুরা মাত্রায় নৈশ ভোজনের পরেও এক এক দিন গভীর রাত্রে বিষ্ণুরাম নিদ্রা হইতে উঠিয়া নাকি উক্ত রক্ষিত দুগ্ধ সবটুকু পান করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সেকালের লোকের স্বাস্থ্যও ছিল অটুট, গুরু ভোজনেও শরীর উপসর্গরহিত থাকিত।

বৃটিশ শাসন তখন দেশে বদ্ধমূল হয় নাই, যাতায়াতের পথসকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাতে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগদী বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান,—লাঠি এবং সড়কী চালনাতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে স্থানে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া ছয় পল্লাতে গৃহস্থ বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙ্গার মাঠের মধ্যে ঠাকুর-ঝি লুকুর নামক সেখানকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুর ধারের প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়ের কার্য্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরণের। পথ চল্‌তি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহারা তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। লাল পুকুরের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্ত্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথাশ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুর পাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে এই বটগাছ আজও আছে, ও সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে; ধান আবাদ করিবার সময় চাষাদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্ব্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকা শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্ত্তিক মাসের শেষ; কন্যার বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। তখন পথের ধারে ধারে পল্লীর ও গণ্ডগ্রামের বাজারে পথিকদের জন্য চটি থাকিত। রেল হইবার পর দূরদেশের যাত্রীগণ হাঁটাপথ পরিত্যাগ করার দরুণ চটিগুলি ইদানীন্তন উঠিয়া গিয়াছে। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ

দূরের নবাবগঞ্জের বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্ত্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যেই সূর্য্যকে ডুবু ডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথমে ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণ ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ, অপরে বালক,—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনদলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে পায়ে পড়িয়া অন্ততঃ পুত্রটীর প্রাণ রক্ষার জন্য বহু কাকুতি মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপেথ আশঙ্কায় অপরের মাথা ব্যথা হইবার কথা নহে বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে, তাহারা ধরা পড়িতে পারে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতা ও পুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকা পানা ও শ্যামা ঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশীদিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাঙ্গলা ১২৩৮ সাল। বীরুরায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুর বাড়ী দক্ষিণ শ্রীপুর হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িয়া দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িত হইত। সেখান থেকে আর দিন চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর সকালে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহানায় একটা নির্জ্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই; একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুই দিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষতঃ পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। হু হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহানার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম্ করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন; কিছুই কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল বুঝিবার পূর্ব্বেই বাকী দাঁড়ী মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল সে কৈ? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি মাঝিদের মুখও শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ্ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশ বনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল—ডাঙ্গা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে!

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে তাড়াতাড়ি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝ নদীতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত পা ছোঁড়াছুড়ি। বীরুরায়ের পত্নী উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই নির্জ্জন চরের এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; জোর করিয়া ধরিয়া সকলে তাঁহাকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া হইতে বাধা দিল। গত বৎসর দেশের ঠাকুরজি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জ্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরুরায় ঠকিয়া শিখিলেন যে ধর্ম্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও আপন পথ চিনিয়া লয়। বাড়ী আসিয়া বীরুরায় আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশলোপ পাইলেও তাঁহার ভাইএর বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্ব্বেই কোনো না কোনো রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটী মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হৌক্, বা ব্রহ্মশাপের তেজ কয়েকপুরুষ পরে ক্রমে কর্পূরের মত উবিয়া যাইবার দরুণই হোক্, বংশের একমাত্র পুত্র হইয়াও হরিহর এই সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে এখনও বাঁচিয়া আছে।

৩

দিন কয়েক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পরই শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসিমা নাই, অন্য দুই মাসের উপর হইল একদিন কি লইয়া তাহার মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হওয়ায় পরে রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন এক আত্মীয় বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবার কোনও লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্য্যন্ত সে কখন খায়, কখন শোয়, তাহা কেহ বড় দেখে না। তাহার বাবা সারাদিন বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকে, সবদিক দেখিবার সময় পায় না।

খুকী শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল কুড়ুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল।

বাঁশ বনে হাওয়া লাগিয়া শিরশির্ শব্দ হইতেছে। একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে তাহার শীত করিতেছিল একটু গুটিশুটি হইয়া শুইল। আঁতুড় ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথা বার্ত্তা কহিতেছে। ঘুমের ঘোরে বুঝিতে পারিল না কাহাদের গলা। বাঁশ গাছ দুলিতেছে, কেমন যেন আলো···ছায়া ছায়া...খুকীর বড় ভয় করিতেছিল, সে আর একবার উঠিয়া বসিল। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে, কেমন আছে খুড়ী? কি হয়েচে? আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরণের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল; গলার আওয়াজটা তাহার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে কিছু বুঝিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

তাহার পরই দুই তিন জন তাড়াতাড়ি কি সব কথা কহিতে লাগিল। নেড়ার ঠাকুমা যেন কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর আবার অনেকে একসঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিড়াল

ছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চট্‌ করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনী বিড়ালের ছানাগুলা সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে···ছোট তুল্‌তুলে ছানা কয়টী···এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল ঐ যাঃ—ওদের হোলা বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেল্লে...ঠিক্।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি ঠিক আছে, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হোলা বিড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনো দিকে। পরে সে অবাক্ হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েচে দেখ্‌বানা?...ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেঁচি এত কাণ্ড হয়ে গেল, কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হয়েল, কালপুরের পীরির দরগায় সিন্নি দেবানে—বড্ড রক্ষে করেছেন রাত্তিরে। খুকী এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়ে উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ায় গা ঘেঁসিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটী টুক্‌টুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাঁচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটীও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভাল দেখা যায় না। সে ক্ষাণিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটী চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটী নাড়িয়া নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে ঈষৎ ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অ-বিকল বিড়াল ছানার ডাক···দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার যো নাই। হঠাৎ, অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট, নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটীর জন্যে দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা কুড়ুনীর মা ও দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছে সত্বেও আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যা দিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া যায়। এইরকম কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! সে কি করিয়া বুঝিয়াছে যে মায়ের সাম্‌নে পিসিমার কথা বলা ঠিক হইবে না, মা পছন্দ করিবে না। যখন মন কেমন করে কান্না পায়, সে মনে মনেই রাখে। খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া আসে; সকলে দেখিয়া বলে ঘর আলো করা খোকা হয়েচে, কি মাথার চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন দি? কি বড় বড় চোখ—যাক্ ভিটে অনেকদিন জঙ্গল হয়েছিল এইবার আলো হোল। যাহারা একবার দেখিতে আসে, তাহারা আরও অনেকবার দেখিয়া যায়।

খুকী ভাইয়ের দোলা ছাড়িয়া অন্য কোথায় যায় না। কেবল ভাবে তাহার পিসীমা একবার যদি আসিয়া দেখিত! সবাই দেখিতেছে, আর তাহার পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না? রাত্রে কত রাত পর্য্যন্ত পিসির কথা ভাবিতে ভাবিতে সে জাগিয়া থাকে, ঘুমাইতে পারে না, মন হু হু করে। কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়া ফেলে তবু কাহাকেও জানায় না। সে ছেলেমানুষ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছে যে এবাড়ীতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভাল বাসেনা, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাইলে মন কেমন করে, ঘরের কবাটটা এক একদিন আলগাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চাম্‌চিকার নাদি জমিয়াছে। তাহাদের বাড়ীর উঠানও আর আগেকার মত পরিষ্কার নাই। উঠানে সেরকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত? খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায়—এতদুঃখ হয় যে খাইতে বসিলে ভাত ভাল লাগে না। পিসির কথা মনে হয়—পিসির খাইবার সেই বড় পাথরখানা রান্নাঘরের এককোণে থাকে, দেখিলে মনে পড়ে কেমন আম্‌ড়াভাতে দিয়া পিসিমা ভাতের বড় বড়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দলা তুলিত ? সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে ?

সে সেদিন বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল। হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী যে এল। ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক্ থেকে একটা ঘটি আর পুঁটুলি হাতে করে আস্‌চে ; এসে চক্কত্তি মশায়দের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, যাও ছুগ্‌গাকে পাঠিয়ে দাও হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহোলে রাগ পড়্‌বে এখন—

হরি পালিতের বাড়ী বুড়ী বসিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল। আসল কথা, সেও আর দীর্ঘদিন বাড়ী ছাড়িয়া দুর্গাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছিল না। আজ পঁয়র্ষাট্ট বৎসরের বাঁধন যে ভিটার সঙ্গে তাহার মায়া কি এত সহজেই ছাড়া যায় ? কয়দিন ধরিয়া সে ছট্‌ফট্ করিতেছিলে গ্রামে ফিরিবার জন্য। কিন্তু এতকাল পরে হঠাৎ কি করিয়া গিয়া একেবারে বাড়ী উঠা যায় সেজন্য এখানে আসিয়া উঠিয়াছে।

ও পিতি! বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল,—ওমা, সেই আমার উম্‌নো ঝুম্‌নো চুল—এতদিন কি করে যে ছেলাম তোরে—কথা শেষ হইতে না হইতে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল···উঠানে ঝি বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন নেও,—ঠাকুরঝি ও তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল। সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেচে—

. অনেকদিন পরে বাড়ী আসিয়া বুড়ী আকাশ হাতে পাইল। এতদিন যে সে কি করিয়া এই ভিটা ফেলিয়া ছিল, খুকীকে ফেলিয়া ছিল ! খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে !—আহা, সেই কতকালের ভিটা, তাহার ভাই গোলোক, পিসে ব্রজ রায়, কালীপূজায় সেই ধূমধাম, পৌষ পার্ব্বণের সেই উৎসব আজও যে তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে! সে কালের আর কে বাঁচিয়া আছে, কাহার কাছে সে আর সেবারকার কার্ত্তিকে ঝটকার গল্প কথা কইবে ? বাড়ীর পিছনের মুখুয্যে বাগানে নৌকা আসিয়াছিল, বন্যার জলে পথে ঘাটে মাছ ধরিয়া লোকে ঢিবি করিয়া ফেলিয়াছিল, বাজারে বিক্রয় হইত না কে কত খায় ? আহা পলাশপুর গ্রামের খুদিরামদের কর্ম্মস্থান পলাশপুর কুঠি হইতে নৌকাযোগে পরিবারবর্গসহ আসিতে আসিতে নৌকাতে পথিমধ্যে ঝড়ে পড়েন। একজন মাঝি ও তিনি ছাড়া তাঁহার স্ত্রী, দুটী পুত্র ও একটি কন্যা এবং দ্রব্যাদিসহ জলমগ্ন হয়।

বুড়ী সকালে উঠিয়া আসে, ঝাঁট দিতে ছোটে—কতদিন যে ঝাঁট পড়ে নাই ! খুকী ভারী খুসী হয়—সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মহা উৎসাহে বলে, "পিতি, কাঁতাল গাছে একটা লতা উতেচে ছিঁড়ে দেবো ?" তাহার পিসি দেখিয়া বলে, "তাইতো হ্যান্দেখো লাও ঝিক্‌ড়ে লতা,—দাডা গিয়ে বাড়ী থেকে নিয়ে আয়ত মা। পিসি ভাইঝি মিলিয়া মহা খুসিতে ভিতর বাহিরের উঠান ঝাট্ দেয়, আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারটা যেন ঠিকমত চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহার করিয়া বুড়ী খিড়্‌কীর পিছনে বাঁশবনের পথের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। সেদিকে আর নদীর ধার পর্য্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ—এই সমস্তটা সুধু বড় বড় আমবাগান ও ঝুপ্‌সি বাঁশবন ও অন্যান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, আবোল তাবোল বকে। পিসি ভাইঝিতে নানা গল্প হয়। বুড়ী বলে, তোর জন্যে অনেকগুলো বাঁশের খোলা কুড়িয়ে রেখেচি পেঁপেঁ তলায় আছে টাট্‌কা খোলা, আজই পড়েছে। দুর্গা বলে—এখানে আন্‌বো পিসি ? বুড়ী বলে—এখানে আর সে আন্‌বি ? খেলাঘরে নিয়ে গিয়ে রাখিস্। আদর করিয়া বলে—আমার পাগ্‌লি,—পাগ্‌লি ছোট এক বোঝা কাটাকঞ্চি জড় হইলে দুর্গা সেগুলি বহিয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় বুড়ীর নানাকথা মনে আসে। সেই কতকাল আগেকার কথা সব ! সেই তিনি বার তিনেক আসিয়াছিলেন—স্বপ্নের মত মনে পড়ে ! একবার তিনি পুঁটুলির মধ্যে কি খাবার

তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। এখনো আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী তখন দুই বৎসরের। ওলা, ওলা, সকলে বলিল, ওলা—চিনির ডেলা মত! ঘটির জলে গুলিয়া সেও একটু খাইয়াছিল। সে ইএকজন লোক আসিল—পুরানো সেই পেয়ারা গাছটার কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুর বাড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে হাতে একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, ভাই গোলোকও পূর্ব্ব বৎসর মারা গিয়াছে—ব্রজ কাকার চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজেই পত্তর খানা লইয়া গেল। সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে হয়—ন জ্যেঠা, মেজ জ্যেঠা, ব্রজ কাকা, ওপাড়ার পতিত রায়ের ভাই যাদু রায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধি ভজহরি। পত্তর পড়িলেন সেজ জ্যাঠা। অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আন্‌লে এ চিঠি রে ইন্দির্? তাহার পর ইন্দির্ ঠাক্‌রুণকে বাড়ী আসিয়া তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের বড় সাধের জিনিষ বাপ-মায়ের দেওয়া রূপার পৌঁছে জোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিঁন্দুর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিতে হইল। আহা, তাহার কিছুদিন আগেও ব্রজকাকার মেয়ে কাদুর নতুন-গড়ানো নারিকেল ফুল দেখিয়া নারিকেল ফুল পরিবার সাধ হইয়াছিল! এ জন্মের বহু সাধের ন্যায় সে সাধও অপূর্ণই রহিয়া গেল।—কত কালের কথা—সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের!···দুর্গা বলে—নোনা গাছটা কত বড় হয়েচে দেখিচিস্—সেই এতটুকু ছিল? না পিতি?··· দুপুরের রৌদ্র বাঁশবনের ফাঁক দিয়া আসিয়া নোনা পাতার গায়ে চক্‌চক্ করে। বুড়ীর আবার যেন আমেজ আসে, নিবারনের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ! ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ। ষোল বৎসরের বালক কি টক্‌টকে গায়ের রং, কি চুল! ঐ যে চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জর রোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন দিন রহিল। আহা, বালক সর্ব্বদা "জল, জল" করিত, কিন্তু ঈশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। সেই নিবারণ চতুর্থ দিন রাত্রে মারা গেল, মৃত্যুর একটু আগেও সেই 'জল, জল তার মুখে বলি—চোখ বুজিলে চোখের উপর সব যে জাগে!···সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর পাঁচ দিনের মধ্যে বড় খুড়ীর মুখে কেউ একবিন্দু জল দেওয়াইতে পারে নাই—পাঁচদিনের পর ভাসুর রামচাঁদ চক্কত্তি নিজে ভ্রাতৃবধুর ঘরে গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, তুই চলে গেলে আমার দশা কি হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাবো মা? বড় খুড়ী ধনী বারেন্দ্র ঘরের মেয়ে ছিলেন—জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, অমন রূপসী বধূ এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পাদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই—সেকালের গৃহিণী রন্ধন করিয়া আত্মীয় পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্য আহার করিতেন। দান ধ্যানে, অন্ন বিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। তাই ভাসুরের কথায় মনের কোন্ কোমল স্থানে বুঝি ঘা লাগিল—তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশী দিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনিও পুত্রের অনুসরণ করেন।

একটু জল দে মা—এতটুকু দে—

জল খেতে নেই ছিঃ বাবা—কব্‌রেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

এতটুকু দে—এক ঢোক্ খাই মা—পায় পড়ি—

দুপুরের পাখ্-পাখালির ডাকে সুদূর ৫০ বছরের পার থেকে বাঁশের মর্ মর্ শব্দ, কানে ভাসিয়া আসে···

খুকী বলে—পিতি তোর ঘুম নেগেচে?...আয় শুবি চল্। হাতের দা খানা রাখিয়া বুড়ী বলে—ওই দেখো, আবার পোড়া ঝিমুনি ধরেচে—অবেলায় এখন আর শোবো না মা—এই গুলো সঙ্গে করে রাখি—নিয়ে আয় দিনি ওই বড় আগালেডা?...

দিন যায়। সন্ধ্যা বেলা আবার বুড়ীর দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথার বিছানা পাতা হইত। দুর্গা পুরোনো সেই দিন-গুলার কথা ভাবে—পিসি যে দিন এখানে ছিল না!··· ভাবিলেও তাহার মন কেমন করে!

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৯
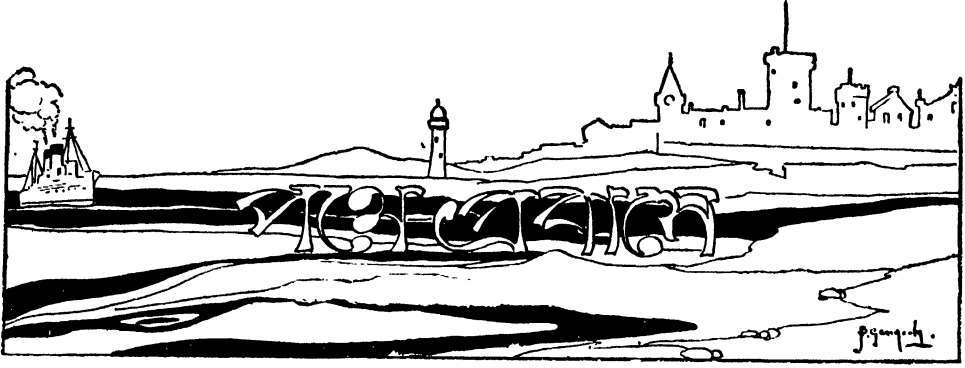
এই ক'টি দিন সুধায় গেল ভ'রে। কয়েক দিন থেকে আলোর আর অবধি নেই, ভোর চারটের থেকে রাত (?) ন'টা অবধি আলো। যে দিন সূর্য্য থাকে সেদিন তো স্বর্গসুখ, যেদিন মেঘ্‌লা সেদিনও সুখ বড় কম নয়, কেবল আলো—সেও অনেকখানি। আর উত্তাপ কোনো দিন আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো, কোনো দিন আমাদের চৈত্র মাসের মতো। আমার পক্ষে তো বেশ আরামের, কিন্তু এদেশের লোকগুলি ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে সুরু করেছে। এদের মতে এটা অকাল গ্রীষ্ম। শীত, বর্ষা, কুয়াশা এদের গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, ও নিয়ে এরা প্রতিদিন খুঁৎ খুঁৎ করে বটে, কিন্তু ও ছাড়া আর কিছু ভালোও বাসে না।

অবশ্য সাধারণের কথাই বল্‌ছি, কেননা অসাধারণরা তো এখন কোনো দেশের বাসিন্দা নন্‌, তাঁরা সব-দেশের বাসাড়ে। তাঁরা শীতকালটা রিভিয়েরুয় কাটান, বসন্তটা সুইজারল্যাণ্ডে, গ্রীষ্মকালটা বরফের সন্ধানে কাটান্‌, শরৎকালটা পৃথিবী পরিক্রমায়। তা' ব'লে সাধারণরাও যে একই স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে এমন নয়। তারাও এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে বাসা বদ্‌লাতে লেগেছে। অসাধারণদের সঙ্গে তাদের তফাৎটা কেবল এই যে, তাদের টান ছুটীর টান নয় কাজের টান। তবু কাজের টানে বারোমাস কেউ কর্ম্মস্থলে কাটায় না, এক আধ মাসের জন্যে হ'লেও দশ বিশ ক্রোশ দূরে গিয়ে মুখ বদ্‌লিয়ে আসে। আর ছুটীর টানে বারোমাস যাঁরা বিশ্বময় ঘুরপাক খাচ্ছেন তাঁরাও বড় সাবধানী পথিক, তাঁরা এজেন্সী নিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে, কাগজে লিখে পাথেয় জোটান।

পাথেয় যে যেমন করেই জোটাক্‌ সকলেই একালে পথিক, কেউ একালে গৃহস্থ হ'তে চায় না। এই লণ্ডন শহরে কত ফরাসী ফ্যাসানজ্ঞ, জার্ম্মান সঙ্গীতজ্ঞ, ইতালিয়ান নৃত্যনিপুণ, রাশিয়ান পলাতক, দিনেমার চাষীদের এজেণ্ট্‌, মার্কিন নির্ম্মাতাদের এজেণ্ট্‌, চাট্‌গেঁয়ে জাহাজের খালাসী, চাইনিজ্‌ কোকেন-চালানদার ইত্যাদি নানা দিগ্‌দেশাগত মানুষ এক আধ বৎসরের জন্যে বাসা বেঁধেছে। এ শহরে না পোষালে নিউইয়র্কে কিম্বা বুএনস্‌ এয়ার্সে ভাগ্যান্বেষণ করবে। এদের সামনে সারা পৃথিবী প'ড়ে রয়েছে, যেখানে যতদিন থাক্‌তে পাবে ততদিন থাক্‌বে, তারপরে সুট্‌কেস্‌ হাতে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌বে।

রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যে পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে দু'দিন কাটিয়ে এসেছে—কেউ জাহাজে কাজ নিয়ে হনলুলু ঘুরে এসেছে, কেউ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ল'ড়ে এসেছে। রোজ এমন লোকও দেখি যে কিছু পয়সা জমাতে পার্‌লে এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে আর্‌জেণ্টাইনায় ব্যবসা ফাঁদ্‌বে, কিম্বা নিউজিল্যাণ্ডে চাকুরীর জোগাড় করিবে।

এদের কাছে পৃথিবীটা এত ছোট বোধ হচ্ছে যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন কল্‌কাতা থেকে কাশী। এদের অপরাধ কি, আমারি তো এখন মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষ ছোট একটা দেশ, বম্বে কল্‌কাতা ছোট এক-একটা শহর। নিউইয়র্কের লোক জাহাজে চ'ড়ে ছ'সাতদিনে পারী পৌছয়, সেখানে বসে বাড়ীর লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে। আর কিছুকাল পরে যখন পারীর সঙ্গে নিউইয়র্কের এরোপ্লেন চলাচল সহজ হবে, তখন নিউইয়র্কে ডিনার খেয়ে পারীতে ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ খেতে পারা যাবে, যেমন কল্‌কাতায় ডিনার খেয়ে কাশীতে ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌।

এর ফলে দেশে আর মানুষের মন টিঁক্‌ছে না, বিদেশের স্বপ্নে মন বিভোর। শনিবার হ'লেই চলো লণ্ডন ছেড়ে পারী, সেখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো লণ্ডনে। পরের শনিবারে চলো বেল্‌জিয়াম্‌, কিম্বা হল্যাণ্ড্‌। সাত দিনের ছুটী পেলে চলো জার্ম্মানী কিম্বা সুইজারল্যাণ্ড্‌। তিন সপ্তাহের ছুটী পেলে চলো নিউইয়র্ক্‌ কিম্বা ওয়েষ্ট্‌-ইণ্ডিজ্‌। দেড় মাসের ছুটী পেলে চলো সাউথ্‌ আফ্রিকা কিম্বা ইণ্ডিয়া। ছ'মাসের ছুটী পেলে চলো ওয়ার্ল্‌ড্‌ টুরে। এগুলো অবশ্য জাহাজী যুগের মানুষের স্বপ্ন। এরোপ্লেনী যুগের মানুষ— অর্থাৎ এরোপ্লেন যখন জাহাজের মতো সস্তা ও নিরাপদ ও সর্ব্বত্রগামী হবে, তখনকার মানুষ আফিসের ঘড়ীতে ছ'টা বাজ্‌লেই ছুট্‌বে পারীর এরোপ্লেন ধর্‌তে। এখন এরোপ্লেনে পারী পৌছতে তিন ঘণ্টা লাগ্‌ছে, তখন লাগ্‌বে দেড় ঘণ্টা। সুতরাং ডিনারের সময় পারীতে হাজির হ'তে পার্‌বে। শনিবার হ'লে সে ভাব্‌বে যাওয়া যাক্‌ ঈজিপ্টে, রবিবারটা পিরামিড্‌ দেখে সোমবার সকালে পারী পৌছে ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ খেয়ে লণ্ডনের আফিসে আসা যাবে গাধা-খাটুনি (drudgery) খাট্‌তে। খাটুনীর ফাঁকে রেডিওতে শোনা যাবে বুএনস্‌ এয়াসে'র ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা আর টেলিভিসনে দেখা যাবে নাচের দৃশ্য। ঐ উত্তেজনায় আরো কিছুক্ষণ গাধা-খাটুনি সুসহ হবে। তারপরে ছুটী, পারী-গমন, রাত্রিভোজন, থিয়েটার দর্শন, নিদ্রা।

আমাদের নাতীনাৎনীরা ভাব্‌বে, এই তো জীবন: আমরাই তো সেণ্ট্‌ পারসেণ্ট্‌ বাঁচছি! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগুলো কি বাঁচ্‌তে জান্‌তো? ছিল ওদের আমলে এমন সব পাড়া-ময় শহর-ময় হোটেল? পেত ওরা এমন সব কলে তৈরী বিশুদ্ধ হাইজেনিক খাবার? পার্‌ত ওরা নিউইয়র্কের ব্যাণ্ড্‌ শুন্‌তে শুন্‌তে কল্‌কাতায় নাচ্‌তে? সারা জগতের কোথায় কি ঘট্‌ছে তা চোখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিশ্রামকাল কাটাতে? ওদের সময় নাকি স্নেহ প্রেম আতিথ্য ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল—বাজে কথা। ওদের সময় গ্রামে গ্রামে মাম্‌লা মোকদ্দমা দেশে দেশে যুদ্ধ লেগেই থাক্‌ত, ইতিহাসে লেখে। মেয়েরা নাকি গৃহকোণে বন্দী হয়ে স্বামীপুত্রের সেবা কর্‌ত—ধিক্‌। মেয়েদের যেন নিজস্ব প্রতিভা নেই, তারা যেন পুরুষের মতো তাই নিয়ে দিনরাত ব্যাপৃত থাক্‌তে পারে না, তাদের যেন পাব্লিকের প্রতি দায়িত্ব নেই, তারা থাক্‌বে স্বার্থপরের মতো গৃহ সংসার নিয়ে!

হায়! গতি-গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে ওরা তো বুঝ্‌বে না ওদের পূর্ব্বপুরুষদের স্থিতিসুখ। ওরা যখন ঘণ্টায় এক্‌শো মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে থ্রিলের আতিশয্যে মুর্চ্ছাসুখ পাবে তখন তো ওরা বুঝ্‌বে না গরুর গাড়ীতে চড়ে ঘণ্টায় এক মাইল অগ্রসর হবার তন্দ্রাসুখ। মার্স্‌ ভেনাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার উত্তেজনায় ওরা ভুলে থাক্‌বে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বাধাবার উত্তেজনা। পৃথিবীটাই যখন ওদের আরাম করে পা ছড়াবার পক্ষে নিতান্ত অপরিসর ঠেক্‌বে তখন ওরা কি করে বুঝ্‌বে আমার নগণ্য আঙিনাটুকুই আমার স্ত্রীর চোখে কত বৃহৎ ব'লে সে-বেচারী লজ্জায় ভয়ে ঘোম্‌টা টেনে দেয়। আমাদের সেই রাত ভোর ক'রে বেলা দশটা অবধি যাত্রা দেখা, দুপুর বেলা ঘুম দিয়ে রাত ন'টায় ওটা, একটি গ্রামে একটা জীবন সাঙ্গ করেও তৃপ্তি না মানা, ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্ম'ণ্ডকে দেখা—এসব ওদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। "সেকেলে" বলে ওরা আমাদের অবজ্ঞা কর্‌বে।

তা করুক, কিন্তু একথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার কর্‌বা না যে কোনো একটা যুগ কোনো আরেকটা যুগের

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

চেয়ে সুখের, কোনো এক যুগের মানুষ কোনো আরেক যুগের মানুষের চেয়ে সুখী। পৃথিবী দিন দিন বদ্‌লে যাচ্ছে, মানুষ দিন দিনে বদ্‌লে যাচ্ছে, সমাজ দিন দিন বদ্‌লে যাচ্ছে—কিন্তু উন্নতি? প্রগতি? perfection? তা' কোনো দিন ছিলও না, কোনো দিন হবারও নয়। অতীত পূজকরা বল্‌বেন, সত্যযুগ ছিলনা তো কোন্ আদর্শের আমরা অনুসরণ কর্‌ব? ভবিষ্যৎ পূজকরা বল্‌বেন, সত্য যুগ হবে না তো কোন্ আদর্শের অভিমুখে আমরা যাবো? আমরা কিন্তু বর্ত্তমান-প্রেমিক, আমরা বলি, এইটেই সত্য যুগ, এইটেই কলি যুগ, এটা ভালোও বটে, মন্দও বটে। লাখ বছর পরে যারা আস্‌বে তাদের যুগ এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এমনি ভালোয়-মন্দে-মেশা দুঃখে-সুখে-বিচিত্র প্রেমে-হিংসায়-জটিল থাক্‌বেই। আমরা চলার আনন্দে চলি, কারুর অনুসরণেও না, কারুর অভিমুখেও না। গতিটাই আনন্দের, শম্বুকের গতি আর পক্ষিরাজের গতি বেগের দিক থেকে ভিন্ন, আনন্দের দিক থেকে একই।

কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে ক্রমেই আমাদের চলার বেগ বাড়্‌ছে, ধীরে চলার আনন্দ গিয়ে ছুটে চলার আনন্দ আস্‌ছে। মানুষ এখন ঘর ভেঙ্গে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল, উদ্ভিদের মতো এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চল্‌তে চাইল না, পাখীর মতো ঠাঁই ঠাঁই উড়্‌তে উড়্‌তে চল্‌ল। কোনো স্থানের প্রতি তার স্থায়ী আসক্তি রইল না। আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজ্‌ম্, তার পরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজ্‌ম্, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক-একটা দেশের বৈশিষ্ট্য চলে যাচ্ছে, দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের লোক দেশে আস্‌ছে, কে যে কোন দেশে জন্মাচ্ছে কোথায় বিয়ে কর্‌ছে কোনখানে মর্‌ছে তার ঠিক্ নেই। এই ইংলণ্ডের এক অতি অখ্যাত অতি বিজন পল্লীগ্রামে এক তামিল চাষা—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অশিক্ষিত—ইংরেজ মেয়ে বিয়ে ক'রে ছেলেপিলে নিয়ে সংসার কর্‌ছে। সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ঘর ছেড়ে ছিল, এখন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়েছে। এর ছেলেপিলে হয়ত ক্যানেডায় বাসা বাঁধ্‌বে কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ায়। কোন্ দেশের প্রতি তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম্ যাবে? বাপের মাতৃভূমি, না নিজের মাতৃভূমি, না নিজের ছেলের মাতৃভূমি—কার প্রতি?

কত চীনা-মালয়-কাফ্রির ইংরেজ ছেলে দেখ্‌ছি, কত কত ইংরেজের ফরাসী, জার্ম্মাণ, জাপানী ছেলে দেখ্‌ছি, কত শাদা-রঙের আয়া লাল্‌চে কালো-রঙের ছেলেকে ঠেলা গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যায়, কত আর্য্য-ধাঁচের মুখে মঙ্গোলীয়-ধাঁচের ভুরু শোভা পায়। জগৎ জুড়ে একটা সঙ্কর জাতি গ'ড়ে উঠছে, সে জাতির নাম মানব জাতি। এই নতুন মানবের জন্য যে নতুন সমাজ খাড়া হচ্ছে সে সমাজের নীতিসূত্রও নতুন। সে সব নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি, গরুর গাড়ীর সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরো নর নারীর মিলন-নীতি। গরুর গাড়ীর যুগের নর নারী অল্প বয়সে বিবাহ কর্‌ত পিতামাতার নির্ব্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে চিন্‌ত না জান্‌ত না দেখ্‌ত না, দুজনেই একস্থানে থেকে জীবন শেষ কর্‌ত এবং একজন কর্‌ত গৃহের অন্দরের কাজ অন্যজন কর্‌ত গৃহের সদরের কাজ। এরোপ্লেনের যুগের নর নারী বিবাহ করে বেশী বয়সে পঞ্চশরের নির্ব্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে শৈশবে দেখ্‌তে পায় ইস্কুলে; যৌবনে দেখ্‌তে পায় আফিসে; বিবাহের পূর্ব্বে দেখ্‌তে পায় ক্লাবে, নাচঘরে টেনিস্ কোর্টে কাফে-রেস্তরাঁয়; বিবাহের পরে দেখ্‌তে পায় আফিসের সহকর্ম্মিণী বা সহকর্ম্মী রূপে, একলা পথের সহযাত্রিণী বা সহযাত্রীরূপে, একলা প্রবাসের বান্ধবী বা বান্ধবরূপে। তারপর স্বামী স্ত্রী এক স্থানে থাক্‌তে পায় না, দু'জনের দুইস্থানে জীবিকা। দু'জনেই বাইরের কাজ করে, হোটেলে বাস করে, রেস্তরাঁয় খায় এবং সুবিধা না হলে দেখা কর্‌তে পায় না। সন্তানরা মেটার্নিটী হোমে জন্মায় বোর্ডীং স্কুলে বাড়ে এবং বড় হলে জীবিকার সন্ধানে দেশে বিদেশে বেড়ায়।

এহেন যুগে প্রেম ও সতীত্বের নীতি বদ্‌লাতে বাধ্য। প্রেম বা সতীত্ব থাকবে না এমন নয়, থাক্‌বে, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা হবে অন্যরকম। একনিষ্ঠতা সুকর ছিল যখন স্বামী স্ত্রী থাক্‌ত এক স্থানস্থ

এবং যখন অনাত্মীয় অনাত্মীয়াদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল অল্পই। এখন স্বামী লণ্ডনের দোকানে কাজ করে তো স্ত্রী কাজ করে চিকাগোর দোকানে, এবং উভয়েরই দোকানে বা দোকানের বাইরে বান্ধব-বান্ধবীর সংখ্যা নেই। একদিন যে প্রেম এ্যাটলান্টিকের এক জাহাজে যেতে যেতে হয়েছিল, চিরদিন সে প্রেম নাও টিঁক্‌তে পারে এবং সে প্রেমের পথে প্রলোভনও তো অল্প নয়। সুতরাং ডিভোর্স্‌ এবং পুনর্বিবাহ এবং আবার ডিভোর্স্‌। কিম্বা বিবাহটা একজনের সঙ্গে পাকা, মিলনটা অন্যান্য জনের সঙ্গে কাঁচা। এটা অবশ্য গরুর গাড়ীর ধর্ম্মনীতির সঙ্গে এরোপ্লেনের হৃদয়-গীতির সন্ধি করার প্রয়াস। কেননা ডিভোর্স্‌ আইন্‌ এখনো গরুর গাড়ীর অনুশাসন অনুসারে কড়া, এবং রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতে সন্ধির দরকার হবে না, গরুর গাড়ী হঠ্‌বেই, ডিভোর্সটা বিবাহের মতো সোজা হবে এবং বিবাহটা স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বদ্‌লাবে। কেবল মুস্কিল এই যে মানুষের হৃদয়টা অত সহজে বদ্‌লাবার নয়, এডোনিসকে হারিয়ে ভেনাস্‌ কেঁদে আকুল হবে, ইউরিডিস্‌কে খুঁজতে অর্ফিউস্‌ পাতাল প্রবেশ করবে, সীতার শোকে রঘুপতি স্বর্ণ সীতাকেই হৃদয় দেবেন।

এতদিন নারী নরের সম্বন্ধগুলো ছিল পারিবারিক মাতা ও পুত্র, ভগিনী ও ভ্রাতা, স্ত্রী ও স্বামী, কন্যা ও পিতা। এখন এক নতুন সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েছে :—সখা ও সখী। বিয়ের আগে বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না শতেক সখীর মধ্যে কোনটি প্রিয়তমা—কোনটি স্ত্রী। বিয়ের পরেও পদে পদে সন্দেহ হচ্ছে, যাকে বিয়ে করেছি সে স্ত্রী না সখী, এবং যাদের সঙ্গে সখ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন একজন সখী না স্ত্রী। গুরুজনের নির্ব্বন্ধে যখন বিয়ে করা যেত এবং অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘট্‌ত না, তখন যাকে পাওয়া যেত সেই ছিল স্ত্রী। কিন্তু এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে, ঠিক্‌ কর্‌তে গিয়ে ভুল ক'রে ফেলা অতি সহজ, এবং ভুল থেকে উদ্ধার পাওয়া অতি শক্ত। এখন অনাত্মীয়াদের সঙ্গে নানাসূত্রে পরিচয়। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও স্ত্রীর সঙ্গে যত না সাক্ষাৎ হয় সখীদের সঙ্গে ততোধিক, স্ত্রী যখন নিকটে থাকে তখন শোবার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখা কর্‌বার ফুরসৎ কোনো পক্ষেরই নেই; যে যার নিজের কাজে যায় ও রেস্তরাঁয় একা একা খায়। আর স্ত্রী যখন দূরে থাকে তখন তো দেখা হবারই নয়।

এই দূরে থাকাথাকিটাই বেশীর ভাগ স্থলে ঘট্‌ছে। কেননা বিয়ের আগে স্ত্রী যে কাজে বিশেষজ্ঞ হয়েছে বিয়ের পরে সে কাজটি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক কর্ম্মস্থল থেকে আরেক কর্ম্মস্থলে ঘুর্‌তে থাকা তার পক্ষে মস্ত বড় ত্যাগ, এবং সে ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি। সুতরাং প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর স্বামী যদি সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি হয় তো স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয় বৎসরান্তে একবার। কিম্বা কৃষক স্বামীর স্ত্রী যদি ভ্রাম্যমান চিত্রকর হয় তো স্বামীর সঙ্গে সে একবারে বেশীদিন থাক্‌তে পারে না। অথচ অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন নূতন পুরুষের আলাপ-বন্ধুতা এবং সংবাদদাতার সঙ্গে প্রতিদিন নূতন নারীর সাক্ষাৎ পরিচয়। এরূপ স্থলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, কে স্ত্রী, কে সখী—যাকে বিবাহ করেছি সে নাও হ'তে পারে স্ত্রী, যাকে বিবাহের আগে দেখিনি সেই হ'তে পারে সখীর অধিক। যারা হৃদয়-সম্বন্ধে অনেষ্ট্‌ তাদের পক্ষে এটা এক বিষম সমস্যা, যারা সমাজকে ভয় ক'রে ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে কিছু নয়। তারা হয় চুপ ক'রে স'য়ে যায়, কাঁদে; নয় যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ ডুবে ডুবে জল খায়।

বিশ বছর আগেও স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুতা ছিল সমাজের চোখে সন্দেহাত্মক, বিশেষত বিবাহের পরেও স্বামীর বা স্ত্রীর অনভিমতে। এখন বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে স্পষ্ট বোঝাপড়া হ'য়ে যাচ্ছে যে, স্ত্রীর সখাদের নিয়ে স্বামী কিছু বলতে পারে না, স্বামীর সখীদের নিয়ে স্ত্রী কিছু বল্‌তে পাবে না, পরস্পরের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুতা কোনো কোনো স্থলে সঙ্কট ঘটালেও, মোটের ওপর সমাজ-সম্মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ-সম্মত না হ'লে চল্‌তও না। কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন একটা ব্যবধান অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছে, দূরত্ব-জনিত ব্যবধান। স্ত্রী আর গৃহীনী নয়, হোটেলবাসীর গৃহিণীর প্রয়োজন নেই না। স্ত্রী আর সচিব ও নয়, ভ্রাম্যমান সংবাদদাতা তার অভিনেত্রী-স্ত্রীর কাছে কি মন্ত্রণা প্রত্যাশা কর্‌তে পারে?

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

স্ত্রী নিজের কাজে ব্যস্ত। বরং একজন নারী-সাংবাদিকার কাছে মন্ত্রণা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। তারপর স্ত্রী যদিবা সখী হয় তবু দূরে থাকে ব'লে বন্ধুতার সব দাবী মেটাতে পারে না,—ধরো, এক সঙ্গে টেনিস্ খেল্তে পারে না, সিনেমায় যেতে পারে না, টেবিলে খেতে পারে না, মোটরে বেড়াতে পারে না, অবসর কালে গল্প করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে অনিবার্য্য ব্যবধানটি, এটিকে পূরণ কর্‌তে পারে অন্য নারী বা অন্য পুরুষ—সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক্ না কেন। সেই জন্যে এখন পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে-নারীতে বন্ধুতার মতো স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতাও চল্‌তি হ'য়ে গেছে, এ নিয়ে কেউ কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয় না।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে সেকালের প্রেম ও সতীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমতঃ প্রেম যে চিরস্থায়ী, এমন কি, দীর্ঘস্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিবাহের সময় এখনকার তরুণ তরুণীরা তাদের ঠাকুর দাদা ঠাকুরমা'র মতো গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করে না যে যাবজ্জীবন পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাক্‌বেই। প্রতিজ্ঞা যদিও বাঁধা-নিয়ম মেনে করে, তবু লঘুভাবেই করে, মুখে যা বলে মনে তা' বলে না। মনে মনে যোগ ক'রে দেয়—"আশা করি"। যেক্ষেত্রে ডিভোর্স্ যত সুলভ সেক্ষেত্রে লঘুভাবটা তত বেশী। এই লঘুভাবটা না থাক্‌লে মানুষ ভয়ে আধমরা হতো। কেননা এখন তো বিবাহ পিতামাতার নির্ব্বন্ধে নয় যে ভুলের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভগবানকে ডেকে আশ্বস্ত হবে। নিবন্ধ যখন নিজেরি হাতে তখন ভুলের দায়িত্বও নিজেরি। একদিনের ভুলের জন্যে চিরজীবন প্রায়শ্চিত্ত করা অসহ্য। তা ছাড়া ভুল নাই হোক্, ঠিকই হোক্, একদিনের ঠিক্ কি চিরদিন ঠিক্ থাকে? বিশ বছর বয়সের ঠিক কি ত্রিশ বছর বয়সেও ঠিক থাকে? দু'পক্ষই বদ্‌লায়, দু'পক্ষই নতুন সত্যকে পায়, পুরোনো সত্যকে ভোলে। রলাঁর "আনেৎ" যাকে প্রাণ ভ'রে ভালো বাসত তাকে কথা দিতে পার্‌লে না যে চিরদিন তেমনি ভালো বাস্‌বে, সেই জন্যে তাকে বিবাহই কর্‌তে পার্‌লে না, অথচ তার ভালোবাসার চিহ্ন ধারণ কর্‌লে তার সন্তানের মা হ'য়ে।

দ্বিতীয়তঃ, সতী নারীর স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের সঙ্গে তেমনি অন্তরঙ্গতা থাক্‌তে পারে যেমন অন্তরঙ্গতা এ যাবৎ কেবল সখীর সঙ্গেই সম্ভব ছিল। পরপুরুষকেও ভালোবাসা যায়, তার সঙ্গে গা-ঘেঁষে বসা যায়, তার কোলে মাথা রাখা যায় অভিনয় কালে তাকে চুম্বন-আলিঙ্গনও করা যায়, এমনকি অন্য সময়ও। স্বামীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার সখার সঙ্গে তেমনি। অথচ সতী ধর্ম্মের ব্যত্যয় হয় না। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ়তম ভালোবাসা থাকে। এক কথায় সখ্য প্রেম ও মধুর প্রেম পরস্পর বিরোধী নয়, একই হৃদয়ে দু'য়েরি স্থান হতে পারে। এবং এমনো একদিন হতে পারে যে সখ্য প্রেমই মধুর প্রেমে পরিণত হয়েছে, মধুর প্রেম সখ্য প্রেমে পর্য্যবসিত। সেরূপ স্থলে সম্বন্ধ-পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই ঠাঁই থাকার ফলে এমন ঘটা বিচিত্র নয়। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই স্বতন্ত্র, দু'জনেই স্বাবলম্বী, দু'জনেই ভ্রাম্যমান—একদিন যে দু'টি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে মিলেছিল চিরদিন তারা সেইস্থানে থাক্‌তে পারে না, পরস্পরের থেকে সমান দূরত্ব রাখ্‌তে পারে না, দূরত্বের কম বেশী ঘটে, অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এক সম্বন্ধ আরেক হয়ে ওঠে। যে ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না,—দাম্পত্য ও সখ্য যেমন ছিল তেমনি থাকে, সে ক্ষেত্রেও যে সতীত্বের পুরোনো আদর্শ খাটে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা পুরোনো সতীত্বের সঙ্গে ছিল নিজের দ্বারা স্ত্রীকে বা স্বামীকে সাত-পাকে ঘিরে রাখা, এখন অনেকখানি ঢিল দিতে হচ্ছে, কোনো পক্ষেই বিশ্বস্ততার জন্যে পীড়াপীড়ি নেই, বিশ্বস্ততার জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই, Othello ক্রমশ সেকেলে হয়ে পড়ছে। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে। চিরকুমার থাক্‌লে সেকালে উপবাসী থেকে যেতে হতো, চিরকুমার থাক্‌লে একালে আধপেটা থাক্‌তে পারা যায়—সখী থাকে কাছে। বিবাহ কর্‌লে সেকালে পেট ভরে উঠত, বিবাহ করেও একালে আধপেটা থাক্‌তে হয়—স্ত্রী থাকে দূরে। এ কালের কুমারীদের অনেক দুঃখ থেকে অব্যাহতি মিলেছে, সেইজন্য তারা বিবাহের জন্যে কেঁদে মরছে না। এবং একালের বিবাহিতারাও অনেক

সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেইজন্যে তারা সৌভাগ্যগর্ব্বে বাড়াবাড়ি কর্‌ছে না।

তবে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স প্রমুখ দেশে স্ত্রীপুরুষের সাতিশয় সংখ্যা-বৈষম্যের দরুণ প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিমতার উৎপত্তি হয়েছে বটে। কর্ত্তারা দুনিয়া দখল কর্‌তে ব্যস্ত, যুদ্ধ না কর্‌লে তাদের চলে না, দেশের নারী সংখ্যার অনুপাতে পুরুষ সংখ্যা যে কম্‌তেই লেগেছে আর সেজন্যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই যে demoralisation হচ্ছে একথা কর্ত্তারা বুঝেও বুঝছেন না। ছেলেরা জানে মেয়েরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী, সুতরাং বিবাহের গরজটা মেয়েদেরই বেশী, সাধ্‌তে হয় তো ওরাই সাধবে, তপস্যাটা একেবারে ও-তরফা। মেয়েরা জানে সকলের বরাতে বিবাহ নেই, বিবাহ যদি বা হয় তবু স্বামীকে ধ'রে রাখতে পারা যাবে না, একজনকে হারালে আরেক জনকে পাবার আশা নেই, তপস্যাটা অনর্থক এ-তরফা। এর পরিণাম এই হচ্ছে যে তপস্যাটাকে কোনো তরফই স্বীকার করছে না, হাতে হাতে যখন যা পাচ্ছে তখন তাই নিচ্ছে, পরমুহূর্ত্তে ছেলেরা ফেলে যাচ্ছে, মেয়েরা কান্না চাপছে। এ বড় নিষ্ঠুর খেলা। দু'পক্ষে সমান নিয়ম খাট্‌ছে না, একপক্ষ ফাউল্ কর্‌তে কর্‌তে অতি সহজে জিৎছে, অপরপক্ষ ফাউল্ সইতে সইতে অতি সহজে হার্‌ছে। দু'পক্ষেরই demoralisation, তবু মেয়েরা দোষ ধরছে ছেলেদের, ছেলেরা দোষ ধর্‌ছে মেয়েদের। মেয়েরা বল্‌ছে, বাপ রে! একেলে ছো-গুলোর কী দেমাক; এরা আমাদের খাওয়াবে না পরা'বে না প্রতিপালন কর্‌বে না, সুধু আমাদের বিয়ে ক'রে মাথা কিন্‌বে, এরই জন্যে এত খোসামদ! আমাদের ঠাকুরমাদের জন্যে আমাদের ঠাকুরদা'রা কী না কর্‌তেন, ডুয়েল্ লড়ে প্রাণ বিপন্ন কর্‌তেন, যাকে অত কষ্টে পেতেন তাকে ক... যত্নে রাখ্‌তেন! আর আমাদের এঁরা—। ছেলেরা বল্‌ছে, তোমরা সব স্বাধীনা স্বতন্ত্রা আলোকপ্রাপ্তা শি-ম্যান, আমাদেরকে না হ'লে তোমাদের যে চলে না এ তো বড় লজ্জার কথা! আর, আমরা তো বেশ লক্ষ্মীছেলেই ছিলুম, তোমরা এতগুলোতে মিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণীর কাকে ছেড়ে কাকে ধরা দেবো আমরা পুরুষ চন্দ্রমারা! বলি, বহুবিবাহে রাজী আছ?

পণ্ডিতেরা বহুবিবাহের গুণ গেয়ে সন্দর্ভ লিখ্‌ছেন—বার্ণাড শ' বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ থেকে সুরু করে চুণোপুঁটিরাও। ফেমিনিষ্ট্‌দের আত্মসম্মানে বাধছে সপত্নী হতে, কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ সহ-জননী হতে আপত্তি কর্‌ছেন না। ফেমিনিজ্‌মের আধুনিকতম ধুয়া হচ্ছে জননী হবার দাবী। পার্লামেণ্টের ভোট তো হয়ে গেল, এখন সাফ্রাজেট্‌রা বেকার। তাঁদের নেত্রী সিল্‌ভিয়া প্যাঙ্ক্‌হার্ষ্টের একটি খোকা হয়েছে সম্প্রতি। খোকাটি মাতৃনামা এবং তার পিতাটি অপ্রকাশিতনামা।

(ক্রমশঃ)

মানুষ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

পদলেহী কুক্কুরের মত, ভারবাহী
গর্দ্দভ সমান হ'য়ে—বেঁচে কাজ নাহি।
কেঁচো সম মেরুদণ্ডহীন, মৃত্তিকায়
বুক পেতে চলা, ধূলিরো অধম, হায়!
ধূলি? সে-ও উর্দ্ধে উঠে, করে সে আঘাত
পবন-পীড়নে; কিন্তু এ দুর্ভাগা জাত,
সদা ভীত ত্রস্ত স্তব্ধ শঙ্কিত কম্পিত
সর্ব্বহারা নিঃস্ব রিক্ত লাঞ্ছিত বঞ্চিত
তবু নাহি জাগে; সদা আত্মঘাতে রত
ছেদি মুণ্ড খায় রক্ত ছিন্নমস্তা মত।
পশু সে-ও আত্মরক্ষা করে মৃত্যু হ'তে
তা-ও করিবারে কিগো নারি কোন' মতে?
জৈব ধর্ম্মে জীবমাত্র জন্মেছি ধরায়
মানুষ তা' বলে' মোরা হইনি তো তায়।

২

মানুষ অসাধ্য সাধে আপনার বলে
ক্ষয় ক্ষতি ক্ষোভে দুঃখে দলি পদতলে;
আগুনে দহিয়া, কভু সাগরে ভাসিয়া,
ভূমিকম্পে হারাইয়া, প্রলয়ে নাশিয়া,
বজ্রে জ্বলি, ঝড়ে উড়ি, মড়কে মরিয়া,
দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যেরে গৌরবে বরিয়া—
তপার্জ্জিত শক্তি মানবের; কাছে যার
বিনায়াস-লব্ধ শক্তি স্বর্গ-দেবতার,
অতি তুচ্ছ ম্লান পাণ্ডু; নাহি যে রে তা'য়
অর্জ্জন-বেদনা-সুখ ভরা মমতায়।
চাহিনা দেবতা হ'তে তাই বিশ্ব-মাঝে
মানুষ হইয়া যেন বাঁচি সর্ব্ব কাজে;
মানুষের প্রাপ্য যাহা মানুষেরে দাও,
দেবতা না করি নরে, মানুষে বাঁচাও।

৩

মানুষের তরে বিশ্ব, বিশ্বের গৌরব
মানুষের ভোগ্য বলি; নহিলে এ সব
হ'ত না সুন্দর হেন; ব্যর্থ নিরর্থক
প্রাণহীন হ'ত মহা দুঃসহ নরক।
কবি রচে স্তব-শ্লোক, চিত্রী আঁকে রূপ,
গীতী গায় জ্বালাইয়া অন্তরের ধূপ।
চাষী এর বক্ষ চষি আহরিয়া আনে
অন্নের অমৃত; কবে হ'তে কেবা জানে
অমর মজুরগণ ঢালিতেছে প্রাণ
করিতে পৃথ্বীরে রূপ রস গন্ধ দান;
দিবারাত্র কাঁটা কুশে বিদ্ধ পদতল
গড়িছে চলার পথ পথিকের দল।
স্রষ্টা দ্রষ্টা মন্ত্রদ্রষ্টা মানুষ ধরার—
স্রষ্টারি সৃষ্টিতে সুধু ভোগে অধিকার।

৪

জীবনের পর পারে মৃত্যুর আঁধারে
স্বর্গ যদি থাকে, থাক্; চাহিনা তাহারে।
আমার সকল সুখ সব অভিলাষ
একান্ত কামনা আশা, বিষাদ উল্লাস,
এই দেহে এই মনে আছে জড়াইয়ে
সর্ব্ব অঙ্গে, প্রতি রক্তকণে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে;
আপনার প্রিয়জন আত্মীয় বান্ধবে
বেড়িয়া ঘেরিয়া মোর সুখ দুঃখ ভবে;
যাদের বিরহ ব্যথা বিরস বদন
বাজে মোর অন্তরেতে বাজের মতন,
যাদের বিয়োগে বিশ্ব লুপ্ত হয় মোর,
পাছে ছেড়ে যেতে হয়, মৃত্যু ভয় ঘোর,—
হেন প্রিয়তম মর্ত্ত্য-ভূমিরে তেয়াগি
বিন্দুমাত্র বাঞ্ছা মম নাহি স্বর্গলাগি।

অলক্ষিত শিল্পজগৎ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীরমেশ বসু

অলক্ষিত স্থানেও কি করে রূপ-রসিকের দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে না, তার কথা ও চিত্র-পরিচয় আমরা আগে একটি প্রবন্ধে দিয়েছি। তাতে দেখান হয়েছে রেখা-মণ্ডলের মধ্যে মানুষের হাতের স্পর্শ ছাড়াও অসম্ভাবিতরূপে শিল্পের খোঁজ মিল্‌তে পারে। শিল্পীরা প্রকৃতির মধ্যে নানা যায়গা থেকে যেরূপ মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পারেন, এদিক থেকেও তেমনি তাঁদের চোখ ও হাত অনেক কিছু আদায় করে নিতে পারে। খণ্ড খণ্ড ভাবে তা পেয়ে ইউরোপ তার সদ্ব্যবহার অনেক যায়গায় করেছে জানা যায়; কিন্তু সমগ্রভাবে রূপ ধরার সুরু চিত্রলোকের ইতিহাসে এই প্রথম। কথা হতে পারে শিল্পীরা যা রচনা করেন সুধু তাই-ই শিল্প, না তাঁরা বিশ্ব সংসারে রূপের যে অমূল তরু দেখ্‌তে পান, তার কোন রূপ-রস আছে কিনা। এই রূপের ছায়া আছে, বস্তু নেই। এগুলোকে সূক্ষ্ম শিল্পের গৌরব দেওয়া হবে কিনা সে কথা হয়ত বিচার সাপেক্ষ, কিন্তু এগুলি মানুষের হাতের রেখাদ্বারা ছন্দিত হয়ে উঠ্‌লে বোধহয় এর মূল্য অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

অভিজাত পদ্ধতিতে শিল্প চর্চ্চা ছাড়া আরও নানা যুগে যে সব নানারকমের শিল্প রচিত হয়েছে, তাদেরও কোন কোনটির সঙ্গে এই নূতন পদ্ধতির মিল ও তফাৎ দুই-ই আছে। ইউরোপে সিলুয়েৎ (Silhouette) নামে এক ধরণের ছবি চলিত আছে। উহা দ্বারা ছায়া অবলম্বনে মানুষের চেহারা নানারকমে ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু তাতে সুধু সীমা-রেখারই স্থির বা চঞ্চল ভঙ্গিমার সাহায্যে ছবি তৈরি হয়। কিন্তু মানুষের চেহারায় বা অন্য কোন কিছুর মূর্ত্তিতে অনেক যায়গায়ই রেখার যে ভাঁজ পড়ে তার কিছুই ঐ পদ্ধতি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

কাগজ কেটে কেটে মূর্ত্তি রচনার (Stencil-work on Paper) কাজকেও একটি ঐ শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে গণ্য করা যায়। এ কাজেও সীমা-রেখাগুলিরই প্রাধান্য দেখা যায়। কাগজকে ভাঁজ করে নিয়ে এমনভাবে কাটা হয় যেন মূর্ত্তির দুই দিক খুব সুসঙ্গত হয়। কিছুদিন আগেও আমাদের এই বাংলা দেশেরও নানা জায়গায় এই কারিকুরী খুব প্রচলিত ছিল—পুরুষ স্ত্রীলোক উভয়েরই এ কাজে হাত পড়ত। এতে মানুষ জীবজন্তু ও লতাপাতার রূপকে ফোটাবার চেষ্টা খুব বেশী ছিল এবং কোথাও কোথাও পৌরাণিক চিত্রও আঁকা ও কাটা হত। অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম Decorationও এতে ছিল। এসবের নমুনা এখনও আমাদের দেশে কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং এখনও স্থানে স্থানে অনেকে সুন্দর কাজ করতে পারে।

উপরের ঐ দুই পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের আলোচিত পদ্ধতির মিল আছে সীমা-রেখার দিক থেকে। কিন্তু সমগ্রভাবে মূর্ত্তিটিকে—বিশেষ ক'রে বল্‌তে গেলে মূর্ত্তির সমগ্র ভাবটিকে—প্রকাশ করবার দিক থেকেই এ পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য।

—শিকারী পাখী—

—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা

[অলক্ষিত শিল্প-জগৎ] শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

—বাংলার বাউল—

[অলক্ষিত চিত্র অবলম্বনে]

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

শ্রীরমেশ বসু

প্রথমে, বহু রেখার মাঝখান থেকে এই ধরণের ছবিকে গড়ে তুল্‌তে হয় বলে সীমা সম্বন্ধে সচেতন না হলে চলে না, সীমার বন্ধনের সাহায্য না হলে একে সাকার করে ধ'রে রাখা যায় না, কেননা কোন্ ফাঁকে যে সব গুলিয়ে যায় তার ঠিক নাই। এমনও হয় যে, কতক রেখাকে একটু-আগে-সম্পূর্ণ-অলক্ষিত অন্যান্য রেখার সঙ্গে নূতন করে জড়িয়ে দেখার জন্য একেবারে অন্য ছবির সন্ধান হয়ে উঠে। অনেক সময় এমন হয় যে, একবার যে ছবির কল্পনা করা যেতে পারে, পরে হয়ত বহু চেষ্টাতেও আর সহজে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না—অথচ রেখাগুলো তো সে স্থানে স্থির হয়েই রয়েছে! দ্বিতীয় বিষয় এই যে—সুধু রূপটিকে প্রথমে ঐভাবে ধরা যায় বটে কিন্তু ছবির যে Idea-টি হৃদয়কে প্রথমে অভিভূত করে' আকর্ষণ করেছিল রেখার ইতস্ততঃ বিকার্ণ ভাঁজগুলিকে ধরতে না পার্‌লে সেইভাবে ও সমগ্ররূপে তার আপন মহিমায় ছবিটী পূর্ণ হয়ে উঠে না,—সুধু বাইরের সীমা দিয়ে। সেইখানে ঐ কারণে শিল্পীকে রেখার ভাঁজের অনুসন্ধানে অনুপ্রবিষ্ট হতে হয়।

এই নূতন পদ্ধতিতে অন্যান্য রেখা ও অঙ্গের গতি সুধু কোন রকমে আভাসে বুঝে নিতে হয় না, দুটি চারিটি সরু বা সরলরেখার টানে তার ভঙ্গি অতি বিচিত্ররূপে সম্পূর্ণ সজীব হয়ে উঠে।—কেবল তার বিশেষ ভাবগুলিকে জাগাবার জন্যে রসগ্রাহীর নিকটে রেখার ভাঁজগুলোর ভিতরে তাঁর চিন্তার ঠাঁইয়ের অবকাশটুকু রেখে। অথচ অঙ্গ-যোজনার দিক থেকে এর ত্রুটি একটু লক্ষ্য করে দেখ্‌লেই ধরা পড়ে যায়—এমন কি, অনেক সময়ই শারীর-সংস্থানের (Anatomy) হিসাবে এর কোন দামই হয় না, তবু সমগ্রভাবে দেখলে ঐ ত্রুটির কথা ত মনেই হয় না বরং ঐ ত্রুটি থাকার জন্য এর যা কিছু চমৎকারিতা। মানুষের হাত নেই অথচ মানুষের মনের মায়াই তাকে জন্ম দেয় এমন রূপ-কল্পনার হাত ছাড়ানো মুস্কিল।

বিন্দুর সঙ্গে বিন্দুর এবং রেখার সঙ্গে রেখার যোগসাধন করা যে মানুষের চোখের একটা বিশেষ ধর্ম্ম তা মানুষের অতি প্রাচীন সভ্যতার যুগেও ধরা পড়েছিল। যখন জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই প্রায় জানা ছিল না তখনও মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর নক্ষত্রপুঞ্জের জ্যোতিবিন্দুগুলিকে দেখে নানা জীবজন্তুর আকার মানুষের মনে আস্‌ত, এবং প্রাচীন কালে নক্ষত্রপুঞ্জের নামও সেই অনুসারেই রাখা হয়েছিল। কতদূরের নক্ষত্রের সঙ্গে কতদূরের নক্ষত্রের এই সম্পর্ক পাতান্ মানুষের চোখের অনুসন্ধিৎসা এবং রসানুভূতির আনন্দ ছাড়া আর কি হতে পারে?

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন পাড়াগাঁয়ে কোন কোন সময়ে ঘন ঝোঁপ জঙ্গলের মধ্যে গাছপালা ও লতাপাতা মিলে এমন একটা কিছু করে তোলে যা রাত্রির অন্ধকারে বা জ্যোৎস্নার দ্বারা রচিত পটের গায়ে এক একটা মূর্ত্তি এঁকে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হাওয়ার সাহায্যে ডালপালা ও লতার চঞ্চলতায় এই সব মূর্ত্তি যেন সজীব মনে হয়। এই মূর্ত্তি কোথাও সুন্দর আবার কোথাও ভীষণ হয়ে দেখা দেয়। গ্রামের লোকেরা ভয় দেখার জন্য বেশী করে প্রস্তুত থাকে বলেই এমন সব ছায়া সহজেই তাদের চোখে পড়ে যা দেখে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সুন্দরকে খুঁজে বার কর্‌তে জান্‌লে তার সন্ধানও মিল্‌তে পারে না কি? আলোচিত চিত্রগুলির অনেক আদ্‌রাতেও যে বহু অদ্ভুত ধরণের অসম্পূর্ণ আবার কোথাও বা সম্পূর্ণাকার মূর্ত্তি অধিক দেখা যায় ও প্রথমে দেখা যায়,--এবং বহু চেষ্টার পরে হয়ত কোন কোন স্থলে তাদেরই ভেতর থেকে অশেষ সুন্দর একখানি চিত্রের কতক রেখা হঠাৎ হেসে দেখা দিয়ে ফেলে, এ সত্য খুব সম্ভব ওরূপ ক্ষেত্রেও প্রযুজ্য হতে পারে—এবং ভবিষ্যতে আমাদের আলোচ্য চিত্রগুলির মধ্যে তাদেরও একটি সত্য সন্তোষজনক স্থান ঘটে উঠা খুব বেশী অসম্ভব নয়।

সুধু তাই নয়, অনেক সময়ে কোন সমতল স্থানের উপর দিয়ে অল্প পরিমাণে চল্‌তি জলের চলার পথের মধ্যে, কোন স্থানে কোন কিছুর ফাঁক দিয়ে রোদ ও ছায়ার খেলার মধ্যে, ঈষৎ চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী যে সব আদ্‌রা হঠাৎ চোখে পড়ে'

গো-চারণ

—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা—

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

[অলক্ষিত শিল্প-জগৎ]

যায়,—যাদের আশ্চর্য্য রকমের গভীরভাব ও সংস্থানটি রূপ-রসলিপ্সুকে কোথাও স্তব্ধ, স্তম্ভিত এবং কোথায় কুতূহলী ও অধীর করে তোলে, সেগুলিকে স্থায়ী রূপ দিয়ে ধরতে পারলে আলোচ্য পদ্ধতির মধ্যে যে আরও সমৃদ্ধির সূত্র পাওয়া যাবে তাতে ভুল নেই। যদিও খুবই সামান্য সফলতার সঙ্গেই শ্রীযুক্ত মিত্র-মজুমদার মহাশয় যে সে প্রয়াসকেও একেবারে নিছক্ অব্যাহতি দিতে পারেন নি তা বলাই বাহুল্য। ওরা তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। ভবিষ্যতে তার ফল শিল্পিসঙ্ঘের কাছে পরিবেশন করা হয় ত চল্‌তে পার্‌বে। স্থির বা গতিশীল বা স্পন্দমান বা পরিবর্ত্তন-স্পৃহ প্রকৃতির বা প্রকৃতিরও অজানা ভঙ্গীর ভিতর থেকে শিল্পীর হৃদয়ের খাদ্য বা অন্তরের তৃপ্তিকে এবং জগতের চিত্রশালাকে কতদূর সাহায্য এরা করতে পারে, তা বুঝবার দিন হয়ত এগিয়ে আস্‌ছে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব চিত্র দেখান হয়েছে সেগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইহার সবগুলিই, এগুলির দ্রষ্টা শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয় নানা অলক্ষিত স্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন। একাজে তাঁর দৃষ্টি ও হাতেরও নৈপুণ্য কতটা ফুটেছে তা পূর্ব্ববারে প্রকাশ পেয়েছে। এবং এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞের অভিমতও জানা গিয়েছে। এবার-কার নমুনা থেকে এ ধরণে ছবি আঁকার শক্তি কোথায় তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে মনে করি।
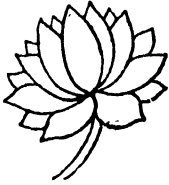
অলক্ষিত শিল্প জগৎ

শ্রীরমেশ বসু

—বাউল—

(অলক্ষিত চিত্র)

—শীতের টুপী—
(অলক্ষিত চিত্র)

দ্রষ্টা ও স্রষ্টা
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
মহাশয়ের সৌজন্যে
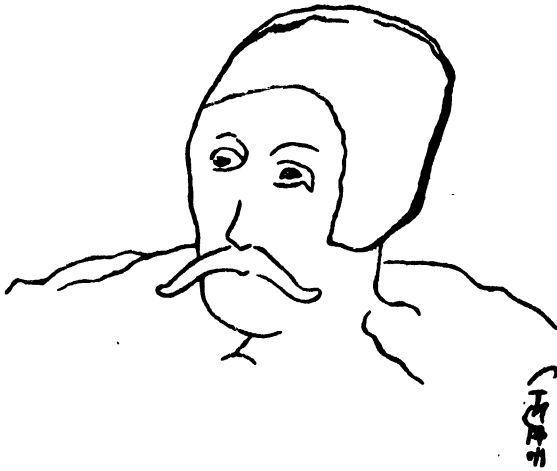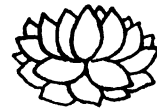
শিকারী পাখী

এক পুরাণো বাড়ীর কবাট থেকে সংগৃহীত। ঐ কবাট আগে হলুদ ও নীল রঙ্গে রঙ্গান ছিল, ওর এক পাল্লার রং ফেটে ও চটে যায়, তার উপর মানুষের গা থেকে লাগা তেলের দাগ পড়ে। এসব দিয়েই রঙ্গিন্ ছবিটী হয়ে উঠেছে। এতে রেখাও আছে আবার বর্ণের লেপও (Shade) আছে। মূল ছবি প্রদর্শিত ছাপা অপেক্ষা প্রায় আড়াইগুণ বড়।

শীতের টুপী

দেয়ালের বালি-চুণের আস্তর থেকে পাওয়া। ফাটা ও ময়লা-ধরা একত্র হয়ে এরূপ হয়ে উঠেছে। মূল প্রায় দ্বিগুণ বড়।

গো-চারণ

কুঠরীর দেয়ালের নিচের দিকে বিলাতী মাটির আস্তরের উপরে ইহার অবস্থান। ঐ আস্তরের গায়ে জলের দাগ লেগে ও বিলাতী মাটি ঘেমে যে দাগ হয় তা শুকিয়ে এক সঙ্গে মিলে এই ছবিটী হয়েছে। রেখা ও জলের ছোপের মিলনে এই কাণ্ড হয়েছে। মূল প্রায় চারগুণ বড়।

মুঘল সম্রাট

এখানাও দেয়াল থেকে পাওয়া। বালি ও বিলাতি মাটির আস্তরে তৈরী নূতন দেয়ালে জল লেগে লেগে সময় সময় যে দাগ পড়েছে—সেই দাগের বূাহ থেকে কোন কোন রেখার সূত্র ধরে এর উদ্ধার সাধন হয়েছে। এতগুলি খামখেয়ালি রেখার সঙ্গতি-বিধান একদিনের দেখায় হওয়া অসম্ভব। তিনবার চেষ্টা করে তবে একে কায়দা করা গিয়েছে। প্রথমে চোখটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ক্রমে আশপাশের রেখাগুলো ছবিটাকে ধরে দেওয়ার পথ করে। প্রথম বারের চেষ্টায় চোখ, নাক ও চিবুক অবধি তুলে নেওয়া হয়। কিছুদিন বাদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের চেষ্টায় মুকুটের দিকে নজর পড়ে ও তা এঁকে ফেলা হয়। মূল ছবিটী প্রায় দশগুণ বড়।

দ্বৈরথ

দ্বন্দ্বে মাত্‌বার প্রথম অবস্থাটি যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা সকলের চোখে ধরা পড়্‌বে। যেমন একটা সজীবতার আঁচ পাওয়া যায়, তেমনি রেখার জটিলতায় মুখ দুখানির মধ্যে ক্রোধের এবং ক্রূর কর্ম্মের ও প্রতিহিংসার আনন্দ ফুটে উঠেছে।

মাঝামাঝি পুরাণো ধরণের আস্তরহীন সুরকীর গাঁথনী ইঁটের দেয়ালের গায়ে ছিল। ইহার আদ্‌রা জমাট সুরকীর গাঁথনী ও ইঁটের ফাটলের সংযোগে উৎপন্ন। মূল দৃশ্য এখানে প্রদত্ত ছবি থেকে প্রায় ছয়গুণ বড়।

শ্রীরমেশ বসু

—মুঘল সম্রাট—

[অলক্ষিত শিল্প-জগৎ] —দ্রষ্টা ও স্রষ্টা—

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

মলক্ষিত শিল্প জগৎ]

দ্রষ্টা ও স্রষ্টা

—দ্বৈরথ—

শ্রীঃ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

বাউল

এবারকার ছবিগুলির মধ্যে ইখানা দেখে আমাদের মনে পরিপূর্ণ ত্রর যে স্থান আছে তার জায়গ রেখার অসম্পূর্ণতা ও স্বৈর গতির দ্বারা কি ফল হয় তা ধরা পড়ে যায়।

জীর্ণ পুরাণো দেয়ালের মধ্যে আল্‌কাত্‌রার লেপ্‌টি কোথাও ফেটে ও কোথাও চটে যাওয়ায় ও নীচের চূণের পোছ্‌ বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে মিল দেওয়ায় এই ছবির সম্ভাবনা হয়েছে।

বাংলার বাউল

আমাদের আলোচিত ছবিগুলোকে মূল ধ'রে নিয়ে তা থেকে পুনর্কল্পনা Reconstruct) ক'রে কিরূপ ছবি তৈরী হ'তে পারে তার একটী বি নমুনা হচ্ছে এই ছবি । পূর্ব ী ছবি থেকে একে গ তোলা হয়েছে। শ্রীযুক্ত মিত্র-মজুমদার মহাশয় কয়লা-রং খানা আঁক ক নতুন রূপ ও গভীর দৃ ান দিয়েছেন। এরূপ ছবি অন্য কোন উপায়ে আঁকা ত মনে হয় না।

রক্তকরবী

শ্রীনবেন্দু বসু

নিছক নাটক হিসাবেই রক্তকরবীর আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। "রূপক" বা "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" নয়—সে বিষয়ে পাঠক আশ্বস্ত হ'তে পারেন। তবে অল্পস্বল্প রূপকের স্পর্শ যদি কোথাও লাগে তো আশা করা যায় যে মাত্র সেইটুকুর জন্যেই প্রবন্ধটি বর্জ্জনীয় হবে না। কেননা কাব্য বা অন্য কোন শিল্পসৃষ্টিতে যে রূপকের স্থান নেই এমন কথা কেউ বলে না, এবং রক্তকরবী যে সম্পূর্ণ রূপকবর্জ্জিত তাও কেউ বলতে চায় না।

আধুনিক যুগের অনেক নাটকের রূপ আর গঠন সনাতন নিয়মানুযায়ী নয়। রক্তকরবীকেই উদাহরণস্বরূপ নিলে দেখা যায় যে নাটকখানি একাঙ্ক, দৃশ্য পরিবর্ত্তন নেই, এমন কি দুটি একটি চরিত্রের সঙ্গে তো পাঠক বা দর্শকের চাক্ষুষ পরিচয় একরকম ঘটেই না, যদিও তাদের কথা যথেষ্টই শুনতে পাওয়া যায়, আর তাদের কার্য্যকলাপের যথেষ্ট চিহ্নই বর্ত্তমান থাকে। অনেকের মনে এই সব থেকেই নাটকের প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব জাগতে পারে, যেটা শেষ পর্য্যন্ত তাদের পূর্ব্বধৃত ধারণাগুলির সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়ে দেয়। কিন্তু মাত্র এই নূতনত্বটুকুই যে সব সময়ে বিরক্তির যথেষ্ট সঙ্গত কারণ তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। যে কোন নতুন বেশে দর্শন দিক না কেন উৎকৃষ্ট নাটককে কতকগুলি নিয়ম মেনেই চলতে হয়, পঞ্চাঙ্কই হোক আর একাঙ্কই হোক, আর সেইগুলির উপরেই তার সত্যকারের মর্য্যাদা নির্ভর করে।

সাহিত্যসৃষ্টিতে উপন্যাস আর নাটকের প্রধান কার্য্য জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ধ'রে তাই দিয়ে আমাদের চিত্তাকর্ষণ আর মনোরঞ্জন করা। তবে ঔপন্যাসিক অপেক্ষা নাট্যকারের দায়ীত্ব একটু বেশী আর অন্য রকমের। নাটকে আমরা সে অদৃশ্য বক্তাটিকে পাই না যে উপন্যাসে ঘটনা আর চরিত্রের আড়ালে থেকে দুর্ব্বোধ্য ব্যাপারগুলির অর্থ পরিষ্কার করতে করতে চলে। নাট্যকার সে দায়ীত্ব অনেকটা পরিমাণে চাপান পাঠক, শ্রোতা, দর্শক, অভিনেতা, আর দৃশ্যকারের উপর; আর তাঁকে তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে হয় প্রত্যক্ষ কার্য্য আর বাক্যপরম্পরার ভিতর দিয়ে। অভিনেতা আর দৃশ্য সজ্জা প্রভৃতির সাহায্য নাটকে একটা খুব বড় সাহায্য। অতএব নাটকখানি পাঠ্য হিসাবে উপভোগ করতে হ'লে যে, পাঠককেই একা অনেক দিক দেখতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। তাকে হ'তে হয় অভিনেতা, দর্শক, পাত্রপাত্রী, রসবেত্তা, সমালোচক—একাধারে সব; অনেকটা কল্পনা-শক্তির ব্যয় করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আর নাট্যকারকে স্থান কাল পাত্রের দিকে নজর রেখে ঔপন্যাসিক অপেক্ষা আরও স্বল্পপরিসরে কাজ করতে হয় ব'লে নাটকের রসগ্রহণ কার্য্যটি আরো শক্ত হ'য়ে পড়ে। কেননা নাট্যকারের লেখা থেকে অবান্তর যা তা বাদ যায়। খুঁটিনাটিকে স্থান দেওয়া চলে না। কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা আর যোগাযোগ মাত্র তাকে বেছে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সুতরাং ঔপন্যাসিক অপেক্ষা নাট্যকার বলে কম, আভাস দেয় বেশী। তার পক্ষে প্রত্যেক চরিত্রের জীবনচরিত লেখা সম্ভব নয়। আবশ্যক মত কতকগুলি গুণাগুণের উপর জোর দিয়েই সে ক্ষান্ত হয়। ঘটনাধারা চালিত করবার জন্যে যতটা প্রয়োজন তার বেশী বর্ণবিন্যাস অগ্রাহ্য। এই থেকে আমরা দেখতে পাই যে নাটকে চরিত্র, ঘটনা আর কার্য্যক্রম এ সমস্ত একটা সামঞ্জস্যসূত্রে গাঁথা থাকা দরকার। একটা আর একটাকে ফুটিয়ে তুলবে। পাত্র পাত্রীদের মনোভাব আর ব্যবহারই ঘটনার গতি ফেরাবে। এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের কৃতিত্ব কতখানি ছিল তা তাদের আঁকা প্রধান চরিত্রগুলি থেকে জানতে পারা যায়। সেখানে তো সমস্ত দায়িত্বই

থাকতো দেবদেবী আর ভবিতব্যের হাতে, পাত্রপাত্রীরা ছিল তাদের চালিত ঘুঁটিমাত্র, কিন্তু তবুও তারা বিশেষত্বহীন নয়। মনেতে তারা যথেষ্ট ছাপ রেখে যায় আর সেই জোরে সাহিত্যসৃষ্টিতে তারা অমর হ'য়ে আছে। অবশ্য স্বীকার্য্য যে গ্রীক-নাট্যসাহিত্য কাব্যশক্তির অনেকখানি সাহায্য পায়। চরিত্র যেমন ঘটনাকে পরিস্ফুট করে, ঘটনাও তেমনি এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে চরিত্রগুলির নিজত্ব আর অন্যান্য বিশেষত্বগুলি স্পষ্ট আর সজীব হ'য়ে ওঠে; তবেই বুঝতে পারি কোন্ কোন্ মনোবৃত্তি, উদ্দেশ্য আর প্রবৃত্তি, নাটকঘটিত ব্যাপারগুলিকে চালিত করছে। তবেই নাটকের মূল বিষয়টি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু নাটকের মূল বিষয়টি কি? সেটা নিহিত থাকে একটা বিরোধজনিত দ্বন্দ্বের মধ্যে। নাটকের প্রধান লক্ষণ তাই। সে বিরোধের দুপক্ষে থাকে দুজন মানুষ বা তাদের দুটি দল, দুটো মনোভাব বা স্বার্থ বা তিনটিরই কোন সংঘবদ্ধ অবস্থা। নাটকের ভিতর দিয়ে এই বিরোধগত দ্বন্দ্বটির উত্থানপতন ঘটে, এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত ঘটনাবলী বা প্লট উঠতে নামতে থাকে। প্লটটি নাটকের দৃশ্যশ্রেণীর ভিতর দিয়ে একটা ক্রম-বর্দ্ধমান অবস্থায় আত্ম-প্রকাশ করে আর শেষের দিকে তার অবসান হয়। সাধারণ পঞ্চাঙ্ক নাটকে এই ক্রমিক অবস্থাটা চোখে পড়তে দেরী হয় না, তবে রক্তকরবীর মতন একাঙ্ক নাটকে অত স্পষ্টভাবে না হ'লেও একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেই ঘটনার এই স্তর-বিভাগটি ধরতে পারা যায়। আধুনিক যুগের একাঙ্ক নাটকের আবির্ভাব বা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করবার স্থান এ নয়। কেবল এইটুকু ব'লে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে পঞ্চাঙ্ক নাটকে যেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ অঙ্কে নাটকের চরম ঘটনাটি ঘটে, একাঙ্ক নাটকে সেইখান থেকেই পালা আরম্ভ হয়, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আর পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনা ঐ একটি অঙ্কেই সঙ্কুচিত ক'রে দেখান হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এইসব দিক থেকেই রক্তকরবীর আলোচনা করবো। নাটকের গল্পাংশটুকু কি, আগে সেইটে দেখে পরে দৃশ্যবিভাগ ক'রে তার মধ্যে সেই গল্পটি কেমন করে স্ফুর্ত্তি আর বিকাশলাভ করে তাই দেখতে হবে। সাহিত্য-রাজ্যে কেবল নাটকেই এইরূপ বিভাগ কার্য্য কতক-পরিমাণে ফলদায়ক বলে ক্ষমার্হ হ'তে পারে। নইলে লেখকের ওপর সমালোচকের কলম চালানোর দায়িত্ব বড় বেশী।

যে দ্বন্দ্বটিকে মূল ক'রে নাটকের আখ্যানভাগ গড়া হয়েছে, সেটা প্রকাশ পায় দুটো বিভিন্ন দলে দুটো বিভিন্ন স্বার্থ রূপে। দ্বন্দ্বটি এই :—

এক জালের আড়ালে ঢাকা রাজাকে (যাকে এখানে আমরা লোভ আর স্বার্থ প্রসূত কর্ম্ম আর নিয়মভারক্লিষ্ট অন্ধ মানব মন বলতে পারি) তার নিয়োজিত কর্ম্মী আর সেবকদের হাত থেকে (অর্থাৎ যে সমস্ত মনোভাব আর চেষ্টা উক্ত স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত) উদ্ধার করবার জন্যে নন্দিনী ব'লে এক সুন্দরী কুমারী আর তার প্রেমিক রঞ্জনের (যারা এখানে সৌন্দর্য্য আর তার অন্তর্গত মোহিনী শক্তির প্রতিনিধি) প্রবল চেষ্টা। অর্থাৎ একপক্ষে নন্দিনী আর রঞ্জন, আর অন্যপক্ষে রাজার সর্দ্দারের দল। এই দুইয়ের মধ্যে রাজাকে অধিকার করবার জন্যে যে সংঘর্ষ তাই নাটকের মূল বিরোধের ভিত্তি।

যে গল্পটির ভেতর দিয়ে এই বিরোধের সমাধান হয় তা এই :—যক্ষপুরীর রাজা জালের আড়ালে বাস করেন। সেখানকার প্রজারা মাটির নীচে খনিতে সোনা তোলার কাজ করে। রাজার সর্দ্দার তাদের খাটায় আর রাজা সেই ধনের নেশায় বিভোর হ'য়ে থাকেন। লোকগুলোর মধ্যে মনুষ্যত্ব জিনিষটি প্রায় লুপ্ত হ'য়ে এসেছে। এমন সময় দুটি নতুন মজুরের আমদানী হয়, নন্দিনী নামে একটি মেয়ে, আর রঞ্জন নামে এক ছোকরা। কিন্তু তাদের কাজের কড়া নিয়মের মধ্যে বাঁধা গেল না। তারা সকলের মনে একটা অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে তাদের দাসত্ব কাটিয়ে স্বাধীন হবার জন্যে। তাই দেখে মালিকরা নন্দিনী আর রঞ্জনকে পরস্পরের সঙ্গে মিশতে দেন না। ওরা কিন্তু পরস্পরকে ভালবাসে। এদিকে ওদের কার্য্যকলাপ দেখে রাজার মন কেমন যেন বিচলিত হ'য়ে উঠেছে। নন্দিনী মধ্যে মধ্যে গিয়ে রাজার মনটিকে আরো বিক্ষিপ্ত করে তার সৌন্দর্য্য আর আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। তার ফলে তার প্রেমিক যে রঞ্জন তার প্রতিও রাজার একটা

শ্রীনবেন্দু বসু

সম্ভ্রমের উদয় হ'য়েছে এই ভেবে যে নন্দিনীর ভালবাসা যে ভাগ্যবান অধিকার করতে পেরেছে সে না জানি কেমন লোক ; অথচ এই নন্দিনীকেই রাজা এত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের করতে পারছে না। রাজা রঞ্জনকে দেখবার জন্যে উৎসুক। এদিকে রঞ্জন নন্দিনীকে খবর পাঠিয়েছে যে সে যেমন করে পারে নন্দিনীর সঙ্গে এসে মিলবে। নন্দিনী জানে যে তখন সে রঞ্জনের সাহায্যে রাজাকে উদ্ধার করবে, কেননা তার সেই রুদ্ধ অবস্থা দেখে নন্দিনীর মুক্ত প্রাণ কেঁদে কেঁদে ওঠে। এইসব বুঝতে পেরে সর্দ্দারের দল ধরপাকড় আরম্ভ ক'রে দিলে। সেই সূত্রে বিশু বলে একজন বুড়ো খোদাই-করকেও গ্রেপ্তার করা হ'ল কেননা সে কেবল নন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। বিশুর গ্রেপ্তারের কথা শুনেই কিন্তু মজুরদল ক্ষেপে উঠলো আর বিদ্রোহ বাধিয়ে দিলে। বিশু ছিল দলের মধ্যে তাদের খুব প্রিয়পাত্র। এদিকে রাজার বিচলিত অবস্থায় সন্দিহান হ'য়ে আর রঞ্জনকে কোন রকমে আটকাতে না পেরে সে রাজ্যের ধ্বজা আর অস্ত্রপূজার দিন, যেদিন রাজারও পূজায় বেরবার কথা, সর্দ্দার রঞ্জনের আসল পরিচয় না দিয়ে রাজার কাছ থেকে রঞ্জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ বা'র করলে, আর রঞ্জনের সেই দণ্ডবিধান হ'ল। তার মৃতদেহ যখন রাজার সাম্‌নে প'ড়ে, সেই সময়ে নন্দিনী এসে তাকে দেখে চিন্‌তে পারে। তখন রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। ফলে স্বয়ং নন্দিনীর সঙ্গে মিলে প্রজাদের বিদ্রোহে যোগদান করলেন। নন্দিনী আর রঞ্জনের কাজ সম্পূর্ণ হোলো, রাজার জালের আবরণ ঘুচলো আর সর্দ্দার আর তার দল তাদের নিজে-দের জালেই জড়িয়ে পড়লো।

এই গল্প অনুযায়ী নাটকখানিকে চারটি অংশে বা দৃশ্যে এই ভাবে ভাগ করা যায়।—

১ম দৃশ্য। গোড়া থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রা ও ফাগু-লালের প্রস্থানের পর "নন্দিনীর প্রবেশ" পর্য্যন্ত।

২য় দৃশ্য। "নন্দিনীর প্রবেশ" থেকে আরম্ভ ক'রে "সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ" পর্য্যন্ত।

৩য় দৃশ্য। "সর্দ্দার ও মোড়লের প্রবেশ" থেকে আরম্ভ ক'রে "একদল লোকের প্রবেশ" পর্য্যন্ত।

৪র্থ দৃশ্য। "একদল লোকের প্রবেশ" থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত।

দক্ষ নাট্যকার তাঁর ছকটিতে ঘুঁটিগুলি সাধারণতঃ এমন ভাবে সাজান যে যথাসম্ভব গোড়াতেই পাঠক বুঝতে পারে কোন্ ঘটনা কোন্ ধারা অবলম্বন ক'রে কোন্ দিকে যাবে। তবেই চরিত্রবিকাশ কেমন ভাবে হচ্ছে বোঝবার সুবিধা হয়। কারণ বাস্তব জীবনে যেমন মানুষ নিজেই অনেকটা তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে ঘটনার আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে, নাটকেও আমরা তাই দেখতে চাই। চরিত্রস্ফুরণই নাট্যকারের প্রধান কাজ। সুতরাং যে চরিত্র যত দেরীতে রঙ্গভূমিতে নামে তার জন্যে তত আগে থেকে গোড়াপত্তন করতে হয়, যাতে যখন সে সত্যি সত্যি আবির্ভূত হয় তখন ঘটনাবলী আর চরিত্রচিত্রণের সমন্বয়-কৌশল দেখে নাট্যরসপিপাসুর তৃপ্তিসাধন হয়। রক্তকরবীর প্রথম দৃশ্যে আমরা তাই দেখি।

মূল দ্বন্দ্বটির সন্ধান পাওয়া যায় যখন শুনি যে অধ্যা-পক নন্দিনীকে বলছে যে সে নন্দিনীকে রাজার ঘরে ঢুকতে দেবে না অথচ নন্দিনী বলে "আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেছি এই ঘরের মধ্যে ঢুকতে। এই দুজনের কথায় প্লটের আভাসও বর্ত্তমান। আমরা জান্‌তে পারি যে যক্ষপুরীর লোকে সোনার তাল বার করতে ব্যস্ত। সেখানকার রাজা জালের আড়ালে থাকে। সেই রাজাকে উদ্ধার করতে হবে। এ কার্য্যটি যে রঞ্জনের সাহায্যে হবে তা জানতে পারি নন্দিনী আর রাজার কথা থেকে যখন নন্দিনী বলে যে "রঞ্জন" যেখানে যায় ছুটী সঙ্গে নিয়ে আসে", এবং একটু পরে শুনি "আজ আমার রঞ্জন আসবে···কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।" তার যে বেশী দেরী নেই সে খবর গোকুল সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বলে। "আজ দিন না যেতেই একটা কিছু বিবাদ ঘটাবে।" নাটকের আকাশ বাতাস এইখান থেকে থমথমে হয়ে থাকে একটা কোন ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্যে! সেই দিনটাই তো সে রাজ্যের ধ্বজাপূজা আর অস্ত্রপূজার দিন। পরে দেখি ঐ উদ্দেশ্যে যে মিছিল বেরয় তারই সঙ্গে ঘটনাসূত্র জড়িত। পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি, তাও এই দৃশ্যের ফাগুলাল-চন্দ্রা অংশ থেকে প্রকাশ। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ

অবস্থা ঠিক প্রলয়কাণ্ডের পূর্ব্বাবস্থা। বিদ্রোহ আসন্ন আর জমি উর্ব্বরা, কেবল বারুদে অগ্নিসংযোগ করবার যা দেরী। প্রজাদের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত অবনত। তারা মদ্যপ, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী, অথচ তাদের চিন্তাশক্তি লুপ্ত। মন তাদের নিশ্চল তাই একবার চন্দ্রা বলে ওঠে "কায ছেড়ে দাও না, চলো না ঘরে ফিরে……আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো? যেন ধানের গায়ে তুঁষ, ফালতো কিছু নেই?" আবার পরক্ষণেই আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, "এমন আরামের কাযেও টিঁকতে পারলে না বেয়াই।" তারা এখন যন্ত্র মাত্র—Robots কায করতে পরিশ্রম নেই, কারণ পরিশ্রম অনুভব করবার শক্তি তাদের অপহৃত। তারা মনুষ্যত্বহীন—তাদের মানুষের বা পাড়ার নাম নেই, সবই সংখ্যা। বিশুর ভাষায়, "আমি ৬৯ ঙ, গাঁয়ে ছিলুম। মানুষ এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়া খেলা চলেছে।" এদের মধ্যে নন্দিনীর মতন নিয়ম না মানা অঘটনঘটনপটিয়সীর উপস্থিতি একটা আশঙ্কার কারণ তো বটেই। চন্দ্রা বলে যে সে "মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটবে।" সে বিপদকে সম্পদ বলে বরণ করবার মতন দৃষ্টি বুঝি তাদের আর নেই। তাই গোকুল বলে, "নন্দিনীকে ভাল ঠেকছে না। তবে মনে হয় এখনও আশা আছে, এখনও চকিতের মতন একবার একবার আলো খেলে। ঠিক ঐরকম কোন মুহূর্ত্তে ফাগুলালের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, "নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে, ওর সামনে কথা কইতে পারিনি।" মাত্র বিশুর চোখেই নন্দিনী দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশমানা।

কিন্তু এদৃশ্যে রঞ্জনের আসা ব্যাপারটারই ওপর কবি তাঁর অসামান্য সৃষ্টিশক্তি যেন ঢেলে দিয়েছেন। সেইটেই যে নাটকের প্রধান ঘটনা, সেটা আমাদের মনে একেবারে গেঁথে যায়, আর কত সরস ক'রে, কত প্রাণস্পর্শী ক'রে কথাটি বলা হয়েছে। কত রকমের আলোর আভাস খেলে গিয়ে কতদিক থেকে ব্যাপারটিকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। কিশোরের সঙ্গে যখন নন্দিনী কথা কয় তাতে যেন ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় বোনের স্নেহ ক্ষরিত হ'তে থাকে। আবার যখন অধ্যাপকের সঙ্গে সে রঞ্জনের কথা কয় তখন দেখি তার অন্য রূপটি—তখন সে আত্মনির্ভরশীলা, গর্ব্বিতা-প্রেমিকা, দেবতার পূজারিণী। তার রঞ্জনকে আনলে "এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।" রঞ্জনের জোর ওদের শঙ্খিনী নদীর মতন। নন্দিনীর সঙ্গে তার দেখা হবার খবর এসেছে "যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রং, বাতাসের লীলা।" তার রঞ্জনের ভালবাসার রং সে গলায়, বুকে, হাতে পরেছে। তার আসবার আনন্দে সে অধ্যাপককে ফুল উপহার দিতে প্রস্তুত। অধ্যাপককে স্বীকার করতে হয় যে "রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না।" কত গভীর তার প্রেম সেটা রাজারও অজানা নেই। সেও জানতে চায় রঞ্জনকে দেখে কোন্ তালে ওর মন নাচে। রঞ্জন থেকে নিজের প্রভেদটুকু জেনেও সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে তাকেও নন্দিনীর রঞ্জনের মতনই ভাল লাগে কিনা। আজ রাজা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে তার প্রচণ্ড শক্তি রঞ্জনের যাদুতে বশীভূত। আর যখন তার ছুটি হবে তখন সে ছুটি কেমন করে মধুতে ভরে দিতে হবে সে জবাবও দেবে রঞ্জন!

এই দৃশ্যে প্লটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কত স্পষ্টভাবে চরিত্রগুলির ওপর রেখাপাত করা হ'য়েছে তাও বিস্ময়কর এই একাঙ্ক নাটকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে। গল্পটুকুর সূত্রপাত করতে যেটুকু বাক্যালাপের প্রয়োজন তার বেশী অবান্তর কথা কোথাও বসানো হয়নি, অথচ সেইটুকুর মধ্যে দিয়েই প্রত্যেক চরিত্র নিজের ব্যক্তিগত বিশেষত্বটুকু জানিয়ে চলেছে।

আগেই চোখে পড়ে নন্দিনীকে। সে রঞ্জনের প্রেমিকা আর প্রথমেই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার রঞ্জনের প্রতি একান্ত বালিকাসুলভ ভালবাসা, তার আশাপথ চেয়ে ব্যাকুল আর উদগ্রীব প্রতীক্ষা। তার আশা আর বিশ্বাসভরা প্রাণ শুধু তাকেই আনন্দে বিভোর করে রাখে না, চারিদিকে সমস্ত অবসাদ ঘুচিয়ে একটা নূতনত্বের শিহর লাগায়। সে যেন আনন্দ বিলিয়ে বেড়ায়। যাকেই তার ছোঁয়াচ লাগে তারই প্রাণ

শ্রীনবেন্দু বসু

চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাকে দেখে বড় বেশী করে মনে পড়ে Browning এর Pippa কে। রেশমকলের মজুর বালিকা একদিনের ছুট পেয়ে কেবল আপন মনে গান গেয়ে বেড়িয়েছিল নিজের মনের আনন্দে আর নিঃসাড়দের প্রাণে চমক লাগিয়ে লাগিয়ে। তবে নন্দিনী যেন অতটা আপন ভোলা নয়, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিবিচারসম্পন্না। সে আর একটু সজাগ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অধ্যাপকের তর্কজাল ভেদ করতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম। বাধা সে মানবে না। ঘরের মধ্যে যেমন করে পারে ঢুকবেই। Bernard Shawর St. Joan এর সঙ্গেও তার সাদৃশ্য বড় বেশী! St. Joanএর মতন সেও তার স্বাভাবিক মধুর ব্যবহারেই সব বাধা অতিক্রম ক'রে কার্য্যোদ্ধার করে কিন্তু তার ঠিক স্থান বোধ হয় St. Joan আর Pippaর মাঝামাঝি কোথাও, কেন না সে St. Joan অপেক্ষা আর একটু আপন ভোলা, যেন তার নির্দ্দিষ্ট কাজে আর একটু বেশী আনন্দ পায়, অতটা দায়ীত্বজ্ঞানক্লিষ্টা নয়। আর তার কারণও আছে। তার জীবনে দৈন্যের স্থান নেই, সে প্রেমের ঐশ্বর্য্যে উজ্জ্বল। তার মর্ম্মস্থল রাঙ্গিয়ে গেছে রক্তকরবীর ভালবাসার রঙে। আবার রাজার সামনে আমরা তাকে দেখি তার সরল অথচ পূর্ণগঠিত নারীরূপে। মহিমান্বিতা St. Joan যেমন আবেগভরে বলে উঠেছিল "How long, O Lord, how long" তেমনি আকুলভাবে নন্দিনীর মিনতি শ্বসিয়ে ওঠে, "আলোতে বেরিয়ে এস, মাটির উপর পা দেও, পৃথিবী খুসী হয়ে উঠুক।" মনের জোর তার অপূর্ব্ব। সে বলে, "তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।" পৃথিবীর বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসার অভিসম্পাতটুকু সে বেশ বোঝে, আবার রহস্যপ্রিয়া বালিকা-প্রকৃতির আড়াল থেকে একটু আধটু বাক্যযন্ত্রণা দেবার লোভটুকুও সামলাতে পারেনা। সে বলে, "তোমার এত আছে তবু কেবলি অমন লোভীর মতন কথা বল কেন?" "তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন?"

রাজার চরিত্র আর একটি মনোজ্ঞ সৃষ্টি। সে এক ভগ্নপ্রায় মানুষ। তবু যেন সে তার পুরাণো পাশব-শক্তির প্রেতাত্মাটিকে আঁকড়ে বসে আছে। তার কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়েও ছাড়াতে পারছে না, আর পারছে না বলেই মধ্যে মধ্যে তার সঙ্গে সন্ধি করে থাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় অস্থির হয়ে পড়ছে। এই অশান্তিটুকু নন্দিনী-রাজা সংবাদে বড়ই স্বাভাবিক আর হৃদয়গ্রাহী ভাবে প্রকাশ পায়। এই অংশটি নাট্যকারের সূক্ষ্মসৃষ্টি, আর কল্পনার প্রাচুর্য্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ দৃশ্যের সাফল্য বোধ করি উচ্চাঙ্গের অভিনেতার হাতে যেমন নির্ভর করে তেমন আর কিছুতে নয়, কেননা তাকে নাকীসুরের উচ্ছ্বাস বাঁচিয়ে এক মহান সঞ্চিত আবেগের ব্যঞ্জনা করতে হয়। রাজাকে দেখে আমাদের মনে হয় যে আজকে যেন সে নন্দিনীর হাতেই তার বিচার ভার তুলে দিয়েছে। পদে পদে তার উৎকণ্ঠা ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, আর অক্ষমতার স্বীকারোক্তি বেজে ওঠে। আজ এতদিনে সে বুঝেছে, শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে। তাই আজ নন্দিনীর পায়ের ওপরে তার এই হৃদয় বিদারক ভেঙ্গে পড়া—"আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছি না।" তাই বুঝি রাজা এখন অপেক্ষাকৃত সাবধান, না বুঝে হাত বাড়াতে চায় না, অথবা কোন সংস্কারগত রাজরক্তের গরিমা এখনও তার মাথার ওপর হানা দিতে থাকে আর তাকে ধৈর্য্যশিক্ষা দেয়, আর সে দীপ্তস্বরে ব'লে ওঠে, "আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনও সময় হয়নি। তবে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবেই জানিয়ে দেয়, "যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা সেই বন্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে", কেননা সে নন্দিনীর মধ্যে "বিশ্বের বাঁশীতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ" দেখতে পেয়েছে। সে বুঝেছে যে রঞ্জনের মধ্যে রয়েছে যাদুর খেলা। তাকে এখন

নতুন নেশাতে পেয়েছে "সহজের থেকে ঐ প্রাণের যাত্নটুকু কেড়ে" আনবার। এখন তাকে আটকানো দুঃসাধ্য। *এই কথার পাশে অধ্যাপকের দম্ভ যে তাদের "মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ঙ্কর শক্তি" তাদের "মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ঙ্কর প্রতাপ" আর "সে থাকে জালের আড়ালে ঢুকতে দেবে না"*—এসব নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজ হয়ে পড়ে। রাজার এই ভাবান্তরই যেন ওদের মাঝখানে নন্দিনীর প্রার্থিত বিধাতার একটা হাসি হেসে ওঠা। রাজার প্রতাপ ভয়ঙ্কর তো বটেই কিন্তু সে যে কোন্ কাযে লাগবে তা অধ্যাপকের এখনও জানা নেই। গোকুল বিশুকে বলে রাজা যেন নন্দিনীকে "খামকা" আনিয়াছেন। আমাদের মনে হয় খামকা তো নয়, এর মধ্যে অর্থ আছে। চরিত্রদের অগোচরে তাদের কথার একটা ভিন্ন অর্থ যেটা দর্শকের কাছে সুপরিস্ফুট এটা নাট্যকারের বিদ্রূপ আর নাট্যের একটা রীতি। গ্রীক নাটকে আর সেক্সপীয়রে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। রক্তকরবীতেও এই প্রকারের রহস্যাবৃত ভবিষ্যদ্বাণীর উদাহরণ আরও পাওয়া যায় কখন কথার মধ্যে দিয়ে কখন বা ঘটনার আবর্ত্তে। সে পরিচয় আমরা শীঘ্রই পাইব।

অন্যান্য প্রধান চরিত্র যাদের আমরা এই দৃশ্যে পরিচয় লাভ করি তারা অধ্যাপক, বিশু আর সর্দ্দার। এখানে তাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় মাত্র, এখনও তারা রাজা বা নন্দিনী চরিত্রের মতন পূর্ণতালাভ করেনি।

অধ্যাপক আত্মপ্রবঞ্চক। সে বোঝে সব কিন্তু মানতে চায় না পাছে তাকে দুর্ব্বলতা প্রকাশের অপবাদ সহ্য করতে হয়। এই তার ধারণা। অস্বীকার করবারই সাহস তার আছে, স্বীকার করবার সাহস নেই। সে জানে নন্দিনী ঠিক কি ভাবের "আচমকা আলো" এবং তাতে বিস্মিত হবার কারণও যথেষ্ট। তাকে নিয়ে ওদের "ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে"। নিজের বিষয়েও তার ধারণা সুস্পষ্ট। সে নিজেও আছে "একটা জালের পিছনে"। কিন্তু তা জেনে তার কি হবে। সে নিজেকেই নিজে বলে যে সে একটা "ভয়ঙ্কর পণ্ডিত। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে।" সুতরাং তার জ্ঞান জ্ঞানমাত্র, কার্য্যকরী নয়। সে সন্দিগ্ধচিত্ত। সাধ্যমত বাধা না দিতে পারে কিন্তু ভরসাও বিশেষ রাখে না। *কেননা সে সংস্কারবদ্ধ অতিপাণ্ডিত্যের ফল। তার নিজের কথায় বলতে গেলে, "দেবতার হাসি সূর্য্যের আলো, তাতে বরফ গলে কিন্তু পাথর টলে না।"* তাই আজ রঞ্জনের শক্তিতে তার এত অবিশ্বাস—হয়ত তাতে কোন কায হবে না, এবং হলেও রঞ্জনের সেখানে আসাই সুবিধা হবে না, সর্দ্দারদের চোখ এড়াবে সে কেমন করে। অথচ মনে মনে যে তার একটা আশঙ্কা হয় না তা নয়। নন্দিনীর "রক্ত আভায় একটা ভয়-লাগা রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য্য নয়" সেটুকু পণ্ডিতের চোখ এড়ায় না। "সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি" দেখে আজ তার বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হয়েছে তাতে কি লিখন লেখা হবে এই ভেবে। কিন্তু সব জেনেও সে অচঞ্চল। সে একটা প্রাণহীন নিশ্চল মূর্ত্তি—অতি পাঠের ফল! এ রকম লোক গড্ডলিকা প্রবাহে পেছনে পেছনে চলে। নিজে কখন এগোয় না। সেই জন্য যখন অধ্যাপক দেখে যে সর্দ্দারের দল পরাজিত তখনই সে বড় গলা করে প্রচার করে যে সেও নন্দিনীকে ভালবাসে আর তাই তার দলে গিয়ে ভেড়ে। তার আগে নয়। কেননা সে নিরাপদবাদী। অধ্যাপকের চরিত্রের এই পরিণতিটুকু নাটকের শেষের দিকে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দেখি যে চরিত্রগুলির একটা সঙ্গতিসম্পন্ন বিকাশের প্রতি নাট্যকারের কতটা প্রখর দৃষ্টি আছে। অধ্যাপক চরিত্র সেই রকম একটা উদাহরণ। বোধ হয় অধ্যাপক চরিত্রটি ভাল করে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই তার ঠিক পরেই সুড়ঙ্গ খোদাইকর গোকুলকে এনে উপস্থিত করা হয়েছে। আর সেটা খুব স্বাভাবিক ভাবে, কেননা নাট্যকার যাই করুক না কেন যতক্ষণ না একটা ঘটনা বা চরিত্র বা কথা তার ন্যায্য স্থানে স্থান না পায় ততক্ষণ সেটা ব্যর্থ। দুটি ভিন্ন চরিত্রের পাশাপাশি থেকে প্রত্যেককে উজ্জ্বল করে তোলবার আর একটি দৃষ্টান্ত নন্দিনী দৃশ্যাংশগুলি—নন্দিনী-কিশোর, নন্দিনী-অধ্যাপক, নন্দিনী-রাজা ইত্যাদি। অধ্যাপক-গোকুল দৃশ্যও সেই রকম। গোকুলের পাণ্ডিত্যও নেই, অত সমস্যাও নেই, অত ভাবনাও নেই। তাই বুঝি তার

শ্রীনবেন্দু বসু

কর্ত্তব্যজ্ঞানও স্পষ্টতর। সে বোঝেও ভাল। রাঙা রঙের তুলির লিখন পড়তে না পারলেও সে বুঝতে পারে যে সেদিনটা "না যেতেই একটা কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ।" সে তাড়াতাড়ি যায় নির্ব্বোধদের সাবধান ক'রে দিতে।

বিশুর চরিত্র পরে নন্দিনী আর রঞ্জনের সংস্পর্শে আরো ভাল করে বোঝা গেলেও এখানে আমরা তাকে পাই খোদাই-করদের মধ্যে একজন আর সহকর্ম্মী ফাগুলাল, চন্দ্রা, গোকুল ইত্যাদির চেয়ে একটু স্পষ্টদ্রষ্টা। তা ছাড়া নাটকে তার স্থান অনেকটা গ্রীকনাটকের chorusএর মতন। সে কতকটা পরিমাণে নাট্যকারের প্রতিনিধিস্বরূপ। সে সমালোচক বিষদ ভাবে বুঝিয়েও দেয় আবার মন্ত্রবাণীতে সমন্বয় সাধনও করে। chorus এর ভাব প্রকাশ পেত গানে আর কথায়। বিশুরও তাই। প্রথমেই শুনি গানের ভিতর দিয়ে তার নন্দিনীকে আবাহন—"মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে?" পরে দেখি সে কথার ভেতর দিয়ে রোগের নিদানটুকু আমাদের চোখের সামনে ধরে দেয় যথা "যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয় এইটেই সর্ব্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড় সাজা তাই।" কিন্তু তার কথায় এমন একটা তেজ আছে যে তাকে গ্রীক নাটকের প্রচলিত chorus অপেক্ষা অনেক বেশী জীবন্ত ব'লে মনে হয়। সে আগাগোড়াই নিজের দরকারে কথা বলে। chorus ব'লে একেবারে নাট্যকারের চাবিটেপা কল মাত্র নয়। যক্ষপুরীর মাতালদের বিষয়ে তার মন্তব্যটুকু সুন্দর, তাথেকে তার নিজের মনুষ্যত্ব আর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে—"আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।" নৈরাশ্যবাদের চূড়ান্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করা! এই কথাটাই যখন তারে গানে বার হয় তখন সে গান গ্রীক chorusএর অধিকাংশ উচ্ছ্বাস অপেক্ষা কত সহজ, কত অনুভূতি-প্রসূত, অতএব কত বেশী আবেদন-পূর্ণ। কত ব্যাকুল তার প্রার্থনা—

"তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক না সেই তিমির রাতি
লুপ্তি নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক ভোলাবার ঘোরে।"

আবার নন্দিনীর ছোঁয়াচ লেগে যখন অত নৈরাশ্যের মধ্যেও তার অন্তর নন্দিত হ'য়ে ওঠে, যখন তার রোঁয়ায় রোঁয়ায় আনন্দের কাঁপন লাগে, যখন তার ক্লান্ত ক্লিন্ন কপালে সে বসন্তের মলয় পরশ অনুভব করে, তখন তার মুখের ওপর দেখি এক দিব্য শান্তি আর উৎসাহের আভাস। তখন তার কথা এই রকম "কাছের পাওনাকে নিয়ে বাস-নার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।" এই তো chorusএর মুখে চিরন্তন সঙ্গীত—music of the spheres।

যদিও বিশু chorus, যদিও সে কতকপরিমাণে নাট্য-কারের মুখপাত্র, সে একটা একঘেয়ে চরিত্র নয়। তার ভাবে, চিন্তায়, পরিবর্ত্তনশীলতায়, কার্য্যক্ষমতায় সে সম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী"র সমালোচনা করতে গিয়ে টমসন সাহেব দুঃখ করেন যে রবীন্দ্রনাথের নাটক নাটক হ'লেও ভাবের চাপে অনেক সময় ঘটনাধারা বাধা পায়, আর চরিত্রগুলি যেন সকলে তাঁর আপন সন্তান (৯৫ পৃষ্ঠা—Tagore, Poet and Dramatist) এই অনুযোগের প্রথমাংশের উত্তরস্বরূপ রক্তকরবী নাটকখানি আগাগোড়া দৃষ্টান্ত করে ধরা যেতে পারে, যদিও রক্তকরবীর প্রতি সাহেব বিশেষ সুপ্রসন্ন নয়। আর অনুযোগের দ্বিতীয়াংশের প্রতি-বাদ স্বরূপ বিশু চরিত্রটিকে দেখান যেতে পারে। যেখানে সে লেখকের প্রতিনিধি হ'য়েও এত নিজত্ব আর স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ. সেখানে অত সাধারণ ভাবে মত প্রচার করা চলে না, কোন নাটককে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে কোন কথা বলা গেলেও। তবে আর একদিক থেকে রক্তকরবীকে অবলম্বন ক'রে আমাদের বলবার এইটুকু মাত্র আছে যে রক্তকরবীতে লঘু-রসের যেন একটু অভাব দেখি যেটার অবতারণা করা নাটকের প্রথমাংশের ফাগুলাল-চন্দ্রা অংশে হয়ত সম্ভব ছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে লঘু-রসের অবতারণা করাতে হয়ত বাস্তব রসের হানি ঘটতে পারতো। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে সরলতা আশা করা যায় না, অথচ যক্ষপুরীর নাগরিকদের মধ্যে প্রাণের বিশেষ অভাব। তাদের আমরা জানি ট-ঠ পাড়ার আর ৭১ এর দল ব'লে। তবু বলি যে এ দৃশ্যে না হ'লে স্বল্পপরিসর রক্তকরবীতে লঘুরসের সুযোগ আর আসে না।

সর্দ্দার চরিত্রটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটবার আগে কৌতূহল সবটুকু জাগে। সে যে একটা বিশেষ কিছু আর এ ব্যাপারে যে সে প্রকাণ্ড একটা কিছু ঘটাবে সে আভাস পাই অন্যের মুখে যখন বিশুর মতন লোক চন্দ্রাকে সাবধান করে দেয়, আর সেই সঙ্গে আমাদের জানিয়ে দেয় সর্দ্দারের স্বরূপ। যদিও তাকে দেখে চন্দ্রার বেশ মনে হয় বটে কিন্তু সে "বেশ ঝকঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড় পরিপাটী করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।" এই ভাবে যেই আমাদের কৌতূহলটুকু বেশ সচেতন হয়েছে অমনি দেখি সর্দ্দারের প্রবেশ; এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে তার আলাপের মধ্যে দিয়ে আমরা তার বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। তার নিজের মুখে অল্প দুটি একটি কথা কিন্তু প্রত্যেকটি কথা যেন তুলির উজ্জ্বল বর্ণপাত। তার স্বভাবের ছবিটি এমনভাবে চোখের সামনে এঁকে যায় যে পরে আর ম্লান হয় না। সর্দ্দার চরিত্র আঁকাতে বা অন্যান্য স্থানেও আমরা যে নাট্যকৌশলের আর নাট্যরীতিজ্ঞানের পরিচয় পাই তা ইংরাজী নাট্য সাহিত্যে শেক্সপীয়রের কলাজ্ঞান অপেক্ষা কোন অংশে হীন বলে মনে হয় না।

বিশুর প্রতি সর্দ্দার রাখে একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ পরিহাসের ভাব। বিশু যেন "সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।" এ থেকে বুঝি সর্দ্দারের চরিত্রের একটা দিক—আত্মশক্তিতে একটা সদম্ভ বিশ্বাস। তার প্রমাণ যখন সে বলে যে সে বুঝেছে "উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে" আর এদের ভার তাকেই নিতে হচ্চে। দৃষ্টি তার সত্যি প্রখর আর নজর তার চারিদিকে—সে গোঁসাইজীকে পাঠায় করাতিদের নাম শুনিয়ে শান্ত করতে আর নিজেও সকলকে খুসী রাখতে সচেষ্ট। চন্দ্রার দরবারটা তো মনে রাখবেই, কথার পিঠে বিশুকেও জানিয়ে দেয় যে তার পাড়ার মেজাজটা একটু গোলমাল হয়েছে যেটা তার চোখ এড়ায় নি। সর্দ্দার হবার যোগ্য লোক সন্দেহ নেই।

প্রথম দৃশ্যেই সমস্ত যাদুটা উজাড় করে দেখিয়ে দেওয়ায় কৃতিত্ব আছে। যদি সমস্ত আয়োজন আর ব্যবস্থা চোখের সামনে ধরে দিয়েও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে তবেই নাট্যকারের হাতযশ। প্রথমটা লুকিয়ে রেখে শেষের দিকে আশাতিরিক্ত অসম্ভব আর অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে চমক লাগিয়ে দেওয়ায় ভেল্কীবাজী দেখান যেতে পারে, তাতে মনুষ্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। আর যেখানে যাদুকরকে আমারই মত (যদিও আমার চেয়ে বেশী ক্ষমতা-সম্পন্ন) মানুষ বলে না জানলুম সেখানে তাকে দূর থেকেই নমস্কার করলুম, আলিঙ্গন করলুম না। সেখানে চমক থাকতে পারে, দরদ থাকে না। রঙের আকর্ষণ আর রসের আকর্ষণ দুটো আলাদা জিনিষ। সফল নাট্যকার বলে তোমাদের দৈনন্দিন জীবন আর তার অন্তর্নিহিত ন্যায়ের ওপরই আমার ভিত্তি। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপিষ্ট ব্যাপারের মধ্যেই যে আশ্চর্য্যের ধারা লুকানো আছে সেইটুকু হয়ত তোমাদের দেখাতে পারবো। নইলে তোমরা বলবে যে আলাদীনের প্রদীপ পেলে তো আমরাও যা নয় তাই করতে পারি। বাহাদুরী তো প্রদীপটারই। তাই আগে থেকে দেখিয়ে দিলুম যে কোন অলৌকিকগুণসম্পন্ন যাদুদণ্ডের ব্যবহার এখানে নেই। ভাল নাট্যকারের হাতে তার প্রথম দৃশ্যগুলি একটা দাবী—চ্যালেঞ্জ।

দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা নাটকের চরম ঘটনার খুব কাছে এসে পড়ি। কৌতূহল, উদ্বেগ আর ঔৎসুক্য তীব্রতার শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়ায়। কত কৌশলে, কত কৃতিত্বের সঙ্গে যে নাট্যকার এই ভাবটি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলেন আর বাঁচিয়ে রাখেন তা দৃশ্যটি পড়লে তবেই সম্যক উপলব্ধি করা যেতে পারে। নন্দিনী ইতিমধ্যে রাজার সঙ্গে জালের আড়ালে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছে। এবং সেই সাক্ষাতের পর থেকে রাজার যে অস্থিরচিত্ততা আমরা লক্ষ্য করি তাই

শ্রীনবেন্দু বসু

থেকেই জানতে পারি যে সেই সাক্ষাত ব্যাপারের গুরুত্ব কতখানি। চোখে না দেখেও উপলব্ধি টুকু চোখের দেখার বেশী হয়। তাছাড়া সে সাক্ষাতের যে বর্ণনা নন্দিনী বিশুর কাছে এসে দেয় সে বর্ণনা এত নিখুঁত আর এত সতেজ যে চোখে দেখার কায তাইতেও হয়। নন্দিনীর কথাগুলি নাট্যকারের বাহ্যদৃশ্যের কল্পনা প্রাখর্য্যের একটি সুন্দর উদাহরণ। তার শেষ কথাগুলি যে রাজা বল্লে "যাও আমার ঘর থেকে যাও, যাও কায নষ্ট করে দিও না" মনে পড়িয়ে দেয় হ্যামলেটের কথা—যখন সে ওফিলিয়ার ভাব পরিবর্ত্তন হবার কারণ বুঝতে না পেরে অথচ নিজের কাহিনীও সবটা বলতে না পেরে নিতান্ত বিষাদতিক্ত আর নিরাশাহত স্বরে বলেছিল "Get thee to a nunnery, go." রাজা-নন্দিনী দৃশ্যগুলি বোধ হয় জগতের শ্রেষ্ঠতম নাট্যপ্রতিভারই যোগ্য আর টমসন সাহেব প্রমুখ সমালোচকদের আর আমাদের দেশেও অনেক সংস্কারবদ্ধ পাঠকের অনুধাবনযোগ্য।

রাজার অস্থিরতার এই সব নিদর্শনগুলি আমাদেরও আসন্ন মুহূর্ত্তটির প্রতি উন্মুখ করে তোলে, মনে হয় সব হয়ে গেল এইবার বাকি একটুখানি সাহস, সামনে প্রত্যক্ষগোচর খানিকটা অন্ধকার, আর ওপারে স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল আলো বা অন্ধকারের অতল তল—কে জানে! শুধু দেখি যে দাঁড়াবার স্থান বা অবকাশ আর নেই। এগিয়ে যেতেই হবে। রাজা যে এইবার নিজের ভাগ্য নিজে হাতেই বেছে নিয়েছে। সে যে পাথরের আড়াল থেকে তিন হাজার বছর টিকে থাকা ব্যাংটাকে বার করে হাতে ধরেছে। অবসানের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা গিয়েছে। নন্দিনার কথায় "চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।" আর রাজা, যে এখন ফাটলে ফাটলে আলো দেখ্‌তে পেয়েছে, বলে' ওঠে "তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখ্‌তে চাই।" এটা রাজার দয়াপরবশ অনুমতি নয়। এটা যে বীরের পরাজয় স্বীকার। আজ সে জয়মণ্ডিতা নন্দিনীর স্পর্দ্ধায় মুগ্ধ হয়ে বলে, "তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয়। এতদিন যা কিছু ভেঙ্গে চুরমার করেছি তারি রাশি করা পাহাড়ের চূড়ার ওপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছা করে।" রাজার মাথার ভেতর আজ তাণ্ডব নাচ, প্রলয়ের আগুন, একবার জ্বলে ওঠে, একবার নিভে যায়। একবার বুঝি বা তার মনে পড়ে, আবার বুঝি ভুলে যায়। একবার সে তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে যে নন্দিনীর ভেতরকার আগুন সে দাহন করে বের করবে তার আগে তার নিষ্কৃতি নেই, আবার পরমুহূর্ত্তেই স্তব্ধ হয়ে যায়। আগুনের শুদ্ধির ওপর বর্ষণ হয় চোখের জলের শান্তিধারা। সে ভেঙ্গে প'ড়ে বলে, "সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা। আমার এই হাতদুটো সে দিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য্য আর কখনো এমন ক'রে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করেছে। তুমি জানোনা আমি কত শ্রান্ত।" জালের আড়ালে সাক্ষাতের এই ফল। অহঙ্কারী রাজা আজ মৃত, তার জায়গায় জন্মেছে প্রেমিক! আজ অধ্যাপকের কাছে নন্দিনীর দম্ভ সার্থক হয়েছে। রাজা আজ গান শুনতেও ভয় পায়, মরা ব্যাংটা ফেলে পালিয়ে যায়, কারণ "ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাংটা সকল রকম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে।"

রঞ্জনের ক্রমাগত উল্লেখ হ'ল দ্বিতীয় উপায় যাতে কৌতূহলের পরিপুষ্টি হয়। তার সঙ্গে বা তার কার্য্যকলাপের বিষয় তেমন চাক্ষুষ পরিচয় আমাদের ঘটেনা, তবু বুঝি সেই নাটকের প্রাণ। তাকে সর্ব্বদা মনে রাখি অন্যদের মুখে তার কথা শুনে আর তার সুখ-দুঃখগুলিকে নিতান্ত আপনার করেনি তার প্রেমিকার মুখে তার বিষয়ে অত কথা শুনে। একটা চরিত্রকে একেবারে রঙ্গমঞ্চে না এনে, তার ওপর সমস্ত নির্ভর করিয়ে তাকে এতটা চিত্তাকর্ষক আর তার অভিব্যক্তি এতটা গুণসম্পন্ন ক'রে তোলার দৃষ্টান্ত বোধ হয় নাট্যসাহিত্যে বিরল।

আজ আবার খবর পাই যে রঞ্জন আসবে। এতক্ষণ আশায় আশায় থেকেও সে আসে নি। হয়ত আর আশা থাকতোই না কিন্তু সেই আশাই আবারও দ্বিগুণ প্রবল হ'য়ে ওঠে এই দৃশ্যে। শেষ পর্য্যন্ত নন্দিনী বলতে থাকে

"রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে।" সেই তো ওর সকল শক্তির মূল প্রেরণা। রাজাকে নন্দিনী পরাজয় স্বীকার করিয়েছে তারই দীপ্তি নিজের মুখের ওপর নিয়ে। আজ তাই আমাদেরও মনে হয় রঞ্জন আসবেই। শুধু যে নন্দিনীর মনের মধ্যেই খবর এসেছে তা নয়, স্বয়ং সর্দারও সেই কথা বলে। তবে কি অবস্থায় আর কখন্ কোন পথ দিয়ে আসবে তা কে জানে? নন্দিনী তো তার পথ চেয়ে দুর্গদুয়ারে বসে রইল, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রিয় নাট্যকারের হাতে প'ড়ে সে দেখতে পেলে কি? তাই নন্দিনীর উৎসাহ আর আবেগের এই কমনীয় পরিণতি দেখে আমাদের চোখ সজল হয়ে ওঠে। সেটা তার অজানায় তারই গানের কান্নার মধ্যে রনিয়ে ওঠে যখন সে রাজাকে শোনায়—

সেই সুরে সাগরকুলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে যাওয়া গানের বাণী, ভোলাদিনের কাঁদন হাসি।

আবার নিতান্ত না জেনেই সে আপন আনন্দে গেয়ে চলে—

আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে
শুক্ল রাতে সেই আলোকে, দেখা হবে এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে'
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

হৃদয়বিদারক এই বিদ্রূপ আর তার গীতোচ্ছ্বাস কোন গ্রীক নাটকের irony আর lyricism এর চেয়ে হীন রসজ্ঞ পাঠক অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

রঞ্জন সম্বন্ধে উদ্বেগ বাড়ে যখন তার স্বরূপ সম্বন্ধে আর একটু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, আর তা এই দৃশ্যেই। সে শক্তির একটা সংহতরূপ। সে নন্দিনীকে "তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে বনের ভেতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে" সে তার "ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হাহা করে হাসে।" "নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোল পাড় করে" নন্দিনীকেও "নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করে।" রাজা বলেছিল রঞ্জন একটা যাদু। এখানে দেখি সে একটা শক্তি, যার প্রয়োগক্ষেত্র নন্দিনী, তাই তাকে আমরা বলি সুন্দরের অন্তর্গত মোহিনী শক্তি, যে সুন্দরের প্রাণে প্রাণে থেকে সুন্দরের ভেতর দিয়েই অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করে। বাইরে তার স্বাধীন সত্তা নেই, এক সুন্দরই তাকে খোঁজে। কেউ যে রঞ্জনকে দেখতে পায় না অথচ নন্দিনীতেই সর্ব্বদা তার আলো দেখতে পায় সে তো আশ্চর্য্য কিছু নয়। যে খোঁজে, তা সে যত বড় রাজাই হোক না কেন, সে তার সজীব মূর্ত্তি তো দেখতে পায় না। সে যে তার অন্তরের মধ্যেই। ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারে আর সেখানেই সে বিরাজ করে। সেইটুকু ভুলে যাওয়ারই তো এই শোচনীয় পরিণাম। সেই কান্নাই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল শেলীর Hymn to Intellectual Beautyতে

Spirit of Beauty that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form,—where art thou
gone?
Why dost thou pass away and leave our state,
This dim vast vale of tears, vacant and
desolate?

মনে হয় রঞ্জন নন্দিনী আর বিশু এই তিন জনেই মিলে যেন একটা শক্তসংঘ যেটা সর্দারের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করেছে। তৃতীয় দৃশ্যে বিশুর বন্ধনব্যাপারে এই ভাবটা বেশ স্পষ্ট হয়। এখানেও অনেক কথা থেকে আভাস পাওয়া যায়। রঞ্জন যেমন নন্দিনীকে রঞ্জিত করে রেখেছে, নন্দিনীও তেমনি বিশুকে নন্দিত করে। নন্দিনীর মুখেই জানতে পারি যে রঞ্জন যখন "প্রাণ নিয়ে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে হারজিতের খেলা খেলে" আর সেই খেলাতেও তাকেও জিতে নেয় তখন একদিন বিশুও তার মধ্যে ছিল, কিন্তু কি মনে ক'রে বাজিখেলার ভীড় থেকে একলা বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেরিয়ে তো তাকে যেতেই হবে। বাজীখেলায় দরকার তরুণের জোর আর সাহস। সে যে আর তার

শ্রীনবেন্দু বসু

নেই। উদ্দাম যা তা আজ সংযত, আর সংযত না হ'লে যে এখন আর কার্য্যকরী হবার উপায় থাকে না। তাইত তার বন্ধনই আজ যক্ষপুরীর আগুনে ইন্ধন যোগাতে পারলে। সেই তো নন্দিনীকে সর্দ্দারের সোণার চুড়োর নীচে এনে হাজির করেছে। আজ নন্দিনী দেখে তার কত বড় সামর্থ্য। আবার অন্যদিকে দেখি বিশুর ওপর নন্দিনীর জোর আর প্রভাব যখন সে বলে যে সেখান থেকে সে বিশুকে বের করে' নিয়ে যাবে আর বিশু তাতে রাজী হয়। রঞ্জন আর বিশুর সম্পর্ক দেখি যখন সে রাজার কাছে আত্মপরিচয় দেয় নিজেকে "রঞ্জনের ও-পিঠ" বলে'। তবে নন্দিনীর মধ্যে দিয়েই রঞ্জনের প্রকাশ বলে নন্দিনীই যেন বেশী কাছে কাছে থাকে। বিশু তার সাথী, তাকে গান শেখায় আর সে বিশুর "তিন বছরের প্রিয়া" তার সাহায্যও নেয় আবার তার চোখে অসীমেরও ঘোর লাগায়, তখন বৃদ্ধ গেয়ে ওঠে—

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগ্‌ল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হ'ল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

রক্ত করবীর এই দ্বিতীয় দৃশ্যটিতে ঘটনা বিন্যাস বা চরিত্র-স্ফুরণ বলে আলাদা দুটো জিনিষ নেই। সবই পূর্ব্ব-পরিচিত, এখানে কেবল রসের মধ্যে একসঙ্গে ঘনীভূত হয়ে দানা বাঁধে। এই নাট্যকলাজ্ঞান অবিশ্বাসীর প্রণিধান যোগ্য।

তৃতীয় দৃশ্য বিশেষভাবে ঘটনামূলক। এতে যেন যুদ্ধ বাধবার পূর্ব্বে দু'পক্ষের রণসজ্জা আর আনুসঙ্গিক সমস্ত আয়োজন পরীক্ষা করবার একটা শেষ সুযোগ দেওয়া হয়। সেই জন্যে দুই পক্ষের দুই সেনাপতি রঞ্জন আর সর্দ্দারের বিষয়েই এ দৃশ্যে অত করে বলা হয়েছে, কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তে পড়ে গিয়ে এখন আর অলসভাবে অন্যের মুখে তাদের বৃত্তান্ত শুনি না, এখন তাদের পরিচয় পাই তাদের দুজনকার মেধা আর কার্য্যকুশলতার মধ্যে দিয়ে। একদিকে রঞ্জন রাজা প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ বাধিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সর্দ্দার তার সমস্ত সর্দ্দারি শক্তিটা প্রয়োগ করেছে। দুজনের এই বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনাটুকু এ দৃশ্যে খুব উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। অথচ সে জন্য নাট্যকারকে অনাবশ্যক বাক্যব্যয় করবার প্রয়োজন হয় না বা অন্যদের এই দুজনের বিষয়ে অবান্তর কথা কওয়া-বার আবশ্যক হয় না। এখন আর যে দাঁড়াবার বা অবসর করে শোনবার অবস্থা নয় সেটা নাট্যকার যাঁর চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষবৎ ভাসছে বিলক্ষণ অনুভব করেন। রক্তকরবীর গঠন-প্রণালীতে এই বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় বড়ই স্পষ্ট আর মনোজ্ঞ। এই দৃশ্যে দেখি যে দাবানল জ্বলে উঠেছে, আর সর্দ্দার আর রঞ্জন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সর্দ্দারের দুর্জ্জয় শক্তি আর সুষ্ঠু ব্যবস্থা রঞ্জনকে কোন মতে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছে না। আজ সর্দ্দারের বাহুবল আর রঞ্জনের মন্ত্রবলে দ্বন্দ বেধেছে। বৈসাদৃশ্য বা contrast নাটকের প্রাণের প্রকাশ, কেননা তার জন্যও বিরোধে। কিন্তু সেটার প্রকাশ অনাড়ম্বর অথচ স্পষ্ট হওয়াই নাট্যরসিকের কাম্য, কারণ সেটা যেমনই হোক তাকে প্লটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। তা না হয়ে যদি সেটা লোমহর্ষণ বা মাত্র একটা থিয়েটারি ভঙ্গিমামাত্র হয় তাহ'লে সেটা অস্বাভাবিক আর চোখ মনের পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে। এই কলাকুশলতার পরিচয় তৃতীয় দৃশ্যের ছত্রে ছত্রে।

প্রথম কথা শুনি সর্দ্দারেরই, আর তা রঞ্জনেরই বিরুদ্ধে। অন্ধ পাঠকের এইখানেই চোখ খোলে। তার পর মোড়ল ব'লে তাকে আটকাতে গিয়ে তার বিফলতার কাহিনী যা' থেকে রঞ্জনের চরিত্র পূর্ণতর হ'য়ে প্রকাশ পায়। তারা ওকে নিয়ে গেছলো বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কায করতে। সেখানে গিয়ে সে বলে যে হুকুম মেনে কায করা তার অভ্যাস নেই—"গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে।" খোদাইকরদের দলে ভিড়ে তাদের মাতিয়ে তুল্লে নাচে গানে। শিকলের বন্ধন থেকে পিছলে বেরিয়ে এসে সে বজ্রগড় থেকে কুবেরগড়ে পালিয়ে এলো। সকলের সামনে দিয়ে রাস্তা দিয়ে সারেঙ্গী বাজাতে বাজাতে চলে গেল এমনি অদম্য তার সাহস। গার-দের মধ্যেও তাকে রাখা গেল না। তখন আবার ছোট সর্দ্দার

তাকে বাঁধতে চললো, কারণ বড় সর্দ্দারের হুকুম যে সে পাড়ায় রঞ্জন নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে না মিলতে পারে। সর্দ্দার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি লোক, কিন্তু এত সতর্কতাও বুঝি বিফল হয়, কারণ দেখতে দেখতে রঞ্জনের "দল ভারি হ'য়ে উঠছে," কখন কর্ত্তাদের শুদ্ধ "নাচিয়ে তুলবে।" মোড়লের অভিমত এই। মেজ সর্দ্দার তো ইতিমধ্যেই দ্বিধায় প'ড়ে গেছেন, "তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না।" সর্দ্দারের নিজের উৎকণ্ঠাও আজ বড় বেশী, কেননা সে নিজে দেখেছে যে রাজা বড় বিচলিত। গোঁসাইকে নিজের এই সন্দেহটুকু না ব'লে থাকৃতে পারে না, আবার অধ্যাপক আর চিকিৎসকও এসে ঐ খবরই দেয়। এত ব্যাপারের মূলে আগাগোড়া রঞ্জনকেই দেখতে পাই এবং বিশুর সংবাদ যে সে কাছাকাছিই কোথাও আছে আর অলক্ষ্যে তার কায করে চলেছে এই তথ্যটুকু বড় চমৎকার ভাবে উপলব্ধি হয়। এতটা রসানুভূতি বুঝি রঞ্জন চোখের সামনে থাকলে হ'তে পারতো না।

সর্দ্দারের আয়োজন আজকে বড় কঠিন। খোদাই-করের দল বন্ধন দশায় যা থেকে বিশুও বাদ যায় না। বিশুর বন্ধন নাটকের একটা প্রধান ঘটনা। কেননা তার বন্ধনই বারুদে আগুন সংযোগ। তারপরেই খোলাখুলি ভাবে ফাগুলাল আর চন্দ্রার দল বিদ্রোহে মেতে ওঠে আর তাইতেই নাটকের মুক্তি বিপ্লব ঘটে। অসন্তুষ্ট প্রজারা আজ এতদিনে বুঝেছে যে সমস্তই তো সর্দ্দার ঘটিয়েছে। পালোয়ান তাদের মুখপাত্র হ'য়ে কথা বলে। সে সর্দ্দারের চোখ দুটো উপড়ে ফেলতে চায়। তার বুকে দাঁত বসাতে চায়। ঠিক এই সময়ে রঞ্জনকে উপলক্ষ করে নন্দিনীর কথাগুলি কেমন সুপ্রযুক্ত—যেন আসন্ন প্রলয়ের সপ্রেম আবাহন, বিদ্যুৎছটা দেখে আনন্দের করতালি, যেন বিধাতার হাসিতে যক্ষপুরীর চমক ভেঙ্গে যাওয়া—"দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হ'য়ে উঠলো। ঐ কি আমাদের মিলনের রং? আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে।" মনোজ্ঞ পশ্চাতদৃশ্য!

এ সমস্ত বিশুর বন্ধনের ফল। যে বিশুকে দেখে নন্দিনী একদিন দুঃখ করেছিল সে বাজিখেলার ভিড় থেকে বেরিয়ে গেছলো বলে, যাকে সে আকুল ভাবে জানিয়েছিল যে সেই তার "প্রাকার", আজ সেই বিশুই আবার বাজি খেলার মধ্যেই এসে ঢুকেছে। আর যে মেয়েটিকে সে সোনার চুড়োর নীচে নিয়ে যাবার স্পর্দ্ধা করেছিল তারই টানে আসতে হ'য়েছে, অন্য কোন কারণে নয়। তাই আজ সে নন্দিনীর এত কাছে। তার বন্ধন সংবাদ শুনে নন্দিনী কারিগরদের বন্দীশালা ভাঙবার দলে ভিড়ে যায় "ভাঙতে যাবো" বলে'। বিশুর অভাবে বুঝি বা তার রঞ্জনের সঙ্গে মিলনও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই বিশুর আশীর্ব্বাদের উত্তরে সে শঙ্কিত দুঃখে বলে, "মিলনে আমার আর সুখ হবে না। একথা কোনদিন ভুলতে পারবো না যে তোমাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েছি।" নন্দিনী—রঞ্জনের মিলনের আনন্দ-নাচ সেতো বিশুর হৃদয়স্পন্দনের তালে তালে, সে তো বাইরে কোথাও নয়। তাই সে যখন যায় সব নিয়ে যায়। তার আনন্দে আর তার সাফল্যেই নন্দিনী আর রঞ্জনের মিলন। তাই তার পরম বিজয়ের মুহূর্ত্তে সে নন্দিনীকে চরম আশীর্ব্বাদ ক'রে যায়, "এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।"

ওপরে বলা হ'য়েছে যে নন্দিনী, রঞ্জন আর বিশু একটা শক্তিসঙ্ঘ। প্রমাণ পেলুম এখানে। এইখানেই বিশু চরিত্রের পূর্ণবিকাশ, সে একটা অবান্তর চারণ বা chorus অপেক্ষা অনেক ওপরে। সে আলোকের আধার, তার সমান্তরাল চরিত্র রাজা যার মধ্যে এখনো আঁলো ভাল করে পশেনি। এই সমান্তরালতা রক্তকরবী নাটকে বড় প্রচ্ছন্ন আর সহজ ভাবে পাই। তার প্রধান উদাহরণ বিশু-রাজা আর রঞ্জন-সর্দ্দার চরিত্র দল দুটি। রঞ্জন জ্যোতি আর সর্দ্দার অন্ধকার।

আজ সর্দ্দারের অশ্রু বিসর্জ্জনের দিন। একদিকে তার দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ অন্যদিকে তেমনি ক্ষীণ। একদিকে সে লক্ষ্য করে যে রাজা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, আর রঞ্জন আর নন্দিনীর ওপর খুব প্রখর নজর রাখে। সে এক মুহূর্ত্ত অলস থাকে না, একসঙ্গে অনেক দিক সামলায়। বাগানে মজলিসের তদারক, আবেদন শোনা, অনুগ্রহ বিতরণ, সব কায নিজেই করে, তার ওপর সে একটা দক্ষ সেনাপতি। কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ সে একটা শোকান্তক চরিত্র—tragic character, তার পতনে আমাদের হয় করুণার আনন্দ।

মেঘলোক

আষাঢ় ১৩৩৫

শিল্পী—শ্রীব্রতীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বসু

অধ্যাপকের একটা কথার সত্যতা সে প্রমাণ করে বড় চমৎকারভাবে যে "মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।" তার ভাগ্যের গতি নিহিত ছিল তারই চরিত্র আর কর্ম্মধারার মধ্যে। সে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে—"The Engineer is hoist with his own petar।" সে কাহিনী পরের দৃশ্যে। তখন দেখি যে তার বন্দোবস্ত আর ব্যবস্থার পরিণতি আর গভীরতা কতখানি, অথচ তার ভাগ্য যায় তার আশা আর হিসেবের বিরুদ্ধে।

ধ্বজাপূজার দিন যেদিন রাজাও পূজায় যাবেন, নন্দিনী দ্বার খোলায়। যদিও রাজা আজ নন্দিনীময়, তবু আত্মবিশ্বাস-হারা ব'লে নন্দিনীকে কাছে আসতে দিতে সঙ্কুচিত। অমনিতে সে স'রে না ব'লে এখনও ভয় প্রদর্শন চলে। এতে শুধু যে নাটকের স্বাভাবিকতাই বজায় রাখা হ'ল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে রাজার চরিত্র আর একটু উজ্জ্বল করে দেখান হ'ল তার উঁচু মনোভাবের পরিচয় দিয়ে। নাট্যশক্তির কেমন সফল অথচ পরিমিত ব্যবহার! দ্বার যখন খোলে, নন্দিনী সামনেই দেখতে পায় রঞ্জনের মৃতদেহ। মৃত্যুর কারণ রাজা নিজেই যদিও সেটা সর্দ্দারের চাতুরীর ফল। যেহেতু সে শেষ পর্য্যন্ত রাজাকে রঞ্জনের প্রকৃত পরিচয় জানতে দেয়নি, অথচ রঞ্জন এমনভাবে নন্দিনীর বিষয়ে কথা কইলে যে রাজার "নাড়ীতে নাড়ীতে যেন অগুন জ্বলে উঠলো।" রাজা থাকতে পারলে না। সে প্রকৃত পরিচয় পেলে রঞ্জনের মৃত্যুর পর, কিন্তু তখন সে পরিচয় সর্দ্দারের পক্ষে কত ভয়ঙ্কর; তাতে করে টেনে আনলে সর্দ্দারের নিজের শোচনীয় পরিণাম।

রঞ্জনের শেষ পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকাটা কি নাট্যকারের উদ্ভট খেয়ালমাত্র? রাজা বা নন্দিনী কেন তাকে ইতিপূর্ব্বে দেখতে পায় না তার কারণ ইতিপূর্ব্বে দেখেছি। সুন্দরের শক্তি তো সুন্দরের মধ্যে দিয়েই কার্য্য করে। চোখে থাকে সুন্দরটুকু আর বাকীটুকু গুপ্ত। সেটা যে ওতঃপ্রোতভাবে সুন্দরে মেশানো। সে অরূপের সুন্দরটুকুই রূপ। অন্বেষী চোখে হয়ত কতক কতক পড়ে। সাধারণ চোখে মনে হয় সেটা সুন্দরের আড়ালে একটা কিছু, আর সুন্দরটা তার সৃষ্ট একটা ভেল্কীবাজি মাত্র। তাই বোধ করি আজকের দিনে জগতে সুন্দরের এত অপমান। যতক্ষণ না রাজার চোখে পড়লো ততক্ষণ তার কাছে নন্দিনীর খাতির হোলো না। সর্দ্দারের চোখে তো পড়লোই না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নন্দিনীর নন্দনের ভেতর দিয়েই রঞ্জন রঞ্জিত করলে। এমনি করেই তো সুন্দর বীজ বপন করে। কখন সকলের অজান্তে জালের আড়ালে গিয়ে কার্য্যসিদ্ধ ক'রে আসে কেউ জানতে পারে না। এ নাটকে রঞ্জনকে চাক্ষুষ দেখেছে কে? সে কিশোর, তার দেখ্‌তে পাওয়া আশ্চর্য্য নয়, সে দেখেছে তার শিশু মনের দৃষ্টি দিয়ে, সে যে সত্যদ্রষ্টা, সে Wordsworth এর "Mighty prophet, seer blest।" আজ তাই নন্দিনী খোঁজে সেই বালককে "যে বালক এই ফুলের মঞ্জরী রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।" বড় দুঃখ করে সে বলে, ঐ যে বালক কিশোর ও আমার কাছ থেকে কি বা পেলে?"

রঞ্জনকে আমরা জীবিতই বা দেখি না কেন? কারণ সহজ। সুন্দরকে মানুষ ঠেকিয়ে রাখতে পারে, যেমন রাখা হয়েছিল নন্দিনীকে। কিন্তু তার অন্তর্গত শক্তির সঙ্গে একবার মুখোমুখি হ'লে ক্ষণিকের বিরোধ বা সন্ধি করে তার সঙ্গে কারবার করা চলে না। হয় সে জেতে নয় তো হার মানে। তাই সর্দ্দারের হাতে তার মরণ হয়, সর্দ্দার তাকে আমল দেয় না ব'লে। কিন্তু সর্দ্দারের এই জয় তো সত্যিকার জয় নয়, এটা ভ্রমাত্মক। তাই রঞ্জনের শবদেহটা দেখে সকলে তাকে মৃতই ঠাওরায়। কিন্তু সে যে চিরজীবিত। উপস্থিত পাঠক দেখে যে রঞ্জনের সঙ্গে তার মৃত্যুর পর সাক্ষাৎ হওয়াটা হঠাৎ মাত্র চমক লাগিয়ে দেবার জন্যেই নয়। উচ্চাঙ্গের নাটকের রীতি তা নয়, ডিটেকটিভ উপন্যাসের হ'লেও হ'তে পারে। এক্ষেত্রে পাঠক দেখে যে রকম ভাবে ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে তাতে এছাড়া অন্য কোন সমাধানে নাটকের সমন্বয় সাধন হয় না, অথচ আশ্চর্য্য হবার আনন্দ সবটাই পাওয়া যায়।

রঞ্জনের দেহ মাঝখানে নিয়ে রাজার স্বীকারোক্তি আর প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা, আর নন্দিনীর আবেগময় কথা নাট্যরসে অপূর্ব্ব। রূপকব্যাখ্যা এখানে তলিয়ে যায়। তখনো

নন্দিনী যখন না বুঝে রাজাকে রাগের বশে বলে, "আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই" তার উত্তরে রাজার কথা আমাদের মনে শুধু একটা অপ্রত্যাশিতের ধাক্কা লাগিয়েই ক্ষান্ত হয় যে তা নয়, তার প্রকৃত মূল্য রাজার রাজোচিত আর পরম মনুষ্যত্বপূর্ণ সুরটিকে পরিস্ফুট করাতে। রাজা বলে,"......চলো আমার সঙ্গে...... আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছো না? সেই লড়াই সুরু হয়েছে।......আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক' তাতেই আমার মুক্তি।" অপূর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত! আজ নন্দিনী হ'ল রাজার 'প্রলয় পথে দীপ শিখা।" এই তো রঞ্জনের ম'রেও বাঁচা। নাট্যকারের অন্যত্র ব্যবহৃত কথায় আমরা তাকে বলি—"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।" আজ নন্দিনীকে বাহন ক'রেই তার জয়যাত্রা সুরু হ'য়েছে। সে বলে, "মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠ্‌বে, ও কখনও মরতে পারে না।" তার পর যখন রাজাকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনী সর্দ্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়, আর আমাদের সামনে থেকে শেষবারের মতন অপসারিত হয়, তখন শেষ কথা যা সে আমাদের কানে রেখে যায় তা "জয় রঞ্জনের জয়।" তারপর আর নাটকে তার দেখা পাই না। কারিগরদের বন্দীশালা ভেঙ্গে ফেলবার পরও বিশু তাকে খুঁজে ফেরে কিন্তু দেখা পায় না, শুধু ধুলোর ওপর দেখে পড়ে রয়েছে নন্দিনী-রঞ্জনের মিলনের রক্তরাখী। Keats এর ভাষায়—

And they are gone: ay ages long ago
These lovers fled away into the storm.

"নন্দিনীর জয়" বলে বিশু লড়ায়ের দলে মিশে যায়, নন্দিনীর প্রথম গানটিকে তার শেষ গান ক'রে আর তাইতে লড়ায়ের ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে—"ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে।" নন্দিনী গাইলে "রঞ্জনের জয়", বিশু গাইলে "নন্দিনীর জয়।" বিশুতে নন্দিনী আর রঞ্জন সমাহিত হোলো। রাজা মুক্ত, সর্দ্দার পরাজিত! নাটকের শেষ গানে ঝঞ্ঝার নির্ব্বাণ আর স্থির কোমল শান্তিতে আনন্দের ইন্দ্রধনু উদয়!

চাহার মাকালা

[মূল ফার্সী হইতে অনুদিত]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

[ফার্সী সাহিত্যে "চাহার মাকালা" অতীব প্রসিদ্ধ গদ্য গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকার সুকবি নিজামী উরুজী সমরকন্দী। তিনি ওমর খাইয়ামের সমসাময়িক ছিলেন।]

হিজরী ৫০৬ অব্দে খাজা ইমাম ওমর-খাইয়াম ও খাজা ইমাম মজাফ্ফার-ই-ইসাফিজারী বলখসহরে "বান্দাবাবসায়ী গলিতে" আমির আবু সাদ জররাহের গৃহে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং আমি সেই সময়ে তাঁহাদের খেদমতে হাজির হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই প্রীতি-মজলিসে 'হুজ্জাতল হক' (সত্যের সাধক) ওমর খাইয়ামকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "আমার সমাধি এমন স্থানে হইবে যেখানে বৃক্ষ সমূহ বৎসরে দুইবার আমার কবরের উপরে পুষ্প বর্ষণ করিবে।" আমার নিকট তখন ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল,—যদিও আমি জানিতাম তাঁহার মত ব্যক্তি কখনই অর্থশূন্য বাক্য বলেন না।

হিজরী ৫৩০ অব্দে আমি নিশাপুরে পৌঁছি, তাহার চারি বৎসর পূর্ব্বেই সেই বুজর্গ ধুলির ঘোমটায় তাঁহার বদনমণ্ডল আবৃত করিয়াছিলেন ও এই জড়জগৎ তাঁহাকে হারাইয়াছিল; শুক্রবারে আমি তাঁহার কবর জিয়ারত করিতে যাই, আমার উপর তাঁহার উস্তাদের হক্ ছিল। এতদুপলক্ষে একজন পথ-প্রদর্শক সঙ্গে লইয়াছিলাম। সে আমাকে হিরাতের গোরস্থানে লইয়া গেল। আমি বামদিকে ফিরিয়া তাঁহার কবর বাগান প্রাচীরের পাদমূলে দেখিতে পাইলাম। কবরের উপরে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ভিড় করিয়া রহিয়াছে এবং নিম্নদেশে এত পুষ্প রহিয়াছে যে কবরধূলি তাহাদের নিম্নে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হইয়া

ওমর খাইয়ামের কবর

রহিয়াছে। তখন বলথ সহরে তাঁহার মুখ-নিস্থত বাণী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল; আমি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম কারণ পৃথিবীর বক্ষে এবং ভূগোলকের আবাস উপযোগী স্থান সমূহে কোথাও তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখিলাম না। শান্তিদাতা ও শক্তিশালী খোদা তাঁহার উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

যদিও আমি সেই 'হুজ্জাতলহকে'র নিকট হইতে এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়াছিলাম তবুও আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে জ্যোতিষী গণনায় তাঁহার কোন বিশ্বাস ছিল না। বা অন্য কোন বুজর্গের যে এইরূপ বিশ্বাস আছে তাহা আমি দেখি নাই বা শুনি নাই।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

যদি কভু পথ ভুলে, কভু আনমনে,
অজানা গোপন তব হৃদয় দুয়ারে
অজ্ঞাতে পশিয়া থাকি নিঃশঙ্ক চরণে—
পারিবে কি ভুলে যেতে, ক্ষমিতে আমারে?
তখন জানিনে আমি গোধূলির আলো
ম্লান হ'য়ে মিশে যাবে আঁধারের রাতে,
জানিনে মুদিবে চির দীপ্ত আঁখি কালো
অর্দ্ধ পথে, দিশাহারা, তপ্ত অশ্রুপাতে।

মালাটী ফেলেছি দূরে গন্ধ সাথে তার,
দীপ নিবায়েছি মোর শূন্য গৃহ মাঝে,
আমার চরণ-চিহ্ন দুয়ারে তোমার
মুছিয়া ফেলেছি এক সর্ব্বহারা সাঁঝে!
শুধু আশা জেগে আছে অন্তিম শরণে—
অনন্ত বিস্মৃতি এক অনন্ত মরণে!

জীবন-নাট্য

—গল্প—

শ্রীরামেন্দু দত্ত

১

একদিন নোটিস্ না দিয়েই মৃত্যু এসে বাবাকে নিয়ে গেল। চোখের সামনে জগৎ অন্ধকার! তাঁর "লাইফ্ ইনসিওরের" দশ হাজার টাকা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ঋণের সংখ্যা তখন এগার হাজার ছাড়িয়ে গেছে! একমাত্র সম্পত্তি এই কলিকাতার বাড়ীটা দেড় হাজার টাকায় বন্ধক রেখে পাওনাদারের দেনা মিটিয়ে দিতে হ'ল। যাক—বিক্রী নয়, বন্ধক; তাই বাঁচোয়া। মেয়ে দুটো মস্ত বড় হ'য়ে উঠেছে। ভাবনা?—হ্যাঁ ভাবনা হয় বই কি, কিন্তু তা'তে ত মীমাংসা হয় না, তাই আর ভাবি না। প্রাণপণে কেরাণীগিরির মাসিক আটান্ন টাকা থেকে সঞ্চয় সুরু হ'য়েছে,—মেয়ের বিয়ের জন্যে নয়,—বাড়ীটার ওপর ঋণের সুদ হু—হু—করে' বেড়ে চলেছিল তা'রই ব্যবস্থার জন্যে। কিন্তু চমৎকার বিধাতার মার, ঠিক এমন সময় চাকরীটা গেল। বি, এ, পাশ; শিক্ষিত লোক; কাজ জুটবে না? পিতৃ-বন্ধুদের ধ'রে বসলুম। একটা স্কুলে ২২ দিন ঠিকে মাষ্টারী পাওয়া গেল; অন্তে দক্ষিণা একুশ টাকা পনর আনা নগদ, এক আনা "রিসিট-ষ্ট্যাম্প"।

টাকা পেয়েই একজনের সতর টাকা ধার শোধ দিতে হ'ল; সেই টাকা খেয়ে এই ২২ দিন মাষ্টারী করেছি। বাকী থাকে চার টাকা পনর আনা, চল্লো আটদিন, তা'র পর স্ত্রী বল্লেন "চাল বাড়ন্ত।" মুদীর দোকানে গিয়ে বল্লাম "ওহে তোমার টাকা কটা একসঙ্গে মাসকাবারে দেবো'খন আরো আধমন চাল—" সে বল্লে "না মশাই, আর ফেলে রাখতে পারি না।" কথাটা চাবুকের মত লাগলো। পরক্ষণেই ভাবলুম দূর—ছাই, খেতে পাই না তা' আবার মানের কান্না। দোকানী কি আমার মনের কথা শুনতে পেলে? বল্লে "নেহাৎ এসেছেন পাঁচসের নিয়ে যান, কিন্তু আর দু'তিন দিনের সব মধ্যেই মিটিয়ে দেবেন।"

তিন দিন পরে একটা রবিবার। শুক্‌নো মুখে বেলা সাড়ে এগারটায় 'ফুটপাথ্' দিয়ে ফিরছি। সমস্ত সকালটা ঘুরে একটা পয়সাও পাইনি; ছোক্‌রা মতন একজন কে নমস্কার করলে, অবাক হ'য়ে প্রতি নমস্কার করতেই বল্লে "স্যর চিনতে পারলেন না; সেই যে আমাদের ক্লাসে ক'দিন "গ্রামার" পড়িয়েছিলেন? আজকাল স্কুলে যান না কেন স্যর?" মুখটা আমার মুহূর্ত্তে উজ্জল হ'য়ে উঠ্‌ল—বল্লুম "ভাই পকেটে কিছু আছে? টাকা—পয়সা—আধুলি? ছেলে মেয়েগুলো বাড়ীতে না খেয়ে মরলো, দিতে পার কিছু?"—

সে দিনটাও চলে' গেল।

—২—

স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ। পয়সা নাই যে উপযুক্ত চিকিৎসা করাই, এক বন্ধুর কাছে বারটা টাকা ধার পেয়েছি ম তা'তেই সংসার চল্‌ছে—কিন্তু তা'তে নেশার পয়সাই কুলোয় না ত সংসার খরচ! মদ খাই বলে' লোকে বিদ্রূপ আরে বাপু, কেন খাই—তা'ত কেউ দেখেনা।

কি—রে? মেণ্টু? পয়সা চাই? আর ত মা মোটে একটি টাকা আছে, এই নে—যা', জ্বালাস্‌নে, একটু একলা থাকতে দে।

মেয়েটা চ'লে গেল। আর হাতে এখনো দু টাকা সাড়ে বারো আনা মজুত; যাই সা'দের দোকানে, নইলে এটাও খরচ হ'য়ে যাবে।

বেরিয়েছি আর মেয়ে দুটো হাত ধরলে, "আবার কোথা যাও বাবা।" ভারী সয়তান। হবেনা কেন; বয়স হয়েছে

সব বোঝে ত? হাত ছাড়িয়ে জোরে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলুম—সটান রতন সাহা'র দোকানে।

—৩—

বউ মরেছে—গত বোশেখ মাসে। বেশ হ'য়েছে; বেঁচে গেল। মরলাম না কেবল আমি। তা'হলে প্রায়শ্চিত্ত করবে কে? দিন চল্‌ছে—কি করে' চল্‌ছে জানিনে; জানতে চেষ্টাও করিনে—ভয় করে। শুনতে পাই বন্ধুরা দয়া করে মেয়েদের হাতে এক টাকা আধ টাকা পৌঁছে দেয়; আমার হাতে দেয় না—"রতন সাহা।" হতচ্ছাড়া মেয়েগুলো বেড়েই চলেছে; বড়টা ত আধ-পাগলা, খালি কাঁদে; বন্ধু নরেন মস্ত ডাক্তার, বল্‌লে বলে "ইগ্নেষিয়া—সিক্স্ দাও।" তা—ও দিয়েছি—তবুও কাঁদে।

আজ গেলুম একজন ভদ্রলোকের বাড়ী। নতুন আলাপ বললাম "মশাই একটা সিকি দিতে পারেন?" লোকটাত অবাক। দিলে—ব্যস্—রতন সাহা।

আর একদিন তাঁরই বাড়ী গিয়েছি; বললুম "মশায় বাজার করতে বেরিয়েছি কিছু ধার দেবেন? দিন কতকের মধ্যেই দিয়ে দেবো" নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ন'টা পয়সা দিয়ে বল্‌লেন "আর ত খুচরো নেই।" কিনেছি দু' পয়সার শাক, দু' পয়সার ডাল, এক পয়সার নুন—রতন সাহা'র ধান্যেশ্বরী চার পয়সা।

বুঝ্‌তে পারি, লোকেরা বলে "শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে, কি ক'রে এমন চেয়ে চেয়ে বেড়ায়? এক পয়সা দু' পয়সা, কি নীচতা! ছিঃ।" আরে এখনো যে ঝুলি কাঁধে ক'রে চেঁচিয়ে "দাও বাবু একটি পয়সা" করি না সেই তোমাদের ভাগ্যি। শিক্ষিত,—খেতে দাও? ভদ্রলোকের ছেলে হ'লে বাড়ীতে কি পয়সার গাছ জন্মায়? খাঁটি চারিটি বছর আফিসে আফিসে, দোরে-দোরে ঘুরেছি। জামা ছিঁড়েছে, কাপড়ে গিঁঠ্, জুতো'র ওপরটাই টিঁকে আছে—আবার নীচতা! ছোঃ। এক পয়সা দু' পয়সা ধার চেয়ে বেড়াই, দোষ হ'য়েছে স্বীকার করি; কিন্তু হাজার দেড় হাজার ধার মিলবার মত Credit ত বাজারে নেই। জোচ্চোর বটি, কিন্তু ছোট জোচ্চোর যে!

ছেলেটার বয়স বারো। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—লেখা নাই, পড়া নাই, স্কুলের দেবার পয়সা নাই। মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। যাই একবার—শ্রীপতি বাবুর বাড়ী; সঙ্গে ক'রে "বেঙ্গল ট্রেডিং" এর বড় বাবুর কাছে নিয়ে যাবার কথা ছিল। অমনি সোমেনদের বৈঠকখানাটা সেরে যাবো—চা—পেলেও এক কাপ্ পেতে পারি; নিদেন ফরওয়ার্ডের 'ওয়াণ্টেড্ কলমটাও' দেখা হ'বে ত?—অলস হয়ে বসে থাকা কিছু নয়।

দিশাহারা

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

জ্যোছ্না জোয়ারে ভাসে রজনী,
চল দুয়ে ভেসে যাই সজনি,
স্রোত আছে নাই হাওয়া,
পাশাপাশি ভেসে যাওয়া
পারের নাহিক কোনো ভাবনা ;
চোখে চোখে দুজনার
বাহিয়া চলিব দাঁড়
মুখোমুখি ছাড়া আর চাবোনা।

যে সাধ নয়ন মেলে গোপনে
বুকের নিবিড় তলে স্বপনে
কাঁপে শুধু থর থর
সহেনা কথার ভর
খসে পড়ে পলকের সরমে,
তারে, যেতে যেতে দূরে,
কথা হারা সুরে সুরে
রাখো একে আরেকের মরমে।

নিথর এ জ্যোছ্নার পাথারে,
পারহারা অতলের সাঁতারে
ডুবে গেছে যত সব
ধুলি ভরা কলরব
ঘুমের আঁচল-তট ছাপিয়া।
ঝরা স্বপনের দল
করে শুধু টলমল
তারকার বুকে বুকে কাঁপিয়া।

আলো অবগাহে দেহ আবরি'
ভোলো লাজ খোলো সাজ কবরী।
শুধু মৃদু হেসে হেসে
অনায়াসে ভেসে ভেসে
আরো কিছু কাছে এস সরিয়া,
একের কাঁপন রাশি
আরেকের বুকে আসি
পড়ুক নিবিড় নাড়ে ঝরিয়া।

চকিত ছোঁয়ার এক পলকে
যে কাঁপন ফিরে ফিরে ছলকে
পাঁজরের চারি ধারে
উছসিয়া বারে বারে
দেহের কিনারে যায় ঠেকিয়া,
মুকুরিত এ নিশায়
নিঝুমের নিরালায়
তারে আজি লবো দুয়ে দেখিয়া

বাঁধা নিয়মের বোনা কাহিনী
তুমিও চাহনা আমি চাহিনি।
এক কথা বারে বার
ভালো নাহি লাগে আর
অবশেষে এসে পড়ে ছলনা,
দুজনার দুটী হিয়া
নিতিকার কথা দিয়া
আজো তাই জানাজানি হ'লোনা

পরাণ কেবলি আজ কহে রে
খোঁজাখুজি নহে আর নহে রে !
দুখানি আকুল হিয়া
এসো দেই এলাইয়া,
যত জানা অজানার বেদনা—
ঘুচে যাক, মুছে যাক্,
পরাণ ভরিয়া থাক
কাছাকাছি আছি—এই চেতনা ।

দিশাহারানোর এলা বেশেতে
এ মধুর রজনীটী এসেছে ।
এ ভরা নিশার সাথে
নিতিকার দিনে রাতে
কোথাও তুলনা কিছু নাহি রে,
এ যেন রে ধরণীর
পুরাণো আঁচলটীর
আবরিত আড়ালের বাহিরে ।

আকুল আকাশভরা জোছনার
নেশাটী লাগুক প্রাণে দুজনার ।
নিতিকার লাজ ভয়
দুখ সুখ সমুদয়
থাক পিছনের তীরে পড়িয়া ।
আজি চোখে চোখে চাওয়া
পাশাপাশি ভেসে যাওয়া
পরাণেরে দিশাহারা করিয়া ।

চিরদিনকার ধরা ছাড়িয়ে
আজ মোরা গেছি দুয়ে হারিয়ে !
যে দিকেতে ফিরে চাই
কোথা আর কিছু নাই
কাছাকাছি আছি শুধু দুজনা,
শুধু চোখে চোখে চাওয়া
পাশাপাশি ভেসে যাওয়া
এর বেশী কিছু আর খুঁজোনা ।

জোছ্না জোয়ারে ভাসে রজনী,
চল দুয়ে ভেসে যাই সজনি ।
স্রোত আছে নাই হাওয়া,
পাশাপাশি ভেসে যাওয়া,
পারের নাহিক কোনো ভাবনা,
চোখে চোখে দুজনার
বাহিয়া চলিব দাঁড়
মুখোমুখি ছাড়া আর চা'বোনা ।

টলষ্টয়ের জীবনের একটি দিন

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

বৃদ্ধের চোখ হইতে আস্তে আস্তে ঘুমের পর্দ্দা খুলিয়া গেল। তিনি জাগিয়া চারিদিকে তাকাইলেন। প্রভাতের আলো তখন তাঁহার জানালার উপর আসিয়া পড়িয়াছে; দিন আগত। অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া সুপ্ত চৈতন্য ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

'আমি এখনো জাগিয়া আছি' এই প্রথম অনুভূতিটি কি বিস্ময়কর ও আনন্দপূর্ণ! প্রতিদিনের মত সেদিন তিনি আর জাগিবেন না ইহা মনে করিয়াই বিনীত অন্তঃকরণে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়রীতে আগামী দিবসের তারিখ লিখিয়া, তাহার নীচে নির্ব্বাপিত-প্রায় প্রদীপালোকের এই তিনটি কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলন—'যদি কাল বাঁচি।' এ এক অনন্ত বিস্ময়! ভগবান আর একটি দিন তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। তিনি বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, তিনি ভাল আছেন। তিনি একবার সজোরে নিশ্বাস গ্রহণ করিলেন—ইহা যেন তাঁহার প্রতি বিধাতার একটি বিশেষ দান। সোৎসুক নয়নে বারবার তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর কাপড় ছাড়িয়া স্নানের ঘরে গিয়া সেখানে বরফ-শীতল জলে স্নান করিলেন। তাঁহার সুস্থ সবল দেহে রক্তধারা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তিনি সহজসাধ্য কিছু কিছু ব্যায়াম করিলেন। সজোরে নিশ্বাস গ্রহণ করা ও শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা করা তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাস। তারপর তাঁহার শাদাসিধে রকমের পোষাক পরিধান করিয়া নিজের ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়া ঘর ঝাঁট দিয়া যা কিছু আবর্জ্জনা ঘরে ছিল তা তিনি ঘরের জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার নিজের চাকর তিনি নিজেই।

তারপর সকালের আহারের জন্য ভোজনকক্ষে আহারের স্থানে গেলেন। সেখানে তাঁহার স্ত্রী সোফিয়া এণ্ড্রিভনা তাঁহার কন্যারা, তাঁহার সেক্রেটারী, এবং দুই একজন বন্ধু পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত ছিলেন। আগুনের উপর চায়ের জল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল। তাঁহার সেক্রেটারী সেদিনকার ডাকের একরাশ চিঠিপত্র, খবরের কাগজ, বই প্রভৃতি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। চিঠিপত্র প্রভৃতির উপর দেশ বিদেশের নানা বর্ণের ষ্ট্যাম্পের ছাপ।

টলষ্টয় অর্দ্ধবিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই কাগজ-স্তূপের দিকে তাকাইলেন। তারপর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন—'যত গোলমাল, যত চিত্তবিক্ষেপ। বিশ্বের কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া ঘুরপাক খাওয়া আমাদের উচিত নয়। ভগবানের সঙ্গে আরো বেশী নির্জ্জন সহবাসের সুযোগ আমাদের সকলেরই থাকা উচিত। যাহা আমাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়, যাহা আমাদিগকে গর্ব্বিত ও লুব্ধ, ও মনকে বিকৃত করে, তাহা হইতে আমাদের যথাসাধ্য দূরে থাকাই উচিত। এই কাগজের স্তূপকে আগুনে পুড়াইয়া মুক্ত স্বাধান হইতে পারিলে বাঁচি।'

শেষে কিন্তু বিরক্তিকে পরাস্ত করিয়া কৌতূহলই জয়ী হইল। চিঠিগুলির উপর তিনি দ্রুত আঙুল চালাইয়া একে একে খুলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। কোনটায় প্রার্থনা, কোনটায় নালিশ, কোনটায় আবেদন, কোনটায় দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি, কোনটায় বা কোন বিশেষ কাজের কথা, কোনটায় একেবারে অর্থহীন অসম্বদ্ধ প্রলাপ। ভারতবর্ষ হইতে একজন ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন তিনি বুদ্ধকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন; একজন

(Living Age পত্রে Stefan Zweig লিখিত প্রবন্ধের তর্জ্জমা)

কয়েদি জেলখানা হইতে তাহার জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিয়াছে; একজন যুবক তাহার দ্বিধা, সন্দেহের কথা, একজন দরিদ্র তাহার নৈরাশ্যের কথা জানাইয়াছে। সকলেই অতিশয় নম্র ও বিনীতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কারণ তাহারা জানে তিনিই একমাত্র লোক যিনি তাহাদের সাহায্য করিতে পারেন; তিনিই সমস্ত জগতের ধর্ম্মবুদ্ধি।

দুই ভ্রূর উপর তাঁহার ললাট ক্রমশই কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'কাহাকে আমি সাহায্য করিতে পারি? আমি নিজেকেই কতটুকু সাহায্য করিতে পারিলাম? প্রতিদিনই তো আমি ভুল করিতেছি, অন্যায় করিতেছি; এই ভুলভ্রান্তিপূর্ণ জীবনকে বহন করিবার জন্য আবার কত রকমের সান্ত্বনাও আবিষ্কার করিতেছি, নিজেকে ভুলাইবার জন্য কত আড়ম্বর সহকারে সত্যধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। ইহা আমার নিকট এক বিস্ময়কর ব্যাপার—সকলে আমার নিকটেই আসে, আমাকেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—'লেভ নিকলেইভিচ, বল আমরা কি ভাবে জীবন যাপন করিব?' আমার সমস্ত জীবন মিথ্যাপূর্ণ, কেবল ভান, কেবল আত্মপ্রচার। সত্য বলিতে কি, আমি একটি শূন্যপাত্র। আত্মপ্রচারের ইচ্ছা দমন করিয়া নিজের মধ্যে নিজে সমাহিত হইবার চেষ্টা করাই আমার উচিত। দিনরাত্রি কেবল কথা না বলিয়া হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে ভগবানের আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমার সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। তবু তাদের আমি একেবারে ফিরাইয়া দিতে পারিনা; তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আছে। তাদের কিছু না কিছু উত্তর আমাকে দিতেই হইবে।'

অন্য সব চিঠি রাখিয়া একখানা চিঠি বিশেষ ভাবে বারবার করিয়া পড়িতে লাগিলেন। এই চিঠিখানা কলেজ হইতে একটি ছাত্রের লিখিত। অন্যকে জল পান করিবার উপদেশ দিয়া তিনি নিজে মদ্যপান করেন সেই কথার উল্লেখ করিয়া ছাত্রটি তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে সমালোচনা করিয়াছে। নিজের সুখ ও আরামপূর্ণ গৃহ-বর্জ্জন, নিজের সমুদয় সম্পত্তি কৃষকদের বিতরণ ও নিজের অন্তর-দেবতার অনুসন্ধানে তীর্থযাত্রায় গমন করিবার তাঁহার সময় হইয়াছে। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'সে ঠিকই বলিয়াছে। তার কথা আমার অন্তরের কথারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু যে কথা আমি নিজেকেই বলিতে পারিলাম না সে কথা তাকে আমি কি করিয়া বলি? সে যখন আমারই নাম করিয়া আমাকে দোষারোপ করিয়াছে তখন কি করিয়া আমি নিজকে দোষমুক্ত করিব!' সেই চিঠিখানা হাতে করিয়া তাঁর নিজের ঘরে যাইবার জন্য তিনি উঠিলেন। সেই চিঠিখানার উত্তর এখনই তাঁকে দিতে হইবে।

ঠিক সেই সময়ে তাঁর সেক্রেটারী তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে সেদিন দুপুরে টাইমস্ কাগজের সংবাদদাতা তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে। তিনি তাহাকে আসিতে বলিবেন কি না টলষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। টলষ্টয়ের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। 'বারবার কেন আমাকে এ অনুরোধ? তারা আমার কাছে কি চায়? আমার অন্তরাত্মার প্রতি তাদের কেন এ কৌতূহল? আমার যা বলিবার সবইতো বইয়েতে লেখা আছে। যা জানিবার বই পড়িলেই জানিতে পারিবে।' কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিরক্তি দমন করিয়া অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বলিলেন—'যদি একান্তই আমার সঙ্গে দেখা করিবে, বেশ, আধ ঘণ্টার জন্য আসিতে বোলো।' ঘরে প্রবেশ করিয়া পরক্ষণেই আবার নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'কেন আমি সম্মতি দিলাম? আমার সঙ্গে কেন তারা সাক্ষাৎ করিতে আসে? আমি মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তবু আত্মপ্রচার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না! তবু আমার অহঙ্কার ঘুচিল না! কতদিনে আমি নিজেকে লুপ্ত করিতে পারিব? কবে আমার কথা বলা বন্ধ হইবে? হে ভগবান, তুমি আমার সহায় হও।'

এইবার তিনি তাঁর ঘরে একা। ঘরের শূন্য দেয়ালে একখানি কাস্তে, একখানি আঁচরা (rake) ও একখানি কুড়াল ঝুলিতেছে। টেবিলের সামনে একটা ভারি, শক্ত চৌকি। ঘরের ভিতরটি দেখিতে খানিকটা সাধু সন্ন্যাসীর গুহার মত, খানিকটা কৃষকের ঘরের মত, টেবিলের উপর

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

একটি অসমাপ্ত লেখা—'জীবন সম্বন্ধে চিন্তা।' চৌকিতে বসিয়া তিনি সেই লেখাটি পড়িতে লাগিলেন। কিছু কিছু কাটিলেন, কিছু কিছু নূতন যোগও করিলেন। তারপর আবার লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্রুত,অস্পষ্ট, শিশুর ন্যায় কাঁচা হাতের লেখায় বারবার বাধা পড়িতে লাগিল। 'আমি বড় তাড়াতাড়ি করিতেছি; আমার ধৈর্য্য বড় কম। ভগবানের সম্বন্ধে আমি কি করিয়া লিখিব? তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা আমার নিজের মনেই যে এখনো স্পষ্ট হইল না। নিজের কাছেই কি সত্য হইতে পারিলাম? প্রতিদিনই কি আমার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না? যিনি মন ও বুদ্ধির অতীত তাঁকে আমি কি করিয়া প্রকাশ করিব? আমার যা করিবার ইচ্ছা সে যে আমার সাধ্যের অতীত। আমি যখন গল্প লিখিতাম তখন ভগবানের এই সৃষ্টিকে কী নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গেই লোকের নিকট প্রকাশ করিতাম। কিন্তু আমার মন কত দ্বিধা, কত সন্দেহে পূর্ণ! না, আমি মোটেই সত্যদ্রষ্টা নই; কাহাকেও উপদেশ দিবার অধিকার আমার কিছুমাত্র নাই। অন্য দশ জন অপেক্ষা ভগবান আমাকে একটু বেশী দেখিবার ক্ষমতা ও দৃষ্টির একটু বেশী গভীরতা দিয়াছেন। হয়তো আমার যে জীবন আর্টকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই যথার্থ, তাহাই খাঁটি। সেই আর্টকেই এখন আমি অভিশাপ দিয়া থাকি।'

কেহ যেন তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে এই ভাবিয়া সভয়ে এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য ভাবে আর্টকে বাহুল্য ও পাপের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া দেরাজের একটি গোপন স্থান হইতে গোপনে লিখিত দুইখানা গল্পের বই বাহির করিলেন। সেই দুইখানা বই—'হাজি-মুরাদ' (Haji Murad) ও "হারানো নিদর্শনপত্র" (The Lost Coupon)—গোপনে লিখিত ও লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত। খাতায় চোখ রাখিয়া তিনি দুই এক লাইন পড়িলেন। তাঁহার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—'এ সত্যিকারের লেখা; এ সত্যই খুব ভাল। ভগবান তাঁর সৃষ্ট বিশ্বসংসারের ছবি আঁকিবার জন্যই আমাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁর অভিপ্রায়কে প্রকাশ করিবার অধিকার তিনি আমাকে দেন নাই। আর্ট—সে কী সুন্দর! সৃষ্টি—সে কী মহান! চিন্তা—সে কী ব্যথা ও বেদনাপূর্ণ! এই পাতাগুলি লিখিবার সময় আমার মন কী আনন্দেই না পূর্ণ ছিল। বিবাহদিনের বসন্ত প্রভাতটি বর্ণনা করিবার সময় কতবার আমার চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেই অতীত দিনে আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। এখন যে পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি সেই পথ ধরিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, কারণ কত সন্দেহপূর্ণ হৃদয় সাহায্যের জন্য আমার দিকে তাকাইয়া আছে। আমার আর থামিবার উপায় নাই; আমার দিনও ফুরাইয়া আসিয়াছে।' এই বলিয়া সেই বইদুখানা দেরাজের সেই গোপন স্থানে আবার লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর অতিরিক্ত রচনাশ্রম-পীড়িত লেখকের মত কুঞ্চিত কপোলে ঝুঁকিয়া পূর্ব্ব অসমাপ্ত লেখায় মন দিলেন। তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু এক একবার লিখিত কাগজের উপর বুলাইয়া যাইতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন। আজিকার মত অনেকটা লিখিয়াছেন। কলম রাখিয়া উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত পা ফেলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। একজন সহিস সিঁড়ির মুখে তাঁহার প্রিয় অশ্ব 'ভেলিরকে' লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক লাফে ঘোড়ার উপর উঠিয়া অবিরত ঝুঁকিয়া লেখার ফলে অবনত পিঠ সোজা করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সুদক্ষ কসাক সৈন্যের ন্যায় সহজ ভঙ্গিতে ঘোড়ার পেটে দুই পায়ে চাপ দিয়া নিকটবর্ত্তী বনের দিকে তেজস্বী ঘোড়াকে ছুটাইয়া দিলেন। তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু বাতাসে উড়িতে লাগিল। প্রাণ ভরিয়া তিনি দুই ধারের ক্ষেতের গন্ধে পূর্ণ নির্ম্মল বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, চারিদিকের নূতন প্রাণের স্পর্শে তাঁহার বৃদ্ধ ভঙ্গুর দেহ সতেজ হইয়া উঠিল। তাঁহার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুই কর্ণে, প্রত্যেক আঙুলের মাথায় রক্তের প্রবাহ নৃত্য করিতে লাগিল। বনের প্রান্তে আসিয়া তিনি অশ্বের গতি সংযত করিলেন। তিনি অতিশয় বিস্ময় ও কৌতূহলপূর্ণ

দৃষ্টিতে বনের ধারে প্রস্ফুটিত ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া কেমন করিয়া এই ফুলগুলি উহাদের সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু বসন্তের ঈষৎ উত্তপ্ত স্থর্য্যকিরণের দিকে মেলিয়া দিতেছিল তাহাই তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন। আকাশের গায় উহাদের প্রথম প্রস্ফুটিত রূপটি কী সুন্দর! ঘোড়ার জিনের উপর চাপিয়া বসিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটি বার্চ গাছের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার কৌতূহল-জাগ্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টি গাছের উপরে আহার্য্য বহনে রত এক সারি পিপীলিকা আবিষ্কার করিল। তিনি কিছুক্ষণের জন্য কর্ম্ম-রত পিপীলিকা শ্রেণীকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ কী বিস্ময়! এই প্রকৃতি, এই যে ভগবানের প্রতিচ্ছবি, সত্তর বৎসরের মধ্যে ইহার তো একটুকুও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—তবু তো ইহা সেই একই নয়, প্রতিদিনই নূতন, প্রতিদিনই আশ্চর্য্য ও বিস্ময়পূর্ণ, প্রতিদিনই এক—তবু প্রতিদিনই কত পরিবর্ত্তনশীল।

তাঁহার ঘোড়া থাকিয়া থাকিয়া সজোরে হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতেছিল। চলিবার জন্য সে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। টলষ্টয়ের দিবা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। মাতার ন্যায় স্নেহময় ও সেবাপরায়ণ প্রকৃতির এই এক মূর্ত্তি—কিন্তু আজ তিনি তাহার উন্মত্ত, তাণ্ডবময় লীলাকেও হৃদয়ে অনুভব করিবেন। তাই তিনি চিন্তামুক্ত ও উল্লসিত হইয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। ঘোড়া একদৌড়ে পনেরো মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া ফেলিল। উহার দেহের মাংসল অংশ সকল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি' অশ্বের গতি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে ফিরিলেন। তাঁহার চোখ দীপ্ত, মন চিন্তালেশহীন। শৈশবেও তিনি এই বনের ভিতর দিয়া এমনি করিয়াই ঘোড়া ছুটাইতেন।

গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে তাঁহার মুখের দীপ্তি ক্রমশই নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বাড়ির এত নিকটে তাঁহারই জমিদারীতে জমি সকল অকর্ষিত অযত্নাবস্থায় পড়িয়া আছে, জমির চারিদিকের বেড়া ভাঙ্গা, কাঠ সবই স্থানান্তরিত। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ক্রুদ্ধমনে তিনি নিকটবর্ত্তী একটি কুটিরের দিকে অশ্বচালনা করিলেন। কুটিরের নিকটবর্ত্তী হইলে একটি স্ত্রীলোক কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পা খালি, বস্ত্র ছিন্ন ও অপরিস্কার, মাথায় চুল বিপর্য্যস্ত, চোখে নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টি। তিনটি ছোট ছোট অর্দ্ধনগ্ন ছেলে মেয়েও তাহার গা ঘেসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, ঘরে একটি ছোট শিশুর ক্রন্দন শোনা গেল। তিনি ক্রোধ ও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীলোটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার জমির এমন অবস্থা কেন। স্ত্রীলোকটি জড়িত কণ্ঠে তাহার মনিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। দেড় মাস যাবৎ তার স্বামী কাঠ চুরীর অপরাধে জেলে আছে। একা সে কি আর করিবে! ঘরে খাবার ছিল না তাই তার স্বামী কাঠ চুরী করিয়াছে। তার মনিব তো জানেন এবার ফসল ভাল হয় নাই—তার উপর জমির সমুদয় খাজনা দিতে হইয়াছে। শিশু তিনটিও তার মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করিল। টলষ্টয় তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়াইয়া কয়েকটি মুদ্রা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না—অপরাধীর ন্যায় তাড়াতাড়ি তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ বিষাদপূর্ণ—মনের সমস্ত শান্তি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

'আমারই—ঠিক আমার নয়, আমার স্ত্রীর—জমীদারীতে এমন ঘটনা! কিন্তু এই জমিদারী আমিই তো তাদের দিয়াছি। নিন্দা, গ্লানি হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য আমার একি কাপুরুষের মত ব্যবহার? বিশ্ববাসীকে মিথ্যাদ্বারা ভুলাইবার জন্য আমার একি প্রতারণা? আমি কি জানি না, আমি যেমন প্রজাদের রক্ত শোষণ করিতাম তেমনি আমার স্ত্রী প্রজাদের রক্ত শোষণ করিতেছে? আমি তো ইহা খুব ভাল করিয়াই জানি। আমার বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট তাহাদেরই পরিশ্রমলব্ধ অর্থে, তাহাদেরই রক্তে তৈরী। এই জমিদারী আমার স্ত্রী ও আমার সন্তানদের দান করিবার আমার কী অধিকার আছে? যে কৃষকরা ইহার জমি চাষ করে, ইহাতে ফসল ফলায় ইহা কি তাহাদেরই নয়? আমি এই লেভ টলষ্টয় ভগবানের নামে প্রতিদিন লোকের নিকট ন্যায়-ধর্ম্ম প্রচার করি। আমাকে কি

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

এই প্রতারণার জন্য ভগবানের নিকট লজ্জিত হইতে হইবে না ?

টলষ্টয়ের মুখ ক্রমশই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। গৃহে প্রবেশ করিতেই উজ্জ্বল পোষাকে সজ্জিত দুই সহিস ও খানসামা তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। তীব্রস্বরে তিনি মনে মনে বলিলেন—'আমার সব ভৃত্যবৃন্দ।'

বিস্তৃত ভোজনকক্ষে কাউন্টপত্নী, তাঁহার পুত্র কন্যারা, সেক্রেটারি, গৃহ-চিকিৎসক, দুইজন ফরাশী ও ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী, দুইজন প্রতিবেশী, একজন রাজদ্রোহী ছাত্র—তাঁহারই সে গৃহ-শিক্ষক—প্রভৃতি সকলে আহারে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। প্রকাণ্ড টেবিলে রৌপ্য ও চিনামাটির পাত্রসকল ঝক্‌মক্ করিতেছে। টলষ্টয় ঘরে প্রবেশ করিলে সকলের তর্ক থামিয়া গেল। অতিথিদের অভিবাদন করিয়া নিঃশব্দে তিনি চৌকীতে উপবেশন করিলেন। উজ্জ্বল পোষাকে সজ্জিত খানসামা তাঁহার সম্মুখে তাঁহার নিরামিষ খাদ্য রাখিল। তাঁহার সেই খাদ্য বহুব্যয়ে স্থানান্তর হইতে আনীত ও বহুযত্নে প্রস্তুত। তাঁহার সেই স্ত্রীলোকটির কথা মনে পড়িল—তাহার সেই শতছিন্ন বস্ত্র, অনশনক্লিষ্ট নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টি আর তার সেই অর্দ্ধনগ্ন শিশু তিনটি। বিষাদ ও অনুশোচনা পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি সম্মুখের আহার্য্যের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

'আমার স্ত্রী, পুত্র কন্যারা যদি একবার বুঝিতে পারিত এইরূপ জীবন ধারণ করা আমার পক্ষে কতদূর অসম্ভব। আমার এই জীবন যাত্রার প্রণালী আমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আমার চারিদিকে এত ভৃত্য, এত প্রচুর আহার্য্য, এত বাহুল্য উপকরণ—আর আমারই ঘরের প্রান্তে যারা আছে তারা জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেও বঞ্চিত। তারা জানে, তাদের নিকট আমার এইটুকু মাত্র দাবী তারা এই উপকরণ-বহুল জীবন ত্যাগ করুক। এই উপকরণ-বহুল জীবনের জন্য আমরা বিধাতার নিকট অপরাধী। আমার সহচরী পত্নীর উচিত আমার সহধর্ম্মিণী হওয়া। কিন্তু আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। তিনি পাথরের মত আমার গলার ভারস্বরূপ হইয়া কেবলি আমাকে মিথ্যা হইতে মিথ্যায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বহুপূর্ব্বেই আমার এই বন্ধন ছিন্ন করা উচিত ছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে ধর্ম্মমতের একটুও মিল নাই। তাহারা আমার জীবনকে নষ্ট করিল, আমিও তাহাদের জীবনকে নষ্ট করিতেছি। আমি আমার নিজের ও সকলের ভার স্বরূপ হইয়া আছি। আমার জীবনের কোন প্রয়োজন নাই।'

হঠাৎ অসংযত ক্রোধাবেগে মুখ তুলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন, 'একি, এত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে? মাথার চুল শুভ্র, কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত? নাজানি কত রুদ্ধ বেদনা তার ওষ্ঠপুটে কম্পিত হইতেছে'। তাঁহার মন করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—ইহা কি সত্য, এ কি সেই নারী যে যৌবনে ছিল সদা হাস্যময়ী, যে নির্ম্মল নির্দ্দোষ কুমারী-জীবন লইয়া আমার জীবনের সঙ্গিনী হইয়াছিল ? আমরা দুজনে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছি সে কোন যুগে—সে তো আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের—চল্লিশ কেন পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কথা। তাহার অপরিস্ফুট কুমারী-জীবন লইয়া সে যখন আমার নিকট আসিল তখন আমি পরিণত বয়স্ক যুবক, পাপাচরণে আমার হৃদয় কলুষিত। সে আজ আমার তেরটি সন্তানের মাতা, আমার সব কাজের সঙ্গিনী,- কিন্তু আমি তার কতটুকু সাহায্য করিতে পারিয়াছি? কত রকমে আমি তার মনে ব্যথা দিয়াছি—আমার জন্য তাহাকে কত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমার পুত্রেরা—আমি জানি তারা আমাকে ভালবাসেনা—আমার কন্যারা, তাদের আমি যৌবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছি। চড়াই পাখী যেমন করিয়া রাস্তা হইতে খাবার কুড়ায় তেমনি করিয়া আমার সেক্রেটারী আমার মুখের কথা কুড়াইতেছে। ইতিমধ্যেই মৃত্যুর পর আমার দেহ রক্ষা করিবার জন্য তাহারা নানাবিধ তৈলনির্য্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে। আমার ইংরেজ সেক্রেটারীর হাতে সর্ব্বদাই একখানা নোটবুক,—সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য কখন আমি কি বলি তাহা লিখিয়া লইবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। অথচ এই গৃহ, এই টেবিল, টেবিলের

চারিধারে আমরা সকলেই সেই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করিতেছি। এই নরকের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আমি প্রচুর আহার ও প্রচুর আরাম উপভোগ করিতেছি। আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করাই উচিত—আমি অনেক দিন বাঁচিয়া আছি। আমার নিজের নিকট আমি একটুকুও সত্য হইতে পারিলাম না।'

ভৃত্য আর এক পাত্র খাবার তাঁহার সম্মুখে আনিয়া রাখিল। সে খুব উপাদেয় খাদ্য—ফলের উপর বরফ দিয়া দুধের সর জমানো। ক্রোধ ও বিরক্তিভরে খাবারের পাত্রটি সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিলেন।

কাউণ্ট-পত্নী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'খাবার কি ভাল হয় নাই ?'

টলষ্টয় তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'খুব ভাল হইয়াছে, আমার পক্ষে একটু অতিরিক্তই ভাল হইয়াছে।'

ছেলেদের মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল—কাউণ্ট-পত্নী অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন।

আহার শেষ হইলে সকলে মিলিয়া বসিবার ঘরে গেলেন। বিদ্রোহী ছাত্রটীর সঙ্গে তাঁর তর্ক আরম্ভ হইল। ছাত্রটি টলষ্টয়ের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান হইলেও অসঙ্কোচে সে তাহার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে লাগিল। টলষ্টয়ের চোখ দীপ্ত—তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বাক্য-প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। যৌবনে টেনিস্ ও শিকারে যেমন তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন এখন তেমনি তিনি তর্কের সময় উত্তেজিত হইয়া উঠেন। হঠাৎ তিনি নিজেকে সংযত করিলেন—কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—'হয়তো আমারই ভুল। সকলের হৃদয়েই ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার বীজ নিহিত আছে। কে বলিতে পারে সেই মঙ্গল ইচ্ছার বীজ প্রতিজনের হৃদয়ে কাজ করিতেছে কিনা।' আলোচনার গতি ফিরাইবার জন্য তিনি বলিলেন—'চল একটু বেড়াইয়া আসি।'

কিন্তু পথিমধ্যে তিনি বাধা পাইলেন। তাঁহারই বাড়ির কাছে বহু পুরাতন প্রকাণ্ড 'এলম' গাছটির নীচে একদল লোক জড় হইয়াছে। তাহাদের কেহ ভিক্ষুক, কেহ সাধু সন্ন্যাসী, কেহ বা কৃষক। কেহ বিশ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া টলষ্টয়ের দ্বারে তীর্থ যাত্রায় আসিয়াছে। কেহ তাঁহার নিকটে উপদেশ চায়, কেহ সামান্য কিছু অর্থের প্রার্থী। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত,—দেহ রৌদ্রদগ্ধ ও ধূলায় আপাদমস্তক আবৃত। গাছের নীচে সকলে তাঁহারই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া আছে। তিনি আসিলে সকলে দাঁড়াইয়া গুরুর ন্যায় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাদের দিকে তাকাইয়া স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে ?'

'মহারাজ, (Your Highness) আপনার নিকট একটি নিবেদন—

টলষ্টয় দ্রুত তাহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—'আমি তোমাদের মহারাজ নই। একমাত্র ভগবান ভিন্ন তোমরা এ নামে অন্য কাহাকেও সম্বোধন করিতে পার না।

ভয়বিহ্বল কৃষক ইতস্ততভাবে তাহার টুপি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। অবশেষে বারবার থামিয়া জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল যে জমি তারা চাষ করে সে জমি সত্য সত্যই কি তাদের প্রাপ্য ? তাহাদের প্রাপ্য অংশটুকু তাহারা কবে পাইবে। একজন ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে লিখিতে পড়িতে জানে কিনা। সে পড়িতে জানে শুনিয়া টলষ্টয় তাঁহার লেখা 'আমাদের কি করা উচিত ?' পুস্তিকাখানি আনাইয়া তাহাকে দিলেন। তারপর একে একে ভিক্ষুকরা তাঁর নিকট আসিতে লাগিল। তিনি তাহাদের সকলেরই হাতে কিছু কিছু মুদ্রা ফেলিয়া দিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি ফিরিতেই দেখিতে পাইলেন তাঁর ইংরেজ সেক্রেটারী সেই অবস্থায় তাঁর ফটো লইতেছেন। তাঁহার মুখ আবার বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন 'এই ভাবেই তারা আমার ফটো তোলে—প্রজাপ্রিয়, দাতা, মাহাত্মা টলষ্টয়; তাহারা যদি আমার অন্তঃস্থল দেখিতে পাইত তাহা হইলে তাহারা দেখিত আমি মোটেই ভাল নই—ভাল হইবার ইচ্ছা আমার মনে সুধু জাগিয়াছে। আমি তো নিজেকে লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। অন্যের জন্য কতটুকু করিয়া

টলস্টয়ের জীবনের একটি দিন

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

থাকি? যৌবনে মস্কো সহরে জুয়া খেলায় এক রাত্রিতে যে পরিমাণ অর্থ নষ্ট করিয়াছি তাহার অর্দ্ধেকও তো আমি এ পর্য্যন্ত দান করিতে পারি নাই। ডষ্টোভেসিক যখন প্রতিদিনই অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন তাহা জানিয়াও কি আমি কখনো তাঁহাকে অর্থদ্বারা সাহায্য করিয়াছি? আমার যখন সবেমাত্র ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ তখন কিনা আমি মহা আড়ম্বরসহকারে মহাপুরুষের ন্যায় সকলের নিকট হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ করিতেছি।

তিনি দ্রুত পা ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্যেরা অতি কষ্টে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি অল্পই কথা বলিতেছিলেন। তখন তাঁহার সকল মন দ্রুত চলার দিকে। তবু তিনি এক একবার থামিয়া থামিয়া তাঁহার কন্যাদের টেনিস্ খেলা দেখিতেছিলেন। ভালো খেলা দেখিতে পাইলেই সেইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্যে তাঁহার মনের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি স্নিগ্ধ শান্তমনে ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া একটু পড়িলেন—খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পেতেই তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়েন। একখানা অয়েলক্লথ-মোড়া সোফার উপর শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন—'আমার সে কী-এক আতঙ্কের দিনই গিয়াছে যখন মৃত্যুকে আমি প্রেতাত্মার ন্যায় ভয় করিতাম। তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল কি করিয়া উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই। এখন আমার আর সে ভয় নাই—বরং উহাকে এখন সাদরে আহ্বান করিতে ইচ্ছা হয়,—এখন নিকটে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা হয়।

এক একটি চিন্তা এক একটী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। কলম লইয়া তিনি দুই একটী কথা লিখিলেন। তারপর অনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তদবস্থায় পুর্ব্বস্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা উদ্ভাসিত তাঁহার মুখে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে তিনি তাঁহার ঘর হইতে নামিয়া আসিলেন। নীচের বসিবার ঘরে তখন সকলে একত্র হইয়াছে। তিনিও তাদের মধ্যে গিয়া বসিলেন। গোলডেনভাইসের জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কিছু বাজাইয়া শুনাইবেন কি না। তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়া পিয়ানোর গায় ঠেসান দিয়া বসিলেন। পাছে তাঁহার হৃদয়াবেগ দেখা যায় সেই জন্য তিনি দুইহাতে চোখ আড়াল করিলেন। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। সঙ্গীতের এ কী মোহিনী শক্তি! উহার পবিত্র ধারায় তাঁহার হৃদয় মন ধীর শান্ত, সংযত হইল। তিনি নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন—'আর্টকে খর্ব্ব করিবার আমার কী অধিকার আছে? জগতে এতবড় সান্ত্বনা আর কোথায় আছে? চিন্তা আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে; বিদ্যা আমাদের গর্ব্বিত করে। আর্টের মধ্যে আমরা ভগবানের রূপকে যেমন করিয়া অনুভব করিতে পারি এমন আর কিসে? বিটোফেন সোপেঁ, তোমরা আমার ভাই! তোমাদের নির্নিমেষ দৃষ্টি আমি হৃদয়ে অনুভব করিতেছি, তোমাদের হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ভাই, তোমাদের আমি তিরস্কার করিয়াছি, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।'

বাজনা শেষ হইল। সকলে একসঙ্গে আনন্দসূচক হাততালি দিয়া উঠিল। টলষ্টয় কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহাদের সঙ্গে হাততালি দিতে যোগ দিলেন। তাঁহার মনের সমস্ত বিরক্তি বিক্ষোভ দূর হইয়া গেল। তিনি সহজ আনন্দে সকলের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত-বিক্ষুব্ধ দিন আনন্দের মধ্য দিয়া শেষ হইবে বলিয়াই মনে হইল।

কিন্তু শয়ন করিবার পুর্ব্বে পুনরায় তিনি তাঁহার শূন্যকক্ষ পায়চারি করিতে লাগিলেন। শুইবার পুর্ব্বে সমস্ত দিনের কাজের হিসাবনিকাশ তাঁহাকে করিতে হইবে। টেবিলের উপর তাঁহার ডায়রী খোলা রহিয়াছে। উহার পাতাগুলি কঠিন বিচারকের ন্যায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। সেই কৃষক স্ত্রীলোকটির কথা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা ভিন্ন অন্যকোন সাহায্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে পড়িল ভিক্ষুকদের সঙ্গে কথা বলিবার

সময় কতবার তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, স্ত্রীর উপর তাঁহার কঠিন ব্যবহারের কথা মনে পড়িল। তিনি একে একে তাঁহার এই সকল দুর্ব্বলতা নির্ম্মমভাবে তাঁহার ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে লিখিলেন—'পুনরায় অক্ষমতা, পুনরায় আত্মার খর্ব্বতা সাধন, পুনরায় যথেষ্ট ভাল করিতে অসমর্থ। পুনরায় প্রমাণ হইল যা শক্ত, যা কঠিন, তা করিবার শক্তি আমার মধ্যে নাই। বৃহৎ মানব-সমাজ (humanity) ভিন্ন যাহারা আমার অতি নিকটে আছে তাহাদের প্রতি আমার ভালবাসা নাই। হে ভগবান, তুমি আমার সহায় হও। তারপর পরদিবসের তারিখ খাতার পৃষ্ঠায় লিখিয়া তার নীচে গভীর রহস্যপূর্ণ এই তিনটি কথা লিখিলেন—'যদি কাল বাঁচি।'

সেদিনের মত তাঁহার কাজ শেষ হইল। আর একটী দিনের মতো তিনি বাঁচিয়া রহিলেন। অবনত মস্তকে তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পায়ের ভারি মোটা জুতা খুলিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। পুনরায় মৃত্যুর চিন্তা তাহার মনে উদিত হইল। চিন্তার পর চিন্তা তাহার মাথায় উঁকি মারিতে লাগিল। তিনি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে তাহার মন চিন্তাবিমুক্ত হইয়া আসিল—তাহার পর একসময় তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু একি! কাহার পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে না? তিনি হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। পায়ের শব্দ বটে, পাশের ঘর হইতে আসিতেছে—অতি মৃদু অতি গোপন। নিঃশব্দে বিছানা হইতে উঠিয়া দরজায় উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। হাঁ, আলোই বটে। কে একজন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। কে একজন তাঁহার টেবিলের কাগজপত্র ওলট পালট করিয়া দেখিতেছে—তাঁহার ডায়রীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থল দেখিবার চেষ্টা। এ যে তাঁহারই পত্নী। এ কী অতৃপ্ত কৌতুহল! চারদিক হইতে তাঁহার আত্মার নিভৃত নিকেতনের দিকে এ কী গোপন অনুসন্ধান! তাঁহার হাত রাগে কাঁপিতে লাগিল। তিনি দরজার খিল চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল হঠাৎ দরজা খুলিয়া তাঁহার স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে সংযত করিলেন। হয়ত "ইহাও আমার একটী পরীক্ষা।" তিনি ধীরে ধীরে আবার শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না। মহাগুণী মহাপুরুষ লেভ নিকলেভিচ টলষ্টয় নিজেরই গৃহে প্রতারিত সন্দেহের দ্বারা বিদগ্ধ ও সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।
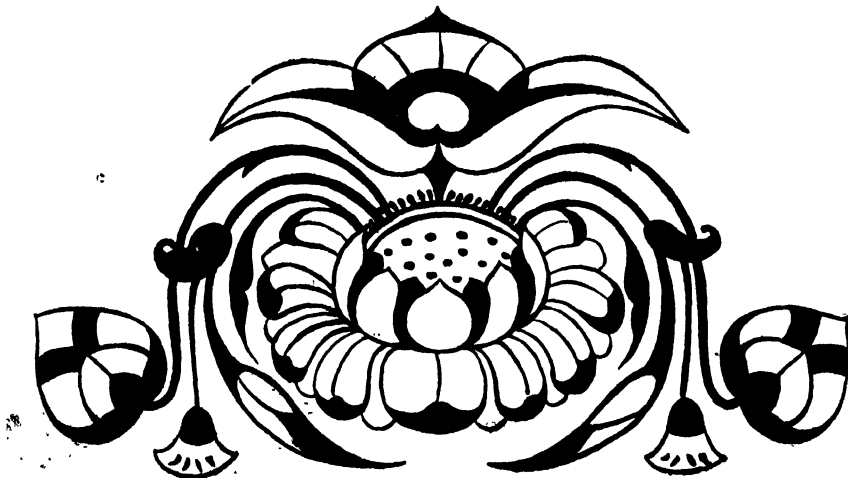
বিমাতা

—গল্প—

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

সকলেই বলিল—আহা, এ পক্ষের একটি ছেলে থাকিলে ভাল হইত, মেয়েটী একেবারে সতীনপোর হাত-তোলা হইয়া রইল। কিন্তু কৈলাসচন্দ্রের কায়েমী রকম উইলের ব্যবস্থা শুনিয়া সকলেই বলিল—হাঁ উকিল বটে, মেয়েটার একটা হিল্লে করে গেছে। কিন্তু খুশী হইলেন না হরনাথ, কৈলাসের প্রথম পক্ষের শ্বশুর। জামাতার দ্বিতীয়-বার বিবাহের পর হইতে তিনি দুই বৎসরের দৌহিত্র দীপককে নিজের কাছে রাখিয়া আজ ষোল বৎসর ধরিয়া মানুষ করিতেছেন এই আশায় যে তাঁহার বর্ত্তমানে জামাতার একটা কিছু হইলেই দৌহিত্রর বিষয় দৌহিত্রর পুরাপুরি রকম ফিরিয়া আসিবে এবং কন্যার বন্ধ্যা সতীন কাশী চলিয়া যাইবে। আজ উইলের সংবাদ পাইয়া তিনি নিজে দৌহিত্র সমেত দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে বৈবাহিকের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

তিনদিন হইল শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বৃহৎ ব্যাপারের রেশ তখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান। সমস্ত বাড়ীটা জুড়িয়া একটা শূন্যতা, সদ্য সমাপ্ত সমারোহক্রিয়ার একটা মর্ম্মভেদী প্রতিধ্বনি বিরাজ করিতেছিল। তরুণ দীপক তাহার দুটী ডাগর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন সেই লুপ্ত প্রতিধ্বনির মৃদু আভাস হৃদয় দিয়া অনুভব করিল। পিতাকে এক রকম সে ভুলিয়া গিয়াছিল, পিতার বাটী সে কখন চক্ষে দেখে নাই। তাই রূপকথার রাজপুত্রের মত সে এক স্বপ্নপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মোহাবিষ্টের মত অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সরকার ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি উভয়কে অন্দরে লইয়া গেল। সদ্যবিধবা বিমলা পূজা শেষ করিয়া তুলসীমঞ্চে জল দিতে যাইতেছিলেন এমন সময় হরনাথ ও দীপককে লইয়া ভিতরে আসিয়া ঘনশ্যাম বলিল, "—মা, বড়মার বাবা ও আমাদের দাদাবাবু এসেছেন"। দীপক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বিমলাকে সে কখন দেখে নাই, বিমাতা রাক্ষসীর নামান্তর ছোট বেলা হইতে ইহাই সে মামার বাড়ীতে শুনিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজ সেই বিমাতার এই ম্লান শোকের মূর্ত্তিখানি নিজ চক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার পর বিষাদের সে নিশ্চল মূর্ত্তির ভিতর কোথাও এতটুকু রাক্ষসীত্ব খুঁজিয়া পাইল না। সে বিমলার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া "মা" বলিয়া প্রণাম করিতেই ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

হরনাথ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"দীপু, ও কি হচ্ছে, কাঁদবার ঢের সময় আছে—ওঠ এখন কাজের সময়। নিজের বিষয় বুঝে নিয়ে তারপর যত পার কেঁদ।"

বিমলা আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—"থাক্, থাক্, বিষয় বুঝে নেবার যথেষ্ট সময় আছে; আজ ও:ক একটু কাঁদতে দিন বাবা। ওরে দীপু, মরবার আগে সুধু তোর নামই করেছিলেন, যদি তখন একবারটী আসতিস্ বাবা। হাঁরে দীপক, বিমাতা এতই শত্তুর রে?" তাহারও দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। তরুণ দীপক যেন তাহার মৃত স্বামীর একখানি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

বিষয়ী হরনাথের কাছে এ মিলনের ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকিল না, তিনি দীপকের হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন—"কিন্তু ও ত তোমার বক্তৃতা শুনতে আসেনি মা, ও এসেছে ওর বাপের বিষয় বুঝে নিতে।"

ঠিক এতখানি নীচতা এত অল্প সময়ের ভিতর বিমলা আশঙ্কা করে নাই। অত্যন্ত তেজী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া চিরদিন তার একটা অখ্যাতি ছিল, তাই সে-ও দৃঢ়কণ্ঠে কহিল —"কিন্তু বিষয় ত দীপুকে তিনি কিছুই দিয়ে যান নি রায় মশাই, তিনি ত ওকে ত্যাজ্য পুত্তুর করে গেছেন।"

পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত না হওয়াতে একটা নিদারুণ লজ্জায় দীপকের সমস্ত মনটা যেন ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে লজ্জা যে কত কঠিন তা এই পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটার মধ্যে প্রবেশ করার পর হইতেই সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল, কিন্তু রায়মশাই হটিলেন না। একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"কিন্তু সেইটেই ত আমরা জানতে চাই মা, উইলটা কি সত্যই তিনি করেছেন, না—"

বিমলা কথাটা শেষ করিতে দিল না—স্নেহের সহিত কহিল—"আপনার সন্দেহ ভঞ্জনটা পরে হ'লেও চলতে পারে, এখন ত স্নানাহার করে ছেলেটাকে ঠাণ্ডা হতে দিন।"

২

বিষয়ের মোহ হরনাথকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ বর্ষের দীপককে তাহা স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাই আহারান্তে পিতার ঘরটীতে শুইয়া সে একমনে কত কথাই ভাবিতেছিল। জীবনে মাকে সে কোনদিন দেখে নাই—মাতৃস্নেহ সুধু সে শুনিয়াই আসিয়াছে। আজ প্রভাত হইতে এই মায়াপুরীতে প্রবেশ করিবার পর হইতেই তাহার অন্তরাত্মা যেন এক অজানা ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। আজ মধ্যাহ্নে তাহার খাইবার সময় বিমলা যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হাঁ দীপু, আমাকে বুঝি তোমার ভাল লাগে না?" তখন সে থতমত খাইয়া কোন জবাব দিতে পারে নাই, কিন্তু দরদীর হৃদয় দিয়া বুঝিয়াছিল যে এক পতিপুত্রহীনা নারী তাহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা লইয়া দুটী উদ্যতবাহু তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই যে মাতৃস্নেহরস সে কোনদিন পায় নাই, যাহা সে কোনদিন পাইবার আশাও রাখে নাই, সেই স্নেহরসটুকু তাহাকে মন্দাকিনী-ক্ষীরধারার মতই সিক্ত করিয়া দিয়াছিল। আজ এই নির্জ্জন কক্ষের সমস্ত ইট কাঠগুলিও যেন তাহার কাছে অতি প্রিয়, অতি পরিচিত, অতি পবিত্র মনে হইতেছিল। তাহার মনে পড়িল—আচমনের জলটুকু হাতে ঢালিয়া দিতে দিতে বিমলা বলিতেছিল—"বাস্তুভিটা স্বর্গ, পিতৃগৃহ তীর্থ; আমার বাড়ী যতই আদরের হোক, এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই বাবা।" তখন সে অভিমান করিয়া জবাব দিয়াছিল—"কিন্তু এই বাস্তুভিটায় ত আমার থাকবার জায়গা নেই মা, আমি ত বাবার ত্যজ্যপুত্র।" বিমলা আবেগে বলিয়া উঠিয়াছিল—"কিন্তু বাপের ত্যজ্য বলে তুই কি মারও ত্যজ্যপুত্র হবি দীপক? আমার কে আছে বাবা? এই যক্ষপুরী আগলে আমি আছি কিজন্যে? কবে তুই এসে আমায় মা বলে ডাকবি এই আশাতেই না? বিষয়টাই বড় হল দীপু, আর মা কি কেউ নয়?" আজ এই কথাগুলিই যেন তাহার কানের কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। পিতাকে সে হেলায় হারাইয়াছে, নিজের মাকে সে চক্ষে দেখে নাই, কিন্তু আজ যে মাকে সে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইল তাহাকে সে হারাইতে পারিবে না। মাথার বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৩

এদিকে সারাদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া হরনাথ নালিস করিবেন স্থির করিলেন। অপরাহ্নে দীপকের ঘরে আসিয়া কহিলেন, "বিপদে ধৈর্য্য ধরাই মানুষের কাজ দাদা, কৈলেস চাড়ুয্যে ত কম বিষয় রেখে যায়নি, সে বিষয় ফিরিয়ে আনতে আমায় যদি সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় সেও ভাল। এখন চল উকিলের পরামর্শ নেওয়া যাক্।" দীপক এক ভাবেই শুইয়াছিল সে কোন উত্তর না দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

দিগন্ত রাঙাইয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। তাহারই শেষ রশ্মিটুকুর সঙ্গে বিমলা দীপকের ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি কাগজ দীপকের হাতে দিয়া কহিল—"এই নাও দীপক, তোমার সমস্ত বিষয় এতে তোমার নামে লেখাপড়া করে দেওয়া আছে।"

দীপক কাগজখানা বিমলার হাত হইতে লইয়া ধীরে ধীরে হরনাথের হাতে দিয়া কহিল, "এই নিন দাদা, আপনি ফিরে যান। আমি এখানেই রইলুম।"

নারী

শ্রীমতী আশালতা দেবী

সেদিন হাতের কাছে কোন কাজ ছিল না এবং বৈশাখের অপরাহ্লকাল মেঘাবৃত হ'য়ে উঠেছিল। এমনই ব'সে একটা বাঁধান প্রবাসীর পাতা খুলে দেখছিলুম, নারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা চোখে পড়ল। এটা আমি প্রথম যখন হাতে পেয়েছিলেম অভিনিবেশ করে দেখেছি, অথচ এখনও না পড়ে ছাড়তে পারলুম না। আমাদের বাড়ীর সম্মুখের একটা অশ্বত্থ গাছের শাখা প্রশাখা কেবলই অন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌চে এবং ঘন মেঘে পূর্ব্ব আকাশের সমস্তটা স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠেচে। সেই দিকে চেয়ে অনেক কথা মনে হোল। কিছুকাল আগে 'একটি সমস্যা' বলে এক প্রবন্ধে একজন লেখক কোন য়ুরোপীয় তরুণীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে বসে স্ত্রীলোকের coquetry নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আজ দেখলুম রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন "মেয়েরা যে রহস্যময় আকর্ষণে পুরুষকে কাছে টানে তাকে ইংরেজীতে বলে charm, বাংলায় তাকে বলা যেতে পারে হ্লাদিনী শক্তি।" হায় নারী, তোমার যে সকল কার্য্যকলাপের উপর তুমি অপ্রকাশ্যতার আবরণ টানিতে চাও, বর্ত্তমান কালের যুক্তি এবং সাইকো-এনালিসিসএর বানে তাহারা বিখণ্ড হইয়া যাইতেছে। তা যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু আবরণ যখন যাবার উপক্রম হয়েচে তখন তাকে ভালো রকম করে যাবার সুযোগ দেওয়াই প্রয়োজন। কোনখানে রহস্যাবেশের লেশ যেন অবশেষ না থাকে। এই দুইজন লেখক, যাঁদের আমি উল্লেখ করলুম, তাঁদের দ্বারাই আলাপ আলোচনা হয়েছিল ীলোকের coquetry কখনও তার charm নয়। কারণ হ্লাদিনী শক্তিকে স্ত্রীলোকের হেয় coquetryর সহিত এক আসন দেওয়া যায় না। তা যদি না যায় তা হ'লে coquetry কি? সেইটের ভাল করে পরিচয় দেওয়া দরকার। লোক স্ত্রীলোকের সহিত মোহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেনা, তারা পরস্পরে জানে যে তাদের দুজনের দৃষ্টি স্বচ্ছ, সেখানে মেঘলোকের আভাস অবধি নেই। তারা উভয়ের সাহচর্য্য কামনায় গভীর কিছুই প্রত্যাশা করেনা, কেউ কাহাকেও ভালবাসেনা এবং একজন আর একজনকে নীরবে সমালোচনা করচে। কিন্তু স্ত্রীলোকে যখন পুরুষের সংস্পর্শে এসেচে তখন অসংশয়ে অনুভব করেছে এখনকার দৃষ্টির মাঝে স্নেহ আছে মোহ আছে উত্তপ্ত যৌবনরঞ্জিত আবেগ রয়েচে। মানুষ যেমন করে প্রত্যাশা করে তার প্রত্যাশার দান তেমনি করে তার কাছে আসে। নারী যখন দেখে পুরুষে বরঞ্চ আবেগের ভিতর দিয়ে অতিশয়োক্তি করে ঠকতে রাজী রয়েচে কিন্তু অহোরাত্র সুতীক্ষ্ণ বিচারভারে তাদের দৃষ্টির আবেশ এবং মাধুর্য্যটুকু নিঃশেষ করতে চায়না, তখন তার ভিতরকার নারী-প্রকৃতি নিজের থেকে তার মাঝে যেখানে যেটুকু অসুন্দরতা রয়েচে তাকে গোপন করে হাস্যে বাক্যে পরিপাটি কর্ম্মকুশলতায় বিস্রস্ত অঞ্চলপ্রান্তে একটি বিশেষ মাধুর্য্যকে প্রকাশ করতে বসে। একজনের কাছে আর একজনের অস্তিত্বকে মধুর করে ব্যক্ত করবার আকাঙ্ক্ষায় তার ভিতর যদিচ কোনখানে সামান্য অসঙ্গতি এসে পড়ে, যদি বা কোথাও বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষের মাঝে একটু অধিক তীব্রতা থাকে, কেশপাশের সৌরভ স্বাভাবিক মৃদুতাকে অতিক্রম করে যায়, বসন-প্রান্তের যতটুকু বায়ুভরে বিচ্যুত হ'লে সহজ হ'য়ে প্রকাশ পেত তার চেয়েও স্খলিত হয়ে পড়ে, তাতে কি হয়েচে? কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাটাই যে বড়ো। নারী যে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে তার অস্তিত্বের মাধুর্য্যকে নিরন্তর ব্যক্ত করতে চাইছে, পুরুষের মনোবৃত্তির কাছে এইটে কি কম প্রাপ্তি? অবশ্য coquetry নিয়ে আরও অনেকদিক থেকে অনেক দেখান যেতে পারে এবং তাকে যে বিস্তর অসুন্দরতার ভিতর দিয়েও বিশ্লেষণ করা যায় তাও সত্য। কিন্তু আমি বলতে চাইছিলুম হ্লাদিনী শক্তিটা তাহলে কি? আমার ত মনে হয়

এ ছাড়া কিছুই নয়। মনোজগতে মিলের সুর খুঁজে পাওয়া, স্ত্রীলোকের মানস সৌন্দর্য্যকে উত্তেজিত করে তুলবার বিশেষ ক্ষমতা কোনটাকেই আমি অস্বীকার করচিনে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন তার বন্ধুর সঙ্গে বিজ্ঞান নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তখনও সে গভীর মানসিক আনন্দ পায়, অথচ এক জন সংযত এবং চিন্তাশীল স্ত্রীলোক যদি তাঁদের আলোচনায় যোগ দান করেন তা'হলে জিনিষটা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, এই কথাটা আধুনিক কালের অনেকেই জোর দিয়ে বলচেন। এইখানে বলা যায় নারীলাবণ্যে পুরুষের চিন্তাশক্তি এবং কর্ম্মশক্তি দ্বিগুণতর হ'য়ে ওঠে, তাই তাঁর আসায় আলাপ আলোচনা আরও নিবিড় হবার অবকাশ পায়। অথচ ব্যাপারটা ঠিক যে তাই তা নয়। তখন স্ত্রীলোক তাঁর বিজ্ঞান আলোচনার ভিতর দিয়েও নিজের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যকে নানা আভাসে গুঞ্জনে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেন। সেই অতি-সুকুমার প্রচেষ্টা অতিশয় প্রকাশ্য না হ'লেও এসব স্থানে একটুখানি অপ্রকাশ্যতার প্রভাব যে বিন্দুমাত্র কম নয় সেটা আধুনিক কালের অনেকে নিশ্চয় বোঝেন। এবং পুরুষেও তার সমস্যালোচনার ভিতর দিয়ে তার ভিতরকার যা কিছু উচ্চ ও যা কিছু সুন্দর নারীর সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতে চায়। পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে যখন তার কথোপকথন হয়, তাদের তখনকার আলোচনাকে দুটো মূর্ত্তিমান থিওরি পরস্পরকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখচে এ সংজ্ঞাও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নারীর অভ্যাগমের সহিত তাদের মধ্যকার যে পুরুষ প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে, রহস্যে, ভাবে অনির্ব্বচনীয় হয়ে রয়েচে সে তর্কালোচনা করেও নিজের এই বিশেষ সত্ত্বাকে কথায়, স্মিতহাসিতে, নয়নপ্রান্তের স্নিগ্ধ-ছায়ায় স্ত্রীলোকের অনুভবগম্য করে তুলবার জন্য ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে থাকে। এ চেষ্টাটা উভয় পক্ষেরই। এই জিনিষটা যে কত ভালো তার তুলনা হয় না। আমাদের মধ্যে ইম্পার্সোনাল সমস্যা-নির্ণয় বাদ দিয়ে যে একটি ব্যক্তিগত মানবসত্ত্বা রয়েচে তার আবেগ-স্পন্দিত সৌন্দর্য্যকে যখন কাজে কথায় জ্ঞানস্পৃহা এবং সাহিত্য আলোচনার ভিতর দিয়েও ফুটিয়ে তুলতে পারি এবং এমন করে বিচ্ছুরিত করতে পারি যাতে সে অনেকের অনুভবগম্য হয়ে ওঠে, তখন আপনাকে বিশেষ সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারচি এরই উত্তেজনায় নিজেও অপরিসীম আনন্দ পাই, এবং আমাদের সংস্পর্শে অপরকেও আনন্দ দিতে পারি। কিন্তু সুধু নারীলাবণ্য নয়। স্ত্রীলোকেও পুরুষের কাছে এই জিনিষই দাবী করতে পারে। পরস্পরের কাছে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, এবং চেষ্টা করেও নিজেকে মধুর করে প্রকাশ করবার কামনা এইটেই পুরুষের ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত এবং উদ্বোধিত করে এবং নারীকেও বিশেষ তৃপ্তি দেয়। অথচ এমন বিপজ্জনক কথা বলাও উচিত নয়। তরুণ এবং তরুণী যখন একত্র হয় তখন তাদের বক্ষস্পন্দন এত দ্রুত হয়ে ওঠে, তাদের ভিতর এমন প্রবলতার সৃষ্টি হয় যে কোথায় গিয়ে তারা থাম্‌বে? তাদের পরস্পরের মানসসৌন্দর্য্যকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা কতদূর নিয়ে গিয়ে নিরস্ত করতে হবে এসব কি স্পষ্ট করে স্মরণ থাকে? এইখানেই হয়ত একটুখানি ভাব-বার রয়েচে। আবেগ জিনিষটা ভালো, কিন্তু সংযত আবেগ তার চেয়েও ভালো। স্ত্রীলোক এবং পুরুষের মাঝে যে একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে অস্বীকার না করেও সংযত ব্যবহারের ভিতর দিয়ে অপরিসীম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যায়। এজন্য স্ত্রীলোকের manly হবার প্রয়োজন নেই। যা স্বাভাবিক তার ভিতর যে সহজ শ্রী রয়েচে, কোন কারণেই তাকে বিসর্জ্জন করতে বসলে ভালো ফল হয় না। কিন্তু পরস্পরকে সংযম এবং সঙ্গতিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করতে হবে। Traditional moralityর উপর আমার এতটুকু স্পৃহা নেই। বর্ত্তমানকালে জোর করবার দিন চলে গিয়েছে। মানুষ স্বতঃউৎসারিত ভাবে যেটুকু পায় তাকেই সে যখন আবিষ্কার করে নেয় তখন বাইরেকার কোন জোর কোন দাবী সে স্থান পূর্ণ করতে পারে না। Traditional moralityর স্থান যদি artistic temperament দিয়ে পূর্ণ হয় তাতে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, অথচ জীবনে মাধুর্য্য অনেক বেড়ে ওঠে। সৌন্দর্য্যশীল মনোবৃত্তি কাকে বলে, কি তার নিয়ম-বিধান খুব স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া যায়না বটে, কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতির উপর স্পষ্ট কথা এবং সুস্পষ্ট বিধি নিষেধ যে বেশি করে কাজ করে

শ্রীমতী আশালতা দেবী

এবং তার সংযত উচ্ছ্বাস, সৌন্দর্য্যের সঙ্গতিবোধ, এইদিকে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন কাজেই আসে না তা আমি মনে করিনে। অথচ সমাজ সংস্কার জিনিষটা যে কি পর্য্যন্ত বিপজ্জনক সে আমার জানতে বাকী নেই, তা ছাড়া ও ভালও লাগে না। আমি সুধু বলছিলুম বাইরেকার মোটা হিসেব বাদ দিয়ে artistic temperament যদি traditional moralityর স্থান গ্রহণ করে তা হ'লে মানসিক রাজ্যে ফল আরও ভালো হয়। আবেগের দ্বারা বিপর্য্যয় ঘটতে পারে বলে যদি মনোলোক থেকে কেহ আবেগ বর্জ্জন করবার প্রস্তাব করে, তাতে তার প্রকৃতির পূর্ণবিকাশ কিছুতেই হবে না। আবেগ বাদ দিয়ে মানুষের চিত্তবৃত্তির refinement যাকে বলা হয় অন্তঃপ্রকৃতির উপর একটু সুকুমার লাবণ্য, সেইটে পাওয়া অসম্ভব। যারা অনুভব করে বেশি এবং সংবরণ করে বেশি তারাই যথার্থ সংযত। আর্টের মাঝে যেটা সবচেয়ে সুন্দর সেটা এই বস্তু। এবং আর্টিষ্টিক টেম্পারামেণ্ট ব'লে কথাটার অর্থবোধ এইদিক দিয়েই বুঝবার পথ রয়েচে। শব্দার্থ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা যায় না। অনুভবের আতিশয্যে উত্তেজনা ঘটবার সম্ভাবনা রয়েচে বলে যেখানে মানুষের প্রকৃতির অনুভবের অংশটা সুধু রাখবার বিধি রয়েচে, এবং তাকে যৎপরোনাস্তি শক্ত করে মুহ্যমান করে তুলবার ব্যবস্থা আছে সেখানে সংযম এবং সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি অসম্ভব। যেটা সৃষ্টি হয়ে ওঠে সেটা অনাবশ্যক অসৌন্দর্য্য। কিন্তু আমি একটু প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি। প্রবাসীর সেই নারী বিষয়ে আলাপ আলোচনায় ছিল "পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষ প্রকৃতি বিকাশের অনুকূল সেই নারীশক্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ভাবেই আছে। সেখানকার পুরুষদের উদ্যমশীল করে রেখেছে।" তারপর প্রশ্ন উঠেচে—কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, রোম এবং ভারতবর্ষে পুরুষের কর্ম্মশক্তি দুর্ব্বল ছিলোনা এবং নারীকিরণও সমাজের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে ছিলনা। এর কারণ নির্দ্দেশ হয়েছে, তা ছিল না বটে, কিন্তু তখন একশ্রেণীর মেয়ে ছিলেন যাঁদের কাজ ছিল আলাপ আলোচনার তরঙ্গ তুলে পুরুষের মানসিক রাজ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করা। সেই শ্রেণীর মেয়েরা সমাজের দায়িত্ব স্বীকার না করেও সতর্কভাবে তাঁদের সম্ভ্রম রক্ষা করতেন এবং স্ত্রীলোকের হ্লাদিনী শক্তি তাঁদের মাঝে বিশেষ করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাধারণ পণ্য স্ত্রীদের সহিত তাঁদের তুলনা করে বিচার করলে ভুল করা হবে এবং তারপর মৃচ্ছকটিক নাট্য অবলম্বন করে বসন্তসেনা এবং চারুদত্তের পরস্পরের সম্বন্ধের ভিতর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উল্লেখ রয়েচে। কিন্তু হ্লাদিনী শক্তি কথাটা উপমা। আমাদের অনেক বৈষ্ণব পদাবলী এবং কাব্য আশ্রয় করে ওই কথাটার চারিদিকে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য রচনা হয়েছে। কিন্তু প্রথমে আমি বলেছিলুম নারীর অপ্রকাশ্যতার আবরণ যখন চ্যুত হয়ে পড়চে তখন তার চারিপাশে উপমার ভিতর দিয়েও একটা অস্পষ্ট মাধুর্য্যের অন্তরাল না রেখে যুক্তির দ্বারা সহজ ক'রে বল্‌লে এইরকম করে বলা যেতে পারে concubinage জিনিষটা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে রয়েচে কিন্তু এখন আমাদের দৃষ্টিতে অশ্রদ্ধা কেমন করে ঘনিয়ে এসেচে। অসামাজিক প্রণয় কেবল কাব্যলোকে স্থান পেয়েছে কিন্তু বাস্তবজগতে তার হীনতার শেষ নেই! তখনকার কালে এরই ভিতর হয়ত মাধুর্য্যের অভাব ছিলোনা। এবং পুরুষেরা অশ্রদ্ধা করে চাইত না বলে বড় করে পাবার সুযোগ পেত, এবং স্ত্রীলোকেরাও নিজেদের উপর বিতৃষ্ণা করার গ্লানির ভারে প্রতিদিন নীচে নেমে যেতনা, তারা অপ্রতিহতভাবে তাদের দূরত্ব এবং সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখত, এমনকি গ্রীকদৃষ্টিতে নারীর স্থান বলে একটা লেখায় রয়েচে

"There were temples in honour of the goddess of illicit love and statues were erected of famous courtesans—"

কিন্তু এই সব কথার এতই সহজে মীমাংসা হয়ে যায় না। সমাজের স্বাভাবিক আবেষ্টনী থেকে বের করে নিয়ে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের মানসিক সৌন্দর্য্য সতেজ রাখবার কাজ যে খুব পরিপূর্ণ করে শেষ হয় তা বলে ত আমার মনে হয় না। প্রেম, আর্ট, চিন্তা এই সব জিনিষেরও সর্ব্বব্যাপ্ত গভীরতা সকল সময় একই রকম থাকে না। তাদের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত রয়েচে, তারা কখন যে অতর্কিত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এবং তারপর তাকে ঠিক সেই রকম প্রবল করে

অনুভব করা যায় না। এই জন্যে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্যে প্রেমই যথেষ্ট নয়, তার একটা common-life সন্তান এ সমস্তই আবশ্যক করে। এবং আর্ট নিয়ে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের পক্ষে কেবলই কল্পলোক নিয়ে কারবার করার চেয়ে বাস্তবদিকের একটা সুস্থ স্বাভাবিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ক্ষণকালের নিমেষগুলিকে একটা সংলগ্ন এবং দৃঢ় আশ্রয় দেবার জন্যেই এইটে দরকার হ'য়ে পড়ে। সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোক যখন একান্ত স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেন, তাঁর কোনখানে কোন কৃত্রিমতার আভাস অবধি থাকে না, তখনই মনের দিক থেকে তাঁদের সাহায্য পাবার কামনা, তৃপ্তি হবার সবচেয়ে সংযত ও মধুর পথ সহজ হ'য়ে আসে। আর্ট এবং প্রেমের ক্ষেত্রে ওই যে কথাটা আমার ঠিক বলে মনে হয়েচে স্ত্রীপুরুষের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও এই প্রয়োজন। সমাজের ভিতর বাস্তব দিক থেকেও তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা উন্মুক্ত এবং সহজ যোগ বন্ধন থাকা আবশ্যক। এইটেকে আশ্রয় করেই মানসলোকের সৌন্দর্য্য সৃজনের সহায়তার কাজটা অনায়াসে এবং আত্মবিস্মৃতভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে।

এক বিন্দু অশ্রু

—শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

এক বিন্দু অশ্রু ওই চোখের পাতায়
তোমারে কাঁদায়ে দিল একান্ত আপন
আমার মর্ম্মের মাঝে; অতি সঙ্গোপন
সদ্য পরিচয় আজ তোমায় আমায়।

ঝলে যেন ইন্দুলেখা কালো দীঘি জলে,
একা সন্ধ্যাতারা কাঁপে মেঘল আকাশে,
হৈমন্তী শিশির-কণা-তৃণ শীর্ষে ভাসে
হাসে শুভ্রা সুকৃষ্ণার স্থির উৎসতলে।

ওই অশ্রু দর্পণেতে ফেলিয়াছে ছবি
অনাগত মাতৃব্যথা; আকাঙ্ক্ষার ভয়;
তব সর্ব্ব দেহমন করি দীপ্তিময়
বাজে কৈশোরের বেলাশেষের পূরবী।

কণ্ঠের ভাষায় যাহা ছিল অপ্রকাশ
চোখের ভাষায় তার কাঁপিছে আভাস।

গল্পের ছাঁচ

—গল্প—

—শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

আমাদের সান্ধ্য আড্ডার অধিকারী, গলির মোড়ের হরিশ বাবুর ভিতর অনেকগুলি দোষগুণের সমন্বয় হয়েছিল। অর্থ স্বাচ্ছল্য থাকলে মানুষের অনেক খেয়ালই শোভা পেয়ে যায়, তাই হরিশ বাবুর খেয়ালের কোন নিরিখ ছিল না। আমাদের মজলিসে অবিরাম চা, পান ইত্যাদি সরবরাহের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে গিয়ে আরো গোটাকয়েক জিনিষ মান্য করে চলতে হ'ত। সমস্ত দিন অফিসের খাটুনির পর ঘরে অভাব অভিযোগের হাত থেকে ত্রাণ পাবার এই আড্ডাটির মত ওযুধ ছিল না, তাই সময়ে অসময়ে সাহিত্যসেবা, গান প্রভৃতির হাওয়া এলে রাত দশটা বাজা পর্য্যন্ত বাহবা দিতেই হ'ত। হরিশ বাবু নিজে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন না, কিন্তু সে অভাব পূর্ণ করেছিল পাড়ার একটি শিক্ষিত অথচ স্বভাববেকার ছেলে। হরিশ বাবুর অর্থ সাহায্যের এবং প্রসাদ বিতরণের তালিকায় তার নাম ছিল। হুকুম মত লেখা সে লিখত, আর আমরা নানা রকমে দেহ এলিয়ে সেই লেখা শোনবার চেষ্টা করতুম। হরিশ বাবুর দোষের মধ্যে তিনি ছিলেন ভারী অসহিষ্ণু, আর সময়ে সময়ে তাঁর বাক্‌সংযম থাকত না। এ ছাড়া তিনি মানুষটা নিতান্ত মন্দ ছিলেন না।

সন্ধ্যার সময়েই যখন হরিশ বাবুর চাকর তাড়াতাড়ি মজলিশে যাবার তাগিদ দিয়ে গেল, মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল—ধুত্তোর, আবার গল্প! ছোট ছেলেটি অনর্গল কি বলছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে পাংশু মুখে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

আমাদের নভেলিষ্ট চারু ছোকরা নেহাৎ মন্দ ছিল না, কিন্তু ভারি জ্বালাত এই গল্প লিখে। সেদিন যখন পৌছলুম, গল্প সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে—

পরেশ থাকত এক পাড়াগাঁয়ে। নায়কের যা থাকা উচিত, দেহে অর্থাৎ—রূপ, শরীরে শক্তি, মগজে বুদ্ধি, ব্যাঙ্কে টাকা আর মধ্য রকমের এক জমিদারী—পরেশের এ সবই ছিল। বাপ বেঁচে থাকলে সব সময়ে এই স্বাধীনচেতা নায়কের সুবিধা হয় না। কারণ বাপগুলো নিজেদের মত আঁকড়ে ধরে থাকবার সময় নেহাৎ একগুঁয়ে হয়ে থাকে, তাই পরেশের বাপ ছিল না। মাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কেননা মা উদারমতাবলম্বিনী অর্থাৎ পরেশের ইচ্ছায় বাধা দেবার তাঁর শক্তি ছিল না।

ভূমিকাতেই বাধা দিয়ে হরিশ বাবু বল্লেন—"তোমার পরেশ কোন জাত হে?"

"আজ্ঞে ব্রাহ্মণ—বাঁড়ুজ্যে।"

"গোড়াতেই ব্রহ্মহত্যা করলে বাপু, যাত্রাটা শুভ হল না।"

"আজ্ঞে শুনুন" বলে চারু পড়তে আরম্ভ করলে :—

পাশের বাড়ীতেই থাকত একটি মেয়ে, চেহারাটা তার ছিল মন্দ নয়, বয়স ছিল দশ কি বারো, কিন্তু এই বয়সেই সে প্রেমের মর্য্যাদা বুঝেছিল। নায়ক ছেলেবেলা থেকে প্রেমে পড়তে শিখলে, ভবিষ্যতে বড় রকম প্রেমে পড়বার সময় পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে, কাজেই পরেশ বিমলার প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু প্রেমের নিদর্শন তেমন বিশেষ কিছু পাওয়া যেত না। পরেশ তাকে সুবিধামত ডাঁসা পেয়ারা, পাকা কুল ইত্যাদি পেড়ে খাওয়াত, কারণ পেয়ারা অথবা কুল গাছের তলায় ছেলে বেলায় কেউ প্রেমে পড়েনি এমন কথা কোন নায়কেই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেনা। বিমলার ভালবাসা প্রকাশ পেল হঠাৎ একদিন পরেশের মুখে সাবান মাখিয়ে দিতে, তা সাবানটা সাজির ডেলা কি সুনলাইট্ কিছুই বোঝা গেল না। সেইক্ষণ থেকেই পরেশের মনের শাদা কাগজে কে প্রেমের লাল কালী ঢেলে দিলে—

হরিশ বাবু তাঁর তাকিয়া থেকে গর্জ্জন করে উঠলেন—"উপমাটা কি রকম হল শুনি?" জবাবটা দিলেন আমাদের

পণ্ডিতজ্ঞা, বল্লেন—"কাল কালী ঢাল্‌লে কাগজ মলিন হ'য়ে যায়, তাই তুলনাটা ঠিক খাপ খেয়েছে। ফর্সা মুখে রাঙা ঠোঁট না ভাল লেগে কি দাঁতে মিশি ভাল লাগে বাবাজী?" হরিশ বাবুর তৃতীয় পক্ষ শুনেছিলুম শুক্লবর্ণা, উপমাটা বোধ হয় অন্তরে উপলব্ধি করে বল্লেন, "এগিয়ে পড় চারু।"

এর কিছুদিন পরে বিমলার বিয়ে হয়ে গেল আর এক-জনের সঙ্গে; দুজনের কারো তাতে বুক ফাটতে দেখা যায় নি, বরং পরেশ খুসি হয়েই নেমন্তন্ন খেয়েছিল। কিন্তু পরেশ গ্রামের স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে গোঁফের রেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিন বুঝে ফেল্লে সব নায়কের যেমন নায়িকা বিহনে হৃদয় মরুভূমি হওয়া উচিত তারও তাই হয়েছে। তার মা কিন্তু তাকে এসব ভাবতে না দিয়ে কোলকাতায় পড়তে পাঠিয়ে দিলেন।

বিমলা সধবা থাকলে গল্প চলে না, তাই বিমলার স্বামী তাকে বৃহত্তর প্রেমের ক্ষেত্র দেবার জন্য হঠাৎ মারা গেল। বিমলা পিতৃগৃহে ফিরে এল এবং বিধবা হলে যতটা কাঁদা উচিত সে কিছু কম কাঁদলে না, বিশেষ করে পাড়া-গেঁয়ে মেয়েরা যখন একটু ঘাটবাট ছাপিয়ে বেশী চীৎকার করেই কাঁদে। কৈশোরের ডাঁশা পেয়ারার প্রতি টানের চেয়ে যৌবনের প্রেম যে বেশী করে বিমলাকে কাতর করত এ কথা জানা যায় নি, কিন্তু বিমলা ঘরের বাতায়নেই হোক আর ঘাটের চাতালেই হোক আনমনা হ'য়ে ব'সে থাকত। এমনি এক দিনে পরেশ গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী এল এবং এক নির্জ্জন সন্ধ্যায় পুকুর ধারে বিমলাকে দেখতে পেলে। পাড়া-গাঁয়ে পুকুর ধার না হ'লে কিছু হবার জো নেই; না হয় মেয়ে-দের দুপুরের মজলিস্, না হয় আর কোন কাজ, এমন কি পুকুরধার না হ'লে ভূত পেত্নীগুলোও মানুষের ঘাড়ে সুবিধা করে চাপতে পারে না। তাই ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশের পোড়ো পরেশ বিমলাকে একলা পেয়ে তার মুখের দিকে খানিক পিপাসু নেত্রে চেয়ে থেকে হাত দুটি ধর্‌লে—

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জনের মত হরিশ বাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—

"চেরো?"

"আজ্ঞে"

"হতভাগা, বখাটে বেল্লিক, এই সন্ধ্যা রাত্রে তুই ব্রাহ্মণের বিধবা কচি মেয়ে একটা বাঁদরের হাতে তুলে দিলি? ও হবে না বলছি, বুঝলি?"

"যে আজ্ঞে" বলে চারু পড়তে লাগল—

পুরোনো অভ্যাস বশেই পরেশ বিমলার হাত ধরেছিল, বিমলা চকিতে হাত সরিয়ে নিয়ে পরেশকে প্রণাম করলে, তারপর দু'একটা কথা ক'য়ে দুজনেই বাড়ী গেল।

কিছুকাল পরে পরেশ এফ, এ পরীক্ষায় একেবারে ফার্ষ্ট হল, সেকেণ্ড হল না, কারণ গল্পের নায়ক সব দেশেই অজেয় হয়ে থাকে, ভাবটা যেন

আমি মারিলে মরিনা,
কাটিলে কাটিনা,
আগুনে পুড়িনা ভাই,
আমি নভেল নায়ক
মারিলে মরিনা তাই—

এখন বাবু চোখ রাঙালে কি করব বলুন? পরেশ এবার বাড়ী এসে বিমলাকে দেখে আর থাকতে পারলে না, একেবারে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল, এমন কি তার মাকেও জানালে এই বিয়ে না হ'লে তার হৃদয় শ্মশান হ'য়ে যাবে।

আমরা সভয় নেত্রে হরিশ বাবুর দিকে চাইলুম। তিনি গুম হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ ইংরাজী নবীশ কনক বাবু বলে উঠলেন, "এতে আর বাবুর ক্রোধের ভয় করছ কেন চারু, সায়েবদের দেশে এমন আকৃসার ত ঘঠ্‌ছে!" হরিশ বাবু কনক বাবুর বিলেতী নজিরগুলো বেশ মেনে চলতেন, তাই বেচারী চারু সে যাত্রা বেঁচে গেল।

গল্প চলতে লাগল—

মার মত না পেয়ে পরেশ পাগলের মত এক ছুটে ষ্টেশনে গিয়ে রেল চেপে একেবারে কোলকাতা গেল। মনের আগুনে পুড়তে পুড়তে সে সন্ধ্যায় গোলদীঘি গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে ভগবান পরেশের এক বাল্যবন্ধু মিলিয়ে দিলেন; পরেশের হতাশ প্রেমের করুণ কাহিনী শুনে সে পরেশের এই বিপুল দুঃখ নিবারণ করতে প্রতিশ্রুত হ'ল। এই গোলদীঘিতে পরেশের দুঃখ মিটবে এমন আর কি কথা, এখানে টহলরাম, বিপিন পাল, সুরেন বন্দ্যো, চিত্তরঞ্জন দেশের দুঃখের

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

সমাধানের পথ খুঁজেছেন, এখানে ধর্ম্ম প্রচারকেরা কত অভিশপ্ত জীবের দুঃখ নিবারণ করতে রোজ ভাঙা গলায় চীৎকার করেন। বিধবার প্রেমে প'ড়ে তাকে পাবার রাস্তা যে এখানেই মিলতে পারে তার ত পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্ছে বিদ্যাসাগরের মর্ম্মর মূর্ত্তি! পরেশ বন্ধুর সঙ্গে মনের প্রলেপের সন্ধানে এক বিদুষী বারনারীর ঘরে গিয়ে উঠ্‌ল; যে হেতু যত ভাল ভাল বইয়ে দেখা যায়, হতাশ প্রেমিকের একমাত্র পরিণতিই এই।

যার বাড়ী পরেশ বন্ধু নিয়ে উপস্থিত হ'ল নামটি তার নীলা, চেহারাটি সত্যিই বেশ, যেন ছবিখানি। ছিপছিপে দেহটি, মুখখানি যেন গোলাপী পাথর কুঁদে বার করা, চোখ দুটির দৃষ্টি দর্শকের অন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'রে স্পর্শ করে। নিকষকালো চুলের ওপর লাবণ্যে ভরা ঢলঢলে মুখখানি যেন প্রাবৃটের কাজল মেঘের বুকচেরা এক ঝলক বিদ্যুতের জ্যোতি।

পরেশের বিমলার প্রতি টান্ এই প্রথম দর্শনেই পট্ করে ছিঁড়ে গেল। সে যে ওষুধ খুঁজছিল নীলা তা' হোয়াইট সীল মার্কা বোতল ভ'রে ভ'রে তাকে খাওয়াতে লাগল। কিন্তু কিছুকাল থেকে নায়কদের একটা ফ্যাসান দাঁড়িয়ে গেছে যে নায়ক নায়িকাকে সময়ে অসময়ে অপমান, অবহেলা করবে, আর নায়িকা তাকে প্রাণপণে ভালবাসবে। পরেশ-নীলা ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তার-পর পরেশ রাত্রে অর্দ্ধমাতাল অবস্থায় বাড়ী এসে দেখলে তার মা এসেছেন। মা এসে সেই একটা রাত্রে খাবার আগলে বসেছিলেন, ঘরে বোধকরি আলোও ছিল, কিন্তু আধা মাতাল বলে পরেশ দেশলাই খুঁজতে লাগল। আধা মাতালটা কি, আমি ঠিক বলতে পারলু্ম না, কেননা বাবুর প্রসাদ যেদিন ভাল করে পেয়েছি সে দিন এই আধা-আধি রফার কোন ধারই ধারিনি।

হরিশবাবু এই সময়ে বলে উঠলেন—"ছুঁচো ব্যাটাকে শুধু খাওয়া চারু, বেটা তেজচন্দর হোয়াইট সিলের অপমান করে।"

চারু বল্লে, আজ্ঞে আমি ওর নেশা করাই বন্ধ করছি। মাকে দেখে পরেশের হ'ল অনুশোচনা, সে একদম মদ ছেড়ে দিলে। ছাড়বার সময় তার তিন বছরের ভাগ্নেটিকে মদের অপকারিতা সম্বন্ধে যা লেকচার দিলে রেডিওতে তা শুনতে পেয়ে পুসিফুট জন্‌সন আনন্দে তার চোখ উপড়ে ফেলে পরেশকে উপহার দিলে। নীলারও রিফরমড্ হবার সময় এল, সে কাশী গেল। কেরাণী, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার সকলেই যখন অ্যাপ্রেন্টিস্ খাটে নীলা সতী হবার জন্য অ্যাপ্রেন্টিস্ খাটবে এ আর বিচিত্র কি! নীলা দশাশ্বমেধ ঘাটে আঁচল পেতে ভিক্ষা আরম্ভ করে দিলে। তাতেও যখন সুবিধা হ'ল না, কোলকাতায় ফিরে এসে টাইফয়েড জ্বরে পড়ল, কারণ সে শুনেছিল টাইফয়েডে মানুষ একেবারে বদলে যায়। একুশ দিনের দিন জ্বর বিরামের সঙ্গে সঙ্গে নীলার নাম লোকে অহল্যা, দ্রৌপদী, তারার সঙ্গে একনিশ্বাসে উচ্চারণ করতে লাগল। নীলা মির্জাপুরে বাড়ী ভাড়া করলে।

হরিশ বাবু ঘন ঘন হাই তুলছেন দেখে চারু লজ্জিত হয়ে এবার একটু জোর গলায় পড়তে লাগল—

দেশে বিলাত ফেরতার এত ভীড় বেড়েছে যে, তাদের বাদ দিয়ে এখন গল্প লেখা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে, তাই কামিনী সেন ব্যারিষ্টারকে এই গল্পে টেনে নামাতে হ'ল। তিনি যখন ব্যারিষ্টার তখন রোজগারটা সিঙ্গি কিংবা সি, আর, দাশের সমতুল্য না হ'লে গল্প নেহাৎ গেরস্ত হ'য়ে পড়ে। সেন সাহেব বিলেত যাবার আগে লাবণ্যদেবীকে ভালবাসতেন কিন্তু বিলেত যেতে হবে আর প্রেমে jilted হ'বে না এ কোন ভদ্রগল্পে সম্ভব হ'তে পারে না। লাবণ্য বিয়ে করলেন আর একজনকে কিন্তু পূর্ব্বের ভালবাসা রইল, আর সেই দাবীতে তিনি সেন সাহেবের মা-মরা মেয়ে সমীরাকে মানুষ করে তুল্লেন।

নায়কের বাপ না থাকা সুবিধা বটে কিন্তু নায়িকার মা মরে গিয়ে অসম্ভব ধনী এবং খুব স্নেহপ্রবণ বাপ বেঁচে থাকা আরো সুবিধার। নায়কের অর্থ রোজগার করবার অবসর বড় একটা থাকে না, থাকলেও এত সহজে একটি স্ত্রী এবং তার সঙ্গে Kimberly mines পাবার সুবিধাটা হ'য়ে ওঠে না।

সমীরা ব্যারিষ্টারের মেয়ে কাজেই সুন্দরী ও বিদুষী। কিন্তু বিলেত ফেরতের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা না থাকলে মুস্কিল হয় গল্পে তার হাবভাব কথাবার্ত্তা নিয়ে। অথচ এমন মুনঝালওয়ালা মেয়েও অন্য সমাজে চট করে মেলে না।

সমীরার সঙ্গে পরেশের দেখা না হ'লে গল্প জমে না, তাই দেখা করানোর সবচেয়ে সুবিধা হ'ল, এক বুড়োকে ট্যাক্সি চাপা দিয়ে। সমীরা কালচর্ড সোসাইটির মেয়ে, সুতরাং তার ডেম্‌লার কার হাঁকিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, ভিড়ে বাধা পেয়ে গাড়ী থামাল। পরেশকে ত মোটর চাপা পড়া বৃদ্ধকে তুলতেই হবে কেননা কামস্কাট্‌কা থেকে আলজিয়ার্স পর্য্যন্ত সব স্থানেই এ রকম হ'য়ে এসেছে।

সমীরা যখন পরেশ আর বৃদ্ধকে তার গাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলে, পরেশ বউবাজারের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বল্লে—আমি যাবনা. কেননা আমি মন্দ। লোক হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল, কেননা তারা স্বভাবত হাঁ করেই থাকে। পরেশের এই কথা বলায় একটা উপকার হ'ল—বিশ্ববিদ্যালয় তারপর দিন থেকে ছেলেগুলোকে সক্রেটিস পড়ানো বন্ধ করলে, আর নবজীবন প্রেস Experiments with Truth বইখানা বম্বের Back Bay বোজানর জন্য দান করলে।

এরা সোজা লাবণ্যের বাড়ী গিয়ে উঠল এবং দিন কয়েকের ভেতর পরেশ সেখানে কায়েমী হ'য়ে গেল। ছাই চাপা আগুনের মত পরেশের অনেক গুণের মধ্যে কীর্ত্তন গাইবার ক্ষমতা হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল। নভেলের নায়কদের সাধনার কিছুরই দরকার হয় না, পরেশের কণ্ঠস্বরে রাস্তার পথিক চলবার জন্য পা তুলে সেই অবস্থাতেই রইল, গাছে পাখী শাবককে খাবার দিতে ভুলে গেল, এবং আরো নানা রকম অলৌকিক অ-ঘটনা ঘটতে লাগল। কিন্তু গান সুধু গাইলেই হয় না, গানের বিষয়ে পরেশ আসরের লোকদের একদিন একটা ব্যাখ্যাও দিয়ে ফেল্লে, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল—কীর্ত্তনের মাসতুত ভাই হচ্চে গজল,—এই দুইয়ে মিলন না হ'লে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের আশা নেই।

হরিশ বাবু এই সময়ে হাই তুলে তুড়ি বাজাতে বাজাতে জিজ্ঞাসা করলেন "কটা বাজল রে?"

গল্পটা তখন জমে উঠেছে, আমরা সকলেই একটু মন দিয়ে শুনছিলুম, পাছে সভা ভঙ্গ হ'য়ে রসভঙ্গ হয় তাই পণ্ডিতজী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন "চারু, গল্পটা এবার ঘুরিয়ে ফেল বাবা।"

"যে আজ্ঞে" বলে চারু আবার পড়তে লাগল————

পরেশ রাস্তায় বেরুলে রোজ কতগুলি মেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে হাসপাতালে যেত, তার সংখ্যা আমি মেডিক্যাল কলেজের খাতায় দেখিনি; হাতপাখা বেশী কি বরফ বেশী বিক্রি হ'ত তা জানিনে, কিন্তু সমীরা যে গানের আসরের আবছায়া এক কোণে ব'সে পরেশের সে গান—

"বসনে বসন লাগিবে বলিয়া
একু রজকেরে দেয়—

শুনে বদলে যেতে লাগল তা জানি। চণ্ডীদাসের পদের গুণ, না পরেশের কিন্নরকণ্ঠের কেরামতি তা বলতে পারিনি, কিন্তু সমীরার দেহে রোমাঞ্চ থেকে আরম্ভ করে গালে রক্তজমা পর্য্যন্ত, প্রেমের সব অবস্থাগুলো এক এক করে হ'তে লাগল, এবং সেও বুঝে ফেল্লে পরেশই তার বাঞ্ছিত।

পরেশের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই সমীরা মাথা হেঁট ক'রে তার পাৎলা কিড্‌স্কিনের ফ্রেঞ্চ শ্লিপারের ডগা দিয়ে কার্পেট খুঁড়ত, তার নাসা বিস্ফারিত হ'ত, সে চোখ তুলে চাইতে পারত না, গলাও বোধ করি ধ'রে আস্‌ত, কেননা নায়িকার প্রেমের এ সব লক্ষণগুলো একেবারে মার্কামারা হয়ে গেছে। আর পরেশ—সেও সমীরার মুখে চাঁদ, ফুটন্ত গোলাপ প্রভৃতি দেখত, এমন কি সমীরার চোখে সে অতীতের যুগ যুগান্ত দেখতে পেত, কারণ সকল নায়কই কিছুদিন থেকে ও রকম দেখতে আরম্ভ করেছে।

হরিশ বাবু হঠাৎ বলে উঠলেন "ছবিটি খাসা আঁক্‌ছিস্ রে চারু! কি খেয়ে গল্প লিখিস্ বল্ ত?"

"আজ্ঞে, আপনার প্রসাদ" বলে চারু আবার পড়তে লাগল—

নীলাকে সতীসাধ্বী করে বাঁচিয়ে রেখে বেশী কষ্ট দেওয়া ঠিক হয় না কাজেই নীলা একদিন পরেশের কাছে

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

লোকের ওপর লোক পাঠিয়ে বিরক্ত করে তুল্লে। স্বতরাং পবিত্রমনা নায়ককে যেমন করে যেতে হয়, পরেশ অনিচ্ছাসত্বে এবং মনের উপর ঘৃণার এক বোঝা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হ'ল। গিয়ে দেখলে শীর্ণা নীলা জীর্ণ একখানা রূপোর পাতের মত বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে। কথায় আছে, নেব্‌বার আগে প্রদীপ বেশী করে জ্বলে, তাই নীলা পরেশকে তার ভালবাসার ইতিহাস জোর গলায় শোনালে, কেননা আওয়াজটা গ্যালারী পর্য্যন্ত পৌছান একান্ত দরকার। পূর্ব্বাবস্থা ত আর ছিল না, কাজেই একানুরক্তির নিদর্শন দেখিয়ে নীলা পরেশের পায়ের ধূলো নিয়ে—অবশ্য সিল্কের মোজা নিংড়ে বুকে, জিভে, মাথায় ঠেকালে; টাকাকড়ি পরেশের নামে পূর্ব্বেই রেজিষ্ট্রি হয়ে গিছল, গলায় থান কাপড়ের আঁচলটা দিয়ে রেজেষ্ট্রি দলিল খানা পরেশের পায়ের ওপর রেখেই সেই যেমন ভাল ভাল বইতে লেখে বাতাহত কদলী বৃক্ষের মত বিছানায় ধপাস করে পড়ে চিঁ চিঁ করতে করতে বলতে লাগল—আমায় ক্ষমা করো, ওগো আমায় মার্জ্জনা কর। তারপর তার কথার মাঝে ক্রমশঃ ফাঁক বৃদ্ধি পেতে লাগল; শেষে নায়িকার মরবার axiom হিসেবে বল্লে—বি-১, ২, ৩, ৪,-দা—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০—আয়। প্রাণটা তার বিদায়ের শেষ রেশের সঙ্গে অনন্তে মিশে গেল,। পরেশের ভাঁড়ে করে গঙ্গাজল এনে তার মুখে দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ডিক্যাণ্টার থেকে বিশুদ্ধ কলের জলই দু গণ্ডুষ তার মুখে দিতে হ'ল।

কোলকাতা কর্পরেশনের কোন সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সাহিত্যা-মোদী সদস্যের চেষ্টা করা উচিত যাতে নিমতলা ঘাটে একটা বুথ (Booth) রাখা হয় যাতে থাকবে আরসী, চিরুণী, ক্ষুর, সাবান, গোলাপজল এবং খানিকটা প্রোটার্গল লোশ্যন। কেননা সব নভেলের নায়কই যখনই প্রেম পাত্রীদের একে একে পুড়িয়ে আসে তাদের চোখ হয় লাল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর চুল রুক্ষ, উস্কোখুস্কো; এতে যে নায়কের সৌন্দর্য্যহানি হ'য়ে গল্পের অসামান্য ক্ষতি হয় এটা সকলেরই জানা উচিত। পরেশ এই রকম চেহারা নিয়ে বাড়ী আসতেই সমীরার মনে সন্দেহ হ'ল, এবং ইবসেনী ছাঁচে ঢালা মেয়ের মত হাতে মাত্র ভ্যানিটি ব্যাগটি ঝুলিয়ে একেবারে মাসুরী পাহাড়ে গিয়ে উঠল এবং পরেশকে একখানা চিঠি লিখে সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে একটা চুল Shingle আর Bob করার দোকান খুল্লে।

একে একে ত দুটি নায়িকার ব্যবস্থা করা গেল, বাকি রইল বিমলা। হঠাৎ বিমলা পরেশকে তার ওপর তার পুরাণো দাবী স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য একখানা চিঠি দিলে। লেখা হ'ল চমৎকার গোটা গোটা মেয়েলি ছাঁদে, আকাশে বকের পাঁতির মত কাগজে মুক্তোর হার ফুটে উঠল।

তিরিশ হাত মাটি খুঁড়লে যদি জল বেরোয় তবে সিরিশ কাগজ অভাবে চিঠির কাগজ ঘস্‌লে যে মরচে পড়া প্রেম কেন চক্‌চকে হ'য়ে উঠবে না বলতে পারি না—

হরিশবাবু এবার সত্যই ভয়ানক রেগে উঠে পড়লেন, রোষ-কষায়িত নেত্রে বল্লেন "হতভাগা, শুয়ার বিধবা অবলার পেছন লাগা তোমার বার কচ্ছি, দাঁড়াও—দরোয়ান !!!"

চারু শুষ্ক হয়ে বলিদানের পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—"আজ্ঞে, আর এক লাইন শুনলেই বুঝতে পারতেন আমি কি বলতে চাই।"

হরিশবাবু কি ভেবে বল্লেন—"আচ্ছা পড়।"

চারু পড়লে, পরেশ একদিন বিমলার সঙ্গে দেখা কর্লে, তার মুখে বসন্তের গভীর ক্ষত-চিহ্ন দেখে সেই দিনই সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল।

দরোয়ান এসে দাঁড়িয়েছিল, হরিশবাবু বল্লেন—"ভেতরে বলে আয় চারুবাবু আমার সঙ্গে খাবেন—"

আমরা চারুর বুদ্ধির তারিফ করতে করতে বাড়ী ফিরলুম।

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

৪

বারভূঞার আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ

কর্‌রাণী বংশের রাজত্ব

মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগ হইতেই পশ্চিমাঞ্চল-বাসী মুসলমানগণ বাঙ্গলা দেশকে বড় সুনজরে দেখিতেন না। ইবন্ বতুতা ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে জিনিসপত্র কেমন আশ্চর্য্য সস্তা তাহার বর্ণনা করিয়া ও তালিকা দিয়া লিখিয়াছেন যে পশ্চিমাঞ্চল-বাসী মুসলমানগণ এই দেশকে বলে দোজখ্‌ই-পুর নিয়ামত অর্থাৎ ভাল জিনিসে ভরা নরক। কারণ এই দেশে কুয়াসা ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি লাগিয়াই আছে! আবুল ফজল বলেন প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গলা দেশের নাম বুলঘারখানা বা অশান্তিনিকেতন (Akbarnama III 256)। দিল্লির সম্রাট যাঁহাকেই এই দেশে শাসন কর্ত্তা করিয়া পাঠাইতেন, তিনিই কিছুদিন পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেন।

চৌসার যুদ্ধের পর বাঙ্গালা ও বিহারের অধিকার লাভ করিয়া শেরশাহ রাজোপাধি ধারণ করিলেন, এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে খিজিরখাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া হুমায়ূনের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। ইহার পরে হুমায়ূন বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং শেরশাহ নববিজিত সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলাবিধানে মনোনিবেশ করিলেন। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে তিনি যখন গাক্কার দেশ শাসনে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময় তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিল যে বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা খিজিরখাঁর চাল-চলতি বড় ভাল বোধ হইতেছে-না। তিনি বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব সুলতান মাহম্মদ শাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এবং স্বাধীন নবাবের চালে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের রোগে খিজিরখাঁকে ধরিয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র গাক্কার বিজয়ভার অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া শেরশাহ আশ্চর্য্য দ্রুততার সহিত বাঙ্গালা অভিমুখে রওনা হইলেন। খিজিরখাঁ একদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া শুনিলেন যে তেলিয়াঘরী গিরি শঙ্কটের দরজায় শেরসাহ উপস্থিত! শুনিয়া খিজিরখাঁর মুখের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বেশ কল্পনা করা যায়।

এই নিবন্ধে তেলিয়াঘরী অনেকবার উল্লিখিত হইবে, কাজেই এইখানে ইহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিবার তিনটি রাস্তা আছে। পাটনা পর্য্যন্ত আসিয়া এক রাস্তা তিন রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণের রাস্তাকে বলে ঝাড়খণ্ডের রাস্তা। ইহা পাটনা হইতে বাহির হইয়া বিহার সহর হইয়া সোজা দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ঝাড়খণ্ডের পাহাড় ও জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। পরে গিধোর, চাকী, দেওঘর ইত্যাদি হইয়া বীরভূমে প্রবেশ করিয়াছে। তথায় নগর, শিউড়ী ইত্যাদি হইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়াছে। এই পথ রেনেলের ৯ম সংখ্যক ম্যাপে পরিষ্কার অঙ্কিত আছে। এই পথে বিস্তর বনজঙ্গল পাহাড়পর্ব্বত এবং অসভ্য বন্যজাতির আবাস বলিয়া সহজে এই পথে কেহ পা দিত না।

দ্বিতীয় পথটি ছিল গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া ত্রিহুতের মধ্য দিয়া। রেনেলের ম্যাপে এই পথটিও বেশ দেখান আছে। অর্দ্ধস্বাধীন দেশ ও জাতি সমূহের মধ্য দিয়া এই পথ। রাস্তায় গঙ্গারই সমান বিস্তৃতকায়া কুশী নদী,—তীব্রবেগ-শালিনী। উহা সসৈন্যে পার হওয়া এক বিষম ব্যাপার। সম্রাট ফিরোজ তোগলক্ এই পথে দুইবার বঙ্গ আক্রমণে

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

আসিয়াছিলেন। আর বড় উল্লেখযোগ্য কেহ এই পথ দিয়া বাঙ্গালায় আসিতে চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু গঙ্গার দক্ষিণতীরস্থ রাস্তাকেই বাঙ্গালার সদর রাস্তা বলা যায়। পাটনা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া এই রাস্তা ভাগলপুর হইয়া কোলগঙ্গ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পরেও কিছুদূর পর্য্যন্ত এই রাস্তার কোন বাধা নাই। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায়, সম্মুখে সু-উচ্চ পাহাড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই পাহাড় একেবারে দুরারোহ এবং দক্ষিণে প্রায় ৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বীরভূম জেলার উত্তর সীমানায় পরিণত হইয়াছে। পাহাড়ের অব্যবহিত উত্তরেই গঙ্গার বিশাল স্রোত বটে, কিন্তু গঙ্গার পার দিয়া গঙ্গা ও পাহাড়ের মধ্যে মাইল খানেক প্রশস্ত (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আরও বেশী প্রশস্ত) স্থান আছে। উহা অপেক্ষাকৃত সমতল এবং উহারই নাম বিখ্যাত তেলিয়াঘরী শঙ্কট। ইহার উপর দিয়া বাঙ্গলায় প্রবেশের সদর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, এবং এই রাস্তারই সঙ্কীর্ণতম স্থান অধিকার করিয়া রাস্তা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া তেলিয়াঘরী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তেলিয়াঘরী শঙ্কট প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গের সিংহদরজা বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

খিজিরখাঁ যখন জানিতে পারিলেন যে, সেরশাহ তেলিয়াঘরীতে উপস্থিত, তখন গৌড় হইতে অগ্রসর হইয়া যথাসম্ভব প্রসন্নবদনে শেরশাহকে অভ্যর্থনা করা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না। কিন্তু ইহাতেও তিনি সেরশাহের কোপদৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। সের শাহ খিজিরখাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি করিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাগণের এই বিদ্রোহ রোগ দূর করা যায়। রোগের যে ঔষধের ব্যবস্থা তিনি করিলেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য রাজনৈতিক সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন প্রবল শক্তিশালী শাসন কর্ত্তার হস্তে প্রায় সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন ও অপ্রতিহত ক্ষমতা পড়িলে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে সে চাহিবেই, ব্যাপার এই বুঝিয়া তিনি শাসনকর্ত্তার পদই উঠাইয়া দিলেন। তিনি বাঙ্গালা দেশকে কতকগুলি সরকার বা জেলায় বিভক্ত করিলেন, এবং প্রত্যেক সরকারে একজন শাসনকর্ত্তা স্থাপন করিলেন। ইহাদের প্রত্যেককে সরাসরি সম্রাটের নিকট জবাবদিহী করা হইল, এবং ইহাদের কাজে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সর্ব্বোপরি একজন কাজি ফাজিলত নিযুক্ত করা হইল। এই কাজির হাতে সৈন্য সামন্ত বিশেষ কিছুই রহিল না। তিনি সম্রাটের আদেশ সরকারে সরকারে পৌঁছাইতেন। এবং সরকার কর্ত্তারা যাহাতে একে অন্যের বিরুদ্ধে না লাগে এবং সম্রাটের আদেশ মানিয়া চলে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতেন ও সম্রাটের কাছে রিপোর্ট দিতেন।

এই চমৎকার ব্যবস্থা সুধু শেরসাহের জীবনকাল পর্য্যন্তই বলবৎ ছিল। পূর্ব্বে যে ফজল গাজি কর্ত্তৃক উপহৃত শেরসাহের লিপিযুক্ত একটি কামানের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কামানের লিপিটি ৯৪৯ হিজরির = ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের, অর্থাৎ খিজির খাঁর পতনের বছর দুই পরের। কামানটি এখন ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ঠিক অনুরূপ একটি লিপিযুক্ত কামান ঢাকার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত দোলাই খালের গর্ভে লোহার পুলের নিকটে ১৯২২ সনে পাওয়া যায়। উভয় লিপিতেই লেখা আছে, শেরশাহের রাজত্বে এবং সৈয়দ আহাম্মদ রুমীর আমলে এই কামান দুইটী নির্ম্মিত হয়। ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব বলেন আমল্ মানে হাতের কাজ, অর্থাৎ কামানটী সৈয়দ আহাম্মদ রুমী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। (J. A. S. B. 1909. P. 367) খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হাসান সাহেব বলেন, (Dacca Review 1911, P. 219) আমল মানে শাসন কাল।* আকবর নামার প্রথম খণ্ডে তিন জন রুমী খাঁর পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু উহাদের একজনেরও নাম সৈয়দ আহাম্মদ নহে।

এইখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শের শাহ বাঙ্গালা দেশকে যেই সরকারগুলিতে ভাগ করিয়াছিলেন, টোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তে সম্ভবতঃ সেই বিভাগ গুলিই গৃহীত হইয়াছে। আর এই অনুমান অযৌক্তিক নহে যে শেরশাহ প্রতিষ্ঠিত সরকার শাসনকর্ত্তাগণের অন্ততঃ

* খান বাহাদুর সাহেব সম্প্রতি আমাকে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, আমল মানে 'হাতের কাজ'ই হইবে এবং ষ্টেপলটন সাহেবের কথাই ঠিক।

কতকের বংশধর অবশেষে বার ভৌমিকের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়া আকবরের আমলে স্বাধীনতা সমরে লিপ্ত হইয়াছিলেন। হয়ত ভাওয়ালের ফজল গাজি শাহের আমলে এইরূপ একটী সরকার কর্ত্তা ছিলেন এবং এইরূপেই গাজী ভৌমিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইসলাম শাহ সম্রাট হইলেন এবং পিতার আবিষ্কৃত অভিনব পন্থা রদ করিয়া তিনি আত্মীয় মুহম্মদ খাঁ শুরকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন এবং সুলেমান করবার্তী নামক একজন সম্ভ্রান্ত আফগানকে বিহারের শাসনকর্ত্তা করিলেন। দুরাচার আদিল শাহ যখন অন্যায়রূপে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন তখন বঙ্গে মুহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন এবং অনতিকাল পরেই আদিল শাহের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। মুহম্মদ পুত্র বাহাদুর কিন্তু পর বৎসর সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং সুলেমান কররাণীর সহায়তায় আদিল শাহকে যুদ্ধে নিহত করিলেন।

বাহাদুর ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন এবং তাহার পরে তাঁহার ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন জালাল শাহ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জালালের পুত্র আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে সুলেমান কররাণী স্বীয় ভ্রাতা তাজ খাঁ কররাণীর সহায়তায় বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করিয়া বসেন। তাজ খাঁ কিছুদিন পর্য্যন্ত ভ্রাতার প্রতিনিধি রূপে বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সুলেমান গৌড় হইতে রাজধানী তাঁড়ায় স্থানান্তরিত করিয়া বাঙ্গালা বিহারের অধিকারী হইয়া বসিলেন। তিনি অত্যন্ত হুঁসিয়ার লোক ছিলেন, তাই স্বাধীন রাজচিহ্নাদি ধারণ না করিয়া নামমাত্র আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং শান্তিতে জীবন কাটাইয়া গেলেন (১৫৭২ খ্রীঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ রাজা হইলেন বটে কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন এবং সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দায়ুদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দায়ুদ দেখিলেন, তাঁহার ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৪০,০০০ পদাতিক এবং ২০,০০০ কামান আছে। তিনি অমনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং আকবরের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

উপরের দুই প্যারায় সঙ্কলিত ঐতিহাসিক তথ্য যে কোন বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যাইবে, তবু হাতের কাছে মোটামোটী কথা কয়টা যাহাতে থাকে সেই জন্য পাঠকগণকে বালক-পাঠ্য ইতিহাস কিছু শুনাইতে হইল

দায়ুদের সহিত আকবরের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। কৌতূহলী পাঠক ষ্টুয়ার্টের বা রাখাল বাবুর ইতিহাস হইতে, অথবা ডাঃ ভি, এ স্মিথের "আকবর, দি গ্রেট মুঘল" নামক পুস্তক হইতে সেই বিবরণ পড়িতে পারেন।

আবুল ফজল আকবর নামাতে আকবরের আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়াছেন। দায়ুদ-আকবর-বিরোধ কাহিনী নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই আবুল ফজলের পন্থা অনুসরণ করিয়া আকবরের যেন দৈবনির্দ্দিষ্ট সৌভাগ্যেরই প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন। দায়ুদের সৈন্য বল প্রচুর ছিল—সম্ভবতঃ আকবর অপেক্ষা বড় কম ছিল না। আফগানগণের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ বীরের সংখ্যা প্রচুর ছিল, দায়ুদের রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রারও অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে, মোগল যোদ্ধাগণ সেনানায়কগণ পদে পদে এমন স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা এবং কর্ত্তব্যবিমুখতার পরিচয় দিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে একেবারে অবাক হইয়া যাইতে হয়। এত সম্পদ থাকিতেও যে দায়ুদ হারিলেন এবং এমন অধম, সৈন্যবল সহায়তায়ও যে আকবর জিতিলেন তাহাতেই বুঝা যায় যে, মানুষ হিসাবে, রাজা হিসাবে আকবর দায়ুদ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দায়ুদকে তবকত-ই-আকবরীর গ্রন্থকার গিয়াসুদ্দিন ভ্রষ্টচরিত্র হতভাগ্য (Dissolute scamp) বলিয়া গালি দিয়া লিখিয়াছেন যে রাজ্যশাসন এমন হতভাগার কর্ম্ম নহে। দায়ুদ সম্ভবতঃ ভ্রষ্টচরিত্র ছিল, দুর্ব্বুদ্ধি পরিচালিত ছিল তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সর্ব্বোপরি ছিল সে হতভাগ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা-সমর

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

সাধারণ বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া ধারণা হইবে যে পিতার হুঁসিয়ার নীতি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজের নামে মুদ্রার প্রচার করিয়াই দায়ূদই বুঝি অনর্থক নিজের ঘাড়ে বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল। ষ্টুয়া-টের বই পড়িয়াও এই ধারণা হইবে, রাখাল বাবুর ইতিহাস পড়িয়া এই ধারণাই হইবে। কিন্তু ইহা একেবারেই সত্য নহে। দায়ূদ স্বাধীনতা ঘোষণা করুন বা না করুন, সাম্রাজ্য-লোলুপ আকবর যে শুধু সুলেমান কররানীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, আকবর নামা পড়িয়াই একথা বেশ বুঝা যায়। অনুরূপ অবস্থা ইলিয়াস সাহের আমলে আর একবার হইয়াছিল, আমার Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal নামক গ্রন্থে এবং ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩২৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় (৩৬৫—৩৬৬ পৃষ্ঠা) বঙ্গে সুলতানী আমল নামক প্রবন্ধে তাহার বিশেষ বিবৃতি আছে। মুহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বের শেষ অবস্থায় সর্ব্ববঙ্গের আধিপত্য অর্জ্জন করিয়া ইলিয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফিরোজ তুঘ্‌লক দিল্লীর সুল-তান হইয়া বিদ্রোহী ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে অভিযান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যতদিন ইলিয়াস বাঁচিয়াছিলেন ততদিন ফিরোজশাহ আর বাঙ্গালা জয় করিবার উদ্যম করেন নাই। এমন কি ইলিয়াসের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্তও তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূচক দূত বিনিময় করিয়াছেন। ফিরোজ শাহের ইতিহাসকার বলেন, ইলিয়াস বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বৎসর ফিরোজশাহকে উপঢৌকন পাঠাইতেন। উপঢৌকন বিনিময় হয়ত সত্য সত্যই হইত, কিন্তু বশ্যতা স্বীকারের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না কারণ ইলিয়াস স্বাধীন ভূপতির মতই মুদ্রা প্রচার করিতেন এবং দেশময় তাঁহার অজস্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক একবার ইলি-য়াস শাহের দূত উপঢৌকন লইয়া দিল্লী আসিল এবং বিনিময়ে ফিরোজশাহের দূত তাহার সহিত উপঢৌকন লইয়া বাঙ্গালা অভিমুখে চলিল। বিহার পর্য্যন্ত আসিয়া শুনা গেল যে ইলিয়াস শাহ আর ইহজগতে নাই। দিল্লীর দূত যখন স্বীয় প্রভুকে এই সংবাদ দিল তখন ফিরোজশাহ তাহাকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিলেন এবং যথাসম্ভব সত্বর অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ইলি-য়াসের পুত্র সেকেন্দর তখন বাঙ্গালার সুলতান হইয়াছেন। ফিরোজশাহের সেনা বাঙ্গালা দেশের কাছে পৌঁছিলে তিনি ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন, ফিরোজশাহ তখন তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—তুমি অধীন রাজার কর্ত্তব্য পালন কর নাই ইত্যাদি ইত্যাদি, তাই এই অভিযান তোমার বিরুদ্ধেই যাইতেছে। ইতিহাসজ্ঞগণ জানেন বাঙ্গালী সুলতানের হাতে এবারও ফিরোজশাহকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল।

আকবর যখন শুনিলেন যে, সুলেমান কোর্‌রানী মৃত্যু হইয়াছে, তখন তিনি গুজরাট জয়ে চলিয়াছেন। তাহার পর কি হইল, আকবরের নিজস্ব ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ভাষায়ই শুনা যাক্। আবুল ফজলের ভাষার বেভারিজ কৃত ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালী পাঠক বরদাস্ত করিতে পারিবেন না, কাজেই ভবিষ্যতে সুধু মর্ম্মানুবাদই প্রদত্ত হইবে। এক্ষেত্রে শুধু নমুনা দেখাইবার জন্য অবিকল অনুবাদই প্রদত্ত হইল।

"এই সময়ের এক ঘটনা, বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ক্ষমতা-মারুত-প্রশ্বাসকারী সুলেমান কররানীর মৃত্যু। কঠোরব্রতী জ্ঞানীগণ এবং রাজনীতিবিদ্‌গণ যাঁহারা মানব জাতির শান্তি কামনা করেন তাহারা জানেন যে ঐ শান্তির জন্য (দেশে) এক রাজা, এক রাজ্য, এক চালক, এক চিন্তা, এক: উদ্দেশ্য আবশ্যক। তাঁহারা এই ঘটনায় ভাগ্যের প্রসন্নতারই নিদর্শন লক্ষ্য করিলেন। এবং অবোধগণ, যাহারা পূর্ব্বে ভারতে তুষ্টচেতা আফগানগণের চাঞ্চল্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গুজরাট যাত্রার বিরোধিতা করিতেছিল তাহারা এই ঘটনার বিফলতার গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইল। আর একদল সঙ্কীর্ণবুদ্ধি লোক গুজরাট যাত্রা ও বিজয়ের সার্থকতা বুঝিতে পারিত না, এবং তাই বুদ্ধিহীনের মত যা তা' বলিত, তাহাদের রসনা এই ঘটনায় আবার অসংযত হইয়া উঠিল এবং (গুজরাট যাত্রা স্থগিত রাখিয়া) পূর্ব্ব ভারতে অগ্রসর হওয়ার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাহারা বক্তৃতা দিতে লাগিল। ভগবদ্ভক্তিশীল মহারাজাধিরাজ চিন্তা করিয়া

বুঝিলেন যে গুজরাটের অত্যাচারক্লিন্ন প্রজাগণকে অনুগ্রহ-দোলায় আরোপণ করা আবশ্যক; তাই তিনি এই সব অর্থশূন্য কথায় মন দিলেন না, এবং পবিত্র অধরোষ্ঠ হইতে এই বাক্য বাহির করিলেন যে গুজরাট যাত্রার পথে যে এই সুলেমানের মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে, ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ রাজধানীতে থাকার কালে এই সংবাদ পৌছিলে অধিকাংশ কর্ম্মচারীর অভিমত মতে প্রথমে তাঁহাকে অবশ্যই পূর্ব্বদেশ বিজয়ে যাত্রা করিতে হইত। সুলেমানের মৃত্যুর পরে আর সাহান শাহের নিজে পূর্ব্বদেশ বিজয়ে যাত্রা করিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই (সামান্য কাজ) এখন কর্ম্মচারীগণের সাহস ও কর্ম্মকুশলতায়ই অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারিবে। তদনুসারে মুনিম খাঁ খাঁ-খানানের উপর পরোয়ানা জারি হইল যে অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের সহিত একমত হইয়া তিনি যেন বঙ্গবিজয় সাধিত করিয়া ফেলেন।" *

আবুল ফজলের উপরি উদ্ধৃত বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়

১। আকবরের ভারত একচ্ছত্র করিবার অভিপ্রায় চিরদিনই ছিল; সুলেমান কররানী পূর্ব্ব ভারতে তাহার প্রবল প্রতিবন্ধক ছিলেন।

২। সুলেমানের মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র আকবরের কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্বভারত যাত্রার পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং রাজধানীতে থাকিলে আকবর এই পরামর্শ নিশ্চয়ই শুনিতেন।

৩। প্রত্যাবর্ত্তন অসুবিধাজনক দেখিয়া মুনিম খাঁর উপর অবিলম্বে বঙ্গ জয় করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

যাঁহারা বলেন দায়ুদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, আশা করি উপরের বিচারে তাঁহাদের এই ভুল ধারণা দূর হইবে। আর প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া ছিলেন প্রথম বায়াজিদ। আকবর নামাতেই সেই কথা আছে, যথা—

"সুলেমানের মৃত্যুর পর আফগানগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। রাজ্য পাইয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল এবং ঐ দেশের যত লক্ষীছাড়া আফগানের সহিত মিলিয়া সে নিজের নামে খুৎবা * পাঠ করাইল। যে ছলনা-নীতির বলে সুলেমান (এতকাল) গর্ব্বোদ্ধত এবং বিদ্রোহোদ্যত ব্যক্তিগণকে বশে রাখিয়াছিল, বায়াজিদ দুঃসাহস পরিচালিত হইয়া সেই ছলনা নীতি পরিত্যাগ করিল, এবং তাহাদিগকে বিরক্ত ও অত্যাচার-জর্জ্জরিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।"

Beveridge. III, P. 28.

কাজেই দায়ুদ সুধু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়াছিল মাত্র। ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে nothing succeeds like success—সফলতার মত এমন সফল জিনিষ আর কিছু নাই। ইলিয়ামপুত্র সেকেন্দর ফিরোজ শাহকে বেশ দু' ঘা দিয়া দিল্লী অভিমুখে ফেরত পাঠাইতে পারিয়াছিল (১৩৬০ খ্রীঃ অঃ), তাই বাঙ্গালা দেশে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য দায়ুদ পর্য্যন্ত (১৫৭৫ খ্রীঃ) প্রায় অব্যাহত চলিয়া আসিতে পারিয়াছিল। আর দুর্ব্বুদ্ধি পরিচালিত হতভাগ্য দায়ুদ তাহা পারে নাই তাই ঐতিহাসিকও তাহাকে গালাগালি দিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাহাকে অপদার্থ ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারি না। দায়ুদ সম্ভবতঃ অপদার্থই ছিল, হতভাগ্য তো ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু রাজনৈতিক কোন অপরাধে যে সে অপরাধী ছিল না, আশা করি তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

দায়ুদের উজীরের নাম ছিল লোদি খাঁ। বায়াজিদের মৃত্যুর পরে লোদিই দায়ুদকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। লোদি যে একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এমন কি আবুল ফজলও তাঁহাকে আফগান দলের একমাত্র অপ্রমত্ত বুদ্ধির লোক বলিয়া প্রশংসা

* আকবর নামা, তৃতীয়খণ্ড, বেভারিজ কৃত ইংরাজী অনুবাদ, ৫—৬ পৃষ্ঠা।

* স্বাধীন মুসলমান রাজার প্রধান দুইটি অধিকার খুৎবা এবং সিক্কা অর্থাৎ মসজিদে মসজিদে প্রকাশ্য নমাজের সময় রাজার মঙ্গল কামনায় যে প্রার্থনা হয় তাহাতে নিজের নাম বসান এবং সিক্কা বা মুদ্রা প্রচার। সুলেমানের সময়ের মুদ্রা পাওয়া যায় না, বায়াজিদেরও পাওয়া যায় নাই। দায়ুদের বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

সভামণ্ডপ

আষাঢ়, ১৩৩৫

বিলাতী চিত্র হইতে

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

করিয়াছেন। দায়ূদ বঙ্গে রাজা হইলে আফগান সেনা-নায়ক গুজর খাঁ বিহারে বায়াজিদের পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এই সময় মুনিম খাঁ চুনার হইতে পূর্ব্ব ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাটনা অভিমুখে রওনা হইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আফগান-স্বাধীনতার পরম হিতৈষী লোদি গুজর খাঁর সহিত আপোষে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং মুনিম খাঁকে উপহারাদি দানে সন্তুষ্ট করিয়া এবং মুখবন্ধ করিয়া বিদায় দিলেন। রাজনৈতিকের অস্ত্র সাম দামাদির দামই যে এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ ঘুষ খাইয়া যে মুনিম খাঁ বাড়াবাড়ি করিতে বিরত হইলেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আবুল ফজলও মুনিম খাঁর কার্য্যে মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করিতে ভুলেন নাই, রৌপ্য প্ররোচনাই যে মনোযোগের অভাবের মূল সেই কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময় গোরখপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং মুনিম খাঁ সেই বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে মোগল সেনানায়কগণের মধ্যে বিষম বিরোধ লাগিয়া গেল এবং অনেকে মুনিম খাঁকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ফলে গোরখপুরের বিদ্রোহ দমন করিতে মুনিম খাঁ হিমসিম খাইতে লাগিলেন। এই সুযোগে লোদি, কালা পাহাড় ইত্যাদি আফগান সেনানায়কগণ জৌনপুর বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। অল্পকাল পরেই মুনিম খাঁ ও লোদিতে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। মুনিম খাঁ কাতর হইয়া সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন, আকবর তখন সুরাট জয়ে ব্যস্ত—মুনিম খাঁকে কোন সাহায্যই করিতে পারিলেন না। এইরূপে যখন বিজয়লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাস্যে দায়ূদের ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এমন সময় দুষ্ট বুদ্ধির তাড়নায় সে নিজের সর্ব্বনাশ সাধনে লাগিয়া গেল। মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সে তাজ খাঁ কররাণীর পুত্রকে হত্যা করিল,—এই আশঙ্কায় যে ভবিষ্যতে যদি লোদি তাহাকে সরাইয়া তাজ খাঁর পুত্রকে রাজা করিতে চাহে! তাজ খাঁ লোদির পুরানো কালের মনিব, লোদির কন্যার সহিত তাজ খাঁর পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ছিল। এদিকে দায়ূদের সভায় লোদির বিরুদ্ধে নিত্য ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া লোদি দায়ূদের বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন, আফগানগণের অভ্যুদয়ের আশা চিরকালের জন্য নিভিয়া গেল! কালা পাহাড় (হিন্দু নাম রাজু) যখন দায়ূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়া লোদির পক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল, তখন সেই মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ কিছুদিন পূর্ব্বেই লোদির নিকট করযোড়ে সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। লোদি বাধ্য হইয়া তাঁহারই সাহায্য চাহিলেন এবং রোটাস্ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে আকবর মুনিম খাঁকে বিহার ও বঙ্গ বিজয়ের জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন এবং অবস্থা কি জানিবার জন্য তোডর মল্লকে পাঠাইয়া দিলেন। তোডর মল্ল যাইয়া ভাল রিপোর্ট দিল, তাই আকবর কিছু দিনের মত নিশ্চিন্ত রহিলেন।

কিন্তু বেশী দিন এইরূপে নিশ্চিন্ত থাকা আকবরের স্বভাবে ছিল না। তিনি নূতন নূতন সেনা-নায়ককে মুনিম খাঁর সাহায্যে পাঠাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে আকবরের তাড়নায় মুনিম খাঁকে অগ্রসর হইতে হইল। আকবর আবার তাড়া দিয়া তোডর মল্লকে পাঠাইলেন এবং এবার সত্যই পূর্ব্ব ভারত জয়ে মোগল বাহিনী অগ্রসর হইল।

স্বদেশের স্বজাতির এই বিপদে মহাপ্রাণ লোদি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি গুজর ও কতলুর প্ররোচনায় আবার দায়ূদের পক্ষে যোগ দিলেন এবং বীরদর্পে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া শোন নদের তীরে মোগল বাহিনীর গতিরোধ করিলেন। মোগল বাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

কতলু খাঁ এবং প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি ছিল দায়ূদের ঘাড়ের শনি। লোদি আবার সেই আফগান পক্ষের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া অসামান্য দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিল, তখন এই দুই দুর্ব্বৃত্ত আবার তাহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল এবং মস্তিষ্কহীন দায়ূদের কানে তাহার বিরুদ্ধে লাগাইতে লাগিল। তবকত্-ই-আকবরী বলে যে শোন তীরে গতিরোধ করিয়া লোদি মুনিম খাঁকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়া-

ছিলেন,—আকবর নামাতে সন্ধি করিবার কথা নাই। যাহা হউক আফগানগণের এমন পরম সঙ্কট সময়েও দায়ুদের সুবুদ্ধির উদয় হইল না। কত্‌লু ও শ্রীহরির পরামর্শে লোদি বন্দী হইলেন, ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। মোগলদিগের বিরুদ্ধে কালবিলম্ব না করিয়া প্রবল উদ্যমের সহিত যুদ্ধ চালাইতে দায়ূদকে পরামর্শ দিয়া এই মহাপ্রাণ আফগান প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কতলু উকীল এবং শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য উজীর নিযুক্ত হইলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মনোবাসনা পূর্ণ হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আফগানকুলের লক্ষ্মীও অন্তর্হিতা হইলেন।

মুনিম খাঁর সাহায্যার্থে সেনানায়কগণকে পাঠাইতে আরম্ভ করেন। কাজেই অক্টোবরের শেষ ভাগে বা নভেম্বরের প্রথমে মুনিম খাঁ পূর্ব্ব ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বর্ষার শেষে উহাই পূর্ব্ব ভারতে যুদ্ধ-যাত্রার প্রকৃষ্ট কাল সন্দেহ নাই। ১৫৭৩ এর ডিসেম্বরে বোধ হয় পাটনা অবরুদ্ধ হয়। ১৫৭৪ এর এপ্রিলে মুনিম খাঁ রিপোর্ট করিলেন যে অবরোধ মোটেই অগ্রসর হইতেছে না। ১৫৭৪ এর ১৫ই জুন আকবর স্বয়ং জলপথে পাটনা বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। ১৫ই আগষ্ট তিনি পাটনার নিকটে যাইয়া পৌছিলেন। বর্ষা-স্ফীত নদী, প্রবল ঝড়ে রাস্তায় অনেক নৌকার নিমজ্জন কিছুই সেই পুরুষসিংহকে বাধা দিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল
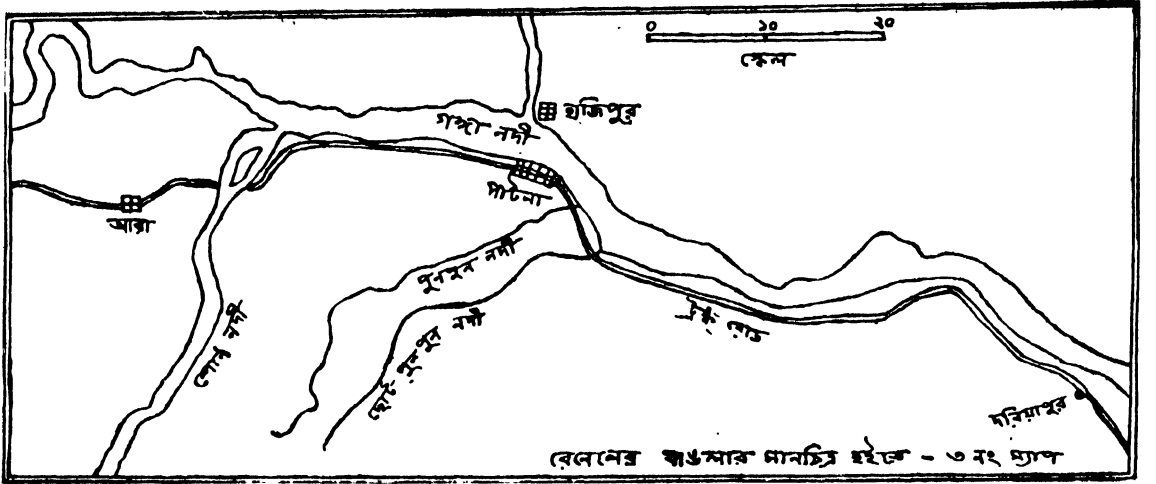
পাটনা-গাজিপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান

এইবার মোগলদিগকে বাধা দিবার আর তেমন কেহ রহিল না এবং তাহারা অনায়াসে শোন উত্তীর্ণ হইল। আর, আবুল ফজলের ভাষায়—"সাহান সা আকবরের এমনি সৌভাগ্যের জোর যে এমন সৈন্য সম্পদ ও বিপুল যুদ্ধসম্ভার থাকা সত্ত্বেও হতভাগ্য দায়ুদ নিতান্ত ভীরুর মত হঠিয়া গিয়া পাটনা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় লাগিয়া গেল।" মুনিম খাঁ অগ্রসর হইয়া পাটনা অবরোধ করিলেন।

আকবর গুজরাট বিজয় করিয়া ৫ই অক্টোবর ১৫৭৩ খ্রীঃ তে রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। তথায় পৌছিয়াই তিনি

না। আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছিবামাত্র যুদ্ধের অবস্থা বদল হইয়া গেল। পাটনা গঙ্গার দক্ষিণ পারে, গঙ্গার উত্তর পারে পাটনার বিপরীত দিকে হাজিপুর সহর। এই হাজিপুর হইতে রসদাদি সংগ্রহ হইত বলিয়া পাটনা এতদিন অবরোধ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আকবর আসিয়াই হাজিপুর দখলের ব্যবস্থা করিলেন এবং হাজিপুরের পতন হইল। গতিক বড় সুবিধাজনক নহে দেখিয়া একদিন গভীর রাত্রে দায়ুদ তাহার পক্ষীয়গণকে একরকম পরিত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে চম্পট দিল, অনুগত শ্রীহরিও তাঁহার ধনরত্নগুলি এক নৌকায় তুলিয়া

দিয়া অবিলম্বে প্রভুর অনুসরণ করিল। * গুজর খাঁ স্থলপথে সৈন্যসামন্ত ও হস্তীগুলি লইয়া বাহির হইলেন। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার পুরা বর্ষাকাল, রাস্তা-ঘাট সমস্ত জলপ্লাবিত বর্ষার ধারা নামিয়া নদীগুলি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। নিজামউদ্দিন তাঁহার তবকত-ই-আকবরী গ্রন্থে এই রাত্রিকে প্রলয় রাত্রির সহিত তুলনা করিয়াছেন। পলাইতে গিয়া কত লোক যে দুর্গ-পরিখায় ডুবিয়া মরিল, কত যে নদীতে ডুবিয়া মরিল, কত আবার হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হইয়া গেল তাহার সংখ্যা নাই। পাটনার ১০ মাইল পূর্ব্বে পুন্‌পুন্ নদী গঙ্গাতে পড়িয়াছে। পলায়মানগণের ভারে তাহার উপরের পোল ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক হাতী নদীতে পড়িয়া গেল এবং বহু সৈন্য ডুবিয়া মরিল।

শেষ রাত্রে আকবরের কাছে খবর পৌছিল যে দায়ুদ পাটনা ছাড়িয়া পলাইয়াছে। অমনি আকবর পাটনা দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইতে চাহিলেন কিন্তু সেনাপতিগণের পরামর্শে দিন হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। তাহার পরে আরম্ভ হইল পশ্চাদ্ধাবন—গুজর হাতীগুলি ফেলিয়া পালাইলেন। প্রায় ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত এক চোটে ঘোড়া হাঁকাইয়া দরিয়াপুর পর্য্যন্ত আসিয়া আকবর থামিলেন, রাস্তায় ঘোড়ার পীঠে চড়িয়াই পুন্‌পুন্ নদী পার হইয়া গেলেন। এইরূপে দায়ুদকে বাঙ্গালা দেশে তাড়াইয়া তাহাকে একেবারে শেষ করিবার ভার মুনিম খাঁর উপর রাখিয়া ২৪শে আগষ্ট, ১৫৭৪, খৃঃ আকবর রাজধানীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। মাত্র ১০ দিন সময়ের মধ্যে যেন ভোজবাজির মত দায়ুদ-বিজয় সমাপ্ত হইয়া গেল!

* তারিখ-ই-দায়ুদী, মখজান-ই-আফগানা ইত্যাদি আফগান পক্ষীয় ইতিহাসের মতে দায়ুদ কিছুতেই পাটনা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই কত্‌লু, ইত্যাদি নায়কগণ তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে মাদক প্রয়োগে হতচেতন করিয়া রাত্রিযোগে তাহাকে লইয়া পলাইয়াছিল। কথাটা সত্য হইলে, দায়ুদের ছেলেমানুষী বুদ্ধির এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাবের ইহা আর একটি নিদর্শন। পলায়ন কখন আবশ্যক অভিজ্ঞ সেনাপতিকে তাহা বলিয়া দিতে হয় না, তিনি স্বপক্ষীয়গণের নিরাপদ প্রস্থানের ব্যবস্থা করিয়া সুযোগ বুঝিয়া নিজে সরিয়া পড়েন। এদিকে যুদ্ধের show বা অভিনয় এমনিভাবে চলিতে থাকে যে শত্রু টেরও পায় না যে Evacuation বা স্থানত্যাগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দায়ুদের পাটনা পরিত্যাগের বিবরণে এইরূপ সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত পলায়ন ব্যবস্থার কোন পরিচয় পাই না।

অতি আধুনিকের বার্ত্তা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রাচীনতর যুগে মানুষে পরিচিত ছিল মানুষের উর্দ্ধতর অংশের সহিত; এই উপরকার ভাগে প্রকৃতির যে ধরণ-ধারণ তাহার সম্বন্ধেই বিশেষ সে সজাগ সচেতন ছিল। নীচেরকার দিকের প্রকৃতির উপর তেমন নজর সে দিত না—সেই প্রকৃতি আপন সংস্কারের পথে, আপন নৈসর্গিক ধর্ম্মে একটা যন্ত্রের মত চলিয়া যাইত, মানুষ তৎসম্বন্ধে অনেকখানি অজ্ঞ ও অচেতনই ছিল। আমি অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে আপামর সকল মানুষই তাহার উপরের প্রকৃতিকে চিনিত জানিত; সর্ব্বসাধারণে হয়ত উপরকার ভাগ আর নীচেরকার ভাগ উভয়ের সম্বন্ধেই সমান অজ্ঞ ও অচেতন ছিল—আমি বলিতেছি সর্ব্বসাধারণের প্রতিভূ যাহারা, যে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী চিরকাল তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম দিয়া মানুষ-জাতির মনুষ্যত্বের মাপ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের কথা। কিন্তু যতই দিন গিয়াছে দেখি মানুষের চেতনার কেন্দ্র ততই যেন সরিয়া নিম্নতর ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে। মানুষ সজাগ সচেতন হইয়া চলিয়াছে তাহার অধস্তর প্রকৃতির সহিত; এখানে নূতন সত্য নূতন শক্তির আবিষ্কার করিয়াছে এবং তাহাদের কল্যাণে পূর্ব্বতন সংস্কারকে দিয়াছে নূতন সংস্কৃতি।

এই যেমন প্রথমে, বেদ উপনিষদের যুগে, দেখি মানুষের প্রতিষ্ঠা ছিল মস্তকে—তাহার জ্ঞানে, তাহার বুদ্ধিতে, তাহার ইচ্ছাশক্তিতে—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ; তন্ত্রের ভাষায় বলিতে পারি, সহস্রদল বিশুদ্ধিচক্র আর আজ্ঞাচক্র লইয়া যে ক্ষেত্র সেখানেই ছিল মানুষের দৃষ্টি-সৃষ্টি আলোচনা-গবেষণা, সাধনা ও সিদ্ধি। তারপরে আসিল বৌদ্ধযুগ—মস্তক হইতে মানুষ অবতরণ করিল বুকে—অনাহত চক্রে। বৌদ্ধ-সাধনার প্রধান কথাই হইতেছে হৃদয়স্থ অগ্নির উদ্বোধন এবং এই অগ্নির শিখায় সকল সংসার সকল কর্ম্ম পোড়াইয়া ভস্মীভূত করা। হৃদয়াগ্নির যে তেজ যে তপস্যা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে তীব্র বৈরাগ্যে, নির্ব্বাণে; আর সেই হৃদয়াগ্নিরই যে একটা চারুতা রম্যতা তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে বৌদ্ধ করুণায়, ভূতদয়ায়, তাহার শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে। তার পরের যুগে মানুষ নামিয়া আসিল আরও নীচে—চিত্তে, প্রাণে—তাহার মণিপুরে। কত অদ্ভুত কত অপ্রত্যাশিত সত্য ও শক্তি সে এখানেও আবিষ্কার করিয়াছে, নূতন রূপে ঐশ্বর্য্যে ইহাকে রূপান্তরিত ভূষিত করিয়াছে। ইহাকে বলিব বৈষ্ণব যুগ; ধর্ম্মে এখানে প্রকাশ পাইয়াছে ভক্তির প্রেমের রসের সাধনা, সাহিত্য শিল্পে ফুটিয়াছে "রোমান্টিক" ধারা। পরবর্ত্তী যুগে মানুষ আরও এক ধাপ নামিয়া বাসা বাঁধিল দেহে, স্থূলে,—ইহাই হইল আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ; কত রকমের জড়শক্তি আমরা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছি, মানুষের জীবনকে তাহার দ্বারা গঠিত নিয়ন্ত্রিত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি, সমাজকে দিয়াছি একটা নূতন গড়ন। এ যুগের সমস্ত ব্যবস্থা দেহকে লক্ষ্য করিয়া, দেহের সত্য দেহের শক্তিই আমাদের চেতনায় আমাদের ধর্ম্মেকর্ম্মে বিপুল বিশাল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত আসিয়াও আমরা থামিয়া যাই নাই, আমরা আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছি—কোথায়? অতি আধুনিকের বৈশিষ্ট্য এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব জগতের আবিষ্কারে। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পায়ের তলা এই দুই প্রান্তের মধ্যে মানুষের যে আধার তাহা হইতেছে মানুষের ব্যক্তরূপ, তাহার উপরের প্রকৃতি। কিন্তু পায়ের তলা হইতে নীচের দিকে তাহার উপরের আধারেরই একটা প্রতিরূপ প্রসারিত হইয়া আছে; দেহের, প্রাণের, মনের গুপ্ত কথা সব এইখানে বাসা বাঁধিয়া আছে—ইহাকেই আজকাল বলে sub-liminal self—মগ্নসত্তা, sub-consciousness—অবচেতনা।

অতি আধুনিকের বার্ত্তা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পুরাণে চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা আছে—কিন্তু তাহার সাতটি হইতেছে উপরের দিকে পৃথিবী পর্য্যন্ত আর সাতটি পৃথিবী হইতে নীচের দিকে পৃথিবীর অন্তরালে। অতি আধুনিক যুগে আমরা আমাদের প্রকৃতির এই অধমস্তরে, এই রসাতলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছি—সেখানকার যত অজ্ঞাত লুক্কায়িত সত্যের শক্তির পরিচয় গ্রহণ করিতেছি। এক-কালে উপরের যে আলোর জগতে আমরা বিচরণ করিতাম সেখান হইতে আজকাল দূরে সরিয়া পড়িয়াছি; ব্যক্তজগতে, প্রকৃতির বাহ্য গতিবিধির ক্ষেত্রে আর আমরা নাই, ডুবো জাহাজের মত মানবস্বভাবের অতলে অন্ধকারে নামিয়া চলিয়াছি। নীচের দিকে যত অবতরণ করিয়াছি, আমাদের অধস্তর প্রকৃতি সম্বন্ধে ততই সজাগ সচেতন হইয়াছি; আর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমাদের পূর্ব্বেকার উপরের চেতনাও সেই অনুপাতেই মলিন হীনপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। তাই বর্ত্তমানের যুগে দেখি আদিকালের সৌষ্ঠব পারিপাট্য হাস্যলাস্য আমাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে নাই; আমরা ভূগর্ভস্থ খনির মজুরের মত কয়লায় ময়লায় স্বেদে খেদে ক্লিন্ন খিন্ন হইয়া উঠিয়াছি। তবে আবার উপরের অর্দ্ধের চেতনা যেমন অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে, নীচের অর্দ্ধেকের চেতনা তেমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষের স্বভাবে বা চেতনায় এই পরিবর্ত্তন তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে পর্য্যন্ত নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতেছে। সমাজের গোষ্ঠীগত জীবনের মধ্যেও দেখি চলিয়াছে একটা অবরোহণ। এতদিন সমাজে কর্ত্তৃত্ব ছিল পুরুষের আর দ্বিজাতির—বর্ত্তমানে সেই কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইয়াছে নারী আর শূদ্র, যাহারা সর্ব্বপ্রকারে ছিল পরাধীন অধঃপতিত। নারীর আর শূদ্রের অভ্যুত্থান—বর্ত্তমান যুগের ইহাই হইল সকলের চেয়ে বড় কথা। নারী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, পুরুষের পুরুষালীতে পর্য্যন্ত যাইয়া সে দাবি করিতেছে; আর শূদ্র পা হইতে এখন সমাজের মাথায় আসন করিয়া লইতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞান শৌর্য্য বীর্য্য ধনদৌলত সমস্ত আজ তাহারই করতলগত হইয়া চলিয়াছে। এখানেও এই অবরোহণ—ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রের, পুরুষ হইতে নারীর রাজ্যে অবতরণ, ইহারও অর্থ পৃথিবীর উপর নামিয়া আসা। নারী আর শূদ্র, এই দুইটি হইতেছে পৃথিবীর শক্তি—পার্থিব সত্তার ও সত্যের, ঐহিক চেতনার প্রতিনিধি ইহারা দুই জনা। নারী ত প্রকৃতি, আর প্রকৃতির স্থূল রূপ বা বিগ্রহ হইতেছে পৃথিবী; আর উপনিষদে বলিতেছে পোষণকারী পৃথিবীর অন্য নাম পুষা এবং সে শূদ্রবর্ণা—শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং (বৃহদারণ্যক—১।৪।১৩)। সামাজিক ক্ষেত্রেও আমরা পৃথিবী পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাই নাই—কারণ একেবারে হালে সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা হইতে চলিয়াছে শূদ্রেরও শূদ্র যাহারা—চতুর্থ বর্ণ নয়, পঞ্চম ব বর্ণ। অস্পৃশ্য যাহারা; আর নারীর মধ্যেও তাহারাই যেন তত প্রধান হইয়া উঠিতেছে যাহারা কুলশীল যত বিসর্জন দিতে পারিয়াছে।

এই যে অবরোহণ বা অবতরণ, ইহা অধঃপতন নয়? প্রকৃতির মধ্যে একটা আরোহণেরই ধারা চলিয়া আসিতেছে জানিতাম—তবে এই অবরোহণের অর্থ কি, সার্থকতা কি?

প্রকৃতির যে আরোহণ—যাহার নাম বিবর্ত্তন, ক্রম-বিকাশ, ক্রম-পরিণাম বা ক্রমোন্নতি—তাহার মূল কথা, অচেতন হইতে সচেতন হইয়া উঠা, আর এই সচেতন হইয়া উঠার ফলে একটা রূপান্তর ও ধর্ম্মান্তর। স্থূলভূত হইতে ক্রমে ক্রমে যে মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে, প্রকৃতি জড় হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে রূপান্তরিত ধর্ম্মান্তরিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার ভিতরকার প্রেরণা হইতেছে এই—অধিকতর সচেতন সজ্ঞান হইয়া উঠা। খনিজ হইতে উদ্ভিদ বেশী সচেতন, উদ্ভিদ হইতে পশু আরও সচেতন, পশু হইতে মানুষ আরও এক মাত্রায় বেশি সচেতন। আবার মানুষেরও মধ্যে আছে অভি-ব্যক্তি হিসাবে স্তর বিভাগ—তাহারও মূল তত্ত্ব ঐ একই। আদিম মানুষ বলি তাহাকে যে মানুষোচিত সচেতন ভাবের গোড়াপত্তন করিয়াছে, কেবলমাত্র পশুর চেতনার খোলস যে সবে পরিত্যাগ করিয়াছে; আর যে মানুষ নিজের সম্বন্ধে নিজের আকৃতিপ্রকৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম হাবভাব সম্বন্ধে যত সজাগ যত সচেতন, ক্রমবিকাশের তত উন্নত-সোপানে সে তত সে সভ্য শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মানুষ বরাবর এই যে উপরের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে ক্রমোন্নতির একটা বিপুল আবেগে বা প্রলোভনে, তাহাতে একটু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে; উপরে সে উঠিয়াছে বটে, কিন্তু যতই উপরে সে উঠিয়াছে নীচের কথাও ততই ভুলিয়াছে—নীচের আয়তনগুলির মধ্যে তাহার চেতনাকে প্রোজ্জ্বল প্রদীপ্ত পাবক করিয়া তুলিবার অবসর তাহার হয় নাই। পরিশেষে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়িল যখন ওপারে, তখন তাহার সাধনা হইল এপারটি কোন রকমে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাওয়া—অমুত্রের সিদ্ধির জন্য ঐহিকের দিকে চক্ষু মুদিয়া থাকা। এইভাবে উপরের ভাগ দিয়া সে হয়ত উপরের আলো ধরিয়াছে, কিন্তু নীচের ভাগ যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে; পরিশেষে যখন সে ব্রহ্মানন্দের মধ্যে সমাধির মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লইয়াছে ঠিক তখনই তাহার ব্যবহারিকের আধার সর্ব্বাপেক্ষা তমোগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আরোহণের ব্যস্ততায় ত্রস্ততায় মানুষ একদিন যে সকল ধাপ ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গিয়াছিল, সত্যকার ক্রমবিকাশের বিবর্ত্তনের জন্যই সে গুলিতে ফিরিয়া আবার নামিয়া আসিতে হইতেছে, একে একে গভীরতর ভাবে তাহাদের পরিচয় লইতে হইতেছে। বলিলাম বিবর্ত্তনের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনের জন্য—কি প্রয়োজন তাহা? অবশ্য মানুষের কি সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্যই যদি হইত নির্ব্বাণ বা প্রলয়, ঐহিকের হাত হইতে ঐকান্তিক মুক্তি—তবে স্বীকার করিলেও করিতে পারিতাম যে ঐহিককে কোন প্রকারে ভুলিয়া যাওয়া, চেতনা হইতে যেরূপে হোক তাহাকে বহিষ্কার করাই নিঃশ্রেয়স; সে রকম অবস্থায় যে আধারকে বিসর্জ্জন দিলাম, যে প্রকৃতিকে বাতিল করিলাম তাহার কি গতি হইল বা না হইল তাহাতে আমার বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু সৃষ্টির প্রকৃতির লক্ষ্য তাহা নয়, মানুষের চরম সিদ্ধিও এই পথে নয়। ঐহিকের মধ্যে, পৃথিবীর উপরে, দেহকে আশ্রয় করিয়াই চাই চরম পরম সংসিদ্ধি—ইহৈব তৈত্তিতং।

পৃথিবীর যে জড়তা, দেহগত চেতনার যে তমঃ তাহা এক পাশে ফেলিয়া রাখিলে বা কাটিয়া বাদ দিলে, আর কোন লোকের একটা স্থায়ী সিদ্ধি আমরা অধিকার করিতে পারি, কিন্তু পার্থিব প্রতিষ্ঠানে জীবনের মধ্যে জাগ্রত কোন রূপান্তর ধর্ম্মান্তর প্রকটিত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। অথচ সমস্ত প্রকৃতির ক্রমগতির লক্ষ্যই হইতেছে এই দৃশ্য এই জড়ের মধ্যে চৈতন্যকে মূর্ত্ত করিয়া তোলা, পৃথিবীকে দেবত্বের বিগ্রহ করিয়া তোলা, মৃত্যুকে অমৃতত্বে পরিণত করা।

পৃথিবীকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া ধরিতে হইলে দুই দিক হইতে কাজ করা প্রয়োজন। প্রথম, পৃথিবীর উপরের দিকে; দ্বিতীয় পৃথিবীর নীচের দিকে। বিবর্ত্তনের ক্রমগতি একদিন এই উপরের দিকটা লইয়া ব্যস্ত ছিল, তাহাকে জাগ্রত সচেতন করিয়া ধরিতেছিল, দূর হইতে—"পরম ব্যোম" হইতে আলো বাতাস লইয়া আসিয়া তাহার মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছিল—অন্য কথায়, আমাদের বা প্রকৃতির সাধনা ও সিদ্ধির ক্ষেত্র এ যাবৎ ছিল বিজ্ঞানময়, মনোময় আর প্রাণময় জগৎ। কিন্তু পৃথিবীর নীচেকার জগৎ যদি আলোকিত না হয়, তবে পৃথিবী পূর্ণ আলোকিত হইবে না, উপরকার জগত সকলও সম্যক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে না। কারণ পৃথিবীর নীচে, জড়-চেতনার অভ্যন্তরেই রহিয়াছে সকল সৃষ্টির সকল বীজ—অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা দেখি তাহা অঙ্কুর, ডালপালা, ফুলফলমাত্র।

প্রাচীন যুগে এক সময়ে আমরা অর্দ্ধমানব আর অর্দ্ধ-পশুরূপী নানা জীবের কল্পনা করিয়াছি—sphinx, centaur satyr, mermaid ইত্যাদি—তাহার পিছনে খুব সম্ভব আছে এই সত্যের অনুভব যে, উপরের অর্দ্ধেকে মানুষ মানুষ হইলেও নীচের অর্দ্ধেকে সে নানা ভঙ্গীতে পশুমাত্র। এই নীচের অর্দ্ধেকের পশুকে কি রকমে রূপান্তরিত করিয়া পূর্ণ মানুষ অথবা দেবত্বে পরিণত করিতে হয় সে রহস্য আমরা খুঁজি নাই; বড় জোর ইহাকে ভুলিয়া ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া উপরের অংশকে ধরিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু ফলে বোধ হয় বেশির ভাগ উপরের অংশকে নীচেরই সেবায় পরিশেষে নিযুক্ত করিয়াছি। দেহের প্রাণের মনের ব্যক্ত ধারাকেই মাজ্জিত শানিত করিয়াছি, কিন্তু অব্যক্তে তাহাদের যে আপনকার রূপ সেখানে কোন

হাত দেই নাই। প্রকৃতিকে আমরা প্রাকৃতই করিয়া রাখিয়াছি, প্রকৃতির সম্পদ যতদিন উপভোগ করিয়াছি তাহা প্রকৃত হিসাবেই করিয়াছি—দেবত্ব বা পুরুষার্থ রাখিয়াছি এই প্রকৃতির বাহিরে কোথাও।

কিন্তু বর্ত্তমানে হাওয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, আমাদের চক্ষু খুলিয়াছে। আজ মানুষ সাহিত্যে শিল্পে জীবনে তাহার প্রকৃতিকে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেছে—কারণ এই সব অজ্ঞাত অবজ্ঞাত লোকে উপরের আলোক প্রবেশ করিতে সুরু করিতেছে; রূপান্তরের আয়োজন হইতেছে বলিয়াই সেখানে অধিবাসীরা সব জাগিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে কোলাহল, চাঞ্চল্য—দেখা দিয়াছে ওলটপালট, ভাঙ্গাচুরা।

আমরা আজ চেতনার পাতালে রসাতলে নামিয়া যাইতেছি—সৃষ্টির মানুষের গোড়াকার রহস্য আবিষ্কার করিতে। কোথায় original sin তাহাকে আর না রাখিয়া ঢাকিয়া, স্পষ্ট খুলিয়া ধরিতে। মানুষের হাড়ে মজ্জায় যত বিষ যত কলঙ্ক জমিয়া আছে, প্রকৃতির স্থূলতম জড় অণুতে অনুস্যূত যত কলুষ কল্মষ সেগুলি আমরা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে লাগিয়া গিয়াছি। পৃথিবীর পার্থিব সত্য ও শক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে যে সকল গোপন গহ্বরে সেখানে আমরা জ্ঞানের সন্ধানী আলো ছড়াইয়া দিয়াছি। সংসার যদি বিষবৃক্ষই হয়, তবে খুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া বিষবৃক্ষের গোড়ায় শিকড়ের মধ্যে চলিয়া যাইতে হইবে, সেখানে ঢালিতে হইবে আলো বাতাস—নূতন রকমের সার বা রসায়ন, তবেই না বিষবৃক্ষ অমৃতবৃক্ষে পরিণত হইতে পারিবে।

আমার প্রিয়া

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আমার প্রিয়া নয়রে কোনো
ধনীর মেয়ে সে,
হয়নি বড় বড়-ঘরের
সোহাগ স্নেহে সে।
নয় রূপসী,— নয় সে মোটেই
কুন্দ-বরণা,—
নয় সে বনের হরিণ সম
চটুলচরণা।
বাঁশীর মত নয় নাসিকা—
চিত্ত হরে না,
হাসির কালে মোটেই মুখে
মুক্তা ঝরে না.
মরাল গ্রীবা, খঞ্জন চোখ,—
স্বর্গীয় দ্যুতি
বিম্ব অধর কিম্বা কপোল
নয়রে নিখুঁৎই।

কথার বেলা পাইনে কোনো
গানের ইসারা,—
খোঁজ্ করিনি বুকের মাঝে
আয় সে কি সাড়া!
নামটি তাহার নয় "উর্ব্বশী."
নয়ক "ঊষা"রে,
আদর করে' কেউ ডাকে না
"মঞ্জুষা" তারে।
"মঞ্জুলিকা," "মঞ্জুরাণী"—
কেউ তারে না কয়—
"বন্-মালতী"—"হাস্নু-হানা"
"জ্যোৎস্না-কণা" নয়।
"সিপ্রা" "রেবা", "দীপ্তি," "আভা"
নয়ক কভু রে;
যে যা' বলুক—আমার কাছে
প্রিয়াই তবু সে।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

প্রকৃতির ষড়রূপের মধ্যে এলায়িত ঘন-মেঘ-কুন্তলা দীপ্ত-বিদ্যুত-চর্চ্চিতা স্নিগ্ধশ্যামাঙ্গিনী বর্ষা সুন্দরীই আমাদের কবিকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ ক'রেছে বলে মনে হয়।

চূত-মুকুল-গন্ধ-উতলা দক্ষিণ-সমীর-উত্তরী-চঞ্চল বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য্য, রজত মেঘ-কিরীটিনী শেফালি-সুশোভনা শারদ লক্ষ্মীর আলোক-বীণার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা এই প্রকৃতি-প্রেম-বিহ্বল কবিকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে বটে, কিন্তু এই কাজল-কালো সজল-নয়না প্রাবৃষা সুন্দরীর নব নব কাজরী গুঞ্জনের বিচিত্র রাগিণী তাঁকে যেন একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছে!

প্রকৃতির সঙ্গে আপন একাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্য ও রসলীলার মধ্যে আপনাকে নিগূঢ় ভাবে মিশিয়ে দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

এই সুন্দরী প্রকৃতির বিচিত্র-সৌন্দর্য্য সম্ভারকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিত্বের রসধারা উৎসারিত হ'য়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত কবির অন্তরের অখণ্ড গভীর যোগ তাঁর সমস্ত কাব্যের মধ্যেই মূল সূত্রের ন্যায় গ্রথিত রয়েছে। প্রকৃতিকে বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করবার, পরিপূর্ণ রসে অনুভব করবার ক্ষমতা তাঁর জন্মগত বা সহজাত শক্তি ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

বর্ষচক্রের বিজয় রথে চড়ে' ধরণী বক্ষে পরের পর আসা ছয়টি ঋতুকেই এই রূপদক্ষ রসশিল্পী তাঁর অসাধারণ ভাব-নৈপুণ্যে ও অভিব্যক্তি-পটুতায় জয় ক'রে নিয়ে ভারতীর কাব্য-নিকুঞ্জে বন্দী ক'রে রেখেছেন। সকল ঋতুই কবির মন্ত্রময় বাঁশীর সুরে তাঁর কাব্য-কাননে নিজেদের মূর্ত্তরূপে ধরা দিয়ে সার্থক হ'য়েছে, কিন্তু বর্ষা যেন উল্লাসে বিষাদে চাঞ্চল্যে গাম্ভীর্য্যে, ঔদাস্যে উৎসাহে, হাসি-কান্নায় নৃত্য-গীতে ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র হ'য়ে বারে বারেই এই কবিকে ভুলিয়ে তার গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে।

জগতের সকল কবিই ষড়ঋতুর মধ্যে ঋতুরাজ বসন্ত-কেই বিশেষ ভাবে স্তুতি ক'রে গিয়েছেন এবং শরতের প্রতিও তাঁদের পক্ষপাতিত্ব কতকটা দেখা গিয়েছে। কিন্তু বর্ষার জয়গান একমাত্র বৈষ্ণব-কবিগণের রচনার মধ্যে ছাড়া অন্যত্র বিরল। অবশ্য মহাকবি কালিদাসের 'মেঘ-দূত' বিশ্ব-সাহিত্য ভাণ্ডারে বর্ষার সৌন্দর্য্যরস-পরিবেশনে যথেষ্ট দৌত্য করেছে।

বর্ষা কেবল একটি মাত্র রূপ নিয়েই ধরণীর দ্বারে এসে দেখা দেয় না। সে নিত্য নূতন ভাবে সুসজ্জিতা হ'য়ে নব নব সৌন্দর্য্যশ্রীতে উদ্ভাসিতা হ'য়ে দেখা দেয়। সে আসে কখনও উন্মুক্ত-মেঘ জটা বিদ্যুৎ-ভ্রূকুটী-নয়না ঝঞ্ঝা-ক্রোধ-দীপ্তা রুদ্র-ত্রিশূল-হস্তা ভৈরবী-রূপে, কখনও প্রেমাবিষ্ট-নয়না বিহ্বল-আত্মবিস্মৃতা মনোমোহিনী রূপে, কখনও প্রিয়-বিরহাতুরা ম্লানমুখী বেদন-কাতরা বিষাদিনী বেশে, কখনও দীর্ঘ-বিরহান্তে মিলন-পুলকমগ্না তরুণীর হাসি ও অশ্রুর মিলিত-লীলা সমন্বয়ে স্নিগ্ধ-মধুর সুষমা মণ্ডিতা হ'য়ে। প্রতি মুহূর্ত্তে তার সেই অভিনব রূপের বিচিত্র-সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নাগ্রে প্রতিফলিত হ'য়ে—অন্তরের গোপন তারে এক অননুভূতপূর্ব্ব ব্যথা ও পুলকের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তোলে। সমস্ত ধরণী ও আকাশ-পরিব্যাপ্ত বর্ষার সেই-সুর, নিখিল-মানবচিত্তের মধ্যে যা' অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে, কবির কাব্য ও সঙ্গীতে আমরা যেন তারই প্রাণের স্পন্দন আবার নূতন ক'রে অন্তরঙ্গ ভাবে অনুভব ক'রতে পারি।

পূর্ব্বেই বলেছি প্রকৃতির ষড় রূপই এই পরম রসিক কবির সূক্ষ্ম অনুভূতি'র ঘন আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে, এবং কবিও প্রত্যেক রূপটিকেই যোগ্য সমাদরে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এই নব-ঘন-বসনা বর্ষাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ়-চিত্রজল্পতা দর্শনে সহজেই সন্দেহ হয় যে তিনি এর প্রেমে একটু বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছেন! এই মধুর

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

পক্ষপাতিত্ব-টুকু দ্রুপদ-দুহিতা কৃষ্ণার অন্তরে ফাল্গুনীর প্রতিষ্ঠার ন্যায় মোহন-বিশেষত্বে মণ্ডিত এবং অতি উপভোগ্য। প্রাবৃষার প্রতি কবির এই অতিরিক্ত মুগ্ধ অনুরাগ, তাঁর অসংখ্য স্তবগানে ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছে দেখা যায়।

আসন্ন আষাঢ়ের 'নবীন-মেঘ-ঘনিমা' হ'তে আরম্ভ ক'রে 'মাহ ভাদরে'র ক্লান্ত-বর্ষণ প্রাতের অশ্রু-ধৌত স্নিগ্ধ-রৌদ্র রেখার আনন্দ-হাসিটুকু পর্য্যন্ত—বর্ষা সুন্দরীর সর্ব্ব অবয়বের প্রতিচ্ছবি, লীলায়িত-অঙ্গের প্রত্যেকটি তনুরেখা, বেশ-বাসের বহু বিচিত্রতা, তার অপূর্ব্ব কণ্ঠের সমস্ত সুর, তাল, লয়, রাগ, তার রত্নালঙ্কারের মধুর শিঞ্জনধ্বনি,—হাসি-অশ্রু মৌন-মুখরতা—তার সর্ব্ব-লীলারস কবি যেন নিঃশেষে আপন অন্তরপুটে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে নিয়েছেন, এবং নব নব ছন্দহারে তাকে কাব্যে রূপায়িত ক'রে বর্ষার প্রেম-তর্পণ ক'রেছেন।

প্রথম ধারাপাতে সিক্ত ধরণীর উদ্গত-মৃৎ-সৌরভে কেতকী-কুঞ্জের মোহ-মদির সুগন্ধে যূথী-কাননের করুণ সুমিষ্ট বাসে, ভুঁই-চাঁপাদের নিঃশব্দ-কটাক্ষে, মেঘ-ছায়াঙ্কিত সবুজের বুকে কবি কত অভিনব বিস্মৃত-বার্ত্তাবাহী-লিপিকা—কত বিস্ময়-ঘন অশ্রুত-কাহিনী পাঠ ক'রে চলেছেন, তার অপূর্ব্ব দুর্লভ ইতিহাস—তার রোমাঞ্চকর অনুভূতি সমস্ত লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে কবির কাব্যের প্রতি ছন্দে ও ছত্রে।

আজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরাও আমাদের বহিশ্চক্ষু ও অন্তশ্চক্ষু মেলে বর্ষাকে আর তার কেবল একটি মাত্র রূপেই দেখতে পাচ্ছিনে; প্রাবৃষার প্রতিক্ষণের পাদ-বিক্ষেপে তার নব নব রূপ আমাদের দৃষ্টিপথে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে—নূতন নূতন রস আমাদের অন্তরের ভাব-পাত্রে রসায়িত হচ্চে! আমরা বর্ষাকে আজ অনেকটা অন্তরঙ্গ রূপে স্পষ্ট ভাবে ধরতে পারছি।

সঙ্গীতে এবং কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-প্রশস্তি অফুরন্ত হ'লেও আমি তারই ভিতর হ'তে কতকগুলি গান ও কবিতার পুনরাবৃত্তি ক'রে এই গগন-সঞ্চারিণী চির-স্বাধীনা বিচিত্রা বর্ষাকে, কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে কেমন প্রগাঢ় প্রেমে ও নিগূঢ় সৌন্দর্য্যে বন্দিনী করেছেন, তার একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রবো।

এই সব গান, এই সব কবিতা এমন হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী, ভাব-সৌন্দর্য্য ও সত্যানুভূতি তার ছত্রে ছত্রে এমন ভাবে প্রতিফলিত যে, কোনও অংশ বাদ দিয়ে খণ্ড ভাবে উদ্ধৃত করা কঠিন। এর একটি ছত্রও ছাড়তে মন সরেনা। কিন্তু এই নিবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে সেরূপ ভাবে পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয় ব'লে আমি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবেই পরিচয় দিতে চেষ্টা ক'রবো।

কবির বর্ষার গান ও কবিতা গুলিকে আমি চার ভাগে বিভক্ত ক'রে নিয়েছি। আসন্ন-বর্ষা, নববর্ষা ঘনবর্ষা ও ক্লান্ত-বর্ষা;—এই চারটি রূপের মধ্যে যে বিভিন্নতর সৌন্দর্য্য এবং রস-সমাবেশ আছে—সে গুলিকে পাশাপাশি পৃথকভাবে রেখে দেখলে তা' অনেকটা স্পষ্টতর রূপে হৃদয়ঙ্গম হবে।

আসন্ন বর্ষা

ধূলায় ধূসর রুক্ষ-উড্ডিন-পিঙ্গল-জটাজাল, রক্ত-চক্ষু রুদ্র নিদাঘের দাব-দগ্ধ দিগন্তে ছায়া-ঘন মেঘের গুরু-গুরু গরজনে বরষার স্নিগ্ধ-আভাস ধরণীর তৃষিত প্রাণকে কতখানি যে উন্মুখ ও ব্যগ্র করে' তোলে, কবি তাঁর নিজের হৃদয় দিয়ে সেটি অনুভব করেছেন; তাই তৃষ্ণা-কাতর-নেত্র উর্দ্ধে মেলে উদ্গ্রীব-কণ্ঠে তাকে আহ্বান করেছেন—

> "এসহে এস তৃষ্ণার জল,—
> ভেদ কর কঠিনের ক্রুর-বক্ষতল
> কল কল ছল ছল।"

শুভাগমন বার্ত্তা নিয়ে ঝঞ্ঝা-দূত ধরণীর বুকে নেমে আস্‌চে। বর্ষা-রাণীর ঝলসিত বিবর্ণ আকাশের আপিঙ্গল-নেত্রে কোন্ বিস্মৃত স্বপ্ন ছায়ার কালো আভাস ঘনিয়ে আসছে—তার জ্বলন্ত দৃষ্টি কার আকুল প্রতীক্ষায় স্নিগ্ধ ও উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে।

বুকে তার আনন্দের ঝড় উঠলো। এ 'কাল-বৈশাখী'র উদ্দাম তাণ্ডব নয়, আসন্ন-বর্ষার আভাসে পুলকিত-বাতাসের

উল্লাস-কম্পিত নৃত্য! বর্ষণ-প্রতীক্ষু অশান্ত-হাওয়ার সঙ্গে কবির চিত্তও অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। উতলা-বাতাসের সুরে সুর-মিলিয়ে কবি ডাকছেন—

"হাঁকিছে অশান্ত বায়
'আয় আয় আয়!" সে তোমারে খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গ-রবে
করতালি দিতে হবে
এস হে চঞ্চল!
কলকল ছলছল।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এস বন্ধহীন ধারা—
এস হে প্রবল!
কলকল ছলছল।"

'লোলুপ চিতাগ্নি-শিখা লেহি লেহি বিরাট-অম্বর' এবার নূতন মেঘস্তূপে দ্রুত-আচ্ছন্ন হ'য়ে চলেছে। জ্যৈষ্ঠ-অন্তে বিদগ্ধ-আকাশ-পটে নব-মেঘোদ্গমের স্নিগ্ধ-ছবিতে কবি হর্ষোৎসাহিত কণ্ঠে আহ্বান ক'রছেন—

"হে নূতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি'
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি' লুপ্ত করি' স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন-ঘোর স্তূপে।"

নিদাঘ-তাপিতা ধরণী তীব্র তৃষ্ণায় এত কাতর যে বর্ষাকে কবি বিপুলতর বেগে ঝাঁপিয়ে আসতে ডাকছেন। শিথিল মৃদু চরণপাতে অলস গুরু গুরু রবে এলে এ পিপাসার নিবৃত্তি হবেনা, এ জ্বালা স্নিগ্ধ হবে না,—ভৈরবী ভীমা মূর্ত্তিতে বিজয়িনীর বেশে, ত্বরিত গতিতে ঝাঁপিয়ে আসা চাই। তাই বলছেন—

"তোমার ইঙ্গিত যেন ঘন-গূঢ় ভ্রুকুটীর তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে
বায়ু গর্জ্জে' আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসার তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি' হাসে—"

তারপরে আমরা গগন-অঙ্গনে সমাগত মেঘদলের ঘন-সমারোহ দেখতে পাই। এই নবীন মেঘের উৎসবে নিদাঘ-বিবর্ণ আকাশের জ্বলন্ত বক্ষ কাজল-কালো প্রলেপে স্নিগ্ধ হওয়ার ছবি,—যা' কোনও এক আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মহাকবি কালিদাসের অন্তরে বিপুল বিরহ-বেদনা জাগ্রত করে সেই অকথিত বিরহ-ব্যথাকে মেঘ-দূতের বিরহী চক্ষে রূপান্তরিত করে' তুলেছিল,—সেই নব মেঘসৌন্দর্য্য আমাদের কবিকে কোনো অজানার আকর্ষণে, অকারণ-বিরহব্যথায় উন্মনা করে' তুলেছে দেখতে পাই। তাই আসন্ন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিনখানি তাঁর কণ্ঠে অলস উদাস রাগিণী ঝঙ্কৃত করে' তুলেছে—

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে' আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।"

আজ এই মৃদু-দেয়া-গরজিত মেঘলা-দিনে তিনি ব'সে আছেন তাঁর কোনও পরম প্রার্থিতের প্রতীক্ষায়। বৎসরের অন্য কতদিন নানা কাজের বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে এসেছে —তাঁর কাছ হ'তে কাজ নিয়ে গেছে ও কাজ দিয়ে গেছে—কিন্তু—

"আজ আমি যে বসে' আছি তোমারি আশ্বাসে।"

আজ এই মেঘ-ঢাকা দিনে প্রকৃতির গভীর আন্তরিকতা সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে,—প্রকৃতির সেই গভীরতা কবি তাঁর অন্তরে নিবিড় রূপে অনুভব করতে পেরেছেন। তাই আজ তাঁর কাছে 'কাজের প্রয়োজন' নেহাৎ তুচ্ছ ও অনাবশ্যক হ'য়ে গেছে। আজ তিনি অকারণ-প্রতীক্ষায় কোন্ গভীর গোপন অতলের আসা পথ পানে আঁখি মেলে বসে আছেন।

এই অকারণ-প্রতীক্ষার উদ্বেগ, এই অকারণ পুলক-বেদনায় বক্ষ-দোলন, এই তো আজিকার মেঘাচ্ছন্ন-দিনের সত্য বস্তু, আর সবই মিথ্যা—সবই তুচ্ছ।

মেঘলোকে আত্মহারা কবির মন আজ আঁধার গগন-পথে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে। উতলা-প্রাণ তাঁর মেঘলা হাওয়ার ব্যথিত নিঃশ্বাসের সাথে আকুল হ'য়ে কেঁদে ফিরছে।

"দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত-বাতাসে।"

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

আসন্ন বরষার মেঘ-সমাগম কবির চিত্তকে ক্রমশঃই অধিকতর দোলা দিয়ে সচঞ্চল করে' তুলছে। নীল-নভতলে তারই ঘনায়মান আবির্ভাবের দিকে চেয়ে তিনি উদ্বেল-স্বরে ব'লছেন—

"একি গভীর বাণী এল
ঘন মেঘের আড়াল ধরে,—
সকল আকাশ আকুল করে'।
সেই বাণীর পরশ লাগে,
নবীন প্রাণের বাণী জাগে'
হঠাৎ দিকে-দিগন্তরে!
ধরার হৃদয় ওঠে ভরে'।"

মেঘের ঘন ঘন ডাক কবিকে ঘরের বাইরে টেনে আনছে। তাঁর ভাবনা আজ উতলা হ'য়ে উঠেছে 'অকারণে'র প্রেরণায়। তিনি মেঘাবিষ্ট-নয়নে বিহ্বল-কণ্ঠে গান ধরেছেন—

"আজ, নবীন মেঘের সুর লেগেচে আমার মনে!
আমার ভাবনা যত উতল হ'ল অকারণে।
কেমন ক'রে যায় যে ডেকে
বাহির করে ঘরের থেকে
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে-ক্ষণে।"

এই বিচিত্রা বর্ষাসুন্দরীকে আমরা সকলেই মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এমন নিবিড় ও সুস্পষ্টরূপে ধরতে পারিনা কেন? তার কারণ আমাদের দেখার সঙ্গে এই পরম রসগ্রাহী ভাব-শিল্পী কবির দেখার পার্থক্য আছে। আমাদের চক্ষে অতি শীঘ্র পুরাতনের ছোপ্ লেগে যায়। এই পুরাতন-লাগা' বা বৈচিত্র্যহীনতার অঞ্জনে আমাদের দৃষ্টি এত সহজে ঘোলা হ'য়ে ওঠে যে, এই পত্র পুষ্পাচ্ছন্না, নদী গিরি নির্ঝর অলঙ্কৃতা, সুন্দরী ধরিত্রীর অঙ্গন দিয়ে, প্রভাত-সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না-রৌদ্রের যে ঘুরে ফিরে নিত্য-যাতায়াত চলেছে, তার মধুর সৌন্দর্য্য আমরা নিবিড়ভাবে দেখতে পাই না, কারণ আমাদের দৃষ্টি বৈচিত্র্যহীনতার আবরণে ঢাকা রয়েছে, এবং চিত্তের রস-গ্রাহিতা-শক্তি, জীবনের দৈনন্দিন সাংসারিক ও দৈহিক প্রয়োজনের গুরু-ভারে শুষ্ক ও শীর্ণ হ'য়ে পড়েছে।

এই বিহগ কাকলি-মুখর পুষ্প-বিকাশ সমারোহ-লগ্ন চির নবীন প্রভাতের শুভ্র স্নিগ্ধ-আলোক ধারার প্রেম-সম্ভাষণ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাইনে,—হঠাৎ কখনও কখনও তার ঈষৎ আভাস পাই মাত্র।

সিন্দুর-চর্চ্চিতা লাজ বিনম্রা শান্ত সন্ধ্যার স্নিগ্ধ রূপশ্রী আমাদিগকে প্রতিদিনই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেনা। পশ্চিমের অলস মেঘ স্তবকের উপর গোধূলির বিচিত্র বর্ণ চাতুর্য্য-লীলা আমাদিগকে ক্ষণতরে বিমোহিত ক'রলেও, বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে সেই বর্ণ তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে আমরা প্রতিদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারি না। তার কারণ আমাদের সঙ্কীর্ণদৃষ্টি নিত্যই একই বস্তু দেখে; সে তার মধ্যে নূতনত্বের আনন্দ-আস্বাদ পায়না, তাই তার সকল সৌন্দর্য্য সকল বিচিত্রতা আমাদের কাছে অস্পষ্ট হ'য়ে যায়। অফুরন্ত শোভা-সম্পদ ময়ী বিচিত্রা প্রকৃতি আমাদের দৃষ্টির সামনে তাঁর চির-তারুণ্যের চির-নবীনতার পসরা বিকশিত ক'রে ধ'রে থাকলেও আমরা তা' দেখতে পাইনে। বর্ষা তাই আমাদের কাছে বর্ষে বর্ষে নূতন প্রহরে প্রহরে বিচিত্র হ'য়ে ওঠেনা।

কবির দৃষ্টি চির-নবীনতার শ্যাম-অঞ্জনে বিরঞ্জিত। এই যে ভোরের আলো, এ প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টির সামনে আসে—কিন্তু সেই একই রূপে নয়, প্রতিদিনই সে নূতন হ'য়ে আসে। যে কোনও দিন পুরাতন নয়, তাই সে চির সুন্দর। আমরা আমাদের রুগ্ন দুর্ব্বল দৃষ্টি দিয়েই তাকে পুরাতন ক'রে ফেলি। সে কিন্তু প্রতি-নিশান্তে পরিপূর্ণ নবীনত্বে মণ্ডিত হ'য়ে এসে ফুলের কুঁড়ি'র ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, বিহঙ্গমের নিঃশব্দ-নীড়গুলি মুখর ক'রে তোলে, সুপ্তা ধরণীর শ্রবণে দিবসের পায়ের নূপুর ঝঙ্কার পৌছে দেয়। এই প্রভাত-আলোরই মতো রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি চির-নূতনত্বের কোমল দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তিনি প্রতিদিনই নবীন-দৃষ্টি নিয়ে আঁখি মেলে চান—তাই এই সুন্দরী পৃথিবীর নিত্য-নব সৌন্দর্য্য তাঁর নয়নে স্পষ্ট প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছে।

ধরণীর কোলে নবাগত শিশু আকাশের পানে যে বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায়, আজন্ম-অন্ধ প্রথম নব দৃষ্টি লাভ করে রূপসী-ধরার পানে যে বিপুল বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চায়,—

চেয়ে চেয়ে অপরিসীম আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়ে, এই পরম-রসিক কবির দৃষ্টি সেই প্রথম-দেখারই নূতনত্বে নিত্য-বিমণ্ডিত। পৃথিবীকে প্রতিদিনই নবীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেন বলে, প্রকৃতির কোনও সুগোপন সৌন্দর্য্য ও রস-মাধুর্য্য তাঁর নিকটে লুকিয়ে থাকতে পারেনি।—ষড় ঋতু প্রতিবর্ষে কবির চির-নবীন দৃষ্টির সামনে অফুরন্ত রূপ-উৎস উৎসারিত ক'রে নৃত্যে গীতে শোভায় সম্পদে নেমে আসে।

বর্ষাকে তিনি প্রতিবর্ষেই এমন নূতন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখেন, যেন—এই দেখাই তাঁর প্রথম-দেখা,—এর পূর্ব্বে বর্ষার সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র যেন তাঁর জানা ছিলনা।

কবির কাব্য ও সঙ্গীত এ কথা আজ আমাদের সকলকে জানিয়ে দিয়েছে যে বর্ষার মধ্যে প্রকৃতই অভিনব রূপ ও রসের লীলা-চাতুর্য্যের অন্ত নেই। সে কখনও রোষোদ্দীপ্তা, কখনও বিষাদ-মগনা, কখনও পুলক-বিহ্বলা, কখনও শোকোন্মাদিনী, কখনও উদাসিনী, কখনও হাস্য-চঞ্চলা।

নিদাঘ-দগ্ধ আকাশ তলে বাদল-ছায়া নেমে আসার স্নিগ্ধ ছবি কবির নয়নে কোনও নীলনয়নার কাজল-আঁকা চ'খের সজল-করুণ চাউনি রূপে প্রতিভাত হ'য়েছে।

"হেরিয়া শ্যামল-ঘন নীল-গগনে
সজল কাজল-আঁখি পড়িল মনে।
অধরে করুণা মাখা
মিনতি বেদনা আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-ক্ষণে।"

* * *

"আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভ'রেছে অই গগনের নীল-নয়নের কোণে!
আজকে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে
অমনি ফিরে যেওনাক' গোপন সঞ্চারে;—
দাঁড়িয়ো আমার মেঘলা-গানে বাদল অন্ধকারে।"

এইবার দেখতে পাই সমাগত মেঘ-সৈন্যদল ঘন-গুরু-গর্জ্জনে রণশঙ্খ মন্দ্রিত ক'রে নিদাঘের বিরুদ্ধে জয়যাত্রার আয়োজন ক'রছে।

ধরণী তার পরম-প্রার্থিত অতিথির 'দুরু দুরু, গুরু গুরু' আহ্বানের উত্তর দিতে ভোলেনি। এই মেঘের ডাকের প্রত্যুত্তর ধরার বুকের মূক-ভাষায় নীরব-ইসারায় যা' ফুটে উঠ্ছে,—কবির চির-উৎকর্ণ শ্রবণে তা' বেজেছে! কবির কানকে সে এড়াতে পারেনি।

কবি শুনতে পাচ্ছেন—'আকাশ-তলে দলে দলে মেঘ যে ভেসে যায়—

"আয় আয় আয়।"
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই,
"যাই যাই যাই।"
উড়ে-যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক ভরা ডালে
পাতায় পাতায়!
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ভেসে যায়
"আয় আয় আয়।"
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই
"যাই যাই যাই"।
মেঘের গানে তরী গুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়।"

এই মেঘ-সমারোহ ক্রমশঃ ঘন হ'তে ঘনতর হ'য়ে উঠ্ছে। বিদ্যুতের তীব্র-কশাঘাতে আকাশের আর্ত্ত নিনাদ, বজ্রধ্বনিতে দিক্ প্রকম্পিত করে' তুল্ছে! গগন তলে এক প্রকাণ্ড যুদ্ধ-আয়োজনের বিপুল-ব্যস্ততা-চিহ্ন ফুটে উঠেছে!

আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু,
ডমরু-রব অই হ'য়েছে সুরু!
তাই শুনে আজ গগন-তলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নি-বরণ নাগ নাগিনী
ছুটেছে উদাসী।"

আসন্ন বর্ষার ছবি আমাদের চিত্তে যেন সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্ছে। আকাশ-পটে আগন্তুক মেঘ-পুঞ্জের বিরাট শোভাযাত্রার বিপুল ব্যস্ততা, কবিকে আনন্দে দিশাহারা ক'রে দিয়েছে। ক্ষ্যাপা মেঘ-করীদলের দ্রুত-চলার পানে তাকিয়ে তাঁর হৃদয় বালকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত-আনন্দে দু'হাত তুলে নৃত্য করে' উঠেছে—

"পথিক মেঘের দল জোটে ঐ
সুনীল-গগন অঙ্গনে

শ্রীরাধারাণী দত্ত

মনরে আমার উধাও হ'য়ে
নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।"

সব আয়োজন প্রস্তুত। ধারা নামলেই হয়। আনন্দে ঝোড়ো হাওয়া বেণুর কুঞ্জে মেতে উঠেছে, আমলকী বন কাঁপিয়ে, ঝাউয়ের শাখায় লুটোপুটি খেয়ে আম-জাম-দেবদারু-পিয়াল-তমালে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে। তার বিপুল-আনন্দ আজ নদীর জলে ফেণা হ'য়ে উপ্‌ছে উঠেছে।

কবি আনন্দ-মাতাল বর্ষা হাওয়ার অশ্রু-করুণ অথচ উদ্দাম-মধুর বিচিত্র রাগিণীকে সাপুড়িয়ার বংশীতানের সঙ্গে উপমিত করেছেন। যে সুর করুণ অথচ অদ্ভুত, মধুর এবং মোহমন্ত্র ভরা,-- যে মন্ত্রময়-রাগিণীতে অতি ক্রুর বিষধরের হৃদয়ও বিগলিত এবং বশীভূত হয়, সেই বাঁশী-সুরের সঙ্গে এই বাতাসের সুরের তুলনা, কবির অতুলনীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি!

পুব-সাগরের পার হ'তে কোন্
এল পরবাসী!
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশী!"

এই সাপ খেলাবার বাঁশীর সুরেই মেঘান্ধকার আকাশে চপলার চপল বিকাশকে কবি 'অগ্নিবরণ নাগ-রাগিণী'র মতোই দেখেছেন। এ দৃষ্টি সাধারণের পক্ষে দুর্লভ। এ সুধু কবিরই সম্পদ!

এবার সম্ভাবিত মিলনের আবেগ আর হৃদয়-পাত্রে ধ'রে রাখা যাচ্ছেনা। আজ শিশু-চিত্তের উচ্ছল আনন্দ কবিকে মাতাল করে' তুলেছে! তিনি বিপুলখুসীতে করতালি দিয়ে কল-কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন—

"হারে রে রে রে রে-
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে!
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দেরে!"

* * * * * * *

আসন্ন-বরষার ঘনায়মান মেঘ-সৌন্দর্য্য মানব-অন্তরের গোপন-অন্তঃপুরের চিররুদ্ধ-দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত দিয়ে সুপ্ত-অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে চায়। মূকমর্ম্ম তখন কি জানি কোন্ না-বলা কথা বলবার জন্য ব্যাকুল চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মানুষের অন্তরের যে মধুর রসধারা, শুষ্ক কঠিন বস্তুরাশির পেষণে বিশুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে, যে অনুভূতি-শক্তি যন্ত্রময়-কর্ম্ম-জগতের বিপুল চাপে অসাড় হয়ে আসছে, এই "ছেড়ে দেরে দেরে" বাণী, আসন্ন বর্ষা'র মোহাঞ্জন স্পর্শ-জনিত তাদেরই চিরন্তনী ক্ষণ-ব্যাকুলতা!

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ যে কতখানি নিবিড়, মেঘান্ধকার দিনের অকারণ-ব্যথা উদ্বেলিত প্রাণ দিয়ে, শ্রাবণ-ঘননিশীথ-রাতের বর্ষণ ধারায় হৃদয়ের বিরহানুভূতিতে,—ফাল্গুনের জ্যোৎস্না-রজনীতে চঞ্চল প্রাণের উদাস-প্রেমিকতায়,—অনেক সময়ে ধরা পড়ে যায়। এই অনুভূতি-শক্তি আমরা নিজেরাই অবহেলায় নষ্ট করে' ফেলি।

বর্ষা বর্ষে বর্ষে আমাদের সেই কারাবরুদ্ধ নষ্ট-প্রায় অনুভূতি-শক্তিকে তার বিচিত্র ঝুলন-হিল্লোলে কাজরী-গানে নাড়া দিয়ে দুলিয়ে দিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' ও 'শেষ-বর্ষণে'র বিচিত্র সুর ও শব্দ-ঝঙ্কৃত, সুন্দরতম ভাব-সম্বলিত গানগুলি—নব-আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়ার মতোই আমাদের অন্তর আচ্ছন্ন করে ফেলেচে।

'শেষ-বর্ষণে'র গান-গাওয়ার প্রারম্ভে কবি 'নটরাজে'র মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,—"ঘন-মেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণ-ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য-উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এস নীপবনে ছায়া-বীথি তলে।
এস কর স্নান নব ধারা-জলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ;
পর দেহ ঘিরি মেঘ-নীল বেশ;
কাজল-নয়নে যূথী-মালা গলে
এস নীপ-বনে ছায়া-বীথি তলে॥"

জল স্থল শূন্য ও সমগ্র মানব হৃদয় মথিত করে' তীব্র-আকাঙ্ক্ষা ঊর্দ্ধপানে ছুটে চলেছে। শস্য-বিরল বিদগ্ধ-ক্ষেত্র, বিশুষ্ক-বক্ষ নদী নির্ঝরিণী, তাপ-বিবর্ণ ম্রিয়মান-অরণ্যানী,

নিদাঘ-তপ্ত প্রাণীদলসহ তৃষিতা ধরিত্রী বর্ষণ প্রতীক্ষায় ব্যাকুল স্বরে আহ্বান করছে,—

এস হে এস সজল-ঘন বাদল-বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল-স্নেহে এসহে এ জীবনে।
এসহে গিরি-শিখর চুমি'
ছায়ায় ঘিরি কানন-ভূমি,
পরাণ ছেয়ে এসহে তুমি
গভীর গরজনে।"

সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মর্ম্মবীণায় তীব্র আকাঙ্খায় তৃষিত রাগিনী রণিয়া ওঠেনা কি ?—

"এসহে এস হৃদয়-ভরা
এসহে এস পিপাসা-হরা
এসহে আঁখি শীতল-করা
ঘনা'য়ে এস মনে !"

চিঠি

শ্রীউমা দেবী

আজকে তোমার চিঠি এল
কত দিনের পরে
মনে হোল দখিন্ হাওয়া
আমার বন্ধ ঘরে—
হঠাৎ কখন ঢুকে পড়ে
লাগ্‌লো এসে মুখে,
জুড়িয়ে গেল পরাণ আমার
চিঠি পাওয়ার সুখে।
মনে হোত নিজেকে মোর
নোঙর-ছেঁড়া নায়,
সংসারের এ ঢেউ-এর পরে
ভাসিয়ে নিয়ে যায়,
কখন বুঝি ডুবিয়ে দেবে
মিল্‌বেনা আশ্রয় ;
চিঠির আশে এত ব্যাকুল
মন কেন যে হয়।
ভাবনা গুলো ফিরিয়ে দিতে
ভুলিয়ে দিতে মন
কতই ছল্ যে করেছি আর
কতই আয়োজন।
মন ভোলেনি—কাজ ভুলেছি
পথের পানে চেয়ে—
এই কথা আজ এল মনে
তোমার চিঠি পেয়ে।
মিছেই আমার ব্যাকুলতা
মিছে আমার মান—
এই তো আমার চিঠির মাঝে
হারিয়ে গেল প্রাণ।
চিঠির সাথে প্রাণের আরাম
মনের শান্তিটুক্
কতদিনের পরে এল—
জুড়োলো তাই বুক্।

বুদ্ধের বাল্যজীবন

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

শাক্য গণতন্ত্রের নায়ক রাজা শুদ্ধোদনের দুই পত্নী ছিলেন; প্রথমা মহামায়া—দ্বিতীয়া মহাপ্রজাবতী। উভয়েই দেবদহ রাজার কন্যা। জ্যেষ্ঠা মহামায়া রাজার প্রধানা মহিষী এবং কনিষ্ঠা মহাপ্রজাবতী দ্বিতীয়া মহিষী ছিলেন। যতদূর জানা যায় শুদ্ধোদন তৃতীয়া রাণীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে একস্থানে দেখা যায় যে মহাপ্রজাবতী বলিতেছেন, "আমাদের দুই ভগ্নীর কাহারও সন্তান হইল না; সুতরাং আপনি তৃতীয়া পত্নী গ্রহণ করুন্ মহারাজ!" রাজা তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, তৃতীয়া রাণী গ্রহণ করিলে তিনি সুখী হইতে পারিবেন না। ইহার কিছুদিন পরেই মহামায়া গর্ভবতী হন। মহাপ্রজাবতী মহামায়ার ভগ্নী সপত্নী, তাহাতে আবার সন্তানহীনা, কিন্তু তিনি মহামায়ার সহিত কোন দিনই অন্যায় ব্যবহার করেন নাই; বরং তাঁহার সখীরূপে রাজা ও রাজমহিষীর চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন। তিনি ছায়ার মত মহামায়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, এবং তাঁহার সুখ সুবিধার দিকে সতত লক্ষ্য রাখিতেন। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় যেদিন মহামায়া সন্তান প্রসবের জন্য দেবদহে যাত্রা করিয়া ভাগ্যচক্রে লুম্বিনী উপবনে বুদ্ধকে প্রসব করেন, সেদিনও মহাপ্রজাবতী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলে মহাপ্রজাবতীই তাঁহাকে প্রথম কোলে তুলিয়া লন। মহাপ্রজাবতী বুদ্ধকে নিজের পুত্রের ন্যায়ই পালন করিয়ছিলেন।

প্রথমে বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। মহাপ্রজাবতীই প্রথম ভগবান বুদ্ধের নিকট সংসার পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ প্রথমে তাঁহাকে অনুমতি দেন নাই। অবশেষে তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় এবং আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি মহাপ্রজাবতীকে সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার দান করেন। মহাপ্রজাবতীই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্থান লাভ করেন।

লুম্বিনী উপবনে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হওয়ার সংবাদ চারিদিকে বায়ুবেগে প্রচারিত হইল। রাজধানী কপিলবস্তুতে মহাসমারোহ চলিতে লাগিল। রাজা নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও উৎসব করিয়া রাণীদ্বয়কে রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। রাজধানীতে এক নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ অযাচিত ভাবে আমন্ত্রিত হইলেও যথেষ্ট দক্ষিণা লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আশাতীত অর্থলাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাগমন করিল। সকলেই আসিয়া বুদ্ধকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে রাজ্যের প্রধান সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে দেখিতে আসিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ; সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী। রাজ্যের সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে, ভয় করে এবং সম্মান করে। তিনি রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি পথে আসিবার সময় দৈববাণী শুনিতে পাইলাম, কে যেন বলিতেছিল 'শাক্য রাজার লুম্বিনী উপবনে যে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, এবং জগত-বাসীর ত্রাণকর্ত্তা।' মহারাজ! আনন্দ করুন, আমি সেই রত্নকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলে এমন পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রাজা আনন্দে অধীর হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন যে পুত্র ঘর আলো করিয়া মহাপ্রজাবতীর ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রাজা তাঁহাকে নানাপ্রকার রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে আনয়ন করিলেন। সন্ন্যাসী রাজপুত্রের রূপ দেখিয়া

আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার বদনমণ্ডল কালিমায় আচ্ছন্ন হইল এবং চোখের কোণে জল দেখা দিল।

সন্ন্যাসীর অবস্থা দেখিয়া রাজা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁর চোখেও জল দেখা দিল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনি অমন করিতেছেন কেন? তবে কি আমার প্রাণের ধন বাঁচিবে না? ভগবান করুন মৃত্যু যেন আমার পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিতে না পারে, ভগবান করুন আমি যেন আমার এই রত্ন না হারাইয়া ফেলি। যাহার পুত্র আছে তাহারই কেবল দুইটি চক্ষু, মৃত্যু হইলে একচক্ষু নিদ্রা যায় অন্য চক্ষু পাহারা দেয়। যাহার পুত্র নাই সে ত বাস্তবিকই অন্ধ।"

রাজার কথায় সন্ন্যাসী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি দুঃখ করিবেন না—আনন্দ করুন। আমি দুঃখ করি যে আমি এত বৃদ্ধ হইয়াছি যে, ইঁহার রাজত্বে বাস করিতে পারিব না। যখন ইনি জ্ঞানবলে পৃথিবী শাসন করিবেন তখন আমি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। তিনি যে ধর্ম্ম করিবেন তাহা হইবে নদীর মত গভীর, ভরা নদীর মত পরিপূর্ণ, নদীর মোহানার মত প্রসর। হ্রদের অগাধ জলের মত তাঁহার যোগ হইবে গভীর। সূর্য্যের তেজের মত তাঁহার জ্ঞান হইবে, এবং সমস্ত জগৎ তিনি জ্ঞানের আলো দ্বারা শাসন করিবেন।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী রাজার অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পঞ্চম দিবসে বুদ্ধের নামকরণ হইল। মহাপ্রজাবতী মাতার সমস্ত কাজ করিলেন। নানাপ্রকার যাগ যজ্ঞ করিয়া পুত্রের মঙ্গল কামনা করা হইল, এবং রাজপুত্রের নাম রাখা হইল "সিদ্ধার্থ", সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এই অর্থে। যখন বুদ্ধের নাম সিদ্ধার্থ রাখা হইল তখন তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করাতে পিতামাতার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে এই জন্য তাঁহার নাম হইল সিদ্ধার্থ।

বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করার দিন হইতেই মহাপ্রজাবতী বুদ্ধের সমস্ত ভার নিজে লইয়াছিলেন এবং মহামায়ার তত্ত্বাবধানও তিনিই করিতেন। কিন্তু পুত্রের জন্মের দিন হইতেই মহামায়ার মন কেমন যেন উদাস হইয়া গিয়াছিল। পুত্রের জন্মে রাজ্যশুদ্ধ লোক যে আনন্দে উৎসবে যোগ দিয়াছিল, মহামায়া সে আনন্দে যোগ দেন নাই। তিনি ঘরের কোণে একা উদাসভাবে পড়িয়া থাকিতেন। যিনি বুদ্ধের মাতা হন তিনি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হন না, এবং সপ্তম দিবসে স্বর্গারোহণ করেন। মহামায়া সপ্তম দিবসে জানিতে পারিলেন যে তিনি আর বাঁচিবেন না। তিনি মহাপ্রজাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার উপর শিশু পুত্রের ও স্বামীর ভার বুঝাইয়া দিলেন। তিনি মহাপ্রজাবতীকে বলিলেন, "ভগ্নি, প্রিয়ভগ্নি, সপ্তম দিবসে আমার মৃত্যু। যাহাদের জন্য পৃথিবীর এত আনন্দ সেই সকল মাতা আর পৃথিবীতে থাকিতে পারেন না; তাহাদের স্থান স্বর্গের অমরাবতীতে। আমার স্বর্গে যাওয়ার সময় হইয়াছে। আমার ভগ্নী যদি আমাকে সাহায্য না করে তবে আমি আর আমার স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতে পারি না, এবং পুত্রকে রক্ষা করিতে পারি না। আমার স্বর্গে যাওয়ার সময়ের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু ভগ্নি, দুঃখ করিও না, সমস্তই মঙ্গলের জন্য। আমার স্থান স্বর্গে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখান হইতে আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। হে ভগ্নি, তুমি আমাকে ভুলিও না। আমি আমার প্রিয় শিশুকে তোমাকেই দিয়া গেলাম; তোমার স্তনের দুধে তাহাকে প্রতিপালন কর এবং মহারাজার সেবা কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আমার মত আমার সন্তানের বিমাতারও স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাউক।"

ইহা বলিয়া বুদ্ধকে মহাপ্রজাবতীর কোলে দিয়া মহামায়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। মহাপ্রজাবতীও শিশুকে তাঁহাদের দুই ভগ্নীর মধ্যে শয়ন করাইয়া তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রা গেলেন।

একে একে রাজপুরীর সমস্ত লোক গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। পরে তাহারা মহানন্দময় স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভোরে জাগিয়া উঠিল। সকলেই একে একে উঠিল; শিশু মায়ের বুকে স্থান পাইবার জন্য কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু মহামায়ার আর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম লইলেন।

বুদ্ধের বাল্যজীবন

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

কোন কোন পুস্তকে "সিদ্ধার্থ" নামের ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। মহাপ্রজাবতীর কোন সন্তান হয় নাই এই জন্য তিনি মনকষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন। বুদ্ধ জন্ম লইবার দিন হইতে তাঁহার মনকষ্ট কিছু দুর হইয়াছিল, কিন্তু যেদিন মহামায়া বুদ্ধের সমস্ত ভার ভগ্নীর উপর অর্পণ করিলেন, সেদিন আর তাঁহার মনের কোন আশা অপূর্ণ রহিল না। তিনি যাঁহার সাধনা করিতেছিলেন তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেন বলিয়া বুদ্ধের নাম রাখিলেন "সিদ্ধার্থ।"

প্রায় সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধেই কোন না কোন অলৌকিক কাহিনীর প্রচলন দেখা যায়। খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, কবীর, নানক, মহম্মদ—কাহারও পক্ষে এ নিয়ম হইতে ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ভগবান বুদ্ধের সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে।

কুমারের জন্মের কথা শুনিয়া কালদেবল নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি বুদ্ধকে দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন—যেদিন বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করিবেন সে দিন আর তিনি জীবিত থাকিবেন না। তারপর তিনি ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার ভগ্নীর পুত্র নালক যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তবে সে বুদ্ধকে দেখিতে পাইবে, এবং বুদ্ধের সেবা করিতে পাইবে। তাঁহার বংশের লোকের এমন সৌভাগ্য হইবে জানিতে পারিয়া তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ভগ্নীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার ভগ্নীকে সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহার ভগ্নী এক ক্রোড়পতির গৃহিণী, কিন্তু ভ্রাতার কথা শুনিয়া তিনি নিজ পুত্র ৮।১০ বৎসরের বালক নালককে কালদেবলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কালদেবল গৈরিক বসন ক্রয় করিয়া নালককে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দিলেন। নালক কোন আপত্তি না করিয়া এই অপরিণত বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি বুদ্ধের সেবা করিয়া তাঁহার বংশের নাম ও মান রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয়গণ জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং দেহলক্ষণ গণনায় কত পারদর্শী হইয়াছিলেন তাহা বুদ্ধের সম্বন্ধে নানা লোকের ভবিষ্যৎ বাণী হইতেই বুঝা যায়। বুদ্ধের জন্ম হইলে রাম, ধ্বজ, লক্ষণ, মণ্ডী, কৌণ্ডিণ্য, ভোজ, সুদাম, এবং সুদাতা নামে আটজন ব্রাহ্মণ রাজসভায় আগমন করিলেন। ইঁহারা সকলেই ভাগ্য গণনা করিতে পটু। রাজার আদেশানুসারে তাঁহারা বুদ্ধের আকৃতি হস্তরেখা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়া দিলেন। তাঁহাদের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন জানিতে পারিয়া কৌণ্ডিণ্য ভিন্ন সকলেই বাড়ী গিয়া আপন আপন পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তাহারা যেন তাঁহার নির্দ্দেশ মত চলে। বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখন তিনজন বাদে চারজনের চারপুত্র কৌণ্ডিণ্যের সহিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সঙ্ঘে স্থান লাভ করেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ পঞ্চভ্রাতা নামে পরিচিত।

মহাপ্রজাবতীর যত্নে স্নেহে মমতায় ও রাজ্যের সকলের আশীর্ব্বাদে বুদ্ধ দিন দিন চন্দ্রকলার মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে মহাপরিবর্ত্তন হইল। বুদ্ধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইতে আরম্ভ করিল। যেক্ষেত্রে শস্য হইতে না, তাহা এখন আপনা হইতেই শস্যশালী হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বকালে রাজাগণ কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করাকে হেয় মনে করিতেন না। একদিন রাজা শুদ্ধোদন কৃষিকার্য্যের জন্য একশত আটখানা হাল ঠিক করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ প্রজাবৃন্দেরও আরও হাজার হাল সংগ্রহ হইল। রাজ্যের এই উৎসব প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। রাজধানীর প্রতি গৃহ ফলেফুলে লতায় পাতায় সজ্জিত হয়, সকলেই নব বস্ত্র পরিধান করে, রাজ্যে এক মহোৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়।

যে একশত আটটী হাল রাজপরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল সেগুলি ছিল রৌপ্যময়। মহারাজার হালটি স্বর্ণ নির্ম্মিত ও মণিমুক্তা খচিত ছিল। রাজার হালের বলদগুলির শৃঙ্গ এবং খুর সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। রাজা যথাসময়ে পাত্র মিত্র এবং সিদ্ধার্থকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে গেলেন। যেখানে হাল

চালনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার নিকটে একটি গোলাপজামের গাছ ছিল। গাছটি শাখা-প্রশাখায় বহুদূর বিস্তৃত, সবুজ পাতার ঘন আবরণে স্থানটি মনোরম। এই বৃক্ষের নীচে মহারাজার সুসজ্জিত রথ আসিয়া দাঁড়াইল। রথে তিন চার বৎরের বালক বুদ্ধ ছিলেন। গাছের নীচে একটি চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইল। রাজা বুদ্ধকে গাড়ীর মধ্যে রাখিয়া একদল পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত কৃষি-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। রাজা গিয়া নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট হাল লইয়া আগে আগে জমি কর্ষণ করিতে করিতে চলিলেন। রাজার পশ্চাৎ রাজকর্ম্মচারী ও রাজপরিবারের সকলে হাল লইয়া চলিল; তাদের পিছনে রাজ্যের ছোট বড় অনেক প্রজা হাল চাষ করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হইল।

রাজা হাল লইয়া যতই দূরে যাইতে লাগিলেন, জনতা ততই সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরিচারিকার দল কৃষিকার্য্য দেখিবার জন্য রাজার রথের নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধ এই সময় কাহাকেও নিকটে না দেখিয়া রথের উপরে উঠিয়া আসিয়া বসিলেন এবং তিনি পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত গাছের ছায়া পূর্ব্বদিকে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ যখন রথের উপর পদ্মাসনে বসিলেন তখন গোলাপজামের গাছের ছায়া কোন দিকেই হেলিল না। যেমন দুপুরের সময় গাছের ছায়া ঠিক গাছের নীচে থাকে সেই রকম। কিছুক্ষণ পর পরিচারিকার দল রথের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অভিভূত হইল। তাহাদের একজন দৌড়াইয়া গিয়া রাজাকে বলিল, মহারাজ, রাজকুমার রথের উপর পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, আর আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সমস্ত গাছের ছায়া পূর্ব্বদিকে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, আর কুমার যে গাছের তলায় আছেন তাহার ছায়া কোনদিকে হেলিয়া পড়ে নাই; ঠিক গোল হইয়া গাছের নীচে পড়িয়াছে।

রাজা এই কথা শুনিয়া শীঘ্র রাজকুমারের নিকট চলিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, শ্রদ্ধায় তাঁহার মস্তক অবনত হইয়া পড়িল।

বুদ্ধের শিক্ষা সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তজ্জন্য রাজা যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। পূর্ব্বকালে নৃপতিগণ কুমারগণের শিক্ষার জন্য, বিশেষ করিয়া রাজনীতি ও অস্ত্র বিদ্যার প্রতি, সাতিশয় মনোযোগী ছিলেন। শিক্ষার বন্দোবস্তও সুবিজ্ঞ আচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত হইত। যতদিন শিক্ষা সমাপ্ত না হইত, ততদিন রাজকুমারগণ আচার্য্যের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিতেন।

বুদ্ধ বড় হইলে শুদ্ধোদন তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দেশের নানা ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে সিদ্ধার্থ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইবেন, এই জন্য কোন সন্ন্যাসীর হাতে পুত্রের শিক্ষার ভার দিতে ভয় করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর হাতে দিলে, সন্ন্যাসীর শিক্ষার প্রভাবে হয়ত রাজকুমার সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন; তাই কোন সন্ন্যাসীর হাতে না দিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সত্য বলে বলিয়ান বিশ্বামিত্রকে ডাকাইয়া তাঁহার হাতে পুত্রের শিক্ষার ভার দিলেন।

বিশ্বামিত্র শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া বুদ্ধকে ডাকাইলেন। বুদ্ধ আসিয়া গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ সকল প্রশ্নেরই উত্তর সহজ সরল ভাষায় দিলেন। গুরুদেব দেখিলেন যে বুদ্ধের শিখিবার আর কিছুই বাকি নাই—তিনি অবাক হইলেন; তবু বুদ্ধের ভাবগুলিকে উৎকর্ষ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ একবার যাহা দেখেন বা শুনেন তাহা আর কখনও ভুলেন না। তিনি সকল বিদ্যাতেই অল্পদিনের মধ্যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

বুদ্ধের বাল্যকালে যাহারা খেলার সাথী ও সহপাঠী ছিল, তাহাদের মধ্যে দেবদত্ত ও আনন্দর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। উভয়েই বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্র। দেবদত্ত ও আনন্দ রাজকুমার বুদ্ধের সমবয়স্ক ছিলেন এবং সকলে একসঙ্গে

বুদ্ধের বাল্যজীবন

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

খেলা ও লেখা-পড়া করিতেন। দেবদত্ত কিন্তু বুদ্ধকে দেখিতে পারিত না। আনন্দ তখন হইতেই বুদ্ধকে সহোদর ভ্রাতার মত ভাল বাসিতেন এবং বুদ্ধের সহিত ছায়ার মত থাকিতেন। দেবদত্ত এই সকল দেখিয়া হিংসা করিত। দেবদত্ত বুদ্ধকে সারাজীবন কষ্ট দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কখন কখন বুদ্ধের প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত করিতে যত্নশীল হইয়াছিল। রাজা অজাতশত্রুর সহিত যোগদান করিয়া মত্তহস্তী প্রেরণ করিয়া এবং গুপ্ত ঘাতক পাঠাইয়া বুদ্ধকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

বাল্যকালে দেবদত্ত বুদ্ধের নামে নানা প্রকার মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া বুদ্ধকে লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্য যাঁহার একমাত্র সহায়, প্রেম যাহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার কখনও পরাজয় হয় না। একবার দেবদত্ত রাজধানীতে প্রচার করিয়া দিল যে বুদ্ধ অস্ত্র-বিদ্যা মোটেই শিক্ষা করে না। সে অলস এবং আমোদ-প্রিয়। এই কথায় পুরস্ত্রীগণ নানা কথা বলিতে লাগিল। যিনি দুদিন পরে রাজা হইবেন, তিনি যদি অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা না করেন তবে তিনি কেমন করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন,—প্রজাগণ নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল। এই সকল কথা শুনিয়া শুদ্ধোদনের মনে বড় দুঃখ হইল তিনি বুদ্ধকে ডাকিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধ পিতার কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া শুধু পিতাকে বলিলেন যে তিনি যেন সাতদিনের মধ্যে একটী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, তাহাতে তিনি তাঁহার শস্ত্রবিদ্যার পারদর্শিতা প্রতিপন্ন করিবেন। রাজা পুত্রের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত ঘোষণা করিলেন যে সে দিন হইতে সপ্তম দিবসে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইবে, তাহাতে রাজকুমারগণ নিজ নিজ যুদ্ধ কৌশল দেখাইবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্রীড়াক্ষেত্রে বহুসংখ্যক দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর যথা সময়ে রাজপুত্রগণ ধনুর্বাণ হস্তে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; সবাই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল এবং বুদ্ধের শান্ত স্বভাব ও উত্তেজনাহীন মুখমণ্ডল দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, বুদ্ধ আজ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই জয়ী হইতে পারিবেন না। একে একে অনেক রাজকুমার নিজ নিজ ক্রীড়া দেখাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর দেবদত্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নামিল। তাহার ক্রীড়া দেখিয়াও সবাই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল; কিন্তু সে পাঁচ ছয়টির বেশী ক্রীড়া দেখাইতে পারিল না। অবশেষে বুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। চারিদিক হইতে করতালির রোল উঠিল। কেহ বাস্তবিকই প্রশংসা করিল, কেহ ঠাট্টা করিয়া করতালি দিল। তারপর একে একে বারটি ক্রীড়ার কৌশল দেখাইলেন। সভা তখন নিস্তব্ধ। দেবদত্তের গর্ব্বোজ্জল মুখ ম্লান হইয়া গেল। বিচারকগণ বুদ্ধের শস্ত্র চালনায় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রচালক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহারা বুদ্ধের নিন্দা শুনিয়া নানা কথা বলিয়াছিল তাহারা সেদিন সুখী হইয়া ঘরে গেল। প্রত্যেক প্রতিযোগিতাতেই বুদ্ধ জয় লাভ করিতেন এবং দেবদত্ত পরাস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

গাছের প্রথম অবস্থা দেখিলেই যেমন বলা যায় গাছ কি রকম হইবে, মানুষের বাল্যাবস্থায় দেখিয়াও তেমনি বলিতে পারা যায় ভবিষ্যতে সে মানুষ কি প্রকৃতির হইবে। গৌতম বুদ্ধের বাল্যাবস্থা বিশেষ সমাধানের সহিত বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে পরবর্ত্তীকালে তিনি একজন মহাপুরুষ হইবেন। মহাপুরুষগণের চরিত্র বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাল্যে অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির এবং দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন। অবশ্য এই দুষ্টামীর ভিতর দিয়া বাল্যাবস্থাতেই তাহাদের চরিত্রে একটা পৌরুষ ভাব ফুটিয়া উঠিত। শত দুষ্ট হইলেই এই পৌরুষভাব সকলের মনকে আকৃষ্ট করিত এবং সে কারণ তাহাদের উপর কেহই ক্রোধ করিতে পারিত না। তাহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা হইত।

কিন্তু আমরা দুইজন মহাপুরুষের ভিতর এই দুষ্টামী দেখিতে পাই না; একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যিশু, অন্যজন বুদ্ধ। সকল মহাপুরুষের চরিত্রে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করিয়া বাল্যচরিত্র। ভগবান বুদ্ধ বাল্যাবস্থা হইতেই সত্যপ্রিয় ছিলেন। যাহা মিথ্যা, যার ভিতর ধর্ম্মের কোন চিহ্ন নাই, তিনি তাহা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া-

ছেন। তিনি এই অল্প বয়সেই নির্জ্জনে বসিয়া মহাসত্যের সন্ধান করিতেন। অনেক সময় তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। গরীব দুঃখী বলিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় সঙ্গে অর্থ না থাকিলে নিজের গলার মুক্তা গরীবদিগকে অকাতরে দান করিয়া আসিয়া মাতা প্রজাপতির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। পুত্রের এই সৎগুণাবলি মহাপ্রজাবতীকে বাস্তবিকই আনন্দ দিত, এই জন্য সময় সময় তিনি তাঁহার ভগ্নী মহামায়ার জন্য দুঃখ করিতেন। এমন ছেলে গর্ভে ধারণ করিয়াও তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

একদিন তিনচারজন রাজকুমারের সহিত বুদ্ধ কোন এক গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলেন। গ্রামের নিকট একটি সুন্দর নির্জ্জন বন ছিল। বনের শোভা দেখিয়া তিনি মোহিত হন। এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অন্য রাজকুমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একা নিবিড় বনমধ্যে চলিয়া যান; এবং সেই নির্জ্জন স্থানে তাঁহার মন এক মহাসত্যের ধ্যানে নিযুক্ত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁহার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলেন। রাজকুমারগণ বাড়ী চলিয়া গিয়া কহিলেন যে, বুদ্ধ যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রাজধানীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। রাজা বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজকুমার বুদ্ধ বনের মধ্যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। লোকটির কথা শুনিয়া মহারাজ অচিরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুলোকের কোলাহলে রাজকুমারের ধ্যান ভঙ্গ হইল। ধ্যান ভাঙ্গিতেই তিনি দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি লজ্জিত হইয়া পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া নানা উপায়ে পুত্রের মন আমোদ প্রমোদের ভিতর ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুক বুদ্ধ মোটেই পছন্দ করিতেন না। যখনই ক্ষণকালের জন্য একা থাকিতেন, তখনই তিনি মহাসত্যের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। নির্জ্জন স্থানই তিনি বিশেষ করিয়া পছন্দ করিতেন।

এইরূপ ভাবে গুরুদেবের শিক্ষায়, পিতার স্নেহে, মাতার আদরে, আনন্দের ভালবাসায়, গুরুজনের আশীর্ব্বাদে, প্রজাদের আন্তরিক কামনায় তিনি বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।
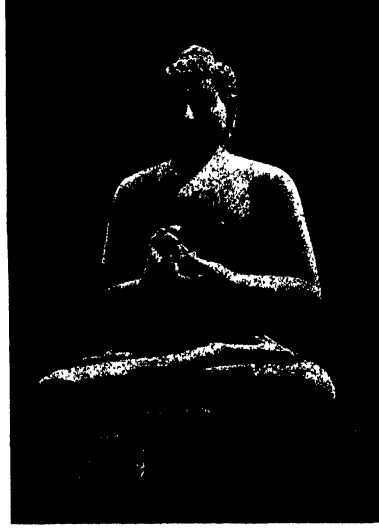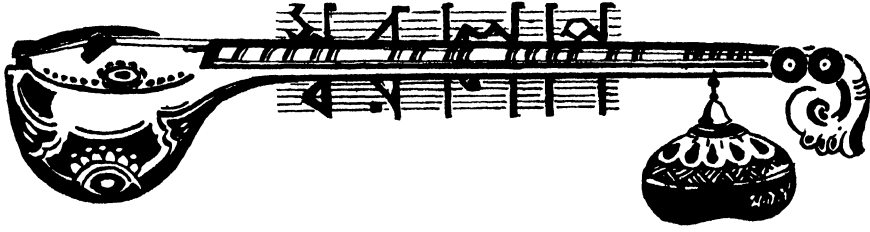
দিন শেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে,
তাই নিয়ে ব'সে আছি বীণাখানি কোলে।
তারি সুর নেব ধ'রে
আমারি গানেতে ভ'রে,
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চ'লে।
থাম, থাম, দখিন্ পবন,
কি বারতা এনেছ তা কোরোনা গোপন।
যে দিনেরে নাই মনে
তুমি তারি উপবনে
কি ফুল পেয়েছ খুঁজে গন্ধে প্রাণ ভোলে॥

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মা পা I
দি ন

II পরমা -জ্ঞরা সা -া। -া -া -া -া I র্সনা -র্রা র্সাঃ -ণধঃ। ধপা -ধা -মা -া I
শে ০ ০ ষে ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ স ন্ ত ০ ০ ০

I পা -র্সা র্সণা ধা। পা মগা মা পা I মা জ্ঞরা মজ্ঞা -রা। সা -া -া -া I
যা ০ প্রা ণে গে ল ব লে দি ন শে ০ ষে ০ ০ ০

I সা -গা -মা -পা। পমা মা জ্ঞা রা I সরা -জ্ঞমা -মজ্ঞা -রা। সা -া -া -া I
তা ০ ০ ই নি য়ে ব সে আ ০ ০ ০ ০ ছি ০ ০ ০

I ধা -া ণা -া । ণধা পা পধা -ধপা I মা জ্ঞরা মজ্ঞা -রা । সা -া -া -া I
বী ০ ণা ০ খা নি কো লে দি ন শে ০ ষে ০ ০ ০

I {জ্ঞা রা জ্ঞা -া । জ্ঞরা -া মজ্ঞা রা I র্সনা -া না না । র্সা -া র্সা -র্রা I
তা রি সু র্ নে ০ ব ধ রে ০ আ মা রি ০ গা ০

I র্সা -নর্রা র্রর্সা ণধা । পা -া -া -া } I পা ধা ণা ণধা । পা পা পধা ধপা I
নে ০ ০ তে ভ রে ০ ০ ০ ঝ রা মা ধ বী র সা থে

I পগা -া -মা -া । -জ্ঞা -া -া -া I জ্ঞরা -া জ্ঞা -া । -জ্ঞা -া -রা -সা I
যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I রা -পা পমা জ্ঞা । রা সা রা সা I সন্‌া -া সা -া । -া -া -া -া I
যা য়্ সে যে চ লে দি ন শে ০ ষে ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ধা ণা -া । -া -া -ধা -পা I
থা ০ ম ০ ০ ০ ০ ০

I {পা -ধা ণা -া । -া -া -ধা -পা I পা ধা ণা পধা । ধপা -া -া -া I
থা ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ দ খি ন্ প ব ০ ০ ন্

I পগা -া গমা মপা । মা -া -া -া I মপা পমা জ্ঞা -রা । জ্ঞা -া -া -া I
কি ০ বা র তা ০ ০ ০ এ নে ছে ০ তা ০ ০ ০

I জ্ঞপা পমা জ্ঞা -া । জ্ঞপা পমা জ্ঞা -া I জ্ঞপা পমা জ্ঞা -া । সরা -া সা -া} I
কো রো না ০ কো রো না ০ কো রো না ০ গো ০ প ন্

I {পা পা পা ধা । ধর্রা -া র্রর্সা -না I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
যে দি নে রে না ই ম ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I র্সর্রা র্রর্সা ণধা ণা । ধর্সা সণা ধা পধা I ণা -র্রা র্রর্সা -ণা । ধা পা মা গা I
তু মি তা রি উ প ব নে কি ০ ফু ল্ পে য়ে ছ খুঁ

I মা -া পা ধা । ণা -র্রা র্রর্সা -ণা I ধা পা পমা গা । মা -া -া -া I
জে ০ ও গো কি ০ ফু ল্ পে য়ে ছ খুঁ জে ০ ০ ০

I মা -পা পমা -জ্ঞরা । রমা মজ্ঞা রা সা I সরা রণা ন্‌া -া । সা -া -া -া II
গ ন্ ধে ০ ০ প্রা ণ ভো লে দি ন শে ০ ষে ০ ০ ০

সহযোগী-সাহিত্য

ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

"Behold, I do not give lectures or a little charity,
When I give I give myself."
—Song of Myself.

(১)

আর্ট এবং জীবনের সম্বন্ধ আকাশ এবং আলোর মত কিনা,—এ প্রশ্নের অদ্যাবধি মীমাংসা হয়নি। এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের জীবন তাঁদের শিল্পের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। অথচ এর বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই; বহু শিল্পীর জীবনে আর্টের বিকাশ আকাশে আলোকের প্রকাশের মতন। তাঁরা শুধু কালিকলমে শিল্পসৃষ্টি করেননি, নিজেদের রক্তমাংসের দেহে শিল্পের আত্মা সঞ্জীবিত করেছেন। তাঁদের জীবন ও শিল্প যেন আধার এবং আধেয়; একে অপরের পরিপূরক। ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান এই শেষোক্তদের একজন।

পৃথিবীটাকে হুইট্ম্যান কি চোখে দেখেছেন—এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর যে কোনো লেখা থেকে পাওয়া যায়। সে চোখের দৃষ্টি প্রসন্ন, উজ্জ্বল; হাসির একটা দীপ্তি তাতে নিয়ত লেগে আছে। হুইট্ম্যান আনন্দবাদী। তাঁর কাব্যের সর্ব্বাঙ্গে আনন্দস্রোত প্রবাহিত, অথচ এ আনন্দের রক্তধারার সৃষ্টি দুঃখ-বেদনায়। সে দুঃখ কল্পনাগত নয়,—রূঢ় বাস্তবের কোলে তার জন্ম, বাস্তবের মাতৃদুগ্ধে তার পুষ্টি। ১৮৬০ সালে আমেরিকায় যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আগুন জ্ব'লে ওঠে, সে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ছিল না, কিন্তু তার ধ্বংসলীলার পাশাপাশি সৃষ্টিকার্য্য চলেছিল,—একটি মানুষের মনে। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সেবাব্রত নিয়ে হুইট্ম্যান উপস্থিত ছিলেন; আহতের সেবায় নিজেকে নিমগ্ন ক'রেই তিনি প্রথম নিজের প্রকৃত পরিচয় পেয়েছিলেন এবং এই আত্ম-পরিচয়ের পরিণামেই তাঁর ভিতরকার শিল্পী মনের জন্ম হয়। মৃত্যুর হাহাকারের মধ্যে যার জন্ম সে শিল্পী-মন যে কেমন ক'রে দীর্ঘকাল আনন্দগান রচনা করল তা বোঝা কঠিন। তবে একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে মনে হয়, আহতের যন্ত্রণা ভোলাবার জন্য হুইট্ম্যান তাদের কাছে যে আশা আনন্দের বাণী প্রচার করতেন, সেই বাণীই ক্রমশঃ তাঁর কাছে একান্ত সত্য হয়ে ওঠে; ছেলে ভোলাবার ছলে যে শুক্তিরাশির বিতরণ তিনি আরম্ভ করেছিলেন, সেই সব শুক্তি যে মুক্তাগর্ভা তা তিনি ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছিলেন, এবং বুঝে সারা জীবন কখনো উক্ত বিতরণ কার্য্য থেকে বিরত হননি। আনন্দোচ্ছ্বাসের যে কথা তাঁর মুখের কথা ছিল, সে তাঁর মনের কথা হয়ে ওঠে।

(২)

"তৃণপর্ণ" "Leaves Of Grass" কাব্যের প্রথম কবিতাটিতে আছে,—

"...The Female equally with the Male I sing,
Of life immense in passion, pulse and power
Cheerful, for free'st action form'd under the laws divine
The Modern Man I sing."

কাব্যসৃষ্টির জন্য যে দুটি বস্তু না হলে চলে না, মার্কিণ প্রতিভায় তার একেবারে অভাব,—গভীরতা ও নিবিড়তা। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়; এমার্সনের

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

লেখায় আছে গভীরতা, এবং হুইট্‌ম্যানের লেখায় আছে নিবিড়তা। জীবনের passion, pulse ও power-এর ত্রিধারা উক্ত নিবিড়তায় এসে মিশেছে। মার্কিণ-প্রতিভায় নিবিড়তা ও গভীরতার স্থান গ্রহণ করেছে স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছন্দতা। এ দুটি গুণ এক নয়, কিন্তু প্রথমটি হতেই দ্বিতীয়টির সৃষ্টি। স্বচ্ছতা চোখের গুণ এবং স্বচ্ছন্দতা পায়ের গুণ। চোখের দৃষ্টি যার সামনের বস্তু ভেদ ক'রে এগিয়ে চলে, স্বভাবতই পায়ের চলায় তার জড়তা থাকে না। হুইট্‌ম্যান এই মার্কিণ বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। তাঁর বলবার কথা যেমন স্পষ্ট, বলবার ভঙ্গী তেম্নি নির্মুক্ত; তীরের মত বুকে গিয়ে লাগে। কিন্তু হুইট্‌ম্যানের লেখায় জাতীয় ভাব-বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে যে বস্তু উপরে উঠেছে সে তাঁর ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রীতির প্রবাহ এ ব্যক্তিত্বের শিরায় শিরায়; এবং সাম্য, মৈত্রী, ঐক্যের মন্ত্র তার মেদমজ্জায়। মানুষকে হুইট্‌ম্যান মানুষ রূপেই দেখেছেন, দেবতা অথবা উপদেবতা রূপে নয়। সহজ এবং স্বাভাবিক হৃদয়বন্ধনের মধ্যে দিয়ে তিনি মুক্তির প্রয়াসী। "Song of Myself"-এর এক জায়গায় তিনি বলেছেন,

"All the men ever born are...my brothers and the women my sisters and lovers"

সকল মানুষকে এমন ক'রে অন্তরে স্থান দেওয়ার এই প্রবৃত্তি হুইট্‌ম্যানের মর্ম্মগত ছিল। নিশ্বাসের বাতাস যেমন শরীরের রক্ত বিশোধিত করে, বিশ্বমৈত্রীর হাওয়া তেম্নি তাঁর মনের বিশোধন সাধন করেছিল। সাম্যবাদের এত বড় কবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। "To you" কবিতায় আছে,

"Stranger, if you passing meet me, and desire to speak to me, why should you not speak to me? And why should I not speak to you?—

ভাষার কারুকার্য্য এ কথাগুলোয় নেই, চিন্তার সমুজ্জ্বল আভারও এতে অভাব, কিন্তু এতে যা আছে সে একটা গোটা হৃদয়ের সহজ পরিচয়। সব মানুষের যেমন দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য থাকে, মানসিক গঠনের বিশিষ্টতাও তেম্নি তাহাদের থাকে। হুইট্‌ম্যানের মনের চেহারার বিশিষ্টতা তার সৌম্য প্রসন্নতায়; সে মনের চোখদুটি যেন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসি দিয়ে সকলকে আলিঙ্গন করতে চায়, আর নিজের জন্য কামনা করে,

"To confront night, storms, hunger, ridicule, accidents, rebuffs, as the trees and animals do."

(৩)

লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করার উপায় জড় বিজ্ঞান অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারেনি। বহুদিনযাবৎ বিজ্ঞান পরশপাথরের অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু ও বস্তু যে আর্টের ধনাগারে আছে সে কথা বিজ্ঞান জ্ঞাত নয়। অবশ্য বৈজ্ঞানিক যে পরশপাথরের স্বপ্ন দেখে, সে বস্তু আর্টিষ্টের পরশপাথর থেকে বিভিন্ন। সেকস্‌পীয়র যাতে হাত দিয়েছেন তাই সোনা হয়ে গেছে। সেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে হুইট্‌ম্যানের একদিকে মিল এবং অন্য এক দিকে অমিল আছে। হুইট্‌ম্যান সেক্‌স্‌পীয়রেরই মতন অসংখ্য বস্তুর দেহে হস্তার্পণ করেছেন। সামান্য ধূলিমুষ্টি হতে পর্ব্বতের বিরাট দেহ—কেহই তাঁর হাতের বাইরে নয়। কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়রের হাতের স্পর্শমণি মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানভ্রষ্ট হয় না, আর হুইট্‌ম্যানের হস্তস্থিত স্পর্শমণি মাঝে মাঝে অতর্কিতে তাঁর হাতছাড়া হয়। সেক্‌স্‌পীয়রের পরিণত বয়সের রচনায় শুধু সুবর্ণ আছে, অন্য কোনো ধাতুর বর্ণ তাতে পাওয়া যায় না। হুইট্‌ম্যানের রচনায় বহু ধাতু সন্নিবিষ্ট। বিচারের আগুনে নিক্ষেপ করলে তার অনেকখানি অংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু এ কার্য্য হুইট্‌ম্যান নিজে কখনো করেননি। তাই তাঁর কাব্য পাঠে মনে তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে কেমন একটা বিতৃষ্ণার সঞ্চার হতে থাকে।

উক্ত বিতৃষ্ণার উৎপত্তির মূলে আর একটী ভাব আছে। এ ভাব আসলে একটা অভাব। তাঁর কবিতায় সুর আছে কিন্তু ছন্দ নেই। ইংরাজিতে যাকে form বলে সে বস্তু হুইট্‌ম্যানের লেখায় নেই। শিল্পী মণিকারের মত সাবধানে একটির পর একটি কথা সযত্নে যোজনা ক'রে রচনা করেন। কিন্তু তাঁর নৈপুণ্যবশতঃ এই যোড়ার দাগ দেখা যায় না, মনে হয় সে যেন বস্তুর সন্নিবেশে রচিত নয়, স্বভাবতই এক, নিরবচ্ছিন্ন। সে যেন গঠন নয়,—সৃষ্টি। নিপুণ শিল্পীর

চিত্রে বর্ণ অথবা রেখার দিকে দৃষ্টি যায় না, পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য-বশত সমগ্র চিত্রটাই মন অধিকার ক'রে বসে! কবির কাব্যেও তেম্নি ভাষার বর্ণমাধুর্য্যে অথবা বিশেষ বিশেষ কথার রেখাচাতুর্য্যে মন লুব্ধ হয় না,—সমস্ত কবিতাটাই শত মুখে কথা বলতে থাকে। কাব্যের এই বিশিষ্ট ধরণটিরই নাম form ; ও জিনিষের সঙ্গে হুইট্‌ম্যানের পরিচয় নেই।

এ অভাবের অংশত পূরণ হয়েছে অন্য দুটি বস্তু দিয়ে। হুইট্‌ম্যানের কাব্যে গতি আছে, এবং যতি (Pause) আছে। যতির কাজ গতির শক্তিবর্দ্ধন, এবং গতি থেকে গীতির উৎপত্তি। 'Song of Myself,' 'Song of the Red-wood Tree,' 'One's Self I sing,' 'Song of the Universal',—এসব শিরোনামা থেকে কবিতাগুলিতে গীতির কতখানি স্থান তা ভেবে নেওয়া যায়।

হুইট্‌ম্যানের কবিতার উল্লিখিত দোষ-গুণের পরিব্যাপ্তি তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে। অর্দ্ধশতাব্দীর সাহিত্যসাধনা তাঁর দীর্ঘ জীবনে কোনো পরিবর্ত্তন অর্থাৎ পরিণতি আনতে পারেনি। তাঁর যৌবনের রচনায় এবং বার্দ্ধক্যের রচনায় দুস্তর তফাত নেই। কথাটা আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য। শিল্পীমনের পরিণতির কোনো ধরাবাঁধা পথ থাকে না। তার রচনায় শক্তির নিদর্শনের পরেই অক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। অপর পক্ষে মাঝে মাঝে সে মনকে নিস্তেজ আগ্নেয়গিরির সমতুল্য মনে হবার পরক্ষণেই তাকে জ্বলে উঠতে দেখা যায়। হুইট্‌ম্যানের শিল্প প্রতিভা এই সাধারণ নিয়মের বাইরে। সহসা জ্বলে-ওঠা এবং মুহূর্ত্তে নিভে-যাওয়া তার ধর্ম্ম নয়। সে প্রতিভা উদয়াস্তবিহীন ; তার দীপ্তি গোড়ায় যেমন, শেষেও তেম্নি।

(৪)

জগৎকবিসভায় হুইট্‌ম্যানকে বসাতে আমাদের অনেকে প্রস্তুত নই, তার কারণ উক্ত সভার কবিরা তাঁহাদের লেখায় দিয়েছেন factএর ভগ্নাংশ এবং truth, আর হুইট্‌ম্যান দিয়েছেন factএর পূর্ণাংশ এবং truth। Fact এবং truth এ দুটো জিনিষ একেবারে পৃথক্। তাদের তফাৎ, ফুল এবং ফুলের গন্ধে যা তফাৎ। ফুলের দেহ হতে গন্ধ অংশটুকু বার করে নিয়ে নির্য্যাস তৈরি হয়। উক্ত নির্য্যাস কিন্তু শুধু ফুল থেকেই তৈরি হয় না,—খনির কয়লা থেকেও হয়। ফুলের নির্য্যাস বা এসেন্স কয়লা হতে প্রস্তুত সুগন্ধির চেয়ে ভাল এ কথা নির্ভয়ে বলা চলে না। Truth জিনিষটা আসলে একটা এসেন্স্; যে বস্তু থেকে তাকে প্রস্তুত ক'রে নিতে হয় তার নাম fact; এ fact ফুলের মত সুন্দর হ'তে পারে, আবার কয়লার মত কালোও হয়। পৃথিবী যাঁদের বড় কবি ব'লে মানে তাঁদের অনেকেই fact এর শুধু পুষ্পাংশ গ্রহণ করেছেন এবং কয়লার ভাগ বর্জ্জন করেছেন। অপর পক্ষে হুইট্‌ম্যান পুষ্প ও কয়লার মধ্যে জাতিভেদের সৃষ্টি করেননি; যতক্ষণ তাদের মধ্যে সত্যের রসবস্তু আছে, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার উদ্ধার সম্ভবপর, ততক্ষণ তিনি এতদুভয়ের বর্ণ, গন্ধ, আকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। চরম লক্ষ্যের অভিমুখে তাঁর দৃষ্টি; লক্ষ্যের সাধনে কয়লার ধোঁয়ায় সর্ব্বাঙ্গ কালো হলেও তাঁর কুণ্ঠা নেই। মনোভাবের এরূপ ভঙ্গী ভাল কি মন্দ, সুন্দর কি কুৎসিত, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন হয়ে থাকে। সে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ে একটা কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন। হুইট্‌ম্যানের সমধর্ম্মী আছেন অনেক, কিন্তু এই সব সমধর্ম্মী কি হুইট্‌ম্যানের সমান ধার্ম্মিক? সত্যের আহ্বান কি তাঁরা পেয়েছেন, না শুধু fact এর কয়লায় দেহমন কালো করাই তাঁদের সার হয়েছে? আত্মাভিমান মানুষের মনে স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল; সত্যের যখন খোঁজ্ পাওয়া যায় না, তখন আত্মাভিমানের তাড়না থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করে নিজেকে ঠকিয়ে, অর্থাৎ fact কে truth ভেবে নিয়ে। তাছাড়া প্রেয়কে শ্রেয় ব'লে বিশ্বাস করার দুর্ব্বলতা মানব ধর্ম্মের মজ্জাগত। হুইট্‌ম্যান এঁদের দলস্থ নন্, কারণ তিনি fact কে factই বলেছেন। কয়লার কালোয় শ্বেতপাথরের শুভ্রতা তিনি দেখেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'City Dead-house' কবিতায় পতিতার মৃতদেহ দেখে তিনি লিখেছেন,

"...House of life, erstwhile talking and laughing—but oh, poor house, dead even then,

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

Months, years, an echoing, garnishe'd house —but dead, dead, dead.

দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে মানসিক মৃত্যুর মধ্যে বেদনার গাঢ়তর অভিব্যক্তি আছে, এই বিশ্বাস বলে ও ক'টি লাইন লিখিত হয়েছে। কিন্তু মানসিক মৃত্যু দৈহিক মৃত্যুর মত একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নয়, কারণ মন বস্তুটা ম'রে যাবার পরেও বেঁচে উঠতে পারে। জঁা ক্রিস্তফের ভূমিকায় রোমা রোলাঁ লিখেছেন "আমাদের জীবনে মৃত্যু আর পুনর্জন্ম বারম্বার ঘ'টে আসছে; আমরা মরি নূতন করে বেঁচে ওঠবার জন্যই।" মানব মনের এই মৃত্যুকে অতিক্রম করবার দুর্নিবার শক্তিতে প্রবল আস্থাবশত হুইট্ম্যান চতুষ্পার্শ্বে শত শত মৃত মনের দ্বারা পরিবৃত হ'য়েও আনন্দের গান রচনা করতে পেরেছিলেন; জীবন কোন দিন তাঁর কাছে ভয়াবহ কঙ্কালসার হ'য়ে ওঠেনি।

"Children of Adam and Cadmus" এর অন্তর্গত দেহ এবং sex সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে হুইট্ম্যানের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তার থেকে তাঁকে ঠিক্ মত বোঝা সহজ নয়। নিজের জীবনের চারদিকে হুইট্ম্যান এমন একটা পরম সংযত পবিত্রতার প্রভা রক্ষা করে এসেছিলেন, যার প্রভাবে তাঁকে দৈহিক-সুখলিপ্সু ব'লে ভেবে নেওয়া অসম্ভব। অথচ তাঁর জীবনের মন্ত্র এক এবং কাব্যের মন্ত্র অন্য—এ কথাও অবিশ্বাস্য, যেহেতু তাঁর জীবনের মূলভিত্তির উপর ছিল তাঁর কাব্যের সংস্থিতি। 'So Long' কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন,

"Camerado, this is no book
Who touches this touches a man."

তাঁর কাব্যের এর চেয়ে ভাল পরিচয় দু'কথায় হয় না। অথচ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এমার্শনের নিষেধ সত্বেও হুইট্ম্যান উক্ত দেহাত্মক কবিতাগুলি প্রকাশ করেছিলেন, এবং নিজের এ রচনা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থনে কুণ্ঠিত হননি। তার কারণ sex জিনিষটা তাঁর কাছে সে বস্তু ছিল না, বার্ণার্ড্ শ যাকে বলেছেন 'etching for pleasure'। মানবদেহ হুইট্ম্যানের চোখে দেবমন্দিরের মতন, এবং sex সে মন্দিরের হোমানল শিখা। 'I sing the Body Electric' এর মত কবিতা রক্তমাংসময় দেহের জয়গান, কিন্তু এ সব গানের সুরে এত সূক্ষ্ম ও নিবিড় সৌন্দর্য্যানুভূতি বিদ্যমান, যাতে মনের স্থূল প্রবৃত্তিগুলোর বাহু তাদের স্পর্শ করতে পারে না। ভিনাস্ দ্য মিলোর প্রতিমূর্ত্তির মত তারা সৌন্দর্য্যের অনাবৃত অথচ প্রশান্ত প্রকাশ। সৌন্দর্য্য যেখানে অত্যন্ত নিবিড় এবং পরিপূর্ণ সেখানে নগ্নতা তার দোষ নয়, গুণ; দেহাবরণ সেখানে শুধু বাহুল্য নয়, অপরাধ। রবীন্দ্রনাথের "বিজয়িনী" ('অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন') কবিতায় এই কথাই বলা হ'য়েছে। হুইটম্যানের কাছে মানবদেহ মানবাত্মারই বিগ্রহ; আত্মাকে চেন্‌বার জন্য দেহের দুয়ার দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন। তার প্রমাণ তাঁর লেখায়,—

"I will make the poems of my body and of mortality, for I think I shall then supply myself with the poems of my soul and of immortality." 'র‍্যাবিবেন্ এজ্‌রা'র ব্রাউনিং-এর এম্‌নি এক কথা স্মরণ যোগ্য,—

"...nor soul helps flesh more than flesh helps soul."

অবশ্য এ জাতীয় লেখা সব পাঠকের মনেই শিল্পোপলব্ধির আনন্দ সঞ্চারিত করে না, অনেকের মনে শুধু উত্তেজনা জাগায়। হুইট্ম্যান নিজেও সে কথা জানতেন। তিনি ব'লেছেন,"আমার কাব্য শুধু মঙ্গল করবে না, সেই পরিমাণে ক্ষতিও করবে,—হয়তো মঙ্গলের চেয়ে ক্ষতিই বেশী করবে।" পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু এমন কোনো সাহিত্যধর্ম্মীর কথা লেখা নেই যিনি দুর্ব্বল মনের অসহায়তার দিকে চেয়ে নিজের বলিষ্ঠ মর্ম্মকথা প্রকাশে লেশমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেছেন। পুরানো পাত্রে নূতন সুরা রাখলে পাত্রটির ভেঙে যাবার সম্ভাবনা,—ইংরাজিতে এম্‌নি একটা কথা আছে। পাত্রের ভঙ্গুরতার দিকে কিন্তু চিন্তাবীরের দৃষ্টি থাকে না। বিতরণ তাঁর কার্য্য, তাঁর সুরার শক্তি সহ্য করতে না পেরে দু'চার হাজার জরাজীর্ণ মরণোন্মুখ মন বিচূর্ণ হয়ে গেলেও জগতের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই,—যদি সে সুরা শুধু দু'চারটি সুস্থ, জোরালো মনের পুষ্টি সম্পাদন করতে পারে।

অপর পক্ষে 'I Sing the Body Electric' এর মত কতকগুলি কবিতা সম্বন্ধে যে কথা বলা হ'ল, হুইট্‌ম্যানের দেহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বহু কবিতা সম্বন্ধে সে কথা সত্য নয়। কাব্যের মত অকাব্যও তিনি প্রচুর রচনা ক'রে গেছেন। চলতি সংস্কারের পিঠে ধাক্কা দেওয়ার অকারণ আগ্রহ হ'তে এই সব অকাব্যের সৃষ্টি।

মৌলিকতার উগ্র প্রয়াসও মাঝে মাঝে হুইট্‌ম্যানের মনে অন্ধ আত্মবিস্মৃতি জাগিয়েছে। সুইডেনের লেখক Strindberg তাঁর "মূর্খের স্বীকৃতি" গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন, "Alas! is it ever possible to say where the spiritual ends and the animal begins?" নিজের মনের মধ্যে গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি হুইট্‌ম্যানের ছিল না। সেইজন্য তাঁর spiritual যে কখন animalএ নেমে আসত তা তিনি বুঝতে পারতেন না। এ বিষয়ে Wordsworth এর সঙ্গে তাঁর অংশত মিল আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ রাশি রাশি কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু সুবিখ্যাত Intimations Odeএর পাশাপাশি Prelude এর মত অতি সাধারণ কবিতা রচনা করতে তাঁর বাধেনি। গভীর অনুভূতির প্রভায় দৃষ্টি যখন ভ'রে উঠত তখনই হুইট্‌ম্যান সৃষ্টি করতে পারতেন; অন্য সময়ে তাঁর প্রয়াস শুধু ব্যর্থ হত তা নয়,—সে ব্যর্থতার পরিমাণ বোঝবার শক্তিটুকুও তিনি হারাতেন।

(৫)

সাহিত্যের ধর্ম্ম শিক্ষাপ্রদান নয় শুধু আনন্দদান—এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। কথাটার কোনো মানে নেই, কেননা শিক্ষা ও আনন্দে মূলত কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃত আনন্দপ্রার্থী মাত্রেই শিক্ষার্থী, এবং শিক্ষা মাত্রেই, এমন কি statistics এর শিক্ষাও, আনন্দপ্রসূ। শত শত জিহ্বা দিয়ে গাছ যেমন ভূমি থেকে রস সংগ্রহ করে, শিক্ষার শত শত পন্থা দিয়ে আমরা তেমি আনন্দ সংগ্রহ করি। এই আনন্দের রসে অভিষিক্ত হ'য়ে আমাদের মনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরস এবং সবল হয়। শিক্ষাবিহীন আনন্দ থাকা যদি বা সম্ভবপর, নিরানন্দ শিক্ষার কথা আমাদের জানা নেই। একথা অবশ্য সত্য যে শিক্ষার আনন্দের তলায় মস্তিষ্ক আছে, এবং রসানুভূতির আনন্দে আছে হৃদয়। কিন্তু হৃদয় এবং মস্তিষ্ক এই দুই যন্ত্র বৈদ্যুতিক তার দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। এর যে-কোনো একটিকে ঘুরোলে দ্বিতীয়টি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকবে। তফাৎ এই, মাঝে মাঝে একের ঘূর্ণনবেগ অপরের চেয়ে অধিক হয়। সুতরাং আসলে এ তফাৎ শুধু accentএর তফাৎ। জীবনের পায়ে পায়ে শিক্ষার আনন্দ আহরণ এবং বিতরণ করা ছিল হুইট্‌ম্যানের কার্য্য। তাঁর লেখায় ফিলজফি নেই, কিন্তু থিওরি আছে। এক কথায় এ থিওরির নাম সাম্যবাদ। অথচ একস্থানে তিনি লিখেছেন "A morning glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books." অর্থাৎ তত্ত্বের যে ধমনী তাঁর লেখার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেই তত্ত্বকথার চেয়ে প্রভাতী প্রকৃতির শোভা তাঁর অধিক প্রিয়। এর থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, তত্ত্বের আনন্দে হুইট্‌ম্যানের সম্পূর্ণ তৃপ্তি নেই; মাঝে মাঝে তাঁর হৃদয় তাঁর মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী সজাগ ও পিপাসিত হ'য়ে ওঠে। হুইট্‌ম্যানের কাব্যে এই কোমল দিক্‌টার খুব বড় স্থান আছে। এম্নি এক মুহূর্ত্তের রচনা তাঁর 'Fears' কবিতা। এমন অবিমিশ্র কল্পনা তাঁর রচনার অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ। এ জাতীয় আরো দু'চারটি কবিতার নাম এখানে দেওয়া গেল, যেমন, 'When lilacs last in the dooryard bloom'd,' 'O Captain, my Captain, Out of the Cradle Endlessly Rocking,' 'Pioneers O Pioneers'! হুইট্‌ম্যানের সাগরসঙ্গীতগুলি যেমন, 'In Cabin'd Ships at Sea,' 'Sea-drift,' Old-time Sea-fight,' 'Voice from the Sea' অত্যন্ত সুন্দর। 'Proud Music of the Storm' কবিতাটিতে ঝড়ের দোলানি প্রকাশিত; "Drum Taps" এর অন্তর্গত 'By the Bivouac's Fitful Flame' নামের একটি কবিতা আকারে ছোট হলেও হুইট্‌ম্যানের শিল্পের এক বড় পরিচয়। Sparkles from the Wheel' কবিতাটি পড়বার মতন। 'O Me! O Life! কবিতাটির এখানে বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, যেহেতু হুইট্‌ম্যানের আনন্দকাব্যে এটি একটি নিরালা নিরানন্দের সুর; বেদনায় যিনি চির অবিচল, তাঁর

ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

মুখে দুঃখের এ গান বড় করুণ শোনায়। শেলীর 'O world! O life! O time!' এর সুরের ছায়া এতেআছে।

হুইট্ম্যানের শিল্পী সত্তার আর একটা দিক্ জানবার মত। সে তাঁর মিষ্টিক্ দিক। মিষ্টিসিজ্ম্ বলতে সাধারণত যে অস্বচ্ছতা বোঝায় এ সে বস্তু নয়। এর মধ্যে ধোঁয়া অবশ্য আছে, কিন্তু সে ধোঁয়ার আবরণ এত পাতলা যে চোখের দৃষ্টি অবাধে তার ভিতর দিয়ে যেতে পারে। "Autumn Rivulets" এর অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিতে এই ভাব বিদ্যমান। তার মধ্যে 'Passage to India' কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেহেতু কবি নিজে এর সম্বন্ধে বলেছেন, "There's more of me, the essential ultimate in me, in this than in any other of the poems"—এ কবিতার প্রাণ তার এক প্রশ্নে; সে প্রশ্ন আমার আত্মায় কিসের এ অতৃপ্তি! সংসার বিদ্রূপ-হাস্যে কোথায় আমায় নিয়ে চলেছে?

শুধু জীবনের তারেই শিল্পী হুইট্ম্যান হাত দেননি, জীবনকে অতিক্রম করে মৃত্যুর হিমস্পর্শও তিনি অনুভব করেছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর চরম কথা,—I am deathless"। "অমৃতস্য পুত্রোঽহম"—ভারতের ঋষির উচ্চারিত এই বাণী হুইট্ম্যানের লেখায় উৎসারিত। মৃত্যু হুইট্ম্যানের কাছে ভয়ঙ্কর নয়, যেহেতু জীবন তাঁর কাছে সুন্দর, এবং মৃত্যুকে তিনি ইহজীবনের ওপারে জীবনেরই একটা নূতন আরম্ভ বলে মনে করেন। "Whispers of Heavenly Death"-এ তিনি বলেছেন,

"Did you think that life was so well provided for, and Death, the purport of all life, is not well provided for?"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবিষয়ক কবিতাগুলির একটিতে আছে,

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে' বেড়াই
দুঃখ সুখের ব্যথা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

ব্রাউনিং লিখেছেন,

"......Thou waitedst age; wait death nor be afraid!"

আর ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের কাব্যে আছে,

"O I see now that life cannot exhibit all to me, as the day cannot,

I see that I am to wait for what will be exhibited by death."

সাহিত্য ও আর্ট

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস কন্যা। সাহিত্যও তেমনি সাহিত্যিকের মানস প্রসূত। কবি বা সাহিত্যিক তাঁর কল্পনার প্রভাবে একটা নূতনতর জগৎ তৈরী ক'রে তাকে মনের রঙে রঙীন ক'রে তুলে আমাদের চোখের সামনে ধরেন। বাস্তবজগতে যা কিছু অসুন্দর, যা' কিছু শ্রীহীন, কবি বা সাহিত্যিক তাকে সৌন্দর্য্যের আবরণে মণ্ডিত করে তোলেন। সুন্দরকে সুন্দরতর করে' তোলা, অসুন্দরকে সৌন্দর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত করা, সসীম বা অস্থায়ীর ভিতর অসীম ও অনন্তের সন্ধান পাওয়া, মানবজীবনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যের আবিষ্কার করা,—কবির বা সাহিত্যিকের কাজ। নিরানন্দ সংসারে আনন্দের প্রস্রবণ খুলে দেন তিনি ; আর সে প্রস্রবণ থেকে যে আনন্দ-ধারা বেরোয় তা' "ব্রহ্মাস্বাদ-সদৃশী প্রীতি'র মতো স্বচ্ছ, নির্ম্মল, অনাবিল।

বাস্তব জগতে সংগ্রামের পর সংগ্রাম অহরহ চল্‌ছে—তার না আছে বিরাম, না আছে শান্তি। কিন্তু কাব্য-জগতে দেখি বিপরীত। সেখানে শান্তির ধারা বইছে,—উদ্দাম কামনা নিবৃত্তিতে পরিসমাপ্ত হয়েছে ;—বিদ্রোহের মাদকতা চিরশান্তিতে লুপ্ত হয়ে গেছে। সেখানে অত্যাচার নেই ; অবিচার নেই,—আছে শুধু আনন্দ, আছে শুধু প্রীতি, আছে শুধু প্রেম। শ্রীহীন মানবজীবন সেখানে পূর্ণশ্রীতে মণ্ডিত—বিফলতা বিজয় গৌরবে ভূষিত,—তাই মানুষ সেখানে যেতে চায় আকুলপ্রাণে নিজের চিত্ত-দাহের ক্ষণিক উপশমের আশায়।

সাহিত্যিক যখন এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারেন যা', জীবন-ব্যাধির পক্ষে বিশল্যকরণীর স্বরূপ ফলপ্রদ—তখনি তার সার্থকতা। এখানে আমরা পদে পদে নিরাশ হচ্ছি,—দীনতা আমাদের গ্রাস করে' ফেলছে—চল্‌তে চল্‌তে কেবল পথ হারিয়ে মরছি—মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে তার পানে ছুটছি। এই যে জগৎ—যা' আমাদের প্রত্যেককে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করে' ফেল্‌ছে—তা থেকে বহুদূরে অবস্থিত সাহিত্য জগৎ—চিরসুন্দর, কল্পনার রঙে রঙীন।

সাহিত্য রস ও রূপের সৃষ্টি করে। বিষয়-বস্তুর বিশেষ কিছু ধার সে ধারে না। কাজেই সাহিত্য আর্ট বা কলাবিদ্যা। সাহিত্যিকের দৃষ্টি বর্ত্তমানের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নয়। তিনি রোমান দেবতা Janusএর মতো দু' জোড়া চোখ নিয়ে চেয়ে থাকেন পেছন দিকে আর সামনের পানে। অনন্ত অতীতে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, আবার অনন্ত অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের দিকেও তাঁর নজর। বর্ত্তমানের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ-স্মৃতি ও আশার মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য তৈরী করেন। তিনি দুঃখবাদী নন ; দুঃখের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি সুখের স্বপ্ন দেখেন, আর প্রাণের রঙে রঙীন সেই স্বপ্ন তাঁর সঙ্গীতময়ী ভাষায় অভিব্যক্ত করে মানুষকে আশা দেন,—"ওগো মানব, তোমার দুঃখের দিন দূর হ'বে। এইবারে তোমার পূর্ণসুখ।

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে!"

সাহিত্যিক ফটোগ্রাফার নন, চিত্রশিল্পী। ফটোগ্রাফার যা' দেখেন হুবহু তারি ছাপ তোলেন। কিন্তু চিত্রশিল্পী তাঁর নিপুণ তুলিকা সঞ্চারে শুধু বাহিরটাকে প্রকাশ করেন না, অভিনব রূপ ও রসে ভিতরটাকে অভিব্যক্ত করে তোলেন। এই যে ফটোগ্রাফার ও আর্টিষ্ট—এঁদের তফাৎ ডট্টয়ভস্কি বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,—"চিত্রশিল্পী যে মুখ আঁকবেন সেটী সযত্নে নিরীক্ষণ করে' তার ভিতরকার

বিশেষ ভাবটিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। হয়তো বা যে সময় তিনি মুখটি আঁকছেন তখন সে মুখে সেই বিশেষ ভাবটি ব্যক্ত হয় নি, অথচ তিনি কল্পনার সাহায্যে সেই অন্তর্নিহিত ভাবটিকে ধ'রে ফেলতে পারেন। কিন্তু ফটোগ্রাফার লোককে যেমন দেখেন ঠিক অবিকল তার ছবিটা তুলে ফেলেন। এতে লোকটীর বাইরের দিক প্রকাশ হতে পারে বটে, কিন্তু অনেক সময় আসল মানুষকে ধরা যায় না। ফটো দেখে নেপোলিয়নকে কখনও বোকা আবার বিসমার্ককে কখনো করুণহৃদয় বলে' মনে হতে পারে।

কবি বা সাহিত্যিক আপাত-প্রতীয়মান সত্যকে উপেক্ষা ক'রে আভ্যন্তরীণ সত্যের, চিরন্তন সত্যের আবিষ্কারে যত্নবান হন। তাঁর কাছে বাস্তব জগৎটা বড়ো নয়—বড়ো হচ্ছে অন্তর জগৎ। মানুষ বাইরে দুর্ব্বল—একটা ভাঙ্গা ভেলার মত সংসার সমুদ্রে ভাস্‌ছে—ব্যাধি, জরা, দারিদ্র্য তাকে অহরহ আক্রমণ করছে—ষড় রিপুর মধ্যে প্রত্যেকটি কোনো না কোনো সময়ে তার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে—তার পশুপ্রবৃত্তি তা'কে কেবলি ভাগাড়ের দিকে টানছে। বাইরের এই যে দীনতা, দুর্ব্বলতা—এই কি মানুষের প্রকৃত রূপ? না তা তো নয়। মানুষ দেবতার চেয়ে বড়ো। তাকে শয়তান ও তার সহস্র অনুচরের সঙ্গে অহর্নিশি সংগ্রাম করতে হচ্ছে;—আর সেই অক্লান্ত সংগ্রামে তার আক্রান্ত প্রায়-পরাজিত দেবত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হচ্ছে—মানুষ প্রকৃতিজয়ী—সে সত্যের সন্ধানে কঠোরকে বরণ করে নিয়েছে—দিনের পর দিন সে স্বর্গের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—তার মন শত সহস্র বিপদে অচল অটল—সে প্রমিথিয়ুসের মতো দুর্জ্জয়—দধীচির মতো ত্যাগী—বুদ্ধের মতো মার-জয়ী। এই তো মানুষের প্রকৃত রূপ। মানুষ যেখানে পশু—সাহিত্য, অন্ততঃ সৎসাহিত্য, তার সেই দুর্ব্বলতাটুকুকে বড়ো ক'রে এঁকে তাকে অপমান করে না। মানুষ সেখানে পশুত্ব থেকে দেবত্বে উপনীত হচ্ছে, প্রতি যুগের প্রতি খাঁটি সাহিত্যিক তার সেই বিজয়-যাত্রার নূতনরূপ সৃষ্টি করে। তাকে গৌরব-মুকুট বিভূষিত করে।

সাহিত্য ও আর্ট

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

প্রসিদ্ধ ইতালীয়ন্ চিত্রকর লিওনাদো দাভিকি বলেন—"মানুষ ও তার আত্মার আকাঙ্খা তুলিতে ফুটিয়ে তোলাই চিত্রকলার স্বার্থকতা।" সাহিত্যের পক্ষেও এই কথা বলা যেতে পারে। মানুষের আকাঙ্খা দু'রকমের—দেহের ও আত্মার। দেহের ক্ষুধা যা, সেইটাকে বড়ো ক'রে দেখানো সাহিত্যের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আত্মার ক্ষুধাটাকে রূপ দেওয়াই প্রতি দেশের সাহিত্য-রথীরা নিজেদের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা ব'লে উপলব্ধি ক'রে এসেছেন। যেখানে মানুষে আর পশুতে কোনো তফাৎ নেই, সেখানে সে ছোটো; কিন্তু মানুষ যেখানে সত্য, শিব, সুন্দরের দিকে ধাবমান, সেখানে সে বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; আর মানুষের এই প্রচেষ্টা অমর করে গেছেন বিশ্বের কবি ও সাহিত্যিকেরা। যাঁরা তা' করেন নি, যাঁরা মানুষে পশুতে কোনো তফাৎ দেখেন নি,—বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তাঁদের স্থান সবার পেছনে। সাহিত্য-বোধের খোরাক আত্মার খোরাক সরবরাহ করে—দেহের নয়।

আধুনিক যুগের দুজন নামজাদা পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের কথা বলবো—ইবসেন ও ডষ্টয়ভস্কি। এঁরা দু'জনেই মানবাত্মার আশা আকাঙ্খার চিত্র এঁকেছেন। দুজনেই মানুষের ভিতর শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছেন. এবং ডষ্টয়ভস্কি সোজা ভাষায় তাঁর আবিষ্কৃত সত্যের প্রকাশ করেছেন তাঁর অনেক রচনার মধ্যে। ইবসেন অবশ্য হেঁয়ালীর আশ্রয় নিতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যটা একটু ধোঁয়াটে করে ফেলেছেন।

শিল্পী কোনো জিনিসকে টুকরো টুকরো করে দেখেন না। তিনি একটা অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধি করে' আনন্দ পান, আর সাধারণকে সেই আনন্দের অধিকারী করেন। মানবের দৈনন্দিন জীবন কঠোর তীব্র সত্য বটে, কিন্তু তা আর্টের সত্য নয়। আর্ট তার একটা চিরন্তন পূর্ণ রূপ দিয়ে তাকে সুন্দর করে' অর্থপূর্ণ করে' গড়ে তোলে। এই চিরন্তন অখণ্ড সত্যের আবিষ্কার সকলে করতে পারে না।

A thousand poets pried at life
And only one amid the strife
Rose to the Shakespeare.

—Browning.

কিন্তু প্রতি খাঁটি শিল্পীর এবং সাহিত্যিকের এই সাধনা। শিল্পীর বা সাহিত্যিকের প্রচেষ্টা তখনি সার্থক হ'য় যখন তিনি বোঝেন,—

"This world's no blot for us,
Nor blank; it means intensely, and means good.

—Browning

বাইরের দিক থেকে মানুষকে দেখে বিচার করলে তার উপর অবিচার করা হবে। নিছক পশুধর্ম্মী বা নিছক দেবধর্ম্মী মানুষ নেই বল্লেই হয়;—তার ভিতর পশুত্বও আছে দেবত্বও আছে। এই সত্য জানতে গেলে তার অন্তরটা দেখ্‌তে হবে;—এবং সেই দেখাই শিল্পীর দেখা।

কুৎসিতের ভিতর সৌন্দর্য্যের সন্ধান সাধারণ লোকে করে না। কিন্তু শিল্পী তা করতে পারেন। কাজেই আর্টের বিষয়-বস্তুর কোনো সীমানা নির্দ্দেশ হতে পারে না। সাধারণের চোখে যেটা অসুন্দর, যা'র কোনো মূল্য নেই,—যেটা পশুপ্রবৃত্তি, ঘৃণ্য, অপবিত্র, প্রকৃত আর্টিষ্ট তা'রি ভিতর সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান ও তা'র একটা নবরূপের সৃষ্টি করে' তা'কে বিশ্বের বরেণ্য করে তোলেন। ব্রাউনিংএর প্রতিধ্বনি করে' তিনি বলেন,—"O world as God has made it, all is beauty." দুনিয়ায় যা' কিছু আছে কবি বা আর্টিষ্ট তারি উপর নিজের প্রতিভার আলো বিস্তার করতে পারেন। সে আলো নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও সুদূর-সন্ধানী। পঙ্কের ভিতর পদ্ম জন্মে; তেমনি কুৎসিতের ভিতরও সৌন্দর্য্যের সন্ধান মেলে। যে মানুষ সারাজীবন পশুর মতো কাটিয়ে আসে, সেও কখনো কখনো পশুধর্ম্মের উপর বিজয়ী হ'য়ে নিজেকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারে। সে যে মুহূর্ত্তে দেবতা, শিল্পী সেই মুহূর্ত্তটিকে অমর কোরে' আঁকেন আর সেই আঁকাতেই তাঁর চরম সার্থকতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কবি টমাস হুড্, ষ্টীফেন ফিলিপ্‌স্, সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে পতিতার উচ্ছৃঙ্খল জীবনে এই অনন্ত মুহূর্ত্তের সন্ধান পেয়েছেন, তাই তাঁদের চরিত্র-সৃষ্টি 'শ্রেষ্ঠ আর্ট বলে' চিরকাল অমর হ'য়ে থাকবে। বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী রোদাঁ বলেন,—"আভ্যন্তরীণ সত্যের অভিব্যক্তিই আর্টের সৌন্দর্য্য। বাইরের রূপ ভেতরকার রূপ প্রকাশের সাহায্য করে মাত্র। নীল আকাশে রঙের লীলা, দিগ্বলয়ের ক্ষীণরেখা, মানুষের কাজ ও আকার ইঙ্গিত, তার মুখের রেখাগুলি,—এ সবের আর কিছু স্বার্থকতা নেই,—এগুলো ভিতরকার আত্মার, ভাবের প্রকাশ বলেই শিল্পীর কাছে এদের দাম।" আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে গোর্কি ও গিসিং দুজনেই কুৎসিৎকে বহু মান দিয়াছেন কিন্তু কুৎসিৎ বলে' নয়, সুন্দরের ব্যঞ্জক বলে'ই। ভালো আর মন্দের মধ্যে তফাৎ করা যেতে পারে না, কেন না, "good and evil in the field of this world grow up together almost inseparably" —Milton। কিন্তু মন্দের ভিতর ভালোকে দেখাই শিল্পী বা স্রষ্টার চরম লক্ষ্য। বাইবেলে আছে যে, ভগবান যা কিছু সৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, সকলি ভালো। সৃষ্টির মূলে আনন্দ; কুৎসিৎ সে আনন্দ দিতে পারে না।

সাহিত্যিক বা আর্টিষ্ট যেখানে সেই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, যেখানে তিনি পাঁককে পাঁক বলে' এঁকেছেন, কুৎসিৎকে নিছক কুৎসিৎ ভেবেই লোকের চোখের সামনে তা'র নগ্নমূর্ত্তি ধ'রে বলেছেন,—ওগো কুৎসিৎ, ওগো শ্রীহীন, তুমি অসুন্দর, তাই তোমায় ভালবাসি'—সেখানেই তার সকল প্রচেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে। যে সব ভাস্কর নারীর নগ্নমূর্ত্তির মধ্যে একটা অপার্থিব সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করেছেন,—তাঁরাই প্রকৃত ভুবন-বিজয়ী। কিন্তু যাঁরা সেই নগ্নমূর্ত্তির দ্বারা মানুষের কামানলে আহুতি প্রদান করেছেন,—তাঁদের চেষ্টা অন্তত সুধী সমাজে সাফল্য মণ্ডিত হ'তে পারে নি। Venus of Milo দেখে কারো মনে কুভাব উদিত হতে পারে না,—সেটা নিখুঁত সৌন্দর্য্যের নিখুঁত ছবি। কিন্তু যে সব নগ্নছবি হাটে বাজারে বিক্রি হয়, তা'তে কি কোনো সৌন্দর্য্যের প্রেরণা আছে? Velasquezএর মাতালের ছবি প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে; কিন্তু তাই ব'লে Titian, Corregis বা

সাহিত্য ও আর্ট

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

Raphaelএর কোনো ছবির পাশে কি তাকে দাঁড় করানো যেতে পারে? প্রাচীন গ্রীসে যাঁরা হোটেলের দৃশ্য প্রভৃতির ছবি আঁকতেন, সকলেই তাঁদের ঠাট্টা করতো।

বিষয় সাহিত্যের উপাদান মাত্র—চিত্রেরও তাই। সাহিত্যিক যে কোন বিষয় বস্তু কল্পনার পরশ-পাথরের সাহায্যে সোনায় পরিণত করে দিতে পারেন। যে বিষয় নিয়ে সভ্যতার আদিম প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি যুগে একবার নয় অনেকবার নাড়াচাড়া হ'য়ে গে'ছে, খাঁটি সাহিত্যিক তাকে নূতন রূপ দিয়ে তার ভিতর অভিনব রসের সন্ধান দিয়ে তা'কে বিচিত্র করে গড়ে' তোলেন। তার সাক্ষী আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত কাব্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে ধার নিয়ে কত কবি কত নাট্যকার অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন। Shakespeare বিশ্বের প্রধান কবি বলে পূজা পাচ্ছেন যুগে যুগে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদানের জন্য তাঁকে ধার করতে হয়েছিল বার বার,—মহাজনের টাকা নিয়ে তিনি কারবার করেছিলেন আর সেই কারবার এতো ফলাও হয়েছিল যে তারি উপস্বত্ব থেকে তিনি অমর অটুট কীর্ত্তি-সৌধ রচনা করে গিয়েছিলেন। Shakespeareএর মৌলিকতা বিষয়বস্তুতে নয়—তাঁর মৌলিকতা নূতন রূপসৃষ্টিতে, অভিনব-রস উদ্বোধনের শক্তিতে। প্রতি যুগেই দেখি, অতি পুরাতন বিষয় বস্তুগুলো সাহিত্য শিল্পীর কাছে তাদের নিবেদন জানায়,—

> "ওগো কবি, ওগো সাহিত্যিক,
> আন নব রূপ, আন নব শোভা,
> নূতন করিয়া লহ আরবার
> চির পুরাতন মোরে।'

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশে সাহিত্যের উপর একটা বিপ্লবের ঝড় বয়ে' গেছে। উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি Comte তাঁর Positivism প্রচার করে' বলেন—যা' কিছু আমরা জানি বা জেনেছি সবই বৈজ্ঞানিকের চোখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করে' দেখ্‌তে হবে'। অনুভূতি একটা স্বপ্নমাত্র, তার কোনো সার্থকতা নেই। বিজ্ঞান যেখানে বলবে, না,—সেখানে আর কোনো দ্বিরুক্তি না করে' তার রায়টা মেনে নিতে হ'বে।" সেই থেকে ফরাসী দেশে Realism জিনিসটার—আমদানি হোল। কতকগুলি সাহিত্যিক চীৎকার করে' উঠ্‌লেন,—"সৌন্দর্য্য, আদর্শ এ সব নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাটি হ'য়ে গে'ছে; আর 'কাব্যি' করলে চল্‌বে না। এইবার থেকে আমরা চোখের সামনে যা' দেখছি, তাই লিখ্‌বো, আর সে সব দেখে মনে যে ভাব উদয় হয়, তারি প্রকাশ করবো সাহিত্যে।" ১৮৫০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসী ঔপন্যাসিক Champfleury বিদ্রোহের সুরু করে' দিলেন। আর সেই বিদ্রোহের পেছনে ছুটলেন কয়েকটি চিত্রশিল্পী—Courbet, Daumier ও Monnier প্রভৃতি। ১৮৫৬ সালে Realisme নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হোল। কিন্তু ছ'মাসের বেশী তা'র বাঁচা হোল না। তা'র পর ১৮৫৭ সালে Flaubert যখন দুর্দ্দম সাহসে মাদাম বোভারী প্রকাশ করলেন—তখনি ফরাসী দেশে Realism এর বিজয় বার্ত্তা বিঘোষিত হোল। Flaubertএর যে Realism তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। তিনি কতকগুলি কঠোর ও কুৎসিৎ সত্যকে কল্পনার আলোতে রঞ্জিত করেছিলেন। পরিদৃশ্যমান জগতে ও নৈতিক জীবনে শ্রী ও সৌন্দর্য্যের অভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বটে; কিন্তু তারি অভ্যন্তরে যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে, যা শুধু শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে, এটি তিনি ভোলেন নি। তাঁর মতে, যা' চিরন্তন তারি প্রকাশের নাম আর্ট; যদিও তিনি এও বলেছেন যে, তিক্ত যা' তা'কে জোর করে' মিষ্ট করায় কোনো লাভ নেই।

এইবার এলেন জোলা তাঁর naturalism নিয়ে। Naturalism ও Realism দুইয়েরি কাজ হচ্ছে, যেটা দেখা যাবে সেইটে প্রকাশ করা। কিন্তু তফাৎ আছে। Realism সবটুকু প্রকাশ করে, অর্থাৎ এ পৃথিবীতে ভালো মন্দ যা' কিছু আছে Realist এর চোখে তা' সবি ধরা পড়ে যায়, সমাজের সুস্থ অবস্থা ও ব্যাধি সে অপক্ষপাতভাবে এই দুয়েরই রূপ আঁকে। কিন্তু Naturalist এর কাছে মাত্র একটা নমুনা আছে যে, জীবনটা বিলকুল খারাপ, এতে ভালো কিছুই নেই,—পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড জেলখানা,

এখানে যারা আছে সবাই কোনো না কোনো অপরাধে *অপরাধী;—আর সে যা কিছু দেখে সবি এই নমুনা মাফিক কাট ছাঁট করে নেয়।* *জোলা বল্লেন,—"উপন্যাস লিখতে চাও, তো তোমার চার পাশের লোকগুলোকে* বেশ ক'রে চোখ চেয়ে দেখো;—কিন্তু তুমি তো, বাপু, খবরের কাগজের রিপোর্টার নও, কাজেই যে সব ঘটনা চোখে পড়বে, সেগুলোর একটা সামঞ্জস্য ক'রে তোমার বক্তব্যটা খাড়া করো।"—অর্থাৎ জোলার মতে বাস্তব ঘটনা নিয়ে ঔপন্যাসিককে একটা রাসায়ণিক প্রক্রিয়া করতে হবে। কিন্তু সেই যে রাসায়ণিক প্রক্রিয়া তার জন্যে যে পরীক্ষাগার চাই, তা তো বাস্তবজগতে মিলবে না। এই খানেই জোলার গলদ।

Realism বা Naturalism এর মধ্যে মানব জীবনের নানান্ অভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবার যে প্রচেষ্টা, সেটা খুবই ভালো, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে, জীবনের যে দিকটা মানুষের পাশবিক ভাবকে প্রকাশ করছে, সেই দিকটাই দেখবো, অপর কোনো দিকে নজর দেবো না, এ নিছক বাতুলতা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? ফরাসী উপন্যাসের প্রভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যে মানুষের পশুত্বটাকে বড়ো করে দেখানো—যেটা বাজে সেইটাকে বহু মান দেওয়া—এই দিকেই বেজায় ঝোঁক এসেছে। এটা বিকারগ্রস্ত রোগীর হাত পা ছোঁড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। স্পেনিয় ঔপন্যাসিক আর্ম্যান্দো পালাসি ও ভলদেসের কথায় বলতে গেলে,—আর্ট যেন আজকাল মেজাজ ও একগুঁয়েমির আখড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন নূতন সাহিত্যিক কখনো বা উন্মত্তের মতো প্রলাপ বকছেন, কখনো বা ভাঁড়ামি করছেন,—তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকছেন কতকগুলো বিশ্রী ভড়ং দিয়ে। যতদূর সম্ভব পাঠকদের রুচি-বিকারের সুবিধা নিচ্ছেন—আর এ দিকে পাঠক সম্প্রদায় তাঁদের পাল্লায় পড়ে ভালো-মন্দ, সম্ভব অসম্ভবের বিচারশক্তি হারিয়ে ব'সেছে। এই যে আর্টের রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে, এর কারণ তিনি দিচ্ছেন যে—আজকাল যাঁরা উপন্যাস লেখেন তাঁদের মধ্যে "একটা নূতন কিছু করোর" ধুয়ো উঠেছে। অতীত যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে বিষয় ধার করতে তাঁরা নেহাৎ অরাজী, যদিও তাঁরা বেশ ভালো রকম জানেন যে, পুরাণোর উপর রঙ ফলানোর চেষ্টাই তাঁদের যোগ্য কাজ,—তাই তাঁরা এমন কতকগুলি আজগুবি সমাজ-সমস্যার অবতারণা করছেন যা' সম্ভবের গণ্ডী অনেক জায়গায় ছাড়িয়ে গেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাস, বিশেষতঃ কতকগুলি রুষিয় উপন্যাস তলিয়ে বুঝলে দেখতে পাবো যে, নায়ক বা নায়িকাকে উপলক্ষ করে' লেখকেরা একটা কোনো সমাজের বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর সমাজের ছবি আঁকছেন,—এবং সেটা বেশ ধীর স্থীরভাবে না এঁকে, তার একটা প্রকৃত চিত্র না লিখে, বাহবা নেবার জন্য বা সকলকে চমকে দেবার জন্য কতকগুলো বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা সমন্বয় করবার চেষ্টা করছেন মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের ভিতর দিয়ে। রূপ ও রসকে বরখাস্ত করে' তাঁরা কোন বিশেষ মতবাদের উপর সাহিত্য-সৃষ্টি খাড়া করে তুলছেন। ঝোঁকের মাথায় যা' করছেন, পাগলের মতো সেইটেকেই যুগধর্ম্মের প্রকাশ বলে' প্রচার করছেন। তাঁরা যেটাকে সত্য বলে গর্ব্ব করছেন, সে যে কতবড়ো মিথ্যা, তা' তাঁরা অন্ততঃ কখনো কখনো টের পান; কিন্তু নতুনের নেশা তাঁদের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটায় বলে' তাঁরা মিথ্যাকে সত্যের পথে চালান্ করতে পিছপাও হন না। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ; পাপই যদি তার ধর্ম্ম—কুৎসিৎই যদি একমাত্র সত্য,—তাহ'লে তো পৃথিবীর কোনো মূল্য নেই, জীবনের কোনো সার্থকতা নেই,—মানুষ আর পশুতে এতটুকু তফাৎ নেই।

Plato বলেন যে আত্মভোলা মানুষ সৌন্দর্য্য-সাধনা দ্বারাই জ্ঞানের চরম সীমায়—তার জীবনের সার্থকতায় উপনীত হয়। প্রতি যুগের খাঁটি কবি বা সাহিত্যিক এই সৌন্দর্য্য সাধনার পথে মানুষকে এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ এই অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, পাশ্চাত্য দেশের উপন্যাস লেখকেরা আমাদের বলছেন,—"সৌন্দর্য্য সাধনায় কাজ নেই। কুৎসিৎ যা, ঘৃণ্য যা, এতদিন মানুষ যাকে লোকসমাজে বার করতে চায়নি, অথচ যা' অতি সত্য, তাকেই বরণ করে' নিতে হ'বে। যুগ যুগান্তরের বদ্ধমূল ধারণাকে উপড়ে ফেলতে

হবে। চারপাশে অন্ধকার তাই ভালো—আলোতে কোনো প্রয়োজন নেই। প্রেম ঝুটো—সাঁচ্চা হচ্ছে কাম। মানুষের মহত্ত্ব স্বপ্নমাত্র,—মানুষ পশু—এই হচ্ছে চরম সত্য।"—এই যদি এ যুগের বাণী হয় তাহ'লে বুঝি মহাপ্রলয়ের আর বেশী দেরী নেই। জীবনের ঝড় ঝাপ্টা থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ এতদিন সাহিত্য-দর্শনের পাদপ-ছায়ায় আশ্রয় নিতো—সে আশক্তি আর তার নাই। এ ভীষণ অবস্থা আধুনিক যুগের সেই ধুরন্ধর-বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েড যিনি আধুনিক পাশ্চাত্য realistic সাহিত্যের মন্ত্রগুরু তিনিও আজ উপলব্ধি করে 'শিউরে' উঠেছেন—তাই তিনি বলেছেন—"আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না"—হুগো, শেলী, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ,—তোমাদের স্বপ্ন আজ ভেঙে গেছে—তোমরা যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে তার খোলস খুলে' গিয়ে তার নগ্নমূর্ত্তি লোকের চোখে ধরা প'ড়ে গেছে,—কী বিশ্রী রূপ রসহীন কঙ্কাল! তোমরা যে জুয়াচুরি দিয়ে এতদিন সকলকে ভুলিয়ে আসছিলে, হে যুগযুগান্তরের কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ, সে জুয়াচুরি আর টি'কবে না—বিজ্ঞান আজ মানুষের চোখ খুলে দেছে! Freud আর Havelock Elis আজ তোমাদের সিংহাসনচ্যুত করেছে।

এই যে Realism এতে কি কোন আর্ট নেই? আছে, একশোবার বলবো আছে। সে আর্টটা যে কি প্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক ফাগুয়ে (Faguet) তা'র ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, "বাস্তবজগতে যা' কিছু আছে সেগুলো ঠিক মতো ও ধীর স্থির ভাবে দেখা এবং সাহিত্যে তার স্বরূপ প্রকাশ করার নামই Realism, তা' বলে' সবগুলো অগোছাল অবস্থায় সাহিত্যের বস্তার ভেতর ফেলে দেওয়া realism নয়। তা যদি হোত তা' হ'লে রাস্তার একমুড়ো থেকে আর একমুড়ো পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ানই সব চেয়ে সেরা আর্ট হোত। অভিজ্ঞতা-লব্ধ হাজার হাজার জিনিষের ভেতর থেকে খুব অর্থপূর্ণ কয়েকটা বেছে নিয়ে সেগুলিকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যা'তে তাদের স্বরূপের কোনো হানি না হয়, অথচ যাতে পাঠকদের মনে এমন একটা অনুভূতি আসে, যা' তারা নিজের চোখে সে সব দেখলেও জেগে উঠ্‌তো, কেবল সে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তীব্রতর ভাবে মনকে স্পর্শ করবে এই হচ্ছে আসল আর্ট।" পাঠকের মনের অনুভূতিই সাহিত্যিক প্রকাশ করেন, কিন্তু এমন এক ভঙ্গীতে যা' সাধারণ মানুষে পারে না;—আর সাহিত্যিক যখন সেটা প্রকাশ করেন তখনি পাঠক বুঝতে পারে সব প্রথম যে, সাহিত্যিক তা'র নিজেরই প্রাণের কথা ব্যক্ত করেছেন। আর একজন ফরাসী লেখক গুইয়ো (Guyan) বলেন—"আপাতদৃষ্টিতে যাতে কবিতার লেশ নেই বলে' মনে হয়, তার ভিতর কবিতার অনুভূতি,—পুরাণো মর্চ্চে পড়া দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নূতনত্বের আবিষ্কার এই হচ্ছে realism-এর মূলমন্ত্র।" তিনি আরো বলেন যে, "অতি সাধারণ জিনিষ নিয়ে সাধারণভাবে ঘাঁটাঘাঁটি আর realism এ দুটো আকাশ পাতাল তফাৎ।" (Le realisme bein entendu est juste le contraire de ce q'on pourrait appelor le trivalisme) তাহ'লে যাঁরা বাস্তব জীবনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন তাঁদের একটা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই,—যার সাহায্যে তাঁরা সাধারণের ভেতর অসাধারণের উপলব্ধি করতে পারেন আকার ইঙ্গিত কার্য্যকলাপের ভেতর দিয়ে মন বা আত্মার সন্ধান নিতে পারেন। কিন্তু একটা কোনো দৃঢ় সংস্কার মনে নিয়ে যদি তাঁরা একাজে প্রবৃত্ত হন, যেমন যদি তাঁরা ভাবেন যে, নর বা নারীর প্রত্যেক কর্ম্ম ও চিন্তার একমাত্র উৎস হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট কাম প্রবৃত্তি—তাহ'লে তাঁরা ভুল করে বসবেন। Realism বজায় রাখ্‌তে গেলে আরো দু'এক বিষয়ে লেখকদের সতর্ক হ'তে হ'বে। রসসাহিত্য কল্পনা-প্রসূত, কাজেই অতি সাধারণ কতকগুলি ব্যাপার নিয়ে কেবল ঘাঁটাঘাঁটি করলে তার গতি বাধা পায়, ও সাহিত্য অনেকটা প্রাণহীন হ'য়ে পড়ে। যে সাহিত্যের মধ্যে লেখকের রঙের ছোপ্ নেই, তা যথার্থ সৃষ্টি হ'তে পারে না; কিন্তু বাস্তব জীবনের সত্যটুকু বজায় রাখতে গেলে, যিনি শিল্পী তাঁকে কতকটা নিরপেক্ষভাবে নির্লিপ্তভাবে থাকতে হবে—নইলে অতিরঞ্জন খুবই স্বাভাবিক।

Pater বলেন, কল্পনা-প্রসূত সাহিত্য বাস্তবের প্রতিলিপি নয়,—বাস্তব জগৎ সাহিত্যিকের মনে যে অনুভূতি

আনে, তারি প্রকৃত ও নিখুঁৎ চিত্র।—আর্ট-সম্বন্ধে এইটেই বোধ হয় সব চেয়ে বড়ো কথা। এই যে সাহিত্যিক অনুভূতি এটা ঠিক সাধারণ অনুভূতি নয়। Shelley বলেছেন,—

Nor heed nor see what things they be.
But from these create he can
Things more real than living man,
The nurslings of immortality.

সাধারণ লোকে একটা ফুলের হুবহু বর্ণনা করিতে পারে; কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী সেই ফুল থেকে এমন একটা ইঙ্গিত পান যা' আর কেউ পায় না; আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই ইঙ্গিতটাকে ভাষার বাঁধনে বেঁধে ফেলেন; এবং যখন তিনি তা' করেন, তখনি প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারেন। বাস্তব-সাহিত্যের গুরু-স্থানীয় Flaubert বলেন,—"শিল্পীর মন হবে সমুদ্রের মতো স্বচ্ছ, অনন্ত অসীম।... জগতে যা' কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টি শান্ত-গম্ভীর অতল-স্পর্শ; পর্ব্বতের মতো স্থির, সমুদ্রের মত বাত্যাবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গ সঙ্কুল, অথচ সুন্দর, অরণ্যের মত কুজনময়, মরুভূমির মতো ভীষণ, আকাশের মতো নীল।

Flaubert এর সাক্ষাৎ শিষ্য মোপাসাঁ। তিনি যা' বলেছেন, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—"যেটা তুমি ভাষায় প্রকাশ করতে যাচ্ছ, সেটিকে খুব ভালো করে' অনেকক্ষণ ধরে' দেখ্‌বে। তখন তুমি তার এমন একটা দিক ধরতে পারবে যা' আর কেউ কখনো দেখেনি বা প্রকাশ করেনি। প্রত্যেক জিনিসেই অনাবিষ্কৃত কিছু একটা আছে। সব চেয়ে সামান্য যা' তাতেও অজানার সন্ধান মেলে। তাই খুঁজে বার করতে হবে। জলন্ত আগুন কিম্বা প্রান্তরের গাছ বর্ণনা করতে গেলে তা'র সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে,—তা'কে নিরীক্ষণ করতে হবে,—তারপর এমন এক সময় উপস্থিত হ'বে যখন সেই গাছ, সেই আগুন তার একটা বিশেষ মূর্ত্তি চোখের সামনে প্রকাশ করবে। এই অনুভূতি হ'চ্ছে সাহিত্যিকের মৌলিকতা।"

তাহ'লে ফল দাঁড়ালো এই যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বাস্তব যা' কঠোর সত্য যা' তা'কে বাদ দিলে চলবে না। এমন একদিন ছিল যখন কবি বা ঔপন্যাসিক বিজ্ঞান বা ইতিহাসের কোনো ধার ধারতেন না—তাঁরা ছিলেন নিরঙ্কুশ। কিন্তু সে দিন আর নেই—এখন জ্ঞান চারদিকে বিস্তার হয়ে পড়েছে—কাজেই অবৈজ্ঞানিক বা ইতিহাস-বিরুদ্ধ কোনো কথা বলতে গেলেই বিপদ। Politicsএ যেমন রাজতন্ত্রের সমাধির উপর প্রজাতন্ত্র অধিষ্ঠিত হচ্ছে,—সাহিত্যেও তেমনি একটা সার্ব্বজনীনতা এসে পড়েছে, যাকে ফরাসীরা La Republique des lettres. সাহিত্যের আভিজাত্য, তার দ্বিজত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে এসেছে,—সাহিত্যক্ষেত্রে এখন পঞ্চম বা পারিয়ার মতন অস্পৃশ্য কিছুই নেই। চন্দন আর পাঁক—দুটোই এখন পাশাপাশি থাকতে পারে। কিন্তু রূপকথার রাজপুত্রের মতো সাহিত্য-শিল্পীর একটা সোণার কাঠি থাকা চাই—সেটি হচ্ছে কল্পনা, যা এই কুৎসিৎ জড় জগতের ভিতর নূতন জীবনের সঞ্চার করে। গ্রীক পুরাণের Antaeus দানবকে যেমন নূতন শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য পৃথিবী স্পর্শ করতে হ'তো যখন তখন,—কবি বা সাহিত্যিককে তেমনি নিজ শক্তি সংগ্রহের জন্য বাস্তবকে স্পর্শ করতে হ'বে কেবলি,—কেননা, বাস্তব-জীবনে যা সত্য তাকে এড়ানো যেতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যিকের প্রধান সাধনা বাস্তবের ভিতর এমন একটা কিছু আবিষ্কার করা যা' লোকচক্ষুর অগোচর যা' গভীরতর সত্য, শিব, সুন্দর। পারিপার্শ্বিক ব্যাপারের দিকে নজরটা কিছু কম ক'রে 'অন্তরের চিরসত্য যা' তারি দিকে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই সাহিত্যিকের চরম সার্থকতা। বাহ্যরূপ অন্তরের প্রকাশ—তাই তার দাম—এটা ভুললে সাহিত্যিকের চল্‌বে না।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর দিয়ে Bolshevismএর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অতীত যা' তা' অতীত—তাকে ভেঙে ফেলতে হ'বে—বর্ত্তমানই হচ্ছে খাঁটি সত্য—ভবিষ্যতের কথা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, কাজেই তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। চারিদিকে এই বুলি। এটা যে প্রকাণ্ড মিথ্যা, তা' কি কেউ বোঝে না? আমি তুমি সবাই অতীতের সন্তান—আমরা যে যুগে বাস করছি সেটার দাম খুব বেশী হলেও গত যুগগুলো যে আমাদের দেহে মনে

সাহিত্য ও আর্ট

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

তাদের ছাপ দিয়ে গেছে তা'কি ভুলতে পারা যায়? জনতন্ত্রের প্রধান কবি Whitman ও অতীতটাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনিও বলেন,—

Dead poets, philosophers, priests,
Philosophus, artists, inventors, governments
long since,
Language—shapers on other shores
Nations once powerful, now reduced, withdrawn,
or desolate,
I dare not proceed till I respectfully credit what
you have left—wafted hither.

আমরাই আবার ভবিষ্যৎটাকে গড়ে তুলবো; কাজেই ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি রাখা চাই। সাহিত্য-শিল্পী যিনি, তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, যুগের পর যুগ চলে যেতে পারে; কিন্তু মানুষের আশা আকাঙ্খা সমানই থাকে—সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন আপাতদৃষ্টিতে যত বেশী বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে তত বেশী নয়। এই যে মানবজীবনের, মানব হৃদয়ের একটা চিরন্তন সত্য,—যার প্রকাশ আমরা রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত কাব্য সাহিত্যে,—দেখে আস্‌ছি,—তাই উপলব্ধি করা ও তাকে নূতনতর ভাবে নবরূপে ব্যক্ত করাই সাহিত্য শিল্পীর প্রকৃত সাধনা। সাহিত্যিক ভাঙতে আসেন্‌নি—পুরোণো যা' তা'র ভিত্তির উপর একটা সুন্দরতর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন—যা' যুগযুগান্তরের ধ্বংসলীলায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। খাঁটি সাহিত্যিক যিনি—অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্ত্তমানের প্রতি স্নেহ ও ভবিষ্যতের আশা—এই তিনটিই তাঁর থাকা চাই। শ্রদ্ধাহীন, স্নেহহীন, নিরাশাময় সাহিত্য, অমরতার দাবী করতে পারে না।

প্রকৃত আর্ট, প্রকৃত রস-রচনা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র গণ্ডী, সহজ প্রাপ্যের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায় না। যুগযুগান্তরের অন্তর্নিহিত বাণীকে রূপ দেবার চেষ্টা তা'র। ব্রাউনিং তাঁর Andrea del Sarto কবিতায় আর্টের যে ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করেছেন, সেইই তাঁর আসল ব্যাখ্যা। Andrea নিখুঁৎ শিল্পী; তিনি প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ করতে পারতেন। কিন্তু Raphael এর চিত্রশিল্পে অনেক খুঁত ছিল। Anatomyতে তাঁর তেমন দখল ছিল না। Andrea তাঁর চিত্রের অনেক পরিবর্ত্তন করতে পারতেন; কিন্তু Raphael যে অন্তর্নিহিত আত্মাকে ফুটিয়ে তুলতেন,—সেটা Andreaর সাধ্যাতীত ছিল। তাই তিনি বল্লেন,—

"its soul is right,
He means right, that, a child may understand,
Still, what an arm! and I could alter it,
But all the play, the insight and the stretch—
Out of me: out of me!"

এক কথায় তিনি শিল্পীর আদর্শের ইঙ্গিত করলেন,

"A man's reach should exceed his grasp,
Or what's Heaven for?

এই যে পাওয়ার ভিতর না পাওয়ার সন্ধান, এই একটা অনন্ত চিরন্তনের ইঙ্গিত এই খানেই আসল আর্ট। শিল্পীর দেখার ধরণ একেবারে absolute নিরপেক্ষ, নূতন,—চির নূতন।

আগেই বলেছি, যে কোনো বস্তুর উপর রস সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হ'তে পারে। যৌন মিলন—যেখানে মানুষ আর পশুতে কোন তফাৎ নেই—যা'র প্রবৃত্তি মানুষের আদিম ও চিরন্তন প্রবৃত্তি—তাকে ভিত্তি ক'রে যে রচনা হয়, সংস্কৃত কবিরা তা'কে আদিরসের রচনা ব'লে গেছেন। জগতের আদিকবি বাল্মীকির প্রথম কবিতা এই যৌন মিলনকে স্পর্শ ক'রে যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রাচীন সব সাহিত্যেই এই আদিরস ওতঃপ্রোতঃ ভাবে আছে। জগতের কাব্যসাহিত্যে অমর কীর্ত্তি Shakespeare এর Antony ও Cleopetra, Romeo ও Juliet, ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা এই যৌন মিলনের গৌরবগীতি। ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভিত্তি করে Flambert তাঁর Madame Bovary ও Tolstoy তাঁর Anna Kareina রচনা করেছেন। এমন কি, অবাধ যৌন-মিলনের বিষময় ফল একটি কুৎসিত ব্যাধির উপর Brieux তাঁর Damaged

Goods নাটকের ভিত্তির স্থাপনা করেছেন। তা' ব'লে এসব বইকে অপাংক্তেয় ক'রে রাখতে পারে কোন সমালোচক? তা'র কারণ, কবি বা লেখক এখানে এমন একটা আবেদন নি'য়ে আমাদের হৃদয়ের দ্বারে এসেছেন যা' বাস্তবিকই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

আর্টের এই আবেদন সবচেয়ে বড়ো কথা। টেলিমেকাসকে দিয়ে আদি-কবি হোমার বলিয়েছেন যে—"যা' অভিনব তাই সবচেয়ে সুন্দর সঙ্গীত।" কবি বা সাহিত্যিক বর্তমান যুগকে ভালবেসে সেই যুগের স্বরূপ মূর্ত্তিটাকে প্রকাশ করবেন,—কিন্তু তাকে জঘন্য ঘৃণ্য ব'লে চিত্রিত করবার অভিপ্রায়ে নয়—তার বাইরের অবগুণ্ঠনটা খুলে' অন্তরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা তাঁর কাজ—যে সৌন্দর্য্য চিরন্তন চির-সত্য। প্লেটো বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে সঙ্গীত সুপ্ত আছে। সাহিত্যের আবেদন মানব-প্রাণের এই সুপ্ত সঙ্গীতের কাছে। এ আবেদন যে রস-রচনার ভিতর দিয়া আসে না,—সে রচনা সাহিত্যে অপাংক্তেয়। বিষয়টা আসল নয়; আসল হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত ভাব, আসল হচ্ছে বলবার ভঙ্গী, আসল হচ্ছে রূপ ও রস। স্থায়ী ভাবকে রস বলে। যে সাহিত্য এই 'স্থায়ী' ভাব' মনে এনে দিতে না পারে—তাকে রস-রচনা বলা যেতে পারে না। এই স্থায়ী ভাবের অপর নাম আনন্দ— আত্মার আনন্দ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অগ্নিতে আহুতি দেয় যে সাহিত্য তা' থেকে এ আনন্দ মেলে না। কারণ—লালসার পরই আসে অবসাদ। যে সাহিত্য মানুষের উচ্চতম প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে—প্রকৃত আনন্দ দিবার অধিকার তারই।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বিকার বা "বিশেষ মেজাজ" এখন এসেছে—রবীন্দ্রনাথের কথায় সেটা "অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্চ্ছা আক্ষেপ' তা ছাড়া আর কিছু নয়। কবি লিখেছেন,—"কোনো সাহিত্য একেবারেই স্তব্ধ নয়। তার চলতিধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা' নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই তা আবর্জ্জনা কুণ্ডে স্থান পায়।" এই যে অস্বাস্থ্যকর সাহিত্য Seneca যাকে বলেছেন 'Nihil sanantibus litteus—এটা বেশী দিন টিক্‌তে পারে না, কারণ, এ "কালচারের" লক্ষণ আদৌ নয়। আজ য়ুরোপ যে আদর্শ জগতের সামনে ধরছে সেটি সাহিত্যের চরম আদর্শ নয়—আর তার মাপ কাটিতে সাহিত্যের কোনো সমঝদার বিশ্বসাহিত্যে যা' Classic এর সম্মান পেয়েছে তার পরিমাণ করবেন না। এই বিকৃত সাহিত্য যদি অমর হোত তা'হলে আজ Shakespeare ছেড়ে Congrave এর নাটক পড়তাম,—Shelleyর কবিতাকে নর্দ্দামায় বিসর্জ্জন দিয়ে Don Juan কে আদর করতাম—Dante কে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করে' Boccaccio কে জীবনের সাথী করতাম—কালিদাসের কাব্যকে বিদায় দিয়ে 'অমরুশতক' নিয়ে মেতে থাকতাম।

বাংলা সাহিত্যের ছোট একটা গণ্ডীর মধ্যে পাশ্চাত্য Naturalism এর অধিকার দেখতে দেখতে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। এটা অবশ্যম্ভাবী হজম করবার ক্ষমতা যাদের নেই তা'রা যদি গো-গ্রাসে গেলে, তাহলে, বদহজম হ'বেই। তা' ছাড়া আমাদের দোষ হচ্ছে এই যে, পশ্চিমে বাতাসে যাই ভেসে আসে, তাই আমরা আগ্রহে গ্রহণ করতে চাই,—বুঝি না, সেটা ভালো কি মন্দ! যে সব তরুণ সাহিত্যিক বিদ্রোহের ধ্বজা ধরেছেন, যাঁরা ভূত মানেন না, ভগবান মানেন না, ভালোবাসা মানেন না,—যাঁরা মানেন শুধু কাম-প্রবৃত্তি,—তিলোত্তমা, আয়েষাকে ছেড়ে মেসের ঝির আকর্ষণই যাঁরা সার বুঝেছেন,—দেশে সমাজে যাঁরা ব্যাধিই দেখছেন, স্বাস্থ্যের কোনো লক্ষণই যাঁদের নজরে পড়ছে না, আজ নববর্ষের প্রথমদিনে তাঁদের সম্বন্ধে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না। তাঁরা যা' করছেন তার মধ্যে কোনো অসদুদ্দেশ্য আছে বলে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না; সস্তায় নাম কেনা আর অভিনবত্বের প্রলোভনই তাঁদের ভুল পথে টানছে। তাঁদের কাছে আমার একটা নিবেদন—তাঁরা এটা যেন ভুলে যাবেন না যে, ভবিষ্যতের বীজ তাঁদের ভেতর নিহিত আছে—ভুলবেন না পাশ্চাত্য সমাজ আর এদেশী সমাজ এক নয়—ভুলবেন না, ব্যাধি যদি থাকে তো তার প্রতিকারের ব্যবস্থাই হোল বড়ো কাজ—সংস্কার মানে

সাহিত্য ও আর্ট

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

ভাঙা নয়, গড়ে তোলা। সমাজের সর্ব্বাঙ্গের ঘা, এই যদি তাঁদের একমাত্র অভিজ্ঞতা, একমাত্র বক্তব্য হয়, তা' হলে বেচারী মিস্ মেয়ো কি দোষ কর্লে'ন? তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন,—তাতে চিরন্তনের ছাপ কই? প্রতিধ্বনি, বলে কই? কোমর বেঁধে তাঁরা লেগে গেছেন ভাঙার কাজে—কিন্তু গড়ার কাজে তো তাঁদের এতটুকু উৎসাহ দেখি না। Diana এর নগ্ন মুর্ত্তি দেখে Actaeon এর যে দশা হয়েছিল,—যদি তাঁরা দেশীয় সমাজের নগ্নতা দেখে থাকেন, তাঁদেরও যে সেই দশা হ'বে। তাঁদের প্রতিভা আছে; সেই প্রতিভা দিয়ে তাঁরা মানবের জীবন ধারা অমৃতময় করে তুলুন—তবে তো তাঁদের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা। বিষই কি একমাত্র সত্য—রোগই কি সমাজ দেহের সাধারণ অবস্থা? অমৃতের পুত্র আমরা—আমাদের জীবনে কি অমৃত নাই? মানসিক স্বাস্থ্য কি এখানে মরীচিকার মতো দুর্লভ? পাঁক গায়ে মাখা, সেই কি ভালো—চন্দনের চেয়ে স্নিগ্ধ? তরুণ সাহিত্যিকেরা আর যাই করুন, 'কুৎসিৎই' চরম সত্য এই মতবাদের ওপর নিজেদের সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করবেন না। ভিতে গলদ থাক্‌লে প্রকাণ্ড সৌধও ভূমিসাৎ হ'য়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য সাহিতিকের বিকৃতি দেখে বড়ো দুঃখে Mrs. Maynell বলেছেন—"এই যে দেখি, ক্লিওপেট্রা ছেড়ে চারমিয়ানের দিকে নজর, মেসের ঝির জয়গান, এতে কি আর্টের খুব বেশী গৌরব হচ্ছে? যা কলুষ, যা জঘন্য যা বিকৃত অসম্পূর্ণ,—এই যে সহরের আবহাওয়া একে আবেগভরে ভালোবাসা, এইখানেই আজকালকার সাহিত্যের চরম বিকার। কেউ কেউ বলবেন যে, অনাবৃত আলো আর্টের পক্ষে বড়ো বেশী তীব্র। তাহ'লে তো আর্টের দুরবস্থা বলতে হ'বে। আর তাও যদি মানি—তা হ'লেও প্রকৃতির দান যা আকাশের মেঘ, বর্ষার অন্ধকার, ঊষা ও গোধূলির ম্লানিমা, তাই দিয়ে—না, কুৎসিৎ অসুন্দর সহরের ধোঁয়া ও ধুলো দিয়ে সে আলোর তীব্রতা কমিয়ে তাকে শিল্পীর উপযোগী করে' তুলতে হবে? ধোঁয়ার রহস্যের স্তুতিগান করেন যাঁরা—আলোর গভীরতর রহস্যের সন্ধান কি তাঁরা আদৌ রাখবেন না?'

বাস্তব জগৎ সত্য। প্রকৃতি সত্য। আর্ট তার পরিপন্থী নয়। সে বরং বাস্তবকে আরো সুন্দর, আরো সম্পূর্ণতর ক'রে তোলে। Shakespare বলেছেন,—

"Nature is made better by no mean,
But nature makes that mean; so, over that art.
Which, you say, adds to nature, is an art,
That nature makes. You see, sweet maid, we marry
A gentler scion to the wildest stock;
And make conceive a bark of baser kind
By bud of nobler race. This is an art
Which does mend nature—change it rather; but
The art itself is nature"—(**Winter's Tale**)

আর্ট বাস্তবের যে রূপ সৃজন করে তা' দেশ কাল-পাত্রের সীমার বাইরে। যুগ যুগান্তর ধরে' সে রূপ মানবের প্রাণে আনন্দ দিতে থাকে। সাহিত্যিক যে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করেন—তা' বিশ্বমানবের হৃদয়ে অনুরূপ অনুভূতির উদ্বোধন করে। সাহিতিকের সার্থকতা সম্বন্ধে, রবীন্দ্রনাথ বড়ো সুন্দর কথা বলেছেন,—"পূর্ব্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, "হে গুণি, কোন অপূর্ব্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি কর্‌লে?"

জানি আমার এ দীর্ঘ প্রবন্ধ অরণ্যে রোদন মাত্র। তবুও শ্রোতৃমণ্ডলির মধ্যে অন্ততঃ দু'একজন নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা আমার কথায় সায় দিবেন। তাঁদের উদ্দেশে আমি বলি,—শতপথ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক ঋষি অর্থভাগকে যেমন বলেছিলেন,—"হাতে হাত দাও, বন্ধু, এ জ্ঞান শুধু তোমার ও আমার জন্যেই হয়েছে।"

---

* ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন ও নববার্ষোৎসবে পঠিত। সভাপতি—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বার এট ল।

ভূপাল

মধ্যভারতের পর্ব্বতভূমি কোন্ কুহকে ভুলাইয়া দুর্দ্দান্ত আফগান দস্যু দোস্ত মহম্মদকে সুলেমানি পর্ব্বতশ্রেণীর অপর পার হইতে রাজ্যস্থাপনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; কিন্তু ইতিহাসে আছে যে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিনিই এইখানে ভূপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ পিণ্ডারী দস্যুর অত্যাচার বিশৃঙ্খলা ও উৎপীড়নের রঙ্গভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন ভূপালের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে একটি নিয়মিত কর দিতে প্রতিশ্রুত হ'ন। বিনিময়ে ইংরাজেরা একদল সৈন্য ভূপালের প্রয়োজনার্থে সেই রাজ্যেই রাখিয়া দিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত ভূপাল ইংরাজ-রাজের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য ও রাজভক্তি দেখাইয়া আসিতেছে! সিপাহী বিদ্রোহের সময় বহু বিপন্ন, নিরাশ্রয় ইংরাজ নরনারী ও শিশু এখানে আশ্রয়লাভ করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

প্রায় সপ্তসহস্র বর্গ মাইল বিস্তৃত ও কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ-ষষ্ঠলক্ষ অধিবাসী সমন্বিত এই রাজ্যটি ভারত-বর্ষের মুসলমানাধিকৃত দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে হায়দ্রাবাদের পরই স্থান পাইতে পারে। ভূপালের একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে। চারিপুরুষ ধরিয়া ইহার সিংহাসনে মুসলমান স্ত্রীলোকেরা আসন পাইয়া আসিতেছেন। প্রথম রাজ্ঞী, নবাব খোদশিয়া বেগম, জ্ঞানে বুদ্ধিতে ও চরিত্রবলে আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহার কন্যা ও পরবর্ত্তী রাজ্ঞী নবাব সেকন্দর বেগম, সিপাহী বিদ্রোহের মত ভারতব্যাপী চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলতার দিনে সাতিশয় দক্ষতার সহিত তাঁহার রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। অসীম নৈপুণ্য, নারীদুর্ল্লভ সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে তিনি স্বীয় বিদ্রোহোন্মুখ সৈন্যদিগকে দমনে রাখিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহে যোগদান করিতে দেন নাই। ইঁহার শাসনকালেই বহু ইংরাজ নরনারী উন্মত্ত বিদ্রোহীদের করাল হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। নবাব সেকন্দর বেগমের কন্যা ও উত্তরাধিকারী, নবাব সাহজাহান বেগম, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ত্তমান রাজ্ঞী, নবাব সুলতান জেহান বেগম সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান জেহান বেগমের বয়স এখন প্রায় সত্তর বৎসর কিন্তু ইনিও এই পর্দ্দানসীন মহিলা-শাসিকাদের অন্য সকলের মতই এ যাবৎ এরূপ কঠোর ভাবে পর্দ্দা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন যে নিতান্ত নিকট-আত্মীয় ব্যতীত অপর কোন পুরুষই ইঁহার মুখ দেখেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ইনি নিজের রাজ্যের ও প্রজাবর্গের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি বিষয়ের সহিত বিশেষ পরিচিত। ইনি ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহু সহস্র মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। বেগম সাহেবা যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন রাজকোষ অর্থশূন্য ছিল। তিনি অবিলম্বে রাজপরিবারে ও রাজ্যের সমস্ত অর্থসম্বন্ধীয় ব্যাপারে এরূপ মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করিয়া আনিতে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সমর্থ হইলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্বরূপ রাজকোষ হইতে প্রায় আট লক্ষ প্রজা নানা উপায়ে সাহায্য লাভ করিতেছে। ইনিই বর্ত্তমান ভারতে একমাত্র নারী শাসন-কর্ত্তা।

ভূপালে এখনো মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ব্যবস্থার সহিত আধুনিক সভ্যতার লড়াই চলিয়াছে; ধীরে ধীরে বিংশ শতাব্দী তথায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া জয়লাভ করিতেছে! ভূপালের প্রাচীন বিপণিসমূহে বর্ত্তমান যুগের স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই পরিবর্ত্তনে তাহাদের কোনই সহানুভূতি নাই বরং সম্ভব হইলে তাহারা একটা সভা ডাকিয়া এই যন্ত্রচালিত সমব্যবসায়ীদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে প্রস্তুত! এইরূপে নূতন ও পুরাতনের অসম্পূর্ণ সংমিশ্রণে ভূপাল এখনও ভারতের অন্যান্য আধুনিক মহানগরী হইতে বেশ একটু পৃথক্।

যে প্রাচীন নগর-প্রাচীর এক সময়ে ভূপাল সহরটিকে আততায়ীদের হস্ত হইতে বাঁচাইয়াছিল আজ তাহা
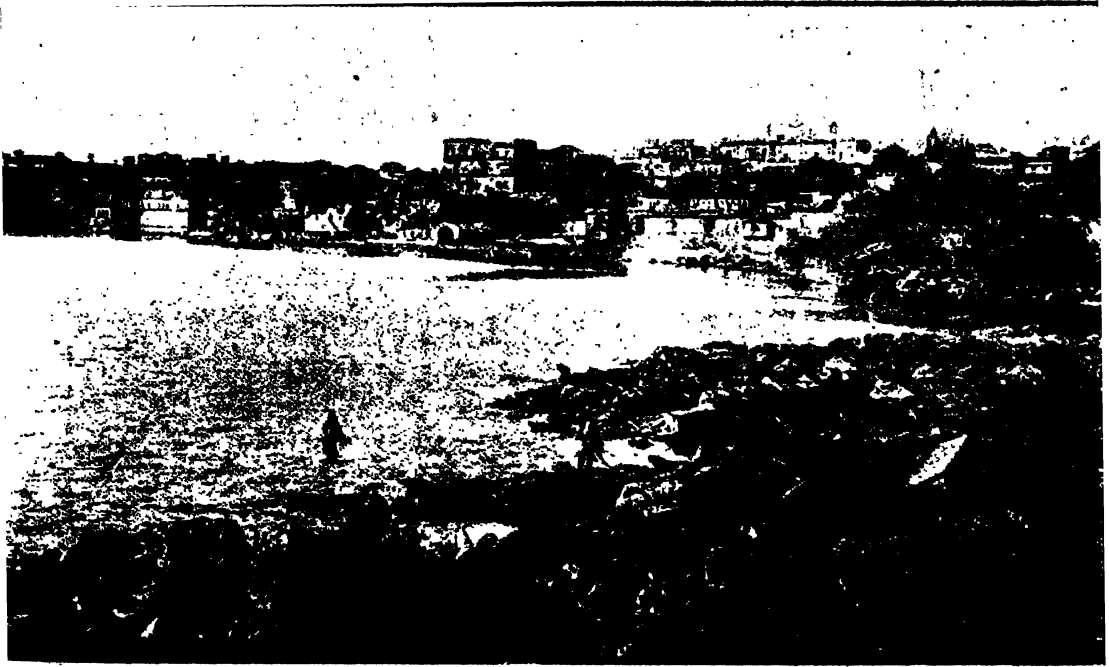
ভূপালের সাধারণ দৃশ্য

কাচ, চিনামাটি ও এ্যালুমিনিয়মের বাসনের সহিত পুরাতন ধরণের তামা পিতল ও অন্যান্য ধাতুর তৈজসপত্র বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বল রাজপথসমূহে সনাতন গো-যানের পাশাপাশি দ্রুতগতি মোটর-কার ছুটিয়া চলিয়াছে এ দৃশ্য এখন সাধারণ। সেই বিজ্ঞান-সম্মত শব্দশীল শকটের গর্জ্জনে অনভ্যস্ত ভীত-সন্ত্রস্ত পশুগুলি পথের একপাশে উৎক্ষিপ্ত-লাঙ্গুল হইয়া যখন সরিয়া দাঁড়ায় তখন স্থানে স্থানে জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সেই পূর্ব্বের "জোর যা'র মুল্লুক তা'র" দিনগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্ত্তমানের শান্তিময় দিন-কাল তাহার সংস্কারের অন্তরায় হইয়াছে। সেই নগর-দেউলের সিংহদ্বার এখন নিত্য উন্মুক্ত; আজ সেখানে পূর্ব্বকালের প্রাচীন প্রথায় সজ্জিত প্রহরী ক্রীড়নকের মত বংশীধ্বনি দ্বারা পথচারীদের ও দ্রুতগামী যান-বাহনাদির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সুপ্তমনা সভ্যতাপিপাসী পাশ্চাত্যানুকারী প্রজাবর্গ আজ

শান্তিসুখে তন্দ্রাহত; পিণ্ডারী-দস্যু, মাহরাট্টা আক্রমণকারী দুয়ারে হানা দিয়া আর এখন তাহাদের সে সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় না !

বেগম-সাহেবা তাঁহার নারী-প্রজাদের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে সবিশেষ যত্নপর। তিনি প্রজাদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ; বালিকাদের জন্য তিনি কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দিয়াছেন। রাজবাড়ী হইতে পর্দ্দাঢাকা গাড়ী যাইয়া ছাত্রীদিগকে বাড়ী হইতে স্কুলে লইয়া আসে ও বিদ্যালয়ের ছুটির পর পুনরায় গৃহে রাখিয়া যায়।

বেগম সাহেবা মার্কিণ আদর্শে পরিচালিত একটি নারী-সমিতি স্থাপিত করিয়াছেন। সেখানে স্ত্রীলোক-দিগকে কি করিয়া উপযুক্ত জননী ও গৃহিণী হইতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। নিছক আমোদ-প্রমোদের জন্য উক্ত সমিতি বা 'ক্লাব্' স্থাপিত হয় নাই।

স্ত্রীলোকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র হাসপাতাল আছে, সেখানে সুশিক্ষিতা মহিলা চিকিৎসক ও ধাত্রী রাজ্যস্থ স্ত্রীলোক-রোগীদের আরোগ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

বালকদিগের জন্যও বিদ্যালয়, যাদুঘর এবং বহুমূল্য প্রাচীন তথ্যপূর্ণ পুঁথি ও গ্রন্থে সমৃদ্ধ পুস্তকাগার আছে ;

ভূপালের বাজার

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সে গুলির সব কয়টিই সুবৃহৎ অট্টালিকায় স্থাপিত। মুসলমান রাণীর রাজত্ব, সুতরাং কতকগুলি নূতন ও পুরাতন মসজিদও আছে। এই মসজিদের একটিকে অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া নবাব শাহজাহান বেগম মারা যান; ইহা আয়তনে সুবৃহৎ ও পরিকল্পনায় সুন্দর। শিলাময় দুর্গসমেত পুরাতন রাজপ্রাসাদটির নাম ফতেগড়। উহার মধ্যে একটি বৃহদাকার কোরাণ শরীফ্ আছে, ও উহা ভুপালের দর্শনীয় বস্তুসমূহের অন্যতম।

প্রত্যূষে ও কখনো কখনো পুনরায় সন্ধ্যাকালে তিনি বায়ু সেবনার্থ বাহিরে গমন করেন। বেগম সাহেবা উদ্ভিদ্ পরিচর্য্যায় সুদক্ষ। সেইজন্য তিনি ভ্রমণকালে মালীদের কাজকর্ম্ম যথারীতি পরিদর্শন করিয়া থাকেন ও প্রয়োজন হইলে উপদেশাদিও দেন।

বেগম নিজে একজন সুশিক্ষিতা মহিলা ও আচারনিষ্ঠা মুসলমান। কোন উপবাস বা
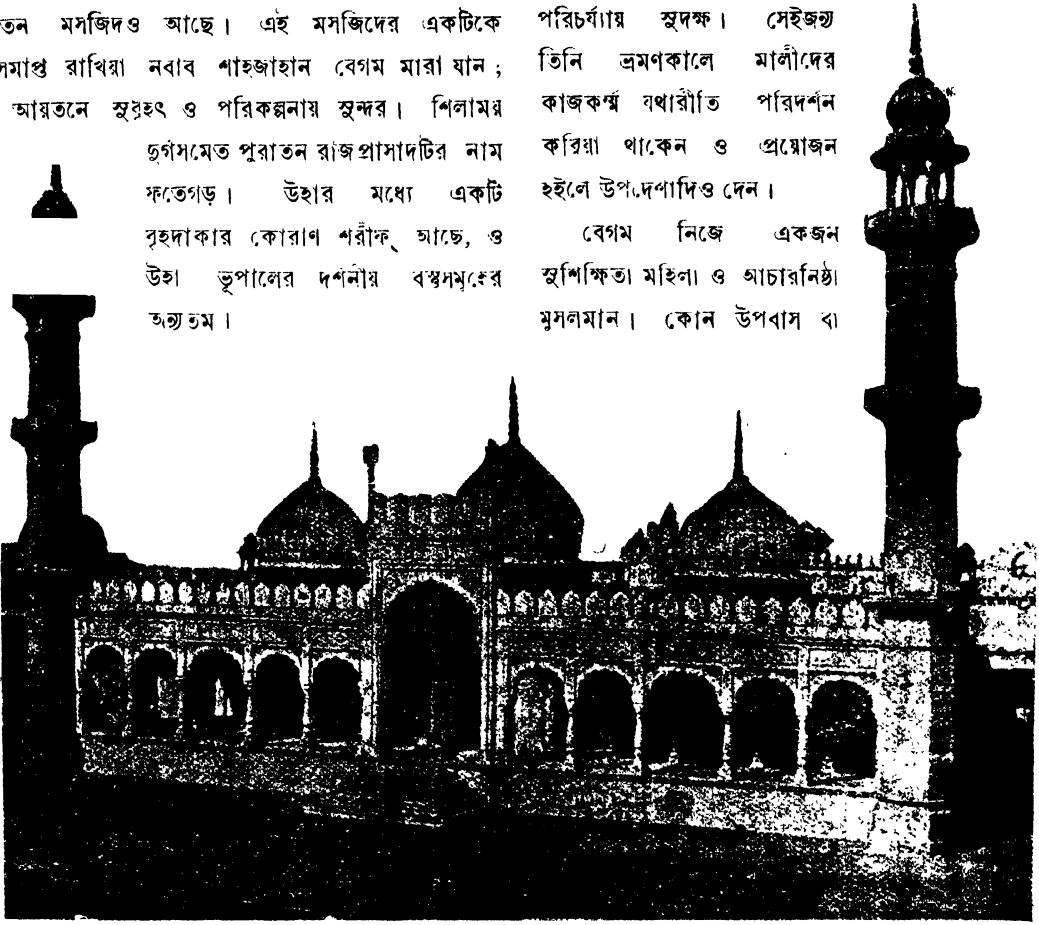
ভুপালের একটি মসজিদ

একটি পর্ব্বতিকার শীর্ষদেশে এক সুরম্য উদ্যান-বাটিকার মধ্যে একটি সুবিশাল মনোরম সৌধে বেগম-সাহেবা বাস করেন। এখান হইতে চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক শোভা পরিদৃশ্যমান ও এই অট্টালিকার নাম 'আহামেদাবাদ প্যালেস্'। প্রাসাদ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সুবিস্তীর্ণ উদ্যান একটি সু-উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সখী-সহচরী-পরিবৃতা বেগম সাহেবা এই উদ্যান মধ্যে অসঙ্কোচে পদ-চারণা করিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে মুক্ত বাতাস ও মুক্ত আলোক উপভোগ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ অতি

পারণ বাদ যায় না। ইস্‌লাম সাহিত্য তিনি ভালরূপে পড়িয়াছেন ও ভারতীয় মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থদান করেন এবং সম্প্রতি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার পদে বৃতা হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাবর্গের প্রতিও সমধিক লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। তাহারা সংখ্যায় তাঁহার মুসলমান প্রজা অপেক্ষা অধিক। উভয় সম্প্রদায় তাঁহার নিকট তুল্য ব্যবহার পাইয়া থাকে।
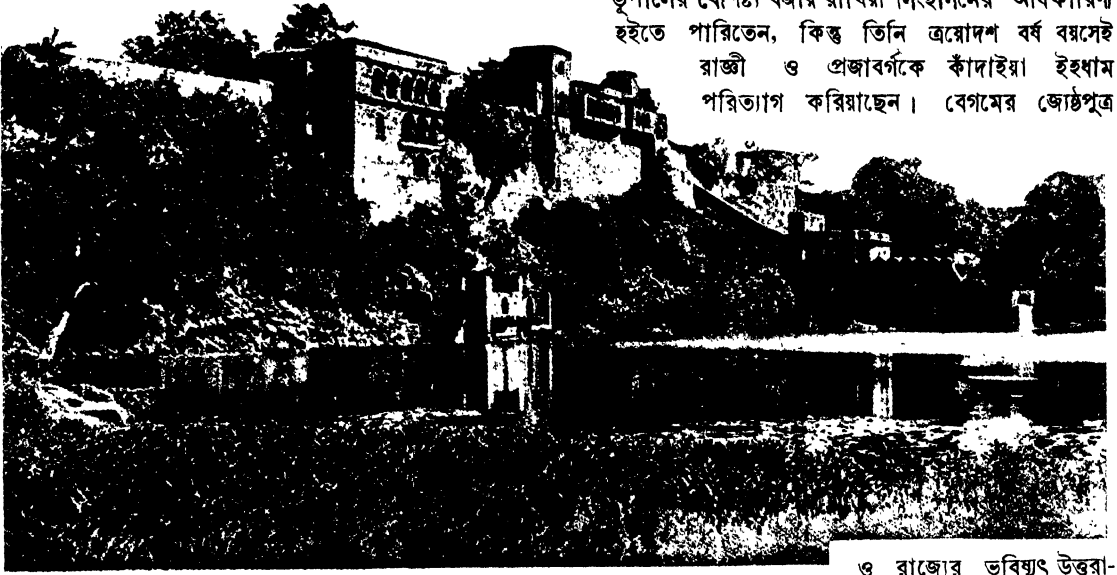
ভূপালের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া সিংহাসনের অধিকারিণী হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই রাজ্ঞী ও প্রজাবর্গকে কাঁদাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেগমের জ্যেষ্ঠপুত্র ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী শান্ত প্রকৃতির যুবক। স্বদেশে থাকিয়া তিনি গৃহ-শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও স্বীয় রাজকীয় কর্ত্তব্যগুলি যথারীতি

প্রাচীন দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ, 'ফতেগড়'

তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা বিলখিল্ জেহান বেগম আজ বাঁচিয়া থাকিলে প্রায় পঞ্চশৎ-বর্ষ-বয়স্কা হইতেন এবং যথাকালে

'আহমেদাবাদ প্যালেস্'

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রাজসৈন্যের প্রধান অধিনায়ক, ও কনিষ্ঠ শিক্ষাবিষয়ক কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন; এই তিনজনই রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকেন। বেগম স্বয়ং নিয়ম-বাঁধা কার্য্য-তালিকা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার সময় ও সামর্থ্য প্রজাবর্গের কল্যাণ ও উন্নতি-চিন্তায় ব্যয়িত করিতেছেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে মাতৃ-তুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকে।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

পা ওয়া

ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া "পা ওয়া" এখন কলিকাতার আলিপুর পশুশালায় অবস্থিতি করিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে নাকি মাত্র এই একটি শ্বেত হস্তী আছে। এই জাতীয় হস্তীকে শ্বেত হস্তী বলা হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিকই ইহাদের বর্ণ শ্বেত নহে। বর্ম্মা, কম্বোডিয়া, সিংহল ইত্যাদি বৌদ্ধপ্রধান দেশের অধিবাসীগণ ইহাদিগকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। তাহারা কিন্তু ইহাকে শ্বেত-হস্তী বলে না। এই প্রকার হস্তীকে তাহারা "চ্যাংপুয়েক" নামে অভিহিত করে। চ্যাংপুয়েকের প্রকৃত অনুবাদ বিচিত্র হস্তী।

চ্যাংপুয়েক বিভিন্ন প্রকারের হয়। কাহারও শরীরের কোনও কোনও অংশ শাদা হয়, কাহারো মাথার স্থানে স্থানে নানা প্রকারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও বা লাল রংএর চুল থাকে, কাহারও সম্মুখের পায়ে আটটি আঙ্গুলের পরিবর্ত্তে দশটি আঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-প্রধান দেশে যখনই কোনও চ্যাংপুয়েকের সন্ধান পাওয়া যায় তখন আর তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। সম্রাট পর্য্যন্ত তাহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তাহাদের বিশ্বাস চ্যাংপুয়েক ভগবান বুদ্ধের অবতার। কেহ কেহ বা বলেন স্বর্গগত মহাত্মাগণের আত্মা ইহাদের মধ্যে রক্ষিত থাকে।

শ্যামের বর্ত্তমান সম্রাটের রাজত্বের প্রারম্ভে বোর্ণিও কোম্পানি নামক এক ইংরাজ বণিকের অধিকৃত এক জঙ্গলে পা ওয়াকে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সে নিতান্তই শিশু, বয়স মাত্র দুই মাস। ইহা প্রকৃত চ্যাংপুয়েক কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দুইজন পশুবিদ্‌কে জঙ্গলে পাঠান হয়। তাহারা আসিয়া সংবাদ দেয় যে পা ওয়াতে চ্যাংপুয়েকের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান আছে। পা ওয়াকে তখন শ্যামরাজ্যের উত্তরাঞ্চলে চেংমাই সহরে আনিবার ব্যবস্থা করা হয়—সেখানে আবার পশুবিদ্‌ দ্বারা পা ওয়াকে পরীক্ষা করান হইল, তাহারাও যখন ইহাকে চ্যাংপুয়েক বলিয়া স্বীকার করিল, তখন রাজা ও রাণী পা ওয়াকে দেখিতে আসিলেন, এবং সেই অবধি ইহাকে রাজকীয় সম্মানে রাখা হইয়াছে।

কিছুদিন পরে পা ওয়াকে মহাসমারোহে শ্যামের রাজধানী ব্যাংককে আনা হয়। ইহার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই যাত্রায় নাকি দুই লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল। ষ্টেশনে ষ্টেশনে পীত বসন পরিহিত বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণ, শুদ্ধিজল প্রদান ইত্যাদি নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তাহাকে অভিনন্দন করেন। রাজ্যের অমাত্যবৃন্দ পথে নানাস্থানে উপস্থিত থাকিয়া পা-ওয়াকে অভিবাদন করেন। ব্যাংকক ষ্টেশনের অভ্যর্থনাটি ভারি ভাবোদ্দীপক—অমাত্যগণ পা ওয়া ও তার মাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। একটি প্রজ্বলিত মশাল বাদ্যের তালে তালে এক-জনের হাত হইতে আর একজনের হাতে ফিরিতে লাগিল, তিন-বার এই ভাবে বরণ করিবার পর মশালটি নির্ব্বাপিত করা হয়। তারপর কতকগুলি ছোট মেয়ে মিলিয়া পা ওয়া ও তার মাকে ঘেরিয়া ললিত ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া তাহাদের অভিবাদন করে। বৌদ্ধগণ নানা-ফল, ফুল, ইক্ষু সুগন্ধিধূপ ইত্যাদি অর্ঘ্য দ্বারা পা ওয়াকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে।

"পা ওয়া"
আলিপুর পশুশালায় গৃহীত
ফটো হইতে

স্পেশ্যাল ট্রেনখানির ভিতরে পা ওয়ার আরামের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুসজ্জিত প্রশস্ত তাহার মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা। একটি টেলিফোনও রাখা হইয়াছিল, পা ওয়ার অনুচরগণের সহিত ট্রেণের চালক ও ট্রেনের সহিত যে রাজকুমার ছিলেন তাঁহার সহিত পা ওয়ার সম্বন্ধে সংবাদাদির আদানপ্রদানের জন্য। ট্রেনের মধ্যে পা ওয়ার স্নানের জন্য একটি জলাধারেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।-প্রায় পাঁচশত মন জলপূর্ণ একটি জলাধার হইতে জল সরবরাহ করা হইত। পাছে ট্রেনে উঠিবার সময়ে পা ওয়া কোনও গোলযোগ করে সেই জন্য ট্রেনের প্রবেশ পথটি নানাপ্রকার বৃক্ষ

পা ওয়াকে শুদ্ধিজল দেওয়া হইতেছে

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

পত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

রাজধানীতে অভ্যর্থনার পর ব্যাংককের রাজপথে দেড় মাইল ব্যাপী এক মিছিল করিয়া পা ওয়াকে লইয়া এক শোভাযাত্রা করা হয়। অগ্রে ও পশ্চাতে বয়স্কাউটের দল, অনেকগুলি সুসজ্জিত হস্তী ও পদাতিক সৈন্য ইত্যাদি লইয়া মিছিলটি গঠিত হয়।

শ্যামের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পা ওয়া সন্দর্শনে সারিবদ্ধ হইয়া যাইতেছেন

ব্যাংককে যাত্রাকালে ট্রেনের মধ্যে একটি পীতলের বৃহদাকার বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি শ্বেত বানর ছিল। শ্যামবাসীগণ শ্বেত বানরকেও সৌভাগ্যের নিদর্শন-স্বরূপ জ্ঞান করে। পা ওয়া ব্যাংককে আসিয়া পঁহুছিলে স্বয়ং সম্রাট আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করেন এবং তার সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে দুইদিন ব্যাপী নানা-প্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করেন।

শ্যামের সম্রাট এবং অমাত্যবর্গ পা ওয়াকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যাইতেছেন

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে শ্বেত হস্তী আর দেখা যায় নাই। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পা ওয়াই এখন একমাত্র শ্বেতহস্তী। আমরা পা ওয়ার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

চীনে হিন্দু সাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

৬

নরেন্দ্রযশ ও জিন গুপ্ত

৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চীনে 'বাই' রাজত্বের অবসানে উত্তরৎসী (North Tsi) রাজত্বের আবির্ভাব হয়। এই বংশের রাজগণ ২৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। কিন্তু বংশের প্রথম সম্রাট বেন্-সুয়ান্-তি'র (Wen Hsuan Ti) নাম নানা কারণে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগকে মধ্যে মধ্যে যে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও চীনা পণ্ডিতদিগের মধ্যে ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল। চীনা পণ্ডিতদিগের মধ্যে তাও মতাবলম্বীরাই ছিলেন তখন প্রবল। সম্রাট বেন্ সুয়ানতি মনস্থ করিলেন যে, এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা তিনি করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন যে দুইটী মতই কখনও সত্য হইতে পারে না, সুতরাং একটির বিনাশ প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক কলহে চিরকাল রাজার মতই শেষ পর্য্যন্ত সকল মতামতের নিয়ন্তা হইত, ইহা আমরা য়ুরোপে দেখিয়াছি, ভারতে দেখিয়াছি, আবার চীনেও তাহাই দেখিয়াছি। এক বিরাট সভা করিয়া সম্রাট বেন্-সুয়ান্-তাও ও বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগকে আহ্বান করিলেন। উভয় মতের যুক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা বৌদ্ধ মতেরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলেন। বৌদ্ধদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। এদিকে তাও-ধর্ম্মীগণ ম্লান হইয়া গেলেন। রাজার আদেশ হইল হয় তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় প্রাণ দিতে হইবে। চারিজন তাও-ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা প্রাণ দিলেন।

সম্রাট বেন্ সুয়ানের সময় ভারত হইতে নরেন্দ্রযশ নামক একজন মহাপণ্ডিত চীনে আসেন। নরেন্দ্রযশ ছিলেন উত্থানের অধিবাসী। উত্থান হইল বর্ত্তমান আফ-গানিস্থান। এক চীনা গ্রন্থ হইতে নরেন্দ্রযশের জীবনী আমরা জানিতে পারি। গ্রন্থখানির যে অংশে নরেন্দ্রযশের জীবনী রহিয়াছে, সেই অংশটুকু ফরাসী পণ্ডিত শাভান্ (Chavannes) অনুবাদ করিয়াছেন। নরেন্দ্রযশ সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া তৎকালীন প্রথানুসারে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিংহল পরিভ্রমণ করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন। কিন্তু দেশ ভ্রমণের নেশা তখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ভিক্ষুর মন নব নব আলোক পাইবার জন্য ব্যগ্র, উপরন্তু বিদেশে বৌদ্ধদিগের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিবার জন্য তাঁহার মন উদ্‌গ্রীব হইল। অবশেষে পাঁচজন সঙ্গীর সহিত মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তিনি চীন অভিমুখে চলিলেন। চীনে যাইতে হইলে বহু পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করিতে হয়। কথিত আছে যে তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ চলিতে চলিতে এক স্থান আসিলেন, সেখানে সম্মুখে যাইবার দুইটী পথ। একটী পথ মানবের, একটী পথ দানবের। সরল পথিক দানবের পথে গিয়া প্রাণ দিত। কোন এক শুভানুধ্যায়ী রাজা এই দুই পথের মোহনায় বৈশ্রমণের এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—অঙ্গুলি দ্বারা প্রস্তর মূর্ত্তি সত্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত। পাহাড়ের পথে পথিকের সহজেই দিক্‌ভ্রম হয়। নরেন্দ্রযশের এক সঙ্গী বিপথে গিয়া প্রাণ নষ্ট করিতে বসেন। বহু কষ্টে নরেন্দ্রযশ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে তাঁহারা 'জুই জুই' (Juei Juei) নামক এক জাতির দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তুর্কীরা জুইজুইদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। এই নিমিত্ত নরেন্দ্রযশ পূর্ব্বদিকে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; জুইজুইদের দেশে কিছুকাল তাঁহাকে থাকিতে হইল। কিন্তু ভ্রমণস্পৃহা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। পূর্ব্বের পথ রুদ্ধ দেখিয়া তিনি উত্তরাভিমুখে চলিলেন। তুর্কীদের রাজ্যের উত্তর সীমানায় 'নি' নামক হ্রদ পর্য্যন্ত তিনি যান। সম্ভবতঃ বৈকাল হ্রদের

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

তীরস্থ তুর্কীদেশ পর্য্যন্ত তিনি গিয়াছিলেন। ৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনে আসিয়া ৎসী (Tsi) রাজ্যের রাজধানী Yeh নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর মাত্র।

তিয়েন পিং (Tien Ping) মঠে তিনি অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সহায়তায় বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মঠের একটী ঘরে বহু সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রযশ সেগুলির মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাতখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিলেন। নরেন্দ্রযশের ঋষিতুল্য চরিত্র, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করে। অনুবাদ কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন একজন হিন্দু ভিক্ষু, তাঁহার নাম গৌতম ধর্ম্মজ্ঞান। নরেন্দ্রযশ কিন্তু শান্তিতে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে পারিলেন না। রাজনৈতিক বিপ্লবের প্লাবনে ৎসী রাজ্য লুপ্ত হইয়া গেল। চাঙ-আনের রাজবংশ চিউ (Cheu) তখন উত্তর চীনে তাহার প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিল, তাহার নিকট ৎসী-রাজ্য পরাজয় স্বীকার করিল। এই নূতন রাজবংশের দ্বিতীয় সম্রাটের সময় Yeh নগরীর নরেন্দ্রযশ প্রমুখ হিন্দু-গণ ও চাঙআনের হিন্দুভিক্ষুগণ চীন হইতে বিতাড়িত হইলেন।

চিউ রাজবংশ চাঙ্-আনে রাজ্যস্থাপন করেন ৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে চিউ সম্রাট বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার রাজত্বের সময় কয়েকজন হিন্দু ভিক্ষু চাঙ-আনে আসিয়া কার্য্য করিবার সুযোগ পান। ৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চারিজন হিন্দুশ্রমণ একত্রে চাঙ্-আনে আসেন—জ্ঞানভদ্র, জিনযশ, যশোগুপ্ত ও জিনগুপ্ত। জ্ঞানভদ্র ছিলেন ইঁহাদের গুরু। সমগ্র ত্রিপিটক তাঁহার পড়া ছিল তবে বিশেষভাবে তিনি বিনয়ের আলোচনা করেন। তাঁহার নিজের কোনও অনুবাদ এখন পাওয়া যায় না। পঞ্চবিদ্যাশাস্ত্র নামক একটী গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। জিনযশ ছিলেন মগধ-বাসী; ছয়খানি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। তাহার মধ্যে দুইখানি রহিয়াছে, অপরগুলি লুপ্ত। গ্রন্থ দুইখানির নাম মহামেঘসূত্র ও অভিসময়সূত্র। ঐ দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে একখানিতে জিনযশ বলিয়াছেন যে তাঁহার অনুবাদ কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন যশোগুপ্ত ও জিনগুপ্ত। যশোগুপ্ত সম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। তাঁহার অনুদিত একখানি গ্রন্থ রহিয়াছে। উল্লিখিত চারি-জন শ্রমণের মধ্যে চীনসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন জিনগুপ্ত। এক চীনা ইতিহাস হইতে এই হিন্দু ভিক্ষুর জীবনী জানিতে পারা যায়। পণ্ডিতবর শাভ্যান জিন-গুপ্তের জীবনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাও-সুয়ান্ (Tao Suion) নামক জনৈক চীনা ভিক্ষু জিন-গুপ্তের এক শতাব্দী পরে তাঁহার জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়া উক্ত ইতিহাস সঙ্কলন করেন।

জিনগুপ্ত ছিলেন গান্ধার দেশবাসী। পুরুষপুর বা বর্ত্তমান পেশোয়ার তাঁহার জন্মভূমি। ক্ষত্রিয়বংশে তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহাদের পারিবারিক উপাধি ছিল কম্বু। তাঁহার পিতার নাম বজ্রসার। বাল্যকাল হইতেই জিনগুপ্তের মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। সাত বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পিতা মাতা তাঁহাকে বাধা দেন নাই। সেই অল্প বয়সেই তিনি শ্রমণের ব্রত লইয়া মহাবান বিহারে প্রবেশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার গুরু জুটিয়াছিল ভাল। জিনযশ ছিলেন তাঁহার উপাধ্যায় ও জ্ঞানভদ্র ছিলেন তাঁহার আচার্য্যগুরু।

জিনগুপ্তের বয়স যখন ২৭, তখন তিনি বিদেশে গিয়া হিন্দুশাস্ত্র প্রচার করিবেন স্থির করেন। এই সময় তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন তাঁহার গুরুদ্বয়—জ্ঞানভদ্র ও জিনযশ। সে যুগে মধ্যএশিয়ার দুর্গম পথ দিয়া একা যাওয়া খুবই কঠিন ছিল। জিনগুপ্ত দশজন পরিব্রাজকের সহিত চলিলেন। পথের কষ্টে ছয়জন প্রাণত্যাগ করেন। অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া ৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা চার জন চীনে আসিয়া পৌছান।

৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জিনগুপ্ত চীনের রাজধানী চাঙ্ আনে প্রবেশ করেন। তখন প্রথম চিউ সম্রাট্ মিং উত্তর চীনের অধীশ্বর। সম্রাট্ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। সম্রাটের আদেশে হিন্দু ভিক্ষুগণের জন্য এক বিরাট

মন্দির নির্ম্মিত হইল। সেই মন্দিরে বাস করিয়া তাঁহারা গ্রন্থ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট্ জিনগুপ্তের উপর এতই প্রীত ছিলেন যে তিনি তাঁহাকে Yi জিলার চীনা ভিক্ষুদিগের প্রধানাচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এই সম্রাটের তাঁহার প্রতি এত সম্মান ও সমাদর, এ যেন দীপ নিভিবার পূর্ব্বের শেষ শিখা। চিউ বংশের দ্বিতীয় সম্রাটের মন সহসা বৌদ্ধদিগের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজা ৎসী রাজবংশকে পরাভূত করিলেন;—তথাকার হিন্দুভিক্ষু নরেন্দ্রযশকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন, ও নিজের রাজধানী চাঙ্-আনের বৌদ্ধগণকেও বিদূরিত করিলেন। জিনগুপ্ত প্রমুখ ভিক্ষুগণ চীনের পশ্চিমে তুর্কীদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

তুর্কীদের দেশে গিয়া তথাকার Kagan বা Khan খাঁ বা, রাজার আশ্রয় তাঁহারা ভিক্ষা করিলেন। যে রাজার নিকট তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহার নাম তো-পো-কাগান (To-Po-Kagan); ৫৭৫খ্রীঃ হইতে ৫৮১খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার খ্যাতি রহিয়াছে! কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। চীনা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে তো-পা-কাগান (To-Po-Kagan) ৎসী-রাজাদিগের রাজধানী Yeh হইতে Huei-lin নামক এক শ্রমণকে বন্দী করিয়া আনেন। হুই-লিন, খাঁকে বলেন যে ৎসী রাজা যে ক্ষমতাশালী তাহার কারণ সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। হুইলিন্ খাঁর নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করেন ও তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। খাঁ একটী বিহার স্থাপন করিলেন ও বৌদ্ধগ্রন্থ চাহিয়া ৎসী সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ তথা হইতে বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ, মহাপরিনির্বাণসূত্র ও অবতংসক, সর্বাস্তিবাদ বিনয় প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়া আসেন। তো-পো-কাগান সদ্ধর্ম্মের উপদেশ যথাসাধ্য পালন করিতেন। তিনি খেদ করিতেন কেন তিনি মধ্যদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ রাজার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জিনগুপ্তের বিশেষ কষ্ট হইল না। জ্ঞানভদ্র, জিনযশ ও যশোগুপ্তের এই দেশেই মৃত্যু ঘটিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জাগিবার পূর্ব্বে, ৎসী রাজত্বকালে ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দশজন চীনা বৌদ্ধকে ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। ৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা যখন ফিরেন, তখন তাঁহারা শুনিলেন যে ইতিমধ্যে ৎসীরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, চিউরাজগণ স্বধর্ম্মের ভীষণ বিরোধী। এই অবস্থায় তাঁহারা দেশে প্রবেশ করা নিরাপদ মনে করিলেন না; তুর্কীদের দেশেই রহিয়া গেলেন। জিনগুপ্তের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। জিনগুপ্তের সাহায্যে তাঁহারা যে ২৬০ টী পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন সেগুলির নামের তর্জ্জমা করিয়া লইলেন। চীনা বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ এই মহাপণ্ডিতের পরিচয় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে তুর্কীদেশে সংবাদ আসিল চীনে পুনরায় নূতন রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছে। ৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে চিউ রাজত্ব লোপ পাইয়া তাহার স্থানে 'সুই' (Sui) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াং চিয়েন (Yang Chien) চিউ রাজাদিগের এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে তিনি রাজা হন। ৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়া প্রথমেই তিনি বিতাড়িত বৌদ্ধদিগকে পুনরায় রাজধানীতে ফিরাইয়া আনেন। পূর্ব্বোল্লিখিত চীনা বৌদ্ধগণও পুঁথি লইয়া দেশে আসেন। সুই সম্রাট এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইবার জন্য এক অনুবাদ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যক্তি বিশেষের অনুবাদে ভ্রম থাকার সম্ভাবনা থাকে। হিন্দু ভিক্ষুগণ গ্রন্থের বিষয়ের সহিত সুপরিচিত হইলেও অনেক সময় চীনভাষা তাঁহাদের তেমন জানা থাকিত না। আবার চীনা ভিক্ষুদিগের সংস্কৃত জ্ঞান এমন থাকিত না যে সংস্কৃত বাক্য ও ভাব তাঁহারা নির্ভুলে চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। উপরন্তু নির্ভুল অনুবাদই যথেষ্ট নয়, চীনাদিগের নিকট সাহিত্যের সৌন্দর্য্য একটী বড় জিনিস। এই সকল কারণে, অনুবাদ মূলানুযায়ী হইতেছে কিনা, চীনাভাষা সুপাঠ্য হইতেছে কিনা, উক্ত সমিতি তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিতেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

নরেন্দ্র যশকে নির্ব্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সুই সম্রাট তাঁহাকে এই সমিতির প্রথম সভাপতি করিলেন। নরেন্দ্রযশের তত্ত্বাবধানে অনুবাদ কার্য্য চলিতে লাগিল। আটখানি গ্রন্থ অনুবাদের পর তা-হিং-চান মন্দিরের পণ্ডিতগণ নরেন্দ্রযশ সম্পাদিত অনুবাদের কয়েকটী মারাত্মক ত্রুটী বাহির করেন। সভাপতির কার্য্যের ভার যোগ্যতর ব্যক্তিকে দিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইলেন। এই কার্য্যের উপযুক্ত ছিলেন একমাত্র জিনগুপ্ত। জিনগুপ্ত কিন্তু তখনও তুর্কীদের রাজ্যে নির্ব্বাসনে বাস করিতেছেন। চীনা বৌদ্ধগণ জিনগুপ্তকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সম্রাট্‌কে অনুরোধ করেন। সম্রাটের আমন্ত্রণে জিনগুপ্ত পুনরায় চীনে ফিরিয়া আসে।

জিনগুপ্তের পাণ্ডিত্যের কথা কাহারও অবিদিত ছিলনা। চীনভাষা তাঁহার উত্তমরূপ জানা ছিল, তুর্কীভাষায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল; সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ছিল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। সুতরাং তাঁহাকেই অনুবাদ সমিতির সভাপতি হইতে হইল।

ধর্ম্মগুপ্ত নামক এক হিন্দু শ্রমণও দুইজন চীনা শ্রমণের সাহায্যে জিনগুপ্ত সংস্কৃত হইতে চীনা অনুবাদ করিতেন; অপর দশজন ভিক্ষু এই অনুবাদ মূলের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া দেখিতেন। তাহার পর চীনা সাহিত্যিকগণ রচনার ভঙ্গী কিরূপ হইল না হইল বিচার করিতেন, প্রয়োজন হইলে সংশোধন করিয়া দিতেন। জিনগুপ্ত সর্বসমেত ৩৭টী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে ৩৬খানি পাওয়া যায়। চীন সম্রাট কাওৎসু (Kaostsu) তাঁহাকে হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে পুঁথি অনুবাদ করিতে অনুরোধ করায় ৫৯২ খৃষ্টাব্দে এক বিপুল গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করেন, তাহাতে ২০০ অধ্যায় রহিয়াছে। ৬০০ খৃষ্টাব্দে চীনেই জিনগুপ্তের মৃত্যু হয়।

সুই রাজত্বের আরও তিন জন হিন্দু শ্রমণের মধ্যে দুইজনের নাম আমরা প্রসঙ্গক্রমে করিয়াছি। গৌতম ধর্ম্মজ্ঞান ৎসী রাজত্বের সময় নরেন্দ্রযশকে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করেন। Cheu রাজত্বের সময় তিনি Yansen এর শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে সুই রাজবংশ চীনের রাজা হইলে ধর্ম্মজ্ঞান রাজধানী চাঙআনে আহূত হন। একখানি সূত্র তিনি অনুবাদ করেন। আর একজন হিন্দু শ্রমণের নাম হইল বিনীতরুচি। ইনি ছিলেন উদ্যানের অধিবাসী। ৫৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি চীনে আসেন। দুইখানি সূত্রের অনুবাদ তিনি করেন। সুই যুগের শেষে অনুবাদক ধর্ম্মগুপ্ত আসেন ৫৯০ খৃষ্টাব্দে। জিনগুপ্ত ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন এই ভিক্ষু মধ্য এশিয়ার সেই দুর্গম পথ দিয়া চীনে আসেন। দশখানি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা হিন্দু শ্রমণদিগের ইতিহাস ও তৎপ্রসঙ্গে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা সেই যুগের শ্রেষ্ঠ দুইজন অনুবাদক নরেন্দ্রযশ ও জিনগুপ্তের অনূদিত কয়েকটী গ্রন্থের বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। নরেন্দ্রযশ চিউরাজত্বের সময় কয়েকটী ও তৎপরে সুই রাজত্বকালে কয়েকটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাহার মধ্যে পিতাপুত্রসমাগম হইল একটী। ইহা রত্নকূট বর্গের অন্তর্গত। ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ গ্রন্থটীকে একটী মূল্যবান্ গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। শিক্ষাসমুচ্চয়ের লেখক এই গ্রন্থ হইতে দুইটী অংশ উদ্ধার করিয়াছেন। বোধিসত্ত্ব মানবের প্রতি প্রেম ও অনুকম্পার নিমিত্ত কত কষ্টস্বীকার করেন একটীতে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার সেই কষ্ট স্বীকারের মধ্যে দুঃখ নাই, ঔদাসীন্যও নাই, বরং তিনি ইহাতে যথার্থ আনন্দ উপভোগ করেন। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ সেই মহাপুরুষের ন্যায় বোধিসত্ত্ব বহুদিন ধরিয়া এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রার্থনা এই ভাবেই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। তিনি প্রার্থনা করেন যে যাহারা আমাকে প্রীতি দান করে তাহারা শান্তি ও আনন্দলাভ করুক। যাহারা আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করে, যাহারা পালন করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে, সকলে শান্তির আনন্দ উপভোগ করুক। যাহারা আমাকে অভিশাপ করে, যন্ত্রণা ও দুঃখ দেয়, অত্যাচার করে, ছুরিকা-বিদ্ধ করে, আমার জীবন শেষ করিয়া তৃপ্ত হয়, তাহারাও পূর্ণজ্ঞানের যে আনন্দ তাহার অংশলাভ করুক। এই অতুল জ্ঞানের আলোকে তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাক্।"

এইরূপ চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, কর্মের দ্বারা তাহা পরিপুষ্ট করিয়া, বোধিসত্ত্ব ক্রমেই পরার্থ প্রেমে বিভোর হইয়া যান, ও ক্রমশঃ সকল কার্য্যে সকল বস্তুতে তিনি নির্মল আনন্দলাভ করেন। যখন সকল বস্তুতে তিনি আনন্দলাভ করেন তখন কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না, মারের মায়াজালে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।"

অন্য আর একটী অংশে লেখক দেখাইতেছেন যে 'দৃশ্যমান জগতের কোনও স্থায়ী সত্ত্বা নাই। কিন্তু কর্মফলের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিগূঢ়। কর্মফলের নিজস্ব কোনও গুণ নাই ইহা সত্য, কিন্তু দৃশ্যমান ঘটনাবলী অনেকাংশে ইহার উপর নির্ভর করে।' তাহার পর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও বিজ্ঞান এই ছয়টী ধাতুর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সেই অংশটীর কতকটা উদ্ধার করিয়া দিলেই গ্রন্থটীর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।—'ভগবান্ বুদ্ধ কোন্ বস্তুর জ্ঞানকে পরমজ্ঞান বলিয়াছেন? সে রূপ না চেতনা, ভাবনা না বেদনা?' বোধিসত্ত্বের মনে এই চিন্তার উদয় হইল—'রূপ, বেদনা, ভাবনা বা চেতনা কোনটারই সত্ত্বা নাই, যাহার সত্ত্বা নাই তাহার জ্ঞান কেমন করিয়া হইতে পারে। কে বুদ্ধ, জ্ঞান কি, বোধিসত্ত্ব কে—এসকলের ধারণা কিছুই সুস্পষ্ট হয় না। শূন্যই হইতেছে রূপের প্রকৃত স্বরূপ। অন্য সমস্ত সংস্কারমাত্র, সংজ্ঞা ও আবরণমাত্র। অতএব জ্ঞানী যে, সে এই অলীকত্বে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।"

নরেন্দ্রযশের অনূদিত একখানি গ্রন্থের নাম চন্দ্রপ্রভা-সমাধিসূত্র। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি হইতেছে সমাধিরাজ-সূত্র। গ্রন্থখানি এখনও রহিয়াছে। পুঁথিখানি নেপাল হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে য়ুরোপের প্রধান গ্রন্থাগার সমূহে ও নেপালে এই গ্রন্থ রহিয়াছে। শান্তিদেব তাঁহার শিক্ষাসমুচ্চয়ে এই গ্রন্থখানি হইতেও কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন। সমাধিরাজ সূত্রে চন্দ্রপ্রভা নামক জনৈক বোধিসত্ত্বের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথন বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে কেমন করিয়া বোধিসত্ত্ব ধ্যানের বিভিন্ন সোপান পার হইয়া ধ্যানের সর্বোচ্চ-শিখরে সমাধিরাজে উপনীত হন। সোপানগুলি ক্রমান্বয়ে বলা হইয়াছেঃ—বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তি, জগৎসংসারে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, সর্ব্বজীবে করুণা, নিজের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, প্রয়োজন হইলে অপরের জন্য আত্মাহুতি। পরিশেষে এই দৃশ্যমান জগতের শূন্যতা উপলব্ধি। গ্রন্থখানির বহুস্থানে বারম্বার ইহাই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের শারীর-মূর্ত্তি যেন ধ্যানের বিষয় না হয়, কারণ বুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মকায়। তিনি অজাত, অনাদি, অনন্ত করুণার আধার।" নরেন্দ্র-যশের অনূদিত এই গ্রন্থখানি চীনবাসীর নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার সকল গ্রন্থের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল যে গ্রন্থগুলি চীনবাসীর নিকট ভারতীয় ধর্ম্মের ভাবটী সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছে তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

জিনগুপ্তের অনূদিত গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব হইতেছে এই যে তাঁহার সকল অনুবাদই সূত্রপিটকের অন্তর্গত। ৩৬ খানি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন, সকল গুলির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নাই। তাঁহার একটী গ্রন্থ হইতেছে রাষ্ট্রপালপরিপৃচ্ছা; ইহা রত্নকূটবর্গের অন্তর্গত। জিনগুপ্ত ইহার প্রথম অনুবাদ করেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি রহিয়াছে। নেপালের দরবার লাইব্রেরী ও য়ুরোপের কোন কোন প্রধান গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি অবলম্বনে ফরাসী পণ্ডিত লুই ফিনো (Louis Finot) গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। রুশিয়া হইতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে। পালিতে রট্ঠপালসুত্ত নামক একটী গ্রন্থ আছে, তাহার সহিত সংস্কৃত গ্রন্থের কোনও সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত গ্রন্থটীর কিয়দংশ নীতিপূর্ণ কিয়দংশ পৌরাণিক। প্রথম অংশে রাষ্ট্রপালের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব ধর্মবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন; দ্বিতীয় অংশে কুমার পূণ্যরশ্মির জাতক বিবৃত করা হইয়াছে। প্রথম অংশেও বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের পঞ্চাশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতক রহিয়াছে। শেষ জাতকটীর উপসংহারে বুদ্ধদেব ধর্মের অধঃপতনের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। গ্রন্থখানি বৌদ্ধগণ খুব মূল্যবান মনে করিতেন। শিক্ষাসমুচ্চয়ে ইহা হইতে চারিটী অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে।

অধ্যাশয় সংবোদন সূত্র নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ জিনগুপ্ত প্রথম অনুবাদ করিয়াছেন। মূল গ্রন্থখানি

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

এখন আর পাওয়া যায় না। তবে শান্তিদেব তাঁহার শিক্ষা সমুচ্চয়ে কয়েকটী উপাদেয় অংশ ইহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; তাহা হইতে আমরা মূল গ্রন্থখানির আভাস পাই। শীলপার মিতার অনর্থ বর্জন বিষয়ক পরিচ্ছেদে শান্তিদেব অধ্যাশয় সংবোদন হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধার করিয়াছেন :—

'যে বোধিসত্ব নির্বাণ প্রার্থী, তিনি কখনও অনর্থ বা কুৎসিৎ কোনও বস্তু দেখিয়া লুব্ধ বা ক্ষুব্ধ হইবেন না। অসীম ধৈর্য্য, অজস্র করুণা ও পরমা ক্ষান্তি হৃদয়ে বহন করিয়া তাঁহাকে পার্থিব সকল পাপ, দুরাচার সহ্য করিতে হইবে। সর্বজীবের মঙ্গল কামনায় তিনি আত্ম-বিসর্জন করিবেন।"

যে সকল গ্রন্থ চীনে পূর্ব্বেই সুপরিচিত ছিল, সেরূপ কয়েকটী গ্রন্থও জিনগুপ্ত পুনরায় অনুবাদ করেন। সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক হইল তাহার মধ্যে একটী। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্মক্ষোম ইহার সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ করেন। কুমারজীবও ইহার অনুবাদ করেন, তাঁহার অনুবাদের যথেষ্ট সমাদর হয়। তবে জিনগুপ্ত ধর্মগুপ্তের সাহায্যে সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীকের যে অনুবাদ করেন তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। তাঁহার অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকা হইতে কতকগুলি তথ্য জানিতে পারা যায়। ভূমিকাটী সম্ভবত উক্ত অনুবাদ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তির লেখা। লেখক বলিতেছেন :—

'ধর্মক্ষোমও কুমারজীবের অনুবাদ সম্ভবত পৃথক পৃথক পুঁথি হইতে করা হইয়াছিল। মঠের গ্রন্থশালায় আমি সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীকের দুই খানি পুঁথি দেখিয়াছি। একখানি তালপত্রে লিখিত, অপরটী কুচার অক্ষরে লেখা। প্রথম খানির সহিত ধর্মক্ষোমের অনুবাদের মিল সমধিক, দ্বিতীয় পুঁথিখানি বা কুচার পুঁথিখানির সহিত কুমারজীবের অনুবাদ মিলিয়া যায়।" কুমারজীব কুচার অধিবাসী; সুতরাং তিনি কুচার পুঁথি লইয়া কাজ করিয়াছিলেন। দুইটী পুঁথি ও অনুবাদের মধ্যে পরিচ্ছেদের অনুক্রম বিভিন্ন। তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। জিনগুপ্ত প্রমুখ অনুবাদকগণও সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের পরিচ্ছেদের অনুক্রম বদলাইয়া ছিলেন! এতদ্ব্যতীত এক পরিচ্ছেদের কতক-গুলি সূত্র লইয়া অপর পরিচ্ছেদে সংযোজিত করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবর্ত্তন অনুবাদকগণ স্বেচ্ছায় করিতেন।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক মূল সংস্কৃত গ্রন্থটী পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি হইতে Burnout সাহেব সর্ব্বপ্রথম ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে ওলন্দাজ পণ্ডিত Kern, Sacred Books of the East এর অন্তর্গত করিয়া এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎপরে রুশিয়া হইতে প্রকাশিত Bibliotheca Buddhica সিরিজে ওলন্দাজ পণ্ডিত Kern ও জাপানী পণ্ডিত Manjio সংস্কৃত গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। জাপানী পরিব্রাজক কওয়াগুচি তিব্বত ভ্রমণ কালে সপ্তমশতাব্দীতে লিখিত সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের একখানি পুঁথি পাইয়াছেন। মধ্য এসিয়ায় খুব প্রাচীনকালের পুঁথির ভগ্নাংশসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জিনগুপ্তের অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হইতেছে অভিনিস্ক্রমণ সূত্র ; চীনানামের যথাযথ অনুবাদ করিলে গ্রন্থটীর নাম হয় বুদ্ধপূর্ব্বকার্য্য-সংগ্রহসূত্র। ৬০ খণ্ডে গ্রন্থখানি বিভক্ত। Beal সাহেব ইহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুইরাজত্বের ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের তিনটী তালিকা প্রস্তুত হয়। ইহাদের পূর্ব্বে বহুবার নানা তালিকা নির্ম্মিত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। সুইবংশের প্রথম সম্রাট ইয়াংচিয়েনের অনুজ্ঞায় ৫৯৩, ৫৯৪, ও ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি তালিকা প্রস্তুত হয়; তাহার মধ্যে প্রথমখানি ফা-চিং প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত সম্পাদন করেন। ইহাতে ২২৫৭ খানি বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার কিন্তু কোথাও বলেন নাই সকল গ্রন্থই পাওয়া যায় কিনা। সম্ভবত অধিকাংশের নাম জানাছিল মাত্র। কারণ পর বৎসরের দ্বিতীয় তালিকাতে ৫৫১ খানি মহাযান গ্রন্থ ও ৫২১ খানি হীনযান গ্রন্থ—মোট ১০৭২ খানি গ্রন্থের মাত্র উল্লেখ রহিয়াছে। খুব সম্ভব এই ১০৭২ খানি গ্রন্থই সম্রাটের গ্রন্থাগারে সুপরিচিত ছিল। ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে তৃতীয় তালিকা প্রস্তুত হয় তাহাতে ২১০৯ খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। সুই-

দিগের ইতিবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে সম্রাট্ ইয়াং (৬০৫-৬১৬) পুনরায় আর একখানি তালিকা প্রস্তুত করান। প্রাসাদের মধ্যে যে বৌদ্ধ বিহার ছিল, এই তালিকা মাত্র সেই বিহারের গ্রন্থাবলীর। এই তালিকার শ্রেণী-বিভাগও অনুরূপ। গ্রন্থেরসংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, ১৯৬২। রাজপ্রাসাদের বিহারে প্রায় দুই সহস্র বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ সংগ্রহ করা হয়—ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি সুই সম্রাট্-দিগের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।—

নীল আকাশের তারা

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

নীল আকাশের তারা!
আকুল করা চাউনি যে তোর সকল সৃষ্টিছাড়া।
দিবস যখন সাঙ্গ হয়ে যায়,
পথিক যখন আপন গৃহে ধায়,
তখন হ'তে সারা নিশি একলা কাটাস জাগি,
উতল প্রাণে কোন অতিথির পরশটুকু মাগি?

নীল আকাশের তারা!
আঁধার মাঝেই তোর জীবনের সুরু এবং সারা!
তাই কি রে তোর পর্দ্দা গেছে টুটে,
দীপ জ্বালি তোর আপন বক্ষ পুটে,
চলিস্ শুধু চলার পথে, আপন মহিমাতে,
ফুটিয়ে ফুল সবার তরে ফুরিয়ে গিয়ে প্রাতে?

নীল আকাশের তারা!
ধন্য তোর এ ফুরিয়ে যাবার হারিয়ে যাবার ধারা
আঁধারকে তুই করিসনাকো ভয়,
মরণকে তুই করিস না সংশয়,
আঁধার মাঝে জনম ল'য়ে আলোক রেখা টানি,
হারিয়ে যাস অলক্ষ্যেতে ফুলের হাসি আনি।

১৫

বাইরের বারান্দার একধারে টেবিল চেয়ার পাতা। সেখানে ল্যাম্প জ্বেলে ব'সে একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে সুকুমার নিবিষ্ট মনে দরখাস্ত লিখছিল। মুশাবিদাটা কিন্তু কিছুতেই ঠিক তেমন হ'য়ে উঠছিল না যাতে প্রার্থী হিসাবে তার উপযুক্ততা সম্বন্ধে চীফ্ এঞ্জিনীয়ারের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকে। কেবল-মাত্র কার্য্যপটু ঠিকাদার পিতামহর দাবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত লিপি-চাতুর্য্য কিছুতেই আয়ত্ত হচ্ছিল না, এমন সময়ে বিনয় এসে পাশেই একখানা ইজি চেয়ারে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল।

আড়ভাবে বিনয়কে একবার দেখে সুকুমার ডাক্‌লে, "বিনয়!"

সুকুমারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিনয় বল্‌লে, "কি?"

"তুমি দরখাস্ত লিখ্‌তে জানো?"

"জানি। কিন্তু আমার লেখা দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না।"

হো হো ক'রে হেসে উঠে সুকুমার বল্‌লে, "তবে ত খুব লিখ্‌তে জানো! কখনো দরখাস্ত করোছলে না কি?"

"করেছিলাম।"

"কবার?"

"দু'বার।"

উৎসুক হ'য়ে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "দু'বার? কোথায়-কোথায় হে?"

একটু চুপ ক'রে থেকে বিনয় বল্‌লে, "একবার কলকাতায় কস্‌টম্ হাউসে অ্যাপ্রেজারের কাজের জন্যে—আর একবার লাহোরের একটা ব্যাঙ্কে একাউন্টেন্টের জন্যে।"

বিনয়ের কথা শু'নে সুকুমার আবার হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "সে তোমার দরখাস্ত লেখবার দোষে নামঞ্জুর হয় নি, বুদ্ধির দোষে হ'য়েছিল। আর্টিষ্ট্ হ'য়ে তুমি অ্যাপ্রেজার আর একাউন্টেন্টের কাজের জন্যে দরখাস্ত কর? নাঃ, তুমি দেখ্‌চি সত্যি-সত্যিই একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট্!"

সবিস্ময়ে বিনয় বললে, "তার মানে?"

"তার মানে তোমার কমন্ সেন্স্ অতিমাত্রায় কম। যে যত বড় আর্টিষ্ট্ তার কমন্‌সেন্স্ তত বেশী কম।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিনয় বল্‌লে, "কি আশ্চর্য্য! আমি ছবি আঁকি ব'লে আমার অন্য কোনো বিষয়ে যোগ্যতা থাক্‌তে পারে না?"

সুকুমার স্মিতমুখে বল্‌লে, "একটা কোনো বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ যোগ্যতা থাক্‌লে অনেক সাধারণ যোগ্যতা তাতে ডুবে মারা যায়। এমন অনেক ব্যাপার আছে যা অন্য অনেক ব্যাপারের পক্ষে বিরোধী। ডাক্তারকে জমিদারির ম্যানেজার রেখেচে, এ কথনো শুনেচ? তুমি যে আর্টিষ্ট্ এ তোমার অনেক বিষয়ের পক্ষে অপগুণ—disqualification।"

বিনয় বল্‌লে, "তা-ই যদি হয়, তা হ'লে দরখাস্ত লেখার পক্ষেও।"

সুকুমার আবার হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "নাঃ, তুমি ঠকিয়েচ। সহজ বুদ্ধি না থাক্, কূটবুদ্ধি তোমার বেশ আছে।" তারপর দরখাস্তের মুসাবিদাখানা বিনয়ের হাতে দিয়ে বল্‌লে, "প'ড়ে দেখ ত কি রকম হয়েচে। আর পারা যায় না—এই থাক্‌ল, এতেই যা হবার হবে।"

সংক্ষিপ্ত আবেদন পত্র। পিতামহর গুণকীর্ত্তনেই তার পরিসমাপ্তি। প'ড়ে সুকুমারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বিনয় বল্‌লে, "এ দরখাস্ত পড়লে নিঃসংশয়ে মনে হয় তুমি তোমার যোগ্য পিতামহর অযোগ্য পৌত্র।"

কপট বিমর্ষতায় মুখ বিমর্ষ ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "তা ছাড়া ত' আর-কোনো যোগ্যতা আমার নেই বিনু!"

বিনয় স্মিতমুখে বল্‌লে, "সে তো তোমার হিসেবে ভালই, তা হ'লে কাজে কাজেই disqualification-ও কিছু নেই।"

সুকুমার হাস্‌তে লাগল।

"বিনু!"

"বল।"

"এ দরখাস্ত যা হয় হবে, কিন্তু তোমার বউদিদির দরখাস্তের কি করলে?"

চমকিত হয়ে বিনয় ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর আরক্ত মুখে বল্‌লে, "কিছু করিনি। কি-যে করব তাও জানি নে!"

"কেন, সে এমনই কি কঠিন কথা?"

"কঠিন কি সহজ, তা জানিনে ভাই,—কিন্তু আমার ত বুদ্ধি লোপ পেয়েছে!"

সুকুমার মনে করেছিল শৈলজা বিনয়কে শুধু তাদের বাড়ি ছেড়ে না যাওয়ার জন্যই উপরোধ করবে, বিনয়ের কথা শুনে তার সন্দেহ হ'ল হয়ত বা শোভার কথাও সে বলেছে। ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বিনু, আমাদের বাড়ি ছেড়ে তুমি বিশ্বনাথ বাবুর বাড়ি না যাও, এ ছাড়া আর অন্য কোনো কথা শৈল তোমাকে বলেছে কি?"

মৃদুস্বরে বিনয় বল্‌লে, "বলেছেন।"

"কি কথা?"

"শোভার কথা।"

হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর ফেলে, ত্বরিতবেগে চেয়ারটা ঘুরিয়ে বিনয়ের দিকে মুখ ক'রে বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ স্বরে সুকুমার বল্‌লে, "শোভার কথা বলেছে? অত্যন্ত অন্যায় করেছে! ছি, ছি! ভারী ছেলেমানুষ শৈল!"

"কিন্তু ছেলেমানুষ তুমি কি ক'রে বল সুকু? ভুলই হ'ক আর ঠিকই হ'ক, শোভার বিষয়ে যে অনুমান তিনি করেছেন তাতে এ কথা আমাকে না জানিয়ে তাঁর উপায় কি? তুমি এ কথা জান্‌তে?"

"তোমার জান্‌বার মিনিট দশ পনেরো আগে শৈলর মুখেই শুনেছিলাম।"

"আচ্ছা, বউদিদি যদি আমাকে এ কথা না বলতেন, তুমি কি করতে? তুমি এ কথা আমাকে জানাতে,—না, জানাতে না?"

একটু চিন্তা ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "হয়ত জানাতুম না··আমি যে কমলার কথা জানি।"

"কিন্তু কমলার কথাও ত' অনুমান ভিন্ন আর কিছু নয়।"

সুকুমার বল্‌লে, "কমলার কথা অনুমান হ'তে পারে, কিন্তু তোমার কথা ত অনুমান নয় বিনু। আমি যে তোমার কথাও জানি।"

বিনয় এ কথার আর কোনো উত্তর দিলে না, সুকুমারও আর কিছু বল্‌লে না; সমস্যা-বিমূঢ় দুই বন্ধু নীরবে বহুক্ষণ ব'সে রইল। সুকুমার ভাবতে লাগল, সব দিক বিবেচনা না ক'রে শোভার কথা ব'লে বিনয়কে এমন সঙ্কটে ফেলা সঙ্গত হয় নি। এর দ্বারা বন্ধুর প্রতি অবিচার এবং অতিথির প্রতি উৎপীড়ন হয়েচে। অসঙ্কোচে 'না' বলবার সুবিধা যার ষোল আনা নেই, অনুরোধের দ্বারা তাকে বিড়ম্বিত করা সুনীতি-বিরুদ্ধ। সমবেদনায় সুকুমারের সদয় চিত্ত ভ'রে উঠল।

"বিনু!"

বিনয় সুকুমারের দিকে চেয়ে দেখলে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"এতে ভাবনারও কোনো কারণ নেই—বিবেচনারও কোনো কথা নেই। হৃদয় যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করবে সেখানে মাথা ঘামানো বৃথা। শোভা যদি তোমাকে কামনা ক'রে থাকে ত তাকে আমি দোষ দিতে পারিনে বিনু—কারণ তুমি যে কামনার বস্তু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যখন বুঝতে পারবে যে তোমার প্রতি তার ভালবাসার আকার বদলানো উচিৎ—তখন যে সে বিষয়ে তার দেরি হবেনা তাতেও আমার সন্দেহ নেই। সে যা হ'ক, উপস্থিত দ্বিজনাথ বাবুর বাড়ী যাওয়া-না-যাওয়া সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করছ?"

"না যাওয়াই স্থির করছি।"

সুকুমারের মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল; বল্‌লে "সে বেশ কথা—তোমার বউদিদির তিরস্কার থেকে আমি অব্যাহতি পেলাম। তাঁর ধারণা আমার জন্যেই তোমার সেখানে যাওয়া হচ্ছিল।"

"কিন্তু এখানেও আমি থাকচিনে সুকুমার। আমি বোধ হয় কাল কলকাতা যাচ্ছি।"

বিস্মিত হয়ে সুকুমার বল্‌লে, "এই উভয় সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে কাপুরুষের মতো?"

বিনয় বল্‌লে, "কাপুরুষেরই মতো,—বীরপুরুষদের বীরত্ব প্রকাশ করবার নির্ব্বিঘ্ন সুযোগ দিয়ে।"

"কিন্তু তোমার ছবি আঁকা!"

"ছবি আঁকা এই পর্য্যন্তই রইল।"

সবিস্ময়ে সুকুমার বললে, "এই পর্য্যন্তই রইল? আর আঁকবে ব'লে চুক্তি করেছ যে?"

সহাস্যমুখে বিনয় বল্‌লে, "আঁক্‌ব ব'লেই চুক্তি করেছি,—চুক্তি ভাঙব না ব'লে ত চুক্তি করি নি।"

সুকুমার বল্‌লে, "হ্যাঁ, এ একটা যুক্তি বটে! কিন্তু শুধু চুক্তির দাবীই ত' নয়, তার চেয়েও কঠিন দাবী দিয়ে তোমাকে আট্‌কাবেন প্রথমত দ্বিজনাথ বাবু, এবং দ্বিতীয়ত, যদি প্রয়োজন হয়, তাঁর কন্যা কমলা। এক হাতে স্নেহ এবং অপর হাতে প্রেমের বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়বে।"

বিনয় বল্‌লে, "সুকুমার, তুমি নিশ্চয় লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখ। তোমার কথাগুলি কাব্য-রসাত্মক!"

এমন সময়ে শোভা এসে জানালে আহার প্রস্তুত।

রাত্রে সুকুমারের মুখে সমস্ত কথা শুনে শৈলজা অতিশয় রেগে গেল। সুকুমারের উপর রাগ করলে, বিনয়ের উপর রাগ হ'ল, শোভার উপর রাগ হ'ল, দ্বিজনাথের উপর রাগ হ'ল, আর সকলের চেয়ে বেশি রাগ হ'ল কমলার উপর। সে-ই—যত নষ্টের গোড়া! ছবি না আঁকালে যেন চল্‌ছিল না। ছবি আঁকানো-টাকানো কিছু নয়—ও সমস্ত কৌশল ছেলে ধরবার জন্যে! কলেজে-পড়া মেয়েদের উপর একটা গভীর অশ্রদ্ধায় শৈলজার মন ভ'রে গেল।

১৬

পরদিন সকালবেলা শোভাকে দেখ্‌তে পেয়ে সে তর্জ্জন ক'রে ডাক্‌লে, "এ দিকে আয়!"

নিকটে এসে শোভা জিজ্ঞাসা করলে, "কি বলছ, বউদি?"

রুক্ষ-স্বরে শৈলজা বল্‌লে, "বলছি তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু! বিনয় ঠাকুরপো তোকে চায় না—ও চায় সেই কটা-চামড়া কম্‌লিকে। বুঝলি? ফের যদি তুই ওকে ভালবাস্‌তে যাবি তো মাছ-কোটা বঁটি দিয়ে তোর নাক কেটে দোবো; আর মাকে সব কথা ব'লে দিয়ে মজা দেখাবো!"

এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের জন্যে শোভা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না—সে বিস্ময়ে আর আতঙ্কে অভিভূত হ'য়ে কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বল্‌লে, "ওকি বলছ বউদিদি? আমি কি করেচি!"

শৈলজা গর্জ্জন ক'রে উঠল, "আমি কি করেচি? ধিঙ্গী হয়েচেন, স্বাধীন হয়েচেন, কারুর সঙ্গে শলা-পরামর্শ না ক'রে আপনার মনে প্রেম করচেন! আবার বলা হচ্চে আমি কি করেচি! পর জন্মে কটা চামড়া নিয়ে এসে তারপর প্রেম করিস্! বুঝলি?"

এবার শোভা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল—শৈলজার কঠোর বচনের দুঃখে নয়—স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়ার সমবেদনার স্পর্শ লাভ ক'রে। এ ধরণের তিরস্কার তার পক্ষে এই নতুন নয়, সে নিঃসংশয়ে জানত এই কর্কশ

ছদ্মবেশী স্নেহধারা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শোভার চোখে জল দেখে শৈলজা বাহুবন্ধনের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বল্লে, "দেখ দিখিনি, মিছিমিছি সকালে উঠে কতকগুলো বকুনি খেয়ে মলি! ও পোটোর সঙ্গে তোর বিয়ে, সাধলেও, আমরা দিতুম না। তোর বিয়ে হবে বিলিতি পাশ-করা হাকিমের সঙ্গে।"

তখন ছটা বেজেছে। আটটার সময়ে চীফ্ এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করবার কথা। ভোর পাঁচটা থেকে উঠে সুকুমার হৈ চৈ ক'রে সমস্ত বাড়ি তোলপাড় ক'রে তুলেছিল। শোভাকে বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে শৈলজা বল্লে, "শীগ্‌গির যা'। তোর দাদা এখনি বেরোবেন; চা ক'রে খাবার দে।"

ভাল ক'রে আঁচলে চোখ মুছে শোভা বললে, "বিনু-দাকেও এখনি দোবো?"

ভিতরে ভিতরে একটা নিঃশ্বাস চেপে কোমল স্বরে শৈলজা বল্লে, "তাঁকে এ তাড়াতাড়িতে না দিয়ে পরে ভাল ক'রে গুছিয়ে দিস্।"

দ্রুত পদে শোভা প্রস্থান করলে।

আরো আধ-ঘণ্টা-কাল অনাবশ্যক দৌড়োদৌড়ি ক'রে, বাড়ির সমস্ত লোককে অকারণ ব'কে ধমকে, অর্দ্ধেক খাবার আর আধ পেয়ালা চা খেয়ে ঝড়ের মতো সুকুমার গাড়ি ক'রে বেরিয়ে গেল। পনেরো মিনিট পরে দেখা গেল সুকুমারের গাড়ি প্রবলবেগে ফিরে আস্‌চে। থাম্‌তে না থাম্‌তে গাড়ি থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটো ক'রে সিঁড়ি লাফিয়ে বারান্দায় উঠে টেবিলের দেরাজটা সজোরে টেনে সুকুমার তাড়াতাড়ি একটা কাগজ বার ক'রে নিলে।

বারান্দায় বিনয় বসেছিল, জিজ্ঞাসা করলে, "ও-টা কি সুকুমার?"

"দরখাস্তটা ফেলে গিয়েছিলাম।"

সবিস্ময় পুলকে বিনয় বল্লে, "দরখাস্তটাই ফেলে গেছলে? আর কিছু ফেলে যাচ্ছ না ত?"

সিঁড়িতে নাম্‌তে নাম্‌তে পিছন ফিরে সুকুমার বল্লে, "তোমার বুড়িদিদিকে ফেলে যাচ্ছি।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বিনয় ব'সে রইল।

গাড়ী ছুট্‌ল সবেগে।

সন্ধ্যার ক্রমবর্দ্ধমান অন্ধকারে দিনান্তের ক্ষীণ আলোটুকু যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে যায়, তেমনি চিন্তার নিবিড়তার মধ্যে বিনয়ের অধরের হাস্য-রেখাটুকু ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল। গত রাত্রি হ'তে যে কঠিন সমস্যাজালে সে আবদ্ধ হয়েচে তা থেকে যেন আর উদ্ধার নেই! কমলা অনিশ্চিত,—অনির্ণীত। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলী মথিত ক'রে সে সম্ভাবনা, অনুমান মাত্র;—তার বেশি কিছুই নয়। কিন্তু তার অনিশ্চয়তাই যেন তার আকর্ষণী শক্তি, তার দুর্লভতাই যেন তার মূল্য। শোভা সুনিশ্চিত, সুলভ। শৈলজা বলছিল সে বিনয়ের জন্য পাগল। সেকথা বিনয়ের মনে জাগাতে সক্ষম হ'ল কেবলমাত্র করুণা,—প্রেম রইল বহু অন্তরালে সুষুপ্ত, অনাহত। উন্মাদনায় আবেগ উদ্গত না হ'য়ে উদ্গত হ'ল অনুকম্পা।

সুধু তাই নয়। এই অনুকম্পা, এই করুণা বিনয়ের চিত্তের আর একদিকে প্রেমকে বর্দ্ধিত ক'রে তুল্‌লে,—কালো মখমলের আধারে হীরকখণ্ড উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌ল। শোভাকে দিয়ে কমলা সুনির্ণীত হ'ল; পয়সা দিয়ে টাকার মূল্য বোঝা গেল।

একটা দেবদারু গাছের মাথায় প্রভাত সূর্য্যের আলো শাখা-পত্র অবলম্বন ক'রে সোনালী রঙে ঝিক্‌মিক্ করছিল। বিনয়ের মনে হ'ল শরৎকালের সুনির্ম্মল আকাশ ঠিক যেন একটা বিশাল হৃদয়ের মতো সেই নিঃশব্দ নিবেদন নির্ব্বিবাদ প্রসন্নতায় গ্রহণ করছে; সামান্য মাত্র আপত্তি নেই, বিরক্তি নেই। একদিক থেকে অকপট দান, আর এক দিক থেকে অকুণ্ঠিত গ্রহণ;—কে দিচ্ছে কে নিচ্ছে যেন বোঝাই যায় না। স্বীকার করবার, গ্রহণ করবার একটা অসঙ্কোচ উদারতায় বিনয়ের হৃদয় প্রসারিত হয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল এবার থেকে কিছুই সে প্রত্যাখ্যান করবে না; অগ্রাহ্য করবে না। বুদ্ধি দিয়ে যাকে বুঝবে, প্রাণ দিয়ে তাকে গ্রহণ করবে।

একটা অপরিসীম মমতায় শোভার প্রতি বিনয়ের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। মনে করলে আজ দ্বিজনাথের বাড়ি গিয়ে দেনা-পাওনা মিটিয়ে সেদিকের ব্যাপারটা সুনিশ্চিত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহজ ক'রে আসবে। তারপর এদিকের ব্যাপার যেমন হয় করলেই চল্‌বে। অপরের সুখ দুঃখের প্রতি কোনো মনোযোগ না দিয়ে নিজের হৃদয়-বৃত্তিকে একান্তভাবে অনুসরণ করা বর্ব্বরতা ব'লে তার মনে হ'ল। একটা বাধাহীন সীমাহীন উদারতায় বিনয়ের মন নৃত্য করতে লাগল,—সব-রকম ত্যাগ স্বীকার করবার, সব রকম দুঃখ ভোগ করবার আনন্দে।

"বিনু দা!"

"কি শোভা?"

"তোমার চা এনেছি।"

বিনয় উঠে টেবিলের সাম্‌নে গিয়ে ব'সে বল্‌লে, "এই খেনে রাখ।"

চা এবং জলখাবার টেবিলের উপর রেখে শোভা চ'লে যাচ্ছিল, বিনয় ডাক্‌লে, "শোভা!"

শোভা ফিরে দাঁড়িয়ে বিনয়ের দিকে চাইলে।

বিনয় বল্‌লে, "অতিথির সামনে শুধু খাবার রেখে দিলেই আতিথ্যের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। অতিথিকে দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হয়। ঘোড়াকেও দানা দিয়ে সইস্ সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি যদি চিড়িয়াখানার বাঘ হতাম, তাহ'লেও না হয়—"

শোভা লজ্জিতমুখে বল্‌লে, "আমি যাচ্ছিলাম আপনার হাত ধোবার জল আন্‌তে।"

বিনয় হেসে বল্‌লে, "অর্থাৎ কিনা, খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে এক ঘটি জল নিয়ে এসে দাঁড়াতে, যার কোনো দরকারই নেই; এই গেলাসের জলেই হাত ধোয়ার কাজ অনায়াসে সারা যেতে পারবে। সকাল বেলা বড় এক পেয়ালা চা খেয়ে তারপর এক গেলাস জল খাওয়ার মতো তেষ্টা থাক্‌লে তোমাদের ডাক্তার ডাক্‌তে হোত।"

শোভার মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিলে।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।"

অদূরে একটা চেয়ারে শোভা উপবেশন করলে বিনয় বল্‌লে, "আমি বোধ হয় তোমাদের বাড়িই থেকে গেলাম শোভা।"

শোভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বল্‌লে, "কেন?"

সহাস্যমুখে বিনয় বল্‌লে, "কেন? বোধহয় তোমাদের বাড়ির দানাপানি আমার অদৃষ্টে আছে ব'লে।"

মৃদু স্বরে শোভা বল্‌লে, "দ্বিজনাথবাবু কিন্তু দুঃখিত হবেন।"

"তিনি দুঃখিত হোন, তুমি ত হবেনা?"

শোভার চোখে জল এল, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অল্প একটু ঘাড় নাড়লে;—অর্থাৎ, দুঃখিত হবে না।

শোভার অবস্থা বুঝতে পেরে বিনয় দেখলে মনের ব্রেক হঠাৎ একটু বেশি আলগা হয়ে গিয়েছিল, সামান্য কথা দরকার; বল্‌লে, "শোভা, একটু আগে তোমার দাদা কি রকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"বউদিদি দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

চমকিত হ'য়ে বিনয় ও শোভা পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে, শৈলজা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে জান্‌লায় মুখ দিয়ে হাস্‌ছে।

শৈলজাকে দেখে ভয়ে শোভার মুখ শুকিয়ে গেল। তার মনে পড়ল একটু আগে শৈলজা তাকে তিরস্কার করেছিল 'ফের যদি তুই ওকে ভালবাস্‌তে যাবি তো তোর নাক কেটে দোবো।' কিন্তু শৈলজার হাসিমুখ দেখে সে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে, একমাত্র প্রসন্নতা ভিন্ন সেখানে অন্য কিছুই নেই।

একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বিনয় বল্‌লে, "ওখেনে কি করচেন বউদি?"

সুমিষ্ট হাস্যে মুখ ভরিয়ে শৈলজা বল্‌লে, "আড়ি পাতছি।"

বিনয়ের মুখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

শৈলজা বল্‌লে, "ওরে শোভা, ঠাকুর-পোকে আরো গোটা দুই সন্দেশ নিয়ে গিয়ে দে।"

ব্যস্ত হ'য়ে বিনয় বল্‌লে, "না, না, বউদিদি, এমন কোনো গুরুতর অপরাধ করি নি যাতে এমন ক'রে মিষ্টি খাইয়ে দণ্ড দেবেন!"

শৈলজা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "তবে খানিকটে নুন খাইয়ে দে—তাতে যদি কিছু গুণ গান।"

আর কোনো কথা বলতে সাহস না ক'রে বিনয় উঠে পড়ল; বললে, "ছবি আঁকতে চল্‌লাম বউদি! দেরি হয়ে গেছে—গাড়ী এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

ব্যস্ত হয়ে শৈলজা বল্‌লে, "খাবার পড়ে রইল যে!"

মৃদু হেসে বিনয় বল্‌লে, "সেখানকার জন্যে একটু স্থান রেখে না গেলে মারা যাবো। জানেন ত' দ্বিজনাথবাবুকে; স্ত্রীলোকেরও বাড়া।"

দ্বিজনাথের গৃহে উপস্থিত হয়ে বিনয় দেখলে তার প্রত্যাশায় কমলা প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছে।

উদ্বিগ্ন স্বরে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "এত দেরি বিনয়? অসুখ-টসুখ কিছু করেনি ত?"

বিনয় বল্‌লে "না।"

"আমি ভাবছিলাম কাল অতখানি হেঁটে বুঝি—"

দ্বিজনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিনয় বল্‌লে, "অতটুকু হেঁটে অসুখ করলে তাতে ভাবনার কথা যত না থাক, লজ্জার কথা তার শতগুণ বেশি হোত।"

"সে যা হোক, তুমি এ বেলাই জিনিষপত্র নিয়ে এলে না কেন? ও বেলা নিশ্চয় এসো।"

বিনয় বল্‌লে "আগে ছবিটা এঁকে নিই, তারপর সে-সব কথা কইলেই হবে। মিস্‌ মিত্র তৈরী হয়ে রয়েছেন, তাঁকে অনর্থক বসিয়ে রাখবেন না।"

ছবিখানা যথাস্থানে রেখে সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে নিয়ে বিনয় বল্‌লে, "মিস্‌ মিত্র, আপনি দয়া ক'রে এবার একটু পাশ ফিরে বসুন।"

কমলা কিন্তু পাশ ফিরে না ব'সে চেয়ার থেকে উঠে ধীরে ধীরে ভিতরে চ'লে গেল।

বিমূঢ়ভাবে দ্বিজনাথ বল্‌লেন "কি হ'ল কমলা?"

বিনয় ব্যাপারটা বুঝেছিল; বল্‌লে "কে আস্‌ছেন।"

পথের দিকে তাকিয়ে ভাল ক'রে দেখে দ্বিজনাথ চিৎকার ক'রে উঠ্‌লেন, "আর কে ও? সন্তোষ? এস, এস! ভাল আছ ত? অনেকদিন পরে!"

সন্তোষ হাস্‌তে হাস্‌তে বারান্দায় উঠে দ্বিজনাথের পদধূলি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছবির সাম্‌নে এসে বল্‌লে, "কমলার ছবি? চমৎকার হচ্চে ত!" তারপর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "আপনি আঁকচেন?"

উত্তর দিলেন দ্বিজনাথ। বললেন, "হ্যাঁ, ইনিই আঁকচেন। ইনি বিখ্যাত আর্টিষ্ট মিষ্টার বিনয়ভূষণ রায়।" বিনয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "ইনি কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিষ্টার সন্তোষকুমার চৌধুরী; আমার—আমার—আমার পরম আত্মীয়। পরে বলব অখন।"

বিনয় ও সন্তোষ সহাস্যমুখে পরস্পরকে নমস্কার করলে।

(ক্রমশঃ)
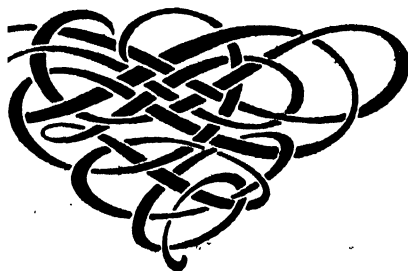
পুস্তক সমালোচনা

গীতায় মুক্তিবাদ—শ্রীঅমরীকান্ত কাব্যতীর্থ প্রণীত। ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তি-স্থান—শক্তিযোগ কার্য্যালয়, ১৪৭।এ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ পুস্তকখানি গীতার প্রথম অধ্যায়ের শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ এবং বিস্তৃত ভাষ্য। গীতার অনেকগুলি টিকা পুস্তক আছে, কিন্তু এ পুস্তকখানি যে তাহাদের মধ্যে নিজস্ব একটি স্থান করিয়া লইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মত স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-চিত্তকে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের অরণ্যে দিশাহারা না করিয়া বর্ত্তমান ভাষ্যকার গীতার প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং টিপ্পনীগুলি স্মরণ রাখিয়া নিজের চিন্তা এবং ধারণা প্রসূত ব্যাখ্যা এমন মুক্ত ভাবে দিয়া গিয়াছেন যাহাতে পাঠকের চিন্তা-বৃত্তিকে ব্যাহত না করিয়া উত্তেজিত করে। একজনকে কোনো বিষয়ে সহজ ভাবে ভাবিতে দেখিলে নিজেদেরও ভাবিবার একটা প্রবৃত্তি আসে; পক্ষান্তরে, পরের ভাবনার দ্বারা কাহাকেও বিড়ম্বিত দেখিলে চিন্তা-শক্তি সেখানে প্রতিহত হয়। আদি কারণ মৌলিক একটি মাত্র শক্তিকে স্বীকার করিয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়মে নিলয় হওয়াই নির্ব্বাণ মুক্তি, বেদান্ত সাঙ্খ্য বৈষ্ণব-শাস্ত্র এবং তন্ত্রের সমন্বয়ে প্রতিপন্ন এই মত বর্ত্তমান ব্যাখ্যার মূল সূত্র হইবে, এমন ইঙ্গিত অবতরণিকায় দেওয়া হইয়াছে। বই খানিতে কিন্তু কোনো কোনো স্থানে বানান ভুল এবং শব্দ ব্যবহার বিষয়ে প্রাদেশিকতা দোষ আছে। ভাষাও স্থলে স্থলে দুরূহ-শব্দ-ভারাক্রান্ত এবং জটিল হইয়াছে। ভবিষ্যতে লেখক এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি গীতার প্রথম অধ্যায়েই শেষ। খণ্ডে খণ্ডে বাহির করিয়া সমগ্র গীতা এই ভাবে শেষ করা পরিশ্রম এবং ·· ·ধ্য। আশা করি লেখক মহাশয় সর্ব্বসাধারণের নিক· হ··ত এ বিষয়ে সহানুভূতি এবং সহায়তা পাইবেন।

গীত মঞ্জরী—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। ১২৬ পৃষ্ঠা মূল্য আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানি স্বরলিপির বই। মীরাবাই, সুরশ্যাম, তুলসীদাস, কবীর, অনুবর, চন্দনচৌবে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম ও গ্রন্থকার রচিত ৬০খানি গানের স্বরলিপি এ পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। বইখানি পরীক্ষা করিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। বৈচিত্র্য হিসাবে গানগুলির নির্ব্বাচন ভাল হইয়াছে—বিশেষত পণ্ডিত ভাতখণ্ডে জীর ১৫খানি বিভিন্ন রাগিণীর লক্ষণ-গীতি বইখানিকে মূল্যবান করিয়াছে। গ্রন্থখানি সঙ্গীত-রসলিপ্সু সমাজে আদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনাগত—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজী ১৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের দুঃখ-দৈন্য-অধীনতার উপর স্থাপিত ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া লিখিত এ একখানি উপন্যাস। মোটের উপর বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ভাষা সুন্দর, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, কথোপকথন কৌতুহলোদ্দীপক। কিন্তু কয়েকস্থলে, ইংরাজীতে যাহাকে বলে sensational, তাহা উপন্যাস খানির মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে নরেশ ও অনিন্দিতার দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে চিরাগত প্রথানুযায়ী যথাকালে কিশোরের আবির্ভাব এবং নরেশকে আক্রমণ। নরেশ যখন 'জানু পাতিয়া' 'মিনতি কাতরকণ্ঠে' অনিন্দিতাকে প্রেম নিবেদন করিয়া বলিতেছে, "আমাকে বিশ্বাস কর, অনিন্দিতা। আমি তোমাকে ভালবাসি, এই দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণু দিয়ে ভালবাসি।" তখন নরেশের নিজ গুপ্ত দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া তাহার প্রতি অনিন্দিতার অপরিসীম ঘৃণা হইতে পারে—কিন্তু তাহাকে 'বিশ্বাসঘাতক!

হীন কাপুরুষ! অসহায়া নারীকে একাকী পেয়ে'—বলা সত্যসত্যই sensational। এমন কি উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে আলিপুর জেলে মোহিত ও প্রতিমার কথোপকথনের মধ্যেও কোনো কোনো স্থলে sensational element আছে। তৎসত্ত্বেও এ উপন্যাসখানি সুলিখিত, এবং সেইজন্য ভবিষ্যতে লেখকের নিকট হইতে আমরা সুন্দরতর সৃষ্টির প্রত্যাশা রাখি।

হালুম বুড়ো—শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য দশ আনা। ৯১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এখানি ছেলেদের জন্য রচিত একটি সচিত্র কবিতার বই। অধিকাংশ কবিতাই বর্ষা-বৃষ্টি লইয়া রচিত ;—কবি যে জলদজালের পক্ষপাতী তাহা শিশুদের কানেও বলিয়াছেন। শেষ কবিতা 'ঝুপ্-ঝুপ্ বরষা'র 'চুপচাপ নিঝঝুম প'ড়ে থাকা নাহি ঘুম, শুধু শোনা ঝুপ্ঝুপ্ বরষা' শুধু শিশুদের নয়, শিশুর পিতাদের কানেও আরাম দেয়। উপস্থিত বর্ষাকালে একখানি করিয়া হালুম বুড়ো পাইয়া ছেলে মেয়েরা যদি কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে ত' মন্দ হয় না।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—বৈশাখ ১৩৩৫—নববর্ষের প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বাঙ্গলার এই পত্রিকা-খানি বাঙ্গালীর সঙ্গীত বিদ্যার নিদর্শন। এই বিশেষ সংখ্যার মর্য্যাদা-বৃদ্ধি করিয়াছে বাঙ্গলার খ্যাতনামা লেখক লেখিকা, ওস্তাদ ও গুণী-মণ্ডলীর সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও স্বরলিপি এবং গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি।

বাঙ্গালার সঙ্গীতের একমাত্র মাসিক পত্রিকাখানির উন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

নানাকথা

বর্ত্তমান সংখ্যায় বিচিত্রার দ্বিতীয় বর্ষের সূত্রপাত হ'ল। নূতনের যা বিপদ, তা থেকে বিচিত্রা রক্ষা পায় নি—অনেক ঝঞ্ঝা এর মাথার উপর দিয়ে গেছে, অনেক দুর্য্যোগ একে কাটাতে হয়েচে। কিন্তু আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে বর্ষা বাদলের মধ্যে যার জন্ম সে শুধু বজ্রই পায় না, বর্ষণও পায়। তাই যে-সব লেখক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠকের স্নেহধারা লাভ ক'রে এই অল্প দিনের মধ্যেই বিচিত্রা মঞ্জরিত হয়েচে, তাঁদেরই অনুগ্রহে সে যে অচিরে পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হবে এ আশা আমরা করি। আমাদের পক্ষ থেকে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেচে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এবং সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে আমরা দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হলাম।

* * * *

শারীরিক অসুস্থতা বশত অক্সফোর্ডে গিয়ে হিবার্ট লেক্‌চার দেওয়া এক বৎসরের জন্যে পিছিয়ে দিয়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিংহল থেকে দেশে ফিরে আসচেন। মাদ্রাজ হ'য়ে তিনি মাদুরায় পৌঁছেচেন; কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় পৌঁছবেন। বিশেষ সুখের বিষয়, উপস্থিত তিনি কিছু ভাল আছেন।

ওমর খৈয়ামের কবি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত সনেট নামে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক এই মাসেই প্রকাশিত হবে। সনেটগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাক্‌বে,—ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ন এবং ইংরাজি পদ্ধতির। বই খানির উৎসর্গ শেষে কবি বলেছেন,

> "চাঁপার কলি আঁকা মৃণাল ভুজে যার,
> রাতুল পদতল যে দেবী প্রতিমার;
> তাহারে স্মরি' আজ এনেছে কবি তার
> অর্ঘ্য রচি' এই বিফল সাধনার!"

ছাপাখানার গর্ভে এ বইখানি যাদের দেখবার সুযোগ হয়েচে, বিনয়-বচন সত্যকে অতিক্রম ক'রে কতদূর যেতে পারে তা দেখে তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে।

* * * *

'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে গত পৌষের 'বিচিত্রা'তে প্রকাশিত শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় লিখিত "জমা-খরচ" নামক গল্পটী 'ইণ্ডিয়ান ব্রড্‌কাষ্টিং কোং' কর্ত্তৃক 'রেডিও'তে অভিনীত হইয়াছিল। অতঃপর বৈশাখের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত তাঁহার "কবির সাধনা" গল্পটী উক্ত কোম্পানী পুনরায় 'ব্রড-কাষ্ট' করিবার আয়োজন করিতেছেন।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta.
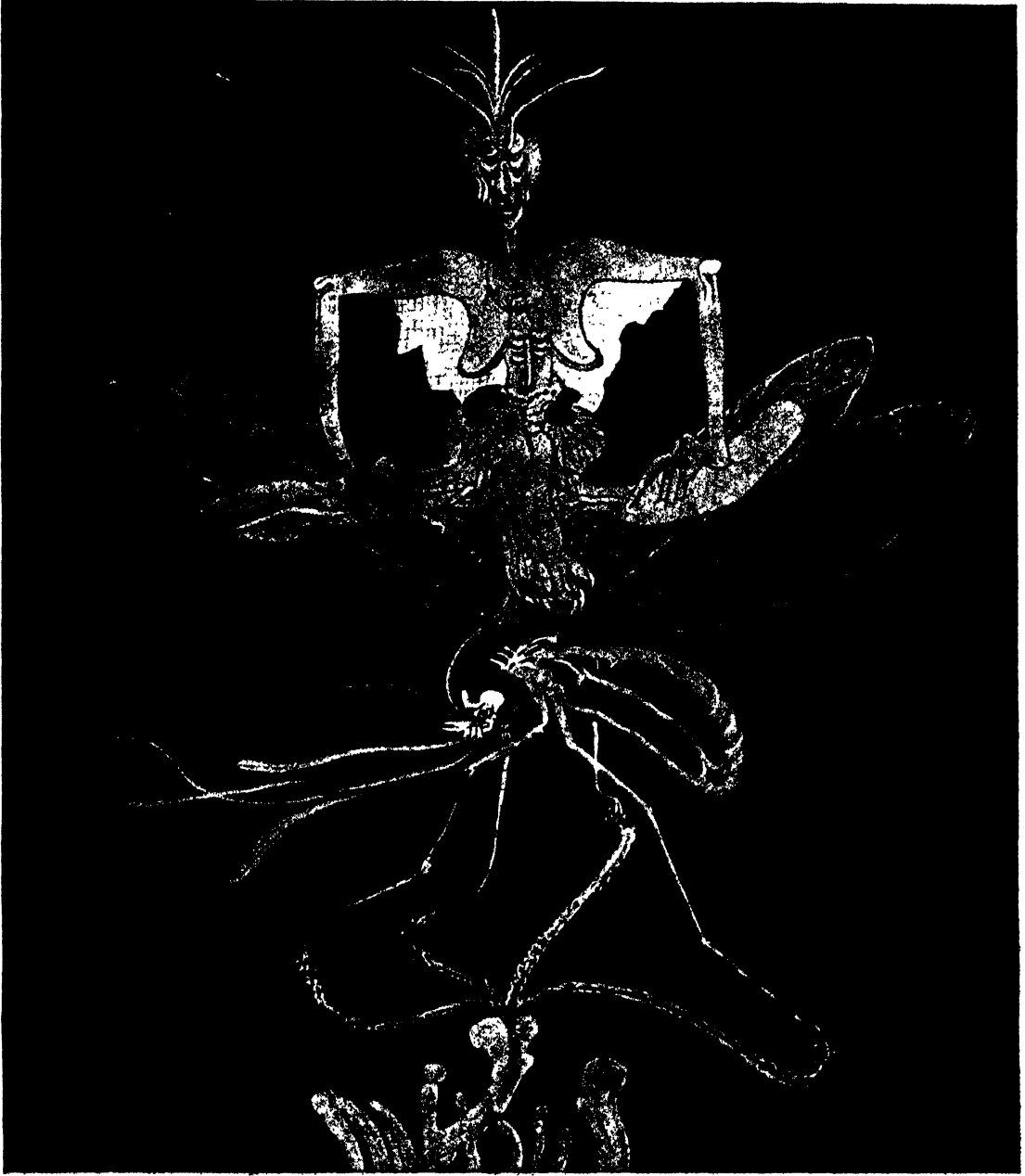
মশকবাহিনী ম্যালেরিয়া

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রঞ্জিত

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৩৫ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আশীর্বাদ

কল্যাণীয়াসু

সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে
যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে;
হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল শুভ্রতার
দিয়েছে দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার।

এই আশীর্বাদ, বৎসে, আমার গোপন অন্তঃপুরে
ছন্দের নন্দনবন সৃষ্টি কর সুধাস্নিগ্ধ সুরে;
বাণীর নন্দিনী তুমি, প্রিয়জনে কর আনন্দিত,
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক্ গানের অমৃত॥

— ॥ —

শ্রীর

শান্তিনিকেতন
২২ ভাদ্র ১৩৩০

কবির প্রতি

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

তুমি চিনিবেনা মোরে,
হে যশস্বী, তোমার সকাশে
কত লোক আসে যায়—ভারে ভারে ভক্তি-অর্ঘ্য আসে,
কত ফুল কত মালা, কত গান কত কবিতায়
তোমারে পূজিছে সবে, বিরাজিছ দীপ্ত মহিমায়
আপনার সিংহাসনে ;
আমি কোন্ ক্ষুদ্র ধূলিকণা,
কোথায় মিলায়ে আছি, আপনারে আপনি চিনি না,
কেমনে চিনিবে তুমি !

জানি মনে আমার এ ভুল
নিমেষে ভাঙ্গিয়া যাবে, মরুভূমে ফুটিবে না ফুল,
তবু মনে এ কি আশা ! একবার ক্ষণিকের তরে
মনে হয়—সাধ যায়—একবার চিনাতে আমারে
তোমার নয়ন তলে, খুলে দিয়ে মরমের দ্বার
প্রাণ খুলে ব'লে আসি—ওগো কবি, চাও একবার
ধূলিম্লান গৃহ কোণে। সেথা ক্ষুদ্র মৌন মুগ্ধ হিয়া
তোমারি একান্ত ভক্ত, দূর হ'তে ফিরিছে চাহিয়া
একটু করুণা কণা। বঙ্গবধূ, সরম-কুণ্ঠিতা,
তোমারে দেখেনি কভু—তবু সে যে চিরপরিচিতা
গানের মাঝারে তব।—তাহার প্রথম পরিচয়
তোমার সুরের সাথে, সে তো দেব, আজিকার নয় ;
বিগত বরষ কত, তখন সে গগনের 'পর
উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন রবি—উদিয়াছ প্রদীপ্ত ভাস্কর
উজলিয়া চারিদিক,

কবির প্রতি

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

ছোট আমি জননীর বুকে
মাথা রেখে মুগ্ধ-নেত্রে চেয়ে মা'র স্বপ্নময় মুখে
কত ছড়া শুনিতাম, কত ঘুম-পাড়ানিয়া গান
প্রাণে দিয়ে যেত সাড়া।
'কে মা কবি?' শুধাতাম নাম,
গৌরবে ভরিত বুক, সম্ভ্রমেতে নত করি শির
যুক্ত-করে মনে মনে অঞ্জলি দিতাম ভকতির।
হে কবি, সেদিন হ'তে শৈশবের সেই সে প্রভাতে
তোমায় আমায় দেখা, চোখে নয়—হৃদয়ের সাথে
হ'য়ে আছে পরিচয়। তুমি কোথা রাজ-সিংহাসনে
নিতি নব নব সুরে গান গাও আপনার মনে,
মুগ্ধ করি চারিদিক; দিকে দিকে প'ড়ে গেল সাড়া,
বিদেশী সঁপিল অর্ঘ্য—সে গানেতে হ'য়ে আত্মহারা
লুটাল চরণে বিশ্ব।

আমি হেথা আঁধার কুটিরে,
অন্তরালে পূজিলাম আনন্দের সুখ-অশ্রু-নীরে;
তুমি জানিলে না তাহা? না না সে সম্ভব কভু নয়,
নাহি বটে উপচার, তবু সেতো হীন কিছু নয়
সকল পূজার চেয়ে, ছিল তা'তে অম্লান কুসুম,
ছিল বঙ্গ-বালিকার হৃদয়ের ভক্তি অনুপম,
আজন্মের শ্রদ্ধারাশি, ছিল অকথিত ভালবাসা,
সে পূজা পাওনি তুমি? সে কী তবে আমারি দুরাশা—
আমারি মনের ভুল?

তাই হোক্—তবে তাই হোক্
তোমার করুণা লভি' জাগিয়া উঠুক সপ্তলোক;
আমি একা রব দূরে, দূর হ'তে রব শুধু চেয়ে,
মনেরে সান্ত্বনা দিব— আমি এই বাঙ্গালারি মেয়ে,
যে দেশের কবি তুমি; এ বাতাস—এ আকাশ-আলো
তোমারে পরশ করে, আমারেও বাসে এরা ভালো,
গভীর নিবিড় স্নেহে।

এত কাছে—তবু কেন দূরে ?
কেন দেখা দাওনাকো—ডাকনাকো স্নেহময় সুরে
মুছায়ে এ অভিমান !
ছোট আমি ? কিবা তার ক্ষতি ?
তপনের আলো এসে পড়ে না কি সবাকার প্রতি ?
আমি কি মানুষ নই ?
না, না, এ কি প্রলাপ আমার !
বাঙ্গালার বধূ আমি—এর বেশী নাহি অধিকার
কাছে গিয়ে দাঁড়াবার ; চুপে চুপে গৃহ কোণ থেকে
তোমারে প্রণাম করি—মনে মনে ফিরি' ডেকে ডেকে,
সেই মোর সার্থকতা।
যদি পায়ে ক'রে থাকি দোষ
ছাই ভস্ম যা' তা' লিখে, ক্ষমা কোর, কোরনাকো রোষ,
প্রথম এই অপরাধ,—এই শেষ।

হে কবি, প্রণাম,
কোথায় বিস্মৃতি স্রোতে—ভেসে যাবে 'কল্পনার' নাম !

'কবির প্রতি' এই ঐকান্তিক দক্ষিণা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কবির "আশীর্ব্বাদ" লাভে সমর্থ হইয়াছিল। পুষ্প ও ফলের মত, "কবির প্রতি" ও "আশীর্ব্বাদে"র ইহাই নিবিড় যোগ। বিঃ সঃ

—উপন্যাস—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১
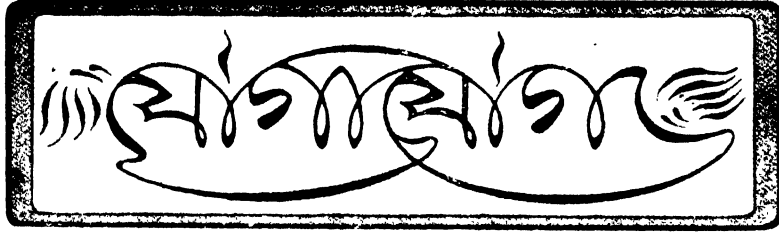
মধুসূদনের মন থেকে মস্ত একটা ভার গেল নেমে, আত্মগৌরবের ভার—যে কঠোর গৌরব-বোধ ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলি পাথর চাপা দিয়েচে। কুমুর প্রতি ওর মন যখন মুগ্ধ তখনো সেই বিহ্বলতার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে চলেছিল লড়াই। যতই অনন্যগতি হ'য়ে কুমুর কাছে ধরা দিয়েচে, ততই নিজের অগোচরে কুমুর 'পরে ওর ক্রোধ জমেচে। এমন সময়ে স্বয়ং নক্ষত্রদের কাছ থেকে যখন আদেশ এলো যে লক্ষ্মী এসেচেন ঘরে, তাঁকে খুসি করতে হবে, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে ওর দেহ মন যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল; বারবার আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগ্‌ল,—লক্ষ্মী, আমারি ঘরে লক্ষ্মী, আমার ভাগ্যের পরম দান। ইচ্ছে করতে লাগল, এখনি সমস্ত সঙ্কোচ ভাসিয়ে দিয়ে কুমুর কাছে স্তুতি জানিয়ে আসে, ব'লে আসে, 'যদি কোনো ভুল ক'রে থাকি, অপরাধ নিয়োনা।' কিন্তু আজ আর সময় নেই, ব্যবসায়ের ভাঙন সারবার কাজে এখনি আপিসে ছুট্‌তে হবে, বাড়িতে খেয়ে যাবার অবকাশ পর্য্যন্ত জুটল না।

এদিকে সমস্ত দিন কুমুর মনের মধ্যে তোলপাড় চলেচে। সে জানে কাল দাদা আসবেন, শরীর তাঁর অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাটা সহজ হবে কি না নিশ্চিত জানবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে। নবীন কোথায় কাজে গেছে, এখনো এলনা। সে নিঃসন্দেহ জানত আজ স্বয়ং মধুসূদন এসে বৌরাণীকে সকল রকমে প্রসন্ন করবে; আগে ভাগে কোনো আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করতে চায় না।

আজ ছাতে বসবার সুবিধা ছিল না। কাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ ক'রে আছে, আজ দুপুর থেকে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি সুরু হ'ল। শীতকালের বাদলা, অনিচ্ছিত অতিথির মতো। মেঘে রং নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মন-মরা, সূর্য্যালোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সঙ্কুচিত। সিঁড়ি থেকে উঠেই—শোবার ঘরে ঢোকবার পথে যে ঢাকা ছাদ আছে সেই খানে কুমু মাটিতে ব'সে। থেকে থেকে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট আস্‌চে। আজ এই ছায়া-ম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হ'ল তার নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলে ফেলেছে, তারি ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটু মাত্র ফাঁক নেই। যে দেবতা ওকে ভুলিয়ে আজ এই নিরুপায় নৈরাশ্যের মধ্যে এনে ফেল্‌লে তার উপরে যে অভিমান ওর মনে ধোঁয়াচ্ছিল আজ সেটা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠ্‌ল। হঠাৎ দ্রুত উঠে পড়ল। ডেস্ক খুলে বের করলে সেই যুগল রূপের পট। রঙীন রেশমের ছিট দিয়ে সেটা মোড়া। সেই পট আজ ও নষ্ট ক'রে ফেলতে চায়। যেন চীৎকার ক'রে বলতে চায়, তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করিনে। হাত কাঁপচে, তাই গ্রন্থি খুল্‌তে পারচে না; টানাটানিতে সেটা আরো আঁট হ'য়ে উঠ্‌ল, অধীর হ'য়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। অমনি চিরপরিচিত সেই মূর্ত্তি অনাবৃত হ'তেই

আর সে থাকতে পারলে না ; তাকে বুকে চেপে ধ'রে কেঁদে উঠ্‌ল। কাঠের ফ্রেম বুকে যত বাজে ততই আরো বেশী চেপে ধরে।

এমন সময়ে শোবার ঘরে এল মুরলী বেহারা বিছানা করতে। শীতে কাঁপচে তার হাত। গায়ে একখানা জীর্ণ ময়লা র‍্যাপার। মাথায় টাক, রগ টেপা, গাল বসা, কিছু কালের না-কামানো কাঁচা পাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হ'য়ে উঠেচে। অনতিকাল পূর্ব্বেই সে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিল, শরীরে রক্ত নেই বল্‌লেই হয়, ডাক্তার বলেছিল কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে যেতে, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি।

কুমু বল্‌লে, "শীত করচে, মুরলী ?"

"হাঁ মা, বাদল ক'রে ঠাণ্ডা পড়েচে।"

"গরম কাপড় নেই তোমার ?"

"খেতাব পাবার দিনে মহারাজা দিয়েছিলেন, নাতীর খাঁসির বেমারী হ'তেই ডাক্তারের কথায় তাকে দিয়েচি মা।"

কুমু একটি পুরোনো ছাই রঙের আলোয়ান পাশের ঘরের আলমারি থেকে বের ক'রে এনে বল্‌লে "আমার এই কাপড়টি তোমাকে দিলুম।"

মুরলী গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লে, "মাপ করো, মা, মহারাজা রাগ করবেন।"

কুমুর মনে পড়ে গেল এ বাড়ীতে দয়া করবার পথ সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের জন্যেও যে ওর দয়া চাই, পুণ্য-কর্ম্ম তারি পথ। কুমু ক্ষোভের সঙ্গে আলোয়ানটা মাটিতে ফেলে দিলে।

মুরলী হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "রাণীমা, তুমি মা লক্ষ্মী, রাগ কোরো না। গরম কাপড়ে আমার দরকার হয় না। আমি থাকি হুঁকাবরদারের ঘরে, সেখানে গামলায় গুলের আগুন, আমি বেশ গরম থাকি।"

কুমু বল্‌লে, "মুরলী, নবীন ঠাকুরপো যদি বাড়ি এসে থাকেন তাঁকে ডেকে দাও।"

নবীন ঘরে ঢুকতেই কুমু বল্‌লে, "ঠাকুরপো, তোমাকে একটি কাজ করতেই হবে। বলো, করবে ?"

"নিজের অনিষ্ট যদি হয় এখনি করব, কিন্তু তোমার অনিষ্ট হ'লে কিছুতেই করব না।"

"আমার আর কত অনিষ্ট হবে ? আমি ভয় করিনে।" ব'লে নিজের হাত থেকে মোটা সোনার বালা জোড়া খুলে বল্‌ল, "আমার এই বালা বেচে দাদার জন্যে স্বস্ত্যয়ন করাতে হবে।"

"কিছু দরকার হবে, না, বৌরাণী, তুমি তাঁকে যে ভক্তি করো তারি পুণ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর জন্যে স্বস্ত্যয়ন হচ্চে।"

"ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই করতে পারব না। কেবল যদি পারি দেবতার দ্বারে তাঁর জন্যে সেবা পৌঁছিয়ে দেব।"

"তোমাকে কিছু করতে হবেনা, বৌরাণী। আমরা সেবক আছি কি করতে ?"

"তোমরা কি করতে পারো বলো ?"

"আমরা পাপিষ্ঠ পাপ করতে পারি। তাই করেও যদি তোমার কোনো কাজে লাগি তা' হ'লে ধন্য হ'ব।"

"ঠাকুরপো, একথা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না।"

"একটুও ঠাট্টা নয়। পুণ্য করার চেয়ে পাপ করা অনেক শক্ত কাজ, দেবতা যদি তা' বুঝতে পারেন তা' হ'লে পুরস্কার দেবেন।"

নবীনের কথার ভাবে দেবতার প্রতি উপেক্ষা কল্পনা ক'রে কুমুর মনে স্বভাবত আঘাত লাগতে পারত, কিন্তু তার দাদাও যে মনে মনে দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না, এই অভক্তির 'পরে সে রাগ করতে পারে না যে। ছোট ছেলের দুষ্টুমির পরেও মায়ের যেমন সকৌতুক স্নেহ, এই রকম অপরাধের পরে ওরও সেই ভাব।

কুমু একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পারো ; আমাদের যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কি ক'রে ? দিন যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাইনে। আমাদের কি দয়া করবার কোথাও কেউ নেই ?"

নবীনের চোখ জলে ভেসে উঠ্‌ল।

"দাদাকে উদ্দেশ ক'রে আমাকে কিছু করতেই হবে ঠাকুরপো, কিছু দিতেই হবে। এই বালা আমার মায়ের,

সেই আমার মায়ের হ'য়েই এ বালা আমার দেবতাকে আমি দেবো।"

"দেবতাকে হাতে ক'রে দিতে হয় না বৌরাণী, তিনি এমনি নিয়েচেন। দুদিন অপেক্ষা করো, যদি দেখ তিনি প্রসন্ন হন নি, তা' হ'লে যা' বলবে তাই করব যে-দেবতা তোমাকে দয়া করেন না তাঁকেও ভোগ দিয়ে আসব।"

রাত্রি অন্ধকার হ'য়ে এল—বাইরে সিঁড়িতে ঐ সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। নবীন চমকে উঠ্‌ল, বুঝলে দাদা আসচে। পালিয়ে গেল না, সাহস ক'রে দাদার জন্যে অপেক্ষা ক'রেই রইল। এদিকে কুমুর মন এক মুহূর্ত্তে নিরতিশয় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এই অদৃশ্য বিরোধের ধাক্কাটা এমন প্রবল বেগে যখন তার প্রত্যেক নাড়ীকে চমকিয়ে তুল্‌লে বড়ো ভয় হোলো। এ পাপ কেন তাকে এত দুর্জ্জয় বলে পেয়ে বসেচে ?

হঠাৎ কুমু নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, কাউকে জানো যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারেন ?"

"কি হবে বৌরাণী ?"

"নিজের মনকে নিয়ে যে পেরে উঠ্‌চিনে।"

"সে তোমার মনের দোষ নয়।"

"বিপদটা বাইরের, দোষটা মনের, দাদার কাছে এই কথা বার বার শুনেচি।"

"তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন—ভয় করো না।"

"সেদিন আমার আর আসবে না।"

মধুসূদনের বিষয় বুদ্ধির সঙ্গে তার ভালোবাসার আপোষ হ'য়ে যেতেই সেই ভালোবাসা মধুসূদনের সমস্ত কাজ কর্ম্মের উপর দিয়েই যেন উপ্‌চে ব'য়ে যেতে লাগ্‌ল। কুমুর সুন্দর মুখে তার ভাগ্যের বরাভয় দান। পরাভবটি কেটে যাবে আজই পেলো তার আভাস। কাল যারা বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল আজ তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ সুর ফিরিয়ে ওকে চিঠি লিখেচে। মধুসূদন যেই তালুকটা নিজের নামে কিনে নেবার প্রস্তাব করলে অমনি কারো কারো মনে হ'ল ঠকলুম বুঝি। কেউ কেউ এমনো ভাব প্রকাশ করলে যে কথাটা আর একবার বিচার করা উচিত।

গরহাজির অপরাধে আপিসের দরোয়ানের অর্দ্ধেক মাসের মাইনে কাটা গিয়েছিল, আজ টিফিনের সময় মধুসূদনের পা জড়িয়ে ধরবামাত্র মধুসূদন তাকে মাপ ক'রে দিলে। মাপ করবার মানে নিজের পকেট থেকে দরোয়ানের ক্ষতিপূরণ। যদিচ খাতায় জরিমানা র'য়ে গেল ; নিয়মের ব্যত্যয় হবার জো নেই।

আজকের দিনটা মধুর পক্ষে বড়ো আশ্চর্য্যের দিন। বাইরে আকাশটা মেঘে ঘোলা, টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়চে, কিন্তু এতে ক'রে ওর ভিতরের আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিলে। আপিস থেকে ফিরে এসে রাত্রে আহারের সময়ের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত মধুসূদন বাইরের ঘরে কাটাত। বিয়ের পরে কয়দিন অসময়ে নিয়মের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে যাবার বেলায় লোকের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করেচে। আজ সশব্দ পদক্ষেপে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে যেন জানিয়ে দিতে চাইলে, যে সে চলেচে কুমুর সঙ্গে দেখা করতে। আজ বুঝেচে পৃথিবীর লোকে ওকে ঈর্ষা করতে পারে এতবড়ো ওর সৌভাগ্য।

খানিকক্ষণের জন্যে বৃষ্টি ধ'রে গেছে। তখনো সব ঘরে আলো জ্বলেনি। আন্দিবুড়ী ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে বেড়াচ্চে ; একটা চামচিকে উঠানের উপরের আকাশ থেকে লণ্ঠন-জ্বালা অন্তঃপুরের পথ পর্য্যন্ত কেবলি চক্রপথে ঘুরচে। বারান্দায় পা মেলে দিয়ে দাসীরা উরুর উপরে প্রদীপের সল্‌তে পাকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে ঘোমটা টেনে দৌড় দিলে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শ্যামাসুন্দরী, হাতে বাটাতে ছিল পান। মধুসূদন আপিস থেকে এলে নিয়ম মতো এই পান সে বাইরে পাঠিয়ে দিত। সবাই জানে, ঠিক মধুসূদনের রুচির মতো পান শ্যামাসুন্দরীই সাজতে পারে ; এইটে জানার মধ্যে আরো কিছু একটু জানার ইসারা ছিল। সেই জোরে পথের মধ্যে শ্যামা মধুর সামনে বাটা খুলে ধ'রে বল্‌লে, "ঠাকুর পো, তোমার পান সাজা আছে, নিয়ে যাও।" আগে হ'লে এই উপলক্ষে দুটো একটা কথা হ'ত, আর সেই কথায় অল্প একটু মধুর রসের আমেজও লাগ্‌ত। আজ কি হ'ল কে জানে, পাছে দূর থেকেও শ্যামার ছোঁয়াচ লাগে সেইটে

এড়িয়ে পান না নিয়ে মধুসূদন দ্রুত চ'লে গেল। শ্যামার বড়ো বড়ো চোখ দুটো অভিমানে জ্ব'লে উঠ্‌ল, তা'রপরে ভেসে গেল অশ্রুজলের মোটা মোটা ফোঁটায়। অন্তর্যামী জানেন শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে ভালোবাসে।

মধুসূদন ঘরে ঢুকতেই নবীন কুমুর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "গুরুর কথা মনে রইল, খোঁজ ক'রে দেখ্‌ব।" দাদাকে বল্‌লে, "বৌরাণী গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্র উপদেশ শুন্‌তে চান। আমাদের গুরুঠাকুর আছেন, কিন্তু—"

মধুসূদন উত্তেজনার স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "শাস্ত্র উপদেশ! আচ্ছা সে দেখ্‌ব এখন, তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

নবীন চ'লে গেল।

মধুসূদন আজ সমস্ত পথ মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এসেছিল, "বড়ো বৌ, তুমি এসেচ আমার ঘর আলো হ'য়েচে।" এরকম ভাবের কথা বলবার অভ্যাস ওর একেবারেই নেই। তাই ঠিক করেছিল, ঘরে ঢুকেই দ্বিধা না ক'রে প্রথম ঝোঁকেই সে বল্‌বে। কিন্তু নবীনকে দেখেই কথাটা গেল ঠেকে। তার উপরে এল শাস্ত্র উপদেশের প্রসঙ্গ, ওর মুখ দিলে একেবারে বন্ধ ক'রে। অন্তরে যে আয়োজনটা চল্‌ছিল, এই একটুখানি বাধাতেই নিরস্ত হ'য়ে গেল। তারপরে কুমুর মুখে দেখলে একটা ভয়ের ভাব, দেহ মনের একটা সঙ্কোচ। অন্যদিন হ'লে এটা চোখে পড়ত না। আজ ওর মনে যে একটা আলো জ্বলেচে তাতে দেখবার শক্তি হ'য়েছে প্রবল, কুমু সম্বন্ধে চিত্তের স্পর্শবোধ হ'য়েছে সূক্ষ্ম। আজকের দিনেও কুমুর মনে এই বিমুখতা— এটা ওর কাছে নিষ্ঠুর অবিচার ব'লে ঠেকল। তবু মনে মনে পণ করলে বিচলিত হবে না, কিন্তু যা' সহজে হ'তে পারত সে আর সহজ রইল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে মধুসূদন বল্‌লে, "বড়ো বৌ, চ'লে যেতে ইচ্ছে করচ? একটুখন থাক্‌বে না?"

মধুসূদনের কথা আর তার গলার স্বর শুনে কুমু বিস্মিত। বল্‌লে, "না, যাব কেন?"

"তোমার জন্যে একটি জিনিষ এনেচি খুলে দেখ।" ব'লে তার হাতে ছোট একটি সোনার কৌটো দিলে।

কৌটো খুলে কুমু দেখ্‌লে দাদার দেওয়া সেই নীলার আংটি। বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠ্‌ল, কি করবে ভেবে পেল না।

"এই আংটি তোমায় পরিয়ে দিতে দেবে?"

কুমু হাত বাড়িয়ে দিলে। মধুসূদন কুমুর হাত কোলের উপর ধ'রে খুব আস্তে আস্তে আংটি পরাতে লাগল। ইচ্ছে ক'রেই সময় নিলে একটু বেশি। তারপরে হাতটি তুলে ধ'রে চুমো খেলে, বল্‌লে, "ভুল করেছিলুম তোমার হাতের আংটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে কোনো দোষ নেই।"

কুমুকে মারলে এর চেয়ে কম বিস্মিত হ'ত। ছেলে-মানুষের মতো কুমুর এই বিস্ময়ের ভাব দেখে মধুসূদনের লাগ্‌ল ভালো। দানটা যে সামান্য নয় কুমুর মুখভাবে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু মধুসূদন আরো কিছু হাতে রেখেচে, সেইটে প্রকাশ করলে; বল্‌লে, "তোমাদের বাড়ীর কালু মুখুজ্জে এসেচে, তাকে দেখ্‌তে চাও?"

কুমুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "কালুদা?"

"তাকে ডেকে দিই। তোমরা কথাবার্ত্তা কও, ততক্ষণ আমি খেয়ে আসিগে।"

কৃতজ্ঞতায় কুমুর চোখ ছল ছল ক'রে এল।

৪৩

চাটুজ্জে জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ। সমস্ত বিশ্বাসের কাজ এর হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়। এর কোনো এক পূর্ব্বপুরুষ চাটুজ্জেদের জন্যে জেল খেটেচে। কালু আজ বিপ্রদাসের হ'য়ে এক কিস্তি সুদ দিয়ে রসিদ নিতে মধুসূদনের আপিসে এসেছিল। বেঁটে, গৌরবর্ণ, পরিপুষ্ট চেহারা, ঈষৎ কটা ড্যাবড্যাবা চোখ, তার উপরে ঝুঁকে-পড়া রোমশ কাঁচাপাকা মোটা ভুরু, মস্ত ঘন পাকা গোঁফ অথচ মাথার চুল প্রায় কাঁচা, সযত্নে কোঁচান শান্তিপুরে ধুতিপরা এবং প্রভু-পরিবারের মর্য্যাদা রক্ষার উপযুক্ত পুরাণো দামী জামিয়ার গায়ে। আঙুলে একটা আংটি—তার পাথরটা নেহাৎ কম দামী নয়।

কালু ঘরে প্রবেশ করতে কুমু তাকে প্রণাম করলে। দুজনে বস্‌ল কার্পেটের উপর। কালু বল্‌লে, "ছোটো

খুকী, এইতো সেদিন চ'লে এলে, দিদি, কিন্তু মনে হচ্চে যেন কত বৎসর দেখিনি।"

"দাদা কেমন আছেন আগে বলো।"

"বড়ো বাবুর জন্যে বড়ো ভাবনায় কেটেচে। তুমি যেদিন চ'লে এলে তার পরের দিনে খুব বাড়াবাড়ি হ'য়েছিল। কিন্তু অসম্ভব জোরালো শরীর কিনা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সামলে নিলেন। ডাক্তাররা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে।"

"দাদা কাল আসচেন?"

"তাই কথা ছিল। কিন্তু আরো দুটো দিন দেরি হবে। পূর্ণিমা পড়েচে, সকলে তাঁকে বারণ করলে, কি জানি যদি আবার জ্বর আসে। সে যেন হোলো, কিন্তু তুমি কেমন আছ দিদি?"

"আমি বেশ ভালই আছি।"

কালু কিছু বল্‌তে ইচ্ছে করল না, কিন্তু কুমুর মুখের সেই লাবণ্য গেল কোথায়? চোখের নীচে কালি কেন? অমন চিকণ রঙ তার ফেকাশে হ'য়ে গেল কি জন্যে? কুমুর মনে একটা প্রশ্ন জাগ্‌চে, সেটা সে মুখ ফুটে বল্‌তে পারচে না,—"দাদা আমাকে মনে ক'রে কি কিছু ব'লে পাঠান নি?" তার সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরের মতোই যেন কালু বল্‌লে, "বড়ো বাবু আমার হাত দিয়ে তোমাকে একটি জিনিষ পাঠিয়েছেন।"

কুমু ব্যগ্র হ'য়ে বল্‌লে, "কি পাঠিয়েচেন, কই সে?"

"সেটা বাইরে রেখে এসেচি।"

"আন্‌লে না কেন?"

"ব্যস্ত হোয়োনা দিদি। মহারাজা বল্‌লেন তিনি নিজে নিয়ে আসবেন।"

"কি জিনিষ বলো আমাকে?"

"ইনি যে আমাকে বল্‌তে বারণ করলেন।" ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে কালু বল্‌লে, "বেশ আদর যত্নে তোমাকে রেখেচে—বড়ো বাবুকে গিয়ে বল্‌ব, কত খুসি হবেন। প্রথম দুদিন তোমার খবর পেতে দেরী হ'য়ে তিনি বড়ো ছট্‌ফট্‌ করেচেন। ডাকের গোলমাল হ'য়েছিল, শেষকালে তিনটে চিঠি এক সঙ্গে পেলেন।"

ডাকের গোলমাল হবার কারণটা যে কোনখানে কুমু তা আন্দাজ করতে পারলে।

কালুদাকে কুমু খেতে বল্‌তে চায়, সাহস করতে পারচে না। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, এখনো তোমার খাওয়া হয়নি।"

"দেখেচি, কলকাতায় সন্ধের পর খেলে আমার সহ্য হয় না, দিদি, তাই আমাদের রামসদয় কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ আনিয়ে খাচ্চি। বিশেষ কিছু তো ফল হোলো না।"

কালু বুঝেছিল, বাড়ির নতুন বৌ, এখনো কর্তৃত্ব হাতে আসেনি, মুখ ফুটে খাওয়াবার কথা বল্‌তে পারবে না, কেবল কষ্ট পাবে।

এমন সময় মোতির মা দরজার আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে কুমুকে ডেকে নিয়ে বল্‌লে, "তোমাদের ওখান থেকে মুখুজ্জে মশায় এসেচেন, তাঁর জন্যে খাবার তৈরি। নীচের ঘরে তাঁকে নিয়ে এসো, খাইয়ে দেবে।"

কুমু ফিরে এসেই বল্‌লে, "কালুদ, তোমার কবিরাজের কথা রেখে দাও, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।"

"কি বিভ্রাট! এ যে অত্যাচার! আজ থাক, না হয় আর একদিন হবে।"

"না, সে হবে না,—চলো।"

শেষকালে আবিষ্কার করা গেল, মকরধ্বজের বিশেষ ফল হয়েচে, ক্ষুধার লেশমাত্র অভাব প্রকাশ পেল না।

কালুদাদাকে খাওয়ান শেষ হ'তেই কুমু শোবার ঘরে চ'লে এল। আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতদিনে নুরনগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধরেচে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুর ধারের চাতালে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে—মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত, ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুর বেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগ্‌ত, জান্‌ত না তার অর্থ কি। সেই ব্যথায় সন্ধেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুর ধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হ'য়ে উঠেচে। বুঝতে পারেনি যে ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েচে মায়া মেলে, ওর যুগলরূপের উপাসনায় সেই করেচে লুকোচুরি, তাকেই টেনে

এনেচে ওর চিত্তের অলক্ষ্যপুরে এসরাজে মূলতানের মীড়ে মূর্চ্ছনায়। ওর প্রথম যৌবনের সেই না-পাওয়া মনের মানুষের কত আভাস ছিল ওদের সেখানকার বাড়ির কত জায়গায়, সেখানকার চিলে কোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেত গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন-লাগা শর্ষে ক্ষেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা, যেখানে ব'সে পাঁচিলের ছ্যাৎলাপড়া সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন্ পুরাতন বিস্মৃত-কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি,—দোতালায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে শাদা পালগুলো দেখতে পেত, দিগন্তের গায়ে গায়ে চলেছে যেন মনের নিরুদ্দেশ-কামনার মতো। প্রথম যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেচে কলকাতায় ওর পূজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে। সেই তো দৈবের বাণীর ভান ক'রে ওকে অন্ধভাবে এই বিবাহের ফাঁসের মধ্যে টেনে আনলে। অথচ প্রখর রৌদ্রে নিজে গেল মিলিয়ে।

ইতিমধ্যে মধুসূদন কখন পিছনে এসে দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় কুমুর মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলে কুমুর মন যেখানে হারিয়ে গেচে সেই অদৃশ্য অজানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিছুতেই চল্‌বে না। অন্য দিন হ'লে কুমুর এই আনমনা ভাব দেখলে রাগ হ'ত। আজ শান্ত বিষাদের সঙ্গে কুমুর পাশে এসে বস্‌ল; বল্‌লে, "কি ভাবচ বড় বউ?"

কুমু চম্‌কে উঠ্‌ল। মুখ ফেকাশে হ'য়ে গেল। মধুসূদন ওর হাত চেপে ধ'রে নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না?"

এ কথার উত্তর কুমু ভেবে পেলে না। কেন ধরা দিতে পারচে না সে প্রশ্ন ও যে নিজেকেও করে। মধুসূদন যখন কঠিন ব্যবহার করছিল তখন উত্তর সহজ ছিল, ও যখন নতি স্বীকার করে তখন নিজেকে নিন্দে করা ছাড়া কোনো জবাব পায় না। স্বামীকে মন প্রাণ সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হ'ল? মেয়েদের একটি মাত্র লক্ষ্য সতী সাবিত্রী হ'য়ে ওঠা। সেই লক্ষ্য হ'তে ভ্রষ্ট হওয়ার পরম দুর্গতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়—তাই আজ ব্যাকুল হ'য়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "তুমি আমাকে দয়া করো।"

"কিসের জন্যে দয়া করতে হবে?"

"আমাকে তোমার ক'রে নাও—হুকুম করো, শাস্তি দাও। আমার মনে হয় আমি তোমার যোগ্য নই।"

শুনে বড়ো দুঃখে মধুসূদনের হাসি পেল। কুমু সতীর কর্ত্তব্য করতে চায়। কুমু যদি সাধারণ গৃহিণী মাত্র হ'ত, তা' হ'লে এই টুকুই যথেষ্ট হ'ত, কিন্তু কুমু যে ওর কাছে মন্ত্র-পড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি, সেই বেশিটুকুকে পাবার জন্যে ও যতই মূল্য হাঁকচে সবই ব্যর্থ হচ্চে। ধরা পড়চে নিজের খর্ব্বতা। কুমুর সঙ্গে নিজের দুর্লঙ্ঘ্য অসাম্য ব্যাকুলতা কেবলি বাড়িয়ে তুলচে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মধুসূদন বল্‌লে, "একটি জিনিষ যদি দিই তো কি দেবে বল।"

কুমু বুঝতে পারলে দাদার দেওয়া সেই জিনিষ, ব্যগ্রতার সঙ্গে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"যেমন জিনিষটি তারই উপযুক্ত দাম নেব কিন্তু," ব'লে খাটের নীচে থেকে রেশমের খোল দিয়ে মোড়া একটি এসরাজ বের ক'রে তার মোড়কটি খুলে ফেল্‌লে। কুমুর সেই চিরপরিচিত এসরাজ, হাতির দাঁতে খচিত। বাড়ি থেকে চ'লে আসবার সময় এইটি ফেলে এসেছিল।

মধুসূদন বল্‌লে, "খুসি হয়েচতো। এইবার দাম দাও।"

মধুসূদন কি দাম চায় কুমু বুঝতে পারলে না, চেয়ে রইল। মধুসূদন বল্‌লে, "বাজিয়ে শোনাও আমাকে।"

এটা বেশি কিছু নয়, তবু বড়ো শক্ত দাবী। কুমু এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেচে যে মধুসূদনের মনে সঙ্গীতের রস নেই। এর সামনে বাজানোর সঙ্কোচ কাটিয়ে তোলা কঠিন। কুমু মুখ নীচু ক'রে এসরাজের ছড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মধুসূদন বললে, "বাজাও না বড়ো বৌ, আমার সামনে লজ্জা ক'রো না।"

কুমু বল্‌লে, "সুর বাঁধা নেই।"

"তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বলনা কেন?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথাটার সত্যতায় কুমুর মনে তখনি ঘা লাগ্‌ল ; বললে, "যন্ত্রটা ঠিক ক'রে রাখি, তোমাকে আরেক দিন শোনাব।"

"কবে শোনাবে ঠিক ক'রে বল। কাল ?"

"আচ্ছা, কাল।"

"সন্ধেবেলায় আপিস থেকে ফিরে এলে ?"

"হাঁ, তাই হবে।"

"এসরাজটা পেয়ে খুব খুসি হয়েচ ?"

"খুব খুসি হ'য়েছি।"

শালের ভিতর থেকে একটা চামড়ার কেস বের ক'রে মধুসূদন বল্‌লে, "তোমার জন্যে যে মুক্তার মালা কিনে এনেচি, এটা পেয়ে ততখানিই খুসি হবে না ?"

এমনতর মুস্কিলের প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করা ? কুমু চুপ ক'রে এসরাজের ছড়িটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"বুঝেচি, দরখাস্ত নামঞ্জুর।"

কুমু কথাটা ঠিক বুঝ্‌লে না।

মধুসূদন বললে, "তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেব ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তার আগেই ডিস্‌মিস্‌।"

কুমুর সামনে মেজের উপর গয়নাটা রইল খোলা। দুজনে কেউ একটিও কথা বললে না। থেকে থেকে কুমু যে রকম স্বপ্নাবিষ্ট হ'য়ে যায়, তেমনি হ'য়ে রইল। একটু পরে যেন সচেতন হ'য়ে মালাটা তুলে নিয়ে গলায় পরলে, আর মধুসূদনকে প্রণাম করলে। বল্‌লে, "তুমি আমার বাজনা শুন্‌বে ?"

মধুসূদন বললে, "হাঁ শুনব।"

"এখনি শোনাব," ব'লে এসরাজে সুর বাঁধলে। কেদারায় আলাপ আরম্ভ করলে ; ভুলে গেল ঘরে কেউ আছে, কেদারা থেকে পৌছল ছায়ানটে। যে গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধরল, "ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।" সুরের আকাশে রঙীন ছায়া ফেলে এলো সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েচে, প্রাণে পেয়েচে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন র'য়ে গেল—"ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।"

মধুসূদন সঙ্গীতের রস বোঝে না, কিন্তু কুমুর বিশ্ব-বিস্মৃত মুখের উপর যে সুর খেলছিল, এসরাজের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কুমুর আঙুল-ছোঁওয়ার যে ছন্দ নেচে উঠ্‌ছিল তাই তার বুকে দোল দিলে, মনে হ'তে লাগ্‌ল ওকে যেন কে বরদান করচে। আনমনে বাজাতে বাজাতে কুমু হঠাৎ একসময়ে দেখ্‌তে পেলে মধুসূদন তার মুখের উপর একদৃষ্টে চেয়ে, অমনি হাত গেল থেমে, লজ্জা এল, বাজনা বন্ধ ক'রে দিলে।

মধুসূদনের মন দাক্ষিণ্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "বড়ো বউ, তুমি কি চাও বলো।" কুমু যদি বল্‌ত, কিছুদিন দাদার সেবা করতে চাই, মধুসূদন তাতেও রাজি হ'তে পারত ; কেননা আজ কুমুর গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলি চেয়ে চেয়ে সে নিজেকে বলছিল, "এইতো আমার ঘরে এসেচে, এ কি আশ্চর্য্য সত্য।"

কুমু এসরাজ মাটিতে রেখে, ছড়ি ফেলে চুপ ক'রে রইল।

মধুসূদন আর একবার অনুনয় ক'রে বল্‌লে, "বড়ো বউ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।"

কুমু বল্‌লে, "মুরলী বেয়ারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।"

কুমু যদি বল্‌ত কিছু চাইনে, সেও ছিল ভালো, কিন্তু মুরলী বেহারার জন্যে গায়ের কম্বল! যে দিতে পারে মাথার মুকুট, তার কাছে চাওয়া জুতোর ফিতে!

মধুসূদন অবাক। রাগ হোলো বেহারাটার উপর। বললে, "লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত করচে ?"

"না, আমি আপনিই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিলনা। তুমি যদি হুকুম করো তবে সাহস ক'রে নেবে।"

মধুসূদন স্তব্ধ হ'য়ে রইল। খানিক পরে বললে, "ভিক্ষে দিতে চাও! আচ্ছা দেখি, কই তোমার আলোয়ান।"

কুমু তার সেই অনেক দিনের পরা বাদামী রঙের আলোয়ান নিয়ে এলো। মধুসূদন সেটা নিয়ে নিজের গায়ে জড়ালো। টিপায়ের উপরকার ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে একজন বুড়ি দাসী এল ; তাকে বল্‌লে, "মুরলী বেহারাকে ডেকে দাও।"

মুরলী এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালো ; শীতে ও ভয়ে তা'র জোড়া হাত কাঁপচে।

"তোমার মা-জি তোমাকে বকশিষ দিয়েচেন," ব'লে

মধুসূদন পকেট-কেস থেকে একশো টাকার একটা নোট বের ক'রে তার ভাঁজ খুলে সেটা দিলে কুমুর হাতে। এ রকম অকারণে অযাচিত দান মধুসূদনের দ্বারা জীবনে কখনো ঘটে নি। অসম্ভব ব্যাপারে মুরলী বেহারার ভয় আরো বেড়ে উঠ্‌ল, দ্বিধা কম্পিত স্বরে বল্‌লে, "হুজুর—"

"হুজুর কিরে বেটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যত খুসি গরম কাপড় কিনে নিস্‌।"

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হ'ল—সেই সঙ্গে সেদিনকার আর সমস্তই যেন শেষ হ'য়ে গেল। যে স্রোতে কুমুর মন ভেসেছিল সে গেল হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে, মধুসূদনের মনে আত্মত্যাগের যে ঢেউ চিত্তসঙ্কীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিল তাও সামান্য বেহারার জন্যে তুচ্ছ প্রার্থনায় ঠেকে গিয়ে আবার তলায় গেল নেমে। এর পরে সহজে কথাবার্ত্তা কওয়া দুই পক্ষেই অসাধ্য। আজ সন্ধের সময় সেই তালুক-কেনা ব্যাপার নিয়ে লোক এসে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করচে, এ কথাটা মধুসূদনের মনেই ছিল না। এতক্ষণ পরে চমকে উঠে ধিক্কার হ'ল নিজের উপরে। উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কাজ আছে, আসি।" দ্রুত চ'লে গেল।

পথের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর ঘরের সামনে এসে বেশ প্রকাশ্য কণ্ঠস্বরেই বললে, "ঘরে আছ?"

শ্যামাসুন্দরী আজ খায়নি; একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মেজেয় মাদুরের উপর অবসন্ন ভাবে শুয়েছিল। মধুসূদনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ঠাকুরপো?"

"পান দিলে না আমাকে?"

(ক্রমশঃ)
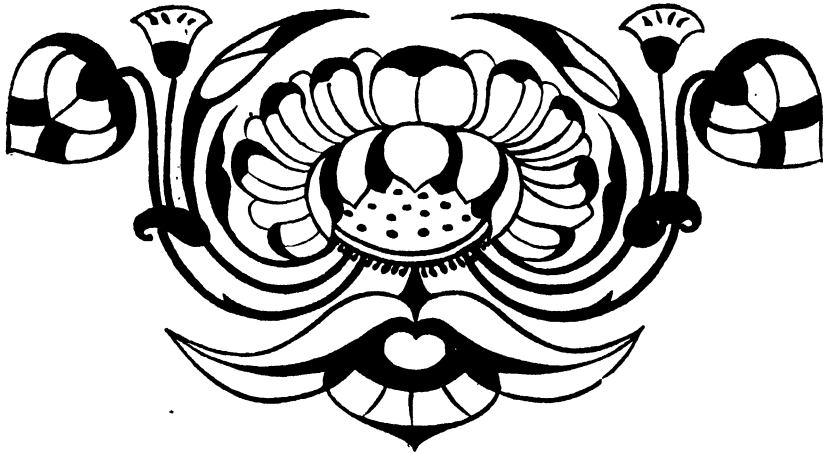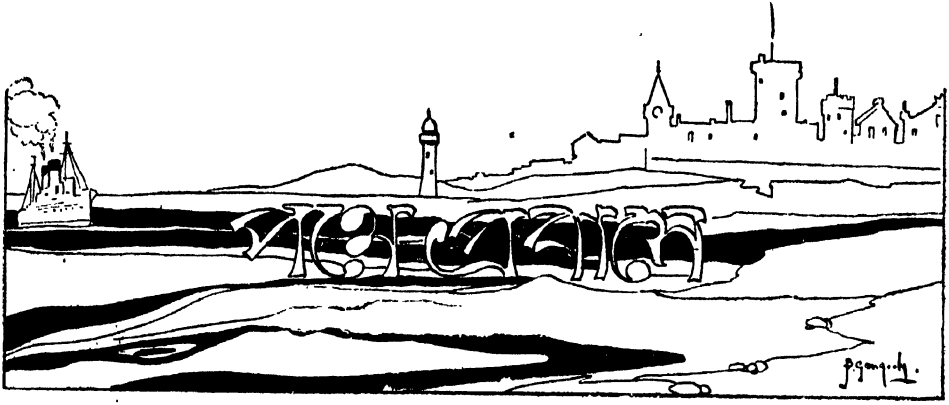
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১০

এদেশে এসে অবধি দেখ্‌ছি বিপুলভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা চলেছে। পাড়ায় পাড়ায় গির্জ্জা, পথে ঘাটে ধর্ম্মপ্রচার, কুলীর পিঠে ধর্ম্ম বিজ্ঞাপন। যে জাতীয় সংবাদপত্রে কুকুর দৌড়ের শেয়ার মার্কেটের ও ডিভোর্স্‌ কোর্টের খবর থাকে সে জাতীয় সংবাদপত্রেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। রেলে ও বাসে আপিস থেকে ফের্‌বার সময় একহাতে সান্ধ্য কাগজ ও অন্য হাতে ছ'পেনী দামের ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়ে একবার এটাতে ও একবার ওটাতে চোখ বুলিয়ে যেতে কত লোককেই দেখি। শুনতে পাই এখন ধর্ম্মগ্রন্থগুলোর যত কাট্‌তি নভেল নাটকেরও নাকি তার বেশী নয়। বছর পনেরো কুড়ি আগে নাকি এতটা ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে হঠাৎ ধর্ম্মচর্চ্চার মরা গাঙে বান ডেকেছে। তা বলে অর্থচর্চ্চা বা কামচর্চ্চা যে কিছুমাত্র কমেছে এমন নয়। একসঙ্গে ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা চলেছে—গড্‌, ম্যামন, কিউপিড্‌। ব্যাঙ্কে এক্সচেঞ্জে ডার্‌বীতে থিয়েটারে নাচঘরে হোটেলে পার্কে গির্জ্জায় সর্ব্বত্র লোকারণ্য, কোনো একটার ওপরে বিশেষ পক্ষপাত কারুর নেই; স্কুলে কলেজে লাইব্রেরীতে কারখানায় যেখানে যাই সেখানে লোকের ভিড়; মিউজিয়ামে চিত্রশালায় হাস্‌পাতালে অন্ধ-আতুর-অনাথাশ্রমে জন্মনিবারণী সভায় কোথাও কারুর আগ্রহ কম নয়। একটা জীবন্ত জাতির হাজারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই সমান জীবন্ত, যেমন তাদের বৈচিত্র্য তেমনি তাদের বৈপরীত্য, ভালো মন্দ সুন্দর কুৎসিৎ পদ্ম পাঁক ঐশ্বর্য্য দৈন্য প্রেম হিংসা সবই একাধারে বিধৃত, এবং সবই সমান প্রচুর। সেইজন্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সকলেই ভাব্‌তে সুরু করেছে, একুশ বছর বয়সের গামছাপরা flapper পর্য্যন্ত। এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলেই লিখ্‌তে সুরু করেছে। সিগারেট্‌খোর মেয়েরা হচ্ছে সকলের চেয়ে গোঁড়া খ্রীষ্টান লেখিকা। শনিবারের দিন সন্ধ্যাবেলা যে সব যুবক যুবতী পরস্পরের কোলে মাথা রেখে মাঠে বাগানে সকলের সাম্‌নে প্রেমালাপ করে, রবিবারের দিন সকাল বেলা সেইসব যুবক যুবতী গির্জ্জায় ভিড় ক'রে অখণ্ড মনোযোগের সহিত ধর্ম্মোপদেশ শোনে, কলের পুতুলের মতো হাঁটু গাড়ে। এবং সোমবারের দিন দুপুরে যখন তারা আপিসে গিয়ে পাশাপাশি কাজ করে তখন কেউ কারুর সঙ্গে ইঙ্গিতেও কথা বলে না, এমনি কঠোর ডিসিপ্লিন। কাল যদি যুদ্ধ বাধে ছেলেরা হাসিমুখে বন্দুক কাঁধে নিয়ে মরণযাত্রা করবে, মেয়েরা দেশের ভার কাঁধে নিয়ে ঘর ও বাহির দুই আগ্‌লাবে। সুখের সময় সুখ, দুঃখের সময় আশা, সব সময় প্রস্তুত ভাব—এই হচ্ছে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম, ইউরোপের ধর্ম্ম।

সামরিক সংস্কার বহুদিন হ'তে আমাদের সমাজে নেই, যখন ছিল তখন সমস্ত সমাজটার একটি বিশেষ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম্মেরও উচ্ছেদ হয়েছে। ইউরোপের সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বাসী, এ বিশ্বাসের ওপরে এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না, এ বিশ্বাস এদের প্রকৃতিগত, যুদ্ধহীন জগৎ এরা মনেও আন্‌তে পারে না। মানুষে-মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা' এদের অনেকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝ্‌ছে কিন্তু সংস্কার থেকে পায়নি। পশুতে মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের সময় থেকে জেনেছি, এরা এখনো জানেনি। প্রকৃতিতে-পুরুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা দৈব-বাদীরা কবে শিখলুম জানিনে, এরা কোনোদিন শিখবে না। এদের ভাবজগতেও আইডিয়াতে আইডিয়াতে যুদ্ধ। এদের ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকার ধর্ম্ম। ন কিঞ্চিদপি বলহীনেন লভ্যম্। নিশ্চেষ্ট যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হও তবে অপরে তোমাকে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

ধর্ম্ম ও রিলিজন এক জিনিষ নয়। ধর্ম্ম হচ্ছে প্রকৃতি, রিলিজন হচ্ছে অভ্যাস। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে অভ্যাসের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেখানে সোনায় সোহাগা—আমাদের দেশে তাই। আমাদের ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম, লোকমুখে হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু মানে ভারতীয়, সুতরাং ভারতীয় ধর্ম্ম। আমাদের রিলিজনগুলোর নাম বৈষ্ণব মত শাক্ত মত সৌর মত শৈব মত গাণপত্য মত ইত্যাদি। আমরা যদি খ্রীষ্টীয় মত বা মহম্মদীয় মত নিই তবু আমরা হিন্দুই থাক্‌ব, ধর্ম্মতঃ হিন্দু। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মমতের তেমন সহজ সম্বন্ধ থাক্‌বে না, কতকটা স্বতোবিরোধ এসে পড়্‌বে। আমাদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়েছেন তাঁরা হিন্দুই আছেন, কিন্তু ভিতর থেকে সৃষ্টির স্ফূর্ত্তি পাচ্ছেন না, ইচ্ছানুসারে ইস্‌লামকে বা খ্রীষ্টিয়ানিটীকে পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার্‌ছেন না, পরমুখাপেক্ষী হচ্ছেন। ইউরোপেরও এই দশা। ইউরোপের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমত অঙ্গাঙ্গী নয়, বিরুদ্ধ। ইউরোপের প্রকৃতি হোমারের আমলে যা ছিল এখনো তাই, কিন্তু মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে প্যালেষ্টাইন অঞ্চলের একটি অভ্যাস। সে অভ্যাস ইহুদি প্রকৃতির পক্ষে সহজ, যে গাছের যে ফুল। কিন্তু ইউরোপের প্রকৃতির পক্ষে আড়ষ্টতাজনক। খ্রীষ্টিয়ানিটীর দ্বারা ইউরোপের অশেষ উপকার হয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানিটীর পেষণে ইউরোপের আত্মা সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত্তি পায়নি। ইউরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল। ইউরোপের কীর্ত্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্ত্তি যোগে। ইউরোপ বিনা পরীক্ষায় কিছুই মানে না, পরীক্ষার পর যা মানে তার বাইরে সত্য খুঁজে পায় না। আমরা অম্লানবদনে সব মেনে নিই, অধিকারী ভেদে মিথ্যাকেও বলি সত্য। ইউরোপ বিশ্বাস করে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে, আমরা বিশ্বাস করি সমন্বয়ে। এহেন যে ইউরোপ তাকে তার নিজস্ব রিলিজন অভিব্যক্ত কর্‌তে না দিয়ে রাহুগ্রস্ত ক'রে রাখলে খ্রীষ্টিয়ানিটী। সেই দুঃখে গোটা medieval periodটা ইউরোপ অন্ধকারেই কাটাল। যেদিন গ্রীসকে দৈবাৎ পুনরাবিষ্কার ক'রে সে আপনাকে চিন্‌ল সেদিন ঘট্‌ল Renascence; তারপর থেকে সুরু হলো Reformation অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানিটীর অগ্নিপরীক্ষা। সে অগ্নিপরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চার এই প্রাবল্য দেখে মনে হয় এ বোধ হয় নির্ব্বাণ দীপের শেষ দীপ্তি, এর পরে হয় খ্রীষ্টিয়ানিটীকে ভেঙ্গে বিজ্ঞানের আলোয় নিজস্ব করে গড়া হবে, নয় বিজ্ঞানের ভিতর থেকে নতুন একটা রিলিজন বা'র করা হবে। বিজ্ঞান কথাটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। ইউরোপীয় দর্শনটাও বিজ্ঞানেরই তাঁবেদার। এবং বিজ্ঞান বল্‌তে কেবল Physics ও Biology নয়, Psychology'ও বোঝায়। এখনো বিজ্ঞানের সাম্‌নে বিরাট একটা অজানা রাজ্য রয়েছে—মানুষের মন। ক্রমে ক্রমে যতই তাকে চেনা যাবে ততই একটা নতুন রিলিজনের মালমশ্‌লা পাওয়া যাবে।

রিলিজনের জন্যে মানব হৃদয়ের যে সহজ তৃষা তাকে শান্ত কর্‌বার ভার অপরকে দিলে চলে না; নিজেরি ওপরে নিতে হয় সে ভার। ইউরোপের ভার এতদিন অন্যে বয়েছে। অন্যের ফরমাস খেটে ও বাঁধা বরাদ্দ পেয়ে ইউরোপের তৃষা তো মেটেনি, অধিকন্তু খ্রীষ্টিয়ানিটীর ওপরে রাগ ক'রে রিলিজনের প্রতি জন্মেছে অনাস্থা—যেন রিলি-

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

জনকে না হলেও মানুষের চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য্য উন্নতি ঘটেছে সে উন্নতি বহু দিনের রুদ্ধ জলের নিষ্কাসন, তাই সে এমন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রীসের যদি মরণ না হতো, খ্রীষ্টিয়ানিটী যদি আফিং খাইয়ে ঘুম না পাড়াত, তবে গ্রীসের ছেলেটি আমার কোলে অমানুষ না হয়ে তার নিজের কোলে দিন দিন শশি-কলার মতো বাড়্‌তে বাড়্‌তে এতদিনে কেমন হয়ে উঠ্‌ত জানিনে, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানিটীর ওপরে আধুনিক ইউরোপের মহা মনীষীদের এমন অশ্রদ্ধা ও রিলিজনের ওপরে তাঁদের এমন অনাস্থা দেখ্‌তুম না। তাঁরা বল্‌ছেন, এই হতভাগা ধর্ম্মমতটার জন্যেই এত যুদ্ধ, এত অশান্তি, এত গোঁড়ামী, এত কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাসী যাজকরা sexকে পাপ ব'লে নিজেরা বৈরাগী হয়েছে, অথচ অন্যদের বলছে বহুসন্তানবান হতে, আর জনবৃদ্ধির ফলে যখন যুদ্ধ বেধেছে তখন এরাই দিয়েছে মরণ-মারণের উত্তেজনা; এরা প্রচার করেছে আত্ম-সম্মাননাশী উৎকট পাপবাদ—"We are all born in sin," আমরা অধম, একমাত্র যীশুই ভরসা; গণতন্ত্রের এরাই শত্রু, স্বাধীন মানুষকে এরা সহ্য কর্‌তে পারে না; এদের ভগবান এক দাসব্যবসায়ী, এরা নিজেরাও দাসব্যবসায়ের সমর্থক; এরা বড় লোকের মোসাহেব, ক্যাপিটালিষ্টের বাহন, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে রাশিয়া থেকে চার্চ্চ্‌ উঠে গেল, ফ্রান্সে চার্চ্চের ওপরে কড়া নজর, ইংলণ্ডে চার্চ্চের প্রতিপত্তি কিছুদিন থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে ততটা ছিল না। তবে ইংলণ্ডের চার্চ্চ্‌ ইংলণ্ডের ষ্টেটেরই মতো জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। সেই জন্যে জন-সাধারণকে খুসী রাখার জন্যে এর অবিশ্রাম চেষ্টা।

চার্চ্চ্‌ ও ষ্টেট্‌ এদেশের সমাজের এপিঠ ওপিঠ। যাঁরা চার্চ্চের নেতা তাঁরা পার্লামেণ্টে বসেন, যাঁরা ষ্টেটের কর্ণ-ধার তাঁরাও পার্লামেণ্টে বসেন, পার্লামেণ্ট্‌ই হচ্ছে এদেশের সমাজপতিদের আড্ডা। আমাদের দেশে ষ্টেট্‌ ও সমাজ এক নয় এবং চার্চ্চ্‌ আমাদের নেই। চার্চ্চ্‌ যে এদের কতখানি তা' আমরা দূর থেকে ঠিক্‌ বুঝ্‌তে পার্‌ব না, কেননা চার্চ্চ্‌ মানে শুধু গির্জ্জা নয়, চার্চ্চ্‌ মানে সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘ আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগের পর থেকে নেই। কেশব চন্দ্র সেন সঙ্ঘের পুন-প্রবর্ত্তন করেন, আমাদের আধুনিক সঙ্ঘের নাম ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্মসমাজকে কেউ কেউ ব্রাহ্ম-চার্চ্চ্‌ ব'লে থাকেন, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকেও প্রবর্ত্তক চার্চ্চ নাম দেওয়া চলে। কিন্তু হিন্দুসমাজকে হিন্দু চার্চ্চ্‌ বলা চলে না। হিন্দু সমাজ কোনো একটা বিশেষ ধর্ম্মমতকে প্রতিপদে মেনে চল্‌বার জন্যে গঠিত একটা কৃত্রিম সঙ্ঘ নয়, হিন্দুর কাছে ধর্ম্মমত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্বামী শাক্ত ও স্ত্রী বৈষ্ণব ও সন্তান নাস্তিক হলেও হিন্দু সমাজ আপত্তি করে না। আজ যদি হিন্দু সমাজ সেকা-লের মতো জীবন্ত থাক্‌ত তবে স্বামী শৈব ও স্ত্রী মুসলমান হলেও আপত্তি কর্‌ত না। হিন্দু ধর্ম্ম ছিল দেশের ধর্ম্ম, দেশে যেকেউ বাস কর্‌ত সে ছিল হিন্দু, জাতিভেদের উৎপত্তি হয়েছিল পেশাভেদের দ্বারা, পেশা বদ্‌লালে জাতিও বদ্‌লাত; কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো অধিবাসীকেই অহিন্দু বলা হতো না, যাই হোক না কেন তার ধর্ম্মমত বা রিলিজন।

হিন্দু সমাজ কোনো দিন ধর্ম্মমত নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু দেশের আচারকে বা দেশের প্রথাকে শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে মেনেছে। এখনো কি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-আর্য্য খ্রীষ্টান-মুসলমান ভারতীয়রা সাকারবাদী শাক্ত বৈষ্ণব-দের মতো একান্নবর্ত্তী পরিবার ও তার অনিবার্য্য পরিণাম বাল্যবিবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? একান্নবর্ত্তী পরিবারের সঙ্গে বাল্য বিবাহ উঠে যাচ্ছে industrial revolutionএর ফলে। এর সঙ্গে ধর্ম্মমতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ধর্ম্মমতনির্বিশেষে অখণ্ড হিন্দু সমাজের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে খ্রীষ্টান-মুসলমান বৈষ্ণব-শাক্ত সকল ভারতীয়ের মধ্যে একই সংস্কার বিদ্যমান। তবু কয়েকটা ধর্ম্মমতকে হিন্দু নাম দিয়ে অন্যগুলিকে অহিন্দু নামদেওয়া হচ্ছে ধর্ম্মমতকে ধর্ম্ম ব'লে ভুল ক'রে।

চার্চ্চ্‌ বা সঙ্ঘ হচ্ছে একটা ধর্ম্মমতের বা রিলিজনের দ্বারা পরিচালিত সমাজ, জাতীয় প্রকৃতি বা জাতীয় ধর্ম্মের সঙ্গে তার রক্ত-সম্পর্ক নেই। চার্চ্চ অনায়াসেই আন্তর্জ্জা-তিক হতে পারে। রোমান চার্চ্চ একদিন সমস্ত ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাবেই শাসন কর্‌ছিল, ক্রমশ আধিভৌতিক দিকটাকে নিয়ে আধুনিক ধরণের ষ্টেট্‌

গ'ড়ে ওঠে, চার্চ্চের কাজ লাঘব হয়। তারপর নানা দেশে ষ্টেটের সঙ্গে চার্চ্চের নানা বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কোথাও ষ্টেট্ চার্চ্চকে গ্রাস করে, কোথাও ষ্টেট্ চার্চ্চকে ভাতে মারে, কোথাও ষ্টেট্ চার্চ্চকে কোনো মতে টিঁকে থাক্‌বার অনুমতি দেয়। ইংলণ্ডে কিন্তু ষ্টেট্ ও চার্চ্চ বেশ বনিবনা ক'রে চল্‌ছে, চার্চ্চ অবশ্য এখন স্ত্রৈণ স্বামীর মতো ষ্টেটের বিশেষ অনুগত, নইলে রাশিয়ার চার্চ্চের মতো তাকেও ভিটে-ছাড়া হয়ে বনে পালাতে হতো। কিন্তু অত্যাধুনিক স্ত্রীদের খোস্ মেজাজের ওপর অতটা ভরসা রাখা স্বামী মাত্রেরই পক্ষে ভয়াবহ। ইংলণ্ডের চার্চ্চও কবে disestablished হয়ে মনের দুঃখে বনে যাবে বলা যায় না, ষ্টেটের জুলুম দিন দিন বাড়্‌ছে। তবে লোকটা নেহাৎ মন্দ ছিল না, অনেক উপকার করেছে, সন্তানগুলিকে সঙ্ঘ-বদ্ধ হ'তে শিখিয়ে দিগ্‌বিজয়ী ক'রে দিয়েছে, এত বয়সে বেচারাকে তালাক দিলে দারুণ অকৃতজ্ঞতা হবে।

খ্রীষ্টীয় আদর্শের যাঁরা সমর্থক তাঁদের অনেকে বল্‌ছেন, Christianity never had a trial, খ্রীষ্টীয় আদর্শকে আমরা গ্রহণই করিনি এতদিন, আমরা গ্রহণ করেছি চার্চ্চের কর্ম্ম কাণ্ড, আমরা শরণ করেছি সঙ্ঘকে। চার্চ্চের দ্বারা খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এতকাল ঢাকা প'ড়ে এসেছে, খ্রীষ্টের সরল উক্তি-গুলিকে চার্চ্চের মহামহোপাধ্যায়রা টীকা ভাষ্যের দ্বারা জটিল ক'রে—কুটিল ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের সৃষ্টি-তত্ত্ব ও নিউ টেষ্টামেণ্টের ত্রাণতত্ত্বকে গোড়াতে স্বীকার না ক'রেও খ্রীষ্টের অনুজ্ঞা পালন করা সম্ভব, খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা সম্ভব। খ্রীষ্টের জন্মঘটিত রহস্যগুলো সম্বন্ধে খ্রীষ্ট স্বয়ং কিছু বলেননি, চার্চ্চই যা-খুসী বানিয়েছে। নিজের প্রতিপত্তির জন্যে চার্চ্চ্ খ্রীষ্টকে exploit করেছে, খ্রীষ্টকে ইচ্ছামতো ভেঙ্গে গড়েছে। আমরা সত্যিকার খ্রীষ্টকেই চাই, আমরা চার্চ্চের হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমরা খ্রীষ্টের সৃষ্ট Christianityকেই চাই, আমরা চার্চ্চের বানানো Christianity বর্জ্জন করব।—চার্চ্চের হাত থেকে রিলিজনকে উদ্ধার ক'রে তাকে ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষার বিষয় কর্‌বার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এতকালের চার্চ্চ্‌কে এক কথায় বিদায় দেওয়া যায় না, তুলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সঙ্ঘের মধ্যেও একটা সত্য আছে, সঙ্ঘবদ্ধ সাধনারও একটা মূল্য আছে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝখানে হয়ত চিরকাল একটা মধ্যস্থ থেকে যাবেই, সেটার নাম group বা party বা sect যাই হোক্ না কেন। নির্জ্জলা ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বা নির্জ্জলা সমাজতন্ত্রবাদ সফল হ'তে না জানি কত কাল লাগ্‌বে। হিন্দু সমাজের পেশাগত জাতি একদিন জন্মগত জাতি হ'য়ে না দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হিন্দু সমাজই জগৎকে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাক্‌ত।

রিলিজনের ক্ষেত্রে পূর্ব্ব দেশের কাছ থেকে কোনো-রকম দিশা পাওয়া যায় কি না এই নিয়ে অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নাড়া চাড়া কর্‌ছেন, বুদ্ধকেও নাড়াচাড়া করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছর রিলিজন বল্‌তে কেবল খ্রীষ্টিয়ানিটীই যাঁরা বুঝেছেন, তাঁদের মুখ বদ্‌লাবার পক্ষে পৃথিবীর অপরাপর রিলিজন-গুলোর মূল্য থাকৃতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তাঁরা স্থায়ীভাবে ওগুলিকে গ্রহণ করবেন এমন ভাবা ভুল। কারণ ওসব রিলিজন খ্রীষ্টিয়ানিটীরই মতো অন্য মাটীর গাছ, ইউরোপের মাটীতে রোপণ কর্‌লে ওদের বৃদ্ধি তো হবেই না, ইউরোপের নিজের ফসল ফলাবার জন্যে যথেষ্ট জায়গাও থাক্‌বে না। ইউরোপের ধর্ম্মের সঙ্গে বাইরের ধর্ম্মমতের নাড়ীর বাঁধন নেই, তেলে জলে মিশ খাবার নয়। ইউরোপের প্রকৃতি নিজের ফুল নিজে ফোটাতে পারে তো নিজেই একদিন ফোটাবে, অন্যের ফুল আদর ক'রে দেখতে পারে, পর্‌তে পারে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে তাজা রাখতে পার্‌বে না। ইউরোপের আপনার জিনিষ তার ফিলজফী তার বিজ্ঞান। পরের কাছে ধার করা থিওলজীকে সে এখনো আপনার করতে পার্‌লে না, দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে থাপ খাওয়াতে পার্‌লে না। আবার যদি ধার করতে যায় তো দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধার করবে, নিজের ধাতের ভিত্তির ওপরে পরের মতের সৌধপ্রতিষ্ঠা করবে, ভূমিকম্প হয় তো ভিত্তি টল্‌বে না, সৌধই ধ্বংসে পড়বে। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হ'ড়ে দৈব।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ইউরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্ব ভাব শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি; আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। ইউরোপ অর্জ্জন ক'রে উড়িয়ে দেয়; আমরা অম্‌নি ভিতর থেকে পাই, সঞ্চয় করি। আমাদের উপলব্ধি ইউরোপ যদি নেয় তো নিজের মনের মতো ক'রে নেবে, খ্রীষ্টিয়ানিটীর আত্মাটুকু বাদ দিয়ে যেমন ধড়টাকে চার্চ্চে ঝুলিয়ে রাখল, এবং নিজের যুদ্ধপ্রিয়তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে বেতাল ক'রে তুল্ল, আমাদের বেদান্ত বা বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই কর্‌বে, এবং নিজের বিজ্ঞান-দর্শনের দ্বারা distil ক'রে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই তার গ্রহণ কর্‌বে না। সেইজন্যেই আমাব মনে হয় ইউরোপকে আমরা মুরুব্বির মতো শিক্ষা দিতে পার্‌ব না, কেবল বন্ধুর মতো সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব। আমাদের সাহায্যে ইউরোপ যদি নিজের রিলিজন নিজে সৃষ্টি করে, আর ইউরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজনগুলোকে বিজ্ঞান শোধিত ক'রে নিই, তবে অতি দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম; দু'টিতে হবে হরিহরাত্মা। তার পরে যখন আরো দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের প্রকৃতি এক হ'য়ে আস্‌বে, ধর্ম্ম এক হ'য়ে আস্‌বে, তখন দু'টিতে হবে এক দেহমন, একাত্মা।

এই মুহূর্ত্তে রিলিজন সম্বন্ধে ছোটবড় ইতর ভদ্র সকলেই কিছু কিছু ভাবছে, কিন্তু এখনো সে ভাবনা তেমন ঐকান্তিক হয়নি, যেমন হ'লে নতুন একটা রিলিজনের জন্ম-লক্ষণ দেখা যেত। মাত্র দেড়শো বছরের বিজ্ঞান চর্চ্চা জীবনকে এখনো যথেষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত করেনি, দেড়শো বছর আগের গরু ঘোড়ার গাড়ী থেকে মাত্র এরোপ্লেন অবধি উঠেছে, এখনো অসংখ্য উদ্ভাবন বাকী। আগামী দেড়শো বছরে হয়তো আকাশে বাড়ী তৈরি ক'রে বাগান তৈরি ক'রে ফুল ফুটিয়ে দেবে। জীবন যতই জটিল হয় রিলিজনকে ততই দরকার হয়—রিলিজন খুলে দেয় গ্রন্থি, রিলিজন ক'রে তোলে সরল। সরলীকরণের আকাঙ্ক্ষা এখনো তীব্র হয়নি বটে, তবু সরলীকরণ যে দরকার সে জ্ঞান সকলেরই কতকটা হয়েছে। ভারতবর্ষে গান্ধীর জন্ম, তিনি যন্ত্রের প্রতাপ সামান্যই দেখেছেন, তাঁর বিশ্বাস যন্ত্রকে না হলেও মানুষের চলে, তিনি জীবন থেকে যন্ত্রকে ছেঁটে ফেল্‌লেই সরলীকরণের সাক্ষাৎ পান। কিন্তু ইউরোপে যে সব মনীষীর জন্ম তাঁরা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাঁদের জন্মের বহু পূর্ব্ব হতেই যন্ত্র ও জীবন এক হয়ে গেছে, যন্ত্রকে ছেঁটে ফেলা ও শরীরের চর্ম্ম তুলে ফেলা তাঁদের পক্ষে একই কথা, সরলীকরণের জন্যে তাঁরা যন্ত্রকে ছেড়ে যন্ত্রীর দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন, যন্ত্রকে রেখেও জীবনকে কতখানি সরল করা যায় এই হচ্ছে তাঁদের প্রশ্ন।

সেইজন্যে দেখা যায় ধনীদের ঘরেও আসবাবের বাহুল্য কম্‌ছে, সুন্দর দেখে অল্প কয়েকটি আস্‌বাব রাখা হচ্ছে। মেয়েদের পোষাকের ওজন কম্‌ছে, বহর কম্‌ছে; সুরুচিকর দেখে অল্প কয়েকখানা কাপড় পরা হচ্ছে। খোলা আকাশ খোলা হাওয়া খোলা মাঠের টানে ছেলেরা পায়ে হেঁটে পৃথিবীময় ঘুর্‌ছে। অল্প কাপড়, সাদাসিধে খাবার, প্রচুর শারীরিক শ্রম, খোলা জায়গায় নিদ্রা—এই সব হলো "youth movement"এর মূলসূত্র। জার্ম্মানী অঞ্চলে কাপড় জিনিষটাকে যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টা চলেছে, অথচ ঐ ভয়ানক শীতে! উলঙ্গ ব্যায়াম উলঙ্গ সাঁতার অর্দ্ধোলঙ্গ নাচ ক্রমেই চল্‌তি হচ্ছে। খাদ্যগুলো ক্রমেই কাঁচার দিকে যাচ্ছে। বাসগৃহগুলোর জানালাগুলো বড় হতে হতে এতবড় হয়ে উঠ্‌ছে যে ঘরে থেকে বাইরে থাকা যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বরফ বিছিয়ে skate করা হচ্ছে। দারুণ শীতেও বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে উঠে অল্প সংখ্যক পাৎলা কাপড় পরা হচ্ছে। এক কথায় দেহটাকে লোহার মতো মজ্‌বুৎ ক'রে গড়া হচ্ছে। গ্রীক মূর্ত্তির মতো সবল সুসামঞ্জস সুন্দর দেহ এখনকার আদর্শ। নরনারী এ উভয়েই আদর্শ গ্রহণ কর্‌ছে। খ্রীষ্টিয়ানিটী দেহকে তাচ্ছিল্য ক'রে ইন্দ্রিয়কে রিপু ব'লে উপবাসকে শ্রেয় ব'লে আত্মনিগ্রহকে ধর্ম্ম ব'লে চালিয়েছিল, কিন্তু এ ধর্ম্ম ইউরোপের প্রকৃতিগত নয়। সেইজন্যে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিক্রিয়া চলেছে। Sexকে খ্রীষ্টিয়ানিটী এত ঘৃণা করেছিল ব'লেই sexকে হঠাৎ এত শ্রদ্ধা করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার সময় কোন জিনিষের যে কত দাম তা স্থির করা শক্ত হয়।

মানুষের মধ্যে যে-ভাগটা পশু সে-ভাগটাকে অযথা নিন্দা ক'রে অযথা নির্য্যাতন করা হয়েছে; পরিণামে আজ সেই ভাগটাই সবচেয়ে বড় ভাগ, হয়ত সেইটেই সব,এমন কথাও শুনতে হচ্ছে। গ্রীককে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপরে খ্রীষ্টানকে ঢেলে সাজালেই হয়ত সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু কোনো-পক্ষের গোঁড়ারা স্চ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়্বেন না।

সরলীকরণ বল্‌তে যারা Paganism বুঝে দেহের বোঝা লাঘব কর্‌ছে, তারাই রিলিজনের মোহ এড়াতে না পেরে গির্জ্জায় যাচ্ছে, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়্‌ছে, ধর্ম্মালোচনা কর্‌ছে, ঘরে ব'সে রেডিওতে ধর্ম্মকথা শুনছে। শ্যাম ও কুল দুই রাখ্‌ছে, কিন্তু দুয়ের সমন্বয় কর্‌তে পার্‌ছে না। দু'হাজার বছরের অভ্যাস বড় সহজ কথা নয়, বাঘকে আফিং অভ্যাস করালে বাঘও হাই তোলে। আফিঙের বদলে কোকেন ধরিয়ে লাভ নেই—প্রাচ্য রিলিজন মাত্রেই ইউরোপের পক্ষে পর-ধর্ম্ম। তার যখন ক্ষুধা প্রবল হবে সে তখন নেশার বদলে খাদ্য খুঁজে নিলেই সব দিক থেকে ভালো। সে খাদ্য তার নিজের ভাঁড়ার ঘরে মালমশ্‌লা আকারে প'ড়ে রয়েছে, নিজের রান্নাঘরে নিয়ে পাক ক'রে নিলে পরে পরিপাক-যোগ্য হবে। ইউরোপের রিলিজন ইউরোপের লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী-ষ্টুডিও ষ্টেডিয়াম থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে, গির্জ্জা-মস্‌জিদ্-মন্দির থেকে নয়। Dr. Voronoffএর কাছে monkey gland operation নিয়ে যদি দেড়্‌শো বছর বেঁচে যেতে পারেন তো চোখে দেখে যেতে পার্‌বেন হয়ত—কেমনতর এ রিলিজন।

সাহিত্য ব্যবসায়

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ব্যবসায়-বিলুব্ধের হাতে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের সদ্‌গতি প্রত্যাশা করা চলেনা; কিন্তু বৈশ্য যুগধর্ম্মের প্রভাবে, জীবনে যা-কিছু অমূল্য তাকেও পণ্য দ্রব্যের মূল্য দিয়ে মানুষ পণ্যবীথির সামগ্রী ক'রে তুলেছে। তাতে ভয়ের কারণ তাদেরই, যারা অন্তরের সম্পদ নিয়ে দোকানদারী পসার জমাতে একান্ত কুণ্ঠিত। হাটের আদর্শ প্রবল ও সর্ব্বব্যাপী হয়ে উঠলে বিপদ এই যে যে-শালীনতায় মানুষের আত্মমর্য্যাদা, তাকেও দুর্ব্বল সৌখীনতা ব'লে বলাভিমানীদের পরিহাস লোক-প্রচলিত হয়ে ওঠে; তখন, যাদের চরিত্রে যথার্থ আত্মসম্মানের অভাব, নিজেকে অশোভনভাবে প্রকাশ করতে যাদের লজ্জা নেই, তারা অনায়াসে অসৌজন্যকে পৌরুষ ব'লে দম্ভ করে' বেড়ায়। সাহিত্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই রকম মললিপ্ত রূঢ়তাকে বিনয়ী ব্যক্তি মাত্রই যথাসাধ্য দূরে রেখে চল্‌তে ইচ্ছা করে—তারা জানে শিষ্টতার আদর্শানুযায়ী আন্তরধর্ম্মকে রক্ষা ক'রে চলাই অশুচিতার একমাত্র সদুত্তর, লাঞ্ছনার শ্লেষবর্ষণ যেমন ক'রে হোক্ তাদের মান্‌তেই হয়।

দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় লক্ষপতি খবরকাগজওয়ালার সঙ্গে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মিলন সর্ব্বজনবিদিত। যেখানে মানুষের চরিত্রদৈন্য, যেখানে তার স্বার্থবুদ্ধি তার ধর্ম্মবুদ্ধিকে সহজে ছাড়িয়ে যায় সেখানেই মানুষের সাময়িক মনোবিকারের উত্তেজনা নিয়ে ব্যবসাদারী সাহিত্যের বাজার জমে উঠেছিল। সাহিত্য যখনি ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁকে তখনি মানস-সরোবরের পদ্মকে ছেড়ে পঙ্কের দিকে নামতে তার সঙ্কোচ থাকে না। সেদিন রাষ্ট্রনীতি-ব্যবসায়ী ও বাক্য-বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাসেল্ স্পষ্ট কথা ব'লে গিয়েছিলেন জেলে, বার্ণার্ড শ'র বই ছাপা হতেই দিল পুড়িয়ে। ব্যবসায়িক সংঘশক্তির পিছনে তখনো ছিল ধর্ম্মব্যবসায়ীদের দল। ধর্ম্মের দোহাই আধুনিক কর্ম্মকৌশলের প্রধান উপাদান। আধুনিকেরা সব চেয়ে দুরূহ দুষ্কার্য্য করেন ধর্ম্মের ধ্বজা ধ'রে, সব প্রথমে যজমানদের নিয়ে যাজকেরা যান গির্জ্জায়, ভগবানকে দলে টেনে অকার্য্যের সাধু ছদ্মবেশকে সুশোভন করবার জন্যে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হতে থাকে বোমা-বারুদ। আমাদের দেশেও দেখি বিদ্যালয়ের হাটে ব্যবসায়বুদ্ধি সনাতন ধর্ম্মের অভিমানকে আপন দলে টানে, পিছনে পিছনে রাষ্ট্রব্যবসায়ও সেটাকে আপন ব্যবহারে লাগাবার লোভে ন্যায় অন্যায়ের বোধকে বিসর্জ্জন দিতে দিতে চলে। এক সময়ে মানুষের বুদ্ধি ছিল সরল, তখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সীমানা-ভেদ ছিল সুস্পষ্ট। তখন যারা অন্যায় করত তারা অন্যায়ের স্পর্দ্ধা ক'রেই করত, সে কার্য্যে ধর্ম্মগুরুর জয়োচ্চারণ নেওয়া অনাবশ্যক বোধ করত। কিন্তু এখনকার কালে যখন আমরা দুষ্কর্ম্মের ব্যবসায় চালাতে যাই তখন কর্ত্তব্যবুদ্ধির আড়ম্বর দিয়ে তার ভূমিকা করা আবশ্যক বোধ করি। ৺পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় "নায়ক" কাগজের সৃষ্টি। তিনি অকপট সাহসের সঙ্গেই সাহিত্যে গুণ্ডামি করতেন। অনেক সময় অসঙ্কোচেই স্বীকার করেছেন যে খাদ্য পেলেই তাঁর মুখ বন্ধ হ'তে পারে। গালি দেবার অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁর ছিল, সে নৈপুণ্য তিনি লাভজনক ব্যবসায়ে লাগিয়েছিলেন—সেজন্য প্রায় তাঁকে পুলিস কোর্টে ছুটোছুটী করতে হয়েচে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্চি সাহিত্যে বীভৎস কাজের অবৈধ আক্রমণের ব্যবসায় চলতে আরম্ভ করেচে ধর্ম্মবুদ্ধির নামে।

একথা সত্য, বাঙলা ভাষায় সম্প্রতি সহসা তারুণ্যের আস্ফালন সহকারে সাহিত্যবিকার দেখা দিয়েচে। সেটা বিলিতী ব্যাঙ্গো এবং দরিদ্রনারায়ণের আর্ত্তস্বর, কুশ্রী কাল্পনিকতা, আত্মঘোষণা ও মহত্ত্বের প্রতি অশ্রদ্ধায় মিশ্রিত ব্যাপার। অতি-তারুণ্যের পিছনে যশোবণিক সাহিত্যিকের

পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট ছিল, অধ্যাপনজীবীদেরও অসদ্ভাব ঘটেনি, কিন্তু মোটামুটি রচনায় তাঁরা প্রকাশ্যত বিধর্ম্মী; ধার্ম্মিক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হ'ল সর্ব্বশেষে। এই সমাজ সংস্কারকের দল সাহিত্যের কমলবনে প্রবেশ করেন পঙ্কোদ্ধারের সাধু সঙ্কল্পে; রাতারাতি এঁরা সাহিত্যের নীতি, আদর্শ, গতিবিধির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন, প্রশংসাপত্র ব্যঙ্গচিত্র অভদ্র সমালোচনা এঁদের হুকুমজারি, সাহিত্য-সিংহাসনে এঁরা শাসনদণ্ডধারী। ঘাতপ্রতিঘাত উঠল জমে, উত্তেজনা হ'ল খুব, ব্যঙ্গশ্লেষে পারদর্শী দুচারটি কলমের শক্তি ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া গেল— কিন্তু স্বভাব-ভদ্র লোকের এতে রুচি হল না, কেননা জল্লাদের ব্যবসায় ত ভালো নয়। রক্ত-পিপাসু এই অধীর সমাজধার্ম্মিকের দল মিস্ মেয়োর কলম চুরি ক'রে অপ্রীতিভাজন অপরপক্ষের ত্রুটি স্খলনের ঝুড়ি-ভরা সঞ্চয় ফেরি করলেন ভদ্র-গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে, সস্তা পত্রিকার পত্রে। উদ্যত নবোন্মুখ তারুণ্যের অতি রঞ্জনের মধ্যে প্রতিভার দীপ্তি তাঁদের চোখেই পড়ল না। সহায়সামর্থ্যহীন আত্মবিলাসী ক্ষীণপ্রাণ বাঙালীযুবকের মনস্তত্ত্বালোচনায় করুণার প্রয়োজন ছিল, সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি। স্থানবিশেষে সেই চেষ্টা হয়েছিল, ফলও পাওয়া গিয়েছিল আশাতীত। কিন্তু নেশা চায় নিজের ভোগকে, জগৎকে সে বিচার করে আত্মপ্রসারের খাদ্যরূপে। মেয়ো-পন্থী পাণ্ডিত্যাভিমানীর দল আপন ব্যবসায়কে জয়যুক্ত করবার সকল গুপ্ত পন্থাই মেনে নিলেন। দস্তুরমত কুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গরস, ব্যক্তিগত কুৎসারচনা বীভৎস ব্যবসায়ের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই মলিন পন্থায় সাহিত্য-সমালোচনার সংযম ও শিষ্টাচার পরিত্যাগ করে' একদল বিদ্যাদাম্ভিক লেখক দেশমান্য সাহিত্য-স্রষ্টা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে ইতরভাবে আক্রমণ করলেন। প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষে আত্মসমর্থন অনাবশ্যক। প্রমথবাবুর মতো লেখক আপন সার্থকতার আন্তরিক গৌরবে বাহিরের স্তুতিনিন্দা স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকর্ম্মে, গভীর মননশক্তিতে, জ্ঞানের বৈচিত্র্যে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় নিয়ত বিকশিত হয়ে চলেছে; তাঁর রচনাবলীতে যে দুর্লভ দীপ্তি প্রতিভাত বাংলা সাহিত্যে কোনো দিন তা ম্লান হবে না। তবে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই বেদনা বোধ বেশি, কুটিল ব্যঙ্গশ্লেষের আক্রমণে তিনি যে বিস্মিত ব্যথিত হয়েছেন এটা নিঃসন্দেহ। তাঁর এই অপমানে বাংলাদেশের ভদ্রসমাজের সকলের অপমান, এইটে আজ আমাদের বলবার কথা। যে অশুচি হাস্যরসিকতা তাঁর মতো শ্রদ্ধেয় লোকের সম্মানরক্ষা করতে জানে না বিকৃতরুচি ব্যঙ্গচিত্রে যার কলুষস্পর্শ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর হ'তে পেরেছে, তীব্রভাবে আমরা তার প্রতিবাদ জানাতে চাই। স্বভাববিশেষে অসত্যভাষণ, পরনির্য্যাতনের উত্তেজনা প্রীতিকর হতে পারে, তাতে ব্যবসায়ের সুবিধা হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু সাহিত্যসেবকের ধর্ম্ম এ কখনই নয়।

মানুষ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৫)

স্বর্গ কোথা, ভ্রান্ত নর, ধরার বাহিরে ?
থাকে যদি, এই মর্ত্ত্যে—নতুবা নাহি রে !
মৃত্যু যবে কাড়ি লয় সম্পদ সকল,
ইন্দ্রিয়-মন্দির দেহ, যার পীঠ-তল
নিত্য নব শব্দ-রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-গানে
চেতন জাগ্রত চির, তার অবসানে—
শুদ্ধ মুক্ত প্রাণ-পাখী এ পিঞ্জর ছাড়ি
নিরুদ্দেশ মহাশূন্যে দেয় যবে পাড়ি,
কে র'বে তখন সেই স্বর্গ ভুঞ্জিবারে ?
কার তরে স্বর্গ তবে ? কে কহিতে পারে ?
বহ্নি সে আধার চায় হরিতে আঁধার।
সুখ, ভোগ, স্বর্গ, সব কামনা কাহার।
যখন ভাঙিবে দীপ, আলো যাবে নিবে,
তখন দীপের পূজা মিছে কেন দিবে ?

(৬)

স্বর্গ কেহ দেখে নাই, সে শুধু কল্পনা—
যুগে যুগে দেশে দেশে সে বহু, অল্প না।
সেথা নাকি চির-সুখ, দুঃখ কষ্ট নাই,
প্রচুর বহুল সব, না চাহিতে পাই,—
মৃত্যুহীন শুধু ভোগ। নাহি রোগ শোক,
ভস্ম-শেষ সব বাঞ্ছা, পূর্ণ স্বর্গ-লোক !
মানুষ রহেনা স্বর্গে মানুষ এমন,
দেবত্ব লভিয়া হয় কে জানে কেমন !
আমি তাই ভাবি শুধু স্তম্ভিত হইয়া,
অমর হইয়া তারা এ সুখ লইয়া
কেমনে কাটায় কাল ! নাহি যেথা চাওয়া,
আশা ও নিরাশা; বাঞ্ছা, হারাইয়া যাওয়া,
আকুলতা, অশ্রু, ব্যথা, শ্রান্তি, স্বেদ-কণা—
সেথা কি সুখের বাসা ? সে গুরু বেদনা।

(৭)

দুঃখ আছে তাই সুখ হেন মধুময়।
সুখের চরম-ক্ষণে হারাবার ভয়।
যে মোহ ঘনায়ে তোলে, যে তৃষ্ণা বাড়ায়,
তন্ময় করিয়া দেয়, আবেশে মাতায়,
সে বিচিত্র আকুলতা মাঝে—সে ক্ষণিক,
তাই মন-মণি-কোঠা পায় সে মাণিক—
তবে তো সার্থক সুখ। মাধুর্য্য সকলি
ক্ষণিক পলায়মান পলাতক বলি।
মনের কামনা করে সুখের বিচার,
সম্ভোগ, আদর ; কিন্তু যেথা কামনার
হয়েছে সমাধি, সেথা কি সুখের স্থান ?
তারে তো কখনো আমি করিনি আহ্বান !
অনিচ্ছিত অনাহুত সে প্রচুর সুখ—
অনন্ত যন্ত্রণা সে যে, সেই সত্য দুখ !

(৮)

মানুষের দুঃখ-সুখ—সূর্য্য চন্দ্র-সম,
গড়িতেছে দিবারাত্রি, আলো আর তম !
তার মাঝে কামনার ফোটে ফুল-রাশি,
নিদাঘের জ্বালা আর বসন্তের হাসি,
মনের মানস-কুঞ্জে, দেহ বেণু-বনে
পুলক বাজায় বাঁশী মদির পবনে।
এই নিত্য মহোৎসব-সমারোহখানি—
মর্ত্ত্যের জীবন, শুধু এই মাত্র জানি।
পূর্ণ কর পাত্র', বন্ধু, ধর' হাতে ধর'
ফেনিল উচ্ছল সুরা, সুখে পান কর' ;
ভুলে যাও সব কথা, আসুক বিস্মৃতি,
প্রাণের ধ্যানের রূপ পরম অতিথি !
ভ্রান্তি এ যে, মুক্তি এ যে ! এস কর' দূর
জীবনের উৎসবের অবসাদ-সুর।

এ, রোদিন সেণ্ট জন

পি, গগুঁই তাহিতি সুন্দরী

এ, রেনয়র

সি, কটেট্ তাস খেলোয়াড়

চিত্রাবলী

জি, মোরো অরফিউস্

ই ডেগাস সেমির‍্যামিস
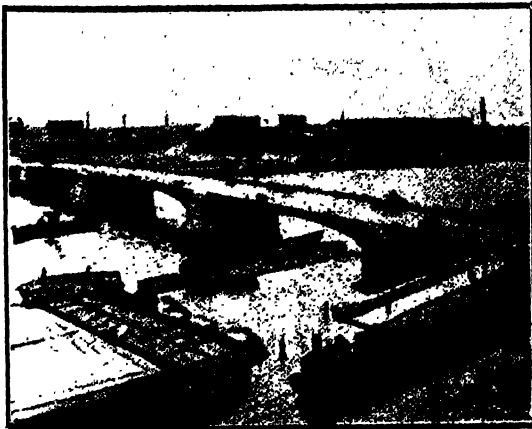
এ, মারকোয়ে পারির ঘাট

জে, মনিয়ার সঙ্গীত শিক্ষা

জে, কাজিন অগার ও ইসমাইল

এইচ্, ম্যাটিসি রংমহালের ক্রীতা-নারী

জি, কেলিবোট্ গৃহ মার্জ্জনা

সি কটেট্, সাগরাক্রান্ত

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত।

অতিথি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি সত্য আছে, সেটি মানুষের অন্তরতম। বোধ করি, সেই জন্যেই তাকে আমরা ভুলে থাকি। বাইরের নানা টানে নানা দাবীতে আমাদের বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সকলের চেয়ে অন্তরের এবং কাছের কথাটিতে আমাদের মন যায় না।

সে কথাটি এই,—আমাদের জীবনের দ্বারে একজন অতিথি আছেন।

একদিকে তিনি দেবেন আর আমরা নেব, এর সামঞ্জস্য করতে হলে, আরেকদিকে আমরা দেব আর তিনি নেবেন এইটুকু থাকা চাই, নইলে দানের ভারে আমরা নেমে পড়ব। তাই তিনি আমাদের দ্বারের কাছে এসে অপেক্ষা করেন, নিজের কর্ত্তৃত্বরাজ্যে যেমন প্রভুরূপে থাকেন তেমন ভাবে নয়, আমাদের কর্ত্তৃত্বের সংসারে অতিথিরূপে। আমরা তাঁকে কতটুকু জায়গা ছেড়ে দিই, তাঁর জন্যে আমাদের কতটুকু সেবার আয়োজন, সেইটুকুতেই আমাদের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সত্য হয়।

যখন ভালবাসি তখন দেওয়াতে আর বাধা থাকে না। এই যে অতিথি আমাদের ঘরে আশ্রয় চেয়েচেন, আর বলেচেন, তোমার সম্পদ তুমি একলা ভোগ কোরো না, আমাকেও স্মরণ কোরো! তবু পারিনে দিতে; সব জায়গাই আমার "আমি" জুড়ে থাকে, আমার সব শক্তিই এই "আমি"র দাবী মেটাতেই ব্যাপৃত। তাঁকে দাঁড় করিয়েই রাখি। এমন কেন হয়? প্রেম নেই বলে; দিতে তাই আনন্দ নেই। তাই কেবলি বলি, তুমি রোসো, আমার সময় নেই, আমার অনেক কাজ।

সংসারে সত্য হব এবং সংসারকে সত্য করব, এইটে হ'ল মানব জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন করবার জন্যেই আপনাকে প্রত্যহ বল্‌তে হবে; "সকলের চেয়ে বড় যিনি তিনি অন্তরের মধ্যে এসেচেন, ছাড় সব ছোট কথা ছোট বাসনা।" বল্‌তে হবে, "সকলের চেয়ে প্রিয় যিনি তিনি হৃদয়ে এসেচেন, আপনার স্বার্থকে আনন্দে তাঁর কাছে বিসর্জ্জন কর।"

সংসারে প্রতিদিন যদি বলি, আমিই আছি, আমার মধ্যে আমার চেয়ে বড় কেউ নেই, তাহ'লেই বড় সত্যকে বাদ দিয়ে সংসারটাকে দেখি, তাহ'লেই ওজন ঠিক থাকে না, তাহ'লেই বিপদ বাধে, তাহ'লেই সব চেয়ে বড় ঠকা ঠক্‌তে হয়।

যিনি বিশ্বের অধীশ্বর তিনি আমার অতিথি হ'য়ে এসেচেন, আমার জীবনে এইটেই সব চেয়ে বড় সত্য কেন? কেননা, এইখানে দুটি সত্যের মিলন হ'য়েচে—একটা হচ্চে তিনি বড়, আরেকটা হচ্চে আমিও ছোট নই।

এক রকম বড় আছে সে অভিভূত করে, আমার সব কেড়ে নিয়ে জবরদস্তি করে; সে যত বড়ই হোক তার কাছে নত হওয়া তার কাছে আত্মাবমাননা। কিন্তু এ ত তা নয়। তিনি সকলের চেয়ে বড় হ'য়ে আমাকে চাইলেন। তাতে তিনিও বড় রইলেন আমাকেও বড় করলেন। যিনি কর্ত্তৃত্ব করেন, তিনি এইখানে আমার কর্ত্তৃত্ব মানেন। আমি ভুলে থাকি, তাঁকে ফিরিয়ে দিই, কিন্তু তিনি দরজা ভাঙেন না, অপেক্ষা করেন। তিনি বলেন আমি এসেচি তোমাদের হৃদয় নিতে; খাজনা নিতে নয়।

এই যে সূর্য্য, এ সমস্ত সৌরজগতের অধিপতি। এই পৃথিবীকে সে বেঁধেচে তার নিজের সঙ্গে। সকালে পূর্ব্ব দিগন্তে যখন সূর্য্য দেখা দেয়, যখন তার করাঘাতে অন্ধকারের কপাট খুলে যায়, তখন পৃথিবী পুলকিত হ'য়ে অনুভব করে সমস্ত সৌরমণ্ডলের সূর্য্য বিশেষভাবে তারই আপন হ'য়ে তার দ্বারে অতিথি, তাই আনন্দে সে তার ফুলের সাজি সাজিয়ে ধরে, তার নহবতে প্রভাতী সুর বাজিয়ে দেয়। এই পূজায় তার নিজের মহিমা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়।

এই সকালে সূর্য্য পৃথিবীর দ্বারে এল, সে ত প্রভুভাবে এল না, আনন্দের সুর বাজিয়ে এল। পৃথিবী যদি তার সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটন না করত, যদি বন্ধ থাকত তার ঘর, তাহ'লে কি অমঙ্গলই হ'ত, চারিদিকে কি অন্ধকার, কি নিরানন্দ !

এমনি ক'রেই অসীম পুরুষ প্রত্যেক মানুষের আত্মার দ্বারে তারই বিশেষ অতিথি হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। বল্‌চেন, আমি যে প্রভু সেই কথাটি ভুলে যাও, মনে রাখ আমি একান্তভাবে তোমার, আমাকে গ্রহণ কর। আমি জোর করব না, আমার সৈন্যসামন্ত আনিনি, আমি তোমার সমান হয়ে এসেচি। তাঁর এই কথাটি যদি মন দিয়ে শোনবার সময় ক'রে নিতুম, তাহ'লে সব টানাটানি কাড়াকাড়ি শান্ত হ'য়ে যেত, আনন্দে সমস্ত চিত্ত গান গেয়ে উঠত, বলত, এস, এস, সবই তোমার।

মানুষের আমিত্ব আপনাকেই মেনে সার্থক হয় না, আপনার চেয়ে বড়কে মেনে সার্থক হয়। যতক্ষণ এইটি সে না মানে, ততক্ষণ নিজের সব চেয়ে বড় অধিকার সে পায় না। তার সব চেয়ে বড় অধিকার হচ্ছে আত্মদানের অধিকার। যতক্ষণ তার দেবার কৃপণতা, ততক্ষণ আপনার উপর তার পূর্ণ অধিকার নেই। তাঁকে যখন সত্য ক'রে আপন অতিথি ব'লে মানি, সেই অধিকার পাই। তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে বলি, আমার ধনজনমান সব তোমার হোক্! তখন আমার ইচ্ছার উপর আমার চরম কর্ত্তৃত্ব হয়, তখন আমি ইচ্ছা ক'রেই বল্‌তে পারি, "আমি সব দিলুম।"

এই যে আমার "আমি" বিশ্বের সকলের উপরে মাথা তোলবার জন্যে ব্যস্ত, চন্দ্র সূর্য্য তারা সকলেই এর স্পর্দ্ধা স্বীকার করচে, "হাঁ, তুমি খুব বড়।" এই যে বড়, এই যে খুব বড়, এ'কে আনন্দে নত হ'য়ে বল্‌তে হবে, "আমি কিছুই না।" সেই আতিথ্য-সৎকারের মহা দিনটির জন্যেই দুঃখ পেয়ে আঘাত পেয়েও সকলে এ'কে মেনে নিচ্ছে। যদি সে দিন না আসে, যদি আপনাকে দেবার অধিকার না পাই, তবে সে বড় দুঃখ,—শুধু একা আমার নয়, সকলের।

নোট্‌কে ভাঙাতে পারলে তবেই যেমন তার অর্থ, তেমনি আমার "আমি"কে ভাঙাতে পারলে তবেই তার অর্থ পাব। নোট্‌টাকেই যদি শেষ ব'লে জানি, যদি সেটাকে নিয়ে কাগজের নৌকা বানিয়ে খেলা করি, তা হ'লে সেটা হ'ল ফাঁকি। "আমি"কে নিয়ে তেমনি যদি খেলা ক'রে যাই, তাহলে তার থেকে তার সত্যকে পাওয়া গেল না, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ফাঁকি র'য়ে গেল। আমাদের জীবনের যিনি অতিথি তাঁর সেবার আয়োজনের জন্যে ঐ আমিটাকে ভাঙাতে হবে, ওকে একেবারে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে তবে ওকে সার্থক করতে হবে। এ হ'লেই যা দিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি পেলুম। সেই অনেক বেশি পাবার ব্যবস্থা আছে। বীজকে যদি সঞ্চয় না ক'রে রোপন করতে পারি, তাহলে যেমন বীজের অহমিকা বীজের কৃপণতা বিদীর্ণ হ'য়ে তার চেয়ে যে অনেক বেশি সেই উদ্ঘাটিত হয়, তেমনি আমার সেই অতিথি ভূমার কাছে আপনাকে দিয়ে ফেল্‌লে তবেই এর পরিপূর্ণতা কঠিন আবরণকে দ্বিধা ক'রে ফেলে অন্ধকার থেকে আলোকে প্রকাশিত হয়।

সেই প্রকাশের জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও, আমার আপন হ'তে তোমাতে নিয়ে যাও। সেই জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, হে আবি, আমার কাছে আবির্ভূত হও—অর্থাৎ আমার মধ্যে তোমার যে প্রকাশ সেইটে যেন অপ্রকাশিত না থাকে, অতিথিকে যেন না দেখে ফিরিয়ে না দিই। যদি সেই প্রকাশ আমার কাছে মোহের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে, রুদ্র, শোকদুঃখ অভিঘাতে বাধা ভেদ ক'রে তোমার দক্ষিণ মুখ আমার জীবনে অবারিত কর, এবং তেন মাং পাহি নিত্যম্, তাহার দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর। দুঃখ হ'তে রক্ষা করা নয়, তোমার প্রকাশের বাধা হ'তে রক্ষা কর, হে রুদ্র, দুঃখের দ্বারাই রক্ষা কর !

শোধবোধ

—গল্প—

—শ্রীগোপাল হালদার

সে কত বৎসরের কথা—বাংলার এই সমুদ্র উপকূলে তখন হৃত-শক্তি মুঘল-সাম্রাজ্যের মরণ-শয্যার পার্শ্বে মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুর তাণ্ডব নৃত্য চল্‌ছে। মগী ডাকাত ও ফিরিঙ্গী বণিকের বজ্‌রা ও ছিপ্ তখন এই সমুদ্র-বেলার অঞ্চলগুলিকে নিঃশেষে লুঠ ক'রে মেঘনা-পারের অন্তরস্থ গ্রামগুলিকেও এক সশঙ্ক আতঙ্কে অস্থির করে তুল্‌ছে।

এই ভাঙ্গা গির্জ্জাটা সেই বিলুপ্ত যুগের শেষ চিহ্ন।

এ অঞ্চলের জমিদার বিশ্বম্ভর রায় তখন সবে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। যাঁর তাঁবের লাঠিয়াল ও ভ্রূকুটি-কুটিল বজ্রনাদের সাম্‌নে দাঁড়াবার মত স্পর্দ্ধা কারো ছিল না, তাঁর নামের জোরেই ত' তখনও তাঁর বিশাল ভূ-সম্পত্তি শাসিত হচ্ছিল। সেই নামের শক্তিকে সম্বল করে পিতার সম্পত্তি তেমনি বজ্র-দৃঢ়-করে রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যা শঙ্করী। ষোল বৎসর বয়সে শিশু পুত্রটিকে কোলে নিয়ে শঙ্করী পিতৃগৃহে ফিরেছিলেন বিধবা। আজ একুশ বৎসর বয়সে কোল থেকে ছেলেকে নামিয়ে পিতৃহীনা শঙ্করী পিতৃ সম্পত্তি শাসন-সংরক্ষণের ভার নিলেন অবলা রমণী। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদের লোলুপ-দৃষ্টি থেকে একমাত্র পিতার নামই হয়ত তাঁকে রক্ষা করতে পারত না, যদি মগ এবং ফিরিঙ্গীর শ্যেন-দৃষ্টিতে তাঁদের নিজেদেরই সর্ব্বদা আক্রমণ ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকৃতে না হ'ত।

শিব মন্দিরের মধ্যে সন্ধ্যার আহ্নিক শেষ করে শঙ্করী গলায় আঁচল জড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠ্‌তেই বৃদ্ধ দেওয়ান গোবিন্দসুন্দর মন্দিরে ঢুকে বললেন, "মা!"

শঙ্করী একটু চম্‌কে উঠে প্রশ্নমিশ্রিত বিস্মিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাকলেন?"

"বড় বিপদ। নয়াচরের বাঁকে ফিরিঙ্গীর ছিপ্ দেখা গেছে। দেবগাঁয়ের নায়েব মশায় সংবাদ পাঠিয়েছেন—তারা এদিকেই এগুচ্ছে।"

শঙ্করী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালেন—বুকের উপর কৃতাঞ্জলী-বদ্ধ করদুটি কঠিন ও শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবগাঁ এখান থেকে কতদূর, কাকা—আট ক্রোশ?"

"না মা, আরও একটু বেশী, দশ ক্রোশ।"

"ফিরিঙ্গীর ছিপ্ এখানে পৌছাতে তা হ'লে আরও এক প্রহর লাগ্‌বে?"

"প্রায় এক প্রহরই লাগ্‌বে। তাই বলছি সময় আছে—পালকী আর বেহারা এতক্ষণে দুয়ারে হয়ত এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুমি চলো মা, দেরী না করে খোকাবাবুকে নিয়ে উঠে বসো। তারা আস্‌তে আস্‌তে তুমি রায়গড়ে পৌছে যাবে।"

শঙ্করী চুপ করে থেকে বললেন, "তা হয় না। ম্লেচ্ছের হাতে এখানকার দেব-বিগ্রহ সঁপে দিয়ে আমি যেতে পারব না। মনে আছে ত, বাবা বলতেন, 'প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু দেবতার মন্দিরে যেন অনাচার না হয়।'—আমি দেবতার মন্দির রক্ষা না করলে আজ স্বর্গ থেকেও তিনি শান্তি পাবেন না।"

"সে মন্দির রক্ষার আয়োজন না হয় আমরা করব,—তুমি একটু দূরে গিয়ে নিরাপদ থাক। ফিরিঙ্গীর অত্যাচার ত জানো, মা! মান-সম্ভ্রম সম্মান ইজ্জত কিছুই তাতে বাঁচবে না।"

"দেবতাকে নিরাপদ না করে নিজে নিরাপদ হ'লেই কি মান-সম্ভ্রম বাঁচবে?—এখান থেকে এক পাও আমি নড়ব না। আপনি ভবানীকে ডাকুন আর সম্‌সেরকে তাঁবের লাঠিয়ালদের নিয়ে তৈরী হ'তে হুকুম দিন।"

ভবানী সর্দ্দার বুড়া, তাঁবের সর্দ্দার সে। সম্‌সের জাতে পাঠান,—তার বয়স প্রায় চল্লিশ,—সে-ই ভাবী সর্দ্দার।

গোবিন্দসুন্দর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, আর একবার বললেন, "মা! ভেবে দেখলে মনে হয় তোমার আজকার

রাতের মত এ স্থান ছেড়ে যাওয়াই ভালো।—সেবার যখন কর্ত্তাবাবু ঐ মতিচ্ছন্ন ফিরিঙ্গীটাকে কালি মা-এর সাম্‌নে বলি দেন, তখন তাদের সর্দ্দার খবর পেয়ে জানিয়েছিল যে এর প্রতিশোধ যখন সে তুলবে তখন স্ত্রীপুরুষ বিচার করবে না, মন্দিরের বা মানুষের কারো পবিত্রতাই অটুট থাক্‌বে না।—তুমি চ'লে যাও মা! আমরা শেষ পর্যন্ত তাকে ঠেকাতে চেষ্টা করব।"

"আমি পালিয়েছি জান্‌লে আমার তাঁবের লাঠিয়ালদের আর লড়াইয়ে উৎসাহ থাক্‌বে না। কাকামশায়! বাবা থাক্‌লে কি তিনি আজ এমনি করে পালাতেন, না আপনিই এমনিতর পরামর্শ দিতে সাহস করতেন!—তা হ'লে আজ এতক্ষণ তাঁবের লাঠিয়ালদের হুঙ্কার শোনা যেত, বন্দুকের শব্দ উঠ্‌ত, মশালের আলোয় সমস্ত নদীর পাড়টা জ্বলে উঠ্‌ত।"

"তিনি ছিলেন সিংহ, মা! তিনিই যদি থাক্‌তেন, তবে ফিরিঙ্গীর এত স্পর্দ্ধাই হ'ত না।"

"আমিও ত তাঁরই মেয়ে, আপনি তাঁরই আমলের দেওয়ান, আর এই লাঠিয়ালরা তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত। তবু, ফিরিঙ্গীর ভয়ে আমায় পালাতে হবে,—আপনারা ফিরিঙ্গীর ভয়ে এত জড়সড় হ'য়ে গেলেন?—আপনি বলুন গে সবাইকে, আমি এক পা নড়ব না। এই শিব মন্দিরের মধ্যে আমি দোর বন্ধ ক'রে বসলুম,—যদি আপনারা ফিরিঙ্গীদের হটিয়ে ফিরে আসেন, তবেই দোর খুলব; নইলে ম্লেচ্ছ যখন মন্দির পুড়িয়ে দেবে, তার সাথে-সাথেই আমিও স্বর্গে যাব।"

শঙ্করী মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, গোবিন্দসুন্দর জিজ্ঞাসা করলেন, "মা! খোকা বাবু? তাকে অন্ততঃ পাঠিয়ে দাও।"

"না! সে আমার কোলেই থাক্‌বে।"

নদী-তীরের নিশীথ রাতের মরণ-যজ্ঞ রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই শেষ হয়ে এসেছিল—মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ ভবানী সর্দ্দার ফিরিঙ্গীর বজ্র-নাদী বন্দুকের ধ্বনি এগিয়ে আসছে বুঝতে পারছিল। অন্দরমহলের পরিচারিকা এবং কুটুম্বিকার দল—যারা পূর্ব্বে দুর্ব্বুদ্ধিবশে পালায় নি এবার সশব্দে ক্রন্দন আরম্ভ ক'রে কপালে করাঘাত করছিল।

ঝন্‌-ঝন্‌-ঝনাৎ শব্দে আর্ত্তনাদ করে, রাজপুরীর কত-কালের বিশ্বস্ত সিংহদ্বার ভেঙে পড়ল, বিকৃত কণ্ঠে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় মত্ত-উল্লাসে কি চিৎকার করতে করতে ফিরিঙ্গী ডাকাত রাজপুরে ঢুকছিল। স্তব্ধ ভবানী দাঁড়িয়ে শুনছিল—অন্দর মহলের দুয়ারে ঘা পড়ছে—ভয়ার্ত্তা নারীকুলের কণ্ঠে আর চিৎকারের ক্ষীণ আভাসটুকুও নেই।—পঁয়ষট্টি বৎসরের সমস্ত শক্তিকে একত্র করে ভবানী সর্দ্দার চিৎকার করল,—'জয় মা কালী'—একদিন যে চিৎকারে প্রকাণ্ড প্রান্তর থর-থর করে কেঁপে উঠ্‌ত অথবা নদীপারের নিঃশব্দ বিজনতা খান্‌-খান্‌ হ'য়ে ভেঙে যেত, আজ অন্দর মহলের এই ক্ষুদ্র কোণটিরই চারিপাশে সে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলে আত্মগোপন করল।—ভবানীর প্রাণে এই শঙ্কট কালেও আপ্‌শোষ জাগল,—হায়রে সেদিন!

দুয়ার ভেঙে এল ফিরিঙ্গীর প্রলয়োচ্ছ্বাস;—তারপর, অন্দরে, প্রাঙ্গনে, গৃহাভ্যন্তরে কক্ষে কক্ষে সেই রাত্রি-শেষের মশালের আলোয় মৃতপ্রায় অন্তঃপুর-নিবাসিনীদের উপর মদোন্মত্ত ফিরিঙ্গী ডাকাতের উৎকট বীভৎসতার উন্মত্ত তাণ্ডব। শুধু সর্দ্দার ডি-জোহন্‌ ছিলেন স্থির দাঁড়িয়ে,—শিব-মন্দিরের দুয়ার ভেঙে 'জেণ্টু'র দেবতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ না করে জলস্পর্শ করবেন না—মাতা মেরিয়ার নাম নিয়ে তিনি এ শপথ করেই এবার বেরিয়েছিলেন।

মন্দিরের দুয়ার অনেকক্ষণ তার অন্তরালের সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে আগলে রেখে শেষে কুড়'লের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পড়ল।—এক হাতে মশাল আর হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে ভবানী সর্দ্দারের মৃতদেহ ডিঙিয়ে ডি-জোহন্‌ লাফিয়ে মন্দির মধ্যে ঢুক্‌লেন। পাথরের ঠাকুরের মাথাটাকে চূর্ণ করবার জন্য এগিয়ে যেতে হঠাৎ যেন মনে হল তার পদতলে কোনো মনুষ্যদেহ কেঁপে উঠ্‌ছে। ফিরিঙ্গী-সর্দ্দার লাফিয়ে তলোয়ার তুললেন; মন্দিরের নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকের শিখায় দেখলেন—নতমুখী কোন্‌ নারীমূর্ত্তি দেবতার সম্মুখে লুটিয়ে!—এক মুহূর্ত্তের জন্য সর্দ্দার ডি-জোহন্‌ বিচলিত হলেন, বিস্মিত হলেন, তারপর বিকট অট্টহাস্যে সমস্ত মন্দির কাঁপিয়ে হাতের মশাল এবং তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে তাকে ধরতে গেলেন।

শোধবোধ

শ্রীগোপাল হালদার

অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে জ্বল্‌ছিল শিকারী ব্যাঘ্রের মত হিংস্র-লালসা-লেলিহান এক জোড়া চোখ, আর ধ্বনিত হচ্ছিল ভীতা কবলিতা মৃগীর করুণ কাকুতি ও আর্ত্ত অভিশাপ।

লুণ্ঠন-শেষ রাজপুরীতে শ্রান্ত ফিরিঙ্গীর দল আগুন ধরিয়ে দেবার আয়োজন করছিল;—স্বয়ং ফিরিঙ্গী সর্দ্দার ডি-জোহন্ নিজের হাতে মন্দিরগুলোতে আগুন দিচ্ছিলেন।. এমন পুণ্যকার্য্য তিনি অপর কারো হাতে দিয়ে নিজেকে পুণ্যফল থেকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সন্ধ্যার পাণ্ডুর আকাশের নীচে শত বৎসরের দর্পিত-শীর্ষ শিব-মন্দিরের ত্রিশূল-শোভিত উচ্চ চূড়াটা ভেঙে পড়ল,—সোল্লাসে একবার ডি-জোহন্ বলে উঠ্‌লেন, "মেরিয়ার জয়।"

তাঁরি ডান কাঁধের উপর দিয়ে অসম্বৃত আঁচল উড়িয়ে ঝড়ের মত বেগে ছুটে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কে যেন। সচকিত সর্দ্দার বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে দেখলেন,—সেই রমণী!—শঙ্করী!

কত বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগালের তটভূমি যেদিন পরিত্যাগ ক'রে ডি-জোহন্ ভাগ্যান্বেষণে সাগরে ভেসেছিলেন, সেদিন থেকেই জীবনের অন্যান্য সুখস্মৃতির বন্ধনগুলিকেও তিনি ওপারেই ঝেড়ে ফেলে এসেছিলেন। কোনোদিন আবার জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে সেই আজন্মের ছেঁড়া বন্ধনগুলিকে কুড়িয়ে নেবেন এ বাসনা আর তাঁর মনে ছিল না। এই 'জেণ্টু'র দেশে নূতন কোনো বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেও হারিয়ে ফেলবেন না,—এ সঙ্কল্পও তাঁর ছিল—তথাপি এই লুণ্ঠন শেষে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিলেন এই বিজিত জমিদারীর বুকে নিজের আসন বিছিয়ে বসলেই বা মন্দ হয় কি? এই জমিদার-কন্যা বিধবা রূপসীটিকে খ্রীষ্টানোচিত প্রথায় বিবাহ ক'রে বা একদম বিবাহ নাই বা ক'রে অঙ্কশায়িনী করলেই বা কি ক্ষতি?—নিজের দু'জন বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে জমিদার-কন্যাকে সমর্পণ করে তিনি আপাততঃ এই অবিশ্বাসীদের মন্দিরগুলি পুড়িয়ে দিতে এসেছিলেন।

ডি-জোহন্ আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন—যদি উদ্ধার করতে প্যারেন আগুনের দাহে হাত যেন পুড়ে গেল—তিনি হাত টেনে নিলেন। পিছন ফিরে দেখলেন তাঁর অনুচর দু'জন ভয়ে কাঁপছে—নখাঘাতে তাদের কপাল, গাল ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছে।

ক্ষণকাল ডি-জোহন বিমূঢ় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন,—দেখলেন আগুনে সে নারীর অঙ্গের বসনের চারিদিক্ ঘিরে ধরেছে। —মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করে তিনি বললেন, "সুন্দরী! তোমায় বাঁচাবই।" মাথার শিরস্ত্রাণ ও গায়ের পরিচ্ছদ টেনে ছিঁড়ে ফেলে অর্দ্ধনগ্ন ফিরিঙ্গী সর্দ্দার আগুনের দিকে ঝাঁপ দিলেন। ঠিক তখনই ভগ্ন-চূড়ার অর্দ্ধ-দগ্ধ একখানা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে অনল-পরিবৃতা রমণী তার দিকে সবলে ছুঁড়ে মারল—কটাক্ষপাতের সময় ছিল না, হাত তুলে বাধা দেবার অবসরটুকু ছিল না। সর্দ্দারের কপালে ঠেক্‌তেই রক্তের ধারা ছিট্‌কে লাফিয়ে উঠ্‌ল,—ডি-জোহন একবার মাত্র যীশুর নাম উচ্চারণ করতে না করতেই ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

আগুনের সরোষ গর্জ্জন ছাপিয়েও আগুন-পরিধির ঠিক বুক থেকে একটা বিকট অট্টহাস্য শোনা গেল।

একদিন একরাত্রি পরে যখন সেই বিজিত রাজপুরীর আঙিনায় ডি-জোহনের জ্ঞান ফিরে এল, তখন সাম্‌নের শিব-মন্দিরের রয়েছে শুধু ভস্মরাশি আর দগ্ধ থাককত মসীকৃষ্ণ পাথর। যে কঠিন শীলাতল নির্ভর-পরা দর্পিতা পূজারিণীর লজ্জা ও লাঞ্ছনা ঔদাস্য-ভরে সয়েছিল,—তার কাতর প্রার্থনায়ও বক্ষদীর্ণ করে তাকে আপন অন্তরে গ্রাস করে রক্ষা করে নি,—দুইটি রাত্রির শেষে তাহারি অগ্নিশুদ্ধ দেহ-শেষ ভস্মরাশিতে তাকে মুখ গুঁজে অবগুণ্ঠন টানতে হ'ল। মুক্ত আঙিনায় চোখ খুলতেই ডি-জোহন দেখলেন, সেই দগ্ধ প্রস্তরখণ্ডগুলি আর সেই ভস্ম-স্তূপ। ভয়ে তার চোখ বুজে গেল।

পাশ ফিরে সর্দ্দার বল্‌লেন, "ইস্‌লামাবাদের পাশে ফিরিঙ্গীদের মধ্যে যে নূতন পাদ্রী এসেছেন, তাঁকে আন্‌তে লোক পাঠাও। তাঁর কাছে সব কবুল করে মুক্তির আশ্বাস না পেয়ে আমি স্বর্গলোকে যেতে পারছি না।

সাতদিন পরে পাদ্রী এলেন, সঙ্গে এক ফিরিঙ্গী চিকিৎসকও এলেন। আরো সাতদিন পরে শয্যায় উঠে

ব'সে ফিরিঙ্গী সর্দ্দার হুকুম দিতে দিতে বললেন, "যীশুর একনিষ্ঠ ভক্তকে এখনো দেবদূতরা নিয়ে যেতে প্রস্তুত নন ;—এই খানে প্রভুর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁকে আগে করতেই হ'বে। অবিশ্বাসীর ভাঙা মন্দিরের উপর বিশ্বাসীর গির্জ্জা উঠবে—সেই 'কুমারী জননীর' জয়ধ্বনি এখানে উঠ্‌বে। বক-দ্বীপে তাঁর ও তাঁর অনুচরদের যে এ দেশী সন্তান আছে এখানেই তাদের বসতি পত্তন হবে।

এক বৎসর পরে সেই গির্জ্জার প্রারম্ভের প্রশস্তি পাঠে যখন পাদ্রী এক মহাভূমিকে ঈশ্বরের পুত্রের মহানামে অদূর ভবিষ্যতে দীক্ষিত হবার স্বপ্ন দেখে সম্মিলিত ফিরিঙ্গীদের কাছে এ মহাকার্য্যের উদ্যোক্তা সর্দ্দার ডি-জোহনের জন্য স্বর্গলোকে কোন্ আসন নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন্ স্তব গানে র‍্যাফেল মাইকেল্ প্রভৃতি দেবদূতগন তাঁর শুভাগমনে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করবেন, কোন্ অক্ষয় পরম মহনীয় অনন্ত আনন্দ-রাশি তাঁর জন্য সঞ্চিত হচ্ছে, তা গদ্‌গদ্ ভাষে ব্যক্ত করছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর অগ্রে উপবিষ্ট সর্দ্দার ডি-জোহন্ তখন স্থির বিস্ফারিত নেত্রে দেখছিলেন, বেদি-শিরের কুমারী-জননী ও তাঁর ক্রোড়স্থ ত্রাতার মূর্ত্তি।—স্বর্গ-সুখের চিত্র অসম্পূর্ণ রয়ে গেল পাদ্রীর মুখে,—বেদিতলে আর্ত্ত চিৎকারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লেন সর্দ্দার ডি-জোহন্। বেদীর কোণে কপাল ঠেকতেই পুরোণো ক্ষত থেকে আবার দর্ দর্ করে রক্ত ছুটে বেরুল।

সেই গির্জ্জায় সেই আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানায়মান আলোকে সর্দ্দার ডি-জোহন্ তাঁর করাল ভয়াল ক্রুর-কামনা-পঙ্কিল জীবন-কাহিনী নিঃশেষে উদ্ঘাটিত করলেন পাদ্রীর পায়ে,—ঘনায়মান মৃত্যুর কাছে যাচ্ঞা করলেন নিষ্কৃতির আশ্বাস। সে আশ্বাস দিয়ে পাদ্রী জর্ডনের পবিত্র বারি সিঞ্চনে তাঁর কপালে আঁকতে চেষ্টা করলেন পবিত্র ক্রশ-চিহ্ন। ডি-জোহনের কপালে সে জল স্পর্শ মাত্র তিনি চম্‌কে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "ফাদার! ফাদার! কপাল পুড়ে যাচ্ছে যে।"—জর্ডনের জল কপালের উপর জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠ্‌ল—যেন তরলিত অনল। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত আবার উচ্ছ্রিত হয়ে বেরুল। বিস্ময়াকুল পাদ্রী কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, ডি-জোহান্ প্রভুর বিশ্বস্ত অনুচর! একবার ওই "কুমারী জননী ও তাঁর শিশুর দিকে তাকাও। সমস্ত অশান্তি ঘুচে যাবে।"

বেদীর উপরে শয়ান ডি-জোহন্ ভয়ে-ভয়ে মুখ তুললেন ;—সেই মাতৃমূর্ত্তির চারিদিকে তখন মোমবাতি জ্বলে উঠেছে,—প্রশান্ত সৌম্য সস্নেহ দৃষ্টিতে যীশু জননীর মুখ উজ্জ্বল। ডি জোহনের স্থির দৃষ্টিতে আর্ত্ত দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌ল,—ক্ষীণ কণ্ঠ আর একবার আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"বাঁচাও! বাচাও! পুড়তে দিয়ো না ওই 'জেণ্টু' নারীকে!"—তাঁর চোখ বড়, আরো বড় হয়ে উঠ্‌ল—শেষে মাথা নুয়ে বেদীর উপরে লুটিয়ে পড়ল—সমস্ত দেহ থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে শেষে স্থির হয়ে গেল।

সেই গির্জ্জার প্রশস্তি-পাঠের সেই সন্ধ্যায়ই পুরোহিত ভীত মুহ্যমান ফিরিঙ্গী অনুচরদের কাছে এই পবিত্র কর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার ডি-জোহনের জীবনান্তের শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

বিস্মৃতির প্রদোষ অন্ধকারের মধ্যে পুরোণো রাজপুরী তলিয়ে গেল, নূতন গির্জ্জার ক্রুস চিহ্নিত উদ্ধত শির যেখানে পুরোণো মন্দিরের ত্রিশূল-শোভিত দর্পিত চূড়া চিতাশয্যা পেতেছিল সেখানে লোটায়ে পড়ল ; শুধু এই তিনটি গ্রাম জুড়ে রয়েছে তিন হাজার ফিরিঙ্গী বংশধর,—বাংলার বিস্মৃত-প্রায় এক কালের শেষ চিহ্ন তাঁরা, এক কালের বিকট বীভৎসতার গ্লানিকর পশরা তাঁদের শিরে।

ভাঙা গির্জ্জার অদূরে আজ নূতন গির্জ্জা রয়েছে সেখানে শাদা আইরিশ পাদ্রী বা কালো গোয়ানিজ পাদ্রী এই তিন হাজার কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতাঙ্গ বংশধরদের যীশুমাতার করুণা বেটে দিচ্ছেন।—একদিন হৃদয়হীন নির্ম্মমতায় ফিরিঙ্গী ডাকাতের দল যাদের লাঞ্ছিত করেছেন আজ হৃদয়হীন অবজ্ঞার উপহার তাদেরই হাত থেকে ফিরিঙ্গী সন্তানদের হাত পেতে নিতে হচ্ছে।—পর্ত্তুগালের দূরভূমি তাদের বিস্মৃত হয়েছে ; বর্ণ গর্ব্বিতের বর্ণ-মহিমা ঘুচে গেছে, ধন-লিপ্সুর ধনাকাঙ্ক্ষা অন্নহারা দৈন্যে অবসান লাভ করেছে,—'জেণ্টু'র ভাষা ছাড়া তার আজ অন্য ভাষাও নেই।—

শোধবোধ

শ্রীগোপাল হালদার

রেল্‌ওয়ে ষ্টেশনের এক ফিরিঙ্গী ইঞ্জিন ড্রাইভার কেমন করে লাইন পের'তে গিয়ে একটা 'শ্যান্টিং' ইঞ্জিনের নীচে চাপা পড়ে গেছে—তারই মৃত্যু-শয্যায় পাদ্রীর ডাক পড়ল।

স্বীকারোক্তির অবসর ছিল অল্পই-ফ্রান্সিস্ ডি জোহনের মৃত্যুর অল্প কয়টি নিমেষমাত্র বাকী ছিল। ফ্রান্সিস্ বহু কষ্টে বলে গেল, "ফাদার! পবিত্রতা জীবনে অটুট থাকেনি—কজনারই বা তা আছে আমার বন্ধুবান্ধবদের, তোমার যজমানদের?—তা নয়; কিন্তু ফাদার! পাপ আমার আরও ভয়ানক; হয়ত তার থেকে নিষ্কৃতিও তুমি আমায় দিতে চাইবে না—এত কুৎসিৎ।"

কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস্ বলল, "শোনো।—আমার বোন্ মনিকা—মনে আছে? যাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমি তোমায় দু'হাতে টাকা বিলিয়ে দিয়ে ছিলুম? ছয় মাস আগে ঠিক এই লাইনের উপরেই সে কাটা গেছে, বড় সাহেবের কুঠির ফটকটার কাছে,—সেদিন সে ইঞ্জিনে আমিই প্রথম ফাষ্ট ড্রাইভার হ'য়ে সদর্পে গাড়ী ছুটিয়ে ফিরছি।—তিন জন লোকের উপরের দাবী ডিঙিয়ে আমাকে বড় সাহেব ফাষ্ট ড্রাইভার ক'রে ছিলেন—কেন?—মণিকা সুন্দরী ছিল, ইংরেজী জানত খাসা! তাঁর বদলে আমি পেলুম ফার্ষ্ট ড্রাইভার-গিরি। কিন্তু সে আর মুখ দেখালে না। ফাদার! শুধু আমারই অনুনয়ে—ভাই-এর কথায়—বোন্ তাঁর সর্ব্বস্ব খুইয়েছিল;—কিন্তু বাঁচতে আর চাইল না। ফাদার! আমার কি মুক্তি আছে?"

মাথা নীচু করে পাদ্রী ষ্টেশন থেকে ফিরছিলেন। সঙ্গের খৃষ্টান চাকরটি অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করল, "ফাদার! কোথায় ফ্রান্সিস্‌কে 'গোর' দেবেন?"

"সে বলে গেছে, ওই ভাঙ্গা গির্জ্জার ডানদিকে।"

"তাই হোক্। আজ ছয় মাসের মধ্যে সে এই গির্জ্জার ছায়াও মাড়ায় নি—কুমারী জননীর কাছে একবারও হাঁটু নীচু করে প্রার্থনা করে নি। বলত এসব তার সহ্য হয় না। অবশ্যি, ওর বোনের মৃত্যুর পরই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। তবু, আমাদের গির্জ্জার কাছে ওর সমাধি না হওয়াই ঠিক হয়েছে।"

দু'শ বৎসর আগে এই তিন গাঁএর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যেখানে উদ্দাম আবিলতাময় জীবনের শেষ অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত, তাঁর স্মৃতি ও কথা সমস্ত গাঁএর মন থেকে কবেই মুছে গেছে, তাঁর আপনার জনের মনের পটেও একটি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নেই;—তথাপি দু'শ বৎসর শেষে তাঁরই অভিশপ্ত বংশের শেষ সন্তান নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁরই পার্শ্বে সমস্ত জগতের অজ্ঞাতসারে দু'শ বৎসরের পঙ্কিল দুর্ভাগ্যের বোঝা নামিয়ে শেষ শয্যা বিছিয়ে চির সুষুপ্তিতে লুপ্ত হল।

১৭

সে দিন আর ছবি আঁকা হ'ল না। পথশ্রান্ত সন্তোষের পরিচর্য্যার দিকে দ্বিজনাথ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন; সেই সুযোগে বিনয় তার সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে নিয়ে এক সময়ে অন্তর্হিত হ'ল। যাবার আগে দ্বিজনাথের টেবিল থেকে একটুকরা কাগজ নিয়ে তাতে লিখলে,—শ্রীচরণেষু, আজ রাত্রের ট্রেনে আমি কলকাতা যাব, সুতরাং ছবি-আঁকা উপস্থিত বন্ধ রইল। কতদিনের জন্যে তা বলতে পারছি নে তবে সম্ভবতঃ বেশি দিনেরই জন্যে। তাই যে টাকাটা আপনি আমাকে আগাম দিয়েছিলেন, সেটা সুকুমারের কাছে রেখে যাব, সে আপনাকে দিলে অনুগ্রহ ক'রে তা গ্রহণ করবেন। তা ছাড়া, ছবি-আঁকা নিয়ে যে হাঙ্গামাটা আপনাদের ভোগ করতে হয়েচে অথচ যা উপস্থিত সার্থক হ'ল না, তার যে কি করব তা জানিনে। আশা করি আপনার অমিত স্নেহ ও করুণার হিসাবে তার কাটান হবে। তা ছাড়া আর উপায় কি? ছবিটা আপাতত যেমন আছে থাক, দেখব পরে কোনো সময়ে যদি তার গতি করতে পারি। আপনি আমার শ্রদ্ধাসহ প্রণাম গ্রহণ করবেন, এবং অনুগ্রহ ক'রে আমার প্রণাম ঠাকুরমাকে ও নমস্কার মিস্ মিত্রকে জানাবেন। ইতি স্নেহাধীন শ্রীবিনয়ভূষণ রায়। চিঠি লেখা শেষ হ'লে কাগজখানা ভাঁজ ক'রে উপরে দ্বিজনাথের নাম লিখে একটা কাগজ-চাপায় চেপে রেখে সে চ'লে গেল।

বিনয় চ'লে যাবার আধ ঘণ্টাটাক্ পরে দ্বিজনাথের হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে বিনয় নেই, চ'লে গিয়েছে। তখন তিনি একেবারে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন. কখন্ গেল, কেন গেল, কাকে কি ব'লে গেল ইত্যাদি প্রশ্নে বাড়িশুদ্ধ লোক অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল। চাকররা বল্‌লে, বহুক্ষণ পূর্ব্বে সে চ'লে গিয়েছে, কিন্তু যাবার সময় তাদের কিছু ব'লে যায় নি। কমলা বল্‌লে, কখন সে গিয়েছে তা জানে না; সুতরাং কেন সে গিয়াছে তা-ও জানে না। পদ্মমুখী বল্‌লেন, সে যে সে দিন এসেছিল তাই তিনি জানেন না।

"তুমি কিছু জান সন্তোষ? যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

এই অনাবশ্যক প্রশ্নে পুলকিত হ'য়ে সহাস্য মুখে সন্তোষ বল্‌লে, "আমার সঙ্গে দেখা হ'লে আপনার সঙ্গেও ত দেখা হ'ত।"

যুক্তির সারবত্তায় পরাজিত হ'য়ে অপ্রতিভ মুখে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তা সত্যি।" মনটা অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল এই মনে ক'রে যে সন্তোষের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার ফলে তার প্রতি যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হ'য়েছিল তারই জন্যে ক্ষুব্ধ হ'য়ে সে চ'লে গিয়েছে। বিকাল বেলা বাসা তুলে চ'লে আসবার কথাটা পাকাপাকি হ'তে পারল না এই অনুশোচনায় নিজের প্রতি একটা বিরক্তি দেখা দিলে, আর তারই সঙ্গে দেখা দিলে বিনয়ের প্রতি একটা সূক্ষ্ম অভিমান। মুখে প্রকাশ্যে বল্‌লেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! চ'লে গেল, কিন্তু কিছু ব'লে গেল না?"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দূরে দাঁড়িয়ে কমলা পিতার এই কাতরোক্তি শুনে মনে মনে মাথা নেড়ে বল্‌লে, তা কথ্‌খনো নয়, নিশ্চয় ব'লে গেছেন। তারপর সন্তোষকে নিয়ে দ্বিজনাথ পুনরায় ব্যাপৃত হবামাত্র সে পিতার টেবিলে উপস্থিত হয়ে কাগজ-চাপায় চাপা বিনয়ের চিঠি দেখ্‌তে পেয়ে নিজের অনুমান পূর্ণ হওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। চিঠিখানা তুলে নিয়ে খুলে সে একবার, দুবার, তিনবার পড়লে; তারপর চতুর্থবার আর একবার ভাল ক'রে পাঠ ক'রে যেমন চাপা ছিল তেম্‌নি ভাবে চেপে রেখে ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে প্রস্থান করলে। বিনয়ের চিঠির কথা কিন্তু দ্বিজনাথকে সে কিছুই জানালে না।

মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হবার পর কিছুক্ষণ গল্প-গুজবে কাটিয়ে অনিদ্রা-পীড়িত সন্তোষকে একটু বিশ্রাম করবার উপদেশ দিয়ে দ্বিজনাথ যখন নিজের টেবিলের সম্মুখে এসে বসলেন তখন বেলা দেড়টা। অভ্যাস অনুযায়ী দৈনিক খবরের কাগজখানা নিতে গিয়ে চোখে পড়ল বিনয়ের চিঠি। খবরের কাগজখানা ফেলে দিয়ে চিঠিখানা নিয়ে চশমা বার ক'রে প'ড়ে দ্বিজনাথের মুখ সন্ধ্যাকাশের মত আরক্ত আর কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। উচ্চস্বরে ডাকলেন, "কমল! কমল!"

পাশের ঘরে কমলা এ আহ্বানের জন্য প্রস্তুত ছিল; সে জান্‌ত দ্বিজনাথের প্রবেশের অনতিবিলম্বেই এই ডাক পড়বে।

পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে কমলা জিজ্ঞাসা করলে "কি বলছ বাবা?"

ক্রোধ, বিস্ময়, বিরক্তি, দুঃখ—সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিগুলো মুখমণ্ডলে একসঙ্গে ব্যক্ত ক'রে চিঠিখানা কমলার হাতে দিয়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "কাণ্ডটা একবার দেখ!"

পঞ্চমবার চিঠিখানা পাঠ ক'রে ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে কমলা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

কমলার মন্তব্যের প্রত্যাশায় খানিকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা ক'রে দ্বিজনাথ পুনরায় রুষ্টস্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন। "দেখ্‌লে একবার ব্যাপারখানা?—কি যে অপরাধ হয়েচে তা জানিনে, চল্লাম একবারে রাত্রের গাড়িতে কলকাতা! রইল প'ড়ে তোমার ছবি আঁকা!—তারপর কথা শোন! আগাম দেওয়া টাকা ফেরৎ দিয়ে গেলাম, অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করবেন। আজকালকার ছেলেদের আত্মসম্মান জ্ঞান এত বেশি টন্‌টনে হয়েচে যে অপরের সম্মানের ওপর কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখা দরকার ব'লে তারা মনে করে না। কাজটা শেষ হ'ল না ব'লে তিনি সইবেন তাঁর করা পরিশ্রম, কিন্তু আমাকে ফেরৎ নিতে হবে আমার দেওয়া টাকা। দিয়ে ফেরৎ নেওয়া জিনিষটাকে এরা এতই সহজ মনে করে!—আশ্চর্য্য!"

কমলা বল্‌লে, "কিন্তু বাবা, কাজ শেষ না ক'রে আগাম-নেওয়া টাকা ফেরৎ না দিয়ে চ'লে যাওয়া ত সহজ কথা নয়!"

দ্বিজনাথ উচ্চস্বরে বল্‌লেন, "কিন্তু—চ'লে যেতে কে বল্‌ছে তাকে? চুক্তি ভেঙ্গে চ'লে যাওয়া কি এতই সহজ কথা যে গেলেই হ'ল? আইন নেই? আদালত নেই? হাকিম নেই, বিচার নেই! আমি তোমাকে ব'লে রাখচি কমল, এ আমি কখনই সইব না। আমি তাকে একটু শিক্ষা নিশ্চয়ই দোবো।"

কমলা নিঃসন্দেহে জান্‌ত এ সমস্তই ফাঁকা আওয়াজ, এর মধ্যে টোটাও নেই ছর্‌রাও নেই যে কোনো দিক দিয়ে আঘাতের কোনো সম্ভাবনা আছে। বল্‌লে, "তা তোমার যা ভাল মনে হয় কোরো বাবা,—কিন্তু এই সুযোগে ছবি আঁকা বন্ধ হ'লে এক রকম ভালই হয়"

দ্বিজনাথ যেন ভিতর থেকে একটা আঘাত পেয়ে ঝাঁকা দিয়ে উঠলেন। "ক্ষেপেছ তুমি! ওই ছবি আমি দশ দিনের মধ্যে শেষ করাব তবে নিরস্ত হব! আজ রাত্রের গাড়িতে কে কল্‌কাতা যায় তা আমি দেখ্‌চি!"

অলক্ষ্যে কমলার মুখমণ্ডলে নিশ্চিন্ততার একটি মৃদু হিল্লোল খেলে গেল; বল্‌লে, "বাবা, এখন তা হ'লে আমি আসি?"

শান্তস্বরে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "এসো।"

১৮

অপরাহ্ণ চারটার সময়ে বারান্দায় ব'সে দ্বিজনাথ সন্তোষকে নিয়ে চা পান করছিলেন, এমন সময়ে ধীরে ধীরে তাঁর মোটর এসে সম্মুখে দাঁড়ালো।

কমলা বল্‌লে, "গাড়িতে কি তুমি বেরুবে বাবা?"

"হাঁ।"

"এই রদ্দুরে কোথায় যাবে?"

"বিশেষ কোথাও নয়। এমনি একটু ঘুরে আস্‌ব।"

উচ্ছ্বসিত হাসি দমন ক'রে কমলা বল্‌লে, "সুকুমার বাবুদের বাড়ির দিকে যাবে কি?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তা হয়ত যেতেও পারি। কেন বল দেখি?"

মৃদুস্মিত মুখে কমলা বল্‌লে, "একবার তা হ'লে আমি শোভার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতাম।"

একটু চিন্তা ক'রে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তোমার আজ গিয়ে কাজ নেই, সন্তোষ তা'হলে নেহাৎ একলা পড়বেন।"

সন্তোষ সহাস্যমুখে বল্‌লে, "আমিই বা একলা পড়ব কেন? আপনারা যদি যান আমিও না হয় আপনাদের সঙ্গে যাই।"

এ কথার উপর আর কোনো কথা বলা চলে না; অগত্যা দ্বিজনাথ বল্‌লেন. "বেশ, তা হ'লে তোমরা শীঘ্র তৈরী হ'য়ে নাও, আমি প্রস্তুত আছি।"

উভয়ে গেল প্রস্তুত হ'য়ে আস্‌তে। সুটকেস্ থেকে একখানা রেসমি পাঞ্জাবী বার ক'রে গায়ে দিয়ে দুমিনিটের মধ্যে বাইরে এসে সন্তোষ বল্‌লে, "আমি প্রস্তুত।"

দ্বিজনাথ সমনোযোগে সন্তোষের বেশের পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন, "পাঞ্জাবী আর ব্লাউসে অনেক তফাৎ—ব্লাউস্ এখনো পুরো অপ্রস্তুত। ব্লাউস্ যদি তার অচলতা দিয়ে পাঞ্জাবীকে টেনে না রাখত তা হ'লে পাঞ্জাবী এতদিনে এগিয়ে গিয়ে আফগানী হ'য়ে উঠ্‌ত!" ব'লে স্বীয় রসিকতার উপভোগে হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগলেন।

মৃদু হেসে সন্তোষ বল্‌লে, "শুধু ব্লাউসই নয়,—তৎপরতার পক্ষে মেয়েদের মাথা একটা মস্ত বাধা। অযথা মাথার চুলকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে তুলে তাকে গুছিয়ে নেবার সময় তৎপর পুরুষ জাতির সত্যিই ধৈর্য্য নষ্ট হয়।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "সেই সময়টায় তোমরা যদি নিজেদের দাড়ি গোঁফ্ কামিয়ে নাও তা হ'লে বোধ হয় উভয় পক্ষের আর অনুযোগের কোনো কারণ থাকে না। চাষা যখন ধান কাটে চাষা-বউ তখন গোছা বাঁধে;—মাঠের নিয়মটা মাথায় চালালে মন্দ হয় না।"

সন্তোষ বল্‌লে, "কিন্তু কাট্‌তে যা সময় লাগে বাঁধতে যে তার অনেক বেশি লাগে।"

দ্বিজনাথ মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "সব সময়ে কিন্তু তা নয়। আমাদের বারের পি, ডি'র কথা জানো? পুরো একটি ঘণ্টা তার লাগে দাড়ি কামাতে। দাড়ি কামানোর জন্যে তার পয়সা কামানো হ'ল না। মক্কেল এসে ব'সে থেকে থেকে বিরক্ত হ'য়ে চ'লে যায়। কেউ সে কথা বল্‌লে বলে, 'দাড়ি কামানো নিজের হাতে, পয়সা কামানো বরাতে। বরাতে কামানোর চেয়ে নিজের হাতে কামানোই আমি বেশি পছন্দ করি। আমি দৈববাদী নই, পুরুষকারবাদী। মিসেস পি, ডি একবার দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, "তুমি যদি ও-রকম ক'রে এক ঘণ্টা ধ'রে দাড়ি কামাও তা হ'লে আমি তোমারি ক্ষুরে মাথা মুড়োবো। তা'তে ব'লেছিল, "অমন কার্য্যটি কোরো না—ক্ষুর ভোঁতা হ'য়ে গেলে তোমার দুঃখের কারণ বেড়েই যাবে।" ব'লে অপরিমিত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হাস্‌তে লাগলেন।

এমন সময়ে কমলা ফিরে এল—যে বেশে যে অবস্থায় গিয়েছিল, ঠিক্ সেই বেশে সেই অবস্থায়। দ্বিজনাথ তাকে দেখে বিস্মিত স্বরে বল্‌লেন, "একি কমলা! এখনো তুমি একটুও তৈরী হও নি! তোমার মতলব কি বল ত?"

অপ্রতিভমুখে কমলা বল্‌লে, "আমার তৈরী হ'তে দেরী হবে বাবা। তোমাদের তাড়া আছে, তোমরা যাও।"

হাস্‌তে হাস্‌তে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "এ বিবেচনাটুকু আর একটু আগে করলেই ত' ভালো করতে মা।" তারপর সন্তোষের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আমার তাড়া সত্যিই আছে, কিন্তু তোমার কোনো তাড়া নেই। তুমি একটু অপেক্ষা কর, কমলা তৈরী হ'য়ে নিক্। ততক্ষণে রোদ্দুরও প'ড়ে যাবে, তারপর পাহাড়তলী দিয়ে রেল্ লাইনের ধারে ধারে দুজনে একটু বেড়িয়ে এসো। ভারি চমৎকার লাগবে।" কমলার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "কি বল কমল?"

কোনো কথা না ব'লে কমলা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। অপাঙ্গে কমলার নিঃশব্দ আড়ষ্টভাব লক্ষ্য ক'রে ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্তোষ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'তার চেয়ে চলুন আপনার সঙ্গেই যাই।"

কি বল্‌বেন ভেবে না পেয়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "আমার সঙ্গেই যাবে?"

"মন্দ কি?"

কন্যার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে কন্যার পিতার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া মন্দ, একথা প্রকাশ্যভাবে খুলে বল্‌তে দ্বিজনাথের সঙ্কোচ হ'ল। বল্‌লেন, "তবে তাই চল।',

অন্তরাগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গাড়ীতে উঠে কমলাকে বললেন, "সন্তোষ এসেচেন, আজ রাত্রে তিন চার জনকে খেতে বল্‌তে পারি। সেই বুঝে পিসিমাকে খাবারের ব্যবস্থা করতে বোলো।"

কমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কাদের বল্‌বে বাবা?"

"বলব কি না তাই এখনো স্থির করি নি—তা কাদের বলব কি ক'রে বলি।"

পিতার এই স্বচ্ছ অকুটিল ছলনায় স্বেচ্ছায় প্রতারিত হ'য়ে কমলা বল্‌লে, "জানতে পারলে সেই মত ব্যবস্থা করতাম।"

তাঁর প্রচ্ছন্ন অভিলাষ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী কমলা ধরতে পারে নি, এই আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হ'য়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "শোন কথা! জান্‌তে পারলে আবার কি ব্যবস্থা করবে! সাধারণ ভদ্রলোককে খাওয়াতে হ'লে যেমন ব্যবস্থা করতে হয়, তাই করবে। বুঝ্‌লে?"

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে কমলা বললে, "বুঝেচি।"

"আচ্ছা, চলো।"

গাড়ি চল্‌তে আরম্ভ করলে।

গেটের কাছে এসে মহবুবকে লক্ষ্য ক'রে দ্বিজনাথ বললেন, "সোজা কার্সটেয়ার্স টাউনে সুকুমার বাবুর বাড়ি চলো—একটু জোরে।"

গেট পার হ'য়ে মুখ ফিরে গাড়ি বায়ুবেগে ধাবিত হ'ল।

সুকুমারের গৃহে যখন দ্বিজনাথ উপস্থিত হ'লেন তখন সুকুমার ও বিনয় দুই বন্ধু দীর্ঘকালব্যাপী তর্ক এবং বচসা থেকে সদ্য নিবৃত্ত হ'য়ে মুখ ভার ক'রে বারান্দায় ব'সেছিল। দূরে দ্বিজনাথের মোটর দেখ্‌তে পেয়ে উল্লসিত হ'য়ে সুকুমার বল্‌লে, "ঠিক হয়েচে! এবার জব্দ!"

বিনয় কোনো কথা বল্‌লে না, কিন্তু আবার একটা আসন্ন বাদানুবাদের আশঙ্কায় তার মুখে একটা সুস্পষ্ট বিরক্তির ছায়াপাত হ'ল।

মোটর সম্মুখে এসে থামতেই উভয়ে উঠে দাঁড়াল—সুকুমার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সাগ্রহে বল্‌লে, "আসুন মিষ্টার মিটার, আসুন!"

গাড়ির দরজা খুল্‌তে খুল্‌তে সুকুমারের দিকে চেয়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "অ্যারেষ্ট্ করতে এসেছি।"

সহাস্যমুখে সুকুমার বললে, "তা বুঝেচি। বেশ করেচেন।"

বারান্দায় উঠে এসে বিনয়ের কাঁধের ওপরটা সজোরে চেপে ধ'রে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "সাহস তোমার কম নয় ত হে?—হাইকোর্টের একজন দুর্ধর্ষ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ব্রিচ্ অফ্ কনট্র্যাক্ট করতে প্রবৃত্ত হও?" ব'লে হো হো ক'রে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

হাসির আকার এবং প্রকার দেখে বিনয় শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল। যে কথা দ্বিজনাথ ভাষায় ব'লেছিলেন তার উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু এ রকম হাসিকে কাটিয়ে ওঠা সুকঠিন।

সুকুমারের সঙ্গে সন্তোষের পরিচয় করিয়ে দিয়ে দ্বিজনাথ সন্তোষকে বল্‌লেন, "আচ্ছা, তোমরা দুজনে পাঁচ মিনিট পরস্পরে আলাপ পরিচয় কর—আমি ততক্ষণে আমার এই ইয়ং ফ্রেণ্ড্‌টির সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া ক'রে নিই।" ব'লে বিনয়কে হাত ধরে টেনে বারান্দার এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, "কেনই বা হঠাৎ আমাদের বাড়ি থেকে তুমি অমন ক'রে তখন চ'লে এলে, আর কেনই বা আজকে কলকাতা চ'লে যেতে চাচ্ছ আমাকে বল। লুকিয়ো না—সত্যি কথা বোলো।"

দ্বিজনাথের প্রশ্ন শুনে আর প্রশ্নের ভঙ্গি দেখে বিনয় বিহ্বল হ'য়ে নীরবে ক্ষণকাল চেয়ে রইল—তারপর ধীরে ধীরে বিমূঢ় ভাবে বল্‌লে, "বিশ্বাস করুন, তা আমি নিজেই ঠিক বুঝতে পারচিনে। কিন্তু আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই।"

"আচ্ছা, আর দিন দুই থাক—তারপরে হয় ত' সব ঠিক বুঝতে পারবে। আমার কথা শোন, অবাধ্য হ'য়ো না। ছবি তোমাকে আঁকতে হবে না।" ছবির কথা থেকে টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা মনে পড়ে গেল—সহসা উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বল্‌লেন, "ভাল কথা, টাকা তুমি ফেরৎ দিতে চেয়েছে কোন্ বিবেচনায়? টাকা যদি তুমি ফেরৎ দেও ত' তোমার পরিশ্রম আমি কি ক'রে ফেরৎ দিই বল?"

অপ্রতিভ হ'য়ে বিনয় বল্‌লে, "এখন সে সব কথা থাক—পরে যা হয় হবে। আচ্ছা, আপনার আদেশে আমি উপস্থিত যাওয়া বন্ধ করলাম, কিন্তু আপাতত আমাকে সুকুমারের বাড়ি থাকতেই অনুমতি দিন।"

হর্ষোৎফুল্লমুখে দ্বিজনাথ বল্‌লেন্ "আচ্ছা, তাই থাকো।"

(ক্রমশঃ)

"সনেট"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কান্তিচন্দ্র আমাদের অগ্রজ কবি-ভ্রাতা। বাঙ্গালা-সাহিত্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম "ওমার খৈয়ামের" সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার অনূদিত "ওমার খৈয়াম" আমাদের সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট দান এবং এতদ্দ্বারা যে বঙ্গের কাব্য-সাহিত্য কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা কাব্য-রসিকগণের আজ অবিদিত নাই। কান্তিচন্দ্র বঙ্গভাষা-ভাষীগণের সুপরিচিত এবং রবীন্দ্র-পর কবিগণের মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী কবি-হিসাবে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, সুতরাং ইঁহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

"সনেট" ছাড়া অন্য কোনও ভঙ্গীতে কান্তিচন্দ্র কখনও কিছু রচনা করিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না, অন্ততঃ আমরা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ নাই (অবশ্য "ওমার খৈয়াম" বাদে)। কাজেই, জীবন-ভোর যিনি কেবল সনেটই রচনা করিয়াছেন, তাঁহার সনেটে একটা বৈশিষ্ট থাকিবার কথা, এবং এই "সনেটের" মধ্যে তাহা আছে কিনা, আর এই গ্রন্থে তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীর কোন্ রূপ কতটা প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাই বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিশেষতঃ, এই "সনেট"ই যখন কান্তি বাবুর প্রথম মৌলিক রচনার কাব্য, তখন এই কাব্যখানির একটু আলোচনাও প্রয়োজন।

সনেট সম্বন্ধে কবির মনোভাব, কবি সনেটের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "সনেট-পঞ্চাশৎ" হইতে দুইটি ছত্র তুলিয়া তাঁহার "সনেট"-কাব্যের পুরোভাগে, কপালে রাজটীকার মত, মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন—

"ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।"

বাঙ্গালা-ভাষায় "চতুর্দ্দশপদী কবিতা" নাম দিয়া, মহাকবি মধুসূদনই প্রথম সনেট প্রবর্ত্তিত করেন। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ "কড়ি ও কোমল" "মানসী" "সোনার তরী" প্রভৃতি কাব্যে বাঙ্গালা সনেটে ভাবের দিক দিয়া একটা অনির্ব্বচনীয় রূপ ও সৌষ্ঠব দান করিয়াছেন। তাঁহার পরে, শ্রদ্ধাস্পদ প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সনেটকে এমন একটা রূপ দিলেন, যাহা আর কেবলমাত্র চতুর্দ্দশপদী কবিতা রহিল না; প্রমথবাবু মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের বক্স-মণিকণ্ঠী চতুর্দ্দশপদীর দ্বি-সপ্তপদী-ঘটকালী করিয়া বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট আনয়ন করিলেন। আর এই সনেটের মন্ত্রে বর্ত্তমান যুগের কবিগণের মধ্যে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন একমাত্র কান্তিবাবুই। পাশ্চাত্য ধরণে বাঙ্গালা সনেট রচনায় বৈশিষ্ট্য, প্রবর্ত্তক চৌধুরী-মহাশয়ের পরে, কেবলমাত্র কান্তিবাবুই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

"সনেটে" কবি কেবল প্রণয়ের গানই গাহিয়াছেন। যিনি সত্য প্রণয়ী, আসল প্রেমিক, তিনিই শুধু জানেন প্রেম কি—

"কবি কহে—পণ্ডিতের বন্ধ্যা হিয়া মাঝে,
প্রেমের জনম কভু সম্ভবে? না, সাজে?
সে তো কভু দেখে নাই রাধিকার সনে
কুঞ্জে বসি সারা বিশ্ব শুধু শ্যামময়,
বাঁশিটি বাজেনি যার হৃদি-বৃন্দাবনে,
সে কভু বুঝিতে পারে প্রেম কা'রে কয়?"

আর তিনিই জানেন প্রেমের বিরহই প্রাণ। বিরহই প্রেমকে সত্য শিব ও সুন্দর করে। বিরহই প্রেমের রস,

গীতিকাব্য—(কতকগুলি সনেটের সমষ্টি)। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ রচিত, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আয়ু এবং মৃত-সঞ্জীবন। জগতে তাই এই বিরহের বেদনাই কাব্য-লক্ষ্মীর সিংহাসন, কাব্য-সরস্বতীর মরাল, এবং কাব্য-সতীর শিব-ক্রোড়। সীতার বিরহে রামায়ণ, প্রিয়ার বিরহে মেঘদূত এবং কৃষ্ণ-বিরহেই বৈষ্ণব-পদাবলী; বিরহই বিশ্বের একান্ত আপন, প্রাণের নিভৃত ও শ্রেষ্ঠ চেতনা এবং মানবের মনে চিরন্তন অমৃতরস-ধারার গোমুখী।

কবি, তাই গ্রন্থারম্ভেই আভাস দিতেছেন— "বিশ্ব শুধু শ্যামময়" দেখিতে হইলে বিরহ বেদনাতেই তাহা সম্ভব, মিলনের ক্ষণিক তৃপ্তিতে নয়; মিলনে যে প্রেম অঙ্কুরিত হয়, বিরহে তাহাই মুকুলিত হয়।

কবির "——তাই জাগে ভয়

মিলনের রজনীতে যদি বাহু ডোর
শ্লথ হ'য়ে খ'সে পড়ে কণ্ঠ হ'তে মোর
অবসাদ-খিন্ন প্রেম পায় যদি লয়!

বিরহের মধ্য দিয়া, বিরহ-বেদনার পরপারে এইযে প্রেমের সাধনা, কবি আপনার অন্তরে সেই সত্যটি গাঢ়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং এই কাব্যমধ্যে সেই বাণীটিই নানা ছন্দে নানা রূপে নানা বৈচিত্র্যে, প্রকাশ করিয়াছেন। কবির মতে, মিলনে প্রেম অগভীর, অলীক ও ক্ষণিক। "শরীরীর গাঢ় আলিঙ্গনে" ক্ষণিক তৃপ্তি আছে, সেটা সাধারণ দেহ-বিলাসী অপ্রেমিকের একান্ত কামনার ধন, কিন্তু প্রকৃত যে প্রণয়ী—প্রণয়কে যে চিরস্থায়ী করিয়া অন্তরে পূজা করিতে চাহে, যে প্রেম—"মরণে জীবনখানি রচি দিবে নব,

* * *

সংসার-সীমানা-পারে অরণ্যের ছায়"

যে প্রেমে—"পরাণ আজিকে তৃপ্ত পরাজয় মানি"

যে প্রেমের—"স্খলিত দলিত শুষ্ক মিলনের মালা
পড়ে' আছে শয্যা'পরে শতছিন্ন ডোর—
শুধু জেগে আছে স্মৃতি—পীড়িত নিরালা—"

সে প্রেম—

"রূপেতে অরূপ-পূজা—মিলন দুয়ারে
নব সৃষ্টি তরে * বলি আপনারে।"

সে প্রেমে কবির—

"* * আজি মোর সাধনার শেষ,"

সেই যে প্রেমের দেবতা—

"পরাব তারে মানবের বেশ
সৃজন-রহস্য ঘেরা মন্দিরের মাঝ।

আর, সে প্রেমের সুর কি? সে প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কিসে?

"বিসর্জ্জনী সুর সেথা বাজিছে নিয়ত।"

এই "বিসর্জ্জনী সুরই" "সনেটে"র প্রাণ। বিরহের এমন সরস সতেজ ও প্রাণস্পর্শী ব্যঞ্জনা বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যে বিরল। আর প্রণয়ের এই সত্যমঙ্গল রূপের ধ্যানই "সনেট" কাব্যের বিশেষত্ব।

বিরহের পাশাপাশি, মানবের সহজ ও স্বাভাবিক মিলনাকাঙ্খা "সনেটের" বিরহের সুরে এমন একটা অনবদ্য মূর্চ্ছনা ও উপল-মুখরতার মাধুর্য্য দিয়াছে, যাহা পাঠকের মনে কেবলি একটা ব্যাকুলতা, একটা আবেশ ও একটা রূপ জাগাইয়া জাগাইয়া, তাহাকে বিরহের কল্পলোকে লইয়া গিয়া তবে ছাড়ে।

কবি বলিতেছেন—

"তবে আসিওনা আজ কমমূর্ত্তি ধরি,
দূরে রহি বাঞ্ছিতেরে শুধু ভালবেসো,
মিলনে ক্ষণিক তৃপ্তি—দিবা বিভাবরী
অমূর্ত্ত রূপেতে তুমি কল্পনাতে এসো।"

কিন্তু প্রেমিক যে সাধক; তাহার কি সে-মূর্ত্তি কখনও মুছে?

"অজানা বিভব
আমারে রেখেছে করি নবীন সরস।"

এ 'বিভব অজানাই' বটে! সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে সকলেই এই "অজানা" কে জানিবার জন্য কত না প্রাণ-পণ প্রয়াস করিতেছে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত এ রহস্যের কোনো দ্বারই উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই! এ "অজানা" চিরন্তন অজানাই!

"কখন্ ফুরায়ে গেল অভিসার রাতি।"
"ছিন্ন মালা চেয়ে আছে অতীতের পানে,
শুধু আছে গন্ধটুকু—বাসরের স্মৃতি।"

প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মানব-মনের সেই অবস্থা, যখন উভয়েই ভাবে কেহই কাহাকে বুঝিতে পারিতেছে না,

তাই একজনের এই দুঃখ। হয়ত, অন্যজন বেশ সুখেই আছে, তাহারি যত কষ্ট, যত দুঃখ, যত ব্যথা।

আমার বেদনা আমার প্রেমাস্পদ বুঝে না ভাবায়, প্রেমের যে শুধু গভীরতাই সূচিত হয় তাই নহে, ইহাতে একটা আপনকরা রস-উচ্ছল সান্ত্বনা আছে, একটা তন্ময়তা আছে, একটা বৈরাগ্য আছে, একটা মাধুর্য্য-ভরা ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত আত্মনিবেদন আছে।

হায়রে দুর্ব্বল মানব-মন! ভালবাসিলে তাই মনে হয়। এ কথা জীবনে যে একবার সত্য ভালবাসিয়াছে, সেই বুঝিবে।

তাই"—সে রাতি ভুলিনি আজো—স্মৃতিপটে লিখা---
তোমার চরণ-ধ্বনি শুনিবার আশে
জেগে বসেছিনু মোর বাতায়ন পাশে—
* * * *
চোখে এল ঘুমঘোর * * *
তুমি এলে। * * * *
বাসরের দীপ-শিখা কখন্ না জানি
সরমে মরিয়া গেল। কোথায় লুকালো
উদাস ভৈরবী মাঝে কামনার বাণী।"

কামনা মানুষের সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মানুষ তাহাকে একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে না।

এইখানে কবি একটি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়া কামনার গভীরতা যে কত, তাহা একটি কথায় অতি চমৎকার প্রকাশ করিয়াছেন—

"হে মোর বাসন্তী প্রিয়া, আজ মনে হয়—
রূপে না ফুটিয়া যদি আসিতে গো সুরে,
থাকিত না এ আসন্ন বিরহের ভয়।
মোদের মিলন-রাতি কোন সুরপুরে
রহিত অমর হয়ে' অনন্ত অক্ষয়।"

কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রিয়াকে রূপময়ীই দেখিয়াছেন, সুরময়ীরূপে কবি পান নাই। তাই কামনার আগুনে প্রণয় কেবলি দহিয়াছে—আর সেই দাহচিহ্নই প্রেমিকের বুকে প্রকৃত ভৃগু-পদচিহ্ন।—

"রূপ-মুগ্ধ নয়নের তৃষাটুকু মোর
মিটিয়া গিয়াছে আজি। আছে শুধু জ্বালা,
তোমার পিয়াসে তীব্র মদিরার ঘোর।"

"সে আজ অতীত স্মৃতি—। * * *
আজিকে সার্থক হোক দেবতার দান,
তুচ্ছ সোহাগের বাণী তোমারে কি কব?
হৃদয়-স্পন্দনে বাজে তব জয় গান।"

যেহেতু,—"সে যে জেগেছিল মোর বাঁশরীর সুরে,
* * *
হারানু কবে না জানি ক্ষণিকা বধূরে।
আমার মানস-কুঞ্জে আমি জানি তবু
ব্যর্থ হয় নাই সেই অভিসার রাতি;
মানসী প্রিয়া সে মোর ভোলে নাই কভু,
জ্বালিয়া রেখেছে চির মিলনের বাতি।"

বিরহ-সাধনায় মানুষী এখন মানসী হইয়াছেন। তাই এই "মানসী প্রিয়া"র অভিসার-রাত্রির পর—

"প্রভাতে শিথানে হেরি অশ্রুরেখা কার?
সে কি তার? সে কি মোর? সে কি দু'জনার?"—

অনির্ব্বচনীয়!

ওগো—"তুমি আমি এক দোঁহে—মানসী ও কবি—
নিখিল বিশ্বেতে আজ মিথ্যা আর সবি।"

বিরহে এই "বিশ্ব শুধু শ্যামময়" অবস্থা। বিরহ-পঞ্চতপের ইহাই শেষ। কবি কান্তিচন্দ্র প্রেমকে "পণ্ডিতের মত বন্ধ্যা হিয়া"য় দেখেন নাই, তিনি কবির মত, প্রেমিকের মত এবং বৈষ্ণবের মত দেখিয়াছেন বলিয়াই "সনেটে" এই অনন্যসাধারণ নূতন সুরটি এমন মধুর ভাবে বাজিয়াছে—আর এই পরিচয়ের উদ্দেশ্যেই, এ নিবন্ধের অবতারণা।

ভ্রাম্যমাণের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ আবার রাসেলের সঙ্গে সারাদিন বিশ্রম্ভালাপ ক'রে সন্ধ্যাবেলা তাঁর কুটীরের কাছে এই গ্রাম্য সরাইটিতে ফিরে অপাচ্য অখাদ্য খেতে খেতেও মনে হচ্ছে—মন্দ নয়, ভ্রাম্যমাণ জীবনটা নেহাৎ নীরস নয়—তার শত অসুবিধে সত্ত্বেও।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সেই পুরোনো প্রশ্নটি আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে চাইছে যে বর্ত্তমান সভ্যতার একটা মস্ত অবদান মানুষকে গৃহশূন্য করা কি না? ঠিক্ এক-পুরুষ আগে বাঙালীর মনের রূপটির সঙ্গে আজকের-দিনে তার মনের রূপটির একটা মস্ত ফারাক দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এ গহ্বর ক্রমে অতলস্পর্শী হ'য়ে ওঠবার যোগাড়! এর অন্ততঃ একটা কারণ কি এই নয় যে আমাদের পিতাপিতৃব্যেরা ভ্রাম্যমাণ হওয়ায় যতটা বিশ্বাস করতেন আমরা তার চেয়ে বেশি করি? কে বল্‌তে পারে?

তর্ক উঠ্‌তে পারে যে তাঁরাও ত বিলেতে এসেছেন, বিলেত সম্বন্ধে লিখেছেন ও বিলাতী জীবনের সঙ্গে ভেতো বাঙালী জীবনের তুলনা করতেও ছাড়েন নি! তবে?

উত্তরে আমরা—অর্থাৎ আজকালকার ছেলেরা—বল্‌তে পারি না কি যে যতই কেন না তাঁরা ঘুরে বেড়িয়ে থাকুন, আকেজো ভবঘুরে হ'য়ে বিলেতে ঘোরাটায় তাঁদের মন ঠিক্ আমাদের মত সাড়া দিত না কখনই। একথা বলার ইঙ্গিত অবশ্য এ নয় যে তাঁরা কারে পড়লে শেক্সপীরের

> How much a duffer that has been taught to roam.
> Excels a duffer that has been kept at home—

মুখ জ্ঞানগর্ভ বুলি আওড়াতে পারতেন না, বা প্রবন্ধ লেখার সময় উদ্ধৃত ক'রে বিজ্ঞতা জাহির করায় আমাদের চেয়ে পেছপাও হ'তেন। আমার মোটা বক্তব্যটি শুধু এই যে বিদেশী সভ্যতার অভিঘাতকে তাঁরা হয়ত আমাদের চেয়ে বেশি অবচ্ছিন্ন (abstract) ভাবে দেখ্‌তেন, কিন্তু বিদেশী মানুষের মাটির মধ্যে দিয়ে তাকে ঠিক্ আমাদের মতন 'কংক্রীট' ক'রে পেতে চাইতেন না। নইলে—মনে হয়—কোথায় ছিল'ম আমি দুদিন আগে, সুদূর লণ্ডনে ত;—আর কোথায় আজ—কথাবার্ত্তা নেই—দশবার ঘণ্টা ট্রেনে চেপে এক গ্রাম্য সরাইয়ে এসে শোভমান!—কি? না, রাসেলের সঙ্গে একটু উড়ো গল্প করব!! আমাদের পিতা-পিতামহের দল বড় জোর প্রদর্শনী দেখ্‌তে ছুটতেন। মনে পড়ে "ফরসাইথ সাগা-"তে পিতাকে লক্ষ্য ক'রে পুত্রের মন্তব্য:—"তোমাদের ও আমাদের যুগের মধ্যে যে একটা মস্ত তফাৎ আছে সেটা কোথায় সব চেয়ে ধরা পড়ে জানো?—তোমার ও আমার মনটির প্রকৃতির তফাতের মধ্যে।"

কোথায় প'ড়েছিলাম Our fathers should be forgiven—they were younger than ourselves. খুব সত্যি কথা। কেবল দুঃখ এই আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বংশধররা আমাদের ঠিক্ অনুরূপ কৃপার চক্ষে দেখবে। নিরুপায়!

সে যাই হোক্ যাওয়া ত গেল রাসেলের ওখানে ঠিক্ একটার সময়।

হঠাৎ একটা বিষয়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে পিতাপিতামহদের মনের-মিল খুঁজে পেয়ে হৃষ্ট হওয়া গেল। সেটা হচ্ছে—সুপাচিত খাদ্যে সাড়া দেওয়া। আহারের সন্তোষজনক সুনির্ব্বাহের মধ্যে দিয়ে যে বিদেশীর মনের পরিচয়-লাভটাও সুনির্ব্বাহিত হ'য়ে থাকে সেটা আজ তিনদিন ধ'রে আরও উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করা গেছে। কারণ রাসেলের একটা প্রশংসনীয় গুণ হচ্ছে—তিনি অতিথিকে রসনাস্নিগ্ধকর আহার্য্য-সরবরাহ করায় বিশ্বাস করেন। তিনি বেশভূষায় বিশ্বাস করেন না—যায় আসে না। এগার মাইল দূরে হোটেলে তাঁর

একমাত্র ক্ষুর ভুলে আসেন—যায় আসে না, কেন না দার্শনিক 'ক্ষৌরী' না হ'লেও তাঁর গবেষণার ব্যাঘাত ঘটার কোনো শাস্ত্রসম্মত কারণ নেই। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে অবিনশ্বর রন্ধনশিল্পটির গরিমা সম্বন্ধে সংশয়শীল হ'লে "ইতরে-জনা"-র বেশ-একটু আস্‌ত-যেত। কারণ যতই কেন না আধ্যাত্মিক হই, দেখা গেল যে রাত্রে এ গ্রাম্য সরাইটির অর্দ্ধপক্ক খাদ্য সেবার পরে আত্মা বেশ একটু ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠেন—ঠেকানো যায় না। রাসেলের লাঞ্চ ও চা হয়ত তাই আরও বেশি কাম্য হ'য়ে উঠেছিল। একথা স্বীকার করতে লজ্জায় এ-ভারত-সন্তানের মাথা-কাটা যেত যদি না আধুনিক ভিটামাইন-থিওরির বরে পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিষয়ে অসংশয়িত আলোক পাওয়া যেত।

যাহোক্, একথা-সেকথায় রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শান্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় মিষ্টার রাসেল?"

রাসেল একটু হাস্‌লেন।—"খুব উজ্জ্বল নয়।"

—"তাহ'লে এত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন কেন—শান্তিজল ছিটোতে?"

—"মানুষের হৃদয় ব'লে। তাই লেখবার আশা ম'রেও মরে না—এই আর কি।"

—"কিন্তু মানুষ শিখবে না কখনো! কোনো ভরসাই কি নেই?"

—"গত যুদ্ধের আগে ভাব্‌তাম ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে হয়ত শিখলেও শিখ্‌তে পারে। মনে করতে চাইতাম যে শান্তির সম্ভাবনা হয়ত একেবারে সুদূরপরাহত না হ'তেও পারে। কিন্তু শেষটায় যখন যুদ্ধ বাধল তখন সব আশাই ধূলিসাৎ হ'ল—যুদ্ধের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

—"যুদ্ধের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানে?"

—"ধর, যুদ্ধের সময় প্রথম প্রথম আমাদের বলা হ'য়েছিল যে বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমশঃ এতই ভীষণ হ'য়ে উঠ্‌ছে যে মানুষ শেষটায় যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করতে বাধ্য। কিন্তু এরকম আশাকে প্রশ্রয় দিতে পারে কেবল সে-ই যে মানুষের মনস্তত্ত্বকে একদম উল্‌টো বোঝে।"

—"কেন?"

—"কারণ মানুষের মনটা এমনই যে পরাজয়ের ভয় তার যতই বাড়ে যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে সে ততই উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে; ফলে যুদ্ধের সময়ে আমাদের নিষ্ঠুরতাও ততই বাড়তে থাকে। আমার মনে হয় যে এর পরের যুদ্ধে মানুষ শত্রুপক্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে রোগের বীজাণু সংক্রামিত ক'রে জয়ের চেষ্টা করবে।"

—"কি ভয়ানক কল্পনা!"—

—"ভয়ানক বটে, কিন্তু এ থেকে নিষ্কৃতি নেই বোধ হয়।" ব'লে রাসেল ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌লেন।

—"কোনো উপায়ই কি নেই?"

—"এক হ'তে পারে যদি আমেরিকা বা অন্য কোনো বড় শক্তি সমস্ত জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হ'তে সক্ষম হয়। তখন সমস্ত জগৎ একটা Empire ব'লে গণ্য হ'বে। এটা হয়ত সম্পূর্ণ অসম্ভব না হ'তেও পারে।" *

মধ্যাহ্নভোজনের ঘণ্টা পড়ল।

(আহারের মধ্যে নানা কথা হ'ল তার কোনো বিবৃতি লিখে রাখি নি।)

আহারের পরে আমরা বেড়াতে বাহির হ'লাম—আমি, মিষ্টার রাসেল ও মিসেস রাসেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"ওয়েল্‌স তাঁর 'উইলিয়াম ক্লিসোল্‌ড্'—এ লিখেছেন যে আজকালকার চিন্তাশীল মনীষীরা নাকি মার্ক্সকে একদম নাকচ ক'রে দিয়েছেন।"

রাসেল চিন্তিতস্বরে বল্‌লেন, "সম্পূর্ণ নাকচ ক'রে দিতে পেরেছেন বলে মনে ত' হয় না। কারণ মার্ক্সের নীতির মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। একথা অস্বীকার করার ত উপায় নেই।"

—"যথা?"

—"ধর—মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আধুনিক যুগের একটা মস্ত প্রবণতা হবে—উত্তরোত্তর বাণিজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতাদের সংখ্যা ক'মে আসা ও তাঁদের ব্যক্তিগত organisationএর পরিসর বাড়া। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি

* ওয়েল্‌সের মনেও এই সমাধানের সম্ভাবনা খুব আশা দিয়েছে। তাঁর "Salvage of Civilization" দ্রষ্টব্য।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অনেক লোকের হাত থেকে অল্প লোকের মুখের মধ্যে গিয়ে পড়বে। অন্ততঃ এ-ভবিষ্যদ্বাণীটা তাঁর অক্ষরে অক্ষরে ফ'লেছে, নয় কি ?"*

—"আর ?"

—"আর ধর, তাঁর ইতিহাসকে অর্থনীতির সমস্যার দিক্ দিয়ে বিচার ও ব্যাখ্যা করা। মানুষের ইতিহাসকে শুধু তার অর্থনীতিক সমস্যার দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে পুরো বোঝা হয় না একথা সত্য হলেও, প্রতি জাতির ইতিহাস যে তার অর্থনীতিক সমস্যা দিয়ে বড় কম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না এটাও ত কম সত্য নয়! কাজেই স্বীকার করতেই হয় যে মার্ক্সের নীতির মধ্যে সবটাই অসার নয়।"

—"তাহ'লে আপনার বিশ্বাস যে মার্ক্সের নীতি একদম ভুয়ো প্রমাণিত হয় নি ও এখনো চল্‌বে।"

রাসেল তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"তোমার কি মনে হয় ডোরা ?"

মিসেস ডোরা রাসেল বল্‌লেন—"আমার মনে হয় মার্ক্সের নীতি ভুয়ো কি না সেটা একটা প্রশ্ন, আর এ-নীতি চল্‌বে কি না সেটা আর একটা প্রশ্ন। কারণ মার্ক্সের নীতি যদি আগাগোড়াই ভুয়ো প্রমাণ হয় তাহ'লেও তার চল সমানই অব্যাহত থাক্‌তে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তার মানে ?"

রাসেল বল্‌লেন—"কথাটা খৃষ্টধর্ম্মের উদাহরণ নিলে পরিষ্কার হবে। ধর না কেন খৃষ্টধর্ম্মের ভিত্তিটা যে একদম ভুয়ো সেটা তৃতীয় শতাব্দীতে কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক পরীক্ষা করামাত্রই ত প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু ত এটা চল্‌ছে এই বিংশ শতাব্দীতেও—নয় কি ?" ‡

* তাঁর Prospects of Industrial Civilization পুস্তকে রাসেল দেখিয়েছেন আমেরিকার meat-trust কেমন ক'রে ধীরে ধীরে চার জন মাত্র capitalistএর হাতে গিয়ে পড়েছে—যেটা আগে ছিল না। Private industry, Cottage industryর দিন ক্রমেই চ'লে যাচ্ছে।

‡ তাঁর Why I am not a Christian পুস্তকে রাসেল (খৃষ্টধর্ম্মকে লক্ষ্য ক'রে) লিখ্‌ছেন যে যতদিন না মানুষ অতীত যুগের অজ্ঞ প্রচারক প্রভৃতির কাজে নীতি-কথাকে বেদবাক্য ব'লে শিরোধার্য্য ক'রে চল্‌বে ততদিন তার সভ্যতার প্রগতির আশা দুরাশা।

আমরা হেসে উঠ্‌লাম।

হাসি থামলে কথায় কথায় সোশ্যালিজ্‌মের প্রসঙ্গ উঠ্‌ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার Roads to Freedomএ আপনি নানা ধরণের সোশ্যালিজ্‌মের দোষগুণ বিচার ক'রে শেষটায় Guild Socialismএর প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।' কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে অদূর ভবিষ্যতে ঠিক্ এ-ধরণের কোনো সুসমঞ্জস সোশ্যালিজ্‌মের প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা খুবই কম।"

—"হয়।"

—"তা যদি হয়—"

—"কি জানো ? কোনো সুশৃঙ্খল পদ্ধতি বা সুসমঞ্জস বন্দোবস্ত যত বেশি গভীর হবে—অর্থাৎ কিনা তার মধ্যে যত বেশি সত্য থাক্‌বে সেটা হবে—ততই বেশি জটিল। কাজেই প্রতি বড় কিছুই সংসারে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য ও দুরধিগম্য হ'য়ে থাকে ; মিথ্যার প্রভাবও তাই জগতে এত ব্যাপক।"

—"বুঝলাম না—"

—"মিথ্যা মিথ্যা ব'লেই তার জটিল হওয়ার দরকার করে না। তার উদ্দেশ্য শুধু কোনোমতে মানুষের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য হওয়া। কানে কানেই জগতে মিথ্যারই রাজত্ব—নগরের অধিকাংশ মানুষই বোকা ব'লে।"

—"আপনি দেখছি তাহ'লে জীবনে বুদ্ধির আভিজাত্যে বেশি আস্থাবান ?"

—"তার মানে ?"

—"অর্থাৎ আপনি কৌলীন্য-পন্থীদের এই বিশ্বাসের পক্ষপাতী যে সত্য কেবল মুষ্টিমেয়ের বুদ্ধিগম্য হ'তে পারে।"

রাসেল ঈষৎ উত্তেজিত সুরে বল্‌লেন, "আমি কোনো বিশেষ বিশ্বাস বা নীতির বেশি পক্ষপাতী ব'লে নয়। পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন এখানে উঠ্‌তেই পারে না। আমি জীবনকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখ্‌তে পাই—এই মাত্র।"

—"আপনার কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না মিষ্টার রাসেল—"

রাসেল উদ্দীপ্ত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন—"জীবনে কি হওয়া-উচিত-না-উচিত এ সম্বন্ধে আমাদের মনগড়া নৈতিক ধারণাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব আমরা কবে? কি ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে আগে থাক্‌তে গোঁড়া ধারণা ক'রে নিয়ে জীবনকে বিচার করতে যাও কেন? আমি প্রায়ই দেখি যে আমরা মহা গোলযোগে প'ড়ে যাই শুধু এই জন্যে যে আমরা সত্যনির্দ্ধারণের সময়েও আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার পাশমুক্ত হ'তে পারি না। অর্থাৎ আমরা জীবনকে দেখ্‌তে যাই—আবিষ্ট হ'য়ে, নিঃস্পৃহভাবে নয়। কিন্তু কোন্ যুক্তিবলে আমরা আগে থাক্‌তে ভেবে ব'সে থাকি যে আমরা কি চাই না চাই তার সঙ্গে সত্যের স্বরূপের কোনো দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে?"

ব'লে একটু থেমে বল্‌লেন, "ধর না কেন, বাণিজ্যে টাকার চলাফেরা ও ওঠাপড়া; এটা একটা অত্যন্ত জটিল জিনিষ, বটে ত? তা হ'লেই দেখ একজন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের এ সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার হবে কেমন ক'রে? কিন্তু কেন পরিষ্কার হয় না? না, সে এ বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামায়নি বা মাথা ঘামাবার শক্তি তার নেই। কিন্তু একথা বলার মানে কি এই যে আমি তার শক্তিহীনতার পক্ষপাতী? ঠিক্ তেমনি—আমি যখন বলি যে শক্ত জিনিষ সহজ মানুষে বুঝতে পারে না তখন আমি এ-পারা-না-পারার কাম্যতা নিয়ে উচ্চবাচ্য করি না মোটেই। আমি শুধু একটা পরীক্ষিত সত্যকে উচ্চারণ করি মাত্র। আমি যদি বলি যে ঘোড়ার গলা গাছের উচুঁডালের পাতার কাছে পৌছয় না, জিরাফের গলা পৌছয় তাহলে কি বল্‌তে হবে যে আমি কোনো বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করছি?—বল্‌ছি যে ঘোড়ার গলাটাও লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয় বা অন্যতর একটা কিছু? যখন আমরা জীবনটাকে বুঝতে যাই, তার সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করতে ছুটি তখন আমাদের ঠিক্ এই রকম অনাবিষ্ট হ'য়ে কথা বলা উচিত। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভাল মন্দের ধারণাকে তখন নিরস্ত রাখা উচিত। বুঝেছ?"

আমি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বল্‌লাম, "জীবন সম্বন্ধে আপনার অনাবিষ্ট ও নিঃস্পৃহ দৃষ্টির মূল্য আমি বুঝি না মনে করবেন না মিষ্টার রাসেল—"

মিসেস্ রাসেল কয়েক মিনিট আগে পাশের একটি পোষ্টাফিসের মধ্যে গিয়েছিলেন, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে এই আলোচনা করছিলাম। ঠিক্ এই সময়ে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমার কথাটা শেষ করা হ'ল না। আমরা নিঃশব্দে চল্‌তে লাগলাম।

খানিকদূর গিয়ে একটি পাহাড়ের ওপর যাবার সরু পথের কাছে আস্‌তেই রাসেল থেমে দাঁড়িয়ে আমাকে বল্‌লেন, "তুমি আগে চল।"

আমি বল্‌লাম, "আপনি চলুন আগে—"

রাসেল স্নিগ্ধ হেসে বললেন, "সে কি হয়?"

বুঝলাম রাসেল তাঁর খানিকক্ষণ আগের কথার উত্তাপটাকে লঘু কথায় জুড়িয়ে দিতে চাইছেন।

আমরা দুজনে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে একটি বড় পাথরের উপর বস্‌লাম। মিসেস রাসেল নীচে সমুদ্রতীরে পুত্রকন্যার স্নান দেখ্‌তে গেলেন।

খানিকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

পায়ের তলায় অসংখ্য বীচিমালার কলগানে সাগরবক্ষ মুখর! পাশ্চাত্য গগনের কৃপণ রবি হঠাৎ হাওয়ার মদে মাতাল হ'য়ে কিরণ-বিকীরণে মুক্তহস্ত! অদূরে কয়েকটি সাদা পাল—জেলে ডিঙি! দিগন্তের কোলে একঝাঁক পাখী চক্রাকারে পরিক্রমণরত!...

কিন্তু ক্ষুব্ধতা আমার কাট্‌ল না। একটা বিচিত্র ভাব!

রাসেলও বুঝেছিলেন—বেশ বুঝতে পারছিলাম। অথচ না তিনি বল্‌তে পারছিলেন কোনো কথা—না আমি।

মনে হয় আজকের এ অনির্দ্দেশ্য অনুভূতিটির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। বিশেষ ক'রে—হঠাৎ এই সূত্রে রাসেলের চরিত্রের একটা দিকের পরিচয় পেয়েছিলাম ব'লে।

মনে হচ্ছিল গান্ধির ধৈর্য্য রাসেলের চেয়ে কত বেশি। রাসেল হঠাৎ একটা সামান্য প্রশ্ন দুবার করতেই অধীর হ'য়ে উঠ্‌লেন—কিন্তু গান্ধিকে রোজ কতলোকের কত প্রশ্নেরই না উত্তর দিতে হ'য়েছে—কী অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে! রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও একথা খাটে। অন্ততঃ তাঁদের প্রতি প্রশ্নবর্ষণের বেলায়. যে আমি সদয় হ'য়ে প্রশ্ন করেছি—এ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অপবাদ আমাকে আমার অতি বড় শত্রুও দিতে পারবে না। তবে?

মনে আছে এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ একটা উত্তর মনের মধ্যে বিজলীর মতন খেলে গেল। রাসেল আসলে এঁদের চেয়ে আবেগপ্রবণ লোক ব'লেই হয়ত অল্পে এতটা উত্তেজিত হ'ন, এতটা স্পৃষ্ট হ'ন! লেখার সময়ে তীক্ষ্ণ বিচারের কড়া পাহারার সাহায্যে তিনি মনটাকে মুক্ত রাখ্‌তে চেষ্টা করেন বটে—কিন্তু তবু পারেন না ত' সব সময়ে! আর পারেন না ব'লেই না তাঁর বৈজ্ঞানিক লেখার মধ্যে এতটা বিশিষ্ট সরসতা মেলে এবং এইখানেই না Tyndal Spencer or Whitehead প্রমুখ দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। নইলে কি The Study of Mathematics এর মতন প্রবন্ধেও গণিতের বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করার সময়ে তাঁর মনে এ ব্যথাচঞ্চল প্রশ্ন জাগে :—

Have any of us right, we ask, to withdraw from present evils, to leave our fellow-men unaided, while we live a life which, though arduous and austere is yet plainly good in its own nature?" কিন্তু তখনই এ প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়েছেন সেটাও মূলতঃ তাঁর বুদ্ধির উত্তর নয়—ঐ আবেগেরই প্রেরণা :—

"When these questions arise, the true answer is, no doubt, that some must keep alive the sacred fire, some must preserve, in every generation, the haunting vision that shadows forth the goal of so much striving.

মনে পড়ল তাঁর Freeman's Worshipএর অপূর্ব্ব-সুন্দর অশ্রুপূত, আত্মসমাহিত কথাগুলি:—United with his fellow-men by the strongest of all ties, the tie of a common doom, the free man finds that a new vision is with him always, shedding over every daily task the light of love. The life of man is a long march through the night, surrounded by invisible foes, tortured by weariness and pain, towards a goal that few can hope to reach, and where none may tarry long. One by one, as they march, our comrades vanish from our sight, seized by the silent orders of omnipotent Death. Very brief is the time in which we can help them, in which their happiness or misery is decided. Be it ours to shed sunshine on their path, to lighten their sorrows by the balm of sympathy, to give them the pure joy of a never-living affection, to strengthen failing courage, to instil faith in the hours of despair. Let us not weigh in grudging scales their merits and demerits, but let us think only of their need—of the sorrows, the difficulties, perhaps the blindnesses, that make the misery of their lives; let us remember that they are fellow-sufferers in the same darkness, actors in the same tragedy with ourselves. And so, when their day is over, when their good and their evil have become eternal by the immortality of the past, be it ours to feel that, where they suffered, where they failed, no deed of ours was the cause; but wherever a spark of the divine fire kindled in their hearts, we were ready with encouragement, with sympathy, with brave words in which high courage glowed.

কেবল মনে মনে ভাব্‌ছি যে যাঁর মনটা এইরকম সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে ঘর করে তিনি কেমন ক'রে খানিক আগের উষ্ণতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে ইতস্ততঃ বোধ করছেন? ঠিক্ এমনি সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বরে আমি চম্‌কে উঠেছিলাম মনে আছে।

তিনি আমার দিকে ফিরে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন, "আমি যে একটু-আগে উত্তেজিত হ'য়েছিলাম সে জন্যে আমায় ক্ষমা

কোরো।" (তিনি forgive কথাটি ব্যবহার ক'রেছিলেন।)

চিন্তা বা আবেগ কি নীরবতার মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করতে পারে!…আশ্চর্য্য!…

আমার ক্ষোভ মুহূর্ত্তে জল হ'য়ে গেল। তাঁর এত স্পষ্টাপষ্টি ক্ষমা-চাওয়া আমি মোটেই আশা করিনে।

স্পৃষ্ট হ'য়ে বল্লাম, "আমি কিছু মনে করিনি মিষ্টার রাসেল।…হয়ত আমিই একটু বেশি অসাবধান হ'য়ে কথা ক'য়েছিলাম।…আমি ঠিক্ বুঝতে পারিনি যে—কিন্তু সে যাই হোক্ আপনি যে আমার এত শত প্রশ্নের পর প্রশ্ন এত ধৈর্য্য ধ'রে শুনেছেন ও প্রত্যেকটির উত্তর দিতেছেন এটা আপনারই যোগ্য।"

—"প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আমার কাছে একটুও বিস্বাদ মনে হয়নি সত্যি বল্‌ছি। কিন্তু কি জানো? কেবল আমার কাছে একটা জিনিষ অত্যন্ত বড় মনে হয়। হয়ত সেই জন্যেই তার সম্বন্ধে আমি এতটা তীব্রভাবে অনুভব ক'রে যাচ্ছি।"

—"কি?"

—"যে জীবনকে বুঝবার সময়, সত্যকে খোঁজার সময় আমরা অনাবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা পাই না। আমরা সাবধান হই না। তাই আমি চাই যে বাইরেকে পর্য্যবেক্ষণ করার সময় উচিত-অনুচিতের বাষ্পও যেন আমাদের দৃষ্টিকে আবিল না ক'রে তোলে—এই আর কি।" *

—"আপনার অনেক লেখায়ই Scientific outlook-এর প্রশস্তির সময়ে একথা আপনি নানা সূত্রে ব'লেছেন। আপনার সত্যনিষ্ঠার এ আবেগহীন নিষ্কাম দিক্‌টা যে আমার কতখানি ভাল লাগে তা বলতে পারি না। কেবল আমি আপনাকে বুদ্ধির আভিজাত্য সম্বন্ধে ও প্রশ্নটি ক'রেছিলাম—টলষ্টয়ের কথা ভেবে।"

—"ও!"

—"এক সময়ে টলষ্টয়ের এ কথাটি আমাকে ভারি স্পর্শ করত যে মানুষের সেই সব কীর্ত্তিই হচ্ছে আসলে শ্রেষ্ঠ যা এখনই সমস্ত মানুষের বুদ্ধিগম্য। আজকাল আমার মনে হয় একথাটা শুন্‌তে যতই ভাল লাগুক আসলে সত্য নয়—যেহেতু জীবনের ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ঠিক্ উল্‌টো সাক্ষ্য দেয়।"

রাসেল সাম্‌নের দিক্‌চক্রবালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বল্‌তে লাগলেন—"টলষ্টয়ের নীতি সম্বন্ধে সাইকো-আনালিসিসের ফলে নতুন আলো পাওয়া গেছে। সে ভারি চিত্তাকর্ষক।"

—"কি?"

—"টলষ্টয় ভিতরে ভিতরে ছিলেন একজন অত্যন্ত গর্ব্বী মানুষ। তাঁর ফটো থেকে বেশ বোঝা যায় একথা। কিন্তু হ'লে হবে কি—তাঁর যতখানি গর্ব্ব ছিল, ততখানি কালচার ছিল না। ফলে—অর্থাৎ তাঁর গর্ব্ব আত্মপ্রসাদকে জিইয়ে রাখার জন্যে—তাঁর একটা সুবিধেমতন জীবনের Philosophy গ'ড়ে তুলতে হ'য়েছিল। এ Philosophyটা কি? না, যা আমি জানি না বা বুঝি না তা জানা বা বোঝা অনাবশ্যক। এক কথায়, এই হচ্ছে টলষ্টয়ানিজমের মনস্তত্ত্ব।

খানিকক্ষণ আমরা সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "ফ্রয়েড সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

—"তিনি একজন মস্ত লোক যদিও আমি তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে একমত নই।"

"—কোথায় তাঁর সঙ্গে আপনার মতভেদ হয়?"

—"জীবনের সব প্রেরণার মূলে যে যৌন আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকে একথায় তাঁর সঙ্গে সায় দেওয়া কঠিন।* উদাহরণতঃ জ্ঞানকে নেওয়া যেতে পারে।"

—"মানে?"

—"মানে জ্ঞানের প্রেরণার উদ্ভব যৌন-আকাঙ্ক্ষা থেকে নয় ব'লে মনে করার কারণ আছে, যদিও ললিত

* The man of Science, whatever his hopes may be, must lay them aside while he studies nature; and the philosopher, if he is to achieve truth, must do the same. Ethical considerations can only legitimately appear when the truth has been ascertained: they can and should appear as determining our feeling towards the truth, and of our manner of ordering our lives in view of the truth, but not as themselves dictating what the truth is to be."

Mysticism and Logic

* Instincts in the Unconscious পুস্তকে রিভার্স সাহেব ফ্রয়েডের এই নীতির খণ্ডন ক'রেছেন। এ খণ্ডন আজকাল য়ুরোপে বিদ্বৎসমাজে খুব সমাদৃত হ'য়েছে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সৃষ্টি যে যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে মোড় ফিরিয়ে দিতে (Sublimation) পারার দরুণই সম্ভব হ'য়েছে একথা মানি। কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হ'য়েছে বোধহয় শক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মোড় ফিরিয়ে দিতে পারার দরুণ।"

—"কেমন ক'রে ?"

—"যেহেতু জ্ঞান আমাদের শক্তি দেয়। মানুষ ও প্রকৃতিকে আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চলানো ফেরানোর নামই হচ্ছে শক্তি, ও জ্ঞানের ফলে আমাদের এই শক্তি বাড়ে।"

অতঃপর আমরা পাহাড় বেয়ে নীচে নামলাম। মিসেস রাসেল সমুদ্রতীরে ব'সে তাঁর শিশু পুত্রকন্যার সাগর-স্নান দেখ্‌ছিলেন। রাসেল স্নানবেশ পরিধান ক'রে স্নানে নেমে গেলেন।

আমি মিসেস রাসেলের পাশে বস্‌লাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "রুষ দেশ সম্বন্ধে আপনার ও রাসেলের মতভেদ হ'য়েছিল, না মিসেস রাসেল ?"

মিসেস রাসেল বল্‌লেন, "না ত! আমাদের অধিকাংশ বিষয়েই মতের মিল ছিল। কেবল রুষ দেশ হয়ত আমার একটু বেশি ভাল লেগে থাক্‌বে।"

—"কোথায় পড়ছিলাম সেদিন যে বর্ত্তমান জগতে রুষ রমণীর মতন স্বাধীনা নারী নাকি আর কোথাও মেলে না ? একথাটি আপনার সত্য মনে হয় ?"

মিসেস রাসেল চিন্তিতস্বরে বল্‌লেন, "না। আমার মনে হয় আজকালকার ইংরাজ বা আমেরিকান মেয়েরা রাশিয়ার মেয়েদের চেয়ে বেশি মুক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বল্‌তে বাধ্য যে এ জন্যে দোষ রাশিয়ার বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নয়, দোষ—সেখানকার পুরুষের।"

—"মানে ?"

—"মানে বর্ত্তমান রাশিয়ার গড়পড়তা পুরুষেরা শিক্ষায় ইংলণ্ড বা আমেরিকার সমকক্ষ নয়। নইলে রুষ দেশের আইনকানুন প্রভৃতি জগতের সব দেশের চেয়ে অগ্রসারী একথা মান্‌তেই হবে।"

—"কি হিসেবে অগ্রসারী ?"

—"ধর, রুষদেশে এখন যে কোনো পুরুষ বা মেয়ে যে-কোনো মুহূর্ত্তে ডাইভোর্স পেতে পারে যদি সে বলে যে তার স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে তার বন্‌ছে না। আইনের দিক্‌ দিয়ে এটা মস্ত প্রগতির সূচনা করে।"

—"কিন্তু সন্তানদের ব্যবস্থা ?"

—"সন্তানদের সম্বন্ধে আইনে কি সংস্থান ক'রেছে সেটা আমি ঠিক্‌ জানি না ; তবে বোধহয় সে-সম্বন্ধে পিতা-মাতার মধ্যে একটা রফা হয়।"

—"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে এরকম বিবাহ-চ্ছেদের ফলে সন্তানের মস্ত ক্ষতি হয় ?"

—"কি হিসেবে ?"

—"সন্তানের পক্ষে পিতামাতা উভয়েরই স্নেহ ও শিক্ষা কি একান্ত আবশ্যক নয় ?"

মিসেস রাসেল বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন, "কেন আবশ্যক হবে ? আর—সব ছেলেমেয়েরা কি পিতামাতা উভয়েরই সংস্পর্শ পায় মনে কর ? বিশেষতঃ শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা যে প্রায়ই পায় না—একথা কে না জানে ? কোথায় শুনে-ছিলাম একজন শ্রমিকের ছেলের গল্প। তার বাবা তাকে মারাতে সে কাঁদছিল। কে তাকে মেরেছে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব'লেছিল 'যে-লোকটা প্রতি রবিবারে মার সঙ্গে শোয়।"

ব'লে একটু থেমে বল্‌লেন "এমন কত শিশু আছে যাদের সঙ্গে তাদের পিতার সম্বন্ধ শুধু ঐ রবিবার দিনটায়।"

এই সময়ে রাসেল স্নান সমাপন ক'রে এসে আমাদের পাশে একটা পাথরে বস্‌লেন।

আমাদের কথা হচ্ছিল ইংলণ্ডে বিবাহচ্ছেদ সম্বন্ধে আইন নিয়ে। মিসেস রাসেল বল্‌লেন, "এটা একটা অত্যন্ত বাজে আইন যে দুপক্ষই ব্যভিচার করলে বিবাহচ্ছেদ হ'তে পারে না। শুধু তাই নয়, বিবাহচ্ছেদ বিষয়ে আমাদের আইনের অনেক সময়ে কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া যায় না।"

আমি বল্‌লাম, "কি ?"

মিসেস রাসেল বল্‌লেন, "ডাইভোর্সের জন্যে যখন মামলা চলছে তখন যদি স্বামী স্ত্রী একবারও বন্ধুভাবে দেখা

করে—শুধু দেখা মাত্র মনে রেখো—তাহ'লেও বিবাহচ্ছেদ রোধ করাটা আইন তার একটা কর্ত্তব্য মনে করে। এটা যে কি হাস্যকর কথা—"

রাসেল ব'লে বসলেন, "এর মনস্তত্ত্ব হচ্ছে শুধু এই যে বিচারাধিকরণ নিজেকে ধর্ম্মের একজন মহা পাণ্ডা মনে ক'রে থাকে। এ ধর্ম্মকে বজায় রাখ্‌তে হ'লে পাণ্ডার আত্মপ্রসাদের খাতিরে দেখানো দরকার যে যে-পক্ষ বিবাহচ্ছেদের জন্য ব্যগ্র, সে-পক্ষ শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও অপর পক্ষ দ্বারা অত্যাচারিত;—এমন অত্যাচারিত যে সে ক্রোধে রক্তবর্ণ না হ'য়েই পারে না। এখন, যেখানে সে নিজে নিষ্কলঙ্ক নয়, সেখানে তার ক্রোধে রক্তবর্ণ হওয়ারও নৈতিক অধিকার জন্মায় না। কাজেই সেখানে সুবিচারের কর্ত্তব্য হচ্ছে দুজনকেই এক জুড়িতে বেঁধে রাখা—তাতে ক'রে তারা যতই দুঃখ পাক না কেন।"

আমি হেসে বল্‌লাম, "ওয়েল্‌সের 'উইলিয়াম ক্লিসোল্ড্‌—এ' তিনি King's Proctor * এর এই গোয়েন্দাগিরির জন্যে মহা রাগ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন King's Proctorকে আইন রেখেছে শুধু সাধ্যমত মানুষের অসুখ ও অশান্তি বাড়াতে।"

মিসেস রাসেল ব্যঙ্গের সুরে বল্‌লেন, "এ বিষয়ে আইনের গোঁড়ামি ও অন্ধতা দেখ্‌লে গা'র মধ্যে জ্বালা কর্‌তে থাকে। ভাব ত দেখি ডাইভোর্স সম্বন্ধে এই আইনটীর কথা যে যদি 'ক' 'খ'-কে একবার ব্যভিচারী প্রমাণ করতে না পারে, তাহ'লে পরে 'খ' সে-ব্যভিচার সম্বন্ধে যদি নতুন প্রমাণ পায় তাহ'লেও 'ক' ফের নালিশ করতে পারবে না। এই-ই ত আজকালকার আইন না, বার্টরাণ্ড?"

—"হাঁ ডোরা। কারণ কি জানো?" ব'লে রাসেল হেসে বল্‌লেন, "কারণ আইনের সূক্ষ্ম বিবেক বলে যে এক অপরাধের জন্যে কেউ একবারের বেশি অভিযুক্ত হ'তে পারে না। গল্প আছে যে কোনো লোকের খুন করার অপরাধে একজনের বিশ বৎসর কারাদণ্ড হ'য়েছিল। সে বিশ বছর বাদে ফিরে এসে দেখ্‌ল যে যাকে সে খুন করতে গিয়েছিল সে বেঁচে গেছে। সে তখন কর্‌ল কি জানো?—সোজা গিয়ে তাকে তোফা খুন কর্‌ল। কারণ সে নিশ্চিন্ত ছিল যে এ-অপরাধের জন্যে সে যখন একবার কারাভোগ ক'রে এসেছে তখন আইনে তাকে আর দ্বিতীয়বার সাজা দিতে পারবে না।" ব'লে রাসেল হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। আমরা সে হাসিতে যোগ দিলাম।

আমরা শেষে চা খেতে রাসেলের কুটীরে ফিরলাম।

কথায় কথায় রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বার্ণার্ড শ'কে আপনার কেমন লাগে?"

—"চমৎকার লোক। খ্যাতিতে নষ্ট করেনি এমন মানুষ জগতে বিরল। নিজের খ্যাতি বজায় রাখার সম্বন্ধে এমন গভীর ঔদাসীন্য দেখ্‌লেও আনন্দ হয়। এমন সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয় লোক—তাঁর সাহচর্য্য একটা মস্ত লাভ।

—"গল্‌স্‌ওয়র্দ্দি আপনার কেমন লাগে?"

—"শিল্পী বটে। কিন্তু কর্ম্মজগতে important figure নন।"

—"কর্ম্মজগতে important figure আপনি কাকে বল্‌তে চান?"

রাসেল চিন্তিতস্বরে বল্‌লেন, "ধর ওয়েল্‌স্‌—যদিও তিনি বড় শিল্পী নন।"

—"আচ্ছা রোলাঁ বলেন যে বড় শিল্পী মন্দ মানুষ হ'তে পারেন না। এটা—"

—"অত্যন্ত বাজে কথা। ডষ্টয়েভ্‌স্কি ধর না। অত বড় শিল্পী ত! কিন্তু সাইবিরিয়াতে তিনি কর্ত্তৃপক্ষদের যে রকম খোষামোদ করতেন তাতে তাঁর চরিত্রবলের উপর শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হ'য়ে ওঠে না কি?"

—"আপনি কি উপন্যাস প্রভৃতি পড়েন?"

—"পড়ি—যখন সময় পাই—তবে সময় বেশি পাই না।"

—"আপনার বুঝি লেখায় খুব বেশি সময় যায়?"

—"তা যায় বই কি।"

—"আচ্ছা আপনি কি নিজের লেখা খুব সংশোধন ক'রে থাকেন?"

* বিলেতে King's Proctor বিবাহচ্ছেদের ছয় মাস পরে অবধি খোঁজ ক'রে থাকেন। যে দম্পতী ডাইভোর্স পেয়েছে তাদের সম্বন্ধে এ ছয় মাসের মধ্যে কোনো উপরোক্ত রকমের খবর পেলে তিনি ডাইভোর্সকে নাকচ ক'রে দিয়ে থাকেন।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

—"মোটেই না—আমি একটানা লিখে যাই ও শেষ হবা মাত্র প্রেসে পাঠিয়ে দিই।" *

—"আপনার লেখার ভঙ্গীর মধ্যে সংযমটি আমার বড় ভাল লাগে। আপনি কি এ গুণটি অর্জ্জন করবার জন্যে চেষ্টা করতেন?"

—"এক সময়ে করতাম। মনে আছে একটা আইডিয়া কত কম কথায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারা যায়। সে বিষয়ে আমি ছেলেবেলায় নানারকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতাম। এ ডিসিপ্লিন থেকে আমি যথেষ্ট লাভবান্ হ'য়েছি মনে হয়।"

এ কথায় সে কথায় বল্‌লাম, "কি রকম বই আপনার ভাল লাগে। জান্‌তে ভারি কৌতূহল হয়।"

—"তার কি ঠিক আছে? ধর, ডিকেন্স, শেক্ষপীয়র, বার্ণার্ড শ, শার্লক্ হোম্‌স্—"

—"শার্লক্ হোম্‌স্ আপনার ভাল লাগে জেনে ভারি খুসি হ'লাম।"

—"O Sherlock Holmes is delightful!"

এমন সময়ে একটি আমেরিকান মহিলা মোটরে ক'রে এসে হাজির।

তিনি বল্‌লেন তাঁর মেয়েকে কি রকম স্কুলে দেবেন সে-বিষয়ে রাসেলের পরামর্শ নিতেই তাঁর আসা। তিনি ইংলণ্ডেই স্কুলে দিতে চান।

ব'লেই বল্‌লেন, "আমাদের আমেরিকার স্কুলগুলি ইংলণ্ডের স্কুলের চেয়ে এত এগিয়ে—"

(পরদিন মিসেস রাসেল ব'লেছিলেন যে ভদ্র মহিলার মধ্যে আর যে গুণেরই বিকাশ হ'য়ে থাকুক না কেন সঙ্গতিজ্ঞানরূপ গুণটির যে বিকাশ হয়নি সেটা ধ্রুব। "কেন" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হেসে ব'লেছিলেন, "আমেরিকার স্কুলের গুণগানে শতমুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে মেয়েকে আমেরিকা থেকে এনে ইংলণ্ডের কোনো স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়ার পরামর্শ চাওয়া—এ পারে এক আমেরিকান মেয়ে।")

কথায় কথায় ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ এল।

রাসেল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের বয়কট নাকি তোমাদের দেশে খুব কৃতকার্য্য হ'য়েছিল?"

আমি বল্‌লাম, "হাঁ। সর্ব্বত্র তাঁকে অভিনন্দন ক'রেছিল শুধু রাজকর্ম্মচারী, সৈন্য ও পুলিশ। দেশের লোকে তাঁর জয়যাত্রায় যোগ দেয়নি। এমন কি কলিকাতা এলাহাবাদের মতন সহরের রাস্তা ঘাট'ও প্রায় শূন্য ছিল বললেই হয়।"

রাসেল মহা খুসি হ'য়ে বল্‌লেন, "বাহবা! ভারি আনন্দ হ'ল একথা শুনে।" এ খবরে রাসেলের বালকের ন্যায় আহ্লাদে আমরা হেসে উঠ্‌লাম।

একটু পরে রাসেল জিজ্ঞাসা করলেন, "ভারতীয়রা বোধ হয় আজকাল খুব ইংরাজবিদ্বেষী হ'য়ে উঠ্‌ছে?"

আমি বল্‌লাম, "হাঁ।—বিশেষতঃ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশন থ্রি পাশ হওয়ার পরে।"

আমেরিকান মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ আইন দুটি পাশ হওয়ার ফলে কি হয়েছে?"

আমি বল্‌লাম, "হয়েছে এই যে বিচার না ক'রে যে-কোনো ভারতীয়কে যতদিন ইচ্ছে জেলে পুরে রাখা আইন-সঙ্গত ব'লে গণ্য হ'য়েছে।"

আমেরিকান মহিলাটি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কখনো হয়?—বিনা বিচারে—"

আমি বল্‌লাম, "শুধু বিনা বিচারে নয়। কে বিচার করল, কে সাক্ষী দিল, কি অভিযোগ—এ সব বিষয়ই আসামী অজ্ঞ থাকবে—এই আইনের গুণে। শুধু আসামী নয়—দেশের কেউই কখনো জান্‌তে পারবে না।"

রাসেল তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বল্‌লেন, "আর এই 'আমরা' গালাগালি দিই বল্‌শেভিকদের বর্ব্বরতাকে!"

আমি বল্‌লাম, "এটা আক্ষেপের বিষয় একদিক দিয়ে। কারণ ভারতীয়দের মধ্যে আজকাল এই ভুল বিশ্বাসটা হু হু ক'রে বাড়ছে যে সব ইংরাজই হচ্ছে—ভণ্ড।"

* নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর Outline of Philosophyতে রাসেল লিখ্‌ছেন ভারি চিত্তাকর্ষক কথা :—"In writing a book my own experience is that for a time I fumble and hesitate and then suddenly I see the book as a whole, and I have only to write it down as if I were copying a completed manuscript." (pp. 44)

রাসেল হেসে বল্‌লেন, "কিন্তু বিশ্বাসটা ত ভুল নয়। ভণ্ড নয় এমন ইংরাজ যদিই বা থাকে তবে তাদের সংখ্যা এতই কম যে তারা কোথাও কল্‌কে পায় না।"

আমেরিকান মহিলাটি বল্‌লেন, "এর কি কোনো প্রতীকার নেই ?"

আমি বল্‌লাম, "যতদিন না ইংরাজেরা আমাদের এই Reformএর মতন বাজে মাল দিয়ে ছেলে ভুলোতে চাইবে ততদিন প্রতীকার হবে কেমন ক'রে বলুন ?"

রাসেল বল্‌লেন, "ইংরাজেরা তোমাদের যা দয়া ক'রে হাতে ধ'রে দেবে সেটা বাজে মাল ছাড়া যে আর কিছু হতেই পারে না মিষ্টার রায়। তারা তোমাদের কিছু দেবে কেবল তখনই যখন তারা ভড়কে যাবে।"

ব'লে একটু থেমে বল্‌লেন, "আমি আজকাল কিন্তু কোনো রকম গভর্ণমেণ্টের ওপরেই আর ভরসা রাখি না। কারণ আমার মনে হয় জগতে বর্ত্তমান সময়ে কোনো গভর্ণমেণ্টই আসলে ভাল নয়। ধর তোমরা যদি আজ আমাদের ওপর রাজত্ব করতে তা'হলে তোমাদের শাসন পদ্ধতি আমাদের চেয়ে একটুও উচ্চাঙ্গের হ'ত ব'লে মনে করার কোনো ভিত্তি আছে কি ?"

আমি বল্‌লাম, "সে কথা সত্যি।"

রাসেল চিন্তিত স্বরে বল্‌লেন, "কিন্তু অন্যদিকে ইতিহাসের সাক্ষ্য যদি নেওয়া যায় তা'হলে দেখা যায় যে একটা জাতি আর একটা জাতিকে তার সভ্যতার কিছু দিতে পারে কেবল গায়ের জোরে। রোমানরা ইংরাজজাতির মধ্যে তাদের সভ্যতার প্রচার ক'রেছে ঠিক্ তেম্‌নি ভাবে যেমন ভাবে আমরা আজ তোমাদের মধ্যে করছি। এটা ভাল কি মন্দ সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন।" কিন্তু যদি একদেশের সভ্যতার শিকড় অন্য দেশের মাটিতে বপন করতে হয় তাহ'লে এ ছাড়া অন্য উপায় বোধ হয় নাই।"

আমি বল্‌লাম, "কিন্তু এ কথা সব ক্ষেত্রে খাটে কি না সন্দেহ হয়। ধরুন জাপানের কথা। জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ ক'রেছে বটে, কিন্তু সেটা ত বাইরের চাপে নয়, নিজের ইচ্ছায়।"

রাসেল বল্‌লেন, "মোটেই না। বাইরের চাপে নইলে জাপান আজ কখনই জাপান হ'ত না। তুমি নিশ্চয়ই জান, এক সময়ে জাপান তার বন্দরে য়ুরোপীয় বাণিজ্য-জাহাজকে ঢুকতে দিতে চায় নি। কিন্তু তাকে বাধ্য করানো হ'য়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ জাপান এ অপমানের জ্বালায় শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বা আপত্তি ক'রে সময় নষ্ট করেনি। তারা কর্‌ল কি ? না, আমাদের বিজ্ঞানের কাছে হাত পাত্‌ল, আমাদের সমরপদ্ধতির অনুকরণ করল ও আমাদের ধরণ ধারা হজম ক'রে নিল। এমন ক'রে সে এ এ কাজটি সাধন করল যে একপুরুষের মধ্যেই তারা তাদের দ্বীপটির চেহারা বদ্‌লে দিল।"

আমেরিকান মহিলাটি বল্‌লেন, "কিন্তু জাপানের নিষ্ঠুরতা—"

রাসেল বল্‌লেন, "কিন্তু সেটা যে সে আপনার-আমার কাছ থেকেই শিখতে বাধ্য হ'য়েছিল এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন মিসেস—? আপনি কিম্বা আমি কি তাকে আজ শ্রদ্ধা করতাম মনে করেন যদি নিষ্ঠুরতায় তার বিদ্যে গুরুমারা না হ'ত ? কিন্তু সে যাই হোক্ জাপান যা ক'রেছে মানুষের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা ভাবলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যেতে হয় যে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে জাপানের রাজনীতিকেরা তাদের জাতিকে সামরিক প্রথায় দীক্ষিত করবার যে বৃহৎ জল্পনা ক'রেছিলেন তা জাপান এ অর্দ্ধশতাব্দীতে অক্ষরে অক্ষরে সাধন ক'রেছে। এটা মানুষের ইতিহাসে অতুলিত ও অপূর্ব্ব—এমন কি প্রায় অবিশ্বাস্য বল্‌লেও বেশী বলা হয় না।"

বিশ্ব-সুন্দরী

গোলাম মোস্তফা

জীবনের যাত্রা-পথে প্রতিদিন কে তুমি সুন্দরী !
কতরূপে কতবার দেখা দাও কত ছল করি' ?
দাঁড়ায়ে দেখিতে গেলে ধরা নাহি দাও আঁখি-কোণে,
চপলার মত শুধু দূর হ'তে গোপনে গোপনে
আচম্বিতে খেলে যাও। শান্ত হ'য়ে ক্ষণেক থামো না,
ধরিবে—দিবেনা ধরা—এই তব মনের কামনা।
কভু তুমি দেখা দাও আনমনে মুক্ত বাতায়নে,
শিথিল অঞ্চলে কভু দেখি সুপ্ত কুসুম-শয়নে,
বঙ্কিম ভঙ্গিমা টানি' কভু খুলি' বেণীর বন্ধন
কালো কেশ এলাইয়া রচ ফাঁদ বিশ্ব-বিমোহন,
চূর্ণ-করা হাসি-কণা তার মাঝে ছড়াইয়া দিয়া
ফুটন্ত যৌবন-বনে সেই ফাঁদ রাখো বিছাইয়া !
কত মুগ্ধ পথিকের পথ ভোলা মনের চরণ
সে ফাঁদে জড়ায়ে যায় ! অলকের কাজল-মায়ায়
দিশেহারা হ'য়ে ফিরে, মুক্তি-পথ খুঁজে নাহি পায় !
কনক কলসে কভু বাজাইয়া কাঁকন কিঙ্কিণি
বেলাশেষে নদী-তটে নেমে যাও, ওগো সীমন্তিনি !
সে মৃদুমধুর ধ্বনি কোথা কার অন্তরে আসিয়া
নির্ম্মম আঘাত হানে, সারাপ্রাণ দেয় নিষ্পেষিয়া,
সে কথা হয়ত জানো, তবু তাহা প্রকাশ করো না,
সারল্যের ছদ্মবেশে চ'লে যাও নিঃশঙ্ক-চরণা !
কভু রুদ্র নিদাঘের ছায়া-স্নিগ্ধ সরসীর জলে
অবগাহি' কর স্নান সখী সনে মিলি কুতূহলে,
তারপর স্নান-শেষে শুভ্র সিক্ত কুঞ্চিত বসনে
ঢাকিয়া বিপুল বিত্ত—দেহ-স্বর্ণ—অতি সন্তর্পণে
হে ধনিকা, চ'লে যাও লীলায়িত গতি-ভঙ্গিমায়
নিঃস্ব ভিখারীর প্রাণ ভরি' দিয়া শত কামনায় !
কটি-তটে জড়াইয়া কভু মুক্ত বসন-অঞ্চল
সারা অঙ্গে যৌবনের তুলি' নৃত্য-তরঙ্গ চঞ্চল

নদী-তীরে দাঁড়াইয়া কাচো সিক্ত মলিন বসন,
তালে তালে নেচে যায় জীবনের পুলক-কম্পন !
দুল দুলাইয়া কভু কোন দিন চল রাজপথে
ভ্রমণ মধুর করি' কভু চল দূর বাষ্প-রথে।
—এমনি করিয়া তুমি নিশিদিন অন্তরে বাহিরে
তোমার কুহক-জালে সারাপথ রাখিয়াছ ঘিরে !
যেদিকে চলিতে চাই, দেখি শুধু তোমার মূরতি,
চিরন্তনী হ'য়ে তুমি জেগে আছ, বিশ্বের যুবতি !
যারা যায়, চ'লে যায়, ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নাহি তায়,
তোমার মাধুরী চির-সমুজ্জল—পরিপূর্ণতায়।
ফুল ফোটে, ঝ'রে যায়, তবু দেখি নিত্য ফোটা ফুল
সৃষ্টির আদিম হ'তে বন-কুঞ্জ করিছে আকুল ;
সেই মত হে সুন্দরি ! হে অনন্ত-যৌবনা যুবতি !
আদি কাল হ'তে তুমি বিকাশিছ তব রূপ-জ্যোতিঃ
অফুরন্ত সুষমায়। ম'রে যায় যে 'নূরজাহান'
তার লাগি দুঃখ নাই,—শূন্য নাহি রহে তার স্থান !
ওগো রূপ-পসারিণি ! রূপ নিয়ে একী খেলা তব ?
নিশিদিন দিকে দিকে এ কী লীলা নিত্য নব নব !
নিখিল নারীর দেহ—সে কি তব প্রমোদ-বাটিকা ?
তাদের মাঝারে আসি, হে দুরন্ত যুবতী-বালিকা,
রচ' মধু-কুঞ্জবন ; অঙ্গে অঙ্গে ফুটাইয়া ফুল
আপন সুষমা দিয়ে কর তারে ভুবনে অতুল ;
নিজে রহ অন্তরালে, পর্দ্দা-টানা আঁখি-বাতায়নে
উঁকি দিয়ে দেখ এই বিশ্ব-লোক গোপনে গোপনে !
তারপর একদিন খেলা ঘর ভাঙ্গিয়া হেলায়
নিঃশেষে ফিরায়ে নিয়ে সব দান বিদায়-বেলায়
অকস্মাৎ চ'লে যাও, ফেলে যাও শূন্য গৃহখানি
কোথা কোন্ স্বপ্ন-লোকে,—মোরা তার কিছু নাহি জানি।
কী অতৃপ্ত কামনায় হে সুন্দরি, এমন করিয়া
ফিরিতেছ পথে পথে নিতি নব মূরতি ধরিয়া ?
কী আশা মিটেনি তব ? কী বাসনা জেগে আছে মনে ?
বিকাশ-বেদনা নিয়ে ফিরিতেছ কেন এ ভুবনে ?

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

বার ভূঞার আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ

দায়ূদের পতন

পাটনা পরিত্যাগের পরে আফগানগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। কালাপাহাড়, সুলেমান মন্‌কলি, বাবুই মনকলি ঘোড়া ঘাট * অঞ্চলে যাইয়া রহিল, দায়ূদ তেলিয়াঘরী পাহারায় লোক রাখিয়া নিজে তাঁড়ায় চলিয়া গেল। টোডর মল্ল এবং মুনিম খাঁ অগ্রসর হইলেই তেলিয়াঘরীর প্রহরীগণ পলায়ন করিল এবং দায়ূদ সাতগাঁর দিকে চলিয়া গেল। টোডর মল্ল ও মুনিম খাঁ অগ্রসর হইয়া বিনাযুদ্ধে রাজধানী তাঁড়াতে আসিয়া সেনা সন্নিবেশ করিয়া বসিলেন, এবং বঙ্গদেশের শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থায় মনোযোগী হইলেন। আফগানদের প্রধান প্রধান আড্ডাগুলির দিকে এক এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। ঘোড়াঘাটে গেল একদল, ফতেহাবাদ ও বাকলা (ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ) দলন করিতে গেলেন মুরাদ খাঁ **, এবং সোনার গাঁ অভিমুখে প্রেরিত হইল আর একদল। একটি প্রবল দল দায়ূদকে তাড়াইতে সাতগাঁ অভিমুখে চলিল। ঘোড়াঘাটের আফগানগণ হারিয়া কুচবিহারে পলায়ন করিল, অন্যান্য স্থানেও আফগানগণ একে একে পরাজিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে রঙ্গস্থলে জুনৈদের প্রবেশ!

এই জুনৈদের জীবন লইয়া চমৎকার একখানা উপন্যাস লেখা যায়। জুনৈদ সুলেমান কর্‌রাণীর ভ্রাতা ইমাদ খাঁর পুত্র। সুলেমানের জীবন কালেই সম্ভবতঃ গুরুতর কিছু একটা করিয়া সুলেমানের শাস্তির ভয়ে জুনৈদ যাইয়া আকবরের শরণাপন্ন হয় (১৫৬৬ খ্রীঃ)। আকবর তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং আগ্রা সরকারের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে (বর্ত্তমানে জয়পুর ষ্টেটের অন্তর্গত) হিন্দোল নামক স্থানে (আগ্রা হইতে ৭১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে) তাহাকে জায়গীর প্রদত্ত হয়। (A. N. II. 399) বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই আবুল ফজল বলেন, অমূলক আশঙ্কা বশতঃ (A. N. II. 420) জুনৈদ হিন্দোল হইতে সরিয়া পড়ে এবং গুজরাটের বিদ্রোহী দলে যোগদান করে। জুনৈদ কি অমূলক আশঙ্কায় পলাইয়াছিল, আবুল ফজল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তবে বঙ্গসিংহাসনের অন্যতম উত্তরাধিকারী আকবরের দিক হইতে নানা রকমের আশঙ্কাই করিতে পারে। আবুল ফজলের ভাষায়, আকবরের শত্রু-

* ঘোড়াঘাট করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে রঙ্গপুরের সীমায় কিন্তু বর্ত্তমানে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। বগুড়া সহর হইতে সোজা উত্তরে ২৮ মাইল দূরে এবং উত্তর বঙ্গ রেলপথের হিলি ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল পূর্ব্বে। উভয় স্থান হইতেই ঘোড়াঘাট যাইবার উত্তম রাস্তা আছে। ঘোড়াঘাটের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি এখন কিছুই নাই, তবু এখনও গভর্ণমেণ্টের একটি থানা এবং কয়েকটি জমিদারী কাছারী আছে, বুকানন হ্যামিল্টনের Eastern India নামক গ্রন্থে এই স্থানের বর্ণনা আছে (Vol II. P. 679—682.) বুকাননের মতে শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধির সময়ে ঘোড়াঘাট নগর নদীর পারে ৮।১০ মাইল লম্বা ছিল এবং প্রায় দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। এক মাইল লম্বায় এবং আধ মাইল খানিক পাশে একটি দুর্গের চিহ্ন বুকানন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গটি কোন কালেই যে বড় বেশী দুর্ভেদ্য ছিল, এমন তাঁহার নিকট বোধ হয় নাই। একটি বড় মসজিদ ও কয়েকটী ছোট ছোট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাসাদাদির কোন চিহ্ন দেখা যায় না। দুর্গের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে ইসমাইল গাজীর দরগা সবিশেষ বিখ্যাত। ইস্‌মাইল গাজী [illegible]বক্ শাহের আমলের একজন বিখ্যাত সেনা নায়ক ছিলেন এবং ১৪৭৪ [illegible] রাজাদেশে নিহত হন। (J. A. S. B. 1874. P. 215. [illegible]tes on Shah Ismail Ghazi by. G. H. Damont.)

** সমস্ত সেনা নায়কগণের নাম উল্লেখ করিলাম না, বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, তাই। কতকগুলি নামে শুধু মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয়—এবং গোলযোগের বৃদ্ধি হয়। কৌতুহলী পাঠক Akbar Nama III P. 169 দেখিবেন। যে নাম পরে আবশ্যক হইবে শুধু সেই নাম গুলিরই উল্লেখ করা গেল।

গণ, কেহ নৌকা ডুবিয়া মারা যায়, কেহ বা রাজধানীর রাস্তায় অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া খামাকাই প্রাণটা দেয়, কাহাকেও বা উন্মত্ত হস্তী পায়ের তলে পিষিয়া মারে। আকবরের শত্রুগণের এই মরণ-প্রবণতাই হয়ত জুনৈদের আশঙ্কা উদ্রিক্ত করিয়াছিল। যাহা হউক, জুনৈদ যে গুজরাটে নানা দলের সহিত মিশিয়া ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নায়কত্ব করিয়া ফিরিয়াছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী পত্তনে * বিদ্রোহী দলের সহিত আকবরের সেনানায়কগণের যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধে বিদ্রোহী দলের কেন্দ্রের নায়কত্বের ভার জুনৈদের উপর অর্পিত হইয়াছিল, দেখা যায়। যুদ্ধে কেন্দ্রের নায়কত্ব লাভ অপেক্ষা বড় সম্মান আর কিছু নাই। এই যুদ্ধে মোগলগণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পরাজয় একেবারে সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আফগান সৈন্যেরা লুটতরাজে মত্ত হইয়া যায় এবং এই রূপেই মোগলগণের পক্ষে "সম্পূর্ণ পরাজয়ের পরেই সম্পূর্ণ বিজয় লাভ হয়।" (A. N Vol. III. P. 33—34.) জুনৈদ এবং অন্যান্য কতক বিদ্রোহী দক্ষিণাত্যে পলাইয়া যায়। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে দায়ূদ যখন পাটনা পরিত্যাগ করিয়া সাতগাঁ ও উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়মান এবং মুনিম খাঁ ও টোডর মল্ল টাঁড়ায় বসিয়া বাঙ্গলা দেশে শান্তি স্থাপনে ব্যস্ত, এমন সময় শুনা গেল ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্যে কররাণী বীর জুনৈদের আবির্ভাব হইয়াছে। জঙ্গলে সহসা একপাল সিংহ দেখা দিয়াছে শুনিলে বোধ হয় মোগল দল এত চিন্তিত হইত না!

বিশ্বস্ত টোডর মল্ল অমনি একদল সৈন্য ও কয়েকজন সেনানায়ক লইয়া ছুটিলেন সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে। অদ্ভুতকর্ম্মা জুনৈদ সুদূর গুজরাট হইতে দক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া ঝাড়খণ্ডে আসিতে নিশ্চয়ই সঙ্গে মেলা ধন দৌলত ও সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিতে পারে নাই। ঝাড়খণ্ডের প্রধান অধিবাসী এখনও সাঁওতাল, তখনও নিশ্চয়ই ছিল সাঁওতাল। তবু যে কি করিয়া জুনৈদ সেই খানেই সেনাদল গড়িয়া তুলিল এবং টোডর মল্লের সহিত যুঝিবার জন্য দাঁড়াইল, তাহা এক পরম বিস্ময়ের বিষয়। বলা বাহুল্য যুদ্ধে সে জিতিতে পারিল না এবং গম্ভীরতর জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া দায়ূদের নিকট চলিয়া গেল। হতভাগ্য দায়ূদের কিন্তু এই কররাণী বীরের সহিত বনিবনাও হইল না, বোধ হয় ভয় ছিল, পাছে সেই তাহার পরিবর্ত্তে রাজা হইয়া বসে। জুনৈদ হতাশ হইয়া দায়ূদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল। পথে টোডর মল্লের দলের কয়েকজন অগ্রগামী সেনানায়কের সম্মুখে সে পড়িয়া গেল। এই কয়জনের সহিত সৈন্য তেমন বেশী ছিল না, জুনৈদ ব্যাঘ্রের মত তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে সংহার করিল এবং টোডর মল্লের বৃহৎ দল কাছে আসিলে আবার ঝাড়খণ্ডে পলাইয়া গেল।

ইয়ার মুহম্মদ নামে একজন মোগল সেনাপতি বাঙ্গালা বিহারের সীমানায় এক প্রদেশ শাসনে প্রেরিত হইয়া লুটতরাজ করিয়া বেশ দু'পয়সা করিয়া লইয়াছিলেন। 'অপার' নামে একটি বিখ্যাত হস্তীও তাহার হাতে পড়িয়াছিল, মুনিম খাঁর হুকুমে পর্য্যন্ত সে তাহা সরকারে পাঠাইতে স্বীকৃত হয় নাই। আরও কিছু সম্পত্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক ঝাড়খণ্ডের রাস্তা দিয়া গোপনে দিল্লী সরিয়া পড়ার স্বপ্নে যখন সে বিভোর এমন সময় সহসা জুনৈদ তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল এবং সর্ব্বস্ব হারাইয়া সে টোডর মল্লের আশ্রয়ে ছুটিয়া আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। টোডর মল্ল অগ্রসর হইয়া আসিতেই জুনৈদ আবার জঙ্গলে যাইয়া আত্মগোপন করিল।

দায়ূদের পিছনে সাতগাঁ অভিমুখে যে দল গিয়াছিল তাহার নায়ক ছিল মুহম্মদ কুলি খাঁ বরলাস্। দায়ূদ সাতগাঁ ছাড়িয়া উড়িষ্যার দিকে পলাইয়া গেলে মুহম্মদ কুলি সদল বলে হাত পা ছড়াইয়া সাতগাঁতে আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন এবং আরামে মন দিলেন। খবর আসিল শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য যশোর অভিমুখে দ্রুত পলাইয়া যাইতেছে,

---

* আন্হিল বার—পত্তন। গুজরাটের হিন্দু আমলের রাজধানী, দিল্লী হইতে সুরাট যাইবার রাস্তার উপর। মানচিত্রে অতসীপুষ্প-কোরকাকৃতি গুজরাটের স্কন্ধদেশের উত্তরে রন নামে পরিচিত যে অগভীর সমুদ্রশাখা দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বতীরের মাঝামাঝি স্থান হইতে ৫০ মাইল পূর্ব্বে সরস্বতী নদী তীরে পত্তন নগর।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

কিন্তু চতুর শ্রীহরিকে ধরা আরামপ্রিয় মোগল সেনাপতির কর্ম্ম নহে, সে নির্ব্বিঘ্নে যশোরে যাইয়া আত্মগোপন করিল। এমন সময় টোডর মল্ল আসিয়া সাতগাঁতে উপস্থিত হইলেন এবং দায়ূদের পিছন লইবার জন্য সকলকে তাড়া দিতে লাগিলেন। টোডর মল্লের তাড়ায় অতিষ্ঠ হইয়া অবশেষে সকলে উড়িষ্যা অভিমুখে রওনা হইল। রাস্তায় সহসা অসুস্থ হইয়া মুহম্মদ কুলি মারা পড়িলেন। অমনি মোগল সেনা নায়কগণের মধ্যে আত্মকলহ লাগিয়া গেল, টোডর মল্লের কথা কেহই শুনিতে চাহিল না। কুইয়া খাঁ নামক একজন উদ্ধত ব্যক্তিকে নায়ক করিয়া সকলে পরামর্শ করিল যে ঝাড়খণ্ডের রাস্তা দিয়া সকলে দিল্লী চলিয়া যাইবে, রাস্তায় তাহারা জুনৈদকে যদি বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে পারে তবে আর সম্রাটের কোপের ভয় থাকিবে না। বেগতিক দেখিয়া টোডর মল্ল মুনিম খাঁকে খবর পাঠাইলেন যে যথেষ্ট অর্থ না পাঠাইলে আর এই সকল "অর্থদাস" সেনাপতিগণকে শান্ত করা যাইবে না। মুনিম খাঁ অবিলম্বে অর্থ ও নূতন কয়েকজন নায়ক পাঠাইলেন এবং মোগল নায়কগণ আবার কিছুদিনের জন্য শান্ত হইয়া দায়ূদের অনুসরণে চলিল। বর্দ্ধমান ও মন্দারণ হইয়া মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চিতোয়া পর্য্যন্ত আসিয়া বাদসাহী সেনা পৌছিলে পর টোডরমল্ল দেখিলেন যে মোগল সেনানায়কগণের মুখের ভাবগতিক এখনও বড় সুবিধার দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইঁহারা কি করিবেন সেই বিষয়ে টোডর মল্লের মনে যথেষ্ট অনিশ্চিততা ছিল। তাই তিনি মুনিম খাঁকে স্বয়ং আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুনিম খাঁর যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল, তিনিও আরাম ছাড়িয়া সহজে নড়িতে চাহিলেন না। এ এক চমৎকার দৃশ্য। মোগল সেনানায়কগণ ঝাড়খণ্ডের দুর্গম রাস্তা দিয়া ও মুনিম খাঁকে এড়াইয়া দিল্লী পলাইতে ব্যস্ত; মারিয়া, বকিয়া, ঘুষ দিয়া তাহাদিগকে চালাইতেছেন একজন অমোগল—টোডর মল্ল! সর্ব্ববিধ ভার যে মুনিম খাঁর উপর তাহারও ভাব,—"ঐ অমনি এক রকম করিয়া চালাইয়া লও, এই বুড়া বয়সে আর পারি না বাপু ছুটাছুটি করিতে!" ভাগ্যক্রমে এই সময় আকবরের এমন জরুরি তাড়া আসিয়া পড়িল যে মুনিম খাঁ না নড়িয়া পারিলেন না। অবিলম্বে তিনিও আসিয়া চিতোয়াতে উপস্থিত হইলেন।

অদূরে দায়ূদ ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছে—মোগল নায়কগণ অগ্রসর হইতে বা যুদ্ধ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, মুনিম খাঁ মহা বিপদে পড়িলেন। এক মজলিস আহ্বান করিয়া তিনি ও টোডর মল্ল যুগল কৃষ্ণের মত যুদ্ধ-বিমুখ অর্জ্জুনগণকে যুদ্ধ-গীতা শুনাইতে লাগিলেন। অনেক বক্তৃতার পর যুদ্ধে মতি হইলে বিমুখ নায়কগণ বলিলেন—রাস্তা বড় খারাপ, এই রাস্তায় চলিতে পারিব না নূতন রাস্তা চাই। নূতন রাস্তা খুজিয়া বাহির করা হইলে পর সেই রাস্তায় চলিয়া অবশেষে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে দায়ূদের সৈন্য ও বাদশাহী সৈন্য মেদিনীপুর জেলায় তুকারুই নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

এই স্থানটি বর্ত্তমানে দাঁতন থানার অন্তর্গত। ১ ইঞ্চি =১ মাইল থানা ম্যাপে ইহার মৌজা নম্বর দেখা যায় ১৬৮। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে এবং তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে বাদশাহী সড়ক হইতে এই গ্রামের সীমা পূর্ব্বদিকে এক মাইল খানেক হইবে। সড়কের পশ্চিমেই সুবর্ণরেখা নদী। এই গ্রাম হইতে দাঁতন থানা সোজা ৪ মাইল উত্তরে। এই তুকারুইর যুদ্ধ মোগলমারীর যুদ্ধ বলিয়াও বিখ্যাত। মোগলমারী ও বাদশাহী রাস্তার উপরেই, তুকারুই হইতে ৮ মাইল উত্তরে।

এই তুকারুইর যুদ্ধ বাঙ্গালার ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্ব-সম্পন্ন। আবুলফজলও বলেন যে এই যুদ্ধেই প্রকৃতপক্ষে মোগল প্রভুত্ব বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় (A. N. III. P. 179.)। এই যুদ্ধেও দেখা যায় যেন দৈবেই মোগলগণকে জিতাইয়া দিয়াছে। নচেৎ তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছিল বলিলেই হয়, এবং মোগলগণের দুর্দ্দশা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রের মোগলমারী নামকরণেও প্রতিভাত। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বাঙ্গালী পাঠকগণের অপ্রীতিকর হইবে না ভরসা করিয়া এই যুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া গেল।

নিম্নের নক্সা হইতে যুদ্ধের সৈন্য-সংস্থান বুঝা যাইবে। এই ব্যূহ রচনা যুদ্ধ বিজ্ঞানের এক বিশেষ অঙ্গ।*

আলম খাঁ

কুইয়া খাঁ

টোডর মল্ল মুনিম খাঁ শাহম খাঁ

প্রথম অবস্থা

এক্ষেত্রে আফগান ও মোগলগণের সৈন্য সংস্থানে এই একটু বিভিন্নতা দেখা যায় যে যথারীতি কেন্দ্র, দক্ষিণ পক্ষ বাম পক্ষ ও শির এই কয় সংস্থানের মধ্যে মোগল পক্ষে কেন্দ্র ও শিরের মধ্যে আল্‌তমাস বা স্কন্ধরূপেও একটি দল সংস্থিত ছিল। তবকত্‌-ই-আকবরীতে দেখা যায়, মোগলগণের বহু কামান ছিল এবং তাহা সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছিল। আফগানগণের সর্ব্বাগ্রে ছিল একদল প্রকাণ্ড-কায় হস্তী। তাহাদের মাথায় ও দাঁতে বহু কাল রঙ্গের চামর বাঁধিয়া ও চামড়া দিয়া তাহাদের অঙ্গ মুড়িয়া তাহাদিগকে ভয়াবহ করিয়া তোলা হইয়াছিল। আফগান পক্ষে শিরে ছিল গুজর খাঁ—মোগল পক্ষে আলম খাঁ।

প্রথম আক্রমণ করিল আলম খাঁ। সে বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া অনেক দূর চলিয়া গেল এবং বিপক্ষ তীরন্দাজগণের হাতে যথেষ্ঠ অভ্যর্থনা লাভ করিয়া মুনিম খাঁর গরম আদেশে ফিরিয়া আসিল। তখন পর্য্যন্ত মোগল সৈন্য-সংস্থান সম্পূর্ণ হয় নাই, কাজেই আলম খাঁর এই অসাময়িক আক্রমণে ও প্রত্যাবর্ত্তনে মোগল দলে একটু বিশৃঙ্খলা লাগিল। সেই দিন জ্যোতিষীর গণনায় দিনটা ভাল ছিল না বলিয়া মুনিম খাঁর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আফগানগণ যখন অগ্রসর হইয়া আসিল এবং আলম খাঁ সহসা এরূপ আক্রমণ করিয়া বসিল তখন রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। মোগলগণের কামানে আফগান হস্তীদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। তখনকার দিনে কামান ১৫ মিনিটে একবার ছুড়িতে পারিলেই খুব কাজ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই একবার কামান ছুড়িতে ছুড়িতেই হাতীর দল আসিয়া পড়িয়াছিল। আফগান হস্তীগুলির অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া মোগল-শিরের অশ্বগুলি ভয় পাইল এবং দেখিতে দেখিতে আসিয়া স্কন্ধের উপর চাপিয়া পড়িল। সেই চাপে স্কন্ধও ভাঙ্গিয়া গেল এবং শির ও স্কন্ধের মিলিত চাপে কেন্দ্রও বিচলিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে গুজর সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিয়াছে, আলম খাঁ মারা গিয়াছে, কুইয়া খাঁ পলাইয়াছে। শির ও স্কন্ধ ভেদ করিয়া গুজরসিংহ যখন আসিয়া মোগল কেন্দ্রে পৌঁছিল তখন কেন্দ্রও ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না। মুনিম খাঁ, সম্ভবতঃ মোগলগণের অবস্থা ও মতিগতি দেখিয়া, তরবারী ফেলিয়া চাবুক হাতে দাঁড়াইয়া পলায়মানগণকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, গুজর আসিয়া তাঁহার উপর পড়িল। আজীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বৃদ্ধ মোগল-বীর মোগলের মুখ উজ্জ্বল রাখিলেন, পলাইলেন না। তাঁহার অনুচরগণ তখন পলাইয়াছে, দুই চারি জন বীর সহচর দূরে দূরে দ্বৈরথ সমরে নিযুক্ত, হাতে তাঁহার তরবারী নাই। তবু তিনি কশা দণ্ড দিয়াই গুজরের তরবারীর আঘাত ফিরাইতে লাগিলেন এবং মাথায় ও স্কন্ধে আঘাত গুরুতর পাইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরের মত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন সময় তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ঘোড়ার রাশ ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ফিরাইল এবং প্রায় ৮ মাইল হটিয়া গিয়া তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুজর অগ্রসর হইয়া তাঁহার তাঁবু লুঠিয়া লইল। আফগান সেনাগণ যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে ভাবিয়া লুট তরাজে মত্ত হইয়া গেল। যুদ্ধের দ্বিতীয় অবস্থা আরম্ভ হইল।

টোডরমল্ল শাহম খাঁ

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

কুইয়া খাঁ ও মুনিম খাঁর

ভগ্নদল

যুদ্ধের দ্বিতীয় অবস্থা

* মোগলগণের যুদ্ধ প্রথা সম্বন্ধে দুইখানা ভাল পুঁথি আছে। কৌতুহলী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। একখানা Irvineএর Army of the Indian Mughals। আর একখানার বিষয়ও ঐ, জার্ম্মান ভাষায় লিখিত. প্রণেতা Dr. Horn.

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

যুদ্ধজয় সম্পূর্ণ হইবার আগেই লুট তরাজে মত্ত হওয়াতে অনেক জিতা যুদ্ধে হার হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। পূর্ব্বে যে পত্তনের যুদ্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও আফগানগণ ঠিক এই রকমেই জিতা যুদ্ধ হারিয়াছিল। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। আফগানগণকে লুণ্ঠনে মত্ত দেখিয়া কুইয়া খাঁ এবং অন্যান্য মোগল নায়ক কোন রকমে দল গড়িয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় আকবরের বিখ্যাত দৈব আবার তাঁহার সহায় হইল। সহসা অজ্ঞাত হস্ত কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এক শরে মস্তিষ্ক বিদ্ধ হইয়া গুজর ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। ভারতীয় যুদ্ধে পৃথীরাজের আমল হইতে যাহা হইয়া আসিতেছে আবার তাহার পুনরভিনয় হইল। নায়ক অদৃশ্য হইবামাত্র এবং সেই খবর রাষ্ট্র হইবামাত্র বিজয়ী আফগান সেনা আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—"পশ্চাদ্ভাগ দেখত" বলিয়া ছুটিল। বিজয় লক্ষ্মী ঢলিয়া পড়িলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আফগানগণের মূলভাগত্রয় এতক্ষণ দাঁড়াইয়া যেন তামাসা দেখিতেছিল। গুজরের কিছু পূর্ব্বে দায়ূদের দক্ষিণ পক্ষ গুজরের সহিত যোগ দিবার জন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু যেই তাহাদের নিকট গুজরের পতন ও আফগান শিবিরের পলায়নের খবর পৌছিল, অমনি তাহারাও পলাইল। বাকী রহিল কেন্দ্রের দাউদ ও তাহার বাম পক্ষ। ইহাদের সঙ্গে মোগল বাম পক্ষে টোডরমল্ল ও দক্ষিণ পক্ষের শাহম খাঁর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। শাহম খাঁ গুজরের অদ্ভুত কীর্ত্তি শুনিয়া পলাইবার আয়োজন করিতেছিল, কিন্তু সহচরগণের প্রবোধ বাক্যে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদিকে টোডরমল্লে আর দায়ূদে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এমন সময় মুনিম-খাঁর পলায়নের খবর আসিয়া টোডর মল্লের দলে পৌছিল। রাজপুত বীর ত্বরায় খবরদাতার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহারা খবর শুনিয়াছিল তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে একজনের পা পিছলাইয়াছে বলিয়া সকলেরই পা পিছলিবে এমন কথা নাই। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে দায়ূদের বামপক্ষকে পরাজিত করিয়া শাহম খাঁ সদলবলে আসিয়া টোডরমল্লের দলে যোগ দিল। ইহাদের মিলিত বলের কাছে আর দায়ূদ দাঁড়াইতে পারিল না। সে দ্রুত উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করিল। তুকারুই হইতে মোগলমারী প্রায় ৮ মাইল দূর। সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ ৮ মাইল জুড়িয়াই যুদ্ধ চলিয়াছিল। আবুলফজল্ বলেন, বন্দী আফগান সেনাগণের মস্তক কাটিয়া ৮টি বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

ইহার পর দায়ূদ কটকে যাইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু আর যুদ্ধ চালান অসম্ভব দেখিয়া সেনাপতি পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল। রণশ্রান্ত মোগল সেনাপতি-গণ স্বর্ণপ্ররোচনায় যে এই প্রস্তাব লুফিয়া লইলেন এবং টোডরমল্লের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও মুনিম খাঁ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন, আবুল ফজল্ এই সকল কথা অম্লান বদনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দায়ূদকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দায়ূদ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিল। রাগ করিয়া টোডর মল্ল সন্ধিপত্রে সহি পর্য্যন্ত করিলেন না।

আশ্চর্য্য চরিত্র এই রাজপুতবীর টোডরমল্লের। তাঁহার কোন চরিতাখ্যান আছে কি না জানি না, কিন্তু যোগ্য কেহ যদি পরিশ্রম করিয়া এই ধর্ম্মপ্রাণ রাজপুত বীরের একখানা জীবনী বাঙ্গলা ভাষায় সঙ্কলন করেন, তবে উহা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল আকবরের পাঞ্জাব যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনার বিবরণ আবুলফজলের ভাষায় শুনুন:—

"বিশ্বস্ততায় এবং বৈষয়িক জ্ঞানে যেমন টোডরমল্লের তুল্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও কুসংস্কারেও তেমন টোডরমল্লের জুড়ি পাওয়া ভার। টোডরমল্লের বাঁধা নিয়ম এই যে তাঁহার সঙ্গের পূজার পুতুল গুলিকে নির্দ্দিষ্ট বিধানে প্রত্যহ পূজা না করিয়া এবং সহস্র প্রকারে ভক্তি প্রকাশ না করিয়া তিনি অন্ন-জল গ্রহণ করিতেন না। একদিন তাঁবু নাড়াচাড়ার গোলযোগে এই বুদ্ধিহীনের পুতুলগুলি খোয়া যায়। টোডর মল্লের বুদ্ধিহীনতা এমনি আন্তরিক যে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। অবশেষে আকবরের বহু সাধ্য সাধনায় ও প্রবোধে তিনি আবার নিজের কাজে মন দিলেন।" (A. N. III. P. 310.)

অবিরত মুসলমান সংস্রবে থাকিয়াও যিনি নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এমন অটুট রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে অসামান্য দৃঢ়তা ছিল সন্দেহ নাই। আবুল ফজল্ টোডর-মল্লের উপর বড় প্রসন্ন ছিলেন না, তবু বহু স্থানেই তিনি টোডর মল্লের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উৎকোচে না ভুলিয়া মুনিম খাঁ যদি টোডর মল্লের পরামর্শ মত আফগান-বহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিতেন তবে বাঙ্গলা দখলে আকবরের জীবনকাল ব্যয় হইয়া যাইত না।

শেষ রাত থেকে নেমেছে বাদল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শেষ রাত থেকে নেমেছে বাদল
পিছল হ'য়েছে পথ ঘাট,
জল থই থই ডোবায় পুকুরে,
নির্জ্জন আজ হাটবাট।
আকাশ ভরিল ঘন মেঘে, হ'ল
হৃদয় মিলন-উন্মুখ,
গুরু গুরু কাঁপে আকাশের হিয়া,
দুরু দুরু কাঁপে মোর বুক।
রাতের আঁধার কাটেনি তখনো;
মেঘের আঁধার থম্থম্,
সোহাগিনী ঘুমে পতির বক্ষে,
বাহিরে বাদল ঝম্ঝম্।
আমার কেবল কম্পিত চিত,
শঙ্কিত হিয়া ভাবনায়;
বিরহ-বেদন ঘনাইয়া আনে
গহন নিবিড় মেঘছায়।

শেষ রাত্ থেকে হাত দিনু কাজে
মন বসেনাকো কিছুতেই,
পাঁচবার ডাকে তবে পশে কানে,
আমাতে যেন রে আমি নেই।
শাশুড়ী শুধান "অসুখ করেছে?"
মন ভরে মোর লজ্জায়,
চোখে আসে জল, সারা রাত্ শুধু
কেঁদেছি শূন্য শয্যায়;
বাসন-কোষণ ভারী লাগে যেন,
শ্রান্ত এ তনু দুর্ব্বল,—
হেথায় হোথায় জমিয়াছে জল,
পথঘাট সব পিচ্ছল।

পুকুরের পাড়ে তাল নারিকেল
ভেজে ঝিম্ঝিম বাদলায়,
চেয়ে থাকি দূর ব্যথিত আকাশে,
কত ব্যথা এসে মন ছায়।
কবে তাঁর মনে দিয়েছি বেদনা,
কবে করেছিনু অভিমান;
তাই ভাবি, আর কাজ পড়ে' রয়,
—বহিয়া চলেছে দিনমান।
ভিজে ভিজে শুধু ঘর আর ঘাট
ঘুরিতেছি, কত হয় ভুল;
মনে নাহি পড়ে, কখন কোথায়
ফেলেছি কানের দুটো দুল্।
বন-বুকে কাঁপে বেদনা-তিমির,—
আঁখির কাজল ধুয়ে যায়,
কেতকীর প্রাণ শিহরে ব্যথায়,
কামিনীর শাখা নুয়ে যায়।
পুকুরের জল থল্থল্ করে,
শাপ্লা ফুটেছে বুকে তার;
তাল-নারিকেল-খর্জ্জুর-শিরে
ঘনায় মেঘের আঁধিয়ার।

জীবন ও প্রেম

শিল্পী—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

৪

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দুখানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন তখন সে সেই দুখানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—"বৌমা, তোমার খোকার হাসিটী বায়না করা।" খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি সুরু করিবে যে তাহার মা বলে—"আচ্ছা খোকন্, আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্যে একটুখানি রেখে দ্যাও।" মাত্র দুইটী কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে 'জে—জে—জে—জে' এবং দুধে দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, 'না—না—না—না—না' ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সুরু করে। যাহা সাম্‌নে পায়, তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দুখানির জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটীর ঢেলা, এক টুক্‌রা কাঠ, মায়ের আঁচল, দুধ খাওয়াইবার সময় এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দুখানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হ্যাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কাম্‌ড়ে ধল্লি কেন?—ছাড়্, ছাড়্—ওরে করিস্ কি—দুখানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল—ভেঙ্গে গেলে তখন হাস্‌বি কি করে শুনি?" খোকা তবুও ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া অতি কষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাঠরার মধ্যে শুনানি-হওয়া ফৌজদারী মাম্‌লার আসামীর মত আটক্ থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিত—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইলেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া এক মুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তাহার মা বলে—"একি ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়ীচাঁচা পাখী সেজে বসে আছো দেখি; এদিকে আয়।" জোর করিয়া নাকমুখ রগ্‌ড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে, 'জে—জে—জে—জে', তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা থল্‌বল্‌ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইতে যায়। এক এক দিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্ব্বজয়া বলে—"খোকন্‌ বলে টু—উ—উ? দোলো তো খোকা? দোলে দোলে খোকন্‌ দোলে"—খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সাম্‌নে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট দুটী হাত নাড়িয়া গান ধরে—

গীত

'জে—এ—এ—জে—জে—জে—এ—এ—ই

জে—জে—জে—জে—এ

জে—জে—জে—জে—জে—জে—'

তাহার মা বলে—"আচ্ছা থামো, আর দুলো না খোকা, হয়েচে, হয়েচে, খুব হয়েচে"। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্ব্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোনো শব্দ আসিতেছে না—যেন সব চুপ হইয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্‌ করিয়া উঠিত—খোকাকে শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি-উপুড়-করা এক রাশ চাঁপা ফুলের মত মাটীর উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নাল্‌সে পিঁপ্‌ড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিঁপ্‌ড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোক গিলিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিঃশ্বাসের শব্দটীও পাওয়া যাইতেছে না। সর্ব্বজয়া বলিত—"বাছা আমার দুরন্তপনা করে করে অমনি মাটীর উপর ঘুমিয়ে পড়েচে দ্যাখো—ঘুমুক একটু"—তাহার পর কাজ করিতে করিতে শুনিত আবার খোকার গলার শব্দ শোনা যাইতেছে, আবার সে অদৃশ্য শ্রোতাকে লক্ষ্য করিয়া নিজের ভাষায় নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের বার্ত্তা সুরু করিয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারের নির্জ্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কল হাস্যে মুখরিত থাকে,—সর্ব্বজয়া মুগ্ধ হইয়া যায়,—ফুটা চালের ফাঁক দিয়া দূর স্বর্গের জোৎস্নার একটু ঝলক আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের ঘরে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল জন-মনের ব্যক্ত বার্ত্তায়। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার পাগ্‌লামী, মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ-ছানিয়া-গড়া মুখ, আধ আধ আবোল তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না।

এক এক দিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্ব্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে—"ওগো ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েচে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে—ধরো দিকি একটু?—আমি নাইবো, না ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাক্‌লেই হবে?"—হরিহর বলে—"উহুঁ ও সব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত।" সর্ব্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার চটীজুতার পাটীটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে। হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, দ্যাখো বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে!

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্‌ হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—'জে—জে—জে—জে—'

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেক দিন আগের এক রাত্রির কথা মনে হয়। নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুর বাড়ী স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। শ্বশুরবাড়ী খুব বেশী দূরে নয়, তাহাদের গ্রাম হইতে নৌকা-যোগে ছয় সাত ঘণ্টার পথ। দুপুরের পর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের ঘাটে নৌকা পৌছিল। বিবাহের পরে একটীবার মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, পথঘাট মনে ছিল না, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হইল। সে বাড়ীর পত্রে জানিত যে তাহার বড় শালার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও ছোট শালী ছাড়া অন্য কেহ যে নাই ইহা সে পূর্ব্ব হইতেই ঠাওরাইয়াছিল। তাহার ডাকাডাকিতে একটী গৌরাঙ্গী ছিপ্‌ছিপে চেহারার তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাহিরের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহার সঙ্গে চোখো-চোখি হওয়াতে সেখান হইতে চট্‌ করিয়া সরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল--হরিহর ভাবিতে লাগিল মেয়েটী কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। সর্ব্বজয়া দারিদ্র্য হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের একখানা লাল পাড় মট্‌কা শাড়ী পরিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিল। হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকা পত্নীর কিছুই আর এই সুন্দরী তরুণীতে নাই—কে যেন ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। মুখের সে কচিভাবটুকু আর নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়াছে তাহা যে খুব সুলভ নহে, হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেরী হইল না। হাত পায়ের গঠন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বজয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা এক-রূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার সে লজ্জা-টুকু তাকে যেন নতুন করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহরই প্রথমে কথা কহিল; স্ত্রীর ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—"বসো এখানে, ভাল আছো?"

সর্ব্বজয়া মৃদু হাসিল। লজ্জাটা যেন কিছু কাটিয়া গেল। বলিল—"এতদিন পরে বুঝি মনে পড়্‌লো? আচ্ছা কি বলে এতদিন ডুব মেরে ছিলে?" পরে সে হাসিয়া বলিল—"কেন কি দোষ করেছিলাম বলো তো?" স্ত্রীর কথাবার্ত্তায় অজ পাড়াগাঁয়ের টান্‌ ও ভঙ্গিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারী মিষ্ট বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল স্ত্রীর হাতে কেবল গাছ কয়েক কড় ও কাঁচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোনো গহনা নাই। গরীব ঘরের মেয়ে, দিবার কেহ নাই, এতদিন খবর না লইয়া ভারী অন্যায় করিয়াছে সে! সর্ব্বজয়াও চাহিয়া চাহিয়া স্বামীকে দেখিতেছিল। আজ সারাদিন সে চারি পাঁচবার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে—স্বাস্থ্য-ময় যৌবন হরিহরের সুগঠিত শরীরের প্রতি অঙ্গে যে বীরের ভঙ্গি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপ মায়ের কথাবার্ত্তায় আজ সে শুনি-য়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, টাকাকড়ির দিক্‌ হইতেও দুপয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচিল, ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সক-লেই বলিত স্বামী তাহার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে,—আর কখনো ফিরিবে না। সে মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামীর পুনরাগমন এতকাল তাহার কাছে দুরাশার মতই ঠেকিয়াছে। কত রাত্রি দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে, গ্রামের বিবাহ উপনয়নের উৎসবে ভাল করিয়া যোগ দিতে পারে নাই,—সকলেই আহা আহা বলে, গায়ে পড়িয়া সহানু-ভূতি জানায়। অভিমানে তাহার চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনের সোনালি কল্পনা এতদিন শুধু আড়ালে আবডালে নির্জ্জন রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত—এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপ মায়ের মৃত্যুর পরে সে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে? এত-দিনে কিনারা মিলিল। নিজের পাতা, সচ্ছল ঘর-সংসারের একটা ছবি তাহার মনে ফুটিতেছিল আজ সারাদিনটা আর যেন তাহাকে দূরের বলিয়া মনে হয় না, হাতের কাছেই যেন ধরা দিয়াছে।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখ্‌লে—তখন চিন্‌তে পেরে-ছিলে? সত্য কথা বোলো কিন্তু—"

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলিল—"নাঃ, তা চিন্‌বো কেন? প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারি নি, তারপর তখুনি—"

"আন্দাজে—"

"আন্দাজে নয় গো আন্দাজে নয়—সত্যি সত্যি—দেখ্‌লে না তখ্‌খুনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌লাম?

আচ্ছা তুমি বলতো আমায় চিন্‌তে পেরেছিলে? বলতো গা ছুঁয়ে?"

হরিহর হাসিয়া উঠিল, বলিল—"সেটা কিন্তু অনেকটা আন্দাজে—মিথ্যে বলে আর কি হবে?"

নানা কেজো অকেজো কথাবার্ত্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা ওঠাতে সর্ব্বজয়ার চোখের জল আর বাধ মানে না। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল—'বীণার বিয়ে কোথায় হোল?" ছোট শালির নাম সে জানিত না, আজই শ্বশুরের মুখে শুনিয়াছে।

"তার বিয়ে হোল কুড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ্, কি বলে? মধুমতী—সেই মধুমতীর ধারে—"

"বেশ ভাল জামাই?"

"মন্দ না, বাড়ীতে গোলা আছে—বয়েসও অল্প—"

একটা প্রশ্ন বার বার সর্ব্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না দেখাশুনা করিয়া আবার চলিয়া যাইবে সেই কাশী গয়া? বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোনোরূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল—না নিয়ে যাক্ সে—আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট হতে যাওয়া?—

হরিহর সমস্যার সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল—"কাল চল তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই—নিশ্চিন্দিপুরে—"

সর্ব্বজয়ার মনে ধড়াস্ করিয়া যেন ঢেঁকির পাড় পড়িল—সাম্‌লাইয়া লইয়া মুখে বলিল—"কালই কেন? এ্যাদ্দিন পরে এলে—দুদিন থাকো না কেন?...বাবা মা কি তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন? পরশু আবার আমার বকুল ফুলের বাড়ী তোমায় নেমন্তন্ন করে গিয়েচে"

"কে তোমার বকুল ফুল?..."

"এই গাঁয়েই বাড়ী—এ পাড়ায়—আবার ওপাড়াতে বিয়েও হয়েচে।"—পরে সে আবার হাসিয়া বলিল—"কাল সকালে তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে বলেচে যে—"

কথাবার্ত্তার স্রোত এক ভাবেই চলিল—রাত্রি গভীর হইল। বাড়ীর ধারেই সজ্‌নে গাছে রাত-জাগা কি পাখী অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহ-ব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনা-সজ্জা সাজাইয়া বৃথা প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্ব্বর, অপরিচিত মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে! রাত-জাগা পাখীটা ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। এক হিসাবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল; সম্মুখে তাহাদের নব জীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গেল—আজ রাতটী হইতেই তাহার সুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে! কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়রূপে?

দুজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। দুজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে! তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাত্তা?

৫

ইন্দির ঠাকরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাস হইল। সর্ব্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে ঐ বুড়ী ডাইনি সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। দুবেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ইঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন্ দিকে—জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষ দিকে বুড়ী অবশেষে এক যুক্তি ঠাওরাইল। ছয় ক্রোশ দূরে ভাণ্ডারহাটিতে তাহার জামাইবাড়ী। তাহার জামাই চন্দ্র মৈত্র বাঁচিয়া আছেন। জামাইএর অবস্থা বেশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ—অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় চল্লিশ বৎসর জামাইএর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে—কেবল মেয়ের মৃত্যুর বৎসর কয়েক পরে এই প্রথম কি কার্য্যে আসিয়া চন্দ্র মৈত্র প্রথম পক্ষের শাশুড়ীকে ২৲ টাকা প্রণামী দিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—সেও আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের কথা—তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা ও খবরা-খবরের লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে? সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভাণ্ডার-হাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ী দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানের ডাকহাঁকে একজন চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল—"কোথাকার গাড়ী?" তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির হইলেন—"কে রাধু! জিগ্যেস্ করো কোথা থেকে আস্‌ছেন!"

বুড়ী চিনিল—কিন্তু অবাক্ হইয়া রহিল—এই সেই তাহার জামাই চন্দর! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সে সবল দোহারা গড়ন সুচেহারা ছেলেটীর সঙ্গে এই পক্ককেশ প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল! পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রনে উৎপন্ন—না হাসি না দুঃখ গোছের মনের ভাবে সে বিহ্বলের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল! অনেক দিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাঁদিল।

বিস্ময়বিমূঢ় চন্দ্র মৈত্র প্রথমটা আকাশ পাতাল হাতড়াইতে ছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন। একটু সাম্‌লাইয়া বুড়ী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল—"তোমার কাছে এয়েচি বাবাজি এতদিন পরে—একটুখানি আচ্ছ্রয়ের জন্য—আর কডা দিনই বা বাঁচবো! কেউ নেই আর ত্রিভুবনে—এই বয়েসে দুটো ভাত কাপড়ের জন্যি—"

মৈত্র মহাশয় বড় ছেলেকে গাড়ীর দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলের সঙ্গে শাশুড়ীকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। পঞ্চাশ বৎসরের কীটদষ্ট জীর্ণ যবনিকা তুলিয়া একটি গৌরাঙ্গী সুন্দরী বালিকা—গলায় সেকালের ধরণের চাঁপকলি, কাণে পিপুল পাতা, নাকে বেসর—হাসিমুখে যেন বলিয়া উঠিল, কি চিন্‌তে পারো?...সে চন্দ্র মৈত্রের প্রথম যৌবনের তরুণী সঙ্গিনী বিশ্বেশ্বরী। তাহার পর আরও দুই পক্ষ পর পর পার করিয়া বর্ত্তমানে চন্দ্র মৈত্র পক্ষছিন্ন মৈনাকের মত সংসারজলধিতে হাবুডুবু খাইতেছেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। আরও তিনটী পুত্রবধূ আছে। নাতি নাতিনীও তিন চারিটী।

তালগাছের গুঁড়ির খুঁটী ও আড়াবাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া-উঁচু আটচালা ঘর। জিনিষপত্র, সিন্দুক তোরঙ্গে বোঝাই, পা ফেলিবার স্থানাভাব। সন্ধ্যার পরই বেশ আদরের সহিত জলযোগের বন্দোবস্ত হইল—মুগের ডাল ভিজানো, নারিকেল কোরা, পেঁপে, শসা, কলা—কিনিতে হয় না, সবই বাগানের। মৈত্র মহাশয়ের বিধবা মেয়েটীর নাম হৈমবতী। মৈত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান, খুব ভাল মেয়ে—সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জল খাবার সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইল। একথা, ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল—"দিদিমা, আমায় কখন দেখেন নি,—না? কখনো তো এদিকে পায়ের ধূলো দ্যান্‌নি এর আগে? আক কেটে দেবো দিদিমা? দাঁত আছে?"...পাশের রান্নাঘরে ছেলে মেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বসিয়া হৈ চৈ করিতেছে। একজন চেঁচাইয়া বলিতেছে, "ওমা দ্যাখো, উমি সব ডালটুকু আমার পাতে ঢেলে দিচ্চে?" —বড় পুত্রবধূ চেঁচাইতেছে, "ওর কাছে খেতে বসিস্ কেন? রোজ না বলিচি আলাদা বস্‌বি—এই উমি বড্ড বাড় হয়েচে না?"... চিংড়ি মাছ ভাজিবার গন্ধ বাহির হইতেছে। জলযোগ শেষ করিয়া বুড়ী বড় আটচালা ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। এক ধারে রাশীকৃত নারিকেল, একধারে মুগের বস্তা উঁচু করা। হৈমবতী বলিল, "বিছানা করে দি, দিদিমা? একটু শোন্—সারাদিন গাড়ীতে করে এসেচেন—ওরে জীব্‌নে, নিশ্চিন্দিপুরের গাড়োয়ান বাইরে আছে—দ্যাখ্ দিকি নিজে রেঁধে খাবে, না এখানে খাবে?" বাড়ীতে এতটুকু চুপ নাই—হৈ চৈ, কল্ কল্ শব্দ, এ লাফাইতেছে, ও চেঁচাইতেছে—কৃষাণে আসিয়া এটা ওটা চাহিতেছে—পুরুষেরা একবার বাহির একবার ভিতর করিতেছে। মুগের বস্তার পাশে বিছানা

পাতা হইলে বুড়ী বসিল। তাহার যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছিল, এ সে কোথায় আসিল? এতটুকু নিরিবিলি জায়গা নাই যে বসে! উঠানের বাতাবী লেবু গাছে জোনাকী জ্বলিতেছে। সেদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে খুকীর করুণ মুখ মনে পড়িল। খট্ করিয়া বুকের মধ্যে যেন কোথায় কি বাধিল—কত মিথ্যা কথায় তাহাকে ভুলাইয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিবে বলিয়া আসা হইয়াছে। কতকাল আগেকার নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে—আজ যদি সে বাঁচিয়া থাকিত!…তাহা হইলে এই ঘরদোর, ঝালাপালা, ছেলেপিলে সবই তার। জোনাকী-জ্বলা অন্ধকার সন্ধ্যায় কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে!…

দশ-বার দিন কাটিয়া গেল। হৈমবতীর যত্ন আপ্যায়ন দিন দিন বাড়িতেছিল। কেবল বড় বধূ কেমন যেন একটু ঠ্যাকারে। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলা ভয়ানক চঞ্চল ও দুষ্ট, পরস্পর দিনরাত মারামারি কাটাকাটি করিতেছে, ডাকিলেও কেহ কাছে আসে না। বুড়ীর সব যেন কেমন নতুন নতুন ঠেকে, তেমন স্বস্তি পাওয়া যায় না—নতুন ধরণের ঘরদোর, নতুন পথঘাট, নতুন ভাবের গৃহস্থালী। কেমন যেন মনে হয়, এ তো ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। এখানে সে কি করিয়া থাকিবে? তাহা ছাড়া এ বাড়ীর লোক কখন খায়, কখন শোয় তার ঠিকানা নাই—রাত একটা পর্য্যন্তই হৈ চৈ চলিতেছে। তারপর যে যেমন পারিল শুইয়া পড়ে। বুড়ীর নির্দ্দিষ্ট একটা শুইবার বা বসিবার স্থান রহিল না। যখন যে জায়গা খালি পাওয়া যায়, সেইখানেই শোয়া-বসা করিতে হয়। আসল কথা বুড়ী পৃথিবীর অন্যান্য বহুলোকের ন্যায় নিজের মন জানিত না—ইহা সে বুঝে নাই যে, সত্তর বৎসর যে গ্রামের যে ভিটার মানুষ—যার প্রতি দুর্ব্বাঘাসটা সুপরিচিত, আজ এতদিন পরে সত্তর বৎসর বয়সে সে সব পুরাতন চিরপরিচিত জিনিস ছাড়িয়া কি আর নূতন স্থানে নূতনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার সময় আছে? তাই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পড়িত নিরিবিলি দাওয়া আর খুকী ও খোকার মুখ। সারাদিন কোনরকমে চাহিয়া থাকিলেও সন্ধ্যাবেলায় চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিত।

আর এক কথা এই যে, এতদিনেও কেহ তাহাকে স্পষ্ট করিয়া এখানে থাকুন একথা বলে নাই। বরং ভাবটা এইরকম যেন—আর কি—এত দিনতো আদর আপ্যায়ন কুটুম্বিতা যাহা করা উচিত করিয়াছি—এইবার তাহা হইলে?—অর্থাৎ কাল সকালে যদি বুড়ী বলে, আচ্ছা তা হোলে সব দেখাশুনো হোল, তা বেশ, তা হোলে আজকেই আসি—উহারা যেন অমনি বল্‌বে—ও, হেঁ হেঁ, তা হোলে আজই যাবেন ঠিক করেচেন? তবে একখানা গাড়ী আনিয়ে রাখি? দিন কুড়িক পরে ইহারা মুখ ফুটিয়া যাও বা থাকো কিছু না বলিলেও বুড়ী যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। এখানে আর মন টেকে না। যাইবার সময় হৈমবতী সত্যসত্যই একটু দরদ দেখাইল। কর্ত্তার প্রথম পক্ষের শাশুড়ীর এ আকস্মিক আবির্ভাব ও তাঁহার মতলব শুনিয়া বাড়ীর বড় বধূ প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্তর্দ্ধানে খুসি ছাড়া অ-খুসি হইলেন না। চন্দ্র মৈত্রের ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু বড় ছেলে ও বড় বধূর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

অনেকদিন পরে আবার নিজের ঘরের দাওয়ায় দুর্গাকে কাছে লইয়া, খোকাকে কাছে লইয়া বসিয়া—জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেলশাখার মৃদু কম্পন দেখিতে দেখিতে সুখে বুড়ীর ঘুমের আমেজ আসে। বাহিরের উঠান ঝাঁট দিতে দিতে উঁচু নীচু অসমতল মাটী পা দিয়া সমান করিয়া দেয়, তেঁতুল চারাটা উপড়াইয়া ফেলে—বলে—"ও নতুন বৌ, নেবুর কয়ড়াগুলো এই ডালটায় ক' থোলো ছিল, কে সব চুরি করে নিয়ে গিয়েচে দেখোচো? যুগীপাড়া হইতে মহা উৎসাহের সঙ্গে চাউল বহিয়া লইয়া আসে। দুইদিনের কঞ্চি একদিনে কাটিয়া টান করিয়া রাখে—সেই ভারী পাথরখানায় করিয়া তেঁতুল-ভাতে ভাতের যা বড় বড় গ্রাস তোলে!

খুকী প্রথমে ভারী অভিমান করিয়াছিল, কথা কহিবে না, কাছে আসিবে না—নানা কথায় সান্ত্বনা দিবার পর আজকাল ভাব হইয়াছে। বুড়ী ভাইঝির মাথায় আদর করিয়া হাত বুলাইয়া বলে, "বেশ-লাল একজোড়া ঢেঁড়ী ঝুম্‌কো হয়, তো দিব্যি মানায়, না আজকাল কি উঠেচে—এগুলোকে বলে কি ছাই—"

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীত আসিল। বুড়ী ওপাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ী গিয়া বুড়া রমানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে বলিল—"ও রাম, এই জাড় পড়লো বড্ড আবার—তা গায়ে একখানা বস্তর্ এমন নেই যে সকালে সন্দে একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বসি, তা আমায় যদি একখানা—"

রাম গাঙ্গুলী বলিলেন—"আচ্ছা দিদি, একদিন এসো, এ মাসটায় আর হবে না—ও মাসে বরং দেখ্‌বো।" বহুদিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি ঘোরাফেরার পরে একদিন কুষ্টিয়ার রাঙা ছিটের সুতী চাদর একখানা বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিলেন—এই নাও দিদি, ভারী গরম জিনিস—"সাড়ে ন আনা দাম—এর চেয়ে ভাল জিনিস আর নবাবগঞ্জে পাওয়া যায় না—বুধবারে এনে রেখেচি—গ্যাখো না খুলে?" বুড়ীর তখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না! সত্যি তাহার জন্য এতবড় কাপড়খানা? আহ্লাদে একগাল হাসিয়া সে সেখানাকে খুলিয়া দেখিতে লাগিল। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন—"গায়ে গ্যাও দিদি—দিয়ে গ্যাখো কেমন হোল।" বুড়ী গায়ে জড়াইয়া বলিল—"দিব্যি, কেমন ওম্—মোটাসোটা দিব্যি কাপড়—আঃ দাদা বেঁচে থাকো—কানাই, বলাই বেঁচে থাকুক, অক্ষয় পেরমাই হোক্—কাঙাল গরীবকে কেউ গ্যায় না, ওই অন্নদার কাছে একখানা গায়ের কাপড় চাচ্চি আজ ৩ বছর থেকে—দেব দেব বলে, তা দিলে না—সখটা মিটিয়ে নি কড়া দিনই আর বা?"

বাড়ী ফিরিবার পথে যাহার সঙ্গে দেখা তাহাকেই সে গায়ের কাপড় দেখায়। তাহার অনেকদিনের সাধ ছিল একখানা গায়ের কাপড় শীতকালে গায়ে দেওয়া।

সর্ব্বজয়াকে আহ্লাদ করিয়া দেখাইতেই সে বলিল, "গ্যাখো ঠাকুরঝি, এ বাড়ী থেকে যে তুমি সাত দোর মেগে বেড়াবে তা হবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্চি। ভিক্ষে মাগতে হয়, আলাদা বন্দোবস্ত করো—"

বুড়ী সে কথা হজম করিয়া লইল। এরূপ অনেক কথাই তাহাকে দিনের মধ্যে দশবার হজম করিতে হয়। সেকালের ছড়াটা সে এখনও ভোলে নাই—

লাথি ঝাঁটা পায়ের তল
ভাত পাথরটা বুকের বল—

দুর্গা ভারী খুসী হইয়া বলে, "ক' পয়সা দাম পিতিমা—কেমন নাও!—না?" আশ্বাসের সুরে পিসি বলে, "আমি মরে গেলে তোকে দিয়ে যাবো, তুই গায়ে দিস বড় হোলে।" নতুন চাদরের সোঁদা সোঁদা মাড়ের গন্ধটা বুড়ীর কাছে ভারী উপাদেয়, ভারী সৌখীন বলিয়া মনে হয়। সকালে চাদরখানা গায়ে জড়াইয়া ঝাঁট দিবার সময় মাঝে মাঝে নিজের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। নিষ্প্রয়োজনে ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া থাকে, পথ-চল্‌তি নিরীহ ঝি-বউকে ডাকিয়া বলে, "কে যায়, রাজির মা? এত বেলা যে?"—ভূমিকা আর বেশী দূর না করিয়া একটু হাসিয়া নিজের গায়ের দিকে চাহিয়া বলে, "এই গায়ের কাপড়খানা এবার ও পাড়ার রামচাঁদ—সাড়ে ন আনা দাম—"

দু'একটা দুষ্টু মেয়ে বলে—"উঃ ঠাক্'মা রাঙা কাপড়ে যা মানিয়েচে! ঠাক্'মার বুঝি বিয়ে।"

খোকাকে কোলে করিয়া দুর্গা উঠানে বেড়াইতে ছিল, বুড়ী বলিল, "আয় দুগ্‌গি ঘরের মধ্যে। খুকী ভাইকে দাওয়ায় বসাইয়া ছুটিয়া পিসির ঘরে ঢুকিল। পিসি মাঝে মাঝে লুকাইয়া তাহাকে এটা ওটা খাওয়ায়—লোভে লোভে সে ঘোরে। তাহার আন্দাজ মিথ্যা নয়, বুড়ী পিতলের ঘটিটা দেওয়ালের কোণের বাঁশের উপর কাদা দিয়া গড়া তাক্ হইতে নামাইয়া বলিল, "একটা দিব্বি রেখে দিইচি তোর জন্যে। নে ধর্—"

একটা পাকা নোনার আধখানা। খুকী বাঁ হাত দিয়া খাটো চুলের গোছা মুখের উপর হইতে কানের পাশে সরাইয়া মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল,—"পাকা?...কোথা থেকে পেলি পিসি?"...খাইতে খাইতে সে বাহিরে আসিল। পরক্ষণেই তাহার ভয়সূচক ডাক বুড়ীর কাণে গেল। "ও পিসি শিগ্‌গির আয়।" বুড়ী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, দুর্গা নীচু হইয়া বসিয়া খোকার মুখের কাছে হাত লইয়া যেন ওৎ পাতিয়া আছে, বোধ হয় সে একটুখানি নোনা ভাইয়ের মুখে দিতে গিয়া টের পাইয়াছে—দাওয়ায় সুপুরি কি কাঁটালবীচি পড়িয়াছিল, খোকা তাহাই তুলিয়া মুখে পুরিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে শান্ত ভাবে বসিয়া আছে! এখনি যদি গিলিয়া ফেলিতে যায়!...ভয়ে খুকীর বুক শুকাইয়া গেল, জোর করিয়া বাহির

খুকী বলিল, "ও পিসি যাস্‌নে—ও পিসি, কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল।... তুই চলে গেলে আমি কিন্তু কাঁদ্‌বো পিসি—ঠিক—"

সর্ব্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, "তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে, তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনথ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যেণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো?...ঐ রকম কুচকুরে মন না হলে কি আর এই দশা হয়?"...বুড়ী ফিরিল না। খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ী গিয়া গ্রামের ওপাড়ায় নবীন ঘোষালের বাড়ি উঠিল। নবীন ঘোষালের বউ সব শুনিয়া কাণে হাত দিয়া বলিল—"ওমা এমন তো কখনো শুনিনি। হাঁগা খুড়ী? তা থাকো তুমি এখানেই থাকো।" মাস দুই সেখানে থাকার পরে বুড়ী সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ী ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রথম আপ্যায়নের হৃদ্যতাটুকু কিছু দিন পরে উঠিয়া যাওয়ার পরে বাড়ীর লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত; পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে। বুড়ী আরও দু'এক বাড়ী ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরসা ছিল বাড়ী হইতে আর কেহ না হয়, অন্ততঃ হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিন মাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাও আসে নাই। বুড়ী জানে ওপাড়া হইতে এপাড়া অনেক দূরে, ছোট মেয়ে এতদূর আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ওপাড়ায় দু একবার গেল, খুকীর সঙ্গে দেখা হইল না।

বার মাস লোকের বাড়ী আশ্রয় হয় না। পূব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়াছিল—চিন্তে গয়লানী এ গ্রাম হইতে উঠিয়া জামাইয়ের কাছে গিয়া বাস করিতেছে—সকলে মিলিয়া সেই ঘরখানি বুড়ীর জন্যে ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেওয়াল, পাড়া হইতে দূরে, একটা বাঁশবনের মধ্যে। তাহাতে থাকিতে বুড়ীর অবশ্য অন্য কোনো অসুবিধা হইল না, কারণ ইহার অপেক্ষা বেশী সুবিধা সে জীবনে কখনো জানে নাই—তবে সন্ধ্যার সময় বাঁশবনের নির্জ্জনতায় তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। লোকের মুখে শুনিত সর্ব্বজয়া নাকি বলিয়াছে—'তেজ দেখুক্ পাঁচজনে, এ বাড়ী আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায় নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হবে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক্ গিয়ে।' যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা প্রথম দিনকতক খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। বুড়ীর ক্রমে আধপেটা সুরু হইল। বুড়ী ভাবে—কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম? বৌ বারণ কল্লে, খুকী কত কাঁদ্‌লে—হাত ধরে টানাটানি কল্লে—। নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে তার দুই তোব্‌ড়ানো গাল ভাসিয়া যায়। ভাবে, শেষ কালডা এত দুঃখুও ছিল অদেষ্টে—আজ যদি মেয়েডাও থাক্‌তো—

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, নবমীর চাঁদ বাঁশ বাগানের ফাঁক দিয়া চোখে পড়ে, আমগাছের ডালে কচি আমের থোলো বাতাসে দুলিতেছে। গোঁসাই পাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রৌদ্রে এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীর রোজ সন্ধ্যার পর একটু একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটীর ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটীর ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

"পিসিমা!"...

বুড়ী কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুকী উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চক্কত্তির মেয়ে রাজি। খুকীর পরণে ফসা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা পুটলি বাঁধা। বুড়ীর মুখ দিয়া বেশী কথা বাহির হইল না।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"ওরে বাবা আমার, সোনা আমার, মাণিক আমার—" প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

"বলিস্‌নে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দে বেলা চুপিচুপি এলাম, রাজিও এল আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই ত্যাখ. তোর জন্যে সব এনেচি—"

"দেখি দেখি বাবা আমার কি এনেচে আমার জন্যে?"··· (অত্যন্ত আদরের সময় সে খুকীকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে) খুকী পুঁটুলি খুলিল। "মুড়্‌কী পিসিমা, তোর জন্যে দু' পয়সার মুড়্‌কী আর দু'টো কদ্‌মা, আর খোকার জন্যে একটা কাঠের পুতুল—"বুড়ী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলা নাড়িতে চাড়িতে বলিল—"দেখি দেখি, ও আমার মাণিক, কত জিনিস এনেচে ত্যাখো। রাজরাণী হও, গরীব পিসির ওপর এত দয়া! দেখি খোকার কাঠের পুতুলটা! বাঃ দিব্বি পুতুল—কটা পয়সা নিলে!···"

এক ঝোঁক কথাবার্ত্তার পরে খুকী বলিল—"পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম?"

সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েচে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—"

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল—অনাহার ও দুঃখশীর্ণ পিসিমার গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল। বলি তুই অবিশ্যি করে বাড়ী যাস্‌—সন্দে বেলা গল্প শুন্‌তে পাইনে কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো?"···

বুড়ী আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, বলিল, "বৌ বুঝি বল্লে, তোকে কিছু বলে দিয়েচে আজ?"

রাজি বলিল—"খুড়ীমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়ীমা আসতে দেয় না, আমরা বল্লে বকে, তবে তুমি যেও পিসিমা তুমি একটুখানি বলো তাহোলে খুড়ীমা আর কিছু বলবে না—"

"খুকী বলিল—কাল তুই ঠিক যাস্ পিসি, মা কিছু বল্‌বে না—তা হোলে এখন বাড়ী যাই পিসি, কাউকে যেন বলিস্‌নে? কাল সকালে ঠিক্ যাস্ কিন্তু"—দুর্গা ও রাজি দাওয়া হইতে নামিলে বুড়ী বলিল—তোরা একলা যেতে পার্‌বি নে, আমি একটু এগিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া। দুজনেই বলিল, "না পিসি তুই শুয়ে থাক্, আর আস্‌তে হবে না. আমি একলাই যাচ্ছি, ভয় কি?

তাহারা চলিয়া গেলে বুড়ী আবার শুইয়া পড়িল। সারা রাত্রি ঘুমের ঘোরে তাহার মনে হইল শিয়রে যেন তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরী বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে, তবে আট বৎসরের বিশ্বেশ্বরীর মুখখানা যেন দুর্গার মত। বুড়ী সমস্ত রাত বাহিরেই শুইয়া রহিল। দাওয়াভরা জ্যোৎস্না আর চৌধুরীদের বুড়ো নিম গাছটার সুগন্ধ বাতাস।

সকালে উঠিয়া বুড়া দেখিল শরীরটা একটু হাল্‌কা। মনে মনে ভাবিল—আজ যাই, কাল খুকী বলে গেল! বৌএর মন এ্যাদ্দিন নরম হয়ে গিয়েচে। একটু বেলা হইলে ছোট্ট পুঁটুলিতে ছেঁড়াখুঁড়া কাপড় দুখানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ী বাড়ীর দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাক্‌রুণ, তা বাড়ী যাচ্ছ বুঝি? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েচে বুঝি!··· বুড়ী একগাল হাসিল। বলিল, "কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকৃতে গিয়েছিল কত কাঁদলে, বল্লে মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ী চ'—তা আমি বল্লাম—আজ তুই যা, কাল সক্কাল বেলাডা হোক্, আমি বাড়ী গিয়ে উঠ্‌বো- মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায়!...তাই সকালে যাচ্ছি—"

বুড়ী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল বাড়ী কেহ নাই। বোধ হয় সর্ব্বজয়া নদীতে গিয়াছে, খোকাকে কোলে করিয়া দুর্গা কোথায় বাহির হইয়াছে, কারণ ঘুরিয়া বেড়ানোই তাহার স্বভাব; নিজের ঘরটির দিকে চাহিয়া দেখিল ঘরে চাবী দেওয়া আছে, দাওয়ায় কাঠকুটা জড় করা। কাল সারা-রাত জ্বরভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্ব্বল শরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ার পৈঠায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিড়্‌কী দোর ঠেলিয়া সর্ব্বজয়া ভিজে কাপড়ে স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়ীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নিৰ্ব্বাক্ হইয়া একটু খানি দাঁড়াইল। বুড়ী হাসিয়া বলিল—"ও বৌ,

ভাল আছিস্? এই অ্যালাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়েসে—তাই বলি—"

সর্ব্বজয়া আগাইয়া আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল—"তুমি এ বাড়ী কি মনে করে?"

তাহার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্ব্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—"যাও, এখ্খুনি বেরিয়ে যাও, নৈলে পাঁচ জনকে ডেকে অপমান করে তাড়াবো, এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবেনা—সে তোমাকে আমি সেদিনই বলে দিয়েচি—ফের্ কোন্ মুখে এয়েচ?—যাও চলে যাও এখ্খুনি—"

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না। পরে কাহার সন্ধানে তাহার দুই চক্ষু যেন নিজের অলক্ষিতে এদিক ওদিক একবার ঘুরিয়া ফিরিল। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"ও বৌ, এমন করে বলিস্নে—একটু খানি ঠাঁই দে আমারে—কোথায় যাবো আর শেষকালডা বল্ দিকিনি—আজ দুমাস বাড়ী ছাড়া—তবু এই ভিটেটাতে—"

সর্ব্বজয়া কথা বলিতে না দিয়া বলিল—যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যেণ ভেবে তোমার তো ঘুম নেই, যাও এখুনি বিদেয় হও, নৈলে আমি অনথ বাঁধাবো—তোমার জিনিসপত্তর ঘরের মধ্যে যা আছে, নিয়ে যাও তো বলো, নৈলে বাঁশবাগানে টেনে ফেলে দেবো, পরের জঞ্জাল ঘরে রাখতে গেলাম কেন?"

এরূপ ব্যাপার দাঁড়াইবে বুড়ী বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায়, তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ী সেরূপ মুঠা আঁক্‌ড়াইবার আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেমন মনে হইল যে বহু দিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সর্ব্বজয়া বলিল—"যাও আর বসে থেকো না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমার কাজকর্ম্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনো মতেই দিতে পারবো না—"

বুড়ী পুঁটুলি লইয়া অতি কষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান-ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস্ দেওয়ানো আছে, আজ তিন চারি মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা খুকী, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা···তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই। চিরকালের মত তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে। বুড়ীর মনে হইল যে তাহার মাথাটা হঠাৎ যেন শোলার মত হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে।

সজনেতলা দিয়া পুঁটুলি-বগলে যাইতে পিছন হইতে রায় বাড়ীর গিন্নী বলিল—"ঠাক্'মা ফিরে যাচ্ছ কোথায়? বাড়ী যাবে না?" উত্তর না পাইয়া বলিল—"ঠাক্'মা আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে—"

বৈকালে এ পাড়া হইয়া কে আসিয়া বলিল—"ও মা ঠাক্‌রুণ, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এস—দাদাঠাকুর বাড়ী নেই? একবার পাঠিয়ে দেও না!"

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাক্‌রুন মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ী হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব রকম করিবার পরে বেশী বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিতপাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—'তা রদ্দুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রদ্দুরটা পড়েচে আজ?' কেহ বলিতেছে—'এখুনি সাম্‌লে উঠবে এখন ভির্‌মি লেগেচে বোধ হয়—"

বিশু পালিত বলিল—"ভির্‌মি নয়। বুড়ী আর বাঁচবে না, হরি জেঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েচে কিন্তু এতদূরে আসে কে?"

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্ত্তীর বড় ছেলে ফণি ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—"দাও দাদাঠাকুর, একটু খানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি? ছ্যাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়? তবুও তুমি এসে পড়েচ—ফণি হাতের বৈঁচি, কাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—"ও পিসিমা!"

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, তাহার মুখে কোনো উত্তর শুনা গেল না। ফণি আবার ডাকিল—"কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুখ মনে হচ্চে?" পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—"আর একবার দাও দাদাঠাকুর—"

আর খানিকক্ষণ পরে ফণি বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গালদুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাকুরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

৭

ইন্দির ঠাকুরুণের মৃত্যুর পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাপে ঘেরা সরু মাটীর পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোকে সরস্বতী পূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, "ওহে হরি, ভুষ্ণো গোয়ালার দরুণ কলাবাগানটা তোমরা কি খোর্ জমা দিয়েচো নাকি?"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্ব্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন যে মধ্য বয়সী, পুরাদস্তুর সংসারী, ছেলে মেয়ের বাপ হরিহর, খাজনা সাধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্য সেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটে মাঠে জমীর ঘরামির সঙ্গে ঝিঙে পটলের দরদস্তুর করিয়া ঘোরে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধগতি, মুক্ত-প্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোনো মিল নাই। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের সে জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চুণার-দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্য্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত কাটানো, শাহ্ কাশেম্ সুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক্ কমলালেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া, গলিত রৌপ্যধারার মত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্ণনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রানা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন।

পাশেই কথিত কলাবাগান পড়িল। প্রথম বক্তা নবীন পালিত ও আরও দু তিনজন বেড়ার উপর দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। একজন বলিল "বেশ কলা হয়েচে? ভুষ্ণো আর বছর গিইছিল আমার কাছে কলার বোগ নিতে বুঝ্‌লে? তা আমি বল্লাম আমার কলার বোগ নেই—নতিডাঙ্গা থেকে কত হয়রাণ হয়ে—পাইনে—পাইনে—শেষকালে পলাশপুরের বিশ্বেস্‌দের বাগান থেকে সাতগণ্ডা কলার বোগ গিয়ে আনাই।"

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল "ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা? খোকা-আ-আ—"

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটা ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর ছিপ্‌ছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়্‌লে এরি মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো?

ছেলেটা বলিল—"বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড় বড় কাণ?"

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতকে কহিল, "একদিন এই বল্লার ভাওনে মাছ ধর্ত্তে আস্‌বে পালিত খুড়ো? বলে নাকি বড্ড মাছ পড়্‌চে, সেদিন দিগম্বর আর ওপাড়ার ফনি যুগী এসে বসে নাকি এক হালি বড় বড় শোল মাছ ধরে নিয়ে গিয়েচে—হিরু কুমোরের বাড়ী দিগম্বর গল্প কর্চ্ছিলো—"

নবীন পালিত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট্ কুঁক্‌ড়াইয়া বলিল "উঃ! ভারী বর্শেল আমার দিগম্বর! একহালি শোল মাছ অম্‌নি মন্তরে ধরা দিলে? ও সব বাজে ভাঁওতা শোনো কেন? আর বছর শ্রাবণ মাসে ভাসার সময়ে আমি সকাল

দশটা থেকে এসে ঠায় সন্দে পর্য্যন্ত বসে ছিলাম, অমন ছাঁচি কেঁচোর চার্ দিলাম—একখানা মাছের আঁশ না একবার ঠোক্‌রালে না—"

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—"কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড় বড় কাণ?"

হরিহর বলিল, "কি জানি বাবা তোমার কথার উত্তুর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অব্ধি সুরু করেচো এটা কি, ওটা কি, কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি?···নাও এগিয়ে চল দিকি?"

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, "বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধর্ত্তে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চল যাওয়া যাক্— পুব পাড়ায় নেপাল পাড়ুই বাচ্‌দিচ্চে রোজ দেড়মণ দুমণ এইরকম পড়্চে—পাঁচ সেরের নীচে মাছ নেই! শুন্‌লাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বক্‌না বাছুরের ডাক—বুঝ্‌লে?"

সকলে এক সঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"অনেক কেলে পুরোণো বিল, গহিন্ জল, দেখেচো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্ম গাছের জঙ্গল, কেউ ব'লে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফর্সা না হোল ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপর সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো—"

বেশ জমিয়া আসিয়াছে হঠাৎ হরিহরের ছেলেটী মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—"ঐ যাচ্চে বাবা, দ্যাখো বাবা, ঐ গেল বাবা বড় বড় কাণ, ঐ—"

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল, "উঁহু-উঁহু-উঁহু—কাঁটা-কাঁটা-কাঁটা—"পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ্ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল, "আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখ্‌চি তুমি, একশ'বার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আন্‌তে চাচ্ছিলাম না—"বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা?" হরিহর বলিল, "কি তা কি আমি দেখেচি? শুওর টুওর হবে—নাও চলো ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—"

"শুওর না বাবা ছোট্ট যে?"···পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটী হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

"চল চল—হ্যাঁ আমি বুঝ্‌তে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি?"···

নবীন পালিত বলিল, "ও হোলো খরগোস, খোকা, খরগোস এখানে খড়ের ঝোপে খরগোস থাকে, তাই।" বালক বর্ণ পরিচয়ে 'খ'এ খরগোসের ছবি দেখিয়াছে কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোস!—জীবন্ত! একেবারে তোমার সাম্‌নে লাফাইয়া পালায়,—ছবি না, নাচের পুতুল না—একেবারে কাণখাড়া সত্যিকারের খরগোস!!—এই রকমই ভাঁটুগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে!—জল মাটীর তৈরী নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল বালক তাহা কোনো মতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাব্‌লা ও জীওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইটের পাঁজার মত জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরাণো কালের নীলকুঠীর জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠীর আমলে এই নিশ্চিন্দিপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কানসারণের হেড্‌কুঠী ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠীর উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠীর ম্যানেজার জন্ লারমার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। সে সময়ে এখানে অনেক লোকের বাস ছিল। কুঠির আমলা, কারকুণ, আমীন, জমাদার ও ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে আনীত কুলি মজুরেরা স্ত্রীপুত্র লইয়া নদীর ধারের এই সকল মাঠে বাড়ীঘর বাঁধিয়া বসবাস করিত। কুঠী উঠিয়া যাওয়ার পরে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কুলিরা অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল। পরে কতক বা মরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে। কুঠীর ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর, সাহেবের কুঠী, আপিস্, জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে,

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চারিধারের মাঠ পড়্‌তি অবস্থায় বুনো ফুল, উলুখড় ও বন ঝোপে ভরিয়া গিয়াছে। প্রবল প্রতাপ লারমার সাহেবের নামে এক সময়ে এ অঞ্চলে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজ কাল দু একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলা উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজপাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে নাটাকাঁটা ও বন অপরাজিতার ফুল সূর্য্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, অস্ত আকাশের রাঙা আভা—চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য্য; ঠেসাঠেসি, ঘেঁসাঘেঁসি, যদৃচ্ছাক্রমে সাজানো ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান; কোথাও একটুকু দরিদ্রের সাশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই; মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। এক একটা ঝোপ যেন প্রকৃতির হাতে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া—তাজা সবুজ উলুখড়, লতাপাতা, নানা বনজ কুসুমের গুচ্ছ একসঙ্গে বাঁধা। বেলা শেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীনপালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমীতে শাঁক আলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, "কুঠীর ইটগুলো নাকি বিক্রী হবে শুন্‌ছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরদস্তুর কচ্ছে৷ মতি দাঁর কথায় সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধনবান হইয়াছে সেকথা আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্ত্তমান কালের দুর্ম্মূল্যতা আশাড়ুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারী দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে—প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—"নীলকণ্ঠ পাখী কৈ বাবা।"

"এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বস্‌বে—"

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্ত্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতঃস্ততঃ নীচু নীচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ার যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকশিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিষ লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে;—এ সে টের পায়, খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—"ওমা আমার কি হবে! এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি? এই সেদিন উঠ্‌লি জ্বর থেকে, আজ অম্‌নি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্চ! একটুখানি পিছন ফিরেচি আর অম্‌নি এসে দেখি আর বাড়ী নেই, কটা কুল খেয়েচিস্, দেখি মুখ দেখি!..সে বলে, "কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি!"

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের মুখের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হাঁ করে; তাহার মা ভাল করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর মত গন্ধ বাহির-হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে—"কখ্‌খনো খেওনা যেন খোকা!...তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেবো—তাই বোশেখ জষ্টি মাসে খেও; লুকিয়ে লুকিয়ে কখ্‌খনো আর খেও না—কেমন তো?"

হরিহর বলিল—কুঠী কুঠী বল্‌ছিলে ঐ দ্যাখো খোকা সায়েবদের কুঠী—দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠীটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মত পড়িয়াছিল, গতিশীল কালের প্রতীক্ নির্দ্ধন শীতের অপরাহ্ন তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদ বিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

কুঠীর হাতার কিছু দূরে কুঠীয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া

আছে। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কানসারনের বিশাল হেড কুঠীর মধ্যে এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির ওপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে অনেক কাল পাথরের জীর্ণ ফলক এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs. Lermor,
Born May 13, 1853. Died April 27, 1860.

অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটী বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকীর মোহানা হইতে প্রবহমান জোর দক্ষিণ হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটীকে এখনও ভোলে নাই।

বালক অবাক্ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল এ কোন্ অপরূপ জগতে সে আসিয়াছে; সে এতদিন এদিকে আসে নাই, এমন কি তাহার সাত বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ী হইতে এতদূরে আসিল। এতদিন নেড়াদের বাড়ী, নিজেদের বাড়ীর সাম্‌নেটা, বড় জোর রানুদিদিদের বাড়ী, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক একদিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া কুঠীর ভাঙা জাল-ঘরটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে—আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিয়াছে—"মা ওদিকে কি সেই কুটী?" সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠীর মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু এই আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা। ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশ, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গাছের নীচে নির্ব্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ওধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ সুরু হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, "হাঁ, হাঁ, হাত দিওনা-হাত দিওনা, আল্‌কুশী, আল্‌কুশী, কি যে তুমি করো বাবা? বড্ড জ্বালালে দেখ্‌চি, আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুল্‌কে হাতে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বল্‌চি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুন্‌বে না—"

"হাত চুল্‌কুবে কেন বাবা?"

"হাত চুল্‌কুবে বিষ, বিষ—আল্‌কুশী কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জল্‌বে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার সুরু করবে।"

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কীর দোর দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্ব্বজয়া খিড়কীর দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হোল! আমি ভাবচি সন্দে উৎরে গেল, এখনও ছেলেটা এল না, তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে, না কিছু—"

মায়ের কথা শেষ হইতে অবকাশ না দিয়া বালক ছোট্ট দুই হাতে উৎসাহসহকারে খরগোসের কাণ খাড়া করিয়া পালানোর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল—কি রকম ছোট্ট গাছে কুল হইয়াছে তাহা বলিবার পরে হাত দিয়া দেখাইয়া কুলগাছের উচ্চতার একটা ধারণা মার মনে পৌছাইয়া দিতেও ত্রুটী করিল না। তাহার মা বলিল, "কুল খাস্‌নি তো?"

হরিহর বলিল, "পাড়তে যাচ্ছিল—আমি না থাক্‌লে কি আর ছাড়তো? আঃ নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সাম্‌লে রাখ্‌তে পারিনে—আলকুশীর ফল ধরে টান্‌তে যায়।" পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, "কুঠীর মাঠ দেখ্‌বো, কুঠীর মাঠ দেখ্‌বো, কেমন হোল তো কুঠীর মাঠ দেখা?

(ক্রমশঃ)

সত্যমপ্রিয়ম্

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

বাঙ্গালী হিন্দু যখন তাহার অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, তখন সে যে কবে স্বাধীনতার গৌরবে দেশবিদেশে বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহারই স্মৃতি তাহাকে আনন্দ দেয়, না, এই সাতশত বৎসরের দীর্ঘ পরাধীনতার সুগভীর গ্লানি তাহাকে দুঃসহ বেদনায় পীড়িত করে? পাল ও সেন রাজগণের বিক্রম ও কীর্ত্তিকলাপ, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মবীরগণের অসামান্য মনীষাখ্যাতি ও তিব্বত চীন জাপানে ধর্ম্মপ্রচার কাহিনী এখন প্রত্নতাত্ত্বিকের উপজীব্য হইয়া ইতিহাসের উপাদান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং জাতির মনোরাজ্য হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া অমানিশার আঁধার গগনে ম্লানজ্যোতি তারকার ন্যায় ক্ষীণালোক বিকীরণ করিতেছে; কিন্তু যে নিদারুণ সত্য স্বাধীনতা-নাশজনিত অশেষ দুর্গতির অসংখ্য মূর্ত্তি ধরিয়া সহস্র-শির নাগিনীর ন্যায় বহুশত বৎসর আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রাণঘাতী দংশনের জ্বালা ত ভুলিবার নয়। তাই যখন দেখি আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর দেশভক্ত সেই সুপ্রাচীন গৌরবযুগের চিত্রটিকে কল্পনার বলে চোখের সাম্‌নে আনিয়া এই বিষের জ্বালা ভুলিয়া থাকিতে চান, তখন তাঁহাদের এই আত্মমর্য্যাদা লাভের বৃথা চেষ্টায় ক্ষুব্ধ হই, কারণ স্পষ্টই তাহা আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন কোন দেশমান্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অযোগ্য বংশধরের পক্ষে উচ্চকণ্ঠে সকলের নিকট আপনার বংশগৌরবকীর্ত্তন তাহার হীনতাকে আরও বেশী পরিস্ফুট করিয়া তোলে, তেমনই আমাদের অতীত যুগের কীর্ত্তি-কাহিনী লইয়া গর্ব্ব অনুভব করায় অবসাদগ্রস্ত জাতীয় মনের ঘোর দৈন্যই সূচিত হয়। কিন্তু ইহাই যেন আমাদের সাধারণ মনোভাব হইয়া পড়িয়াছে, এবং যদি কেহ ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে মেকলে বা মিস-মেয়োর সঙ্গে তুলনা করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না। আকণ্ঠ-দুর্গতি-পঙ্কে ডুবিয়া থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষের মহত্ত্ব ও বীরত্ব লইয়া বৃথা আস্ফালনই আমাদের যোগ্যতালাভের উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। স্বদেশপ্রেম বলিতে আমরা ইহাই বুঝি যে আমাদের বর্ত্তমান হীনতা যতই কেন গভীর হউক না, এক কালে যে আমরা খুব বড় ছিলাম সেই কথা জোর গলায় গানে, কবিতায় প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় সকলের কাছে জাহির করিতে হইবে; এবং এই আত্মপ্রশংসায় সত্যের মর্য্যাদারক্ষণে অবহিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। এমন কি, গর্ব্ব করিবার সত্য বস্তুর অভাব বোধ হইলে কল্পনাকে একটু বেশীমাত্রায় স্বাধীনতা দিয়া সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে দ্বিধা করি না। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত হইতেছে তাহাই যাহাতে বুদ্ধ ও অশোককে বাঙ্গালী সাজাইয়া বাঙ্গলার গৌরব বাড়ানো হইয়াছে। আর বীরত্ব?

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর?
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর।

যে দেশের বিজয়সিংহ হেলায় লঙ্কা জয় করিল সে দেশকে কি বীর-প্রসবিনী বলিবে না? স্বীকার করি। কিন্তু এই বিজয় অভিযান ও লঙ্কা জয় ব্যাপারটা যে সময় সংঘটিত হইয়াছিল সে সময়কার বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস বড়ই অস্পষ্ট এবং বিজয়সিংহ যে বাঙ্গালী ছিলেন সে সম্বন্ধেও সকলে নিঃসন্দেহ নহেন, *—এই সব কথা বলিলেই স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিক অমনই বলিয়া বসিবেন, তুমি দেশের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর দেখিতেছি। অচ্ছা বেশ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি—প্রতাপাদিত্য। ভারতচন্দ্র যাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিয়াছেন, স্বদেশীর যুগ হইতে যাঁহাকে আমাদের জাতীয় বীররূপে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি,

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল লিখিত প্রবন্ধ 'লক্ষ্মণ সেন' দ্রষ্টব্য।

সেই প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যে সত্যসত্যই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং আমাদের জাতীয় বীর রূপে পরিগণিত হইবার তাঁহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবী আছে, সে সম্বন্ধেও সম্প্রতি কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত বৈশাখের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, 'আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত ঐতিহাসিক প্রমাণ যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি তাহাতে প্রতাপাদিত্য আকবরের সহিত কোনদিন লড়িয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। স্বাধীনতা, দেশ উদ্ধার ইত্যাদি যত বড় বড় আদর্শ ও চেষ্টা প্রতাপাদিত্যের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে তাহা আমার মতে বিলকুল কবি-কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাহাঙ্গীরের সময়ে বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁর সেনাপতিগণের সহিত প্রতাপ লড়িয়াছিলেন বটে এবং লড়িয়া বন্দীও হইয়াছিলেন, কিন্তু সে নেহাৎই আত্ম-রক্ষার্থে; এবং সেই তাঁহার প্রথম ও সেই তাঁহার শেষ প্রয়াস বলিয়া আমি বুঝিয়াছি।'

সত্য-নির্দ্ধারণ অপেক্ষা স্বদেশ-প্রীতিই যাঁহার নিকট বড় তিনি এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া সুখী হইবেন না তাহা নিশ্চয়, এমন কি হয়ত তিনি ইহাকে স্বদেশের উজ্জ্বল ললাটে কলঙ্কলেপন-চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। তখন তিনি উক্ত জাতীয় সঙ্গীতের আর একচ্ছত্র আবৃত্তি করিবেন, এই বাঙ্গালীই একদিন তিব্বত চীনে জাপানে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোক-বর্ত্তিকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এবং এই তিব্বত-চীনযাত্রী বাঙ্গালীদের মধ্যে যিনি সকলের চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হইতেছে অতীশ দীপঙ্কর বা শ্রীজ্ঞান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এতই সামান্য যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কেও বলিতে হইয়াছে যে, "মনে হয় যে দুই জন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন। একজন সামান্য পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন।"* শাস্ত্রীমহাশয়ের এইরূপ উক্তির কারণ এই যে ডাক্তার পি কর্দ্দিয়ে তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিক গ্রন্থকারগণের যে প্রকাণ্ড নামসূচী ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং যাহার একটা বাংলা অনুবাদ তাঁহার সম্পাদিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামকগ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে পঞ্চ পৃষ্ঠাব্যাপী সুধু দীপঙ্কর নামেরই একটা তালিকা আছে। এই তালিকায় দেখা যায় যে অন্ততঃ এক জন দীপঙ্কর ছিলেন যিনি তিব্বতীয় অতীশ বা অতীশা নাম লাভ করেন নাই, এবং যিনি আচার্য্য বা পণ্ডিত বা শ্রীদীপঙ্কর নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং যদি কেহ দীপঙ্কর ও অতীশ নামে দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে বোধহয় সেকথা ঘোর অজ্ঞতার পরিচায়ক বলা চলে না। তিব্বতে নাকি দীপঙ্কর অতীশের খুব বড় বড় জীবনচরিত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে তাঁর স্মৃতি এতই ক্ষীণ এবং আমাদের জাতীয় জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব এতই কম যে আজ তাঁহার নাম লইয়া গর্ব্ব প্রকাশ করায় আমাদের দীনতাই যে বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে কেবল তিব্বতে "বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার এবং বনপা ধর্ম্মের পুরোহিতদের প্রভাব খর্ব্ব" করিবার জন্যই নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনি তিব্বতে দ্বিতীয় বুদ্ধদেবরূপে পুজিত হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালী তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার নাম ব্যতীত আর কিছু পাইয়াছে কি? যতদিন না তাঁহার কৃত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির যথার্থ মূল্য নিরূপিত হইতেছে ততদিন ইহার বেশী আর কিছু বলা চলিবে না।

সে যাহা হউক, এইরূপ অনিবার্য্য মতভেদ সত্ত্বেও দীপঙ্করের ন্যায় বাঙ্গালী ধর্ম্মবীরগণ আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন একথা আমি স্বীকার করি; এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে এই বৌদ্ধযুগেই পাল রাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালী গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলা দেশে যে তামস যুগের সূত্রপাত হইল, তাহার দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর ঘোর অমানিশা একবার মাত্র চৈতন্যদেবের

* বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ, ২২ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

মহোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল ; এবং যদিও বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পাণ্ডিত্যে ও শিল্পে বাঙ্গালীর গৌরব কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, (বস্তুতঃ বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রদত্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণে উল্লিখিত হস্তিবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া আঠারো দফা বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার বিষয় এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করিতে পারি) তথাপি একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও নবজাগ্রত হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্কোচন নীতির ফলে, এবং অপরদিকে পরাধীনতার প্রবল চাপে জাতীয় চরিত্র হইতে সাহস, বিক্রম, পুরুষকার প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিন্তু তার আগে থেকেই বাঙ্গালী চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে বাঙ্গালা দেশ অত সহজে মুসলমানের পদানত হইতে পারিত না। এবং তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাই বৌদ্ধযুগের বঙ্গসাহিত্যে। 'ময়ন'মতীর গানে' ধর্ম্মভাব, ত্যাগ, বৈরাগ্য, পতিপ্রেম প্রভৃতি ভালো ভালো অনেক জিনিস আছে ; নাই কেবল সাহস, বিক্রম ও পুরুষকার। ধর্ম্মপালের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ঐতিহাসিক ময়নামতী উক্ত গাথায় তন্ত্রসিদ্ধা অলৌকিক-ঘটনপটিয়সী ময়নামতীতে পরিণত হইয়াছে। তন্ত্রমন্ত্র পুরুষকার ও আত্মনির্ভরের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন— 'বাঙ্গালী কবির রচনায় আত্মনির্ভরের ভাব বিক্রম প্রকাশ কোনকালেই বেশী প্রশংসনীয় হয় নাই।' (তৃতীয় সংস্করণ ৭৩ পৃষ্ঠা)। শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক অধ্যায়ে আমরা এক শোচনীয় সামাজিক অবস্থার আভাস পাই। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে বৌদ্ধগণ এমনই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল যে যখন মুসলমানগণ আসিয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল তখন বৌদ্ধদের আনন্দের সীমা ছিল না। কবি বলিতেছেন দেবতারাই ব্রাহ্মণদের শাস্তি দিবার জন্য ইজার পরিয়া মুসলমান সাজিয়া দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন আনন্দেতে পরিল ইজার।' বিনা যুদ্ধে বাঙ্গালী কেন যে মুসলমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহারও একটা কারণ এই কাহিনীর মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। তারপরে, ডাক ও খনার বচন বলিয়া যে জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলি আমাদের দেশের সকলের নিকট পরিচিত সেগুলির রচনাকাল যদি বৌদ্ধযুগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও আমাদের উক্ত মতই সমর্থিত হয়। কারণ এই সকল বচনে যেমন একদিকে বাঙ্গালীর গৃহস্থালী ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দেখা যায়, অপরদিকে কিন্তু ইহাই প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গালী টিক্‌টিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে বাঁকার ভয়ে কুঁজোর ভয়ে স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ করিতে, বঙ্গীয় বীর পাজির দোহাই দিত। তাহারা কাক মুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। * * যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার স্ফুর্ত্তি কিরূপে থাকিবে ? * * তাই ঐ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্যদিকে তাহাদের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮৪ পৃষ্ঠা)

ইহাই হইল প্রাঙ্‌মুসলমান যুগের বাঙ্গালী চরিত্র। আর মুসলমান অধিকারের পর আমাদের জাতীয় চরিত্র অধঃপতনের কোন্ স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা জানিতে হইলে তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সাহিত্যের মধ্যে যুগযুগান্তব্যাপী যে ভাব, চিন্তা, আদর্শ ও প্রচেষ্টার ধারা স্পষ্টরূপে ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে তাহাই জাতীয় চরিত্রের সুনিশ্চিত নিদর্শন। ইতিহাস অতীতের কঙ্কালমাত্র আনিয়া দেয়, এবং সেই কঙ্কালও যে কতস্থানে ভগ্ন, অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিজনক তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সমস্ত ভাঙ্গা জোড়া ঢাকিয়া দিয়া সেই কঙ্কালকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন জীবন্ত মূর্ত্তিতে পরিণত করিতে পারে একমাত্র সাহিত্য। সকল দেশের সাহিত্য সম্বন্ধেই একথা খাটে। আমাদেরও অতীতের স্বরূপ জানিতে হইলে সাহিত্যেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর অতীত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আমি সেই চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, 'আগেকার বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের খুব ছড়াছড়ি দেখিতে পাই বটে,—কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্যই তখন সাহিত্য রচিত হইত ;—কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ

বিকাশ,—ত্যাগে, প্রেমে, শৌর্য্যে মহনীয় বাঙ্গালী চরিত্রের চিত্র বড় একটা নয়ন গোচর হয় না।' ইহার কারণ স্বরূপ আমি বলিয়াছিলাম যে, 'আমরা চিরকাল ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম-তন্ত্রের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি। দেশাচার, লোকাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও গতানুগতিকতাই আমাদের ধর্ম্মজীবন নামে অভিহিত হইয়াছে। যে অন্তঃসার-শূন্য ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক দেবদেবী বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারেই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিত তাহা যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে সহায়তা না করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মভীরু (অর্থাৎ ধর্ম্ম যাহাকে ভীরু করিয়াছে) কর্ম্ম-বিমুখ ও মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলিয়াছে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। সাহিত্যেও এই ভাব ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে। ফলে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্রে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অত্যন্ত অভাব লক্ষিত হয়,—বিশেষতঃ মনুষ্যত্বের সেই মহান্ সুপ্রকাশের—যাহা বীরত্বে ও স্বদেশ-প্রেমে ত্যাগে ও দুঃখে নিজেকে সার্থক ও জগদ্বরেণ্য করিয়া তোলে।'

কথাটা অত্যন্ত অপ্রিয় সন্দেহ নাই, এবং সত্য হইলেও এরূপ আত্মনিন্দায় কোন লাভ আছে কিনা তাহাও বিচার্য্য। অবশ্য, যদি কেহ মনে করেন যে আমি এত বেশী মূর্খ ও স্বজাতি-নিন্দুক যে আমাদের চরিত্রে যে একটা খুব উজ্জ্বল দিক আছে সে সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ, আমাদের অতুলনীয়া নারীজাতিকে আমি প্রশংসনীয়া মনে করি না, আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে বা অন্যান্য অনেক বিষয়ে গৌরব করিবার কিছু নাই ইহাই আমার ধারণা, তাহা হইলে সে আমার দোষ নহে, আমার দুর্ভাগ্য। কারণ এ সব বিষয় এতই সর্ব্বজনবিদিত যে আমার প্রবন্ধে ঐ সকল কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি নাই। প্রবন্ধের ভূমিকায় আমি সে কথা লিখিয়াছিলাম এবং আমাদের অধ্যাপক সঙ্ঘে যখন প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলাম তখনও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলাম। মাসিকপত্রে পাঠাইবার সময় ভূমিকাটি অনাবশ্যক বোধে বাদ দিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এরূপ আলোচনায় ফল কি? ফল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই মনে হইয়াছে যে আমাদের দুর্গতির জন্য ভগবান বা ভাগ্যকে দায়ী না করিয়া নিজেদেরই স্কন্ধে যদি তাহার দায়িত্ব তুলিয়া লইতে শিখি তাহা হইলে আমাদের উন্নতির জন্য ভগবানের মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকাইয়া না থাকিয়া আমাদের চরিত্র-গত দোষ-ত্রুটি দূর করিতে হয় ত সচেষ্ট হইতেও পারি। ইহা বড় কম লাভ নয়? পক্ষান্তরে, আমাদের নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেম যদি আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে আমাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া তোলে, যদি আমরা ইহাই কেবল প্রচার করিতে থাকি যে আমাদের ন্যায় শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন অশেষ গৌরবান্বিত জাতি জগতে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইবে না এবং তাহারই প্রমাণ কল্পে আমাদের অতীত ইতিহাস ও সাহিত্যের মৌলিকতাপূর্ণ নব নব ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের এই স্বদেশপ্রেম একটা অত্যন্ত ঝুটা মাল এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের জাতীয় উন্নতি সুদূর-পরাহত। মহানিষ্টকর আত্ম প্রশংসার মোহ হইতে আমাদের জড়ভাবাপন্ন মনকে মুক্তিদান করিতে হইবে, পরপ্রসাদপ্রত্যাশী ভিক্ষুকের পক্ষে পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-কীর্ত্তনের গ্লানি ও হীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে, বৃথা আস্ফালনপূর্ণ স্বাজাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। এইরূপ মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া বিবেকানন্দ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রকৃত দেশহিতৈষী মাত্রেই স্বজাতির উপর নির্ম্মম ভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় দেশকে কয়জন ভাল বাসিয়াছেন? বাঙ্গালীর মৃতবৎ জাতীয় জীবনে প্রাণ সঞ্চার করিতে, তাহার আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদা উদ্বোধন করিতে, হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য সারা জগতে ঘোষিত করিতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা কোথায়? কিন্তু সেই বিবেকানন্দও যখন বাঙ্গালী চরিত্রের ঘোর অবনতি দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে বলিয়াছিলেন—We are the most worthless and the most cowardly and lustful of all Hindus' এবং আমাদের ছুৎমার্গসর্ব্বস্ব ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অসহিষ্ণু-ভাবে এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন—'সাবাস, কি ধর্ম্মের

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

জোররে বাপ! বিশেষ বাঙ্গলা দেশে ঐ ধর্ম্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তাত আর নাই। জপ তপের সার সিদ্ধান্ত এই যে আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র। পৈশাচিক ধর্ম্ম, রাক্ষসী ধর্ম্ম, নারকী ধর্ম্ম!*—তখন দেশের গৌরব রক্ষণে ও ঘোষণে বদ্ধপরিকর কোন স্বদেশ প্রেমিক হিন্দু-ধুরন্ধর তাঁহাকে মেকলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানি না, কিন্তু এই কারণে তিনি যে আজ পর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালীর শ্রদ্ধালাভে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ এখনও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এই সেদিন 'সাহিত্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করিবার জন্য গৌহাটি কটন কলেজের একজন অধ্যাপক এমন কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া লজ্জায় ও দুঃখে আমাদিগকে মাথা হেঁট করিতে হইয়াছিল। আর রবীন্দ্রনাথও অপ্রিয়-কথনের জন্য দেশবাসীর নিকট চিরকাল লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছেন। আমাদের চরিত্রগত হীনতা চাপা দিয়া সকলের মুখরোচক কথা বলিতে তিনি মোটেই অভ্যস্ত নহেন। তাইত তিনি গভীর দুঃখভরে লিখিয়াছিলেন—"হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্টহাসি টানি বলিতে আমি পারিবনা ত ভদ্রতার বাণী!"

ইহাই যখন শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সাধারণ বাঙ্গালীর মনোভাব, যখন দুঃখ দৈন্য ও লজ্জার অসহ্য ভার শিরে লইয়াও তাহাদের একমাত্র কাজ, 'ঘরে বসে' গর্ব্ব করা পূর্ব্বপুরুষের, আর্য্যতেজদর্পভরে পৃথ্বী থরহর,' তখন যদি আমি মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতির উক্তরূপ মানসিক ব্যাধির প্রতিকার কল্পে অপ্রিয় প্রসঙ্গরূপ তিক্ত মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, তাহা হইলে তীব্র সমালোচনার অজস্র কটূক্তি ও অসহ্য বিদ্রূপ আমার মস্তকে বর্ষিত হইলেও আমি যে বড় বেশী অপরাধ করি নাই এটুকু আত্মপ্রসাদ আমার থাকিবে। 'বঙ্গবাণীতে' আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবা মাত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত পত্রেই তাহার এক দীর্ঘ প্রতিবাদ লিখিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আবার এতদিন পরে জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রায়' বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীলমণি আচার্য্য পাশ্চাত্য মনীষীর এই উক্তি, "My friend is dear, but truth dearer" জগৎকে বুঝাইবার জন্য আমার অসত্যগুলি ব্যঙ্গবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহার সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

প্রথমে নীলমণি বাবুর 'উত্তর' সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'এক কথা বলিব। তাঁহার এগার পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিলে এইরূ দাঁড়ায়:—১। সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা, অর্থাৎ ঠিক অর্দ্ধেক, কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের চরিত্রবর্ণন। ২। আড়াই পৃষ্ঠা (গোড়ার দেড় ও শেষের এক) আমার এবং আমার ন্যায় 'শিক্ষিত' বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বদেশ প্রেম সম্বন্ধে নানারূপ সুমিষ্ট ভাষা প্রয়োগ। ৩। অবশিষ্ট তিন পৃষ্ঠায় অর্থাৎ প্রবন্ধের এক চতুর্থাংশে তাঁহার যাহা কিছু 'উত্তর' সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই অংশেও প্রায় সর্ব্বত্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঝাল-মসলাসংযোগ করিতে তিনি কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। প্রাণপণ চেষ্টায় কালকেতু ও ধনপতিকে তিনি আদর্শ মানুষ রূপে খাড়া করিতে পারিয়াছেন বলিয়া যদি তাঁহার বিশ্বাস হইয়া থাকে ত আমি তাঁহার সে আত্মতৃপ্তিতে ব্যাঘাত করিতে চাই না। আমি শুধু বলিতে চাই যে সাহিত্যিক চরিত্র সমালোচনায় মতভেদ অনেক সময়ে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, এবং আমি যদি তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারি তাহা হইলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর একটিমাত্র মন্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলেন যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য কোন না কোন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য রচিত হইত একথা স্বীকার করিলে সে সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা ও ভাবের নামগন্ধও আশা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। কারণ 'ধর্ম্মসাহিত্য বাঙ্গলার বিশিষ্টতার সাহিত্য নয়, উহাতে দেবতাদের মাহাত্ম্যের ঝলকে মানুষের

---

* পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ৩২ পৃষ্ঠা ও ১০০-১০১ পৃষ্ঠা। এখানে যদি কেহ তর্ক তোলেন যে বিবেকানন্দ বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর কথাই বলিয়াছেন, অতীতের নয়, তাহা হইলে তার উত্তর এই যে তিনি অতীতের বাঙ্গালী সম্বন্ধেও কোথাও প্রশংসার কথা কহেন নাই, বরং অনেক স্থলে নিন্দাই করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই উক্তি অতীতযুগের বাঙ্গালীর উপরও প্রযোজ্য তাহা আমরা মনে করিতে পারি।

স্বাভাবিক প্রাণের ছবি মলিন হইয়া রহিয়াছে।' ইত্যাদি। ধর্ম্মসাহিত্য যে বাঙ্গলার বিশিষ্টতার সাহিত্য নয়—একথা তিনি ময়মনসিংহ গীতিকার দোহাই দিলেও আমি মানিয়া লইতে পারি না। নবাবিষ্কৃত ময়মনসিংহ সিংহের পল্লীগাথাগুলিকেই বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্যের আসনে বসাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম-সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিণতি শিষ্ট সাহিত্যরূপে যিনি গণ্য করিতে চান তাঁহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করা বৃথা। ইংরাজী সাহিত্যে ব্যালাড্‌গুলির যে স্থান আমাদের সাহিত্যেও এই শ্রেণীর পল্লীগাথাগুলি সেইরূপ স্থানই অধিকার করিয়া থাকিবে। পার্সি সাহেব (Thomas Percy) এই balladগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া যখন Reliques of Ancient English Poetry নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন তখন যদি কেহ বলিত যে ইহাই ইংরাজের জাতীয় সাহিত্য, শেক্ষপীয়র মিল্টন সৃষ্ট সাহিত্য ইহার তুলনায় নগণ্য তখন ব্যাপারটা যেমন হাস্যকর হইত, তেমনই আমাদের সাহিত্যে ময়মনসিংহগীতিগুলিকেই মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বেশী মাত্রায় জাতীয় চরিত্র-ব্যঞ্জক বলিয়া মত প্রকাশ আমরা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি। তারপর ধর্ম্মসাহিত্যের কথা। দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রকটিত করা যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সে সাহিত্যে মানুষের মনুষ্যত্ব যে কেন 'মলিন' হওয়া প্রয়োজন তাহা ত বুঝি না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সমালোচক মহাশয় এখানে ধর্ম্মসাহিত্যের যে সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতেছেন তাহাতে ধর্ম্ম একটা বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িতেছে, মানুষের হৃদয়ের নহে। ধর্ম্ম তখনই সত্য ও সার্থক হয় যখন সে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতাটিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে, এবং তখন সেই মানব হৃদয়ের জাগ্রত দেবতাই ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ, বাহিরের কোন দেবতাই তাহাকে খর্ব্ব বা মলিন করিতে পারিবে না। ইহাই ভারতের শিক্ষা এবং আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যে ও পুরাণে মনুষ্যত্বের এই মহোচ্চ আদর্শই সর্ব্বত্র চিত্রিত হইয়াছে। 'আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য-প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়; তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।' (রবীন্দ্রনাথ) শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব অর্জ্জুনের বীরত্বকে একদিনের তরেও ম্লান করে নাই। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহার হৃদিস্থিত হৃষিকেশরূপে তাঁহার সমস্ত তেজোবীর্য্যের প্রস্রবণ স্বরূপ ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইল যখন তাঁহার লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনের বাহু গাণ্ডীব তুলিবার শক্তি হারাইল। কিরাত-বেশী শিবের অর্জ্জুনের হস্তে পরাজয় কাহিনীর মূলেও এইরূপ শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। ভগবানের চেয়ে যে তাঁর ভক্ত বড়, মানুষের বীর্য্য ও মনুষ্যত্বের নিকট যে স্বয়ং ভগবান পরাজিত তাহাই এখানে দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কবি যখন গাহিয়াছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' তখন তিনিও এই তত্ত্বেরই আভাষ দিয়াছেন। সকল সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠতার মূলে যদি মানুষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসাহিত্যকেও সেই পর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইবে, নহিলে তাহা সাহিত্যপদবাচ্যই হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম্মসাহিত্যে কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতাকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিয়া মানুষের মনগড়া ঝুটা দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলির নায়কেরা বিপদে পড়িয়া আনুনাসিক সুরে স্ব স্ব উপাস্য দেবতাদের স্মরণ করিয়া কেবল কাঁদিতে পারে, (ভগবানের পায়ে কি চমৎকার আত্মসমর্পণ!) কিন্তু একটি বারও কাহারও মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হয় না—

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

*　　*　　*　　*

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

সুতরাং আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম আমাদের ধর্ম্মসাহিত্য সম্বন্ধে নীলমণিবাবুর মন্তব্য হইতেও সেই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে। তাহা এই যে আমরা চিরকাল ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মতন্ত্রের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি। এই দুয়ের মধ্যে যে কত প্রভেদ এবং মানুষের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ এই প্রভেদের ফলে কিরূপ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার আগেকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

সত্যমপ্রিয়ম্

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

এইবার রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উত্তর সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিয়া আমার এই অপ্রিয় আলোচনার উপসংহার করিব। দুঃখের বিষয় তিনি আমার প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়টি সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, আমি ভূমিকা স্বরূপ বা প্রসঙ্গতঃ দু'এক ছত্রে যে দু'একটি ঐতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম (যথা, লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কাহিনী, বিজয়সিংহের লঙ্কাজয় প্রভৃতি) সেই সব সম্বন্ধেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তা'ছাড়া, তিনি বাঙ্গালার শিল্প, বাণিজ্য, নব্যন্যায় প্রভৃতি এমন সব অবান্তর বিষয় তাঁর আলোচনার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন যে সব কথার অবতারণা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া মনে করি। আমার বক্তব্য ছিল এই যে, সাহিত্যে আমরা যে বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাই তাহার ললাটে মহত্ত্বের দীপ্তি নাই, চরিত্রে পুরুষকারজনিত আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব। একথা নীলমণিবাবু বা অপর কেহ না মানিলেও তিনি যে অস্বীকার করিতে পারেন না তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তাঁহার সমগ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'খানি গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। আমার 'বাঙ্গালীর অতীতে' তাঁহার এইরূপ একাধিক মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। এখানে আরও কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—

'কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষ চরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব তাহাদের সাহিত্যে অন্য রূপ হইবে কেন? আমরা যাহা তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে?' (১১৭ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র দীনেশবাবু বলিতেছেন—'কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় শারীরিক শক্তি সম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় সুকোমল করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপকরণ এই ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল উৎপত্তি করে না। বাঙ্গালী উত্তর পশ্চিম হইতে আর্য্যতেজ অবশ্যই আনিয়াছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের মহিমান্বিত রাজশ্রী ও সিংহল বিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সুকুমার ভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—মালকোচা, ফুলকোঁচা এবং শূল, ফুল হইয়া গিয়াছিল;—ইহা এদেশের গুণ। বাঙ্গলা রামায়ণ মহাভারতে সীতা-বিলাপ, তরণী ও সুধন্বার ভক্তি-কাহিনী অভাবনীয় সুধা ঢালিয়া দিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব পুষ্পমালায় আবৃত হইয়া গিয়াছে।' (২৬৫ পৃষ্ঠা)। 'বঙ্গীয় কাব্যসমূহে অতিমাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়াও আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাই না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র চাঁপা নাগেশ্বর জটায় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গল দৈত্যকে বধ করিয়া সহচরীগণের নিকট বিশ্রাম জন্য একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ইত্যাদি।* * এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের ন্যায় দুই একজন প্রকৃত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ গণ্য হইবেন। * * * প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের শরের শন্ শন্ ও বাঁশের লাঠির ঠন্ ঠন্ একরূপ ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় বোধ হয়।' (৫৪৬ পৃষ্ঠা)। কাশীরাম দাসের মহাভারতে দেখি, 'লক্ষ্য ভেদের উপলক্ষ্যে সমাগত ব্রাহ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীরু অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, উহা একখানি যথাযথ ছবি। কাশীরাম দাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ণপর সৈন্য বর্ণনা বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, সুতরাং কবি ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য।' (৫৩৩ পৃষ্ঠা)। এইখানে কবি গঙ্গারাম কৃত 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীর ভয়ে গ্রামবাসীগণের পলায়ণ কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। নবাব ত আগেই বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়ায় পলাইয়াছেন। তারপর গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল। অথচ বর্গী যে কোথায় তাহা কেহ জানে না। পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে।

'তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেইখ্যা আমরা পলাই॥'

ইহাই বাঙ্গালী চরিত্র। স্বজাতি প্রেমে অন্ধ হইয়া এই অত্যন্ত অপ্রিয় সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। বাঙ্গালীবিদ্বেষী মেকলে বাঙ্গালীর অনেক মিথ্যা নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একটি সত্য কথা বলিয়াছেন। মেকলে যে লিখিয়াছেন, the Bengalee would see his country overrun, his house laid in ashes, his children murdered or dishonoured, without having the spirit to strike one blow, তাহা মিথ্যা বলি কিসে? ইহার প্রত্যেক বর্ণ যে মহারাষ্ট্রপুরাণের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে? এবং অদ্যাপিও মাঝে মাঝে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর শিল্প ছিল, কলা ছিল, বাণিজ্য ছিল, নব্য ন্যায় ছিল, ছিল না কেবল মনুষ্যত্ব। শত শত বৎসরের দাসত্বে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মেকলে ইটালীয়ানদের সঙ্গে হিন্দুদের তুলনা করিয়াছেন, কারণ তখন ইটালী পরপদানত ছিল, এবং এই পরাধীন জাতির চরিত্রও অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও সর্ব্ববিধ ললিতকলায় ইহারা খুবই উন্নত ছিল। এই তুলনা হয়ত অসঙ্গত নয়, কিন্তু তাহা হইলেও ইটালিয়ানদের সাহিত্যে বা ইতিহাসে বাঙ্গালীর পলায়ন কাহিনীর তুলনা বোধহয় কোথাও মিলিবে না। একবার ইটালির একটা বড় সহরে অষ্ট্রীয়ান সৈন্যরা আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। সহরবাসী অনেকেই পলায়নপর হয়। তখন একটি বালক সম্মুখে যাহা পাইল তাহাই হাতে তুলিয়া লইয়া রাজপথে অষ্ট্রীয়ান সৈন্যের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সৈন্যগণ আশ্চর্য্য হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এদিকে যাহারা দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পলাইতেছিল তাহারা যখন দেখিল যে একটি ক্ষুদ্র বালক শত্রুর পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তাহারাও ফিরিল, এবং মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্যদের নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। রাজপথের সেইস্থানে একটি জয়স্তম্ভ সেই বালকের বীরত্ব আজ পর্য্যন্ত জগতের সম্মুখে ঘোষিত করিতেছে। ফলে ইটালি আজ স্বাধীন, আর বাঙ্গালী যে তিমিরে সেই তিমিরে।

উপরে দীনেশবাবুর যে মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে দেখা যাইবে যে আমাদের উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। এবং বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এই মত যে এখনও অপরিবর্ত্তিত আছে তাহা সম্প্রতি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে পুরুষকার' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিতেছেন, 'এখানে (সংস্কৃতের প্রভাবান্বিত বঙ্গীয় কাব্যে) কোন চরিত্র সংসারক্ষেত্রে নৈতিক বলশালিতা ও বিক্রমে উদগ্র হইয়া উঠে নাই। * * * এই যুগে যে কেহ কোন বিপদে পড়িয়াছে, সে বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলি হেলনপূর্ব্বকও আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা পায় নাই।' ইত্যাদি (প্রণব, মাঘ, ২৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তথাপি তাঁহার মতে আমি নাকি 'নিজের দেশের গৌরবের উপর ধূলিনিক্ষেপ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত' করিয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার ন্যায় সুবিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি আমার মুখ্য বক্তব্য বিষয়টিকে আমোল না দিয়া অবান্তর বিষয় টানিয়া আনিয়া আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। পল্লীগাথাগুলির আমি উল্লেখ করি নাই বটে। এগুলি স্থান ও কাল বিশেষের বাঙ্গালী চরিত্র চিনিয়া লইতে আমাদিগকে সাহায্য করিবে; কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের মাপকাটি ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে বলিলে সে কথা আমি স্বীকার করিব না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র আপামরসাধারণ বাঙ্গালীর নিকট যে এত সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে তার কারণ বাঙ্গালী ইঁহাদের মধ্যে নিজের চরিত্র, ভাব, আদর্শ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রতিবিম্বিত দেখিয়াছে। সুতরাং ইহাদের লইয়াই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগাথাগুলি এই সাহিত্যের দরবারে একপার্শ্বে বিশিষ্ট স্থান পাইবে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক দিক্‌পালদের স্থানচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতে পারে না।

আমার নিকট যাহা সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা অপ্রিয় হইলেও প্রকাশ করিয়া যে অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়াছি তজ্জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু দোহাই তাঁহাদের তাঁহারা যেন আমাকে মেকলে বা মিস্ মেয়োর স্বজাতীয় বলিয়া মনে না করেন। আমিও আমার দেশকে

তাঁহাদের চেয়ে কম ভালবাসি না এবং কোন বৈদেশিক বিদ্বেষবশে আমাদের নিন্দা করিলে অত্যন্ত ব্যথা পাই। কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের মধ্যে যদি কিছু নিন্দার থাকে তাহা চাপিয়া গিয়া আত্মপ্রশংসার মদিরা পানে সত্যাসত্য সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া থাকিতে হইবে এমন কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। তাই আমি এই কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে অতীতের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও অবসাদ কাটাইয়া উঠিয়া আমরা বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে যে মুক্তির স্বাদ পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, সাহিত্যে তার পরিচয় পাই। ইহা একটা বিশেষ সুলক্ষণ বলিয়া মনে করি। গত কয়েক শত বৎসর বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের মহোচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহারই গ্লানি সাহিত্যে ও সমাজে প্রকটিত হইয়াছিল। এরূপ ব্যাপার যে আর কোথাও হয় নাই এমন নহে, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই একই দৃশ্য চোখে পড়ে (অবশ্য, রাজপুত, মহারাষ্ট্র ও শিখদের কথা একটু স্বতন্ত্র)। "অনেক সময়ে সমাজের পাথেয় নিঃশেষিত হ'য়ে যায় এবং বাহিরের নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। * * এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস, রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েছি। অবসাদের সময়ে কলুষটাই প্রবল হ'য়ে উঠে।" (রবীন্দ্রনাথ)। পরাক্রান্ত রোমক জাতির চরিত্র খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল; অভিডের (Ovid) রচনাবলী তাহার কিছু আভাস দেয়। আরও একশত বৎসর পরে টেরেন্সের (Terence) নাটকগুলিতে তাহাদের অধঃপতন আরও বেশী পরিস্ফুট। পতনবেগ ক্রমশঃ এত দ্রুত হইয়া চলিল যে পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিরাট রোম সাম্রাজ্য দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সকল জাতির ইতিহাসেই উত্থান পতন আছে। ইংরাজও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে সকল বিষয়ে ইংরাজের ঘোর পতন হইয়াছিল। বাঙ্গালীর অধঃপতন যে এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে তাহার কারণ, শুধু যে আমাদের 'পাথেয়' নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে, পরাধীনতার ফলে 'বাহিরের নানা ঘাতপ্রতিঘাত' এত বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে সুচিরকাল জাতিটা মাথা তুলিতে পারে নাই। সাহিত্যে ইহার জের চলিয়াছিল রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্বদেশ প্রীতির অভাব আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে লক্ষ্য করিয়াছি। তা' ছাড়া, 'কবির লড়াই, পাঁচালী, তর্জ্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে বিকার দেখা দিয়াছিল সেগুলিতে বীর্য্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই।' (রবীন্দ্রনাথ)। ইহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই অতীতযুগও বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আজ বাঙ্গালী ভারতের নবযুগের মুক্তি-প্রচারক; দেশময় তাহার প্রাণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; নানাদিকে তাহার প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; ধর্ম্ম, ত্যাগ ও জ্ঞানের পবিত্র হোমানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আজ শত শত হোতা পরম কল্যাণের আরাধনায় ব্যাপৃত, এবং সেই আগুনে প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া স্বাধীনতা পথের অসংখ্য যাত্রী দুঃখকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। রজনীর আঁধার এখনও চারিদিকে ঘনায়মান, কিন্তু তাহারই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতেছে, 'উষারাগ বুঝি দেখা যায় ঐ পূর্ব্ব আশার কোলে'।

অভিশপ্তা

—গল্প—

—শ্রীসত্যপ্রেম রায় চৌধুরী

ফুট্ ফুটে ছোট্ট মেয়েটী।

পরণে তার জোড়াতালি দেওয়া ময়লা লাল সাড়ী একখানা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ কেশ, তৈলাভাবে পিঠময় ছড়ানো, হাতে একটা মগ।

পথে যেতে যেতে এর কাছে ওর কাছে গিয়ে বেদনা-ভরা ডাগর ডাগর চোখ-দুটী তুলে চায়। সঙ্কোচে আড়ষ্ট হ'য়ে বলে, "একটা পয়সা দেবে গা—একটা পয়সা?"

কেউ দেয়, কেউ মুখ না তুলেই চ'লে যায়, আবার কেউ বা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে ওঠে,—"যা যা যা!"

সে চলে নিজের খেয়ালেই। কাঠফাটা রোদ্দুর, মাথার উপরে দিনের দেবতা চিড়িক মেরে চলেছে—রাস্তায় পা ফেলা যায় না।

মাঝে মাঝে গুণ্-গুণ্ ক'রে গান ধরে,—"হাত ধ'রে নিয়ে যাও গো তুমি"—

কী করুণ সুর! হৃদয়ের ভিতর থেকে গুমরে গুমরে উঠে বাতাসের কোলে ভেসে শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

পা আর চলেনা—শরীর অবসন্ন! গলা শুকিয়ে আসে, নিজের জীবটাই ও নিজে চোষে।

দূরে একটা কল দেখতে পেয়ে সব অবসাদ জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে। বাঁ হাত দিয়ে কলটা সজোরে টিপে অঞ্জলি পাতে, জল পড়ে না।

ভিখিরীর আবার জল!

অভিমানে রাগে ভরা মুখখানি উপরে তুলে ও তাকায়—যেন বিশ্বটাকে ভেঙ্গে চুর ক'রে পদ-দলিত ক'রতে চায়। বুকফাটা একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, চোখের কোণ বেয়ে দু' এক ফোঁটা মুক্তো ঝরে। হিংস্র কুটিল-দৃষ্টিতে কলটার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে কপাল থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে আবার চলে ধীরে ধীরে।

রাস্তার এক পাশের বড় বড় বাড়ীগুলো বিরাট দৈত্যের মতো লোলুপ দৃষ্টিতে যেন ওৎ-পেতে ব'সে আছে। গম্ভীর—নিস্তব্ধ! মাঝে মাঝে ট্রামগুলো সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে চলেছে পথের বুক চিরে—বীর দর্পে।

আর এক পাশে গাছের সারি।

একটা কাক বিকট শব্দে চীৎকার ক'রে উঠলো;—কঃ কঃ—

নিজের মনেই হাসে, ঘাড় নাড়ে, জীব বার ক'রে ভেঙ্‌চে বলে,—"দূর্ মুখ্‌পোড়া, হতচ্ছাড়া—"

গাছের পাতাগুলো ঝির ঝির ক'রে কেঁপে ওঠে, যেন ওর আসাতে ভারী খুসী; বলে, "এস গো—এস, সার্থক হ'লাম। তুমি যে আমাদেরই একজন।"

পাশেই মাঠ। কচি কচি ঘাস সবুজ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে গাছগুলোর পানে চেয়ে অধর টিপে হেসে বলে, "হুঁ, হুঁ ছোট হ'লে কী হয়? আমরাও কম্‌তি যাই না।"

ঝনাৎ—

পকেট থেকে মনিব্যাগটা প'ড়ে যায়। সাহেব ট্রাম থেকে নেবেই বড় বড় পা ফেলে চলতে থাকে। কোনো ধারে ভ্রূক্ষেপও নেই।

ঝাঁ ক'রে মনিব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে ও ছোটে সাহেবের পিছু;—হাঁকে,—"ও সাহেব—"

সাহেব শুনেও শোনে না।

তবু ছোটে—

সামনা-সামনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মণিব্যাগটা সাহেবের চোখের কাছে উঁচু ক'রে ধ'রে বলে,—"মা,—মা—মাটীমে গির্ গিয়া।"

সাহেব নিজের ব্যাগ চিন্‌তে পেরে ওর হাত থেকে নেয়। একগাল হেসে ওর গালটা টিপে ব্যাগটা খুলে একটা দুয়ানি বার করে তাকে দিয়ে আবার হন্ হন্ ক'রে চল্‌তে থাকে।

ফুর্‌তির্ ফুর্‌ফুরি!

শ্রীসত্যপ্রেম রায় চৌধুরী

ভারী আনন্দ—দু আনা! কী মজা! মার ওষুধ—সাবু—ডাক্তারের—ওঃ সব হবে! তারপর তার নিজের জন্য সন্দেশ—রসগোল্লা—এই রকম ক'রে পায়ের উপর পা রেখে—উঃ কী মজাই না হবে!

"চাই চেনা বাদাম।"

ফিরিওয়ালা হেঁকে যায়।

ও বলে,—"এই এক পয়সার দে তো।"

ঝুড়িটা নামিয়ে বলে,—"আগাড়ি পয়সা দে।"

দু আনিটা ও ঝুড়ির উপর ফেলে দেয়।

সে দু আনিটা শালপাতার নীচে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করে,—"দু আনি কাঁহা মিলা?"

যেন পাওয়াটা ওর কাছে অসম্ভব।

ও হেসে বলে,—"সাহেব দিয়া।" ঘাড়টা বেঁকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। ভারী সুন্দর দেখায়। কোঁকড়ানো চুলগুলো দমকা হাওয়ায় নেচে ওঠে।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিনেবাদামওয়ালা বলে,—"সাহেব দিয়া। এঁ! দেনেকো আদমী নেহি মিলা? ভাগ চোট্টা",—ব'লে ঝুড়িটা মাথায় তুলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। তার কাপড় ধ'রে ও বুকফাটা চীৎকার করে। কোমল গালে এক চড় মেরে চিনেবাদামওয়ালা তার গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়। ও তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে হাত পা ছুড়ে কাঁদতে ব'সে যায়। গরীবের আবার কান্না!

সারাদিনটা আগুন ঢেলে দিনের দেবতা মাথার উপর দিয়ে ঢলে পড়ে—রাঙ্গা হ'য়ে।

গাছের নীচে ব'সে কে এক বুড়ো কী যেন গো-গ্রাসে খাচ্ছে। দেখেই ও ছুটে তার কাছে যায়। লোলুপ দৃষ্টিতে তার খাওয়ার জিনিষটার দিকে চেয়ে থাকে।

বুড়ো খেতে খেতে ওকে দেখে বলে, "খাবি?"

একটু ঘাড় কাত ক'রে ও বলে, "হুঁ।"

"আয় বোস্!" ব'লে বুড়ো ওকে সামনে বসবার জায়গা দেখিয়ে দেয়। ফুরফুরে বাতাস গায়ে ওর পরশ দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে নেয়। সাত বছরের মেয়ে বইত নয়, কতই বা আর খাবে? মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বুড়ো বলে, "খা, সমস্ত দিন খাস নি বুঝি?"

ও বলে, "হুঁ।"

বুড়ো বলে, "আমিও আজ তিন দিন খাইনি, আয় আধা-আধি খাই।"

সমস্ত দিনের পর পেটে কিছু প'ড়ে চোখ দুটো ওর আনন্দে নাচে।

ও বলে, "তোমার পায়ে নেকড়া বাধা কেন গা?"

বুড়ো বলে,—"ট্রেমগাড়ী—একেবারে ওপর দিয়ে; একটা পা গেল দু-আধখানা হ'য়ে, আর এইটে গেল থেঁতলে।"

ও শিউরে ওঠে। চোখ দুটো সজল হয়। ন্যাকড়া বাঁধাটা আধখোলা ছিল। ও তার কচি হাত দিয়ে আবার ভালো ক'রে বেঁধে দেয়।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার গোধূলি জগৎটাকে ঘিরে ফেলে।

এ রাস্তার চেয়ে ও ফুটে অনেক ভাড়। তাই ছুট্—যদি কিছু মেলে।

রাস্তা পেরুতে গিয়ে যেই মাঝ পথে অমনি একখানা প্রকাণ্ড নিঃশব্দগামী মোটরের তলায়! তারপর একটা হৃদয় ভাঙ্গা চীৎকার,—"মাগো" আর 'গেল গেল' শব্দে মর্ম্ম-স্তুদ এক বিচিত্র কোলাহল রাস্তার উপর ভেসে ওঠে।

"নম্বর কত,—নম্বর?"—

"কী জানি মশাই—যা ধোঁয়া ছেড়ে পালালো—"

"ওনার, না ড্রাইভার?"

"একজন বাঙ্গালী বাবু—"

ভোঁ ভোঁ শব্দ ক'রে আর একখানা মোটর সেই ভাড়ের মাঝে এসে দাঁড়ায়। বাবু গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বার ক'রে একজনকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কী হয়েছে হ্যা?"

"চাপা পড়েছে।"

"কে?"

"আজ্ঞে, ছোট একটা ভিখিরীর মেয়ে।"

"ওঃ ভিখিরীর,"—ব'লে মুখটা ঘুরিয়ে সোফারকে বলেন, "এই চালাও।"

হাহাকারের মধ্যে ওর রক্তে রাস্তায় ঢেউ খেলে যেতে লাগে।

বীরবল*

মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন

সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম উজ্জলরত্ন বীরবলের নাম আমরা বাঙ্গালী বোধ হয় ভুলিয়া যাইতাম। হয়ত বা দুই একজন ঐতিহাসিকের মস্তিষ্কে তাঁহার নাম টিকিয়া থাকিত বা দুই একখানি কীটদষ্ট ইতিহাসের পৃষ্ঠার এক কোণে লুক্কায়িত রহিত। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দরবারে সাহিত্যিক বীরবল আমাদের পুরাতন স্মৃতি সর্ব্বদা চক্ষুর সামনে নূতন করিয়া ধরিয়াছেন। সম্রাট আকবরের বীরবল হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বীরবলের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিশেষ কম নহে। কাজেই এই মণিকাঞ্চন সংযোগের ফলে, অতীতের বিখ্যাত নাম বর্ত্তমানের বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বিজড়িত, আমরা সকলে অবহিত আছি।

মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, "আরসটিটলের নামের সহিত আলেকজান্দারের নাম যে প্রকার ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, সম্রাট আকবরের নামের সহিতও তদ্রূপ এমন কি তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট ভাবে বীরবলের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট।" কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, তাঁহার নাম মহেশদাস এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই তাঁহাকে ভাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার তখাল্লুস (Pen name) বারহিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহার নাম বারহাম দাস ভাট বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি কালপী,—পূর্ব্বে তিনি রামচন্দ্র ভাটের দরবারে একজন চাকর ছিলেন। অন্যান্য ভাটের মত তিনিও সহরে সহরে ভ্রমণ করিয়া হিন্দি গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে কোন স্থানে তাঁহার সহিত বীরবলের সাক্ষাৎ হয়, কি কারণে তিনি বীরবলের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। যাহাহউক বীরবল অতি সামান্য পদবী হইতে উচ্চপদে সমুন্নিত হইয়াছিলেন। ফলকথা, কোন পদবীর আমীর ওমরাহ্ই তাঁহার মত স্বাধীন ভাবে সম্রাট আকবরের নিকট যাতায়াত করিতে পারিতেন না। রাজা তোডড়মল্ল ও তাঁহার মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। রাজা তোডড়মল বিচক্ষণ ও সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, বীরবলের এ সমস্ত গুণের কিছুই ছিল না, তথাপি আকবরের সভায় নবরত্নের মধ্যে তিনি সম্রাটের যতখানি প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত ছিলেন, অন্য কেহই ততদূর ছিলেন না।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহার বিষয়ে নিম্ন লিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন "৯৮০ হিজরীতে হোসেন কুলী খাঁ নগরকোট জয় করেন। অল্প কথায় বলিলে ইহাই দাঁড়ায় যে বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণভাট ও অন্যান্য হিন্দুদের প্রতি সম্রাটের গভীর টান ছিল, এবং তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই বাহ্‌রাম দাস নামক একজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ভাট তাঁহার চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া ক্রমে তাঁহার নৈকট্যলাভ করেন। তিনি কালপীর অধিবাসী ছিলেন, এবং প্রশস্তি গান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তিনি অতিশয় ধূর্ত্ত ও চতুর ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এতাদৃশ উচ্চপদে উন্নীত হন যে নিম্নস্থ কবিতা তাঁহার পক্ষে সত্যে পরিণত হইয়াছিলঃ—

"মান তু শোদম, তু মান শোদা
মান তন্ শোদম তু জান শোদী"

"আমি তুমি হইলাম, তুমি আমি হইলে। আমি শরীর হইলাম, তুমি প্রাণ হইলে।" প্রথমে তিনি কবিরায় উপাধি প্রাপ্ত হন।

কাঙ্গারা আক্রমণের কারণ এই যে সম্রাট বিশেষ কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া উহা অবরোধ করেন এবং মহেশদাসকে রাজা বীরবল উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে তাহার অধিপতি নিয়োগ করেন। সম্রাট আকবর হোসেন কুলী খাঁর উপর ফরমান প্রেরণ করিয়াছিলেন যে কাঙ্গারা জয় করিয়া

* শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবী চোধুরাণী মহোদয়ার আহ্বানে "সত্যেন্দ্র স্মৃতিসভায়" লেখক কর্ত্তৃক গত শ্রীপঞ্চমীর দিনে পঠিত।

মুহম্মদ মনস্থুরউদ্দিন

রাজা বীরবলকে জায়গীর স্বরূপ দান করিও। ইহাতে এই উদ্দেশ্য ছিল যে কাঙ্গারা হিন্দুদের পবিত্রস্থান, স্থতরাং ইহার সহিত একজন ব্রাহ্মণ শাসকের নাম বিজড়িত থাকুক। হাসান কুলী খান পাঞ্জাবের আমির ওমরাহ্‌গণকে সমবেত করিয়া সৈন্য সামন্ত গোলাবারুদ সংগ্রহ করিলেন, এবং যথোপযুক্ত রসদ সহ কুচ করিলেন, সকলের আগে রাজা বীরবল রহিলেন। যে কষ্ট ও ক্লেশের মধ্য দিয়া সৈন্য সামন্ত পার্ব্বত্য চড়াই উত্তীর্ণ হইয়াছিল ও উপত্যকা সমূহ অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে ঐতিহাসিক কলম পর্য্যন্ত থামিয়া আসে।

মৌলানা আজাদ বলেন, "যখন এই সঙ্গীন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন বোধহয় রাজা বীরবল হাসি তামাসা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। যাহা হউক কাঙ্গারা অবরোধ অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সৈন্য উভয় দলেই ছিল, এবং তাহারা প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছিল। ইব্রাহীম মীর্জ্জা বিদ্রোহী হইয়া পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন। কাজেই হোসেন কুলী খাঁ বাধ্য হইয়া কাঙ্গারা অবরোধ উঠাইয়া লইয়া সন্ধি করিলেন। কাঙ্গারার রাজা এই স্থযোগ পাইয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন, এবং সকল সর্ত্তই পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। সেনাপতি চতুর্থ সর্ত্তানুসারে বলিলেন 'সম্রাট বীরবলকে কাঙ্গারার জায়গীর দান করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার সম্মান রক্ষা করা প্রয়োজন।'

কাঙ্গারাধিপতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বীরবলকে আকবরী ওজনের পাঁচমণ স্বর্ণ প্রদান করিলেন, ও সম্রাটের জন্য প্রায় সহস্র টাকার মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য জিনিষ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।"

৯৯০ হিজরীর শেষ ভাগে বীরবল সম্রাটকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং সম্রাট আনন্দচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তাঁহার আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে যে সমস্ত উপহার ও বখ্‌শিশ দিয়াছিলেন তিনি তৎসমুদয় তাঁহার সম্মুখে নজর ধরিলেন। স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাসমূহ তাঁহার উপর বর্ষণ করিলেন ও জোড়হস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

দরবার হইতে রাজ প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে তাঁহার যাতায়াত ছিল। তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা বলে ও সম্রাটের মন অধ্যয়ন দ্বারা প্রায় সময়ই সম্রাটের নিকট হইতে ভাল ভাল ফরমান পাইতেন। এই জন্য রাজা, মহারাজা, আমির ওমরাহ্‌ ও সেনাপতি সকলেই তাঁহাকে লক্ষাধিক টাকার উপহার প্রেরণ করিতেন। এবং সম্রাটও তাঁহাকে অধিকাংশ রাজাদের নিকট দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। কতকটা তাঁহার বংশীয়গুণে, কতকটা দৌত্য পদবীর জন্য, কতকটা হাস্যপরিহাস জন্য অতি সহজেই তিনি রাজাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাব করিয়া ফেলিতেন, এবং এমন ভাবে তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেন যে সৈন্য সামন্ত দ্বারাও উহা সম্ভবপর হইত না। ৯৮৪ হিজরী সম্রাট তাঁহাকে রায় লুনকরণের সহিত দঙ্গরপুরের রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজা তাঁহার কন্যাকে সম্রাট আকবরের হেরেমে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বীরবল পৌছিয়াই রাজাকে এতদূর বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন যে তিনি সকল ভুলিয়া তাঁহার সহিত কন্যা প্রেরণ করিলেন। বীরবল আনন্দাতিশয্যে হাসিতে হাসিতে রাজকন্যা লইয়া সম্রাটের নিকট উপনীত হইলেন।

৯৯১ হিজরীতে সম্রাটের কোকলতাশ জয়েন খাঁনের সহিত রামচন্দ্রের দরবারে গমন করেন। রাজার পুত্র বীরভদ্র সম্রাটের নিকট হাজির হইতে ভীত হইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও বীরবল কথায় ভুলাইয়া দরবারে লইয়া আসেন।

ঐ বৎসর বীরবল এক দুর্ঘটনা হইতে অতি অল্পে রক্ষা পান। যখন সম্রাট আকবর নগর-চীন ময়দানে পলো খেলিতেছিলেন, তখন রাজা বীরবলের ঘোড়া তাঁহাকে ফেলিয়া দেয় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। সত্যই তিনি জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন না রসিকতা করিতেছিলেন তাহা কে বলিবে? সম্রাট তাঁহাকে কয়েকবার ডাকিলেন, সস্নেহে তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, এবং তাহাকে তাঁহার মহলে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

ঐ একই বৎসর সম্রাট আকবর পলো ময়দানে হাতীর লড়াই দেখিতেছিলেন এমন সময় অন্য একটী দেখিবার মত

তামাশা হইয়া দাঁড়াইল। দিলচাচর নামক হস্তীটি পাগলামী ও বদমেজাজীর জন্য বিখ্যাত ছিল। সে হঠাৎ দুইজন সিপাহীর দিকে রুখিল, তাহারা পলায়নপর হইল। হস্তী যখন তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছিল ঘটনাক্রমে সেই পথে রাজা বীরবল আসিতেছিলেন, দিলচাচর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বীরবলকে আক্রমণ করিল। রাজা পলাইয়া যাইতে সাহস করিলেন না, তদ্ব্যতীত তিনি অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন। ইহা একটী উপভোগ্য দৃশ্যে পরিণত হইল এবং দর্শকবৃন্দ উল্লাসে ও ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। আকবর ঘোড়া ছুটাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে পড়িতে পড়িতে পলাইতেছিলেন। সম্রাটের কয়েক পদ পিছনেই হস্তী থামিল, বীরবল সেবারকার মত রক্ষা পাইলেন।

পেশোয়ারের পশ্চিমে সওয়াদ ও বাজোর এক বিস্তৃত ভূখণ্ড। ইহার ভূমি যেমন উর্ব্বর ও শস্যদায়িনী, আবহাওয়াও তেমনি বসবাসোপযুক্ত। ইহার উত্তরে হিন্দুকুশ পর্ব্বত, পশ্চিমে সুলায়মন পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত খাইবার পাশ। ইহা আফগানিস্তানের এক অংশ। সাহসী শক্তিশালী আফগান ইহার অধিবাসী। ইহার সমতল ভূমি বা উপত্যকাসমূহ প্রায় ৩০।৪০ মাইল বিস্তৃত, এই উপত্যকা সমূহ হয়ত উভয়দিকে উচ্চ পাহাড়ের গায়ে মিশিয়াছে, বা গভীর ও দুর্গম বনানার সহিত মিলাইয়া গিয়াছে, কাজেই আক্রমণকারী অতি কষ্টে ইহার মধ্যে চলাফেরা করিতেপারে।

এই আফগানরা দস্যুবৃত্তি করিয়া বা পার্শ্ববর্ত্তী রাজাসমূহ লুটপাট করিয়া জীবন ধারণ করিত। কাজেই আকবর তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ৯৯৩ হিজরী তিনি জয়েন খাঁ কোকলতাশের সহিত সৈন্য ও কয়েকজন ওমরাহ প্রেরণ করেন। জয়েন খাঁ বাদশাহী সৈন্য ও রশদ সহ ঐ প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রথমে বাজোর আক্রমণ করেন।

জয়েন খাঁ স্থানের দুর্গমতা, আফগানদের পলায়ন তৎপরতা, নিজের সৈন্যদের অপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে যাতায়াতের অসুবিধা ও অধিক সময় ক্ষেপণ ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া সম্রাট আকবরকে সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে প্রার্থনা জানাইয়া দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট কোন ওমরাহ্‌কে এই দুর্গম ও সঙ্কটসঙ্কুলস্থানে পাঠাইবেন ভাবিতেছিলেন। আল্লামা আবুল ফজল যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাজা বীরবলও প্রার্থনা জানাইলেন। বাদশাহ "কুরেয়া" (lottery) করিলেন, রাজা বীরবলের নাম উঠিল। যদিও রাজা বীরবলের সঙ্গ ছাড়া সম্রাটের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ছিল, তবুও তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন, এবং বিদায়ের সময় বীরবলের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া সম্রাট বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন।" যাত্রার দিন সম্রাট শিকার হইতে ফিরিয়া রাজা বীরবলের শিবিরে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অনেক উপদেশ ও যুক্তি দিলেন।

তিনি যথেষ্ট রসদ ও সৈন্য সামন্ত সহ রওয়ানা হইলেন। যখন ডক্ নামক বিশ্রাম স্থানে পৌছিলেন তখন দেখিলেন যে সম্মুখে একটী পাশ (pass) এবং আফগানেরা উভয় দিকে উঠিয়া অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। বীরবল অনতিদূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিলেন এবং অন্যান্য ওমরাহ আক্রমণ করিতেছিলেন। পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিরা ভয়ঙ্কর ও অপদার্থ কিন্তু তাহারা বাদসাহী সৈন্য এমন ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যদিও তাহারা নিজেদের অনেকে হতাহত হইয়াছিল তথাপি বাদশাহী সৈন্যের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল, তাহাদিগকে পিছু পানে হটাইয়া দিয়াছিল। দিনও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কাজেই তাঁহারা পুনরায় সমতল ভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট জানিতেন বিদূষক ভাটের দ্বারা কি কাজ হইতে পারে, কাজেই তিনি আবুল ফাতাহ্‌কে এই উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে মিলকন্দ উপত্যকা পার হইয়া জয়েন খাঁর সহিত যোগদান করিবে এবং তাঁহার হস্তেই এই সৈন্যের ভার অর্পণ করিবে।

ইতিমধ্যে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও যুদ্ধ কৌশলে জয়েন খাঁ বাজোর অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সওয়াদ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময় পরপর রাজা বীরবল ও হেকিম আবুল ফাতাহ্ উপনীত হইলেন। যদিও বীরবলের সহিত জয়েন খাঁর সদ্ভাব ছিল না তথাপি যখন তিনি বীরবলের আগমন সংবাদ শুনিলেন তখন সেনা-

মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন

পতির আইন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া সাদরে তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। কোকলতাশ তাহাদিগকে এক ভোজ দান করিলেন, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের তাঁবুতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাতে রাজা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে গোলন্দাজ সৈন্য তাঁহার সহিত, কাজেই তাঁহার তাঁবুতে সকলের যাওয়া উচিত।

অবশ্য ইহা রাজা বীরবলের পক্ষেই কর্ত্তব্য ছিল যে গোলন্দাজ সৈন্যদল কোকলতাশের হস্তে ন্যস্ত করেন, কেননা তিনি একজন সেনাপতি। যাহা হউক তবুও জয়েন খাঁ সকল সৈন্য সহ বীরবলের নিকট আগমন করিলেন ইহাতে অবশ্য সরদারগণ সন্তুষ্ট চিত্ত ছিলেন না। সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্রী ব্যাপার এই যে বীরবল ও হেকিমের মধ্যে সম্বন্ধ ভাল ছিল না। এই উপলক্ষে তাহাদের মধ্যে এমনবিবাদ হয় যে রাজা জঘন্য ভাষায় গালাগালি পর্য্যন্ত আরম্ভ করেন।

যে দিন প্রথম বীরবল সৈন্য সহ পাহাড় পর্ব্বত ও ভীষণ বনানীর সম্মুখে উপনীত হন সেই দিনই দুর্গম ও সঙ্কট সঙ্কুল স্থান দর্শনে তাঁহার ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল। সকল সময় তিনি বদ মেজাজ হইয়া রহিতেন, যখনই তিনি কোকলতাশ বা হেকিমের দেখা পাইতেন তখনই তাঁহাদিগকে গালি পাড়িতেন। ইহার প্রথম কারণ এই যে তিনি রাজপ্রাসাদের সিংহ ছিলেন ও সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের এমন স্থানে যাতায়াত করিতেন যেখানে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এবং সম্রাটের উপর তাঁহার এতাদৃশ প্রভাব ছিল যে তিনি তাঁহার স্থিরিকৃত বিষয় ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিতেন। জয়েন খাঁ ও হেকিমের তিনি কোনই তোয়াক্কা রাখিলেন না।

জয়েন খাঁ সওয়াদ প্রদেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু বীরবল ও হাকিম লুণ্ঠনের জন্য অধিক ব্যগ্র। রাজা নিজে অহঙ্কারী ছিলেন কাজেই তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং নিজের মতলব মত রওয়ানা হইলেন। বাধ্য হইয়া অন্যান্য সকলে তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং এক স্থানে আসিয়া থামিলেন।

বীরবল গুপ্তচর মুখে শ্রবণ করিলেন যে আফগানেরা রজনী যোগে আক্রমণ করিবে এবং তিনি যদি আর আট মাইল পথ অগ্রসর হইতে পারেন তাহা হইলে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। কাজেই সেই স্থানে তিনি বিশ্রাম করিলেন না ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন সন্ধ্যা হইতে তখন অনেক বিলম্ব আছে এবং আট মাইল পথ অতিক্রম করা বিশেষ দুরূহ হইবে না। তিনি ফতেপুর সিক্রী ও আগ্রার রাজপথ দেখিয়াছিলেন কিন্তু পার্ব্বত্য পথ সম্বন্ধে তাঁহার কোনই ধারণা ছিল না। আসল কথা, তিনি শীঘ্র এই পথ অতিক্রম করিবেন বলিয়া যে ধারণা করিয়া ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। যাহারা ইতিমধ্যে তাঁবু ফেলিয়া ছিল তাহারা যখন বীরবলের সওয়ারী অগ্রসর হইতে দেখিল তখন মনে করিল যে তাহাদিগকে ভুল আদেশ দেওয়া হইয়াছে অথবা পূর্ব্ব আদেশ রহিত করা হইয়াছে। ফলে সকলেই হতভম্ব হইয়া গেল এবং যাহারা সবে মাত্র তখন আসিয়া পৌছিল তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল ও যাহারা তাঁবু গাড়িয়া ছিল তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িল। পরে হাতিয়ার পত্র লইয়া পলাইয়া যাইতে মনস্থ করিল। অবশেষে সকলে তাঁবু উঠাইয়া অগ্রসর সৈন্যদের পশ্চাতে ছুটিল। ভারতীয় সৈন্যগণ এই পার্ব্বত্য যুদ্ধে যৎপরনাস্তি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল কাজেই তাহারা এই সুযোগে 'যঃ পলায়তি স জীবতি' পন্থা অবলম্বন করিল এবং যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারাও 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অনুসরণ করিল। আফগানেরা নিকটেই ওৎ পাতিয়াছিল তাহারা উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

এই সময় যদি বীরবল থামিতেন তাহা হইলে লুণ্ঠনকারীগণকে অনায়াসে দমন করিতে পারিতেন। কিন্তু আকবরের প্রিয়পাত্র বীরবল মনে করিলেন এ বিশাল বাদশাহী সৈন্য অনায়াসে আফগান সৈন্য ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে। সৈন্যদল কয়েক মাইল ব্যাপিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছিল এবং একটী শান্ত নদীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে ছিল; এক্ষণে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। আফগানেরা লুণ্ঠন হত্যা ও বন্দী করিতে ব্যস্ত ছিল। পথ বন্ধুর, উপত্যকা সংকীর্ণ; সৈন্যের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। জয়েন খাঁ সাহসের সহিত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু সে

বেচারী একা কি করিবেন? স্থান অতি সঙ্কটপূর্ণ কাজেই লুণ্ঠনকারীরা অনেক রসদ লইয়া গেল। ফল কথা যুদ্ধ করিতে করিতে বাদশাহী সৈন্য ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিল।

পরদিন জয়েন খাঁ মঞ্জিলে থামিলেন। আহতদিগকে ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি করিতে হইবে এবং তাহারা বিশ্রাম লইতে পারিবে। তিনি স্বয়ং বীরবলের তাঁবুতে যাইয়া যুক্তি করিলেন। পিছনে বাদশাহী সৈন্যদল আসিতেছিল। আফগানেরা সাধারণতঃ তাহাই আক্রমণ করে কাজেই জয়েন খাঁ তাহাদের অপেক্ষায় রহিলেন এবং অন্যান্য সকলে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সুযোগ পাইয়া আফগানেরা পঙ্গপালের মত দলে দলে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সকল দিকে অবিশ্রান্ত ভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় তাহাদের আরও সুবিধা হইয়া গেল। তীর নিক্ষেপ দ্বারা বাদশাহী সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। পথ এত সরু ছিল যে, দুইজন অশ্বারোহী সৈন্যও একত্রে যাইতে পারিত না। অধিকন্তু অধিকতর অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল আফগানেরা তখন পাথর তীর ও গুলি ছুড়িতে লাগিল। ইহা যেন 'রোজ কেয়ামতের' দিনে পরিণত হইল। এত অধিক সংখ্যক লোক, ঘোড়া ও হাতী মরিল যে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল। জয়েন খাঁ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অতি কষ্টে পদব্রজে অন্য এক মঞ্জিলে আসিয়া পৌঁছিলেন, আবুল ফাতাহ্ পরে উপনীত হইলেন কিন্তু বীরবলের আর কোন সন্ধানই মিলিল না, শুধু বীরবল নহে শত সহস্র সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছিল।

যখন সম্রাট আকবর রাজা বীরবলের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলেন তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। দুইদিন তিনি কোন আমোদ উৎসব করেন নাই এমন কি কোন আহার্য্যও গ্রহণ করেন নাই। *

* শামসুলউলামা হাসান মুহম্মদ আজাদ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ "দরবার-ই-আকবরী" অবলম্বনে লিখিত। 'দরবার-ই-আকবরী' প্রামানিক ও প্রকাণ্ড বহি। উর্দ্দু সাহিত্যের মণি কৌস্তভ। —লেখক

কলঙ্কিনী

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

বাঁশবনের ঐ ধারে,
সূর্য্যি যেথায় ঘুমিয়ে পড়ে রাতের অন্ধকারে।
চাঁদ যেখানে হাসে,
রূপের আলো ছড়িয়ে দিয়ে শ্যামল দূর্ব্বাঘাসে।
দখিণ হাওয়া পাগল হোয়ে ধানের ক্ষেতে ছোটে,
মধুর ধ্বনি ওঠে;
গাঁয়ের ধারে গহীন্ গাঙে মাঝির কলরব,
নীরব হোলো সব।

সেই গাঁয়েতে হারাণ শেখের বাড়ী,
অনেক দিনের ভাঙা-চুরো চিহ্ন ছিলো তারি।
গোয়ালে তার ছিলো দুটী গরু,—
সে নিজে আর একটী মেয়ে নাম ছিলো তার বড়ু।
সংসারে তার আর ছিলো না কেউ,
মিত্র ছিলো একজনা, আর শত্রু ছিলো শত শত
সঙ্গে লাগা ফেউ।

গরীব ছিলো অতি,
সেই কারণে ঘেঁসতো না কেউ,—ইহাই নাকি এ
সংসারের গতি।
ভোর না হোতেই কাজে চলে যায়
দিন্-মজুরী খাট্‌তে হারাণ্, এ গাঁ ছেড়ে বাহিরের
ঐ গাঁয়।

সন্ধ্যা হোলে আসে,
চার আনা হায় পয়সা নিয়ে—দুখের ব্যথা কতো তাহার
চোখের জলে ভাসে।
বাপে-ঝিয়ে সারাদিনের উপোস থাকি হায়,
রাতের বেলা আধ-পেটা খায়, এম্‌নি কোরে মাসের পরে
মাস্‌টি কেটে যায়।

গরীব ব'লে বয়স তো আর থাক্‌তে
নারে থামি',
ফল্গু-ধারা একে একে বড়ুর গায়ে
এলো যেন নামি'।
কূলে কূলে উঠ্‌লো ফুলে দুকূল-ছাপা বান্,
এই দুনিয়ায় এর হাতে তো কেউ কখনো
পায়নি পরিত্রাণ।
বুদ্ধিকে'ও ভগবানের বলিহারি যাই,
গরীব-ঘরে রূপের ডালি সাজিয়ে এতো দিলেন কেন,
ভেবে মরি তাই।

মাঠ পেরিয়ে বড়ু যখন নদীর কিনারায়
জল্‌কে চলে ধীর গতিতে, ব্যাকুল করে শান্তমধুর বায়
ছল্‌কে আসি আঁচল ধরে টানি;
ওদিকে ঐ ঝোপের আড়ে—কোয়েল বঁধূ করে
কানা-কানি।

শিউরে ওঠে বনের লতাপাতা,
জমে ওঠে সবার মনে কী এক গভীর আকুল-
আকুলতা।
পথের ধারে ঘাসের বুকে জাগে শিহরণ,
ভিজে ওঠে বিরাট ব্যথায় তপ্তরোদে কঠোর কঠিন মন।
নদীর বুকে অথির ঢেউয়ের রাশি,—
মিলিয়ে গিয়ে আপন মনে জেগে থাকে ছড়িয়ে মধুর হাসি।
নিশীথে চাঁদ হাসে,
চুপি চুপি ভাঙা বেড়ার ফাঁকে—ছড়িয়ে গিয়ে
ফুলের মতো আসে নামি' বড়ুর আশে পাশে।
শিউরে ওঠে তাহার কচি বুক,
কী এক গভীর মর্ম্মব্যথা গুম্‌রে উঠে, নত করে মুখ।

সুদূর বাঁশীর করুণ গানে কণ্টকিয়া ওঠে
সকল দেহ—রক্তধারা ছোটে
কপোল দুটী আরক্ত হয় কমলা নেবু প্রায়,
দু ফোঁটা ঘাম জমে তাহার শান্ত ললাট দেশে—
কিসের ছোঁয়া মাগে সকল গায়।

ক্ষণে ক্ষণে ফেলে দীর্ঘশ্বাস—
হাঁপিয়ে ওঠে, ছোট্ট কুঁড়ে—সে ঘরে সে নিতুই করে
বাস।

কাহার যেন আকুল পরশ লাগি
গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জাগি
জাগি!

গরীব পিতার ঘরে সে যে জন্ম নিলো হায়,
কইতে নারে বুকের ব্যথা—আবার তাহা সহাও
নাহি যায়।

*

খাঁ সাহেবের ছেলে এলেন বাড়ী,
বহুৎ দিনের পরে সুদূর অচিন্ বিদেশ ছাড়ি'।
পাইক-প্যাদা চাকর-নফর হাজীর থাকে সবে,
যে কথাটী যবে
হুকুম করে, তামিল হোতে হয় না মোটে দেরী,
খুশী হালে থাকে সবে সদাই তারে ঘেরি'।
মনের খেয়াল যখন যাহা হয়,
আরকি দেরী সয়?

চোবে দোবে ব্যস্ত হ'য়ে ছোটে চারি দিকে,—হঠাৎ দড়বড়ি
যা হুজুরের মর্জ্জী তাহা হাজীর করে, দেরী তাদের
হয়নাকো একঘড়ী।
এমনি কোরে সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে কাটে
তাহার কাল;—ঘটিল জঞ্জাল।

সেদিন সাঁজের বেলা,—
বড়ু গেছে নদীর ধারে, ঘর-দুয়ারের
কাজ সারিয়া মেলা।

রঙিন্ রবি,
দিনের ছবি
মুছে দিয়ে হায়—
ছায়া-ঘেরা গোধূলিতে হারিয়ে যেতে চায়!
বনের পাখী করে ডাকাডাকি,
রাতের শীতল পরশ পেয়ে শিউরে ওঠে ক্ষণেক থাকি
থাকি।

একটা বিরাট মৌনতারি মাঝে,
জগৎ যেন লুকিয়ে যেতে চায়,—কী এক নীরব শান্ত
করুণ লাজে।
সাঁঝ লগনের কাল,
প্রকৃতি আজ তেপান্তরি মাঠ পেরিয়ে ছড়িয়েছিলো
তাহার স্বর্ণ-জাল।
হেন কালে, খাঁ সাহেবের ছেলে,
সাঁঝের হাওয়া খেতে এলো—চাকর-নফর বন্ধু-ইয়ার
ফেলে।

নদীর কিনারায়
চোখের ইশারায়,
বড়ুর তরুণ মনের কোণে কিসের যেন বসিয়ে দিলো
ছাপ,
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ল ধীরে
গভীর সন্তাপ।

সেদিন থেকে রোজ সকালে সাঁঝে,
হারাণ শেখের বাড়ী যেতো খাঁ সাহেবের ছেলে,—
ফলফুলারী নিয়ে যেতো কখন মাঝে মাঝে।
কখনো বা টাকাটা সিকেটা,
কাপড়-চোপড় জামাজোড়া যখন যাহা এটা ওটা সেটা
দিত বড়ুর হাতে,
রুই কাৎলা কখনো বা জুটে যেতো হারাণ শেখের
পাতে।
ভাব্‌তো হারাণ বসি,
ফজল মিঞার অসীম দয়া,—নইলে কেন আমার
গৃহে পশি'

কলঙ্কিনী

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

দেখায় এতো দয়া,
দয়ার শরীর' নইলে কি আর গরীব আমি,—আমার তরে
তাহার এতো 'মায়া' !

কাটে কিছু কাল,
গোয়ালভরা গরু হোলো, ক্ষেতে চযে দু'তিন খানা হাল।
গাঁয়ের লোকে করে কানাকানি,
যারা নাকি দেখে সুখী হারাণ শেখের বেজায় টানাটানি,
দুঃখে তাদের বক্ষ ফেটে যায়!
কি করিবে হায়,
খাঁ সাহেবের ছেলে, তারে কইতে নারে কেহ কোন কথা,
বক্ষে পোরা ব্যথা।
হারাণ শেখে জব্দ করা চাই।
"শোনো শোনো ভাই!
সমাজ গেল রসাতলে, এ জাতিটা বাঁচ্‌বে কতো দিন?
এম্‌নি সবে হীন?
দুর্নীতি যে সমাজ দেহে ঢুকছে অহরহ
বেজায় দুব্বিষহ,
প্রথম ভাগে এ জিনিষ না উচ্ছেদিলেই নয়,
আরকি দেরী সয়?"
পাড়ার যিনি মোড়ল তিনি বলেন, "এ কি হোলো?
কি দুর্নীতি বল।
রহিম মোড়ল থাক্‌তে দেশে সাধ্যি আছে কার?
পেয়ে যাবে পার?"
ঢি ঢি পোড়ে গেলো,
এই কথাটি নিয়ে দেশে যেন কথার বন্যা নেমে এলো।
মুন্‌সী মোল্লা ডেকে,
বল্লে সবাই হেঁকে—
"একি সওয়া যায়?
এ সমাজে এ লোক নিয়ে চলা মোদের
হোলো বিষম দায়।
যা-ই বলো না ভাই,
'এক ঘরে' তো হারাণ শেখে জরুর করা চাই।
কলঙ্কিনী মেয়ে যাহার ঘরে,
সাধ্যি কাহার এই দুনিয়ায় অনুগ্রহ দেখায় তাহার তরে।"
জান্‌লে নাকো কিছু—
গরীব হারাণ্ লজ্জা-ভয়ে মাথা করে সবার কাছে নীচু।
দিন কাটিয়া যায়,
'এক ঘরে' এ হারাণ শেখে কেউ নিয়ে না খায়।
মোড়ল-বাড়ী কতো হাঁটাহাটি,
মোল্লা-বাড়ী ধন্না দিয়ে কতো কাঁদাকাটি।
নাহি গলে মন,
ভাঙল নাকো কারো মনে কঠোর পাষাণ পণ।
মাথায় করাঘাত—
করি হারাণ্ কয় খোদাওন্দ! এর চেয়ে হায়
শিরে কেন হয় না বজ্রপাত।

*

এ সব কথা রয়না কভু ছাপা,
কেউ পারেনা দিতে ধামা চাপা,
ফুলে ফেঁপে কানে
এলো যবে, ফজল মিঞা স'রে তখন পড়্‌লো মানে মানে।
ভাব্‌লেনাকো হায়,
দিন-মজুর এ হারাণ শেখের কি দশা,—আর মেয়ে বড়ু
কি করে উপায়।
কলঙ্কের এ কথা যবে বড়ুর কানে এলো,—
বিরাট ব্যথায় কোমল তাহার বক্ষ ফেটে গেলো।
প্রতারিতা, নির্দ্দোষিণী সে;
এমন কোরে কপাল তাহার পুড়িয়ে দিলে কে?
ভেসে নাহি আসে কানে সুদূর বাঁশীর গান,
নিখিল-ছাওয়া চাঁদের আলো তার কাছে আজ ব্যথায়
পরিম্লান।
অথই আঁধার মনের কোণে জমাট বাঁধি
আসে,
বিরাট-ব্যথা গুম্‌রে ফিরে—অভাগিনী চোখের
জলে ভাসে।
আকাশ ফাটি' ঝরে বারি-ধারা,
লক্ষ কণ্ঠে মর্ম্মব্যথা চীৎকারিয়া ওঠে, কহে—"আহা!
সর্ব্বহারা!"

নিঠুর গাঁয়ের লোক,
কেউ বোঝেনা বক্ষ-ফাটা বড়ুর ব্যথা-শোক।
এ হীন অপমান,
কোর্‌লে যারা, ভাবলে না হায় এই দুনিয়ায় কোথা
তাহার স্থান।
আকাশ ফেটে পড়ে যথা বাজ,
তেমনি ভীষণ শব্দ দিয়ে তৈরী হোলো দশের আদেশ
আজ।
"নাহি দেশে ঠাঁই—
কলঙ্কিনী, তাই
কারো দয়া তাহার পরে নাই—নাই—নাই।
ভাঙা বেড়ার কোণে,
বসি অথির মনে,
লজ্জা-ভয়ে ধূলির সাথে মিশে যেতে চায়,
অতি সঙ্গোপনে
বড়ুর বুকের ব্যথা—
কেউ বোঝে না,— পুছেনা কেউ খরচ করি একটী
মুখের কথা।
*
চারিদিকে কথার খোঁচা সয়ে—
বাস করা হায় কঠিন হোলো কলঙ্কের এ ডালি মাথায়
লয়ে।
চিন্তি' ভাবি' তাই,
পায়না কিছু ঠাঁই,
হারাণ শেখ আজ পাগল হোয়ে, খাঁ সাহেবের বাড়ীর পানে
চলে ছুটিয়াই।
অশ্রু দিয়ে পায়ের মাটী সিক্ত করি' তবে,
বল্লে দুখে যবে—
"হুজুর বাবা কর্তা সালাম, রাখো আমার মান,
কর পরিত্রাণ,
বড়ুকে মোর বাঁচাও বাবা—কেটে তোমার পায়ে দিব
মোর কলিজার জান।
আমার মায়ের দোষ যে কোথা,
তোমার কাছে ছাপা কিছুই নাই,
পায়ে রেখে তরাও তারে এইটুকু আজ ভিক্ষা আমি
চাই।"

চক্ষু করি লাল,
ফজল মিঞা হুকুম দিলেন, তুলে নিতে হারাণ বুড়োর
জীর্ণ দেহের ছাল।
কি বলে এ?—ছোটো লোকের জাত,
এত্তাবড়ি বাত?
রাখ্‌ ব্যাটাকে ঠাণ্ডা-ঘরে বন্ধ করে আজ্‌কে সারারাত।

কতো বড়ো বংশ আমার ভাবলে নাকো
কিছু,
তবু নিলে পিছু,
এই কথা আজ বল্‌তে এসে মাথা তাহার খ'সে কেন
পড়্‌লে নাকো নীচু?
কাতর হয়ে হারাণ শুধু বলে,
"এর তরে যে তুমিই বাবা দায়ী—" আর কথা সে
বোল্‌তে নারে,
সকল কথা ভেসে গেলো তাহার চোখের
জলে।

সকাল হোলে পর,
মুক্ত হ'য়ে হারাণ চলে, ছুটে আপন ঘর,
গায়ে নিয়ে জ্বর।

ভুগে ভুগে ভুগে,
আরো দুখে শোকে,
হারাণ যবে চিরতরে চোখের পাণি ছাড়ি'—আপন বাসা
গড়্‌লো সুদূর অচিন্‌ পরলোকে,

মাথায় দিয়ে হাত—
বড়ু শুধু জাগি জাগি কাটায় সারা রাত।

খেলাফতা বন্যা এলো দেশে,
উঠলো মেতে ছেলে বুড়ো জমলো গিয়ে বিরাট মাঠে
দীঘল গাঁয়ের শেষে।

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

কোরাণ থেকে কতো মধুর বাণী,
হাদীস ধোরে কত টানাটানি,
ওয়াজ শুনি দেশের লোকে মাত্‌লো জোশে,—
সবাই তারা করে কানাকানি।

"অহ্! তোফা,—তোফা ওয়াজ ভাই,
ফজল মিঞা 'জবর' আলীম, এর বাড়া এ ভূ-ভারতে
আরতো বুঝি নাই।"

সঙ্কুচিত মনে,
অতি সংগোপনে,
জীর্ণবাসে দাঁড়িয়েছিলো বিরাট সভা শেষে,
দু' এক কড়ি ভিক্ষা পাবার লাগি—
এক অভাগী ভিখারিণী বেশে।

বক্ষে চাপি' নধর কান্তি ছেলে,
হয়তো কারো গোপন-পাপের সাক্ষীস্বরূপ—হয়তো
কিছু সাদৃশ্যেতে মেলে;
তরুণ-নেতার মুখের চেহারায়,
কলঙ্কিনী করিয়াছে যেবা—স্নেহময়ী নির্দোষিণী মায়।
দিনের আলো মুছে দিয়ে সাঁঝের আঁধার
নামি',
অশথ্ গাছের ঘন পাতার তলায় গেলো থামি'।

সভা শেষে নেতারা সব ফির্‌তেছিল বাড়া.
চাঁদার টাকা কাপড়চোপড় বোঝাই দিয়ে
তিন্‌টে গরুর গাড়ী।
ভিখারিণী হস্ত পাতি দাঁড়িয়ে শুধু বলে,
"ওগো, কিছু ভিক্ষা আমায় দাও—
দুদিন থেকে উপোস আছি পেটে আগুন জ্বলে।

বক্ষ-ফাটা তাহার ব্যথা-দুখে,
কাঁদ্‌লে নাকো কারো কঠিন বুক,
তরুণ-নেতা ফজল মিঞা উঠল শুধু রুখে;
বল্লে, "বেটি কোন্ দেশী এ? বুদ্ধি কিছু নাই,
মাঠের মাঝে কোথায় মোরা পয়সাকড়ি পাই?
এসব টাকা যাবে আঙ্গোরায়,
একি দেওয়া যায়?
কোন্ হিসেবে ভিখারিণী ভিক্ষা আসি চায়?"
আকাশ-পটে বিজ্‌লী চমক লাগে,
নারীর বুকে কতোই ব্যথা জাগে,
চিন্‌তে পেরে হা হা করি উঠলো সবে বলি,
"সোজা পথে যাওনা বাছা চলি,
ও কলঙ্ক মুখ নিয়ে হায় কেমন কোরে লোকের মাঝে চল,
সেই কথাটা বল।
হারাণ শেখের কলঙ্কিনী মেয়ে,
বেজায় দেখি বেড়ে গেছ, স্পর্দ্ধা কোথায় পেয়ে।"

বল্লে সবে এই কথাটি যবে,
একটী তারা সাক্ষী-স্বরূপ উঠলো ফুটে অসীম বিরাট
নভে।
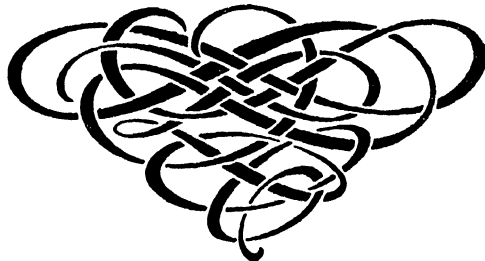
সাহিত্যে আধুনিকতা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এমনিধারাই হয়। রাজার রথচক্র পথের বুকে রেখা অঙ্কিত করিয়া চলিয়া যায়। জনতা পিছনে পড়িয়া থাকে সমুখে ছোটে মৃগয়ার মৃগ; কিন্তু রাজধনুর্দ্ধরের লক্ষ্য থাকে স্থির, সন্ধান—অব্যর্থ। বহুক্ষণ পরে পরিষদবর্গ ধূলি ও ধ্বজা উড়াইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যখন ছুটিয়া আসে, বন তখন চঞ্চল হইয়া ওঠে, তপোবনের শান্তিভঙ্গ হয়। তারপর বিচিত্র রাজখেয়ালের ক্রুদ্ধ সমালোচনা করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর শিবির-বাহকের দল যখন সেথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, চতুর্দ্দিক তখন মুখর হইয়া ওঠে, লক্ষ্যের চিহ্নটুকুও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, মূর্ত্তিমান বিঘ্নের বহুলতায় বনস্থলী ভরিয়া যায়। সাহিত্যের মৃগয়ায়ও আজ ত্রস্ত মৃগকুল হইতে আরম্ভ করিয়া রৌদ্রদগ্ধ পদাতিকদল পর্য্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার ও চাপল্য তাই ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

রুচি ও রীতির বিচার লইয়া উপদ্রবের আর অন্ত নাই। অবান্তরের অন্তরালে সাহিত্যধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝি সত্যই চাপা পড়িয়া গেল। কটু ও কষায় উক্তির প্রয়োগ যখন বাধা মানে না, কোলাহল তখনই বাড়িয়া চলে। হট্টগোলের মধ্যে হরিবোলের হর্ষধ্বনি শোনায় ভাল। কিন্তু গোলে হরিবোলের মধ্য হইতে উপন্যাসের নিরঙ্কুশ 'সাম্মনে'র অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইয়া ওঠে। অতএব সাহিত্যের ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব যদিই বা গুহায় নিহিত হইয়া পড়ে, সাহিত্যের তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে, সাহিত্যিকের ক্ষতি কি?

সাধারণভাবে 'সাহিত্য' কথাটা আমরা ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করি। তাই কখনো কখনো দর্শন, ইতিহাস, এমন কি বৈজ্ঞানিকী কথার বিবৃতিকেও আমরা সাহিত্য নামে অভিহিত করি। সাহিত্য শব্দের যৌগিক অর্থই বা কি, আর রূঢ়িক অর্থই বা কি, সেই সব ব্যাকরণঘটিত প্রশ্ন ও নিষ্পত্তির সদুত্তর জানাতে আমাদের লাভালাভ কিছু নাই। এমন কি সাহিত্যের নাম সাহিত্য না হইয়া আদিত্য অথবা পুরোডাস্ হইলেও ক্ষতি ছিল না, শেষোক্ত বস্তুটি যদি নাকি ঋষিদের জিহ্বায় জল সঞ্চারের কারণ না হইত। এই ব্যাপক অর্থ ধরিয়াই ত রামেন্দ্রসুন্দরের 'ম্যাক্সোয়েলের ভূত,' গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্নতত্ত্ব' অথবা 'বীরবলের প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনা'কে আমরা সাহিত্য বলি। এমন কি মিলের Utilitarianism, মেনের Ancient Law, ডারুইনের Origin of Species, রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' সাহিত্য-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি Einsteinএর থিয়োরিও যদি সহজবোধ্য করিয়া চারু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাংলা মাসিকে প্রকাশ করিতেন, তাহাকেও আমরা সাহিত্য বলিতাম। অর্থাৎ যাহা কিছু সুলিখিত সুবোধ্য, সুনিবদ্ধ, সুব্যক্ত তাহাকেই সাহিত্যের কোঠায় ফেলিতে আমাদের আপত্তি নাই, হোক্ তা বুদ্ধিগত, নাই থাক্ তাতে অনুভূতির কথা, নাই থাক্ তাতে মানব হৃদয়ের সম্পর্ক। এইজন্য সুরচিত সন্দর্ভগুলি সাহিত্যের অন্তর্গত।

সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ অর্থে যে সাহিত্য কথাটি ব্যবহার করি, সত্যকার সাহিত্য তাহাই। সেখানে জ্ঞানের সঙ্গে নয়, বুদ্ধির সঙ্গে নয়—মানব হৃদয়ের সঙ্গে, মানব জীবনের সঙ্গে, অনুভবের সঙ্গে, রসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক। সেথায় কামসূত্র, সাহিত্য দর্পণ, উজ্জ্বল নীলমণি—কাহারই আর প্রবেশাধিকার নাই। রস-সাহিত্যকে আমরা সুধু সাহিত্য

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে রামমোহন লাইব্রেরীর ২২শে বৈশাখের ৬ই মে তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নামে সম্বোধন করি বলিয়া তাহা জ্ঞান-সাহিত্যের সহিত মিশাইয়া যায়। সাহিত্যের স্বরূপ খুজিতে গিয়া তাই কখনো কখনো গোলে পড়িতে হয়, কেননা সাহিত্যের এই দুই সুস্পষ্ট বিভাগের মিল সুধু আকারে—প্রকারে নয়, রূপে—প্রকৃতিতে নয়, মূর্ত্তিতে—ধর্ম্মে নয়। স্বচ্ছন্দ সলীলগতি ধীতন্ত্রী রচনাকে তাই সাহিত্য-ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইবার কালে আমল দেওয়া চলে না। তখন কাব্য-সাহিত্য, কথা সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য, কি না রস-সাহিত্যকেই আমরা সাহিত্য বলিয়া গণ্য করি, অর্থাৎ রূপ ছাড়িয়া রসে আসিয়া অবতীর্ণ হই।

বিচারও চলিতেছে এই শেষোক্ত সাহিত্য লইয়া। আমাদের কাব্য উপন্যাস ও গল্পে কিরকম জিনিষ থাকা ভাল এবং কি থাকা ভাল নয়, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষে বিবাদ তাহা লইয়াই। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ধর্ম্মে'—সাহিত্য কি হওয়া উচিত নয়, এবং 'সাহিত্য-রূপে'—কি হওয়া উচিত, সেই কথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। স্বাভাবিক হ্রী-বশতঃ তিনি কতকগুলি কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই ইঙ্গিত কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে আজ আর তাহা জানিতে বাকি নাই।

সাহিত্যের সমালোচনায় 'রস-সৃষ্টি' কথাটি আত্যন্তিকভাবে চলিয়া গেছে। রস-সৃষ্টিই আর্ট বলিলে সংজ্ঞাটি সুনির্দ্দিষ্ট হয় না, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হয়। অবশ্য রস কি, তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে হইলে কিছু গোলে পড়িতে হয়, কেন না রস উপভোগের জিনিষ, অনুভবের বিষয়। বহিরিন্দ্রিয় দিয়াই হোক্, অন্তরিন্দ্রিয় দিয়াই হোক্, আমরা যাহা আস্বাদন করি তাহা উপলব্ধির বিষয় হইয়াই থাকে। নানারূপে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে যাই, কিন্তু আস্বাদন যে করে নাই তাহার কাছে অনাস্বাদিতের স্বাদ কিছুতেই অনুভূতিগম্য হইয়া উঠিবে না।

মানুষের কতকগুলি অন্তর্নিহিত কামনা—সমাজ সভ্যতা, কৃষ্টি, প্রথা, আচার, ধর্ম্ম, লজ্জা প্রভৃতি নানা কারণে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। এই তীব্র কামনা-সমূহ ক্ষণিক নয়, বাহ্য নয়—প্রকৃতিগত, স্থায়ী। এই সব অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ণ কামনা, অকৃতার্থ মনোবৃত্তি—ধর্ম্মে কর্ম্মে আর্টে সাহিত্যে নানারূপে, নানা মূর্ত্তিতে ফুটিয়া ওঠে। ফুটিয়া ওঠে—কিন্তু স্বরূপে নয়। সমাজ-সভ্যতার অভ্যাস নিয়ন্ত্রিত অন্তরের জাগ্রত নিষেধ-নীতি ইহাদের রূপের পরিবর্ত্তন সাধন করে। এই অন্তরস্থ প্রবৃত্তির আকারের পরিবর্ত্তনই মনস্তত্ত্ব কল্পিত রূপান্তর। কর্ম্মের মধ্যে যে সাধ মিটাইবার সাধ্য নাই, মনের অজ্ঞাতে আর্টের মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে সে সাধ মিটাইয়া লই। প্রাণিজগতের দিক দিয়া যাহা অভিব্যক্তি, মানসিক রূপান্তর অনেকটা তাহারই মত। এই রূপান্তরিত মনোবৃত্তি চিরদিন আমাদের আনন্দ বিধান করে। মন-সন্ধানী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মতে, রসের উৎস নাকি এইখানেই।

নানা দিক দিয়া মানব-মনের পর্য্যালোচনা চলে। জ্ঞান বুদ্ধি ও সত্যের দিক দিয়াও মনকে দেখি, আস্বাদ অনুভূতি রস ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়াও মনকে দেখি। আবার রুচি প্রবৃত্তি আসক্তি বাসনা কামনার ভিতর দিয়াও অন্তরের প্রকৃতি নির্ণয় করি। এই কামনার বশেই মানুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, 'আমি' বলিয়া গৌরব করে, সমাজে আপনাকে ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কামনা মনের সক্রিয় অবস্থা। সুখ দুঃখ বোধের মত আর একটি বোধও কিন্তু মানব চিত্তকে প্রভাবিত করে, তাহা নৈতিক বোধ। মানুষের নৈতিক প্রকৃতি নানারূপে প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া চলে; উচিত হইতে অনুচিত, হিত হইতে অহিত, যথা হইতে অযথাকে পৃথক করে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহা পরিণতি পাইয়াছে, কিংবা মানুষের ইহা মৌলিক প্রকৃতি, সে তর্কে এখন প্রয়োজন নাই। যখন হইতে মানুষ বিশেষ ভাবে বিচারশীল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই বিবেকের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে। আদিম বর্ব্বরতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারিলে এই নৈতিক প্রকৃতি হইতে মানব জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় কি-না, তাহা বলিতে পারা কঠিন। এই নীতিবৃত্তি আছে বলিয়া আজিকার জগতে আমাদের আচরণ অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল উৎকেন্দ্র হইয়া ওঠে না, আমাদের ব্যবহার সঙ্গত শোভন উপযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই নীতি বুদ্ধির প্রভাবেই কি মানুষের মনের চাপা প্রবৃত্তিগুলি রূপান্তর গ্রহণ করে, গরল অমৃত হইয়া যায়, পঙ্কে পদ্ম ফোটে?

'রস ও রুচি' প্রবন্ধে পরশুরাম ঋগ্বেদের 'নাসদীয়' সূক্তটি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে একটি রহস্য-রঙীন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

'অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব'— সতো বংধুমসতি...ইত্যাদি।

পরশুরাম বলিতেছেন, "ঋষি অবশ্য বিশ্ব সৃষ্টির কথাই বলিয়াছেন, এবং 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থই ধরিতে হইবে। কিন্তু 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের বাংলা অর্থ ধরিলে এই শব্দটি আর্ট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ফ্রয়েডপন্থীর সিদ্ধান্ত অনুসারে অসদ্ বস্তু কাম হইতে সদ্বস্তু আর্ট উৎপন্ন হইয়াছে।"

সভ্যতার গোড়াকার কথাই এই—অসৎ হইতে সৎ, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, নিষ্ঠুরতা হইতে করুণা, ঘৃণা হইতে ভালবাসা, কাম হইতে প্রেম। আমাদের কাছে যাহা উচ্চতর প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি, মনোবিদ্‌গণের মতে তাহাই হয়ত জটিলতর চিত্তবৃত্তির প্রকাশ। কম্‌প্লেক্স্‌ হইতেছে সভ্যতার দান।

পশু হইতে মানুষ, বর্ব্বর হইতে সভ্য, সরল হইতে জটিল, ইহাই হইল অভিব্যক্তির নিয়ম।

মানুষ বানর অথবা বানরের পূর্ব্বপুরুষের বংশধর বলিলে এখন আর কেহ রাগ করে না। মানুষের নানা প্রকার উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি কাম হইতে সঞ্জাত বলিলেও তেমনি রাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কামজ প্রবৃত্তি তাহার আদিম কদর্য্যতা পরিহার করিয়া কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পশু আজ মানুষ।

মানবের পক্ষে দেবতা হইবারও বাধা নাই। মানুষের জীবন এক অপূর্ব্ব সংগ্রামের পুণ্যক্ষেত্র। সেখানে সুরাসুরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। সুধার কলস লইয়া মোহিনী অমৃত পরিবেষণ করিয়া যায়। দেহের লালসায় যে পাগল হইয়া ওঠে, অমৃত লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে না। মোহিনীও মায়ার মত অন্তর্হিত হয়। কোথায় কে জানে!

রসের উৎস-সন্ধানে বাহির হইয়া আমরা বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। রস কি মোটামুটি তাহা আমরা বুঝি। যে প্রবৃত্তি হইতেই তাহার উৎপত্তি হোক্ না, আমাদের ভাল লাগা মন্দ লাগা, বাসনা বিতৃষ্ণা, সুখ দুঃখ বোধের মধ্যেই রসের স্থিতি।

রসসৃষ্টি আর্ট, ইহাই কি আর্টের প্রকৃত সংজ্ঞা? রস-সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে যখন আর্ট কথাটি ব্যবহার করি, তখন হয়ত আর্টের এইরূপ অর্থ করিলে দোষের হয় না, কেননা রসসাহিত্যে রসই মূলবস্তু। কিন্তু আর্টের অর্থ ত ঠিক ইহা নহে।

কখনো শিল্প, কখনো শিল্পচাতুর্য্য কখনো কৌশল, কখনো কলা, কখনো কলাবস্তু হিসাবে আর্ট কথাটির প্রয়োগ করি। রচনা-প্রক্রিয়াকেও আর্ট বলি, প্রক্রিয়ার ফলকেও আর্ট বলি। আর্টের স্বরূপ কি?

ভগবানের সৃষ্টি প্রকৃতি, মানবের সৃষ্টি আর্ট। মানুষ যেখানে রচনা করে, সৃষ্টি করে, অভিব্যক্তি করে, সেই খানেই তার আর্ট। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে আর্টকে আইডিয়া হইতে পৃথক করিয়া দেখি। অবচ্ছিন্ন ভাবে ধরিলে, আর্ট সৃষ্টির শ্রী অথবা প্রকাশের প্রকর্ষ হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা আর্টের ভক্ত তাঁহারা বলেন,—সত্য নাই, মিথ্যা নাই, শুভ নাই, অশুভ নাই, সুন্দর নাই, কুৎসিৎ নাই, মানুষ আপনার মনোভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য চিরব্যগ্র। মনোভাবকে মনোরম করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই রচনা চরিতার্থ হইল; সেই ত কলা, সেই ত আর্ট; প্রকাশের পূর্ণতার মধ্যেই আর্টের সার্থকতা।

কিন্তু কোনও জিনিষ ত এমনি খণ্ড করিয়া দেখা যায় না। ভাব ও রূপ, আর্ট ও আইডিয়া, দেহ ও প্রাণের মত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া আছে। একটা তারে ঘা পড়িলে আর একটা তার বাজিয়া উঠে। ভাব মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়; মনকে যাহা স্পর্শ করে, তাহা শুধু রূপ নয়, তাহা মূর্ত্ত-ভাব।

অবিন্যস্ত ভাবপুঞ্জকে আমরা সাহিত্য বলিতে পারি না। কথার রচনা যখন গঠন মূর্ত্তি ও শ্রীর গুণে আর্ট হইয়া ওঠে, সাহিত্যের দরবারে তখনই সে প্রবেশাধিকার পায়। বিষয়-গৌরবে হীন হইয়া রচনা আর্টের প্রসাদে সাহিত্য পদবী লাভ করিতে পারে, তাহা কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়। সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগেও অধিকার-ভেদ আছে। উচ্চ-নীচের বিচার শুধু সামাজিক নয়, সাহিত্যিক ব্যাপারও বটে।

সারঙ্গী-বাদক

শিল্পী—শ্রীমনীষী দে

শ্রাবণ, ১৩৩৫

সাহিত্যে আধুনিকতা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আধুনিক ফ্যাসনের পক্ষপাতী লেখকদলের সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা ও বিচার প্রণালীর মধ্যে একটা অস্পষ্টতা, একটা বিশৃঙ্খলা আছে। তাহারা বলিবার সময় বলে, আমরা কি বলিতেছি বিচার করিও না, আমাদের রচনা কেমন হইল, সেই কথা বল। আমাদের লেখার মধ্যে শক্তি আছে কি না, আমরা কিছু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি কি না, তাহাই তোমাদের বিবেচ্য। আমাদের রচনার বিষয়-বস্তুর উপর নজর দিবার প্রয়োজন নাই, উহা অনধিকার চর্চ্চা।

কিন্তু লিখিবার সময় তাহারা সেই সব উপকরণ সংগ্রহ করে, যাহা কদর্য্য কুৎসিৎ, যাহা এতদিন সাহিত্যে ও সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। এবং ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছি কি না এই প্রশ্ন তুলিয়াও তর্কক্ষেত্রে বলিয়া ফেলে, বিষয় নিরাবরণ বাস্তব হইতেই গ্রহণ করা উচিত, বিষয়-নির্ব্বাচনে নির্ব্বিচার হইলে চলিবে না, এই নিয়ম মানা হয় নাই বলিয়া, অলীক হইয়াও আদর্শ রোমান্স্ প্রেম ও সুরুচি—কথা ও কাব্য সাহিত্যে এত আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

কথা হইতেছে, প্রকাশ-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া এই দল যদি নিজেদের রচনা বিচার করাইতে চায়, তাহা হইলে বাস্তবের দোহাই দেওয়া চলিবে না। উপাদান-নির্বিশেষে আর্ট-হিসাবে সেই সব রচনা সার্থক কি অসার্থক, তাহাই হইবে বিচার্য্যের বিষয়। সেইখানে আসিবে তাহাদের ক্রটি দেওয়ার কথা তাহাদের প্রাদেশিকতা, বিশেষণের অপপ্রয়োগ, পূর্ব্ববঙ্গীয় রূপকথায় ব্যবহৃত historic presentএর অশ্রান্ত অপব্যবহার, আকস্মিক উচ্ছ্বাস, সূক্ষ্মাংশ ও সমগ্রের অসামঞ্জস্য, রসাভাস, রসের ব্যাভিচার এবং বিকৃত অলঙ্কার প্রয়োগ প্রভৃতির কথা।

যদি বাস্তবের ব্যবহারকেই তাহারা সাহিত্যের নিরিখ বলিয়া ধরে, তাহা হইলে সেইখানেই বিষয়-বস্তুর বিচার আসিয়া পড়িতে হইবে। সেখানে আর্টের কথা গৌণ, মুখ্য হইল যে সব ভাব ও অভিজ্ঞতা লইয়া তাহারা কারবার করে—তাহার বিচার, তাহার পরীক্ষা; সেই সব আইডিয়া সুন্দর কি কুৎসিৎ, সুস্থ কি রুগ্ন, ব্যবহার্য্য কি অব্যবহার্য্য গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, সৎ কি অসৎ, নিত্য কি ক্ষণিক, বিশ্বজনীন কি প্রাদেশিক, ইহা আলোচনা করিতে হইবে; দেখিতে হইবে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, কামনার আতিশয্য, শরীরের লালসা, যৌন-মিলনের তাড়না শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উপাদান কি না, এবং যদিই বা হয়, তাহার মাত্রা কি, কতটা পরিমাণেই বা তাহার ব্যবহার করা যায় এবং কোন্ ধরণে ব্যবহার করিলেই বা তাহা দোষের হয় না।

গদাধরচন্দ্র দুধ ও তামাক দুই-ই খাইত। তাই বলিয়া গদাধরচন্দ্রের অনুকরণে আধুনিকেরা একই নিঃশ্বাসে ভাবের দুধ ও আর্টের তামাকের দোহাই পাড়িতে চাহিলে, লোকে শুনিবে কেন? তখন আর বলিলে চলিবে না, কলাবস্তুর মধ্যে সুনীতিও নাই, দুর্নীতিও নাই, তা হইল নীতির অতীত। Oscar Wildeএর মত যাহারা রূপের কারবারী তাহারা বলিলেও বলিতে পারে, 'Art is neither moral nor immoral, it is simply non-moral.' কিন্তু যাহারা বাস্তবের কথা পাড়ে, জীবনের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেয়, তাহাদের পক্ষে অহেতুক প্রকাশ-কামনার বড়াই করা শোভা পায় না। সত্য কথা বলিতে গেলে, সাহিত্যের প্রকৃতি-বিচারে কোন ক্ষেত্রেই art for art's sakeএর দোহাই পাড়া চলে না। সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য—সকল শিল্প, সকল কলার বিচারকালে আসিয়া পড়ে দুটি জিনিষ, প্রথম—তাহার রূপ, দ্বিতীয়—তাহার বস্তু। এ কথা সত্য, ভাবপুঞ্জের সম্যক্ বিন্যাসে, যথাযথ সংস্থানে যে ভুল করিয়াছে, বিষয় বস্তুকে যে সুষ্ঠু আকার দিতে পারে নাই, সে সাহিত্যিক নয়, সাহিত্য-বিচারে তাহার রচনা আলোচ্য নয়। কিন্তু আর্টই সাহিত্যের শেষ কথা নয়। যে বস্তু লইয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, সে বস্তুর মর্য্যাদা বা মাহাত্ম্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে Classicism, Romanticismএর কোন অর্থ থাকিত না; এখানে রূপ ও বিষয়ের মধ্যে শেষোক্ত বস্তুটি অল্প প্রাধান্য লাভ করে নাই। কবিকঙ্কণ ও মাইকেলের প্রভেদ শুধু আর্টে, রূপে, গঠনে নয়, বিষয়, ভাব, অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও কল্পনার বিভেদও বিশেষরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যে আধুনিকতা অতি সামান্য কথা। পিতামহের আমল ছাড়াইয়া আমরা যে অনেক বাড়াইয়া গিয়াছি, এ ধারণা সব যুগেই অল্পাধিক আছে। পুরাতনের তরে কাঁদুনি ও নূতনের সম্পর্কে আস্ফালন—এক বৃন্তের দুই ফুল। বিক্রমাদিত্যের সভা নিজেদের কালের গৌরব করিত, তাই বলিয়া ভোজরাজের সভাসদগণের মনেও নিজেদের যুগের গর্ব্ব কিছু কম ছিল না। পোপ মনে করিত সেক্‌সপীয়র বর্ব্বর যুগের শক্তিশালী লেখক। Congreve, Wycherlyকে লোকে Marlowe, Ben Jonson, এমন কি Shakespeareএর চেয়ে বড় নাট্যকার মনে করিত; ড্রাইডেন, পোপকে মিল্‌টনের চেয়ে বড় কবি মনে করিত। তবু অষ্টাদশ শতাব্দী ত ইংরেজি সাহিত্যে গরিষ্ঠ যুগ বলিয়া গণ্য হইল না। সব যুগেরই বৈশিষ্ট্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই যে তাহা শ্রেষ্ঠ হইবে এমন কোন কথা নাই। এমন কি বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও তাহা নিকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পোপ ড্রাইডেন নিকৃষ্ট লেখক নয়; সেক্‌সপীয়ার মার্লোর তুলনায় তাহারা কোথায় পড়িয়া আছে তাহা ত সাহিত্য-রসিকের কাছে অবিদিত নাই।

'আমরা আধুনিক' অর্থে আমরা কতকগুলি অস্পৃষ্ট-পূর্ব্ব জিনিষ লইয়া সাহিত্য রচনা করিতে বসিয়াছি। অস্পৃষ্ট শেষে অস্পৃশ্য না হইয়া পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা ভাল। কিন্তু ইহারই জন্য যদি চীৎকার করা যায়, "দেখ, দেখ, কি অপূর্ব্ব উপকরণ লইয়াই না আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি!" তাহা হইলে বলিতে হয়, "ঠিক কথা, নাকুর বদলে নরুণ তোমরা পাইয়াছ, এমন কি নরুণ ও চিঁড়ার পরিবর্ত্তে পরের বৌ পাওয়াও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহাতে তোমরা যে কর্ত্তিত-নাসা সে অপবাদ ত ঘুচিবে না।" হইয়াছেও তাই। প্রেমের জায়গা কাম আসিয়া দখল করিয়াছে, পদ্মের স্থান পঙ্ক আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

পদ্ম ও পঙ্কের পুরাণো দৃষ্টান্তটি এখানে পুরাপুরি রকমেই খাটে। পদ্মের জন্মস্থান পঙ্ক, তাই বলিয়া দেবতার পূজায় অথবা মানুষের ভোগে পদ্মের পরিবর্ত্তে পাঁককে কাজে লাগাইলে দেবতা সন্তুষ্ট হন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মানুষ ক্ষেপিয়া ওঠে। প্রেমের উৎপত্তি কামে। তাই বলিয়া প্রেম কাম নহে। এ রস যে আদি তাহাতে সন্দেহ করি না, এমন কি ইহা অনাদিও হইতে পারে, তাই ইহাকে অনন্ত করিয়া তুলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

জীবন ও জগতের সর্ব্বক্ষেত্র হইতেই সাহিত্য রস আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। জ্ঞান ও কর্ম্মের সর্ব্ব বিভাগ হইতেই অসংখ্য স্রোতোধারা আসিয়া সাহিত্যের বিপুল প্রবাহে মিশিয়াছে। মানুষের একটা সামাজিক পরিচয় সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া ইতিহাস বহুদিন নাট্য ও কথা-সাহিত্যের উপাদান জোগাইয়াছে। নৃতত্ত্ব প্রাণিতত্ত্বের উপরও কিছু দিন ধরিয়া সাহিত্যের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন ও ছাড়া পায় নাই। সাইকো-এনালিসিস্ হইতে এখন যদি রসদ সংগ্রহ করা যায়, সাহিত্যের তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই। ঠিক কথা। তবে ভয়ের কথা এই, সত্যের সন্ধান করিতে গিয়া রস পাছে পলাতক হয়, উপাদান-সম্ভারের বোঝার তলে সাহিত্যকে পাছে হারাইয়া বসি।

বিজ্ঞান তথ্যের ভিতর দিয়া এবং দর্শন তত্ত্বের ভিতর দিয়া সত্যের সন্ধান করে। কিন্তু সাহিত্য চায় আনন্দ। আনন্দের প্রতিষ্ঠা রসে। রসের উৎস হৃদয়ে। সত্য সুন্দর কল্যাণের সহিত যেখানে হৃদয়ের যোগ নাই, সেখানে রচনা ব্যর্থ। জ্ঞান দিয়া রচনা করা যায় বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্য—কলকব্জা, রেডিও, এরোপ্লেন, ফিগার, গ্রাফ, নক্সা প্রভৃতি। এ সব রচনার মূলে রহিয়াছে বিশ্লেষণের প্রভাব। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে সংশ্লেষণী প্রতিভা। সাহিত্যে বিজ্ঞান ততটুকু চলিতে পারে, যতটা পরিমাণে বিজ্ঞান সাহিত্যরসের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। তত্ত্বের উপর যেখানে সাহিত্যের নির্ভর, বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকারে সেখানে সাহিত্যও ব্যাহত হয়। বানরের বংশে নরের উদ্ভব শুনিয়া বালক-চিত্রকর মানুষকে সলাঙ্গুল করিয়া আঁকিতে পারে। মনো-বিকলনশাস্ত্রে উদাহরণ পাইয়া মনের ছবি আঁকিতে সে যদি মনোভাবের সঙ্গে একটা গোটা অরূপান্তরিত ইডিপাস কমপ্লেক্স জুড়িয়া দেয়, সাহিত্য ও সাইকো-এনালিসিসের অবস্থা তখন সমান সঙ্গীন হইয়া ওঠে।

সাহিত্যে আধুনিকতা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সমস্যা-সমাধান বা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্য মনকে রঞ্জিত করে, নন্দিত করে, উদ্বুদ্ধ করে, উন্নত করে। কিন্তু সত্যের সহিত বিরোধে যেখানে সেই আনন্দ ক্ষুণ্ণ হইবার অর্থাৎ সত্যের অপলাপে যেখানে রসহানি হইবার সম্ভাবনা, সেখানে সত্যকে অবিকৃত, অবিচলিত, স্বপ্রতিষ্ঠ রাখিতে হইবে। আবার অন্যদিকে সমাজ-ব্যবস্থার কোন-কোন দিক চিরাচরণের ফলে মনের উপর এত দৃঢ় হইয়া বসিয়াছে, কাব্য, গাথা, শাস্ত্র, প্রথা, রীতি, ব্যবহার সেই গুলিকে এমনি মহিমার পরিমণ্ডলে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে যে সত্যের খাতিরে তাহাদের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলেই রসহানি অনিবার্য্য। আজকাল তাত্ত্বিকদের ছাড়িয়া সত্যনিরূপণের উদগ্র রোখ সাহিত্যিকদের পাইয়া বসিয়াছে। রসও তাই তত্ত্ব-ঘন হইয়া উঠিতেছে, ক্রমে ক্রমে কাঠিন্য লাভ করিয়া বরফিতেও পরিণত হইতে পারে।

দু'রকম সাহিত্য-স্রষ্টা আছে। একধরণের লেখক যুগ-সাহিত্যিক। বর্ত্তমানের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, বেদনা, ফ্যাসন, সমস্যা তাহাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। বিশেষভাবে যুগোপযোগী ভাবের সাক্ষাৎ পাই তাহাদের সাহিত্যে। যেমন টেনিসন্। আর একধরণের রচয়িতা আছে, সমসাময়িক ঘটনা তাহাদের মনকে আলোড়িত করিলেও তাহারা সময়কে অতিক্রম করিয়া যায়, নির্দ্দিষ্ট কালের বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ নাই। যুগ তাহার গণ্ডী ও বৃতি দিয়া তাহাদের বেষ্টন করিয়া নাই। একদিক দিয়া তাহারা অতীত হইতে আহরণ করিতে ভয় পায় না, অন্যদিক দিয়া ভবিষ্যতের ভাব, অনুভব, চিন্তা, জিজ্ঞাসা তাহাদের রচনার ভিতর দিয়া মূর্ত্ত হইয়া ওঠে। কালিদাস, গোটে, রবীন্দ্রনাথ এমনিধারা চিরদিনের সাহিত্যিক।

সাহিত্যের বিষয় সমগ্র জীবনের সম্যক্ আলোচনা!

স্মৃতিরঞ্জিত অতীত ও আকাঙ্খারঞ্জিত ভবিষ্যৎ লইয়া সাধারণত হু'গো, বঙ্কিম, স্কট ও শীলারের মত রোমাণ্টিক লেখকের কারবার। রবীন্দ্রনাথ বা টলষ্টয় এই ধরণের রোমান্স্ রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের ব্যবসায়ী হইয়া ইঁহারা অসাধারণ-সাধারণের অভিব্যক্তা। সংসারের এই দিকটি রসময়, রঙীন, অসামান্য; ইহার সুখ ও বেদনা সূক্ষ্মতর, তীব্রতর, নিবিড়তর। জীবনের এই অংশের এক মুহূর্ত্তের আনন্দ ও ব্যথার প্রেরণায় মানুষ সহসা মরিতেও পারে, আবার ক্ষণিকের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া দুঃসহ জীবন দীর্ঘকাল বহিতেও পারে। শরৎচন্দ্রও রিয়ালিষ্ট নন্, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে শরৎচন্দ্র বাস্তব-রোমান্স্-পন্থী! সামান্য বাস্তবের কবির আবির্ভাব আজও আমাদের দেশে হয় নাই। Zolaর মত ঔপন্যাসিক সকল দেশেই বিরল। সাহিত্যের এই শূন্য অংশ পূর্ণ করিবার কাজে একদল লেখক আজ উৎকট উৎসাহে লাগিয়া গেছে। যে অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও আত্মীয়তা এই সাহিত্যকে সত্য ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারিত, তাহার অভাবে তথাকথিত আধুনিক সাহিত্য একান্ত কৃত্রিম অসরল ও অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু চাষার কাহিনী কহিয়া ও মজুরের গজল গাহিয়া বাস্তব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে যাওয়ার মত হাস্যকর ঘটনা দুনিয়ায় দুর্লভ; সেই অভাব দলবদ্ধ সাহিত্যিকেরা সত্যই পূর্ণ করিয়াছে। এই সব সাময়িক রচনার ভাষা ও বাক্‌প্রয়োগ-ভঙ্গীর উৎকটতা চীৎকার করিয়া প্রাণের দৈন্য ও ভাবের কৃত্রিমতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। যে আত্মীয়তা ও ঐক্যবোধ অন্তরের অনুভবকে মানব-সাধারণ করিয়া মনের মধ্যে সহানুভূতির আবেগ জাগাইয়া দেয়, তাহার অভাবে এই একান্ত mannerism-দুষ্ট সাময়িক সাহিত্য রচনা নিতান্ত কপট কষ্টকল্পিত ও কাল্পনিকতা-ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যে সমবেদনায় ব্যাকুল হইয়া গ্রাম্য কবির কণ্ঠ কাঁদিয়া বলিয়াছে;—

"স্বপ্নের হাসি, স্বপ্নের কান্দন, নয়ান চান্দে গায়,
নিজের অন্তরের দুস্কু পরকে বুঝানো দায়।"

সেই একাত্মতা-সঞ্জাত সহানুভূতির অভাবে, এই কুলি-মজুর, জেলে-চাষার কাহিনী ও কবিতা-সম্বলিত রচনাবলী একান্তভাবে বিকৃত কথা ও ছন্দিত ছড়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আধুনিক সাহিত্যে বাস্তব লইয়া খেলা—ঐ সহরের ছেলেদের village-reorganisationএ যাওয়ার মত; মনের

মধ্যে ইচ্ছা আছে অনেক, কিন্তু সে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করিয়া তুলিবার সামর্থ্যেরও অভাব, পথও জানা নাই।

তবুও ইহা আশার কথা। কর্কশ বাস্তবের একটা বিষয়গত ঋজু মহিমা আছে। কোন কোন লেখক যে অন্তরে এই মহিমা উপলব্ধি করে নাই, তাহা বলি না। তাছাড়া যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা খানিকটা বাঁচাইয়া লেখে। ভয় এখানে নয়, ভয় অন্য দিকে।

সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতে এতদিন ধরিয়া মদনকে অতনু করিবার চেষ্টাই চলিয়া আসিতেছিল। এই অনঙ্গ কাম বর্ব্বর সারল্যকে সভ্য এবং সভ্যতাকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। আজ সেই অনঙ্গকে শারীর স্থূলতায় বিকৃত করিবার আয়োজনে যাহারা লাগিয়াছে, কাজ তাহাদের কঠিন নয়, ফল তাহার কুৎসিৎ! যাহা আমাদের সাধারণ প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ, তাহাকে আমরা বলি বিজাতীয়, ম্লেচ্ছ। এই ম্লেচ্ছ মনোভাব সাহিত্যকে আজ আবিল করিয়া তুলিয়াছে। ক্লিন্ন কামনার কুৎসিৎ মূর্ত্তি, আবরণহীন বীভৎস কদর্য্যতা, ম্লেচ্ছ মোহের উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস, শারীর অতৃপ্তির ক্রুদ্ধ জ্বালা, দৈহিক দুষ্ট আকাঙ্ক্ষার ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস, উলঙ্গ লালসার নির্ল্লজ্জ অভিব্যক্তি, রক্তশিরা-সঙ্কুল চর্ম্মাবরণের অন্তর্বিপর্য্যাস,—সাহিত্যের রসলোককে আজ কামবিলাসের প্রেতলোকে পরিণত করিয়াছে।

সরকারী স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীরা ক্রমাগত ভয় দেখাইতেছেন, বিত্তাধরী মজিয়া গেল বলিয়া। বিত্তাধরী মজিলে সহরের নর্দ্দামায় প্লাবন বহিবে। আমাদের সাহিত্যের পয়ঃ-প্রণালীতেও প্লাবন উপস্থিত। বিত্তাধরী-মজানো লেখক ও কবির দল সাহিত্যের পদ্মবনে ময়লার প্রবাহ না বহাইয়া ছাড়িবেন না।

এই সব চিত্রবীর্য্য বিচিত্রবীর্য্যের দল রুগ্ন মনের অসংযত আতিশয্যে সাহিত্যিক সৌকুমার্য্য এবং কলাগত কমনীয়তাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া পুরুষত্বহীন পৌরুষকে পূজার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছে।

সাহিত্যের মৎস্য-হট্টে সাড়া পড়িয়া গেছে, আমিষের তীব্র গন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রুদ্ধ কোলাহল এবং আবিল জলের অজস্র প্রক্ষেপে সে হাট মৎস্যজীবীর বাস্তব স্বর্গে পরিণত।

চাঁপা ফুলের উগ্র গন্ধে মাতাল হইয়া বিস্তারিত ফণা সাপের মত হৃদয়ের চাপা প্রবৃত্তি তার আদিম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গানের কলির তালে তালে দুলিতে দুলিতে অনির্দ্দিষ্ট কামনাময়ীর উদ্দেশে বার বার ফুঁসিতেছে, 'প্রিয়ে, প্রিয়ে, প্রিয়ে!'

ভয় এইখানে।

এক একটা রাত্রি আসে, যে রাত্রে আরসুলার পক্ষ-শব্দে গৃহ শব্দিত এবং গাত্র-গন্ধে বাতাস গুরু হইয়া ওঠে। একটা—আর একটা—আরো একটা, এমনি করিয়া অজস্র জীবের উড়িবার সাড়া পড়িয়া যায়। সে রাত্রে শান্তি সুদূর ও নিদ্রা পলাতক হইয়া ওঠে, তবু উপায় থাকে না। গৃহের সমস্ত সম্মার্জ্জনীর সঞ্চালন বিফল করিয়া চঞ্চল পক্ষ-ধূননের ঐক্যতান উঠিতে থাকে। আরসুলারা ভাবে, আমাদের পক্ষ প্রবল না হইলে কি এতগুলি সম্মার্জ্জনীর আন্দোলন প্রয়োজন হইত? এ যে আজ আরসুলার মহোৎসব রাতি?

আমাদের যদি প্রদীপ্ত জীবন থাকিত, বারম্বার প্রহত হইয়াও যদি মেরুজয়ে যাত্রা করিতাম, গৌরীশঙ্কর অভিযান করিতাম, আকাশকে আত্মীয় করিতে বিমানে উঠিতাম, বানরের ভাষা শিখিতে আফ্রিকার অরণ্যকে গৃহ করিতাম, শারীর যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া আজীবন রেডিয়ামের পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিতাম, সীমাহীন সাগরে বাষ্পতরী চালনা করিতাম, দুর্ম্মদ রণক্ষেত্রে যুযুৎসু সৈন্য চালনা করিতাম, এক কথায়—আমরা যদি সবল হইতাম, দুঃসাহসী হইতাম, স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে হয়ত এমন সব খেয়াল আমাদের পক্ষে অশোভন হইত না। কেন না সবলের রিরংসার মধ্যেও এক রমণীয় ভীষণতা আছে। দুর্ব্বলের লালসা সে ক্ষেত্রে ধিক্কৃত বিরাগের উদ্রেক করে মাত্র। সিংহ ও অজের কামনার উন্মাদে প্রভেদ আছে।

সাহিত্য স্থির নয়। যুগে যুগে সে বিবর্ত্তিত হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। বিচিত্ররূপে সে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবন লইয়া যাহার কারবার, স্থাণু হইয়া থাকিবার তাহার অবসর কোথায়! সাহিত্যের গতি আছে। সত্য কথা।

সাহিত্যে আধুনিকতা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সাহিত্যের যেমন একটি গতি আছে, তেমনি একটি প্রকৃতি আছে। এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন নাই, বৈলক্ষণ্য নাই, বিকার নাই। সাহিত্যের এই চিরন্তন প্রকৃতি জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-অনুভূতি দিয়া রচিত, রসে অভিষিক্ত।

সাহিত্যের এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে, সাময়িক সুখ্যাতি অথবা প্রাকৃত জনের প্রশংসা সে পাইলেও পাইতে পারে। রচনা তাহার সাহিত্য নহে, রস-জগতে তার স্থায়িত্ব নাই। প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া যে ইহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, আপন করিতে পারিয়াছে, সাহিত্যের জয়-টীকা তাহার ললাটেই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। কালিদাস তাই অমর, চণ্ডীদাস তাই মধুর, শেলী তাই সুন্দর, গ্যেটে তাই শ্রেষ্ঠ, হুগো তাই জয়ী।

সাহিত্যে আধুনিকতা খুব বড় কথা নয়। কালের চরণে সাহিত্যের অর্ঘ্য—চিরন্তন আনন্দের দান। সাহিত্যকে আমরা চিরদিন যেন রসের উৎস বলিয়া মনে রাখিতে পারি। হৃদয়ের শাশ্বত আনন্দলোকে যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাকে যেন ক্ষণিকের মোহের মধ্যে বিসর্জ্জিত না করি।

"চণ্ডীদাস প্রেম　　নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।"

সাহিত্যও এমনি নিকষিত হেম। উৎকৃষ্ট ছাড়িয়া নিকৃষ্টে যেন আমাদের মতি না হয়।

"অমিয়া ছানিয়া　　যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে।"

সাহিত্যও এমনি অমিয়া। রসিকজনই রসের অনুমান করিতে পারে। আমরা মত্ত হইতে চাই না, অমৃতের সন্তান আমরা কাব্যের অমৃত পান করিয়া অমর হইতে চাই।

চীনে হিন্দু সাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

হুয়েন-সাঙ।

তাঙ্ রাজত্বের সময় হইল চীনা ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। ৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুই সম্রাট্ ইয়াংতির মৃত্যুর পর সাত জন তাঁহার সিংহাসন দাবী করিলেন। ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে Taiyuan এর শাসনকর্তা লিউয়ান্ (Liyuan) অন্য সকলকে পরাভূত করিয়া চাঙ্আনে আপনাকে একছত্র সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঙ্ রাজত্ব (৬১৮ হইতে ৯০৭ পর্য্যন্ত) প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। পূর্বকার ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলেই আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি যে তাঙ্ রাজগণের সকলেরই বৌদ্ধধর্মের প্রতি সমান সহানুভূতি ছিল না। এই দীর্ঘ তিনশত বৎসরের মধ্যে কখনও বা বৌদ্ধধর্মের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল, কখনও বা অল্পাধিক বাধার মধ্য দিয়া ইহাকে চলিতে হইয়াছিল। তবে সাধারণভাবে তাঙ্রাজাগণ বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। তাঙ্রাজত্বের প্রবর্ত্তক লি-উয়ান বা কাওৎসু স্বয়ং ছিলেন কুংফুৎসু মতাবলম্বী। তিনি রাজা হইয়াই আদেশ প্রচার করিয়া দেন যে পাখীর পক্ষে ডানা যেমন প্রয়োজন, মাছের যেমন জল প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন প্রত্যেক চীনবাসীর কুংফুৎসুর মত গ্রহণ করা। রাজ-ঐতিহাসিক ফু-তি ছিলেন গোঁড়া কুংফুৎসুবাদী, বৌদ্ধ-ধর্মকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। রাজা, তাঁহার পরামর্শে বৌদ্ধদিগের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের জীবন-যাত্রা প্রণালী অনুসন্ধান কবিবার জন্য আদেশ দিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে যাঁহাদের চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাঁহাদিগকে বড় বড় কতকগুলি বিহারে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিহারগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাওৎসু সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র তাওৎসুং (Tao Tsung) সম্রাট্ হন। চীনের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্দিগের মধ্যে তাওৎ-সুং অন্যতম। বহু দেশ জয় করিয়া ও বহু দেশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ইনি চীনকে নানাদিক্ দিয়া সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। তিব্বতের প্রথম শ্রেষ্ঠ রাজা Srong-Sam-Jampoর সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাও-ৎসুং তিব্বতের সহিত চীনের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি ইনি বিরূপ ছিলেন না, আবার সাক্ষাৎভাবে তেমন উৎসাহও প্রদান করিতেন না।

কিছুকাল ধরিয়া চীনে ভারতীয় শ্রমণ তেমন অধিক আসেন নাই, অন্তত তাঁহাদের আসার বিবরণ পাওয়া যায় না। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাকর মিত্র নামক এক হিন্দু শ্রমণ চীনে আসেন। তিনি ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয়, নালন্দা হইতে আসেন। প্রভাকর মিত্র তিনটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁহার তিনটী অনুবাদের মধ্যে দুইটী গ্রন্থ পূর্বে অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার রত্নধারণীসূত্র হইল ধর্মরক্ষের অনূদিত মহাবৈপুল্য মহাসন্নিপাতসূত্রের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। আর্য্যদেবের টীকা সমেত নাগার্জুনের মধ্য-মককারিকা কুমারজীব ৪ খণ্ডে ইহার পূর্বে অনুবাদ করেন। কুমারজীব অনুবাদ সংক্ষেপে করিতেন। তাঁহার অনুবাদটী সংক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রভাকর পুনরায় ৮ খণ্ডে মধ্যমকশাস্ত্রের অনুবাদ করেন। কুমারজীব প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের আলোচনা আমরা করিয়াছি।

প্রভাকরের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ হইল অসঙ্গের মহাযান-সূত্রালঙ্কারটীকার। পণ্ডিতপ্রবর লেভী মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। কারিকা ও টীকাসমন্বিত সমগ্র গ্রন্থখানিই অসঙ্গের রচিত। অসঙ্গ ছিলেন মহাপণ্ডিত, কিন্তু অশ্বঘোষের ন্যায় সুলেখক নন। গ্রন্থখানির শেষ দুই অধ্যায়ে তিনি বুদ্ধের পূর্ণতার মহিমা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

বর্ণনা করিয়া শেষে একটী গাথা দিয়া উপসংহার করিয়াছেন। তাঁহার এই বিশদ বর্ণনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের অপেক্ষা পাণ্ডিত্যেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল নবম অধ্যায়ে যেখানে বুদ্ধত্বের ধারণা সুস্পষ্ট করিবার জন্য তিনি তাঁহার কল্পনাকে অবাধে মুক্তি দিয়াছেন সেখানেই তাঁহার রচনা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

প্রভাকরের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না। তাহার পর আসে হুয়েনসাঙ্-এর যুগ। চীন ও ভারতের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ঘনিষ্ঠতার সূত্রটী রচিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্যে হুয়েনসাঙএর স্থান কোথায় তাহানির্ণয় করিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। আমরা হুয়েনসাঙ্কে কেবলমাত্র পর্য্যটক হিসাবে জানি, কিন্তু হিন্দু-সাহিত্য-প্রচারে তাঁহার স্থান কত বড় তাহা আমরা জানি না।

৬০০ খ্রীষ্টাব্দে 'চেন হুই' পরিবারে হুয়েনসাঙএর জন্ম হয়। এই পরিবারের সকলেই গোঁড়া কুংফুৎসু-মতবাদী ছিলেন। হুয়েন সাঙ্ চার ভাইএর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। পিতা ও অন্য শিক্ষকদিগের নিকট ভাইদের সঙ্গে হুয়েনসাংও প্রাচীন চীনা প্রথায় শিক্ষালাভ করেন, প্রাচীন সাহিত্য তিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। শৈশব হইতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার রচনা যে সহজ সুন্দর হইয়াছিল তাহা কতকটা তাঁহার এই শিক্ষার ফলে। হুয়েন সাঙএর দ্বিতীয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। হুয়েনসাঙ্-এর বয়স তখন অল্প। জ্যেষ্ঠের সহিত নানা বিহারে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ভিক্ষুদিগের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মন বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অলক্ষ্য প্রভাব তিনি রোধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষুর ব্রত অবলম্বন করেন। ইহার পর চীনের বিভিন্ন স্থানের বিহারে যাইয়া তিনি সুপণ্ডিত ভিক্ষুদিগের নিকট বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল কিন্তু চীনা অনুবাদের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন না। মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য ও শাক্যমুনির জীবনধারায় পূতপবিত্র স্থানগুলি দেখিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদিগের পদতলে বসিয়া তাঁহাদের সাহায্যে তাঁহার মনের সংশয় দূর করিবার বাসনা তাঁহার প্রবল হয়।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চাঙ্আন হইতে হুয়েন সাঙ্ ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঙ্ বংশের দ্বিতীয় সম্রাট তখন রাজত্ব করিতেছেন। হুয়েনসাঙ্ রাজার অনুমতি লইয়া যান নাই, তাঁহার ভয় ছিল পাছে রাজা তাঁহাকে যাইতে বাধা দেন। হুয়েনসাঙএর যাত্রার কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহ কেহ আসেন, কিন্তু মরুভূমির নিকট হুয়েনসাঙ্ যখন পৌছান, তখন তাঁহার সহিত মাত্র দুইজন সঙ্গী অবশিষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে সেখান হইতেই তিনি চীনে পাঠাইয়া দিলেন, অপর জন তুন্‌হুয়াং পর্য্যন্ত যান; তাহার পর আর তাঁহার কোনও সন্ধান মিলে না। Turfanএ যাইয়া হুয়েনসাঙ্ তথাকার রাজার নিকট সাদর সম্ভাষণ লাভ করেন। রাজা তাঁহার সহিত যাইবার জন্য চারিজন শিষ্য সঙ্গে দেন ও মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের রাজাদিগের নিকট তিনি হুয়েনসাঙএর পরিচয়পত্র প্রদান করেন। ইহার ফলে হুয়েনসাঙ পথে সর্ব্বত্রই সমাদর লাভ করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া কণৌজের অধিপতি হর্ষের নিকট তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করেন। ভারতের বহু পণ্ডিত ও সাধকের সাক্ষাৎলাভের সুযোগ তাঁহার ঘটে। মহাযানবাদের কেন্দ্রভূমি নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিলাভদ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার নিকট কিছুকাল তিনি সংস্কৃত ও বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করেন। হুয়েনসাঙ্ যখন ভারতে আসেন তখন ভারতে মহাযান মতেরই অধিক প্রভাব; তবে স্থানে স্থানে হীনযানবাদেরও প্রচলন ছিল।

ষোল বৎসর পরে ভারত ভ্রমণান্তে হুয়েনসাঙ্ ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে ফিরিয়া আসেন। তিনি দেশে পৌছিবার পরদিন

বিভিন্ন বিহার হইতে বহু শ্রমণ সমবেত হইয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে ইংফু বিহারে লইয়া যান, সেখানে তিনি ভারত হইতে আনীত দ্রব্যসম্ভার সযত্নে রক্ষা করেন। তৎপরে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের নিকট গমন করেন। সম্রাট আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লন এবং সাগ্রহে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। রাজার ইচ্ছা ছিল যে হুয়েনসাং তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ শক্তি রাজকার্য্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু হুয়েনসাংএর মন সেদিকে ছিল না। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব আপনাকে নানাবিধ চিত্তবিক্ষেপ হইতে সম্বৃত করিয়া লইয়া ভারত হইতে আনীত গ্রন্থগুলির অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অনুরোধে রাজা গ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদন কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত ও কয়েকজন জ্ঞানী শ্রমণকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অপর-দিকে রাজার অনুরোধে তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার হস্তে দেন। তবে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বস্তুত এই ভ্রমণকাহিনী তিনি সম্পূর্ণ করেন। রাজা ইহার একটী প্রশস্তিপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়াছেন।

হুয়েনসাংএর ভ্রমণকাহিনীর তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ আমরা পাই। প্রথমটী হইল তাঁহার নিজের লিখিত গ্রন্থ ফা-তাং-সি-উই-চি (Fa-Tang-Hsi-Yui-Chi) ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এক শিষ্য ইহা সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৮টী স্থানের উল্লেখ আছে; তাহার মধ্যে ১১০টী স্থানে তিনি স্বয়ং গিয়াছিলেন, অবশিষ্টগুলি সম্বন্ধে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করেন। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী-দিগের আচার ব্যবহার ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ না করিলে চলে না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত Julien হুয়েনসাঙএর ভ্রমণ-কাহিনীর ফরাসী অনুবাদ করেন। অনুদিত গ্রন্থটীর নাম Memoires Surles contrees Occidentales. ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাওসুয়ান্ নামক হুয়েনসাঙএর এক শিষ্য ও সহকর্মী Shih-Chia-Fan-Chu নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শাক্যমুনির জন্মভূমির বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। Julien এই গ্রন্থেরই ফরাসী অনুবাদ করেন।

তৃতীয় সংস্করণ যেটী আমরা পাই সেটী হইতেছে একটী ইংরাজী অনুবাদ। হুইলি (Hui li) নামক এক শ্রমণ ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দশ খণ্ডে হুয়েনসাংএর এক জীবনকাহিনী লিখেন।

ইয়েন সাং নামক এক ব্যক্তির Hsi-Yu-Chuan নামক অপর একটী গ্রন্থের কথা আমরা শুনিতে পাই। এই গ্রন্থে ধর্ম্মের ইতিহাস তেমন বিস্তৃতভাবে নাই, কিন্তু ভারতীয় জীবনযাত্রার চিত্র ইহাতে অতি বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। হুয়েন সাঙএর নিজের লিখিত গ্রন্থে ধর্ম্মের দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। তাওসুয়ান্ লিখিত যে গ্রন্থটীর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম (Julien যাহার ফরাসী অনুবাদ করেন) সেই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে হুয়েন-সাঙ্এর নিজের লেখা গ্রন্থ ও ইয়েন সাঙ্এর গ্রন্থ দুইটাই অতি বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের পাঠের জন্য সংক্ষেপে তিনি তাঁহার গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইয়েন-সাঙএর এই গ্রন্থের কোনও ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হয় নাই, কিন্তু পূর্ব এশিয়া ও ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করি-বার জন্য ইহার অনুবাদ নিতান্তই প্রয়োজন। হুয়েনসাঙ্এর ভ্রমণকাহিনীগুলি অমূল্য রত্নের ন্যায় সমাদরের সহিত চীন-বাসীগণ গ্রহণ করিলেন। ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিয়া তাঁহারা আপনা দিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

হুয়েন সাঙ্ চাঙ্ আনে যাইয়া ভারতীয় গ্রন্থসমূহ অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। বার জন শ্রমণ তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। নয়জন ভিক্ষুকে লইয়া একটী সভা গঠিত হয়, ইঁহারা অনুবাদগুলি পুনরায় দেখিয়া শুনিয়া দিতেন; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন তাঁহারা অনুবাদ কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেন। একপ্রস্থ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া সম্রাটের হস্তে দেওয়ার পর সম্রাট সেগুলির ভূমিকা লিখিয়া দেন। উনিশ বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে কায করিয়া হুয়েনসাঙ্ ৭৫টী গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ৬৬৪

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। এই সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক কুড়িটী অশ্বের উপর বোঝাই করিয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ, মূর্ত্তি ও নানাবিধ স্মারক-দ্রব্য ভারত হইতে স্বদেশে আনেন। স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত বুদ্ধের নানাবিধ মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন শাখার মোট ৬৫৭টী গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে আনেন।

হুয়েনসাঙ্ ছিলেন যোগাচারশাখাভুক্ত, কিন্তু সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য তিনি সাগ্রহে আলোচনা করিতেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যে ৭৫টী গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন তাহার মধ্যে নানাবিষয়ক গ্রন্থ ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন চিন্তাশীল দার্শনিক; সুতরাং তাঁহার অনূদিত ৭৫টী গ্রন্থের মধ্যে ৪০টী হইল বিভিন্ন শাখার অভিধর্ম বা দার্শনিক গ্রন্থ। চীন সাহিত্যে এই সকল গ্রন্থ তাঁহার অমূল্য দান। এগুলির বিষয় আমরা ক্রমশঃ বলিতেছি।

হুয়েনসাংএর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ হইল প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের সম্পূর্ণ অনুবাদ। কুমারজীব প্রসঙ্গে আমরা প্রজ্ঞাসাহিত্যের ইতিহাস ও চীনে তাহার বিস্তারের কথা কিছু বলিয়াছি। কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ হুয়েনসাংএর পূর্বে আর হয় নাই। হুয়েনসাংএর পাণ্ডিত্য ছিল যেমন অগাধ তেমনি ধর্মে ছিল তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা। সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের ক্লান্তিকর পুনরুক্তিগুলি তাঁহার সরল ভাষায় সুন্দরভাবে নিষ্ঠার সহিত তিনি অনুবাদ করেন। প্রজ্ঞাপারমিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ ৬০০ খণ্ডে বিভক্ত।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থমালার বিস্তারিত বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। মদীয় গ্রন্থে এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। এই প্রজ্ঞাগ্রন্থমালায় দুইজন সম্রাট্ লিখিত দুইটী ভূমিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট তাওৎসাং ও তাঁহার পুত্র কাওৎসাং দুইজনই তাঁহাদের লিখিত ভূমিকায় হুয়েনসাংএর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে পণ্ডিত প্রবরের কাজ স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিয়াছে।

প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্র, বিমলকীর্ত্তি-নির্দেশ, সুখাবতী-ব্যূহ ও সন্ধিনির্মোচনসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলি হুয়েনসাং অনুবাদ করেন। পূর্বে কুমারজীব ও অন্যান্য আচার্য্যগণ কর্তৃক এসকলের অনুবাদ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সূত্র গ্রন্থও হুয়েনসাঙ সর্বপ্রথম চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল ভৈষজ্যগুরুবৈদূর্য্যপ্রভাসপূর্বনিদান। গ্রন্থখানি চিকিৎসা ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ক। চীনে এই প্রকার গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর হয়। তবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি হুয়েনসাং এই সকল সূত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ অনুবাদের জন্যই তাঁহার অধিক খ্যাতি। সর্বাস্তিবাদ শাখার ও যোগাচার শাখার অভিধর্ম গ্রন্থগুলিই প্রধানত তিনি অনুবাদ করেন।

সর্বাস্তিবাদের প্রভাব এক সময় সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সম্পূর্ণ একটী ত্রিপিটক ইহার ছিল। ইহার দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর এই চারিটী আগমেরই চীন ভাষায় অনুবাদ হয়। সর্বাস্তিবাদ বিনয়েরও চীনা অনুবাদ হয়। ইহার অভিধর্ম কেহ কেহ পূর্বে অনুবাদ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সর্বাস্তিবাদের সম্পূর্ণ অভিধর্ম গ্রন্থ হুয়েনসাঙই প্রথম অনুবাদ করেন; সর্বাস্তিবাদের সমগ্র দার্শনিক মতটী তিনিই চীনবাসীর নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। সর্বাস্তিবাদ নাম হইতে বুঝা যায় যে এই মতে বাহ্য, আভ্যন্তরিক সকল বস্তুরই অস্তিত্ব ও সত্ত্বা স্বীকার করা হয়। সর্বাস্তিবাদী বলেন প্রত্যেক বস্তুরই একটী স্থায়ী সত্ত্বা আছে। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের এক শতাব্দীর মধ্যে বৈশালীতে এক সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বজ্জিয়ান ভিক্ষুদিগের দশটী মত খণ্ডন করা। এই সভার বাক্‌বিতণ্ডার ফলে বৌদ্ধ সঙ্ঘ পৃথক্ পৃথক্ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। সর্বাস্তিবাদ হইল তাহাদের মধ্যে একটী। ইহার সূচনা তখন হইলেও বস্তুত ইহা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে তৃতীয় শতাব্দীতে—রাজা অশোকের সময় পাটলীপুত্রে যে সভা হয় তাহার পর হইতে। পাটলীপুত্রের সভায় মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স সেই যুগের মতগুলি একে একে খণ্ডন করিবার নিমিত্ত তাঁহার 'কথাবত্থু' সঙ্কলন করেন বলিয়া প্রবাদ। তখনও কিন্তু সর্বাস্তিবাদ তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই।

বুদ্ধের মৃত্যুর ৬০০ বৎসর পরে কাত্যায়নী পুত্র নামক কাশ্মীরের এক সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু সঙ্ঘ পুনর্গঠন করিতে প্রয়াস পান। তিনিই প্রথম জ্ঞান প্রস্থান নামক গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা সঙ্কলন করেন। তাহার পর ছয়জন ব্যক্তি এ গ্রন্থের ছয়টী পাদ রচনা করেন; প্রত্যেকটী পাদে লেখক উক্ত গ্রন্থের বিষয়টী পুনর্বার আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ মত ব্যক্ত করেন। হুয়েনসাং মূল গ্রন্থখানি ও ছয়টী পাদের পাঁচটি অনুবাদ করেন। এই ছয়টী পাদ ভিন্ন জ্ঞান প্রস্থানের বহু ব্যাখ্যা রহিয়াছে। মহাবিভাষা ইহাদের মধ্যে প্রধানতম।

জ্ঞান প্রস্থানের দুইটী চীনা অনুবাদ আছে। ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌতম সঙ্ঘদেব একটী অনুবাদ করেন, অপরটী হুয়েনসাংএর। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। সম্ভবত মূল গ্রন্থখানিরই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পাঠ ছিল; অনুবাদগুলির কোন কোন স্থানে অমিল থাকিলেও মূলগত কোন প্রভেদ নাই। সঙ্ঘদেবের অনূদিত গ্রন্থটীর নাম অষ্টগ্রন্থ। হুয়েনসাঙএর গ্রন্থের নাম জ্ঞান-প্রস্থান। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে কাত্যায়নীপুত্র কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, একে একে ক্রমশঃ সেগুলির মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। হুয়েনসাং এই প্রশ্নগুলি অধিকাংশ স্থলে বাদ দিয়াছেন; তাহাতে গৌতম-সঙ্ঘদেবের অপেক্ষা তাঁহার অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে।

সর্বাস্তিবাদ দর্শনের ভিত্তি কাত্যায়নী পুত্রের এই জ্ঞানপ্রস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাত্যায়নী পুত্রের পূর্বে কেবল ধর্ম ও বিনয় ছিল, বৌদ্ধধর্মের দর্শন বা অভিধর্ম ছিল না। শাক্যমুনির বাণীর মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত ছিল, কিন্তু তাহা দার্শনিক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণ। প্রত্যেক ধর্ম্মের ইহাই নিয়ম। মহাপুরুষগণ ধ্যানলব্ধ যে বাণী প্রচার করিয়া যান তাহাই হইল ধর্ম। ক্রমশ সেই ধর্মে যাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই দল বা সঙ্ঘকে পরিচালিত করিবার জন্য কতকগুলি নীতির প্রয়োজন হয় তাহাই হইল বিনয়। তাহার পর ক্রমশঃ যুক্তি দ্বারা সেই বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিয়া সংশয়বাদীর সংশয় দূর করিয়া দর্শন তাহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। অভিধর্ম হইল ধর্মের অভিমুখে যাহা লইয়া যায়, যুক্তি দ্বারা মনকে তৃপ্ত করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ করিয়া তোলে। কাত্যায়নী পুত্র বৌদ্ধধর্মের দর্শন প্রথম গ্রন্থাকারে সঙ্কলন ও লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে নিকটে বা দূরে যে কেহ বুদ্ধের বাণী পূর্ব্বে যাহা কিছু শুনিয়াছেন প্রত্যেকে তাঁহার নিকট যেন তাহা ব্যক্ত করেন। প্রায় পাঁচশত অর্হৎ ও পাঁচশত বোধিসত্ত্ব তাঁহার এই সঙ্কলন কার্য্যে সহায়তা করেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল বাণী চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করেন। সূত্র ও বিনয়ের সঙ্গে যে মতগুলির বিরোধ ছিল না সেগুলি তিনি গ্রহণ করিলেন, অন্যগুলি বর্জন করিলেন। তৎপরে এক একটী মত-প্রতিপাদক উক্তিগুলি এক একটী বিভাগের মধ্যে ফেলিলেন। এইরূপে আটটী বিভাগ বা অধ্যায় হইল। এই কারণেই ইহার নাম অষ্টগ্রন্থ। গ্রন্থটীর মধ্যে বস্তু ও মন (ভূত ও চিত্ত) ও তৎপ্রাসঙ্গিক (ভৌত ও চৈত্ত) অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। প্রয়োজন মত যথাযথ বর্ণনা ও বিভাগ দ্বারা আলোচ্য বিষয়টীকে সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের নাম করিতেছি :—

সংযোজন (মানবের প্রবৃত্তিগুলির যোগ সূত্র), জ্ঞান, কর্ম, চতুর্মহাভূত, ইন্দ্রিয়, সমাধি ও দৃষ্টি।

জ্ঞান প্রস্থান হইল মূলগ্রন্থ—ইহা হইল কায়। ইহার ছয়টী পাদ রহিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ছয়টী পাদ ব্যতীত ইহার বহুসংখ্যক বিভাষা বা টীকা রহিয়াছে। হুয়েনসাং এই সকল গ্রন্থের অনেকগুলি অনুবাদ করিয়াছেন।

ছয়টী পাদের প্রথমটী হইল সঙ্গীতিপর্য্যায়। এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সংখ্যাগত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন একোত্তর ধর্মে মানবের একটী সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা, প্রত্যেক মানব অন্নের দ্বারা জীবনধারণ করে। দ্বিধম পর্য্যায়ে নাম ও রূপ এই

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

দুইটী সত্যের উল্লেখ রহিয়াছে। ত্রিধম পর্য্যায়ে তিনটী তিনটী করিয়া কতকগুলি ধর্মকে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন ত্রি-অকুশল মূলাধর্ম হইল লোভ, দ্বেষ, মোহ; তেমনই ত্রিকুশল মূলধর্ম, ত্রিদুশ্চরিত, ত্রিস্থবির, ত্রিবেদনা ইত্যাদি। এইরূপে চতুধর্মপর্য্যায়, পঞ্চধর্মপর্য্যায় করিয়া দশধর্ম পর্য্যায় পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে। যশোমিত্রের স্ফূটার্থ নামক ভাষ্য গ্রন্থে দেখা যায় যে মহাকৌষ্টিল হইলেন সঙ্গীতিপর্য্যায়ের লেখক। তিব্বতী পণ্ডিত Bustonএর মতও তাই। চীনা পণ্ডিতগণ বলেন সারিপুত্র হইলেন সঙ্গীতিপর্য্যায়ের লেখক। এই দুইজনের মধ্যে কেহই এই গ্রন্থের লেখক হওয়া সম্ভব নয়, কারণ দুইজনই বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য। গ্রন্থের একস্থানে বলা হইয়াছে যে সারিপুত্র বুদ্ধ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া এই দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—এই উক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নাই। বস্তুত বজ্জিয়ান ভিক্ষুকদিগের দশটী বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিবার জন্য বুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে কোনও ব্যক্তি সুযুক্তি-পূর্ণ ভাষায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রকরণ পাদ হইল জ্ঞান প্রস্থানের দ্বিতীয় পাদ। হুয়েনসাঙ ইহার অনুবাদ করেন। তাঁহার দুইশত বৎসর পূর্বে গুণভদ্র ও বুদ্ধযশ এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। —বসুমিত্র ইহার রচয়িতা। হুয়েনসাঙ বলেন পুষ্কলবতী বিহারে বসুমিত্র এই গ্রন্থ লিখেন। সঙ্গীতিপর্য্যায়ে বিষয়গুলি সংখ্যাগত ভাবে সাজান হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রশ্নগুলি আলোচ্য বিষয়ানুসারে আটটী প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে রূপ, চিত্ত, চৈত্তধর্ম, চিত্তবিপ্রযুক্ত সংস্কার ও অসংস্কৃত ধর্ম—এই পাঁচটী ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মজ্ঞান, অন্বয়জ্ঞান, পরচিত্তজ্ঞান, সম্বৃতিজ্ঞান, দুঃখজ্ঞান প্রভৃতি দশটী জ্ঞানের প্রভেদ দেখান হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, গন্ধ, শব্দ, রস প্রভৃতি বারটী আয়তন বা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের বিবরণ রহিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টাদশ ধাতু, দ্বাদশ আয়তন, পঞ্চ স্কন্ধ, দশমহাভূমিকাধর্ম, দশ কুশলমহাভূমিকা, দশক্লেশমহাভূমিকা ও দশ উপক্লেশভূমিকা এই সাতটী বিভাগের প্রভেদ দেখান হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বিষয় বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে সকল বস্তু ধারণার অন্তর্গত তাহাদের প্রভেদ করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে শিক্ষাপাদ, শ্রামণ্যফল, আর্য্যবংশ, ঋদ্ধিপাদ প্রভৃতি এক সহস্র বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা হইয়াছে। অষ্টম ও শেষ অধ্যায়ে সমগ্র বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে।

বিজ্ঞানকায় হইল সর্বাস্তিবাদ দর্শনের তৃতীয় পাদ। গ্রন্থটীর নামের অর্থ সম্ভবত বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিষয় সমূহের সমষ্টি। দেবশর্মা ইহার লেখক এইরূপ অনুমান করা হয়। হুয়েনসাঙএর মতে শ্রাবস্তীর নিকট বিশোক নামক স্থানে দেবশর্মা এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চতুর্থপাদ হইল ধাতুকায়। চীনা পণ্ডিতদিগের মতে বসুমিত্র হইলেন ইহার রচয়িতা। হুয়েনসাঙএর শিষ্য Kweichi বলেন যে গ্রন্থখানির একাধিক সংস্করণ ছিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংস্করণে ৬০০০ শ্লোক ছিল; তৎপরে একজন পণ্ডিত ইহার দুইটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেন, একটীতে ৯০০ শ্লোক, অপরটীতে ৫০০। হুয়েনসাঙএর অনুবাদে ৮৩০টী শ্লোক রহিয়াছে; ইহা দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবাদ।

দুই খণ্ডে গ্রন্থটী বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ, প্রভৃতি দশমহাভূমিকাধর্ম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিদ্যা, প্রমাদ, প্রভৃতি দশক্লেশমহাভূমিকাধম, তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা প্রভৃতি দশ উপক্লেশ-ভূমিকা, চতুর্থ অধ্যায়ে কামলোভ, রূপলোভ, প্রভৃতি পাঁচটী অন্যায়, পঞ্চম অধ্যায়ে সৎকার, অন্তগ্রাহ, মিথ্যা প্রভৃতি পাঁচটী দৃষ্টি, ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিতর্ক, বিচার, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচটী ধর্মের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ষোলটী অধ্যায় রহিয়াছে; তাহাতে পাঁচটী বেদনা, ছয়টী বিজ্ঞান, দুই অকুশলাভূমি প্রভৃতি অষ্টআশীটী বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের সহিত যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে; এগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থখানির স্বরূপ কি তাহা আমরা কিয়ৎপরিমাণে ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি।

সর্বাস্তিবাদ অভিধর্মের পঞ্চম পাদ হইল ধর্মস্কন্ধ। Ching-mai নামক এক পণ্ডিত হুয়েনসাঙ্‌কে এই গ্রন্থ অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে অভিধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মস্কন্ধই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ। ছয়টি পাদের মধ্যে ইহা একটী পাদ বলিয়া ধরা হয় বটে, কিন্তু বস্তুত মূল গ্রন্থ জ্ঞান প্রস্থানের অপেক্ষা ইহা কোনও অংশে হীন নহে। মহামৌদ্গল্যায়ন হইলেন ইহার রচয়িতা। একুশটী অধ্যায় ইহাতে আছে। প্রথম অধ্যায় হইল শিক্ষা-পাদ। দ্বিতীয় অধ্যায় হইল শ্রোতাপত্তাঙ্গ অর্থাৎ শ্রোতাপন্নের অবস্থাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায় হইল অবেত্যপ্রসাদ অর্থাৎ পবিত্রতা প্রাপ্তি। বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ ও শীল—এই চারিটী বিষয়ে কিরূপে পবিত্রতা রক্ষা করিতে হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায় হইল শ্রামণ্যফল। পঞ্চম অধ্যায় অভিজ্ঞাপ্রতিপদ্। ষষ্ঠ অধ্যায় হইল আর্য্যবংশ; বুদ্ধের শিষ্যবৃন্দের আর্যবংশ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃত জয় কি কি তাহাই দেখান হইয়াছে। এইরূপ জয় চারিপ্রকার। যে মন্দ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার দূরীকরণ হইল প্রথম, যে মন্দ ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহার পথরোধ করা হইল দ্বিতীয় জয়; যে শুভ আগত তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন তৃতীয় ও ভবিষ্যতে শুভ আনয়ন করিবার প্রচেষ্টা হইল চতুর্থ। অষ্টম অধ্যায়ে ঋদ্ধিপাদের উপায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। উপায় চারিটী হইল সমাধি, বীর্য্য, স্মৃতি ও অচন্দ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিনাশ। নবম অধ্যায় হইল স্মৃত্যুপস্থান—বা ধ্যানের বিষয়। প্রথম ধ্যানের বিষয় কায়ানুপাস্থনা অর্থাৎ দেহের অপবিত্রতা সম্বন্ধে ধ্যান। দ্বিতীয় বিষয় হইল বেদনানুপাস্থনা, তৃতীয় চিত্তানুপাস্থনা, চতুর্থ ধর্মানুপাস্থনা। বেদনানুপাস্থনা অর্থাৎ বেদনার (Sensation) অশুভ ফলাফল সম্বন্ধে ধ্যান। চিত্তানু-পাস্থনার অর্থ চিন্তার উদ্ভব সম্বন্ধে ধ্যান। ধর্মানুপাস্থনা হইল ধৃতি বা স্থিতির নিমিত্ত বিষয়ক ধ্যান। দশম অধ্যায় আর্য্যসত্য-সম্বন্ধীয়। একাদশ অধ্যায়ে ধ্যানের রূপ ও প্রণালী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে চারি প্রকার 'অপ্রমাণ' (Immeasurable) এর বিবরণ রহিয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায় অরূপ সম্বন্ধীয়। চতুর্দ্দশ অধ্যায় ভাবনা সমাধি বিষয়ক—অর্থাৎ ভাবনা (Reason) শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত ধ্যান। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সাতটী বোধ্যঙ্গ (বোধিজ্ঞানের শাখা) উল্লিখিত হইয়াছে। ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে নানাবিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ অধ্যায়ে বাইশটী ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বারটী আয়তনের উল্লেখ ও ঊনবিংশতি অধ্যায়ে পাঁচ স্কন্ধের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। বিংশতি অধ্যায়ে নানাধাতু (Principles) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একবিংশতি অধ্যায়ে দ্বাদশ প্রতীত্য-সমুৎপাদের উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থটীর বিষয়-নির্দ্দেশের দ্বারাই কিছু পরিমাণে বুঝা যায় কিরূপ সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্ব সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। হুয়েনসাঙ্‌ উল্লিখিত পাঁচটী পাদই অনুবাদ করিয়াছিলেন; ষষ্ঠপাদ প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্রের অনুবাদ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। ধর্মরক্ষ এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন; তিনি ছিলেন ১০০৪ হইতে ১০৫৮র মধ্যে। গ্রন্থটীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। হুয়েন সাঙ্‌এর সময় খুব সম্ভব এইগ্রন্থ সম্বন্ধে কাহারও জানা ছিল না।

সর্বাস্তিবাদ অভিধর্মের এই প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি ব্যতীত হুয়েনসাঙ্‌ এই শাখার আরও কতকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি মূলগ্রন্থটী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা যায়। মহাবিভাষা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মহাবিভাষা জ্ঞানপ্রস্থানের সটীক ব্যাখ্যা। বিভাষার প্রকৃত অর্থ বিকল্প (Option)। সম্ভবত উল্লিখিত ৫০০ জন অর্হৎ যে সকল বিভিন্ন মত সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে উত্তম যে গুলি সেইগুলি বাছিয়া লওয়া হয়; তন্নিমিত্তই গ্রন্থটীর নাম মহাবিভাষা দেওয়া হইয়াছে। চীনাপণ্ডিতগণ বলেন যে উহাতে নানাপ্রকার মতামত দিয়া সমগ্রভাবে দর্শনটীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম মহাবিভাষা। এইরূপ প্রবাদ যে কনিষ্কের সভায় বিভাষাগুলি সঙ্কলিত হয়। কাহারও মতে অশ্বঘোষ ইহার সঙ্কলন ও সংশোধন কার্য্যের সহিত যুক্ত। হুয়েনসাঙ্‌ লিখিয়াছেন যে কনিষ্কের সময় যে সভা হয় তাহাতে সূত্রগুলির উপর একটী উপদেশ ও বিনয়ের উপর একটী বিভাষা প্রণীত হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল

অভিধর্ম প্রণয়ন। কাশ্মীরের এই সভায় বসুমিত্র নামক জনৈক ব্যক্তি ছিলেন সভাপতি। তিনিই এই বিভাষা প্রণেতা এইরূপ মনে করা হয়। মহাবিভাষা গ্রন্থটীতে বস্তুত বৌদ্ধদর্শন সমগ্রভাবে পাওয়া যায়। ইহাকে বলা যায় বৌদ্ধ-দর্শনের বিশ্বকোষ (Encyclopaedia)। তদানীন্তন ও তাহার পূর্বের নানা বিভিন্ন মত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে ও অতি সুন্দর ভাবে সে গুলির সমালোচনা করা হইয়াছে। সেই সময় কয়েকজন দার্শনিক ছিলেন, তাঁহাদিগকে বলা হইত অভিধর্মমহাশাস্ত্রী। এই পণ্ডিতদিগের তুইটী দল ছিল। গ্রন্থখানিতে এই তুইদলের এক পক্ষকে কাশ্মীরী-শাস্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অপর পক্ষকে বলা হইয়াছে গান্ধার-শাস্ত্রী। পরবর্ত্তী কালে এই কাশ্মীরী বৈভাষিকগণই ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রাধান্য লাভ করেন।

বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষের অনুবাদই হইল হুয়েন সাঙ্-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ। বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অভিধর্মকোষই শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মরীচিকা

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

কোথা সন্ধান? পেয়েছ কি দেখা
　　কভু পদ-রেখা তার,
ধরণীর চির কামনা-কমলে,
　　ঢালে যে গন্ধভার?
যুগ যুগ ধরি' যারে খুঁজে ফিরি'
　　মানবের মনোরথ,
তুস্তর মহা মরুভূর বুকে
　　হারায়ে ফেলেছে পথ,
পুন তার খোঁজ?—সে শুধু স্বপ্ন!
　　উন্মাদ অহমিকা!
অধরে সে ধরে মায়া সুধারস;—
　　মরীচিকা! মরীচিকা!

বুদ্ধ, কণাদ কৃষ্ণ হয়তো
　　পেয়েছিল এককণা,—
মণির ঝলকে ভুলিল পলকে
　　ফণির গরল-ফণা!
বলে গেল ভাই! মোরা রেখে যাই
　　সেই মহাপথ-রেখা;—
মৃত্যু-বিজয়ী শাশ্বত এই
　　মুক্তি সাধন-লেখা!
কোথা নির্ব্বাণ?—তবুতো ফুটিল
　　কমলে কামনা-শিখা!
—শুধু মনে হ'ল, বৃথা ও স্বপ্ন!
　　মরীচিকা! মরীচিকা!

পাখীর কাকলী, ফুলের গন্ধ
　　তটিনীর কলতান,—
ধরণীর বুকে ধরা পড়ি' শুধু
　　জাগায় মাধবী-গান!
সব চায় নিতি করিতে মধুর,
　　এ ধরার বুকখানি;—
সে শুধু ক্ষণিক; শুষে ফেলে দেয়
　　ঊষর মরুভূ, জানি!
ঢলে যৌবন!—কোথা সে স্বপন?
　　—আকাশের নীহারিকা,—
ধ্বংশ-বিজয় সাধনে সে শুধু
　　মরীচিকা! মরীচিকা!

লাইপজীগ

শ্রীহীরেন্দ্র বসু

বহুকাল যাবৎ জগৎ-বিখ্যাত মেলার জন্য লাইপজীগ্ সহর বিখ্যাত। প্রতি বৎসর মার্চ্চ ও আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে দুইবার এই সহরে মেলা বসে। সেই সময় পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহু সংখ্যক বণিক, দর্শক ও ক্রেতা এই স্থানে সমাগত হয়। ভারতবর্ষ হইতেও বনিকগণ ঐ সময় এই স্থানে আগমন করেন। মেলার সময় অসংখ্য লোকের সমাগম হেতু এখানকার রেলষ্টেসন ঘর অতি বৃহৎ করিয়া গঠিত করা হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে এই ষ্টেসন-ঘর বৃহত্তম বলিয়া খ্যাত। ইহার দুইটী হলঘরে অনায়াসে ফুটবল খেলা চলিতে পারে বলিয়া বোধ হয়।
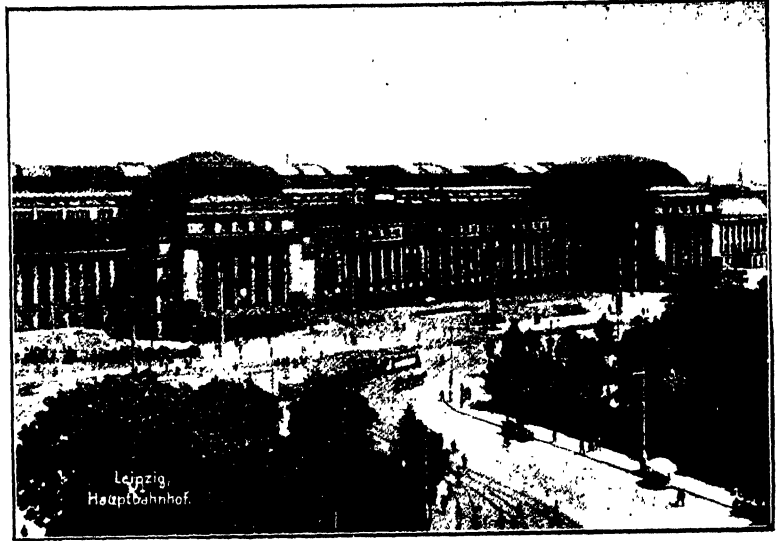
লাইপজীগ রেল-ষ্টেসন

অতি প্রাচীনকাল হইতে এইসহর মধ্য-জার্ম্মানীর বিদ্যা ও শিল্প বিষয়ক প্রধান কেন্দ্রস্থান। গত ১৯০৯ সালে ইহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চ-শত বার্ষিক অধিবেশন হইয়া-গিয়াছে। এই স্থানে গেটে (Goethe) শীলর (Schiller) প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত মনীষিগণ বিদ্যালাভ করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষার জন্যও এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ। স্থানীয় জগৎবিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যালয় বহুকাল যাবৎ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।
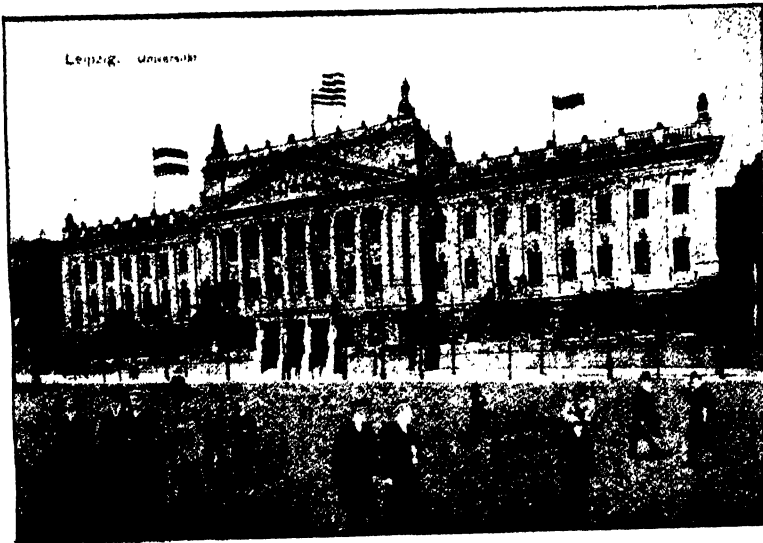
লাইপজীগ বিশ্ববিদ্যালয়

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টো-বর এইস্থানে বিশ্ববীর নেপোলিয়ন

শ্রীহীরেন্দ্র বসু

প্রাসিয়ানদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত সেই সমরক্ষেত্রের উপর একটী সুবৃহৎ স্মৃতি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সমর প্রাঙ্গণে এককালে অসংখ্য বীরের দেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে অধুনা মেলার নিমিত্ত সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

সমর স্মৃতি-স্তম্ভ

পুস্তক মুদ্রণ ও ঐ সংক্রান্ত সমুদায় শিল্পের জন্য এখনও লাইপজীগ জার্ম্মানির প্রধান কেন্দ্র। সমগ্র জার্ম্মান প্রদেশে যত পুস্তক মাসিকপত্র ইত্যাদি মুদ্রিত হয় তাহাদের এক এক খণ্ড এই স্থানের সুবৃহৎ পুস্তকগৃহে রক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতেও বহু পুস্তকাদি এই স্থানে মুদ্রিত হইতে আসে। মুসলমান-দিগের কোরাণ গ্রন্থ বহুসংখ্যায় এইস্থানে মুদ্রিত হয়, কিন্তু প্রথমে ঐ গ্রন্থ মিশরে প্রেরিত হয় এবং তথায় পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়া তৎপরে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।
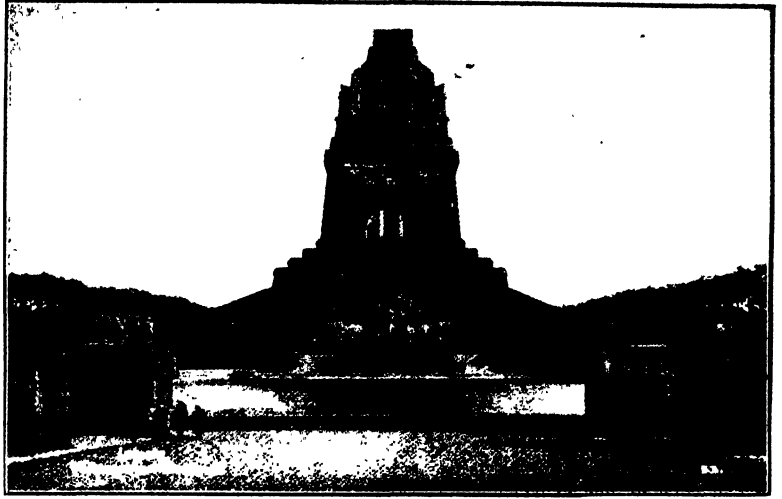
রাত্রিকালে গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যালোচনা করিবার জন্য মেঘমুক্ত আকাশ এদেশে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই অসমদর্শিতায় অসন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্মবীর জার্ম্মান-গণ কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাদের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক প্রশস্ত বৃত্তাকার গৃহে
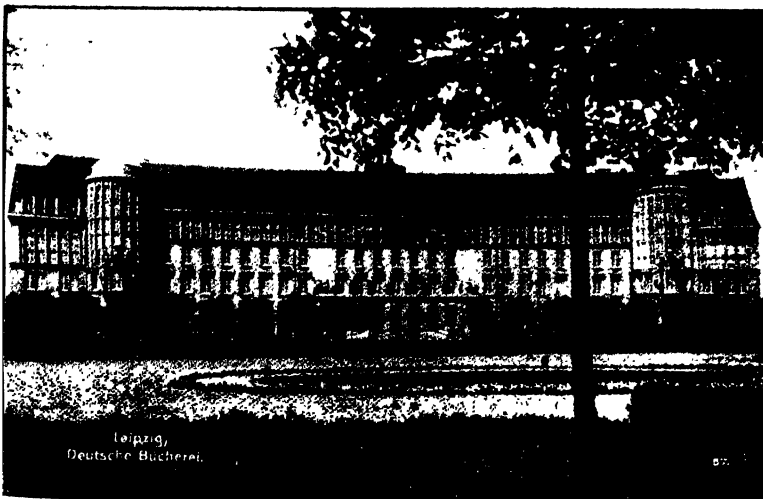
লাইপজীগ পুস্তক গৃহ

বৈদ্যুতিক আলোক সংযোগে এক কৃত্রিম সৌরজগৎ নির্ম্মাণ করা হয় এবং উপস্থিত দর্শকদিগকে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিক্রম, ঋতু-পরিবর্ত্তন এবং ঐসংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই গৃহমধ্যে আসিলে মনে হয় যেন আমরা সত্যসত্যই অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এক আকাশতলে অবস্থান করিতেছি। এই গৃহের

প্ল্যানেটারিয়ম বা নক্ষত্রগৃহ

নাম Planetarium বা নক্ষত্র গৃহ। জার্ম্মানীর অধিকাংশ প্রধান সহরেই এই প্রকার নক্ষত্রগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অধুনা ইংলণ্ডেও এই প্রকার নক্ষত্রগৃহ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

স্মৃতিরত্নের কাশীযাত্রা

—গল্প—

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

(১)

আশ্বিন মাসের রমণীয় প্রভাত। বৃক্ষে লতায় আকাশে বাতাসে শরতের শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শঙ্করনাথ স্মৃতিরত্ন প্রাতঃস্নানান্তে স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণে পুষ্প চয়ন করিতেছেন। কুন্দ, মল্লিকা, জবা, সেফালিকা, করবী, অপরাজিতা, দোপাটী ফুলে সাজি ভরিয়া তিনি পূজা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায় আবৃত্তি শেষ করিয়া "ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদঃ।" বলিয়া দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

পূজাগৃহে তাঁহার বিধবা কন্যা বিমলা দেবী তাঁহার পূজার জন্য চন্দন ঘসিতেছিল। তিনি আসনে উপবেশন করিলে বিমলা বলিল—"বাবা চণ্ডীর এই অধ্যায়ে শুম্ভের দূতের সহিত দেবীর কথোপকথন বড় ভাল লাগে।"

স্মৃতিরত্ন একটু হাসিয়া বলিলেন—"মা, তুমি উহার ভাবার্থ সব বুঝিতে পার?"

কন্যা বলিল—"শুম্ভ বলিতেছেন—মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ—ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম কথান্য শেষতঃ" শুম্ভের মধ্যে এই "অহং" "মম" ভাবটা অত্যন্ত প্রবল। ইহা দেখিয়া হাসি পায়।"

স্মৃতিরত্ন—"প্রবল হবে না? শুম্ভ যে দৈত্যেশ্বর, অসুর যোনিতে তার জন্ম। গীতার সেই অসুর সম্পদের কথা একবার স্মরণ কর। "ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সাদৃশো ময়া।"...আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, বলবান্ ও সুখী — আমার মতন আবার সংসারে কে আছে?" এই ত আসুরিক মনোবৃত্তির লক্ষণ। শুম্ভের মধ্যে এই আসুরিক ভাবটা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় সে দেবতাদিগের পীড়ন আরম্ভ করিল। তাই দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অসুরের বিনাশ সাধন করিলেন।" বিমলা বলিল—"কিন্তু বাবা, সব সময়ে কি মা জগদম্বা এইরূপে অসুরের দর্পচূর্ণ করেন? আমরা ত দেখিতে পাই কত কত অসুর এই সংসারে দর্পভরে বিচরণ করিয়া কত লোকের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে ত তিনি দমন করেন না?"

"সময় হইলে অবশ্যই দমন করিবেন। মা সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রীর ন্যায়বিচারে বিশ্বাস কর।" এই বলিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় পুষ্পপাত্রে ফুলগুলি সাজাইতে লাগিলেন। বিমলা চন্দন ঘসা শেষ করিয়া বলিল, "বাবা আজ চাল বাড়ন্ত।"

স্মৃতিরত্ন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—"গৃহে তণ্ডুল নাস্তি—কালিদাসের সেই কথা! মা, ভাবনা কি? মা অন্নপূর্ণা না খাওয়াইয়া পারিবেন না।" এই বলিয়া তিনি আচমন করিয়া পূজায় বসিলেন।

বৃদ্ধ শঙ্করনাথ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তাঁহার শিষ্য যজমান অনেক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের অনেকেই ক্রিয়াকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। শিষ্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই দীক্ষা গ্রহণ করেন না, আবার কেহ কেহ সোজা পথে মুক্তি লাভের আশায় সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়াছিলেন। কয়েক বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর আছে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিতান্ত ভাল মানুষ বলিয়া তাঁহার বর্গাদারগণ ফাঁকি দিয়া অধিকাংশ ফসল ভোগ করে, অতি অল্প পরিমাণই তাঁহাকে দেয়। বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী আছে, আগে ১০।১২টি ছাত্র থাকিত এখন কমিতে কমিতে মাত্র তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতির জন্য দূরদেশ হইতে অনেক ছাত্র আসে, কিন্তু তিনি আহারদানে অসমর্থ বলিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র গৌরীনাথ

ব্যাকরণ শেষ করিয়া ইংরেজী পড়িতে গিয়াছে, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন ইংরেজী পড়া ভিন্ন তাঁহাদের অর্থাভাব দূর হইবে না। তাঁহার কন্যা বিমলা অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, এখন তাহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিয়াছেন। বিমলা পরম সুন্দরী, তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য জ্ঞানালোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব রূপবতী করিয়াছে। সেই সৌন্দর্য্যের উপর ব্রহ্মচর্য্যের লাবণ্য প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে অসাধারণ জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়াছে। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রায়ই বলিয়া থাকেন,—"মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, তাই ইহার জীবনে সুখ হইল না।"

(২)

পূজা শেষ করিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় বাহিরের চতুষ্পাঠী গৃহে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার ছাত্রগণ আগেই পুস্তক হস্তে সেখানে বসিয়াছিল। তাহারা উঠিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিল। তিনি হুঁকা হস্তে ধূমপান করিতে করিতে তাহাদিগকে পাঠ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা দেশবিখ্যাত জমিদার ধরানাথ রায় চৌধুরীর কর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে সব-ম্যানেজার হরেন্দ্র বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয়! আমাদের জমিদার বাবু আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনাদের জমিদার বাবু এখন কোথায়?"

"আজ্ঞে, তিনি রাজধানী ছাড়িয়া এই দিকেই ভাওয়ানিয়া নৌকায় আসিতেছেন। কাল শ্যামনগরের কাছারিতে পৌছিবেন। আমরা আগে আসিয়াছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন "আমার নিকট কি প্রয়োজন বলুন।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"আমাদের জমিদার বাবুর বড় ছেলে রণজিৎ বাবু বারিষ্টারি পড়িবার জন্য তিন বৎসর পূর্ব্বে বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। জমিদার বাবু তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিতে ইচ্ছা করেন, সে সম্বন্ধে দেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতেছেন। এই দেখুন অনেক পণ্ডিতেই মত দিয়াছেন, কিন্তু আপনি হইতেছেন এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, আপনার মত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। তাই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, আর প্রণামীও কিঞ্চিৎ পাঠাইয়াছেন।"

এই বলিয়া হরেন্দ্র বাবু দুইশত টাকার নোট স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পদপ্রান্তে রাখিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার হাত হইতে অন্যান্য পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্রখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কাগজখানির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"এই সকল মত গ্রহণের প্রয়োজন কি?"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"আমার বলিবার তাৎপর্য্য এই, দু চারি শ টাকা খরচ করিলেই যখন অনুকূল ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তখন এই সকল ব্যবস্থার মূল্য কি?"

হরেন্দ্র বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন "আজ্ঞে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই সমাজের নেতা, তাঁহাদের মতের একটা মূল্য আছেই ত?"

"কিন্তু সমাজে থাকিয়া যাহারা অসংখ্য পাপাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে কেহ আটকাইতেছে কি? এই ধরুন আপনার জমিদার বাবু। বিলাত ফেরতগণ বিলাতে যাইয়া যে সকল অনাচার করে, তিনি ত ঘরে বসিয়াই সে সকল করিতেছেন। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, সুরা পান ইত্যাদি শাস্ত্রে যে সকল মহাপাপ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার কোনটাই ত তিনি বাকি রাখেন নাই।"

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয়! মাপ করিবেন। আমার মনিবের নিন্দা শুনিতে আপনার নিকট আসি নাই। আপনি তাঁহাকে এ সকল পাপকার্য্য করিতে দেখিয়াছেন কি?"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

"দেখার প্রয়োজন হয় না। জগতে অনেক বিষয়ই আমরা আপন চক্ষুতে না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। আপনি আগেই জানেন আমি কাহারও খোসামোদ করিয়া কথা বলি না। তিনি হাজার বড়লোক হউন, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা স্পষ্টরূপে বলিতে একটুও ভয় করি না। তাঁহার পিতার আমলের যে সকল দেবসেবা ছিল তিনি তাহা তুলিয়া দিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন তিনি তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে কত শত প্রজা ভিটা-ছাড়া হইয়াছে। যাহার যত খাজনা তাহার দেড়গুণ দ্বিগুণ দিয়াও নিস্তার নাই। তিনি মানী লোকের মান রাখেন না। গৃহস্থের সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তিনি ছলে বলে কৌশলে—"

হরেন্দ্র বাবু উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—"মহাশয়! থামুন, থামুন। আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতেছেন। আপনি কাহাকে এরূপ অপমান করিতেছেন জানেন কি?"

"খুব জানি। তিনি শুম্ভদৈত্যের ন্যায় ক্ষমতাশালী, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া এরূপ একাধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার পুত্রকে সমাজে তুলিবেন, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিত লইয়া পুতুল নাচানোর প্রয়োজন কি? আপনি এই টাকা তুলিয়া নিন্।"

হরেন্দ্র বাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"সে কথা ভাল ভাবে আগে বলিলেই ত হইত। আপনি তাঁহার অপমান না করিয়াও ত একথা বলিতে পারিতেন। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, জমিদার বাবু একথা শুনিলে নিশ্চয়ই আপনাকে এজন্য অনুতাপ করিতে হইবে। আপনি মান্যমান ব্যক্তি, ইহার অধিক আর আপনাকে বলা উচিত হইবে না।"

এই বলিয়া হরেন্দ্র বাবু নোটগুলি তুলিয়া লইয়া সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

বিমলা অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল। সে আসিয়া বলিল,—"বাবা, এ কি করিলেন?"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন,—"কেন মা? আমার টাকা ফেরত দেওয়া অন্যায় হইয়াছে তাই বলিতেছ?"

বিমলা জি'ব কাটিয়া বলিল,—"না—না—আমি সে কথা বলিতেছি না। সে জমিদার যে রকম দুর্দ্দান্ত লোক—"

"তা' আমি জানি। কিন্তু আমাকে ঘুস দেওয়ার চেষ্টা! আমি এরূপ আচরণ কখনও ক্ষমা করিতে পারি না। সে জন্য দু'কথা শুনাইয়া দিলাম। আমি জানি সে খুব অত্যাচারী লোক, কিন্তু কি করিব? আমার ন্যায়বুদ্ধিতে আঘাত লাগিলে আমি নির্ব্বাক থাকিতে পারি না। ওহো, তুমি ত বলিয়াছিলে মা, ঘরে চাল বাড়ন্ত, এবার সেই চেষ্টায় বাহির হইতেছি।"

(৩)

ইহার সাত দিন পরে বিমলা বাড়ীর অনতিদূরে নবগঙ্গা নদীতে সন্ধ্যাকালে গা ধুইতে গিয়াছিল, কিন্তু সে আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় সেই রাত্রেই তাহাকে খুঁজিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন, পাড়া প্রতিবেশিগণ সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার শোকে নিতান্ত অধীর হইলেন, কারণ তাঁহার পত্নী-বিয়োগের পর এই বিধবা কন্যাই ছিল তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন। আর মেয়েটির চরিত্রগুণে তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিন দিন পরে একটি লোক আসিয়া সংবাদ দিল, বিমলা প্রায় ৬ মাইল দূরে কমলাপুর গ্রামে অনাথনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আছে। তিনি তাহাকে নবগঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় তুলিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। স্মৃতিরত্ন যেন অকূল সাগরে কূল পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া কমলাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে একটা খট্‌কার উদয় হইল, কমলাপুর ত তাঁহার গ্রাম হইতে নদীর উজান দিকে। বিমলা হটাৎ গভীর জলে পড়িয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া বিপরীত দিকে যাইবে কেন?

স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে দেখিয়া বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমি আপনার কুলকলঙ্কিনী কন্যা, আমি জলে ডুবিয়া মরিলাম না কেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—"কেন মা, কি হয়েছে ? সব খুলিয়া বল।" বিমলা চক্ষু মুছিয়া বলিল—"বাবা, আমি সেদিন গা ধুইবার জন্য নদীর জলে নামিয়াছিলাম, একখানা নৌকা নদী দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সেই নৌকা হইতে দুইজন লোক চিলের মত ছোঁ মারিয়া আমাকে সেই নৌকায় তুলিয়া লইল এবং আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে চলিল এবং প্রায় তিনঘণ্টা পরে এক খানা ভাওয়ানিয়া নৌকার পাশে লাগাইল।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এ বুঝি সেই জমিদারের ভাওয়ানিয়া ? মা জগদম্বা ! তোমার মনে এই ছিল।"

"সেই ভাওয়ানিয়ায় একটা আলো জ্বলিতেছিল, এক জন লোক নৌকার ছাদের উপর শুইয়া ছিল। যাহারা আমাকে ধরিয়া নিয়াছিল তাহাদের প্রশ্নের উত্তর সে লোকটা বলিল—"বাবু এখন কাছারি বাড়ীতে আছেন, আমাকে খবর দিতে বলিয়াছেন আমি যাইতেছি।. তোমরা ও মেয়েটিকে ঐ ভিতরের কামরায় নিয়ে রাখ।" এই বলিয়া সে লোকটি নামিয়া গেল। তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিয়া আমাকে নৌকার মধ্যে লইয়া গেল। আমি সেখানে বসিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তখন সে কামরায় আর কেহ ছিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সেই লোকটি আসিয়া বলিল—"বাবু অত্যন্ত মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে উঠানো গেল না। এখন ইহাকে লইয়া তোমরা কি করিবে কর।"

তখন যাহারা আমাকে আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া বলিল—"আমরা আবার কি করিব ? আমাদের কাজ আমরা করিয়াছি। এ লোক এখন তোমার জিম্বায় রহিল। খবরদার যেন পালায় না। আমরা এখন নৌকা ভাসাইলাম। আমাদের এখানে থাকার হুকুম নাই। আমরা রাজধানীতে চলিলাম।" এই বলিয়া তাহারা নৌকা খুলিয়া তীরবেগে চলিয়া গেল। তখন সেই নৌকার লোকটি আমাকে বলিল—"ওগো, তুমি কেঁদো না। ঐ ওখানে শুকনো কাপড় আছে তাই পরো, ঐ যে থালায় খাবার আছে, খাও। খাইয়া ঐ বিছানায় শুইয়া থাকো। তোমার কোন ভয় নাই, আমি ছাদের উপরে আছি। খবরদার সোরগোল করিও না।" এই বলিয়া সে বাহির হইতে কামরার দরজা বন্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ সেইভাবে বসিয়া রহিলাম। পরে যখন তাহার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, তখন আস্তে আস্তে কামরার একটা জানালা খুলিলাম, এবং খুব সন্তর্পণে নদীর জলে পড়িলাম। আমি সাঁতার কাটিতে কাটিতে স্রোতের বেগে অনেক দূর ভাসিয়া আসিলাম, কিন্তু ক্রমে হাত পা অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং আমার চৈতন্য লোপ হইল। পরদিন ভোরে আমার যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখি এই ভদ্রলোক আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। কিন্তু বাবা, আমার জলে ডুবিয়া মরাই উচিত ছিল, আমা হইতে আপনার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী পড়িল !"

এই বলিয়া বিমলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে "দুর্গা ! দুর্গা ! মা তোমার মনে এই ছিল !" বলিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

গৃহস্বামী অনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"স্মৃতিরত্ন মহাশয়, বিপদে অধীর হইবেন না। ভাগ্যক্রমে আমি তখন ঘাটে গিয়াছিলাম নচেৎ মার জীবন রক্ষা হইত না।"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন,—কি ঘোর অত্যাচার ! আমাদের দেশে কি কোন রাজা বা রাজপুরুষ নাই যিনি ইহার প্রতিবিধান করিতে পারেনা ? আমরা কি যথার্থই শুম্ভ দৈত্যের মুলুকে বাস করিতেছি ? চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জানেন ত— কেবল আমার কন্যা বলিয়া নহে—এইরূপ কত কুলললনার উপর সেই পাষণ্ড এইরূপ অত্যাচার করিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? আমার অপরাধ আমি সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলাম। হায় হায় হায়।"

স্মৃতিরত্নের কাশীযাত্রা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

চক্রবর্ত্তী বলিলেন আপনি—"পুলিসে এজাহার দিতে পারেন।"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন—"পুলিস? পুলিস ত তার কেনা গোলাম। বিচারালয়ে নালিশ করিলেও কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সে টাকার বলে সাক্ষী বাধ্য করিয়া ও বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইয়া খালাস হইয়া যাইবে, লাভের মধ্যে আমাদের ঘোরতর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ মামলা মোকদ্দমা করাতে যথেষ্ট টাকা খরচের দরকার, নিতান্ত গরিব, টাকা কোথায় পাইব। না, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমি সে দিকে যাইব না। মা জগদম্বা কত শত দৈত্যদানব দলন করিয়াছেন, তিনি নারীর সতীত্বধর্ষণকারী এই দৈত্যকে দলন করিবেন না? আমি তাঁহারই নিকট বিচার প্রার্থনা করিব। এখন আমার কি কর্ত্তব্য তাই বলুন।"

অনাথবন্ধু বলিলেন—"ঘটনা ত আপনার কন্যার মুখে আনুপূর্ব্বিক শুনিলেন। ইঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ইনি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, ইঁহাকে এখন বাড়ীতে লইয়া যান।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্দিগ্ধচিত্তে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"উহুঁ। আমরা যেন উঁহার কথা বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিবে কি? এমন যে সতীকুলশিরোমণি জানকী, দুর্জ্জন লোকে তাঁহার কথাও ত বিশ্বাস করে নাই?"

বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা, আমিও সীতার পথ অবলম্বন করিতে চাই। তিনি প্রথমে আগুনে, পরে রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি প্রথমে জলে ডুবিয়াছিলাম, এবার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া মরিব। আমি কিছুতেই লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে পারিব না, কিছুতেই আপনার মাথা হেঁট হইতে দিব না।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন—"মা তুই বলিস্ কি? এই কি তোর শিক্ষার ফল? আত্মহত্যা যে মহাপাপ। আত্মঘাতী লোকের কিছুতেই নিস্তার নাই। আমাদিগকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে বিদ্রোহী হইলে চলিবে না।"

অনাথবন্ধু বলিলেন—"স্মৃতিরত্ন মহাশয়! আমাদের সমাজে কত স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। হয়ত তাহাদের লইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত একটা হৈ চৈ পড়ে, একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়, পরে কালক্রমে তাহারা সমাজ শরীরে মিলিয়া যায়। আপনি নিজেও ত কত পাপীলোকের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়া তাহাদিগকে সমাজে চালাইয়াছেন। সে সকলের তুলনায় আপনার কন্যা ত দেবতা, প্রাক্তনের ফলে উঁহার গায় সামান্য একটু আঁচ লাগিয়াছে মাত্র। আপনি ইচ্ছা করিলেই ইঁহাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে সমাজে চলিতে পারেন। আপনার কার্য্যের দোষ ধরিতে পারে কাহার সাধ্য?"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী মহাশয়! আমাকে আপনারা যেরূপ মনে করেন, সেই পরিমাণে সমাজে আমার দায়িত্বও খুব বেশী। আমি অনেক পাপাকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছি, সে জন্য আমার নিজের বেলায় আমাকে অতি সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। লোকে বলিবে—অমুক ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে লম্পট জমিদার ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য জানিয়া শুনিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তবে অন্যের বেলায় তিনি কঠোর ব্যবস্থা দেন কিরূপে? সুতরাং আমার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকে ব্যভিচারের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"কিন্তু আপনার কন্যার সহিত তাহাদের তুলনাই হইতে পারে না। ইঁহাকে ত কেবল ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল--"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন—"আপনি বুঝিতেছেন না। লোকে, বিশেষতঃ দুষ্ট লোকে, কি তাহা বিশ্বাস করিবে?"

চক্রবর্ত্তী—"কিন্তু যে স্ত্রীলোককে কেহ জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া তাহার সতীত্বনাশ করে তাহারও ত প্রায়শ্চিত্ত আছে?"

স্মৃতিরত্ন—"আছে বৈ কি। প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে স্ত্রীলোক অবাধে সমাজে চলিতে পারে। কিন্তু আমার কন্যা যে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক,—আমি তাহাকে কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে পারিব না, সেও কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজি হইবে না।"

চক্রবর্ত্তী—"তবে আপনি এখন কি করিতে চান ?"

স্মৃতিরত্ন—"আমি ইহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না, আবার আমি এই সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া সমাজেরও পাপ বাড়াইব না। সমাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিলেও, সমাজের কল্যাণের জন্য আমিই সমাজকে পরিত্যাগ করিব। আমি আমার কন্যাকে লইয়া দেশত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে যাইব, কারণ, "যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।" তুমি কি বল, মা ?"

বিমলা বলিল—"বাবা ইহাই উত্তম পরামর্শ।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিমলাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার জমিজমা ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া ৺ কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুত্রও সেখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। দেশের লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিতে লাগিল।

(৪)

উক্ত ঘটনার পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। স্মৃতিরত্ন মহাশয় কাশীতে আসিয়া নিজ অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিশুদ্ধ চরিত্রবলে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাসায় ১০।১২টি ছাত্র নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তিনি প্রায় পণ্ডিতসভায় নিমন্ত্রণ পান এবং তাহার দ্বারা তাঁহার সংসার খরচ বেশ চলিয়া যাইতেছে। বিমলা এক জমিদার-কন্যা-প্রতিষ্ঠিত বিধবা-আশ্রমে বালিকাদিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া বেশ আনন্দে সময় কাটাইতেছে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বিমলা ৺কেদারনাথের মন্দিরের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বাহিরের শোভা দেখিতেছিল। সেখানে অনেক মহিলা বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা জপতপ করিতেছিলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার সুবিন্যস্ত সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া নানা বর্ণের বেশধারী স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকার প্রবাহ চলিয়াছে। দূর হইতে দশাশ্বমেধ ঘাটে কীর্ত্তনের খোলের শব্দ ও অস্ফুট কলরব ভাসিয়া আসিতেছে। সুদূর মণিকর্ণিকায় জ্বলন্ত চিতার অগ্নিশিখা এবং পার্শ্বস্থ হরিশচন্দ্র ঘাটে শ্মশানের অগ্নিশিখা—জীবনপ্রবাহের দুই প্রান্তে শ্মশান মানুষ! তুমি যে দিকেই যাও তোমার এই শ্মশানেই পরিসমাপ্তি, এই কঠোর সত্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

"ওমা—আমি এত সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারি না—ওলো সৈরবি, আমার হাতখান ধর তো, মা,"

বিমলা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া খুব জাঁকজমকের সহিত দুইটি পরিচারিকা সহ ঘাটে আসিতেছেন। তিনি আসিয়া বিমলার পাশে বসিলেন। বিমলা তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"মা, আপনার দেশ কোথায় ? আপনার কথা শুনিয়া আপনাকে আমাদের এক জেলার লোক বলিয়া বোধ হইতেছে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন—"আমার বাড়ী প্রতাপপুর জেলায়, তোমার বাড়ীও সেই খানে নাকি ?"

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হ্যাঁ মা, একদিন সেখানেই ছিল। আমরা এই এক বৎসর হইল দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

"কাহার সাথে আসিয়াছ ?"

"আমার বাবার সাথে, তিনি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।"

তেনার নাম কি ?"

"শঙ্করনাথ স্মৃতিরত্ন।"

প্রৌঢ়া রমণী সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—"শঙ্করনাথ স্মৃতিরত্ন ?" শঙ্কর নাথ—তুমি তাঁর মেয়ে ? আমরা যে তেনারে কতদিন তালাস করিতেছি।"

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, তাঁহাকে কেন ? আপনি কে ?"

এই সময় একজন পরিচারিকা বলিল, "এনারে চিনতি পারিল্যা না—ইনি আমারগে ছ্যাশের রাজা দয়ানাথ বাবুর গিন্নী।"

বিমলা বিমর্ষ হইয়া বলিল,—"এবার চিনিয়াছি, আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া কি এখনও আপনাদের আশ মেটে নাই ?"

জমিদার-গৃহিণী কাতর হইয়া করিলেন, "মা, সে কথা আর তুলিও না। ব্রাহ্মণের অভিশাপ, সতীলক্ষ্মীর শাপ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আজ ছ'মাস হইল আমার

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

বড় ছেলে, যে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিল, সে মোটর গাড়ী থেকে পড়িয়া মারা গিয়াছে। আমার স্বামীও ভয়ানক পীড়িত, তাঁহার লিভারে ফোঁড়া হইয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। এখন বাবা বিশ্বনাথ কেদারনাথ ভরসা। তিনি কেবলই বলেন, আমার পাপের পেরাচিত্তি হইতেছে, এখন একবার সেই ব্রাহ্মণকে পাইলে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বাঁচিতাম। তোমারগে বাসা কোথায় মা ?"

বিমলা তাহাদের ঠিকানা বলিল। এই সময়ে ৺কেদারনাথের আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। জমিদার-গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা তোমার বাবারে আমারগে দুঃখের কথা কইও, তিনি যেন একটু দয়া করেন। আমরা ভেলুপুরায় থাকি। ওলো বামি! আমার হাতখান ধরো। বাবা কেদারনাথ! কেরপা কর।" এই বলিয়া তিনি দুইটি দাসীর সাহায্যে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের বাহিরে রাস্তার উপরে তাঁহার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল।

(৫)

বিমলা বাড়ী আসিয়া তাহার পিতাকে এই সকল কথা বলিল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, সে জমিদারের লোক বোধ হয় কালই আপনাকে ডাকিতে আসিবে। আপনি যাবেন কি ?"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা, তুমি কি বল ? যাওয়া উচিত না অনুচিত ?"

বিমলা চুপ করিয়া রহিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন, "মা, আমি মা জগদম্বার নিকটে সেই অপরাধীর বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি তাহার যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছেন। আমরা এখন বাবা বিশ্বনাথের ধামে বাস করিতেছি, এখানেও যদি আমাদের মনে বৈরি-নির্য্যাতনের স্পৃহা বলবতী হয়, তবে আমাদের কাশীবাস বৃথা। সে যখন এতদূর অনুতপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে যাইব। তারপরে, বিবেচনা করিয়া দেখ ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। দেশ-ত্যাগ করিবার সময় আমাদের মনে অপরিসীম কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার কৃপায় আমরা ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছি। তুমি ও এখানে তোমায় উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইয়াছ।"

পরদিন প্রাতঃকালে একজন কর্ম্মচারী স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে জমিদারের বাসায় লইয়া গেল। তিনি ধরানাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, উত্থানশক্তিরহিত। স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে দেখিয়া তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। তিনি পদধূলি দিলে, তাহা মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি মানুষ ন'ন দেবতা, তা' না হইলে আমার মত পাপীকে কেন দর্শন দিবেন। আপনি আমার যে সকল পাপ-কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রত্যেকটী কবুল করিতেছি। আমি গরম রক্তের জোরে ও প্রবৃত্তির তাড়নায় না করিয়াছি এমন পাপ নাই। কিন্তু আমার শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছে। যে ছেলের জন্য রাগের বশে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম সে আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

এই বলিয়া ধরানাথ বাবু চক্ষু মুছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "মৃত্যু দৈবাধীন ঘটনা, সেজন্য শোক করা বৃথা। এখন আপনি কেমন আছেন ?"

ধরানাথ গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আর এক কথা বলি। আপনার কন্যার সতীত্বনাশের অভিপ্রায় আমার ছিল না, কেবল রাগের বশে আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাকেও আনিয়াছিলাম। যাক সে কথা— আমারও এখন অন্তিমকাল উপস্থিত। লিভারে ফোঁড়া হইয়াছে,—অতিশয় অত্যাচারের ফলে,—ডাক্তারেরা বলিয়াছেন অস্ত্র করিতে হইবে, কিন্তু অস্ত্র করিবার সময়ই মরিতে পারি। আপনি আমাকে ক্ষমা করিলেন, অন্তিম-কালে এই কথাটা প্রাণ খুলিয়া বলুন, আমি তাহা হইলে শান্তিতে মরিতে পারিব।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা, তোমার যখন এতটা অনুতাপ হইয়াছে, আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলাম। ক্ষমাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বাবা বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করুন।"

এই সময়ে পাশের কক্ষে স্ত্রীকণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় উঠিয়া আসিবার সময় ধরানাথের গৃহিণী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহার তিন দিন পরে ধরানাথ ধরাধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গোধূলি

হুমায়ুন কবির

নগরীর অট্টালিকা-অন্তরালে স্বর্ণ-বর্ণ রবি
অস্তাকাশে মেঘপুঞ্জে আঁকি দীপ্ত অগ্নিরক্ত ছবি
ম্লান হ'য়ে এল ধীরে। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে,
পদক্ষেপ-মুখরিত ঝলসিত শত দীপহারে
দীর্ঘ পথ রেখা 'পরে আঁখি মেলি ছিনু মোরা বসি'।
লক্ষ চিত্তে সুখ-দুঃখ অশ্রু-হাসি উঠিছে নিশ্বসি,
তরঙ্গ-বন্ধুর সেই জীবনের নিত্য লীলা স্মরি'
আমার সকল হিয়া আকাঙ্ক্ষায় উঠিল গুমরি'।
তুমি বসেছিলে সখি, করতলে শ্রান্তভাল রাখি'
যেথায় পাণ্ডুর রবি শেষ রশ্মি দিয়েছিল আঁকি
আঁধারের চিত্রপটে। দীপহীন নিরালোক ঘরে
কালো আঁখিতারা দু'টী বেদনার অতল গহ্বরে
সন্ধ্যাতারা সম জলে। পথমাঝে জীবনের লীলা
দেখিয়া অন্তর তব উচ্ছ্বসিল অন্তর-সলিলা
শীর্ণ তটিনীর মত। মুগ্ধ-আঁখি মেলি ছিলে চাহি
জীবনের পিয়াসায় প্রাণ তব উঠেছিল গাহি'।

আমি কয়েছিনু কথা, কিবা কয়েছিনু নাহি মনে।
তোমার চরণ তলে প্রেমনিবেদন? ক্ষণে ক্ষণে
আষাঢ় আকাশমাঝে মেঘ-পুঞ্জে বিদ্যুতের রেখা
চকিতে ঝলসি যায়,—তারি মত প্রণয়ের লেখা
তোমার নয়ন লাগি' লিখেছিনু আমার নয়নে?
স্নেহের সান্ত্বনা-বাণী অতি মৃদু কোমল গুঞ্জনে
কয়েছিনু কানে কানে? বৈশাখের রুদ্র রবি-করে
যে তরু শুকায়ে যায়, ধূলিতলে পুষ্পরাশি ঝরে,
বিশুষ্ক অধরে তার রজনীর হিমবিন্দু সম?
অথবা যে আশা নিত্য স্বপ্ন রচে চিত্তমাঝে মম,
যে আলোক-রশ্মি জাগে দীপহীন অটুট আঁধারে,
জীবনের ব্যর্থ ক্ষোভ, নিষ্ফল চেষ্টার ক্ষুদ্রতারে
মহীয়ান করি' তোলে—তারি গানে তুলেছিনু ধ্বনি
সন্ধ্যার তরল ছায়া? অন্ধকারে সূর্য্যকান্ত মণি
ঝলসে যেমন করি, ঝলসিল তোমার নয়ন,
আদিম তিমির গর্ভে আলোকের প্রথম স্পন্দন।

চাহিলে আমার পানে অপূর্ব্ব নয়ন দুটী মেলি,
ভাষার অতীত কথা দুই চোখে উঠিল উদ্বেলি।
সে কি দৃষ্টি? মনে হ'ল যুগান্তের পরপার হ'তে,
সেই জীবনের ধারা ভাসা'য়া জন্ম-মৃত্যু-স্রোতে
আনিয়াছে আমাদের ধরণীর সাগরবেলায়,
তারি কূলে দাঁড়াইয়া সৃজনের রহস্য লীলায়
বুঝিলে সহজ করি'। স্তব্ধবাক বিস্ময়ের ভরে
দেখিনু তোমার চিত্তে কত স্বপ্ন কামনা গুমরে,
ধরণী-অতীত কোন রহস্যের অপরূপ আলো
তোমার নয়নতলে অপরূপ কিরণ জাগালো,
মায়ায় ভুলালো মোরে সীমাবদ্ধ আপনারে মোর।
শুনিনু নিমেষ লাগি লক্ষ চিত্তে বাসনা-মর্ম্মর
নিখিল ভুবন ভরি'। দেখিলাম নিমেষের শেষে
শেষ সন্ধ্যারক্ত রশ্মি তোমার গোধূলি-ঘন কেশে
রচিয়াছে স্বপ্ন-জাল মোহময় অপরূপ অতি!
নিমেষের লাগি হানি দিবস বিষণ্ণ মন্দ-গতি
চলি' গেল দিগন্তরে। ঘনায়ে আসিল অন্ধকার,
আকাশে রঙের খেলা মুছে গিয়ে হ'ল একাকার,
পদতলে নগরীর পথে পথে আলোকের খেলা,
খণ্ড ছিন্ন অন্ধকারে লক্ষ চিত্তে সুখ-দুঃখ মেলা।

সহযোগী-সাহিত্য

নাট্যশিল্পী বিয়র্ণসন।

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

১

কবি ইয়েট্‌স্ বহুদিন পূর্ব্বে লিখেছিলেন, "The arts have failed." এত বড় আশার কথা সে যুগের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। শিল্পের অসার্থকতার নাম তার মৃত্যু; মানুষের মৃত্যুতে দুঃখ যতই থাক, শিল্পের মরণে দুঃখ বা ভয়ের এতটুকু কারণ নেই যেহেতু ও-বস্তুর দেহে রক্তবীজের রক্ত আছে। কোনো একটা শিল্প যখন মরে, তার নিষ্প্রাণ দেহ হতে তখন দশ বিশটা নূতন জীবন্ত শিল্প জন্মলাভ করে; তার এক ফোঁটা রক্তেরও অপচয় হয় না। একটা পুরাতনের চেয়ে বহু নূতনই ভাল। তাই ইয়েট্‌সের মুখে আর্টের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সকলেরই খুসি হবার কথা।

আমাদের—অর্থাৎ ভারতীয়দের—অমরত্ব লাভের লোভ অত্যন্ত প্রবল ব'লে আমরা ত্রিশকোটি অমর অমরীর সৃষ্টি করে বসেছি; আশা, একদিন উক্ত ত্রিশ কোটির মধ্যে আমাদেরও স্থান হবে! পরলোকের অমরদের কথা জোর ক'রে বলা যায় না, ইহলোকে কিন্তু ত্রিশটি অমর খুঁজে পাওয়াই কঠিন। হোমার, বাল্মিকী বেঁচে আছেন, কিন্তু এর মধ্যেই তাঁদের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি কমে এসেছে। দশ হাজার বছর পরেও তাঁদের নাম ইতিহাসের খাতা ছাড়া অন্যত্র লেখা থাকবে একথা নিঃসন্দেহে বলা শক্ত। থাকা উচিতও নয়, কারণ তাতে ক্রমবিকাশের ব্যতিক্রম হয়। দশ হাজার বছর পরের মানুষের শিল্পানুভূতি এখনকার মানুষের শিল্পানুভূতির চেয়ে শতগুণ সূক্ষ্মতর হওয়া প্রয়োজন, এবং সেজন্য আজ যিনি অগ্রগণ্য, ভবিষ্যতে তাঁর নগণ্য হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে এ হ'ল শিল্পীর কথা। শিল্পীর মৃত্যু চরম, কিন্তু শিল্পের মৃত্যু একটা নূতন আরম্ভ। ইউরোপে ক্লাসিসিজ্‌মের মৃত্যুক্ষণ এর এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। ও রকম ঘটনা বারম্বার ঘটে এসেছে, এবং আজও জন্ম মৃত্যুর অদৃশ্য শক্তিপুঞ্জ নীরবে প্রতিনিয়ত কাজ ক'রে চ'লেছে। বিগত যুগের সৌন্দর্য্য এ যুগের মানুষের চোখে আজ অসুন্দর; যা আছে তাতে তার তৃপ্তি নেই। গীতার "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটা শিল্পলক্ষ্মীর মুখের কথা হতে পারে।

নাট্যকলার দিক্ থেকে এই জন্মবৈচিত্র্যের কথা ভেবে দেখলে সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতি যুগ তার নাট্য-কলায় নূতন লীলা, নূতন স্বপ্ন এনেছে। মার্লোর নাট্যের অসংযত গতি-ভঙ্গী, চীৎকার, চাঞ্চল্য, রুদ্র রসের অবসান হয় সেক্‌স্‌পীয়রের লেখায়; সেক্‌স্‌পীয়রের সুবেশা, প্রাণময়ী শিল্পলক্ষ্মীর দেহের আবরণ উন্মোচন ক'রে তাকে নগ্ন ও নির্লজ্জ করে দিয়েছিল কন্‌গীভ্‌এর শ্রেণীর লেখকদের লেখনী। শেরিডান তার হৃত বস্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার বিনষ্ট মুখশ্রী এনে দিতে পারেননি। স্রোতের ধারা এম্নি ক'রে বারম্বার দিগ্বিদিকে ছুটে চলেছিল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে সে ধারা যখন পৌছয়, তার তখনকার রূপ দেখেই ইয়েট্‌স্ বলেছিলেন যে শিল্প মরেছে। কিন্তু সহসা সে শুষ্ক প্রবাহ থেকে দুটি নূতন স্রোত নির্গত হয়ে এল,—তার একটির নাম রূপক নাট্য, অপরটি সমস্যা-নাট্য। প্রথমটির প্রবর্ত্তন-ভূমি প্রধানত ফ্রান্স্, আর দ্বিতীয়টির—নরওয়ে। নরওয়ের আধুনিক নাট্যের কথা বলতেই ইব্‌সেনের কথা মনে আসে। ইব্‌সেন কিন্তু সমস্যা-নাট্যের প্রবর্ত্তন করেননি, প্রবর্দ্ধন করেছেন। যে ব্যক্তি তার আদি স্রষ্টা তাঁর নাম Bjornstjerne Bjornson। বিয়র্ণসনের

সৃষ্ট শিল্প আজ সমস্ত ইউরোপের নাট্যকলার মুখের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে। এ যুগে সমস্যা না হ'লে নাটক হয় না। Mrs. Warren's Profession এর ভূমিকায় বার্ণার্ড্ শ লিখেছেন, "...only in the problem play is there any real drama because drama is no mere setting up of the camera to nature : it is the presentation in parable of the conflict between Man's will and his environment ; in a word, of problem."

২

বিয়র্ণ্‌সনের শৈশব কেটেছিল একদল বন্য লোকের মাঝে, আর কিশোর কেটেছিল নরওয়ের এক পরম রমণীয় স্থানে। মানুষের চতুষ্পার্শ্ব তার সমস্ত মন অনুরঞ্জিত ক'রে থাকে। পরিবেষ্টনের প্রভাবে শৈশবে শৌর্য্য এবং কৈশোরে সৌন্দর্য্য, দুইই বস্তু মিলে বিয়র্ণ্‌সনের শিল্পী-মন সংগঠিত হয়েছিল। তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হবার জন্য ছেলেবেলা থেকেই ছিল তাঁর সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ছাত্রজীবনের অন্তে জীবিকার জন্য তিনি সাংবাদিকের কাজ সুরু করেন, কিন্তু তাতে তাঁর পরিতৃপ্তি হয়নি। সৃষ্টির আগ্রহ তখন তাঁর মনে উগ্র হ'য়ে উঠেছিল। এই সময়ে 'Valborg' নামে একটা নাটক লিখে তিনি এক থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দিলেন। লেখাটা অভিনয়ার্থে মনোনীত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে অভিনয় সুরু হবার পূর্ব্বেই বিয়র্ণ্‌সন নিজের সে নাটক ফিরিয়ে নিলেন, কারণ ইতিমধ্যে তার ভিতর বহু ভুলভ্রান্তি তাঁর চোখে পড়ে। নূতন লেখকের পক্ষে অভিনয়ের জন্য মনোনীত রচনা ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে অর্থ ও সম্মান হ'তে বঞ্চিত করার মত মনঃশক্তি বড় একটা দেখা যায় না।

অতঃপর তিনি গল্প এবং কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করলেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে তাঁর করতলগত হল। সভ্যতার চাকা যাদের বুকের উপর দিয়ে রাস্তা ক'রে চলে, সেই সব নিম্নশ্রেণীয়ের পরিচিত্রণ নিয়ে তাঁর গল্প-লেখার সূত্রপাত। এজাতীয় গল্পের মধ্যে 'সুখী ছেলে' ও 'ধীবর-কন্যার' যথেষ্ট নাম আছে। 'ধূলি,' 'মায়ের হাত,' 'আব্‌সালমের কেশ' এই সুপ্রসিদ্ধ গল্পগুলি অন্য এক জাতীয়। কবিতার মধ্যে তাঁর —'আগে চল, আগে চল'—লিরিকটি নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। কবিতা লেখায় বিয়র্ণ্‌সনের মনের উপর সেই বিরাট ঢেউয়ের ধাক্কা লেগেছিল, যে ঢেউয়ের বেগে ইউরোপের ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্ অর্দ্ধোন্মূলিত হয়ে ওঠে। সে ঢেউয়ের চল্‌তি নাম রোমান্টিক্ মনোভাব। উক্ত ভাবপ্রবাহ তাঁর কাছে পৌঁছেছিল ডেন্‌মার্কের দুজন খ্যাতনামা কবির লেখার মধ্যস্থতায়। তাঁদের একজন ব্যাজেসেন্ (Jens Immanuel Baggesen) আর একজন ওলেন্‌স্লাগার (Adam Gottlab Ohlenschlagar)। প্রথমোক্তের 'একদা আমি ছিলাম অতি ছোট' নামের পরম সুন্দর গীতিকবিতা ডেন্‌মার্কের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠাগ্রে। তাঁর মহাকাব্যগুলি মৃতপ্রায়, কিন্তু উক্ত ক্ষুদ্রকায় কবিতা এ যাবৎ বেঁচে আছে। ব্যাজেসেন ছিলেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে ডেন্‌মার্কের অপর শ্রেষ্ঠ কবি ওলেন্‌স্লাগারের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরাজি সাহিত্যে কোল্‌রিজের যে স্থান, ড্যানিশ সাহিত্যে ওলেন্‌স্লাগারের তাই। ওলেন্‌স্লাগার বহু ট্র্যাজেডি লিখে গেছেন, কিন্তু তার মধ্যে প্রকৃষ্ট তাঁর প্রথম লেখা Horkon Jarl। তাঁর প্রসিদ্ধি কতদূর ছিল তার প্রমাণাথে বলা যায় যে সুইডেনে প্রকাশ্যসভায় একজন বিশপকে দিয়ে Scandinaviaর গানের রাজা বলে তাঁর অভিষেক করানো হয়।

গল্প-লেখার পরে বিয়র্ণ্‌সন উপন্যাস লিখতে সুরু করেন। উপন্যাসেই তাঁর নাট্য-প্রতিভার প্রথম অভিব্যক্তি। নাটকে যে বিশিষ্টতা তাঁকে জগদ্বিদিত করেছে, সেই বৈশিষ্টের ছায়া তাঁর উপন্যাসে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—'নগরে বন্দরে ওড়ে পতাকা নিশান' ও 'ভগবানের পথে' এই দুই উপন্যাসে শিক্ষা এবং বংশানুক্রম সম্বন্ধীয় থিওরি বিদ্যমান। কথাসাহিত্যে সমস্যার প্রবর্ত্তনান্তে বিয়র্ণ্‌সন ও-বস্তু নাট্যসাহিত্যে গ্রহণ করেন।

সমস্যা-নাট্য লেখবার পূর্ব্বে বিয়র্ণ্‌সন কয়েকটা কমেডি লিখেছিলেন। 'নববিবাহিত দম্পতী,' 'ভূবৃত্তান্ত ও প্রেম,'—এ জাতীয় লেখায় দেখা যায় যে সমস্যার

নাট্যশিল্পী বিয়র্ণ্‌সন

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

মেরুদণ্ড ব্যতিরেকেও বিয়র্ণ্‌সনের কমেডি নুব্জপৃষ্ঠ হয়ে পড়ে না। 'নব বিবাহিত দম্পতী' (De Nygifte) নাটকখানা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার অবয়ব ক্ষুদ্র, যেহেতু শুধু দুটি দৃশ্যেই তার সমাপ্তি। এর নায়ক Axel এবং নায়িকা লরা। লরার সঙ্গে বিবাহের পরও Axel স্ত্রীকে পরিপূর্ণরূপে পায়নি, কারণ লরার মনে স্বামীর চেয়ে মাতাপিতার স্থান ছিল অধিক। লরার মধ্যে স্ত্রী-সত্তার চেয়ে কন্যা-সত্তা ছিল সমধিক জাগ্রত। Axelএর তা ভাল লাগে না। তাই লরাকে দেহমণপ্রাণে সম্পূর্ণত আপ-নার করে নেবার জন্যে সে তাকে তার মাতাপিতার কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। Axelএর মনস্তত্ত্ব তার নিম্নোক্ত কথাগুলোয় লেখা আছে।—"শুধু শ্রদ্ধা নিয়ে আমার চল্‌বে না, আমি ভালবাসতে চাই; ওর পায়ের কাছে বসে থেকে আমার তৃপ্তি হয় না, বাহুবেষ্টনে ওকে বাঁধবার জন্য আমার আকুল আগ্রহ। ওর চোখের দৃষ্টি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে আমার দৃষ্টিতে ডুবে যাক্। আমার চুলে ওর হাতের স্পর্শ পেতে চাই, আমার কণ্ঠে ওর বাহু, মুখে মুখ। ওর চিন্তা আমার চিন্তাকে আলিঙ্গন ক'রে বুকে আমার আলো জ্বেলে দিক্। একদিন ও আমার কাছে ছিল শুধু একটা প্রতীক, কিন্তু আজ সে প্রতীক রক্তমাংসের দেহ ধরেছে। দিনের পর দিন ওর নারীত্বের বিকাশ আমার চোখের সাম্‌নে দেখে এসেছি, এখন ও নারী-প্রাণ আমি একেবারে আপ-নার করে নিতে চাই।"

বিয়র্ণ্‌সনের ভাষায় সর্ব্বত্রই এম্নি একটা মৃদু উচ্ছ্বাসের শিরা আছে। সেই শিরার রক্তধারায় উক্ত লেখার শক্তি পুষ্টিলাভ করে। তাঁর লিরিক্‌প্রতিভা ও নাট্যপ্রতিভা শুধু পাশাপাশি বহমান নয়, একের শীকর বারবার বাতাসে উড়ে অপরের দেহ স্পর্শ করতে থাকে।

শিল্প ছিল বিয়র্ণ্‌সনের জীবনের দীপশিখা, কিন্তু নিষ্প্র-দীপ কর্ম্মভূমির আহ্বানেও তিনি কোনো দিন পিছিয়ে যান নি। ব্লাস্কো ইবানেজের মত তাঁর কাছেও রিপাব্-লিক্ রাষ্ট্রের আদর্শ। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই তিনি পলিটিক্‌সের তরঙ্গে নিজেকে নিক্ষেপ করেন। তাঁর লেখনী যেমন শক্তিময়, মুখের ভাষাও ছিল তেম্নি। রচনা ও বক্তৃতা তাঁকে অবিলম্বে এক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে সাম্য ছিল তাঁর কাম্য। এ দ্বন্দ্বে তাঁর বহু বিরুদ্ধবাদী ছিল এবং তাদের চেষ্টায় তাঁকে দু'তিন বছরের জন্য দেশত্যাগী হ'তে হয়। তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাঁর কাব্যলক্ষ্মীও এই সময়ে তাঁকে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়। ফুলের ফসল ছেড়ে ফলের চাষের জন্য যখন তাঁর লোভ হয়, সে লোভের মূলে অবশ্য দোষাবহ কিছু ছিল না, কারণ উক্ত ফল তিনি পেতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশের মুখে তুলে দেবার জন্য। কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী তার প্রিয়কে নিঃশেষে নিজের করে রাখতে চায়। এতটুকু অবহেলা সে সহ্য করে না—নিঃশব্দে গৃহ-ত্যাগ ক'রে কঠিন শাস্তি দেয়।

বাক্যের ঝড়ে, কর্ম্মের চাঞ্চল্যে বিয়র্ণ্‌সনের প্রতিভার প্রদীপ্ত প্রভা যখন ম্লানায়মান, সেই সময়ে ইটালিতে গিয়ে তিনি নিজেকে নিজের হাত থেকে রক্ষা করেন ইবসেনের মত বিয়র্ণ্‌সনও ইটালির কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ, কারণ ওদেশে তিনি তাঁর প্রিয়াকে ফিরে পেয়েছিলেন। পথ-চলার আনন্দ, বহু বিদেশীয় সাহিত্যের সহিত পরিচয়, নর-নারীর নূতন রূপ, নূতন মনের সঙ্গে সংস্পর্শ—এর দ্বারা বিয়র্ণ্‌সনের আত্মচৈতন্য জাগ্রত হয়। যে মুহূর্ত্তে মানুষ বিশ্বকে চিন্‌তে শেখে, সেই মুহূর্ত্তেই নিজের ভিতরটার দিকে সে ফিরে চায়। নিজেকে দেখ্‌বামাত্র বিয়র্ণ্‌সন তাঁর ভিতরের নিদ্রিত শিল্পী-প্রাণকে জাগাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। উক্ত ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয়নি। বিয়র্ণ্‌সনের জীবনে সে এক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত; তখন থেকেই তাঁর সৃষ্টিশক্তির এক নূতন পর্য্যায়ের আরম্ভ।

৩

সুদূর বিদেশের নূতন দৃষ্টিভূমি থেকে স্বদেশের দিকে চেয়ে বিয়র্ণ্‌সন তার সবখানি দেখতে পেয়েছিলেন। এ দেখা তাঁর মনে মোহ অথবা প্রীতির সঞ্চার করেনি, কেননা দৃষ্ট বস্তুর দেহখানা আর্টিষ্টের চোখে ভাল লাগবার মত নয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজের গায়ে যে সব ব্যাধির চিহ্ন আছে, নরওয়ের সমাজ তার থেকে মুক্ত ছিল না।

ক্রমবিকাশের সিঁড়ি বেয়ে নরওয়েজিয় সমাজ অন্যান্য সভ্যসমাজের চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। জোর গলায়, সহজ ভাষায় সত্য কথা বলা সব দেশের জনসাধারণের কাছে এক মহা অপরাধ। বিয়র্ণ্‌সন এই অপরাধের পথে অগ্রসর হলেন; এ বিষয়ে তিনি ইব্‌সেনের অগ্রগামী। অবশ্য ইবসেন যে বিয়র্ণ্‌সনের কাছে পথের সন্ধান সম্বন্ধে ঋণগ্রস্ত একথা জোর ক'রে বলা চলে না। বন্ধুর পথের যাত্রীদের মধ্যে একের বেদনা অপরের মনে স্বভাবত সহানুভূতি জাগিয়ে থাকে, এবং তার থেকে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়; ইবসেন ও বিয়র্ণ্‌সনের মধ্যে এম্নি একটা সহজ বন্ধুত্বের ভাব জেগে ওঠে। তাই "প্রেতাত্মা" প্রকাশিত হবার পর সমালোচনার বিষে ইবসেনের হত্যাচেষ্টা যখন চলছিল, বিয়র্ণ্‌সন তখন বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর অসিধার লেখনী চালনা করেছিলেন। যে শিল্পীর মৃত্যুঞ্জয়ী হবার বাসনা থাকে, তাঁকে অবশ্য বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ হতে হয়; কিন্তু পাশে যদি নিজের সহধর্ম্মী, সহানুভূতিময় একটি মানুষ পাওয়া যায়, তাহলে বিষপানকার্য্য অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে। এ সৌভাগ্য ইব্‌সেনের হয়েছিল।

'রাজা' (Kongen) নাটকে বিয়র্ণ্‌সনের এই সমস্যার (problem) প্রবর্ত্তন বিশেষ একটা নূতন রূপ নিয়েছে। এ যাবৎ যে সব সমস্যা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, তাদের নায়ক-নায়িকা মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র ঘরের। বিয়র্ণ্‌সন্ সাধারণ-তন্ত্রবাদী, কিন্তু তিনি রাজাকে ভুলে যান্‌নি। তাঁর এ নাটকের নায়ক রাজা সাধারণ দশজন রাজার মত নয়, কারণ নিজেকে রাজা বলার চেয়ে মানুষ বলার কামনা তার বেশী; রাজত্বের চেয়ে ব্যক্তিত্ব তার ঢের বেশী লোভের বস্তু। দরিদ্র শিক্ষয়িত্রী ক্লারাকে ভালবেসে সে বিবাহ করতে চায়; বাধা তার মনের গতিরোধ করতে পারে না। তার কারণ, সে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করে, এবং জানে যে রাজশক্তির সুসংযত চালনা করতে পারে শুধু সেই ব্যক্তি—আত্মশক্তি যার পাহাড়ের মত দৃঢ়। রাজা এক জায়গায় ক্লারাকে বলছে, "পাহাড় কেটে তাতে বারুদ পোরা হয়; দূর থেকে তার সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ থাকে। ছোট একটা বোতামে সামান্য একটু চাপ—আর মুহূর্ত্তে প্রকাণ্ড পাহাড়টা শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার ভিতরেও তেম্নি সবই প্রস্তুত রয়েছে; শুধু সেই চাপটুকু—যাতে বিস্ফোরণ হতে পারে—তারি প্রতীক্ষায় আমি চেয়ে আছি। তোমার কাছে যা চাচ্ছি তা যদি না পাই, আমাকে নিয়ে আর কোনো কাজই হবে না। সবই থাকবে, কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না।"

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজাকে তার অদম্য শক্তিসত্ত্বেও হার মানতে হয়েছিল, কারণ মৃত্যুর বেশে এসে নিয়তি তার কাছ থেকে ক্লারাকে কেড়ে নিয়ে গেল। এর পরবর্ত্তী রচনা 'দ্বন্দ্বে আহ্বানে' কিন্তু মিথ্যার জয় দেখানো হয়নি। তার নায়িকা Svava সত্যের সঙ্গে এতটুকু compromise করতে চায়না; মিথ্যাকে সে সগর্ব্বে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে, এবং এ যুদ্ধে পরিশেষে হয় Svavaরই জয়। এই নাটকটিতে বিয়র্ণ্‌সন্ আজকালকার বিবাহের কালো দিক্‌টাই শুধু দেখিয়েছেন; এরূপ বিবাহ যে মনুষ্যধর্ম্মের কত বড় অপমান, উক্ত নাটক পাঠে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। শোনা যায় যে 'দ্বন্দ্বে আহ্বানে'র প্রকাশের ফলে নরওয়ের চারদিকে শত শত বিবাহ সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল।

"কপর্দ্দকহীন" (En Fallit) নাটকের সমস্যাবস্তুর মূলে আছে অর্থ। অর্থসমস্যার মত নীরস বিষয় নিয়েও যে রসের অবতারণা করা যায় ও পুস্তক তার প্রমাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যে এই জাতীয় আর একখানি বইয়ের কথা আমরা জানি,—রুষলেখক Nemirovich Danchenkoএর 'The Princes of the Stock Exchange'। উক্ত লেখকের নাম যত বড়, শক্তি তত বেশী নয়; গোর্কি, শেখভের সঙ্গে তাঁকে আসন দেওয়া যায় না। কিন্তু অর্থসমস্যার কাঠামোর উপর তার স্থিতি ব'লে ও লেখাটার কথা এখানে উল্লেখ-যোগ্য। অর্থশক্তি কেমন ক'রে প্রাণশক্তির চলার মুখ ফিরিয়ে দেয়—এই থিসিসের গায়ে রক্তমাংস সন্নিবিষ্ট ক'রে ও বই লেখা হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে আছে লক্ষপতি ব্যাঙ্কার Stoljeshnikoff, তার সুন্দরী কন্যা Wadja এবং কোটিপতি Valenskiর সুদৃশ্য চরিত্র চিত্রণ।

নাট্যশিল্পী বিয়র্ণ্‌সন

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

৪

'সমস্যা' কথাটার অর্থ খুব ব্যাপক, কিন্তু আজকাল সমস্যা বলতেই আমাদের মনে হয় সমাজের স্থবির দেহটাকে নিয়ে নাড়াচাড়ার কথা। এর কারণ খুঁজ্‌তে বেশী দূর যেতে হয় না। সাধারণ মানুষের মন স্বভাবত অত্যন্ত স্থূল এবং কোনো সূক্ষ্ম বস্তুকে সে স্থূলতার মধ্যে প্রবিষ্ট করানো কঠিন। কিন্তু একবার যিনি এ কার্য্যে সমর্থ হন, মানুষ তাঁকে মহাপুরুষ ব'লে গ্রহণ করে। এ যুগের মহাপুরুষদের মধ্যে ইবসেনের জগৎজোড়া খ্যাতি। তিনি যে সমস্যা চিত্রিত করেছেন সে প্রধানত সামাজিক সমস্যা। সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অক্টোপাসের মত এমন বড় এবং চারদিকে ছড়ানো যে তার ব্যবচ্ছেদেই ইবসেনের একটা গোটা জীবন কেটে গিয়েছিল। এর থেকে এ যুগের জনসাধারণের মনে এই সিদ্ধান্ত বসে গেছে যে সমাজ এবং সমস্যা আধার এবং আধেয়ের মত। সমাজের গায়ে যে সব ক্ষত আছে তার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যা লেখা হয় তারই নাম সমস্যা। একটা বড় বস্তুকে বোঝবার ভুলে ছোট ক'রে দেখার এমন দৃষ্টান্ত জগতে ঝুড়ি ঝুড়ি আছে।

সমাজের বাইরে যে সব ক্ষেত্রে সমস্যার শক্তি খুব প্রবল তার মধ্যে একটা—মানুষের মন। মন বস্তুটী অত্যন্ত অসামাজিক অর্থাৎ individualistic। দুটি মুখের চেহারা যেমন এক হয় না, দুটি মনেব চেহারাতেও তেম্নি তফাৎ থাকে। অবশ্য একাকৃতি যমজ ভাইয়ের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়, এবং মনের দিক্ থেকেও সেইরূপ যমজ থাকতে পারে; কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়মেরই সমর্থক বলে একটা কথা আছে। মানসিক সমস্যা নিয়ে কত গভীর নাট্য রচনা হতে পারে তার প্রমাণ বার্ণার্ড্‌ শ'য়ের Candida এবং Man and Superman। কিন্তু সমস্যার এই বিশেষ গঠনটি শ'য়ের লেখার বহু পূর্ব্বে বিয়র্ণ্‌সনের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। বিয়র্ণ্‌সনের সমস্যা দ্বি-স্রোতা;—একটি স্রোত চলেছে সমাজকে বেষ্টন ক'রে, অপর ধারা চলেছে মানব-মনের অন্ধকার রন্ধ্র হতে রন্ধ্রান্তরে। এক কথায় বিয়র্ণ্‌সনের সমস্যা ইবসেন এবং শ'য়ের সমস্যার সমন্বয়। কিন্তু একথা বলবার সময়ে মনে রাখা দরকার যে ইবসেন এবং শ'য়ে যা পরিণতির আকাশে উঠেছে, বিয়র্ণ্‌সনে সে বস্তুর স্থান বাতাসের স্তরে। ইবসেন শুধু নাটক লিখেছেন, এবং তাঁর সে লেখা সমস্যার একটি বিশেষ ধারা নিয়ে; কেন্দ্রীভূত শক্তি যে কত দুর্দ্দম হয়, ইবসেনের লেখা তার প্রমাণ। বিয়র্ণ্‌সন কিন্তু নাটকের সঙ্গে সঙ্গে বহু উপন্যাস লিখে গেছেন। তাছাড়া তাঁর নাটকও জীবনের ভিন্নমুখী স্রোতোধারা নিয়ে।

মানসিক সমস্যার আস্বাদের জন্য বিয়র্ণ্‌সনের "সম্পাদক" (Redaktoren) এবং "লিওনার্দা" (Leonarda) নাটকদুটি পড়া বিশেষ প্রয়োজন। শেষোক্ত নাটকের নায়ক Hagbart লিওনার্দাকে ভালবাসে কিন্তু নিজের এ ভালবাসার কথা সে নিজেই জানতে পারেনি; সে জানত যে লিওনার্দার ভাগিনেয়ী Aagotকে ঘিরেই তার ভালবাসার স্বপ্ন বিকশিত হচ্ছে। লিওনার্দা বহুদিন পূর্ব্বে তার যৌবন অতিক্রম করেছিল, এবং তাকে চারদিক্ থেকে ঘিরেছিল মিথ্যা কলঙ্কের কাহিনী; পক্ষান্তরে Aagot ছিল সুন্দরী তরুণী। এক্ষেত্রে Hagbart যে কেন Aagotকে ছেড়ে লিওনার্দাকে ভালবাসল তা ভাব্‌তে গেলে প্রেমদেবতার অন্ধত্বে বিশ্বাস করতে হয়। নিজের মনের কাছে প্রতারিত হবার পরে ঘটনার আবর্ত্তনে Hagbart যখন স্পষ্টত দেখতে শিখল, তখন সে জানতে পারল নিজেকে সে এ যাবৎ কতখানি ভুল বুঝে এসেছে। পরিশেষে সে তার মানসিক অবস্থার কথা লিওনার্দার কাছে ব্যক্ত করে বলছে, 'I love you! It is you I have loved in her—since the very first day. I love you!" লিওনার্দার নিজের হাতে-গড়া তরুণী Aagotএর মধ্যে স্বভাবতই লিওনার্দার ছায়া পড়েছিল। মগ্নচৈতন্যে একজনকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তচৈতন্যে অপরের মধ্যে সেই প্রিয়ার ছায়াকে ভালবাসা—এ থিওরি আজকালকার মনস্তত্ত্বজ্ঞের কাছে নূতন নয়, কিন্তু যে সময়ে বিয়র্ণ্‌সন 'লিওনার্দা' লিখেছিলেন তখন পর্য্যন্ত মনোবিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেনি।

৫

যুগ্ম সূর্যোদয় নরওয়ের আধুনিক সাহিত্যাকাশের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই সূর্য্যদ্বয় অর্থাৎ হামসুন ও বোয়ার—একে অপরের পরিপূরক। যে আলো হামসুনে নেই সে আলো বোয়ারে আছে, এবং যে তাপ বোয়ারে নেই সে তাপ হামসুনে আছে। হামসুন এবং বোয়ারের উদয় হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যদ্বয়—ইবসেন এবং বিয়র্ণ্সনের—অস্তগমনের পরে। কিন্তু ইবসেন ও বিয়র্ণ্সন পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন না, যেহেতু তাঁদের দুজনেরই মনের কেন্দ্রবিন্দু এক, শুধু পরিধির তফাৎ। উক্ত কারণে তাঁদের একজনের আলোচনায় অংশত দ্বিতীয়ের আলোচনা করা হয়। মিলের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, এখন এই দুজনের রচনার মধ্যখানে অমিলের যে ভেদরেখা আছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে diagnosis বা রোগ-নির্ণয় ব'লে একটা কথা আছে। রোগের স্বরূপ-নির্ণয় না হলে তার চিকিৎসা সম্ভবপর নয়। অপরপক্ষে শুধু ডায়াগ্নোসিসের ক্ষমতায় চিকিৎসা চলে না, তার জন্য আর এক বস্তু চাই—ফামা-কোপিয়া বা ভৈষজতত্ত্বের জ্ঞান। সমাজের দেহ-মনের রোগনির্ণয়ে ইবসেন ও বিয়র্ণ্সন উভয়েই কৃতকার্য্য হয়েছেন। কিন্তু ইবসেন সে রোগের ব্যবস্থাপত্র দেননি; তিনি শুধু তার প্রকৃতির কথা লিখে গেছেন। পক্ষান্তরে বিয়র্ণ্সন রোগনির্ণয়ান্তে তার থেকে মুক্ত হবার উপায় দেখিয়েছেন। সমস্যার জটিল জাল বোন্বার পর কঠিন হস্তে সে জাল তিনি ছিন্ন করেছেন। 'লিওনার্দা' ও 'দ্বন্দ্বে আহ্বান' পড়লে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তাছাড়া বিয়র্ণ্সন যতই নাট্যরচনা করুন, মনে মনে তিনি চিরদিন ছিলেন একজন কথা-সাহিত্যিক। তাঁর নাটকের বুকে হাত রাখলে যে স্পন্দন বোধ করা যায় সে আসলে উপন্যাসের হৃৎস্পন্দন। নাট্যের দেহে উপন্যাসের হৃদয় সন্নিবিষ্ট করেও তিনি সুন্দর সঙ্গতি রেখে লিখতে পেরেছিলেন। কাজটা কঠিন; কিন্তু অপরের হাতে যা রক্তহীন, নিষ্প্রাণ হয়ে উঠত, বিয়র্ণ্সনের হাতে তা স্বাস্থ্যের প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ডেন্মার্কের সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Gerog Brandes লিখেছেন, "Ibsen is in love with the idea and its psychological and logical consequences···corresponding to this love of the abstract idea in Ibsen, we have in Bjornson the love of humankind." এ কথাগুলোয় বিয়র্ণ্সন সম্বন্ধে একটা বড় সত্য প্রকাশমান। ইবসেনের লেখার মূলে আছে মনঃশক্তি এবং বিয়র্ণ্সনের লেখায় আছে বোধশক্তি। বুদ্ধির আলোয় ইবসেন যা দেখতে পেয়েছেন, বিয়র্ণ্সন তা পেয়েছেন বোধের আলোয়। বিয়র্ণ্সনের এই অনুভব-প্রবণতার অপর এক নাম বিশ্বমানবতা। মানুষকে তিনি বুঝেছেন ভালবাসা দিয়ে।

বিয়র্ণ্সনের লেখায় সঙ্গতি যতই থাক্ সংহতি বড় বেশী নেই। তাঁর শক্তিধারা বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে প'ড়ে গতিবেগ হারিয়েছে। এই জন্য ইবসেনের লেখার আকর্ষণী প্রতিভা তাঁর লেখায় নেই। ১৯০৩ সালে বিয়র্ণ্সন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, অথচ ইবসেনের মত খ্যাতি তিনি কোনো দিন লাভ করতে পারেননি। এই খ্যাতিভেদের মূলে আরো এক কারণ বিদ্যমান। বিয়র্ণ্সন সমাজের বহু ব্যাধির নির্ণয় এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করেছেন, কিন্তু যে সব ব্যাধি কুষ্ঠের মত কুৎসিত তার দিকে তিনি ফিরে চান্নি। অপর পক্ষে ইবসেনের মন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মন; তাঁর কাছে ব্যাধির ভেদ-বিচার নেই। 'Ghosts' এর মতন লেখা বিয়র্ণ্সনের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁর কাছে মানুষ চিরদিনই আলোর সন্তান, শুধু মাঝে মাঝে সে আলো নিষ্প্রভ হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে।

ইবসেনের খ্যাতির বিশ্লেষণ করলে আর একটা সূক্ষ্ম কারণ খুঁজে পাওয়া যায়; সে তাঁর Doll's Houseএর রচনা। উক্ত পুস্তকে ইবসেন নারীজাতির পক্ষাবলম্বন ক'রে পুরুষের বিপক্ষে শরচালনা করেছেন। পুরুষের পক্ষ নিয়ে লেখার চেয়ে নারীর স্বপক্ষে লেখার অনেক বেশী সম্মান পাওয়া যায়,—তার প্রমাণ ইবসেন এবং Strindberg-

নাট্যশিল্পী বিয়র্ণ্‌সন

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

এর খ্যাতি-ভেদ। বিয়র্ণ্‌সন নারীর জন্য কথনো অস্ত্র ধরেননি; সেই জন্য 'Doll's Honse'এর চেয়ে তাঁর লেখা নিকৃষ্ট না হলেও সে লেখা "Dollus House"এর গৌরব কোনো দিন লাভ করতে পারেনি।

বাংলার কথাসাহিত্য ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু তার নাট্যসাহিত্য ইউরোপীয় শিল্পের কাছে লজ্জায় অধোমুখ হয়। এ কথাটা আমাদের জাতীয় মনে এযাবৎ উদিত হয়নি কেন তা ভেবে পাওয়া যায় না। কথাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি খুব ভাল কথা, কিন্তু দেহের শুধু একটা অঙ্গ যদি বাড়তে থাকে, এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সমগ্র দেহটাকে দেখে প্রীতির সঞ্চার হবে না। খণ্ডের মধ্যে যেমন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন, সমগ্রের মধ্যেও তেম্নি। অংশবিশেষ নিয়ে সাহিত্যের চলতে পারে না, বাঁচ্‌তে হলে তাকে বাড়তে হবে, এবং এ বৃদ্ধি হওয়া উচিত তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত। কোন পথে গেলে বাংলা নাট্য নূতন রক্ত, নূতন স্বাস্থ্য লাভ করবে তার সবিশেষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তবে এ কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার পুরাণো বাঁধা পথ সংস্কারের বাইরে চলে গেছে; নূতন রাস্তা তাকে গড়ে নিতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' এবং শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' এম্নি পথের ইঙ্গিত; কিন্তু উক্ত ইঙ্গিতে নির্ভর ক'রে কোনো পথিক সম্মুখে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেননি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক (তার মধ্যেও অধিকাংশ রূপক-নাট্য) ছাড়া বাংলায় এমন কোনো নাটক এ পর্য্যন্ত বেরোয়নি যার মধ্যে আইডিয়ার তীব্র দীপ্তি আছে। বিয়র্ণ্‌সনের প্রতিভা ইউরোপের সব দেশের নাট্যসাহিত্যে নূতন আলো এনেছে। কিন্তু বাংলাব নাট্যশিল্প সে আলোর আস্বাদ এখনো পায়নি। তার প্রধান কারণ আমরা পুরাতন রচনারীতির মৃত দেহ-টাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছি, এবং ভুলে গেছি যে একদিন যে বস্তুটার প্রয়োজন ছিল, আজ তার প্রয়োজনী-য়তা কালস্রোতের অদম্য গতিবেগে ফেনার মত নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নগর-পুঞ্জ

১। খুলদাবাদ ২। কাগজ-ই-পুর ৩। দৌলতাবাদ ৪। ঔরঙ্গাবাদ

খুল্‌দাবাদ বা রোজা—দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলির কথা বলিতে বসিলে, আরো দুই একটি প্রাচীন কীর্ত্তি-পূর্ণ নগরের কথা না বলিয়া থাকা যায় না। জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রায়' আলোচিত এলোরার ভাস্কর্য্যতীর্থ-সমন্বিত পর্ব্বতটির গাত্র বেষ্টন করিয়া একটি পথ খাড়া ভাবে উঠিয়া গিয়াছে। কিছু দূর গিয়া এলোরার মন্দিরগুলি আর দেখা যায় না। এইখান হইতেই খুলদাবাদ সহরের আরম্ভ। এই সহরটি 'রোজা' (অর্থাৎ কবর-স্থান) নামেই অধিকতর পরিচিত। এই নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়া এখানে সাধু-ফকীর, রাজা-উজীরের প্রায় এক হাজার পাঁচ শত কবর আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির উপরে গম্বুজ থাকায় সেগুলি দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য হইতে পারে। ভারতের 'শত-সম্রাট-প্রেয়সী' দিল্লী নগরীকে ইংরাজেরা 'City of Tombs' কবর-নগরী আখ্যা দিয়া উহার একটি নাম বাড়াইয়া বস্তুতঃ তৈলসিক্ত মস্তকেই তৈল সিঞ্চন করিয়াছেন, নহিলে আমাদের আলোচ্য নগরটিও কিছু কম 'City of Tombs' নহে!

খুল্‌দাবাদের কবরসমূহের মধ্যে একটি কবর অতি সাধারণ এবং সর্ব্বপ্রকার কারুকার্য্য ও বাহুল্য বর্জ্জিত। উহারই কুক্ষিগত হইয়া দুর্দ্দান্ত মোগলসম্রাট আওরাঙ্গ্‌জেবের নশ্বর দেহাবশেষ বিরাজ করিতেছে। এই ধর্ম্মান্ধ ঋষি-কল্প সম্রাটের শেষ জীবন যেরূপ সাদাসিদা ও সর্ব্ববিধ বাহুল্যহীন ছিল, রোজার এই কবরটিতেও উহার তদ্রূপ ভীষণ গম্ভীরতা ও সংযমের মর্য্যাদার কিছুমাত্র হানি ঘটে নাই। অপর একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান, হায়দ্রাবাদের নিজাম, বোধহয় ভাবিয়াছিলেন যে আওরাঙ্গ্‌জেব অধিকতর সুন্দর স্মৃতি-মন্দিরের অধিকারী এবং বোধ হয় এই ধারণারই বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগ্রার শিল্পীদের দ্বারা একটি চমৎকার মর্ম্মর-নির্ম্মিত জাফ্রীর বেরা করাইয়া তাঁহার কবরটি উহা দ্বারা বেষ্টিত করাইয়া দেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত যে চিত্র দেওয়া হইল, তাহাতে কবরটির এই শেষোক্ত অবস্থান্তরই পরিদৃষ্ট হইবে।

গোলকুণ্ডার শেষ নৃপতি তানা শা', যাঁহাকে আওরাঙ্গ্‌জেব বহুদিন ধরিয়া নির্দ্দয়-ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও কবর এই রোজাতে আছে। তানা শা'র বিলাসিতা, গন্ধদ্রব্য-প্রিয়তা ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা সম্বন্ধে অনন্ত কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁহার শেষ বিশ্রাম-স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, পার্থিব সৌন্দর্য্যের, বিলাসের ও ঐশ্বর্য্যের নশ্বরত্ব স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরিত হইয়া উঠে।

প্রথম নিজাম আসফ্‌ খাঁ, হায়দ্রাবাদের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার বংশের আরও কয়েকজনের সহিত খুল্‌দাবাদের মৃত্তিকা-নিম্নে বিশ্রাম করিতেছেন। যে সমস্ত প্রসিদ্ধ নৃপতিবর্গ রোজার অগণিত কবরের নীচে অন্তিম শান্তি-শয়নে শায়িত, তন্মধ্যে মালিক অম্বরের নামের সহিতই অভিনবত্ব বিজড়িত। মালিক অম্বর একজন কাফ্রী ক্রীতদাস ছিলেন। স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উদ্যম ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়া অল্পে অল্পে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

একজন প্রসিদ্ধ সেনানায়ক হইতে দক্ষ রাষ্ট্রনৈতিক, ও অবশেষে এক স্বহস্ত-রচিত রাজ্যের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খুল্‌দাবাদে অনেকগুলি সাধু ও ফকিরের গোরস্থান আছে এবং সেগুলি সারা ভারতবর্ষে প্রখ্যাত। সংবৎসর ধরিয়া মুসলমান পর্য্যটকেরা এ স্থানে ভীড় করেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইয়া কবরগুলির চতুষ্পার্শ্বে এক একটি নগর বসাইয়া দেয়। বহু শত বৎসর ধরিয়া খুল্‌দাবাদের বিস্তীর্ণ প্রান্তর কবর-ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে থাকায় তত্রস্থ স্মৃতি-সৌধসমূহের কারুকার্য্যে প্রাথমিক মোসলেম শিল্পের নিদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক আদর্শ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। তবে তন্মধ্যে মোগল-স্থাপত্যের প্রভাবই সমধিক।

এই বিশাল কবরের-রাজ্যে একটি সুবৃহৎ, সুসজ্জিত ও সুরম্য অট্টালিকা আছে যাহা কবর নয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম বহুব্যয়ে উহা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের ও রাজ-পুরুষদের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা দাক্ষিণাত্যের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করিতে আসেন তাঁহাদের পক্ষে ইহার তুল্য 'আস্তানা' আর নাই। এখানে 'ডেরা' গাড়িয়া একখানি 'মোটরকার' লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে অত্যল্প সময়ে ও অতিশয় আরামের সহিত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ এবং অজন্তা এলোরা দর্শন হইতে পারে। যাহাতে পথশ্রান্ত ও পর্য্যটন-ক্লান্ত মোটরবিহারী এখানে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সুবিধা পাইতে পারেন তাহার জন্য কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি নাই।

আওরঙ্গজেবের সমাধি — খুলদাবাদ বা রোজা

কাগজ্‌-ই-পুর—পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদের মোটর-বিহারী কাল্পনিক পর্য্যটক মহাশয় যদি তাঁহার গাড়ীখানিকে কয়েক মিনিট ছুটাইতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমরা কাগজ্‌-ই-পুরে পৌঁছাই! আওরঙ্গজেব, উত্তর ভারত হইতে কারিগর আনাইয়া এখানে হস্ত-প্রস্তুত কাগজের কারখানা স্থাপিত করেন, তাহা হইতেই এই সহরটির এ প্রকার বিচিত্র সংজ্ঞার উদ্ভব। যন্ত্র-প্রস্তুত কাগজ যদিও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন স্থায়ী হয়, তথাপি উহার প্রচার এত অধিক যে দরিদ্র পল্লীকারিগরেরা নিজামের যথোচিত পৃষ্ঠ-পোষকতা

সত্ত্বেও উহার সহিত নিজেদের হস্তজাত দ্রব্যকে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র দাঁড় করাইতে পারে না। তাহারা যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ও যে নিয়মে কাগজ প্রস্তুত করে তাহা বহু শতাব্দীর পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের দক্ষতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, কর্ম্মশক্তি এবং সর্ব্বোপরি পরাজয়-স্বীকারে অনিচ্ছা, প্রশংসার্হ।

দৌলতাবাদ যাওয়ার পথটিকে নির্ব্বিকার ভস্মভূষণ ভোলানাথের মত বহুযুগ ধরিয়া আপনার ধূসর বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছে। দৌলতাবাদের দুর্গটি পূর্ব্বকালের স্থপতিদের অত্যাশ্চর্য্য এক কীর্ত্তি! সমতল উপত্যকা হইতে একটি শৃঙ্গাকৃতি পর্ব্বতচূড়া হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। দেড়শত ফিট ধরিয়া উহা খাড়া ভাবে অবস্থিত ও সেই গিরিগাত্র আবার

মৌলানা জার জারি জার বখ্‌ৎ এর সমাধি। খুলদাবাদ বা রোজা

দৌলতাবাদ—কয়েক মাইল দূরে ৭০০ ফিট উচ্চে দৌলতাবাদের দুর্গ। হিন্দুরা ইহাকে 'দেওগড়' (দেবতার দুর্গ) বলে। একটি অটল নির্ব্বিকার পর্ব্বতশ্রেণী

কৃত্রিম উপায়ে মসৃণ করা হইয়াছে। এইরূপে পর্ব্বতটীকে সম্পূর্ণ দুরারোহ করার পক্ষে কোন চেষ্টার ক্রটি হয় নাই। 'দুর্গ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে আরো সার্থক করিবার জন্য

শ্রীরামেন্দু দত্ত

উহার চতুর্দ্দিকে একটির পর একটি করিয়া সাতটি দেউড়ী ও এই সপ্ত দেউড়ীকে বেষ্টন করিয়া একটি সুগভীর পরিখা বর্ত্তমান।

পর্ব্বত-শৃঙ্গস্থ কক্ষগুলিতে যাইবার জন্য দশ হইতে বারো ফিট উচ্চ ও প্রস্থেও সেই পরিমিত একটি সুড়ঙ্গপথ গিরিগাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে। উপরে গিয়া এই সুড়ঙ্গ-পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, পূর্ব্বকালে সেখান হইতে দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত পথটিকে একটি সুবৃহৎ লৌহ-চাদর দিয়া আচ্ছাদিত করা হইত। অগ্নি-প্রজ্বলন দ্বারা এই আবৃত পথিমধ্যস্থ কাজে লাগাইয়াছিল যে তৎকালে এই দুর্গ সর্ব্বতোভাবে অজেয় ও আত্মরক্ষাক্ষম ছিল। নিষ্ঠুর ভাগ্যের এক অভাবনীয় কৌশলে রাজা রামদেও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাকে মুসলমানদের করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যখন বনমধ্যে মৃগয়া-নিরত সেই সময়ে চর আসিয়া খবর দিল শত্রু নিকটবর্ত্তী। তিনি অমনি আদেশ দিলেন, দুর্গমধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক। দীর্ঘকাল ধরিয়া অবরোধ চলিলেও যাহাতে খাদ্যানটন না ঘটিতে পারে তদ্রূপ

দৌলতাবাদ দুর্গ

বায়ুকে কৃত্রিম উপায়ে ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত করিয়া সুড়ঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী গবাক্ষসমূহ দিয়া পরিষ্কৃত বায়ুপ্রবাহের আমদানী করা হইত।

তাৎকালিক প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা এই দুর্গ জয় করা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব ছিল। পর্ব্বত-শৃঙ্গস্থ একটি উৎসের জল এই দুর্গমধ্যে কখনো জলকষ্ট জানিতে দেয় নাই। প্রকৃতিদেবীর কৃপালব্ধ উপায়গুলিকে মানব তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তি ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা এরূপে নিজেদের ব্যবস্থার জন্য লোক ছুটিল। উত্তরভারতগামী একদল বণিক মুসলমান লুণ্ঠনকারীর আগমন-সংবাদে ভীত হইয়া ত্রস্তভাবে পলায়ন কালে পথিমধ্যে কতকগুলি বস্তা ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। রাজা রামদেওয়ের প্রেরিত লোকেরা এই সকল বস্তা দেখিতে পাইয়া সবগুলিকেই সযত্নে দুর্গমধ্যে আনয়ন ও সংরক্ষণ করিল। রাজার লোকেরা ভাবিয়াছিল যে ঐ বস্তাগুলির মধ্যে নিশ্চয় গম আছে। বিধিদত্ত এই অমূল্য দান সংগৃহীত হইবার

পরক্ষণেই দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল ও মুসলমান সৈন্য দুর্গের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিল। কয়েক দিবসের অবরোধের ফলে যখন দুর্গমধ্যে খাদ্যের অনটন আরম্ভ হইল, তখন রামদেও অমাত্যবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া ভাণ্ডারে সঞ্চিত আহার্য্যের তদারক করিতে আসিলেন। প্রাগুক্ত থলিয়াসমূহের বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া যখন তাহাদের আবরণ উন্মোচিত হইল তখন গমের পরিবর্ত্তে তাহার মধ্য হইতে লবণ বাহির হইয়া পড়িল! রাজা দেখিলেন, সম্মুখে অনাহার ও দুর্ভিক্ষের করাল বিভীষিকা—তিনি হৃদয়-হীনের মত প্রজাবর্গের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে স্বীয় স্বার্থাপেক্ষা ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারিলেন না,—রামদেও দুর্গের সহিত স্বীয় স্বাধীনতা শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষা করিলেন।

কিংবদন্তী আছে, একটি গোপন সুড়ঙ্গ-পথ দুর্গ হইতে এলোরার কোনো এক মন্দির পর্য্যন্ত মৃত্তিকা-গর্ভে চলিয়া গিয়াছে। এই পথটি নাকি দেওগড়ের হিন্দু রাজা, রাজ-পরিবার ও পারিষদবর্গের মন্দিরে পূজা দিতে যাইবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে রামদেওয়ের অপরূপা সুন্দরী কন্যা দুর্গ-সমর্পণের ঠিক প্রাক্কালে এই সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিয়া পর্ব্বতগাত্রস্থ একটি মন্দির মধ্যে আত্মগোপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কতকগুলি মুসলমান সৈনিক তাঁহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া বন্দী করে ও ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এলোরার কক্ষ-গুলি ও তন্মধ্যস্থ মূর্ত্তি-চিত্রাদি নির্দ্দয়ভাবে ধ্বংস করে।

দৌলতাবাদ দুর্গের প্রবেশ পথ

দুর্গের পাদদেশে জনৈক মুসলমান বিজেতার দ্বারা স্থাপিত একটি বিজয়-স্তম্ভ আছে, উহার নাম 'চাঁদ-মিনার'। পনর ফিট উচ্চ কতকগুলি পাথরের কক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে অধিক জায়গা জুড়িয়া অবস্থিত—ইহাই চাঁদ-মিনারের ভিত্তি স্বরূপ, ও তদুপরি এই স্তম্ভ দণ্ডায়মান। উচ্চতায় এই স্তম্ভ একশত ফিটের কাছাকাছি এবং গোড়ার দিকে স্তম্ভটির পরিধিও প্রায় সত্তর ফিট! যত উপরে উঠিয়াছে এই পরিধি তত কমিয়া কমিয়া আসিয়াছে। তিন স্থলে তিনটি বৃত্তাকৃতি কারুকার্য্যশোভিত বারান্দা মিনারটিকে যেন তিনটি চন্দ্রহার পরাইয়া দিয়াছে! দুর্গের প্রবেশ-পথের যে চিত্রটি এখানে দেওয়া হইল পাঠকেরা তাহাতে দেখিবেন যে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই স্তম্ভটি অতি সুন্দর মানাইয়াছে। এই সু-উচ্চ মিনারের গাত্র পূর্ব্বে চাকচিক্যশালী মসৃণ পারস্যদেশীয় টালিতে আবৃত ছিল, কাল-প্রভাবে সেগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে খসিয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম এই স্তম্ভটির সংস্কারের জন্য বহুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন।

ঔরঙ্গাবাদ—দৌলতাবাদকে পশ্চাতে ফেলিয়া কিয়দ্দূর গেলেই ঔরঙ্গাবাদের স্তম্ভচূড়া ও গম্বুজগুলি দৃষ্ট হয়। প্রায় আট মাইল দক্ষিণে, সবুজ উদ্ভিজ্জের মধ্যে, এগুলি উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। দূর হইতে ঔরঙ্গাবাদকে একটি উদ্যানপূর্ণ নগর বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে ইহা প্রকৃত-পক্ষে ছিলও তাই। এখন ঔরঙ্গাবাদের যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাকে ইহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের প্রেতমূর্ত্তি বলা চলে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহার সমস্ত সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

যদিও ঔরঙ্গাবাদের অর্থ ঔরঙ্গজেবের শহর, তথাপি ঔরঙ্গজেব ইহাতে পদার্পণ করিবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বেও ইহা বিদ্যমান ছিল। ইহার শিশুকালে নাম ছিল খিরকী; তখন ইহা একটি ছোটখাট অনাড়ম্বর পল্লীগ্রাম মাত্র। কৈশোরে ইহা মালিক অম্বরের রাজধানী হইবার সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করে; তাহার পর মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ ইহার নূতন নামকরণ করিলেন ফতেনগর। তাহার পর আসিল ইহার যশের ও সমৃদ্ধির যৌবন! শাহজাহানের রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেব যখন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া

ঔরঙ্গাবাদের আলমগিরি মসজিদ

দাক্ষিণাত্য শাসন করিতেছিলেন, তখন এই স্থানটিকে তিনি তাঁহার প্রধান অবস্থিতি-স্থান রূপে মনোনীত করিয়া নাম দিলেন,—ঔরঙ্গাবাদ। এই ঔরঙ্গাবাদকে কেন্দ্র করিয়া তিনি তাঁহার অদম্য রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা, শত সহস্র যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়া পূর্ণ করিলেন। যৌবনে যখন তাঁহার হস্ত অসুরের বিক্রম ধারণ করিত, যখন তাঁহার তারুণ্যপূর্ণ মন প্রেমের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হইতে জানিত, যখন তাঁহার রূপমুগ্ধ চক্ষু রস-সৌন্দর্য্যের মাধুরী উপলব্ধি করিত ও হৃদয় তাহা উপভোগ করিত, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, যখন তাঁহার চক্ষুতারকা নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, পার্থিব রূপমাধুরী হৃদয়ে আর রঙ্ ধরাইতে অসমর্থ হইল, মন যখন বর্ণ-বিলাস ও সৌন্দর্য্য-লীলার প্রতি তিক্তভাব ধারণ করিল, নশ্বর রস-লিপ্সা যখন অবিনশ্বর ভগবৎ পদে পর্য্যবসিত হইল, যখন তিনি মনে-প্রাণে অন্তরে-বাহিরে কঠোর সংযমী তপস্বী হইয়া উঠিলেন, তখন পর্য্যন্ত এই ঔরঙ্গবাদের বাসভবন তিনি পরিত্যাগ করেন নাই।

ঔরঙ্গাবাদ মসজিদ

ঔরঙ্গজেবের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে উহার স্থাপত্য বা কারুকার্য্য দর্শককে আকৃষ্ট করিবে না ; সৌন্দর্য্য-বিলাসী মোগল-সম্রাট্ শাহজাহানের পুত্রের উপযুক্ত সৌন্দর্য্য-বিলাস উহার মধ্যে ধরা পড়িবে না ; নিকটবর্ত্তী মসজিদের বারান্দার ইতিহাস শুনিলেও মন উল্লসিত হইয়া উঠিবে না। প্রাসাদের সন্নিহিত মসজিদের বারান্দাটি জাফ্রী দিয়া ঘেরা। শ্বেত-গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত, শুভ্র-কেশ রাজ-তপস্বী ঔরঙ্গজেব,

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সাদাসিদা পোষাক পরিয়া এইখানে বসিতেন। এইখানে বসিয়া তিনি নিজের জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সত্য সত্যই স্বহস্তে কোরাণ-শরীফ নকল করিতেন! ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রজাবৎসল নাসীরুদ্দিনের গল্প নয়, ইতিহাস-লাঞ্ছিত ধর্ম্মান্ধ সন্ন্যাসী-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবন-কথা। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে অপরের পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে পুষ্ট হওয়া সুধু যে অপৌরুষেয় তাহা নহে, বস্তুতঃ তাহা কাপুরুষেয়! প্রত্যেক মানুষ তা' তিনি রাজাই হউন আর সম্রাটই হউন, নিজের পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন, এই ছিল তাঁহার আদর্শ! রাজপ্রাসাদের অল্প দূরে রাজ-পারিষদগণের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ। বলা বাহুল্য সম্রাট-পোষ্য এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবরা সম্রাটের এতাদৃশ অ-সম্রাট-জনোচিত মনোভাবের সমর্থন করিতেন না; বরং তাঁহার মত বাহুল্যবর্জ্জিত জীবন-যাপনকে ফকিরী-গ্রহণের সামিল ও তদ্রূপই হেয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে তাঁহাদের উজীরী-আমিরী মর্য্যাদা বজায় থাকে সেইরূপ জীবনই যাপন করিতেন।

বস্তুতঃ ঔরঙ্গজেবকে আমরা যতটা সয়তান বলিয়া জানি, তিনি প্রকৃতপক্ষে ততটা নিন্দনীয় ছিলেন না। আমাদের পুঁজি, বৈদেশিকের লেখা পুথি; খুঁজিয়া-পাতিয়া, পুরাতন ধারণা বদ্‌লাইবার প্রয়োজন হইলে পরিপূর্ণভাবে বদ্‌লাইয়া, কিছু পড়িবার মত উদ্যম বা চেষ্টা কয়জনের মধ্যে আছে? স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে লিখিত ইতিহাসে যখন দেখি লেখে, ঔরঙ্গজেব অত্যাচারী সয়তান, সিরাজউদ্দৌলা পাপাত্মা দুরাচার, আকবর দেবাদিদেব ব্রহ্মার মত সংরক্ষক ও শিবাজী হীন, কাপুরুষ, পাহাড়িয়া ছুঁচো (mountain rat), অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসি ঔরঙ্গজেব সয়তানের সর্দ্দার, সিরাজউদ্দৌলা পরম দুরাত্মা, আকবর মহাপুরুষ এবং শিবাজী তস্কর। কিন্তু অগ্নির ন্যায় সত্য কখনো মিথ্যা গ্লানির ভস্মে আচ্ছাদিত থাকে না। মধ্যে মধ্যে এখান-সেখান হইতে তাহার দু' একটি স্ফুলিঙ্গ যতই আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, স্বার্থানুসন্ধিৎসুদের মিথ্যা প্রচেষ্টা ততই ছিদ্র-বহুল হইয়া সত্য-পিপাসুদের নিকট স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছে। তাই আমরা বিশ্বাস করিতে শিখিতেছি যে নাসিরুদ্দিন যেমন টুপী সেলাই করিয়া নিজের খরচ চালাইতেন, ঔরঙ্গজেবও সেইরূপ কোরাণ নকল করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিতেন—ইতিহাস প্রথমোক্ত নৃপতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু শেষোক্তের নিন্দায় সহস্রমুখ; এরূপ না হইলে পরবর্ত্তীরা প্রশংসনীয় হয় কিরূপে? তাই আজ আমরা নূতন করিয়া ইতিহাসের পড়া তৈয়ারী করিতেছি যে অন্ধকূপে হত্যার ব্যাপারটি কোন কালেই সংঘটিত হয় নাই, আর যদিও বা ঐরূপ একটা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহাও সিরাজউদ্দৌলার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, আদেশে ত নহেই। তাই আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি যে গোষ্ঠীশুদ্ধ মুসলমান আক্রমণ-কারীরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া, দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের যে সর্ব্বনাশটা না করিতে পারিয়াছে, একা আকবর, ঔদার্য্যের ও সমদর্শিতার ভাণ দেখাইয়া, রাজপুত কুলতিলকগণকে ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদার বিনিময়ে কিনিয়া লইয়া এবং পবিত্র রাজপুত কুলললনাদিগকে মুসলমানদের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষতি করিয়াছিলেন। কি মর্ম্মন্তুদ বেদনায় রাণা প্রতাপ রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বনমধ্যে স্ত্রী-পুত্র লইয়া অনশনে ভিখারীর মত দিন কাটাইয়াছিলেন, তথাপি আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করাকে শেষ দিন পর্য্যন্ত সমভাবে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছিলেন। কত দুঃখে মৃত্যুশয্যার পার্শ্বোপবিষ্ট সেনাপতিগণকে বলিয়াছিলেন, "যতদিন না চিতোর উদ্ধার করিতে পার, পর্ণকুটিরে গিরিগহ্বরে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়ো তথাপি মোগল-অনুগ্রহ-পুষ্ট হইয়া অট্টালিকায় রাজ-শয্যায় শয়ন করিয়ো না, স্বর্ণ বা রৌপ্যপাত্রে আহার করিয়ো না, শ্মশ্রু-মুণ্ডন করিয়ো না।" কত দুঃখে তাঁহার অসমাপ্ত কাজ পশ্চাতে রাখিয়া তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিলে আকবরের স্বরূপও ধরা পড়িবে।

সত্য একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করে বলিয়াই রামদাসের গৈরিক পতাকাধারী, ভিক্ষুকের প্রতিনিধি, রাজ-তপস্বী শিবাজীকে আজ আমরা পূজা করিতে শিখিয়াছি। 'পাহাড়ীয়া ছুঁচা' রূপে নহে, স্বদেশভক্তিতে, বলে বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, দেশোদ্ধার ব্রতের অদম্য, অপরাজেয়, একনিষ্ঠ সাধক বলিয়া। কলঙ্ক-মসীলেপনকারী তুচ্ছ স্বার্থান্বেষীদের

সকল প্রচেষ্টাই একদিন এইরূপে ধীরে ধীরে বিফল হইয়া যাইবে।

যাহা হউক আমরা আবার ঔরঙ্গাবাদের কথায় ফিরিয়া যাই। এই সহরটির বহির্দ্দেশে সুন্দরী রাবিয়া দৌরাণীর মর্ত্ত্য মাধুরী-মণ্ডিত তনুটির কবর, 'বিবিকা-মক্‌বারা' বিদ্যমান। যুবক ঔরঙ্গজেবের হৃদয় যখন যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গ-প্রবাহে উদ্বেল, চক্ষে যখন তাঁহার সুষমা-স্বপনের মায়া, প্রেমের রঙীন স্বপ্নে অন্তর মন ভরপূর, সেই সময় তন্বী রূপসী রাবিয়া দৌরাণী তাঁহার তরুণ হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বেগমের পুত্র আজাম শা মায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কবরের উপর আগ্রার তাজের অনুকরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। আগ্রার ও ঔরঙ্গাবাদের এই স্মৃতিসৌধ দুইটি যথাক্রমে পিতামহ ও পৌত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং দুই পুরুষের ব্যবধান বিশিষ্ট; কিন্তু আগ্রার মর্ম্মর-সৌধের সহিত ঔরঙ্গজেবের প্রিয় মহিষীর এই কবরটির কত পার্থক্য! প্রতি ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাজের কি অপরূপ রূপ প্রকাশিত হইতে থাকে! বর্ষাস্নাত শ্বেত মর্ম্মরচ্ছবি; কাহার অশ্রুধৌত দীর্ঘশ্বাসের মত মনে হয়! শরৎকালে যমুনার নীল জলে প্রতিবিম্বিত তাজমহল যেন স্বপ্ন-মহলে পরিণত হয়; হেমন্তে, শীতে, কুয়াসার অন্তরালে তাজমহল প্রেমিকের চক্ষে যেন প্রিয়ার বাষ্প-মলিন আঁখিতারার রূপ ধারণ করে; ফাল্গুনে মালঞ্চের কুসুমদাম ও শ্যাম-কিসলয় যেন তাজের গলায় মালা দুলাইয়া দেয়! আজ কত যুগ ধরিয়া এই অপরূপ রূপ-নিকেতন স্বীয় অম্লান সৌন্দর্য্যে বিশ্বের বিস্ময় ও পূজা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে! সর্ব্বধ্বংসী নিষ্ঠুর মহাকাল মানবের মত নিষ্ঠুর হয় নাই, সে প্রেমের সম্মান রাখিয়াছে, সম্রাট-প্রেমিকের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে সে
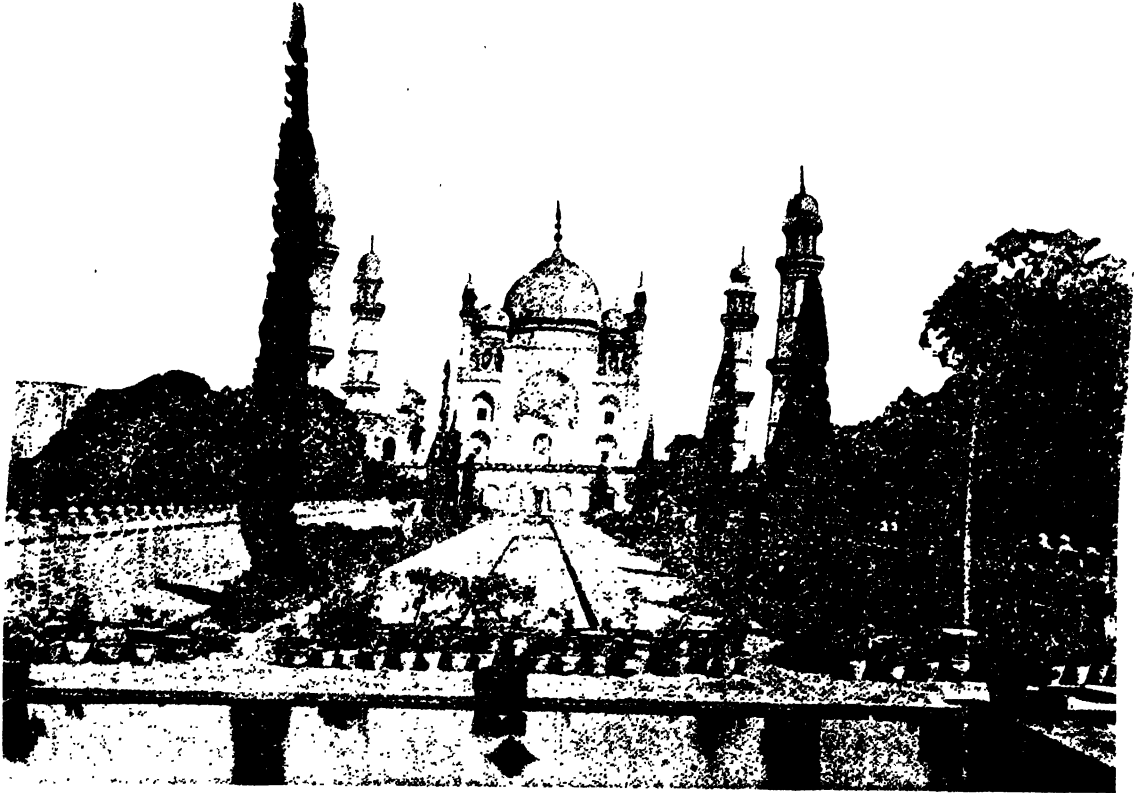
আগ্রার তাজের নকলে ঔরঙ্গাবাদের বিবিকা মাকবারা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়া এ পর্য্যন্ত উহাকে অক্ষত থাকিতে দিয়াছে, দেয় নাই কেবল মানব। কালের করাল হস্ত তাজের মণিমুক্তা, বর্ণ-বৈচিত্র্যময় বহুমূল্য প্রস্তরাদি খসাইয়া লইয়া যায় নাই, তাহার হস্ত তাজের মর্ম্মর খুলিয়া লইয়া অন্তদেশের সৌধ-নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহার করে নাই। এই অতুলনীয় স্মৃতি-সৌধের যা কিছু অপমান, তাহার আদিম সৌন্দর্য্যের যা কিছু হানি, সমস্ত ঘটাইয়াছে মহাকাল অপেক্ষাও হৃদয়হীন, লোভান্ধ মানবে!

'বিবিকা মক্‌বারা' ইতোমধ্যেই কিন্তু কাল-হস্তে লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছে। তাহার চুণের পলাস্তারা খসিয়া পড়িয়াছে, বর্ষার জলে তাহার গাত্র হতশ্রী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মালঞ্চ শুকাইয়াছে, পাতাবাহার লতাগুল্ম মরিয়া গিয়া কুবর্ণন বন্ধুর পার্ব্বত্যভূমি আত্মবিকাশ করিয়াছে; তাজমহলের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ইহাতে বর্ত্তমান নাই। ইহাকে তাজের আকার দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাজমহলের প্রাণ ইহাতে নাই। এইরূপ ব্যর্থ অনুকরণের ফলে দেব গড়িতে গিয়া যে কতগুলি বানর গড়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত তাজের পরবর্ত্তী কাল হইতে আজিকার উন্নত সভ্যতার দিন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। অন্তরের প্রেরণা, একনিষ্ঠ আবেগ ও সাধকের প্রেম ব্যতীত কাহার সাধ্য প্রাণহীন পাষাণে প্রাণ সঞ্চার করে?

শ্রীরামেন্দু দত্ত

পেনসিলভেনিয়া কলামন্দির

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে পেনসিলভ্যানিয়া কলা-মন্দিরের জন্য প্রায় দশ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে যে নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে সম্প্রতি তার গৃহ-প্রবেশ-উৎসব হইয়া গিয়াছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প হয় এবং ইহা প্রস্তুত করিতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছে। ইহার স্থাপত্য সৌধ-শিল্পে যুগান্তর আনিয়াছে। সিনেটার পিপার বলেন যে চিত্তকে সম্পূর্ণ-ভাবে মুক্তি প্রদান করাই এই মন্দিরের প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইবে এবং ইহা ফিলাডেলফিয়ার ললিত শিল্পের কেন্দ্রস্থল হইয়া বিরাজ করিবে। পিপারের মতে ললিত কলা কোনও বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বা জীবনের কোনও বিশেষ সময়ের

পেনসিলভ্যানিয়া কলাভবন

মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের সহিত ইহা যোগসূত্রে গ্রথিত; ইহা কেবল কলা-ভবনের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের কলাভবন নাগরিক জীবনের আদর্শের উন্নতি কল্পে সাহায্য করিবে, বাঁচিবার আনন্দে সহায় হইবে।

পেনসিলভ্যানিয়া কলা-ভবন ও তৎসংলগ্ন কারু-শিল্প-বস্ত্বালয় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ফেয়ার মাউণ্ট পার্কে "মেমোরিয়াল হল" গৃহ অধিকার করিয়াছিল। ফিলাডেলফিয়া সহরের সমস্ত শিল্পবস্তু এই কলাভবনে সযত্নে রক্ষিত হয়।

ইহার শিক্ষাবিধায়ক শক্তি দ্বারা জীবনী-শক্তিতে নূতন উত্যম আনয়ন করিবে। ইহা যে শুধু মানবজীবনকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবে তাহা নয়, পরন্তু জীবনে প্রাচুর্য্য দান করিবে।

এই মন্দিরের আকৃতি ইংরাজি 'E' অক্ষরের ন্যায়। দুই পার্শ্বে দীর্ঘ 'L' এর মত। স্থাপত্যে প্রাচীন গ্রীক আদর্শের অনুসরণ করা হইয়াছে। ত্রিতল অট্টালিকা ও উহার প্রশস্ত বহিরুদ্গত অংশ ও বিরাট সোপান-শ্রেণী সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু মাত্র একদিকের কিয়দংশ

রাইটিংটন হল ও সমসাময়িক গৃহসজ্জা (পেনসিলভ্যানিয়া কলাভবন)

ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। এই অংশেই আপাততঃ প্রদর্শনী-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অংশ দশটী কক্ষ ও আটটী চিত্রশালায় পরিণত করা হইয়াছে। চিত্রগুলি এক অভিনব প্রণালীতে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক চিত্রমঞ্চের সহিত একটি কক্ষ আছে, এই কক্ষগুলি চিত্রমঞ্চে যে যুগের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে সেই যুগে প্রচলিত নানা প্রকার গৃহ-সজ্জায় সজ্জিত। চিত্রগুলি দেখিবার সময়ে তাহার পারি-পার্শ্বিক সজ্জা দ্বারা দর্শকের মনে সেই যুগের ভাব উদয় হইতে পারিবে।

প্রথমেই ইতালীয় চিত্রমঞ্চ, তাহার পর জার্ম্মান, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার চিত্র পর্য্যায়ক্রমে বিভক্ত। কক্ষ-গুলিতে গৃহসজ্জার সহিত প্রসিদ্ধ ভাস্করগণ নির্ম্মিত ব্রোঞ্জ এবং প্রস্তর মূর্ত্তি, স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রব্যাদি এবং নানা প্রকার চিত্র-যবনিকা রক্ষিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের চিত্রমঞ্চের সহিত চারিটি ও আমেরিকার ছয়টি বিভিন্ন যুগের কক্ষ। ইতালীয় কক্ষে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর আসবাব ও শিল্পদ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রগুলি বটেচেলি, করেগিয়ো, বেলিনি প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্পীগণের অঙ্কিত। এই সকল চিত্র বিলাতের ন্যাশন্যাল গ্যালারী অথবা ইতালীর ন্যাশন্যাল কলেক্শনের চিত্রসমূহের সমতুল্য।

ইতালীয় চিত্রশালার পর জার্ম্মান চিত্রমঞ্চ। রেমব্র্যাণ্ড্ট্ ভ্যাণ্ডাইক, রুবেন্স ইত্যাদি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিল্পীগণের রচিত চিত্রাবলী এবং ইহাদের সহিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর নানা প্রকার শিল্পবস্তু।

ইহার পার্শ্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী শিল্প-বস্তু। এই কক্ষে ষোড়শ লুইএর সোফা, চেয়ার ইত্যাদি গৃহসজ্জা রক্ষিত হইয়াছে। এই কক্ষের পর চিত্রমঞ্চে উনবিংশ ও

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

বিংশ শতাব্দীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোরোট, ইংগ্রেস, ম্যানেট ইত্যাদি চিত্রশিল্পীগণ অঙ্কিত।

ইহার পরই ইংলণ্ডের কক্ষ। বিলাতের টাওয়ার হিলের অনুকরণে সজ্জিত। এই কক্ষের প্রাচীরে রোম্‌নি, গেনস্‌বোরো, হোগার্থ ইত্যাদির চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের ডারবিশিয়ারের এক গৃহের অনুকরণে একটি কক্ষ সজ্জিত করা হইয়াছে ; এই কক্ষে কুইন অ্যান ও জর্জ্জিয়ান আসবাবপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পার্শ্বে ল্যাঙ্কেশিয়ারের রাইটিংটন হলের অনুকরণে আর একটি কক্ষ।
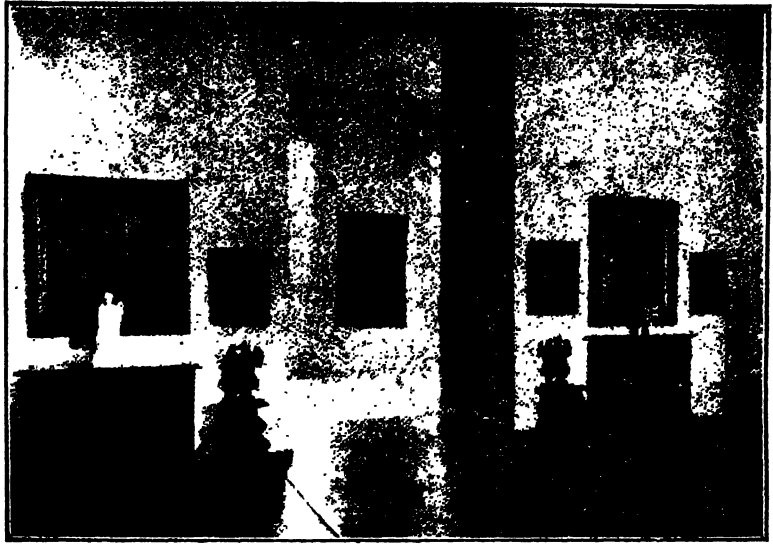
ইতালীয় গ্যালারী—১৪শ ও ১৫শ শতাব্দী। (পেনসিলভ্যানিয়া কলাভবন)

ফরাসী গ্যালারী—১৯শ শতাব্দী
(পেনসিলভ্যানিয়া কলাভবন)

ইংলণ্ড-বিভাগের পার্শ্বে আমেরিকার কক্ষ। ১৭৪০ সালের ট্রিট-হাউস ইত্যাদি নানা প্রকার গৃহের অনুকরণে সজ্জিত। উইলিয়াম কেণ্ট প্রবর্ত্তিত নানা প্রকার কাষ্ঠের আসবাব এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে।

কলামন্দিরের কর্তৃপক্ষ মন্দিরটিকে নানা প্রকারে চিত্তাকর্ষক ও নয়নানন্দকর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন—তাঁহারা বলেন নানা প্রকারের ললিত কলার সৌন্দর্য্য ধনী ও নির্ধন সকলেই যদি সমভাবে উপভোগ করিতে পারে তাহা হইলেই তাহাদের শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

বর্ষায় কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

—নববর্ষা—

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে—"

আবার এসেছে আষাঢ়—দিগ্‌দিগন্ত প্রাবৃত করে' আকাশতল আচ্ছন্ন ক'রে, ধরণী শ্যামান্ধকার করে' মানব-হৃদয়ে চিরন্তন সুচির-বিরহ জাগরিত করে।

মুগ্ধ-কবির আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠ আবেগে কাঁপছে। তিনি বৃষ্টির সুবাসাক্রান্ত বাতাসে অধীর উতলা চিত্তে ঘনাবৃত গগনের পানে পুলকিত-দৃষ্টি প্রসারিত করে ব'লছেন—

"এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিল আবার বাজি'
নবীন-মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।"

তাঁর নিদাঘ-পুরাতন হৃদয় নূতন মেঘের ঘনিমায় নবীন হ'য়ে দুলে উঠেছে,—নয়ন নব মেঘ-রসে মদির হয়ে উঠেছে! আত্মবিস্মৃত কবি বিভোর-কণ্ঠে গেয়েছেন—

"নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল-অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে!
নব-তৃণ-বনে ঘন-বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
বিকশিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
হরষিত-প্রাণ জেগেছে।"

আজ তাঁর চিত্তের গভীর হর্ষ, নববর্ষার গাঢ়-ছায়াচ্ছন্ন উৎসবাঙ্গনে কদম্বকাননের শিহরণের সাথে পুলকাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে! কেতকীকুঞ্জের গন্ধ-মহোৎসবে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে; মেঘছায়াঙ্কিত নবীন তৃণাঙ্গনের সবুজ-বুকে তাঁর মনের খুশী, পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় স্তবকে স্তবকে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে! নব-বর্ষার আনন্দোৎসবে নবীন বৃষ্টি-ধারায় তাঁর হৃদয় বিপুলপুলকে নৃত্য করছে! কবি'র আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে গীত ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল—

"বরষা আইল অই ঘন-ঘোর-মেঘে
দশদিক তিমিরে আঁধারি,
আকুল-হৃদয় অধীর-আবেগে
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারি!"

আকাশের চারিদিক হ'তে সজল-ঘন মেঘরাশি পুঞ্জে পুঞ্জে সমবেত হ'চ্ছে। নূতন বর্ষার এই নবীন মেঘ-মাধুরী অতি নীরস মানব-চিত্তকেও ক্ষণতরে কাজ ভুলিয়ে তার মুগ্ধ-নেত্র আকাশ পানে প্রসারিত ক'রতে বাধ্য করে।

কবি এবার যেন অকথিত আনন্দের দোল্‌নায় শিশুর মতো দুল্‌তে দুল্‌তে ঊর্দ্ধপানে তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ ক'রে গান ধরেছেন—

"ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে
আঁচল খানি দোলে।
ওরি গানের তালে তালে
আমে জামে শিরীষ-শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায়
আকুল- কল্লোলে।"

এই উদ্বেলিত আনন্দ পর-মুহূর্ত্তেই আবার কারণ-হীন বেদনায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে অজানার বিরহে চঞ্চল বিধুর ক'রে তুলেছে। তাই গানের প্রথমার্দ্ধভাগ আনন্দ-চঞ্চল নৃত্য-বিভঙ্গে তরঙ্গিত হ'লেও, শেষার্দ্ধভাগে সেই আনন্দ, উদাস করুণ হয়ে উঠেছে—বাদল-হাওয়ার হা হা রবে তাঁর কোন্ চিরন্তন গোপন-সাথী তাঁকে ডেকে ডেকে ফিরছে,—সেই পরিচিত আকুল-আহ্বানের অশ্রুত-ধ্বনি অনুভব ক'রে!

"আমার দুই আঁখি অই সুরে
যায় হারিয়ে, সজল হাওয়ায়
অই ছায়াময়-দূরে!
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে,
কোন্ সাথী মোর যায় যে ডেকে,
একলা-দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।"

প্রথম-বর্ষণের মেঘান্ধকার দিনখানি কবির নয়ানে সুদীর্ঘ-বিরহান্তে মিলন-মুহূর্ত্তে তরুণী-প্রিয়ার নীলাম্বরীর লজ্জাবগুণ্ঠনের ন্যায় মধুর অথচ রহস্যপূর্ণ প্রতিভাত হ'য়েছে।

তিমিরবসনা নববর্ষা সুন্দরী মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে' ধরার বুকে নেমে এল। বর্ষণ-ঝরঝর ধারা গীত-গুঞ্জরণের সাথে কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দিয়ে, ভুবনের প্রতিভূরূপে কবি বিস্ময়ানন্দ-বিমিশ্রস্বরে প্রশ্ন ক'রলেন—

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

"তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী!
আজি সঘন শর্ব্বরী মেঘ-মগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝ'রি' ঝরিছে জলধারা,
তমাল-বন মর্ম্মরি' পবন চলে হাঁকি'।
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী!"

বরষার স্নিগ্ধ-পরশ মানব-চিত্তে পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবরাশি মুকুলিত ক'রে তুল্‌লো; মর্ম্মকুহরে গভীর রহস্যময় বিচিত্র-বাণী পৌঁছিয়ে দিল; সেই রহস্য-গভীর বাণীর উত্তর-দানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চিত্ততল মথিত ক'রে তুলেছে। কবি ব'লছেন—

"যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
জানিনা কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী!"

তার পরের ছত্রগুলিতে কবি বলেছেন—তিনি বাধা বন্ধনে বদ্ধ আছেন, সকল বাধা ছিন্ন করে' বাইরে যাবেন, কেননা—তাঁর এই বাদল-ঝরা রাত্রি 'বৃথা-ক্রন্দনে' কেটে গিয়ে পরম সার্থক হয় এই তাঁর সাধ। তিনি সকল বাধা লঙ্ঘন করবেন তাঁর বাঞ্ছিতার অশ্রুধারা' গুঞ্জনের সাথে, কারণ-হারা গভীর কান্না কাঁদবার বিপুল প্রলোভনে।

নব বর্ষা'র স্নিগ্ধ-ঘনমেঘ স্বধু সবুজ মাঠ, শ্যামল অরণ্যা-নীর উপরে কাজল-ছায়া বিস্তৃত ক'রে মনোমদ ক'রে তোলে না, মানবের চিরপিপাসিত বুভুক্ষু চিত্তের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তৃত করে। কবি কালিদাস বলেছেন—"মেঘালোকে ভবতি সুখীনোঽপন্যথাবৃত্তিচেতঃ"—মেঘ দর্শনে সুখী মানুষেরও চিত্ত উন্মনা উদাস হ'য়ে ওঠে। নবমেঘ-মায়া-জনিত হৃদয়ের এই শূণ্যতানুভূতি কবিকে ব্যথাতুর করে' তুলেছে দেখতে পাই;—

"আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার।
মনে ছিল আসবে বুঝি
সে কি আমায় পায়নি খুঁজি'
না-বলা তার কথা খানি
জাগায় হাহাকার।
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে
বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে
জানায় আমায় ফিরবে না সে
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল-অভিসার।"

নববর্ষাকে কবি প্রতিক্ষণে নব নব রূপে নব নব বেশে অভিনব লীলা ভঙ্গিমায় সৌন্দর্য্যান্বিত হ'তে দেখছেন। 'আবির্ভাব' কবিতাটির মধ্যে তিনি বর্ষাকে জল-স্থল-গগন-পরিব্যাপ্তা বিপুল গৌরবান্বিতা মহামহিমময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা করিয়েছেন।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বন-ফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়
আকুল করেছো শ্যাম-সমারোহে
হৃদয়-সাগর উপকূল।"

বনফুল-জড়িত-চরণা এলায়িত-ঘন-কুন্তলা বর্ষার মহা মহিমময়ী মূর্ত্তি আমাদের মানস-নেত্রপটে যেন এক অপূর্ব্ব নূতন সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত করে' দেয়।

নববর্ষার সমাগমে যে-হর্ষ আজ দগ্ধ মাঠের বিবর্ণ বক্ষ নয়ন-ভুলানো স্নিগ্ধ-সবুজে সুরঞ্জিত করেছে যূথীবনের, কেয়া ঝোপের, কদম্বকুঞ্জের গোপন আনন্দ, গন্ধরূপে উৎসারিত হ'য়ে পড়েছে, ধরণীর বক্ষতল হ'তে শিলীন্ধ্র পুঞ্জ ঘাসের বুকে জেগে উঠেছে, নিবিড় মেঘের কাজল-বুকে বল'কার শুভ্র মালা দুলেছে—চারিদিকে তৃপ্তির চিহ্ন, তৃষা-হরণের চিহ্ন, অনুরাগের আভাস স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে—সেই নিবিড় ঘন বিপুল হর্ষ আজ ধারা-গুঞ্জরিত মেঘান্ধকার দিনে কবির চিত্ত-শিখীকে পুলকিত নৃত্যে চঞ্চল করে' তুলেছে! তাঁর ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয় হ'তে প্রাণময়ী কবিতা-ধারা উৎসারিত হ'য়ে এসেছে—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করিছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে!"

নববর্ষায় মানব-হৃদয়ের এর চেয়ে সুন্দরতর ভাবাভিব্যক্তি আর কোথাও আছে কিনা জানিনা।

"শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করিছে বিকাশ-"

এই ক্ষুদ্র দুইটি ছত্রে কবি বর্ষাগমে ব্যাকুল মানবহৃদয়ের অপূর্ব্ব আনন্দ-উদ্বেলতার সুন্দর প্রতীকাশ দিয়েছেন। তাঁর অন্তরের বিপুল হর্ষ, অনন্ত বিস্ময়, অফুরন্ত আনন্দ মর্ম্মপাত্র ছাপিয়ে মেঘছায়াঙ্কিত শ্যামদর্ভাচ্ছন্ন ধরিত্রীর বুকে,—বাদল-মাদল-মুখরআঁধার আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে—তারই নিদর্শন এই ছোট দু'টি ছত্রে ফুটে উঠেছে।

ঘনোপল-বর্ষিতা ঝঞ্ঝাবাহিনী বরষার উন্মত্ততার সঙ্গে সঙ্গে কবির উচ্ছ্বসিত ভাব-তরঙ্গও ক্রমশঃ উদ্দাম এবং প্রমত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। নববর্ষার জয়-রথ চক্রের গম্ভীর নির্ঘোষ এবং তার গগনপ্রাবৃত্ত ভৈরবী মূর্ত্তি,—যা' প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর অথচ স্নিগ্ধ মোহন, কবি তাঁর কাব্যপটে সেই রুদ্র-মধুর ব্যঞ্জনা'র অতি সুন্দর প্রতিচ্ছবি তুলে নিয়েছেন।—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব-হরষে,
জল-সিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে
ঘন-গৌরবে নব-যৌবনা বরষা
শ্যাম-গম্ভীর সরসা।
গুরু-গর্জ্জনে নীল অরণ্য-শিহরে
উতলা কলাপী-কেকা কলরবে বিহরে
নিখিল-চিত্ত-হরষা,
ঘন-গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

নব বরষার ভৈরব-হরষে কবির অন্তরের সমস্ত অর্গল উন্মুক্ত হ'য়ে গেছে। তিনি সেই গুরু গরজন ও ঘনবরিষণের গম্ভীর বিরাট মহোৎসবে মুক্ত হৃদয়ে যোগ দিয়ে উন্মুক্ত-কণ্ঠে গেয়েছেন—

"আষাঢ়ে নব আনন্দ উৎসব নব।
অতি গম্ভীর নীল-অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেনরে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে
হের ক্ষুব্ধ তমাল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।
পবন মল্লার-গীত গাহিছে আঁধার-রাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গ ভরে নৃত্য করে অম্বর তলে,
দিকে দিকে কত বাণী নব নব কত ভাষা
ঝর ঝর রস ধারা।"

রুদ্রা ভৈরবী বর্ষায় আনন্দোন্মত্তা মূর্ত্তি আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেম। এইবার কবি এই লীলা-লাস্যপরায়ণার ক্ষণঅভিমানিনী, ক্ষণ-গম্ভীরা, ক্ষণ-হাস্যচঞ্চলা, ক্ষণ ক্রন্দনশীলা মূর্ত্তিখানি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করে' আমাদের নয়ন ও মানসকে মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু তার পূর্ব্বে কবি-কর্ত্তৃক স্বাগত-সঙ্গীতে বর্ষারাণীর সাদর-বরণটুকুর উল্লেখ না করে' আমি অগ্রসর হ'তে পারছিনা। কবি এই ভাবে বর্ষাকে বরণ করেছেন—

"আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা
বাজাও শঙ্খ হুলুরব করো বধূরা
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিনী
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জ-কুটীরে অয়ি ভাবাকুল-লোচনা
ভূর্জ্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিনী।
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিনী!

* * * *

এসেছে বরষা এসেছে নবীন-বরষা
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা।
দুলিছে পবন সন্‌ সন্‌ তরু-বীথিকা
গীতিময় তরু-লতিকা।
শতেক যুগের কবিদল মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত-মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।"

বর্ষা এসেছে। অতীতের বহুশত যুগের বিস্মৃত হাসি কান্নার সৌরভ মেখে বর্ষা এসেছে। শত যুগের শত শত কবি আজ যেন অই মর্ম্মরায়মান বৃক্ষপল্লবের করুণ ধ্বনিতে সিক্ত বাতাসের ব্যথিত নিঃশ্বাসে তাদের শত যুগের রচিত কাজরী-গান পাঠিয়ে দিয়েছে!

কবি ভিজে মাটীর গন্ধে, সিক্ত শাখার মর্ম্মর-ক্রন্দনে, বারিবিন্দু ঝরার টুপ্‌টাপ্‌ শব্দে কোন্‌ এক মৌন বেদনার নীরব ইঙ্গিত—কি যেন এক ব্যথিত রহস্যের গোপন আভাস পাচ্ছেন। কবি তাই বলেছেন—

"অশ্রু ভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত-বায়
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে
করে কে সে বিরহী বিফল-সাধনা॥"

নববর্ষার মন্ত্রস্পর্শে এই কারণ-হারা দুঃখের বেদনাপ্রচ্ছন্ন করুণ সুর—এর মাধুর্য্য, এর নিবিড়তা অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তু।

ক্রন্দনের কোমল-আবরণে যার হাসি আবরিত, তারই হাসি সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী। বিষাদের করুণ ছায়ায় যার আনন্দ-সম্ভোগ তারই আনন্দ সার্থক। করুণ বেদনার ছদ্মে অশ্রুপদ্মের আড়ালে যে-হাসির হরষ ফুটে ওঠে সেই হাসিই সবচেয়ে মনোজ্ঞ, সবচেয়ে হৃদয়-গ্রাহী। যে হাসিতে কারুণ্য-সমাবেশ নেই সে হাসি গভীর নয়,ক্ষণস্থায়ী, ওষ্ঠাধরে ফুটে ওষ্ঠাধরেই ঝরে' পড়ে যায়। অশ্রুর মাঝে যে-হাসি বিকশিত হ'য়ে ওঠে, সে মুখ হ'তে ফোটেনা, বুক হ'তে উৎসারিত হ'য়ে আসে, তাই যাঁদের অন্তর গভীর, তাঁরা সেই বক্ষোৎসারিত অশ্রুঢাকা হাসিরই বেশী অনুরাগী।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

বর্ষার মধ্যে বিষাদের শ্যামচ্ছায়া, বেদনার করুণ রাগিণী, অশ্রুর মধুর সমাবেশ আছে বলেই বোধ হয় সে আমাদের এই পরম রসবেত্তা কবির হৃদয়খানি এমন নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে !

কবি কতখানি গভীর ভাবে বর্ষাকে অনুভব করেছেন, তার অফুরন্ত নিদর্শন বর্ত্তমান র'য়েছে। আমি তার মধ্য হ'তে একটি সর্ব্বজন-বিদিত ও সর্ব্বজন-প্রিয় বর্ষা-সঙ্গীতের উল্লেখ ক'রছি। এই গানটির মধ্যে বোঝা যায়—কী সুগভীর ঘন অনুভূতি দিয়ে কবি বর্ষাকে উপভোগ করেছেন !—

"আমার নিশীথরাতের বাদল-ধারা
এস হে গোপনে,—
আমার স্বপন-লোকে দিশাহারা!
ওগো অন্ধকারের অন্তর-ধন
দাও ঢেকে মোর পরাণ-মন
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা।"

এর পরে বরষার শান্ত সৌন্দর্য্য কবি অতি শান্ততম ভাবে বর্ণিত করেছেন।

"নীল-নবঘনে আষাঢ়-গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে !
ওগো তোরা আজ যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউসের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনায়েছে দেখ্ চাহি রে—
ওগো তোরা আজ যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।"

* * *

"ছায়া ঘনাইছে বনে বনে
গগনে গগনে ডাকে দেয়া,
কবে নব ঘন বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া।"

* * *

"বহু যুগের ওপার হ'তে
আষাঢ় এলো আমার মনে,
কোন সে কবির ছন্দ বাজে
ঝর ঝর বরিষণে ;
যে মিলনের মালাগুলি
ধূলায় মিশে হ'ল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে
আজি সজল-সমীরণে।"

এই শান্ত মধুর গানগুলির মধ্যে কেমন-যেন একটি অতি প্রচ্ছন্ন গোপন বেদনার বেশ ঝঙ্কৃত,—তাই এই গানগুলির সাহায্যে অনেক সময়ে, নব বর্ষার ছোঁয়া-লাগা অকারণ ব্যথায় উতলা প্রাণকে অনেকখানি যেন শান্ত ও আনন্দিত ক'রতে পারি।

বর্ষার দিনে এই গানগুলি, আজ এখানে ঘরে ঘরে কিশোর ও তরুণ নর-নারীর কণ্ঠে সুরে ও বেসুরে গুঞ্জরিত হ'য়ে ফেরে ; আমরা আমাদের ভাষাহারা মর্ম্মের রুদ্ধবাণীকে এই সকল গানগুলির মধ্যে প্রকাশ ক'রতে পেরে অনেকখানি তৃপ্তি অনুভব করি। সার্থকতার আনন্দে তখন আমরা গাই—

"কখন বাদল-ছোঁয়া লেগে,
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটী সবুজ মেঘে-মেঘে
ঐ, ঘাসের ঘন-ঘোরে
ধরণীতল হ'ল শীতল
চিকণ-আভায় ভরে'!
ওরা, হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো
এলো প্রাণের বেগে।"

তখনই আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারি এবং তখনই স্বীকার করি—

"ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই, এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি'
ওদের খেলা ঘরে
ওদের, দোল্ দেখে আজ প্রাণে আমার
দোলা ওঠে জেগে।"

সুনীল-বসনা সজল কাজল-নয়না মেঘমল্লার-নিমগ্না প্রাবৃট-সুন্দরীর রূপ, কবির লেখনীমুখে অনন্ত সৌন্দর্য্যে উৎসারিত হ'য়েছে, বিচিত্রবর্ণে সুচিত্রিত হ'য়েছে। নব বর্ষার একখানি স্নিগ্ধ-মধুর ছবি এখানে তুলছি—

"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী,
গাঢ়চ্ছায়া সারাদিন মধ্যাহ্ন তপন-হীন
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম-বনশ্রেণী।"

এই তপনহীন ছায়া-ঘন দিবসে, ঘন-কালো অরণ্যানী-পুঞ্জের মৌন গাম্ভীর্য্যের গভীর সমাবেশে আজ কী মনে পড়ে ? না—

"আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে।
সেই দিবা-অভিসার পাগলিনী-রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর-বৃন্দাবনে।"

বর্ষা নিখিল মানব-চিত্তে যে উদাস-ব্যাকুলতা, কারণ-হারা বিরহ-বেদনা জাগ্রত করে, এর কারণ অন্বেষণ করা

মিথ্যা। যেহেতু বাস্তবের সঙ্গে এ' বিরহানুভূতির বিশেষ সম্পর্ক নেই। হয়তো বাস্তবের মধ্যেই এ' বেদনা তার আশ্রয় বা কেন্দ্র খুঁজে কেঁদে ফেরে, কিন্তু বস্তুতঃ অন্তর ধনের জন্যেই অন্তরের এ' আকুলতা!

ভাব-রসিকের অন্তরে বরষার মেঘমায়ায় এই 'কি জানি-কি-না-পাওয়া'র ব্যথা, 'কি-জানি-কি-হারানো'র দুঃখ, আষাঢ়ে ঘনাবির্ভাবের মত, নিশাগমে নিদ্রাবির্ভাবের মত, আপনা-হ'তে বক্ষমাঝে আবির্ভূত হ'য়ে থাকে। সিন্ধু-তরঙ্গের মত সে কখনও নিষ্ফল-আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে, কখনও ব্যাকুল বেদনায় আছড়ে আছড়ে পড়ে কখনও করুণ ব্যথায় লুটিয়ে লুটিয়ে ফেরে।

এই চিরন্তনী-বেদনার মধুর অমৃত, অনাদিকাল হ'তে মানুষের মর্ম্ম-কমলে জাগরূক রয়েছে। যে সনাতন সুমিষ্ট রসধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে বৈষ্ণব কবিগণের কল্পনাপুঞ্জ সুমধুর ভাবঘন বৈষ্ণব কাব্যে 'বিরহরস'রূপ অমূল্য ও অপূর্ব্ব বস্তু গড়ে' তুলেছে। এই পরম বিচিত্র, পরম গভীর, নিবিড়-মধুর বিরহরসকে কেন্দ্র ক'রেই বৃন্দাবনের 'কিশোর-কিশোরী'র মধুর প্রেমলীলা অবলম্বনে, মানবের ভাব-জগতে এক দুর্ল্লভ-সম্পদ্ বা পরম উপভোগ্য রস সৃষ্টি হ'তে পেরেছে!

কবি নব-বর্ষায় সেই চিরন্তনী বিরহ-ব্যথার সুচিরবিকাশ স্পষ্ট অনুভব করেছেন, তাই তিনি বলেছেন—

"আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনও সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
এখনও প্রেমের খেলা
সারাদিন সারা বেলা
এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।"

নানা কথা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভারতের সমস্ত মাসিকের আদিজননী। গত বৈশাখে ইহা ৮৬ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যে যে মনীষী সাহিত্যিকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের রচনা যে কেবল ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহা নহে, সকলেই সাময়িকভাবে সম্পাদকীয় সম্পর্কে ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সকল দিক দিয়া তত্ত্ববোধিনীর বঙ্গ সাহিত্যে একটী ঐতিহাসিক মূল্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত, গত ১২।১৩ বৎসর কাল পরলোকগত ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরীর সম্পাদকতায় একান্ত উদার ও অসাম্প্রদায়িকভাবে তত্ত্ববোধিনী সমাজহিতকর সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন।।

* * * *

বিগত ২৪শে আষাঢ় রবিবার উংকেন্দ্র সমিতির উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "পরশুরাম" বিরচিত "চিকিৎসা সঙ্কট" নামক প্রহসন নাটিকার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ রচনাটি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল ভারতবর্ষে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন ইহাকে নাটকের আকার দিয়া ও ইহাতে কয়েকটি গীত সংযোগ করিয়া ইহাকে প্রহসনের উপযোগী করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় রচিত বেঙাচির গান এবং প্রচলিত একটি উর্দ্দু গজল ভিন্ন অপর সমস্ত গানগুলিই যতীন্দ্রকুমারের রচিত। শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং সাহিত্যিকগণ মিলিয়া প্রহসনটি অভিনীত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটি পরিচালিত করিয়াছিলেন যতীন্দ্রকুমার। অভিনয় দেখিয়া দর্শকেরা যথেষ্ট কৌতুক উপভোগ করিয়াছিলেন।

* * * *

উড়িষ্যার "সমাজ" কাগজের সম্পাদক প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস সাক্ষীগোপালের সত্যবাদী আশ্রমে গত ১৭ই জুন দেহত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী পঞ্চাশ হাজার টাকা জনহিতে এবং "সমাজ" কাগজখানি এবং তৎসম্পর্কিত প্রেসটি সার্ভেন্ট অফ দি পিউপল্ সোসাইটিতে দান করিয়া গিয়াছেন। গোপবন্ধু দাস মহাশয়ের অভাবে উড়িষ্যা সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই।।
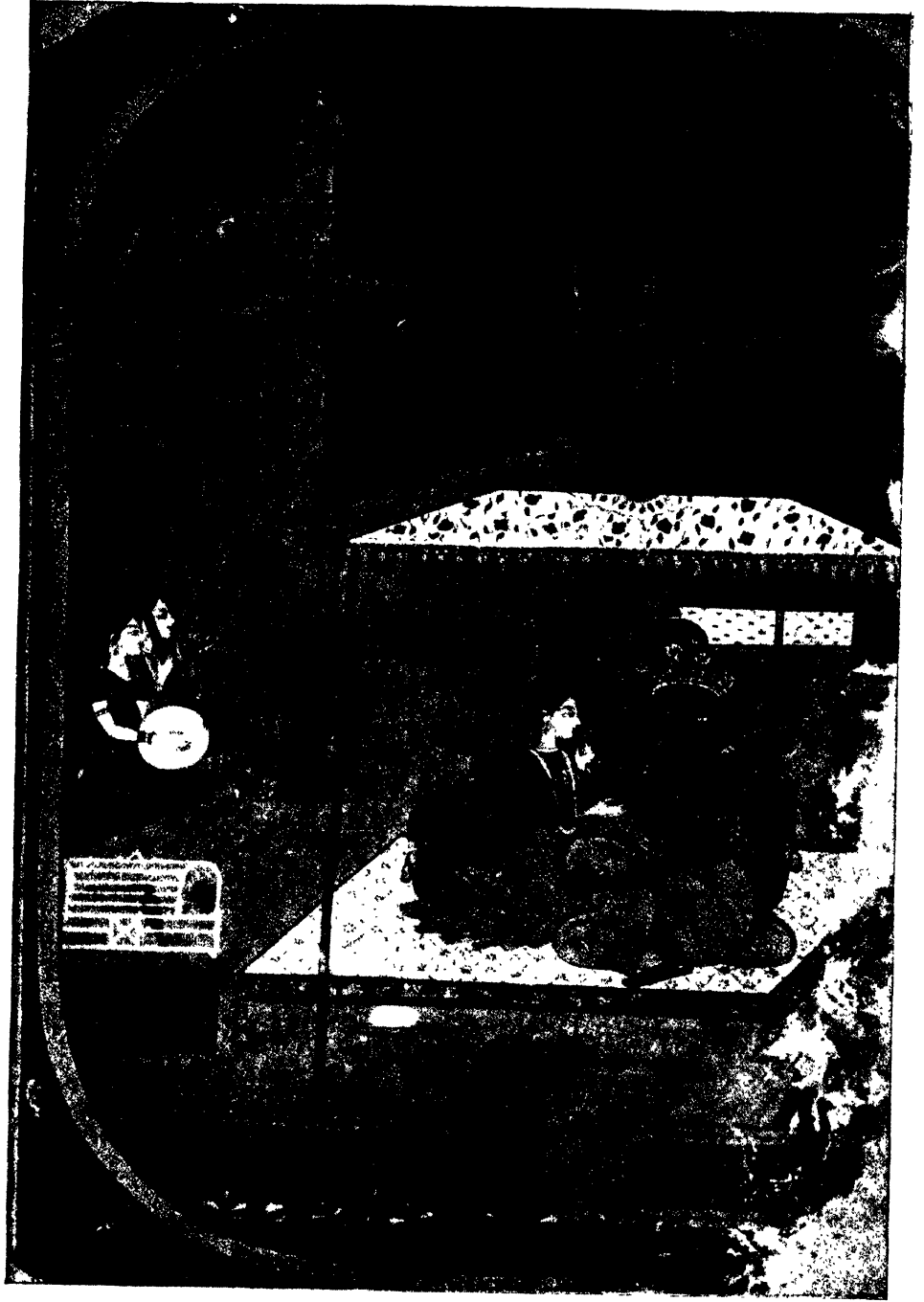
রাধা-কৃষ্ণ

মোলারাম অঙ্কিত

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ হইতে

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৩৫	তৃতীয় সংখ্যা

শেষ কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি'
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,—
ব্যথায় নিবিড় হোলো শেষবাক্য বলিবার কাল ॥

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
শান্ত হোলো শেষ দেখা,—নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো ॥

যে দ্বার খুলিয়া গেল রুদ্ধ সে হবেনা কোনোমতে।
কান পাতি' র'বে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে---
তোমার অমূর্ত্ত আসা-যাওয়া
যে-পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া ॥

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুল-মত্ততা
মধুপ-গুঞ্জনে মিশি' আনে কোন্ কানে কানে কথা
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা ॥

সঙ্গহীন স্তব্ধতার সুগম্ভীর নিবিড় নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্ম্মমাঝে পশি'
আপন মহিমা হ'তে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী ॥
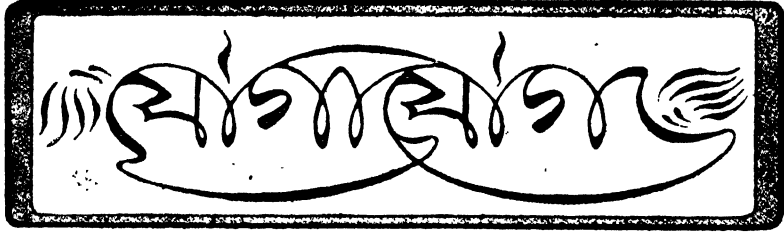
—উপন্যাস—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

বাইরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে একটি মানুষ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল—হাব্লু। কম সাহস না। মধুসূদনকে যমের মতো ভয় করে, তবু ছিল কাঠের পুতুলের মতো স্তব্ধ হ'য়ে। সেদিন মধুসূদনের কাছে তাড়া খাওয়ার পর থেকে জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সুবিধে হয়নি, মনের ভিতর ছট্ফট্ করেচে। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আসা নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ওকে বিছানায় শুইয়ে রেখে মা যখন ঘর-কন্নার কাজে চ'লে গেচে এমন সময়ে কানে এলো এসরাজের সুর। কি বাজচে জানত না, কে বাজাচ্চে বুঝ্তে পারেনি, জ্যাঠাইমার ঘর থেকে আস্চে এটা নিশ্চিত; জ্যাঠামশায় সেখানে নেই এই তার বিশ্বাস, কেন না তাঁর সামনে কেউ বাজনা বাজাতে সাহস করবে এ কথা সে মনেই করতে পারে না। উপরের তলায় দরজার কাছে এসে জ্যাঠামশায়ের জুতোজোড়া দেখেই পালাবার উপক্রম করলে। কিন্তু যখন বাইরে থেকে চোখে পড়ল ওর জ্যাঠাইমা নিজে বাজাচ্চেন, তখন কিছুতেই পালাতে পা সরল না। দরজার আড়ালে লুকিয়ে শুন্তে লেগেছে। প্রথম থেকেই জ্যাঠাইমাকে ও জানে আশ্চর্য্য, আজ বিস্ময়ের অন্ত নেই। মধুসূদন চ'লে যেতেই মনের উচ্ছ্বাস আর ধ'রে রাখতে পারলে না—ঘরে ঢুকেই কুমুর কোলে গিয়ে ব'সে গলা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে বল্লে, "জ্যাঠাইমা!"

কুমু তাকে বুকে চেপে ধ'রে বল্লে, "একি তোমার হাত যে ঠাণ্ডা! বাদলার হাওয়া লাগিয়েচ বুঝি!"

হাব্লু কোনো উত্তর করলে না, ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে জ্যাঠাইমা এখনি বুঝি বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবে। কুমু তাকে শালের মধ্যে ঢেকে নিয়ে নিজের দেহের তাপে গরম ক'রে বল্লে, "এখনো শুতে যাওনি গোপাল?"

"তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম। কেমন ক'রে বাজাতে পারলে, জ্যাঠাইমা?"

"তুমি যখন শিখ্বে তুমিও পারবে।"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে?"

এমন সময় মোতির মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই ব'লে উঠ্ল, "এই বুঝি দস্যি, এখানে লুকিয়ে ব'সে! আমি ও'কে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্চি। এদিকে সন্ধ্যা বেলায় ঘরের বাইরে দু পা চল্তে গা ছম ছম করে, জ্যাঠাইমার কাছে আসবার বেলায় ভয় ডর থাকে না। চল্ শুতে চল্।"

হাব্লু কুমুকে আঁকড়ে ধ'রে রইল।

কুমু বল্লে, "আহা, থাকনা আর একটু।"

"এমন ক'রে সাহস বেড়ে গেলে শেষকালে বিপদে পড়বে। ওকে শুইয়ে আমি এখনি আস্চি।"

কুমুর বড়ো ইচ্ছে হ'ল হাব্লুকে কিছু দেয়, খাবার কিম্বা খেলবার জিনিষ। কিন্তু দেবার মতো কিছু নেই, তাই ওকে চুমো খেয়ে বল্লে, "আজ শুতে যাও; লক্ষ্মী ছেলে, কাল দুপুর বেলা তোমাকে বাজনা শোনাব।"

হাব্লু করুণ মুখে উঠে মায়ের সঙ্গে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মোতির মা ফিরে এল। নবীনের ষড়যন্ত্রের কি ফল হোলো তাই জানবার জন্যে মন অস্থির

হ'য়ে আছে। কুমুর কাছে ব'সেই চোখে পড়ল, তার হাতে সেই নীলার আঙটি। বুঝলে যে কাজ হ'য়েছে। কথাটা উত্থাপন করবার উপলক্ষ স্বরূপ বল্‌লে, "দিদি, তোমার এই বাজনাটা পেলে কেমন ক'রে?"

কুমু বললে, "দাদা পাঠিয়ে দিয়েচেন।"

"বড়ো ঠাকুর তোমাকে এনে দিলেন বুঝি?"

কুমু সংক্ষেপে বল্‌লে, "হাঁ।"

মোতির মা কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে উল্লাস বা বিস্ময়ের চিহ্ন খুঁজে পেলে না।

"তোমার দাদার কথা কিছু বল্‌লেন কি?"

"না।"

"পর্শু তিনি তো আস্‌বেন, তাঁর কাছে তোমার যাবার কথা উঠ্‌ল না?"

"না, দাদার কোনো কথা হয়নি।"

"তুমি নিজেই চাইলে না কেন, দিদি?"

"আমি ওঁর কাছে আর যা-কিছু চাইনে কেন, এটা পারব না।"

"তোমার চাবার দরকার হবে না, তুমি অমনিই ওঁর কাছে চ'লে যেয়ো। বড়ো ঠাকুর কিছুই বল্‌বেন না।"

মোতির মা এখনো একটা কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি যে মধুসূদনের অনুকূলতা কুমুর পক্ষে সঙ্কট হ'য়ে উঠেচে; এর বদলে মধুসূদন যা' চায় তা' ইচ্ছে করলেও কুমু দিতে পারে না। ওর হৃদয় হ'য়ে গেছে দেউলে। এই জন্যেই মধুসূদনের কাছে দান গ্রহণ ক'রে ঋণ বাড়াতে এত সঙ্কোচ। কুমুর এমনো মনে হয়েচে যে, দাদা যদি আর কিছুদিন দেরি ক'রে আসে তো সেও ভালো।

একটু অপেক্ষা ক'রে থেকে মোতির মা বল্‌লে, "আজ মনে হ'ল বড়ো ঠাকুরের মন যেন প্রসন্ন।"

সংশয়ব্যাকুল চোখে কুমু মোতির মার মুখে তাকিয়ে বললে, "এ প্রসন্নতা কেন ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে, তাই আমার ভয় হয়; কি করতে হবে ভেবে পাইনে।"

কুমুর চিবুক ধ'রে মোতির মা বল্‌লে, "কিছুই করতে হবে না; এটুকু বুঝতে পারচ না, এতদিন উনি কেবল কার-বার ক'রে এসেচেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। একটু একটু ক'রে যতই চিন্‌চেন ততই তোমার আদর বাড়চে।"

"বেশি দেখ্‌লে বেশি চিন্‌বেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই ভাই। আমি নিজেই দেখ্‌তে পাচ্চি আমার ভিতরটা শূন্য। সেই ফাঁকটাই দিনে দিনে ধরা পড়বে। সেই জন্যেই হঠাৎ যখন দেখি উনি খুসি হ'য়েচেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠকেচেন। যেই সেটা ফাঁস হবে সেই আরো রেগে উঠ্‌বেন। সেই রাগটাই যে সত্য, তাই তাকে আমি তেমন ভয় করিনে।"

"তোমার দাম তুমি কি জানো দিদি! যেদিন এদের বাড়িতে এসেচ, সেই দিনই তোমার পক্ষ থেকে যা' দেওয়া হোলো, এরা সবাই মিলে তা' শুধ্‌তে পার্‌বে না। আমার কর্ত্তাটি তো একেবারে মরিয়া, তোমার জন্যে সাগর লঙ্ঘন না করতে পারলে স্থির থাক্‌তে পারচেন না। আমি যদি তোমাকে না ভালো বাস্‌তুম তবে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে যেত।"

কুমু হাস্‌লে, বল্‌লে, "কত ভাগ্যে এমন দেবর পেয়েচি।"

"আর তোমার এই জা-টি বুঝি ভাগ্যস্থানে রাহু না কেতু।"

"তোমাদের একজনের নাম কর্‌লে আর একজনের নাম করবার দরকার হয় না।"

মোতির মা ডান হাত দিয়ে কুমুর গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, "আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।"

"কি বলো।"

"আমার সঙ্গে তুমি 'মনের কথা' পাতাও।"

"সে বেশ কথা, ভাই। প্রথম থেকে মনে মনে পাতানো হ'য়েই গেছে।"

"তা' হ'লে আমার কাছে কিছু চেপে রেখোনা। আজ তুমি অমন মুখটি ক'রে কেন আছো কিছুই বুঝতে পারচিনে।"

খানিকক্ষণ মোতির মার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কুমু বল্‌লে, "ঠিক কথা বল্‌ব? নিজেকে আমার কেমন ভয় করচে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"সে কি কথা! নিজেকে কিসের ভয়?"

"আমি এতদিন নিজেকে যা' মনে করতুম আজ হঠাৎ দেখ্‌চি তা' নই। মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েই এসেছিলুম। দাদারা যখন দ্বিধা করেচেন, আমি জোর ক'রেই নতুন পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু যে মানুষটা ভরসা ক'রে বেরোলো তাকে আজ কোথাও দেখতে পাচ্চিনে।"

"তুমি ভালোবাসতে পারচ না! আচ্ছা আমার কাছে লুকিয়ো না, সত্যি ক'রে বলো, কাউকে কি ভালোবেসেচ? ভালবাসা কাকে বলে তুমি কি জানো?"

"যদি বলি জানি, তুমি হাস্‌বে। সূর্য্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভ'রে ভালোবাসা তেমনি ক'রেই জেগেছিল। কেবলি মনে হয়েচে সূর্য্য উঠ্‌ল ব'লে। সেই সূর্য্যোদয়ের কল্পনা মাথায় ক'রেই আমি বেরিয়েচি, তীর্থের জল নিয়ে—ফুলের সা'জ সাজিয়ে। যে দেবতাকে এতদিন সমস্ত মন দিয়ে মেনে এসেছি, মনে হ'য়েচে তাঁর উৎসাহ পেলুম। যেমন ক'রে অভিসারে বেরয় তেমনি ক'রেই বেরিয়েছি। অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার ব'লে মনেই হয় নি, আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কি দেখলুম, বাইরেই বা কি দেখ্‌চি! এখন বছরের পর বছর, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটবে কি ক'রে?'

"তুমি কি বড়োঠাকুরকে ভালোবাস্‌তে পারবে না মনে কর?"

"পার্‌তুম ভালোবাস্‌তে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমতো ক'রে নেওয়া সহজ হোতো। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়োঠাকুর ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েচেন। আজ সব জিনিষ কড়া হ'য়ে আমাকে বাজচে। আমার শরীর মনের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষ্‌ড়ে তুলে দিল, তাই চারিদিকে সবই আমাকে লাগ্‌চে, কেবলি লাগ্‌চে, যা' কিছু ছুঁই তাতেই চম্‌কে উঠি। এর পরে কড়া প'ড়ে গেলে কোনো একদিন হয়ত স'য়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাবো না তো।"

"বলা যায় না ভাই।"

"খুব বলা যায়। আজ আমার মনে একটুমাত্র মোহ নেই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মতো স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। নিজেকে একটু ভোলাবার মতো আড়াল কোথাও বাকি রইল না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও ন'ড়ে বস্‌বার একটুও জায়গা নেই? তাদের সংসার-টাকে নিষ্ঠুর বিধাতা এত আঁট ক'রেই তৈরি ক'রেছে।"

এতক্ষণ ধ'রে এমনতরো উত্তেজনার কথা কুমুর মুখে মোতির মা আর কোনোদিন শোনে নি। বিশেষ ক'রে আজ যেদিন বড়োঠাকুরকে ওরা কুমুর প্রতি এতটা প্রসন্ন ক'রে এনেচে, সেই দিনই কুমুর এই তীব্র অধৈর্য্য দেখে মোতির মা ভয় পেয়ে গেল। বুঝ্‌লে লতার একেবারে গোড়ায় ঘা লেগেচে, উপর থেকে অনুগ্রহের জল ঢেলে মালী আর এ'কে তাজা ক'রে তুলতে পারবে না।

একটু পরে কুমু ব'লে উঠ্‌ল—"জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারচিনে এ আমার মহা-পাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্চে না যেমন হচ্চে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে ক'রে।"

মোতির মা কোনো উত্তর না ভেবে পেয়ে হত-বুদ্ধির মতো ব'সে রইল। একটু চুপ ক'রে থেকে কুমু বললে, "তোমার কত ভাগ্যি ভাই, কত পুণ্যি করেছিলে, ঠাকুরপোকে এমন সমস্ত মনটা দিয়ে ভালো-বাসতে পেরেচ। আগে মনে করতুম, ভালোবাসাই সহজ—সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে। আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় ঘটে। আচ্ছা ভাই, সত্যি ক'রে বলো সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?"

মোতির মা একটু হেসে বল্‌লে, "ভালো না বাস্‌লেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কি ক'রে?"

"সেই আশ্বাস দাও আমাকে! আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হ'তে পারি। পুণ্য তাতেই বেশী, সেইটেই কঠিন সাধনা।"

"বাইরে থেকে তাতেও বাধা পড়ে।"

"অন্তর থেকে সে বাধা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারা যায়। আমি পারব, আমি হার মানব না।"

"তুমি পারবে না তো কে পারবে?"

বৃষ্টি জোর ক'রে চেপে এল। বাতাসে ল্যাম্পের আলো থেকে থেকে চকিত হ'য়ে ওঠে। দমকা হাওয়া যেন একটা ভিজে নিশাচর পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুমুর শরীরটা মনটা শিরশির্ ক'রে উঠল। সে বল্‌লে, "আমার ঠাকুরের নামে আর জোর পাচ্ছিনে। মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে যাই, মনটা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিছুতে সাড়া দিতে চায় না। তাতেই সবচেয়ে ভয় হয়।"

বানানো কথায় মিথ্যে ভরসা দিতে মোতির মার ইচ্ছে হ'ল না। কোন উত্তর না ক'রে সে কুমুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলে। এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল, "মেজ বৌ!"

কুমু খুসি হ'য়ে উঠে বল্‌লে, "এসো, এসো ঠাকুরপো।"

"সন্ধ্যাবেলাকার ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখ্‌তে পেলুম না, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।"

মোতির মা বল্‌লে, "হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে!"

"কে মণি আর কে ফণী তা' চক্ষনাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কি বল বৌরাণী।"

"আমাকে সাক্ষী মেনোনা ঠাকুরপো।"

"জানি, তা'হ'লে আমি ঠকবো।"

"তা' তোমার হারাধনকে তুমি উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাও, আমি ধ'রে রাখব না।"

"হারাধনের জন্যে ওঁর কোন উৎসাহ নেই, দিদি, ছুতো ক'রে বৌরাণীর চরণ দর্শন করতে এসেচেন।"

"ছুতোর কি কোন দরকার আছে? চরণ আপনি ধরা দিয়েচে। সব চেয়ে যা' অসাধ্য তার সাধনা করবে কে? সে যখন আসে সহজেই আসে। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ আছে আমার চেয়ে যোগ্য, তবু অমন সুন্দর পা-দুখানি আমিই পারলুম ছুঁতে, তারা তো পারলে না। নবীনের জন্মসার্থক হ'য়ে গেল বিনামূল্যে।"

"আঃ কী বলো, ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই। তোমার এন্‌সাইক্লোপীডিয়া থেকে বুঝি—"

"অমন কথা বল্‌তে পারবে না, বৌরাণী। চরণ বল্‌তে কি বোঝায় তা' ওরা জানবে কি ক'রে? ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওয়ালা জুতোর মধ্যে লক্ষ্মীদের পা কড়া জেনানার মধ্যে ওরা বন্দী ক'রে রেখেচে। সাইক্লোপীডিয়া-ওয়ালার সাধ্য কি পায়ের মহিমা বোঝে! লক্ষ্মণ চোদ্দটা বৎসর কেবল সীতার পায়ের দিকে তাকিয়েই নির্ব্বাসন কাটিয়ে দিলেন, তার মানে আমাদের দেশের দেওররাই জানে। তা' পায়ের উপরে সাড়ি টেনে দিচ্ছ তো দাও। ভয় নেই তোমার, পদ্ম সন্ধেবেলায় মুদে থাকে ব'লে তো বরাবর মুদেই থাকে না—আবার তো পাপড়ি খোলে।"

"ভাই মনের কথা, এমনিতরো স্তব ক'রেই বুঝি ঠাকুরপো তোমার মন ভুলিয়েচেন?"

"একটুও না দিদি, মিষ্টিকথার বাজে খরচ করবার লোক নন উনি।"

"স্তুতির বুঝি দরকার হয় না?"

"বৌরাণী, স্তুতির ক্ষুধা দেবীদের কিছুতেই মেটেনা, দরকার খুব আছে। কিন্তু শিবের মতো আমি তো পঞ্চানন নই, এই একটি মাত্র মুখের স্তুতি পুরোণো হ'য়ে গেছে, এতে উনি আর রস পাচ্ছেন না।"

এমন সময় মুরলী বেয়ারা এসে নবীনকে খবর দিলে, "কর্ত্তামহারাজা বাইরের আপিস ঘরে ডাক দিয়েচেন।"

শুনে নবীনের মন খারাপ হ'য়ে গেল। সে ভেবেছিল মধুসূদন আজ আপিস থেকে ফিরেই একেবারে সোজা তার শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হবে। নৌকা বুঝি আবার ঠেকে গেল চড়ায়।

নবীন চ'লে গেলে মোতির মা আস্তে আস্তে বল্‌লে, "বড়ো-ঠাকুর কিন্তু তোমাকে ভালবাসেন সে কথা মনে রেখো।"

কুমু বল্‌লে, "সেইটেই তো আমার আশ্চর্য্য ঠেকে।"

"বল কি, তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য্য! কেন? উনি কি পাথরের?"

"আমি ওঁর যোগ্য না।"

"তুমি যাঁর যোগ্য নও সে পুরুষ কোথায় আছে?"

"ওঁর কতবড়ো শক্তি, কত সম্মান, কত পাকাবুদ্ধি, উনি কত মস্ত মানুষ। আমার মধ্যে উনি কতটুকু পেতে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারেন? আমি যে কি অসম্ভব কাঁচা, তা' এখানে এসে দুদিনে বুঝতে পেরেচি। সেই জন্যেই যখন উনি ভালোবাসেন তখনি আমার সব চেয়ে বেশি ভয় করে। আমি নিজের মধ্যে যে কিছুই খুঁজে পাইনে। এতোবড়ো ফাঁকি নিয়ে আমি ওঁর সেবা করব কি ক'রে? কাল রাত্তিরে ব'সে ব'সে মনে হোলো আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা, আমাকে দাম দিয়ে নিতে হয়েচে, খুলে ফেল্‌লেই ধরা পড়বে যে ভিতরে চিঠিও নেই।"

"দিদি, হাসালে! বড়োঠাকুরের মস্তবড়ো কারবার, কারবারী বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই, সব জানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেচ যে, যোগ্যতা নেই ব'লে ভয় পাবে? বড়ো ঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা ক'রে বলেন, তবে নিশ্চয় বলবেন তিনিও তোমার যোগ্য নন।"

"সে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন।"

"বিশ্বাস হয়নি?"

"না। উলটে আমা'র ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে ভুল করলেন, সে ভুল ধরা পড়বে।"

"কেন তোমার এমন মনে হ'ল বলো দেখি?"

"বলব? এই যে আমার হঠাৎ বিয়ে হ'য়ে গেল, এতো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুল্‌লুম—কিন্তু কি অদ্ভুত মোহে, কি ছেলেমানুষী ক'রে? যা' কিছুতে আমাকে সেদিন ভুলিয়েছিল তার মধ্যে সমস্তই ছিল ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিষম জেদ, যে সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পারত না। দাদা তা' নিশ্চিত জানতেন ব'লেই বৃথা বাধা দিলেন না, কিন্তু কত ভয় পেয়েচেন, কত উদ্বিগ্ন হয়েচেন তা' কি আমি বুঝতে পারিনি? বুঝতে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও সামলাইনি, এতবড়ো অবুঝ আমি। আজ থেকে চিরদিন আমি কেবলি কষ্ট পাব, কষ্ট দেব, আর প্রতিদিন মনে জানব এ সমস্তই আমার নিজের সৃষ্টি।"

মোতির মা কি যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দিদি, তুমি যে বিয়ে করতে মন স্থির করলে কি ভেবে?"

"তখন নিশ্চিত জানতুম স্বামী ভালোমন্দ যাই হোক্ না কেন স্ত্রীর সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে প্রজাপতি যাকেই স্বামী ব'লে ঠিক ক'রে দিয়েচেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেচি, মনে হয়েচে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।"

"দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয়নি।"

"আজ বুঝতে পেরেচি, সংসারে ভালোবাসাটা উপরি পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধ'রে সংসার-সমুদ্রে ভাসতে হবে। ধর্ম্ম যদি সরস হ'য়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হ'য়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।"

মোতির মা নিজে বিশেষ কিছু না ব'লে কুমুকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতে লাগল।

৪৫

মধুসূদন আপিসে গিয়েই দেখ্‌লে খবর ভাল নয়। মাদ্রাজের এক বড়ো ব্যাঙ্ক ফেল করেচে, তাদের সঙ্গে এদের কারবার। তারপরে কানে এলো যে কোনো ডাইরেক্টরের তরফ থেকে কোনো কোনো কর্ম্মচারী মধুসূদনের অজানিতে খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করচে। এতদিন কেউ মধুসূদনকে সন্দেহ করতে সাহস করেনি, একজন যেই ধরিয়ে দিয়েচে অমনি যেন একটা মন্ত্র-শক্তি ছুটে গেল। বড়ো কাজের ছোটো ত্রুটি ধরা সহজ, যারা মাতব্বর সেনাপতি তারা কতো খুচ্‌রো হারের ভিতর দিয়ে মোটের উপর মস্ত ক'রেই জেতে। মধুসূদন বরাবর তেমনি জিতেই এসেচে—তাই বেছে বেছে খুচ্‌রো হার কারো নজরেই পড়েনি। কিন্তু বেছে বেছে তারি একটা ফর্দ্দ বানিয়ে সেটা সাধারণ লোকের নজরে তুল্‌লে তারা নিজের বুদ্ধির তারিফ করে, বলে আমরা হ'লে এ ভুল করতুম না। কে তাদের বোঝাবে যে ফুটো নৌকো নিয়েই মধুসূদন পাড়ি দিয়েচে, নইলে পাড়ি দেওয়াই হ'ত না, আসল কথাটা এই যে কূলে পৌঁছল। আজ নৌকোটা ডাঙায় তুলে ফুটোগুলোর বিচার করবার বেলায়, যারা নিরাপদে এসেছে ঘাটে, তাদের গা শিউরে উঠ্‌চে। এমন-

তরো টুক্‌রো সমালোচনা নিয়ে আনাড়িদের ধাঁধাঁ লাগানো সহজ। সাধারণত আনাড়িদের সুবিধে এই যে, তারা লাভ করতে চায়, বিচার করতে চায় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ বিচার করতে বসে তবে মারাত্মক হ'য়ে ওঠে। এই সব বোকাদের উপর মধুসূদনের নিরতিশয় অবজ্ঞামিশ্রিত ক্রোধের উদয় হোলো। কিন্তু বোকাদের যেখানে প্রাধান্য সেখানে তাদের সঙ্গে রফা করা ছাড়া গতি নেই। জীর্ণ মই মচ্‌মচ্‌ করে, দোলে, ভাঙার ভয় দেখায়, যে ব্যক্তি উপরে চড়ে তাকে এই পায়ের তলার অবলম্বনটাকে বাঁচিয়ে চল্‌তেই হয়! রাগ ক'রে লাথি মারতে ইচ্ছে করে, তাতে মুস্কিল আরো বাড়বারই কথা।

শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখ্‌লে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়, ব্যবসা সম্বন্ধে মধুসূদনের সেই রকম মনের অবস্থা। এ যে তার নিজের সৃষ্টি; এর প্রতি তার যে দরদ সে প্রধানত টাকার দরদ নয়। যার রচনা-শক্তি আছে, আপন রচনার মধ্যে সে নিজেকেই নিবিড় ক'রে পায়, সেই পাওয়াটা যখন বিপন্ন হ'য়ে ওঠে, তখন জীবনের আর সমস্ত সুখ দুঃখ কামনা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। কুমু মধুসূদনকে কিছুদিন থেকে প্রবল টানে টেনেছিল, সেটা হঠাৎ আল্‌গা হ'য়ে গেল। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনটা মধুসূদন প্রৌঢ় বয়সে খুব জোরের সঙ্গে অনুভব করেছিল। এই উপসর্গ যখন অকালে দেখা দেয়, তখন উদ্দাম হ'য়েই ওঠে। মধুসূদনকে ধাক্কা কম লাগেনি, কিন্তু আজ তার বেদনা গেল কোথায়?

নবীন ঘরে আসতেই মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "আমার প্রাইভেট জমাখরচের খাতা বাইরের কোনো লোকের হাতে প'ড়েচে কি, জানো?"

নবীন চমকে উঠ্‌ল, বললে, "সে কি কথা?"

"তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে খাতাঞ্চির ঘরে কেউ আনাগোনা করচে কি না।"

"রতিকান্ত বিশ্বাসী লোক, সে কি কখনো—"

"তার অজানতে মুহুরিদের সঙ্গে কেউ কথা চালাচালি করচে ব'লে সন্দেহের কারণ ঘটেচে। খুব সাবধানে খবরটা জানা চাই কারা এর মধ্যে আছে।"

চাকর এসে খবর দিলে খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। মধুসূদন সে কথায় মন না দিয়ে নবীনকে বললে, "শীঘ্র আমার গাড়িটা তৈরি ক'রে আন্‌তে ব'লে দাও।"

নবীন বললে, "খেয়ে বেরবে না? রাত হ'য়ে আস্‌চে।"

"বাইরেই খাব, কাজ আছে।"

নবীন মাথা হেঁট ক'রে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল। সে যে কৌশল করেছিল ফেঁসে গেল বুঝি।

হঠাৎ মধুসূদন নবীনকে ফিরে ডেকে বললে, "এই চিঠিখানা কুমুকে দিয়ে এসো।"

নবীন দেখলে বিপ্রদাসের চিঠি। বুঝলে এ চিঠি আজ সকালেই এসেছে, সন্ধে বেলায় নিজের হাতে কুমুকে দেবে ব'লে মধুসূদন রেখেছিল। এমনি ক'রে প্রত্যেকবার মিলন উপলক্ষ্যে একটা কিছু অর্ঘ্য হাতে ক'রে আনবার ইচ্ছে। আজ আপিসের কাজে হঠাৎ তুফান উঠে তার এই আদরের আয়োজনটুকু গেল ডুবে।

মাদ্রাজে যে ব্যাঙ্ক ফেল করেচে সেটার উপরে সাধারণের নিশ্চিত আস্থা ছিল। তার সঙ্গে ঘোষাল কোম্পানীর যে যোগ সে সম্বন্ধে অধ্যক্ষদের বা অংশিদারদের কারো মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। যেই কল বিগড়ে গেল, অমনি অনেকেই বলাবলি করতে আরম্ভ করলে যে আমরা গোড়া থেকেই ঠাউরেছিলুম, ইত্যাদি।

সাংঘাতিক আঘাতের সময় ব্যবসাকে যখন একজোট হ'য়ে রক্ষার চেষ্টা দরকার, সেই সময়েই পরাজয়ের সম্বন্ধে দোষারোপ প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং যাদের প্রতি কারো ঈর্ষ্যা আছে তাদেরকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় টলমলে ব্যবসাকে কাৎ ক'রে ফেলা হয়। সেই রকম চেষ্টা চলবে মধুসূদন তা বুঝেছিল। মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের বিপর্য্যয়ে ঘোষাল কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ যে কতটা দাঁড়াবে এখনো তা' নিশ্চিত জানবার সময় হয়নি, কিন্তু মধুসূদনের প্রতিপত্তি নষ্ট করবার আয়োজনে এও যে একটা মসলা যোগাবে তা'তে সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, সময় খারাপ, এখন অন্য সব কথা ভুলে এইটেতেই মধুসূদনকে কোমর বাঁধতে হবে!

রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ হবার পর নবীন ফিরে এসে দেখলে কুমুর সঙ্গে মোতির মার তখনো কথা চল্‌চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীন বললে, "বৌরাণী,—তোমার দাদার চিঠি আছে।"

কুমু চমকে উঠে চিঠিখানা নিলে। খুলতে হাত কাঁপতে লাগল। ভয় হোল হয়তো কিছু অপ্রিয় সংবাদ আছে। হয়তো এখন আসাই হবে না। খুব ধীরে ধীরে খাম খুলে প'ড়ে দেখলে। একটু চুপ ক'রে রইল। মুখ দেখে মনে হোলো যেন কোথায় ব্যথা বেজেচে। নবীনকে বললে, "দাদা আজ বিকেলে তিনটের সময় কলকাতায় এসেচেন।"

"আজই এসেচেন! তাঁর তো—"

"লিখেচেন দুই একদিন পরে আসবার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে আগেই আসতে হোলো।"

কুমু আর কিছু বললে না। চিঠির শেষ দিকে ছিল একটু সেরে উঠলেই বিপ্রদাস কুমুকে দেখতে আসবে, সে জন্যে কুমু যেন ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হয়। এই কথাটাই আগেকার চিঠিতেও ছিল। কেন, কী হয়েচে? কুমু কী অপরাধ করেচে? এ যেন এক রকম স্পষ্ট ক'রেই বলা তুমি আমাদের বাড়ীতে এসোনা। ইচ্ছে করল মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে খানিকটা কেঁদে নেয়। কান্না চেপে পাথরের মতো শক্ত হ'য়ে ব'সে রইল।

নবীন বুঝলে, চিঠির মধ্যে একটা কি কঠিন মার আছে। কুমুর মুখ দেখে করুণায় ওর মন ব্যথিত হ'য়ে উঠল। বললে, "বৌরাণী, তাঁর কাছে তো কালই তোমার যাওয়া চাই।"

"না আমি যাবনা।" যেমনি বলা অমনি আর থাকতে পারলে না, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

মোতির মা কোনো প্রশ্ন না ক'রে কুমুকে বুকের কাছে টেনে নিলে, কুমু রুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দাদা আমাকে যেতে বারণ করেচেন।"

নবীন বললে, "না, না, বৌরাণী তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ।"

কুমু খুব জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে যে সে একটুও ভুল বোঝেনি।

নবীন বললে, "তুমি কোথায় ভুল বুঝেছ বলব? বিপ্রদাস বাবু মনে করেচেন আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দিতে চাইবেন না। চেষ্টা করতে গিয়ে পাছে তোমাকে অপমানিত হ'তে হয়, পাছে তুমি কষ্ট পাও সেইটে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিজে থেকে তোমার রাস্তা সোজা ক'রে দিয়েচেন।"

কুমু এক মুহূর্ত্তে গভীর আরাম পেলে। তার ভিজে চোখের পল্লব নবীনের মুখের দিকে তুলে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। নবীনের কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে একটুও সন্দেহ রইল না। দাদার স্নেহকে ক্ষণকালের জন্যেও ভুল বুঝতে পেরেচে ব'লে নিজের উপর ধিক্কার হ'ল। মনে খুব একটা জোর পেলে। এখনি দাদার কাছে ছুটে না গিয়ে দাদার আসার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারবে। সেই ভালো।

মোতির মা চিবুক ধ'রে কুমুর মুখ তুলে ধ'রে বললে, "বাসরে, দাদার কথার একটু আড় হাওয়া লাগলেই একেবারে অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠে!"

নবীন বললে, "বৌরাণী, কাল তা হ'লে তোমার যাবার আয়োজন করিগে।"

"না, তার দরকার নেই।"

"দরকার নেই তো কি? তোমার দরকার না থাকে তো আমার দরকার আছে বই কি।"

"তোমার আবার কিসের দরকার!"

"বা! আমার দাদাকে তোমার দাদা যা কিছু ঠাওরাবেন সেটা বুঝি অমনি স'য়ে যেতে হবে! আমার দাদার পক্ষ নিয়ে আমি লড়ব। তোমার কাছে হার মানতে পারব না। কাল তোমাকে ওঁর কাছে যেতেই হচ্চে।"

কুমু হাসতে লাগল।

"বৌরাণী, এ ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের বাড়ীর অপবাদে তোমার অগৌরব। এখন চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এসো, খেতে যাবে। ম্যানেজার সাহেবের ওখানে দাদার আজ নিমন্ত্রণ। আমার বিশ্বাস তিনি আজ বাড়ির ভিতরে শুতে আসবেন না, দেখলুম বাইরের কামরায় তাঁর বিছানা তৈরি।"

এই খবরটা পেয়ে কুমু মনে মনে আরাম পেলে, তার পরক্ষণেই এতটা আরাম পেলে ব'লে লজ্জা বোধ হল।

রাত্রে শোবার ঘরে মোতির মার সঙ্গে নবীনের ঐ কথাটা নিয়েই পরামর্শ চল্‌ল। মোতির মা বললে, "তুমি তো দিদিকে আশ্বাস দিলে! তার পরে?"

"তার পরে আবার কি? নবীনের যেমন কথা তেমনি কাজ। বৌরাণীকে যেতেই হবে, তার পরে যা' হয় তা' হবে।"

নতুন গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্য্যাদাবোধ খুবই উগ্র। এঁরা নিশ্চয় ঠিক ক'রে আছেন যে, বিবাহ ক'রে নববধূ তার পুর্ব্ব পদবীর চেয়ে অনেক উপরে উঠেচে; অতএব বাপের বাড়ি ব'লে কোনো বালাই আছে একথা একেবারে ভুলতে দেওয়াই সঙ্গত। এ অবস্থায় দুই দিক রক্ষা করা যদি অসম্ভব হয় তবে একটা দিক তো রাখতেই হবে। সেই দিকটা যে কোন্‌টা তা' নবীন মনে মনে পাকা ক'রে রাখলে। যেখানে দাদার অধিকার চরম, সেখানে ও কোনোদিন দাদার সঙ্গে লড়াই বাধাতে সাহস করতে পারবে এ কথা আর কিছুদিন আগে নবীন স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল যে কাল সকালে কুমু একবার মাত্র বিপ্রদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা ক'রে আস্‌বে, এই প্রস্তাব মধুসূদনের কাছে করা হবে। যদি রাজি হয় এবং কুমুকে সেখানে পাঠানো যায় তা' হ'লে তার পরে সেখান থেকে দু চার দিনের মধ্যে তাকে না ফেরাবার সঙ্গত কারণ বানানো শক্ত হবে না।

মধুসূদন বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে, সঙ্গে একরাশ কাগজ পত্রের বোঝা। নবীন উঁকি মেরে দেখলে মধুসূদন শুতে না গিয়ে চোখে চশমা এঁটে নীল পেন্সিল হাতে আপিস ঘরের ডেস্কে কোনো দলিলে বা দাগ দিচ্চে, নোট বইয়ে বা নোট নিচ্চে। নবীন সাহস ক'রে ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "দাদা, আমি কি তোমার কোনো কাজ ক'রে দিতে পারি?" মধুসূদন সংক্ষেপে বল্‌লে, "না।" ব্যবসার এই সঙ্কটের অবস্থাটাকে মধুসূদন সম্পূর্ণ নিজে আয়ত্ত ক'রে নিতে চায়, সবটা তার একার চোখে প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার; এ কাজে অন্যের দৃষ্টির সহায়তা নিতে গেলে নিজেকে দুর্ব্বল করা হবে।

নবীন কোনো কথা বলবার ছিদ্র না পেয়ে বেরিয়ে গেলো। শীঘ্র যে সুযোগ পাওয়া যাবে এমন তো ভাবে বোধ হোলো না। নবীনের পণ, কাল সকালেই বৌরাণীকে রওনা ক'রে দেবে। আজ রাত্রেই সম্মতি আদায় করা চাই।

খানিকক্ষণ বাদে নবীন একটা ল্যাম্প হাতে ক'রে দাদার টেবিলের উপর রেখে বললে, "তোমার আলো কম হচ্চে।"

মধুসূদন অনুভব করলে—এই দ্বিতীয় ল্যাম্পে তার কাজের অনেকখানি সুবিধা হোলো। কিন্তু এই উপলক্ষ্যেও কোনো কথার সুচনা হ'তে পারলো না। আবার নবীনকে বেরিয়ে আসতে হোলো।

একটু পরেই মধুসূদনের অভ্যস্ত গুড়গুড়িতে তামাক সেজে তার চৌকির বাঁ পাশে বসিয়ে নলটা টেবিলের উপর আস্তে আস্তে তুলে রাখলে। মধুসূদন তখনি অনুভব করলে এটারও দরকার ছিল। ক্ষণকালের জন্যে পেন্সিলটা রেখে তামাক টানতে লাগল।

এই অবকাশে নবীন কথা পাড়লে—"দাদা, শুতে যাবে না? অনেক রাত হয়েচে। বৌরাণী তোমার জন্যে হয়তো জেগে ব'সে আছেন।"

"জেগে বসে আছেন" কথাটা এক মুহূর্ত্তে মধুসূদনের মনের ভিতরে গিয়ে লাগল। ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টলমল করতে করতে চলেচে, একটি ছোট ডাঙার পাখী উড়ে এসে যেন মাস্তলে বসল; ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্যে মনে এনে দিলে শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি। কিন্তু সে কথায় মন দেবার সময় নয়, জাহাজ চালাতে হবে।

মধুসূদন আপন মনের এইটুকু চাঞ্চল্যে ভীত হোলো। তখনি সেটা দমন ক'রে বললে, "বড়ো বৌকে শুতে যেতে বলো, আজ আমি বাইরে শোব।"

"তাঁকে না হয় এখানে ডেকে দিই" ব'লে নবীন গুড়গুড়ির কলকেটাতে ফুঁ দিতে লাগল।

মধুসূদন হঠাৎ ঝেঁকে উঠে ব'লে উঠ্‌ল, "না, না।"

নবীন তা'তেও না দ'মে বল্‌লে, "তিনি যে তোমার কাছে দরবার করবেন ব'লে ব'সে আছেন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রুক্ষস্বরে মধুসূদন বললে, "এখন দরবারের সময় নেই।"

"তোমার তো সময় নেই, দাদা, তাঁরো তো সময় কম।"

"কি, হয়েচে কি ?"

"বিপ্রদাস বাবু আজ কলকাতায় এসেচেন খবর পাওয়া গেছে, তাই বৌরাণী কাল সকালে—"

"সকালে যেতে চান ?"

"বেশিক্ষণের জন্যে না, একবার কেবল—"

মধুসূদন হাত ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বললে—"তা' যান্ না, যান। বাস্, আর নয় তুমি যাও।"

হুকুম আদায় ক'রেই নবীন ঘর থেকে এক দৌড়। বাইরে আসতেই মধুসূদনের ডাক কানে এসে পৌঁছল, "নবীন।"

ভয় লাগ্ল আবার বুঝি দাদা হুকুম ফিরিয়ে নেয়। ঘরে এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন বললে, "বড়ো বৌ এখন কিছুদিন তাঁর দাদার ওখানে গিয়েই থাকবেন, তুমি তার জোগাড় ক'রে দিয়ো।"

নবীনের ভয় লাগলো, দাদার এই প্রস্তাবে তার মুখে পাছে একটুও উৎসাহ প্রকাশ পায়। এমন কি সে একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়ে মাথা চুল্কতে লাগ্ল। বল্লে, "বৌরাণী গেলে বাড়িটা বড়ো খালি খালি ঠেক্বে।"

মধুসূদন কোনো উত্তর না ক'রে গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে কাজে লেগে গেল। বুঝ্তে পারলে প্রলোভনের রাস্তা এখনো খোলা আছে—ওদিকে একেবারেই না।

নবীন আনন্দিত হ'য়ে চ'লে গেল। মধুসূদনের কাজ চলতে লাগল। কিন্তু কখন এই কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর একটা উল্টো মানস ধারা খুলে গেছে তা' সে অনেকক্ষণ নিজেই বুঝ্তে পারেনি। এক সময়ে নীল পেন্সিল প্রয়োজন শেষ না হ'তেই ছুটি নিলো, গুড়গুড়ির নলটা উঠ্লো মুখে। দিনের বেলায় মধুসূদনের মনটা কুমুর ভাবনা সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নিয়েছিল, তখন আগেকার দিনের মতো নিজের পরে নিজের একাধিপত্য ফিরে পেয়ে মধুসূদন খুব আনন্দিত হ'য়েছিল। কিন্তু যত রাত হচ্চে ততই সন্দেহ হ'তে লাগল যে শত্রু দুর্গ ছেড়ে পালায়নি। সুড়ঙ্গের ঘরে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বাগানের কোণে এক প্রাচীন সিসু গাছের উপরে আকাশে উঠে আর্দ্র পৃথিবীকে বিহ্বল ক'রে দিয়েচে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা, মধুসূদনের দেহটা বিছানার ভিতরে একটা গরম কোমল স্পর্শের জন্যে দাবী জানাতে আরম্ভ করেচে। নীল পেন্সিলটা চেপে ধ'রে খাতাপত্রের উপর সে ঝুঁকে পড়লো। কিন্তু মনের গভীর আকাশে একটা কথা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আওয়াজে বাজ্‌চে, "বৌরাণী হয়তো এতক্ষণ জেগে ব'সে আছেন।"

মধুসূদন পণ করেছিল, একটা বিশেষ কাজ আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ ক'রে রাখবে। সেটা কাল সকালের মধ্যে সারতে পারলে যে খুব বেশি অসুবিধা হোতো তা' নয়। কিন্তু পণ রক্ষা করা ওর ব্যবসায়ের ধর্ম্মনীতি। তার থেকে কোনো কারণে যদি ভ্রষ্ট হয় তবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। এতদিন ধর্ম্মকে খুব কঠিন ভাবেই রক্ষা করেছে। তার পুরস্কারও পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু ইদানীং দিনের মধুসূদনের সঙ্গে রাত্রের মধুসূদনের সুরের কিছু কিছু তফাৎ ঘ'টে আসচে—এক বীণায় দুই তারের মতো। যে দৃঢ় পণ ক'রে ডেস্কের উপর ও ঝুঁকে প'ড়ে বসেছিল—রাত্রি যখন গভীর হ'য়ে এলো, সেই পণের কোন্ একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা উক্তি ভ্রমরের মতো ভন্ ভন্ করতে সুরু করলে—"বৌরাণী হয়ত জেগে ব'সে আছেন।"

উঠে পড়ল। বাতি না নিভিয়ে, খাতাপত্র যেমন ছিলো তেমনি ভাবেই রেখে চল্ল শোবার ঘরের দিকে। অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরা যে বারান্দা দিয়ে তেতালার ঘরে যেতে হয় সেই বারান্দায় রেলিঙের ধারে শ্যামাসুন্দরী মেজের উপর ব'সে। চাঁদ তখন মধ্য আকাশে, তার আলো এসে তাকে ঘিরেচে। তাকে দেখাচ্চে যেন কোন্ এক গল্পের বইয়ের ছবির মতো; অর্থাৎ সে যেন প্রতিদিনের মানুষ নয়, অতি নিকটের অতিপরিচয়ের কঠোর আবরণ থেকে যেন একটা দূরত্বের মধ্যে বেরিয়ে এসেচে। সে জান্ত মধুসূদন এই পথ দিয়েই শোবার ঘরে যায়—সেই যাওয়ার দৃশ্যটা ওর কাছে অতি তীব্র বেদনার, সেই জন্যেই তার আকর্ষণটা এত প্রবল। কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে

ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামীই যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা' নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে— যদি ক্ষণকালের মধ্যে একটা কিছু ঘ'টে যায়; অসম্ভব কখন্ সম্ভব হ'য়ে যাবে এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা।

মধুসূদন ওর দিকে একবার কটাক্ষ ক'রে উপরে চ'লে গেলো। শ্যামাসুন্দরী নিজের ভাগ্যের উপর রাগ ক'রে রেলিং শক্ত ক'রে ধ'রে তার উপরে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌লো।

শোবার ঘরে গিয়ে মধুসূদন দেখে যে কুমু জেগে ব'সে নেই। ঘর অন্ধকার, নাবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে অল্প একটু আলো আসচে। মধুসূদন একবার ভাবল, ফিরে চ'লে যাই, কিন্তু পারলো না। গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে দিলে। কুমু বিছানার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমচ্চে—আলো জ্বালাতেও ঘুম ভাঙলো না। কুমুর এই আরামে ঘুমোনোর উপর ওর রাগ ধরল। অধৈর্য্যের সঙ্গে মশারি খুলে ধপ্ ক'রে বিছানার উপর ব'সে পড়ল। খাটটা শব্দ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল।

কুমু চম্‌কে উঠে বসল। আজ মধুসূদন আসবে না ব'লেই জানত। হঠাৎ তা'কে দেখে মুখে এমন একটা ভাব এলো যে তাই দেখে মধুসূদনের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা শেল বিঁধল। মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেলো, ব'লে উঠ্‌লো, "আমাকে কোনো মতেই সইতে পারচ না, না?"

এমনতরো প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কুমু তা ভেবেই পেলে না। সত্যিই হঠাৎ মধুসূদনকে দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে। তখন ওর মনটা সতর্ক ছিলো না। যে ভাব-টাকে ও নিজের কাছেও সর্ব্বদা চেপে রাখতে চায়, যার প্রবলতা নিজেও কুমু সম্পূর্ণ জানেনা সে তখন হঠাৎ আত্ম-প্রকাশ করেছিল।

মধুসূদন চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌লে, "দাদার কাছে যাবার জন্যে তোমার দরকার?"

কুমু এই মুহূর্ত্তেই ওর পায়ে পড়তে প্রস্তুত হ'য়েছিল, কিন্তু ওর মুখে দাদার নাম শুনেই শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "না।"

"তুমি যেতে চাওনা?"

"না, আমি চাইনে।"

"নবীনকে আমার কাছে দরবার করতে পাঠাও নি?"

"না, পাঠাইনি।"

"দাদার কাছে যাবার ইচ্ছে তাকে তুমি জানাওনি?"

"আমি তাঁকে ব'লেছিলুম, দাদাকে দেখ্‌তে আমি যাব না।"

"কেন?"

"তা' আমি বলতে পারিনে।"

"বল্‌তে পার না? আবার তোমার সেই নূরনগরী চাল?"

"আমি যে নূরনগরেরই মেয়ে।"

"যাও, তাদের কাছেই যাও! যোগ্য নও তুমি এখান-কার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্য্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।"

কুমু কাঠ হ'য়ে ব'সে রইলো, কোনো উত্তর করলে না। কুমুর হাত ধ'রে অসহ্য একটা ঝাঁকানি দিয়ে মধুসূদন বল্‌লে, "মাপ চাইতেও জানো না?"

"কিসের জন্যে?"

"তুমি যে আমার এই বিছানার উপরে শুতে পেরেছ তার জন্যে।"

কুমু তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে চ'লে গেলো।

মধুসূদন বাইরের ঘরে যাবার পথে দেখ্‌লে শ্যামাসুন্দরী সেই বারান্দায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে। মধুসূদন পাশে এসে নীচু হ'য়ে তার হাত ধ'রে টেনে তোলবার চেষ্টা ক'রে বললে, "কি করচ, শ্যামা?" অমনি শ্যামা উঠে ব'সে মধু-সূদনের দুই পা বুকে জড়িয়ে ধর্‌লে, গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বল্‌লে, "আমাকে মেরে ফেলো তুমি।"

মধুসূদন তাকে হাত ধ'রে তুলে দাঁড় করালে, বললে, "ইস্ তোমার গা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম! চলো তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসিগে।" ব'লে তা'কে নিজের শালের এক অংশে আবৃত ক'রে ডান হাত দিয়ে সবলে চেপে ধ'রে শোবার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো। শ্যামা চুপি চুপি বললে, "একটু বসবে না?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধুসূদন বল্‌লে, "কাজ আছে।"

রাত্রের বেলা কোথা থেকে ভূত চেপে এতক্ষণ মধুসূদনের কাজ নষ্ট ক'রে দেবার জোগাড় করেছে—আর নয়। কুমুর কাছ থেকে যে-উপেক্ষা পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার অন্য কোথাও জমা আছে এটুকু সে বুঝে নিলে। ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরম মূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেটা অনুভব করবার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিলো। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবন মন দিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্রে কাজের জোর পেলে, যে অমর্য্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলে।

এদিকে রাত্রে কুমু যে-ধাক্কা পেলে তার মধ্যে ওর একটা সান্ত্বনা ছিলো। যতবার মধুসূদন তাকে ভালোবাসা দেখিয়েছে, ততবারই কুমুর মনে একটা টানাটানি এসেছে; ভালোবাসার মূল্যেই এর পরিশোধ করা চাই এই কর্ত্তব্য-বোধে ওকে অত্যন্ত অস্থির করেচে। এ লড়াইয়ে কুমুর জেতবার কোনো আশা ছিল না। কিন্তু পরাভবটা কুশ্রী, সেটাকে কেবলি চাপা দেবার জন্যে এতদিন কুমু প্রাণপণে চেষ্টা করেচে। কাল রাত্রে সেই চাপা দেওয়া পরাভবটা এক মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ ধরা প'ড়ে গেল। কুমুর অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পেয়েচে যে কুমুর সমস্ত প্রকৃতি মধুসূদনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ; এইটে নিশ্চিত জানা হ'য়ে গেলো সে ভালো, তার পরে পরস্পরের যা' কর্ত্তব্য সেটা অকপটভাবে করা সম্ভব হবে। মধুসূদন ওকে কামনা করে, সেইখানেই সমস্যা; ক্ষোভের সঙ্গে ওকে যে বর্জ্জন করতে চায় সেইখানেই সত্য। সত্যই মধুসূদনের বিছানায় শোবার অধিকার ওর নেই। শুয়ে ও কেবলি ফাঁকি দিচ্চে। এ বাড়িতে ওর যে পদ সেটা বিড়ম্বনা।

আজ রাত্রে এই একটা প্রশ্ন বারবার কুমুর মনে উঠেচে —কুমুকে নিয়ে মধুসূদনের কেন এত নির্ব্বন্ধ? ওতো কথায় কথায় নূরনগরী চালের প্রসঙ্গ তুলে কুমুকে খোঁটা দেয়, তার মানে কুমুর সঙ্গে ওদের একবারে ধাতের তফাৎ, জাতের তফাৎ, কিন্তু মধুসূদন কেন তবে ওকে ভালোবাসা জানায়? একি কখনো সত্য ভালোবাসা হ'তে পারে? কুমুর নিশ্চয় বিশ্বাস, আজ মধুসূদন যাই মনে করুক না কেন, কুমুকে দিয়ে কখনোই ওর মন ভরতে পারেনা। যত শীঘ্র মধুসূদন তা' বোঝে ততই সকল পক্ষের মঙ্গল।

নবীন কাল রাত্রে দাদার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে যত আনন্দ ক'রে শুতে গেলো, আজ সকালে তার আর বড়ো-কিছু বাকি রইল না। কাল রাত্রি তখন আড়াইটা। মধুসূদন কাজ শেষ ক'রে তখনি নবীনকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। হুকুম এই যে কুমুদিনীকে বিপ্রদাসের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যতদিন মধুসূদন না আপনি ডেকে পাঠায় ততদিন ফিরে আসবার দরকার নেই। নবীন বুঝলে এটা নির্ব্বাসন দণ্ড।

আঙিনা-ঘেরা চৌকো বারান্দার যে-অংশে কাল রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকের বারান্দার সংলগ্ন নবীনের শোবার ঘর। তখন ওরা স্বামী-স্ত্রী কুমুর সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল। এমন সময় গলার শব্দ শুনে মোতির মা ঘরের দরজা খুল্‌তেই জ্যোৎস্নার আলোতে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের ছবি দেখতে পেলে। বুঝ্‌তে পারলে কুমুর ভাগ্যের জালে এই রাত্রে নিঃশব্দে আর একটা শক্ত গিঁঠ পড়ল।

নবীনকে মোতির মা বল্‌লে, "ঠিক এই সঙ্কটের সময় কি দিদির চ'লে যাওয়া ভালো হচ্চে?"

নবীন বল্‌লে, "এতদিন তো বৌরাণী ছিলেন না, কাণ্ডটা তো এতদূর কখনোই এগোয়নি। বৌরাণী আছেন ব'লেই এটা ঘটেচে।"

"কী বলো তুমি!"

"বৌরাণী যে-ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েচেন তার অন্ন জোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থপাত করতে বসেচে। আমি তো বলি এই সময়টায় ওঁর দূরে থাকাই ভালো, তাতে আর কিছু না হোক্‌ অন্ততঃ উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।"

"তবে এটা কি এমনি ভাবেই চলবে?"

"যে আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে আপনি জ্ব'লে ছাই হওয়া পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।"

পরদিন সকালে হাবলু সমস্তক্ষণ কুমুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরলে। গুরুমশায় যখন পড়ার জন্যে ওকে বাইরে ডেকে পাঠালে, ও কুমুর মুখের দিকে চাইলে। কুমু যদি যেতে বল্‌ত তো ও যেতো, কিন্তু কুমু বেহারাকে ব'লে দিলে আজ হাবলুর ছুটি।

বধূ কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্চে সেই সুরটি আজ কুমুর যাত্রার সময় লাগ্‌ল না। এ বাড়ি যেন ওকে আজ হারাতে বসেচে। যে-পাখীকে খাঁচায় বন্দী করা হ'য়েছিল, আজ যেন দরজা একটু ফাঁক করতেই সে উড়ে পড়ল, আর যেন এ খাঁচায় সে ঢুকবে না।

নবীন বল্‌লে, "বৌরাণী, ফিরে আসতে দেরি কোরো না এই কথাটা সব মন দিয়ে বলতে পারলে বেঁচে যেতুম, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোলো না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেই খানেই তুমি থাকো গে। কোনো কালে নবীনকে যদি কোনো কারণে দরকার হয় স্মরণ কোরো।"

মোতির মা নিজের হাতে তৈরি আমসত্ব, আচার প্রভৃতি একটা হাঁড়িতে সাজিয়ে পাল্কীতে তুলে দিলে। বিশেষ কিছু বললে না। কিন্তু মনে তার বেশ একটু আপত্তি ছিল। যতদিন বাধা ছিল স্থূল, যতদিন মধুসূদন কুমুকে বাহির থেকে অপমান করেচে, মোতির মার সমস্ত মন ততদিন ছিল কুমুর পক্ষে; কিন্তু যে বাধা সূক্ষ্ম, যা মর্ম্মগত, বিশ্লেষণ ক'রে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, তারই শক্তি যে প্রবলতম, এ কথাটা মোতির মার কাছে সহজ নয়। স্বামী যে-মুহূর্ত্তে প্রসন্ন হবে সেই মুহূর্ত্তে অবিলম্বে স্ত্রী সেটাকে সৌভাগ্য ব'লে গণ্য করবে, মোতির মা এইটেকেই স্বাভাবিক ব'লে জানে। এর ব্যতিক্রমকে সে বাড়াবাড়ি মনে করে। এমন কি, এখনো যে বৌরাণী সম্বন্ধে নবীনের দরদ আছে, এটাতে তার রাগ হয়। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা যে অহঙ্কার নয়, এমন কি এইটে নিয়ে যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জ্জয় বিরোধ, সাধারণত মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার ক'রে নেওয়া কঠিন। যে চীনে মেয়ে প্রথার অনুসরণে নিজের পা বিকৃত করতে আপত্তি করেনি, সে যদি শোনে জগতে এমন মেয়ে আছে যে আপনার এই পদসঙ্কোচ-পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক ব'লে মনে করে, তবে নিশ্চয় সেই কুণ্ঠাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, নিশ্চয় বলে ওটা ন্যাকামি। যেটা নিগূঢ় ভাবে স্বাভাবিক, সেইটেকেই সে জানে অস্বাভাবিক। মোতির মা একদিন কুমুর দুঃখে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল, বোধ করি সেই জন্যই আজ তার মন এত কঠিন হ'তে আরম্ভ করেচে। প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান করতে আসে, তখন তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যে-মেয়ে অবিলম্বে সে বর গ্রহণ করতে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মার পক্ষে অসম্ভব,—এমন কি মার্জ্জনা করাও।

(ক্রমশঃ)
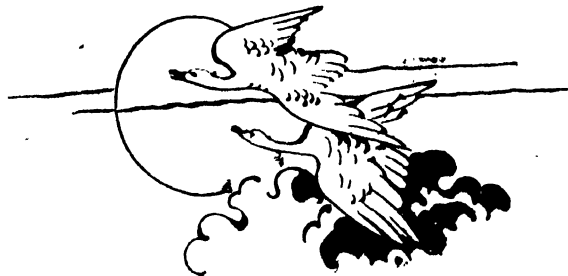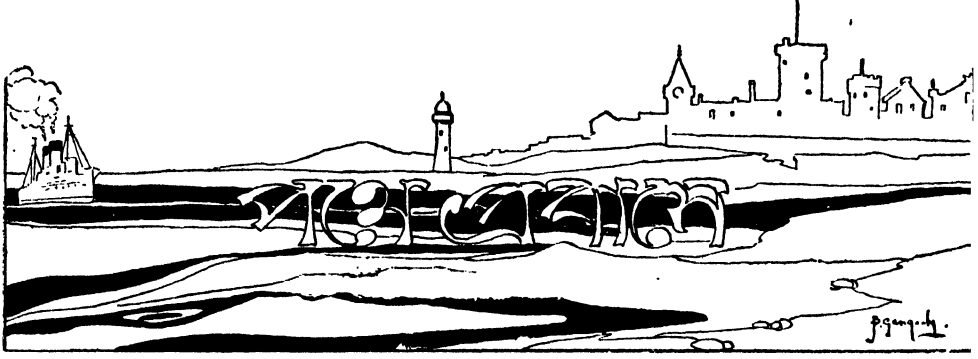
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১০

পার্লামেন্টের সদস্যনির্বাচন অবশ্য বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় না, কিন্তু এক নির্বাচনের পর থেকে আরেক নির্বাচন অবধি প্রত্যেকটি দিন সমস্ত দেশটাই নির্বাচনের মালা জপ্‌তে থাকে। এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে না, কেন না চোখ-কাড়্‌বার মতো দৃশ্য এই একটি নয়, ইংলণ্ডের মতো দেশে দু'টি চোখ নিয়ে বাস করা এক ঝক্‌মারী। সম্প্রতি এখানে বৈশাখ মাসের গরম, ষোলো সতেরো ঘণ্টা সূর্য্যালোক, তাই মাস চার পাঁচ আগে যে সময় ঘুমতে যেতুম, সেই সময় বেড়াতে বেরিয়ে দেখি রাত্রের আহার শেষ ক'রে লোকে সূর্য্যের আলোয় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুন্‌ছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক-একজন বক্তা এক-একখানা টুল্‌ বা চেয়ার বা ভাঙা বাক্স বা কোনো রকম একটা উঁচু আসন জোগাড় ক'রে তার উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দেখ্‌বামাত্র আমাদের দেশের সঙ্গে দুটো তফাৎ ধর্‌তে পারি। প্রথমতঃ, বক্তা যে দলেরি হোন তিনি যুক্তি দেখান, দেখাতে বাধ্য হন্‌, প্রশ্নের চোটে তাঁকে নাকাল কর্‌বার মতো শ্রোতার অভাব হয় না, নানা দলের লেখা ও বক্তৃতা প'ড়ে শুনে প্রত্যেকেরি চোখ কান এতটা সজাগ হয়েছে যে কারুর চোখে ধুলো দেওয়া বা কানে মন্তর দেওয়া সোজা কথা নয়। ভাবপ্রবণতা এ জাতটার ধাতে নেই, গোলদীঘির বক্তাদের হাইড্‌ পার্কে দাঁড় করিয়ে দিলে শ্রোতা, নয় দর্শক, যদি বা জোটে, তবে তাদের একজনেরো চোখের পাতা ভিজ্‌বে না, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হবে না, শিরায় বিদ্যুৎ খেল্‌বে না। সুতরাং বক্তারা শ্রোতাদের অন্য রকম দুর্ব্বলতার সুযোগ নেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ হয় বোঝে যুক্তিতথ্য, নয় বোঝে মদ; সেকালে মদ খাইয়ে ভোট আদায় করা হতো, একালে ও সব উঠে গেছে, তাই যুক্তিতথ্যকে এমন কৌশলে পরিবেশন কর্‌তে হয় যা'তে শ্রোতার বা পাঠকের নেশা ধর্‌বে। Statisticsএর মারপ্যাঁচে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা কর্‌তে না জান্‌লে ইংলণ্ডের ভবীকে ভোলানো যায় না। তাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা বৃথা, কান্না পাওয়ানোর চেষ্টা হাস্যকর। বক্তারা তর্জ্জন গর্জ্জন বা বিলাপ প্রলাপের দিক দিয়েও যান না, তাঁরা নিপুণ ক্যান্‌ভাসারের মতো বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেন।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা-সম্পন্ন নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। গালাগালি সহ্য করা তো তুচ্ছ কথা, কোনোমতেই তাঁরা মেজাজ হারাবেন না, বেফাঁস কথা ব'লে বস্‌বেন না, তাঁদের ব্যক্তিগত মান অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর্‌বেন না, তাঁদের একমাত্র ভাবনা তাঁদের দল কেমন ক'রে পুরু হবে। অথচ তাঁরা ভাড়াটে বক্তা নন্‌; হয়তো পেশাদার বক্তাও নন্‌; কেউ দুপুর বেলা মাটী কেটে এসেছেন, কেউ গাড়োয়ানী ক'রে এসেছেন, এখন চান্‌ দলের লোকের সাহায্য কর্‌তে। রাজনৈতিক দলাদলির

ঠিক নীচে ধর্ম্মনৈতিক দলাদলি। কিন্তু সব দলেই অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবিকা আছে—তারা দলের জন্যে আর কিছু ত্যাগ করুক না করুক অন্তত অসহিষ্ণুতা-টুকু ত্যাগ করেছে। তাদের দলের তালিকায় যদি একটাও নাম বাড়ে তবে বোধ করি তারা জুতোর মারও সহ্য করবে। মিশনারীরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে তারা ধর্ম্মপ্রচার করেনি, এমন ভাষা নেই যে ভাষার বর্ণমালা না থাক্‌লেও যে ভাষায় তারা বাইবেল ছাপায়নি। এই অসাধারণ উদ্যোগিতা এদের জাতিগত। ভোট দেবার অধিকার লাভ করবার জন্যে এদের মেয়েরা পঞ্চাশ বছর ধ'রে কী অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে—কী অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন খেটে এসেছে! জনকয়েকের প্রচেষ্টা ক্রমশঃ লক্ষ লক্ষ জনের হলো, তারপরে জয়। কিন্তু ঐটুকুতে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে সব বিষয়ে সমান অধীকারী করবে, তার আগে থাম্‌বে না। এখন তাদের যুদ্ধ চলেছে স্ত্রীপুরুষকে সমান খাটুনির বিনিময়ে সমান মজুরি দেওয়া নিয়ে, বিবাহিতা নারীকে বিবাহিত পুরুষের মতো চাক্‌রী করতে দেওয়া নিয়ে, সব রকম জীবিকায় স্ত্রীপুরুষকে সমান সর্ত্তে স্থান দেওয়া নিয়ে। এদের শ্রমিকরাও এমনি নাছোড়বান্দা প্রকৃতির যোদ্ধা। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তারা সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট। আমাদের শ্রমিকদের এখন যে অবস্থা, এদের শ্রমিকদেরও এক শতাব্দী আগে সেই অবস্থা ছিল। কিন্তু তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে সামান্য জমীজমাকে শত ভাগ ক'রে মান্ধাতার আমলের চরকাখানাকে শতবার ঘুরিয়ে ফল পেলে না, কলকারখানার কাছে slum তৈরি ক'রে ঐখানেই জেদ ক'রে প'ড়ে রইল, এবং জেদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগ্‌ল। এখনো তাদের অবস্থার যেটুকু উন্নতি হ'য়েছে সেটুকু তাদের মনঃপূত নয়, তাই তাদের লড়াই থাম্‌ছে না, তারা সব বিষয়ে ধনিকদের মতো না হওয়া পর্য্যন্ত লড়াই চালাবেই। ধনিকরাও চুপ ক'রে ব'সে থাকেনি, এরা ডালে ডালে চলে তো ওরা পাতায় পাতায় চলে, সুতরাং লড়াই কোনো কালে থাম্‌বার নয়।

লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে। তাই বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়, সেটা তাদের সৌখীন বাচালতা নয়, সে জন্য তারা কারুর হাততালির আশা রাখে না, কেউ না শুন্‌লেও তারা রণে ভঙ্গ দেয় না, যে পর্য্যন্ত একটিও শ্রোতা থাকে সে পর্য্যন্ত তাদের বক্তৃতা চল্‌তে থাকে, বরং তখনি তাদের বক্তৃতা জোরালো হয়। আমাদের দেশে মাত্র দুটি শ্রেণীর লোককে আমি এমন নাছোড়বান্দা হ'তে দেখেছি—পাণ্ডা আর ঘটক। অভিমান কাকে বলে কেবল এই দুই শ্রেণীর লোক জানে না; বাকী সকলেই অল্প বিস্তর অভিমানী। কিন্তু ইংলণ্ডে পরের উপর মান করলে ঘরের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তাই অভিমান কথাটা ইংরেজী ভাষায় নেই। এতে ইংরেজী ভাষার ক্ষতি হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু ইংরেজ জাতটার বৃদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র জাহাজ না পাঠালে ইংলণ্ডকে প্রায়োপবেশনে মরতে হয়, জৈন ধর্ম্মের চর্চ্চা ইংলণ্ডে কোনো কালে ছিল না, ইংলণ্ড গুজ্‌রাট নয়। সুতরাং ইংলণ্ডকে দুনিয়ার সকলের দ্বারে ধাক্কা দিতেই হয় "Knock and it shall be opened unto you." এমনি ক'রে ইংলণ্ড আমেরিকার অষ্ট্রেলিয়ার আফ্রিকার বন্ধ দুয়ার খুল্‌লে, ভারতবর্ষকেও ঘুমতে দিলে না।

যে কারণে ইংলণ্ডকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফির্‌তে হয় সেই কারণে ইংলণ্ডের লোককে ঘরের ভাণ্ডারে ভাগ বসাবার চেষ্টা করতে হয়। পার্লামেণ্টের হাতে ভাণ্ডারের চাবী। চাবীটার জন্যে দিনরাত লড়াই। এক মুহূর্ত্ত ঢিল দিলে সর্ব্বনাশ। চাবীটা যাদের হাতে আছে তাদের যেমন ভাবনা, চাবীটা যাদের হাতে নেই তাদেরো তেমনি ভাবনা। আমাদের দেশে রাজনীতিকে লোকে জীবন মরণের ব্যাপার ব'লে ভাবতে শেখেনি; আমাদের কাজের লোকেদের শেষ জীবন কাটে কাশীতে বৃন্দাবনে; রাজনীতি চর্চ্চাটা এখনো আমাদের চোখে দেশের প্রতি একটা অনুগ্রহ; সে অনুগ্রহটুকু যাঁরা করেন তাঁরা একলম্ফে দেশপূজ্য। এদেশে কিন্তু ওটা ধর্ম্মচর্চ্চারি মতো অবশ্যকরণীয় ব্যাপার; যাঁরা করেন তাঁরা নিজের বা নিজের দলের বা নিজের দেশের গরজে করেন; সে জন্যে বাহবা পাবার কথাই ওঠে না; দেশপূজ্য হওয়া

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

...র থাক্ দেশের কাজে লাঞ্ছনা পাওয়াটাই ঘটে। লয়েড্ জর্জ্জ কাশী-বৃন্দাবনে না গিয়ে পার্লামেণ্টে যান—সে জন্যে তাকে ছেড়ে কথা কইতে হবে কেন? তাঁর পুণ্যার্জ্জনের লোভ আছে; তাই তিনি ভারতবর্ষ হ'লে কাশী যেতেন, ইংলণ্ড ব'লে পার্লামেণ্টে গেলেন; লোকে যেমন কাশীবাসীকে ছেড়ে কথা কয় না, পার্লামেণ্টবাসীকেও ছেড়ে কথা কয় না। বল্ড্ইন দেশের জন্যে ত্যাগ বড় কম করেননি, ইংলণ্ডের আদর্শে সে ত্যাগ চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের চেয়ে ছোট নয়। তবু তাঁকে তাচ্ছিল্য করতে রাস্তার টম্ ডিক্-ও পশ্চাৎপদ নয়। লয়েড্ জর্জ্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিনে তাকে রক্ষা করলেন—অথচ তাঁকে ঠাট্টা করা ও ক্ষ্যাপানো এখনকার একটা ফ্যাশান।

মোট কথা আমাদের দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও এদের দেশে Public এর কাজ একই রকম মাপকাটীতে মাপা যায়। কোনো সদাশয় কুকুরদের মহাপ্রসাদ খাইয়ে কিম্বা দরিদ্র-নারায়ণদের 'কাঙালী ভোজন' করিয়ে পরোপকার করলে আমরা যেমন মুখে প্রশংসা করতে করতে মনে বলি, "লোকটা চালাক, এই সুযোগে পরকালের একটা গতি ক'রে নিলে", কোনো ত্যাগী বল্ড্ইন বা স্বল্পবিত্ত লয়েড্ জর্জ্জ রাষ্ট্রচালনা ক'রে পরার্থ সাধন করলে এরাও তেমনি এক মুখে প্রশংসা করতে করতে আরেক মুখে বলে, "লোকটা ঘুঘু, এই সুযোগে বেশ কিছুকাল রাজত্ব ক'রে নিলে।" দেশের নেতাদের প্রতি কারুর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। ভাগো ইংলণ্ডে একটি রাজা আছেন, তা নইলে লোকের শ্রদ্ধাবৃত্তিটা কাকে আশ্রয় ক'রে তৃপ্ত হতো তাই ভাব্‌ছি। ইংলণ্ডের লোক রাজহীন রেপাব্লিক্ সহ্য করতে পারে না; যদিও তারা রাজাটিকে সাক্ষীগোপাল ক'রে এনেছে তবু তাদেরি একজন যে রাজা হবে বা প্রেসিডেণ্ট হবে এটা তাদের অসহ্য। প্রধান মন্ত্রীকেও সেদিন বলতে হয়েছিল যে, তিনি প্রধান ব'লে অপরাপরদের চেয়ে বেশী সম্মান বা বেশী অধিকার পেতে চান এমন নয়।

ইংলণ্ড দিনকের দিন যতই গণতান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার মহাপুরুষ-ভীতি বাড়্‌ছে। মাঝারী মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ ক্রমশই ইংলণ্ডের মাটীতে অসম্ভব হ'য়ে আস্‌ছে। একজন ক্রমওয়েল্‌কে বা একজন মুসোলিনিকে ইংলণ্ড দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারবে না। এমন কি একজন পীল্‌কে বা গ্লাড্‌ষ্টোনকেও না। ইংলণ্ডের মতো অতি স্বাধীন দেশে কোনো মানুষই যথেষ্ট স্বাধীন নয়। হাজারো আইন কানুন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দশজনের একটা mass suggestionও আছে, সমাজের দশজন চায়না যে তাদের মধ্যে কোনো একজন সর্ব্বেসর্ব্বা হোক কিম্বা বাকী ন'জনের চেয়ে মাথায় উঁচু হোক। গণতন্ত্রের আন্তরিক ইচ্ছা, কেউ বামন হবে না কেউ দৈত্য হবে না, সবাই প্রমাণ সাইজ্ হবে। তাই ইংলণ্ডের মহাপুরুষরা, কেবল রাজনীতিতে নয়, কোনো বিষয়েই আকাশস্পর্শী হচ্ছেন না। সাহিত্য ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর ব্রাউনিং টেনিসন কার্লাইল ডিকেন্‌সের দোসর দেখা যাচ্ছে না, বিজ্ঞানেও কোনো একজন লোক ডারুইনের মতো অতি অসাধারণ নন। অথচ মাঝারি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিজ্ঞেরা গত শতাব্দীর চেয়ে এ শতাব্দীতে সংখ্যায় অধিক ও উৎকর্ষে বড়। তাঁরা লোকের নিন্দা প্রশংসা পাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা বা বিশেষ অশ্রদ্ধা পাবার মতো মহান্ তাঁরা নন। তাঁদের নিয়ে এক-একটা school দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য schoolএর সঙ্গে মাথা ফাটাফাটি বাঁধ্‌ছে, এমন নয়। গণতন্ত্রের দেশের জনসাধারণ কোনো একজনকে অসাধারণ হ'তে দেয় না। আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার চেয়েও ইংলণ্ডের গণতন্ত্র খাঁটি। সেইজন্যে ইংলণ্ডে একটি ফোড বা আনাতোল ফ্রাঁস্ বা লেলিন সম্ভব হয় না।

তবে এটা কেবল ইংলণ্ডের নয় এ যুগের সব দেশেরি অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে মহাপুরুষের খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সব সুখ, কেবল ঐ একটি দুঃখ। গণতন্ত্র সকলকে সমান করতে চায়, কাউকে অসমান করতে চায় না। আগে ছিল ভোটের সাম্য, এখন আস্‌ছে মজুরির সাম্য, তারপর আস্‌বে মাথার সাম্য। ইস্কুল মাষ্টারের সাহায্যে সকলের মাথাকে সমান শক্তিবিশিষ্ট না করলে বুদ্ধির জোরে গোটাকয়েক লোক বাকী সকলের চেয়ে সুবিধা ক'রে নিতে পারে। এখন থেকেই কোনো কোনো লোক ষ্টেট্ সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধে এই ব'লে আপত্তি করছে যে, সকলকে যদি সব বিষয়ে সমান সুযোগ দেওয়া

হয় তবে তাদের মধ্যে যারা ইহুদীবংশীয় তারাই বুদ্ধির জোরে বড় বড় পদগুলো দখল করবে ও বাকী সকলের উপরে সর্দ্দারি করবে। সব সইতে রাজি আছি, কিন্তু ইহুদীর কর্ত্তৃত্ব! কিন্তু ইহুদীকে কোনো বিষয়ে কোনো সুযোগ না দিলেও কি তাকে দাবিয়ে রাখা যায়? ইহুদী যে সোলার মতো, তাকে সমুদ্রের তলে পাথর চাপা দিলেও সে ভাস্‌বেই। ইউরোপ আমেরিকার এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে ইহুদীকে হাজার দাবিয়ে রাখ্‌লেও সে উপরে ওঠেনি? ভাবী কালের গণতন্ত্রের রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র মুড়ি মিছরী—সকলেরি একদর হবে, কিন্তু কতগুলো লোক যদি বেশী বুদ্ধিমান হয় তারা তো বেশী সুবিধা ক'রে নেবেই —তারা ইহুদী বা আর যাই হোক্ না কেন। শেষকালে তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বংশধরদের মাথা standardise করতে হবে। রাশিয়ার মানুষের মাথাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ক'রে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কিন্তু উৎকর্ষের তারতম্য থেকে গেলে তম-প্রত্যয়ান্ত মাথাগুলো তর-প্রত্যয়ান্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্‌তে চাইবে না কি?

এমন কথাও আজকাল শুন্‌তে হয় যে আর্ট্‌কে সকলের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, দর্শনকে সর্ব্বজনবোধ্য করতে হবে, সব শাস্ত্রের অ-আ-ক-খ সকলের জানা চাই, সকলেই এক-খানা ক'রে মোটর গাড়ী পাবে, সকলের মাথায় bowler hat না থাক্‌লে সর্ব্ব মানবের ঐক্যবোধ হবে না, সকলের গায় কটিবস্ত্র না থাক্‌লে ভারতবর্ষের মধ্যে ধনী দরিদ্র ভেদ থেকে যাবে। গণতন্ত্রের যুগের যতগুলি প্রোফেট সকলেই সাম্যবাদী এবং সাম্য বল্‌লে এ যুগে বোঝায় বহিঃসাম্য। গান্ধী লেনিন ফোর্ড বার্ণার্ড'শ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউটো-পিয়ায় সব মানুষকে সমান বানাতে চান। কিন্তু সব মানুষ কি আত্মায় সমান নয়—কোনো দিন সমান ছিল না? সব মানুষ কি দেহে মনে সমান হ'তে পারে—কোনো দিন সমান হবে? অতীতে আমরা অধিকারী ভেদের উপরে বড় বেশী জোর দিয়াছিলুম, বর্ত্তমানে আমরা অধিকারী সাম্যের উপরে বড় বেশী জোর দিচ্ছি। সেই জন্যে আমা-দের মধ্যে যাঁরা আর্টিষ্ট তাঁরা ভাব্‌ছেন যে-আর্ট জন-কয়েক সমঝ্‌দারের মধ্যে নিবদ্ধ সে আর্ট একটা মহার্ঘ বিলাসিতা, আর্ট্‌কে জনসাধারণের যোগ্য করতে গিয়ে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা এমন মোটর গাড়ী উদ্ভাবন করতেই ব্যস্ত যে-মোটর গাড়ী সব চেয়ে সস্তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো হবে, তা নইলে বেশী লোক মোটর কিন্‌বার সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। যাঁরা শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ তাঁদের ইচ্ছা শিক্ষাকে এমন সুকর করা হয় যাতে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্বল্পতম সময়ে বহু বিষয়ে শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারবে। ইংলণ্ডে দেখ্‌ছি ছেলেমেয়ে-দের মধ্যে এক শ্রেণীর বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। "Children, do you know?" এই হলো প্রশ্ন। এর উত্তর বইয়ের পাতায় পাতায়। কে সর্ব্বপ্রথম কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের চূড়ায় হাতী দেখেছিল, কোথায় গাছের ডালে বিছানা পেতে মানুষে শোয়, কোন তারাটার আলো পৃথি-বীতে পৌঁছতে ঠিক বারো বছর এগারো মাস ঊনত্রিশ দিন তেইশ ঘণ্টা লাগে—এমনি সব উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর না জেনে রাখ্‌লে ভদ্র সমাজে বেচারা শিশু পণ্ডিত ব'লে মুখ দেখাতে পারবে না, প্রতি প্রশ্নে অপদস্থ হবে।

সব জিনিষ যে সকলকে জান্‌তেই হবে পেতেই হবে করতেই হবে এইটে আমাদের যুগের কু-সংস্কার। এরি উৎপাতে আমরা গভীরতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রসারের দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছি বেশী। একটা তাজমহল সৃষ্টি না ক'রে এক লাখ বাসগৃহ তৈরী করছি। একটি যীশুর জন্যে প্রস্তুত না হ'য়ে সহস্র সহস্র পাদ্রী প্রস্তুত করছি। Mass production পেছনেও এই মনোভাব। দু' একজন কোটি পতির ভোগের জন্যে নির্ম্মিত একটি ময়ূর সিংহাসন এযুগে অসম্ভব, এ যুগের শিল্পীদের চোখ publicএর ভোগযোগ্য একরাশ এক প্যাটার্ণে তৈরি লোহার বেঞ্চির উপরে, যে বেঞ্চিতে ব'সে একজন কয়লা-ফেরিওয়ালা এক পেনী দামের Daily Mail পড়্‌তে পড়্‌তে বিশ্রাম করবে। রাশিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো এখন নাকি গুদামঘরে পরিণত হয়েছে, Versaillesএর রাজনগর এখন একটা চিত্র প্রদর্শনী। আভিজাত্যের ভাবটা পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যারা লোপ পেতে দিচ্ছে তারা আর কেউ নয় অভিজাতেরা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

। রুমেনিয়ার রাণী এক পেনী দামের খবরের কাগজের নিজের ঘরোয়া সুখ দুঃখের কাহিনী লিখে প্রচুর টাকা ন, তবে তাঁর ঠাট বজায় রয় ! লর্ডেরাও কেউ মদ বিক্রী রে লক্ষপতি হবার পরে লর্ড পদবী পেয়েছেন, কেউ হাজের খালাসীগিরি কর্‌বার পরে ওকালতীতে উন্নতি ক'রে পদবী পেয়েছেন। ইংলণ্ডে তবু নামমাত্র একটা শ্রেণী আছে, ফ্রান্স্ জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে বুর্জ্জোয়ারাই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী এবং রাশিয়াতে সে-শ্রেণীও নেই।

একদিন মানুষ প্রাণপণে যা চায় আরেক দিন যখন হাতের মুঠায় তা পায় তখন ভাব্‌বার সময় আসে যা পেলুম সত্যিই কি তা এতই ভালো যে এর জন্যে যা হাতে ছিল তাকে ছাড়্‌লুম ! ইউরোপের কেউ কেউ এখন ভাব্‌তে আরম্ভ করেছেন, গণতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্রের চেয়ে সত্যিই ভালো ? লাখ লাখ মাঝারি মানুষ কি এক আধজন মহাপুরুষের চেয়ে সত্যিই কাম্য ? The greatest good of the greatest number কি প্রতি মানুষকে একটি ক'রে ভোট ও একশো টাকা ক'রে মাইনে দিলে হয় ? খাওয়া পরার কষ্ট ও পরাধীনতার কষ্ট অতি অসহ্য কষ্ট—কিন্তু এ কষ্ট দূর কর্‌লেও কি সব চেয়ে বড় কষ্টটা থাক্‌বে না ? সব চেয়ে বড় কষ্ট আভিজাত্যের অভাব, qualityর অভাব। দু' একটি মানুষ যদি বাকী সকলের চেয়ে অত্যন্ত বেশী বড় হয় তবে তাদের সেই অত্যন্ত বেশী বড় হওয়াটা কি বাকী সকলের পক্ষে greatest good নয় ? ক্যাপিটালিজ্‌মের পেছনেও একপ্রকার আভিজাত্য ছিল। এক এক জন ক্যাপিটালিষ্ট যখন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ফাঁদেন, প্রকাণ্ড একটা Combineএর কর্ত্তা হন, তখন তাঁর সেই শ্রেষ্ঠতা কি মানবজাতির শ্রেষ্ঠতা নয় ? কিন্তু ইংলণ্ডের মতো দেশে ক্যাপিটালিজ্‌মের দৌড় সীমাবদ্ধ হ'য়ে এসেছে, আমেরিকাতেও হ'য়ে আস্‌বে। ক্যাপিটালিজিম্ থাম্‌বেই। কিন্তু যে-বুদ্ধিবলের আভিজাত্য ক্যাপিটালিজ্‌মের পেছনে ছিল সে আভিজাত্যও যদি সেই সঙ্গে থামে তবে তাতে মানুষের লাভ বেশী, না, ক্ষতি বেশী ?

আমেরিকার স্বাধীনতা ফ্রান্সের বিপ্লব ও ইংলণ্ডের যান্ত্রিকতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যে সাম্যবাদ জড়িত ছিল সে সাম্যবাদ সমস্ত পৃথিবীকে standardised না ক'রে ছাড়্‌বে না ; এই দেড় শতাব্দীর মধ্যে সে ইউরোপ-আমেরিকাকে একাকার ক'রে তুলেছে, এখন এক স্থানে ব'সেই দেশভ্রমণের ফল পাওয়া যায়। ইতর-ভদ্র শূদ্র-ব্রাহ্মণ শ্রমিক-ধনিক প্রজা-রাজা নারী-নর তরুণ-প্রবীণ সকলকেই একই নেশায় পেয়েছে—পরস্পরের সঙ্গে সমান হ'তে হবে। এ যুগের একমাত্র বিরোধী সুর কেবল নীট্‌শে। কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁর পরুষ কণ্ঠকে যথেষ্ট ললিত কর্‌তে লেগেছেন, তা নইলে ডেমক্রেসীর কর্ণপটহে ব্যথা লাগ্‌বে। নীট্‌শের Supermanকে তাঁরা এমন চেহারা দিচ্ছেন যে দেখ্‌লে মনে হয় Supermonkey। আসল কথা বৈষম্যবাদের সবে সুরু হচ্ছে, অসম পুরুষকে ঠিক্ মতো কল্পনা কর্‌তে পারা যাচ্ছে না। কল্পনা ক'রেও কোনো ফল নেই। তিনি যখন আস্‌বেন তখন আপনি আস্‌বেন, তাঁকে বানাবার ভার যে বামনরা নিতে চায় তাদের সব কল্পনার চেয়ে তিনি বড়। তিনি এলে তাঁর সমাজের যে কেমন চেহারা হবে তার নক্সা তৈরি করা এইচ জী ওয়েল্‌সেরো অসাধ্য।

ব্রোঞ্জ্-যুগ—এ, রোদাঁ।

ব্যাটিগ্‌নল্‌-কোয়ার্টারে চিত্রাগার—এইচ্‌ ফাতঁ্যা-লাতুর

মাদ্রুরার একটি পথ—এ, বেনার

অলিন্দ—ঈ, মানে

উদ্যানচারিণী—সি, মোনে

মাতৃত্ব—এম্ দেনি

মাদাম পাস্‌কা—এল্ বোনা

বালক সেণ্ট্‌জন—জে, দাঁপ্‌ত্‌

বিপত্নীক—জে, রাফেইল্

পরিচিত গৃহ—জে-এল্. ফোরেঁ

জলসত্র—জে, ফ্লদ্রিঁ
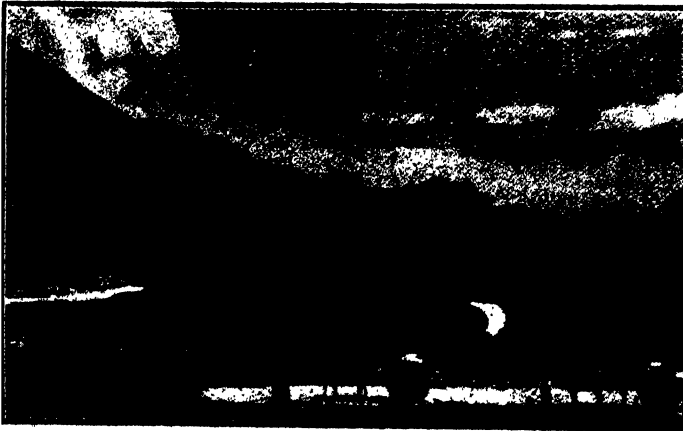
শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক
নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত

পল্লী-স্মৃতি

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

শৈশব মোর কেটেছে কেবল পল্লী-গৃহের ছায়ে,
পথ অসরল, দীঘি কালো জল উতলা পাগল বায়ে ;
ছিল না কঠিন সমাজ-শাসন,
বন্ধন বাধা জীবন-নাশন,
স্বভাবের মাঝে ছিনু বিকশিয়া বিশ্বদেবের পায়ে।

আজি নগরীর কোলাহলে ভরা—রুদ্ধ গৃহের কোণে,
ছেলেবেলাকার সেই কথাগুলি থেকে থেকে পড়ে মনে,
কি ছিলাম আমি হ'য়েছি কেমন,
কোথা সে আমার সুকোমল মন ?
অকারণে আজ লুটায় কাহার কঠোর নির্যাতনে!

মনে হয় আহা,—যদি ফিরে পাই অতীতের দিন মোর,
স্বপ্নের মত যদি ভেঙে যায় কঠিন সমাজ-ডোর ;
শিশুর মতন পুন কাঁদি হাসি,
মন খুলে দিয়ে সবে ভালবাসি,
ছুটে চ'লে যাই পুরাণো সে গাঁয়ে, সুখের স্বপ্নে ভোর।

সেখানে আমারে বরিবে আদরে বিপুল উদার স্নেহ,
কারো ভয়ে আর হব না চকিত, শাসিবে না আর কেহ ;
গলাগলি করি ঘন তরুছায়—
সাথীরা ডাকিবে "আয়-আয়-আয়",
দু'বাহু পসারি' টেনে নেবে কোলে সাধের পল্লীগেহ।

খোলা আকাশেতে কি রংয়ের মেলা,—বাতাসে সুবাস ভাসে,
বনের পাখীর গান শুনে শুনে চোখে জল ভ'রে আসে ;
উতলা কোকিল কুহরে কোথায়,
'বউ কথা কও,' কেহ ডেকে যায়,
'পিয়া—পিয়া—পিয়া' ফুকারে পাপিয়া নিশিদিন কার আশে ?

গাছে গাছে ঘেরা ছায়ার মাঝারে ক্ষুদ্র কুটীর-দ্বারে—
বিস্মৃতপ্রায় ছবিখানি সম মনে পড়ে আপনারে, ;
আঁচলেতে ভরা একরাশ ফুল,
কেশে ঝ'রে পড়া আকুল বকুল,
প্রভাতে প্রদোষে কুসুম কুড়ানো পুরাণো দীঘির ধারে।

আঁকা বাঁকা সেই পথখানি দিয়ে নিতি কত যাওয়া আসা'—
গন্ধে আকুল নেবুর শাখায় বুলবুলিটির বাসা
দিছি কতবার পাতা দিয়ে ঢেকে,
পাছে কেহ নেয়,—পাছে কেহ দেখে,
ফলে ফুলে ভরা কুলগাছটিকে অযাচিত ভালবাসা!

দুপুর বেলায় রোদে রোদে ঘোরা লুকায়ে মায়ের কাছে,
বাগানেতে সেই বকুলতলায় না জানি কী সুধা আছে!
মাথার উপরে পাতা ফাঁকে ফাঁকে
সকরুণ স্বরে ঘুঘু পাখী ডাকে—
অবাক্ হইয়া শুনি শুধু তাই,—কি জানি কি ওরা যাচে!

মনে পড়ে সেই শানে বাঁধা ঘাট—বট অশথেতে ছাওয়া,
তারি তলে বসি' সাথীদের সনে কত সে যে গান গাওয়া ;
অদূরে তাহার মেঠো ঘাট-তলে
পল্লীবধূরা আসে দলে দলে,
নাচে কালো জল—খেলা করে ছলে উতলা পাগল হাওয়া।

এ কি আমি সেই ? বিস্মিত হ'য়ে ভাবি তাই বারে বারে,
বসন ভূষণে ঢাকিয়া বাঁধিয়া কি করেছি আপনারে!
লোকে ভালবাসে,—বলে,—"আহা মরি,
যেন অপ্সরা স্বর্গের পরী!"
বলে না ক—"গৃহলক্ষ্মীর রূপে এলে তুমি সংসারে।"

এরা চাহেনা ক' হৃদয় আমার এরা শুধু চায় দেহ,
সাজাইতে চায় পুতুলের মত, দেবে না প্রাণের স্নেহ ;
তাই প্রাণ-হারা হয়ে আছি হায়,
রূপের আড়ালে মরমগুহায়—
মনের আলোক আছে কি নিভেছে দেখেছে কি তাহা কেহ ?

তাই এ পরাণ লুকাইতে চায় সেই কুটীরের পাশে,
প্রাঙ্গণে যার আজো ফুলকলি প্রভাতবাতাসে হাসে ;
সেই দীঘি জলে,—সেই তরুছায়,
হৃদয় আমার ঘুরিয়া বেড়ায়—
সেথাকার সেই স্নিগ্ধ বাতাস আজো তারে ভালবাসে।

কাজ কাজ খেলা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীতে একদল লোক আছে যারা কাজ করে, আর একদল লোক আছে যারা খেলা করে। তোমরা মনে কোরো না যে একদলেরই দরকার আছে অন্যদলের নেই, বা প্রথম দল শ্রেষ্ঠ এবং শেষের দল নিকৃষ্ট।

পৃথিবীতে ডাঙা জমি আছে সেখানে চাষ বাস বাণিজ্য ব্যবসা যুদ্ধ বিগ্রহ চলে—পৃথিবীতে সমুদ্র আছে, সেখানে কেবলই ঢেউ খেলচে আর কলধ্বনি উঠচে। যারা সমজদার লোক তারা জানে অকর্ম্মণ্য সমুদ্রের খেলার সঙ্গে ব্যস্তবাগীশ ডাঙার কাজের গভীরতর যোগ আছে। বৃষ্টি জিনিষটা ছেলেখেলা বই কি, ঊনপঞ্চাশ বায়ু তার বাহন—তার না আছে হাল লাঙ্গল গোরু মহিষ, না আছে ঠিক ঠিকানা, না আছে অধ্যবসায়;—আর ফসল ফলা ব্যাপারটা, যাকে আমাদের সাময়িক পত্রের সমালোচকেরা বলেন, "সারবান,"—কিন্তু,—আর অধিক বলবার দরকার নেই।

আমার শেষ পত্রে তোমাকে আভাস দিয়েছিলুম যে আমি হচ্চি জগতের খেলাঘরের মানুষ। শুনে তোমার মনে হ'ল আমি বুঝি স্বাভাবিক বিনয় গুণে নিজেকে খাটো ক'রে দেখলুম। তাই তুমি প্রমাণ করতে বসেচ যে আমি এত তুচ্ছ নই, বিধাতা আমাকে তাঁর খেলা ঘরে না -প্রত্যুত কাজের ক্ষেত্রেই পাঠিয়েচেন। তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনে মনে দুঃখ হল। তুমি ত জান আমি বিশ্বজনের সাম্‌নে আমার অন্তর্য্যামিনীকে বলেচি, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" কথাটা বিশ্বাসই করলে না! কিম্বা হয়ত ঠাওরেচ, দেবী আমার আবেদন নামঞ্জুর ক'রে দিয়েচেন, অতএব আমাকে দেশ উদ্ধার করতেই হবে—এই শেষ বয়সে চরখা এবং খদ্দর প্রচার ক'রে আমার জীবলীলা সমাধা হবে! বাল্যকাল থেকেই আমার আত্মীয় স্বজন আমার হিতৈষীবর্গ আমার আশা ছেড়ে দিয়েচেন—তুমি কে হে—হঠাৎ আমার উপরে তোমার এমন শ্রদ্ধা কি ক'রে হ'ল? হয় ত কোন্ দিন ব'লে বসবে যে, দৈনিক সাপ্তাহিকের সাব-এডিটরী করতে পারি এত বড় যোগ্যতাও আমার আছে!

তুমি এক সাক্ষী খাড়া করেচ বিশ্বভারতী। হায়রে, তুমি কবি হ'য়েও ওর স্বরূপটা বুঝতে পারলে না! ওটা কি কাজ? ওটা আমার কাজ কাজ খেলা। সেই জন্যেই ত আমাদের দেশের প্রবীন কাজের লোকে কেউ ওকে গ্রাহ্যই করলে না। ওটা যে ঊনপঞ্চাশ বায়ুরই কীর্ত্তি-বিশেষ সেটা গৌড়জনের কাছে ধরা প'ড়ে গেচে। ফাঁকি দিয়ে কলঙ্কভঞ্জন সকলের ভাগ্যে হয় না। শুধু গৌড়জন কেন, সেদিন দুজন গুজরাটি আশ্রমে তাদের ছেলে দেবে ব'লে এসেছিল—জিজ্ঞাসা করলে এখানে চরকা কয় ঘণ্টা চলে—শুন্‌লে চলে না। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলে এখানকার সমস্ত জিনিষটাই ফাঁকা কবিত্ব—অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেল। আমার একটা এই সান্ত্বনা রইল মনে যে, আর যাই হোক পরিচয়টা পেয়ে গেল—বুঝলে, ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই।

ভারাকর্ষণের একটা নিয়ম আছে,—সে হচ্চে, পদার্থই পদার্থকে আকর্ষণ করে। আমার কারবার যত অপদার্থকে নিয়ে; তাতে খেলা জমে ভাল—কেবল মুস্কিল, সপদার্থ এসে কৈফিয়ত তলব করে—তখন বোকার মত হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতে হয়। সপদার্থরা পদার্থতত্ত্বই বোঝে, তারা নিরর্থতত্ত্ব বোঝে না; এই জন্যে সেটাকে তারা অনর্থ ব'লেই ঠাওরায়। তারা বলে, দেশে আগুন লেগেচে, তোমার বালতি কোথায়? আমি অকিঞ্চন তার জবাবে মাথা চুলকে বলি, আমার বালতি নেই, কেবল ফুঁ আছে। শুনে তারা বোঝে আমি দলের লোক নই। কিন্তু সে কথা বুঝে তাদের মন শান্ত হয় না। কারণ যারা দল-চর জীব, দলে না থাকাটাকেই তারা অপরাধ ব'লে গণ্য করে। এ জন্মে সে অপরাধের ক্ষালন আমার দ্বারা হবে না। সে জন্য দায়ী আমার লগ্নাধিপতি—তিনি রাতের আকাশে স্বপ্ন-সমুদ্রে সন্তরণ ক'রে বেড়ান; আমরা পরীক্ষা দিতেও পারলুম না, আর সাব-এডিটারী করবার মত বুদ্ধিও ঘটে জোগাল না। শেষ বয়সে বিশ্বভারতী নাম দিয়ে একটা মস্ত খেলা ধরেচি। যাবার বেলায় হয়ত ও পুতুলটাকেও ভেঙ্গে দিয়ে যেতে হবে—এমন অনেক পুতুলকে ত ভেঙেচি। "সাধনা" নামক এক কাগজের খেলনা ছিল—সেটা ভেসে গেল কেন? যেহেতু ওটা অপদার্থের লীলা। অতএব তোমরা আমার কাছ থেকে এমন কিছুই প্রত্যাশা কোরোনা যাতে কাজের সুবিধা হ'তে পারবে। কারণ আমার দরবারের অধিষ্ঠাত্রী আমাকে কাজে পাঠাতে চান না—কাছে রাখতেই চান।

মানুষ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

৯

এ জীবন মধুচক্র ; প্রতিকোষে তার
অহরহ আহরিয়া মধুর সম্ভার
ভরিতেছে মধুমক্ষি নর। ধরাময়
যত আছে বিফলতা, কণ্টক, সংশয়,
নৈরাশ্য, বিয়োগ, অশ্রু, বিরহ, বেদনা,
লজ্জা, ভয়, দুঃখ, বাধা, আকাঙ্ক্ষা, চেতনা,
অপ্রণয়, অপমান, নিন্দা ও সংস্কার—
এ সবের মাঝে গুপ্ত মধুর ভাণ্ডার।
পরিপূর্ণ আনন্দের উন্মাদনা বুকে
ফিরে নর চিরকাল সর্ব্বদেশে যুগে
মধুর সন্ধানে ; জলে, স্থলে, গুল্মে, গাছে,
আকাশে, বাতাসে, বনে, ধূলিকণা মাঝে,
পেয়েছে মানুষ মধু ; অমৃত-সন্তান
মানুষ অমর তাই, শাশ্বত প্রধান।

১০

কে বলে নশ্বর নর ? হেন মিথ্যা বাণী
যে রটায়, মানুষের শত্রু তারে মানি।
মানুষ মরিত যদি, তা' হ'লে কি ধরা
থাকিত অদ্যাপি হেন প্রাণ-মনোহরা ?
মানুষ অমর।
মানুষে ক্ষুদ্র কে কয় ?
কি আশ্চর্য্য, জানে না সে নিজ পরিচয় !
দেবতা হয়ত আছে, কিম্বা তিনি নাই,
তাঁহার সাক্ষাৎ মোরা কভু নাহি পাই ;
কিন্তু এ মানুষ, চিরন্তন এই ধারা,
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাই যার সাড়া—
এ প্রত্যক্ষ, নিত্য, সত্য, কেমনে তাহারে
উড়াইয়া দিবে, বন্ধু, কোন্ সে আঁধারে ?
মানুষ শাশ্বত সত্য, দেবতার বড়,
বৃহৎ অনন্ত সে যে, তারে খাটো করো ?

১১

ভালো মন্দে, দোষে গুণে, সত্যে ও মিথ্যায়,
ষড়-রিপু-কবলিত, মানুষ ধরায়।
হত্যা করে এক হাতে নিষ্ঠুর পাষাণ,
অন্য করে রক্ষা করে আরে দিয়া প্রাণ ;
একে হরি', অন্যে দেয় ; কভু হাসে কাঁদে ;
কারে মুক্তি দিয়া, কভু অন্য জনে বাঁধে ;
কখন হারায় জ্ঞান স্বার্থের কারণ,
সর্ব্বস্ব সমর্পে কভু না মানে বারণ,
আত্মঘাতী হয় কভু, শোকেতে শুকায়,
সেই সে আবার অন্যে সান্ত্বনা শুনায় ;
অবিচ্ছিন্ন উচ্চনীচ তরঙ্গই জল,
তরঙ্গ জলের প্রাণ, শাশ্বত চঞ্চল।
রৌদ্র মেঘে এই আলো-আঁধারির খেলা,
এই ধূপছায়া চির মানুষের মেলা।

১২

মানুষ মাগিছে মুক্তি ; ছিঁড়িতে বন্ধন
প্রাণপণে যুঝে ; অই বন্দীর ক্রন্দন
নিঃশ্বসিছে জগতের আকাশে, বাতাসে,
মাটিতে ও জলে নিত্য গভীর হতাশে।
সংস্কার, সমাজ, রাষ্ট্র, পুঁথি ও সংহিতা,
বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম, আর ইজ্জৎ, সভ্যতা,
দিবা নিশি চতুর্দ্দিকে তর্জ্জনী-হেলনে
আছে রচি' বিভীষিকা ; এ কর-চরণে
ও নির্ম্মম শৃঙ্খলার দাসত্ব-শৃঙ্খল
হরিয়াছে সর্ব্বশক্তি স্বাধীনতা বল।
মানুষের হাতে গড়া' এ সব শিকল
বাঁধিয়া রাখিবে চির মানুষ সকল ?
পায়ের শিকল উঠে কণ্ঠে বুক বেয়ে,
হবে কি সে এত বড় মানুষেরো চেয়ে ?

বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মনে পড়ে আজ প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের অনেক মাসিক পত্রে সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে একটা আলোচনা উঠেছিল। প্রতিবাদীপক্ষ থেকে এই একটা আপত্তি উঠেছিল যে সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিক নন এজন্য তাঁর প্রতিও অনেক রকম কটাক্ষ হয়েছিল। বস্তুতান্ত্রিকতার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনেক আলোচনার মধ্যে অজ্ঞাত ও অখ্যাত ভাবে আমিও একটু সামান্যভাবে যোগ দিয়েছিলুম এবং সবুজ পত্রে অভিনবের ডায়েরী নামে একটা প্রবন্ধ ছেপেছিলুম। এ দ্বন্দ্ব যে আজও মিটেছে তা নয়, অতি আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও প্রগতি, কল্লোল, ধূপছায়া, কালি-কলম, শনিবারের চিঠি প্রভৃতিরা একত্র হয়ে বেশ একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। বিবাদটা এখন আর বস্তুতান্ত্রিকতা এই নাম অবলম্বন ক'রে চল্‌ছে না, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে বিবাদটার মূলে এই রকম একটা মতের স্বপক্ষে বিপক্ষে টানাছেঁড়া চলেছে। বস্তুতান্ত্রিকতা কথাটা আমাদের দেশের কোন প্রাচীন কথা নয়। ইংরেজীসাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে কোনও ইংরেজী ভাবের বাঙ্গালা তর্জ্জমার চেষ্টায়ই এই শব্দটির উৎপত্তি। আমার সন্দেহ হয় যে ইংরেজীতে যে realism ব'লে একটা কথা চলে সেইটা থেকেই বাঙ্গালায় এই শব্দটির উৎপত্তি। ইংরেজী সমালোচনার ধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছুদিন ধ'রেই প্রয়োগ করবার চেষ্টা চলেছে, এবং সেই চেষ্টার ফলে ওদেশে যে সব ঝগড়াঝাঁটি চলেছে আমরাও বাঙ্গালা ক'রে সেই সব ঝগড়াঝাঁটি সুরু করেছি। ঝগড়ার সুরুতেই ঝগড়ার বুলি-গুলি তর্জ্জমা করা নিতান্তই দরকার হ'য়ে পড়েছিল।

আধুনিক কালে ইংরেজী ভাষায় realism ব'লে যে শব্দটি চলে সেটি সাহিত্য থেকে দর্শন শাস্ত্রে এসেছে কি দর্শন শাস্ত্র থেকে সাহিত্যে গেছে, সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ নিয়ে আমি একটা নূতন বিবাদ আরম্ভ কর্ত্তে চাই না ; তবে আমার মনে হয় যে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে realism বা neo-realism ব'লে যে শব্দটি পাওয়া যায় তার অর্থটি বেশ পরিষ্কার এবং ব্যাপক। আমার আরও মনে হয় যে সেই অর্থটি ধীর-প্রসারিত নানা গৌণ অর্থে সাহিত্যিক realismএর সকল অর্থকেই পরিষ্কার ক'রে দেয়। আমরা যখন নানা ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে নানা বস্তুকে জানি তখন এই জানার সঙ্গে যে বিষয়টি জানি তার কি সম্পর্ক সেই প্রসঙ্গে এই realism বাদটি আধুনিক দর্শন শাস্ত্রে উঠেছে। প্রাচীন ইয়োরোপীয় দর্শন শাস্ত্রেও realism ব'লে একটি মত ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলা প্রাসঙ্গিক হবে না। কিছুদিন ধ'রে ইয়োরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী ও নবীন-পন্থীদের মধ্যে এই নিয়ে একটা ঘোরতর কলহ উঠেছে যে যে বিষয়টি আমরা জানি, সে বিষয়টির স্বরূপ ও প্রকৃতি আমাদের জানা দ্বারা কোনও রকমে পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত হয় কি না। নবীনেরা বলেন যে রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ যা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, সেগুলি ঠিক তেমন তেমনটি হ'য়েই বাইরে রয়েছে। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের জানালা দিয়ে যখন সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়, তখনই সেগুলিকে আমরা "জানি" ব'লে ব্যবহার করি। জানা ব'লে জিনিষটা যদি সংসারে একেবারেই না থাকত, তথাপি জান্‌বার বিষয়গুলির অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির কোনও রূপ ক্ষতিবৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন হ'ত না। দৈহিক বা আন্ত-রিক নানাপ্রকার ভাবপরম্পরা ও সুখদুঃখাদি বোধ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। জ্ঞেয় বিষয় মাত্রই আপন আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই বিদ্যমান রয়েছে। মন সেগুলিকে কোনও রকমে আপন ইচ্ছায় গড়েপিটে নিতে পারে না, বা পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পারেনা ;

বর্ত্তমান বর্ষের রবীন্দ্র পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণরূপে পঠিত ও রবীন্দ্র পরিষদের দ্বিতীয় নিষ্ক্রান্তিরূপে প্রকাশিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মনের কাজ হচ্ছে সেগুলিকে শুধু জানা। আমি এই জন্যে এই realism মতটিকে বাঙ্গালায় তর্জ্জমা কর্ত্তে গেলে তাকে যথাস্থিতত্ব বাদ বলব—অর্থাৎ যেটি যেমন আছে সেটি ঠিক তেমনই আছে; আমাদের জানার দ্বারা যথাস্থিত বস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদের বিপরীতবাদিদিগকে idealist বলা যায়। তাঁহারা বলেন যে জানার সঙ্গে জানার বিষয়ের এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে জানা ছাড়া বিষয়টি যে কি তা বলবার কোনও উপায় নেই। জানার মধ্য দিয়েই বিষয়টি নিজকে প্রকাশ করে, তাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির কোনওটিই জানার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন হ'য়ে, আলগা হ'য়ে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে এমন কথা বলার উপায় নেই কারণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ব'লে যা কিছু আমরা জানবার বিষয় বলি সেগুলি সবই ত জানারই বিভিন্ন রূপ, তাই জানা ছাড়া সেগুলির কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব বোঝ্‌বার উপায় নেই। এঁদেরই অনেকে আবার এমনও বলেন যে জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের যে সম্পর্ক সেটা পরস্পরাপেক্ষী একটা জীবনপ্রবাহের মত। সকালে যেটি বর্ণহীন, গন্ধহীন কুঁড়ি ছিল, বৈকালে সেইটিই রূপে, গন্ধে ভরপুর, কাল যে বীজটি প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় মাটির মধ্যে পড়েছিল, আজ সেইটিই সবুজ অঙ্কুর হ'য়ে মাটি ভেদ ক'রে উঠেছে। সমস্ত জীবনের ব্যাপারেই আমরা দেখ্‌তে পাই যে থাকা ব'লে কোনও জিনিষ নেই, কেবল হওয়ারই স্রোত চলেছে। আমাদের সঙ্গে আর আমাদের জানার সঙ্গে এমনি একটা জীবন-ব্যাপার চলেছে যে এদের কোনটিকেই এমন ক'রে বলা যায় না যে সেটি যেমনটি তেমনটি হ'য়েই স্থির হ'য়ে রয়েছে। "যেমনটি" এ কথার কোনও মানেই নেই; যে দেখে, যখন দেখে, যেমন ক'রে দেখে, সেই অনুসারেই যেমনটি ভেসে বেড়াচ্ছে। বিশ্বময় এমনি একটা একাত্ম প্রাণবন্ধনের যোগ রয়েছে যে কাউকে ছেড়ে কারুরই সীমানা নির্দ্দেশ করা চলে না। বিজ্ঞান আজ এমন কথাও বল্‌ছে যে একগজ লাঠিখানাও সকল সময় একগজ থাকে না। লাঠিখানা স্থির আছে, কি জোরে চলছে, কে তাকে কোনখান থেকে কি ভাবে দেখ্‌ছে তার উপর লাঠির পরিমাণ নির্ভর করে। আমরা যে ঘরে ব'সে কথা বল্‌ছি এই কথার শব্দ যদি গ্রহান্তর থেকে শোনা যেত তবে আমার বক্তৃতার প্রথম ভাগ যে স্থানে উচ্চারিত হয়েছে তার মধ্যভাগ সেই স্থানেই উচ্চারিত হয়েছে ব'লে কেউ ভ্রম কর্‌ত না। অথচ এইখানে ব'সে এমন অসম্ভব কল্পনা কর্‌লে লোকে তাকে পাগল না ব'লে ছাড়ে না। এম্‌নি ক'রে দেখা যায় যে জানার সঙ্গে আর যা জানি তার সঙ্গে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চলেছে যে এ দুটিই পরস্পরের মিলনে পরস্পরকে পরিবর্ত্তিত ক'রে নূতন থেকে নূতনতর হ'য়ে চলেছে। আমাদের সুখ দুঃখ ও ভাল-লাগা মন্দলাগা, সুন্দর অসুন্দর, ভালবাসা ও মন্দবাসা, আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, আমাদের শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য, যা কিছু আমরা শ্রেয় এবং প্রেয় মনে করি, যা কিছু আমরা পাচ্ছি, পেয়েছি বা হারিয়েছি সবই যেন জীবনের ছন্দে "তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ" ক'রে নেচে চলেছে। আমাদের জানা ব'লেও এমন কোন স্থির বিন্দু নেই বা আমরা ব'লেও এমন কোন স্থির বিন্দু নেই, যেখানে সমস্ত বিষয়গুলি এসে আশ্রয় নেয়। রূপে গন্ধে, সত্যে কল্পনায়, হাসি কান্নায় যা সত্য, তা ক্রমশঃ আপনার রূপ অভিব্যক্ত কচ্ছে। সে রূপ স্থির নয়, তা চঞ্চল। তাই এমন কিছু স্থির বস্তু নেই যা যথাস্থিতভাবে আমাদের জ্ঞানে এসে প্রতিফলিত হয়। যা দেখি, যা অনুভব করি, সে সমস্তই আমাদের অনুভবের সোণার কাঠির স্পর্শে পরিবর্ত্তিত হয় এবং আমাদের অনুভবের সোণার কাঠিটিও সর্ব্বদাই অষ্টধাতুতে পরিণত হ'য়ে চলেছে। এই মতটিকে idealism বলে। বাঙ্গালায় আমি এ'কে পরি-কল্পনাবিবর্ত্ত বা কল্পনাবিবর্ত্ত বলতে চাই।

এই দুইটি মতকে পাশ কাটিয়ে আর একটি দার্শনিক মতও কিছুদিন ধরে ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে উঠছে। সেটিকে আমি বল্‌ব অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদ বা ব্যবহারিত্ববাদ (pragmatism)। এঁরা বলেন যে, সত্য আমরা তাকেই বলি যা আমরা কাজে খাটাতে পারি, বা যার অনুসারে আমরা আমাদের নানাবিধ ব্যবহার সম্পন্ন কর্ত্তে পারি। কোনও কাজ কর্ত্তে গেলে, যা না বিশ্বাস করলে আমাদের চলে না বা অসুবিধা হয় সেইটাকেই সত্য ব'লে এঁরা মেনে নিতে চান। বিশ্বাস করাও এঁরা তাকেই বলেন যে অনুসারে

আমরা কাজ করি। কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে যে চাঁটগা যেতে চায় সে রেলওয়ে টাইম্ টেব্‌লে বিশ্বাস করে আমরা তখনই বল্‌ব যখন আমরা দেখ্‌ব যে ভোরে ৭টায় গাড়ী ধরবার জন্য তল্পি তল্পা বেঁধে সে যথাসময়ে শিয়ালদহের দিকে ছুট্ দিয়েছে। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনার আসরে বস্তুতান্ত্রিকতার দল থেকে এ মতেরও প্রভাব কম নয়। চর্‌কা ঘুরলে দেশের মঙ্গল হবে এটা যখন নিশ্চিত, তখন চর্‌কা ঘুরন সম্বন্ধে খণ্ড কি মহা কাব্য নিশ্চয়ই জ'মে উঠ্‌তে পারে, সে জন্য নবোদ্গতপক্ষ কবিদের এই বিষয়েই কাব্য লেখা উচিত। এ সম্বন্ধে দুচারখানা কাব্য বেরিয়েছে এ কথাও আমি শুনেছি। ঋতু সম্বন্ধে বৃথা রসোদ্রেক করবার চেষ্টার চেয়ে যদি আমি লিখি—চর্‌খা ঘুমা ঘুমাকে চৌষট্ হাজার বাচা বাচাকে স্বরাজ লেঙ্গে, এটার কাব্যরস সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ হওয়া উচিত নয় কারণ এতে এক ঢিলেই তিনটি পাখী মারা গেছে। প্রথমতঃ, এটা হিন্দীতে লেখা, তার প্রথম ফল এটা সকলে বুঝবে; দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীর চৌষট্টী হাজার টাকা এতে বাঁচান গেল; তৃতীয়তঃ, এতে চরকা ঘোরান গেল। এতগুণ সত্ত্বে কবিতাটির চতুর্থ চরণের অভাব মার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে pragmatic বিষয়ের অভাব নাই, যথা ধাঙ্গড়বিদ্রোহ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়ানিবারণ, বন্যানিবারণ, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ ইত্যাদি।

আজকালকার বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁরা realist বা যথাভূতবাদী তাঁরা মনে করেন যে যে বস্তুটি যেমন ক'রে আছে তাকে ঠিক সেই রকম ক'রে চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। সমাজের আবর্জ্জনা বা পাঁক, পাপ বা মলিনতা, দুর্দ্দাম সংযমহীন ইন্দ্রিয়লোলুপতা এ সব জিনিষই ত রয়েছে। পূর্ব্বতন কবিরা এগুলিকে কাব্যের বিষয় করেন নি, কিন্তু না কর্‌বার ত কোন হেতু নেই, যেটি যেমন ক'রে আছে সেটি ত তেমন ক'রেই সত্যি। জঘন্যতা বা নিন্দনীয়তা ত মানুষের মনে, বস্তুর মধ্যে ত কোন নিন্দা প্রশংসা নেই। প্রাচীনেরা যদি জীর্ণ সংস্কারবশে কতগুলি সত্যকে হেয় ও বর্জ্জনীয় মনে করেন, তাই ব'লে সেগুলি হেয় বা বর্জ্জনীয় হ'তে পারে না। এঁরা যথাস্থিতবাদী, সেই জন্যেই এঁরা বিশ্বাস করেন যে যেটি যে ভাবে আছে সেই ভাবেই সেটি সত্য এবং কাব্যের বিষয় হবার যোগ্য। এঁদের মন্ত্র হচ্ছে এই যে স্বভাবে সুরুচি কুরুচি নেই, সুনীতি দুর্নীতি নেই, পাপপুণ্য নেই। এঁরা চান না যে কোন প্রাচীন সংস্কারের আদর্শের দ্বারা স্বভাবে যা রয়েছে তাকে ওলট্ পালট্ ক'রে দিয়ে পুরোণো ঢংএ গ'ড়ে তুলবেন, কারণ মনের কাজ শুধু যা আছে তাই দেখা, কাব্যেরও কাজ তাই যা আছে তাই চিত্রিত করা। ব্যবহার-বাদীরা হয়ত বলেন যে কাব্য জিনিষটা কল্পনায় না রেখে সত্যকার কাজে লাগান উচিত। কাব্যরসের দ্বারা যখন লোকের মন অভিষিক্ত হয়, তখন সেই মনকে এমন ক'রেই নরম ক'রে দেওয়া উচিত যাতে অনায়াসে সুতো কাটতে বা কাপড় বুনতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, অথবা ধাঙ্গড়দের দুঃখ দূর কর্ত্তে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

যথাস্থিতবাদিদের গোড়াকার বনেদে এই একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র আছে যে যেমনটি যা আছে সেটি তার পূর্ব্বাপরকে নিয়ে এমন ভাবেই আছে যে সেখান থেকে তাকে ছিন্ন ক'রে কাব্যে চিত্রিত কর্‌বার জন্য মনের রঙে রঙিয়ে নিতে গেলেই যেমনটি আছে তেমনটি চিত্রিত করা সম্ভব হয় না। আর একটি ছিদ্র এই যে রস জিনিষটি মনের বা হৃদয়ের অনুভবের বস্তু। অথচ হর্ষ, শোক, ভয়, দৈন্য, দুঃখ প্রভৃতি যা কিছু আমরা লৌকিক জীবনে অনুভব করি এবং যাকে ইংরেজীতে বলা যায় emotion সেটা কাব্য-রস নয়। কাব্যরসটা এইভাবে অলৌকিক যে emotion গুলি যেরূপ বহুল পরিমাণে ইন্দ্রিয়ভোগ্য শরীরভোগ্য ও স্বার্থজড়িত, কাব্যরস তা নয়। কাব্যের শোকরসে লোকে কাঁদে বটে, কিন্তু সে শোকরসে লৌকিক শোকের দুঃসহতা নেই, কাজেই বাহ্যতঃ লৌকিক রসের সহিত কাব্যরসের একটা আপাতসাদৃশ্য আছে, এরূপ মনে হ'লেও, ইহা লৌকিক রস হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুরভি যেমন তৃণশষ্প আহরণ ক'রে তাকে আপনার মধ্যে এমন ক'রে পরিপাক করে যে সমস্ত তৃণশষ্পকে ক্ষীরধারায় পরিণত করে, কবিও তেমনি তাঁর সুনিপুণ অনুভবের চমৎকারিত্বের দ্বারা লৌকিক রসকে কাব্যরসরূপে সৃষ্টি করেন। যতই

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

থিওরির জঞ্জাল থাক্ না কেন, এ কথার একটুও নড়চড় হবার যো নেই যে রসসৃষ্টি না হ'লে কিছুতেই কাব্য হয় না। এই রসসৃষ্টি জিনিষটা কিছুতেই যথাস্থিতের চিত্রণে সম্ভব হয় না, কারণ প্রাণের অনুভবের অন্তরালোড়নের পরিপাকেই এর সৃষ্টি। যেমনটি আছে, কাব্যরসে কখনই ঠিক তেমনটি পাওয়া যায় না। যথাস্থিতবাদিরা যতই কৃতী হউন, যদি তাঁরা কাব্যরসের সৃষ্টি করেন, তবে কিছুতেই তাঁরা যথাস্থিতবস্তুকে চিত্রিত করতে পারবেন না। দৈহিক ও প্রাকৃতিক আলম্বন উদ্দীপন ছাড়া রস-সৃষ্টি সম্ভব নয়, কিন্তু তাই ব'লে যে emotionটি শুধু রক্ত মাংসেই প'ড়ে থাকে, রক্তমাংসকে অতিক্রম ক'রে প্রেমের অলৌকিকতাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাকে যথার্থ কাব্যরস বলা চলে না। সেইজন্য আমার মনে হয় যে নিছক সর্ব্বাঙ্গীণ realismএর দ্বারা কাব্যরসের সৃষ্টি হতে পাবে না, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে কাব্যে realism থাকা সম্ভব নয়। যে কাব্যে প্রধানতঃ যথাস্থিত স্বভাববস্তুকে স্থান দেওয়া হয়, স্বভাবকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখে সেই স্বভাবের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে আলৌকিক আনন্দরসের চমৎকারিত্ব কবির প্রাণকে স্পর্শ করে, স্বভাবের সমস্ত উপকরণসম্ভারের সহিত সেই স্পর্শটুকু কবি যখন বিতরণ করেন, তখন সেইখানেই আমরা কাব্যের realismএর পরিচয় পাই। অবশ্য চুলচেরা বিচার করতে গেলে কাব্যে realism সম্ভবই নয়, কারণ স্বভাবানুগত যে বস্তুরই বর্ণনা কবি করুন না কেন তার অলৌকিক রসানুভূতির স্পর্শটুকু না দিতে পারলে কিছুতেই কাব্যসৃষ্টি হয় না। অপর পক্ষে realismএর দিক থেকে একথা বলা চলে যে উপকরণসম্ভারের প্রাচুর্য্য না থাকলে শূন্যের গলায় দড়ি দিয়ে শুধু পরিকল্পনার বলে কাব্য সৃষ্টি চলে না। প্রাচীন কাল হ'তে আমাদের দেশের কাব্য যে ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, তা দেখলে মনে হয় যে যথাস্থিত স্বভাববর্ণনার প্রাধান্যেই আমাদের দেশের কাব্যের আরম্ভ। প্রকৃতির দিকে যখন আদি কবি বাল্মীকি চেয়ে দেখতেন, তখন প্রকৃতির নিছক আপন রূপটি বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করত। প্রকৃতির ব্যাপারের সহিত মানুষের ব্যাপারের যে একটা সাদৃশ্য আছে, বা প্রকৃতির ব্যাপারগুলি মানুষের জীবনকে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত করে, বা কি ভাবে মানুষের ভোগে বা উপকারে আসে, বা মানুষকে কি ভাবে প্রতিহত বা বিপর্য্যস্ত করে তার ছায়া বাল্মীকির কবিতায় যে নাই তা নয়, কিন্তু ক্ষীণ। কিন্তু বাল্মীকির পরবর্ত্তী অনেক কবির মধ্যেই দেখা যায় যে তাঁরা ক্রমশঃই প্রকৃতির ব্যাপারের দ্বারা মানুষ কি ভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং তাদের নানাবিধ দৈনন্দিন ব্যাপার প্রকৃতির লীলাবৈষম্যের দ্বারা কিরূপে প্রসারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই দিক হ'তেই বিশেষ ক'রে ফুটাবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃতিকে মানুষ যখন তার ব্যবহারের উপযোগিতার দিক হতে দেখে, তখন তাকে ব্যবহারিক অর্থক্রিয়ামূলক বা pragmatic বলা যায়। পূর্ব্বেই বলেছি যে ব্যবহারিকতা বা pragmatismএর উপর নির্ভর করলে কাব্য জমে না, এবং সেই হিসাবে এই শ্রেণীর অনেকের কাব্য জমেও নি। কিন্তু অনেকেই আবার এই pragmatismএর ছায়াকে এত ক্ষীণ করেছেন যে তার মধ্য দিয়ে কাব্যরসের আনন্দটি কুণ্ঠিত হয় নি। তৃতীয় স্তরে দেখা যায় যে কেহ বা pragmatism এর ব্যবহারিকতার অংশটি ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতি থেকে মানুষচরিত্রের নানা লীলাবৈষম্যে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। চতুর্থ স্তরে দেখা যায় যে কবি প্রকৃতির আনন্দে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে একেবারে অন্তর্লোকের দেদীপ্যমান শুভ্রজ্যোতি পুরুষের স্পর্শটুকু প্রকৃতির রসে রসাল ক'রে কাব্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইখানেই কাব্যের পরিকল্পনা-বিবর্ত্ত বা idealismএর চরম বিকাশ। প্রকৃতির উপকরণ-সম্ভারমূলক যথাস্থিতবৃত্তিক realism হ'তে মানুষের চিত্ত এইরূপে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে কল্পনাবিবর্ত্তের বিমল স্বর্গে আরোহণ করে। ভারতবর্ষীয় বর্ষাকবিতা থেকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ক'রে কাব্যে realism হ'তে idealismএ উঠ্‌বার ক্রমপদ্ধতি অতি সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করতে চেষ্টা করব।

সুগ্রীব রামচন্দ্রের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে রাবণের নিকট হইতে সীতাকে তিনি উদ্ধার করিয়া দিবেন কিন্তু ইতি-

মধ্যে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে, একালে যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব, তাই রামচন্দ্র বর্ষাবসানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সীতাকে ছাড়িয়া রাম রহিয়াছেন, একদিকে এই বিরহ; অপরদিকে হৃতদার, হৃতরাজ্য রামচন্দ্র বর্ষাকালের প্রতিকূলতায় যুদ্ধ-যাত্রা করিতে পারিতেছেন না।

অহন্তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ ॥
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ।
রাবণশ্চ মহাঞ্ছত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে ॥
অযাত্রাং চৈব দৃষ্ট্বেমাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্।
প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্ ॥

রামচন্দ্রের এমন বিরহ, এমন শোক, এমন বিপদ, অথচ এই বর্ষাকালে দীর্ঘদিনের পর সুগ্রীব তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেছে।

অপি চাপি পরিক্লিষ্টং চিরাদ্দারৈঃ সমাগতম্।
আত্মকার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্ বক্তুং নেচ্ছামি বানরম্ ॥

চারিদিকের এই সমস্ত ঘটনায় বেশ একটি pragmatic atmosphere দেয়। পরবর্ত্তী কবিরা হইলে স্ত্রী কাছে থাকিলে, কি কি উপভোগ করা যাইত, বর্ষাকালে স্ত্রী কাছে না থাকিলে, তাহার কি দুঃখ এ সম্বন্ধে অনেক কান্না কাঁদিতেন। কিন্তু বাল্মীকির কবিতায় এই subjective reference বা pragmatic attitude অত্যন্ত ক্ষীণ। একবার মাত্র নীলমেঘের কোলে বিদ্যুৎ দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে সীতাহরণের সময় সীতা রাবণের কোলে এমনি করিয়াই বুঝি ছটফট করিয়াছিলেন :—

নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥

মেঘের জলবর্ষণ দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল যে সীতাও বুঝি এমনি করিয়াই বাষ্প বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন :—

এষা ধর্ম্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥

কিন্তু বৃষ্টি দেখিয়া সীতার কথা এইভাবে স্মরণ হওয়াতে কোনরূপ ব্যবহারিকতার ছায়া নাই। কেবলমাত্র নিজের দিক্ দিয়া (subjective reference এ) একটু স্মৃতি মাত্র। এই স্মৃতি যে শুধু সীতা সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল তাহা নয়, রামচন্দ্রের পূর্ব্বজীবনের অন্যান্য ঘটনার সহিতও বর্ষার তুলনা করিয়া এইরূপ স্মৃতির বর্ণনার উদাহরণ পাওয়া যায়। একস্থানে রাম বলিতেছেন যে পর্ব্বতগুলি যেন মেঘের কৃষ্ণ অজিন পরিয়া ও বৃষ্টিধারার উপবীত গলায় দিয়া ব্রহ্মচারিদের ন্যায় গুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া বেদপাঠ করিতেছেন। আবার অন্যত্র তিনি বলিতেছেন যে আকাশের গায়ে কে যেন বিদ্যুতের সোণার চাবুক মারিতেছে, আর তারি আঘাতে আকাশ বেদনাতুর হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে :—

মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতপূরিতগুহা প্রাধীতা ইব পর্ব্বতাঃ ॥
কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিত নির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্ ॥

কিন্তু এ ছাড়া সাধারণতঃ তাঁহার গোটা বর্ষাবর্ণনাটাই নিছক বর্ষাকালের প্রকৃতির বর্ণনা, ফলফুলের বর্ণনা, পশু, পক্ষীর বর্ণনা। আর গরম নাই, ধুলা নাই, বাতাস সিক্ত, পথঘাটে কাদা, গাড়ী চালাইবার উপায় নাই, আকাশের কোনও স্থল পরিষ্কার, কোনও স্থল মলিন, চারিদিকে ছিন্ন মেঘ; কখনও বা আকাশ দেখিতে শান্ত সমুদ্রের ন্যায় :—

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বতসন্নিরুদ্ধং রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥

গৈরিক পাহাড়ের রংএ অরুণিত জলধার পাহাড়ের গা বাহিয়া পড়িতেছে আর তাহার সঙ্গে শাল আর কদম ফুল ভাসিয়া আসিতেছে। চারিদিকে তরুণ ঘাস উঠিয়াছে। নদী, পুকুর, দীঘি, পৃথিবী সমস্ত জলে ভাসিয়া যাইতেছে। জোরে বাতাস বহিতেছে, আকাশ ঘনান্ধকারে অবলিপ্ত, বড় বড় পাহাড়ের মতন মেঘগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পাহাড়ের শিখরগুলি জলবিধৌত হইয়া আরও উচ্চতর দেখাইতেছে। নীলমেঘের গায়ে নীলমেঘ লাগিয়া রহিয়াছে, বড় বড় জামের গাছে পাকা পাকা কাল জামগুলি ভ্রমরের মত ঝুলিয়া রহিয়াছে, কোনও কোনও স্থানে বা ঝড়ে চ্যুতবৃন্ত আমগুলি গাছের তলায় লুটাইতেছে। সমস্তদিন বর্ষণের পর বৈকালের দিকে মেঘগুলি ভার হইয়া রহিয়াছে। হস্তীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বলাকার মালা গলায় দিয়া

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিশ্রাম করিয়া মেঘগুলি আকাশ দিয়া তাহাদের দীর্ঘ অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসংনিকাশা।
গর্জ্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥
মেঘাভিকামা পরিসংপতন্তি সংমোদিতা ভাতি বলাকপঙ্‌ক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী লম্বেব মালারুচিরাম্বরস্য॥

আবার বনে বনে কদম্বফুল ফুটিয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ হইয়াছে এবং ময়ূরেরা কেকাধ্বনির সহিত নৃত্য করিতেছে। কেতকী ফুলের গন্ধে মত্ত হইয়া হাতীগুলি মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার জলধারার আঘাতে মধুমাতাল ভ্রমরের মত্ততা দূর হইতেছে; ক্রীড়ামত্ত সুরাঙ্গনাদের মুক্তার হার ছিঁড়িয়া গিয়া বৃষ্টিধারায় পতিত হইতেছে। পাতার উপর মুক্তার মতন টলটলে জল পাখীরা পান করিতেছে, মেঘের মৃদঙ্গনিনাদের সহিত ময়ূরের কেকাধ্বনি ও ভেকের কণ্ঠতাল যুক্ত হইয়া সমস্ত বনস্থলীকে যেন সঙ্গীতের সঙ্গত করিয়া তুলিয়াছে, আর সেই সঙ্গতে বিচিত্র বর্ণালঙ্কৃত ময়ূরীরা নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আকাশে তারাও দেখা যায় না সূর্য্যও দেখা যায় না, খালি অবিশ্রান্ত জলধারা বেগে পতিত হইতেছে।

ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা ন ভাস্করোদর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা তমোবলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ॥
মত্তাগজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রা।
রম্যানগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রা প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ।
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তা প্রিয়াবিহীনা শিখিনঃ প্লবঙ্গমাঃ॥

এম্‌নি ক'রে আমরা দেখতে পাই যে আদি কবি বাল্মীকির রচনায় যথাস্থিতবস্তুবিষয়ক realismএরই প্রাধান্য অথচ এই realism এর মধ্য দিয়ে বর্ষার সৌন্দর্য্য তাঁর প্রাণে যে হর্ষস্পর্শের ঝঙ্কার তুলেছে, তাঁর কাব্যের প্রতি অক্ষরে তা ফুটে উঠেছে। আদি কবিগুরুর শিষ্যানুশিষ্য ভবভূতিও মালতীমাধবের ৯ম অঙ্কে বর্ষা বর্ণনার কবি গুরুকে অনুবর্ত্তন ক'রে এই realism-এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:—কুঞ্জবেরা সরোবরের ধারে বেতের ফুল ফুটেছে, জুঁইএর বনের গন্ধে বাতাস হাই তুলছে, কুটজ ফুল পাহাড়ের গায়ে গায়ে হেসে ঝ'রে পড়ছে আর মেঘেরা ময়ূরদের নাচিয়ে তুলছে। পাহাড়ের গা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে আর তার মধ্যে, তার পাশে ফলভারপরিণামশ্যাম জম্বুবন, আর তার গায়ে নীল রংএর নূতন মেঘ আশ্রয় ক'রে রয়েছে। সাঁ সাঁ শব্দে ঝড়ে অর্জ্জুন আর শালের ফুল উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, ইন্দ্রনীলের মতন চিকণ কাল মেঘ শ্রেণী বেঁধে আকাশে দুলছে, নূতন জলধারার ভেজা গন্ধে পুরাতন গ্রীষ্ম কালের দিনগুলি সরে গিয়ে নূতন শোভা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছে। ভবভূতির বর্ণনায় বিষয়ের তত জোর না থাকলেও শব্দ ও ছন্দের ঝঙ্কার ঠিক বর্ষাকালের মতনই গম্ভীর:—

বাণীরপ্রসবৈর্নিকুঞ্জসরিতামাসক্তবাসং পয়ঃ।
পর্যান্তেষু চ যূথিকাসুমনসামুজ্জৃম্ভিতং জালকৈঃ॥
উন্মীলৎকূটজ প্রহাসিষু গিরেরালম্ব্য সানূনিতঃ।
প্রাগ্‌ভারেষু শিখণ্ডিতাণ্ডববিধৌ মেঘৈর্বিতানায্যতে॥
জৃম্ভাজর্জ্জরডম্বরঘনশ্রীমৎকদম্বদ্রুমাঃ
শৈলাভোগভুবো ভবন্তি ককুভঃ কাদম্বিনীশ্যামলাঃ।
উন্মৎকন্দলকান্তকেতকভৃতঃ কচ্ছা
সরিচ্ছ্রোতসামাবির্গন্ধশিলীন্ধ্রলোধ্রকুসুমস্মেরা বনানাং ততিঃ॥

অন্যান্য অনেক কবিও এঁদের পথানুবর্ত্তী হ'য়ে এই রকম যথাবদ্বস্তুবর্ণনার দিক দিয়ে বর্ষাঋতুকে সম্ভোগ করবার চেষ্টা করেছেন। কবি যোগেশ্বর বল্‌ছেন, ধারাবর্ষার পর অতি ধীরে বায়ু বইছে, আকাশ মেঘে ঢাকা, চন্দ্রতারা ঘুমিয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কে ওঠায় এদিক ওদিক একটু আধটু দেখা যাচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতি এমন শান্ত যে বেঙের ডাক অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ছে আর কদম্ব-রেণু-ধোয়া বাতাসের গন্ধ চারিদিক ব্যাপ্ত করছে, বিরহীরা কেমন ক'রে এমন রাতগুলি কাটায়—

আসারান্তমৃদুপ্রবৃত্তমরুতো মেঘোপলিপ্তাম্বরাঃ
বিদ্যুৎপাতমুহূর্ত্তদৃষ্টককুভঃ সুপ্তেন্দুতারাগ্রহাঃ।
ধারাক্লিন্নকদম্বসম্ভৃত সুরামোদোদ্বহাঃ প্রোষিতৈঃ
নিঃসম্পাতবিসারিদর্দ্দুররবা নীতাঃ কথং রাত্রয়ঃ॥

বাতোক কবি বল্‌ছেন যে এমন জোরে বর্ষা চলেছে যে মদমত্ত হস্তীর গর্জ্জনের মতন মেঘগর্জ্জনের দ্বারা সকলের মন একেবারে এমন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে যে দিগ্‌বধূদের কোলে

সূর্য্য চন্দ্রের দুই চোখ বুজে আকাশ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ছে।

এতস্মিন্মদজর্জ্জরৈরুপচিতে কম্বুরবাড়ম্বরৈঃ।
স্তৈমিত্যং মনসো দিশত্যনিভৃতং ধারারবে মূর্চ্ছতি॥
উৎসঙ্গে ককুভো বিধায় রসিতৈরম্ভোমুচাং ঘোরয়ন্
মন্যে মুদ্রিতচন্দ্রসূর্য্যনয়নং ব্যোমাপি নিদ্রায়তে॥

আর একজন কবি বল্‌ছেন যে কেতকী ফুলের ধূলি গায়ে মেখে বলাকাবলির শাদা কাপড়ে ঢাকা মড়া মাথায় নিয়ে নীল মেঘের জটায় জটিল হয়ে বিদ্যুতের ধনু খড়্গ ধারণ ক'রে বিরহিনীদের বধ করবার জন্য এ কোন কাপালিক এসে উপস্থিত হ'ল।

অভিনন্দ কবি বল্‌ছেন যে ভীষণ ঘনান্ধকার বিদ্যুতের দ্বারা মধ্যে মধ্যে ছড়ে যাচ্ছে; কাছের গাছটিকে পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, খালি জোনাকি দ্বারা অনুমান করে নিতে পারা যায়; ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানে রাত্রি ঝন্ ঝন্ করে উঠ্‌ছে।

বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃস্তোমান্তরাঃ সন্তত
শ্যামাম্ভোধররোধসংকটবিয়দ্ বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।
খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি
গম্ভীরাম্বাসারোদকমত্তকীটপটলীক্কানোত্তরা রাত্রয়ঃ॥

কিন্তু ভারতবর্ষীয় চিত্ত কোমলস্পর্শী, তাই এদেশের বর্ষা বর্ণনার মধ্যে যে realism দেখতে পাওয়া যায় তা প্রায়শঃই বর্ষার প্রসন্নতা স্তিমিততা বা সৌন্দর্য্যকেই বিশেষভাবে বরণ ক'রে নিয়েছে। উদ্দাম ঝড় বর্ষার যে ভীষণ প্রচণ্ডতার বর্ণনা আমরা মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় কবিতায় দেখতে পাই, ভারতবর্ষীয় কবিতায় সেরূপ প্রচণ্ডতার Realism প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না বল্‌লেই হয়। যেমন, Burnsএর Brigs of Ayr :—

'When heavy, dark, continued, a'-day rains
Wi' deepening deluges o'erflow the plains;
When from the hills where springs the brawling Coil,
Or stately Lugar's mossy fountains boil,...
Aroused by blustering winds and spotting thowes,
In many a torrent down the snaw-broo rowes;
While crashing ice, borne on the roaring spate,
Sweeps dams, an' mills, an' brigs, a' to the gate,
And, from Glenbuck down to the Ratton-key,
Auld Ayr is just one lengthened tumbling sea', etc.

অথবা যেমন Thomsonএর The Seasons কবিতায় :—

First, joyless rains obscure
Dry through the mingling skies with vapour foul,
Dash on the mountain's brow, and shake the woods
That grumbling wave below. The unsightly playing
Lies a brown deluge,—as the low-bent clouds
Pour flood on flood, yet unexhausted still
Combine, and deepening into night shut up
The day's fair face .
At last the roused up river pours along
Resistless, roaring; dreadful down it comes
From the rude mountain and the mossy wild,
Tumbling through rocks abrupt, and sounding far.
Then o'er the sanded valley floating spreads,
Calm, sluggish, silent; ..
Then issues forth the storm with burst
And hurls the whole precipitated air
Down in torrent. On the passive main
Descends the ethereal force, and with strong gust
Turns from its bottom the discoloured deep.
Through the black night that sits immense around,
Lashed into foam, the fierce conflicting brine
Seems o'er a thousand raging waves to burn.
Meantime the mountain-billows, to the clouds
In dreadful tumult swelled, surge above surge,
Burst into chaos with tremendous roar,
And anchored navies from their stations drive
Wild as the winds across the howling waste
Of mighty waters :

কালিদাসের বর্ষা কবিতার বৈচিত্র্য দুই এক কথায় সারবার নয়, অনায়াসেই কোন সুলেখক তাঁর বর্ষা কবিতার উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থিকা রচনা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের হাতে সময় নাই, তাই দুই একটি কথা বলা ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই। কালিদাসের বর্ষা বর্ণনার

বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাল্মীকির Realismএর চেয়ে আমরা আরও অনেকখানি উঁচু ধাপে উঠে দাঁড়াই। একদিকে যেমন তিনি বর্ষা প্রকৃতির স্বভাব বর্ণনা করেছেন, বর্ষাতে প্রকৃতি কেমন সুন্দর হয় তা বর্ণনা করেছেন, তেমনি বর্ষাতে মানুষের চিত্তকে কেমন ক'রে নূতন নূতন রেশে প্রভাবিত ক'রে তোলে তাও তিনি বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরি কাব্যে আমরা প্রথম দেখতে পাই যে বর্ষা ঋতু বা মেঘ শুধু ঋতু নয়, সে একটি ঋতু-পুরুষ। এই ঋতু-পুরুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা গভীর সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতির বন্ধন আছে, তা কালিদাস মেঘদূতে খুব ভাল ক'রেই দেখিয়েছেন। রামগিরির যক্ষ বিরহাতুর হৃদয়ে দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী হ'য়ে কুটজ কুসুমে অর্ঘ্য রচনা করে, বন্দনা করে, সন্তপ্তের শরণ মেঘকে বন্ধুত্বে বরণ ক'রে তার বিরহের বার্ত্তা এই মর্ত্তলোক ছেড়ে সেই দূরের অলকাপুরীতে প্রেরণ করেছিল। মর্ত্তের যা বন্ধন তা কালিদাস কোন কাব্যেই অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু মর্ত্তের বন্ধন থেকে যে আমরা অমৃতে পৌছুতে পারি, মর্ত্ত থেকে আমাদের যে প্রেম সুরু হয়, তা যে অমৃত পর্য্যন্তে গিয়ে পৌছয় একথা কালিদাস তাঁর অনেক কাব্যেই আমাদের বলেছেন। বর্ষাকালে মানুষের মন পত্নার সহিত মিলিত হবার জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে, একথা কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক কবিই বলেছেন, কিন্তু মানুষের প্রেম যে এমন অক্ষয়, এমন অমর যা জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদক রামগিরি হইতে নিত্য প্রেমের, নিত্য নবযৌবনের, নিত্য জ্যোৎস্নাময় অলকাপুরী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং বর্ষা ঋতু যে ভাইয়ের মতন, দেবরের মতন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মিলন সঙ্ঘটন ক'রে দেয় এই idealismটি সকল ভাষায়, সকল কাব্যে এই নূতন। শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্যে সংযমের দ্বারা ভোগাতীত মিলনকে পাওয়া যায় এ কথা কালিদাস আমাদের বলেছেন। কিন্তু, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দৌত্যে, সখিত্বে, যে বিরহী বিরহিণীর মিলনাতুর হৃদয় অশরীরী প্রেমে মিলিত হয়, এইটিই মেঘদূতের শিক্ষা। কালিদাসের অন্তর্বৃত্তির পরিকল্পনা বিবর্ত্তে তিনি যে বর্ষাঋতুকে শুধু প্রাণময় ক'রে দেখেছিলেন, তা নয়, মিলনাতুর হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন যে এই ঋতুপুরুষকে স্নেহসিক্ত ক'রে তুল্‌তে পারে এবং এই ঋতুপুরুষের দ্বারা আমরা যে আমাদের বিরহের গানকে আমাদের প্রিয়জনের নিকট পাঠাতে পারি এই কথাটি কালিদাস সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যান, তখন তরুলতারা স্নেহ বিগলিত হ'য়ে তাকে উপহার দিয়েছিল, সেইখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃতিচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের একটি সহানুভূতি আছে। সে সহানুভূতি যে সত্যই কত গভীর হ'তে পারে সে কথা আমরা মেঘদূতে বুঝতে পারি। প্রকৃতি মূক নিঃশব্দ তবু সে মানুষের দুঃখ বোঝে, মানুষের বন্ধু হয়ে বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করে। তাই মেঘদূতের উপান্ত শ্লোকে কালিদাস বলছেন যে, হে মেঘ, তুমি নিঃশব্দ হ'য়ে চাতককে জল দাও, তাই নিঃশব্দ হ'য়ে আছ ব'লে আমার বন্ধুকার্য্য যে করবে না এমন কথা আমি মনে কর্ত্তে পারি না।

> কচ্চিৎসৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
> প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি
> নিঃশব্দোহপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
> প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব

অন্তিম শ্লোকে তিনি বলছেন যে হে মেঘ, বিদ্যুৎ পত্নীর সহিত তোমার কখনও যেন বিরহ না হয়। তুমি বন্ধুত্বের অনুরোধেই হ'ক, কৃপার অনুরোধেই হ'ক, বা আমাকে আর্ত্ত দেখেই হ'ক, তুমি আমার এই দৌত্য সম্পাদন ক'রে তারপর তোমার যথেচ্ছ দেশে গমন করতে পার। ঋতুপুরুষকে কালিদাস যে সম্পূর্ণ সজীব ও সচেতন ক'রে দেখেছিলেন, তা তাঁর মেঘদূতের প্রতি ছত্রে বোঝা যায়। এই ঋতুপুরুষ শুধু যে মানুষের সুহৃৎ বন্ধু ও সখা তা নয়, সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে এই ঋতুপুরুষের যে চেতনপুরুষের ন্যায় আনন্দ সম্ভোগের লীলা চলেছে, প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু রেখে তা কালিদাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর মেঘদূতকে পথ দেখাবার সময়ে তার দৌত্য-যাত্রার পথে নানা মনোবিলোভন ব্যাপারের কথা বর্ণনা ক'রে মেঘকে উৎসুক ক'রে তুলেছিলেন। কালিদাসের কথা বলতে আরম্ভ করলে আর থামা যায় না, কিন্তু আজ আর বলা চলে না।

কালিদাসের মধ্যে যে উচ্চ অঙ্গের idealism দেখতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে সেরূপ idealism আর কোন কবির মধ্যেই তেমন ক'রে দেখা যায় না। তুলসী-দাস একজন বড় কবি, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রধানত ভক্ত, তাই একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতিকে যথাবৎ ভাবে বর্ণনা কর্ত্তে ভালবাসতেন, অপর দিকে তাঁর idealism ছিল এই ধরণের যে তিনি সর্ব্বদাই প্রকৃতি থেকে উপদেশ পাওয়ার চেষ্টা করতেন। যথা :—

ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোরা। প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা
দামিনী দমকী রহী ঘন মাহী। খল কিপ্রীতি যথা থির নাহি
বরষহিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে। যথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পায়ে
বূঁদ অঘাত সহেঁ গিরি কৈসে। খলকে বচন সন্ত সহ জৈসে
ভূমি পরতভা ডাবর পানি। জিমি জীবহিঁ মায়া লপটানী

বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে বর্ষার realistic বর্ণনা বেশ সুন্দর দেখা যায়, যেমন :—

গগনে অবঘন মেঘ দারুণ সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন পবন খরতর বলগাই

… … … …

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে পন্থ হেরই মোর।

আবার

ঝরঝর বরিষ সঘন জলধার দশদিশ সবহুঁ তেহ আঁধিয়ার
এ সহি কিয়ে করব পরকার অবজনু বাবয়ে হরি অভিসার……
ঝলকই দামিনী দহন সমান ঝন্‌ঝন্ শব্দ কুলিশ ঝনঝান্
ঘরমহি রহত রহই ন পার কি করব ই সব বিঘিনি বিথার

আবার

রজনী কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম কুলিশ পড়য়ে দুরবার
গরজ তরজ মন রোষে বরিষ ঘন সংশয় পড় অভিসার

আবার

কাজরে সাজলি রাতি ঘন ভৈ বরিখয়ে জলধর পাঁতি
বরিষ পয়োধর ধার দুরপথ গমন কঠিন অভিসার
যমুনা ভয়াউনি নীরে আরতি ধসতি পাউতি নহি তীরে
ঘিজুরি তরঙ্গে ডরাই ভোঁভল কর জোঁ পলটি ঘর যাই
[illegible]তি দেব বনমালী এহি নিশি কোনে পরি আউতি গোয়ালী

আবার

[illegible]রা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর ইত্যাদি।

গোবিন্দদাসের বর্ষা বর্ণনাও অনেকটা বিদ্যাপতিরই মতন; যথা :—

ঝর ঝর জলধর ধার, ঝঞ্ঝা পবন বিথার,
ঝলকত দামিনী মালা, ঝামরি ভৈ গেল বালা;
ঝাঁপি রহত দুহুঁ কাণ ঝন ঝন বজর নিশান;
ঝিল্লিরি ঝঙ্কর রাতি ঝক সহনে নাহি যাতি ইত্যাদি

এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে বর্ষাঋতুর বর্ষণের দিকটা সুন্দর শব্দযোগে সুন্দর ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত বর্ষার বর্ষণটি কৃষ্ণরাধার আলম্বন উদ্দীপন রূপেই ব্যবহার হয়েছে। বর্ষা ঋতুতে স্ত্রী পুরুষ মিলনের জন্য সমুৎসুক হয়, ঘনান্ধকারে যখন অভিসারিকারা নায়কের নিকট গমন করে তখন মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকে তারা আপন পথ দেখে নেয়। এ সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের অতি প্রাচীন মামুলী বর্ণনা। সেই হিসাব থেকে এই বর্ষা ঋতুতে কৃষ্ণের জন্য রাধার যে উৎকণ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে, বা রাধার অভিসারের পথে যে সমস্ত বিঘ্নের বর্ণনা করা হয়েছে, সে অংশে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতিতে কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রভৃতিরা এই মিলনোৎকণ্ঠাকে এমন চমৎকার আবেগের সহিত চিত্রিত করেছেন যে শব্দ-ঝঙ্কারের সহযোগে নূতন না হ'লেও তা অতি নূতনভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং দ্রবীভূত করে।

মধ্যযুগের বাঙ্গালাদেশের ঘরোয়া কবিতায় অনেক সময়ে বর্ষাঋতুর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন অতি সুন্দরভাবে realistic অপর দিকে তেমনি স্ত্রী-পুরুষের মিলনাতুর চিত্তের উৎকণ্ঠায় ভরপুর। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৈমনসিংহ গীতিকার কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যান হ'তে একটু উদ্ধৃত ক'রে দেখান যেতে পারে।

আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা সম্ভাষণে॥
নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা॥
হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাঁচিয়া॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শুকনা নদী ভরে উঠে কুলেকুলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী॥

আবার

কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ুর ময়ুরী নাচে ধরিয়া পেখম॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা॥
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা॥
জলেতে কমল ফুটে আর নদী কুল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল॥
দিন রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কুল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি॥
থাউরি বিউনা করে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী॥
রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর॥
কোন না বিরহী নারী।হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি কান্দি ফিরে পথে॥

পরবর্ত্তী বাঙ্গালা কবিদের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তই বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ষার মধ্যে যে গ্রীষ্মের গুমোট হয় তার বর্ণনা করেছেন, গ্রীষ্মের সঙ্গে লড়াই ক'রে বর্ষা কেমন ক'রে তার বিক্রম বিস্তার করে তার বেশ realistic বর্ণনা দিয়েছেন, খুব ঝমাঝম বর্ষার বর্ণনা দিয়েছেন, খুব বর্ষা হওয়ার পর চারিদিক কেমন শীতল হ'য়ে যায় তারও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাগুলি একদিকে যেমন realistic, অপরদিকে তেমনি pragmatic অর্থাৎ বর্ষাকালে কেমন ছারপোকা হয়, মশা হয়, বর্ষাকালে সাহেবরা কি করে, বাঙ্গালীরা কি করে, মুসলমানেরা কি করে এর কোন কথাই তিনি বলতে ছাড়েন নি।

কি কব দুখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশা,
দুই কালে বজ্র দুইজন;
শয্যায় ভার্য্যার প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনার মধ্যে নানাস্থানে অনেক চমৎকারিত্ব আছে।

কিন্তু কালিদাসের পরই রবীন্দ্রনাথ বর্ষার চরম কবি। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতার একটা মোটামুটি সমালোচনাও এতটুকু প্রবন্ধে হওয়ার উপায় নাই। Realism থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ idealism-এর চরমে উঠেছেন। সে idealism কালিদাস থেকে আরম্ভ ক'রে কালিদাসকেও অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। ঝর ঝর ক'রে বর্ষা ঝরছে—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ বাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

আবার

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠিত
থর থর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্
বরখত নীরদ পুঞ্জ,
শাল পিয়ালে তালতমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

মেঘ করে আসছে,—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে

জোরে বর্ষা নেমে আসছে

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা!
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে,

নিখিল চিত্ত হরষা।
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য সরিয়ে রেখে আমাদের দেশের সমস্ত প্রাচীন কবিদলের সভায় নিজেকে আহুত ক'রে সেই সভার মুখপাত্র হয়ে বর্ষাকে অভিনন্দন করছেন

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা
শত শত গীত মুখরিত বনবীথিকা।

তাই তিনি সেই প্রাচীন সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছেন

যূথী পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে,
জাগ সহচরী আজিকার নিশি ভুলনা
নীপশাখে বাঁধ ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা।

কিন্তু বর্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে দৃষ্টি সেটা তাঁর ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির বর্ষা থেকে, প্রকৃতির অন্ধকার থেকে অন্তরের রসসিক্ত বর্ষায়, অন্তরের নিভৃত গিরিগুহায় প্রত্যাবর্তন। বর্ষা দেখে তাঁর প্রাণ আপনি আপনি নৃত্য ক'রে ওঠে, সে নৃত্যের ছন্দ ও গানের সন্ধান সেইখানে পাওয়া যাবে যে ছন্দে ময়ূর তার কেকাধ্বনি ক'রে নৃত্য করে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শিশু, তাই প্রকৃতির বর্ষণধারায় তাঁর স্বাভাবিক আনন্দ।

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শত বর্ণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে প্রাণ যাচেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচেরে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘন বন ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকসিত প্রাণ জেগেছে,
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

বর্ষায় যে প্রিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে কথা বলার একটা আনন্দ আছে, সে সম্বন্ধে কবির দুটি একটি কবিতা আছে, যেমন:—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরষায়।
এমন মেঘ স্বরে বাদল ঝর ঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।

* * * *

সে কথা শুনিবে না কেহ আর;
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

* * * *

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আজি যেন বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরষায়।

কিন্তু বর্ষা ঋতুতে রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিরহ জাগায় সেটি অধিক স্থলেই প্রিয়ার নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রিয়ের। কালিদাস যে বিরহটি প্রিয় ও প্রিয়ার অবিনাশী প্রেমের মধ্যে গ'ড়ে তুলেছিলেন, বর্ষাকালের যে বিরহ সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় কেবলমাত্র তরুণ তরুণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত, রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই বিরহই তরুণ তরুণীর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সম্পর্ক। বর্জ্জন করে মানুষের অন্তরের মধ্যে ধরা ছোঁয়া যায় না এমন যে একটি অশরীরী আকিঞ্চন আছে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। ঝম্ ঝমে একঘেয়ে বৃষ্টির ধারা তাঁর মনের তারকে পিড়িং পিড়িং ক'রে সেই একই তারে সর্ব্বদা বাজায়—

বাদল বাউল বাজায়রে একতারা,
সাঁঝ বেলা ধরে ঝরে ঝর ঝর ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।

বাদলের ছোঁয়ায় তার প্রাণের মরুভূমি সবুজে পূর্ণ হয়ে যায়—

কখন বাদল ছোঁয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে
*   *   *
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরু জয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।

ঝড়ের তালে তাঁর দুটি চোখ সজল হ'য়ে ডুবে যায়, হৃদয়ে ব্যথার তুফান ওঠে—

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে,
আঁচলখানি দোলে।
*   *   *
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন সাথী মোর যায় যে ডেকে ;
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।

বনের বীণার সুরে—

মন যে আমার পথ হারান সুরে,
সকল আকাশ বেড়ায় দূরে দূরে
শোনে যেন কোন ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে।

নবীন মেঘের সুরে তিনি নিরুদ্দেশ পথে হারিয়ে যান,—

নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,
ভাবনা যত উতল হল অকারণে।
*   *   *   *   *   *
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানস লোকের গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে।

শ্রাবণ মেঘের দরজা দিয়ে তিনি তাঁর পথ-ভোলা অতিথিকে দেখতে পান, যে অতিথি তাঁর মনের মধ্যে ব'সে সর্ব্বক্ষণ সুরের জাল বুনছে—

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন পথ ভোলা।
*   *   *   *   *
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা।

বর্ষায় কবির কোন চিত্তবিহারীর বিরহ ব্যথা বাদল ধারার সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে—

গগন তল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

নিশীথ রাত্রির বাদল ধারায় কবি এই প্রাণের আকিঞ্চনে নিদ্রাহারা হ'য়ে অন্তরের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন, গোপন ক্রন্দনে তাঁর হৃদয় ব্যথায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এসহে গোপনে।
*   *   *
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে,
নিয়োগো নিয়োগো
আমার ঘুম নিয়োগো হরণ ক'রে।

আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে ;
দিয়োগো দিয়োগো
চোখের জলের দিয়ো সাড়া।

কবির বর্ষা কবিতাগুলি একটার পর আর একটা যতই আমরা প'ড়ে যাই ততই দেখ্‌তে পাই যে বর্ষার জলধারার আঘাতে আঘাতে তাঁর সমস্ত অন্তর যেন কোন্ হৃদয়বিহারী প্রিয়তমের বিরহে কখনও বা যেন নিঝুম হ'য়েরয়েছে, কখনও বা যেন সুরে সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌ছে কখনও বা যেন দীর্ণ বিকীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে।

এই বিরহের সুর ছাড়া আর একটা ভাবধারা কবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সেটা তাঁর নূতন কাব্য ঋতুরঙ্গে যেমন প্রকাশ পেয়েছে এমন আর কোথাও নয়। কালিদাসের কাছে ঋতু ছিলেন বন্ধু, ঋতু ছিলেন সখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ভিতর বাহির উভয় প্রাঙ্গণ জুড়ে সেই পরমমঙ্গলময় নটরাজের লীলানৃত্য চলেছে। তাই ঋতুর তালে তালে আমাদের চিত্ত নেচে ওঠে, তাই প্রতি ঋতু তার পদের অলক্তকচিহ্ন আমাদের হৃদয়ে রেখে যায়। এই দিক্ থেকে দেখতে পাই যে বর্ষাঋতু—সে সুধু ঋতু নয়, সে নটরাজের এক রূপ, সে ঋতুপুরুষ। সেই ঋতুপুরুষের লীলা বর্ণনাই ঋতুরঙ্গ লীলানাট্যের বিষয়। এ বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলা আর এই প্রবন্ধে চল্‌তে পারে না। কিন্তু এই ঋতুরঙ্গের মধ্যে যে ভাবটি দেখা যায় সেটা কবির অন্য ধারাতে একটি সম্পূর্ণ ধারা। সে ধারাটি হচ্ছে সেই ধারা যাতে কবির চিত্ত তাঁর আপন অন্তরের অন্বেষণে যা পান নি ভিতর ও বাহিরের মিলনে যে আনন্দলীলা চলেছে সেখানে তাঁকে পেয়েছেন। এই লীলায় আত্মপ্রাপ্তি যথার্থ আত্মপ্রাপ্তির লীলা।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণ পবন পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

লেখক মনে করেন যে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা স্থানাভাবে অনেকটা অসম্পূর্ণ। অন্য প্রবন্ধে তিনি ইহা পূরণ করিবেন এই তাঁহার আশা। লেখক।
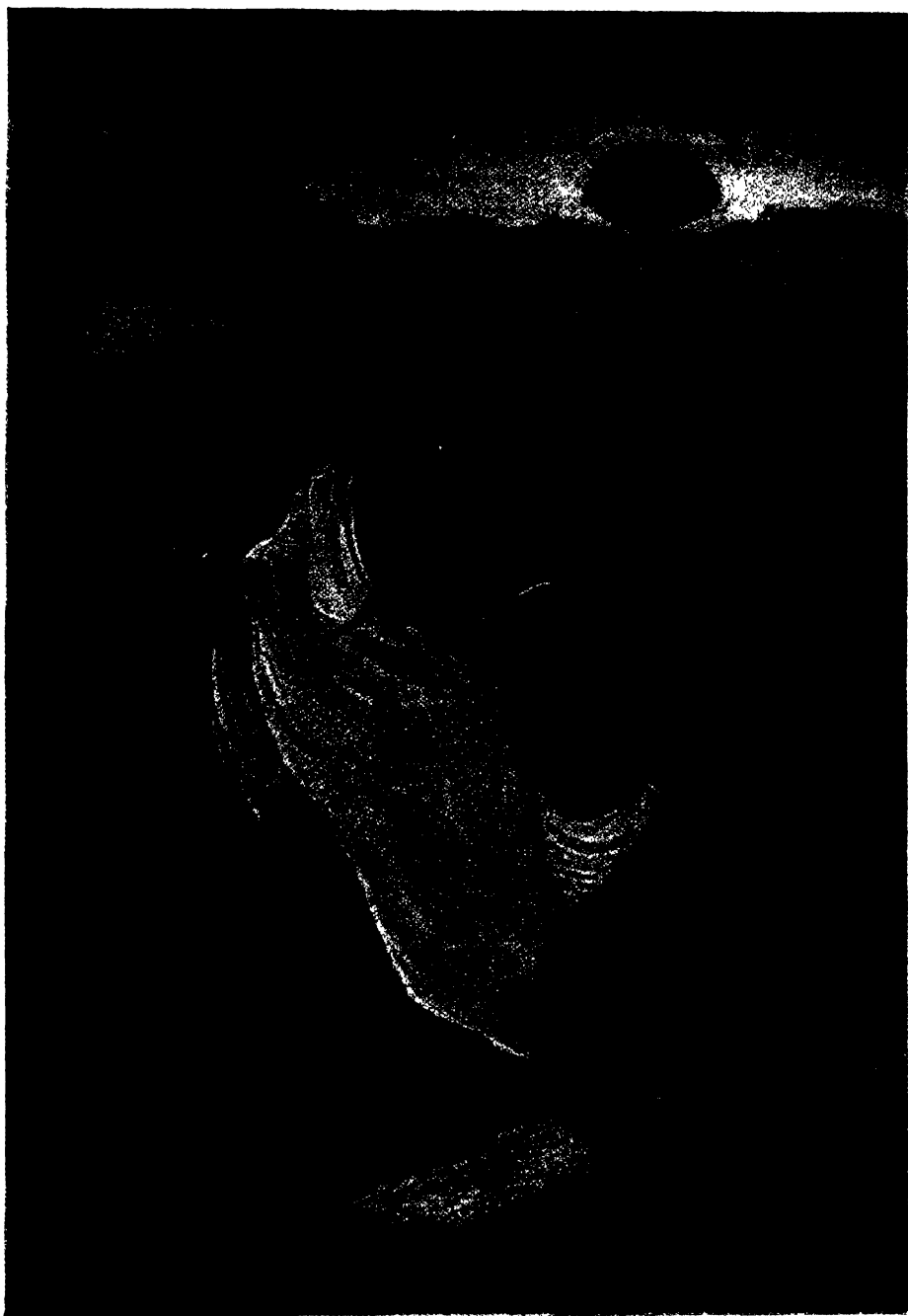
দেহাতি-বধূ

শিল্পী—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

বিচিত্রা

ভাদ্র ১৩৩৫

শিল্পীর অভিনন্দন

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

শিল্পীদের নিয়ত অভিনন্দিত করচে এই তরুপল্লবঘন সবুজ ধরণী, হরিণ-নয়নার ছল ছল করুণ কটাক্ষ, অশ্রু-হাসি আলো-আঁধারের লীলায়, জীবন-মরণের ধীর চঞ্চল দোলায়। শিল্পী যখন ভোরের বেলায় চোখ মেলে গবাক্ষের বাইরে তাকালেন, দেখলেন—আকাশের পটের উপর আলোর বিচিত্র রেখার আর রঙের ঢেউ রচনা করতে করতে রবি তাঁকে প্রভাতীসুরে আলোর ঝঙ্কারে আহ্বান করচেন, আর চোখ মেলে দেখতে বলচেন—"চোখে দেখিস প্রাণে কানা হিয়ার মাঝে দেখনা ধরে ভুবনখানা।" এই আহ্বানে এই অভিনন্দনে নন্দিত হয়ে, খুসী হয়ে শিল্পী সুরে, রঙে, রেখায়, লিপিতে লিপিতে আপনার হৃদয়ের অভিবাদন যুগে যুগে সুধীসমাজে বিতরণ করচেন।

প্রকৃতির এই অভিনন্দন শিল্পীরা আপন আপন রস-বোধের দ্বারা যেরূপভাবে গ্রহণ করেন সেইরূপ তাঁর রেখায় ও রঙে, সুরে ও গানে, তালে ও ছন্দে ফুটিয়ে তোলেন। কারু কাছে প্রকৃতি নগ্নভাবে দেখা দেয়, কেউ বা তার অপূর্ব্ব বর্ণ-কিরণ-গন্ধময় উজ্জ্বল ভাবে তাকে অনুভব করেন। কারু কাছে তাঁর আহ্বান ক্ষীণ হ'য়ে, মৃদু হ'য়ে মধুর হ'য়ে বাজচে, কারুকাছে সেটা বজ্র হ'য়ে ভীষণ হ'য়ে প্রকাশ পায়। নবনব রসে নবনবরূপে শিল্পীরা প্রকৃতির অভিনন্দন গ্রহণ করেন। শিল্পীরা কেউ কেউ তার সঠিক নগ্নরূপ ধরবার জন্যে নানান বৈজ্ঞানিক উপায় আলোছায়ার ওজন ও হিসাবের অঙ্ক কসচেন, আবার কোনো কোনো আপন-ভোলা শিল্পী অবহেলায় তুলির আঁচড়ে তার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটি ফুটিয়ে তুলচেন। তার মানে কারু কাছে তার অভিনন্দন না-পৌছেই তার রূপটি ধাঁধা লাগিয়েচে, আর অপরের কাছে তার অভিনন্দন ভাবলোকের শ্রী হ'য়ে প্রতিভাত হয়েচে। বৈচিত্র্যের মধ্যে এক আহ্বানের সুর অহরহঃ যা বাজচে তাকে ধরা—তার আস্বাদ গ্রহণ করাই হ'ল শিল্পীর কাজ।

ইউরোপে শিল্পীরা প্রকৃতির অভিনন্দনে উৎসাহিত হ'য়ে তার পায়ে নূপুর পরাতে, মাথায় মুকুট চড়াতে চাননি, তাঁরা সচরাচর চান তাকে চর্ম্ম চক্ষে এমন ভাবে ধরতে যেন সেটা চোখ দিয়ে স্পর্শ করা যায়। আর আমাদের দেশের শিল্পীরা চেয়েচেন তার আহ্বানে তাকে সাজিয়ে তুলতে। যদিও কথাগুলি খুবই মোটামুটি কথা কিন্তু একটু না ভেঙে বললে হয়ত এটা একটা হেঁয়ালীর অঙ্গ বলে কেউ কেউ ভাবতে পারেন।

প্রকৃতির নকল এবং প্রকৃতির পূজা এই দুয়ের মধ্যে যা' প্রভেদ ইউরোপের শিল্পের এবং দেশের শিল্পের ঠিক সেই একই ভেদ দেখা যায়। নকলেতে তাকে ধরা-ছোঁয়ার আশ মেটে, পূজায় অভূতপূর্ব্বভাবে মনকে আকুল করে দেয়। একটি হ'ল কচলানো অপরটি আঘ্রাণ করা। প্রকৃতির অভিনন্দনে প্রকৃতই যে জাগে তার কাছে শেষের পন্থাই বাঞ্ছনীয় হয়। তবে আমাদের দেশে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে তার রূপ-বিকৃতি ও বিকলাঙ্গ করাটাকেই কোনো কোনো শিল্পরসিক ভারত-শিল্পের প্রধান পরিচয় বলে প্রচার করে থাকেন। এ বিষয় আমরা একমত হতে পারি না। যদিও সতীর্থ সুহৃদ সুবিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যেও কারু কারু Conventional আর্টের দিকেই বিশেষ ঝোঁক দিতে দেখা যায়। প্রকৃতির ভিতর যা সুন্দর সেটার হুবহু আকারটা সঠিকভাবে না-এঁকে ছবির মত করবার জন্যেই বিশেষভাবে Conventional ঢংএ একটু এঁকিয়ে বেঁকিয়ে আঁকলে ছবি হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর যা দেখা যায় তার সঠিক রূপটির সুসামঞ্জস্যরূপে পটের উপর হুবহু ফলালেও আর্ট হ'তে বাধ্য। অবশ্য যেখানে ছবিতে মানসিক রূপ-লোকের সৃষ্টি করার দরকার সেখানে conventional ছাঁদে ছবি আঁকা চলে।

শিল্পী আনন্দের আহ্বানে অভিনন্দিত হ'য়ে শিল্পরচনা করেন। যদি তাঁর জীবনোপায় বা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই শিল্প-রচনা হয়, ত সেটা হয় ব্যবহারিক শিল্প আর যেটা তাঁর আনন্দের আহ্বানে করেন সেটা হয় শিল্পকলা। কেউ জানেনা কখন হৃদয়ের কান্নার বেগ জমাট হ'য়ে একদা আনন্দের রূপে সম্রাট সাজাহানকে তাজনির্ম্মাণে অনুপ্রাণনা দিয়েছিল। নচেৎ এমন অনর্থক-সার্থক শিল্পরচনা করতে তিনি সমর্থ হতে পারতেন না। তাঁর বিরহবেদনা জমাট হ'য়ে শিল্পরচনার অনুপ্রাণনারূপে আনন্দের আকারে প্রকাশ পেয়েচে—যা দেখলেও লোকের মনে সেই ব্যথার সুরের সৌন্দর্য্য বাজে। দীপের সলিতার আলো নিভলো, বলে গেল শিল্পীকে যে আমি চললুম, ফুলের পাপড়ি খুলল আহ্বান করলে শিল্পীকে নূতন সৃষ্টিতে। কাজের যে লোক সে কাজ করে চলেচে, অলস বসে বসে দিন কাটাচ্চে, কিন্তু কোথাও আর আনন্দ নেই! আনন্দের সাড়া যেখানে সেখানে শিল্পী বসেচেন গান রচনায়, ছবি আঁকায়, মূর্ত্তি রচনায়, কবিতা রচনায়—প্রাণের উৎস সেখানে উন্মুক্ত বেগে চলেচে—বাধা কোথাও নেই। তার কি যে আহ্বান কি যে আনন্দ তা' সৃষ্টি যারা করেন তাঁরাই জানেন।

ছিরি-ছাঁদের ফাঁদ পাতাই হ'ল শিল্পীর কাজ—সে ছাঁদে ধরা পড়ে চাঁদ, ধরা পড়ে সূর্য্য, ধরা পড়ে আনন্দের রূপ। রেখার আরেখনে, লিপির আলিম্পনে, ফাঁদ পাতার কাজে যে লাগে তার কাছে দুদিনের পাওয়া, দুদিনের চাওয়া, দুদিনের মুক্তি, দুদিনের বন্ধন সবই [illegible] হ'য়ে যায়—তার অন্তর পূর্ণ থাকে এসব চূর্ণ করে অনন্তের আস্বাদ পেয়ে। এই পূর্ণতার মধ্যে শিল্পী বাড়তে থাকেন—এই হ'ল তাঁর কাজ।

প্রকৃতির অভিনন্দনলাভে স্ফীত না হ'য়ে বরং নম্র হ'য়ে তার পূজায় জীবনকে ঢেলে দেয় শিল্পী। সাধারণ লোকের সঙ্গে শিল্পীর এই খানেই তফাৎ। সকলের জন্যেই প্রকৃতির লাবণ্য, কোনো এক বিশেষ জাতের লোকের জন্যে সঞ্চিত নয়, কিন্তু তবুও শিল্পীরাই তার রসগ্রহণ করেন আর সাধারণ তাকে অতি সাধারণভাবেই নিয়ে থাকে। জলের ঢেউ, তরুপল্লবের মর্ম্মর, পাখীর কূজন ত আদিমকাল থেকেই মানুষেরা শুনচে কিন্তু তা' চোখে দেখেচে এবং কানে শুনেচে এবং মর্ম্মে স্পর্শ অনুভব করেচে শিল্পীরা এবং তাই তারা দুনিয়ার লোকের কাছে—এমনভাবে ছন্দে, রঙে, সুরে ডালি সাজিয়ে ধরেচেন যা' অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় হ'য়ে সকলের কাছে আজ প্রতিভাত হয়েচে। সমুদ্রের ঢেউ গর্জ্জন করেচে নাবিকের ত্রাস জন্মাতে—সাগর-সঙ্গীত কিন্তু শুনেচেন কবি তার প্রতি ঢেউয়ের মূর্চ্ছনায়! বুলবুল্ পাখী ত সবাই দেখেন, কিন্তু যিনি পারস্য কবিদের কাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত তাঁরা যদি কোনো উদ্যানে বুলবুল্ দেখতে পান ত তাঁদের কাছে—সেই বাগানটির সমস্তটাই একটা পারস্য কবিতা বলে প্রতিভাত হয়। লণ্ডনের ধোঁয়া যা' সেদেশের দুচক্ষের বিষ তাও তুলিতে ফুটে উঠে কাব্যের মধ্যে স্থান পেয়ে লোকের কাছে অপূর্ব্ব-রস যোগালে। মা ও ছেলের সহজভাবটি কারু চোখে এমন উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটতোনা যদি না র‍্যাফেলের আঁকা মাতৃমূর্ত্তি ছবির সৃষ্টি হ'ত। তেম্নি অনেক সহজ-সরল প্রকৃতির লীলার মধ্যে যে হাসিটি লুকানো আছে তা' ধরে দেয় শিল্পী—তার শিল্প-কলায়; কদর তখনই তার হয়, তার আগে অজ্ঞাত থাকে। সৃষ্টির সঙ্গে সৃজনের আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ, তাতে তার অহঙ্কার বাড়েনা, মাথা তার নত হ'য়ে পড়ে পদে পদে। তার কাছে যখন সৃষ্টির ভিতরের গূঢ় রহস্য একে একে প্রতিভাত হয় তখন সে টের পায় যে মানুষ কত ছোট, কত ক্ষুদ্র; কেবল এই বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির রসগ্রহণ করে যখন সে আপনরসে সেটিকে রঙিয়ে তুলে ফুটিয়ে তোলে তখনই সেও অমৃত হয়—অমর হয়। এই আনন্দেই সে গড়ে—অহঙ্কার সব চূর্ণ হয়ে যায়।

শিল্পী তাই সর্ব্বদাই জানচে, সর্ব্বদাই পাচ্চে, এইভাবে সে সারাজীবন সাধনার পথে চলেচে—তার আর শেষ নেই। কেউ আঁকা শেষ করে বল্লে না "ব্যস শেষ করে দিলুম ছবি আঁকার শেষ কথা।" তাই কবি গেয়েচেন—

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।
আঘাত দিয়ে দেখা দিল আগুণ হ'য়ে জ্বলবে।
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা, সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হ'লে নদী হয়ে গলবে।

শিল্পীর অভিনন্দন

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ফুরায় যা' তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে ;
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে মরণে ফল ফলবে।"

আমাদের দেশে শিল্পীদের বড়ই একা একা আপন মনে গান গেয়ে চলতে হয়। ইউরোপে যেমন প্রত্যেক শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক গুণগ্রাহী রসিকদল তাদের উৎসাহ দিয়ে বাঁচান, আমাদের দেশে সে পুরস্কারের কোনোই আশা নেই বরং তিরস্কারটাই সহজলভ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় এইরূপ একলা একলা কাজ করার দরুণ শিল্পীদের ক্ষতি অপেক্ষা লাভও যথেষ্ট, কেননা শিল্পীর প্রতিভা সহজে যখন ফোটে তখন সেটার বিকাশ চরম হয়। বাগান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে কেয়ারীর কড়া নিয়মের বাঁধনে বীজের প্রজনন পরীক্ষা করতে গেলে তার ফলে ফুল যে সব সময় সেরা হ'য়ে ওঠে তা' নয় বরং এলোমেলো বীজ পড়ে বাগানের আনাচে কানাচে যা' জন্মায় তাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে ফুটে উঠে বাগানের গৌরব বাড়ায়। শিল্পীর শিল্পও ঠিক এই একই নিয়মে বাঁধা-বাঁধন মেনে চলা একজামিন পাশ করার কেয়ারীর অর্থাৎ ষ্টীল ফ্রেমে খর্ব্বই হ'য়ে পড়ে—উৎকর্ষ হয় যখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে আপনি অলক্ষ্যে বিকাশ পাবার অবকাশ পায়।

শিল্পী স্বাধীন জীব। তাকে ছেড়ে দিতে হয় আপন মনে কাজ করে যেতে—কোনো বাঁধা নিয়মের চাপে তাকে চালালে তার সবই খর্ব্ব হয়। তেমনি তাকে বেশী আন্দোলনের বিষয় করে তুল্‌লেও তার সমূহ ক্ষতি করা হয়। অনেকটা নদীকে যদি তার সহজ গতিতে চলতে না দিয়ে তার দুপাড় মর্ম্মর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া যায় ঠিক্ সেইরূপ। সহজ পরিণতি নদীটির হয় যখন সে আঁকা বাঁকা উত্থান পতনের গতিতে মাটির সহজ ভাবটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এঁকে বেঁকে চলে—তেমনি শিল্পীকে তার আপন পথে অবহেলায় চলতে দিলে তারও সেইরূপ বিচিত্র সৃষ্টিতে তার জীবনের গতি অলঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। যে প্রকৃতির অভিনন্দনের আস্বাদ পেয়ে সে সারাজীবন আপন ভোলা হ'য়ে সাবলীল গতিতে চলে তাতে তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? বরং তার সৃষ্টির আনন্দে যোগ দিয়ে তাকে উৎসাহিত করে তুললে তার মানসিক পরিণতির পক্ষে সহায়তা করা হয়। তাই আমাদের মনে হয় তাকে আর অভিনন্দন করা কেন? তাকে প্রকৃতির কাছে অভিনন্দিত হ'তে দিলেই স্বভাবের উপর ছেড়ে দিলেই সে তার প্রতিভার বিকাশ আপন ক্ষমতা অনুসারে করবে। তাকে ছোলা ছাতু খাইয়ে সোনার দাঁড়ে তুলে ভাল ভাল নাম পড়াবার মত চেষ্টা না করে তাকে খোলা বাগানের বুল্‌বুলের মত অবাধে ছেড়ে দিলে তার সম্মান না বাড়লেও তার স্বভাব স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে, সুন্দর হ'য়ে, জগতের কাছে একদিন দেখা নিশ্চয়ই দেবে। পাখী যাঁরা খাঁচায় পালন করেন তাঁরা একই স্থানে একই ভাবে চিরকাল তাকে দেখতে পান—বৈচিত্র্য তাতে থাকে না কিন্তু যাঁরা বনের পাখীকে বশ করতে জানেন তাঁদের কাছে পাখীর রূপ নানা অবস্থায় নানা আকারে ধরা পড়ে।

আমরা যখন কোনো শিল্পীকে অভিনন্দন করি তখন ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পীকে ভেবে করিনে দেশের শিল্পকে ভেবেই করে থাকি। এক্ষণে আমাদের মনে হয় শিল্প-কলার অভিনন্দন ব্যক্তিগত শিল্পীর অভিনন্দনের বাইরেই হওয়া ভাল আর সেই সঙ্গে শিল্পী শিল্পী হতে গিয়ে যাঁর অভিনন্দন-টীকা পরেছেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে যে কোনো অনুষ্ঠানই বরণীয়।

-উপন্যাস-

৮

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। সংসারের কাপড়-চোপড় বড় মলিন হইয়া পড়ায় সর্ব্বজয়া সাজিমাটী দিয়া সিদ্ধ করিয়া ঘাটে কাচিতে লইয়া গিয়াছে। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে। তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙ্গা। আগে সেটা তাহার দিদির পুতুলের বাক্স ছিল, ডালা-ভাঙ্গা অবস্থাতেই বহুদিন সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। গত বৎসর তাহার মামার বাড়ী হইতে মায়ের এক দূর সম্পর্কের জেঠামশায় আসিয়া এখানে কিছু দিন ছিলেন। দিদির পুতুলের বাক্সের দুর্গতি দেখিয়া নবাবগঞ্জের বাজার হইতে একটা নতুন বাক্স কিনিয়া দিয়া যান—সেই হইতে ভাঙ্গা বাক্সটী তাহার নিজের দখলে। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে,—একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল্-খাওয়া টিনের ভেঁপু বাঁশী, গোটা কতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মী-পূজার কড়ির চুপ্‌ড়ী হইতে খুলিয়া লইয়াছিল, পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্ব্বদা লুকাইয়া রাখে। একখানা পাতা-ছেঁড়া ইংরাজি কি ছবির বই—রেলগাড়ীর ছবি—ষ্টীমারের ছবি, এই সব। এ-খানাও সে মায়ের জেঠামশায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছে। একটা দু' পয়সার দামের পিস্তল, কতকগুলা শুক্‌না নাটা ফল। দেখিতে ভাল বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপ্‌রার কুচি। গঙ্গাযমুনা খেলিতে এই খাপ্‌রাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহা মূল্যবান সম্পত্তি। তবে এ তালিকা আংশিক মাত্র—তাহার সমুদয় সম্পত্তির বিস্তৃত ফর্দ্দ দাখিল করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, বা সবগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাহিরের বাজে লোকের কোনো ধারণা থাকারও কথা নহে। অপুর হাতে এখন অনেক কাজ। কারণ এতগুলি জিনিষের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশীটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটার সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও এক পাশে পিঁজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপ্‌রাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার ওপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপ্‌রা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে, তাক্ ঠিক হইতেছে কিনা।

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

না, কোথা হইতে এই মাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মত লক্ষ্মীর চুপড়ীর কড়িগুলা তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল—কিরে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে—শোন্—

দুর্গার বয়স দশ এগার বৎসর হইল। গড়ন পাত্‌লা পাত্‌লা, রং অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরণে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কিরে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নীচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আস্‌তে পারিস্? আমের কুসী জরাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলিরে দিদি?—

দুর্গা বলিল—পটুলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়েছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মার্‌বে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

তুই যা না শিগ্‌গির করে, মা আস্‌তে এখন ঢের দেরী—ক্ষার কাচ্‌তে গিয়েচে—শিগ্‌গির যা—

অপু বলিল—নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আস্‌বো—তুই খিড়্‌কী দোরে গিয়ে দ্যাখ, মা আস্‌চে কিনা। অপু মালা লইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল। নিম্নস্বরে পিছনে পিছনে দুর্গা বলিতে লাগিল—তেল টেল যেন ঢালিস্‌নে—সাবধানে নিবি—নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ভাঁড়ে এট্টুখানি তেল ছিল। দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত্।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?—

অতগুলো বুঝি হোল? এই তো—ভারি বেশী—যা, আচ্ছা নে আর দুখানা—বাঃ, খেতে বেশ হয়েচে রে—একটা লঙ্কা আন্‌তে পারিস্? আর একখানা দেবো তা'হলে—

লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়—আমি যে নাগাল পাইনে?

তবে থাক্‌গে যাক্—আবার ওবেলা আন্‌বো এখন—পটুলিদের ডোবার ধারের আম গাছটার গুটী যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে চৌধুরীপাড়া যাইবার সরু পথ, দু'ধারে শেওড়া, ভাঁট্, নোনা গাছের জঙ্গল। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেল তবে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী।

দুর্গাদের বাড়ীর দুই দিকের পাঁচিল নাই,—আগে ছিল, পড়িয়া ইট স্তূপাকার হইয়া আছে। হরিহরের পৈত্রিক আলয়ের বাড়ীটা অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সাম্‌নের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটীর ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরের দোরজানালার কপাট সব ভাঙ্গা, নারিকেলের দড়ী দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কী দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্ব্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাক্‌চে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্ত্তি। সে তাড়াতাড়ি জরানো আমের চাক্‌লাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁটাল গাছটার কাছে সরিয়া

গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণ-পণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাইবার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনা-সূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান্ মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়ার পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যালো না বাঁদর—নুন লেগে রয়েচে যে—

পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা ?

কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল। একটুখানি যদি কোনো দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড় মেয়ে সংসারের কুটোগাছটা ভেঙ্গে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে টোকলা সেধে বেড়াচ্চেন—সে বাঁদর কোথায় গেল ?

ঐ তো কাঁটালতলায় রয়েচে—আমরা তো—বাইরের উঠোনে তো—

কথাটা শেষ না করিয়া সে মাকে বুঝিতে দিল সকাল হইতে তাহারা দুজনে, বিশেষ করিয়া সে, শান্ত-শিষ্টের মত বসিয়া আছে, কোথাও বাহির হয় নাই। সর্ব্বজয়া পা ধুইতে ধুইতে বলিল—ও বাড়ীর ন-খুড়ীমা এসে ফিরে যান্‌নি তো? ঘাটে বল্লেন, দই পাতবার জন্যে একটু তেঁতুল নিয়ে যাবো

দুর্গা বলিল—কৈ না—আমি তো—এগুলো বেড়ার গায়ে রোদে মেলে দেবো মা ?

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েচে।

রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু—একটু খানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ—বেলা হয়ে গিয়েছে দুকুর—হাঁড়িটা না চড়িয়ে আমি এখন আর কোনো দিকেই যেতে পারবো না। ও দুর্গা, দ্যাখ্‌তো বাছুরটা হাঁক্ পাড়চে কেন? খানিকটা পরে সর্ব্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"আর এট্টু আটা বের্ করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।"

তাহার মা বলিল—তোর ওই মুড়ির ধামিটা নিয়ে আয়, ওতে দি—

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—চাল ভাজা আর নেই মা ?

—দেখি যদি ঘড়াতে থাকে। পরে বলিল—সরে দাঁড়াও বাপু, ঘাড়ে এসে পোড়ো না। তোমার তো সাত রাজ্যি ঘাঁটা কাপড়—

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবোনা যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্দ্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি? সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্ব্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি ?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি —এই তো এখন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাক্‌লে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হোল—কম্‌লে বাছুর ও সয়, এত বেলা ক'রে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ-দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েচে —আবার কোনো দিন আম দেবো খেও—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটুদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জরাবো, এই এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়? খেও এখন? হাঁদা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ?

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিল। সর্ব্বজয়া ছেলেমেয়েকে খাওয়াইয়া হাঁড়ী লইয়া বসিয়া আছে, বলিল—একটার গাড়ী যে যাবার যোগাড় হোল? এ রকম কাজ হলেই হয়েচে! হরিহর বলিল—তা কি হবে—দুখানা গাঁয়ের তাগাদা সেরে ফিরে হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে তবে আস্‌চি।

হরিহর স্নান সারিয়া খাইতে বসিল। পিতামহ রামহরি রায়ের আমলের একটা বড় কাঁটালকাঠের পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া আহার করা তাহার অভ্যাস। সন্ধ্যার পর এক একদিন সেই পিঁড়িটাই ঠেস্ দিয়া দালানে বসিয়া ছেলেকে কাছে বসাইয়া গল্প করে ও "বঙ্গবাসী" কাগজ পড়ে। খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখ্‌চিনে? সর্ব্বজয়া বলিল—অপু তো ঘরে ঘুমুচ্চে।

দুগ্‌গা বুঝি—

সে সেই খেয়েই বেরিয়েচে—সে বাড়ী থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে—কোথায় কার বনে বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরচে—এই চত্তির্ মাসের রদ্দুর? ফের দ্যাখোনা এই জ্বরে পড়লো বলে—অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?—

হরিহর খাইতে খাইতে বলিল—আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছ্‌লাম, বুঝ্‌লে? একজন লোক, বেশ মাতব্বর, দুপয়সা আছে, পাঁচ ছয় গোলা বাড়ীতে, আট দশটা লাঙলের গরু, বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে—'দাদা ঠাকুর, আমায় চিন্‌তে পাচ্চেন?' আমি বল্লাম—'না বাপু, আমি তো কৈ—?' বল্লে—'আপনার কত্তা থাকতে তখন তখন পূজো আচ্চার সব সময়েই তিনি আস্‌তেন, পায়ের ধুলো দিতেন। তা আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়ীশুদ্ধ মন্তর নেবো নেবো ভাব্‌চি—আপনি থাক্‌তে অন্য কোথাও মন্তর নেবো সেটা তো ঠিক নয়? তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন তবে ভরসা করে বলি—আপনিই কেন মন্তরটা দেন্ না?' তা আমি তাদের বলিচি—'আজ আর কোন কথা বল্লেম না, ঘুরে এসে দু এক দিনে বুঝ্‌লে?'

সর্ব্বজয়া ডালের বাটী হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটী মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁগা, তা মুখ্যু কি? দ্যাওনা ওদের মন্তর? কি জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল—বলোনা কাউকে?—সদ্গোপ। মন্তর দিলে বেশ দুপয়সা পাওনা আছে, ওদের ব্রাহ্মণের ওপর ভক্তি খুব—এ-ও বলেছে যে ধানের জমি টমি দেবে। মানে যাতে চলে যায় তার বন্দোবস্ত করবে—কাউকে বোলো না—তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—

—আমি আবার কাকে বল্‌তে যাবো? তা হোক্ সে সদ্গোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্চে—সে ও মাসের রায়বাড়ীর টাকা যা এসেছিল—ঐ রায়বাড়ীর আটটা টাকা ভরসা—তাও দু তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়—আর এদিকে রাজ্যির দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকুরুণ বল্লে—বৌমা আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দেইনে—তবে তুমি অনেক করে বল্লে বলে দিলাম—আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখ্‌তে পারবো না, টাকাটা দিয়ে দিও ওবেলা যাবো। তা আমি অনেক করে বল্লাম, সেজখুড়ী, কটা দিন সবুর করো, আস্‌চে মাসে তোমার টাকা দিয়ে তবে অন্য কথা—তা কোত্থেকে সে টাকা হবে? এদিকে রাধা-বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্চে, দুবেলা তাগাদা আরম্ভ করেচে। ছেলেটার কাপড় নেই—দু তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েচে যে একদিকে বেরিয়ে যাই—

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ উঠিবার বেশী বিলম্ব নাই বুঝিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিবার ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—আর একটা কথা ওরা বল্‌ছিল, বুঝ্‌লে? বল্‌ছিল, 'এগাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এ গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা জমি দিয়ে বাস করাই—গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে।' তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজী—পয়সার তো অভাব নেই? আজকাল চাষাদের ঘরেই লক্ষ্মী বাঁধা—ভদ্দর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্ব্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।—এখখুনি—তা তুমি রাজী হলে না কেন? বল্লেই হোত যে

আচ্ছা আমরা আস্‌বো! ওরকম একটা বড় মানুষের আশ্রয় এ গাঁয়ে তোমার আছে কি? শুধু ভিটে কাম্‌ড়ে পড়ে থাকা—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল! তখুনি কি রাজী হ'তে আছে! ছোটলোক, ভাব্‌বে ঠাকুরের হাঁড়ী দেখ্‌চি শিকেয় উঠেচে—উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—তাড়াতাড়ির কি? আর এখন ওঠ বল্লেই কি ওঠা চলে? সব ব্যাটা এসে বল্‌বে টাকা দাও—নৈলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল, এবং আর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ওধারের পাঁচিলের পাশ বাহিয়া—বাহির বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাতে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁটালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলো যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। রৌদ্রে ঘুরিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। কিন্তু বাবা, বিশেষতঃ মার সাম্‌নে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ী ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁটালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুক্‌নো রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুণিতে আরম্ভ করিল, এক—দুই—তিন—চার—ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উল্টাপিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে তাহা হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল- অপুকে এইগুলো দেবো—আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো—কেমন বীচিগুলো তেল চুক্‌চুক্‌ কচ্ছে—আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম; নৈলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিতো—ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে—সেবার কতকগুলো এনিছিলাম, আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহাখুসির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

৯

অপুদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যাইত। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। অন্য সব গাছের মাথার উপরেও অশথ্‌ গাছটার মাথাটা উঁচু থাকিত। সেইদিকে যতবার সে চাহিয়া দেখে ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক—দূরের কোন্‌ দেশের কথা মনে হয়—কোন্‌ দেশ এ তাহা তাহার ঠিক ধারণা হইত না—তবু মনে হইত কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মার মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে। দুপুর বেলায় সর্ব্বজয়া শুইয়া শুইয়া কথনো কথনো ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারত থাকিয়া থাকিয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত—বাড়ীর ধারের নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিলটা ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মহাভারত পড়া শুনিত। মহাভারত সে মায়ের মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, সকলের চেয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথাই ভাল লাগে। দ্রোণ পাঁচ বাণ মারিলেন, তো অর্জ্জুন কিরূপে দশ বাণ সন্ধান করিয়া দ্রোণের পাঁচ বাণ অর্দ্ধপথে কাটিয়া ফেলিলেন, অবশেষে বাণ ফুরাইয়া গেলে কিরূপে যোদ্ধারা গদা হাতে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে, অথবা ঢাল ও তলোয়ার হস্তে কিরূপে পরস্পরের মুণ্ডপাত করিতেছে, এ সব অংশ তাহার

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অত্যন্ত ভাল লাগিত—অর্জ্জুন এক এক বারে একশত কি পাঁচশত বাণ ধনুকে জুড়িতেছেন শুনিয়া বিস্ময়ে সে অবাক্ হইয়া যাইত। অর্জ্জুন যে কত বড় বীর ছিলেন তাহা সে বাণছোঁড়া হইতেই বুঝিতে পারে। একদিন তাহার হঠাৎ অত্যন্ত ইচ্ছা হইল যে, সে অর্জ্জুনের মত ধনুক ছুঁড়িতে শিখিবে। কিন্তু ধনুক কোথায় পাওয়া যায়? সে নিজে অত্যন্ত ছেলেমানুষ, বাঁখারি চাঁচিয়া ধনুক তৈয়ারী করা তাহার সাধ্যাতীত। মাঝে মাঝে সে তাহার অভাব অভিযোগ দিদির কাছে জানাইয়া থাকে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে আপনা আপনি কেবল তাহার মনে হইল যে, ধনুক সম্বন্ধে দিদিকে বলিয়া কোনো লাভ নাই। তাহা ছাড়া তাহার দিদি নিজের তাল সামলাইতেই ব্যস্ত, রাতদিন টুকুদের বকুলতলায় বসিয়া বসিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছে। আজকাল তাহার কাজই হইয়াছে ঐ। ছোট বড় নানা আকারের মালা সে রোজ গাঁথিয়া আনে এবং এ পুতুল ও পুতুলের গলায় পরাইয়া দ্যায়। মালা টালা গাঁথার সহিত তাহার কোনো সহানুভূতি নাই, যদিও তাহার দিদি সকলের চেয়ে ভাল মালাগাছটী রোজ বৈকালে বাটী ফিরিয়া তাহার গলাতেই পরাইয়া দেয়।

একদিন তাহাদের বাড়ীর রান্নাঘর সারিতে ঘরামি আসিল। তাহারই মধ্যে একজন মজুরের অনেক খোসামোদ করিয়া এবং গাছ হইতে লুকাইয়া পাতিনেবু ছিঁড়িয়া তাহাকে ঘুস্ দিয়া অপু একখানি ছোট ধনুক তৈয়ারী করাইল। পাকাটীর মাথায় কঞ্চির খোল পরাইয়া সে বাণও তৈয়ারী করিয়া দিল। অপুর কাজ হইল মহা উৎসাহে দিনরাত ধনুক বাণ ছোঁড়া!—এক এক সময় সে ধনুক উঁচু করিয়া আকাশের দিকে বাণ ছাড়িত—পরে সে ফুলের মত মুখখানি উঁচু করিয়া একদৃষ্টে বাণের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত—সট্ করিয়া পাকাটির তীরটা মাথা সোজা করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ক্রমে অনেক দূর চলিয়া যাইত—উঠানের কাঁঠাল গাছটার মাথা ছাড়িয়া ঠেলিয়া উঠিত—পিছনের বাঁশঝাড়টারও মাথা ছাড়াইয়া আরও অনেক—অনেক দূর উঠিত—এমন কি অপুর মনে হইত বাণটা আর নামিয়া আসিবে না—চলিল। নীল আকাশের গায়ে গিয়া বিঁধিয়া যাইবে বুঝি! শুধু বাণের পিছনের দিকটা তাহার চোখে পড়িত, কিন্তু আগার দিকের কঞ্চির কোনটা আর চোখেই পড়ে না! অপু অবাক্ হইয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিত—ওঃ, বাণটা একেবারে কোথায় উঠিয়াছে! আচ্ছা, যদি আর ফিরিয়া না আসে? তাও কি হয় না? চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বাণটা যেন একটুখানি থামিয়া পরে হঠাৎ মাথা ভারি হইয়া ঘুরিয়া কঞ্চির খোলটা মাটির দিকে ফিরাইয়া সন্ সন্ করিয়া নামিয়া আসে ও ঠক্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। অপু ছুটিয়া যাইয়া বাণটাকে সযত্নে মাটী হইতে তোলে—বাণটা কোথায় উঠিয়াছিল—একেবারে ওই ওই বাঁশ গাছটা ছাড়াইয়া—সেই কোথায়! এত কাছে এবং হাতের মুঠার মধ্যে থাকিয়াও যে জিনিসটা হঠাৎ এত উঁচুতে উঠিয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতে পারে—যেখান দিয়া শুধু পাখীর দলের সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরিবার পথ, দুপুর রোদে চিল উড়িয়া যাইবার পথ,—সেই অতদূরে ইহা মনে হইয়া বাণগুলি তাহার কাছে এক রহস্যময় জিনিস হইয়া দাঁড়াইল। অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময় মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করে, নীল রংএর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়ীটা—কুঠীর মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারে না, বলিতে পারে না কাহাকেও—কিন্তু এ সব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যায়—এবং সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন বড় কেমন করিয়া ওঠে! হঠাৎ তাহার মনে হয় যেখানে সে যাইতেছে, সেখানে তাহার মা নাই অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়ে। কতবার যে এ রকম হইয়াছে! আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমেই মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির বাটী হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্য্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—ত্যাখো ত্যাখো ছেলের কাণ্ড

ত্যাখো—ছাড়্—ছাড়্—দেখ্চিস্ সক্‌ড়ী হাত ?···ছাড়ো মাণিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই ত্যাখো চিংড়ি মাছ ভাজ্‌চি—তুমি যে চিংড়ি মাছ ভাজা ভালোবাসো ?···আঁ—দুষ্টুমি করে না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুর বেলা তাহার মা ছেঁড়া মহাভারত খানা লইয়া জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শোয়। দুর্গাকে বলে—একটা পান সেজে দে তো দুগ্‌গা ? পরে অপুকে জিজ্ঞাসা করে কোন্‌টা শুন্‌বি আজ ?···অপু বলে—মা সেই ঘুঁটেকুড়ুনোর গল্পটা ?···তাহার মা বলে—ঘুঁটে কুড়ুনোর কোন্ গল্প বল্ তো—ও সেই হরিহোড়ের ? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই ?···পরে পান মুখে দিয়া সে সুর করিয়া পড়িতে থাকে—

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন
কহিব অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণণ
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলে—আমায় একটু পান ? মা চিবানো পান মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলে—"এঃ বড্ড তেতো —এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও খয়ের যেন আনে না তবুও—পরে সে আবার পড়িতে থাকে।

জানালার বাহিরের বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া, ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের চেয়ে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—দুই হাতে প্রাণপণে কর্ণ সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র, অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ, মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন! মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত···চোখের জল বাগ্ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম, তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত ···সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব-অনুভূতির সঞ্জীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ,—পুরাণো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্র ভরা দুপুরের মায়াঅঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।··· বেলা পড়িলে, মা গৃহকার্য্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সে অশথ্ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া চাহিয়া দেখে—হয়ত কড়া চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয়-তো বৈকালের অবসন্ন রাঙা-রোদ অলস ভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে···সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত···কর্ণ যেন ঐ অশথ্ গাছটার ওপারে, আকাশের তলে, অনেক দূরে, কোথায় এখনও মাটী হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে···রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ!··· বিজয়ী বীর অর্জ্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল—রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল—বিজয়ী, কর্ণ—যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনার অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।

এক এক দিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিষটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিষটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাঁখারি কিংবা হাল্‌কা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুড়্‌লেন, অর্জ্জুন করলেন কি একেবারে ছশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপরে ও সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ!···বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল!

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(এখানে সে মনে মনে যতগুলা বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে কিন্তু তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতের বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জ্জুন করলেন কি ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়্‌লেন—পড়ে এই যুদ্ধু! দুর্য্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে—আর কিছু দেখা গেল না!...মহাভারতের রথীগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, যশোলাভের পথ ক্রমশঃই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে—বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমান ভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা। বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্ব্বে দ্রোণ গুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপি-ধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্য-দলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময়ে শেওড়া বনের ওদিক্ হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাস করিল—ও কিরে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ-টানা জ্যাকে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে!... অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগ্‌লা? আপন মনে কি বক্‌চিস্ বিড়্ বিড়্ করে, আর হাত পা নাড়্‌চিস্? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল!...কোথাকার একটা পাগল! কি বক্‌ছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জায় দিদির দিকে চোঁখ তুলিয়া চাহিতেই পারিল না। সে নির্জ্জনে যাহা করিয়া থাকে—তাহার জন্য আজ দিদির সাম্‌নে এরূপ ভাবে ধরা পড়িয়া কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া লজ্জিত মুখে বার বার বলিতে লাগিল—যাঃ, বক্‌চো কি?...বক্‌ছিলাম বুঝি?..আচ্ছা যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে—

কোথায় রে?

আয় না?...তোকে একটা জিনিষ দেখাবো—

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস্?...কত নোনা পেকেচে?...এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি?...

অপু বলিল—উঃ—অনেক রে দিদি!—একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?—

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর্, ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে থেকে আঁকুসিটা নিয়ে আয় দিকি?—আঁকুসি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে—দেখিস্ এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিকি, আমি আন্‌চি—

অপু চলিয়া গেলে দুর্গা নিকটস্থ একটা ডালের নোনা পাড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কোনো রকমে হাত বাড়াইয়া ডালটা নাগাল না পাওয়ায় সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অপু আঁকুসি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার পাঁচটার বেশী ফল পাড়িতে পারিল না—খুব উঁচু গাছ, সর্ব্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুসি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল্ আজ এইগুলো নিয়ে যাই, কাল নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আন্‌বো—মার হাতে ঠিক নাগাল আস্‌বে—দে, নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুসিটা নে—নোলক পর্‌বি?—

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়্-কলমী লতায় শাদা শাদা ফুলের কুঁড়ি। দুর্গা হাতের ফলগুলা নামাইয়া রাখিয়া নিকটে ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমী ফুলের নোলক পরিতে ভাল-বাসে বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল বলে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে

দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। প্রথমতঃ, দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়—এমন সব জিনিষ জুটাইয়া আনে, যাহা হয়ত কুপথ্য হিসাবে উহাদের উভয়েরই খাইতে নিষেধ আছে। যদি সে কথা না শোনে তাহা হইলে হয়তো দিদি তাহার সহিত আড়ি করিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিবে, ইহা সে সহ্য করিতে পারে না। দিদি যদি তাহার সহিত কথা বন্ধ করে তবে তাহার কান্না পায়, মন কেমন করে, কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শোনা তাহার সাহসে কুলায় না।

দুর্গা একটা কুঁচি ভাঙিয়া সাদা জলের মত যে আটা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে অপুর নাকে কুঁড়িটী আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—পরে ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া মুখ নিজের দিকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্চে?—বাঃ বেশ হয়েচে—চল মাকে দেখাইগে—

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল্ না—খুলে ফেলিস্‌নে যেন—বেশ হয়েচে—

বাড়ী আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্ব্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুসী হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে!—

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়্‌বে মা?—এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা—

কোন্ জায়গায় বল্ দিকি! আমি তো ওল তুল্‌তে গেছ্‌লাম সেদিন, দেখিনি তো?

—বাঃ ছাখোনি! মস্ত বড় গাছ যে! আচ্ছা কাল আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। পরে সে আড়াল ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছাখো মা,—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে, চিনতে তো পারিনে? দেখি?—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল। বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্‌রে অপু, ঐ কোথায় ডুগ্‌-ডুগী বাজ্‌চে, চল্ বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক্, শীগ্‌গির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া বাঁদর নয়, ওপাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ওপাড়ায় তাহার দোকান, তাহা ছাড়া সে আবার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়ত মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল, কখনো পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়ত সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাতব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুণ মাথায় করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছছাড়া এমন কোনো জিনিষ নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কীসন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ী ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ার লোকে কখনো কিছু খায় না। তবুও দুর্গা ও অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গিয়া মাথার রেকাবী নামাইতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ীতে পাঁচ ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। তাঁহার এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ এ সংসারের কর্ত্রী। তাঁহার স্বামী সহরে এক কার্য্য করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অদ্য সাত আট বৎসর

হইল ইনি এক পুত্র ও এক কন্যা লইয়া এ গ্রামে আসিয়া আছেন। সেজ-বৌএর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে!

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাঁতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুয্যের ছেলে মেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্য খাবার কিনিয়াছিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন দিয়া ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না রোয়াকে উঠে গিয়ে খাওনা—এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে!—

চিনিবাস চাঙ্গারী মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ী চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল দেখিগে টুনুদের বাড়ী—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখ্‌তে পারিনে বাপু,—ছুঁড়ীটার যে কি হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ী আছে গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না লোকের দোর দোর—যেমন মা তেম্‌নি ছাঁ—

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া অপু দিদির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল- তোর বাক্সে একটা পয়সা আছে দিদি, না?

দুর্গা বলিল—আমি ও হাটে যে আল্‌তা কিন্‌তে দিলাম বাবাকে সেই পয়সাটা দিয়ে—আবার বাবার কাছ থেকে রথের সময় চারটা পয়সা নেবো—তুই দুটো—আমি দুটো? তুই আমি মুড়কী কিনে খাবো—

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের কতদিন আছে রে দিদি?—

—দূর্, রথের এখনো অনেক দেরী—এখনো আমই পাক্‌লো না,—কাঁটাল যখন পাক্‌বে সেই সময় রথ হবে—দেখিস্‌নি রথতলায় কত পাকা কাঁটাল বিক্রী হয়।—সেই আর বছর?—

১১

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বজয়া ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল। পিছনে পিছনে অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও বাড়ী হইতে আসিল। সর্ব্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল্ দিকি? ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো?—কাজ কর্ত্তে দিবি না—না? অপু বলিল—তা হোক্—কাজ তুমি ওবেলা কোরো এখন মা, তুমি যাও ঘাটে! পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণস্বরে কহিল—আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না?—আজ চারদিন যে খাইনি?

—খাওনি তো করবো কি? রদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাধিয়ে বসবে, বল্লে কি কথা কানে নেও নাকি তোমরা? ছিষ্টির কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাবো? বসে তো নেই? যা ওরকম দুষ্টুমি করিস্ নে—তোমাদের ফরমাজ মত কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ কর্ত্তে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি বাদ যাবে না?··· এক্ষুনি ঘাটে যাও—না, আমি শুন্‌বো না,···করো দিকি কেমন কাজ করবে?

সর্ব্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ও রকম দুষ্টুমি করে না, ছিঃ—এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটু খানি সবুর করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব—দুষ্টুমি করে কি? ছাড় আঁচল, ক'খানা পল্‌তার বড়া ভাজা খাবি বল্ দিকি?

ঘণ্টাখানেক পরে অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল। একবার ভাত মুখে দিয়াই বলিল—উঃ—বড্ড নুন বেশী হয়েচে।

—কিসে নুন বেশী হোল রে? নুন তো বেশী কোনোটাতেই দিই নি।

গত কয়েকদিন অসুখের সময় বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে যত কুপথ্য কুপথ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার মধ্যে

পল্‌তার বড়া একটা। তাই মাকে বিশেষ তাগিদ কাল বৈকাল হইতে দিয়া আসিতেছে। কিন্তু অত্যন্ত সাধের পল্‌তার বড়া খাইতে গিয়া একখানা মুখে তুলিয়াই তাহার মনে হইল তাহাতে মুন্‌ তো বেশী বটেই, ঝালও যেন বেশী। গ্রাস তুলিয়া সে চক্‌ চক্‌ করিয়া অর্দ্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নীচে ছড়াইয়া বাকী জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

—কৈ খাচ্ছিস্‌ কৈ! এতক্ষণ তো ভাত ভাত ক'রে হাঁপাচ্ছিলে—পল্‌তার বড়া—পল্‌তার বড়া—ঐ তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে?

সর্ব্বজয়া একবাটী দুধে কিছু ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল।—দেখি হাঁ কর্‌—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তার ছেলের দশা দেখ্‌লে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচু মাঁচু—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচু মাঁচু—বাঁচবে কি খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বৈ তো নয়—ওরকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ—হাঁ করো—লক্ষ্মী—দেখি এই দলাটা হলেই হোয়ে গেল—আবার ওবেলা টুনুদের বাড়ী মনসার ভাসান হবে! তুই জানিস্‌ নে বুঝি শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চলো, আমরা সব—

দুর্গা বাড়ী ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধুলা, কপালের সাম্‌নে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলাধুলা নাই—কোথায় কোন্‌ ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্‌ গাছটায় আমের গুটী বাঁধিয়াছে, কোন্‌ বাঁশতলার শেঁয়াকুল খাইতে মিষ্ট—এ সব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্ব্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কিনা! যদি কোথাও কণ্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ [illegible] করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া [illegible] পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপ্‌রা লইয়া ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে; গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোন্‌ খানায় ভাল তাক্‌ হয়—পরীক্ষায় যেখানা ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্ব্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্ব্বজয়া বলিল—এলে? এসো, ভাত তৈরী। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোন্‌দিকে বেরুতে হবে বেরোও। এই সংসারে খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে গেল—ক্ষার কাচা থেকে আরম্ভ করে আর রান্না অব্‌ধি—গাছের পাড়্‌বো আবার তলার কুড়ুবো; বোশেখ্‌ মাসের দিন সকলের মেয়ে ছাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিব পুজো করচে—আর অতবড় ধাড়ী মেয়ে—দিন রাত কেবল টো টো, সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে, এখন এল বাড়ী—মাথাটার ছিরি ছাখো না? না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুণী ছোঁয়ানো—কে বল্‌বে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে কি বাগ্‌দীদের কেউ—বিয়েও হবে ঐ দুলে কি বাগ্‌দীদের বাড়ীতেই—আঁচলে ওগুলো কি ধনদৌলত বাঁধা—খোল্‌ দিকি?

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—ওই রায়কাকাদের বাড়ীর সাম্‌নে কালকাসুন্দে গাছে—পরে ঢোক্‌ গিলিয়া কহিল—এই অনেক বেনে—বউ, তাই—

বেনে-বৌএর কথায় হৃদয় গলে না এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্ব্বজয়া তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া কহিল—তোর বেনে-বৌয়ের না নিকুচি করেচে, যত ছাই আর ভস্‌সো রাতদিন বেঁধে বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন—আজ টান্‌ মেরে তোমার পুতুলের বাক্স ঐ বাঁশতলার ডোবায় যদি না ফেলি তবে—

সর্ব্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর সেজ ঠাক্‌রুণ, পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আর চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সেজ ঠাক্‌রুণ কোনো দিকে না চাহিয়া বা বাড়ীর কাহারও

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্ হন্ করিয়া ভিতরের দিকে রোয়াকে উঠিলেন। পিছনে পিছনে ছেলে-মেয়েরা সকলেই গিয়া উঠিল। পরে সেজ ঠাক্রুণ নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয়—বের্ কর পুতুলের বাক্স দেখি—

বাড়ীর কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেজঠাক্রুণের মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর এক ছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল—এই ত্মাখো মা—আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেল্তে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোন সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটী বাহির করিয়া বলিল—এই ত্মাখো জেঠিমা আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ীর সকলের কাছেই এত রহস্তময় মনে হইল যে, এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্ব্বজয়া কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিল—কি কি খুড়ীমা! কি হয়েচ? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

এই ত্মাখোনা কি হয়েচে, কীর্ত্তিখানা ত্মাখো না একবার—তোমার মেয়ে সেদিন খেল্তে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে—মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ—তারপর সতু গিয়ে বল্লে যে তোর পুঁতির মালা দুগ্গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম—ত্মাখো একবার কাণ্ড—তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহদ্দ চোর—আর ওই ত্মাখো না—বাগানের আমগুলো গুটী পড়্তে দেরী সয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কতায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্ব্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস্ এই মালা ওদের বাড়ী থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন—না আন্লে কি আর মিথ্যে করে বল্চি নাকি! বলি এই আম কটা ত্মাখো না? সোনামুখীর আম চেন না নাকি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্ব্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজখুড়ী, আপনার মিথ্যে কথা তাতো বলিনি? আমি ওকে জিগ্যেস করচি। সেজঠাক্রুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁঝের সহিত বলিলেন—জিগ্যেস করো আর যা কর বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি—এই বয়েসে যখন চুরি বিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে। চল্‌রে সতু—নে আমের গুটীগুলো বেঁধে নে—বাগানের আমগুলো লক্ষ্মী-ছাড়া ছুঁড়ীর জ্বালায় যদি চোখে দেখ্‌বার যো আছে? টুনু মালা নিইচিস্ তো?

সর্ব্বজয়ার কি জানি কেমন একটু রাগ হইল—ঝগড়াতে সেও কিছু পিছু হটিবার পাত্র নয়—বলিল—পুঁতির মালার কথা জানিনে সেজখুড়ী—কিন্তু আমের গুটীগুলো—সেগুলো পেড়েচে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেচে তার গায়ে তো নাম লেখা নেই সেজখুড়ী—আর ছেলে মানুষ যদি ধরো এনেই থাকে—

সেজঠাক্রুণ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বল্‌চো? বলি আমের গুটীতে নাম লেখা না হয় নেই-ই, তোমাদের কোন্ বাগান থেকে এগুলো এসেচে তা বল্‌তে পার? বলি টাকাগুলোতেও তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে? আজ এক বচ্ছরের ওপর হয়ে গেলো, আজ দেবো, কাল দেবো—আস্‌বো এখন ওবেলা—টাকা দিয়ে দিও—ও আমি আর রাখ্‌তে পারবো না—টাকার যোগাড় করে রেখো বলে দিচ্চি।—

দলবল সহ সেজঠাক্রুণ দরজার বাহির হইয়া গেলেন। সর্ব্বজয়া শুনিতে পাইল পথে কাহার কথায় উত্তরে তিনি বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বলিতেছেন—ওই এই বাড়ীর ছুঁড়ীটা টুনুর বাক্স থেকে এই পুঁতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে করেচে কি, নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে—আর ত্মাখো না এই আমগুলো—পাশেই বাগান যত ইচ্ছে

পাড়্‌লেই হোল---তাই বল্‌তে গেলাম, তা মা আবার কেটে কেটে বল্‌চে—(এখানে সেজবৌ সর্ব্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গী নকল করিলেন)—তা—এনেচে ছেলে মানুষ—ও রকম এনেই থাকে—ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি? শোনো কথা? নাম লেখা নেই বলে আমার জিনিষ আমি চিনিনে? (সুর নীচু করিয়া) মা-ই কি কম চোর নাকি, মেয়ের শিক্ষে কি আর অম্‌নি হয়েচে? বাড়ীশুদ্ধ সব চোর—

অপমানে দুঃখে সর্ব্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল-ভাত-মাখা হাতেই দুড়্‌দাড়্‌ করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ্‌-বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেচে---ম'লেও আপদ্ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা—যা এখ্‌খুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কী-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্ব্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক্ হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটী যে চুরির জিনিষ নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল—এবং সোণামুখীর তলায় আম ক'টা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে। কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটীগুলো জরাবো কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ী উপস্থিত থাকার দরুণ উক্ত প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। আজ সকালেও একবার দিদি বলিয়াছে—ঘুরে এসে সেই দুপুরের পর আমের গুটীগুলো জরাবো—বুঝ্‌লি অপু?—[illegible] না দিয়ে দিদি কখনো কিছু খায় না সে জানে। এখানে [illegible], ছুটিয়া আসিয়া আগে তাহাকে দিয়া তবে সে নিজে খায়। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিষ আমগুলা এভাবে লইয়া গেল---তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল! দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সাম্‌নে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে ওড়ে—তখনই, কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ ওখানে নাই। কেবলই মনে হয় কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল! কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ী, পটলিদের বাড়ী, নেড়াদের বাড়ী---একে একে সকল বাড়ী খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ট পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠীমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি,—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে—দেখেচ জেঠীমা?

বাড়ীর পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশ বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়্‌কী-দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহ নাই। তাহার মা বোধ হয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়ীতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশ-ঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া পড়া শুক্‌না কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজ্-ঝোলা হল্‌দে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশ ঝাড়ের ঐ কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখী চারিদিকের বনে কিচ্ কিচ্ করিতেছে। নীলমণি রায়দের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশথ্ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—এক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু রাঙা রোদ গাছের মাথাটায় এখনও মাখানো, মগ্-ডালে একটা কি সাদা মত জিনিস দুলিতেছে, হয় বক, না হয় কাহার ঘুড়ি ছিঁড়িয়া আট্‌কাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিক নির্জ্জন···কেহ কোনোদিকে নাই···নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটায় বন কচুঝাড়ের কালো ঘনসবুজ নতুন পাতা চক্ চক্ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হু হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ী আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুয্যের বাড়ী সব ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটী করিয়া লুকোচুরী খেলিতেছে। পাড়ার সব ছেলেমেয়েই আছে—তবে তাহার দিদি এ সব খেলাধূলায় কমই মেশে—সে আপন মনে পথে পথে একা খেলা করিয়াই বেশীর ভাগ ঘুরিয়া বেড়ায়—নয়ত তাহার দিদির খেলার সাথী সে নিজে। রানু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে—ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অপু। অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেল্‌বো না রানুদি,—দিদিকে দেখেচো?

রানু জিজ্ঞাসা করিল,—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি? বকুল তলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে।—ভুবন মুখুয্যের বাড়ী হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুল গাছটা অনেক দুর পর্য্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপ্‌সি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই···যদি কোনোদিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি? দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখা ঝট্‌পট্ করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলা হইতে একটু দূরেই একটা ডোবার ধারে একটা খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁসা খেজুরের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। বকুল গাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই একবার চীৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁট-শেওড়া-বনে কি জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খস্‌খস্ শব্দ করিয়া ডোবার দিকে ছুটিয়া পলাইল।

বাড়ীর পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সাম্‌নে সেই গাব গাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্ব্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে! কেন যে তাহার এই গাছটার নীচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়াই ভয় অত্যন্ত বেশী করে। এত দেরী পর্য্যন্ত সে কোনো দিন বাড়ীর বাহিরে থাকে নাই—আজ তাহার সে খেয়াল হইল না, মন ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক না থাকিলে সে কখনই এপথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ী যাইবার আর একটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটুদিদের বাড়ীর উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পট্‌লির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর রোয়াকে ছেলে-পিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পট্‌লির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, ঠাক্‌মা—বকুলতলায় থেকে আস্‌তে আস্‌তে—

ঠাকুরমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ী গেল! এই কতক্ষণ যাচ্চে—ছুটে যা দিকি—বোধহয় এখনও বাড়ী গিয়ে পৌঁছায়নি—

সে এক দৌড়ে বাড়ীর দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পট্‌লির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস্ অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনার খেলার নতুন ঘর কেটেচি ঢেঁকুশেলের পেছনে নিমতলায়—দুগ্‌গাকে বলিস্—

তাহাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল—দুর্গা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে

করিতে বাড়ীর দরজা দিয়া দৌড়িয়া বাহির হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল—যাও, বেরোও—একেবারে জন্মের মত যাও—আর কক্ষনো বাড়ী যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক্—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।—ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মত আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়ীতে ঢুকিয়া মাটীর প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতেই তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো? তারপর কালই আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে কেঁপো এখন? তারপর নিয়ে এস সাবু, নিয়ে এস মিছরী, নিয়ে এস কুইনেন্—তোমাদের ত দুখ-দরদ নেই, মুখে রক্ত উঠে খেটে মরে গেলেও তো তোমরা কেউ দেখ্‌বে না? মর্‌চিস্, তুই মর্—আমার হোলেই হোল—এদিকে সরে এস এখন, পায়ে হাতে জল দ্যাও—কাপড় ছেড়ে ফেলো—

দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? সে কি আবার কোনো জিনিষ চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোন কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মত মায়ের কথা মত কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া নিজের ছোট বইএর দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ—কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা মোটা ভারী ইংরাজি কি বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালী, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি যোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে। মাঝে মাঝে খুলিয়া আপন মনে ইংরাজী পড়ে—টেমানেস্‌-তোম-হিফসেইস্‌-টেনা-নিফ্-উক্-টেমা টেট্ ষ্টেমা সে ওবাড়ীর রাজীর মামাকে ইংরাজী পড়িতে শুনিয়াছে এবং উক্ত ইংরাজী পড়া তাহার কানে যেরূপ শুনাইয়াছে, সে মাঝে মাঝে মহা উৎসাহে আপন মনে তাহার নকল করে। তাহার শুনা কথাগুলির মধ্যে "ষ্টেমা" কথাটা বেশ কানে ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা, কাজেই তাহার নকল ইংরাজী পড়ার মধ্যে অতি অল্পদূর পরে পরে উক্ত শব্দটীর পুনরুক্তি কিছু বেশী।

দপ্তর খুলিয়া সে এ বই ও বই নাড়িতে লাগিল। দপ্তরে একটা কাগজ ফুঁড়িবার শজারুর কাঁটা আছে—সেইটা দিয়া সে একখানা বালির কাগজের কোণ কয়েকবার বিনা কারণে এফোঁড় ওফোঁড় করিল। পরে ক্ষণিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালীখানা খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার বাবা মাঝে মাঝে এখানা লইয়া বৈশাখী সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া চেঁচাইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার একটু খানি মনে আছে:—

—মুনি বলে খাওরে পান, এর সত্ত্ব সুধাপান—

পড়া হইয়া গেলে তাহার বাবা বলে—এই নেও বাবা অপু, বই খানা তোমার দপ্তরে বেঁধে রেখে দ্যাও—খুব ভাল বই, তুমি বড় হলে ভাল করে পড়্‌তে শিখলে পোড়ো—আহা, দাশুরায়ের মত জিনিষ কি আর আছে?

বইখানা খুলিয়া সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতেছে, এমন সময়ে সর্ব্বজয়া এক বাটী সাবু হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—এস খেয়ে নাও দিকি! সেই দুদলা ভাত খেয়ে আছো—আজ আর বিকেল বেলায় কিছু খাওয়াও হয়নি—দেখি সরে এস—

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটী উঠাইয়া লইয়া সাবু চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে সাবু খাইতে তাহাকে রাজী করানো খুব সন্দেহের বিষয়। একটু-খানি মাত্র খাইয়া সে বাটী মুখ হইতে নামাইল। সর্ব্বজয়া বলিল—ওকি? নেও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু সাবু ফেললে তবে বাঁচ্‌বে কি খেয়ে—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপু বিনা প্রতিবাদে সাবুর বাটী পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্ব্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রাখিয়াছে···কিন্তু চুমুক দিতেছে না···তাহার বাটীশুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে... পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটী নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্ব্বজয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কি হোল রে? কি হয়েচে? জিব কামড়ে ফেলেচিস্?—

অপু বলিল—দিদির জন্যে বড্ড মন কেমন কর্‌চে!... কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া সে ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল···

সর্ব্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া...পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের কাঁধে হাত দিয়া কোলের দিকে টানিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তস্বরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না—অমন করে কাঁদে না, ওঁর সঙ্গে--আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন—তাকে ডাক্‌তে পাঠাবো এখন—ঐ পটুলিদের কি নেড়াদের বাড়ী বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টুমেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাক্‌তে পাঠাচ্ছি—কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আস্‌বে--আঁ—ছিঃ।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকী সাবুটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটী তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল।—হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী, সোনা, উনি এলেই ডেকে আন্‌বে এখন—একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেচে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ—

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তপোষে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে। বাবা বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া পর্য্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে?—

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার ওপর রাগ্ করিচিস্? দিদি? আমি তো কিছু করিনি?

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল—না বৈকি? তবে সতু কি করে টের পেলে যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় বিছানায় উঠিয়া বসিল। না--সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি দিদি, আমি তো দেখাইনি? আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে—কাল সতু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেল্‌ছিলাম—তা'র পর বুঝ্‌লি দিদি সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখ্‌ছিল—আমি বল্লাম, ভাই তুমি দিদির বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে—সেই সময় দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেচে--রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্‌কন্ কচ্ছে, এইখানে এই ত্যাখ্ হাত দিয়ে! এই—

এই খানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

থাক্‌গে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাবো বুঝ্‌লি? কামরাঙা যা পেকেচে! এই এত বড় বড়—কাউকে বলিস্‌নে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুর বেলা ফুটো পেড়ে খেয়েচি—মিষ্টি যেন গুড়—

(ক্রমশঃ)

নাগরিক সাহিত্য

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

পূর্ব্বকালের যে-সব প্রসিদ্ধ নগরের নাম শুনতে পাই তাদের প্রসিদ্ধির কারণ ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা—এক কথায় তাদের কালচার (culture)। আর আজকাল যে-সব বড় বড় নগরের নাম আমাদের মুখে মুখে ফেরে তারা প্রসিদ্ধ হচ্চে তাদের বাণিজ্য-প্রাধান্য এবং আরো এমনি কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্য বশতঃ। সুতরাং নাগরিকতার স্বরূপও ও দুয়ের মাঝে ভিন্ন হবে তাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালের নগরগুলি অনেক সময়ই শাসনকেন্দ্র হ'লেও শস্ত্রকণ্টকিত শাসনের মূর্ত্তিটাই তার আসল মূর্ত্তি ছিল না। নগরপ্রাচীর হয়ত সুরক্ষিতই ছিল, গুপ্তচরের শ্যেন দৃষ্টি হয়ত সর্ব্বদাই শত্রুর নিঃশব্দ সঞ্চার লক্ষ্য করতে তৎপর থাকত, কিন্তু রাজসভা ছিল নিরুদ্বিগ্ন — সেখানে রাজা তাঁর কুলীন অমাত্যবর্গকে নিয়ে আর রসিক ভাবুক বিদ্বান্ পণ্ডিতদের নিয়ে নানারূপ দর্শন সাহিত্য শাস্ত্রের আলোচনা করতেন।

তার ফলে সাহিত্য শাস্ত্র দর্শন রচিত হ'তো। বিদ্বৎসমাজের মার্জ্জিত রুচির দ্বারা যে-সাহিত্য গৃহীত হতো তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। জনসাধারণ তখন সেই সাহিত্যকে বিনা বিচারেই গ্রহণ করত। নাগরিক হ'লেও সে সাহিত্য জনসাধারণের সাহিত্য হয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা ছিলনা — একমাত্র অক্ষরজ্ঞানের অভাব ছাড়া।

২

তার কারণ, যানবাহনের টেলিগ্রাম পোষ্টাফিসের এবং বেতারবার্ত্তার যত অভাবই তখন থাক, ছোট ছোট দেশ তাদের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে একটা ঐক্যরক্ষা ক'রে চলত। সে ঐক্য সামাজিক জীবনাদর্শের ঐক্য— সে ঐক্যের বিরুদ্ধ-যাত্রা রাজদণ্ডের যোগ্য ছিল। রাজা তখনও সমাজপতি। এই সামাজিক জীবনের একতান প্রবাহ ছিল ব'লে নগরের সাহিত্যে যে-আদর্শ যে-ভাব প্রকাশ পেত তার সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের মূলগত বিরোধ কোথাও হতো না। তবে গ্রাম্য জীবন চিরকালই গ্রাম্য ছিল আর নাগরিক জীবন চিরকালই নাগরিক ছিল ব'লে মনে হয়। নাগরের জীবন-যাত্রায় মার্জ্জিত বিলাস এবং রসবোধ ছিল, তার চাল চলন একটু বেশি ভব্য, কথা-বার্ত্তা একটু বেশি রকমের কায়দাদুরস্ত ছিল —এ সব বিষয়েও সন্দেহ করবার কোনো কারণ আছে ব'লে মনে হয় না।

সে প্রভেদ যতই থাক্, নাগরিক সাহিত্য গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারত ওই এক কারণে—সামাজিক জীবনের একতায়। রামায়ণ মহাভারত পুরাণের তত্ত্ব এবং কথা, তাই এত সহজে গণ-চিত্তকে অধিকার করেছিল। তুলসীদাস —রাজসভায় না হলেও—কাশীনগরীতে ব'সে তাঁর মহাকাব্য রচনা করলেন, যার পাণ্ডিত্যের তুলনা হয় না; অথচ সমগ্র হিন্দীভাষী জনতার প্রতি স্তরে এই রামচরিত-মানসের কি আশ্চর্য্য প্রচারই না হয়েচে! আমাদের প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা চলে। বাঙলার সামাজিক চেতনা মুমূর্ষু হলেও, আজও পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব তার জীবনে একরকম অক্ষুণ্ণই রয়েচে বলা চলে।

৩

কিন্তু বিপদ হয়েচে আমাদের আধুনিক সাহিত্য নিয়ে। আধুনিক সাহিত্য বলা এখানে ঠিক হয়নি নিজেই বুঝতে পারচি। কারণ কাদের আশীর্ব্বাদে জানি না আধুনিক বলতে আমরা বছর চার-পাঁচেকের সাহিত্যকেই মনে করতে সুরু করেচি। যা-হোক আমার এই অপপ্রয়োগ ক্ষমা ক'রে পাঠক সেই সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আবির্ভূত হলো। অর্থাৎ রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে নতুন ভঙ্গীর সাহিত্য রচিত হতে লাগল সেই সাহিত্যের কথা বলচি।

নাগরিক সাহিত্য

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

সাহিত্যে যে শুধু একটা নতুন ভঙ্গী প্রবর্ত্তিত হলো তা নয়; সাহিত্য রাজ্যে এ হলো একটা নব-চেতনার আবির্ভাব। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এ চেতনা ধার করা, এ কথা কেউ কেউ যে না বলেচেন তা নয়—তার কারণও আছে। কিন্তু একটা কথা বলা দরকার, চেতনা ধার করা চলে না। সুতরাং এই আধুনিক সাহিত্যে, বাংলার রেনেসাঁ সাহিত্যে যাঁরা দেখা দিয়েছিলেন তাঁরা একটা নতুন চেতনা, নতুন দৃষ্টি, নতুন বোধ নিয়ে সাহিত্যের নবজন্মকে সম্ভব করলেন, এই কথাই বলা সঙ্গত।

এই সব রেনেসাঁ সাহিত্যিকেরা আপনাদের মধ্যে একটা নতুন সত্তা আবিষ্কার করলেন,—সেটা নব-মানবতা, নব জাতীয়তা। এ দুটো জিনিষ বাঙলা সাহিত্যে, বাঙালী জীবনে ছিল না। বাঙলা সাহিত্যে মানবতা ছিল না এ কথা শুনে অনেকেই আমার অজ্ঞতা দেখে হতাশ হবেন জানি, তবু বলতে হচ্চে যে পূর্ব্বকালের সাহিত্যে এই যে সর্ব্বমানব-প্রীতির কথা, তা ছিল না। এবং আমার এও মনে হয় যে আজ কাল 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এই পদটি নিয়ে যে আমরা বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করচি তার কারণ এই যে আমরাও পদটির ওপর আমাদের মনের মত অর্থ চাপিয়েছি। চণ্ডীদাস যে-সহজ মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য ব'লে প্রচার করেছিলেন তা আমাদের আজকালকার Democratic মানুষ নয় একেবারেই। যাঁরা চণ্ডীদাসের কাব্যকে সহজতন্ত্রের দিক দিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরাই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবেন ব'লে মনে হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও তেমনি ভগবানের অন্য সকল রূপের চেয়ে মানুষ-রূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাঁর মানব-লীলাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা বলা হয়েচে। একে যদি আধুনিক রমাঁ রলাঁর (Clerambault তে) অরবিন্দের (দেবজন্মে) হাচিনসনের (One Increasing Purpose এ) প্রচারিত ভাগবত মানবতার বাণী দিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলি যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মও সেই কথাই বলেচে তা হলে ভুল হবে নিশ্চয়। যাক্, বলছিলাম যে মানুষকে মানুষ ব'লে যে ভালবাসা—এক পরম দেবতা নানারূপে বা নরনারায়ণরূপে প্রকাশ পাচ্চেন ব'লে নয়, কিম্বা ঈশ্বর প্রীত হবেন ব'লে নয়—এই মানুষ আমার ভাই এই ব'লে ভালবাসা,—এই নব-মানবতার আবির্ভাব হয়েছিল রেনেসাঁ সাহিত্যে। আর তার মাঝে জন্ম নিয়েছিল জাতীয়তার চেতনা, Nationalism এর প্রথম স্পন্দন।

বলা বাহুল্য এর সঙ্গে সমগ্র দেশের জীবনধারার সঙ্গে কোনো যোগই ছিল না। মানুষের মধ্যে দেবত্ব দেখে যাঁরা সকল মানুষের পূজা করেন তাঁদের প্রত্যক্ষ দেবত্ব যেমন প্রায় সকল মানুষেরই নিজের কাছে একান্ত অগোচর, তেমনি এঁরা যে-জাতীয়তার অস্তিত্ব সেদিন আপনাদের কল্পনানেত্রে দেখেছিলেন সে-জাতীয়তা সেদিন বাঙলা দেশের প্রায় সকল মানুষেরই নিকট শুধু অগোচর নয়, একান্ত মিথ্যা ছিল। সে কালের নাগরিকেরা যাঁরা ইংরাজীশিক্ষার স্রোতে পড়েছিলেন তাঁরাই এই জাতীয়তার বাণী শুনতে পেয়েছিলেন।

প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব্বে কয়েকজন ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীর নিকট বাঙালীর জাতীয়তা সত্য ব'লে মনে হয়েছিল।

৪

সহস্র লোক যে-আদর্শ এবং যে-ভাবের স্বপ্নও দেখে না সেই ভাব এবং সেই স্বপ্ন নিয়ে যদি কোনো একটি লোক দাঁড়ায়, তা হলে আমরা তাকে পাগল ব'লে উপেক্ষা করি, কিম্বা পাজি ব'লে গালাগালি করি। সক্রেটীস্ এবং খৃষ্টের কপালে শেষের অভিনন্দনই জুটেছিল। অথচ সক্রেটীসের এবং খৃষ্টের ভাবও বিশ্বসংসার একদিন মাথা নত ক'রে স্বীকার করল। সত্যের জয় অমনি ক'রেই হয়ে থাকে।

শতাব্দীপূর্ব্বের গুটি কয়েক নাগরিক সাহিত্যিক যে-আদর্শকে সত্য ব'লে জেনেছিলেন, তার সঙ্গে তাৎকালীন সমাজের কোনোই যোগ ছিল না। এই সাহিত্য সেই কারণেই দেশের মর্ম্মে পৌছাল না। জনসাধারণ থেকে, গ্রাম্য মানুষের কাছ থেকে এ সাহিত্য একান্ত স্বতন্ত্র হয়েই রইল। ইংরাজী আমল থেকে যে নাগরিক জীবন গঠিত হয়ে উঠল সেও তেমনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ ধ'রে। নাগরিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পাশ্চাত্য ভাব-চিন্তা-আদর্শের কেন্দ্র হ'য়ে

উঠতে লাগল এবং এই কারণেই দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় দেশের সামাজিক আদর্শ রীতি নীতির সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারলেন না, উপরন্তু পাশ্চাত্য জীবনাদর্শকেই চরম ক'রে গ্রহণ করতে লাগলেন। এর ফলে যে একটা বিকারের সৃষ্টি হ'লো তা আমি প্রবন্ধান্তরে নির্দ্দেশ করেচি।* এই পাশ্চাত্য আদর্শবাদ সে সময় হয়ত ভালই করেছিল; কারণ তাৎকালীন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে এমন কোনো বৃহৎ ভাব বা আদর্শেরই জাগ্রত সত্তা খুঁজে পাই না যাকে আশ্রয় ক'রে সেদিনকার যুবাজীবন গৌরবান্বিত হ'তে পারত।

যা-হোক, সে-কাল থেকে আমাদের বাঙলা দেশে জীবনের দ্বিধারা ব'য়ে চলল। একটা ধারা নাগরিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে; আরেকটা ধারা, ম্রিয়মাণ জীবনের প্রাচীন সংস্কারগত জীবনের ধারা, ব'য়ে চলল কোনো রকমে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়ে। এই যে সমগ্র দেশের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বাঙালী নাগরিক জীবনের প্রায়-শত-বার্ষিক ইতিহাস,—এ বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। এই ইতিহাস বিশেষ ক'রে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যে ধর্ম্মে অনেক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

৫

আজকালই নাকি আমাদের দেশে অক্ষর পরিচয় আছে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা জন চার পাঁচের বেশি নয়। সেকালে যে কজন ছিলেন তা অনুমেয়। তার মাঝে আবার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যে কত—আজ পর্য্যন্ত—তা ভাবতে গেলে আমাদের সুশাসন সম্বন্ধে একটা অতল বিস্ময়ের মাঝে তলিয়ে যেতে হয়। যা হোক, এই অশিক্ষার মরুভূমির মাঝখানেও যে কতখানি সম্ভব হয়েচে সেইটে মনে রাখা দরকার। বাঙলা দেশ থেকেই স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু হয়েচে এবং ওই মুষ্টিমেয় নাগরিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মাঝ থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রামের আহুতি জুটেচে। বাঙালীর কৃতিত্ব বিশ্ব-সমাজে—তার কাব্য দর্শন এবং বিজ্ঞানের দিক থেকে—পরিচয় লাভ করেচে। মুষ্টিমেয় বাঙালীর এই স্বাধীনতার স্বপ্ন, এই জাতীয়তা এবং স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা যদি এতখানি ক'রে থাকে তা হলে ভবিষ্যতে যে এ জাতি অসাধ্য সাধন করবে না তা বলা চলে না।

কারণ, মনে রাখতে হবে যে-বাঙালী জাতির সামান্য অংশ এই নাগরিক জীবনের নব আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েচে সে-বাঙালী জাতির প্রায় সবটাই তার পল্লীগ্রামে নিদ্রিত শেষ-নাগের মত আজও এক রকম অসাড় হয়েই আছে। আজও পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন দ্বিধারার মিলন হয় নি। লোকশিক্ষার নব-পদ্ধতির আবিষ্কার ক'রে আমাদের পল্লী-শরীরকে নাগরিক মস্তিষ্কের প্রেরণা দিয়ে জাগিয়ে কর্ম্মশীল ক'রে তুলতে হবে। যতদিন তা না হবে ততদিন আমাদের এই নবআদর্শ কিছুতেই সফল হতে পারবে ব'লে বিশ্বাস করা যায় না।

৬

কি-হতে-পারে-না-পারের কথায় আত্মবিস্মৃত হওয়া ঠিক নয়। সুতরাং আমাদের নাগরিক জীবনের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। আমাদের রেনেসাঁ যুগের নাগরিক জীবন যে শুধু পাশ্চাত্য অনুকরণে অনেকটা বিকৃত হয়েছিল সে কথা বলেচি। কিন্তু অনুকরণ মাত্রই খারাপ নয়। শিশু অনুকরণ ক'রেই ভাষার উপর অধিকার স্থাপন করে; শেষে যখন সেই অনুকরণ তার অন্তর্নিহিত ভাষণ-শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, তখন আবার সে-ই রবীন্দ্রনাথ হ'য়ে ভাষাকে নতুন রূপ দেয়। যাকে অনুকরণ করা যায় তার মাঝে যদি এমন কোনো সত্য থাকে আমার অন্তরেও যা সুপ্ত রয়েচে, তা হলে তাকে অনুকরণ করায় ক্ষতি নেই। কিন্তু নিছক সত্যটুকুকেই আমরা অনুকরণ করি না, তার মিথ্যারও একটা মোহ আছে যা আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। ইংরাজ স্বাধীন জাতি; নিশ্চয়ই স্বাধীন হবার কতকগুলো গুণ তার আছে; কিন্তু তা ব'লে ইংরাজের সবটাই তার সেই গুণে একেবারে কাণায় কাণায় ভরা,

* 'সাহিত্যের জাতীয়তা'- বিজলী ৫ম বর্ষ, ২১শ সংখ্যা, ১১ই বৈশাখ ১৩০২ সাল।

নাগরিক সাহিত্য

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

দোষ এবং মিথ্যার স্থান ও গৌরাঙ্গে কোথাও নেই এমন মোহ যদি কাউকে পেয়ে বসে, তা হ'লে সে বড় সুবিধার কথা নয়, অথচ অনুকরণের ওইখানেই বিপদ্;—ওই ভুলই অনুকরণের মাঝে সচরাচর হ'য়ে থাকে। প্রথম অনুকরণের যুগে আমরা নাগরিক জীবনে সেই ভুলকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রেছিলাম। তারপর তাকে বিদায় দিতে কি প্রাণান্ত!

যাহোক, নাগরিক-জীবন পাশ্চাত্য আদর্শের নতুন সত্যকে গ্রহণ ক'রে দেশের প্রাচীন ধারায় ফিরে আসার চেষ্টা করেচে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বাঙালী জাতির একটা কাল্চার, একটা ঐতিহ্য (tradition) গ'ড়ে উঠেছিল; তাকে একেবারে বাদ দিয়ে, তার সঙ্গে যোগরক্ষা না ক'রে যে কোনো ভাবকেই জাতির মর্ম্মে স্থায়ী করা যাবে না এটা ধীরে ধীরে চিন্তাশীল নাগরিকেরা উপলব্ধি করলেন। ফলে নাগরিক জীবনের মাঝেও বরাবরই একটা দ্বন্দ্ব চলেচে। এই বিগত বছর পঞ্চাশ যাবৎ নাগরিক জীবন একদিক থেকে যেমন আত্মস্থ হবার চেষ্টা করচে, অপর দিক থেকে তেমনি বাইরের বিশাল জগতের নানা সভ্যতার সঙ্গে তার পরিচয়ও তেমনি বিস্তার লাভ করচে। ফলে নাগরিক জীবন এখন শুধু ইংরাজের শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্যকেই আপনার একমাত্র আদর্শ ব'লে মনে করতে পারচে না। তার সম্মুখে আজ আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ইটালী, রুষিয়া সবাই এসে জুটেচে।

এখন তাই সর্ব্বত্রই বিশ্বনাগরিক (cosmopolitan) জীবনের স্বপ্ন সকল নাগরিক জীবনের বিশিষ্ট গণ্ডীকে লুপ্ত ক'রে দেবার চেষ্টা করচে। সাহিত্য শিল্পের সাহায্যে এবং বিভিন্ন নাগরিক জীবনের মধ্যে আদান-প্রদান সহজসাধ্য হওয়ার ফলে আজকাল কোনো স্থানীয় রীতি-নীতি এবং জীবনকেই চরম ক'রে দেখা অসম্ভব হয়েচে। নানা বিচিত্র জীবনাদর্শ আমাদের নাগরিক-জীবনকে একই কালে চঞ্চল ক'রে তুলচে। আমরা যে-বিশিষ্ট সমাজিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের জীবনকে বেঁধে ধরতে চাই, সেই সামাজিক আদর্শকে আজ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে আমরা অক্ষম হয়ে পড়েচি। নাগরিক মন তাই আজ অত্যন্ত চঞ্চল; তার যেন কোথাও ঘর নাই; সে আজ পথে পথে সকল বিশ্বকে সাথী ক'রে চলতে চায়।

শুধু যে কল্পনায়ই নাগরিক জীবন এমন চঞ্চল হচ্চে তা নয়। নাগরিক জীবনে সমগ্র বিশ্বজগতের নানা বিচিত্র বস্তুর সঙ্ঘাতের সাড়াও বড় কম জাগচে না। একেই আমাদের জাতির চেতন অংশ অতি সামান্য, তাও যদি আবার এমনি নানা ভাব-সঙ্ঘাতে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে এবং আনুষঙ্গিক মোহ যদি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে তা হ'লে সে বড় কম বিপদের কথা নয়।

৭

নাগরিক সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে আমাদের আধুনিক নাগরিক জীবনের সম্বন্ধে একটু বলা দরকার হয়ে পড়ল। বর্ত্তমান কালের নাগরিক সাহিত্যে আমরা এই নাগরিক জীবনের কতক কতক আভাস পাচ্চি। একদিক দিয়ে নাগরিক মন যেমন বিশ্ব-নাগরিক-জীবনের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে আর কোনো বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শ ও সংস্কারকে একমাত্র সত্য ব'লে আশ্রয় করতে পারচে না, তেমনি অপরদিক দিয়ে আমাদের নাগরিক জীবনও বিশ্বজগতের বিচিত্র সঙ্ঘাতে স্থির থাকতে পারচে না। বর্ত্তমান কালে সমগ্র জগতের উপর দিয়ে Industrialismএর একটা বিপুল বন্যা ব'য়ে চলেচে। মানবজীবনে যন্ত্র-দানবের প্রভুত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকালীন সমাজ-ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবনের নিয়ন্ত্রিত গতিবিধির লোপ হ'তে লাগল। আজকাল তাই নগরে নগরে একটা যাযাবর-পন্থী জীবনের সৃষ্টি হয়েচে। এই যাযাবর মানবেরা ঘর-বাঁধাকে এবং ঘর-বাঁধার সঙ্গে যে স্থিতিশীল মনোভাব আছে সে মনোভাবকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। এই কারণেই বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে—যা নাগরিক জীবনের মাঝ থেকেই উদ্ভূত হচ্চে বলতে হবে—এই যাযাবর মানবের জীবন প্রকাশ পাচ্চে ব'লে মনে হয়; একে শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ বলতে গেলে অবিচার করা হয়।

চারদিক থেকে একটা আক্ষেপ শোনা যাচ্চে বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী স্বাদেশিকতার কোনো আভাসই নেই কেন? নাগরিক জীবনের মধ্যে বাঙালীর এই যে

দেশপ্রেমের নানারকমের অভিব্যক্তি ঘটচে তার প্রকাশ সাহিত্যে নেই কেন? এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সাহিত্যে বাস্তবিক বাঙালীর জীবনের এই দিকটা কি মোটেই প্রকাশ পাচ্চে না? যদি না পেয়ে থাকে তা হলে বলতে হবে যে বাঙালীর মর্ম্ম-জীবনে—যা কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে—এই স্বাদেশিকতা সত্য হতে পায় নি, কিম্বা কোনো কারণে এই কল্পধারা সাহিত্যে প্রকাশ পেতে পারেনি।

স্বদেশীর যুগ ব'লে একটা যুগ বাঙলা দেশে খুব প্রবল ভাবেই এসেছিল; সে যুগের প্রবল আলোড়ন নগরেই শুধু আবদ্ধ ছিল না, তার উদ্দাম বেগ গ্রাম্য জীবনকে পর্য্যন্ত নাড়া দিয়েছিল। সুতরাং সেটা একটা প্রবল সত্য ছিল সেদিন। জীবনের মধ্যে তার অগ্নিদীপ্তিও প্রকাশ পেয়েছিল সে দিন। আজকার তুলনায় সেদিন জীবনের সেই প্রকাশের পথে বাধা কি বিপুল ছিল তা কল্পনা করা কঠিন; তবু সেই সুবিপুল ভয় এবং অত্যাচারের বাধাকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে বাঙালীপ্রাণের সেই অগ্নিমন্ত্র জ্ব'লে উঠেছিল। জীবনে যা এত সত্য ছিল, সাহিত্যেও তা প্রকাশ পেয়েছিল তা আমরা জানি। শাসনসংযত লেখনীমুখেও সেদিন কথা শিখা হয়ে জ্ব'লে উঠেছিল। বাঙালীর সাহিত্য সেদিন সাড়া দিতে ভোলে নি। তারপর এই দীর্ঘকাল কেটে গেছে! বাঙালীর স্বাদেশিকতার সাধনা আজ নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু শুন্‌তে পাচ্চি এবং অনেকটা সত্য ব'লেও মনে লাগে যে বর্ত্তমান সাহিত্যে আর সেই জীবন প্রকাশ পাচ্চে না।

৮

যুগ ব'লে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করুন আর নাই করুন, যুগের এক একটা ভাবপ্রেরণা আকাশে বাতাসে বিদ্যুৎতরঙ্গের মত সঞ্চরণ করে, আর তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব। হেম বঙ্কিম নবীন তাঁদের ভাবপ্রেরণাকে অস্বীকার করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথও বর্ত্তমান যুগের বিশ্বতালে তাল রেখেই চলেচেন। তাঁর যুগের আশা নিরাশা আদর্শের কথা স্থান পেয়েচে, এবং নিতান্ত কোণ ঠাসা অবজ্ঞাত আত্মীয়ের মত নয়। তাঁর 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে' 'কথা ও কাহিনী' 'নৈবেদ্য' 'স্বদেশ ও সমাজ' তার পরিচয় চিরন্তন হয়েই আছে। তারপর যদি শরৎচন্দ্রের দিকে নেমে আসি তা হলেও তাঁর অনেকগুলি পুস্তকেই দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যে চিত্ত আলোড়িত হয়েচে তার প্রমাণ পাই। শরৎচন্দ্র নরনারীর প্রেম নিয়েই চরিত্র সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়েচেন, কিন্তু যে-সব চরিত্রকে তিনি আশ্রয় করেচেন তারা যে বর্ত্তমান কালের বাঙলা দেশের মানুষ, তাদের বুকে যে স্বদেশচিন্তার ছোঁয়াচ লেগেচে, তার প্রমাণ দিতে তিনি ভোলেন নি। 'পল্লীসমাজে', 'গৃহদাহে', 'পণ্ডিতমশাই' এবং 'দত্তায়,' 'শ্রীকান্তে' এবং সর্ব্বশেষ 'পথের দাবীতে' আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। কাব্যসাহিত্যেও অনেক কবিই অল্পাধিক পরিমাণে যে এই জাতীয়তার বাণীকে প্রকাশ করেন নি এ কথা বলা চলে না।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। সাহিত্য বস্তুটা ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ, সে কোনো দলের মনোভাবের প্রকাশ নয়। অবশ্য যদি কোনো বিশেষ দলের মনোভাব কোনো ব্যক্তিরও মনোভাব ব'লে প্রকাশ পায় তা হ'লে দলের মনোভাবও সাহিত্যে প্রকাশ পেতে পারে। সুতরাং কয়েকজন সাহিত্যিকের রচনায় যদি কোনো সময়ের বিশেষ কোনো ভাবপ্রেরণা প্রকাশ না পায় তা হ'লে সেই ভাবপ্রেরণাকে মিথ্যা বলা চলে না। তবে যখন দেশের বা সমাজের কোনো বিশিষ্ট ভাবপ্রকৃতি সেই সমাজের প্রতিভাশালী শিল্পী লেখকদের মাঝ দিয়ে আত্মপ্রকাশ না করে তখন সেই সমাজ এবং দেশসম্বন্ধে আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তাতে সেই সমাজজীবনে এমন একটা বিচ্ছেদ প্রমাণ হয় যা তার জীবনের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

একেবারে হালের যে-সাহিত্য, যাকে কেউ কেউ অতি-আধুনিক নাম দিয়েচেন, সেই সাহিত্যের মধ্যে নাগরিক জীবনের এই যে দুরূহ সাধনার দিক, মনুষ্যত্ব এবং স্বাদেশিকতার দিক, এটা প্রকাশ পায় নি এবং পাবার কোনো লক্ষণও নেই এমনি একটা আক্ষেপ আজ চতুর্দ্দিকে।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

৯

স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালী যুবক অগ্নিমন্ত্রের উপাসনা ক'রে তার দেশাত্মবোধের যে-পরিচয় দিয়েছিল, আজ সে-পরিচয় পূর্ব্বের চেয়ে ম্লান হয়ে গেছে এ কথা কেউ বলবে না। আজ বাঙালী যুবকের দেশসেবা আরো ধীরস্থিরভাবে দিকে দিকে প্রসারিত হ'য়ে চলেচে। অথচ দেশের হাল-ফ্যাসানের সাহিত্যে এই সব দুরূহ সাধনার সাধকদের চরিত্র এবং তাদের চিন্তা অনুভব আদর্শ স্থান পাচ্চে না এ কথাকেও মিথ্যা বলবার উপায় নেই। জানি দুচার জন সাহিত্যিক তাঁদের ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে বাঙালীর এই দেশ ও সমাজ সেবার আদর্শকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করচেন। কিন্তু যাঁদের প্রতিভা আছে, সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁদের আবির্ভাবে নতুন সৃষ্টির আশায় প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তাঁদের লেখনী জীবনের এই মহৎ সাধনার দিকে চালিত হচ্ছে না। হবে না কখনো, তাঁদের লেখনীর মুখে কখনো মানবতার গরিমাময়ী বাণী উচ্চারিত হবে না, তাঁদের দৃষ্টি কখনো বৃহৎ মানুষের সৃষ্টি করতে পারবে না, এমন কথা বলবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু এই অতি আধুনিক সাহিত্যে যে কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখকের দেখা পাওয়া যাচ্চে, তাঁদের অনুকরণে যে অগণিত নব-সাহিত্যিকের প্রাদুর্ভাব হচ্চে তাঁরা সাহিত্যের হাওয়াকে যে-ভাবের দ্বারা পূর্ণ করে তুলচেন তাতে আশঙ্কা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাঁরা শুধু নাগরিক জীবনের উচ্ছৃঙ্খল সমাজনীতি, নির্ম্মম ভোগময় জীবনের শিল্পরচনায় গা ঢেলে দিয়েচেন। সাহিত্যে আজ শুধু বিলাসিনী নাগরীর দেহ মনের লীলাই নানাছন্দে নানা বর্ণে রূপায়িত হয়ে উঠ্‌চে; কিন্তু প্রাণের দেউলে জীবন-সাধনার যে একটি ঘৃতদীপশিখা নীলাকাশের দিকে আপনার আরতি নিবেদন করচে তার একটি কিরণরেখাও এই সাহিত্যের উপর পড়বে না? শত শত বীর প্রাণের আত্মোৎসর্গ বাঙালী জীবনের যে মহিমা রচনা করচে, বাঙালী কল্প-সাহিত্যিকের দৃষ্টি কি তা দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হবে না?

বিশ্ব-বাঁধন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

বাঁধন মাঝে সূর্য্য চলে, চলে চন্দ্র তারা,
বাঁধন-ঘেরা তালের মাঝে নামে সুরের ধারা;
তাইত আমি আকাশ পানে অবাক্ হয়ে চাই
আকাশ-খোলা মুক্তি মাঝে মুক্তি নাহি পাই।
বুকের তলে রক্ত চলে থমকি শিরা সাথে,
হৃদয় ব্যথা ছন্দে বাঁধা কথায় কথা গাঁথে,
সাগর সাথে সুদূর পথে সাগর বাঁধা আছে,
চাঁদের টানে বাঁধন মেনে জোয়ার ভাটা নাচে।

রূপের সাথে চক্ষু বাঁধা, সুরের সাথে কান,
দেহের প্রতি ছন্দ মাঝে বদ্ধ আছে প্রাণ,
দুঃখ সাথে কি সঙ্গীতে বাজে সুখের বাঁশী
হাসির সাথে কান্না বাঁধা, কান্না সাথে হাসি।
যতই খুঁজি আমার মাঝে আমায় নাহি পাই
সবার যেথা আসন বাঁধা আমারো সেথা ঠাঁই,
কণার সাথে কণার মত বিশ্ব বাঁধা ভাই,
বিশ্বমাঝে কাহারে ছেড়ে কাহারো গতি নাই॥

বিধবা

—গল্প—

—শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

পুত্রের ভাগ্যগণনায় বরাহের ভুল হইয়াছিল, প্রতিবেশীর পুত্রের ভাগ্যগণনায় যে হরি দৈবজ্ঞের ভুল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। তাই তিনি যখন ছক কাটিয়া, শীর্ণ অঙ্গুলি নাড়িয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, "রাধু, তোমার এ ছেলে রাজা হবে, বড় শুভ লগ্নে জন্মেছে।" তখন রাধাকিশোর বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আঁতুড়-ঘরে সদ্যপ্রসূত সন্তানকে বুকে করিয়া জননী সুমিত্রার বুকটী দশ হাত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রাজা হইবার আশা দূরে যাক্, পুত্রের জন্মিবার বৎসর খানেকের ভিতর সুমিত্রাকে স্বামী হারাইয়া পল্লীগ্রামে নিঃসন্তান, বিপত্নীক ভ্রাতা চন্দ্রকুমারের আশ্রয় লইতে হইল, এবং সেই খানে বালক সন্তোষ নৃপতির ভাগ্য লইয়া চাষা বালকদের সহিত দিবারাত্র হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শুধু যে সে পড়াশুনার উপর বিরক্ত ছিল তা নয়, তাহার প্রকৃতির ভিতর এমন একটা উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা ছিল যাহার জন্য শুধু মাতাকে নয় সময়ে সময়ে মাতুলকেও প্রতিবেশীদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইত। বয়স প্রায় আঠার ছাড়াইতে চলিল, কিন্তু সে তাহার স্বেচ্ছাচারিতা এতটুকু কমাইল না। শেষে এক ভবঘুরে বেদের দলের সহিত মিশিয়া এমন সব কাণ্ড করিতে লাগিল যে চন্দ্রকুমার ও সুমিত্রার পাড়ায় মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভ্রাতা ভগ্নী এক নয় বৎসরের বালিকার সহিত সন্তোষের বিবাহ দিয়া দিলেন। কিন্তু ছেলেটা বুঝি একেবারেই বিগড়াইয়াছিল, বিবাহের দিন পনর বাদে সেই বেদের দলের সহিত দেশ ত্যাগ করিয়া পালাইল।

২

বাপ মা সাধ করিয়া নাম দিয়াছিলেন উমা। দরিদ্র [illegible] ঘরে সে যেন পার্ব্বতীর রূপ লইয়া জন্মিয়াছিল। বিবাহের পর কি যে হইল সে কিছুই বুঝে নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে যখন বুঝিল তখন দেখিল সে তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছে। সুমিত্রা তাহার দিকে চাহিতে পারেন না, চন্দ্রকুমার মনে মনে শিহরিয়া উঠেন, শুধু সেই বিরহভারাবনতা মূর্ত্তিমতী যৌবন-শ্রী বিশ্বদেবতার অনন্ত সৃষ্টির পানে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। আর বুঝি অনেক রাত্রে হৃদয়ের নিবিড় ব্যথার ভারে আকুল হইয়া "মা গো" বলিয়া শাশুড়ীর বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

এমনি করিয়া দিন যায়। গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে; আকাশ ফাটাইয়া, পৃথিবীর বুকের উপর ঝড় জলের উদ্দাম তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে; শুধু দীন পল্লীর কুটীরের ভিতর তিনটী প্রাণী নিদ্রাহীন রজনী কাটাইয়া দেয়। হয়ত ঝড়ে কুটীরের অনেকটা নড়িয়া উঠিল, অমনি সুমিত্রা বধূকে জাগাইয়া বলেন—"বৌমা দেখত, বুঝি সন্তোষের গলা।" বধূ তড়িৎ গতিতে দীপ জ্বালে, দুয়ার খোলে, কেহ কোথাও নাই। শুধু সম্মুখে দিগন্তব্যাপী নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া ঝড়ো হাওয়া কুটীরের অধিবাসীদের ত্রস্ত করিয়া দেয়, জলের ঝাপটে বধূর ঘন-কৃষ্ণ কেশরাশ ভিজিয়া যায়।

আবার বর্ষা যায়, বসন্ত আসে, কৃষ্ণচূড়ার বনে রঙের আগুন লাগিয়া যায়, কি এক অজানা পুলকে উমার তরুণী-হৃদয় নাচিয়া উঠে, হয়ত অপরাহ্ণ কালে পুকুর ঘাট হইতে জল লইয়া আসিবার সময় পাড়ার দুষ্ট যুবক মোহিতের দিকে কটাক্ষ করিয়া হাসে, বুকের কাপড় সংযত করিয়া ত্রস্ত পদে পালায়।

ইহাও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সুমিত্রার দৃষ্টি এড়াইত না। তিনি বধূকে কাছে কাছে রাখিতেন, আর সকাল সন্ধ্যা তাহাকে সাবিত্রী-কথা শুনাইতেন। উমা অবাক হইয়া শুনিতে শুনিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, "হ্যাঁ, মা! সাবিত্রীর

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্বামী কতদিন বেঁচেছিল ?" সুমিত্রা শিহরিয়া উঠিতেন। কতবার তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিতেন, "মাগো, সন্তোষ ফেরে না ফেরে তোর ইচ্ছে, কিন্তু আমার বৌমাকে সুমতি দে মা।"

৩

ক্রমশঃ উমা ও মোহিতের হাসি-বিনিময়ের ব্যাপারটা এতই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে সেদিন সন্ধ্যায় গুপী মুখুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ফিরিয়া নির্ব্বিবাদী চন্দ্রকুমার একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সুমিত্রাকে বলিলেন—"এর ত একটা বিহিত করতে হয় সুমী, পাড়ার লোকের নিন্দেয় ত আর কান পাতা যায় না!"

কথাটা নানাভাবে সুমিত্রার কানেও গিয়াছিল, কিন্তু পুত্রের অদর্শন-ব্যথা তিনি এই বধূটীকে পাইয়া ভুলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উমাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বোধ করি বেশী ভালবাসিতেন; তাই নিরুপায়ের মত বলিলেন—"সবই ত বুঝছি দাদা, শেষে যে একটা কি কাণ্ড হবে তাও জানি না। পোড়াকপালীকে দেখলেও যে চোখের জল রাখতে পারি নে।"

চন্দ্রকুমার আজ ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন, তাই অধীর হইয়া কহিলেন—"তোর ঐ এক কথা বোন্। যে বিধবাই হ'ল তাকে তুই সধবার মত মাছ মাংস খাওয়াচ্ছিস্। হিঁদুর মেয়ে এতটুকু শাসন ধর্ম্ম মেনে চলবে না?"

সুমিত্রার চোখে জল আসিয়াছিল। তিনি গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "ও কথা বোলো না দাদা, আমার সন্তোষ হয়ত একদিন ফিরবে, তখন আমি তার কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?"

চন্দ্রকুমার একটু ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন—"একদিন, একদিন ক'রে বারোটা বছরও ত কেটে গেল দিদি, আমি বলি কি—প্রয়াগে চল্—সেখানে গিয়ে কুশ-মূর্ত্তি দাহ ক'রে শ্রাদ্ধ-শান্তি ক'রে, মেয়েটার পরকালের কাজ ক'রে দে বোন্। যে গেছে সেত গেছেই, তা ব'লে রাধাকিশোরের অত বড় বংশে কি শেষে একটা কালি পড়বে।"

সুমিত্রা ভাবিলেন। পুত্রের আশায় আশায় থাকিয়া তিনি যেন এতদিন পাগলের মত হইয়া ছিলেন। আজ যখন ধার্ম্মিক ভ্রাতার কঠোর অনুশাসনে আশার শেষ রশ্মিটুকুও নিভাইয়া দিতে হইল, তখন তাঁহার নূতন করিয়া পুত্রশোক জাগিয়া উঠিলেও একটা দুশ্চিন্তার প্রচণ্ডভার যেন মন হইতে নামিয়া গেল। পবিত্রচেতা নারী কতদিন মনে মনে ভাবিয়াছেন বধূর এই উচ্ছৃঙ্খলতা কি করিয়া কমাইবেন, আজ যেন এই কঠোর কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার পবিত্র শ্বশুরকুলকে একটা মহা কলঙ্কের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিলেন। সেদিন রাত্রে উমার দীর্ঘ কেশগুলির ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে তিনি আবেগে তাহার মুখে একটা চুমা দিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার মন ভেঙে যাচ্ছে মা, তবে এই আশীর্ব্বাদ করি যেন তোর শ্বশুরবাড়ীর মানটা বজায় রাখতে পারিস।"

৪

ইঁহাদের প্রয়াগ হইতে ফিরিবার দিন পাঁচেক বাদে একদিন সকালে চন্দ্রকুমার একটু সঙ্কুচিত ভাবে সুমিত্রাকে বলিলেন—"শুনেছি সহরে ক'দিন থেকে যে বড়লোকটী তাঁবু ফেলে বাস করছেন, সে নাকি আমাদেরই সন্তোষ,—আজ তোদের নিতে আসবে ব'লে খবর পাঠিয়েছে।"

সুমিত্রা শুনিয়া বিমূঢ় ভাবে একবার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর বধূর কথা ভাবিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। উমা ছুটিয়া আসিল। মুণ্ডিত-কেশিনী, নিরাভরণা, শুক্লাম্বরা। সদ্য-বিধবার একটা মর্ম্মভেদী শুচিতা তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কান্না থামিলে সুমিত্রা বধূকে বুকের কাছে লইয়া কহিলেন, "এ মুখ কেমন ক'রে দেখাবি মা?

উমা চিরদিন চঞ্চলা, কিন্তু প্রয়াগের জাহ্নবী-তটে সে যেন জীবনের সমস্ত সাধ, সমস্ত চপলতা, তাহার দীর্ঘ ঘন কেশজালের সহিত বিসর্জ্জন দিয়া পাষাণীর মত নির্ম্মম হইয়া আসিয়াছিল,—তাই ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—"ঘরের ছেলে ঘরে এসেছেন তাকে আদর করে বুকে নিন মা, দুঃখ কি।"

সুমিত্রা অশ্রুমাখা কণ্ঠে কহিলেন—"আর তুই।" উমা কথা বলিল না, উঠিয়া গেল।

কেমন করিয়া দীর্ঘ কালের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া গৃহছাড়া সন্তোষ প্রভৃত অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিল, সে কথা নাই বলিলাম ; তবে তাহার মনের মধ্যে যে একটী ক্ষুদ্র বালিকার সরমভরা মুখ আঁকিয়া গিয়াছিল তাহা বুঝি সে ভুলিতে পারে নাই।

দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবা—জীবন-সংগ্রামে জয়ী, হৃষ্টমনা বীর। মাতার মরুহৃদয়ে আবার স্নেহের বন্যা জাগিয়া উঠিল, মাতুলের দীন সংসার লক্ষ্মীর সস্নেহ দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইল, শুধু সাড়া পড়িল না স্ত্রী উমার হৃদয়ে। প্রয়াগ যাত্রার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে যে একটা অফুরন্ত যৌবন-প্রবাহ লীলাচঞ্চল গতি লইয়া বিদ্যমান ছিল, গঙ্গা-তীরে পলাতক স্বামীর উদ্দেশে পিণ্ডদানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। একদিন সুকুমার মোহিতের দর্শন লাভের জন্য তার তৃষিত চোখদুটা মরুর সুধা বহিয়া বেড়াইত, পুরুষের স্পর্শ পাইবার জন্য তাহার সমস্ত শিরা উপশিরার ভিতর উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করিত, আজ যেন সেই নারী প্রকৃতি এই গৌরবর্ণ সুকুমারতনু পুরুষটীকে স্বামী রূপে দেখিতে গিয়া ঘৃণায় লজ্জায় একেবারে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখের সঞ্চিত পবিত্রতা যেন সদর্পে বলিয়া উঠিল—"আমি বিধবা, চিরদিনের মত জাহ্নবী-তটে মাথার চুল, নোয়া, সিঁদুর সব বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি।"

তাই সেইদিন অপরাহ্ণে যখন সে সন্তোষের পায়ের কাছে ভক্তিভরে প্রণাম করিল, তখন মুগ্ধ যুবক উদ্‌ভ্রান্তের মত, সেই সদ্যবিধবার মূর্ত্তি দেখিয়া আবেগে বলিয়া উঠিল—"আর একটা মাস সবুর সইল না উমা, একি করলে বলত।" বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে, সাদরে উমাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইতে গেল। কিন্তু সামনে সাপ দেখিলে যেমন লোকে পিছাইয়া যায় তেমনি একটা দারুণ আতঙ্কে ও উত্তেজনায় দূরে সরিয়া গিয়া পরম মিনতি ভরে উমা কহিল—

"ওগো, আমি যে বিধবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও।"

বর্ষার আয়োজন

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

থেকে থেকে চমকি যায় মন,
বর্ষা নাই তার রয়েছে আয়োজন।
আকাশ ছেয়ে আছে গভীর কালো মেঘে
যেন সে চেয়ে আছে স্বপ্ন মাঝে জেগে!
সকলি হেরি ম্লান চক্ষু আসে ভরে,
চাতক উঠে ডাকি, বক্ষ হাহা করে!
দুয়ার খুলে রেখে বসিনু তারি পাশে,
ওধারে ঢেকে গেছে সবুজ ঘন ঘাসে ;
একটি পাশে জমি এসেছে নীচু নেমে,
সকাল হতে জল রয়েছে থেমে থেমে।
আকাশ কালো হল গভীর ব্যথা লয়ে,
তাহারি ছায়া জলে পড়িল কালো হয়ে।
অশথ তলে গরু গোয়ালা গেল বেঁধে,
বাছুর কোথা ওর ফিরিছে কেঁদে কেঁদে।
একটি ফল লয়ে বসিয়া মুখোমুখি
সালিক দুটো শুধু করিছে ঠোকাঠুকি।
বধূর মত ঐ মাধবী লতা যত
কাঁপিয়া উঠে লাজে করিছে মাথা নত।
সুপুরি বনে দেখি দখিন বায়ু ছোটে,
বিশাল পাতাগুলি উপরে নেচে ওঠে।
কচুর গাছগুলি জলের বুকে বুকে
দুধারে হেলে হেলে পড়িছে ঝুঁকে ঝুঁকে।
মলিন রঙে আজ মেলেছে নব মায়া
আমার বুকে তার পড়েছে ঘন ছায়া

বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল ও অতীন্দ্রিয়বাদ

শ্রীমতী আশালতা দেবী

সেদিন 'মডার্ণ রিভিউ'তে বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সহিত কথোপকথন সূত্রে গুটিকতক মতামত প্রকাশ হয়েছে। লেখা পড়ে বোধ হ'ল তিনি সম্প্রতি সংশয়ী হ'য়ে পড়েছেন। এ মনোভাব দ্বারা আজকাল অধিকাংশ চিন্তাশীলের চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিন্তার মাঝে একটু cynicism'র আভাস এসে পড়েছে। জীবনের অসাম্য, অবিচার এবং সর্ব্বোপরি তার সুবিপুল রহস্য চিন্তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। মানুষ কত আশা করে, কত কার্য্যকারণ নির্ণয় পরিসূক্ষ্মভাবে শেষ করে এবং পরক্ষণে তার কল্পনা, সিদ্ধান্ত, অনুমান চূর্ণ হয়ে যায়। মনে হয় cynicism'র সোজা অর্থ প্রকাশ পায় জীবনকে নিরাসক্ত ভাবে দেখবার প্রবৃত্তিতে—সে যা তাই, তাকে ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করা এবং কোন কারণেই কোন 'আইডিয়া'র বাষ্পে তাকে আচ্ছন্ন না করে ফেলা।

পৃথিবীতে অনেক অসংলগ্নতা, হৃদয়হীনতায় মানুষ আত্মহারা হয়। 'আইডিয়া' দিয়ে, 'থিওরি' গ'ড়ে সুদূর ভবিষ্যৎকে কল্পলোকে গঠিত করে; অন্ততঃ চিন্তাজগতেও সে গুরুভার লাঘবের চেষ্টা করে। বেশ ত করে, কিন্তু বিক্ষুব্ধ এবং আকুল হলেই সত্যের ত লেশমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটবে না। সমবেদনা দিয়ে হৃদয়াবেগ দিয়ে তাকে ভিন্ন প্রতিপন্ন করতে গিয়ে লাভ নেই। কঠোর এবং অসুন্দর সত্যের সঙ্গে এক দিন ত মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতেই হবে।

Cynicism মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, অনাসক্ত করে। যৌবনের পরিপূর্ণ আবেগ যখন চলে যায়, নিজের দুর্ব্বলতা সে টের পায়। নিজেকে নিয়ে এবং পৃথিবীর ভালোমন্দ নিয়ে আবিষ্ট হ'য়ে থাকবার সময় কেটে যায়। মানুষ কত দুর্ব্বল, অজানা দিক এখনো তার কত বাকী, এ সে বোঝে। প্রতিদিন যাপনের বেদনা একটু একটু ক'রে আবেশের বাষ্পমণ্ডল বিদীর্ণ ক'রে দেয়। তাই অসাম্য, বীভৎসতা দেখে পূর্ব্বে যখন সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত, ঘৃণায় আকণ্ঠ ভ'রে যেত, এখন সে স্থানে তার অধরে স্মিত-করুণ হাস্য ফুটে উঠে। Cynicism যে পৃথিবীর কোন কিছুই বিশ্বাস করে না তাত নয়। সৌন্দর্য্য, প্রেম, চিন্তা, এ সমস্তর উপর তার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু কোন বস্তুর চরম সার্থকতা এবং অপৌরুষেয় সত্য নিয়ে সে উত্তেজিত হয় না। নিরতিশয় প্রবল আসক্তির অভাব এবং পরিবিচ্ছিন্নতা তার প্রধান আকর্ষণ।

এ অবধি সংশয়প্রিয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা গেল। জীবন নিয়ে মানুষ যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে তখনই যে সে সব চেয়ে বেশী উপভোগ করে এ বলা শক্ত। কিন্তু যাঁরা বিশ্লেষণশীল এবং সংশয়বাদী তাঁদের কি mysticism'র উপর অনুরাগ থাকতে নেই? mystic religiousদের বিরুদ্ধে রাসেলের অভিযোগ যে তাঁরা সমস্ত জিনিষের অন্তর্নিহিত আইডিয়াকে খুঁজতে বসেন। নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার না করেও, সাধারণ ঘটনার দিক থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যে আনন্দ পাওয়া যায় সে দিকটা তাঁরা বাদ দিয়েছেন। * এর দ্বারা হয়ত রহস্যময় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু সে একান্তই ব্যক্তিগত বস্তু হয়ে ওঠে, সর্ব্বমানবের চিরন্তন অনুভবের দিক থেকে সে আপনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে।

সব বস্তুর মাঝেই যে একটা কিছু সংগোপনে রয়েছে, এই মনোভাব প্রবল হয়ে উঠলে সৌন্দর্য্য অনুভবের ক্ষেত্রে অনেক বাধা ঘটে। সমস্ত জিনিষের একটা একান্ত নিজস্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রয়েছে, যদি সে আর কিছু প্রকাশ নাও করে, কোন গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য আপনার মধ্যে নিহিত না ক'রেও রাখে, তবু সে যা তা-ই; সেইটুকুর জন্যই আমাদের আনন্দে ও শ্রদ্ধায় অবনত হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে জগতের যে অজস্র সৌন্দর্য্যস্রোত জীবনমূলে কম্পন তোলে, সে যদি কেবল সৌন্দর্য্যপ্রকাশের মধ্যেই পরিসমাপ্ত

হয়, কোন সুদূর সত্যকে অথবা গভীর উদ্দেশ্যকে ইঙ্গিত না করে, তথাপি তার মূল্য লেশমাত্র কমে না। সকাল বেলা ফুলের উপর শিশিরবিন্দু দেখে যদি আমরা আনন্দ পাই, অথচ তার মধ্যে বিশ্বের কোন গোপন রহস্যের প্রতিবিম্ব না দেখি, বৃন্তের মুখে সে ফুটে উঠেছে কিছুকাল পরে ঝরে যাবে, এই ছোট ঘটনাটির মধ্যে পৃথিবীর অনাদি কালের কোন নিয়মের পুনরাবর্ত্তন অনুভব নাই করি, ছোট্ট ফুল এবং একান্ত পার্থিব ক্ষণকালের তৃপ্তি এইটেই যদি বড় হয়ে ওঠে, সে আনন্দকে লেশমাত্র কমিয়ে দেখতে পারিনে। জীবনের outlook যে কেবলি তাৎপর্য্যশীল হয়ে উঠবে এবং স্তূপীকৃত তথ্যে সহজ আনন্দোপলব্ধির পথ আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে এইটে ভাল বোধ হয় না, এবং সমস্ত বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য বার করব এ মনোভাবও ভাল লাগে না। পৃথিবীর বস্তুব্যাপারকে অগ্রাহ্য ক'রে কেবল তার নিহিত 'আইডিয়া' নিয়ে যাঁরা চলাফেরা করেন তাঁরা হয়ত গভীর আনন্দ পান, কিন্তু তাকেই সর্ব্বাঙ্গীণ ব'লে মনে করতে পারিনে। অত্যন্ত ছোটখাট ঘটনায়, বাক্যে, ব্যবহারে যে অপরিসীম সৌন্দর্য্য রয়েছে, গুটিকতক 'আইডিয়ার' দ্বারা জীবন সম্বন্ধে এত অনিবার্য্য কৌতূহল নিবৃত্ত হ'তে পারে না। তাকে এত দিক থেকে দেখা যায়, বাস্তবের মধ্যেই তার এত অশেষ বৈচিত্র্যবহুল সমস্যা রয়েছে; জীবন থেকে এই অংশটাকে বাদ দিতে কষ্ট হয়।

কিন্তু সমস্ত স্বীকারোক্তির পরও একটা কথা বাকী থাকে। সাধারণ বস্তু থেকে তার অনিবার্য্য স্বাভাবিক আনন্দ ছাড়া আর কি কিছু আমরা পাই না? বাইরের প্রকাশটাই ত সব পরিচয় উন্মুক্ত ক'রে দেখায় না। তাদের ভিতর যে রহস্য সত্য গোপনে রয়েছে, তাকে উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা কি ছোট জিনিষ? তার চারিদিকে আমাদের অশ্রান্ত কল্পনা কি একটি বিশাল অবকাশ রচনা ক'রে দেয় না? এ যদি আমরা পণ ক'রে বসতুম—কথা কেবল অর্থ দিয়ে যতটুকু প্রকাশ করে তার চেয়ে বেশী ক'রে আমরা বুঝব না; তার মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয়তা রয়েছে, যে স্পষ্ট ক'রে বলে না কিছু, অসমাপ্ত ইঙ্গিত রেখে যায় এবং এই অসমাপ্ত ইঙ্গিতের মধ্যেই তার বৃহত্তের আভাস পাওয়া যায়, এ সমস্তই চোখ বুজে অস্বীকার করব; মানুষ বাক্যে ব্যবহারে আপনার যেটুকু সপ্রমাণ করে তাকে অতিক্রম ক'রে তার অপরিমেয় রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করব না; অস্তিত্বের সহিত ব্যক্তিত্বের যে অংশ অব্যক্তভাবে বিকীর্ণ হয়, যার মাঝে হয়ত মানুষের সব চেয়ে সত্য পরিচয় নিহিত হয়ে রয়েছে তাকে উপেক্ষা করব;—এ যদি করতে বস্‌তাম জীবনের অনেক মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর রহস্য বুদ্ধি দিয়ে যতটা জেনেছি তারই মধ্যে সে আবদ্ধ নেই। সে সঙ্কীর্ণ প্রাচীর বিদীর্ণ ক'রে তার অসীমতা, তার লোকলোকান্তরপূর্ণ মৌনরহস্য, তাকে অতিক্রম ক'রে বহুদূর চ'লে গিয়েছে।

আমার মনে হয় সমস্তপ্রকার সৌন্দর্য্যই প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে মর্ম্মমূলে আঘাত করে। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে যারা অত্যন্ত নিবিড় ভাবে অনুভব করে না অতীন্দ্রিয় জগতে তারা পৌঁছবে কেমন ক'রে? অনুভবশক্তি যার সুতীক্ষ্ণ ও সক্রিয় নয়, অননুভূত আনন্দের রাজ্যের আভাস সে পাবে কি ক'রে? কথার মধ্যকার ঝঙ্কার, ধ্বনিমাধুর্য্য, অর্থবোধ, সঙ্গতিজ্ঞান যে নিরতিশয় স্পষ্ট ক'রে বোঝে না, অনির্ব্বচনীয়তার রসাস্বাদন তাকে দিয়ে কেমন ক'রে সম্ভব হয়! ছোটখাট জিনিষের থেকে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ খোঁজে না সেই বা কি ক'রে বস্তুকে অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর অস্ফুট অপার রহস্যের সন্ধান পাবে? ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ভাল গান শোনার পর, সূর্য্যাস্ত দেখার পর, ভাল বই পড়ার পর মনে একটা সকরুণ প্রশান্তি ব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে। সব গভীর আনন্দোপলব্ধির পর ঐ রকম একটা কম্পন ওঠে যে স্থানে আনন্দের তীব্রতা রহস্যে সুকুমার এবং করুণতায় আর্দ্র হয়। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই পেয়েছি ব'লেই যে সে আপনাকে আরও গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে না, এ কে বলতে পারে? আমি শুধু এই বলতে চাই, ইন্দ্রিয়লব্ধ আনন্দের উপর যদি আমাদের কোন আকর্ষণ থাকে তার জন্য অতীন্দ্রিয় এবং সর্ব্বব্যাপ্ত আনন্দকে ছোট প্রমাণ করতে চেয়ে নিগ্রহ করতে যেয়ে কোন লাভ নেই। একটার মধ্য দিয়েই আমরা আর একটাকে পেতে পারি।

শ্রীমতী আশালতা দেবী

রাসেল Mystic religious দের প্রতি যত শক্ত কথা বলুন, তাঁর রচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায় রহস্যবাদের সুদূর স্নিগ্ধছায়া তার উপর এসে পড়েছে। হয়ত সে সর্ব্বত্র উজ্জ্বল নয়, কিন্তু তাঁর প্রসারিত চিন্তারাজ্যে তারও অপরিদৃশ্যভাবে স্থান রয়েছে। সে সমস্ত স্থানই লিখতে বসা সম্ভব নয়, দু একটি বিচ্ছিন্ন সুমধুর অংশ উদ্ধৃত হল।

"And deeper than all these lies the sense of a mystery half revealed, of a hidden wisdom and glory, of a transfiguring vision in which common things lose their solid importance and become a thin veil behind which the ultimate truth of the world is dimly seen. It is such feelings that are the sources of religion, and if they were to die most of what is best in us would vanish out of life."

......"He sees in his moments of insight that in all human beings there is something deserving of love, something mysterious, something appealing, a cry out of the night, a groping journey and a possible victory."

Principles of Social Reconstruction—Russel.

"There is a sacrednees, an overpowering awe, a feeling of the vastness, the depth, the inexhaustible mystery of existence in which by some strange marriage of pain the sufferer is bound to the world by bonds of sorrow." A Free-man's Worship—Mysticism & Logic—Russel.

রাসেল বলেন বিজ্ঞানের যত গুণ রয়েছে কোনটাই তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু Scientific outlook যাকে বলা হয়—সর্ব্বপ্রকার আবেগশূন্য হ'য়ে সত্যকে পাবার চেষ্টা করা বিজ্ঞানের প্রভাব এইখানে সবচেয়ে বেশি। জীবনকে অতিক্রম ক'রে বৈজ্ঞানিক জীবন-রহস্যের সন্ধান করেন এবং জীবনকে বুঝবার জন্যই তার থেকে নিজেকে পরিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছেন।

"Through a too confident love of life, life itself should lose much of what gives it its highest worth." Mysticism & Logic—Russel.

অনেকে মনে করেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক গণিতবিদ্, যাঁদের মধ্যে এই আবেগহীন দৃষ্টি বিশেষ ক'রে বদ্ধমূল হয়েছে, Mysticism তাঁদের কোন প্রকারেই আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু পারে না যে সেটা আমরা ধ'রে নিয়েছি। জীবনস্তর বিদ্ধ ক'রে তাঁরা তার নিবিড় অর্থ বুঝতে চান। সাধারণ লোক যেমন ক'রে গুটিকতক সত্য ধ'রে নিয়ে এবং মেনে নিয়ে দিনযাপন করে সে ভাবে তাঁরা থাকতে পারেন না। জীবনের উপরি-ভাগের কুয়াশা বিদীর্ণ ক'রে বুঝতে চান। হোক না সে বিজ্ঞানের সত্য এবং গণিতের সত্য, কিন্তু ধ্যানলব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রথমে একটা অপরিস্ফুট কল্পনার প্রতিচ্ছবি কি ছিল না? শুধু কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাকে বাদ দেবার উপায় নেই। সম্মুখে একটা সত্যের আভাস অপরিদৃশ্য ভাবে থাকে, কেন থাকে বলা কঠিন। সমস্ত বাহ্যবস্তু থেকে মনকে প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে একটি বস্তুর প্রতি ধ্যানবদ্ধভাবে স্থাপিত করলে সত্যের ছবি অকস্মাৎ স্খলিত আবরণে ভাস্বর হয়ে ওঠে। একপ্রকার তন্ময়তার মাঝে সত্যের প্রতিবিম্ব প্রথমে পড়ে। তারপর বুদ্ধি, যুক্তি, গবেষণার দ্বারা সে ধীরে ধীরে সুসংহত ভাবে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

উচ্চ গণিতের মৌন সুগভীর সৌন্দর্য্যের মাঝে আবেগ কি একেবারে নেই? সে অত্যন্ত স্তব্ধ, বাইরের প্রকাশ তার লীলাচঞ্চল নয়, তাই হয়ত অনেককে বিচলিত করে না; কিন্তু যখন করে তখন তার নিঃশব্দ বেগ অত্যন্ত সজোরে আঘাত দেয়। সে পরিশুষ্ক নয়, কেবলই যুক্তির দ্বারা এবং গণনার দ্বারা আকীর্ণ নয়,—তার মাঝেও রহস্যাবেশ এবং নিরতিশয় আবেগ রয়েছে।

"I mean the inexpugnable belief that every detailed occurrence can be correlated with its antecedents in a perfectly definite manner, exemplifying general principles; without this belief the incredible labours of scientists would

be without hope. It is this instinctive conviction, which is the motive power of research, that there is a secret, a secret which can be unveiled." Science & the Modern World. A. N. Whitehead.

রাসেল যেখানে লিখেছেন বিজ্ঞানের হাতে জন্মনির্ব্বাচনের এবং নিয়ন্ত্রিত করার ভার ছেড়ে দিলে বহুদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের উন্নতি আজ এবং এখনি মানব জাতি আশা করতে পারে, সেখানে তিনি সর্ব্বপ্রকার রহস্য এবং অব্যক্ত দিক পরিষ্কার ক'রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে মানুষকে দেখেছেন। এদিক থেকে উন্নতি নিঃসংশয়িত, কিন্তু তত্রাচ এইটেই শেষ কথা নয়। Heredity, Electron, Telepathy, Psychic Phenomena বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দ্বারে কি রহস্যের বার্ত্তা আনেনি? রহস্যের অস্তিত্বের অনুভব ছাড়া অনুসন্ধানের কাজ অগ্রসর হয় কি ক'রে? এই যাত্রাপথ কি বিস্তর রহস্যে ছায়াবৃত নয়? সত্যকে খুঁজবার ধরণ বিচ্ছিন্ন, যুক্তিবদ্ধ সুশৃঙ্খলিত হতে পারে;—কিন্তু কেবলই Scientific method, Scientific outlook কি সত্যের কাছে পৌঁছেচে, না সে কোন-কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

গঙ্গার উপর চাঁদের আলো পড়েছে এবং বহুদূরে অস্পষ্ট বনরেখা—জ্যোৎস্নানিষিক্ত। তাকে দেখেছি, বিমুগ্ধ হয়েছি। প্রকৃতি আমাদের সৌন্দর্য্যাকুল করে, কিন্তু তার সবটা কি শোভন দৃশ্য? বিশ্ববস্তুর অন্তরাল ছিন্ন ক'রে আর কোনও গভীর রহস্যের প্রতিচ্ছায়া কি পড়ে না? গঙ্গার পরপারে বিলীনপ্রায় তটভূমি নিঃশব্দ চন্দ্রালোকে যখন চোখে পড়ে' জীবন-রহস্যের সহিত তার কি কোন সাদৃশ্য অনুভব করি না? আকাশের ছায়াপথ, নক্ষত্রের প্রাণোত্তপ্ত স্পন্দন, তার নিবিড় রহস্য যে অনুভব করতে পারে, তার জন্য astronomy সূক্ষ্মভাবে জানার কিই বা প্রয়োজন?

পৃথিবীতে একটিমাত্র দৃষ্টিপাতে, অধরের একটিমাত্র রেখার কম্পনে যে অপরিসীম রহস্য রয়েছে তার কতটুকু আমরা জানি? একটিমাত্র চিত্তের শেষপ্রান্ত অবধি কে [illegible] করেছে? মানুষ বিজ্ঞানতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নয়। জীবনের সহিত তার নিভৃত গ্রন্থি এ সমস্তকেই অতিক্রম ক'রে রয়েছে, তার মনে কত নিগূঢ় স্রোতঃপথ, কত অপরিস্ফুট অঙ্কুর! সাধারণ মানুষকে আমরা অকিঞ্চিৎকর ভেবে এসেছি, কিন্তু স্নেহের আলোকপাতে তারও রহস্যের অসীমতা উন্মুক্ত হ'য়ে চোখে পড়ে। ভালবাসায় ব্যক্তিত্বের সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় এবং তখনই তুচ্ছের মাঝে বৃহতের আভাস অনুভব করতে পারি, এবং একটি প্রিয়চিত্তের প্রকাশকে বহুতর বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নূতন ক'রে বুঝবার অবকাশ ঘটে। মানুষকে আমি নিশ্চয় ক'রে জানিনে, সেইখানেই ত কল্পনার অনবসর বিকাশ এবং সেই অবকাশ পরিধির মধ্যেই যত সৌকুমার্য্য এবং সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিস্থান। স্নেহাস্পদের ভিতর আমি সৃষ্টির আনন্দ পাই, যদি বা সে কল্পনা হয় এবং যদিচ তার অনেক অংশ আমারই আরোপ করা হয় তথাপি আনন্দের ত লেশমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। মনোরহস্যের কূলরেখা চোখে পড়ে না; সে দিগন্তলীন, তাই সেখানে মানবচিত্তের এত সুকুমার আশা, শঙ্কা, আবেগ স্পন্দিত কম্পন উদ্বেল হ'য়ে আছে। মানুষের পরিশ্রান্ত কীর্ত্তি বিশাল রহস্যপ্রাঙ্গণে এসে স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

অশ্রুপ্লুত আষাঢ়ের কর্ম্মহীন দিন এই কারণে চিরকাল আমাদের অভিভূত করেছে। সেই দিনটিতে বিশেষ কিছু লাভ করি যে তা নয়। বিশ্বপ্রকৃতির উপর আনত অন্ধকার—সেই আমাদের আনন্দাকুল করেছে। এমন অনেক কথা আছে বাহিরে প্রাঞ্জল ক'রে অর্থ না বুঝলেও শুধু তাকে কল্পনায় স্পর্শ করতে ভাল লাগে। নিটশের—"Oh, peace in uncertainty" (Thus spake Zarathustra) একটি ছোট লাইন। যদি কেহ বলেন ইহার অর্থ হয় না, তার প্রতিবাদ করা কঠিন; কিন্তু মনে হয় এই ছোট কথাটি সঙ্গীতের মত সুকুমার। এমনি আর একটি কথা সেদিনচোখে পড়ল;—তাকে তার চারিদিকের অর্থবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে কেবল উচ্চারণের মধ্যেও নিবিড় মোহ আছে।

"চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্পসুগন্ধি বনান্ত হইতে আহ্বান আসিল—কোন ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।" পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীমতী আশালতা দেবী

ছায়াবিতানে কেহই প্রতীক্ষা ক'রে নেই। তবু মানুষের মধ্যে কল্পনাপ্রিয়, রহস্যপ্রিয় যে শিশু রয়েছে, সে কল্পনা ক'রে বিমুগ্ধ হয়। একে কাব্যকুয়াশা বললে ভুল করা হয়; রহস্যেরদাবী মনের উপর রয়েছে, তাকে কোন কারণেই উপেক্ষা করা যায় না। বিজ্ঞান বিশ্ববিধান মাঝে যে অখণ্ড নিয়মকে প্রকাশ করেছে, কবিচিত্ত তারই কাছে শ্রদ্ধায় আনন্দে আপ্লুত হয়।

মানুষের পক্ষে একটি ভিত্তিভূমি প্রয়োজন; অগাধ পরিশূন্য লোকে সে কাজ করতে পারে না। Mysticism তার এই স্থির আশ্রয়। সম্মুখে অজানা রহস্য রয়েছে এই দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে সে কাজ করে। আছে যে, একথা ত সপ্রমাণ করবার আবশ্যক হয়নি,—কিন্তু যেমন ক'রে হোক, এ বিশ্বাস তার মনে স্থান পেয়েছে। মানুষের জন্মের পূর্ব্বকাল আবৃত এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী কাল অজানিত, তাই তার ক্ষণিক জীবন এই রহস্যস্রোতের মাঝে স্থিতিলাভ করেছে এবং এই-জন্য তার চেষ্টার, সহিষ্ণুতার, সত্যানুসন্ধানের আজও অবধি নেই। দুঃখকে অতিক্রম ক'রে সে অমৃত কামনা করেছে এবং তার অস্তিত্বের অশেষ প্রকার ব্যথা বিদীর্ণ ক'রে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ববস্তুর সমস্তই মায়া কি না জানি না, কিন্তু তার একটি মাত্র শিশিরার্দ্র পল্লবপ্রান্তে এত অধিক রহস্য কেমন ক'রে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে? আকাশের সুদূরতম ছায়াপথ, পথপার্শ্বস্থ সুপরিচিত ফুলসৌরভ, একটি অনির্ব্বচনীয় স্নেহস্বর সব সময় ত মনে রাখিনে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে জীবনের মাঝে কি তারা মাধুর্য্যের সঞ্চার করে না? 'Cynicism'র সহিত রহস্যবাদ কেন নির্ব্বিবাদে স্থান পাবে না? মানুষের সম্বন্ধে, পৃথিবীর সম্বন্ধে মোহজাল রচনা করবার প্রবৃত্তি নেই। সে যা তাই, তাকে সেই ভাবে দেখেছি। কিন্তু তাই ব'লে মানুষকে কি মানুষ কম ভালবাসে? অস্তিত্বের অপরিসীম বেদনা, সেই ত তার দৃঢ়তম বন্ধন। চিন্তাবেগের মাঝে মানুষকে মানুষ যখন অনুভব করে, তখনও সে কি সহযাত্রীর দোষগুণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে বসে? ভাগ্যের নির্ম্মমতা, মৃত্যুর সুনিশ্চয়তা, পৃথিবীর অশেষ প্রকার দুঃখদৈন্য—এইখানে তারা একই বন্ধনে সব চেয়ে বেশী ক'রে মিলেছে। মানবাত্মার উপর এইটুকু রহস্যবিমিশ্রিত শ্রদ্ধা না থাকলে মানুষকে আমরা ভালবাসতে পারতাম না, জীবনের অনেক সৌন্দর্য্যই নির্ব্বাসন লাভ করত। জীবনের মাঝে রহস্যের এই মৃদু এবং রমণীয় স্পর্শকে কোন কারণেই উপেক্ষা করতে পারিনে। বিশ্বমানবের পরস্পরের প্রতি নিবিড় সমবেদনার মাঝে অনুরাগের মাঝে Mysticism আশ্রয় ক'রে নিয়েছে। রাসেল মানুষের দুঃখকে নিবিড় ভাবে অনুভব করেছেন তাই তাঁর লেখার মাঝে বহুস্থানে এই অনির্দেশ্য রহস্যাবেগের স্নিগ্ধ ছায়া প্রসারিত হয়েছে।
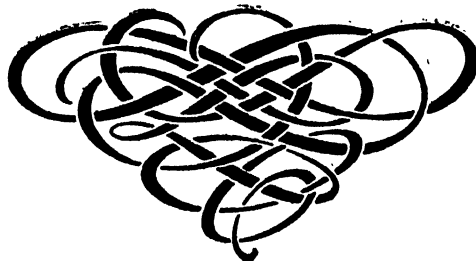
কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

শশাঙ্কমোহনের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী কবি ও লেখক হারাইল। তাহাতে আমাদের সাহিত্যের যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেক সাহিত্য-সেবীরও নাই দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। যাঁরা তাকে জানেন তাঁরা এই সাক্ষ্য দিবেন যে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ সম্মানিত স্থানই তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, এবং সে স্থান তাঁহার অভাবে অন্য কাহারো দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। সেই ধারণা মনে এবং একটা ব্যক্তিগত বেদনার বোধ বুকে লইয়াই শশাঙ্কমোহনের প্রতিভার প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ দু-চারিটি কথা বলিতে চাই, বিস্তৃত সমালোচনা আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, তাঁর পুস্তকাদিও বর্ত্তমানে আমার কাছে নাই।

সতর আঠার বৎসর পূর্ব্বে শশাঙ্কমোহনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তখনো আমি ছাত্র। চট্টগ্রাম সদরঘাটে কোনো আত্মীয়ের বাসায় বেড়াইতে যাই। সেই বাসাতেই শশাঙ্ক বাবুর নয় দশ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, সে-ই আমাকে ধরিয়া তার বাবার কাছে নিয়া যায়। তার পূর্ব্বেই শশাঙ্কমোহনের কাব্যগ্রন্থ "শৈলসঙ্গীতে"র "প্রবাসীতে" প্রকাশিত এক সমালোচনা পড়িয়া এবং বিশেষ করিয়া "সাহিত্য" পত্রে "বর্ত্তমান বঙ্গভাষার প্রকৃতি" সম্বন্ধে তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ পড়িয়া লেখক সম্বন্ধে আমার একটা সশ্রদ্ধ কৌতূহলের উদয় হইয়াছিল। সেই অভাবনীয় উপায়ে শশাঙ্কমোহনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর যে কয়দিন চট্টগ্রামে ছিলাম তার বেশী সময়ই তাঁর সঙ্গে সাহিত্যালোচনাতে কাটিত। সেই সব কথাবার্ত্তায় তাঁর বিশাল অথচ গভীর পাণ্ডিত্য, তাঁর উদার অথচ সূক্ষ্ম সাহিত্য-বোধ, তাঁর সুদূরদর্শী অথচ অন্তঃপ্রবেশকুশল সমালোচকের দৃষ্টি, তাঁর নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গী এবং সর্ব্বোপরি তাঁর সারস্বত তন্ময়তা এবং চরিত্রের শিশুসুলভ সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হই। তখন তাঁর "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে" কাব্যখানি ছাপা হইতেছে, মনে আছে শশাঙ্কবাবু আমাকে আল্‌গা আল্‌গা ফর্ম্মাগুলিই পড়িতে দেন। সেই কাব্য পড়িয়াই শ্রেষ্ঠ সমালোচন-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে শশাঙ্কমোহনে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভাও বর্ত্তমান তাহা জানিতে পারি। শশাঙ্কমোহন হয়ত আমার হৃদয়ের সহানুভূতির স্পর্শলাভ করিয়াই তাঁর নিজ কবি-হৃদয় এত সহজে আমার নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয় সামান্য কয়দিনের আলাপেই তাঁর স্নেহ এবং তাঁর কবি-হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া আমার ফিরিয়া আসা সম্ভব হইয়াছিল।

তার পর হইতেই শশাঙ্কমোহনের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার পত্র-বিনিময় হইত। নানারূপ সাহিত্যিক জল্পনা ও বাদানুবাদ,বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ এবং বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন দিক হইতে একই জিনিষকে দেখিবার প্রয়াসে এই সাহিত্য-লিপিগুলি ভরিয়া উঠিত। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আমাদের আলোচনার কেন্দ্র। নানা দিক দিয়া মতভেদের সম্ভাবনা থাকিলেও শশাঙ্কমোহনের এই পত্ররাজি সাহিত্যসেবী মাত্রেরই উপভোগের সামগ্রী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই চিঠির অনেকগুলি এক একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধবিশেষ। বেশীর ভাগই আমার নিকট আছে বলিয়া মনে হয়। অপরিষ্কার প্যাঁচানো হাতের লেখার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ছাপার অক্ষরে দশের দরবারে উপস্থিত করিবার মতন জিনিষ এগুলি।

শশাঙ্কমোহন তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান এবং জনাদর লাভ করেন নাই এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার কারণ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় শশাঙ্কবাবু লোকপ্রিয় হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় মাসিকপত্রের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রচার করেন নাই। যে একটি মাত্র মাসিক-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়াছিল সেটি

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

হইতেছে ঢাকার "প্রতিভা"। সেই "প্রতিভা"তেই কিছুদিন মাসে মাসে তাঁর কবিতা এবং "বাণীপন্থা" নামে বিশ্বসাহিত্য-ধারার গভীর এবং সরল আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তার ফলেই ঢাকার মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর পরোক্ষ পরিচয় ঘটে, এবং সেই পরিচয় সূত্রেই তাঁকে ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতে দেখিতে পাই। তার কিছুদিন পরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন ও 'ডাক্তার' উপাধি পান। এই দুইটি সম্মানের মূলে দুই চারিজন লোকের গুণগ্রাহিতার পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছিল।

কলিকাতায় কাজ লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই শশাঙ্কমোহনের "সিন্ধুসঙ্গীত", "শৈল সঙ্গীত", "সাবিত্রী", "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে" এই কয়টি কাব্যগ্রন্থ এবং "বঙ্গবাণী" নামে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সুবৃহৎ সমালোচন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরে "বিমানিকা" নামে কবিতাপুস্তক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মধুসূদন সম্বন্ধে সমালোচনার বহি বাহির হয়। "বিশ্বামিত্র" নামে একটি সুবৃহৎ নাট্য-কাব্যের পাণ্ডুলিপি কবি চট্টগ্রাম থাকা কালীনই আমার নিকট পাঠান। এই কাব্য সম্বন্ধে কবির সঙ্গে পত্রে আমার অনেক আলোচনাদি হয়। আমার নিকট, পরে ঢাকার কোনো প্রকাশকের নিকট, এবং সর্ব্বশেষে কবির নিজের নিকট বহুবৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া এখন কলিকাতা হইতে এই কাব্য প্রকাশিত হইবে শুনিতেছি। অসম্পূর্ণ "বাণীপন্থা"ও সম্পূর্ণ আকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে শুনিতে পাই।

শশাঙ্কমোহনকে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলা যায়। তাঁর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা বাংলা সাহিত্যকে কিছু কিছু সমালোচনা উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, প্রকৃত সমালোচন-সাহিত্য-সৃষ্টির দিকে কোনো কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এই দুই জনমাত্র শ্রেষ্ঠ সমালোচন-সাহিত্যের কিছু কিছু নমুনা দেখাইতে পারিয়াছেন। বিশেষ করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধই নিবিড় কাব্যোপলব্ধির সূক্ষ্ম ও রসঘন প্রকাশে সুন্দর ও শক্তিশালী হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু শশাঙ্কমোহনই বিস্তৃতভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং আপন বিশ্বসাহিত্য-বোধ ও মার্জ্জিত শিক্ষিত সারস্বত ধারণা দিয়া বাংলার সাহিত্য-মহারথদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং সভ্য মানবের আদিম সাহিত্য-চেষ্টা হইতে বিশ্বসাহিত্যের ধারা আধুনিক কাল পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। এই সব রচনার মধ্যে লেখকের উদার সাহিত্যবোধ, সূক্ষ্মনিবিড় পর্য্যবেক্ষণ ও বিচিত্র সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। লেখক-বিশেষ কিম্বা যুগবিশেষ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি উপর দিয়া ভাসিয়া বহিয়া যান নাই, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখান নাই, পরন্তু অন্তর-রহস্যের উপর আলোক-পাত করিয়া দিয়াছেন, নানা বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের ভিতর হইতে সমগ্রের ছবিটি চোখের সাম্‌নে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই যে তাঁর সমন্বয়-দৃষ্টি (Synthetic vision) তার কাছেই প্রত্যেক যুগ তার মর্ম্মকথাটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, এই সমন্বয়-দৃষ্টির ফলেই শশাঙ্কমোহনের অনেক সমালোচনাও কতকটা সাহিত্য-সৃষ্টিরই গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

এই সব রচনার প্রকাশ-ভঙ্গীটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সেই ভঙ্গীতে এমনি একটা নিরাময় বলিষ্ঠতা, একটা সুকঠিন ঋজুতা, একটা বাহুল্যবর্জ্জিত দার্ঢ্যের ভাব আছে যাহাতে স্বল্প পরিচয়েই সেটিকে লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া চিনিয়া লইতে ভুল হয় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্যরীতি, পদ্যরীতির মতই, রবীন্দ্রনাথ দ্বারাই প্রায় সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন প্রবন্ধ রচনায় বর্ণগন্ধহীন জলীয় গদ্যরীতির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই অপরূপ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাহাকে অসামান্য কমনীয়তা এবং বিচিত্র ব্যবহারের ভিতর দিয়া আশ্চর্য্য নমনীয়তা দান করিয়াছেন, তিনিই তাকে দিয়া দিয়াছেন মানবমনোগহনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবপর্য্যায়ের প্রকাশ চেষ্টায় অতুলনীয় সাফল্য।

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথী রীতিটি যখন অনেক পরবর্ত্তী গদ্যলেখকের হাতে কতকটা পল্লবিত, মিথ্যা কবিত্বে প্রপীড়িত, কিম্বা অতি-কোমলত্বে মানসতা মেরুদণ্ডহীন হইয়া দেখা দিয়াছে, অথবা ধ্বনির লোভে অর্থকেও বলি দিতে অগ্রসর হইয়াছে তখন গদ্যরীতির ঋজুতা ও ওজগুণের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভূত হইয়াছে। শশাঙ্কমোহনের হাতে কিন্তু গদ্যরীতি সেই সবল ঋজুতায় শক্তিশালী হইয়া দেখা দিয়াছে।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে শশাঙ্কমোহনের এই গদ্য-রীতির বিশিষ্টতা মনে রাখিলে তাঁহার কবি-প্রতিভার বিশেষত্ব-টুকুও আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়িবে। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় আধুনিক যুগের কল্পপন্থী (Romantic) কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে কবি শশাঙ্কমোহন ছিলেন ধ্রুবপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই এক কথায়ই তাঁহার বিশিষ্টতা এবং দোষগুণ অনেকটা বলা হইয়া যায়।

নব নব রূপে নিত্য নূতন দিক দিয়া সৌন্দর্য্যের দিকে অভিযানই হইয়াছে কল্পপন্থার (Romanticism) প্রাণ। নব নব সৌন্দর্য্যের জন্য একটা নিয়তচঞ্চল অদম্য কৌতূহলই কল্পপন্থী সাহিত্যের সর্ব্বব্যাপক বিশেষত্ব। এই কৌতূহল নিত্য নূতন ভাষারীতি ও নব নব ছন্দে যেমন কালে কালে আপনাকে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, তেমনি নব নব বিষয়-নির্ব্বাচনেও আপনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই কৌতূহলই স্কট্ ও বায়রণকে সুদূর অতীতের অভিসারে ছুটাইয়াছে, কোলরিজকে টানিয়াছে কুসংস্কারের মনোবৈজ্ঞানিক রহস্যের মর্ম্মদেশে, ভিক্টর হুগোকে দিয়া আঁকাইয়া তুলিয়াছে কুৎসিৎ-বিকৃতের মর্ম্মান্তঃপুরবাসী অপরূপ সৌন্দর্য্য ছবি। এই কৌহতূলই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থকে নিয়া গিয়াছে অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লী-হৃদয়ে এবং প্রকৃতির দিকে, পোয়ে হ্বর্থণকে গতি দিয়াছে মানব মনো-গহনের অন্তেবাসী (marginal) রহস্যলীলা এবং সূক্ষ্মানুভূতির দিকে। কল্পপন্থার প্রাণস্বরূপ এই কৌতূহলই দেশে দেশে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, এই জন্য কাব্যবিচারে কল্পপন্থার প্রাধান্যই হইয়াছে সাহিত্যোৎকর্ষের মাপকাঠি। কিন্তু এই কল্পপন্থী কৌতূহল যেখানে ধ্রুবপন্থার সংযমে বিধৃত নয়, সাহিত্যে সেই খানেই বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কল্পপন্থা যেমন কৌতূহলের বশে নিত্য নব নব রীতি ও বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে, ধ্রুবপন্থা তেমনি কতকগুলি চিরাচরিত পরীক্ষিত চিরন্তন ও ধ্রুব ব্যাপারের উপর আপন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। কল্পপন্থার বিশেষত্ব যেমন হইয়াছে কৌতূহল অসংযম ও উচ্ছ্বাস, ধ্রুবপন্থার বিশেষত্ব তেমনি শান্তি সংযম ও শৃঙ্খলা। কল্প-পন্থার বিশেষত্ব যেমন সৌন্দর্য্য, ধ্রুবপন্থার বিশেষত্ব তেমনি সত্য ও মঙ্গল। ফ্লোবেয়ারের মতন নিছক সৌন্দর্য্যের পূজারিগণ মাঝে মাঝে আর্টের ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়া সাহিত্যায়-তনে সত্য ও মঙ্গলের দাবী অগ্রাহ্য করিতে চান। Aristotle, Ruskinরাও যুগে যুগে নীতির তরফ হইতে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্যে এই যুদ্ধের বিরাম নাই। বাংলা সাহিত্যেও কিছুদিন পূর্ব্বে এই অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই যে আর্টবাদী ও ইস্কুল মাষ্টারের যুদ্ধ, ভাবিয়া দেখিলে তাহা কল্পপন্থা ও ধ্রুবপন্থার আদর্শের বিরোধ ছাড়া কিছুই নহে।

কিন্তু এই বিরোধ চিরকেলে হইলেও এই দুইয়ের মিশ্রণ ছাড়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্ম হইতে পারে না। Classical সাহিত্য বলিলে বিশেষ করিয়া গ্রীক, ল্যাটিন সাহিত্যকেই বোঝায়। সেই অর্থকে কিছু ব্যাপক করিয়া প্রাচীন কালের যে সব সাহিত্য এখন বিশ্বকালীন হইয়া গিয়াছে সেই সবকেই Classical আখ্যা দেওয়া চলে। এই সমগ্র অতীত কালের বিশ্বকালীন সাহিত্যের মধ্যে যে সব ছন্দ, রীতি, বিষয় এবং আদর্শ স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ বাণীসেবকগণের পরীক্ষায় টিকিয়া গিয়া একরূপ সাহিত্যিক ধ্রুবত্ব বা চিরন্তনত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যের কল্পসৌন্দর্য্যের আলেয়ার পিছনে ধাবমান চঞ্চল অনিশ্চিত কল্পপন্থার সহিত তুলনা করিয়া মোটামুটি সেগুলিকে এখন ধ্রুবপন্থা (বা Classicism) আখ্যা দেওয়া হইতেছে। তবে এই যে ধ্রুবপন্থার পরিধি তাহাও এক জায়গায় ঠিক হইয়া নাই, তাহাও নূতন নূতন সাহিত্য-সাধকের নব নব সিদ্ধিতে দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কারণ বর্ত্তমানের নিয়তসঞ্চরমান অনিশ্চিত কল্পপন্থাই ভবিষ্যতে ধ্রুবপন্থার ধ্রুবত্বে গিয়া রূপান্তরিত হইয়া দেখা

কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

দেয়, এক যুগের কল্পপন্থাই হইয়া উঠে অন্য যুগে ধ্রুবপন্থা। তবে প্রাচীন হউক আর আধুনিক হউক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যে রহিয়াছে এই দুইয়েরই জৈব যোগ। ইউরোপে Pericles-এর যুগ, Elizabethএর যুগ এবং Louis XIVএর যুগ, অথবা ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্যসৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করিলে নিঃসন্দেহে এই দুই রীতিরই সন্ধান পাওয়া যাইবে। এমন যে হোমর, সোফোক্লিশ তাঁদের মধ্যেও কল্পপন্থার অনুসন্ধান বৃথা হইবে না, এমন কি হোমরের ওডিসি কাব্যেতো কল্পপন্থারই প্রাধান্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার আধুনিক যুগের স্বীকৃত কল্পপন্থী Victor Hugo ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ধ্রুবপন্থার ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান যথেষ্ট মিলিবে। বাস্তবিক রচনা বিশেষকে ধ্রুবপন্থী কি কল্পপন্থী বলিতে আমরা তাহাতে কোন্ রীতির প্রাধান্য তাহাই বলিয়া থাকি, নহিলে অবিমিশ্র ধ্রুবপন্থা কিম্বা অবিমিশ্র কল্পপন্থার সন্ধান আমরা কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টিতে পাইব না ; তার সন্ধান পাইতে হইলে যাইতে হইবে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রচেষ্টাগুলির কাছেই। ধ্রুবপন্থার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের অথবা George Sandএর প্রথম বয়সের রচনাবলী ব্যক্তিগত মনোগহনের অলীক ছায়া হইয়া দেখা দিয়াছে, এই ধ্রুবপন্থাকে স্বীকার না করাতেই মিসেস্ র‍্যাড্‌ক্লিফ এবং সময় সময় ব্যালজ্যাকেরও কল্পনা অসংযত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, সৌন্দর্য্যবীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কল্পপন্থার রেখাটিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া চরমে লইয়া ঠেকাইয়াই আধুনিক যুগের অলোকপন্থার (Mysticism) সৃষ্টি হইয়াছে, এই জন্য কল্পপন্থার চেয়েও অত্যাধুনিক অলোকপন্থার সঙ্গেই ধ্রুবপন্থার বিরোধটা বেশী। এই অলোকপন্থার দৃষ্টিভূমি হইতে ধ্রুবপন্থা আরো বেশী দূরে গিয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কাজেই মানবমনের সীমান্তবর্ত্তী রহস্যের কারবারী পোয়ে হর্ণ অথবা মেটারলিঙ্ক্ হাউপ্ট্‌ম্যান্ প্রমুখ অলোকপন্থীদের সাহিত্যিক অর্জ্জনের শ্রেষ্ঠতা কালের পরীক্ষায় কতদূর গিয়া দাঁড়াইবে বলা যায় না। অপর পক্ষে কল্পপন্থার সৌন্দর্য্য-কৌতূহল না থাকিলে কাব্য-প্রয়াসের মূল্য যে কত কমিয়া যায় তার দৃষ্টান্ত Boileau এবং Pope এর রচনাবলী।

বর্ত্তমান বাংলার কবিগণের ভিতর হইতে শশাঙ্কমোহনকে ধ্রুবপন্থী বলিয়া বাছিয়া লইলে এই টুকুই বলা হয় যে শশাঙ্ক-মোহনের কাব্যে ধ্রুবপন্থারই প্রাধান্য। বাস্তবিক তাঁর কাব্যেও যে কল্পপন্থার যথেষ্ট মিশ্রণ রহিয়াছে এবং তাহা যে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক কতকটা অনুপ্রাণিত তাহাতে সন্দেহ নাই। "সিন্ধুসঙ্গীত" "শৈলসঙ্গীত" প্রভৃতির গীতি-কবিতার মধ্যে এবং "সাবিত্রী" ও অপ্রকাশিত নাট্যরূপী মহাকাব্য "বিশ্বামিত্রের"র ভাষা ও ভাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভাবের প্রভাব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলায় বাস করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কোনো কবিই শশাঙ্কমোহনের মত এতটা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই তাহা জোর করিয়া বলা চলে। শশাঙ্কমোহনের এই মৌলিকতা কোন জায়গায় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গেলেই মনে হইবে ধ্রুবপন্থী প্রকাশ-রীতিই তার মধ্যে প্রধান। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান বাংলা কবিতায় এমন একটা স্বচ্ছন্দ গতি এবং সহজ প্রবাহ আনিয়া দিয়াছেন যাহা এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলা সাহিত্যের পরম অর্জ্জন বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু এই অতি-স্বাচ্ছন্দ্যই—এই fatal facilityই—যে আবার অন্যদিকে বাধা হইয়া দেখা দিয়াছে তাহাও না বলিলে চলে না। রবীন্দ্র পরবর্ত্তীদের কবিত্ব-কৃতি সম্বন্ধে এই অনায়াস প্রাচুর্য্য, এই ভাষাছন্দের বাধাহীন গতি কাব্যের পরম শিল্প-কৃতিত্বের যে কতকটা পরিপন্থী হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথের এই গীতি-কাব্যোচিত গতি যে-সব যায়গায় ধ্রুবশিল্পের সংযমে বিধৃত হইয়াছে সেই সব স্থানেই শ্রেষ্ঠ কাব্য-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তবে মোটের উপর বর্ত্তমান কবিতার এই স্বচ্ছন্দ প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে শশাঙ্কমোহনের কবিতায় ঠেকিয়া তার উপল-ব্যথিত গতিতে মুগ্ধ হইতে হয়, কোমলে কঠিনে তার সঙ্গীত একটা নিবিড় রসের সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহাতে কানের সুর এবং মুখের স্বাদ বেশ বদলাইয়া লওয়া যায়। এবিষয়ে শশাঙ্ক-মোহনকে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারেরই উত্তর-সাধক বলিয়া মনে হয়। কাব্য-সাধনায় বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন

দুই উল্টা রীতির সাধক। বালক রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। সাহিত্য-রীতিতে সমানধর্ম্মা হইলেও শশাঙ্কমোহনের উপর সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল কিনা জানি না।

কিন্তু ধ্রুবপন্থার ভাষাছন্দঘটিত এই কৃচ্ছ্রসাধন, কাব্য-স্রোতোপথে এই উপলব্যথা কাব্যকে যেমন একদিকে স্থিতির ভিতর দিয়া গতিকে লাভ করার শক্তি দিয়া দেয়, নানা রকম বাধা ও বিরুদ্ধতার সংঘর্ষণ কাব্যকে যেমন একদিকে বিচিত্র সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তুলে, তেমনি অন্যদিকে কাব্যস্রোতের অন্তর্নিহিত বেগের মধ্যে যেই সামান্য অপ্রাবল্য দেখা দেয় অমনি সেগুলি কাব্যগতিকে রোধ করিয়া সৌন্দর্য্যের সত্যকার বাধাস্বরূপ হইয়া দৃষ্টিপথ জুড়িয়া বসে। শশাঙ্কমোহনের কবিতার বহু জায়গায় ধ্রুবপন্থার গুণের সঙ্গে সঙ্গে এই দোষও দেখা যায় এবং তাহাই হইয়াছে তাঁর লোকপ্রিয় হইবার পক্ষে একটা পরম অন্তরায়। ধ্রুবপন্থার ভূষণই ধীরে ধীরে তাঁর কাব্যসুন্দরীর পায়ের শিকল হইয়া দেখা দিয়াছে এবং তাঁর কলিকাতায় অধ্যাপকের কাজ লইয়া যাওয়ার পর হইতে এই শিকলই তাঁর কাব্যসুন্দরীর নৃত্য একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু তিনি যে কয়টি কাব্যদান করিয়াছেন বাংলা সাহিত্য তাদের মূল্য এবং গৌরব ভুলিতে পারিবে না। ধ্রুবপন্থী আদর্শের স্থিতি ও সংযমের সহিত তাঁহার গীতি-কবিতা ও নাট্যকাব্যে কল্পপন্থী কল্পনার আবেগ ও কৌতুহলের মিশ্রণ ঘটিয়া সুন্দরের সৃষ্টি করিয়াছে। আর অন্ততঃ একটি কাব্যে— "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যের" মধ্যে—কল্পনা ধ্রুবপন্থার বন্ধন মানিয়া লইয়াও তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—সেখানে কল্পপন্থারই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। আর আমার মনে হয় ধ্রুবপন্থী শিকড় কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার উপর কল্পপন্থার এই ফুলটি ফুটাইয়া তুলাই প্রকৃত কাব্যের লক্ষণ। শিকড়কাণ্ডহীন ফুল যেমন আকাশ-কুসুম মাত্র, যে শিকড় কাণ্ডে ফুল ফোটে না সাহিত্যে তারো সার্থকতা [illegible]। "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যের" মধ্যে এক বিরাট প্রেমের ছবি —ইহার মধ্যে আছে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস ও সুবিপুল আবেগ। কবির সমস্ত ধ্রুবপন্থী স্থূলতা, তাঁর সমস্ত পাণ্ডিত্য এবং দার্শনিকতার বোঝা কল্পনার উত্তাপে এই কাব্যে প্রেমের গৌরিকস্রাবে গলিয়া গলিয়া এক অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রেমের এমন transcendental ছবি কোনো সাহিত্যে কেহ আঁকিয়াছে কিনা জানি না। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য—বৈদিক দ্যাবা পৃথিবী অথবা প্রকৃতি পুরুষের আকর্ষণকে কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে ঘনাইয়া আনিয়াছেন, মানবের সব চেয়ে গভীর ও ব্যাপক বৃত্তিকে দিয়া দিয়াছেন একটি সুন্দর ও বিরাট জাতীয় ঘনরূপ। সমগ্র দেশের মধ্যদেশ হইতে উদ্ভূত বস্তুবিষয়কে অবলম্বন করিয়া এই "প্রেমগাথা" রচিত হওয়াতে ইহা প্রেমের মহাকাব্যের রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। এই দিকে Shelleyর Epipsychidion কিম্বা Danter Vita Novar চেয়ে ইহার গৌরব বেশী বলিয়াই মনে হয়।

কবির "সাবিত্রী", "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে", "সমুদ্রমন্থন", * অপ্রকাশিত "বিশ্বামিত্র" প্রভৃতি কাব্য ও নাট্যকাব্যের সাধারণ লক্ষণ হইয়াছে অতীতের জাতীয় বস্তু-বিষয়। এই অতীতের জাতীয় বস্তু-বিষয়ের ভিতর দিয়া আধুনিক ভাব ও চিন্তাধারাকে কাব্যরূপ দান করা হইয়াছে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে শশাঙ্কমোহনের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। এই local habitation and a nameটিই কাব্যের একটি পরম শিল্প-লক্ষণ। অনুরূপ বস্তু-বিষয়ে মূর্ত্তিদান করিতে না পারিলে খুব মৌলিক ভাষা ও ভাবের শিল্প-গৌরব প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাধা ঘটে। কাব্যহিসাবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রত্ন কোন্ গুলি তাহা মনে করিলেই এই কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা," "উর্ব্বশী," "পতিতা," "মালিনী," "গান্ধারীর আবেদন," "তাজমহল, "তপোভঙ্গ" প্রভৃতির পাশে তাঁহার "মানসসুন্দরী," "বসুন্ধরা," "অন্তর্যামী" প্রভৃতি ভালো ভালো কবিতারও গৌরব যে ম্লান হইয়া যায় তাহা বলাই বাহুল্য। "সুরদাসের প্রার্থনা"কে কাটিয়া ছাঁটিয়া মোহিত

* কবি ইহারও পাণ্ডুলিপি আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, পরে "প্রতিভা" পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। এখনো কোনো পুস্তকে ইহা ছাপা হয় নাই. লেখক।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

সেন সংস্করণে "আঁখির অপরাধ" রূপে দার্শনিক নবজন্ম দান করায় কাব্য হিসাবে তার যে অধোগতিই হইয়াছিল রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝিতে পারেন। কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে পরিমাণে গীতি ধর্ম্মীর এবং দার্শনিকের প্রতিভা, সেই পরিমাণে শিল্পীর প্রতিভা নহে; যে পরিমাণে সমুচ্চ চিন্তা, গাঢ় সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং ভাবরাজি তিনি জগৎকে দান করিয়াছেন সেই পরিমাণে কাব্য-শিল্পের বাঁধনে তিনি তাহাদিগকে বাঁধেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই সব সমুচ্চ কাব্য-সম্ভাবনা, এই বিশ্বঘেরা ভাবের নীহারিকা যুগে যুগে বহু ভবিষ্যৎ শিল্পীর স্ফুট শিল্পের খোরাক যোগাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এবং জগতের শিল্পীগণকে ভাবের খোরাক যোগাইবার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে বহুদিন অনতিক্রমনীয় থাকিবেন সে সম্বন্ধে কোনো ভুল নাই। রবীন্দ্র কাব্যের এই বিপুল শিল্প-সম্ভাবনাকে রবীন্দ্র-পরবর্ত্তীদের মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কমোহনই কতকটা কাজে খাটাইয়াছেন। কবি সত্যেন্দ্র নাথ ভাষা-ছন্দের দিক দিয়া আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং দশের মধ্যে ছড়ানো কতকগুলি সাধারণ দেশাত্মবোধের এবং মানবতার ভাবকে লোকপ্রিয় "সাহিত্যরূপ" দিয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবির সমুচ্চ কল্পনা (Imagination), বিপুল আবেগ (Passion) এবং উচ্চ স্তরের মানসতা (Intellectuality), তাঁর মধ্যে তেমন ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেশাত্মবোধ ও মানবতার বোধ তাঁর কাব্যে কতকটা আবেগের রূপান্তরিত আভাস সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, সেগুলি যে কোথাও আবেগে রূপান্তরিত হইয়া শ্রেষ্ঠ কাব্যের সৃষ্টি করিতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ছিল, তার ফলে ইতিহাস বিজ্ঞানের বহু জিনিষ তাঁর কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে, কিন্তু যে উঁচুদরের মানস দৃষ্টি (Intellectual vision) factsএর ভিতর দিয়া sense of factsকে, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এককে দেখিতে পায়, যে কল্পনা স্থূল সত্যকে সূক্ষ্ম করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে—কারণ fineness of truthই হইয়াছে beauty—সত্যেন্দ্রনাথে তার কতকটা অভাব ছিল বলিয়াই তাঁর কাব্যে বহু জায়গায় ফিরিস্তির (Catalogue) চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক উত্তরসাধক হইলেও তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার—তথা শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা মাত্রেরই—এই সব লক্ষণ তেমন আছে বলিয়া মনে হয় না। শশাঙ্কমোহনে এই সমুচ্চ কল্পনা, আবেগ ও মানসতার সন্ধান পাই। এই সবকে জাতীয় কাঠামোর ভিতর পুরিয়া শিল্পের নামরূপ দিবার চেষ্টায় তিনি কতদূর সফল হইয়াছেন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তার বিচার করিবে; কিন্তু এই গীতিকাব্য-প্লাবিত বৃহৎশিল্পসংযম-অসহিষ্ণু বাংলা দেশে, এই অনুকরণের যুগে যতটুকু তাঁর খাঁটি নিজস্ব অর্জ্জন ততটুকুর মধ্যেই তাঁর অনন্যসাধারণ কবি প্রতিভার, বিশিষ্টতা ও বিপুলতা, শক্তি ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্য ও বিজ্ঞান

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রস্তাব

প্রবন্ধের শিরোনামায় "ধর্ম্ম" শব্দের অনুল্লেখের একাধিক কারণ আছে। ব্রাহ্মণ গৃহীত সংস্কৃত শাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ আচার ব্যবহারে আবদ্ধ। জীবনের অভীষ্ট চতুর্বর্গ নির্ণয়স্থানে ধর্ম্ম ও মোক্ষ এক নহে, ভিন্ন। এইটি স্মরণ রাখিলেই ভগবদ্-গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ বোধ হয় :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

মহাভারতে মোক্ষসাধনের নাম মোক্ষ ধর্ম্ম। সেই সাধনে ক্রিয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া চরিত্রের প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মোক্ষ-ধর্ম্ম আচার ব্যবহারে আবদ্ধ নহে। ইহার ভিত্তি চরিত্র ও পরমার্থ নিষ্ঠা। অথচ আচার ব্যবহারের সহিত ইহার বিরোধ নাই। ব্রহ্মসূত্রের নিম্নোদ্ধৃত সূত্র কয়েকটিতে বক্তব্য বিষয়টি সংক্ষেপে প্রাপ্তব্য : যথা—

অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ। ৩।৪।৩৬
অপিচস্মর্য্যতে। ঐ।ঐ।৩৭
বিশেষানুগ্রহশ্চ। ঐ।ঐ।৩৮

এই তিন সূত্রের ফলে দাঁড়াইতেছে যে, বর্ণাশ্রম আচারাদির অভাবেও নিশ্রেয়স্ যাহা সকল জীবের পরাকাষ্ঠা হিত তাহা লাভ হয়—ইহা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে ব্যাসদেব ৯ম সূত্রে বলিয়াছেন—

তুল্যন্তু দর্শনাৎ। *

অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব তাঁহাদের ভিতর বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মের ভাব ও অভাব সমানই দেখা যায়।

মনুস্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র। তাহাতেও প্রাপ্তব্য যে :—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

তথা—

যথোক্তান্যপি কর্ম্মানি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেতু যত্নবান। ১২।৯২

তন্ত্রশাস্ত্রও এ বিষয়ে একবাক্য।

ধর্ম্মোজ্ঞানার্থ এবচ।—কুলার্ণবতন্ত্র। তথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—

যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন পরানিষ্টচিন্তনং।
পরস্ত্রী গমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ ॥

এ প্রকার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উপদেশ, যাহার মূল হইতেছে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও জীবের হিত সাধন, তাহাকে ব্রাহ্মণধর্ম্ম বলা কি যুক্তিযুক্ত? ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম আচার ব্যবহারে আবদ্ধ। অন্যপক্ষে ইহাকে হিন্দু ধর্ম্মও বলা যায় না। হিন্দুনামধারি-দিগের সাধারণ পারমার্থিক ধারণা দুর্নির্ধার্য্য। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান গৃহীত শাস্ত্রে ব্যবহার ও পারমার্থিক উপদেশ একসঙ্গে প্রকাশিত। ব্যবহার দেশ কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টিশূন্য নহে। কাল বিশেষে, স্থান বিশেষে, ব্যক্তি বিশেষে যাহার উৎপত্তি তাহাতে নিত্য ভাবের অতি ক্ষীণ লেশ মাত্র আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রাপ্তব্য। এজন্য ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে ইহা স্মৃতি, শ্রুতি নহে। পারমার্থিক নিষ্ঠা ও তাহার সম্বন্ধে চরিত্র সূচনাতেই শ্রুতির প্রাধান্য। ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মনিষ্ঠের চরিত্র লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।" সুরেশ্বর আচার্য্যের "নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি"তে বিষয়টি সুস্পষ্ট দেখা যায়। যথা—

প্রাপ্ত আত্মপ্রবোধস্যাদ্বেষ্ট্ত্বাদয়োগুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্তাস্য নতু সাধনরূপিণঃ ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা ও জীবহিতে রতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

---

* সভাষ্য ব্রহ্মসূত্র সুলভ। এজন্য বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজনীয়।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

এখন বিচার্য্য যে, যাহাকে ব্রাহ্মণ্য বলা হইল তাহাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলা যায় কিনা। প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য যে, ধর্ম্ম শব্দ সংস্কৃত ও দেশভাষায় একই অর্থবাচক নহে। ইহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম শব্দে যেমন ব্যবহার ও পরমার্থ সমান ভাবে সূচিত, এইরূপ হিন্দুধর্ম্ম শব্দে কোন সাধারণ বা সামান্য লক্ষণ পাওয়া যায় কিনা। ভারতবর্ষে ভিন্ন যাহাদের পুরুষানুক্রমে অন্যত্র বাস অনির্দেশ্য বা যাহাদের গণনাতীত কাল ভারতবর্ষে বাস, তাহাদিগের প্রতি মুসলমানাদির সহিত ভেদ রক্ষার জন্য হিন্দুশব্দের প্রয়োগ। ইহা বিদেশজাত, ভারতবর্ষে ইহার উৎপত্তি হয় নাই—একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। পারসিকগণ শব্দের আদিতে 'স'কার উচ্চারণে অক্ষম বলিয়া তাহাদের মুখে সিন্ধু হয় হিন্দু। পরে এই শব্দ মুসলমানাদির সহিত অপর ভারতবাসীর বিভেদবাচক বলিয়া ব্যবহার চলিতেছে।

হিন্দু শব্দের বাচ্য মনুষ্যের ভিতর আচার ব্যবহার ও বিশ্বাসের সাধারণ লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। আচার ব্যবহার, যৌন সম্বন্ধ মুসলমানাদি ভিন্ন অপর ভারতবাসীর মধ্যে একরূপ নহে। সাঁওতালদিগের মধ্যে বাদনা নামক উৎসবে প্রতি বৎসর তিন দিন করিয়া বিবাহবন্ধন অগ্রাহ্য। সাপ ব্যাং ইহাদের আহারীয়। পাহাড়িয়াদের ভিতর দ্রৌপদীর বিবাহের ন্যায় বিবাহ প্রথা। নায়ারদের ভিতর বিবাহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নায়ারদের মধ্যে ভাগিনেয় হয় মাতুলের উত্তরাধিকারী। গোমাংস ভোজনে বিরতিও হিন্দুর সাধারণ লক্ষণ নহে। অনেক হিন্দু নামে পরিচিত চামার জাতি মরা গরুর মাংস খায়। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারও সাধারণ লক্ষণ নয়। বাংলাদেশের বৈষ্ণব জাতি, হাড়ি, ডোম, ভূঁই মালী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সম্পর্ক শূন্য। মান্দ্রাজ অঞ্চলে লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় হিন্দু নামেপরিচিত। লিঙ্গায়েতগণ গলদেশে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গধারী অথচ সে সম্প্রদায়ে জাতিভেদ বা ব্রাহ্মণের স্থান নাই। কয়েক বৎসর হইল তাঁহারা রাজ দরবারে যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইল। যথা —

In a petition presented to the Government of India the members of the Lingayet community protested against the "most offensive and mischievous order" that all of them should be entered in the census papers as belonging to the same caste, and asked that they might be recorded as Vira Saiva Brahmans, Kshattriya, Vaisyas or Sudras as the case might be.

Imperial Gazetteer
P. 315-316.

ছত্রিশগড়ের বৈরাগী সম্প্রদায়ে প্রবেশকালে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গার মাহাত্ম্য স্বীকারই অন্য ধর্ম্মের তুলনায় হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব। কিন্তু অনেক হিন্দু নামধারী ব্যক্তি প্রকাশ্যে নিরাপত্তে গঙ্গায় ঘৃণ্য দৈহিক পদার্থ পরিত্যাগ করিয়াও হিন্দুনাম রক্ষা করেন। অন্যদিকে বেদান্তাচার্য্যের উক্তি যে, "জ্ঞান প্রবাহো বিমলাদি-গঙ্গা"। জলময়ী গঙ্গা কাজেই নগণ্য। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ্য শব্দ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হয় না কি? ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বর্ত্তমান বিবাদের পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজনীয় না হইতেও পারে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণ্যের সহিত জীব বুদ্ধির কি সম্পর্ক। যে শাস্ত্রের উপদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার সম্প্রদায় প্রাপ্ত নাম প্রস্থান ত্রয়ং। সে গ্রন্থগুলি এই। যথা—(১)ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দশ খানি মহোপনিষৎ (২) ব্রহ্ম সূত্র বা উত্তর মীমাংসা (৩) ভগবদগীতা। এই তিন প্রস্থান বা পথ। পূর্ব্ব মীমাংসা বা জৈমিনি সূত্র ইহার অন্তর্গত না হইলেও দর্শন বা শাস্ত্র বুঝিবার উপায় বলিয়া সমাদৃত। পূর্ব্ব মীমাংসায় বিখ্যাত ভাষ্যকার শবরস্বামী দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্ম্ম যা লক্ষ্য বুদ্ধির অগম্য বটে কিন্তু বুদ্ধির বিরুদ্ধ নয়। তবে তাঁহার বিচার প্রণালী প্রাচীন সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য তাহা এখনকার সাধারণ্যের অনায়াসে গ্রহণযোগ্য কিনা—সন্দেহের বিষয় বলিয়া বর্ত্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য ন্যায় অনুসারে বিষয়টির আলোচনা নিন্দনীয় না হইতে পারে।

সাধারণতঃ সত্য লাভের উপায় দুইটি। এক, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। অপর, ন্যায়ানুসারিণী বুদ্ধির ব্যাপার। পাঁচ

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দাদি পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান হয়। ন্যায়ের অনুগত বুদ্ধির ব্যাপারে সত্যলাভের উপায় দুই প্রকার। জাতি বা সামান্য হইতে ব্যক্তি বা বিশেষ লাভ (deduction)। আর তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্তি বা বিশেষ হইতে জাতি বা সামান্য লাভ (induction)। শেষোক্ত প্রকারে সম্ভাবনা (probability) মাত্র প্রাপ্তব্য। কেননা ব্যক্তি বা বিশেষের সংখ্যা করা জীববুদ্ধির অসাধ্য। আজি যে সকল পদার্থকে পুঞ্জীভূত করিয়া যাহা সামান্য বা সাধারণ সত্য বলিয়া বুদ্ধিতে গৃহীত, আবার পরদিনই তাহা নূতন পদার্থের আবিষ্কারে বিস্তৃততর সামান্য বা সাধারণ সত্য বলিয়া যাহা গৃহীত তাহার প্রভাবে হেয়। এই দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে সর্ব্বজ্ঞ না হইলে এ প্রণালীতে নিত্য সত্য সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত অপ্রাপ্য। অল্পজ্ঞের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে আর সর্ব্বজ্ঞের পক্ষে ইহা নিষ্প্রয়োজন।

অন্য প্রণালীরও সীমা আছে। সিদ্ধান্ত (conclusion) অপেক্ষায় প্রধান হেতু (major premise) অধিকতর ব্যাপ্ত (more extensive) না হইলে সৎসিদ্ধান্ত সম্ভবপর হয় না। এ সিদ্ধান্তে বিরোধের সম্ভাবনা নাই বলিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করা যায় যে, জীবের বোধ শক্তি যখন প্রত্যক্ষ ও অনুমানের গণ্ডীগত তখন মনোবাণীর অতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন বিষয়ের সম্বাদ কোথা হইতে আসিল? বর্ত্তমান কালে লিখিত বা কথিত শাস্ত্রের সহিত নিঃসম্পর্ক মনুষ্যের মধ্যে শাস্ত্রোক্ত রূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচরই বুদ্ধির অতীত, কোনভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় কি? অধুনাতন কেহ কেহ বলেন যে, সহজ জ্ঞান (intuition) প্রভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগোচর পরমার্থ তত্ত্ব যাহা জীবের নিত্যহিতের জন্য প্রয়োজনীয় তাহা শাস্ত্রের বিনা সাহায্যে সুপ্রাপ্য। ইহার পরীক্ষাও সহজ। যদি পারমার্থিক জ্ঞানলাভ সহজ বুদ্ধি-সাধ্য হইত তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেরই এই জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ হইত, আর এ জ্ঞান মানুষে মানুষে বিবাদের হেতু হইত না। অথচ ইহার বিপরীতই যে স্বভাবসিদ্ধ ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী হইল বাংলা দেশে এই মতের প্রচার আরম্ভ হয়। তাহাতে প্রশ্ন উঠে যে Kant কৃত দর্শন হইতে ইহার উৎপত্তি কি না। এ প্রশ্ন বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিচার্য্য নহে। এ মতের উল্লেখ ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়, আর তাহার মীমাংসাও সেখানেই আছে। নিতান্ত প্রয়োজনীয়ত্ববোধে সভাষ্য সূত্রটি উদ্ধৃত হইল।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ। ২।১।১১

শাঙ্কর ভাষ্য।

ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ, সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথা হি—কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুম্। পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যাৎ। অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্যাঽন্যস্য বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়েত, এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব। প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভুক্প্রভৃতীনাং পরস্পরং বিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ। অথোচ্যেত অন্যথা বয়মনুমাস্যামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি, ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যতে বক্তুং, এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে। কেষাঞ্চিৎ তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্ত্বদর্শনেনাঽন্যেষামপি তজ্জাতীয়কাণাং তর্কানামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্ব্বলোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হ্যনাগতেঽপ্যধ্বনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে। শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবমেব মন্যতে—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥" ইতি।
"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি চ

ব্রুবন্। অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কারো যদপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম। এবং হি সাবদ্যতর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যস্তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি। ন হি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢ়েন

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভবিতব্যমিতি কিঞ্চিদস্তি প্রমাণম্। তস্মান্ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চৎ, এবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। যদ্যপি কচিদ্বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বমুপলক্ষ্যতে তথাপি প্রকৃতে তাবদ্বিষয়ে প্রসজ্যেত এবাপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনির্মোক্ষস্তর্কস্য। ন হীদমতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তিনিবন্ধনমাগমমন্তরেণোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্। রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরো লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিত্যবোচাম। অপি চ সম্যজ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ। তচ্চ সম্যজ্জ্ঞানমেকরূপং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যজ্‌জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাহগ্নিরুষ্ণ ইতি। তত্রৈবং সতি সম্যজ্‌জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিরনুপপন্না। তর্কজ্ঞানানাস্তু অন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদ্ধি কেনচিত্তার্কিকেণেদমেব সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোহপরেণ ব্যুত্থাপ্যত ইতি চ প্রসিদ্ধং লোকে। কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্ জ্ঞানংভবেৎ। ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদামুত্তম ইতি সর্ব্বৈস্তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতিপদ্যেমহি। ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং, যেন তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্ত্বমতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্যম্। অতঃ সিদ্ধমস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যজ্‌জ্ঞানত্বং, অতোহন্যত্র সম্যজ্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত। অত আগমবশেনাগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্।*

পূর্ব্বাচার্য্যগণ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণের এই সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রকৃত মর্ম্ম পাঁচটি লক্ষণ যুক্ত। ইহার ব্যতিক্রমে যাহা মর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে তাহা যথার্থ মর্ম্ম নহে। লক্ষণগুলি এই। যথা—(১) উপক্রম (২) উপসংহার (৩) অপূর্ব্বতা (৪) অভ্যাস, (৫) ফল শ্রুতি।

শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম লাভের জন্য দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রের আদি ও অন্তের মধ্যে কোন বিরোধ নাই—সর্ব্বতোভাবে মিলই আছে। তাহার পর দেখিতে হইবে যে, সে মর্ম্ম ইন্দ্রিয় ও অনুমানের অগোচর। শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় বা অনুমান-গোচর বাক্য অর্থবাদ অর্থাৎ আলঙ্কারিক প্রয়োগ মাত্র, যথার্থবাদ নহে। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সুখে ধারণার জন্য অর্থবাদের প্রয়োজন। তদনন্তর দেখিতে হইবে যে একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত। আর শেষে দেখিতে হইবে যে, সেই ভাব বা মর্ম্ম জীবের যে হিত সাধনে সক্ষম তাহা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায়ের অসাধ্য। ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্রেরও অভাব থাকিলে তাহা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম নয় বলিয়া পরিত্যাজ্য। মানসিক পরিশ্রম কাতরতায় যাহারা মনের অনুকূল অংশ বিশেষ শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করিয়া নিজের বুদ্ধিকে শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহা সত্য কিনা তাহার বিচার-প্রার্থনা কি দোষাবহ হইবে?

অথচ শাস্ত্র উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য জীবের নিত্যহিত। কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা মানুষের স্বভাবগত দোষ। অর্থ সংগ্রহ ব্যবহারিক সুখের উপায় মাত্র এ সত্যকে ভুলিয়া অর্থকেই উদ্দেশ্য করিলে কৃপণতায় যে দুঃখ দাঁড়ায় ইহা প্রত্যক্ষ। একদিকে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যের বিষয় হইতেছে অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির অগোচর। অন্যদিকে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনুমানসাধ্য বিষয়ে আবদ্ধ। উভয়ের বিষয় ভেদ বশতঃ বিরোধের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রীয় প্রমাণ এমন বাক্য যাহার লক্ষিত বিষয় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর। সেই বিষয়ের সূচক বাক্যের অস্তিত্বই সেই বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ। বিষয়টি সত্য না হইলে সে বিষয়ের কথা কেহ কল্পনাও করিতে সক্ষম নহে। তাহার সত্যতায় কাহারও কোন স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নাই, বরঞ্চ তাহার সত্যতায় বিশ্বাস পরার্থতার উৎপাদক। এদিকে বিজ্ঞানের বিষয় ও তাহার প্রমাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়াই বিরোধের রাজ্যভুক্ত নহে।

যে বিশেষ বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য দেশে বর্ত্তমান বিরোধ তাহা প্রস্তাবান্তরে বিচার্য্য।

---

* বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন হইলে কালীবর বেদান্তবাগীশের "ব্রহ্মসূত্রে" পাওয়া যাইবে।

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

হুয়েনসাঙ

২

বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষের অনুবাদ হইল হুয়েনসাঙের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ। পরমার্থ বসুবন্ধুর যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বসুবন্ধু প্রথমত সর্বাস্তিবাদী বৈভাষিক দলভুক্তই ছিলেন। সর্বাস্তিবাদের সমগ্র ত্রিপিটক তিনি অধ্যয়ন করেন। পরে সৌত্রান্তিক মতটী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক দুইটী মতের সমন্বয় করিয়া নূতন একটী মত গঠন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে উদিত হয়। এই উদ্দেশ্য সৌত্রান্তিকবাদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবার জন্য ছদ্মবেশে তিনি কাশ্মীরে যান। একটী ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘভদ্রের অধীনে তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন প্রসঙ্গে সৌত্রান্তিক মত ক্রমাগত খণ্ডন করিয়া তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিতেন। এই নবাগত ছাত্রের অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘভদ্রের গুরু স্কন্ধিলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়; ক্রমশ তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারেন যে এই ছাত্র বসুবন্ধু ভিন্ন অপর কেহ নয়। তখন তিনি বসুবন্ধুকে নিভৃতে ডাকিয়া পরামর্শ দিলেন যে গোপনে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, নতুবা ঈর্ষাপরবশ হইয়া কেহ তোমাকে হত্যা করিতে পারে। এই আদেশ পাইয়া বসুবন্ধু গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া ৬০০ কারিকাসমন্বিত অভিধর্মকোষ নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন ও তাহা কাশ্মীরে পাঠাইয়া দেন। এই গ্রন্থটী অভিধর্ম মহাবিভাষারই সারমর্ম লইয়া রচিত। কাশ্মীরের রাজা ও তথাকার পণ্ডিতবর্গ প্রথমে বসুবন্ধুর গ্রন্থটী পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হন; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন গ্রন্থটিতে তাঁহাদের মতটাই সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু স্কন্ধিল পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন বসুবন্ধু তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ মানেন না। গ্রন্থটীর যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিয়া তিনি রাজা ও পণ্ডিতবর্গকে জানাইলেন। তাঁহারই পরামর্শে তাঁহারা বসুবন্ধুকে পুনরায় গ্রন্থটীর একটী বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিতে অনুরোধ করেন। সুতরাং বসুবন্ধু সেই শ্লোকগুলির গদ্যে ব্যাখ্যা করিলেন; এই সটীক সংস্করণে আরও কতকগুলি নূতন শ্লোক যোগ করিয়া দেন ও নৈরাত্ম্য সম্বন্ধে একটী নূতন অধ্যায় লেখেন। এই সটীক গ্রন্থটীর নাম হইল অভিধর্মকোষশাস্ত্র। ইহার কারিকাগুলির মধ্যে বৈভাষিকদিগের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু টীকায় বৈভাষিক মত খণ্ডন করিয়া বসুবন্ধু সৌত্রান্তিক মত আংশিকভাবে সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুত বসুবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ; সুতরাং বৈভাষিক বা সৌত্রান্তিক কোনও মতই তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মত সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা প্রয়োজন। বৈভাষিকদিগের মতে অভিধর্মগ্রন্থসমূহ ও তাহার বিভাষাই হইল সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ। সৌত্রান্তিকগণ তাহা মানেন না। তাঁহারা বলেন ব্যক্তি বিশেষের উক্তির মধ্যে ভ্রান্তি থাকাই সম্ভব। বুদ্ধ অভিধর্ম সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ লিখেন নাই; অন্য কাহাকেও লিখিবার জন্য আদেশ করেন নাই। তিনি কয়েকটী সূত্রের মধ্যে তাঁহার অভিধর্ম ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রগুলিই অভিধর্মের মূল মন্ত্র; অর্থ বিনিশ্চয়। এই সূত্রান্তগুলিকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে বলা হয় সৌত্রান্তিক। সৌত্রান্তিক মত বৈভাষিক মতের প্রায় সমসাময়িক; বিভাষার মধ্যে সৌত্রান্তিক পণ্ডিতদিগের উল্লেখ আছে। কিন্তু মনে হয় বৈভাষিক মতটী সুসম্বদ্ধ হইবার পর সৌত্রান্তিক মতের আবির্ভাব হয়। বৈভাষিক গ্রন্থগুলির টীকার মধ্যেই সাধারণত সৌত্রান্তিক মত দেখিতে পাওয়া যায়, মূল গ্রন্থের মধ্যে নয়। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকদিগের মধ্যে যে সকল মতগত প্রভেদ আছে তাহার মধ্যে প্রধান এই যে বৈভাষিকগণ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব, সত্ত্বা স্বীকার করিয়া লন,

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

তাঁহারা বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষত্বে আস্থাবান্। সৌত্রান্তিকগণের মতে বাহ্যবস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই, উহা মনেরই প্রতিবিম্ব, মন দ্বারা তাহা অনুমেয়। সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব স্বীকার করেন; বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করা যায় না ইহাই তাঁহাদের মত।

অভিধর্মকোষের মূল যে সংস্কৃত গ্রন্থখানি পাওয়া যায় তাহাতে কারিকাগুলি রহিয়াছে, কিন্তু টীকা পাওয়া যায় না। তিব্বতীতে টীকা রহিয়াছে। রুশীয় পণ্ডিত Stcherbatsky তাঁহার বৌদ্ধধর্মবিষয়ক বহুগ্রন্থে ঐ তিব্বতী টীকার সাহায্য লইয়াছেন। হুয়েনসাঙের অনুবাদে কারিকা ও টীকা দুই রহিয়াছে। তাঁহার সমগ্র চীনা অনুবাদটী ফরাসী পণ্ডিত Poussin ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অভিধর্মকোষে নয়টী অধ্যায় রহিয়াছে, আটটী অধ্যায়ে ৬০২টী কারিকা, গদ্যে কারিকাগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে কারিকা নাই; সমস্ত অধ্যায় গদ্যে লিখিত। প্রথম অধ্যায় হইল ধাতুনির্দেশ। ইহাতে বিভিন্ন বস্তুর সত্তার প্রকৃতি নির্দেশ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটী কারিকা। দ্বিতীয় অধ্যায় ইন্দ্রিয়নির্দেশ। ইহাতে চুয়াত্তরটী কারিকা। এই দুইটী অধ্যায়ে সংক্ষেপে সাশ্রব ও অনাশ্রব—প্রাকৃতিক সুতরাং অপবিত্র, ও অলৌকিক বা পবিত্রের প্রভেদ দেখান হইয়াছে। প্রাকৃতিক অপবিত্রতাই হইল সংসার, অলৌকিক পবিত্রতা হইল নির্বাণ। তৃতীয় অধ্যায় লোকনির্দেশে বলা হইয়াছে যে এই পৃথিবী (লোকের) উদ্ভব সাশ্রব হইতে। এই অধ্যায়ে বিরানব্বইটী কারিকা। চতুর্থ অধ্যায় কর্মনির্দেশে দেখান হইয়াছে যে সাশ্রব বা সংসারের মূল কারণ হইল কর্ম। ইহাতে একশত বত্রিশটী কারিকা। পঞ্চম অধ্যায় অনুশয়নির্দেশে বলা হইয়াছে যে কতকগুলি অন্যায় (পাপ) সংসারসৃষ্টির অন্যতম নিমিত্ত; প্রত্যয় বা Condition। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম—এই তিন অধ্যায়ে সংসার-সৃষ্টির যাবতীয় কারণ ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায় আর্য্যপুদ্গলনির্দেশ। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে অনাশ্রব বা নির্বাণের ফলেই অর্হত্ব প্রাপ্তি হয়। তিরাশীটি কারিকা ইহাতে আছে। সপ্তম অধ্যায় জ্ঞাননির্দেশে দেখান হইয়াছে যে অনাশ্রব বা নির্বাণের হেতু হইল জ্ঞান। ইহাতে ৬১টী কারিকা। অষ্টম অধ্যায় সমাধিনির্দেশ। ইহাতে নির্দেশ করা হইয়াছে যে সমাধি, ধ্যান নির্বাণ প্রাপ্তির অন্যতম নিমিত্ত বা প্রত্যয়। ইহাতে উনচল্লিশটী কারিকা। নবম অধ্যায়ে কারিকা নাই। সাংখ্য, বৈশেষিক ও বাৎসী-পুত্রীয়দিগের আত্মবিষয়ক মতটী ইহাতে খণ্ডন করা হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি বসুবন্ধু ছিলেন নির্ভীক, স্বাধীন-চিন্তা-পরায়ণ। প্রয়োজন হইলে তিনি অসঙ্কোচে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মত খণ্ডন করিতেন। তাঁহার অভিধর্মকোষ বাহির হইবার পর সর্বাস্তিবাদিদিগের মধ্যে ইহার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিতে লাগিল। তখন মধ্যভারতে একজন শ্রেষ্ঠ বৈভাষিক ছিলেন; তাঁহার নাম সঙ্ঘভদ্র। পরমার্থ বসুবন্ধুর জীবনীতে লিখিয়াছেন যে সঙ্ঘভদ্র দুইটী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহাতে কোষের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া বিভাষার মত প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ শুনা যায় যে তিনি বসুবন্ধুকে বাগ্‌যুদ্ধে আহ্বান করেন; বসুবন্ধু বার্দ্ধক্যের ওজুহাতে সে আহ্বান গ্রহণ করেন নাই। সঙ্ঘভদ্রের গ্রন্থটীর নাম ন্যায়ানুসার। হুয়েনসাঙ্ বলেন যে প্রথমে ইহার নাম ছিল কোষ-করকা অর্থাৎ কোষের উপর শিলাবৃষ্টি। পরে মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সঙ্ঘভদ্র ঐ নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ন্যায়ানুসার রাখেন। সঙ্ঘভদ্রের অন্য গ্রন্থটী হইল সময়প্রদীপিকা। ইহাতেও বিভাষার মত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "ন্যায়ানুসার নামক একটী গ্রন্থ আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। দার্শনিক আলোচনা যাঁহারা করিতে চান তাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। তবে ঐ বিপুল গ্রন্থের বৃহৎ বৃহৎ বাক্যসমন্বিত ব্যূহভেদ করা কিঞ্চিৎ কঠিন, বহু আয়াসসাপেক্ষ। সুতরাং রচনা সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া আমি পুনরায় সময়প্রদীপিকা সঙ্কলন করিলাম। বসুবন্ধুর কারিকা হইতে আমি এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। ন্যায়ানুসারে যে সকল বিস্তৃত যুক্তিতর্কের দ্বারা বিষয়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিতর্ক এই গ্রন্থে বাদ দিয়াছি, বসুবন্ধুর মতের

ঠিক পরেই আমাদের মতটী দিয়াছি; ইহাতে মতটী সুস্পষ্টতর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।" সঙ্ঘভদ্রের দুইটী গ্রন্থই হুয়েনসাঙ্ অনুবাদ করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থ দুইটী এখন পাওয়া যায় না; উহাদের পরিচয় পাওয়া যায় হুয়েনসাঙের অনুবাদ হইতে। উল্লিখিত ভূমিকার অংশটুকু হুয়েনসাঙের অনুবাদ হইতেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

সর্বাস্তিবাদের বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় শাখার প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই হুয়েনসাঙ্ অনুবাদ করেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি এখন পাওয়া যায় না; এই সকল শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের পরিচয় আমরা হুয়েনসাঙের নিকট হইতে লাভ করি। এককালে ভারতের সর্বত্র সর্বাস্তিবাদ দর্শনের বহুল প্রভাব ছিল; মধ্যএশিয়া, ভারতদ্বীপপুঞ্জ ও চীনেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। সমগ্র এশিয়ার বৌদ্ধদিগের মধ্যে সর্বাস্তিবাদ বিনয়ের সমধিক প্রচলন ছিল। হুয়েনসাঙ যখন সর্বাস্তিবাদের গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন তখন কিন্তু সর্বাস্তিবাদশাখা লুপ্তপ্রায়, যোগাচারবাদ তখন প্রাধান্য লাভ করিতেছে। কিন্তু দর্শনও মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া সর্বাস্তিবাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার করিতে হয়। হুয়েনসাঙ্ স্বয়ং ছিলেন বিজ্ঞানবাদ যোগাচার-শাখাভুক্ত, অথচ সর্বাস্তিবাদের প্রায় সমগ্র গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন।

অশ্বঘোষের সময় হইতেই বিজ্ঞানবাদের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রকৃত প্রবর্ত্তক হইলেন বসুবন্ধুর অগ্রজ অসঙ্গ। বসুবন্ধু এই অগ্রজ ভ্রাতার প্রভাবে ক্রমশ মহাযানমতে দীক্ষিত হন। আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি ক্রমশ বৈভাষিক হইতে সৌত্রান্তিক মতে উপনীত হন, আবার সৌত্রান্তিক মত হইতে ক্রমশ বিজ্ঞানবাদে তাঁহার মন পরিণতি লাভ করে। মহাযানবাদিগণ বলেন যে প্রকৃত সাধক কেবল হীনযানমতে তৃপ্ত হইতে পারেন না হীনযান সাধককে সিদ্ধিদুর্গের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র, মহাযানই সিদ্ধির বিমল আনন্দে মনকে ভরিয়া তুলিতে পারে। সুতরাং বসুবন্ধুর জিজ্ঞাসু মন মহাযানবাদে উপনীত হইয়া তবে তৃপ্তিলাভ করিল। মহা-[illegible] প্রায় সকলই তাঁহার রচিত। তাঁহার ও অসঙ্গের মূল গ্রন্থগুলি অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। যোগাচারের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির চীনা অনুবাদই আমাদের সেই বিষয়ে জানিবার একমাত্র সম্বল। ইহার জন্য হুয়েনসাঙের নিকট আমরা কতদূর ঋণী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই শাখার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ হইল যোগাচার-ভূমিশাস্ত্র। ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় অসঙ্গের নিকট আবির্ভূত হইয়া ইহা ব্যাখ্যা করেন এইরূপ প্রবাদ। এই মৈত্রেয় তুষিত স্বর্গে যান তথা হইতে বাণী বহন করিয়া আনিবার জন্য। গ্রন্থখানিতে যোগসাধনের বিবরণ পাওয়া যায়। যোগসাধনের দ্বারা সাধক একে একে সতেরটী স্তর বা ভূমি অতিক্রম করেন। হুয়েনসাঙ্ এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন।

মহাযানসম্পরিগ্রহ নামক অপর একখানি গ্রন্থে অসঙ্গ তাঁহার সমগ্র দর্শনটী সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করেন। হুয়েনসাঙ্ এই গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন। তাঁহার পূর্বে দুইবার ইহার অনুবাদ হইয়া যায়। ৫৩১খৃষ্টাব্দে বুদ্ধশান্ত প্রথম অনুবাদ করেন, পরে পরমার্থ করেন ৫৬৩ খৃষ্টাব্দে। অসঙ্গের এই গ্রন্থটী তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। বোধিসত্ত্ব Wu-hsi (অগোত্র ?) ইহার এক টীকা লিখেন। হুয়েনসাঙ্ তাহার অনুবাদ করেন। ইহার অপর টীকাটী বসুবন্ধুরচিত। বসুবন্ধুর টীকার তিনবার চীনা অনুবাদ হয়। প্রথম করেন পরমার্থ, তৎপরে ধর্মগুপ্ত, সর্ব্বশেষে হুয়েনসাঙ্। চীনা ত্রিপিটকে এই চারিটী অনুবাদ এক জায়গায় রহিয়াছে।

প্রকরণআর্য্যবাচা নামক গ্রন্থে অসঙ্গ ব্যবহারিক নীতির দিক্ দিয়া যোগাচার মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হুয়েনসাঙ্ ইহার অনুবাদ করেন।

অসঙ্গের অভিধর্মসঙ্গীতিসূত্র ও স্থিতমতি কর্ত্তৃক তাহার ব্যাখ্যারও অনুবাদ হুয়েনসাঙ্ করেন। মধ্যান্ত-বিভঙ্গশাস্ত্রগ্রন্থ মৈত্রেয়ের লিখিত বলিয়া প্রবাদ; বস্তুত উহা অসঙ্গের রচনা। বসুবন্ধু উহার উপর যে টীকা লিখেন তাহা মূল গ্রন্থটী অপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। বসুবন্ধুর টীকার অনুবাদ পরমার্থ পূর্বে করিয়াছিলেন, কিন্তু

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

অসঙ্গের কারিকা ও তৎসঙ্গে বসুবন্ধুর টীকার অনুবাদ হুয়েনসাঙ্‌ প্রথম করেন।

বসুবন্ধু যোগাচারবাদের প্রধান গ্রন্থসমূহের টীকা লিখেন বটে, কিন্তু কেবল টীকা লিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি লিখিয়া যান। বস্তুত প্রজ্ঞাপারমিতার শূন্যতাবাদকে নাগার্জুন যেমন একটী দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, তেমনই বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের একটী সুসম্বদ্ধ দার্শনিক আকার দিয়া যান। বসুবন্ধুর কয়েকটী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অনুবাদ বোধিরুচি ও পরমার্থ পূর্বে করেন। তাঁহার বিজ্ঞপ্তিমাত্র-সিদ্ধি হুয়েনসাঙ্‌ অনুবাদ করেন; তাঁহার পূর্বে দুইবার ইহার অনুবাদ হইয়া যায়। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে বাস্তব অবাস্তব সকল পদার্থের উদ্ভব মন হইতে। মনের ক্রিয়া অনুসারে তাহাকে আটটী বিজ্ঞানে ভাগ করা হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সম্পর্কীয় পাঁচটী বিজ্ঞান; ষষ্ঠ হইল মনোবিজ্ঞান, সপ্তম ক্লিষ্টমনোবিজ্ঞান, অষ্টম আলয়বিজ্ঞান। এই অষ্টম মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই সকল ঘটনা (Phenomena), সকল বস্তুর বীজ নিহিত আছে; ইহা হইতেই দৃশ্যমান জগৎ আবির্ভূত হয়। এই বস্তুজগৎকে সত্যজ্ঞান করিয়া ইহার সম্ভোগে শান্তি পাইবার জন্য মানব বৃথা প্রয়াস পায়; ইহার পশ্চাতে অযথা ঘুরিয়া মরে। যদি সে একবার বুঝিতে পারে যে জগৎ সংসার তাহার মনেরই প্রতিবিম্ব, ইহার বিভিন্ন অস্তিত্ব নাই, তবে তাহার মনের আটটী বিজ্ঞান আর পরস্পরের বিরোধীরূপ ধরে না; তাহারা সম্মিলিতভাবে মনকে জ্ঞানের পথে লইয়া যায়; তখন বাক্য-মনের ঊর্দ্ধে উঠিয়া তথাতার সমগ্র রূপটী উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

হুয়েনসাঙ্‌ যখন ভারতে আসেন তখন যোগাচারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তখন এই মতটী সমর্থন করিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে ছিলেন। নালন্দা ছিল তখন যোগাচারবাদের কেন্দ্রভূমি। সেখানে হুয়েনসাঙের সহিত যোগাচার পণ্ডিতদিগের কয়েক-জনের আলাপ হয়। ভারতে হুয়েনসাঙের গুরু শীল-ভদ্র ছিলেন নালন্দার বিখ্যাত যোগাচারী পণ্ডিত ধর্মপালের শিষ্য। ধর্মপাল আর্য্যদেবের শতশাস্ত্রের এক টীকা লিখেন; হুয়েনসাঙ্‌ তাহার অনুবাদ করেন। আর্য্যদেব ছিলেন নাগার্জুনের শিষ্য; মধ্যমক দর্শনের পৃষ্ঠপোষক। হুয়েনসাঙ্‌ মধ্যমক দর্শনের আর কোনও গ্রন্থ অনুবাদ করেন নাই। সহসা আর্য্যদেবের গ্রন্থের ঐ টীকা কেন অনুবাদ করিলেন এ সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে। বস্তুত ধর্মপাল যে টীকা লিখেন তাহাতে যোগাচার মতই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং হুয়েনসাঙ্‌ তাহার অনুবাদ করেন। চীনে যোগাচার মতের যে প্রসার হইয়াছিল তাহা হুয়েসাঙেরই প্রচেষ্টার ফলে। এমন কি জাপান হইতে দলে দলে ছাত্র আসিত তাঁহার নিকট এই দর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্য। চীনে যোগাচার শাখার নাম হইল Fa-hsiang (ধর্মলক্ষণ): জাপানে ইহার নাম Hosso।

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার ইতিহাস জানিবার আগ্রহ চীনের সকল বৌদ্ধের না থাকিলেও তথাকার পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্‌ শ্রমণগণ চাহিতেন যে তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও সঙ্ঘের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবেন। সংস্কৃতে বসুমিত্রের লিখিত বৌদ্ধধর্মের একটী ইতিহাস ছিল। মূল গ্রন্থখানি হারাইয়া গিয়াছে। গ্রন্থটীর চীনা নাম হইতেছে **I-pu-tsung-lun-lun**; উহার মূল নাম সম্ভবত অষ্টাদশনিকায়সূত্র। ইহার তিনটী চীনা অনুবাদ রহিয়াছে। প্রথম অনুবাদটী কুমারজীবের এইরূপ কিম্বদন্তী; কিন্তু অনেকের মতে এই অনুমান ভ্রমাত্মক। চীনা গ্রন্থের তালিকাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য যেটী সেই Kai-yuen-lu নামক তালিকায় দেখা যায় যে চিন (Chin) রাজত্বের সময় এক অজ্ঞাতনামা লেখক ইহার অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় অনুবাদটী পরমার্থের। তৃতীয়বার অনুবাদ করেন হুয়েনসাঙ্‌। এই গ্রন্থখানিতে বসুমিত্র প্রথমে বিভিন্ন বৌদ্ধ-শাখাগুলির উৎপত্তির কারণ এবং আনুমানিক সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তৎপরে প্রত্যেকটী শাখার মতগুলি প্রথমে যেরূপ ছিল তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমশ পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের হস্তে সেই মতগুলির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন মতগুলির ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়াতে

অনেকের নিকট ইহাগুলি দুর্বোধ্য মনে হয়। এই কারণেই সম্ভবত পরমার্থ ইহার একটী টীকা লিখেন। এখন সেই টীকাটী পাওয়া যায় না; তবে হুয়েনসাঙের সহকর্মী Kwei-chi পরমার্থের এই টীকার সাহায্যে অপর একটী টীকা প্রস্তুত করেন। চীনে ও জাপানে এখন বসুমিত্রের এই গ্রন্থের বহু উৎকৃষ্ট টীকা রহিয়াছে। গ্রন্থখানি বাস্তবিকই মূল্যবান, কারণ ইহা হইতে বৌদ্ধমতের বিভিন্ন শাখার ইতিহাস ও তাহাদের বিভিন্ন দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সুযোগ হইলে পৃথক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করা যাইবে। এখন এই গ্রন্থের রচয়িতা বসুমিত্র যে কে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। চীনা পণ্ডিতগণের মতে বসুমিত্র নামক পাঁচজন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থের লেখক যে-বসুমিত্র, তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে কণিষ্কের সময় ছিলেন। যে চারিজন স্থবির মহাবিভাষা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, এই বসুমিত্র তাঁহাদিগের অন্যতম। কণিষ্কের রাজত্বকালে যে সভায় বিভিন্ন শাখার তর্কবিতর্ক, দ্বন্দ্ব-বিরোধের মীমাংসা হয়, বসুমিত্র ছিলেন সেই সভার সভাপতি। এই সভার সভাপতিরূপে বসুমিত্রের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন মত জানিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের শাখাগুলির ইতিহাস ও তাহাদের মতামত সম্বন্ধে লিখিবার পক্ষে তিনিই উপযুক্ত ছিলেন।

হুয়েনসাঙ্ আর একটী মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। মহাঅর্হন্ নন্দীমিত্র একটী গ্রন্থে ধর্ম্ম রক্ষার ইতিহাস বিবৃত করেন। এই নন্দীমিত্র ছিলেন সিংহলবাসী। বুদ্ধের পরিনির্বাণের আটশত বৎসর পরে নন্দীমিত্র ছিলেন রাজা প্রসেনজিতের রাজধানীতে—এইরূপ প্রবাদ। গ্রন্থখানির ভূমিকায় আমরা দেখি নন্দীমিত্র একদল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে বলিতেছেন যে পরিনির্বাণের পূর্বে স্বয়ং বুদ্ধ ষোল জন অর্হতের নিকট ধর্ম্ম বিবৃত করিয়া ইহা রক্ষা করিবার ভার তাঁহাদের উপর দিয়া যান। এখন, অর্হৎমাত্রেই হীনযানবাদী; সুতরাং কেহ কেহ বলেন যে নন্দীমিত্রের এই গ্রন্থ হীনযান শাখার অন্তর্গত। কিন্তু লেভী ও শাভান্ [illegible] অনুবাদ করিয়াছিলেন [illegible] গ্রন্থটী একটী মহাযানসূত্র। পণ্ডিত প্রবর Vi[illegible] মহাযান ও হীনযান সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্রন্থখানি মহাযানবাদী কোনও এক ব্যক্তিরই লেখা। অর্হৎদিগকে তাঁহার মতভুক্ত করিয়া লইয়া তিনি দুইটী মতের সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। এই সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া তিনি অর্হৎদিগের স্বরূপ বদলাইয়া দিয়াছেন। অর্হৎগণ নির্বাণপ্রার্থী, তাঁহারা চান সত্বর নির্বাণ লাভ করিতে; কিন্তু এই গ্রন্থে অর্হৎগণের উপর ধর্মরক্ষার ভার ন্যস্ত করাতে তাঁহাদের লক্ষ্য আর কেবল নির্বাণলাভ রহিল না; পৃথিবীতে থাকিয়া ধর্মরক্ষা ও ধর্মার্থীদিগের মঙ্গলসাধন হইল তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে এইরূপ সামঞ্জস্য সাধন দ্বারা ধর্মের প্রসার করিবার আগ্রহ আরও অন্যত্র দেখা যায়। যদিও ধর্মরক্ষার্থে তাঁহাদের বোধিসত্ত্বগণ অহরহ নিযুক্ত থাকিতেন, তথাপি অর্হৎদিগকে তাঁহাদিগের সমশ্রেণীতে বসাইয়া দক্ষিণভারতীয় বৌদ্ধমতটীর সহিত উত্তরের যোগসাধন করিতে তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছেন।

হুয়েনসাঙ্ কেবল ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিরই আলোচনা ও অনুবাদ করেন নাই। বসুমিত্র ও নন্দীমিত্রের গ্রন্থদুইটী যে অনুবাদ করিয়াছেন ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ঐতিহাসিক গ্রন্থও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহা ব্যতীত ন্যায় ও বৈশেষিকের কয়েকটী মূল্যবান গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত যে হিন্দুদার্শনিকদিগের বাক্‌যুদ্ধ চলিত তাহার মধ্যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণই ছিলেন প্রধান। ইঁহাদিগের সহিত বিরোধের ঘর্ষণে ক্রমশ বৌদ্ধদিগের নিজস্ব একটী ন্যায়শাস্ত্র গড়িয়া উঠে। তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধদিগের সমগ্র ন্যায়গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। বৌদ্ধন্যায়ের প্রবর্ত্তক হইলেন দিঙ্‌নাগ। হুয়েনসাঙ্ দিঙ্‌নাগের দুইটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন; একটী হইল ন্যায়দ্বারতর্কশাস্ত্র, অপরটী আলম্বনপরীক্ষা বা আলম্বন-প্রত্যয়ধ্যানশাস্ত্র। দ্বিতীয় গ্রন্থটী পরমার্থ [illegible] ন্যায়দ্বার নামক গ্রন্থখানি

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি পদ্যে লিখিত, তিব্বতীতে সম্ভবত ইহার অনুবাদ নাই।

ন্যায়প্রবেশ নামক অপর একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ হুয়েনসাঙ্ অনুবাদ করেন। গ্রন্থখানি দিঙ্‌নাগের রচিত এইরূপ ধারণা এতদিন চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু চীনা পণ্ডিতগণের মতে উহা শঙ্করস্বামী নামক দিঙ্‌নাগের এক শিষ্যের রচিত। হুয়েনসাঙের শিষ্য Kwei chi ন্যায়-প্রবেশের যে টীকা লিখেন তাহাতে স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন যে শঙ্করস্বামী ইহার রচয়িতা। রুশীয় পণ্ডিত Tubianski গ্রন্থের মধ্য হইতে ও বাহিরের নানাপ্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ন্যায়প্রবেশ দিঙ্‌নাগের রচিত নয়। মূল গ্রন্থখানি লুপ্তই মনে করা হইত কিন্তু সম্প্রতি হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধ্রুব এই মূল গ্রন্থটি উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করেন। বিশ্ব-ভারতীর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ইহার তিব্বতী সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ও ইংরাজ পণ্ডিত Kieth-এর মতে দিঙ্‌নাগই ইহার রচয়িতা। হুয়েনসাঙের অনূদিত এই গ্রন্থ কয়টীর উপর চীনা ও জাপানী ভাষায় বহু টীকা রচিত হইয়াছে এবং ন্যায়ের বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। জাপানের ওটানী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে চীনা ও জাপানী ভাষায় লিখিত ১২০টী ন্যায়ের গ্রন্থ আছে।

হিন্দু দর্শনে ন্যায় ও বৈশেষিকের যোগ অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং হুয়েনসাঙ্ বৈশেষিকের একখানি গ্রন্থও অনুবাদ করেন। চীন ভাষায় বৈশেষিকের এই একটী মাত্র গ্রন্থই রহিয়াছে। তবে বৌদ্ধ দার্শনিক দিগের গ্রন্থা-বলীর মধ্যে বৈশেষিকের উল্লেখ সর্বত্র পাওয়া যায়; কারণ বৈশেষিক মতই ছিল তাঁহাদিগের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। হুয়েনসাঙ্ যে গ্রন্থটী অনুবাদ করেন তাঁহার নাম দশপদার্থীবৈশেষিকসূত্র; জ্ঞানচন্দ্র অথবা মতিচন্দ্র ছিলেন ইহার রচয়িতা। জাপানী অধ্যাপক Ui বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মতিচন্দ্র ছিলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে; ইহার পূর্বে নয়।

আমরা জানি হিন্দুবৈশেষিকদর্শনে ষট্‌পদার্থের মাত্র উল্লেখ আছে, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সত্ব বা ভাব, সামান্য বিশেষ ও লক্ষণ। ঋষি উলুক বা কণাদ এই ষট্‌পদার্থী দর্শন প্রবর্ত্তন করেন। কণাদের নিকট হইতে পঞ্চশিখী তাহা শিক্ষা করেন। কিন্তু মতিচন্দ্রের গ্রন্থখানি হইল দশপদার্থীবৈশেষিক সূত্র। তবে হুয়েনসাঙের এই গ্রন্থের চীনা অনুবাদের সহিত কণাদের সূত্রগুলির অনেক স্থলে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। Kwei-chi বলেন যে পঞ্চশিখীর পর ক্রমশ বৈশেষিক দর্শন আঠারটী শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। জ্ঞানচন্দ্র বা মতিচন্দ্র সম্ভবত ঐরূপ একটী শাখার প্রবর্ত্তক ছিলেন। মূল দর্শনের ছয়টী পদার্থের সহিত তিনি আরও চারটী যোগ করিয়া দিয়াছেন, যথা,—শক্তি (Potentiality), অশক্তি, সামান্য অবিশেষ (Commonness) ও অভাব। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখ নাই; এ স্থলেও মূল বৈশেষিক সূত্রের সহিত ইহার প্রভেদ। ফলত মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে, যোগ বা যোগী সম্বন্ধে ইহাতে কোনও আলোচনা নাই। চীনা বৌদ্ধগণ ইহার কোনও টীকা লিখিয়া যান নাই। পরবর্ত্তীকালে জাপানী ভাষায় ইহার দশটী টীকা রচিত হইয়াছে। একখানি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত।

হুয়েনসাঙের অনূদিত সকল গ্রন্থের বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়; কয়েকটী মাত্র গ্রন্থের আলোচনা আমরা করিলাম। বৌদ্ধধর্ম যখন ধ্বংসোন্মুখ, সেই সময় হুয়েনসাঙ্ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে মূল্যবান্ বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সুযোগ তিনি হারাইলেন না। আমরা জানি শত শত পুঁথি তিনি সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যান। বৌদ্ধধর্মের মূল সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ, বিশেষত দার্শনিক গ্রন্থাবলী, ভারত ও চীন হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চীনা অনুবাদগুলি থাকায় সেই সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে নাই। যে বিদ্বৎমণ্ডলী প্রাচীন হিন্দুসাহিত্য উত্তমরূপে আলোচনা করিতে যান তাঁহাদিগকে ঐ সকল চীনা অনুবাদের আশ্রয় লইতে হয়।

কেবল পুঁথি অনুবাদ করিয়াই হুয়েনসাঙ্ ক্ষান্ত হন নাই। একদল শিষ্য তিনি তৈয়ারী করিয়া যান। যে সকল জাপানী শ্রমণ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া যান, তাঁহারাই জাপানে যোগাচার দর্শনের প্রবর্ত্তন করেন।

হারিয়ে যাওয়া

শ্রীউমা দেবী

ভোরের বেলা পুব আকাশে
শুক-তারাটির পানে
কেন যে চায় নয়ন আমার
নয়ন তাহা জানে ;
ওম্নিতর আঁখির আগে
ক্ষণেক তরে এসে
যে আমারে দেখা দিয়ে
পালিয়ে গেছে হেসে,
মুখখানি তার দেয় উঁকি যে
আমার প্রাণে প্রাণে—
কেন যে চায় নয়ন আমার
নয়ন তাহা জানে।

কোন্ ফুলটি ফোটে আমার
আঙিনাটির পাশে,
গন্ধটি তার সাঁঝের বায়ে
ভাসিয়ে নিয়ে আসে ;
মনে পড়ে এম্নি ক'রে
রিক্ত ক'রে দিয়ে
যে জন আমার গেছে চলে
কবে বিদায় নিয়ে,
পরশ তাহার রেখে গেছে
ফুলের মধু বাসে,
সাঁঝের বায়ে গন্ধটি তার
ভাসিয়ে নিয়ে আসে।

আঁধার ঘরে প্রদীপ শিখা
যখন ওঠে জ্বলে,
ক্ষীণ আলোটি স্মৃতির কানে
কি কথা যায় বলে ?
বলে মোরে—এম্নি ক'রে
প্রদীপ-শিখা রূপে
আঁধার বুকে জ্বালিয়ে আলো
থাকত যে গো চুপে !
কখন্ প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে
সে গেছে আজ চলে,
প্রদীপ-শিখা স্মৃতির কানে
সেই কথা যায় বলে।

মধ্য দিনের রোদের বেলা
নীল আকাশের গায়,
কোন্ পাখীটি কোন্ দেশেতে
কোথায় উড়ে যায় ;
তার ঠিকানা কোথায় আছে
জানে কি সেই পাখী,
এম্নি ক'রে আর কতকাল
রাখবে দিয়ে ফাঁকি— !
সে ছিল যে নীল পাখী মোর
বুকের খাঁচাটায়—
তার স্মৃতিটির আভাস দিয়ে
পাখী কোথায় যায় !

দুঃখ দিনের শান্তি আমার
সুখেরি জয়টিকা—
বুকের খাঁচার নীল পাখীটি
অন্ধকারের শিখা !
ফুলের গন্ধ শুকতারা সে
প্রাণের প্রিয় ধন ;
কোন অজানায় লুকিয়ে আছে
চির জানার জন !
হয়তো তারে দেখছি হেথায়
নূতন কোনো রূপে,
হারিয়ে গিয়েও দেখা দিয়ে
যাচ্ছে সে কি চুপে ?

অন্ধদের দেশ

—গল্প—

—শ্রীবিমল সেন

১

খাড়া, পিছল পাহাড়ের পথ। চল্‌তে চল্‌তে পা ফস্‌কে হঠাৎ সে একহাজার ফিট্‌ নীচে গড়িয়ে নেবে এল।

এততেও তার প্রাণ গেল না, দেহের একখানি হাড় পর্য্যন্ত ভাঙল না। শুধু পতনের বেগে সে নিঃসংজ্ঞ হ'য়ে পড়্‌ল। একরাশি বরফ তুলার ন্যায় নরম তাকে মায়ের মত পরম স্নেহে জড়িয়ে রেখেছিল, তাই দেহে আঘাত লাগেনি।

যখন তার সংজ্ঞা হ'ল, মনে হল সে যেন রোগ-শয্যায় শুয়ে আছে। দেহ তার বড় দুর্ব্বল। তারপর আকাশের বুকে তারার আলো জ্বলে উঠ্‌ল। তখন তার খেয়াল হ'ল—সে পা পিছ্‌লে প'ড়ে গেছে। অনেক নীচে, অনেক নীচে। শূন্যদৃষ্টিতে একবার সে ঊর্দ্ধ পর্ব্বত-শৃঙ্গের দিকে চোখ তুলে চাইলে। কী সুন্দর, মহান্‌, বিরাট দৃশ্য! তার বুক ফেটে করুণ হাসির স্রোত উথ্‌লে উঠ্‌ল।

নীচে উপত্যকার বুকে চাঁদের আলো ঝল্‌-মল্‌ কচ্ছে। আরো নীচে আধো অন্ধকার, অন্ধকারের কোলে তৃণশয্যা। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকৃছে তাকে।

বেদনাতুর দেহভার বহন ক'রে সে এসে সেই তৃণশয্যায় লুটিয়ে পড়্‌ল। গভীর ঘুমে রাত কেটে গেল।

সকালে উঠে শরীরটা তার একটু তাজা মনে হ'ল।

পাহাড়ের চড়াই-উংরাই পার হ'য়ে হ'য়ে যখন সে এসে নীচেকার সমভূমিতে দাঁড়াল, তখন সূর্য্য মধ্য আকাশে উঠেছে। তার ভারি পিপাসা পেল। সাম্নেই নির্ম্মল ঝর্ণা, দুহাতে আচ্‌লা ক'রে সে আশ্‌ মিটিয়ে জল খেয়ে নিলে।

তারপর চেয়ে দেখ্‌লে—সামে তার এক অদ্ভুত রাজ্য।

২

সারি সারি সবুজ মাঠ, সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছে ভরা। চারিদিকে খাড়া-পাহাড়ের বেষ্টনী,—তার ফাটল দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে জল পড়্‌ছে [illegible] জলে মাঠের মাটি [illegible] সরস হচ্ছে। মাঝে মাঝে উঁচু জায়গায় 'লামা'গুলি চ'রে বেড়াচ্ছে। পথ চলেছে মাঠের বুকে,—কোনটা বা কালো পাথরে মোড়া, কোন্‌টা বা শাদা পাথরে সুন্দররূপে সাজানো। তারি বড় একটা রাস্তার দুপাশে সারি সারি ঘর— যেমনি সুদৃঢ়, তেমনি শোভন। কিন্তু তার একখানিতেও জানালা নেই, আর দেয়ালে নানা রকমের রঙ এলো-মেলো ভাবে বসিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। নীল, হরিৎ, ধূসর, কালো যেন তার বুকে লুকোচুরি খেল্‌ছে।

সে ভাবলে—দেয়ালে রঙ বসিয়েছিলে কে গো? তোমার কি চোখ ছিল না! ওগো অন্ধ।

এমনি ক'রে তার মনের দুয়ারে এসে ধাক্কা দিলে—এরা কি অন্ধ? এরা কি অন্ধ?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে আর একটু নীচে নেমে এলো।

দূরে মাঠের বুকে স্তূপীকৃত ঘাসের উপর একদল নর-নারী ব'সে জটলা কচ্ছে। মাঝখানে কতগুলি ছেলেমেয়ে নাচানাচি কচ্ছে, আর একেবারে সামনেই দেয়ালের গা-ঘেঁসে যে পথ—তার উপর দিয়ে চলেছে তিনটি লোক তিনটি পাত্র হাতে নিয়ে। একলাইন্‌ হ'য়ে একের পিছনে আর একজন ধীরে ধীরে চলেছে তারা বাড়ীর দিকে। 'লামা'র পোষাক তাদের পরিধানে, পায়ে জুতো, কোমরে বন্ধনী, মাথায় টুপী—শাদা এবং কালো কর্ণাচ্ছাদনী বসানো। তাদের চলাফেরার ভিতর দিয়ে একটা সম্পদ এবং সম্ভ্রমের ভাব বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

নুনেজ—তাই ছিল তার নাম—নুনেজ একটা পাথরের উপর খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল, তারপর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতলবে একটা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। সমস্ত উপত্যকার বুকে তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠ্‌ল।

লোক তিনটি থাম্‌লো, কানখাড়া ক'রে দাঁড়ালো, মাথা ঘোরালো যেন তাদের চারিদিকটা ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছে। একবার মুখ এদিক ফেরাচ্ছে, আবার ওদিক ফেরাচ্ছে। লুনেজ নানান্ রকম মুখভঙ্গী করতে লাগ্‌লো, কিন্তু কী আশ্চর্য্য, তাদের কেউ তা চোখেই পড়্‌ছেনা। লুনেজের আবার মনে হল, ওরা কি অন্ধ!

লোক তিনটি চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—যেন শব্দের উত্তর তারা শব্দ দিয়েই দিচ্ছে। লুনেজ্ আবার চীৎকার কর্‌লে, লোক তিনটিও চীৎকার ক'রে তার জবাব দিলে। কিন্তু চোখ তুলে চাইল না!

ভয়ানক খাপ্পা হ'য়ে লুনেজ পাহাড় বেয়ে নীচে নেবে এল। একটা জলস্রোত ছিল, তা পার হ'য়ে যখন তাদের সাম্‌নে এল, তখন তার উপলব্ধি হ'ল, এই সেই অন্ধদের দেশ, যার কথা উপকথায় সে পড়েছে। নইলে সে সাম্‌নে এল, অথচ লোক তিনটি তার দিকে ভুলেও না চেয়ে কান খাড়া ক'রে দাঁড়াবে কেন? তারা যেন তার পায়ের শব্দ শুন্‌চে। মুখে তাদের ভয়ের রেখা, চোখের পাতা নীচু এবং বোজা, তারকাগুলি যেন একেবারে ডুবে গেছে। তাদের একজন তখন বল্লে,—মানুষ, মানুষ বা অন্য কোন স্পিরিট্ নেবে এসেছে পাহাড় থেকে।

লুনেজ আরো এগিয়ে এল। তার মনে পড়্‌ল উপকথার সেই ছড়া। কি মজা ভাই কি মজা?

এক যে আছে আঁধিয়া দেশ, একচোখো ভাই তার রাজা।

এই ত অন্ধদের দেশ—তাকে রাজা কর্‌বেন ব'লেই বুঝি ভগবান্ তাকে হেথায় এনেছেন। এগিয়ে সে লোক তিনটিকে অভিবাদন কর্‌লে।

একজন বল্‌লে, 'ভাই পেদ্‌রো, এ লোকটা কোত্থেকে এসেছে?' পেদ্‌রো বল্‌লে, 'ওই পাহাড় থেকে।'

লুনেজ বল্‌লে, 'না গো না। আমি এসেছি পাহাড়ের ওপারের দেশ থেকে। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক থাকে,—সবাই চোখে দেখে।'

পেদ্‌রো অবাক্ হ'য়ে বল্লে, 'চোখে দেখে! সে আবার কি? ... কি? দেখা কি?'

প্রথম লোকটি বল্লে, 'পাহাড় হ'তে সবে নেবে এসেছে কিনা, তাই যা-তা বক্‌ছে।'

তারপর তিনটি লোকই হাতবাড়িয়ে লুনেজকে ধর্‌তে গেল। লুনেজ দুপা পিছিয়ে গেল। তৃতীয় লোকটা ঠিক্ লুনেজের অনুসরণ ক'রে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে বল্‌লে, 'এদিকে এস।'

লুনেজকে ভালো ক'রে ধ'রে, তারা লুনেজের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে নিল। তাদরে হাত এসে লুনেজের চোখে পড়্‌ল। লুনেজ বল্লে, 'একি বাপু, সতর্ক হ'য়ে হাত চালাতে পার না!'

লোক তিনটি অবাক্ হ'য়ে গেল। একি অদ্ভুত জীব! চোখের পাতা উঠ্‌ছে নাব্‌ছে, তাদের ঠিক উল্টো।

পেদ্‌রো বল্লে, 'অদ্ভুত জীব কোরিয়া, চুলে হাত দাও, কি রুক্ষ! যেন লামার লোম!

কোরিয়া বল্লে, 'হ্যাঁ, তাত হবেই, পাহাড় থেকে নেবেছে কিনা!' এই ব'লে তার দাড়িতে হাত দিল। লুনেজের দাড়ি কামানো ছিল না। একজন বল্লে, 'কিন্তু মনে হচ্ছে, এ সময়ে সুন্দর হতেও পারে।'

এই ব'লে তারা প্রচণ্ডভাবে লুনেজকে পরীক্ষা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল্। লুনেজ বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, 'সাবধানে কর হে, সাবধানে কর!'

একজন বল্লে, 'ওরে ভাই, এযে আবার কথা কয়, ঠিক্ যেন মানুষ।'

পেদ্‌রো বল্লে, 'মানুষ ব'লেই ত মনে হচ্ছে! ওহে, তুমি তাহলে পৃথিবীতে নেবে এসেছ?'

লুনেজ বল্লে, 'পৃথিবীতে নাবিনি, পৃথিবী হ'তে নেবে এসেছি। ওপরে—অনেক ওপরে—সূর্য্যের অর্দ্ধেক পথে যে মাটি, সেইখানে আমার বাস।'

একথা যেন তাদের মগজে গেলনা।

কোরিয়া বল্লে, 'আমাদের পিতৃপুরুষরা ব'লে গেছেন, প্রকৃতি হ'তে মানুষের উদ্ভব। পার্থিব বস্তুর শৈত্য, উত্তাপ ও পচনশীলতা—মানুষ এই তিনের সংমিশ্রনের ফল।'

পেদ্‌রো বল্লে, 'নিশ্চয়ই এ যা-তা বল্‌ছে; একে নিয়ে চল বুড়োদের কাছে।'

শ্রীবিমল সেন

কোরিয়া বল্লে, 'তার আগে চীৎকার ক'রে সাবধান ক'রে দাও ছেলে মেয়েদের। এমন আজব জন্তুর কথা শুনে তারা হয়ত ভয় পাবে।'

তখন পেদ্‌রো লুনেজের হাত ধ'রে নিয়ে চল্ল, বাকী দুজন চীৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল।

লুনেজ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লে, 'ছাড়, আমার চোখ আছে, আমি নিজেই পথ দেখি।' বল্‌তে বল্‌তে সে এসে পেদ্‌রোর গায়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌ল।

তৃতীয় লোকটি বল্লে, 'ওহে, ছেড়ে দিওনা, ছেড়ে দিওনা। হাত ধর ওর। বুঝ্‌তে পাচ্ছনা, বুদ্ধি ওর কাঁচা, চল্‌তে চল্‌তে পা ট'লে পড়ে; মানে নেই, এমন সব কথা বকে!'

লুনেজের ভয়ানক হাসি এল। দৃষ্টি কি, একদম এরা জানে না। সে হাত এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'নে বাবা, যা খুসি কর তোদের।'

তিনজনে তখন লুনেজকে নিয়ে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল।

রাস্তায় কোলাহল সুরু হ'য়ে গেছে। অন্ধদের দেশে যত ছেলে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ দলে দলে রাস্তার উপর ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। লুনেজ দেখ্‌লে, মেয়েগুলির প্রায় সকলেরই সুন্দর লাবণ্যমাখা মুখ। সকলেই তার কাছে এসে তার গা শুকতে লাগ্‌ল, গায়ে হাত বুলোতে লাগ্‌ল; সে যা-দু-একটা কথা বল্‌ছিল, তা কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌ল। অনেক ছেলেমেয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিল—যেন লুনেজের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে তাদের ভয় হচ্ছে। সে দেশের ছেলেমেয়েদের স্বর ভারি মিষ্টি।

সেই ভিড় ঠেলে লোক তিনটি লুনেজকে ধ'রে নিয়ে চল্‌ছে—যেন পাহাড় হ'তে এই যে অদ্ভুত জীবটা নেবেছে, তারাই তার মালিক। সবাইকে বল্‌ছে, 'এ বুনো জীবটা পাহাড় থেকে নেবে এসেছে।'

পেদ্‌রো বল্‌লে, 'বুনো বৈকি! একেবারে বুনো। বুনো কথা বলে, মন এখনও তৈরি হয়নি। কথা বল্‌তে একটু একটু শিখেছে মাত্র।'

একটা ছেলে এসে লুনেজের হাতে চিম্‌টি কাটলে, কোন জানোয়ার বাঁধা পড়্‌লে যেমন ছেলেরা তাকে খোঁচা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে। আর একটা লোক রহস্য ক'রে বল্লে, 'কোথা থেকে নেবে এলে চাঁদ?' লুনেজ ভারি বিরক্ত হ'ল। এ কোন্ দেশী ভদ্রতা! বল্লে, 'তোমাদের মত এমন গেঁয়ো সহর থেকে আসিনি বাপু। আমি যে মস্ত দুনিয়া থেকে আস্‌ছি, সেখানে সবার চোখ আছে, সবাই দেখে।'

পেদ্‌রো লোকের ভিড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে বল্লে, 'পথ ছাড়, পথ ছাড়; এ চল্‌তে পারে না, আস্‌তে আস্‌তে এরি মধ্যে দুবার হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে।'

সবাই বল্লে, 'তাই না কি, তাই না কি! ওকে তা হলে বুড়োদের কাছে নিয়ে চল।'

কী জ্বালা! এদেশের বুড়োরা কি সবজান্তা যে সবাইকে তার কাছে টেনে নিয়ে যেতে হবে!

হঠাৎ একটা দোরের ভিতর দিয়ে তাকে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে আনা হ'ল। সে কী ভয়ানক অন্ধকার! অনেক দূরে একটু আগুণের আভা দেখা যাচ্ছে কি না যাচ্ছে। দলে দলে লোক এসে দুয়ারে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। বাইরের যা একটু আলো আস্‌ছিল, তাও এবার বন্ধ হ'য়ে গেল। ভিড়ের চাপ সইতে না পেরে সে তাল সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে প'ড়ে গেল একটা লোকের পায়ের উপর, আর তার হাতটা ছিট্‌কে একখানা গালে গিয়ে লাগ্‌ল। তার মনে হ'ল, গালখানি বেশ কোমল কচি। একটা সরাগ চীৎকার এসে তার কানে বাজ্‌ল, আর একরাশ হাত এসে তাকে চেপে ধর্‌লে! লুনেজ্ তাদের হাত হ'তে মুক্তি পাবার আশায় প্রাণপণে যুঝ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু এই অন্ধকারের জীবদের অন্ধকারে ব'সে একা সে কেমন ক'রে হঠাবে! [illegible] হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বল্লে, 'ওগো, এই মিস্‌মিসে অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে আমি প'ড়ে গিয়েছিলুম্।'

সব চুপ্‌চাপ। মনে হ'ল যেন অদৃশ্য কতকগুলি লোক তার কথার মানে বুঝ্‌তে চেষ্টা কচ্ছে। তারপর কোরিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল, 'নতুন্ সৃষ্টি হ'য়েছে কি না, তাইত পথ চলতে চল্‌তে তাল সাম্‌লাতে পারে না, মানে নেই, এমন সব কথা বলে। অন্যান্য সকলেও তৎক্ষণাৎ মন্তব্য কর্‌লে, লুনেজ নাকি ভাল ক'রে কিছু বলেও না, শোনেও না।

লুনেজ বল্লে, 'ওগো, এবার একটু বসতে দাও। আর তোমাদের সঙ্গে লাগ্‌ছি না।'

তখন তারা পরামর্শ ক'রে স্থির করলে, এখন একে বসতে দেওয়া যেতে পারে।

লুনেজ ব'সে জোরে জোরে হাঁফ্ ছাড়তে লাগল।

৩

সেই দেশের প্রবীণদের একজন তখন লুনেজকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। লুনেজ তাকে বোঝাতে গেল যে পৃথিবী থেকে সে নেবে এসেছে, কত বড়, কত বিরাট সে পৃথিবী। আকাশে ঘেরা—নদীতে ছাওয়া—তারই বুকে গগনস্পর্শী পাহাড়—আরো বিস্ময়কর কত কি।

প্রবীণরা কিন্তু তার কথার একবর্ণও বিশ্বাস করলে না। তার কথার অনেক শব্দও যেন তাদের বোধগম্য হ'ল না।

তার সঙ্গত কারণও আছে।

সে প্রায় চৌদ্দশত বছর আগেকার কথা,—ঐ উপত্যকায় তখন সবে মাত্র উপনিবেশ স্থাপন করা হ'য়েছে। এ দেশে তখন ধন ধান্যের অন্ত ছিল না। পালে পালে মেষ চ'রে বেড়াত। বর্ষা হ'ত না বটে, কিন্তু ঝর্ণা হ'তে অবিরাম জলধারা বের হ'য়ে সমস্ত দেশকে সুজলা ক'রে রাখ্‌ত। সবাই এখানে বেশ সুখেই থাকৃত।

কিন্তু একটা ব্যাপারে তাদের সুখের পথে কাঁটা পড়ল। একটা অদ্ভুত সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল, যাতে ক'রে সে দেশে যত ছেলে মেয়ে জন্মাল, সবই অন্ধ হ'য়ে জন্মাল। ঘরে ঘরে হাহাকার প'ড়ে গেল, কিন্তু রোগ কমল না। প্রবীণ এবং যুবকদেরও দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে লাগল। এত অল্পে অল্পে দৃষ্টি হ্রাস হ'তে লাগল যে তারা সবাই অন্ধের মত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হ'য়ে গেল—তারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে, এ কথাটা তারা উপলব্ধিও করলে না। দেশের সমস্ত পথ-ঘাট তাদের চেনা। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে যা ক'রে থাকে, তারা অনুমান শক্তির সাহায্যে তাই করতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেল। শ্রবণ শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি তাদের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল। পায়ের শব্দ শুনে, গায়ের গন্ধ শুঁকে, তারা কে কোন লোক চিনতে পারত। এমনি করে বছরের পর বছর: শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল। সভ্যজগত হ'তে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে তারা সভ্য জগতের কথা একেবারে ভুলে গেল। পৃথিবীর যত ফুল ফল জীব জন্তু সকলের নতুন্ নতুন্ নাম হ'ল তাদের দেশে। তারপর ক্রমে ক্রমে তারা বিস্মৃত হ'ল, বাইরে এক বিরাট পৃথিবী প'ড়ে আছে। যা কিছু স্মৃতি তার বাকী রইল, তা ছেলেদের রূপকথায়। তারপর বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর আবির্ভাব হ'ল। চক্ষুষ্মান জগতের যত বিশ্বাস, ধারণা, মতবাদ, সকল বিষয়ে তারা সন্দেহ করল, তর্ক করল এবং শেষে কাল্পনিক ব'লে পরিহার করল। নতুন্ মতবাদ, নতুন্ চিন্তা, নতুন্ দর্শন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

কাজেই তারা লুনেজের সকল কথা মস্তিষ্ক বিকার ব'লে উড়িয়ে দিয়ে লুনেজকে বোঝাতে ব'সে গেল, পৃথিবী কি, কেমন ক'রে এর সৃষ্টি হ'ল্ ইত্যাদি। লুনেজ শুনতে লাগল, প্রবীণ বলতে লাগল—

চারিদিকে উঁচু পাথর আর তারই মাঝে ছিল বিরাট শূন্য; সে শূন্যে প্রথম সৃষ্টি হ'ল নির্জীব পদার্থের ফুল ফল লতা পাতা উদ্ভিদের। তারপর পশুপক্ষী প্রভৃতি হীনবুদ্ধি জীবের সৃষ্টি হ'ল। তারপর এল মানুষ, এবং সকলের শেষে দেবদুত।

লুনেজ হাঁ ক'রে শুনতে লাগল।

প্রবীণ বলতে লাগল, তারপর সময়ের বিভাগ হ'ল, দিন এবং রাত। দিনে খুব ঠাণ্ডা, কাজ করার সুবিধা, বেশ কাজ করা যায়। কিন্তু রাত দারুণ গরম, তখন ঘরে ব'সে ঘুমোনো ভালো।

রাতে গরম, দিনে ঠাণ্ডা, সে আবার কি?

প্রবীণ বল্লে, 'আজ আর থাক্। রাত অনেক হ'য়েছে। শোওগে। ঘুমুতে জানোত?'

লুনেজ, বল্লে, 'দিনে ঘুমুব কি? এখনত দিন।'

প্রবীণ বল্লে, 'তোমার বুদ্ধি পাকেনি কি না, তাই দিন-রাত তফাৎ করতে পাচ্ছনা। কিন্তু ভয় নেই, ঘাবড়িও না, তোমায় লেখা-পড়া শিখিয়ে ঠিক্ ক'রে নেব।'

লুনেজ বুঝল্ এরা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন নাম দিয়েছে।

অন্ধদের দেশ

শ্রীবিমল সেন

লুনেজকে খাবার দেওয়া হ'ল, শুতেও দেওয়া হ'ল। লুনেজের কিন্তু ঘুম এলনা। সে শুধু ভাবছিল এই আজব দেশের কথা।

তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ঝলক ঝলক রক্তিম আলোক এসে শস্যক্ষেতের দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে ভারি এক চমৎকার দৃশ্যের পরিকল্পনা কচ্ছি'ল। লুনেজ মুগ্ধ হ'য়ে গেল। বল্লে, ভগবান তুমি আমায় দৃষ্টি দিয়েছ, তাইত আজ আমার এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করার সৌভাগ্য হ'ল।

সে ধীরে ধীরে এসে শস্যক্ষেত্রের পাশে দাঁড়াল।

হঠাৎ পিছন হ'তে কে যেন হা-হা ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, 'ওদিকে যেওনা, এদিকে এস, এদিকে এস।'

লুনেজ ফিরে দাঁড়িয়ে একটু হাস্‌লে। চোখ থাকলে কি মজা কি সুবিধা, এ হতভাগাদের একবারটি না বোঝালে চলছে না। ওরা আমাকে খুঁজে হয়রান হবে অথচ পাবে না।

একজন বল্লে, 'খবরদার, এখান থেকে ন'ড় না।'

লুনেজ চুপি চুপি দু-এক পা এগিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ একজন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, 'চারা গাছ মাড়িও না, গাছ মাড়ানো নিষেধ।'

লুনেজ বিস্মিত হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়াল। সেই চীৎকার-করা লোকটা তার দিকে ছুটে এল। লুনেজ আস্তে পথের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বল্লে, 'এইত আমি।'

সে লোকটা বল্লে, 'ডাকামাত্রই কেন এলে না। তোমায় কি কচি ছেলের মত হাত ধ'রে নিতে হবে? চল্‌তে চল্‌তে কি পথ কানে শুন্‌তে পাও না?'

লুনেজ হাস্‌ল। 'আমি ত পথ চোখেই দেখি।'

সে লোকটা রেগে ধমক দিয়ে বল্লে 'ফের দেখি'। 'দেখা' বলে কোন শব্দ নেই। বোকামি ছেড়ে এখন লক্ষ্মীছেলের মত আমার পায়ের শব্দ শুনে এস।'

লুনেজ বিরক্ত হ'য়ে তার পিছন পিছন চল্ল। বল্লে, 'আচ্ছা আমারও সময় হবে, আমিও বুঝে নেব।'

অন্ধ লোকটা বল্লে, 'হাঁ, তা বুঝ্‌বে বৈকি। সব ক্রমে ক্রমে হবে। পৃথিবীতে কত না জিনিস শেখার আছে, বোঝার আছে।'

লুনেজ বল্লে, 'হাঁ হে, অন্ধের দেশে একচোখো হয় রাজা, এ প্রবাদ কখনও শুনেছ?'

সে লোকটা বল্লে, 'অন্ধ! অন্ধ! অন্ধ কি?'

লুনেজ অনেক বক্তৃতা করলে। কিন্তু জন্মান্ধ যারা, তাদের অন্ধত্বের কথা বুঝতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

এম্নি ক'রে চার দিন চ'লে গেল। পাঁচ দিন হ'ল। চক্ষুষ্মানকে কেউ তবু রাজা ব'লে চিন্‌তে পার্‌ল না। সবাই তাকে অপদার্থ, অজ্ঞ, অকেজো ব'লে চিনে রাখ্‌ল।

লুনেজকে বাধ্য হ'য়ে তাদের সঙ্গে রাত্রে কাজ করতে হয়, দিনে ঘুমোতে হয়। লুনেজ ভাব্‌লে, একি উল্টা ব্যবস্থা! এটা পাল্টে দেওয়া চাই। এটাই হ'ক্, আমার এই অন্ধের দেশে প্রথম সংস্কার।

কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিল না।

লুনেজ নানা রকমে তার দৃষ্টিশক্তির কথা বোঝাতে চাইত। শ্রোতারা মুখ নীচু ক'রে তার কথা শুন্‌ত। তাদের মধ্যে ছিল এক তরুণী—তার চোখের পাতা বেশী ব'সে যায়নি। রঙ্‌ তার ফুট্‌ফুটে, লাবণ্য তার পাকা ডালিমের রসের মত ফেটে পড়্‌তে চাইছে। সেও লুনেজের কথা চুপ্‌টি ক'রে শুন্‌ত। কিন্তু বিশ্বাস কর্‌ত না কেউ। পাগলের কথা কেই-বা বিশ্বাস করে।

তারা লুনেজকে বল্‌ত, পৃথিবীর চারপাশে দেয়াল। লুনেজ বিরক্ত হ'য়ে বল্‌ত, না কখনই না। পৃথিবীর চার পাশে দেয়াল নেই।

সবাই জিভ্‌ কেটে বল্‌তে, ছি, শাস্ত্রের বাক্য অবিশ্বাস কর্‌তে আছে?

লুনেজ পাগলের মত হ'য়ে উঠ্‌ত। কেমন ক'রে সে এদের বোঝাবে দৃষ্টিশক্তি কি।

একটা কোদালি প'ড়ে ছিল মাটিতে, সে চট্‌ ক'রে তা তুলে নিলে। তার এক-ঘা বসিয়ে দিলেই ওরা বুঝ্‌বে চোখ যাদের আছে, তাদের কি সুবিধা!

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোদালিখানা তুল্‌তে না তুল্‌তেই সকল অন্ধ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, 'রেখে দাও, রেখে দাও।'

কোদালি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বল্লে, 'আমি তোমাদের কোন কথা শুন্‌ব না।' এই ব'লে সে হন্‌-হন্‌ ক'রে পথ বেয়ে চল্ল।

সবাই বল্লে, 'কোথায় যাচ্ছ ? কোথায় যাচ্ছ ?'

লুনেজ বল্লে, 'আমার যেথায় খুসি সেথায় যাব।'

লুনেজ ছুট্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। কিন্তু কী আশ্চর্য্য। যেখানেই সে যায়, লোকগুলিও সেখানে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। ঠিক যেন চক্ষুষ্মান্ লোক এরা।

আর না পেরে লুনেজ এক পাথর বেয়ে সেই অন্ধদের পৃথিবীর ওপারে এসে লুকিয়ে পড়্‌ল। পাইন গাছের ছায়ায় সে বাকী রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল।

সকাল বেলা উঠে, তার ভারি ক্ষুধা বোধ হ'ল। কিন্তু খাবার কই ? উপবাস ক'রে তার পূর্ণ দুদিন কেটে গেল।

তিন দিনের দিন সে দেখ্‌ল, প্রাণ বাঁচাতে হ'লে অন্ধদের পৃথিবীতে ধরা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কাজেই আবার সে এসে পাথরের দেয়ালের ওপর বস্‌ল।

অন্ধেরা কাজ কচ্ছিল। সাড়া পেয়ে বল্লে, 'কে ? কে ?'

লুনেজ বল্লে, 'আমি লুনেজ। আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। অল্প দিনকয়েক হ'ল সৃষ্টি হ'য়েছি কিনা !'

একজন অন্ধ বল্লে, 'তাহ'লে সে কথাটা বুঝেছ ?'

লুনেজ বল্লে, 'বুঝেছি।'

"চোখে দেখনা ত এখন ?"

"না, দেখা ব'লে কোন শব্দ নেই।"

"মাথার ওপর কি আছে ?"

"পৃথিবীর ছাদ—খুব বেশী উচুতেও নয়।"

তারপর লুনেজ ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে ফেল্লে। 'ওগো, আর কিছু শেখাতে হ'লে আগে কিছু খেতে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।'

লুনেজকে তখন গ্রামের ভিতর নিয়ে আসা হ'ল।

লুনেজ খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হ'ল।

কিন্তু তার শাস্তিও পেতে হ'ল। রোজ তাকে দিয়ে অনেক রকম কাজ করানো হ'ত। নিরুপায় হ'য়ে লুনেজ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর্‌ল, তারা যা বল্‌ত, তাই আগ্রহভরে শুন্‌ত, যা কর্‌তে বল্‌ত কর্‌ত। এম্নি ক'রে সে যেন অন্ধদের দেশেরই একজন লোক হ'য়ে পড়্‌ল। সে দেশে থেকে তাদের কথা শুনে তার সময় সময় মনে হ'ত বাস্তবিক এই-ই দেয়াল ও ছাদ ঘেরা একমাত্র পৃথিবী—আর কিছু নেই।

৫

কর্ত্তার মেয়েটির নাম ছিল সুরতা। সেই সুন্দরী মেয়েটি যার কথা আগে বলেছি। কিন্তু অন্ধদের দেশে সে সৌন্দর্য্যের কোন কদর ছিল না, কারণ তাদের সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ছিল স্বতন্ত্র। চোখা নাক মুখ, টানা ভুরু; ফুটফুটে রঙ এ তাদের কাছে মান পেত না। তারা সুন্দরী কিনা বুঝ্‌তো মুখে হাত বুলিয়ে। নাক্ মুখ্ চোখ যার বেশ এক-সা প্লেন্ হ'য়ে গেছে সেই ছিল চমৎকার সুন্দরী। তাই তারা সুরতাকে সব চেয়ে কুশ্রী ব'লে সিদ্ধান্ত কর্‌লে। বড় দু বোনের বিয়ে হ'য়ে গেল, সুরতা এখনও কুমারী ; কে এমন মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে ?

লুনেজ সুরতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

একে যদি পায় সে তাহলে বুঝি জন্ম জন্ম এই অন্ধের দেশে কাটিয়ে দিতে পারে।

সুরতার দিকে লুনেজ্ আকৃষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। নানা কাজের ছলে এই অন্ধ মেয়েটির কাছে সে আপনার বুকভরা প্রেম নিবেদন কর্‌ত। সুরতাও যেন তা লক্ষ্য কর্‌ল।

একদিন তারার নিবু-নিবু আলোর তলায় ব'সে সে ও সুরতা। বাতাসে ভারি মিষ্টি গান ভেসে আস্‌ছিল। লুনেজ আর আত্মসম্বরণ কর্‌তে পার্‌ল না। তার হাত এসে সুরতার হাতের উপর পড়ল, আর নিঃশব্দে সে সুরতার কোমল হাতখানিতে জড়িয়ে ধর্‌লে। সুরতা যেন সব বুঝ্‌তে পার্‌লে। সেও প্রত্যুত্তরে নীরবে লুনেজের হাতে মৃদু একটা চাপ দিল।

তারপর আর এক দিনের কথা বল্‌ছি। অন্ধকারে ব'সে সবাই খেতে ব্যস্ত। লুনেজের বোধ হ'ল একখানি কম্পিত পেলব হাত তাকে সন্তর্পণে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আগুন উস্‌কে ক্ষণিকের জন্য চারিদিক আলো হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আলোকের প্রভায় লুনেজ দেখ্‌ল, সুরতার মুখখানি অপূর্ব্ব সুষমায় ভ'রে গেছে।

এমনি ক'রে প্রেমের অভিনয় সুরু হ'ল।

লুনেজ সুরতা নিভৃতে ব'সে কত কথাই না গুঞ্জরণ ক'রে যেত।

ছায়া ও কায়া

শ্রীবিমল সেন

একদিন চাঁদের আলো এসে পড়েছে সুরতার সর্ব্বাঙ্গে আর সুরতা চরকা চালাচ্ছে। লুনেজের মনে হ'ল—এ যেন সোনায় নাওয়া একখানি রজতপ্রতিমা। সুরতার পায়ের তলায় ব'সে লুনেজ বল্লে,—কণ্ঠ তার প্রেমে আপ্লুত—সে তাকে ভালবাসে, কত না সৌন্দর্য্য নিয়ে সে লুনেজের চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

সুরতা কোন শব্দ করল না। লুনেজ দেখ্‌ল, সুরতার গোলাপী মুখ হ'তে আনন্দের রেখা ফেটে বেরিয়েছে।

তারপর দুজনের আলাপ চ'লত যখনই দেখা হ'ত। সেই ছোট্ট উপত্যকাটি আজ তার চোখে একটা মস্ত বড় পৃথিবী হ'য়ে দাঁড়াল।

সুরতাকে লুনেজ বুঝাতে চাইল—দৃষ্টিশক্তি কি!

সুরতার কাছে দৃষ্টিশক্তি ছিল সবচেয়ে কবিত্বময় কল্পনা। সে কান পেতে শুনত চন্দ্র, সূর্য্য, তারা পাহাড়, পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য বর্ণনা, শুনতো সেও নাকি ভারি সুন্দরী, ভারি রূপসী। সে এক বর্ণও সত্য ব'লে বিশ্বাস কর্‌ত না; অর্দ্ধেক বুঝ্‌ত, অর্দ্ধেক বুঝ্‌ত না, তবু বিস্ময়ে, আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে শুনত। আর লুনেজ ভাব্‌ত, সুরতা তার কথার মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছে।

এম্নি ক'রে প্রেম সকল সংশয়-সঙ্কট অতিক্রম ক'রে সাহসী হ'য়ে উঠ্‌ল। লুনেজ সুরতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব তুল্‌তে চাইল। সুরতা কেমন যেন ভয় পেয়ে বাধা দিলে।

সুরতার বড় বোন্ কিন্তু সব টের পেল। সেই প্রথম প্রকাশ ক'রে দিল, লুনেজ-সুরতা প্রেমে পড়েছে।

কথাটা জাহির হ'বামাত্রই সমস্ত পরিবারে, সমস্ত দেশে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। সবাই বল্লে, এ কখন হ'তে পারে না। সুরতা যতই কুশ্রী হ'ক্ না তাদের কাছে, একটা অন্ধ, নিরক্ষর, পাগল বুনো মানুষের হাতে তাই ব'লে কি তাকে সঁপে দিতে হবে। বাপ বল্লে, না। বোন্‌রা বল্লে, এ বিয়ে হ'লে মাথা কাটা যাবে। যুবকেরা বল্লে, এ বিয়ে হ'লে আমাদের জাতির অপমান হ'বে। এমন কি একজন খাপ্পা হ'য়ে লুনেজকে এক চাপড় মার্‌লে। লুনেজ সুদশুদ্ধ তা ফিরিয়ে দিল। তারপর হাতাহাতি আর হ'ল না বটে, কিন্তু লুনেজ-সুরতার মিলন যে হ'বে না, এ কথা স্থির সিদ্ধান্তই হ'য়ে গেল।

কিন্তু সব সিদ্ধান্ত উল্টে দিল সুরতার চোখের জল। সকলের ছোট ব'লে সুরতা বাপের খুব আদুরে ছিল। সে যখন বাপের কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দ অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিলে, বাপ সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, 'ছি মা, জানতো, ওর মাথার ঠিক নেই, কোন কাজ ঠিক মত কর্‌তে পারে না, নেহাৎ বুনো—'

সুরতা বল্লে, 'কিন্তু দিন দিনই ত শোধ্‌রাচ্ছেন। তা ছাড়া গায়ে কত জোর, পৃথিবীর সকলের চাইতে জোয়ান। আর, তিনি যে আমাকে ভালোবাসেন, আমিও যে তাঁকে ভালোবাসি।'

প্রেম যখন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাকে প্রশমিত করা এতই শক্ত।

সুরতার করুণ নিবেদনে অস্থিরচিত্ত হ'য়ে বাবা প্রবীণদের সভা আহ্বান করলেন। তারপর বিবাহের সমর্থন ক'রে বল্লেন, লুনেজের মধ্যে ভালো হবার উপাদান আছে, আমি জানি একদিন তা বিকশিত হ'বে।

প্রবীণদের ভিতর ছিলেন এক ডাক্তার আধুনিক বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তিনি লুনেজকে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, 'আমার মনে হয় চিকিৎসা করলেই এর মস্তিষ্ক ভালো হ'য়ে যাবে।'

কর্ত্তা বল্লেন, 'আমিও এতদিন তাই ভাবছিলুম্।' ডাক্তার বল্লেন, 'এর মাথায় রোগ দাঁড়িয়েছে!'

কর্ত্তা সুধোলেন, 'কি রকম ক'রে বলুন্ ত?'

ডাক্তার বল্লেন, 'এই যে নাকের ওপরে দুটো গর্ত্ত এর নাম চোখ। আমাদের স্বাভাবিক লোকের তা কেমন স্থির, মসৃণ, বন্ধ। কিন্তু লুনেজের তেমন নয়। চোখে দুটো পাতা তাও আবার খোলা, ভিতরের বলটা খালি নড়ে। এই নড়া-চড়ার দরুণ মাথায় ধাক্কা লেগে মাথা খারাপ হ'য়েছে।'

সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। বিজ্ঞানের কি অসাধারণ শক্তি!

ডাক্তার বল্লেন, 'একে আরাম করাও ভারি সোজা। আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, একটা অপারেশন করে'ই একে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে দেব। অপারেশন আর কিছুই না। ওই চোখের বলদুটোকে তুলে ফেলে দেব! তাহ'লেই লুনেজ সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবে। সুরতাকে তখন তার হাতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তুলে দেওয়া যেতে পারে!'

এই পরম আনন্দের সংবাদ লুনেজের কানে এসে পৌঁছতে বিশেষ দেরি হ'ল না। কর্ত্তা ভেবেছিলেন, লুনেজ এতে ভারি খুসি হবে। কিন্তু লুনেজ বেঁকে দাঁড়াল।

কর্ত্তা বল্লেন, 'তা হ'লে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও না?' লুনেজ নিরুত্তরে চ'লে গেল।

শেষে সুরতা এলো, তার মত করালো অন্ধ ডাক্তারের হাতে চিকিৎসা করাতে।

লুনেজ বল্লে,'সুরতা, তুমি বোধ হয় চাও না, আমার দৃষ্টি শক্তি আমি হারাই!'

সুরতা ঘাড় নাড়্লে।

লুনেজ বল্লে, 'আমার দৃষ্টিই আমার জগৎ।'

সুরতার মাথা নীচু হ'য়ে গেল।

আবেগ ভরে লুনেজ বল্লে, 'সুরতা! সুরতা কেমন ক'রে বোঝাই তোমায় কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আছে এ জগতে। ঐ ফুলটি সুন্দর, পাহাড়ের গা-বেয়ে-ওঠা ঐ লতাটি সুন্দর, মেঘভারাবনত ঐ আকাশ সুন্দর, সূর্য্যাস্ত সুন্দর, ঝিকিমিকি করা চঞ্চল তারাদল সুন্দর। আর তুমি এত সুন্দর সুরতা! কি বল্‌ব—তোমার লাবণ্যভরা মুখখানি, তোমার করুণকম্পিত ওষ্ঠ, তোমার ব্যাকুল আহ্বানভরা দুখানি সুডোল বাহু, শুদ্ধ এই দেখার জন্য আমি আমার দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাই। তুমি কি জান না সুরতা, আমার এই চোখ দুটিই সৌন্দর্য্যের শরে বিদ্ধ করেছ তুমি! সেই সাধের চোখ আমি উপড়ে ফেল্‌তে দেব! আর তোমায় ইহজন্মে দেখ্‌ব না, শুধু স্পর্শ, শুধু তোমার কলকণ্ঠের দু-একটি গুঞ্জন, এ সম্বল ক'রে এ দীর্ঘজীবনপথ কেমন ক'রে অতিক্রম করব আমি! তুমি আমায় ও অনুরোধ ক'র না।'

সুরতা ধীরে ধীরে বল্লে, 'আমার মনে হয় সময় সময়—'

লুনেজ বল্লে, 'কি মনে হয় সুরতা?'

সুরতা বল্লে, 'যে তুমি অমন ভাবে যা' তা' ব'ক না।'

লুনেজ বল্লে, 'সুরতা, আমি যা-তা বকি!'

সুরতা বল্লে, 'তোমার কল্পনা—সে ভারি চমৎকার, আমার শুনতে খুবই ভালোলাগে কিন্তু এখন—'

'এখন কি সুরতা?'

সুরতার মুখে আর কথা ফুট্‌ল না। তার প্রাণ যেন নীরব মিনতিতে লুনেজকে জানাচ্ছিল, ওগো তুমি ভালো হও ভালো হও।

হায় অন্ধ নারী! দৃষ্টির আস্বাদ তুমি পাওনি কোনোদিন। তার দাম তোমাকে বোঝাব কেমন ক'রে!

সস্নেহে সুরতাকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে লুনেজ বল্লে, 'আচ্ছা সুরু, আমি যদি রাজী হই?'

সুরতা লুনেজের কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে কেঁদে ফেল্লে, 'ওগো, তাই দাও, তাই দাও।'

৬

অপারেশনের আরো সাতদিন বাকী!

লুনেজের চোখে ঘুম নেই। উদাস মনে ব'সে সে কত কি ভাবে। যে দৃষ্টিকে সে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন ক'র্‌তে যাচ্ছে, তাকে যেন সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছে।

অপারেশনের আগের দিন।

লুনেজ বল্লে,'সুরু, কাল—কালই আমি দৃষ্টিশক্তি হারাব!'

সুরতা তার দুহাত চেপে ধর্‌লে! আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বল্লে, 'সে তো আমারই জন্য প্রিয়তম! আমারই জন্য! আমার নারীজীবনের যা কিছু সম্পদ, আমার প্রাণ, আমার প্রেম, আমার কণ্ঠ—সকল আমি বিনিময়ে তোমার হাতে তুলে দেব।'

লুনেজ নিঃশব্দে সুরতাকে বুকে তুলে নিয়ে তার মুখখানির দিকে একবার চাইলে। এই তার শেষ দেখা।

তারপর সে তেম্নি নিঃশব্দে বেরিয়ে চ'লে গেল।

পৃথিবী আজ তার চোখের সাম্নে দাঁড়িয়েছিল লক্ষগুণ সৌন্দর্য্যের পশরা নিয়ে। বিজন কানন, মাঠের

বুকে শাদা ফুলের মেলা, নির্ম্মল প্রভাত দেবদূত যেন সোনার উত্তরীয় উড়িয়ে পাহাড়ের পথ বেয়ে নীচে নেমে আস্‌ছে এম্‌নি সুন্দর।

এমন সৌন্দর্য্যের কাছে এতটুকু কত ক্ষুদ্র ঐ অন্ধ জগৎ, কত ক্ষুদ্র তার প্রেম।

ফেরবার কথা আর তার মনে রইল না। রৌদ্রস্নাত তুষারগুলি যেন হাতছানি দিয়ে তাকে সুদূরের পথে ডাক্‌ছিল। বাইরের বিশ্ব যা সে বিসর্জ্জন করতে [illegible]ন, আজ তার কল্পনায় ভাস্বর হ'য়ে উঠ্‌ল। দিনের বেলা ধানের ক্ষেতে রোদের খেলা, রাতে জ্যোৎস্নার ছল-ছল মায়া, কোথাও ঝর্ণার কলকল, পাখীর ডাক্ দূরে তরু-নিবদ্ধ কুটীর, সেই নদী, সেই মাঠ-ঘাট বন— আর সবার উপরে এই আকাশ তাকে প্রবল বেগে টেনে নিয়ে চল্লে।

একবার সে গ্রামের দিকে ফিরে চাইলে, একবার ভাব্‌লে সুরতার কথা, সব তার কাছে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র হ'য়ে গেছে!

তারপর সে সাম্নে এগিয়ে চল্ল। আর তার অন্ধদের জগতে ফেরা হ'ল না।

এইচ-জি-ওয়েল্‌সের ছায়াবলম্বনে

শ্রাবণ সাঁঝে

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

টুপ্ টুপ্ ঝরে জল, গড় গড় দেয়া
কে যাবি কে যাবি পারে—ডাকে শেষ খেয়া।
ঝপ্ ঝপ্ পড়ে দাঁড়—ছল্ ছল্ বারি,
এ সাঁঝে জমাতে হবে ও পারের পাড়ি।
মর্ মর্ করে গাছ—সর্ সর্ বন,
কোন্ সে কেতকী বনে উদাসী পবন।
ঝির্ ঝির্ ভিজে বায়—ঝুর্ ঝুর্ নীপ,
মনের গহনে জ্বলে প্রাণের প্রদীপ;
টুপ্ টুপ্ বকুলের ফুল পড়ে ভুঁয়ে,
কে যেন সুরভি বাসে প্রাণ গেল ছুঁয়ে;
চুপ্ চুপ্ কথা বলা কানে কানে আজ,
উদাস অলস ঘন শ্রাবণের সাঁঝ;
ছল্ ছল্ আঁখি জল—আঁখি ভ'রে আসে,
পরাণ কি যেন চায়—চাহে কারে বা সে।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

—ঘন-বর্ষা—

শেষবর্ষণে পরম-রসিক 'নটরাজের' মুখে আমরা শুনেছি—"শ্রাবণ ঘর-ছাড়া উদাসী। আলু থালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত-ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হ'ল। পথহারা তার সব-কথা ব'লে শেষ ক'রতে পারলে না।"

বর্ষাকে গীতমুখর ভাব-রস-মত্ত বাউলের সঙ্গে কবি উপমিত করেছেন :—

"বাদল বাউল বাজায় রে একতারা!
সারা বেলা ধ'রে ঝর ঝর-ঝর ধারা!
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন সুরে আপনি মেতে
নেচে নেচে হ'ল সারা।"

তারপরেই গানখানির ভাব এবং সুর ঘন-খাদে নেমে এসেছে,—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখে এবং মনেও বাদল ঘনিয়ে উঠ্‌ছে :—

ঘন-মেঘের ঘটা ঘনায়
আঁধার গগন মাঝে

তারপরেই ভাব ও সুর যেন একত্রে চঞ্চল-লীলা-লাস্যে ঈষৎ উঁচুতে উঠেছে—

"পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর
নূপুর মধুর বাজে—"

আবার তার পরের সুর আরও উচ্চতর পর্দ্দাতেই উঠেছে, কিন্তু যেন তার উদাস-বেদনা প্রচ্ছন্ন ভাবটুকু বেশ ধরা পড়ে' গিয়েছে :—

"ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে-হাওয়া গৃহ-হারা।"

কবির এই অনবদ্য বর্ষা-সঙ্গীতগুলি যে শুধু ভাব-সম্পদে শব্দ-ঝঙ্কারে প্রতীকাশ-ঐশ্বর্য্যে মধুর ও মহামূল্য—তাই নয়,—গান গুলি রচয়িতার আপন কণ্ঠ-নিঃসৃত ভাব ও কথার সাথে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচিত্র সুন্দর সুরে সজ্জিত হ'য়ে আরও মঞ্জুল হ'য়েছে।

শ্রাবণ-ধারা ধরণীর সঙ্গে গগনের মিলন ঘটিয়ে দেয়। অবিচ্ছিন্ন-বর্ষণের অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে গগনের সহিত পৃথিবীর বিশ্রম্ভালাপ সুরু হয়। ঘন-বরিষণের অবসরে দিগন্ত-প্রান্ত যখন বিরহ-শীর্ণা ধরণীর করতল-চুম্বনচ্ছলে অধরপুট আনমিত ক'রে নিয়ে আসে, উচ্ছ্বসিত বিপুল বারিধারা তখন জলস্থল ও আকাশ-বাতাস একাকার ক'রে দিয়ে, সেই মিলন-পিয়াসী-দ্বয়ের মধ্যের সকল বাধা-ব্যবধান দূর ক'রে দেয়। কবি এই বিরাট-মিলনের মঙ্গল-সঙ্গীত রচনা করেছেন :—

"ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে,
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব-সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে
শিহরে শ্যামল মাটী প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে,
নৃত্য উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিল বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া
বিজলী ঝলিয়া উঠে নব-ঘন মন্দ্রে।"

আবার দেখি, কবি 'শ্রাবণে'র মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রূপে দেখ্‌ছেন। তার ধারা-প্লাবিত মূর্ত্তির আড়ালে অনলের অস্তিত্ব টের পাচ্ছেন। শ্রাবণের বুকে এই গোপন অগ্নি-সমাবেশের সংবাদটি আজ জগতের কাছে এক অশ্রুত-পূর্ব্ব নূতন বার্ত্তা!

"এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে;
সেই আগুনের কালো রূপ যে
আমার চোখের পরে নাচে।
ও তার, শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক হ'তে অই দিগন্তরে,
ও তার, কালো আভার কাঁপন দেখ
তালবনের অই গাছে গাছে।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

বাদল-হাওয়া পাগল হ'ল
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হ'তে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে।"

আবার অন্য মুহূর্ত্তে বর্ষার ধারা-প্লাবন মূর্ত্তি, ধরণীর সঙ্গে মানবের চিত্ত-তলও প্লাবিত ক'রে দিয়েছে দেখা যায়:—

"আজি, বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথায় না ধরে।"

বাদল-ঋতুর ঝঞ্ঝা উদ্দাম ঘন-বর্ষণোন্মত্ত দিনখানি এই গানটির মধ্যে যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে:—

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজি, মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।

এমনতর দিনে ভাবুক-জনের অন্তরের অবস্থা কবি বিজ্ঞাপিত ক'রেছেন। বাইরের উন্মদ মাতামাতির সঙ্গে অন্তরের মধ্যেও মহা বিপ্লব সুরু হ'য়েছে।—

"ওরে, বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন
লুটেছে এই ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ল পাগল,
আজি ভাদরে।
আজ, এমন ক'রে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।"

এর পরে আমরা কোমল ও কঠোরের মিলন-ছবি দেখতে পাই। বাদলের এই উভয়রূপের সমন্বয় বেশ চিত্তগ্রাহী:—

"বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা
তোমার শ্যামল শোভারবুকে বিদ্যুতের জ্বালা।
তোমার মন্ত্রবলে—
পাষাণ গ'লে ফসল ফলে
মরু বহে' আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।
মর-মর পাতায় পাতায়
ঝর ঝর বারির রবে
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে।
সবুজ সুধা-ধারায়—
প্রাণ এনে দাও তপ্তধরায়
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ-ঢালা।"

বর্ষার মায়ামন্ত্র-পরশে মানব-চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র ভাব-রসে মগ্ন হয়, কখনও সে কার যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে, কখনও সে কোন অজানা বাঞ্ছিতা প্রিয়তমাকে বুকের ভিতর লাভ ক'রে অপূর্ব্ব মিলন-পুলকে নিমগ্ন হয়, কখনও লক্ষ্যহীন অর্থহারা বিপুল বিরহ-ব্যথায় কাতর হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে।

আবার কখনও শ্রাবণকেই সে তার 'চাওয়ার ধন' ব'লে তার রূপে রসে বিভোর হ'য়ে তারই প্রেম-স্তুতি গাইতে থাকে; যেমন:—

"শ্রাবণ হ'য়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় গো হারা,
ঢেউ লেগেছে নদীর নীরে।
সকল আকাশ সকল ধরা,
বর্ষণেরই বাণী-ভরা,
ঝর-ঝর ধারায় মাতি'
কাঁদে আমার আঁধার রাতি
বাজে আমার শিরে শিরে।"

* * * *

বাদল মেঘে মাদল বাজে—
গুরু-গুরু গুরু-গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে
আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপনি ভোলে।

কোথায় ছিল গহন-প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে !
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে—
গানে—গানে।"

*　　*　　*

আজ আকাশের মনের কথা
ঝর ঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দীঘির কালো জলের পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে।
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
আঁধার-বাতায়নে—
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে।
ম্লান স্মৃতির বাণী যত
পল্লব-মর্ম্মরের মত
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লি-মুখর সাঁঝে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।"

বর্ষার সাথে মানব হৃদয়ের নিবিড় যোগের পরিচয় পাওয়া গেল। এখন,ঘন বর্ষায় চিত্ত কোন্ অজানার তরে অকারণ-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে? তার অভিব্যক্তি কিরূপ? তারই একটু সন্ধান নেওয়া যাক্। এই ব্যাকুল-প্রতীক্ষায় পথ-চাওয়া ভাবটি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বর্ষা-কবিতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

এই　শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা
যূথী-বনের গন্ধে ভরা।
কোন্　ভোলা দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি, চিনি,
ঘন-বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোম্‌টা-পরা।
কেন বিজন বাটের পানে
তাকিয়ে আছি কে তা' জানে।
যেন　হঠাৎ কখন অজানা সে
আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে
গান গা'বে সে পাগল-করা॥'

"গগন-তল গিয়েছে মেঘে ভরি'
বাদল-জল পড়িছে ঝরি' ঝরি'!
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি'
এমন কেন করিছে মরি মরি!
বেদনা-দূতী গাহিছে—"ওরে প্রাণ!
তোমার লাগি জাগেন ভগবান,
নিশীথে ঘন-অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়া রাখেন তোর মান!"

*　　*　　*　　*

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে
তাই,　ফাগুন-শেষে দিলেম বিদায়।
তুমি,　গেলে ভাসি নয়ন-নীরে
এখন,　শ্রাবণ-দিনে মরি দ্বিধায়।
এখন,　বাদল-সাঁজের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
এখন　ঝর ঝর বারি ধারে
ভাবি,　কি ডাকে ফিরাবো তোমায়।"

এর পরে আর একটি ভাব ফুটে উঠেছে। এটি হ'চ্ছে মিলনের পুলক। এ'র রস অফুরন্ত, চিত্ত-বিহ্বলকারী। ঐ পাওয়ার সুখ যে কী গভীরতর তা' শুধু উপলব্ধির বস্তু। এই পুলকিত মিলন-বিহ্বলতা কবি তাঁর গীত-পুষ্পের প্রতি পেলব পাপ্‌ড়িতে তার স্নিগ্ধ-বর্ণে ও মধুগন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"উতল-ধারা বাদল ঝরে,
সকাল বেলা একা ঘরে॥
সজল-হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল-মেঘে,
তমাল-বনে আঁধার করে'॥
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে!
আঁচল দিয়ে শুখাব জল
মুছাব পা আকুল-কেশে॥"

*　　*　　*　　*

"শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে!"

* * * *

"আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জল-ছল ছল সুরে
হৃদয় আমার কাণায় কাণায় পূরে
খনে খনে ঐ গুরু গুরু তালে তালে,
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে॥
কোন্ দূরের মানুষ এলো যেন আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা,
গোপন-মিলন-গন্ধে অমৃত ঢালা;
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তার অজানা-জনের সাজে।"

এই যে "দূরের মানুষ এলো যেন আজ কাছে" এই অনুভূতি আমাদের সব কষ্ট বেদনা সংসারের নীরস ভ্রূকুটীর দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

'সংসার' ও 'সমাজ' নামে যে দু'টি বস্তুকে একদিন আমরা আমাদের বিশৃঙ্খল অনিয়মিত জীবনকে নিয়মিত ও সংযত করে' কল্যাণ আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ ক'রবার উপায়-স্বরূপে স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেছিলেম, এবং যে-পর্য্যন্ত 'মানুষ'কে তার প্রভু রেখে—সেই সমাজের নিয়মাধীন থেকেছি, ততদিন পর্য্যন্ত ওদের কাছ থেকে আমরা প্রচুর সুফল ও উন্নতি লাভ করেছি;—কিন্তু আজ সেই মানুষের সৃষ্ট সমাজে 'সংস্কার' এবং 'লোকাচার'ই একাধিপত্যে রাজা হ'য়ে 'প্রয়োজনীয়তা' ও 'কল্যাণে'র কণ্ঠরোধ করে' মানুষের উপর প্রভুত্ব ক'রছে। আমরা এখন 'সমাজ' অর্থাৎ 'সংস্কার ও লোকাচারে'রই ক্রীতদাস! তাই দুর্ব্বল আমরা নির্ব্বিচারে তাদের শাসন মেনে নিয়ে বিবেক, বুদ্ধি, স্ফূর্ত্তি, আনন্দ, কল্যাণ, জীবনের বিচিত্র-মাধুর্য্য সমস্তই নষ্ট করে' ফেলতে দ্বিধা করিনা। জীবনের প্রাণরস-ধারা শুষ্ক এবং রুদ্ধ করে', সৌন্দর্য্য এবং জীবনের সত্যকে আবৃত করে' এক একটি 'সামাজিক-যন্ত্র' ও 'সংসার-কীট' হ'য়ে ওঠাই যেন আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও পরম সার্থকতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

হৃদয়ের সুকোমল-বৃত্তিগুলির প্রভাবকে, অন্তরের মাধুর্য্য-রসকে আমরা 'অসার-ভাবপ্রবণতা' বলে' উপহাস করে' থাকি। নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিরোধে আবৃত-নয়নে সমাজের ঘানি-যন্ত্রের অনুবর্ত্তিতা ও অর্থ সংগ্রহ-প্রচেষ্টাকেই আজ আমরা মানব-জীবনে সার ও শ্রেষ্ঠ বলে' মেনে নিয়েছি।

সমাজ ও সংসারের এই যে প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে নাগপাশে আবদ্ধ করে' রেখেছে—কোন্ সময়ে আমরা এর প্রভাব হ'তে মুক্ত হ'তে পারি? ক্ষণকালের তরে এর কঠিন বেদনা-বন্ধন শিথিল হ'য়ে পড়ে কোন্ মুহূর্ত্তে? সামাজিক-জীব মানুষ কখন নির্ভয়ে প্রাণ খুলে স্পষ্ট স্বীকার ক'রতে পারে?—

"সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ' জীবনের কলরব।"

অতিবড় মহাকর্ম্মী, অতিবড় স্বার্থপর অর্থলোলুপ বা জীবিকা-চিন্তন-কাতর দীন দুঃখী মানবও তাদের কঠিন কর্ম্মভার, বিষয় বাসনা ও সংসার-চিন্তার বিপুল-আক্রমণ হ'তে ক্ষণতরে যেন ছুটী পেয়ে আপনার কর্ম্মক্লান্ত চিন্তা-কাতর শুষ্ক অন্তরটি কবির এই গানের সুরে মিশিয়ে দিয়ে একটি বার বলতে চা'ন্—

"যে কথা এ' জীবনে
রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন-ঘোর বরিষায়।"

আজকের দিনটিতে মানুষ মুহূর্ত্ততরে, কোন্ অজ্ঞাত-প্রেরণায়—'সমাজে'র চেয়ে 'প্রাণ'কে বড় ব'লে স্বীকার ক'রে ফেলে,—এবং এক নিমেষের তরে, বিদ্রোহের-স্বরে প্রশ্ন করেঃ—

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণ-বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তা'র
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?"

আজ সে বুঝেছে, আজ সে তার ব্যাকুলপ্রাণ দিয়ে বুঝতে পেরেছে,—এদিনখানি শুধু—

"কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয়ে দিয়ে হৃদি অনুভব"

ক'রবার জন্যই সৃষ্ট হ'য়েছে। তাই কবির সঙ্গে তাদেরও প্রাণ কেঁদে বলে

"ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজলী থেকে থেকে চমকায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন-তমসায়,—
সে কথা আজি যেন বলা যায়।"

ঐ যে বাদলের পরশ—এই যে শ্রাবণের ধারা—এ যে কত স্নিগ্ধ-শীতল-মধুর, কত আকুল বাঞ্ছার ধন, এর মাঝে যে কী সঞ্জীবনী-সুধা সঞ্চিত আছে, কবি তার আভাস দিয়েছেন—

"যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ঐ বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে!
যা' কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবন-হারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে' সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে'।"

এবার "ক্ষান্ত-বর্ষা" বা শেষ বর্ষার সামান্য নিদর্শন দিয়ে বিদায় নেব। কবি রূপ ও রূপকের সাহায্যে এই সকল বিচিত্র লীলাকে কাব্যলোকে মূর্ত্ত করে রেখেছেন। তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। সম্যক্‌রূপে নিখুঁত পরিচয় দিতে হ'লে, একটিমাত্র গানকে নিয়েই সুদীর্ঘ একটি বেলা কেটে যায়,—তবুও মনে হয় তার সবটুকু পরিচয় দেওয়া হ'ল না,—আরও অনেক বাকী র'য়ে গেল।

প্রদোষে

শ্রীপ্রমীলা মিত্র

শান্ত গোধূলি নামে অম্বর তলে,
তালের কুঞ্জে স্বর্ণ-কিরীট জ্বলে—
দীপ্ত রবির শেষ অঞ্জলি দান,
স্বচ্ছ দীঘির স্তব্ধ বুকের পানে
কি করুণ সুর কেঁপে ওঠে কেবা জানে,
মরণাহতের রিক্ত বুকের গান।
পল্লী-বধূর অঞ্চল চঞ্চলি'
আকুল সমীর বন-বীথি হিল্লোলি'—
কার সন্ধানে আপনা হারায়ে ধায়!
রজনীগন্ধা ফুটিছে সঙ্গোপনে—
সন্ধ্যা-মলিন স্তব্ধ গহন বনে
সঙ্কোচ-ভরা আঁখি মেলি কারে চায়?

প্রদোষে

শ্রীপ্রমীলা দেবী

আলোকের শেষ রশ্মি গিয়েছে টুটে,
দীপ্ত তারকা আকাশের কোলে ফুটে,
দিবস-সন্ধ্যা শুভ মিলনের ধারে ;
তারি বন্দনা অভিনন্দন-গীতি
মৃদু গুঞ্জনে ধ্বনি' উঠে নিতি নিতি
ঝিল্লী-মুখর প্রদোষ-অন্ধকারে।
বিহগ চলেছে কোন্ সে কুঞ্জ-পাশে
আপন কুলায়ে গভীর শান্তি-আশে,
লভিবে তৃপ্তি প্রিয় পরিজন সাথে,
শ্রান্ত মানব, আয় ছুটে আয় ওরে,—
দুখিনী মায়ের শান্ত কোমল ক্রোড়ে,
কোলাকুলি ক'রে বাঁধ্ রাখী হাতে হাতে।
দূর দিগন্তে কোন্ মন্দির মাঝে
সন্ধ্যারতির পূজার ঘণ্টা বাজে,
মন্দ পবনে ধূপ-সৌরভ আসে, ,
সুদূর প্রবাসী আপনার জন লাগি'
পল্লীরমণী শুভ কল্যাণ মাগি'
গৃহদীপ জ্বালে তুলসীমঞ্চ-পাশে।
কি মহা সত্য নির্ম্মল নভ মাঝে !
কি মহা পুণ্য শঙ্খের বোলে রাজে !
কোথা নগরের বিলাস-মদির রাতি।
পঙ্ক-মলিন মিথ্যার জালে ঘেরা—
কৃত্রিম সুখে দিয়োনাকো আর ধরা,
এস ভাই বোন, এস ফিরে প্রিয় সাথী।
মিটিবে তৃষ্ণা,—এস হেথা চির সুখে,
মরীচিকা ভ্রমে ছুটো না মরুর বুকে—
নাহিকো শান্তি,—শুধুই দহন জ্বালা ,
নন্দন সম সুশোভিত ফুলে ফলে
পল্লীজননী আদরে লইবে কোলে,
পরাবে গলায় মিলন-মঞ্জু মালা।

রূপ

—গল্প—

—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

১

গোবর্দ্ধনপুরের নবীন বোস কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট আফিসের কেরাণীগিরি ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বসিলে সবাই বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রী কাদম্বিনী শুধু বিস্মিত হইয়াই রেহাই পাইল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবনাটাই মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল যে এবার বুঝিবা অর্দ্ধাশনও উঠিয়া যায়। স্বামীকে তাহার কর্ম্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে খোলসা জবাব দিয়া বসিল—তাহার ভাগ্য যখন ফিরিতে বসিয়াছে—তখন সামান্য কেরাণীগিরি করিয়া ভবিষ্যৎ সম্মান নষ্ট করিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই। কথার হেঁয়ালি কাদম্বিনী ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাই অগত্যা সে জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিল। নবীন বোস মুচকি হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল "বুঝলে না? অমনই নাম স্ত্রী-বুদ্ধি! ওগো আর ভয় নেই। আমি শীগ্‌গিরই বড় মানুষ হচ্ছি—একেবারে কোটিপতি!"

স্বামীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখিয়া ভীত হইয়া কাদম্বিনী কহিল "ওমা, সে কি কথা গো? এ কথা তোমায় কে বল্লে?"

"কালীঘাটের গণক ঠাকুর! এ যে-সে গণক নয়—কত সাহেব-সুবো হাত দেখায় জান? ঠাকুর বলেছে—শীগ্‌গিরই আমি গুপ্তধন পাব। আর কি চাকরি করতে পারি; হাঃ; হাঃ!" এই বলিয়া সে অস্বাভাবিক ভাবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।—

কাদম্বিনী মাথায় হাত দিয়া বসিল। তাহার আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাহার স্বামীর মাথা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, দারুণ অভাবের পেষণে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। পাড়া প্রতিবেশী আসিয়া তাহাকে উপদেশের উপর উপদেশ দিতে লাগিল—ডাক্তার দেখাও, কবিরাজী তেল মাখাও, ঠাকুর দেবতার মানত কর।

কাদম্বিনী তাহাদের সকলের কথাই শুনিল—কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। তাহার বুকের ভিতর দিয়া নানা চিন্তার উন্মত্ত ঝড় নিতান্ত এলোমেলো ভাবে বহিয়া যাইতে লাগিল।

সেদিন কাদম্বিনী নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল, সহসা চিন্তার সূত্র ছিন্ন করিয়া তাহার নবমবর্ষীয়া কন্যা উমা হাঁফাইতে হাঁফাইতে মায়ের নিকট আসিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। জননী কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। কোনও রকমে হাসি দমন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উমা কহিল "আজ বামুনদিদির কাণ্ড দেখতে যদি মা। বুড়ি তো চান্ ক'রে জল ছিটোতে ছিটোতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, মাঝ পথে দেখা ও পাড়ার ষষ্ঠি হাড়ির মেয়ের সাথে। সে বুড়িকে ছোঁয়নি, কিচ্ছুনা, তাকে দেখেই বুড়ি গালাগালি দিতে লাগ্‌লো। আমি বল্লাম, কৈ তোমাকে ছুঁলো বামুনদি? অমনি বুড়ি মুখ ভেঙ্গিয়ে বল্লো, দূর, দূর হতচ্ছাড়ি, আমার মুখের উপর কথা! আমি বলছি ছুঁয়েছে, আর ঐটুকু মেয়ে চোপা করছে। বাপ তো মাথা খারাপ হ'য়ে ঘরে এসে বসেছে—এইবার খেতে না পেয়ে দস্তিপনা ঘুচে যাবে। এই বলে বাম্‌নি আবার গেল ঘাটে ফিরে।—তারপর নেয়ে উঠে খানিকটা এগিয়েছে—অম্‌নি বল্‌বো কি মা, হাঃ হাঃ।" এই বলিয়া উমা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

কন্যার দুষ্টুমিভরা প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া জননীও না হাসিয়া পারিল না, কহিল, "তুই বড় দুষ্টু হয়েছিস উমা। তুই সেখানেও এম্নি ক'রে হেসেছিলি?"

উমা কহিল, "আমি তো আমি, ওরকম কাণ্ড দেখে তুমিও না হেসে থাক্‌তে পার্‌তে না মা!" তারপর কি যেন ভাবিয়া লইয়া সে অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে কহিল "আচ্ছা, বাবার কি সত্যি মাথা খারাপ হয়েছে?

স্বপ্ন

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

কাদম্বিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না মা, ও কথা ঠিক নয়। তবে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এলেন কিনা, তাই ভাবছি দিন আমাদের কি করে চলবে।"

উমার অতটা ভাবিবার আবশ্যক ছিল না, তাহার পিতার মাথা যে খারাপ হইয়া যায় নাই মাতার নিকট এই আশ্বাস পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু কন্যাকে দেখিয়া মায়ের চিন্তা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে তাহার নিজের জন্য ভাবেনা, কিন্তু এই আনন্দপুত্তলী একমাত্র কন্যা কি অনাহারে মারা যাইবে? আর কোনও রকমে আহারের সংস্থান হইলেও তাহার বিবাহ দিবে কি উপায়ে? তাহার ঘরের পুঁজি যে কতখানি তাহা তো তাহার অবিদিত নাই। যে দুই চার বিঘা জমি আছে তাহাও দেনার দায়ে বাঁধা। জমি বিক্রয় করিয়াও যে দেনা শোধের উপায় নাই। একমাত্র সম্বল ছিল স্বামীর চাকরি, তাহাও গেল।

কিন্তু আর তার ভাবিবার সময় হইল না। সহসা বামুন-দিদি অজস্র বকিতে বকিতে সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি খন্ খন্ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বলি বৌ, মেয়েটা দস্যিপনা বাড়ীতে করলেই তো পারে। *রাস্তায় ঘাটে অমন ক'রে লোকের পেছনে লাগবার দরকার কি শুনি? তোমার আদুরে মেয়ের দৌরাত্ম্যে কি বৌ-ঝিরা শুদ্ধাচারে জল নিয়েও যেতে পারে না?"

কাদম্বিনী সমস্ত জানিয়াও কহিল, "কি হয়েছে বামুন-মাসী?"

বামুন মাসী ঝাঁঝালো সুরে বলিলেন, "কি হয়েছে জিজ্ঞাসা কর তোমার আদুরে মেয়েকে। তাও বলি বাপু, অত ভাল নয়—ভগবান আছেন। বাপ তো ঐ দশা হ'য়ে ঘরে এসে বসলেন—এমন কতদিন আর মেয়ের আদর চল্‌বে তাও দেখ্‌বো।"

কাদম্বিনী এই কটুভাষিনী বৃদ্ধার কথায় ক্রুদ্ধ হইল না, বরং স্নিগ্ধস্বরেই কহিল, "সেই ভেবেই তো আমি অস্থির হয়ে উঠেছি বামুন মাসী। এখন তোমারই আশীর্ব্বাদ আমাদের ভরসা। আশীর্ব্বাদ কর মাসী, শীগ্‌গিরই যেন এ দুর্দ্দিন কেটে যায়।"

কাদম্বিনীর স্নিগ্ধ কথায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ক্রোধের অনেকটা উপশম হইল কিন্তু তবুও গম্ভীরভাবেই কহিল, "তা ঘুচবে বৈকি বৌ। দুর্দিন কি আর চিরকাল থাকে। তা যা হোক, তোমার মেয়েটিকে একটু শায়েস্তা করো বাপু। আমি ব'লেই তবু রক্ষা—আর কেউ হ'লে।"

* উমা সেইখানেই দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, এই কথার কি জবাব দিতে যাইতেই কাদম্বিনী তাহাকে ধমক দিয়া কহিল "উমা, তোকে আমি মেরে খুন করবো, ফের যদি লোকের সাথে লাগ্‌তে যাস্। এখন এক কাজ কর দেখি গাছের কচি শসা আর সেই চালকুমড়া বামুন মাসীকে এনে দে তো।"

বামুন মাসীর ক্রোধ নিভিয়া একেবারে জল হইয়া গেল, সহাস্যে কহিল "আহা, ও থাক্ না মা, ছেলেমানুষকে আর কষ্ট করতে হবে না।" তারপর সত্যই উমা মাতৃ-আদেশ পালন করিতে গেলে বৃদ্ধা স্নেহার্দ্র স্বরে বলিতে লাগি[illegible] "তোদের ভাল হোক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই [illegible] আজ নবীনকে অমনি দশায় কাজ ছেড়ে আসতে [illegible] আমার কি আর কম কষ্ট হয়েছে বৌ! সত্যি [illegible] মাথাটাই যেন বিগ্‌ড়ে গিয়েছে, নইলে তোর মেয়ের [illegible] আমি লাগাতে আসি। হায় রে, আমার কপাল! তা তোদের ভাল হবে মা, ভালই হবে। এক [illegible] দেখি মা। শশা তো দিচ্ছিস্—অমনি ওর সাথে পাঁচ আনা পয়সা দে তো দেখি। হরিপুরের মা কালী শুনেছি বড় জাগ্রত। আজই নবীনের কল্যাণে মায়ের পুজো দিয়ে নির্ম্মাল্য নিয়ে আসি। আহা, নবীন ভাল হ'লে তবে আবার আনন্দ করবো—অমন ছেলে যে গ্রামে আর দুটি নেই।"

কাদম্বিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া সওয়া পাঁচ আনা আনিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিল। বৃদ্ধা তাহা লইয়া অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল "হরিপুরের মা কালী ভারী জাগ্রত। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্ বৌ, নবীন আমার নিশ্চয় ভাল হবে।"

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে উমা কহিল, "মাও যেমন, ও পুজো দেবে না ছাই। ও পয়সায় বুড়িরই পেট-পুজোর লাগবে।"

কাদম্বিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "চুপ, চুপ, ওকথা বল্‌তে নেই।"

২

সেদিন বৈকালে উমা ষষ্ঠীচরণের বাড়ীর নিকট যাইতেই দেখিল ষষ্ঠীচরণের কন্যা নিশি ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছে। উমা নিশির প্রায় সমবয়সী এবং এই পরিবারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতাও নিতান্ত অল্প নয়। নিশির মা কুলো চালুন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া গ্রামে বিক্রয় করে—ইহারই ফলে নিশির সহিত উমার পরিচয়। অস্পৃশ্য হাড়ি জাতীয় বলিয়াই অন্য সবাই তাহাদের ঘৃণা করিত, কিন্তু উমার মা'র ব্যবহার অন্য রূপ ছিল। তাহার মধুর কথায়, অমায়িক ব্যবহারে এই অস্পৃশ্য পরিবার তাহাদের অত্যন্ত অনুগত হইয়া গিয়াছিল। নিশি উমার সমবয়সী বলিয়া তাহাদের মিলও হইয়াছিল মন্দ নয়, কিন্তু ইহাতে সহৃদয়তার চেয়ে স্বার্থপরতার ভাবই বেশী ছিল বোধ হয়। কারণ গ্রামের কোন্ গাছে পেয়ারা পাকিয়াছে, কোন্ গাছের কুল প্রায় সুপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, কোন্ গাছের আম কাঁচামিঠা, এসব সন্ধান নিশির মত আর কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া তাহাদের বাড়ীর জামরুল, সুমিষ্ট কুল ও পেয়ারা গাছ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ছয়টি মাস তাহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত।

সেদিন প্রাতে বামুনদিদির নিকট গালি খাইবার পর নিশির কি ভাবে দিন কাটিয়াছে তাহারই সন্ধান লইতে তাহাদের বাড়ী যাইতেছিল। সম্মুখেই নিশিকে পাইয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন মুখ ভার ক'রে আছিস্ যে নিশি ?"

নিশির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল; কহিল, "আচ্ছা, আমি কি তখন বামুন দিদিকে ছুঁয়েছি? আমি একপাশে সরে ছিলাম না? তুমি তো সবই দেখেছ!"

উমা বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হয়েছে কি?" নিশির চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

উমা কহিল, "কি হয়েছে কি বল্ না। বুড়ি বুঝি মার খাইয়েছে? কোথায় মেরেছে দেখি।"

নিশি পিঠের কাপড় তুলিলে দেখা গেল—বেত্রাঘাতের গভীর দাগ চামড়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে।

উমা বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিল—"কেন দাঁড়িয়ে মার খেলি। কেন ছুটে আমার কাছে গেলি নে। মেরেছে, বেশ করেছে।" তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোনো রকমে দমন করিয়া সে দ্রুতগতিতে নিশিদের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"ষষ্ঠীদা'!"

ষষ্ঠীচরণ সমস্ত দিনের পরিশ্রম নিবারণকল্পে গঞ্জিকা সেবনের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় বালিকার তীব্র কণ্ঠস্বরে সে ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "কে? দিদিমণি?"

উমা আর একটু অগ্রসর হইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "কেন অমন করে নিশিকে মেরেছ—ষষ্ঠীদা'?" ষষ্ঠীচরণ হাসিয়া কহিল, "কেন ও বামুন দিদিকে ছুঁতে গেল।"

উমা রাগতভাবে কহিল, "ছুঁয়েছে কে বলেছে তোমাকে?"

"বামুন দিদি কি আর মিথ্যে বলবে দিদিমণি!"

"না মিথ্যে বলবে না। বড় সত্যবাদী ঐ বুড়ি ডাইনি! কেন মিছিমিছি ওকে মারলে বল দেখি। নিশি বুড়ির দশ হাত দূরে ছিল যে! সাধে কি আর ভদ্দরলোক তোমাদের ছোঁয়না। তোমরা সত্যি ছোট লোক। হাড়ি ডোমের আর বুদ্ধি কত হবে।"

এই ছোট্ট গৌরবর্ণা বালিকার ক্রুদ্ধ রক্তবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ষষ্ঠীচরণ হাসিয়াই কহিল, "তা' আমি কি ক'রে জানবো। বামুনের মেয়ের কি মিছে কথা বলতে আছে?"

"না, নেই, যত বলতে আছে তোমাদের ছোটলোকের। ঐ বুড়ি তো মায়ের কাছেও গিয়েছিল নালিস করতে। কিন্তু কি করতে পারলে আমার? আমিই তো বুড়িকে দেখে হেসেছি। নিশিতো চুপটি করে ছিল। মা অমনি ছুটো শশা দিয়েই বুড়িকে ঠাণ্ডা ক'রে দিল। এর নাম ভদ্দরের বুদ্ধি।"

ষষ্ঠীচরণ হাসিয়া বলিল, "এখান থেকেও একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে গিয়েছে। তার দাম কমপক্কে ছয় আনা।"

রূপ

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

"এ সব বুড়ি ডাইনীর কারসাজি। আর কক্‌খনো ওকে কিছু দিও না। ওকে দেখলেও পাপ হয়।"

সে এইবার নিশির কাছে ফিরিল। নিকটে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সহানুভূতির স্বরে বলিতে লাগিল, "আহা, তোকে বড্ড মেরেছে রে। আমি যদি জানি তখনই ছুটে আসি। বাম্‌নি যে এত বড় মিথ্যুক তা কি আগে জানি! ও বুড়িকে কেমন জব্দ করি দেখতে পাবি। ওকে দিনে যদি দশবার চান না করাই তা হলে কি বলেছি।"

নিশির মন এইবার শীতল হইল। সে এইবার কহিল, "তুমি আমাকে ছুঁলে, এই অবেলায় তোমাকে স্নান করতে হবে না?"

"দূর, চান্ করতে যাব কেন? বাড়ীতে গিয়ে অম্‌নি গঙ্গা জল পর্শ করবো, তাহলেই সব শুদ্ধু।"

নিশি এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল।

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেই নবীন বোসের অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধকণ্ঠে উমা চম্‌কিয়া উঠিল। তাহার পিতা তাহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে উমা? যত সব ছোট লোকের সাথে না মিশ্‌লে বুঝি চলেনা।"

পিতার এরূপ কঠোর স্বর উমা কখনও শোনে নাই, তাই সে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। নবীন বোস উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল, "ফের যদি তোমাকে দেখি নিজের মর্য্যাদা ভুলে লোকের দলে মিশেছ, তা হ'লে আর আস্ত রাখবোনা বলে দিচ্ছি।" তারপর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে সে বলিতে লাগিল, "আর চাকর-বাক্‌র গুলোই বা গেল কোথায়? মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে যে থাক্‌বে তারও বেটাদের হুঁস্ নেই। দিচ্ছি, সব দূর ক'রে দিচ্ছি।"

এই কথায় উমা বিস্মিতভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি বলছো বাবা?"

পিতা মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া কহিল, "বলছি আমার মাথা। এখন তুমি আর কেরাণীর মেয়ে নও উমা, তুমি কোটি-পতির মেয়ে। সম্মান বাঁচিয়ে চলা চাই।"

বালিকা উমা সেদিন রাত্রে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মা, সত্যই কি হরিপুরের মা-কালী জাগ্রত?"

কাদম্বিনী সস্নেহে কন্যার মাথার চুল নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "সে কথা কেন মা?"

"কাল আমি বামুন দিদির বাড়ী থেকে নিজেই নির্ম্মাল্য নিয়ে আসবো মা।"

জননী আর কোনও উত্তর দিল না বটে—কিন্তু পিতার অবস্থা বুঝিতে যে আর কন্যার বাকি নাই, এ কথা সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল।

৩

পরদিন প্রত্যুষেই উমা বামুন দিদির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বামুন দিদি তখন একখানা গামছা পরিধান করিয়া অনাবৃত গাত্রে শুদ্ধাচারে গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে-ছিলেন। অদূরে খুঁটার সহিত বাঁধা তাঁহার গাভীটি দাঁড়াইয়া ছিল। গো সেবাকার্য্যে বামুন দিদি বড়ই নিপুণা, কোনও দিন ইহার এতটুকু ত্রুটি হইবার জো নাই। কারণ ব্রহ্মচারিণী বিধবার সাত্ত্বিক আহার এই পশুটি যাহা দান করে, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ ইহাকে খাওয়াইবারও বিশেষ প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিনই গ্রামের কাহারও না কাহারও শস্য ক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বামুন দিদির গাভী এম্‌নি হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে ইহাকে রজ্জুর সাহায্যে বন্ধন করিয়া রাখাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেহ তাঁহার শস্যের অপচয়ের কথা জানাইলে হয় তিনি কোন্দল করিয়া জয়ী হন, অথবা এই বলিয়া বুঝাইতে চাহেন যে নতুন রজ্জু কিনিতে তিনি কোনও দিনই কার্পণ্য করেন না, অথবা গরুটিকে বাঁধিতেও তাঁহার ভুল হয় না, তবে এই গরুটির এম্‌নি স্বভাব যে কিছুতেই বাঁধা থাকিতে চায় না। দড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বৎসরে যে তাঁহার কত গণ্ডা টাকা অপব্যয় করিয়াছে তাহার হিসাব করাও কঠিন। তাঁহার এই ক্ষতির কাছে অন্যের শস্যের অপচয়, সে নিতান্তই সামান্য ইত্যাদি।—যাহা হউক, এই গরুটি বামুন দিদির বড় আদরের, প্রত্যহ ইহার ঘর পরিষ্কার করিয়া, ইহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া, খাইবার সুব্যবস্থা

করিয়া দিয়া তিনি যে পুণ্য অর্জ্জন করেন—তাহাতেই হয় তো তাঁহার অক্ষয় স্বর্গ অবশ্যম্ভাবী।

উমা কিছুক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। বামুন দিদির তখনকার আকৃতি দেখিয়া তাহার বড় হাসি পাইতেছিল। কিন্তু তাহার হাসি দমন করিতে না পারিলে যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছে তাহা সাধন হইবে না। বামুনদিদি গোয়ালঘর পরিষ্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই উমাকে দেখিতে পাইলেন। এত প্রত্যুষে কেন যে এই দুঃশীলা বালিকা উঠানের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইছে—তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মনটা তাঁহার অসন্তোষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। হরিপুরের মা কালী জাগ্রত বটে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য লইবার জন্য—সারারাত জাগিয়া ভোরেই ধন্না দিতে হইবে তাহার কি হেতু আছে? এ নিছক তাঁহার উপর অন্যায় অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। ক্রুদ্ধা বামুনদিদি মুখ ফিরাইয়া লইলেন—কোনও কথা বলিলেন না।

উমা বুঝিতে পারিল যে নির্ম্মাল্য আনা হয় নাই। সওয়া পাঁচ আনা পয়সা এই বুড়ির বাক্সে স্থান পাইয়াছে, শসা দুটিও উদরস্থ হইয়াছে, ইহার মধ্যে কিছুরই উদ্ধারের আশা নাই। তাহার জিহ্বা সংবরণ করা অসম্ভব হইলেও সে শান্ত ভাবেই কহিল, "নির্ম্মাল্য নিতে এসেছি বামুনদি।"

বৃদ্ধা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কেন, আমি কি আর নিয়ে যেতে পারতুম না যে ভোরেই ধন্না দিয়েছিস্!"

উমা কহিল, "আমি এসেছি, তাতেই বা দোষটা হয়েছে কি? যদি এনে থাক, দিয়ে দাও তা বামুনদি।"

অপ্রসন্ন স্বরে ব্রাহ্মণী বলিল, "এখন কি দেওয়ার সময়? চান না ক'রে নির্ম্মাল্য দেওয়া যায় বুঝি?"

উমা এইবার অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, "এনেছ কিনা—তাই বলনা বামুনদি! দুটো ফুল আর বেলের পাতা গাছ থেকে ছিঁড়ে নির্ম্মাল্য ব'লে দেবে—সেটি হচ্ছে না।"

অগ্নিতে এইবার ঘৃতাহুতি পড়িল।—বামুনদিদি লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি ফুল বেলপাতা গাছ থেকে ছিঁড়ে নির্ম্মাল্য ব'লে দি? আমি তোদের সওয়া পাঁচ আনা পয়সায় বড়-লোক হবো? ছোট লোকের মেয়ের মুখে মারি ঝাঁটার বাড়ি। সকাল বেলায় বাড়ী ব'য়ে ঝগড়া করতে এসেছে! ও মুখে পোকা পড়বে, চোখে ঢেলা বেরোবে, হাত পা খ'সে যাবে। আমি বামুনের মেয়ে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—কেউ আমাকে চোর অপবাদ দিতে পারে না, আর তুই আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌বি।"

বামুনদিদিকে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া উমা হাসিতে হাসিতেই কহিল—"কে তোমাকে চোর অপবাদ দিল বামুনদি?"

বৃদ্ধা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "তুই একরত্তি মেয়ে, তোর কথার প্যাঁচ আমি বুড়িমাগি বুঝতে পারিনে, বটে? তোর মায়ের সওয়া পাঁচ আনা পয়সায় আমি পাকাবাড়ী করবো, না, জমিদারী কিনবো রে হারামজাদি?"

উমাও এইবার টক্কর দিয়া বলিয়া উঠিল—"আর কিছু না হোক তোমার পেট পূজো তো চল্‌তে পারে! হরিপুরের মা কালীর পূজো দিতে হ'লে খরচ হ'য়ে যাবে যে!"

ব্রাহ্মণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। গোবর মাখা হাত তুলিয়া ধাইয়া আসিয়া কহিলেন, "বেরো বেরো, আমার বাড়ী থেকে, দূর হ'।"

উমা কয়েকপদ পিছনে সরিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দূর হচ্ছি! নির্ম্মাল্য দে না বুড়ি!"

বৃদ্ধা এইবার অভিসম্পাত দিতে সুরু করিলেন। হাত ঝাঁকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোর বাপ মরুক, তোর মায়ের দশা আমার মত হোক, তখন নির্ম্মাল্য নিয়ে যাব। ফের আমাকে জ্বালাবি তো এখানে পুঁতে ফেলবো।"

উমাও এইবার নিজ মূর্ত্তি ধরিল, কহিল, "ওঃ! পুঁতে ফেলবে, ফেল্‌না দেখি বুড়ি পেত্নী, তোর কত বড় সাধ্যি! আজ নদীর ঘাটে চান করতে যাস্, তোর ঐ পা দুটো যদি না খোঁড়া করে দি—" এই বলিয়া সে হাত দিয়া এক অর্থ পূর্ণ ইঙ্গিত করিল।

বামুন দিদির মুখে ভয়ের আভাস দেখা গেল, কিন্তু তবু তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এ মগের মুল্লুক কিনা, তাই যা ইচ্ছে করবি। বাড়ী থেকে দূর হ', নইলে এখনি পাড়াপড়শী ডেকে জড়ো করবো।"

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

"করুনা বুড়ি। তাদের দেখে আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলুম আর কি। ষষ্ঠীচরণের বাড়ীতে পেট পূরে মুড়ি আর বাতাসা খাওয়া আর বেতের ঝুড়ি আনার কথা যদি না বলি তাহলে—" এই বলিয়া সে অর্থপূর্ণ ভাবে মাথা ঝাঁকাইতে লাগিল।

বৃদ্ধার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কহিলেন, "ওমা, সে কি কথা লো! আমি গেলাম কবে ষষ্ঠীচরণের বাড়ী মুড়ি খেতে? এ ছুঁড়ি যে রাতকে দিন করতে পারে!"

বামুন দিদিকে ভীত হইতে দেখিয়া উমা সহাস্যে কহিল, "কচি শশা মুড়ির সাথে যা ভাল লাগে—তা' কি আর বুড়ি জানে না।"

শশার কথায় আবার বৃদ্ধার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, কিছুদূর ধাইয়া আসিয়া কহিলেন, "তোর মাকে কি শশা দিতে বলেছিলুম যে বারবার শোনাচ্ছিস? বামুনের মেয়ের পেটে গেলে পুন্নি হবে তাইতো সেধে দিয়েছিল। আমি কি ভিক্ষে করে আন্‌তে গিয়েছিলাম।"

উমা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিল, "মুচি পাড়ার মুচিরা যা রেগেছে বুড়ি বামনীর ওপর। ফের ডাইনি বুড়ির গরু কারও ক্ষেত নষ্ট করে, তা'হলে তার যা অবস্থা করবে! পরের ক্ষেতের ধান খাইয়ে গরুর পেট মোটা করা আর পূজো দেবার নাম ক'রে নিজের পেট পোরা বেরিয়ে যাবে!" এই বলিয়া উমা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তখন সেইখানেই লম্ফ ঝম্ফ করিয়া উমা ও তাহার পিতামাতার সদ্গতি করিতে লাগিলেন, তাঁহার উচ্চ চীৎকার ও গালাগালি শুনিতে শুনিতে পাড়ার লোক অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহারা ইহা একেবারেই গ্রাহ্য করিল না, নতুবা আজ বোধ হয় পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত।

৪

যতই লম্ফঝম্ফ গালাগালি করুক না কেন—সেদিন আর বৃদ্ধার নদীতে স্নান করিতে যাওয়া হইল না। উমা যে তাহার কথানুযায়ী কার্য্য করিবে না, একথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে উমা একজন সর্দ্দার এবং দুষ্টামিতে অনেক ছেলেও তাহার নিকট পরাজিত হয় একথা তাঁহার অজানা ছিল না। তাহার ক্ষুদ্র দলটি লইয়া সে গ্রামের মধ্যে যে উৎপাতের সৃষ্টি করিত, তাহাও তিনি কতক কতক জানিতেন।

সুতরাং এই শুদ্ধাচারিণী বৃদ্ধার ভাগ্যে সেদিনটা স্নান হইল না, এবং সেজন্য সারাদিন উপবাসীই রহিয়া গেলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কলসী লইয়া তিনি নদীতে চলিলেন। কোনোরূপে স্নান সারিয়া তিনি কলসীটি জলে ভরিয়া উপরে উঠিয়া ভাবিলেন, আজকার ফাঁড়াটা বোধ হয় কাটিয়া গেল। নদীর উপরেই ঘন পল্লব বিশিষ্ট তেঁতুল গাছ। সহসা তাহার উপর হইতে নাকি সুরে কে যেন বলিয়া উঠিল, "ওঁ বুঁড়ি বাঁমনি।"

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় শোনা গেল, "যাঁচ্ছিস্ কোঁথায়? আঁজ তোঁর ঘাঁড় মটকাবো।"

বৃদ্ধার কক্ষ হইতে কলসীটা পড়িয়া গেল, ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "তোমরা কে বাবা—?"

"হঁরিপুঁরের কাঁলী মাঁয়ের চঁর। পুঁজো দিঁবি বঁলে পঁয়সা নিঁয়ে মাঁয়ের পুঁজো দিঁস্ নি। তোঁর রঁক্ত খাঁবো।"

বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দোহাই বাবা, আমি কালই পূজো দিয়ে আস্‌বো।"

"হুঁ। আঁর খঁবরদাঁর ছোঁট ছোঁট ছেঁলে মেঁয়ের পিঁছনে লাঁগতে যাঁসনে তাঁহলে মঁজাটা টেঁর পাবি।"

বৃদ্ধা কোনো রকমে বলিলেন, "আজকের মত দয়া কর। আর কাউকে কিছু বল্‌বো না।"

"আঁর ফেঁর যঁদি তোঁর গঁরু কাঁরও ক্ষেঁত নঁষ্ট কঁরে।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, এমন কর্ম্ম আর কোনও দিন হবে না।"

"তঁবে যাঁ বুঁড়ি, বঁড় বেঁচে গেঁলি।"

বৃদ্ধা কলসীটি লইয়া ছুটিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে—কিন্তু ভয়ে তাঁহার সমস্ত শরীর এম্‌নি কাঁপিতেছিল যে চেষ্টা করিয়াও দ্রুত যাইতে পারিতেছিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে ঝুপঝাপ করিয়া কতকগুলি বালকবালিকা নামিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

উমা কহিল, "বুড়ি আচ্ছা জব্দ হয়েছে, আর কোনো দিন আমাদের সাথে লাগ্‌তে আসবেনা।"

ভট্টাচার্য্যের পো পন্টু কহিল, "বুড়ি কেমন কাঁপছিল দেখেছিস্ উমা?"

উমা কহিল, "দেখেছি। কিন্তু তোকে আর কোনো দিন এ সব কাজে আন্‌ছিনে—যা হাসিস্!"

পন্টু ক্ষুণ্ণ হইল; কহিল, "আমি আর কেনো দিন হাসবো না ভাই।"

উমা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

হারাধন মুচির ছেলে কাঙ্গি কহিল, "আর ও বুড়ি গরু ছাড়বে না। বাপ্‌রে—যা ক্ষেত নষ্ট করে।"

নিশি কহিল, "উমার কি বুদ্ধি ভাই!"

কাঙ্গি বলিল, "হবে না? ঐ যে আমাদের সর্দার। বুদ্ধি এম্‌নি না হ'লে চলে!"

সেদিন এই দুষ্ট ছেলেমেয়ের দল বড় খুসী হইয়াই বাড়ী ফিরিল—কেননা বুড়িকে এমন ভাবে জব্দ করিতে পারিবে তাহা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই।

পরদিন মধ্যাহ্নেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী নির্ম্মাল্য লইয়া উমাদের বাড়ী হাজির হইলেন। কাদম্বিনীকে কহিলেন—"পূজোটা দিতে একটু দেরী হ'য়ে গেল বৌ—আজ দিন ভাল তাই অপেক্ষা করছিলাম। এই নির্ম্মাল্য দিয়ে একটা মাদুলি করে দিস্, নবীন আমার ভাল হ'য়ে যাবে।"

কাদম্বিনী ভক্তিভরে নির্ম্মাল্যের উদ্দেশে প্রণাম করিল, ভক্তিবিগলিত স্বরে কহিল, "তাই আশীর্ব্বাদ কর মাসী, আর ভুগ্‌তে না হয়।"

উমা এই সময় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ে তো কাল সকালেই আমার ওখানে উপস্থিত। যতই আমি বলি নির্ম্মাল্য নিয়ে আমিই যাচ্ছি—তা কি শোনে! আহা, বাপের অসুখে ওরই কি মাথার ঠিক আছে। অতটুকু মেয়ে হ'লে হবে কি—তোমারই মেয়ে তো, মনটা ওর বড়ই কোমল।"

বৃদ্ধার ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া উমার বড় হাসি পাইতেছিল, সে অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী সস্নেহে কন্যার মুখের দিকে চাহিল।

বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন, "মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে বৌ? গৌরীদানের সময় তো বয়ে গেল। যা হোক এইবার একটা জামাই খুঁজে পেতে বার করো। আর দু চার বচ্ছর যাক্? না বৌমা, সে আমার মোটেই ভাল লাগে না। ধিঙ্গি মেয়ের—সে কি আর বিয়ে? এখনকার কালের ঐ এক ঢং বাপু। তোমার মেসোশ্বশুর আমাকে যখন ঘরে আনে—তখন আমার বয়স ছয় বচ্ছর। তারপর সাতটি বছর হাতের নোয়া বজায় রেখেছিলাম। এখন ছয় তো দূরের কথা, ষোলোর আগে আর কথা নেই। সে বাপু আমার নাত্‌নির বেলায় হতে দিচ্ছিনে। আমি শীগ্‌গিরই উমির বরকে কান ধ'রে হাজির করে দিচ্ছি। কি বলিস্‌রে দিদি?" এই বলিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিতেই সে 'দূর' বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

কিছুক্ষণ পরে নানা উপদেশ দান করিয়া, মঙ্গলেচ্ছা জানাইয়া, নবীন ভাল হোক, কাদম্বিনীর মত বৌ এ গ্রামে আর দুটি নাই, উমার মত পরমাসুন্দরী মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায় ইত্যাদি অভিমত প্রকাশ করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু বাড়ীর পথ না ধরিয়া বিপরীত পথে চলিলেন।

বিধু সা মহাজনী কারবার করে—তাহার নিকট দেনার দায়ে নবীন বোসের কয়েক বিঘা জমি বাঁধা রহিয়াছে, একথা ব্রাহ্মণীর জানা ছিল। তাই তিনি তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধু সা ব্রাহ্মণীকে ভাল ভাবে চিনিত, সে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভরে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

ব্রাহ্মণী কহিল, "কদিন আস্‌তে পারিনি। এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম একবার ঘুরে যাই। শরীর-গতিক সব ভাল তো বিধু!"

বিধু কহিল, "সে তোমার ছি'চরণের আশীর্ব্বাদে পিসি!"

"বেশ, বেশ ভাল থাক্‌লেই আমি খুশী। কেমন কারবার চল্‌ছে এ সময়টা বিধু!"

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

মুখখানি ভার করিয়া বিধু কহিল, "বড়ই মন্দা চলছে পিসি। সুদ তো আদায় হয়-ই না--আসল নিয়ে টানাটানি।"

ব্রাহ্মণী বিজ্ঞার মত মালা ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে কহিলেন, "সে আমি জানি। নবীন বোসের কাছে টাকা আদায়ের কি হচ্ছে বিধু? সে তো পাগল হ'য়ে বাড়ীতে বসেছে। ও টাকা গুলোও বা যায়।"

বিধু কহিল, "জমি বন্ধক আছে। ও আদায় হ'তে পারবে।"

ব্রাহ্মণী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "জমি বেনামী করবার চেষ্টা করছে শুনেই তো তোমার কাছে ছুটে আসা!"

"তাই নাকি পিসি। তাহ'লে এইবার দেখে নিচ্ছি।" এই বলিয়া সে গা ঝাড়া দিয়া বসিল। ব্রাহ্মণীর মুখের ভাব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিল, "তোদের মঙ্গল দেখলেই আমি খুসী বাবা,—নইলে আমার আর এতে স্বার্থ কি!"

বিধু সহাস্যে কহিল, "সে তো ঠিক কথাই পিসি। তোমাকে কি আর আমি চিনি না।"

বিধু ঠিকই বলিয়াছিল।—এই বৃদ্ধা যে কি পদার্থ তাহা সে সত্যই জানিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে সে বিরত হইল না। নবীন বোসের পাওনা টাকাটি আদায় করিবার জন্য সে এইবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

৫

ক্রমশঃ কাদম্বিনীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। নিজের একবেলা দু মুঠা হইলেও কোনও রকমে চলিতে পারে বটে—কিন্তু স্বামী ও কন্যাকে প্রাণ থাকিতে অনাহারে থাকিতে দিবে কি করিয়া? স্বামীর চাকুরি গিয়াছে—উপরন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত। ঠাকুর দেবতার নিকট মাথাকোটা, মাদুলী, নির্ম্মাল্য, সবই ব্যর্থ হইল! তাহাকে দিয়া কোনও কাজ তো হইবেই না—একটা মুখের কথারও ভরসা নাই। এদিকে বিধু সেই টাকার জন্য যে ভাবে তাগিদ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বোধ করি জমিটুকুও মাসখানেকের মধ্যেই হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তারপর শুধু অবশিষ্ট থাকিবে, এই ভিটেটুকু, স্বামীর কল্পিত বড় মানুষী এবং এক অনূঢ়া বালিকা কন্যা!

কাদম্বিনী সান্ত্বনার জন্য স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, স্বামী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে থাকে, "পাড়াগাঁয়ে কি তেতলা বাড়ী পোষাবে? পাড়াপড়শীর চোখ ঠিক্‌রে যাবে যে! যদি বলতো কলকাতাতেই না হয়—।"

যাহার নিজের ভিটা দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, তাহার এই পাগলামি দেখিয়াই কাদম্বিনীর অশ্রু সম্বরণ করা অসাধ্য হইত।

কন্যার দিকে চাহিলেও চোখে তাহার জল আসিয়া পড়ে। তাহার একটি মাত্র কন্যা, হরিণশিশুর মত লাফাইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, ঝর্ণার মত এই বালিকার মুখের হাসি আর কতদিন বজায় রাখিতে পারিবে সে?

সহসা একদিন তাহার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িয়া গেল। কাদম্বিনীর জা'য়ের বাপের বাড়ী কলিকাতায়, সে বিধবা এবং বড় মানুষের কন্যা। নবীনের ছোট ভাইয়ের সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পর বিধবা হইয়া সে পিত্রালয়ে রহিয়াছে। কোনও রকমে ভাশুরের অবস্থার কথা জানিয়া বড় জাকে চিঠি লিখিয়াছে; জানাইয়াছে, সে উমাকে তাহার কাছে রাখিতে চায়। উমা যেমন কাদম্বিনীর কন্যা, তেমনি তাহারও কন্যাস্থানীয়া। কলিকাতায় আসিলে উমার কোনও কষ্ট হইবে না বরং যাহাতে তাহার বড়ঘরে বিবাহ হয় এমন ব্যবস্থা সে করিয়া দিতে পারিবে। সে সন্তানহীনা, উমাকে সে কন্যার অধিক মমতায় পালন করিতে চায়। কাদম্বিনীর যখন ইচ্ছা উমাকে দেখিয়া যাইতে পারিবেন।

কাদম্বিনীর সম্মুখে এ একটা মস্ত বড় প্রলোভন। কিন্তু কি নিদারুণ! কলিকাতায় কাকীমার নিকট গেলে হয়ত উমার একটা গতি হইয়া যায়। কিন্তু সেও যে তাহার একমাত্র সন্তান! একমাত্র উমাই যে তাহার আঁধার ঘরের মাণিক, হীরার টুক্‌রো। তাহাকে কাছছাড়া করিলে সে বাঁচিবে কি অবলম্বন করিয়া?

কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ! মা হইয়া মোহের বশে কন্যার ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দিবে? কলিকাতায় পাঠাইলে যে

ভাবনা তাহার সবচেয়ে বেশী হইয়াছে সেই উমার বিবাহ হয়ত সহজে হইয়া যাইবে। হয়ত বা উমার কাকীর সুপারিসে এমন ঘরে বিবাহ হইয়া যাইতে পারে যাহার কল্পনাও এখন সে করিতে পারিতেছে না।

কাদম্বিনী সারাদিন ভাবিল। রাত্রে তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "উমা, তুই আমাকে ছেড়ে থাকতে পারিস ?"

জননীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া উমা কহিল, "না।"

কাদম্বিনী কহিল, "না কেন রে পাগলি। তোর কাকী চিঠি লিখেছে যে। তোকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। কলকাতায় যাবিনে ?"

উমা বুক হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, "তুমিও চল না। আমি একা কিছুতে যেতে পারবো না।"

কাদম্বিনী কহিল, "একবার ঘুরেই আয় না উমা। তোর কাকী যে খুব বড় লোক। কলকাতায় গেলে কত রকম জিনিষ দেখ্‌তে পাবি। তোর কাকীমাও ঠিক আমারই মত ভালবাস্‌বে।"

উমা এইবার মুখ তুলিয়া কহিল, "যেতে পারি, কিন্তু তিন দিনের বেশী আমি থাকৃতে পারবো না মা, সে তোমায় ব'লে দিচ্ছি।"

পর দিন কাদম্বিনী কলিকাতায় তাহার সম্মতি জানাইয়া চিঠি লিখিয়া দিল।

কয়েকদিন পর কলিকাতা হইতে লোক আসিল। কাদম্বিনীর জা সুনীতি দুই শত টাকা পাঠাইয়া লিখিয়াছে, ছোট বোনের এই কয়টি টাকা লইতে যেন তাহার দিদি কোনও কুণ্ঠা বোধ না করে। তাহার পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবার সৌভাগ্য হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তবু তো সে তাহারই বোন্। কাদম্বিনী মনে মনে মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিল। নিজেরই মনে বলিল, এ কি মেয়ে বিক্রয়ের মূল্য ?

কন্যাকে পাঠাইবার দিন আসন্ন হইয়া আসিল। এ যাওয়া যে অল্পদিনের নয় তাহা সে জানিত। তাহার মন যতই বেদনায় টন্‌টন্ করুক, তবু সে কন্যাকে লোক অভাবে আনিতে পারিবে না, নিজেও যাইতে পারিবে না। একমাত্র সন্তানকে পরের হাতে সমর্পণ করা কি কঠিন কাজ! নিজের হাতে হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া দিলেও বুঝি বা এত ব্যথা লাগে না! কিন্তু উপায় যে নাই। কন্যার ভবিষ্যৎ সে কি মায়ায় বদ্ধ হইয়া নষ্ট করিবে ?

কিন্তু উমা এত বুঝিল না। সে জানে অল্পদিনের জন্য যাইতেছে, আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। সে তাহার সঙ্গীদের কলিকাতায় যাওয়ার সংবাদ শুনাইল। কলিকাতা যে কত বড় জায়গা, সেখানে কত বড় দালান কোটা, গাড়ী ঘোড়া, কেমন চিড়িয়াখানা, তাহার কাকীমা কত বড়লোক, তাহাকে তিনি কত ভালবাসিবেন, কত জিনিষ দিবেন, সমস্ত মনের কথা বলিল। তাহার এই সৌভাগ্যের আর কেহ অংশভাগী হইতে পারিল না দেখিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ হইল।

যাত্রার দিন নবীন বোস কাদম্বিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীতে ব্যাপারটা কি চল্‌ছে বল্‌তে পার ?"

কাদম্বিনী কহিল, "উমা কল্‌কাতায় যাবে; তার কাকী লোক পাঠিয়েছে তাকে নেবার জন্য।"

নবীন বোস কহিল, "সে হবে না। পরের বাড়ীতে আমি মেয়ে পাঠাতে পারবো না। এ কি যে-সে লোকের মেয়ে যে যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকবে!"

কাদম্বিনী শান্ত স্বরে কহিল, "না, সে কথা নয়। তবে কাকী যখন দেখ্‌তে চেয়েছে, একবার ঘুরে আসুক না ?"

অপ্রসন্ন ভাবে নবীন বোস কহিল, "আচ্ছা যাক, কিন্তু বেশী দিন যেন না হয়।"

রওনা হইবার সময় উমা মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল, "মা, মন কেমন করছে যে!"

কাদম্বিনীর চোখের জল সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল. চোখ মুছিয়া কহিল, "যাও মা, কাকীমার কাছে গেলেই মন ভাল হ'য়ে যাবে!"

কন্যাকে বিদায় দিয়াই কাদম্বিনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল! কিন্তু প্রাণ যে একবার কাঁদিয়া লইবে সে অবকাশও তাহার মিলিল না। সেই মুহূর্ত্তেই বিধু সা টাকার তাগিদে আসিল। কাদম্বিনী চোখ মুছিয়া তাহাকে বলিল, "দলিল খানা নিয়ে এস, টাকা দিচ্ছি।"

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

বিধু অবাক হইল বটে কিন্তু তখনই কাগজের তাড়া হইতে দলিল বাহির করিল। কাদম্বিনী সেই দুই শত টাকা দিয়া বিধুসার দেনা পরিশোধ করিয়া দিল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন, "বলি বৌ, মেয়ে কোথায় পাঠালি ?"

ক্ষুণ্ণস্বরে কাদম্বিনী কহিল,"কলকাতায়, কাকীর কাছে।"

"হঠাৎ কাকীর ভালবাসা উথলে উঠ্‌লো যে। নবীনের অবস্থার কথা লিখে ছিলি বুঝি ? তা এ মন্দ হয়নি, মেয়ে বেঁচে অন্ততঃ বিধুর দেনাটাও শোধ হোলো।"

কাদম্বিনীর মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল—তবে কি সে কন্যাকে সত্যই চিরকালের মত বিদায় দিয়াছে ?

৬

ছোট্ট ভাঙ্গা টিনের বাক্সটি লইয়া যখন উমা তাহার কাকীমার পিত্রালয়ে আসিয়া নামিল তখন সেই বাড়ীর অনেক ছেলে মেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উমা অতি বিস্ময়ে তাহাদের দিকে চাহিতে লাগিল। ইহাদের সাজ সজ্জা, কথা বলিবার ভঙ্গিমা দেখিয়া তাহার একেবারে তাক লাগিয়া গেল। তারপর এ কত বড় বাড়ী, কত জিনিষ, কত লোক জন। সে নিতান্ত নির্ব্বোধের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। এখানে সে কাহাকেও চেনে না, যিনি তাহাকে আদর করিয়া আনিয়াছেন তাঁহাকেও সে চোখে দেখে নাই। এই অপরিচিতের রাজ্যে আসিয়া তাহার যেন কান্না পাইতে লাগিল। তাহার অভিমান হইল কেন মা জানিয়া শুনিয়া এমন জায়গায় পাঠাইল ?

অনতিবিলম্বেই উমার কাকীমা সুনীতি আসিল, তাহার সঙ্গে আরও কয়েকটি স্ত্রীলোক। সুনীতি অগ্রসর হইয়া উমাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিল। আশ্রয় পাইয়া উমা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—না দেখিলেও অনুমানে বুঝিল, ইনিই তাহার কাকীমা। সকলেই মন্তব্য প্রকাশ করিল—মেয়েটি দেখতে বেশ। এতদিন অযত্নে পড়েছিল, যত্নে থাক্‌লে ওর চেয়ে অনেক ভাল হবে।

সুনীতি উমাকে লইয়া তাহার কক্ষে আসিল। তারপর তাহার মুখ ধোয়াইয়া, নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিল। উমা নিতান্ত লক্ষ্মী মেয়ের মত কাকীমার নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া যাইতেছিল। এই দুঃশীলা বালিকা—যে গ্রামের মধ্যে দস্যিপনায় শ্রেষ্ঠ ছিল—সে হঠাৎ এই অপরিচিত স্থানে একেবারে সুবুদ্ধি হইয়া উঠিল।

সুনীতি বাক্স খুলিয়া নানারকম জামা কাপড়, পুতুল খেলনা, ছবি ও ছড়ার বই উমাকে দেখাইতে লাগিল। উমা অতি ধীর শান্ত স্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কার কাকীমা ?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "তোমারই উমা।"

উমা সবিস্ময়ে কহিল, "আমার !"

এত জিনিষ সে জীবনে একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার আনন্দ হইল বটে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

সুনীতি সন্তানহীনা বিধবা তাই সে সহজেই উমাকে সন্তানের মত ভালবাসিয়া ফেলিল। সন্তানহীনার যত ব্যথা সমস্ত এই উমাকে দিয়া বিদূরিত করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া তাহার যেন আশা হইল।

কিন্তু উমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তিন চার দিন কোনো রকমে কাটাইবার পর সে সুনীতিকে কহিল, "আমার কবে পাঠিয়ে দেবে ছোট মা ?"

উমা প্রথমে সুনীতিকে কাকীমা বলিত, কিন্তু সুনীতির এ ডাক পছন্দ হয় নাই। তাই সে ছোট মা বলিতে শিখাইয়াছে।

সুনীতি কহিল, "আমার কাছে থাক্‌তে কি তোর ভাল লাগছে না উমি ?"

উমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "না, তা নয়। কিন্তু মায়ের বড় কষ্ট হবে যে !"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আর তুই চ'লে গেলে আমার কষ্ট হবে না বুঝি ?"

উমা আর কোনো কথা কহিল না, কিন্তু মনে মনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তবে কি তাহার মা সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই এইখানে পাঠাইয়াছে ? আর তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে না ? দিন দুই তিন পরে সে তাহার মাকে চিঠি লিখিল :—

মা, আমি আর কতদিন এখানে থাকবো ? আমার মোটেই ভাল লাগেনা। সব সময় তোমার জন্য আমার মন কেমন করে। তুমি বলেছিলে—দুই তিন দিন পরেই চ'লে আস্‌বো—কই তা তো দেখ্‌ছি না। এখানে ছোট মা আমাকে খুব ভালবাসেন। কত জিনিষ আমাকে দিয়েছেন, অমন কেউ চোখেও দেখেনি। জিনিষগুলো তোমাদের দেখাতে আমার এম্‌নি ইচ্ছে করছে! পায়ে পড়ি মা, আমাকে নিয়ে যাও, না হয় ছোটমাকে পাঠিয়ে দিতে লেখ। তিনি আমার কথা শোনেন না—তুমি লিখ্‌লে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন। আমি চ'লে আসার পর নিশি আর আমাদের বাড়ী এসেছিল কি ? তাদের বাড়ীর পেয়ারা কি পেকেছে ? পল্টু, কাঞ্ছি তারা আমার খোঁজ করে কি ? বামুন দিদি আমার কথা কি বলে ? আমি যে পাতাবাহারের গাছটা বুনে এসেছি সেটায় একটু একটু জল দিও—যেন শুকিয়ে না যায়। মঙ্গলার কতখানি দুধ হয় ? বাছুরটা কি এখনও তেম্‌নি ছুটোছুটি করে ? মা, তোমার পায়ে পড়ি, এখান থেকে নিয়ে যাও আমাকে, এখানকার ছেলে মেয়ে গুলো যেন কি রকম—আমাকে তারা গেঁয়ো পেত্নী ব'লে ক্ষ্যাপায়। কিন্তু ছোট মার সাম্‌নে কেউ একটা কথাও বল্‌তে পারে না। আমার শরীর ভাল আছে, কিন্তু শীগ্‌গির যদি না নিয়ে যাও তাহলে আমার সত্যি অসুখ করবে।

সুনীতি চিঠিখানি পড়িল—কিন্তু পাঠাইয়া দিল। সেই সঙ্গে নিজে লিখিয়া দিল—দিদি, উমা যাবার জন্য একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। প্রথম প্রথম একটু হবেই, তারপর স'য়ে যাবে। আমার কাছে উমাকে রেখে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এখন খুবই কষ্ট হবে তোমার, কিন্তু যখন রূপে গুণে ধনে শ্রেষ্ঠ জামাই এনে দেব তখন নিশ্চয়ই তোমার এই ছোট বোনটিকে তুমি আশীর্ব্বাদ করবে। উমার এরই মধ্যে সুন্দরী ব'লে প্রশংসা বেরিয়েছে। দিদি, তুমি যদি একবার শীগ্‌গিরই পায়ের ধুলো দেও তবে তোমার মনও ঠাণ্ডা হবে, উমাও ঠাণ্ডা হবে।

উত্তরে কাদম্বিনী লিখিল—মেয়ে দিয়ে যদি নিশ্চিন্তই না হবো তা হ'লে তোমার হাতে দিতাম না বোন। তোমার হাতে প'ড়ে উমার ভাগ্য ফিরুক তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। জামাই যখন আনবে তখনই একেবারে যাবো, এখন আর সময় হবে না ভাই।

কন্যাকে লিখিল—উমা ! এত শীগ্‌গিরই ছোটমার কাছ থেকে কেন চলে আস্‌বি। তিনি যে তোকে আমারই মত ভালবাসেন। সেখান থেকে চলে এলে কি তাঁর কষ্ট হবে না ? কিছুদিন ওখানেই থাক্ না, মন ঠিক হ'য়ে যাবে।

পত্রখানি পড়িয়া উমা গুম্ হইয়া বসিল। সে ভাবিয়া ছিল পত্র পাইতে না পাইতেই তাহার মা তাহাকে যাইবার জন্য লোক পাঠাইবেন, কিন্তু একি উত্তর ! নিশ্চয়ই তাহাকে চিরকালের মত এখানে রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বেশ !

৭

বছর দুই পরের কথা বলিতেছি। উমা আর ছোট বালিকা নয়, সে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রূপ শত গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামের অযত্নবর্দ্ধিত বালিকা আর নাই, সে এখন সহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্দ্ধিত, কাকীমার অশেষ স্নেহভাগিনী উমারাণী। কাকীমার কৃপায় তাহার কোনো অভাব নাই, তাহার সাজসজ্জা পোষাক পরিচ্ছদে কতক গুলি বাক্স পরিপূর্ণ।

এখন যে তাহার পল্লীগ্রামের কথা মনে পড়ে না তাহা ঠিক নয়। তাহাদের গ্রামের কথা, সমবয়সীদের কথা, বামুনদির কথা —এম্‌নি অনেকের কথা তাহার মনের কোণে ব্যথা জাগাইয়া তোলে। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য জননীর নিকট চিঠি লিখিয়া লিখিয়া ক্লান্ত হইয়াছে আর সে-কথা লেখেনা। মা বাপকে না দেখার দুঃখ তাহারও তো কম নয়। কিন্তু অভিমানভরে মনে করে—তাঁহারাই তো ইচ্ছা করিয়া দূরে পাঠাইয়াছেন সব জানিয়াই তো পর করিয়া দিয়াছেন। এই কথা মনে হইতেই তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়ে।

এদিকে তাহার কাকীমা সুনীতিও নিশ্চেষ্ট নয়। সে উমার বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহার পিতা স্বীকার করিয়াছেন উমার বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করিবেন। অনেকেই উমাকে বধূ করিবার জন্য আগ্রহ দেখায়, তাহার অনন্যসাধারণ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কিন্তু

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

সুনীতির পছন্দ হয় না, একটা না একটা খুঁত সে ধরিয়াই বসে। উমার জন্য যেরূপ বর আনিতে সে প্রতিশ্রুত আছে তাহা অপেক্ষা একটু হীন হইলে তো চলিবে না।

অনেক সন্ধানের পর একটি ছেলে সুনীতির পছন্দ হইল। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী পরিবারের একমাত্র পুত্র—রূপে কন্দর্প, বিদ্যাতেও মন্দ নয়, বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। বর-পক্ষ উমাকে পছন্দ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

বিবাহের ঠিক করিয়া সুনীতি কাদম্বিনীকে লিখিল—দিদি, উমার বিয়ে ঠিক করেছি। জামাইটি কল্‌কাতার মস্ত ধনীর ছেলে। বাপ নাই, মা আছে। এমন নামজাদা বংশে মেয়ে দেওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। আমাদের বরাত ভাল দিদি, তাই এমন জামাই পেয়েছি। জামাই দেখ্‌তে কন্দর্প—বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছে। সবই ভাল। এখন দীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক্‌লেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। দিদি, শুভদিনের তো আর বিলম্ব নাই। বড়-ঠাকুরকে নিয়ে তুমি শীগ্‌গিরই এসো।

পত্র পাইয়া আহ্লাদে কাদম্বিনীর চোখে জল আসিল। এতদিনের কষ্ট তাহার এইবার সার্থক হইতে চলিল যে। একমাত্র কন্যাকে কোলছাড়া করিয়া সে এই দীর্ঘদিন কি ভাবে আছে, তাহা আর কেউ না জানুক তাহা অন্তর্য্যামীর তো অজানা নাই। যে দিনের আশায় সে বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সেই দিনটিইতো এত দীর্ঘকাল পরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্বামীকে উমার বিবাহের কথা জানাইল।

নবীন বোস কহিল, "পরের বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে, সে কি কথা? আমার এমন চক্ মেলান বাড়ী থাক্‌তে—না, না সে হবে না, পরের বাড়ীতে আমি যেতে পারবো না।"

কাদম্বিনীর মন আজ নিতান্ত হাল্কা হইয়াছিল। সে স্বামীর কথায় দুঃখিত না হইয়া হৃষ্টচিত্তেই কহিল, "আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। এখন কলকাতায় চল তো।

কলিকাতায় আসিয়া উমাকে দেখিয়া কাদম্বিনী একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। কে বলিবে এ তাহার সেই উমা। তাহার উমা এমন সুন্দর! সে হাসিয়া সুনীতিকে কহিল, "তোর জোরে উমার বরাত খুলে গেল। আমার মত হতভাগিনীর পেটে জন্মে ওর তো অশেষ দুর্গতি হবারই কথা ছিল বোন্!"

যথাসময়ে উমার বিবাহ হইয়া গেল? কাকীমার ভাব দেখিয়া উমার মনে হইল যেন তাহারই কন্যার বিবাহ, আর কাদম্বিনী বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছে।

বিবাহের পর কন্যা জামাতা বিদায়ের সময় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নবীন বোস সজল চক্ষে কহিল, "তা জামাই মন্দ হয়নি। কোটিপতির জামাই এম্‌নি হবারই কথা। দেখ বাপু, উমা কিন্তু গরীব কেরাণীর মেয়ে নয় কষ্ট ফষ্ট ও জীবনে সহ্য করেনি। দেখ যেন ও দুঃখু না পায়।" কন্যার বিদায় দিবার সময় এই বিকৃতমস্তিস্ক পিতারও চোখের জল বাধা মানিল না।

৮

উমার স্বামী নীতীশ কলিকাতার নামজাদা ধনীবংশের সন্তান, সুতরাং তাহার অভাব কিছুরই ছিল না। শুধু অভাব ছিল তাহার নামের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্যের। ধনীর আদরের দুলাল হইয়া সে শৈশব হইতেই অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। যে আবহাওয়ায় সে বর্দ্ধিত, তাহাতে তাহার সংযম শিক্ষার সুবিধা হয় নাই। তাহার পিতা হরলাল নিতান্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন। স্বেচ্ছাচারিতা ও অসংযমের শাস্তিস্বরূপ তিনি অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নীতীশ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, যেমন অর্থেরও তাহার অভাব ছিল না, তেমনি বদখেয়ালেরও তাহার অন্ত ছিল না। সে বিনা বাধায় অসংযমের স্রোতে অবাধে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহার জননী বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু তিনি পুত্রের কোনও দোষ দেখিতে পাইতেন না। ধনীর সন্তান হইয়া সে কি একটু স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইবে না? এ তো দীনদুঃখীর ছেলে নয় যে সচ্চরিত্র হইয়া থাকিতে হইবে।

বিবাহের পর উমা শ্বশুরালয়ে আসিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। শুনিয়াছিল তাহার স্বামী কলিকাতার বিখ্যাত ধনীবংশের সন্তান কিন্তু তাহাদের

ঐশ্বর্য্য যে কতখানি তাহা সে ধারণায় আনিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল, তাহার কাকীমার পিতার তুল্যই হইবে, কিন্তু এখানে আসিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। এত ঐশ্বর্য্য সে কোনো দিন কল্পনায় আনিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে সে একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল।

নিকট আত্মীয়ার মধ্যে তাহার শ্বাশুড়ী মাত্র ছিলেন আরও অনেকে হয়তো ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত কি সম্পর্ক তাহা সে জানিত না। তাহার শ্বাশুড়ী ব্রজসুন্দরী প্রথমেই সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন--বউমা, তুমি এখন হয়েছ নামজাদা মিত্তির বংশের বউ। এর মর্য্যাদা রক্ষা করে চ'লো। তোমার রূপ দেখেই এ ঘরের বউ ক'রে এনেছি নইলে তোমাদের বংশের মেয়ে এ বাড়ীর দাসী হওয়ারও যোগ্য নয়। সেই রূপ যাতে বজায় থাকে তাই ক'রো, কেউ যেন না বলতে পারে আমার ছেলের বৌ দেখতে খারাপ।

শ্বাশুড়ীর উপদেশ শুনিয়া উমা শুধু একটুখানি ব্যথার হাসি হাসিয়াছিল।

উমার সেবা ও প্রসাধনের জন্য চার জন দাসী নিযুক্ত ছিল। তাহারা সব সময়েই তাহার ঘষা মাজা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। ইহাদের উৎপীড়নে উমা সদাই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু কিছুই বলিবার উপায় ছিল না, কোনো আপত্তি জানাইলেই ব্রজসুন্দরী ধমক দিয়া বলিতেন, "দেখ বৌমা, গেঁয়ো পেত্নী হ'য়ে যে ব'সে থাকবে সে এখানে চল্‌বে না। যেদিন লোকের মুখে শুনবো তোমার চেয়ে আর কারও ঘরের বৌ বেশী সুন্দর সেই দিনই তোমাকে দূর ক'রে ছেলের আবার নতুন বৌ ঘরে আনব।"

সুতরাং উমা বুঝিতে পারিল কিসের মর্য্যাদায় তাহার এখানে স্থান হইয়াছে। রূপ তাহার একটুখানি মলিন হইলেই তাহার ভাগ্যে আর লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এই বাড়ীর হাবভাব কথাবার্ত্তা যতই সে দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল ততই তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই এ বাড়ীর সবাই চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। এমন কি ইহার হাত হইতে তাহার প্রৌঢ়া শ্বাশুড়ীও অব্যাহতি পান নাই তিনি বয়স্থা হিন্দুবিধবা—কিন্তু তবু তাঁহার সাজ সজ্জার আড়ম্বরের ক্রটি নাই। মাথায় বাঁকা সিঁথি, কলপ দিয়া চুলের পক্কতা নিবারণ করা হইয়াছে। গায়ে সব সময়েই আঁটালো জামা, পরণে পাতলা কাপড়, ঠোঁট দুটি পান ও দোক্তার রসে রক্তিম। আর তাহার স্বামীর তো কথাই নাই। বিবাহের পর তাহার দেখা সে অতি অল্পই পাইয়াছে। কারণ, বাড়ীর টানের চেয়ে বাহিরের টান তাহার অত্যন্ত বেশী। কিন্তু যেটুকু দেখিয়াছে তাহাতেই সে বুঝিয়াছে তাহার সুখ আর বিধাতা লেখেন নাই।

বিবাহের পর তাহাদিগকে 'জোড়ে' লইয়া যাইবার জন্য তাহার কাকীমা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার শ্বাশুড়ী জানাইয়া দিয়াছেন—তাহাদের শ্বশুরগৃহে এ নিয়ম কোনো দিনই নাই। এ বাড়ীর বধূ হইয়া প্রবেশ করিলে আর বাহির হইবার রীতি নাই। উমা তো হাঘরের মেয়ে, ধনীর কন্যা হইয়া তাঁহাকেও এই রীতিই মানিয়া লইতে হইয়াছে। উমা বুঝিল—সে চিরজীবনের ন্যায় বন্দিনী হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আর এ ফাঁদ হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

৯

দুই বৎসর পরের কথা। সেদিন বৈকালে উমা তাহার তেতলার কক্ষের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। কলিকাতার অগণ্য অট্টালিকার আড়ালে দেখিতে দেখিতে কোথায় যে সূর্য্য তলাইয়া গেল উমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়াও আর দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ লোচনে বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার দুই চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। সে ভাবিতেছিল তাহারই গ্রামের কথা। সেখানে সূর্য্য নিয়মিত উঠিত, নিয়মিত ভাবেই অস্ত যাইত। তাহাতে যে একটা বৈচিত্র্য রহিয়াছে তখন তাহার কিছুই মনে হইত না। তাহাদের গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে কুলবাড়ীর বিশাল মাঠের সীমান্তে অপরাহ্ণে সূর্য্যদেব মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইত তাহা আর দেখা যাইত না। আজ তাহার মনে সেই চিত্রই ফুটিয়া উঠিল এবং ইহার মাধুর্য্য কল্পনা করিতে করিতে তাহার মন সেই অতিপরিচিত পল্লীর উদ্দেশ্যেই ধাইয়া চলিল।

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

সে ভাবিতে লাগিল, তাহার বাপ মা এখন কি করিতে-ছেন? নিশি তাহার কথা মনে করে কিনা—এতদিন হয়তো বিবাহের পর সে স্বামীর গৃহে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের পেয়ারা আর জামরুলের গাছে এখনও তেম্নি ফল ধরে কিনা? তারপর তাহার মনে হইল বামুন-দিদির কথা। আহা, গ্রামে থাকিতে সে তাহাকে কতই বিরক্ত করিয়াছে। যাহাকে সে গ্রামে দু চক্ষে দেখিতে পারিত না আজ তাহার কথা মনে করিয়াও তাহার দুই চোখ জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। সহসা বৃদ্ধাকে ভূতের ভয় দেখাইবার কথা মনে পড়ায় সে হাসিয়া ফেলিল। সেদিন বামুনদিদি কি ভয়টাই না পাইয়াছিলেন! না, তাঁহার সঙ্গে অতটা ছলনা করিয়া ভাল হয় নাই। আজ যদি তাঁহাকে পাওয়া যাইত তাহা হইলে হয়তো সে সব কথা খুলিয়া বলিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইত।

"শুন্‌ছো? বাহিরের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কেন? ও বাড়ীর ছাদে কিছু দেখবার জিনিষ আছে নাকি?"

উমা চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—স্বামী। তাহার সাজ পোষাকের দিকে চাহিয়াই উমা বুঝিল—সে এখন বাহিরে যাইতেছে এবং খুব সম্ভব আজ আর ফিরিবে না।

নীতীশ সহাস্যে কহিল, "আজ বাগানবাড়ীতে একটু বিশেষ রকম ফুর্ত্তির আয়োজন করা হয়েছে। ইচ্ছা করছে তোমাকেও সঙ্গে নিই।"

স্বামীর কথায় উমা ভ্রূকুঞ্চিত করিল মাত্র, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

নীতীশ বলিতে লাগিল, "কিন্তু তাতে কি তোমার মত হবে? হ'তে যদি সহুরে মেয়ে, তবু বরং কথা ছিল।" তারপর রুমাল দিয়া ঠোঁটের কোণ দুটি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল, "শেফালী কিছুতে ছাড়ে না, নিত্যি বায়না ধরে, আমার বৌ কত সুন্দরী সে দেখ্‌বে। আমি বলি, সে হচ্ছে একটা গেঁয়ো পেত্নী—সে কি আর আমার কথা শোনবার মেয়ে! তা যাই হোক্, পেত্নীই বলি আর যাই বলি তুমি সত্যই সুন্দরী। তোমাকে দেখ্‌লে ওর দেমাক কতকটা কম্‌বে।—যাবে আমার সঙ্গে?"

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া অতি কষ্টে উমা বলিল, "না।"

"না? সে আমি জানি। আমার কথা যদি শুন্‌তে তা হলে আর ভাবনা কি ছিল। তোমাকে দিয়েই যদি খেয়াল মিট্‌তো তা হলে আর বাইরে প'ড়ে থাকবো কেন?"

সে বাহির হইয়া গেল। উমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় জানালার বাহিরে চাহিল। সে এই বাড়ীতে আসিয়া স্বামীর অনেক রকম অভিনয় দেখিয়াছে, সুতরাং তাহার এই অপমানজনক কথায় তাহাকে বড় বেশী বিচলিত করিতে পারিল না। স্বামীর সহিত ফুলশয্যার দিন প্রথম আলাপের সূচনাতেই সে সমস্ত বুঝিয়াছিল। সেদিন মদের নেশায় বিভোর স্বামী অকপটেই তাহার চরিত্রের সমস্তটা একেবারে নগ্ন করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়াছিল। তাহার পর এই দীর্ঘ দুইটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; উমা অনেক দেখিয়াছে সুতরাং সে আর কিছুতেই বিস্মিত হয়না।

"অ বৌমা! বলি জানলার ধারে তো অনেকক্ষণ কাট্‌লো, এখন ওসব ঢং ছেড়ে আমার কথার একটা জবাব দাও তো বাপু। বলি, আমার ছেলে কি হেঁজিপেঁজি যে, সে তোমার হাততোলা হ'য়ে থাক্‌বে? তোমার সব সময়েই অমন হাঁড়ির মত মুখ কেন বল দেখি? ঘুঁটে-কুড়োনীর মেয়েকে রাজরাণী করলে এই দশাই হয়। বলি, নীতীশের সাথে মোটরে একটু ঘুরে এলেই তো হ'তো। হাজার হোক, ও পুরুষ মানুষ, ওর কি আর সখ যায় না। সোয়ামীর সাথে ঘুরে এলে এমন কিছু তোমার মানের হানি হ'তো না।"

উমা কোনো জবাব দিল না, কিন্তু বুঝিল স্বামী বাহির হইয়া যাইবার সময় ঘুরাইয়া কথাটা তাহার বিরুদ্ধে লাগাইয়া গিয়াছে।

ব্রজসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ছেলে ঘরে থাক্‌বে কিসের প্রলোভনে শুনি? তোমার মত বউ যার তার আর বাড়ীতে সুখ কি! স্বামী যা চায় তাই কর, তার মন জুগিয়ে চল। তোমার অভাবটা কি?"

উমার একেবার ইচ্ছা করিল সে জিজ্ঞাসা করে এত জানিয়াও কেন তিনি তাঁহার স্বামীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া

রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু সে জবাবও তিনি নিজেই দিলেন, বলিলেন, "বড় মানুষের ছেলের বাইরের টান থাকবেই, কিন্তু তাই ব'লে কি চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে থাকতে হবে? তুমি যদি মানুষ হতে বৌমা তা হলে ছেলে আমার নিশ্চয় এতটা বাড়াবাড়ি করতো না।"

উপদেশের পর উপদেশ গাঁথিয়া ব্রজসুন্দরী উমাকে শুনাইতে লাগিলেন, উমা স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে উমা 'মাগো' বলিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অবিশ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

১০

সেদিন কাদম্বিনী একখানি পত্র হাতে লইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। চিঠিখানি তাহার ছোট জা সুনীতির নিকট হইতে আসিয়াছে। সে লিখিয়াছে, "দিদি, তুমি উমার কথা জানিতে চাহিয়াছ। আমিই কিছু জানিনা, তোমাকে জানাইব কি। তবে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি আজ সমস্তই জানাইয়া আমি হাল্‌কা হইতে চাই। দিদি, এখন মনে হইতেছে তোমার কোল হইতে উমাকে ছিনাইয়া আনিয়া ভাল করি নাই। বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর যে আজীবন দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছি, ইহা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিনা। সে ধনকুবেরের স্ত্রী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু সে কি তাহাতে সুখী হইতে পারিয়াছে? মনে তো হয় না। আমি কয়েকবার তাহাকে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হই নাই। এমন কি আমি যাইয়া উমার সঙ্গে দেখা করিব এমন অনুমতিও তাহার শ্বাশুড়ী দিতে চাহে না। দিদি, ধনের লোভে এমন চণ্ডালের ঘরে আমার সোনার উমাকে বিলাইয়া দিয়াছি, ইহা মনে করিয়াও বুক ফাটিয়া যায়। এখন শুনিতেছি জামাই অসচ্চরিত্র, মাতাল। সুতরাং তাহার নিকট হইতে উমা যে কি ব্যবহার পাইতেছে তাহাও অনুভব করা কঠিন নয়। যদি তাহাকে এখানে লইয়া না আসিতাম, তাহা হইলে হয়তো কোনও দরিদ্র সচ্চরিত্র যুবকের হাতে উমাকে সমর্পণ করিতে। সে কথা মনে করিতে আমার নিজেরই উপর ধিক্কার জন্মে। উমা যেমন তোমার মেয়ে, আমিও তাহাকে তাহার চেয়ে কম মনে করি না। আমি নিঃসন্তান বিধবা, যে কয়দিন উমাকে কাছে রাখিয়াছিলাম, আমার এ তপ্ত বুক জুড়াইয়াছিল। তাহার কষ্টের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার বুক জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। তুমি তবু নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিবে, কিন্তু আমার তো সে উপায় নাই। আমিই যে নিজের হাতে সোনার প্রতিমাকে চণ্ডালের হাতে তুলিয়া দিয়াছি।"

একমাত্র কন্যার দুঃখের ইতিহাস পাঠ করিয়া কাদম্বিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সুনীতি যতই বুঝাইতে চেষ্টা করুক যে কাদম্বিনীর কোনও দোষ নাই, কিন্তু সে তো তাহার মন দিয়াই জানে একথা মোটেই সত্য নয়। কন্যার ভবিষ্যতের সুখ কল্পনা করিয়া সেই তো তাহার একমাত্র সন্তানকে বুক হইতে ছিনাইয়া একেবারে পর করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়াছিল। উমা তাহাকে কতবার কাকুতি মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়াছে,—কিন্তু সে তাহাকে পুনরায় গ্রামে ফিরাইয়া আনে নাই। কন্যাকে সুখী করিতে যাইয়া সে যে নিজের হাতে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল! তাহার স্বামী বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া যেটুকু বুঝিয়াছিল, সে প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"ও বৌ, সকাল বেলাই অমন ক'রে কাঁদছিস কেন লা!"

সহসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাদম্বিনী চোখের জল মুছিয়া চিঠিখানি হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া একটুখানি ম্লান করুণ হাসি হাসিয়া কহিল, "মেয়ের কথা ভাবছিলাম মাসী। অনেক দিন চোখে দেখ্‌তে পাইনি কিনা।"

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী কহিল, "ভেবে আর কি করবি বৌ। ইচ্ছে ক'রেই যখন মেয়েকে দূরে ঠেলেছিস, এখন আর ভেবে কি হবে। আমার কথা তো শুনলিনে; গাঁয়ের মধ্যে কি আর জামাই পাওয়া যেত না। তা যাক্, বড় ঘরে মেয়ে পড়েছে তার ভাবনাটা কি। ও চিঠি উমা লিখেছে বুঝি, বেশ ভাল আছে তো?"

কাদম্বিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে ভাল আছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

বৃদ্ধা বলিল, "একবার মেয়ে জামাইকে গাঁয়ে নিয়ে আয় বৌ। আমরা দেখে চোখ জুড়োই। ভাবলাম, নাত্‌নীর বিয়েতে কত আমোদ আহ্লাদ করবো, তা তো কিছুই হ'লো না। তোর কানে কি যে মন্তর দিয়ে ছোটবৌ মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আর তাকে গাঁয়ে ফিরতে দিল না।"

কাদম্বিনী ম্লান হাসিয়া জানাইল, "জামাই মস্ত বড় লোক, সে কি আর এ গরীব শ্বশুরবাড়ী আস্‌বে মাসী।"

বৃদ্ধা হাত নাড়িয়া কহিল, "কেন, গরীবের মেয়ে তারা বউ ক'রে নিয়ে যায় নি? আর তারই বাড়ীতে এলেই হলো অপমান? এ আবার কোন দেশী কথা বাপু! লিখেই ছাখ, জামাই নিশ্চয় আস্‌বে।"

কাদম্বিনী শুধু একটু করুণ হাসি হাসিল। ব্রাহ্মণী কহিল, "ও সব ছোট বৌয়ের ফন্দী। আমার নামও রাসু বামনী—কলকাতায় গিয়ে যদি নাত জামাইকে কান ধ'রে এ গাঁয়ে না আন্‌তে পারি তা হলে তোরা যা ইচ্ছে বলিস্।

কাদম্বিনী বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি কি কলকাতায় যাবে মাসী?"

ব্রাহ্মণী কহিল, "অনেকে সুয্যি গেরোণে গঙ্গা চানে চলেছে। আমারও ইচ্ছে আছে বৌ। তবে বুঝতেই তো পারছিস্ টাকার কি রকম টানাটানি। অন্ততঃ সাত আটটি টাকা তো চাইই। একবার উমার শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাতে পারলে আর ভাবনাটা কি। তখন নাত জামাই-য়ের কাঁধে চেপে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াবো না! ও সব বড় মানুষী আমার কাছে খাটবে না।"

কাদম্বিনী কহিল, "তুমি কি জামাই বাড়ী যাবে মাসী?"

বৃদ্ধা যেন অবাক হইয়া কহিল, "শোন কথা, অত বড় নাত জামাই থাক্‌তে আমি কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব?"

কাদম্বিনী কহিল, "না, তা বল্‌ছিনে। কিন্তু তারা তো শুন্‌তে পাই ভাল লোক নয়। যদি তোমাকে অপমান করে মাসী?"

বৃদ্ধা এইবার কোমরে কাপড় জড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমি রাসু বামনি, আমাকে করবে অপমান? সাধ্যি কারুর নেই তা তোকে ব'লে দিচ্চি। দে দেখি গোটা আষ্টেক টাকা। তারপর যদি তোর মেয়ে জামাইকে গাঁয়ে না আন্‌তে পারি তখন আমাকে যা ইচ্ছে বলিস্।"

বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া কাদম্বিনী হাসিয়া ফেলিল, এবং আন্তরিক খুসী হইয়া বলিল, "টাকা তোমায় দিচ্ছি মাসী। তা' হলে কবে যাচ্ছ?"

বৃদ্ধাও আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "কালই সবাই যাচ্ছে কিনা।"

কাদম্বিনী পুনরায় হাসি মুখে কহিল, "নাত জামাইয়ের বাড়ী যদি কেউ কটু কথা বলে তার জন্যে কিন্তু আমায় দুষতে পারবে না।"

বৃদ্ধাও সস্মিত হাস্যে কহিল, "রাসু বামনিও তার উচিত জবাবই দিয়ে আসবে। কথা সহ্য করা তো আমার ধাত নয় বৌ।"

১১

"বলি বৌমা, একটু ওঠ তো বাছা, কাপড় চোপড় প'রে এখনই ঠিক হ'য়ে থাক, ওদের আসবার তো সময় হ'য়ে এল। শরীরের যা ছিরি হয়েছে, লোকের সাম্‌নে বের করতেই লজ্জা করে। তার ওপর যে আলিস্যি। মুখের চামড়া তো এরই মধ্যে কুঁচকে এল। উঠে একটু ভেজলিন্ পাউডার মাখ। কি যে আমার কপাল, বউকে সাজিয়ে গুজিয়ে লোকের সামনে বের করবো—তারও উপায় নেই। নিত্যি অসুখ, হাড় জ্ব'লে গেল্।"

উমা অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। কিছুদিন হইতে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রত্যহ একটু একটু জ্বর হয়। সঙ্গে ঘুসঘুসে কাসি। আজ তাহার মাসতুতো ননদের আসিবার কথা। বিবাহের পর তাহাকে সে দেখে নাই, সুতরাং আজ তাহার রূপ-পরীক্ষার আর একটি দিন। তাই আবার তাহার শাশুড়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই পরীক্ষা তাহাকে বিবাহের পর হইতে কতবার দিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার প্রাণের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না, কিন্তু তাহার রূপ পরখ করাইতে শাশুড়ীর বিরাম নাই। এতদিন তাহার শরীর সুস্থ ছিল, রূপের জৌলুসও অসাধারণ ছিল। কিন্তু এখন রোগে তাহার শরীর ভিতরে ভিতরে ঘুণ করিয়া ফেলিতেছে, রূপও বুঝি

অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাই শ্বাশুড়ী সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, কি জানি যদি তাঁহার বোন্‌ঝি আসিয়া কুরূপা বলিয়া মত প্রকাশ করে। উমা মনে মনে একটু হাসিল। তাহার দেহের রূপই কি ইহাদের নিকট এত বড়? এই রূপের জোরেই সে এই ঘরের বধূ, এ কথা তো শ্বাশুড়ীর মুখে নিত্য শুনিতে পায়। শরীরের ভিতর তাহার যাহাই করিতে থাক, বাহিরটা চক্‌চকে রাখিতেই হইবে। ইহার জন্য হেজলিন আছে, পাউডার আছে, ব্লুমরুজ আছে, আরও হরেক প্রসাধনের বস্তু রহিয়াছে।

শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলে দুইজন পরিচারিকা আসিয়া উমাকে লইয়া পড়িল। তাহার চুল বাঁধিয়া দিল, ভাল কাপড় পরাইয়া মুখে হাতে হেজলিন পাউডার ঘষিয়া দিল। তারপর তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়োয়া গহনা পরাইয়া চলিয়া গেল। উমা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিল, তাহার পর ধীরে দেওয়ালে বিলম্বিত প্রশস্ত আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। এইতো তাহার রূপ! এখনও তো ইহা ম্লান হইয়া যায় নাই। তাহার মাথার কোঁকড়া চুলে উঁচু কপাল ঢাকিয়া রাখিয়াছে, রক্তিমাভ আনন স্নেহদ্রব্যের প্রভাবে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গোলাপী ঠোঁট, উন্নত নাসিকা, যুগ্ম ভ্রু সবই অতুলনীয়। নিজের রূপ দেখিয়া আজ সে নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেল।

উমা এখন কলিকাতার বিখ্যাত ধনীবংশের সুন্দরী কুলবধূ। তাহার যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বিচিত্ররূপেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহা সফল হইল কোথায়? তাহার স্বামীকে তো সে এই রূপে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার তরুণী-হৃদয় পুরুষের সঙ্গলাভের জন্য মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেও তাহার কামনা সিদ্ধ হয় নাই। তাহার স্বামী সুরা ও নারীতে উন্মত্ত হইয়া দিনের পর দিন বাহিরে কাটায়। এদিকে তাহার মাতৃসমা শ্বাশুড়ীরও লক্ষ্য নাই। অতৃপ্ত কামনায় তাহার শরীর ভগ্ন হইতে চলিয়াছে, তবুও এদিকে দৃষ্টি দিবার কাহারও অবসর নাই। তাহার বক্ষ-ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

যথাসময়ে তাহার ননদ আসিল, বৌদিদির রূপ দেখিয়া সার্টিফিকেট দিয়াও চলিয়া গেল। শ্বাশুড়ী পুলকিত হইয়া দুই একটা মামুলী স্নেহের কথা বলিলেন। উমা কাপড় জামা খুলিয়া শয়ন আশ্রয় করিল। তাহার আর বসিবার শক্তি ছিল না, প্রবল জ্বরে সে তখন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখে ক্ষোভে তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

পরদিন যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা কম হয় নাই। উঠিবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় অতি পরিচিত গলার স্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। "উমা কোথায় লা", এই বলিয়া বামুনদিদি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত নেত্রে উমার দিকে চাহিল। উমা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সে যে বামুনদিদিকে এখানে দেখিতে পাইবে ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই।

বামুনদিদি তাহার ময়লা কাপড়ের পুঁটুলিটা রাখিয়া কহিল, "এখনও শয্যা ছেড়ে উঠিস্‌নি। সহুরে হ'য়ে স্বভাবও বদ্‌লে গেছে! বাপ্‌রে বাপ্, বাড়ী খুঁজে বের করতে কম হায়রাণটা হ'তে হয়েছে। তার উপর বাড়ীশুদ্ধ সব্বার কি চোপা! নাতজামাইয়ের বাড়ী এসে কি শেষটায় গলাধাক্কা খেয়ে বিদায় হ'তে হবে? আচ্ছা, দেখি সে কেমন কলকাতার বাবু। আমার নামও রাসু বামনি, এর একটা বিহিত না ক'রে আর যাচ্ছিনে।"

উমা অনুমানেই বুঝিতে পারিল ব্যাপার কি দাঁড়াইয়াছে। তাহার গ্রামের লোক বলিয়া এ বাড়ীর কেহ তো তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করে নাই, উপরন্তু তাহাকে হয়তো কতই না অপমান করিয়াছে। কিন্তু বামুনদিদি যাহার নিকট প্রতীকারের প্রার্থনা জানাইবে মনে করিয়াছে, তাহার সহিত উমার সম্বন্ধ কতখানি তাহা যখন জানিতে পারিবে তখন সে লজ্জা ঢাকিবে কোথায়?

তবু তাহার অতিপ্রিয় জন্মভূমির একটি প্রাণীকে এতদিন পরে দেখিতে পাইয়া তাহার মন আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই বামুনদিদিকে গ্রামে থাকিতে কতই না উত্ত্যক্ত করিয়াছে, কতবার কত ভাবে জব্দ করিবার ফিকির তাহার মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিয়াছে। সেই সব ঘটনার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

কথা মনে পড়িতেই তাহার পরিবর্ত্তিত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বামুনদিদিকে প্রণাম করিল।

বামুনদিদি তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "জন্ম এয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক দিদি। কতদিন দেখিনি। সেই যে মা জোর জবরদস্তি ক'রে গ্রাম থেকে পাঠালেন, আর গ্রামে ফিরলি না। আমি তখনই বৌকে কয়েছিলাম। কিন্তু বুড়ির কথা কেন শোনা হবে। এখন যে দু চোখে জলের ধারা বাধা মানে না তার কি! সেই বুড়ির কথাই তো ফল্‌লো।

মাতার দুঃখ হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া উমার চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, সে ধরাগলায় কহিল, "মা বাবা ভাল আছেন তো বামুনদিদি।"

"তা আছে। কিন্তু এইবার তোদের আমার সনে যেতে হবে।"

উমা ম্লান হাসিয়া কহিল, "এদের তো সে নিয়ম নেই বামুনদি!"

বামুনদিদি হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "সে তো এসেই ঠিক পেয়েছি। বড়লোক আছ—তোমরাই আছ। আমি কি চিরকাল তোমাদের ঘরে থাক্‌তে এসেছি। একটা সম্বন্ধ আছে তাই না আসা!"

উমা কহিল, "গাঁয়ের সব ভাল আছে? পণ্টু, কাঞ্চি, নিশি এরা সব আমার কথা বলে বামুনদিদি?"

বামুনদিদি মাথা নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, "শোন কথা! তা আর বলে না? তারা তো নিত্যি আমার কাছে এসে তোর খবর নিত। তাদের হাঁকুপাঁকুতেই তো আমার কলকাতায় ছুটে আসা।"

বামুনদিদি বোধ হয় ঠিক সত্য কথা বলে নাই—কিন্তু উমা বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। কতদিন তাহার খেলার সাথীদের সে দেখে নাই! সে কত দীর্ঘ দিন! কিন্তু তবু তাহারা তাহাকে ভুলে নাই! তাহার কথা এখনও মনে করে!

"তোমার গাইটি, সে এখনও তেম্‌নি মোটাসোটা আছে? এখনও তেম্‌নি দুধ দেয়?"

বামুনদিদি মাথা ঝাঁকাইয়া কহিল, "কোথায় মোটা? আর কি সে দিন কাল আছে রে দিদি যে বামুনের গাই ব'লে দুটো দাম খেতে দেবে। দড়ি ছিঁড়লো কি অম্‌নি খোঁয়াড়ে। বেঁধে রাখ্‌লে কি আর মোটা সোটা থাকে? ঘোর কলিকাল যে এখন দিদি!" এই বলিয়া বৃদ্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। পূর্ব্বেকার দিন হইলে বামুনদিদির ভাব দেখিয়া সে হাসিয়া গড়াইত, অথবা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিত, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। বৃদ্ধার গাভীটি রুগ্ন হইয়া গিয়াছে মনে করিয়াও তাহার হৃদয়ে ব্যথা বাজিল।

বৃদ্ধাকে দেখিয়া তাহার গ্রামের সমগ্র ছবিটি যেন তাহার মনের কোণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবরটি পর্য্যন্ত না লইলে সে বুঝি মনে শান্তি পাইবে না। যে বামুনদিদিকে সে দেখিতে পারিত না তাহাকে আজ এইখানে দেখিতে পাইয়া যতটা আনন্দ সে উপভোগ করিয়াছে, এতখানি আনন্দ বোধ করি সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার পর আর পায় নাই। সে একে একে গ্রামের সমস্ত কথা জানিয়া লইল।

সহসা উমার গায়ে হাত পড়িতেই বামুনদিদি বলিয়া উঠিল, "গা এত গরম কেন রে?"

উমা করুণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "ওতো সব সময়ই অম্‌নি থাকে বামুনদিদি।"

বৃদ্ধা সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "সব সময়ই অম্‌নি থাকে? বলিস কি! কবরেজ দেখ্‌ছে তো?" তারপর কি একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "নাতজামাইকে দেখতে পাচ্ছিনে! আমাকে লুকোস্‌নে, সে তো তোকে ভালবাসে?"

উমার মুখ আনত হইয়া আসিল; চোখের পল্লব দুটি ভিজিয়া গেল। বৃদ্ধা এইবার ব্যাকুল হইয়া কহিল, "বল উমা, আমাকে কিছু লুকোস্‌নে।" নিতান্ত আপনার জনের মত উমা বৃদ্ধার কোলে মুখ গুঁজিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। চতুরা ব্রাহ্মণী পূর্ব্ব হইতেই কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন, এইবার আর তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না। তাঁহার চোখের কোণও সজল হইয়া উঠিল। এই অতি কুসংস্কারপরায়ণা রুক্ষস্বভাব বৃদ্ধার হৃদয়ও উমার দুঃখ

কল্পনা করিয়া ব্যথিত হইল, এই গ্রাম্য রমণীর অন্তরে যে নিঃস্বার্থ ভাবটুকু লুক্কায়িত ছিল আজ বালিকার দুঃখের অনুভূতিতে তাহা প্রকাশ হইয়া গেল। সে সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "নাতজামাই কোথায় রে ?"

উমা মুখ তুলিয়া কহিল, "জানিনে। বোধ হয় বাগান-বাড়ী।"

ব্রাহ্মণী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঝাঁঝালোসুরে বলিয়া উঠিল, "কেন, ঘরে বৌ নেই ? আমার নাতনির রূপে মন ধরলো না বুঝি ? আচ্ছা, আমি এরও একটা বোঝা পড়া ক'রে নেব। মাকে দেখেই ছেলে কেমন বুঝে নিয়েছি। বুড়ো মানুষ, কুটুমবাড়ীর লোক, নাতনিকে দেখ্‌তে এলাম, মাগির কি চোপা !"

উমা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বামুনদিদি, অমন করে চেঁচিও না, ওরা শুন্‌তে পাবে !"

গলার স্বর নামাইয়া বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, "তোর শ্বাশুড়ী মাগীকে দেখে তো ভাবলাম খেমটাউলি। বুড়ো মাগীর সখ দেখে ম'রে যাই ! বিধবা মেয়েমানুষের আবার গায়ে জামা, মাথায় চুলের বাহার—গলায় দড়ি !" তারপর গলার স্বর আরও একটু নামাইয়া কহিল, "স্বভাব চরিত্তির ভাল তো ? বড় লোকের বড় কথা, তাই বল্‌ছি। কি জানি বাপু, আমার তো ওর চাল-চলন ভাল মনে হ'ল না।

উমা বেগতিক দেখিয়া কহিল, "বামুনদি এইবার তোমার চানের জোগাড় ক'রে দি। যেমনই হোক, এ বেলাটা তোমাকে এখানেই থাক্‌তে হবে, আমি কোনও কথা শুন্‌বো না।"

ব্রাহ্মণী হাসিয়া বলিলেন, "থাকবো ব'লেই তো এসে-ছিলাম দিদি, কিন্তু ভরসা পাচ্ছিনে যে ! তা যাই হোক্, নাত-জামাইয়ের কানটা শক্ত ক'রে মলে না দিয়ে আর যাব না। তোর শ্বাশুড়ী মাগী ঝাঁটা ধরলেও নয়।"

১২

সাতদিন পরের কথা বলিতেছি। উমা জ্বরে আজ তিনদিন হইল অজ্ঞান, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছে। ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে, কাহারও মুখে ভরসার কথা নাই।

বামুনদিদি চলিয়া যাইবার পরই উমার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জ্বরের ঘোরে উমা মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "বামুনদি, কেন তুমি অপমান হ'তে এলে ? এরা কি মানুষ !" তারপর আবার বিড়বিড় করিয়া বলিতেছে, "আর তোমাকে ভূতের ভয় দেখাবো না বামুনদি, আর দুষ্টুমি করবো না।" তারপর আবার উচ্চস্বরে বলিতেছে, "বামুনদি তোমাদের কাছে ভিক্ষা করতে আসেনি, সে শুধু আমাকে দেখ্‌তে এসেছিল। তোমরা বড়লোক, তাতে আমাদের কি ?"

চিকিৎসকগণ বুঝিলেন, এ পীড়া মানসিক অশান্তিতেই সৃষ্ট হইয়াছে, তারপর সহসা কোনও কারণে মনে গুরুতর আঘাত পাইয়া ইহা সহসা এম্‌নি সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহাদের ধারণা মিথ্যা নয়। অনেক অপমান সহ্য করিয়াও বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী দুইটি দিন উমার শ্বশুরবাড়ী ছিলেন। তিনি মনে করিরাছিলেন, যেমন করিয়াই হউক, একবার উমার স্বামীকে দেখিয়া যাইবেন। দুই দিন অপেক্ষা করি-বার পর উমার স্বামা গৃহে ফিরিল, কিন্তু বৃদ্ধাকে দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইল না। বৃদ্ধার গ্রামসুলভ হাসি তামাসায় তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। সে তাহার জননীকে ডাকিয়া তীব্রস্বরে কহিল, "এ সব মাগীকে কেন বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছ মা ? যদি কিছু পাওনার আশায় এসে থাকে, কিছু দিয়ে থুয়ে বিদায় ক'রে দাও। এ সব গেঁয়ো পেত্নীকে চোখে দেখ্‌লেও গা ঘিন ঘিন করে !"

পুত্রের স্পষ্ট কথায় জননী পরিতৃপ্ত হইলেন, সহাস্যে কহিলেন, "বউমা যে বামুনদিদি বল্‌তে অজ্ঞান দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঐ তো আটকে রেখেছে।"

পুত্র তীব্রস্বরে মন্তব্য করিল, "তা আর হবে না ! কেমন ঘরের মেয়ে এনেছ ? যাক্, ওকে এইবার বিদায় ক'রে দাও, আমাকে যেন আর বিরক্ত করতে না আসে।"

পাশের ঘর হইতে উমা ও বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সমস্তই শুনিল, অপমানে তাহাদের দুই জনেরই মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

ব্রাহ্মণী ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "তা' হ'লে এখন চল্লুম ভাই। আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে সাহস হচ্ছে না। কি জানি মুখ দিয়ে বেফ াঁস কথা বেরিয়ে পড়ে।" উমা পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

বামুনদিদি তাঁহার পুঁটুলিটা হাতে লইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মনে কিছু করিস্‌নে দিদি! আমাকে অপমান অনেকেই করে, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোর মত মেয়েকে যারা এম্‌নি করে বিঁধছে, ভগবান তাদের কি বিচার করেন আমার দেখ্‌তে ইচ্ছা করছে। এইবার আসি ভাই!" বৃদ্ধা তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উমা তবু কোনও কথা বলিল না, এমন কি তাঁহাকে প্রণাম করিল না। বৃদ্ধা বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। তিনি ঘরের বাহির হইতেই উমা 'মাগো' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তারপর আর জ্ঞান হয় নাই।

আরও দুই দিন কোনও রকমে কাটিল, তারপর সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই উমা অতৃপ্ত বাসনা লইয়া পরপারে চলিয়া গেল। উমার শ্বাশুড়ী এইবার পুত্রবধূর শবদেহ সাজাইতে বসিয়া গেলেন। ধনী গৃহের বধূ, তাহাকে সেই-ভাবে শ্মশানে পাঠাইতে হইবে তো! নহিলে লোকে নিন্দা করিবে যে!

শ্মশানযাত্রার জন্য বহুমূল্য খাট গদি আসিল। তারপর উমার প্রাণহীন দেহের সজ্জা চলিতে লাগিল। ডালি ডালি ফুল আসিল; ফুলের মালা, ফুলের গহনায় উমাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। শ্বাশুড়ী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন "আহা, বউমা আমার সতীসাধ্বী পুণ্যবতী। নইলে আর হাতের নো' বজায় রেখে যেতে পারে। তাকে সেই ভাবে পাঠাতে হবে!" তাহার কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, সীমন্তে সিন্দুর ও পায়ে আলতা উজ্জ্বল করিয়া দেওয়া হইল।

উমার শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বউমাকে দেখে যে লোকে কুৎসিত বলবে সে আমি এখনও সহ্য করতে পারবো না।" তারপর আবার পাউডার আসিল, হেজলিন আসিল, ব্লুমরুজ আসিল। সে গুলিরও যথারীতি সদ্ব্যবহার করিয়া উমার শ্বাশুড়ীর মন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "কে বল্‌বে যে মা আমার কুৎসিত। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী মর্ত্ত্যে এসেছিলেন, এইবার বৈকুণ্ঠে ফিরে চল্লেন। বউমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ফুলের রাণী, আরামে ঘুমুচ্ছে।"

শ্বাশুড়ীর দরদ দেখিয়া বাড়ীর সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; আহা গিন্নিমার মত মানুষ কি আর হয়! শুধু একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান তাঁহার এই অপরূপ সৃষ্টি দেখিয়া না জানি কি ভাবিতেছিলেন!

* * * *

নীতীশের নিকট যখন উমার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌছিল তখন সে গণিকালয়ে শয্যার উপর পড়িয়াছিল, রাত্রের নেশার ঘোর তখনও তাহার কাটে নাই। সে নেশার ঘোরেই বলিল, "মরেছে আপদ গেছে। বাড়ীতে কি আর লোক নেই যে আমার খোঁজ পড়লো!"

কিন্তু ঘণ্টা দুয়ের পর নেশার জড়তা কাটিয়া গেলে সে অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তারপর শেফালীকে ডাকিয়া কহিল, "আচ্ছা শেফী, এক মজা করলে হয় না।"

শেফালী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সকাল বেলায় আবার কিসের মজা? ঢং দেখে ম'রে যাই।"

নীতীশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার বউকে দেখতে চেয়েছিলি, দেখ্‌বি?"

বিস্মিত হইয়া শেফালী কহিল, "কোথায়?"

"এতক্ষণ বোধ করি শ্মশানে নিয়ে গেছে।" উমার মৃত্যুসংবাদ শেফালী পায় নাই, সে বিস্মিত হইয়া কহিল, "শ্মশানে? বল কি?"

সে কথার জবাব না দিয়া নীতীশ কহিল, "চল্‌ একবার দেখে আসি। যাচাই ক'রে দেখে আয় সুন্দরী কিনা!"

শেফালী ঈষৎ বিরক্ত হইয়া ভাবিল, বউ তো মরেছে, তবু রূপের গরব যায় নাই।

তাহারা দুই জন যখন শ্মাশানে পৌছিল, তখন উমার শবদেহ সেখানে আনা হইয়াছে। ঘাটের সমস্ত নরনারী ঝুঁকিয়া উমার অপূর্ব্ব শবদেহ দেখিতে দেখিতে বলিতেছে, কার ঘরের লক্ষ্মী ঘর আঁধার ক'রে চল্লো আজ, এমন সুন্দরী চোখে দেখিনি তো কোনো দিন!

অনেক সধবা নারী তাহার কপালে সিন্দুর ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল, "এম্‌নি ভাগ্য ক'রেই যেন যেতে পারি বোন্।"

শেফালী এই দৃশ্য দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। নীতীশের পত্নী যে এত সুন্দরী তাহা সে কোনো দিন ভাবিতেও পারে নাই।

নীতীশ গর্ব্বিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখ্‌লি ?"

শেফালী কোনও উত্তর করিল না, স্থির নেত্রে উমার শব দেহের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন নীতীশ ও শেফালীর ভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "শ্মশান ঘাটে আবার এদের আসা কেন! যত সব--" এই বলিয়া সে বিশ্রী কটূক্তি করিল।

আর একজন বলিল, "আহা দেখুক, দেখুক, দেখেও যদি মতি ফেরে।"

শেফালীর পিঠে যেন চাবুক পড়িল; ভাবিল, তাহার চেহারায় এমনি একটা কুৎসিত ছাপ পড়িয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিয়াই তাহার স্বরূপ বুঝিতে লোকের এতটুকু বিলম্ব হয় না। আর ঐ যে সতী রমণী রূপের প্রভায় সমস্ত ঘাটটি আলোকিত করিয়া জয়যাত্রায় চলিয়াছে, তাহার সহিত নিজের প্রভেদ কতখানি! উহার মৃতদেহ দেখিয়াও লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে। তারপর নীতীশের দিকে চাহিয়া ভাবিল, এই স্ত্রীর স্বামী এই! ঘৃণায় তাহার মুখ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

নীতীশ কহিল, "এইবার ফেরা যাক।"

শেফালী কোনও কথা না বলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। পিছন হইতে নীতীশের বাড়ীর পুরাতন গোমস্তা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, এখন ফিরিতে দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবু, শেষ কাজ তো আপনাকেই করতে হবে!"

নীতীশ চোখ পাকাইয়া কহিল, "কেন শুনি ?" সে ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল।

কিছুদূর আসিয়া নীতীশ বলিল, "দেখ্‌লি ?"

"দেখ্‌লুম।"

"সুন্দরী তো ? গর্ব্ব এবার ভেঙ্গেছে ?"

শেফালী সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল কহিল, "তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও, এখন আমি শ্মশান ঘাট ছেড়ে যেতে পারবো না।"

এই বলিয়া সে দ্রুত গতিতে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

"পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি

আষাঢ় সংখ্যা "শনিবারের চিঠি"র লেখক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সংস্কৃতবিদ্যার গভীরতা পরিমাপ করেছেন। Lueders, Aufrecht, Agashe প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখে মনে হ'ল লেখক একজন 'বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত' অর্থাৎ Orientalist। যদি এ অনুমান সত্য হয় তা হ'লে বলব যে শিষ্ট ও সংযত আলোচনার গণ্ডী তিনি এমন ভাবে অতিক্রম করেছেন যার দরুণ প্রত্যেক Orientalistএর লজ্জিত ও দুঃখিত হ'বার কারণ ঘটেছে।

প্রমথ বাবুর অপরাধ তিনি 'মাসিক বসুমতীর' বৈশাখ সংখ্যায় "সংস্কৃত সাহিত্যের ক্যাটালগ্" নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের একস্থানে তিনি বলেছেন "আমি সংস্কৃত কম জানি" এবং অন্যত্র "শুনেছি" বা "শুনলুম" দিয়ে কথা আরম্ভ করেছেন। এতেই "শনিবারের চিঠি"র অজ্ঞাতনামা Orientalist খাপ্পা হ'য়ে কৈফিয়ত তলব করেছেন কেন তিনি তবে সংস্কৃত কম জেনে ও শোনা কথার উপর নির্ভর ক'রে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। কেন লিখেছেন তার পরিষ্কার উত্তর প্রমথ বাবুর প্রবন্ধের ভিতরেই আছে। তিনি নিজেই বলেছেন যে বিশেষজ্ঞদের জন্য তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি। এ সত্ত্বেও "শনিবারের চিঠি"র বিশেষজ্ঞ মহাশয় আস্ফালন করতে ছাড়েননি। তার ফল দাঁড়িয়েছে তাঁর পক্ষে মারাত্মক। এক একটি ক'রে তার প্রমান দিই।

প্রমথ বাবু লিখেছেন যে বানভট্ট "সমসাময়িক কবিদের বিষয় যা বলেছেন তা নিতান্ত অবজ্ঞাসূচক। প্রথমত তিনি ও-সব কবিদের কোকিল ব'লে গাল দিয়েছেন; কেননা তারা নাকি রাগাধিষ্ঠিতদৃষ্টয়ঃ অর্থাৎ তাদের চোখ রাগে লাল এবং তারা বাচাল।" "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত এর ভিতর দু'টী ভুল খুঁজে বের করেছেন। প্রথমত বানভট্ট যা লিখেছেন তাতে কোনই অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নি, দ্বিতীয়ত কোকিল শব্দ যে অবজ্ঞাসূচক তা প্রমথ বাবু কোথায় পেলেন। "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিতমহাশয় যদি কষ্ট ক'রে হর্ষচরিতের শ্লোকটী পড়তেন তা হ'লেই এর উত্তর খুঁজে পেতেন। হর্ষচরিতে আছে—

> প্রায়ঃ কুকবয়ো লোকে রাগাধিষ্ঠিতদৃষ্টয়ঃ।
> কোকিলা ইব জায়ন্তে বাচালাঃ কামকারিণঃ॥"

শ্লোকের অবশ্য দু'টী অর্থ আছে। একটী নিন্দা সেটী সহজবোধ্য; অন্যটী প্রশংসা সে অর্থটী কষ্টকল্পিত। দু'টী অর্থের ভেতর যে-কোনটী ইচ্ছা তাহাই লেখক গ্রহণ করতে পারেন। প্রমথ বাবুও তাই করেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে "বাচাল" হ'বার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

বানভট্ট যে সাতজন শ্রেষ্ঠ কবির নাম করেছেন তাঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে নাকি প্রমথ বাবু "গোল বাধাইয়াছেন" এবং "কিঞ্চিৎ কল্পনাবৃত্তির আশ্রয় লইয়াছেন।" এ অভিযোগই বা কতদূর সত্য তা দেখা যা'ক।

প্রথম, বাসবদত্তা। এ 'বাসবদত্তা' যে সুবন্ধুর লেখা তা বাণভট্ট স্পষ্ট ক'রে না বললেও প্রমথবাবু বলেছেন। এ'টী কি তাঁর নিজের মত? কিন্তু ইউরোপের মহারথীদেরও একদল তাই বলেছেন। (Cf. Keith. Classial Sanskrit Literature 1923. p 77.)

তবে প্রমথ বাবুর কি অপরাধ বুঝলাম না। সুবন্ধুর "বাসবদত্তা" আর ভাসের "স্বপ্ন বাসবদত্তা" ব্যতীত আর কোন "বাসবদত্তা" নামক কাব্যের কথা কি "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত মহাশয় শুনেছেন?

তৃতীয়, সাতবাহন। প্রমথ বাবু মনে করেছেন হাল আর সাতবাহন এক ব্যক্তি। "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত বলেন যে, একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নি। মহারথীদের ভেতর যখন মতদ্বৈধ তখন কোনও দলের মত অনুসরণ না ক'রে 'অন্তরালে' থাকাই প্রমথ বাবুর উচিত ছিল!

চতুর্থ, প্রবর সেন। প্রবর সেনের গ্রন্থকে "লুপ্ত" ব'লে প্রমথ বাবু ভুল করেছেন সত্য। কিন্তু তাঁর কীর্ত্তি সাগরের ওপারে গিয়েছিল একথা ব'লে তিনি কি অপরাধ করলেন। অপরাধ গুরুতর। এতে বোঝা গেল যে, প্রমথ বাবু বাণভট্টের লেখাটী পড়েন নি বা বোঝেন নি। অন্ততঃ "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত মহাশয় তাই বলেন। কিন্তু বাণভট্ট বলেছেন—

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥

এ শ্লোকেরও দু'টী অর্থ। (১) প্রবর সেনের কুমুদোজ্জ্বলা কীর্ত্তি 'সেতুবন্ধ' কাব্যের দ্বারা বানর সেনাদের ন্যায় সাগরের পরপারে গিয়েছিল। (২) রামের কুমুদোজ্জ্বলা কীর্ত্তি বানরসেনার ন্যায় সেতুবন্ধনের দ্বারা সাগরের পরপারে গিয়েছিল। "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত অর্থ করেছেন "রামের কীর্ত্তি যেরূপ সমুদ্রে সেতুবন্ধনের দ্বারা পরপারে গিয়াছিল প্রবর সেনের কীর্ত্তিও সেতুবন্ধ কাব্যের দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল।" এটী কি পণ্ডিত মহাশয়ের ভাবার্থ? তাঁরই "কল্পনা" বেশী "উর্ব্বর" দেখ্‌ছি। "প্রবর সেনের কীর্ত্তি সাগরপারে গিয়েছিল" এ অর্থ গ্রহণ ক'রে প্রমথ বাবু বিশেষ অপরাধ করেন নি।

প্রবর সেনের কীর্ত্তি যে সাগরপারে পৌঁছেছিল তার আরও প্রমাণ আছে। কম্বুজের হিন্দুরাজা যশোবর্ম্মণের শিলালিপিতে যে-সব কবিদের নাম করা হয়েছে তার ভিতর প্রবর সেন, গুণাঢ্য প্রভৃতির নাম আছে। তাঁদের গ্রন্থগুলি যে বহুদিন ধ'রে হিন্দু উপনিবেশে পরিচিত ছিল তা অনেকেই জানেন। জানেন না কেবল "শনিবারের চিঠি"র বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত।

তারপর দণ্ডীর কথা। প্রমথ বাবু লিখেছেন "তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তিনি সুধু কবি নন আলঙ্কারিক হিসাবেও প্রসিদ্ধ।" "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত এতেও ভুল বার করেছেন। ইউরোপের একজন মহারথী Keith সাহেব দণ্ডী সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যা'ক—"There is no real ground for suggesting error in the traditional ascription to him of the Kavyadarsa on poetics and the Dasakumaracharita............suggset a date not later than say 600 A. D. and possibly earlier." (Ibid., 70 p. 72).

নৈষধের কবির নাম প্রমথ বাবু "শ্রীহর্ষ" লিখেছেন। "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত মহাশয় বলেন কবির ঠিক নাম হর্ষ। "শ্রী" কা'ট্‌বার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু এ ভুল শুধ্‌রাতে হ'বে প্রথমত সংস্কৃত কবিদের লেখায়, দ্বিতীয়ত ইউরোপের মহারথীদের লেখায়। তৃতীয়ত "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত মহাশয়ের নিজের লেখায় ("শনিবারের চিঠি"—পৃঃ ২৮৭, "দার্শনিক শ্রীহর্ষ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ!")। তারপর অবশ্য প্রমথ বাবুর পালা। দার্শনিক শ্রীহর্ষ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষকে প্রমথ বাবু একই ব্যক্তি বলেছেন ব'লে পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ খাপ্পা হয়েছেন। প্রমথ বাবু কিন্তু ইউরোপের মহারথীদের পন্থাই অনুসরণ করেছেন। "The Naishadhiya of Sriharsa, the logician, author of Khandanakhandakhadya in which he defends the Vedanta..." (Keith. Ibid p 58.)

প্রমথ বাবু বলেছেন "কাদম্বরী"র মূল গল্প 'বৃহৎ কথা' থেকে নেওয়া। এটীকে "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত প্রমথবাবুর 'প্রথমতম' আবিষ্কার বলেছেন। পণ্ডিত মহাশয় আর একটু খোঁজ রাখ্‌লে দেখ্‌তে পেতেন যে এ কথা বহুদিন পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হয়েছে। (Lacote: *Gunadhya etla Brihatkatha*; Keith—*loc.* cit. p 82, "there is conclusive evidence that he took it from Brihatkatha...")

প্রমথ বাবুর আর একটি ভুল, কুশাণ সম্রাটকে 'তুরস্ক' বলেছেন। "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত মহাশয় যখন সংস্কৃত সাহিত্যর কোন গ্রন্থ পড়তে বাকী রাখেন নাই তখন কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' যে তাঁর চোখে কেন পড়ে নি তা বুঝলাম না। "রাজতরঙ্গিণী"র প্রথম তরঙ্গে (১৭০ শ্লোক) হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ককে "তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূত" বলা হয়েছে। কুশাণরা ছিল Yue-chi (ইউ-চি)-দের এক শাখা। তুরুষ্ক (Tu-kiu)-দের সঙ্গে যে তাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না সে কথা কোন পণ্ডিত এখনও হলপ ক'রে বলেন নি।

"পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

প্রমথ বাবু "শারিপুত্র প্রকরণের" নাম জানেন না ব'লে "শনিবারের চিঠি"র লেখক আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে বইখানির নাম লিখেছেন "সারিপুত্র প্রকরণ।" এ'তেও পণ্ডিত মহাশয়ের স্বভাবসুলভ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। "শারি" যদি "সারি" হয়, ত "পুত্র" "পুত্ত" নয় কেন? এই প্রাকৃত-পণ্ডিত এ বিষয়ে কি বলেন?

কিন্তু বইখানির পাতা ওল্টালেই বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয় তাঁর প্রাকৃত বিদ্যাকে মার্জ্জিত করবার সুবিধা পেতেন। তবে প্রমথ বাবুরই দোষ ধরা কেন? 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের পাতা তিনি ওল্টান নাই কারণ তিনি "সংস্কৃত কম জানেন।" "শনিবারের চিঠি"র পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত বেশী জানেন ব'লেই বুঝি কোন বইয়ের পাতা ওল্টান না?

"শনিবারের চিঠি"র বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত "তন্ত্রাখ্যায়িকা" নামক এক গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি বইখানি দেখে থাক্‌তেন তা হ'লে সহজেই দেখ্‌তে পেতেন যে বইয়ের নাম "তন্ত্রাখ্যায়িক"। সংস্কৃত বেশী জানেন ব'লেই বুঝি বইয়ের চেহারা না দেখেও তিনি তর্ক ক'রে থাকেন।

এইবার আমরা এ অপ্রিয় আলোচনার উপসংহার করব। প্রমথ বাবুর ভুল দেখাতে গিয়ে পণ্ডিত মহাশয় নানারূপে নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা বল্‌তে বাধ্য এত বিদ্যা মাঠে মারা গিয়েছে। যে সব তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে সেইগুলি নিয়েই পণ্ডিত মহাশয় আস্ফালন করেছেন। কোনো তারিখ সম্বন্ধে প্রমথ বাবু নানা মতের উল্লেখ করেন নি কারণ সাধারণ পাঠকের তাতে কিছু আসে যায় না। প্রমথ বাবু যে যে তারিখ দিয়েছেন সেগুলি তিনি গবেষণা ক'রে বের করেন নাই, যাঁরা করেছেন তাঁদের বই থেকে তিনি নিয়েছেন—যথা—Lévi, Lacote, Keith ইত্যাদি। ঝগড়া করতে হ'লে সেটা প্রমথ বাবুর সঙ্গে নয়, এঁদের সঙ্গে করতে হবে। সেটা তেমন সুবিধাজনক ব্যাপার হবে না মনে ক'রেই বুঝি "শনিবারের চিঠি"র পাতায় এত আস্ফালন?

শুধু প্রবন্ধটী নিয়েই যে প্রমথ বাবুর উপর চোট পড়েছে তা' নয়। "সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা যে ধ্বনি ও রসবাদ (আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে যাহার চরম বিবৃতি)"—সেই ধ্বনি ও রসবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় প্রমথ বাবুকে শোনাতে ছাড়েন নি। সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁর এত অধিকার—অর্থাৎ যিনি শুধু "হবি ও কাষ্ঠ'সন" নয়, "ধেনু"ও বল্‌তে পারেন—এ হেন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্যা কি ৯১ নম্বর সার্কুলার রোডেই মারা যাবে?

পরিশেষে পণ্ডিত মহাশয় প্রমথ বাবুকে ভয় দেখিয়েছেন যে "ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের কথা ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।" আমরা বহুদিন থেকে "শনিবারের চিঠি"র নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পরিচয় পাবার জন্য উৎসুক রইলাম।
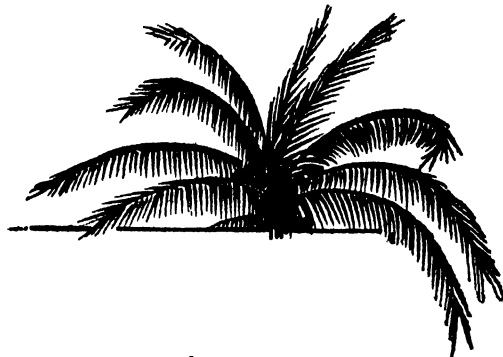
বিবিধ সংগ্রহ

নাসিক

মুখবন্ধ—পুণ্যতোয়া গোদাবরী-তটে শ্রীরামচন্দ্র-পদস্পর্শপূত এই সহরটি হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ। গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান হইতে ইহা প্রায় ১৫ ক্রোশ দূরে, নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। সহরের সন্নিকটে, নদীর উভয় তীরে এবং নদীগর্ভেও অনেকগুলি মন্দির আছে। বন্যার সময় নদীর দুইকূল প্লাবিত করিয়া উদ্বেল জলধারা যেন সমুদ্র সৃজন করে ও এই সময়ে নদীগর্ভস্থ মন্দিরগুলি যেন গঙ্গাবক্ষে 'বয়ার' মত ভাসিতে থাকে। নদীর উত্তর তটে রামায়ণবর্ণিত পঞ্চবটী বন। পাণ্ডারা যাত্রিগণকে নানাবিধ গুহা, বৃক্ষ, প্রস্তর-বেদী প্রভৃতি দেখাইয়া,—এই-খানে রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া কুটির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইখানে সেবানিরতা সীতাদেবী রামচন্দ্রকে বৃক্ষপত্রে ব্যজন করিতেন, লক্ষ্মণ মহারাজ এই বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া রাম ও সীতার ক্ষুন্নিবৃত্তিপূর্ব্বক স্বয়ং অনাহারে অনিদ্রায় কালযাপন করিতেন, এই সব বলিয়া মুমুক্ষু তীর্থ-যাত্রীদের হৃদয় ভক্তি ও বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়া তুলে। সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন এই স্থলে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম নাসিক!

ভৌগোলিক—সহর ব্যতীত এই নামে একটি জেলাও আছে এবং উহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। উহার আয়তন ৫৯৪০ বর্গমাইল। উহার উত্তরে খান্দেশ, দক্ষিণে আহম্মদ নগর, পূর্ব্বে নিজামের রাজ্য ও পশ্চিমে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

গানা জিলা। সমস্ত জিলাটি সমুদ্রবক্ষ হইতে দুই সহস্র ফিট উচ্চ একটি অধিত্যকার উপর অবস্থিত ; কেবল পশ্চিমের দিকের কয়েকটা গ্রামই না জানি কি করিয়া সমতল ভূমির দিকে নামিয়া গিয়াছে। নাসিক জিলার পশ্চিমাংশ পর্ব্বত-বহুল ও সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধ্য চাষ-বাসই এখানে সম্ভব। পূর্ব্বাংশ এ বিষয়ে অনেক ভাল, সেখানে ভূমির উর্ব্বরতার জন্য কৃষিকার্য্য ভালরূপেই হইয়া থাকে। সহ্যাদ্রী পর্ব্বত-মালা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত থাকিয়া ইহাকে মালাবার উপকূল-বাহী মৌসুম বায়ু হইতে কতক পরিমাণে আড়াল করিয়াছে। কিন্তু চন্দ্র পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত থাকিয়া এই জিলার জলনিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। এই পর্ব্বতরাজির দক্ষিণস্থ যাবতীয় নদী গোদাবরীতে গিয়া মিশিয়াছে এবং উত্তরে 'গীর্ণা' ও তাহার উপনদী 'মোসাম্' উভয়ে উর্ব্বর উপত্যকাভূমির উপর দিয়া তাপ্তীতে পড়িয়াছে। নাসিক জেলার বৃক্ষাদি অধিক নাই। সহ্যাদ্রী পর্ব্বতমালার গাত্রদেশে যে 'বনরাজিনীলা' বিরাজিত ছিল, যাহার শোভা-রাশি রামচন্দ্র স্বীয় কান্তাকে বিমানপথ হইতে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন :—
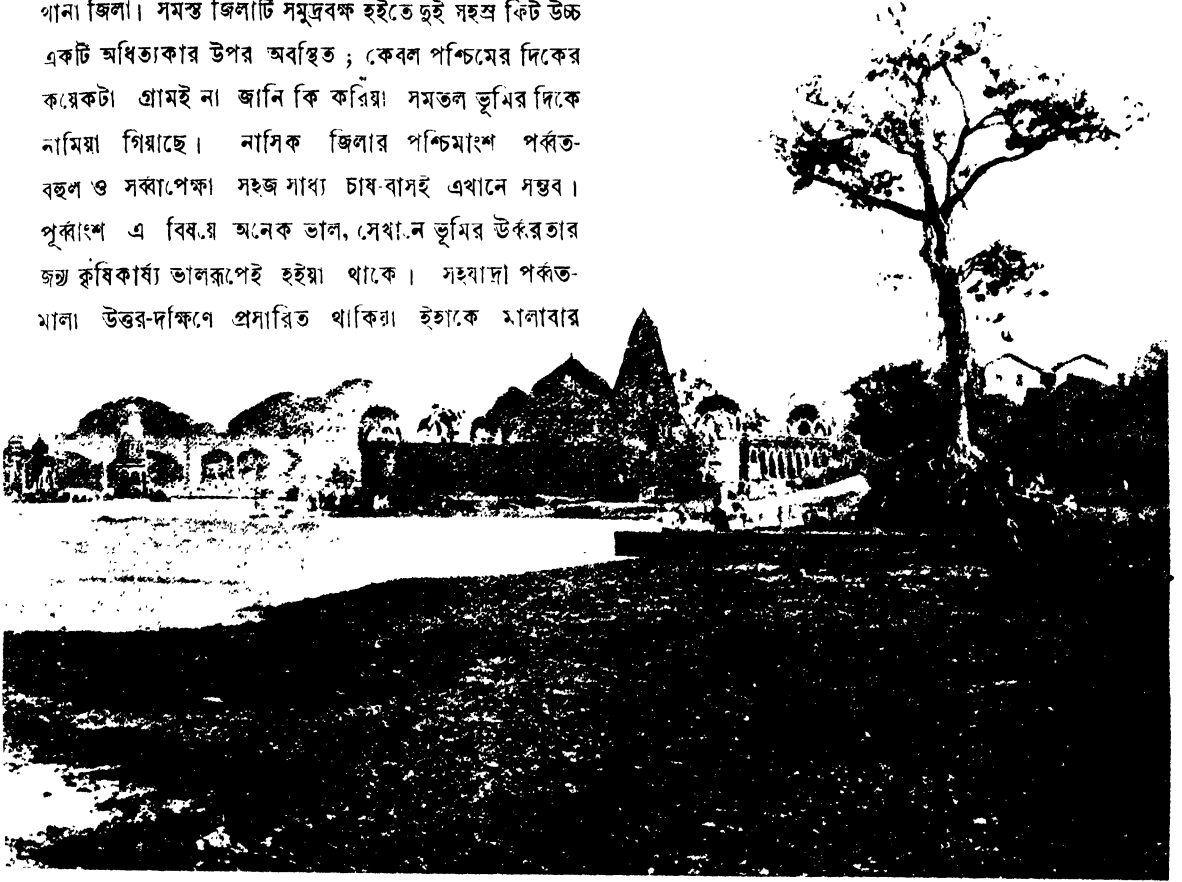
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী
　　তমালতালীবনরাজিনীলা।

গোদাবরীতটশায়ী নাসিক সহর

আভাতি বেলা লবনাম্বুরাশে
　　র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সেই অয়শ্চক্রনিভ তমালতালী আজ লোপ পাইয়া পাষাণময় গিরিগাত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল উদ্ভিজ্জের ধ্বংসনিরোধের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, এবং অনেকস্থলে গিরিগাত্রে নূতন উদ্ভিজ্জের উদ্ভবের জন্যও ব্যবস্থা হইতেছে।

ঐতিহাসিক—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত এই জেলা অন্ধ্রভৃত্য, চালুক্য, যাদব প্রভৃতি রাজবংশের অধিকারে ছিল। ১২৯৫ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাসিক জেলা যথাক্রমে দেওগড় (দৌলতাবাদ)-রাজগণ, বাহমনীগণ, নিজামসাহীগণ এবং ঔরঙ্গবাদের

মোগলগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। ১৭৬০ খৃঃ হইতে ১৮১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের হস্ত হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরাজদের হস্তে আসে। বহু মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করিয়া এই জেলায় আজো অনেকগুলি মহারাষ্ট্র-নির্ম্মিত দুর্গ বর্ত্তমান।

নাসিক সহরের অনতিদূরে 'পাণ্ডব-লেনা' নামে কতকগুলি গুহা আছে। এই গুহাগুলি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। গুহাগাত্রে যে-সমস্ত লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নহে।
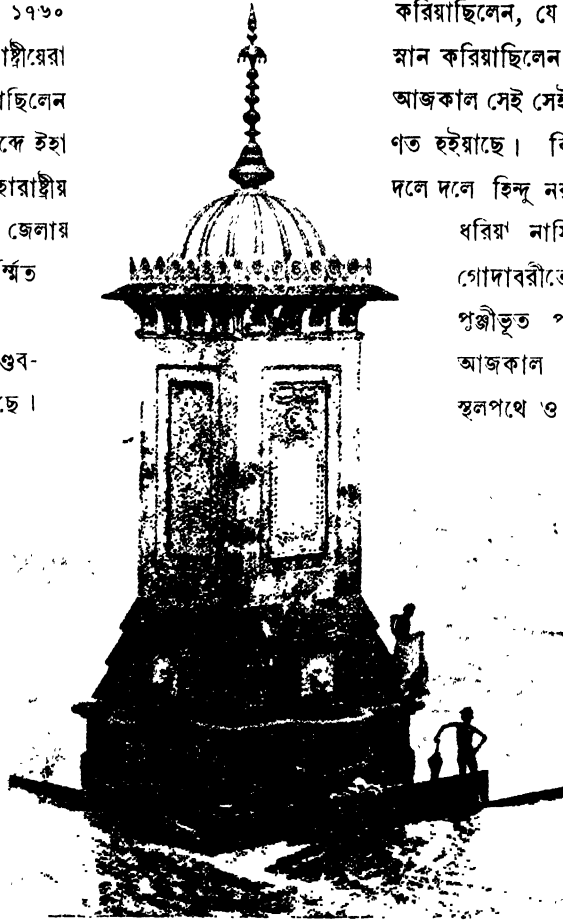
প্রাগৈতিহাসিক কালে আর্য্যেরা যখন দাক্ষিণাত্যে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন, সেই সময় তাঁহারা প্রথমে গোদাবরীতটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কথাটাই রামায়ণের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া আছে। পূর্ব্বকালে যখন গোদাবরীর উভয়পার্শ্ব ঘন বনে আচ্ছাদিত ছিল, তখন সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া রামচন্দ্র এই অঞ্চলে বনবাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে গোদাবরীজলে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আজকাল সেই সেই স্থান,- কুণ্ড ও তীর্থে পরিণত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ যোগের সময় দলে দলে হিন্দু নর-নারী আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া নাসিকে আসিতেছে ও পবিত্র গোদাবরীতে নিমজ্জিত হইয়া বহুদিনের পুঞ্জীভূত পাপ ক্ষালিত করিতেছে! আজকাল রেল ও ষ্টীমারের কল্যাণে স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ যে কেবল অনায়াস-সাধ্য হইয়াছে তাহাই নহে, উহা সুখ-সাধ্যও হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বকালে, যখন ভ্রমণ করিতে হইলেই পদযুগল অথবা গোশকটের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না, সে সময়ও ভারতের বহু দূরদূরান্তর হইতে তীর্থযাত্রীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কখনও মাসের পর মাস ধরিয়া পদব্রজে ভ্রমণান্তর এখানে আসিয়া মিলিত হইত।

বন্যাপ্লাবিত গোদাবরী

তীর্থযাত্রী—রেলপথ, আজকাল এই সপ্তাহ ও মাসকে কয়েকঘণ্টার ব্যাপার করিয়া ফেলিয়াছে। জলপথে, মালাবার-উপকূল-শোভাও এত মনোরম যে, আগমন বা প্রত্যাগমনকালে একবার-ও অন্ততঃ জলপথে ভ্রমণ করিলে সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক এবং সফল হয়! আমরা জলযান

শ্রীরামেন্দু দত্ত

হইতে সাগর-চুম্বী মালাবার-উপকূলের একটি আলোকচিত্র পর পৃষ্ঠায় দিলাম।

আজকাল যানবাহনের এইরূপ সুবিধা থাকার দরুণ শত সহস্র তীর্থাভিলাষী ব্যক্তি নাসিকে আসে। নাসিক-মিউনিসিপ্যালিটি প্রত্যেক স্নানার্থীর নিকট হইতে সামান্য কয়েক আনা কর আদায় করিয়া বেশ-কিছু আয় করে। তীর্থযাত্রীদের অর্থ-সচ্ছলতার অনুপাতে অর্থ আদায় করিয়া পাণ্ডারাও বড় কম টাকাটা রোজগার করে না।

আজও অনেক ধনী জমিদার সুসজ্জিত হস্তীর উপর চড়িয়া, বহু লোক-লস্কর, পাইক-পাটোয়ার সঙ্গে লইয়া এখানে তীর্থ করিতে আসিয়া থাকেন। সেই সময় ভিক্ষুক, দর্শক ও পাণ্ডামহারাজদের মধ্যে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। আজও বহুশত ক্রোশ ক্লান্তচরণে অতিক্রম করিয়া দরিদ্র বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট শুভমুহূর্ত্তটিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপে তাহারা ভবপারের পথে আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া পড়িতে সমর্থ হয়। তাহাদের হয়ত এমন দুই এক টাকাও পুঁজি নাই যে গন্তব্য তীর্থে রেলযোগে পৌছায়। তাহাদের নিকট রেল-কোম্পানী বা ষ্টীমার কোম্পানীর অস্তিত্ব নাই; কিন্তু কিছুই না থাকুক, মনের মধ্যে তাহাদের যে গভীর অদম্য ধর্ম্মবিশ্বাস আছে, তাহাই তাহাদের ক্লান্ত চরণে উদ্যম আনিয়া দেয়, পরিশ্রমে অবশ দেহে নব বল সঞ্চারিত করে, অর্থহীনতার দুর্ভাগ্যকে বিস্মরণীর সলিল-স্রোতে বিলীন করিয়া মনকে অপূর্ব্ব আনন্দ-মাধুরীতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে! পরিধানে কৌপীন, বন্ধুর পার্ব্বত্য-ভূমির অতিক্রমণে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত, উপযুক্ত আহার পানীয়ের অভাবে আবক্ষ-কণ্ঠনালী পরিশুষ্ক, এই সকল লোলচর্ম্ম, অশীতিপর বৃদ্ধ নরনারী ও তরুণ-বয়স্ক যোগীকল্প বালক বালিকাদের দেখিলে মনে হয় যে, এই নিঃস্ব ধর্ম্মপ্রাণ জাতির এইরূপ দৃঢ়তা উদ্যম, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা থাকা সত্ত্বেও এমন মুমূর্ষু অবস্থা কেন? তাহারা দলে দলে লাঠির উপর ভর করিয়া, সমস্ত রাত্রি, প্রভাত ও প্রদোষের শীতলতার আশ্রয়ে পথ অতিবাহিত করে, রৌদ্রের সময় পথিমধ্যস্থ বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্লান্ত শরীর মেলিয়া বিশ্রাম ও নিদ্রা সমাপন করে। পথচারী ধনী পথিকের অথবা কোন পুণ্যশীল গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ খাদ্যে কোনরূপে প্রাণটাকে বাঁচাইয়া অবশেষে ইহারা গোদাবরীর পূত-সলিলে অবগাহন করিয়া ধন্য হয়! কষ্টের যদি পুরস্কার থাকে, সরল বিশ্বাসের যদি মাহাত্ম্য থাকে, অধ্যবসায়ের যদি শক্তি থাকে, নিষ্ঠায় যদি পুণ্য থাকে, তাহা হইলে ইহারা কি তাহা পায় না? তাহারা হয়ত প্রাণান্তকর অসুখের সময় অথবা একান্ত বিপদে পড়িয়া এই তীর্থ মানত্ করিয়াছে, হয়ত কেহ দেহের নির্য্যাতন, রিপুর লাঞ্ছনা ও সংযমের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এই তীর্থ বরণ করিয়াছে, কেহ হয়ত ভারতের যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন

তীর্থস্নানান্তে

করিয়া অথবা পর্য্যটনের পথে এখানে চলিয়াছে—হয়ত বহু-বর্ষ অতীত হইলে এই পর্য্যটন শেষ হইবে, কাহারো হয়ত শেষ হইবার পূর্ব্বেই এই নরদেহ বিনষ্ট হইবে, অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপটু হইয়া মৃত্যুকে সন্নিকটবর্ত্তী করিয়া আনিবে,—তথাপি ইহারা চলিয়াছে, দলে দলে,—আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্বলহীন, অর্থহীন। ইহারা তথাপি চলিয়াছে, স্থির-লক্ষ্য, অপরাজেয় অধ্যবসায় লইয়া,—বালকে, বৃদ্ধে, পুরুষে, নারীতে, সহস্রে সহস্রে! বিশ্বাসের এই অদ্ভুত শক্তির শেষ নাই, তুলনা নাই!

পাণ্ডা-পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের,

"নামিনু শ্রীধামে, দক্ষিণে বামে
সুমুখে পিছনে যত
লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা,
করিল কণ্ঠাগত !"

শ্রীধামে না নামিলেও, দক্ষিণে বামে সমুখে পিছনে পাণ্ডা লাগিয়া যে প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করিতে পারে, একথা যাঁহারা বিশ্বাস না করেন তাঁহাদিগকে একবার নাসিকে করিয়া 'পরিত্রাহি' ডাক ছাড়িতেছে, চেষ্টা করা বৃথা ভাবিয়া উন্মত্ত কোলাহলময় প্রশ্নরাশির উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছে না! হয়ত টানাটানিতে তাহার বাহুদ্বয় ব্যথিত, আড়ষ্ট, গাত্রবস্ত্র বিপর্য্যস্ত ও ছিন্ন হইয়াছে, মন হইতে তীর্থ করিয়া পুণ্যলাভের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে বিদূরিত হইয়াছে ; এমন সময় পাণ্ডামহারাজদের মধ্যে যিনি বলে ও প্রতাপে এবং কণ্ঠস্বরের প্রচণ্ডতায় শ্রেষ্ঠ, তিনি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সেই ব্যূহের অভ্যন্তর হইতে, কেশাকর্ষণ না হউক,

জলপথে মালাবার উপকূলের দৃশ্য

আসিতে অনুরোধ করি। এই তীর্থ-ত্রাস যাত্রীশিকারী হিংস্র শ্বাপদোপম দেব-দেউলের দ্বারবানগণ, ধনী আগন্তুকের চতুর্দ্দিকে নিমেষ মধ্যে একটি ব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহার অবস্থাটা সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যুর তুল্য বিপন্ন করিয়া তোলে! চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়া, কোলাহলে গোদাবরীর কলনাদকে ডুবাইয়া দিয়া তাহারা অজস্র প্রশ্ন-বর্ষণে তীর্থ-কামীকে বিরক্ত, অধীর ও উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে! সে-রূপ ভালমানুষ তীর্থযাত্রী হইলে তাহার আর লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না ; সে হয়ত মনে মনে নারায়ণকে মুহূর্ত্তে শতবার স্মরণ বাহু আকর্ষণ করিয়া সবেগে স্বীয় আলয়পানে টানিয়া লইয়া যান ; এই দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শীর মনশ্চক্ষে অমনি রামায়ণ বর্ণিত ব্রাহ্মণবেশী রাবণ কর্ত্তৃক ভীতা, ত্রস্তা, বিমূঢ়া, কেশাকৃষ্টা সীতাদেবীর অপহরণ-দৃশ্য বাস্তবের স্পষ্টতা লইয়া জাগিয়া উঠে! এইরূপে রামায়ণের যে কয়টা দৃশ্য এই নাসিক জেলায় ত্রেতাযুগে অভিনীত হইয়াছিল, দ্রষ্টার মত দ্রষ্টা থাকিলে আজও তিনি এখানে সেইগুলিকে অন্যরূপে অভিনীত হইতে দেখিবেন। পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল 'কোথা হইতে আগমন, কি নাম তোমার?' তাহার পর তাহাকে তোমার চৌদ্দ-

শ্রীরামেন্দু দত্ত

পুরুষের পরিচয় দিতে হইবে। উহা ঠিকভাবে দেওয়া হইলে একজন না একজন পাণ্ডা তাহার খাতা খুলিয়া নাম গোত্র মিলাইয়া শিকার লইয়া প্রস্থান করিলে তবে গোলমাল মিটিবে। এই তীর্থযাত্রীদের নাম-গোত্র, পূর্ব্বপুরুষপরিচয়, বংশ-তালিকা, আগমনের ও অবস্থানের সময়-সম্বলিত খাতাগুলি পাণ্ডারা পিতাপুত্র পরম্পরায় উত্তরাধিকার-সূত্রে দখল করিয়া থাকে এবং তাহার লিখন-প্রণালী যদিও একান্ত দেশী ধরণের, তথাপি কার্য্যোপযোগিতায় উহা বিলাতী 'লেজার-বুক্' অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এই পুস্তকের অন্তর্গত পরিচয়-তালিকার মধ্যে বহু প্রতাপান্বিত রাজবংশের, জমিদার-গোষ্ঠীর ও ধনীদের বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়। ভূ-সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় মামলা-মোকদ্দমায় যখন উত্তরাধিকার লইয়া গোলমাল বাধে, তখন এই খাতা দায়ের করিয়া বহু জটিলতার মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে ও এই খাতায় উল্লিখিত বৃত্তান্তগুলি প্রামাণিক বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। এই খাতার বংশপরিচয়-তালিকা এরূপ নিপুণতা ও শৃঙ্খলার সহিত প্রস্তুত হইয়াছে যে নাসিকের একজন ব্রাহ্মণ কোন একজন তীর্থযাত্রীর পিতৃপুরুষ-পরিচয় অত্যল্প সময়ের মধ্যে এমন বিস্তৃতভাবে দিয়া দিবে যে স্বয়ং তীর্থযাত্রীই হয়ত তাহার অর্দ্ধেক কথা জানে না! পাণ্ডাদের এই পরিচয়-পত্রের পুস্তকগুলি বহুবার অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজমুকুটের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছে।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

প্রাচীর-চিত্র

নূতন দিল্লীর নব-নির্ম্মিত শাসন-পরিষদ-গৃহের প্রাচীর গাত্র অলঙ্কৃত করিবার জন্য ভারত-সরকার এক চিত্র-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় যে সকল চিত্র মনোনীত হইয়াছে তাহার কয়েকখানির

তপোবন

জি, এচ্, নাগরকর

নৃত্য

বম্বে স্কুল
অফ্ আর্ট্‌স্

গান্ধার যুগ   বর্ত্তমান যুগ

বম্বে স্কুল অফ্ আর্ট্‌স্

প্রতিলিপি এই স্থানে দেওয়া হইল। পুরাতন ভারতের কতকটা আভাস এই চিত্রগুলিতে পাওয়া যায়। চিত্রগুলি ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ এবং রূপদক্ষতায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

আসামের আদিম অধিবাসী।

আসামের প্রায় অধিকাংশ প্রদেশই পার্ব্বত্য। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং পূর্ব্ব সীমান্তে পাটকোই, লুশাই, নাগা ও আরাকান পর্ব্বত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পশ্চিমে খাঁসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো পর্ব্বত আসামকে বাঙ্গলা দেশ হইতে পৃথক করিয়াছে। হিমালয়ের পাদমূলে এবং অন্যান্য পর্ব্বতমালা বেষ্টিত যে সব উপত্যকাদি আসামে দৃষ্ট হয়, তথায় সাধারণত এই সব আদিম অধিবাসীরা বসবাস

কুকি পুরুষ (আসাম)

করে। ইহারা অধিকাংশই মঙ্গোল বর্ণ-শঙ্কর, কিয়দংশ মাত্র কোল, ভীল, সাঁওতাল জাতীয় কোন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সহিত মঙ্গোল সংমিশ্রণ বলিয়া মনে হয়। প্রশস্ত মাথা, নাসিকা ঈষৎ চ্যাপ্টা, উচ্চ গণ্ডাস্থি এবং সুস্পষ্ট মঙ্গোল চক্ষু সকলেরই মধ্যে অল্প বিস্তর দৃষ্টিগোচর হয়।

আসামের উত্তরে 'আহম' জাতিই সর্ব্বপুরাতন। এই 'আহম' হইতেই অপভ্রংশ 'আসামের' উৎপত্তি এইরূপ অনেকেরই ধারণা। আহম জাতীর মধ্যে 'আবর' ও 'মিশমিই' প্রধান। আবরকেও 'দাফ্লা,' 'আকা,' পার্ব্বত্য 'মিরি,' 'গালং,' ও 'পাদাম,' ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর সমষ্টি বলিয়া ধরা হয়। ইহারা সকলেই হিমালয়ের পাদমূলে আসামের প্রায় সমস্ত উত্তর পূর্ব্ব সীমা জুড়িয়া বসবাস করে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হিমালয় হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত নাগা ও কুকি পর্ব্বতরাজিতে 'নাগা' ও 'কুকিরা' বসবাস করে। মণিপুরিরা নাগা ও কুকি পর্ব্বতের মাঝামাঝি স্থানে বাস করে। 'মিকির'রা, ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণে এবং 'খাসিয়া' ও 'গারো'রা, খাসি ও গারো নামক পার্ব্বত্য স্থানে আসামের পশ্চিমে বাস করে।

আসামের অধিকাংশ স্থানই পার্ব্বত্য; ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বতমালা, তাহার মধ্যে মধ্যে উপত্যকাদির মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র ও অপরাপর অনেক খরস্রোত নদনদী প্রবাহিত। অত্যধিক বারিপাত হেতু আবহাওয়া সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা ও আর্দ্র। আদিম অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কোন প্রকার চাষ আবাদ করে না, সামান্য যাহা কিছু হয় তাহা নামে মাত্র। চাষ বাসের যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহাকে 'ঝুমিং' বলে। জঙ্গলের কোন অংশেতে আগুন লাগাইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয় এবং এই ভূমিতে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর শস্য রোপন করা হয়। গাছ পালা পোড়াইবার পর যে ছাই থাকে উহা ছাড়া জমিতে আর কোনও প্রকারের সার দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় বৎসরের পর আর এক খণ্ড জঙ্গল আবার মনোনীত করিয়া, পোড়াইয়া পরিষ্কার করিবার পর শস্য রোপন করা হয়। এই প্রকারে ৭ বৎসরের পর পুনরায় প্রথম খণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া তথায় আবার শস্য রোপন করে। কাজেই প্রত্যেক ভূমিখণ্ডকেই তাহারা দুই বৎসর শস্য উৎপাদনের পর ৭ বৎসর করিয়া রেহাই দেয়। লাঙ্গল ইত্যাদির দ্বারা ভূমি কর্ষণের প্রথা ইহারা এখনও শেখে নাই। জমিতে স্থানে স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তথায় বীজ বপন করে।

আবর ও মিশমিরা সর্ব্বদাই একজোট হইয়া গ্রামের মধ্যে বসবাস করে। গ্রামটীকে পাহাড়ের ধারে এমন কোনও

মিশমি নমুনা আসামের আদিম অধিবাসী

স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তৈয়ার করে যে স্থান হইতে পানীয় জল অতি নিকটে পাওয়া যাইতে পারে। বাঁশ ও বৃহৎ বৃহৎ গাছের গুঁড়ি দিয়াই সাধারণত গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই সব পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির মধ্যে অবিবাহিত পুরুষদের জন্য গ্রামের মধ্যে পৃথক গৃহ নির্ম্মিত হয়। কোন কোন স্থানে অবিবাহিত স্ত্রীলোকদের জন্যও এই প্রকারের ব্যবস্থা আছে। সকল অবিবাহিত পুরুষদের জন্য গ্রামের মধ্যে পৃথক ব্যবস্থা প্রায় সমস্ত আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গল হইতে ফলমূল, গাছ গাছড়া, মৃগনাভি, পশুচর্ম্ম ও লোম ইত্যাদি জিনিষ অনেক দূরে দূরে ব্যবসায়ীদের কাছে ইহারা লইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে লবণ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ করে। আবররা সূতা ও লোমের কাপড় তৈয়ার করিতে পারে। এক প্রস্থ সূতার উপর কাঁচা তূলা স্থানে স্থানে বসাইয়া আবার উহার উপর সূতা দিয়া বুনিয়া এক প্রকারের সুন্দর কাপড় ইহারা তৈয়ার করিতে পারে। সাধারণত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই তিন খণ্ড

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

কাপড়ের টুকরাকে জামা এবং কাপড় হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। হাড়ের মালা ও সিকি দুয়ানির মালা স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। দা, কাটারি, বল্লম ইত্যাদি সকলেরই কাছে এক আধটা থাকে। সুন্দর সুন্দর বাঁশের ঝুড়ি, পেটারি, কোমরবন্ধ ইত্যাদি অনেক প্রকারের জিনিষ তৈয়ার করিতে আবররা বিশেষ দক্ষ। নদী পার হইবার জন্য ইহারা ডোঙ্গা বা শাল্‌তি তৈয়ার করে।

তুলার কম্বলবয়নে নিযুক্ত আবর-রমণী
(আসামের আদিম অধিবাসী)

কাঠের ডোঙ্গা (Dugout) এক একটী বড় গাছ কুঁদিয়া বাহির করিতে হয়; সম্মুখে ও পিছনে লগি মারিয়া ডোঙ্গা চালান হয়। এক একটি বৃহদাকার ডোঙ্গায় ১৫।২০ জন পর্য্যন্ত লোক ধরে এবং ভারী জিনিষপত্র লইয়া যাইবার সময় দুইখানি ডোঙ্গা পাশাপাশি বাঁধিয়া তাহার উপর মাঝখানে জিনিষ রাখা হয়। আবররা দুর্গম পর্ব্বতাদির
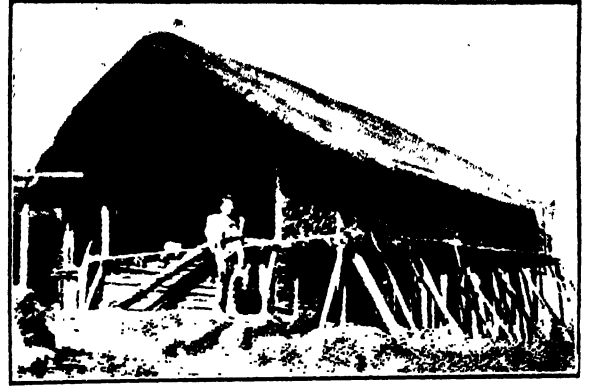
পর্ণ কুটীর
(আসামের আদিম অধিবাসী)

গা ঘেঁসিয়া বাঁশের সেতুর আকারে গমনাগমনের জন্য পথ তৈয়ার করিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী নালা পার হইবার জন্য সাধারণতঃ রজ্জুর সেতুই ব্যবহৃত হয়। গবাদি পশুর মধ্যে 'মিথান' নামক এক প্রকারের মহিষ জাতীয় জন্তু প্রত্যেকেরই কয়েকটী করিয়া থাকে। আবর ও মিশমিদের মধ্যে মঙ্গোল বিশেষত্বগুলি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আসাম দেশের গৌরী গাই

নাগারা রঙীন সাজসজ্জা ও অনাবশ্যক আড়ম্বরে দেহকে সাজাইতে বিশেষ যত্নবান। নাগারা নাগা পর্ব্বতের ধারে উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে দক্ষিণ কাছাড়ের পর্ব্বত পর্য্যন্ত

প্রায় সমস্ত স্থানেই বসবাস করে। নাগাদের মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় যথা, 'আনগামি,' 'লোটা,' 'বানপাড়া,' 'আয়ো,' 'সেমা,' ইত্যাদি। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। গায়ের রং তাঁবাটে হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণও দেখিতে পাওয়া যায়। দাড়ি ও গোঁফ অল্পবিস্তর দেখা যায়। নাগাদের মধ্যে অনেকে একেবারেই উলঙ্গ থাকে। এক শ্রেণীর নাগারা নর-খাদক। রঙীন পোষাক, পালক ইত্যাদির দ্বারা তৈয়ারী মাথার মুকুট এবং হাড়, নখ ও নরমুণ্ডের মালা সচরাচর ইহারা সকলেই পরিয়া থাকে। মঙ্গোল বিশেষত্বগুলি নাগাদের মধ্যে কিছু অল্প পরিমাণই দেখিতে পাওয়া যায় বরং কিছু কিছু প্রাক্তন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সহিত ইহাদের মিল আছে।

ডোঙ্গাতে আবর-পুরুষ
(আসামের আদিম অধিবাসী)

আসামের প্রায় সমস্ত আদিম অধিবাসীর মধ্যেই মাতৃ-ক্রমিক ধারা প্রচলিত। অধিকাংশ স্থানেই বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা শ্বশ্রুগৃহে যায় না; স্বামীকেই তাহার স্ত্রীর কাছে আসিয়া থাকিতে হয় এবং ভাগিনেয় অথবা ভাগিনেয়ী তাহার মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহারা সকলেই জড়-চৈতন্যবাদী এবং মৃত পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিয়া থাকে। গারো ও খাসিয়াদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। নাচগান সকল অনুষ্ঠানেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কলাপে, সামাজিক উৎসবে বা কেবল মাত্র আমোদ-প্রমোদের জন্য সকল কার্য্যেই অনুষ্ঠিত হয়। নাচগানে স্ত্রীপুরুষ উভয়পক্ষই যোগদান করে ও নিজেদের গৃহে চোলাই-করা মদও উভয়পক্ষই পান করে।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

১৯

সুকুমারের নিকট উপস্থিত হ'য়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তোমার বন্ধুর আজ কলকাতা যাওয়া বন্ধ করলাম সুকুমার।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সুকুমার বল্‌লে, "ভারী খুসি হলাম মিষ্টার মিটার।" তারপর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে সে মুখের এমন একটু ভঙ্গি করলে যার নিগূঢ় একটা অর্থ কল্পনা ক'রে বিনয় অপ্রতিভ হ'য়ে উঠ্‌ল।

বিনয়ের এই বিমূঢ় ভাবটুকু সন্তোষের চোখে প'ড়ে গেল;—সে একটু বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, "আপনি আজ কলকাতা যাবার ইচ্ছে করেছিলেন না কি?"

বিনয় সঙ্ক্ষেপে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

সুকুমার বল্‌লে, "শুধু ইচ্ছেই করছিলেন না, বন্দোবস্তও করছিলেন। সুটকেস্ গোছান হ'য়ে গেছে, পেন্টিংএর সাজ সরঞ্জাম সব প্যাক্ করা তয়ের, শুধু বিছানাটা বাঁধ্‌তে বাকি।"

সন্তোষ বল্‌লে, "তা হ'লে ছবির কি হ'ত?—কমলার ছবি ত' এখনো শেষ হয় নি। ফিরে এসে আবার সুরু করতেন?"

অনৌৎসুক্যের সঙ্গে বিনয় বল্‌লে, "তাই হয় ত' করতাম।"

সন্তোষ বল্‌লে, "না, বিনয় বাবু, তা করবেন না—ছবিটা শেষ করবার মধ্যে বন্ধ দেবেন না। আজ সমস্ত দিন আমি শুধু ছবিটাই দেখেছি—ছবিটা really wonderful হচ্চে! এরকম ছবি শেষ না করা শুধু crime নয়, sin।"

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে বিনয়ের শিল্পী-হৃদয়ে একটা আনন্দের মৃদু হিল্লোল খেলে গেল; সন্তোষের দিকে চেয়ে ঈষৎ স্মিত মুখে সে বল্‌লে, "ভালো লেগেছে আপনার?"

সন্তোষ বল্‌লে, 'ভালো লেগেছে বল্‌লে কিছুই বলা হয় না—ভালো লাগার চেয়ে ঢের বেশি আমার বিস্ময় লেগেছে। ছবিটা ঠিক যেন একটা paradox—ষোলো আনা বাস্তবের মধ্যে যে ষোলো আনা কল্পনা আশ্রয় পেতে পারে এ আগে আমি জানতাম না। ছবির মধ্যে কমলাকে আপনি অনুকরণ করেন নি, সৃষ্টি করেছেন। কমলাকে আপনি যেমন দেখিয়েছেন, কমলা নিজে বোধ হয় নিজেকে তেমন দেখাতে পারেন না।"

সুকুমার হাসতে হাসতে বল্‌লে, "ক্ষমা করবেন সন্তোষ বাবু, আপনি যা বল্‌চেন তাও যেন একটা paradox হ'য়ে উঠ্‌চে,—ষোলো আনা সুখ্যাতির মধ্যে যে ষোলো আনা নিন্দে আশ্রয় পেতে পারে এ-ও আগে আমরা জান্‌তাম না!"

সুকুমারের কথা শুনে সকলে হেসে উঠ্‌ল। সহাস্য-মুখে সন্তোষ বল্‌লে, "ষোলো আনা নিন্দে আপনি কোথায় পেলেন সুকুমার বাবু? আমি ত ষোলো আনা সুখ্যাতিই করচি—unadulterated।"

সুকুমার বল্‌লে, "মিস্ মিত্র নিজেকে নিজে যেমন দেখতে পারেন না, বিনয় যদি তাঁকে তেমন দেখিয়ে থাকে তা হ'লে বুঝতে হবে বিনয়ের পোর্ট্রেট্ আঁকা সেখানে ব্যর্থ হয়েচে। ফুল দেখে ফল আঁকা নিশ্চয়ই নিন্দের কথা।"

সহাস্যমুখে সন্তোষ বল্‌লে, "ও! সেই কথা বলছেন? কিন্তু উনি ফুল দেখে ফল আঁকেন নি, body দেখে soul এঁকেছেন। ভাষায় দখল না থাকার জন্যে কথাটা ঠিক মত প্রকাশ করতে পারি নি।"

সুকুমার বল্‌লে, "যিনি নিন্দেকে সুখ্যাতির রূপ, আর সুখ্যাতিকে নিন্দের রূপ দিতে পারেন তাঁর ভাষায় দখল নেই, এ কথা আমরা কেউই স্বীকার করব না।" তার পর বিনয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "তুমি আমার উপর চোটো না বিনয়, ক্যালক্যাটা হাইকোর্টের একজন কাউন্সেলকে দিয়ে ভাল ক'রে তোমার সুখ্যাতি করিয়ে নিচ্ছি,—কৃতজ্ঞই হ'য়ো। Body দেখে soul আঁক্‌তে পারে এমন উঁচু দরের শিল্পী, শুধু আমাদের দেশে নয়, কম দেশেই বেশি আছে।"

বিনয়ের ছবি আঁকার প্রশংসা শুনে দ্বিজনাথ মনে মনে অতিশয় আনন্দ বোধ করছিলেন; উৎসাহভরে বল্‌লেন, "সে কথা মিছে নয় সুকুমার বাবু, তোমার এই বন্ধুটি সত্যি সত্যিই একজন উঁচু দরের আর্টিষ্ট্। বন্ধুগর্ব্বে তুমি গর্ব্বিত হ'তে পার।"

প্রীতিভরে বিনয়ের দিকে চেয়ে সহাস্যমুখে সুকুমার বল্‌লে, "আর বেশি বল্‌বেন না স্যার্—বন্ধু আবার নিজ গর্ব্বে গর্ব্বিত না হন।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠ্‌ল।

অন্তঃপুরে শৈলজা ভাঁড়ার ঘরে ঘি-ময়দা বার করতে ঢুকেছিল,সুকুমার তথায় উপস্থিত হ'য়ে পিছন থেকে ডাক্‌লে, "ওগো শুনছ?"

মুখ না ফিরিয়েই শৈলজা বল্‌লে, "এইত' শুন্‌লাম।"

সবিস্ময়ে সুকুমার বল্‌লে, "কি শুন্‌লে?"

"তোমার কণ্ঠস্বর।"

বিরক্তির ভাণ ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "সময় নেই অসময় নেই, পরিহাসটি সব সময়েই আছে।"

পিছন ফিরে সুকুমারের দিকে চেয়ে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে শৈলজা বল্‌লে, "কোনো কথা না ব'লে 'শুনছ' জিজ্ঞাসা করাই বা কি কম পরিহাস শুনি? কিছু না বল্‌লে কিছু শোনা যায়?"

সুকুমারের মুখে হাসির রেখা দেখা দিলে; বল্‌লে, "তবে কি বল্‌তে হবে?—এবার থেকে তা হ'লে বল্‌ব, 'ওগো অনুমান করছ?'।"

শৈলজা বল্‌লে, "তা হ'লে তবু তার একটা মানে থাক্‌বে—যা হ'ক একটা উত্তর দেওয়া যাবে।"

সহসা মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "ওগো অনুমান করচ?"

উদ্যত হাসি কোনো প্রকারে রোধ ক'রে গম্ভীর মুখে শৈলজা বল্‌লে, "করচি।"

"কি অনুমান করচ?"

শৈলজা বল্‌লে, "অনুমান করচি, জন চারেকের মত চা আর জলখাবার তৈরী করতে হবে। সেই ব্যবস্থাই হচ্চে।"

ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে নীরবে চেয়ে থেকে গভীর বিস্ময়ের সুরে সুকুমার বল্‌লে, "সত্যি শৈলজা, তোমার এত বুদ্ধি,—তুমি যদি——"

সুকুমারের কথা শেষ হ'তে না দিয়ে শৈলজা বল্‌লে, "শৈলজা না হ'য়ে শৈলেন্দ্র হ'তাম তা হ'লে খুব ভাল হ'ত,—না? স্বাতী নক্ষত্রের জল গজ-দন্তে না প'ড়ে ষাঁড়ের শিংএ পড়েছে। আচ্ছা, সে সব কথা যাক্, এখন ঐ যে নতুন বাবুটি এসেছেন তাঁকে একবার তোমার অফিস্ ঘরে ডেকে দাও ত'।"

সবিস্ময়ে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? কি হবে?"

"কথাবার্ত্তা হবে।"

"কার সঙ্গে?"

"আমার সঙ্গে।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ নয়,—ওকে আমি চিনি, উনি আমাদের ফন্তু দাদা।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুকুমার বল্‌লে, "আরে না, না, ফন্তু দাদা নয়, ও সন্তোষ।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সন্তোষ তা জানি—ওর ডাক নাম ফন্তু। মহিম চৌধুরীর ছেলে ব্যারিষ্টারী করে।"

সুকুমার বল্‌লে, "আচ্ছা, মানলাম ও তোমার ফন্তু দাদা, —তবু কি রকম দাদা শুনে রাখি—নিজের দিকের হিসেব-টাও জেনে রাখা ভাল।"

শৈলজা বল্‌লে, "আমার বড়দিদির ছোটো দেওরের শালা।"

"ওঃ! তবে ত' নিকট আত্মীয়!"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মাথা নেড়ে শৈলজা বল্‌লে "একমাত্র সম্পর্কে নিকট হ'লেই বুঝি আত্মীয়তায় নিকট হয়?" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গিয়ে হাসিমুখে বল্‌লে, "কিন্তু সম্পর্কেও নিকট হবার একবার উপক্রম হয়েছিল।"

মুখে চোখে একটা সন্ত্রাসের ভাব উৎপাদন ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল না কি?"

একমুখ হেসে শৈলজা বল্‌লে, "ঠিক তাই। হয়েছিল।"

"তবে ত' ও ব্যক্তির প্রতি তোমার মনে একটু মমতা লেগে আছে?"

"মমতা লেগে আছে, না আরো কিছু!"

"স্নেহ?"

"মিছে বোকোনা বলছি!"

"করুণা?"

শৈলজা তর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—"আঃ, চুপ করবে কি না বল!"

তদ্গত ভাবে সাগ্রহে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "না না, লজ্জা কিসের, বলই না ছাই! বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্যে জিজ্ঞেস করছি!"

"রেখে দাও তোমার বৈজ্ঞানিক তথ্য! আমি চল্লাম অফিস ঘরে, ডেকে দিতে হয় ত' দাও।" কপট ক্রোধভরে শৈলজা প্রস্থান করল।

বাইরে এসে সন্তোষের কাঁধে হাত দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে সুকুমার বল্‌লে, "আপনার সঙ্গে জনান্তিকে একটু কথা আছে।"

আগ্রহ ভরে সন্তোষ বল্‌লে, "উঠে যাব?"

"এলে ভাল হয়।"

একটু দূরে গিয়ে সুকুমার বল্‌লে, "এ বাড়িতে আপনার একজন আত্মীয় আছেন—ওই পাশের ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

বিস্মিত হ'য়ে সন্তোষ বল্‌লে, "আমার আত্মীয়! কে বলুন ত?"

সুকুমার বল্‌লে, "কার কে বলব বলুন; আমার কে, না আপনার কে?"

"আপনার কে বল্‌লে ত' ঠিক বুঝ্‌তে পারব না—আমার কে তাই বলুন।"

একটু চিন্তা ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "আপনার তিনি কে হন বলা কঠিন, তবে আপনি তাঁর ছোট-দেওরের বড় দিদির শালা।"

সম্পর্ক নিরূপণ করবার জন্যে আধ মিনিট নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা ক'রে মৃদু হেসে সন্তোষ বল্‌লে, "আপনি ভুল করচেন;—বড়দিদির শালা আবার কি?"

অপ্রতিভ হ'য়ে সুকুমার বল্‌লে, "তাও ত' বটে! শালীও ত' হয় না। তা অত হাঙ্গামার দরকার কি? আমি ভুল করলেও আপনি ত' আর ভুল করবেন না, ঘরের ভিতর যান, চিন্‌তে না পারেন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আস্‌বেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সন্তোষ বল্‌লে, "সেটা কি ভাল হবে?"

সুকুমার বল্‌লে, "সেটা ভাল হবে না যদি মনে করেন, তা হ'লে না হয় বেরিয়ে আস্‌বেন না।"

ব্যস্ত হ'য়ে সন্তোষ বল্‌লে, "না, না, আমি তা বলচি নে! যাওয়াই ভাল হবে না বল্‌চি।—আচ্ছা আপনার তিনি কে হন?"

"স্ত্রী হন।"

"তাঁর নাম বল্‌তে আপত্তি আছে?"

"কিছুমাত্র না—তাঁর নাম শৈলজা।"

নিবিড় ভাবে চিন্তা ক'রে সন্তোষ বল্‌লে, "Mystery!"

"Mystery কিছুই নয়, দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।" ব'লে সুকুমার সন্তোষের পিঠে হাত দিয়ে তাকে পাশের ঘরের দিকে ঠেলে দিলে।

Mystery কথাটা একটু জোরে উচ্চারিত হয়েছিল ব'লে দ্বিজনাথ এবং বিনয়ের কানেও পৌঁচেছিল। সন্তোষ ঘরে

প্রবেশ করলে উদ্বিগ্ন মুখে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "Mystery ত' আমাদের পক্ষ থেকেও কম বোধ হচ্চে না সুকুমার বাবু! সন্তোষের সঙ্গে খানিকক্ষণ কি বাদানুবাদ ক'রে অবশেষে তাকে ঘরে বন্দী করলে কেন বল দেখি?"

সহাস্যমুখে সুকুমার বল্‌লে, "ও ঘরে সন্তোষবাবুর একজন আত্মীয়া আছেন।"

"সন্তোষের আত্মীয়া তোমার বাড়ী? কে বল ত?" দ্বিজনাথের ঔৎসুক্যের পরিসীমা ছিল না।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "আপনার বউমা।"

"বউমা! তাঁর সঙ্গে সন্তোষের কি সম্পর্ক?"

করুণ ভাবে সুকুমার বল্‌লে, "সম্পর্কটা একটু জটিল, কিন্তু খুব নিকট।"

সুকুমারের কথায় দ্বিজনাথ ও বিনয় উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌লেন।

ঘরে প্রবেশ ক'রে হাস্যোৎফুল্লমুখী শৈলজাকে এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্টভাবে দেখে সন্তোষ ব'লে উঠ্‌ল, "আরে, আরে, এ যে আমাদের টুলু! টুলু তোমাকে যে এখানে এমন ভাবে দেখ্‌ব তা স্বপ্নেও ভাবি নি! এখানে তোমরা বেড়াতে এসেছ,—না, এই তোমার শ্বশুর বাড়ী।"

সহাস্যমুখে শৈলজা বল্‌লে, "শ্বশুর বাড়ী।"

"কিন্তু তোমার বিয়ের সময় ত' তোমার শ্বশুর বাড়ী ছিল কলকাতায়?"

"হ্যাঁ তখন আমার শ্বশুর কলকাতায় থাকৃতেন—এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া ছিল। সে কথা যাক্‌—তুমি এখানে কোথায় উঠেছ ফস্তু দাদা? দ্বিজনাথ বাবুর বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

"ওঁদের সঙ্গে কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?"

সন্তোষের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বল্‌লে, "সম্পর্ক এমন বিশেষ কিছু নেই—দ্বিজনাথ বাবুর আমি জুনিয়ার।"

"তোমার বিয়ে হয়েচে ফস্তু দাদা?"

"না, হয় নি।"

উৎফুল্ল এবং উৎসুক হ'য়ে শৈলজা বল্‌লে, "দ্বিজনাথ বাবুর মেয়ে কমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কোনো কথা আছে কি?"

অল্প হেসে সন্তোষ বল্‌লে, "তুমি যে আমার সমস্ত খবরই নিয়ে ফেল্‌তে চাও,—এবার তোমার খবর কিছু বল।"

প্রশ্ন অতিক্রম করা থেকেই প্রশ্নের সদুত্তর লাভ ক'রে শৈলজা সহর্ষে বল্‌লে, "চমৎকার মেয়ে কমলা। রূপে গুণে এমন একটি মেয়ে সহসা পাওয়া যায় না। তুমি দেরী কোরোনা ফস্তু দাদা, যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে হ'য়ে যাক্‌।"

শৈলজার কথা শুনে সন্তোষ হাস্‌তে লাগল; বল্‌লে, "শুধু কমলা চমৎকার হ'লেই ত' হয় না টুলু, তোমার ফস্তু দাদার ও ত' চমৎকার হওয়া দরকার। পছন্দ ত' শুধু আমারই নেই।"

শৈলজাও হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "পছন্দ যদি অন্য কারো থাকে ত' সেও তোমাকে অপছন্দ করবে না ফস্তু দাদা। দাঁড়ি পাল্লার একদিকে তোমাকে আর অপর দিকে কমলাকে বসালে কোন্ দিক নেবে যায় তা বলা কঠিন।"

এমন সময় দ্বার-পাশে শোভাকে দেখা গেল,—সে ইঙ্গিতে এমন কিছু বল্‌লে যার অর্থ উপলব্ধি ক'রে শৈলজা উঠে দাঁড়ালো, তারপর শোভাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "ওরে শোভা, প্রণাম ক'রে যা;—আমার দাদা।" সন্তোষের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আমার ছোটো ননদ।"

শোভা চ'লে যাচ্ছিল, ফিরে এসে ঘরে ঢুকে সন্তোষকে নত হ'য়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালো।

সঙ্কোচে সুষমায় মণ্ডিত এই স্নিগ্ধাভ কিশোরী মূর্ত্তি দেখে সন্তোষের দুটি চক্ষু জুড়িয়ে গেল। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "তোমার হিসেবে আমিও ত' এঁর দাদা হই টুলু।"

শৈলজা হৃষ্টমুখে বল্‌লে, "তা ত' নিশ্চয়ই।"

সন্তোষ বললে, "এমন লক্ষ্মীমূর্ত্তি বোন পেলে কার না দাদা হ'তে লোভ হয়।"

শৈলজা প্রসন্ন হ'য়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

শোভা চ'লে গেলে শৈলজা বল্‌লে, "বিনয় বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ত' ফস্তুদাদা?"

"হয়েছে বই কি।"

"আমার ভারি ইচ্ছে বিনয় বাবুর সঙ্গে শোভার বিয়ে দিই।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একটু চিন্তা ক'রে সন্তোষ বল্‌লে, "একি শুধু তোমারই ইচ্ছে, না আর কারো ইচ্ছের সঙ্গে তোমার ইচ্ছের যোগ হয়েচে ?"

মৃদু হেসে শৈলজা বল্‌লে, "না, শুধু আমারই ইচ্ছে নয়।"

"বিনয় বাবুর ইচ্ছে আছে ত' ?"

শৈলজা বল্‌লে, "তা থাক্‌লে আর ভাবনা ছিল কি।"

সবিস্ময়ে সন্তোষ বল্‌লে, "নেই ? আশ্চর্য্য!"

"আচ্ছা, তুমি বাইরে গিয়ে বোসো ফস্তদা, আমি চল্লাম তোমাদের চায়ের ব্যবস্থা করতে।" ব'লে শৈলজা প্রস্থান করলে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিনয়, সুকুমার, শৈলজা এবং শোভাকে নিমন্ত্রণ ক'রে একেবারে তাদের সঙ্গে নিয়ে দ্বিজনাথ বাড়ি ফিরলেন।

(ক্রমশঃ)

খোদা

[রুমী]

সোহানী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী

শুন গো সুজনে,　　সারাটি ভুবনে

না হয় যাঁহার স্থান,

ভক্ত নয়নে　　কমল শয়নে

সে খোদা বিরাজমান।

রুমীর মূল ফার্সী হইতে

পুস্তক-সমালোচনা

Life and Times of C. R. Das,—Being a Personal Memoir of the late Deshabandhu Chitta Ranjan and a complete outline of the History of Bengal for the first quarter of the Twentieth Century.—By Prithwis Chandra Roy.—Oxford University Pressকর্তৃক প্রকাশিত। অতএব ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর। বিলাতে ছাপা, সুতরাং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দের নামে অনেকগুলি ছাপার ভুল চোখে পড়িল। ৩১৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখকের নাম সংবাদপত্রসেবী মহলে অজ্ঞাত নহে। রাজনৈতিক মহলেও তাঁহার কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বে পুস্তকখানির যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করিব স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি।

দেশবন্ধু সম্বন্ধে সকল কথা ধীরভাবে বলিবার এখনও সময় আসে নাই। চিত্তরঞ্জনের জীবনের শেষ কয়বৎসরের ইতিহাস বাঙ্গালার তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস। তাহা এক্ষণে এত আধুনিক যে সকল কথা নিরপেক্ষভাবে বলা বা লেখা চলে না। তাহা হইলেও যে এরূপ কোন জীবনী বা সাময়িক ইতিবৃত্ত লেখার সার্থকতা নাই তাহা নহে। নামেই প্রকাশ হয় গ্রন্থখানি মাত্র চিত্তরঞ্জনের জীবনী নহে—তাঁহার সমকালীন যুগের ইতিহাসও বটে। সুতরাং ইহাতে চিত্তরঞ্জনের নিজের কথা অপেক্ষা ষাট বৎসরের বিশেষতঃ স্বদেশীযুগের পরবর্ত্তী বাঙ্গালার ইতিহাসই অধিক বলা হইয়াছে। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বুঝিতে হইলে এ ইতিহাস অনেকাংশে অপরিহার্য্য। কিন্তু গ্রন্থকার সর্ব্বত্র সমতারক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। তিনি স্থানে স্থানে নানা অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া মূল বর্ণিতব্য বিষয় হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিষয় যাহা আরও বিশদভাবে ফুটাইয়া তোলার প্রয়োজন ছিল তাঁহার দৃষ্টি হয় একেবারেই ছাড়াইয়া গিয়াছে বা উল্লেখমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে মতবিচ্যুতি আছে। গ্রন্থকারের সহিত সকলেই যে একমত হইবেন বা তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইবেন এ আশা করা বৃথা। লেখক নিজেও স্বীয় মতগুলিকে উপযুক্তরূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন নাই। সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে বড় দেখাইতে হইলে অপর পাঁচজনকে যে ছোট করিতে হইবে এই প্রথাটাই নিন্দার। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আলোচ্য গ্রন্থও এ দোষ হইতে সম্যকরূপে মুক্ত নহে। লেখক রবীন্দ্রবাবু, ৺সুরেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে সকল স্থানে সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৫৩ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অনেকাংশে ঠিক নহে।

১৫৩-৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর Passive resistance সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে সত্য নহে। ঐ অংশ পড়িলে ধারণা জন্মায় ১৯১৪ সালে জেনারেল স্মাটসের সহিত সর্ত্ত স্থাপনের পর ভারতবর্ষে Passive resistance-এর প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই গান্ধি এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিবার পর ১৯১৯ সালে রৌলট্ আন্দোলনে তাঁহার জীবনের সুযোগ পাইয়া তিনি তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই!

লেখক পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথের প্রতিও সুবিচার করিতে পারেন নাই। সমস্ত পুস্তকখানি ব্যাপিয়াই তাঁহার প্রতি একটা যেন অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়।

বইখানি বোধহয় লেখক একটু শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লিখিবার পর ও প্রকাশের পূর্ব্বে বোধহয় উপযুক্তরূপ সংশোধন করেন নাই। অধ্যায়-সন্নিবেশও সর্ব্বত্র শোভন হয় নাই। সুধু একটা দৃষ্টান্ত দিই। লেখক তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা ও প্রথম জীবনের কথা বলিয়াছেন এবং পঞ্চম অধ্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের

ইতিহাস দিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁহার কবি-জীবনের ও কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থাননির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মনে হয় এ অধ্যায়টী উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। একেবারে শেষকালে ৺ দেশবন্ধুর অবদান, ব্যর্থতা ও অসমাপ্ত স্বপ্নের (২৭ অধ্যায়) পর দিলেই ভাল হইত। সমগ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া সুধু এই কথাই মনে জাগে it lacks a thorough resetting। মনে হয় যথোপযুক্ত পরিবর্জ্জন বা পুনর্লেখনের ফলে এইখানি বাঙ্গালার একটি উৎকৃষ্ট সাময়িক ইতিহাস এবং সুরেন্দ্রনাথের A Nation in the Makingএর companion volume হইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থকারের পরলোকগমনের ফলে তাহা আর এক্ষণে সম্ভব নহে।

এ সকল সত্ত্বেও গ্রন্থখানির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। দেশবন্ধুর কথা যিনি আমাদের যত শুনাইতে পারেন তিনি ততই ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থখানিতে ভাবিবার ও আলোচনা করিবার যথেষ্ট বিষয় আছে।

অবরুদ্ধা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত "ক্যাপটিভ লেডী" নামক ইংরাজি গ্রন্থ হইতে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। মূল্য আট আনা।

কবিবরের ইহাই সর্ব্বপ্রথম রচনা। তখনও তিনি মাতৃভাষায় লিখিবার প্রয়াস করেন নাই। যৌবনের প্রথম অবস্থায় মাদ্রাজে অবস্থানকালে যখন তিনি ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন সেই সময়ে এই কাব্যখানি রচনা করেন। গ্রন্থখানি রাজকুমারী সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তৎকালীন ইংরাজি সাময়িক পত্রগুলিতে বইখানির যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বাঙালী পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদর পায় নাই। ইংরাজি অনভিজ্ঞ অনেকের কাছেই বইখানির অস্তিত্ব অবিদিত। অতুল বাবু বইখানির অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠক মণ্ডলীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও ছন্দগুলি অতি সুললিত। আশা করি বইখানি কাব্য-রসিকগণের নিকট যথোপযুক্ত আদর পাইবে।

চা-পান না বিষ-পান ?—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত। বাংলা দেশে জনসাধারণের মধ্যে কি প্রকারে চা পান প্রবর্ত্তিত হয় এবং অত্যধিক চা পানের অপকারিতা আলোচনা করিয়া পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে। এই প্রকারের পুস্তক জনসাধারণের মধ্যে যতই প্রচারিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, এ, বিরচিত। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী। "আদি ব্রাহ্মসমাজ" যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

বইখানি আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-কথার সহিত গ্রন্থকার তাঁহার রচিত নাটক ও প্রহসনগুলির আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন নিপুণ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, বইখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতে হয়। সঙ্গীত সাহিত্য ও নাট্যকলার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরাগের কথা অনেকেই জানেন কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধ ও স্বদেশসেবার একনিষ্ঠতার কথা বর্ত্তমান যুগে অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। গ্রন্থকার এই বিষয়েও নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠাদ্বারা দেশের উন্নতিসাধনকল্পে একদিন তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। স্বদেশী জাহাজ পরিচালনার কার্য্যে এক সময়ে তিনি মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালীর প্রথম ষ্টীমার "সরোজিনী" ও তাহার পরে "বঙ্গলক্ষ্মী" "স্বদেশী" "ভারত" ইত্যাদি আরও কয়েকখানি ষ্টীমার একসময়ে খুলনা বরিশালের মধ্যে যাত্রী লইয়া নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিত এবং সময়ে সময়ে কলিকাতাতেও বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া আসিত। এই ষ্টীমার পরিচালনার কার্য্যে এক য়ুরোপীয় কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহা দ্বারা বাঙ্গালীর মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকার এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে পড়িয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।

পুস্তকখানিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার আত্মীয় ও তাঁহার কার্য্যাবলীর সহিত যাঁহাদের বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁহাদের হাফটোন চিত্র দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে তাঁহার অঙ্কিত কয়েকখানি রেখা-চিত্রের প্রতিলিপি সংযোজিত করিয়া বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইয়াছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বইখানি সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিবে।

কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ এম, এ, বিরচিত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

আধুনিক যুগে কিশোরীচাঁদের কথা অনেকেই জানেন না। কিন্তু বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে কিশোরীচাঁদ প্রমুখ কতিপয় কর্ম্মবীরের দ্বারা বাংলাদেশের তথা সমুদয় ভারতবর্ষের কত দিকে কত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল গ্রন্থকার এই বইখানিতে সেই সকল বিষয় বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিশোরীচাঁদের জীবনের ঘটনাবলীর সহিত তৎকালীন বঙ্গসমাজের পরিচয় গ্রন্থকার এমন নিপুণভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া গ্রন্থকারের অসাধারণ ক্ষমতার ও সত্যানুরাগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ির জীবনীর পর বাংলা ভাষায় এই প্রকারের জীবনী পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। অনেক পুরাতন কথা যাহা এখন বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে সেই সকল তথ্য গ্রন্থকার অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার এই অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার জন্য বাংলাদেশ তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে। বইখানিতে অনেকগুলি হাফটোন চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি, ইহাতে বাংলাদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

নানাকথা

মাতৃজাতি সেবক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতায় (১) জাতীয় জীবন-গঠনে নারীশক্তির প্রয়োজনীয়তা ও (২) দ্রৌপদী চরিত্র সমালোচনা এই দুইটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখিকাদ্বয়কে দুইখানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রতিযোগিতা কেবল মাত্র মহিলাদিগের জন্য। যে কোন মহিলা প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণাশক্তির পরিচয় থাকা চাই। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৩৩৫ সালের ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। শ্রীশ্যামাচরণ বসাক সম্পাদক—প্রচার বিভাগ—মাতৃজাতি সেবক সমিতি ৬০ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

* * *

'বিচিত্রা'র লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "নববৃন্দাবন" নামক একটি গল্প, যাহা গত বৈশাখ মাসে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল, "ইণ্ডিয়ান ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানী" কর্ত্তৃক গত মাসে পঠিত হইয়াছে। বিভূতি বাবুর গল্পটি শুনিয়া সাধারণে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

* * *

বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্ষার আয়োজন" নামক কবিতার রচয়িত্রী শ্রীমতী মৈত্রেয়ীর বয়ক্রম মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর। উক্ত কবিতাটি হইতেই পাঠকগণ এই বালিকা-কবির কবি-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। আমরা ভবিষ্যতে এই লেখিকার আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত করিব।

* * *

আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে বিচিত্রা প্রতি মাসে মাসের মধ্যভাগে প্রকাশিত হইবে।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta.
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

শরৎ

শিল্পী—শ্রীসুকুমার দেউস্কর, শান্তিনিকেতন

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৪ | চতুর্থ সংখ্যা

ময়ূর

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর, করোনি মোরে ভয়,
সেই গর্ব্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
বনে উঠিছে কচি পাতা,
হোথায় দূরের থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে,—
হেরি' তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি';
বোঝোনা, লেখনী ধরি'
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি'॥

সেই ভালো, ভালো যদি তাই,

তাহে মোর কোনো খেদ নাই।

তবু আমি তুমি আছি,

আজো তুমি কাছাকাছি,

মোরে দেখে নাহি করো ত্রাস।

যদিও মানব, তবু

আমারে করো না কভু

দানব বলিয়া অবিশ্বাস।

সুন্দরের দূত তুমি,

এ ধূলির মর্ত্ত্যভূমি,

স্বর্গের প্রসাদ হেথা আনো,

তবুও ধরি না তোরে,

বাঁধি না পিঞ্জরে ধরে',

এও কি আশ্চর্য্য নাহি মানো ॥

মঞ্জুষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাননের এই এক কোনায়,—
হেথায় তোমার আনাগোনা।
চামেলি-বিতানতল
মোর বসিবার স্থল,
দিন যবে অবসান হয়।
হেথা আসো কী যে ভাবি;
মোর চেয়ে তোর দাবী
বেশি বই কম কিছু নয়।
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।
কাঁচি পাতা যে বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে
তোমার তেমনি অধিকার॥

বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি' লাগি পাছে পাই লাজ,
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীত চিত্র করি।
আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।
ধরায় যেখানে, তাই,
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারো ঠাঁই হয়।
সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব্ব লাগে,
মোরে তুমি করো নাই ভয়॥

ময়ূর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার আমার তরে কোন
ময়ূরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
না, —
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনার।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
তুই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার
তুমি যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আসো যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার ॥

নাশ করে যে আগ্নেয়বাণ
মুহূর্তে অমূল্য তোর প্রাণ —
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় নি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।
যে-বসন্ত প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে-বসন্ত নহে তার তরে।
ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠি বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
কুটিল সংশয় অন্ধকার॥

সৃষ্টিছাড়া এই যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে,—
তার লজ্জা তুই কিরে
আনিতে পারিবি মোর মনে?
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্য্যেরে দেয় ব্যথা
কেন যে তা বুঝিবি কেমনে?
কেন যে হৃদয়ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে হস্ত দানেরি তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিল জনার॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরদেশী *

এসেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখী আমার বনে,
সকাল সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।

অজানা এই সাগর পারে
হ'ল না তার মনের ক্ষতি।

সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে,
বিদেশী পাখী গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে॥

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,
বন-জামেরে চঞ্চু তার
অচেনা ব'লে দোষী না করে।
শরতে যবে শিশির বায়ে
উচ্ছ্বসিত শিউলি-বীথি
বাণীরে তার করেনা ম্লান
কুহেলি-ঘন পুরানো স্মৃতি।

* পরলোকগত পিয়র্সন্ সাহেব কয়েক জোড়া বিদেশী পাখী শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাদেরি একটির উদ্দেশে।

পরদেশী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধু-কাঙালী লোভীর মেলা,
চির মধুর সুর মতো
সে ফুল তব হৃদয় হরে ॥

বেণুবনের আগের ডালে
চপল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখীর সাথে
পরাণে তব ভেদ কি আছে?
উত্তর ছোঁওয়া জানায় ওরে
ছাতিম শাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে-ছবি জাগে
মানুষ তারে প্রবাস বলে।

আলোকে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চির-জানাজানি লীলা,
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে নাচে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ বৈশাখ ১৩৩৪

তিনপুরুষ
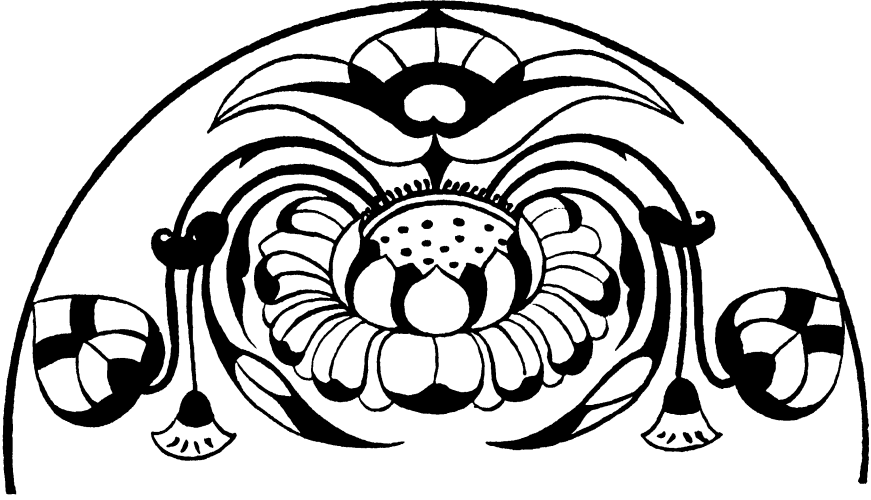
—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হোলো বত্রিশ। ভোর থেকে আস্‌চে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।

গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্ব্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো।

এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান করলে দেখা যায় ঘোষালরা এক সময়ে ছিল সুন্দরবনের দিকে, তার পরে হুগলী জেলায় নূরনগরে। সেটা বাহির থেকে পর্টুগীজদের তাড়ায়, না ভিতর থেকে সমাজের ঠেলায় ঠিক জানা নেই। মরীয়া হ'য়ে যারা পুরাণো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার শক্তিও তাদের। তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের সুরুতেই দেখি প্রচুর ওদের জমি-জমা, গোরু-বাছুর, জন-মজুর, পাল-পার্ব্বণ, আদায়-বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দীঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্চে। আজ সে দীঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্জে জমিদারের। কি ক'রে একদিন ওদের পৈতৃক মহিমা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল সেটা জানা দরকার।

এদের ইতিহাসের মধ্যম পরিচ্ছেদে দেখা যায় খিটিমিটি বেধেছে চাটুজ্জে জমিদারদের সঙ্গে। এবার বিষয় নিয়ে নয়, দেবতার পূজো নিয়ে। ঘোষালরা স্পর্দ্ধা ক'রে চাটুজ্জেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল। চাটুজ্জেরা তার জবাব দিলে। রাতারাতি বিসর্জ্জনের রাস্তার মাঝে মাঝে এমন মাপে তোরণ বসালে যাতে ক'রে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা যায় ঠেকে। উঁচু প্রতিমার দল তোরণ ভাঙ্‌তে বেরোয়, নীচু প্রতিমার

দল তাদের মাথা ভাঙ্‌তে ছোটে। ফলে, দেবী সে-বার বাঁধা বরাদ্দর চেয়ে অনেক বেশি রক্ত আদায় করেছিলেন। খুন-জখম থেকে মামলা উঠ্‌লো। সে মামলা থাম্‌ল ঘোষালদের সর্ব্বনাশের কিনারায় এসে।

আগুন নিব্‌ল, কাঠও বাকি রইল না, সবই হোলো ছাই। চাটুজ্জেদেরও বাস্তুলক্ষ্মীর মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। দায়ে প'ড়ে সন্ধি হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে শান্তি হয় না। যে-ব্যক্তি খাড়া আছে, আর যে-ব্যক্তি কাৎ হ'য়ে পড়েচে—দুই পক্ষেরই ভিতরটা তখনো গর্‌গর্‌ কর্‌চে। চাটুজ্জেরা ঘোষালদের উপর শেষ কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে ওরা ছিলো ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েচে, কেঁচো সেজেচে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে, টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্নপাড়াতেও তাদের এই অপকীর্ত্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকী জুট্‌ল। কলঙ্ক-ভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয়বার ছাড়লো ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্য-ভাবে বাসা বাঁধ্‌লে।

যারা মারে তা'রা ভোলে, যারা মার খায় তা'রা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে খ'সে পড়ে ব'লেই লাঠি তা'রা মনে মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চ'লে আস্‌চে। মাঝে মাঝে চাটুজ্জেদের কেমন ক'রে ওরা জব্দ ক'রেছিল সত্যে মিথ্যে মিশিয়ে সে সব গল্প ওদের ঘরে এখনো অনেক জমা হ'য়ে আছে। খোড়ো চালের ঘরে আষাঢ় সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা সেগুলো হাঁ ক'রে শোনে। চাটুজ্জেদের বিখ্যাত দাশু সর্দ্দার রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বিশ-পঁচিশজন লাঠিয়াল তা'কে ধ'রে এনে ঘোষালদের কাছারীতে কেমন ক'রে বেমালুম বিলুপ্ত ক'রে দিলে সে গল্প আজ একশো বছর ধ'রে ঘোষালদের ঘরে চ'লে আস্‌চে। পুলিশ যখন থানা-তল্লাসী কর্‌তে এল নায়েব ভুবন বিশ্বাস অনায়াসে বল্‌লে, হাঁ, সে কাছারীতে এসেছিল তার নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও করেচি, শুনলেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে। হাকিমের সন্দেহ গেল না। ভুবন বল্‌লে, হুজুর এই বছরের মধ্যে যদি তার ঠিকানা বের ক'রে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়। কোথা থেকে দাশুর মাপের এক গুণ্ডা খুঁজে বার কর্‌লে—একেবারে তাকে পাঠালে ঢাকায়। সে কর্‌লে ঘটি চুরি, পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। হোলো একমাসের জেল। যে তারিখে ছাড়া পেয়েচে ভুবন সেইদিন ম্যাজেষ্টেরীতে খবর দিলে দাশু সর্দ্দার ঢাকার জেলখানায়। তদন্তে বেরোলো দাশু জেলখানায় ছিল বটে, তার গায়ের দোলাইখানা জেলের বাইরের মাঠে ফেলে চ'লে গেছে। প্রমাণ হোলো সে দোলাই সর্দ্দারেরই। তারপর সে কোথায় গেল সে খবর দেওয়ার দায় ভুবনের নয়।

এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্ত্তমানের সাবেক কালের চেক। গৌরবের দিন গেছে; তাই গৌরবের পুরাতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ব'লে এত বেশি আওয়াজ করে।

যা হোক্‌, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময়ে রাতও পোহায়। ঘোষাল পরিবারে সূর্য্যোদয় দেখা দিল অবিনাশের বাপ মধুসূদনের জোর কপালে।

২

মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়ৎ-দারদের মুহুরি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সংসার চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা খাড়ু, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা খুব মোটা পৈতে। ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদার প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পৈতেটা হয়েছিল প্রমাণসই।

মফঃস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, পাটের গাঁটের উপর চ'ড়ে ব'সে। যাচনদার, খরিদদার, গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সার-বাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁঠ-বাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সর্ষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড় বড় তৌল দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।

বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুতিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুল মাষ্টারী থেকে মোক্তারী ওকালতী পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের যে-কয়টা মোক্ষ-তীর্থ তার কোনো না কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্য্যন্তই লিপ্‌পে-গাড়ি হ'য়ে রইল। তারা কেউ বা আড়ৎদারের কেউ বা তালুকদারের দফ্‌তরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে ব'সে গেল। আনন্দ ঘোষালের ক্ষীণ সর্ব্বস্বের উপর ভর ক'রে মধুসূদন বাসা নিলে কলকাতার মেসে।

অধ্যাপকেরা আশা করেছিল পরীক্ষায় এ ছেলে কলেজের নাম রাখবে। এমন সময় বাপ গেল মারা। পড়বার বই, মায় নোট-বই সমেত, বিক্রি ক'রে মধু পণ ক'রে বস্‌ল এবার সে রোজগার কর্‌বে। ছাত্র-মহলে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বই বিক্রি ক'রে ব্যবসা হোলো সুরু। মা কেঁদে মরে—বড় তার আশা ছিল, পরীক্ষা পাশের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুক্‌বে "ভদ্দোর" শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে, তার পরে ঘোষাল বংশদণ্ডের আগায় উড়্‌বে কেরাণী-বৃত্তির জয়পতাকা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল বাছাই কর্‌তে পাকা, তেমনি তার বন্ধু বাছাই কর্‌বারও ক্ষমতা। কখনো ঠকেনি। তার প্রধান ছাত্রবন্ধু ছিল কানাই গুপ্ত। এর পূর্ব্বপুরুষেরা বড় বড় সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি-গিরি ক'রে এসেচে। বাপ নামজাদা কেরোসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

ভাগ্যক্রমে এঁরি মেয়ের বিবাহ। মধুসূদন কোমরে চাদর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাল বাঁধা, ফুলপাতায় সভা সাজানো, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে সোনার কালিতে চিঠি ছাপানো, চৌকি কার্পেট ভাড়া ক'রে আনা, গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা, গলা ভাঙ্গিয়ে পরিবেষণ, কিছুই বাদ দিলে না। এই সুযোগে এমন বিষয়-বুদ্ধি ও কাণ্ড-জ্ঞানের পরিচয় দিলে যে, রজনীবাবু ভারী খুসী। তিনি কেজো মানুষ চেনেন, বুঝ্‌লেন এ ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপজিট্ দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সীতে বসিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যের দৌড় সুরু হোলো; সেই যাত্রাপথে কেরো-সিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়্‌ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে ব্যবসা হু-হু ক'রে এগোলো গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্যোগ-পর্ব্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই বল্‌লে, "একেই বলে কপাল!" অর্থাৎ, পূর্ব্বজন্মের ইষ্টিমেতেই এ-জন্মের গাড়ি চল্‌চে। মধুসূদন নিজে জান্‌ত যে, তাকে ঠকাবার জন্যে অদৃষ্টের ত্রুটি ছিল না, কেবল হিসেবে ভুল করেনি ব'লেই জীবনের অঙ্ক-ফলে পরীক্ষ-কের কাটা দাগ পড়েনি;—যারা হিসেবের দোষে ফেল কর্‌তে মজবুৎ পরীক্ষকের পক্ষপাতের পরে তারাই কটাক্ষ-পাত ক'রে থাকে।

মধুসূদনের রাশ ভারী। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কয় না। তবে কিনা আন্দাজে বেশ বোঝা যায়, মরা গাঙে বান এসেচে। গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে, জীবিতকাল-বর্ত্তী সম্পত্তি ভোগটাকে বংশাবলীর পথ বেয়ে মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে প্রসারিত কর্‌বার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না, মধুসূদন বলে, "প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভর্‌লে তারপরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।" এর থেকে বোঝা যায় মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক পেটটা ছোটো নয়।

এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেল্‌লে, তখন দর সস্তা। ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে

এলো বড়ো বড়ো শাল কাঠ, সিলেট থেকে চূণ, কলকাতা থেকে মালগাড়ি বোঝাই করোগেটেড্ লোহা। বাজারের লোক অবাক! ভাবলে, "এই রে! হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকলো ব'লে!"

এবারো মধুসূদনের হিসেবে ভুল হোলো না। দেখ্তে দেখ্তে রজবপুরে ব্যবসার একটা আওড় লাগলো। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটলো, এলো মাড়োয়ারীর দল, কুলির আমদানী হোলো, কল বস্‌ল, চিম্‌নি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে আকাশে কালিমা বিস্তার কর্‌লে।

হিসেবের খাতার গবেষণা না ক'রেও মধুসূদনের মহিমা এখন দূর থেকে খালি চোখেই ধরা পড়ে। একা সমস্ত গঞ্জের মালিক, পাঁচীল-ঘেরা দোতলা ইমারৎ, গেটে শিলাফলকে লেখা "মধুচক্র"। এ নাম তার কলেজের পূর্ব্বতন সংস্কৃত অধ্যাপকের দেওয়া। মধুসূদনকে তিনি পূর্ব্বের চেয়ে অকস্মাৎ এখন অনেক বেশি স্নেহ করেন।

এইবার বিধবা মা ভয়ে ভয়ে এসে বল্‌লে, "বাবা, কবে ম'রে যাবো, বৌ দেখে যেতে পারবো না কি?"

মধু গম্ভীরমুখে সংক্ষেপে উত্তর কর্‌লে, "বিবাহ কর্‌তেও সময় নষ্ট, বিবাহ ক'রেও তাই। আমার ফুরসৎ কোথায়?"

পীড়াপীড়ি করে এমন সাহস ওর মায়েরও নেই, কেননা সময়ের বাজার-দর আছে। সবাই জানে মধুসূদনের এক কথা।

আরো কিছুকাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফঃস্বল থেকে কলকাতায় উঠ্‌ল। নাতি নাতনীর দর্শন-সুখ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ কর্‌লে। ঘোষাল কোম্পানীর নাম আজ দেশ-বিদেশে, ওদের ব্যবসা বনেদী বিলিতি কোম্পানীর গা ঘেঁসে চলে, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার।

মধুসূদন এবার স্বয়ং বল্‌লে, বিবাহের ফুর্‌সৎ হ'ল। কন্যার বাজারে ক্রেডিট্ তার সর্ব্বোচ্চে। অতি-বড়ো অভিমানী ঘরেরও মানভঞ্জন করবার মত তার শক্তি। চারদিক থেকে অনেক কুলবতী, রূপবতী, গুণবতী, ধনবতী, বিদ্যাবতী কুমারীদের খবর এসে পৌঁছয়। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বলে, ঐ চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়ে চাই।

ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড় ভয়ঙ্কর।

৩

এইবার কন্যাপক্ষের কথা।

নুরনগরের চাটুজ্জেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্য্যের বাঁধ ভাঙ্‌চে। ছয়-আনী সরিকরা বিষয় ভাগ ক'রে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনীর সীমানা খাব্‌লে বেড়াচ্চে। তা'ছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তী অধিকার দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ কর্‌বার চেষ্টা চল্‌চে, ততই তার শস্য অংশ স্থূলভাবে উকীল মোক্তারের আঙিনায় নয়-ছয় হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমলারাও বঞ্চিত হোলো না। নুরনগরের সে প্রতাপ নেই,—আয় নেই, ব্যয় বেড়েচে চতুর্গুণ। শতকরা ন'টাকা হারে সুদের ন'পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারীর চারদিকে জাল জড়িয়ে চলেচে।

পরিবারে দুই ভাই, পাঁচ বোন। কন্যাধিক্য অপরাধের জরিমানা এখনো শোধ হয়নি। কর্ত্তা থাক্‌তেই চার বোনের বিয়ে হ'য়ে গেলো কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের, খ্যাতিটা সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হোলো কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন' পার্শেন্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো পার্শেন্টের গ্রন্থি পড়্‌ল। ছোট ভাই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বল্‌লে, বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসি, রোজগার না কর্‌লে চল্‌বে না। সে গেল বিলেতে, বড়ো ভাই বিপ্রদাসের ঘাড়ে পড়্‌ল সংসারের ভার।

এই সময়টাতে পূর্ব্বোক্ত ঘোষাল ও চাটুজ্জেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর একবার বেধে গেল। ইতিহাসটা বলি।

বড়বাজারের তনসুকদাস হাল্‌ওয়াইদের কাছে এদের একটা মোটা অঙ্কের দেনা। নিয়মিত সুদ দিয়ে আস্‌চে, কোনো কথা ওঠেনি। এমন সময়ে পূজোর ছুটিতে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপ্রদাসের সহপাঠী অমূল্যধন এলো আত্মীয়তা দেখাতে। সে হোলো বড় এটর্ণি আপিসের আর্টিকেল্ড্ হেডক্লার্ক। এই চশমা-পরা যুবকটি নুরনগরের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সেও কলকাতায় ফিরল আর তনসুকদাসও টাকা ফেরৎ চেয়ে বস্‌ল; বল্‌লে, নতুন চিনির কারবার খুলেছে, টাকার জরুরী দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

সেই সঙ্কটকালেই চাটুজ্জে ও ঘোষাল এই দুই নামে দ্বিতীয়বার ঘট্‌ল দ্বন্দ্বসমাস। তার পূর্ব্বেই সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজখেতাব পেয়েচে। পূর্ব্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে বল্‌লে, নতুন রাজা খোষ-মেজাজে আছে, এই সময়ে ওর কাছ থেকে সুবিধে মতো ধার পাওয়া যেতে পারে। তাই পাওয়া গেল,—চাটুজ্জেদের সমস্ত খুচরো দেনা একঠাঁই ক'রে এগারো লাখ টাকা সাত পার্সেণ্ট্ সুদে। বিপ্রদাস হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

কুমুদিনী ওদের শেষ অবশিষ্ট বোন্ বটে, তেম্‌নি আজ ওদের সম্বলেরও শেষ অবশিষ্ট দশা। পণ জোটানোর, পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা কর্‌তে গেলে আতঙ্ক হয়। দেখ্‌তে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক্ একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রং শাঁখের মতো চিকণ গৌর; নিটোল দু'খানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হ'য়ে গ্রহণ কর্‌তে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব।

কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সঙ্কুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হোলো না। যখন থেকে ওর বোঝ্‌বার বয়স হ'য়েচে তখন থেকে চারিদিকে দেখ্‌চে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো দশা, জগদ্দল পাথর, তার যত বড়ো দুঃখ, তত বড়ো অপমান। কিছু করবার নেই কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি। অসম্ভব একটা কিছু ঘটেনা কি? কোনো দেবতার বর, কোনো যক্ষের ধন, পূর্ব্বজন্মের কোনো একটা বাকি-পড়া পাওনার এক মুহূর্ত্তে পরিশোধ? এক একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্ম্মরিত ঝাউগাছগুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে মনে বলে, "কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার ধন মাণিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হ'য়ে থাক্‌ব।"

বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালোবাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালোবাসা। কুমুর পরে তাদের কর্ত্তব্য করতে পারচে না ব'লে ওর ভাইরাও বড়ো ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেচে। এই পিতৃমাতৃহীনাকে উপরওয়ালা যে-স্নেহের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেচেন ভাইরা তা ভরিয়ে দেবার জন্যে সর্ব্বদা উৎসুক। ও যে চাঁদের আলোর টুক্‌রো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর ক'রে রেখেচে। যখন মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যের বাহন ব'লে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়, দাদা বিপ্রদাস হেসে বলে, "কুমু, তুই নিজেই তো আমাদের সৌভাগ্য,—তোকে না পেলে বাড়িতে শ্রী থাক্‌তো কোথায়?"

কুমুদিনী ঘরে পড়াশুনো করেচে। বাইরের পরিচয় নেই বল্‌লেই হয়। পুরোণো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস। তার জগৎটা আব্‌ছায়া;—সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখ্‌তে নেই; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়; অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে; মন্ত্র প'ড়ে, পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগা তাবিজ প'রে, সে জগতের শুভ অশুভের সঙ্গে কারবার; স্বস্ত্যয়নের জোরে ভাগ্য সংশোধনের আশা;—সে আশা হাজার বার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায় অনেক সময়েই শুভ লগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই

প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসঙ্গতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, ভালোমন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই ব'লেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা। ও জানে বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হোলো সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত সে নিজের ব'লেই গ্রহণ করেছিল—সে তার পিতার মৃত্যু নিয়ে।

৪

পুরোণো ধনী ঘরে পুরাতন কাল যে-দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হ'য়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুক্‌তে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছতে তাদের বিস্তর লেট্ হ'য়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরণে চুনট করা ফুর্‌ফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙ্গা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্ত্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্ত্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্বর্ত্তী, দ্বারের কাছে সর্ব্বদা হাজির তক্‌মাপরা আরদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাকমাখা ও সিদ্ধি-কোটার অবকাশে বেঞ্চে ব'সে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ ক'রে বারবার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানারকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরাণো বন্দুক, বল্লম, বর্ষা।

বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নীচে, সামনে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে এদের কার সম্মান কোন্ রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়, বাঁধানো, আবাঁধানো, —না, গুড়গুড়ি। কর্ত্তা মহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপজলের গন্ধে সুগন্ধী।

বাড়ির আরেক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালো-দাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিল্‌টি-করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওয়ালা পরীমূর্ত্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়া-পিঠওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়-লণ্ঠন সমস্তই হল্যাণ্ড-কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্ব্ব-পুরুষদের অয়েল-পেন্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু'একজন রাজপুরুষের ছবি। ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টক্‌টকে কড়া রঙে আঁকা। বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম্মে জিলার সাহেব-সুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষ্যে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয় এইটেই সব চেয়ে প্রাচীন ভূতে-পাওয়া কামরা, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম্-আটকানো দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কবঞ্চিত বোবা।

মুকুন্দলালের যে-সৌখীনতা সেটা তখনকার আদব-কায়দার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তার মধ্যে যে-নির্ভীক ব্যয়-বাহুল্য, সেইটেতেই ধনের মর্য্যাদা। অর্থাৎ ধন বোঝা হ'য়ে মাথায় চড়েনি, পাদপীঠ হ'য়ে আছে পায়ের তলায়। এঁদের সৌখীনতার আম-দরবারে দান-দাক্ষিণ্য, খাস-দরবারে ভোগবিলাস,—দুইই খুব টানা মাপের। একদিকে আশ্রিত বাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর একদিকে ঔদ্ধত্যদমনে তেম্‌নি অবাধ অধৈর্য্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্ত্তার বাগানের মালীর ছেলের কান ম'লে দিয়েছিল মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান বাবদ যত খরচ হয়েচে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার করতেও এখনকার দিনে এত খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকেও অগ্রাহ্য করেন নি। চাব্‌কিয়ে তাকে শয্যা-গত করেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হয়েছিল ব'লে ছেলেটার উন্নতি হ'ল। সরকারী খরচে পড়াশুনো ক'রে সে আজ মোক্তারি করে।

পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথা মতো মুকুন্দলালের জীবন দুই মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর এক মহলে ইয়ার্কি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম্ম, আর এক মহলে একাদশ অকর্ম্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা-অর্চনা, অতিথি-সেবা, পাল-পার্ব্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালী-বিদায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, পাড়া-পড়শী, গুরু-পুরোহিত। ইয়ারমহল গৃহসীমার বাইরেই, সেখানে নবাবী আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম। এইখানে আনাগোনা চল্‌ত গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবৎ শিক্ষার উপায় ব'লে গণ্য কর্‌ত। দুই বিরুদ্ধ হাওয়ার দুই কক্ষবর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য কর্‌তে হয়।

মুকুন্দলালের স্ত্রী নন্দরাণী অভিমানিনী, সহ্য করাটা তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যাস হোলো না। তার কারণ ছিল্। তিনি নিশ্চিত জানেন বাইরের দিকে তাঁর স্বামীর তানের দৌড় যতদূরই থাক্ তিনিই হচ্চেন ধুয়ো. ভিতরের শক্ত টান তাঁরই দিকে। সেই জন্যেই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না। এবারে তাই ঘট্‌লো।

৫

রাসের সময় খুব ধুম। কতক কলকাতা কতক ঢাকা থেকে আমোদের সরঞ্জাম এলো। বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণ-যাত্রা, কোনোদিন বা কীর্ত্তন। এইখানে মেয়েদের ও সাধারণ পাড়াপড়্‌শির ভিড়। অন্যবারে তামসিক আয়োজনটা হ'ত বৈঠকখানা ঘরে; অন্তঃপুরিকারা, রাতে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা বিঁধ্‌চে, দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু আভাস নিয়ে যেতে পারতেন। এবারে খেয়াল গেল বাইনাচের ব্যবস্থা হবে বজরায় নদীর উপর।

কি হচ্চে দেখবার জো নেই ব'লে নন্দরাণীর মন রুদ্ধ-বাণীর অন্ধকারে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। ঘরে কাজকর্ম্ম, লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো দেখাশুনো হাসিমুখেই কর্‌তে হয়। বুকের মধ্যে কাঁটাটা নড়্‌তে চড়্‌তে কেবলি বেঁধে, প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, কেউ জান্‌তে পারে না। ও-দিকে থেকে থেকে তৃপ্ত কণ্ঠের রব ওঠে, জয় হোক্ রাণীমার।

অবশেষে উৎসবের মেয়াদ ফুরোলো, বাড়ি হ'য়ে গেলো খালি। কেবল ছেঁড়া কলাপাতা ও সরা খুরি ভাঁড়ের ভগ্নশেষের উপর কাক কুকুরের কলরব-মুখর উত্তর-কাণ্ড চল্‌চে। ফরাসেরা সিঁড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিলো, চাঁদোয়া নামালো, ঝাড়ের টুক্‌রো বাতি ও শোলার ফুলের ঝালরগুলো নিয়ে পাড়ার ছেলেরা কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিলো। সেই ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে চড়ের আওয়াজ ও চীৎকার কান্না যেন তারস্বরের হাউইয়ের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠ্‌চে। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী; সেখানে সর্ব্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ ও মলিনতা। এই শূন্যতা অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল যখন মুকুন্দলাল আজও ফিরলেন না। নাগাল পাবার উপায় নেই ব'লেই নন্দরাণীর ধৈর্য্যের বাঁধ হঠাৎ ফেটে খান্ খান্ হ'য়ে গেলো।

দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পর্দ্দার আড়াল থেকে বল্‌লেন,—"কর্ত্তাকে বল্‌বেন, বৃন্দাবনে মার কাছে আমাকে এখনি যেতে হচ্চে। তাঁর শরীর ভালো নেই।"

দেওয়ানজি কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লেন,—"কর্ত্তাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হ'ত, মা ঠাকরুণ। আজকালের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন খবর পেয়েচি।"

"না, দেরী কর্‌তে পারব না।"

নন্দরাণীও খবর পেয়েছেন আজকালের মধ্যেই ফের্‌বার কথা। সেই জন্যেই যাবার এত তাড়া। নিশ্চয় জানেন, অল্প একটু কান্নাকাটি সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হ'য়ে যাবে। প্রতিবারই এমনি হয়েচে। উপযুক্ত শাস্তি অসমাপ্তই থাকে। এবারে তা কিছুতেই চল্‌বে না। তাই দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই দণ্ডদাতাকে পালাতে হচ্চে। বিদায়ের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পা সর্‌তে চায় না—শোবার খাটের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কান্না। কিন্তু যাওয়া বন্ধ হোলো না।

তখন কার্ত্তিক মাসের বেলা দুটো। রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত। রাস্তার ধারের সিসু তরুশ্রেণীর মর্ম্মরের সঙ্গে মিশে ক্বচিৎ গলা-ভাঙা কোকিলের ডাক আস্‌চে। যে রাস্তা দিয়ে পাল্কী চলেচে, সেখান থেকে কাঁচা ধানের ক্ষেতের পরপ্রান্তে নদী দেখা যায়। নন্দরাণী থাকতে পারলেন না, পাল্কীর দরজা ফাঁক ক'রে সেদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। ওপারের চরে বজ্‌রা বাঁধা আছে, চোখে পড়্‌ল। মাস্তুলের উপর নিশেন উড়্‌চে। দুর থেকে মনে হোলো, বজ্‌রার ছাতের উপর চিরপরিচিত গুপি হরকরা ব'সে; তার পাগড়ির তক্‌মার উপর সূর্য্যের আলো ঝক্‌মক্‌ কর্‌চে। সবলে পাল্কীর দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, বুকের ভিতরটা পাথর হ'য়ে গেলো।

৬

মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড় লাগা জাহাজ, সসঙ্কোচে বন্দরে এসে ভিড়্‌লেন। অপরাধের বোঝায় বুক ভারী। প্রমোদের স্মৃতিটা যেন অতি-ভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো মনটাকে বিতৃষ্ণায় ভ'রে দিয়েছে। যারা ছিল তাঁর এই আমোদের উৎসাহ-দাতা উদ্যোগকর্ত্তা, তারা যদি সাম্‌নে থাকৃত তাহ'লে তাদের ধ'রে চাবুক কষিয়ে দিতে পারতেন। মনে মনে পণ কর্‌চেন আর কখনো এমন হ'তে দেবেন না। তাঁর আলুথালু চুল, রক্তবর্ণ চোখ আর মুখের অতি শুষ্কভাব দেখে প্রথমটা কেউ সাহস ক'রে কর্ত্রীঠাকুরুণের খবরটা দিতে পারলেন না, মুকুন্দলাল ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। "বড় বৌ, মাপ করো, অপরাধ করেছি, আর কখনো এমন হবে না" এই কথা মনে মনে বল্‌তে বল্‌তে শোবার ঘরের দরজার কাছে একটুখানি থম্‌কে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলেন। মনে মনে নিশ্চয় স্থির করেছিলেন যে অভিমানিনী বিছানায় প'ড়ে আছেন। একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে পড়বেন এই ভেবে ঘরে ঢুকেই দেখ্‌লেন ঘর শূন্য। বুকের ভিতরটা দ'মে গেল। শোবার ঘরে বিছানায় নন্দরাণীকে যদি দেখ্‌তেন তবে বুঝ্‌তেন যে, অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যে মানিনী অর্দ্ধেক রাস্তা এগিয়ে আছেন। কিন্তু বড়-বৌ যখন শোবার ঘরে নেই তখন মুকুন্দলাল বুঝ্‌লেন তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা হবে দীর্ঘ এবং কঠিন। হয় তো আজ রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে, কিম্বা হবে আরো দেরী। কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সম্পূর্ণ শাস্তি এখনি মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমা আদায় করবেন, নইলে জলগ্রহণ করবেন না। বেলা হয়েছে, এখনো স্নানাহার হয়নি, এ দেখে কি সাধ্বী থাকৃতে পারবেন? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেন, প্যারী দাসী বারান্দার এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর বড়ো বৌমা কোথায়?"

সে বল্‌লে, "তিনি তাঁর মাকে দেখ্‌তে পরশুদিন বৃন্দাবনে গেছেন।"

ভালো যেন বুঝ্‌তে পারলেন না, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গেছেন?"

"বৃন্দাবনে। মায়ের অসুখ।"

মুকুন্দলাল একবার বারান্দায় রেলিং চেপে ধ'রে দাঁড়ালেন। তারপরে দ্রুতপদে বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে একা ব'সে রইলেন। একটি কথা কইলেন না। কাছে আস্‌তে কারো সাহস হয় না।

দেওয়ানজি এসে ভয়ে ভয়ে বল্‌লেন, "মাঠাকুরুণকে আন্‌তে লোক পাঠিয়ে দিই?"

কোনো কথা না ব'লে কেবল আঙুল নেড়ে নিষেধ করলেন। দেওয়ানজি চ'লে গেলে রাধু খানসামাকে ডেকে বল্‌লেন, "ব্র্যাণ্ডি লে আও!"

বাড়িশুদ্ধ লোক হতবুদ্ধি। ভূমিকম্প যখন পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন যেমন তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করা মিছে, নিরুপায়ভাবে তার ভাঙা-চোরা সহ্য করতেই হয়,—এ-ও তেমনি।

দিনরাত চল্‌চে নির্জ্জল ব্র্যাণ্ডি। খাওয়া-দাওয়া প্রায় নেই। একে শরীর পূর্ব্ব থেকেই ছিল অবসন্ন, তারপরে এই প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন দেখা দিলো।

কলকাতা থেকে ডাক্তার এলো,—দিনরাত মাথায় বরফ চাপিয়ে রাখ্‌লে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুন্দলাল যাকে দেখেন ক্ষেপে ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে বাড়িসুদ্ধ লোকের চক্রান্ত। ভিতরে ভিতরে একটা নালিশ গুম্‌রে উঠ্‌ছিল,—এরা যেতে দিলে কেন?

একমাত্র মানুষ যে তাঁর কাছে আস্‌তে পার্‌ত সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে; ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন,—যেন মার সঙ্গে ওর চোখে কিম্বা কোথাও একটা মিল দেখ্‌তে পান। কখনো কখনো বুকের উপরে তার মুখ টেনে নিয়ে চুপ ক'রে চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোণ দিয়ে জল প'ড়তে থাকে, কিন্তু কখনো ভুলে একবার তার মার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এদিকে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেছে। কর্ত্রী ঠাক্‌রুণের কালই ফের্‌বার কথা। কিন্তু শোনা গেল কোথায় এক জায়গায় রেলের লাইন গেছে ভেঙে।

৭

সে-দিন তৃতীয়া; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠ্‌ল। বাগানে মড়্ মড়্ ক'রে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ঝাঁকানী দিয়ে উঠ্‌ছে ক্রুদ্ধ অধৈর্য্যের মতো। লোকজন খাওয়াবার জন্যে যে চালাঘর তোলা হয়েছিল তার করগেটেড্ লোহার চাল উড়ে দীঘিতে গিয়ে পড়্‌ল। বাতাস, বাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ ক'রে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে ল্যাজ ঝাপ্‌টা দিয়ে পাক্ খেয়ে বেড়ায়।

হঠাৎ বাতাসের এক দমকে জানলা-দরজাগুলো খড়্-খড়্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল! কুমুদিনীর হাত চেপে ধ'রে মুকুন্দলাল বল্‌লেন, "মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিসনি। ঐ শোন্ দাঁতকড়মড়ানি, ওরা আমাকে মারতে আস্‌চে।"

বাবার মাথায় বরফের পুঁটুলি বুলোতে বুলোতে কুমুদিনী বলে, "মারবে কেন বাবা? ঝড় হচ্চে, এখনি থেমে যাবে।"

"বৃন্দাবন? বৃন্দাবন.. চন্দ্র...চক্রবর্ত্তী! বাবার আমলের পুরুৎ—সে তো মরে গেছে—ভূত হয়ে গেছে বৃন্দাবনে। কে বল্‌লে সে আসবে?"

"কথা কোয়ো না, বাবা, একটু ঘুমোও!"

"ঐ যে, কাকে বল্‌চে, খবরদার, খবরদার!"

"কিছু না, বাতাসে বাতাসে গাছগুলোকে ঝাঁকানি দিচ্চে।"

"কেন, ওর রাগ কিসের? এতই কি দোষ করেচি, তুই বল্ মা!"

"কোনো দোষ করোনি বাবা! একটু ঘুমোও।"

"বিন্দে দূতী? সেই যে মধু অধিকারী সাজত।

মিছে করো কেন নিন্দে,
ওগো বিন্দে শ্রীগোবিন্দে—'

চোখ বুজে গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে লাগ্‌লেন।

"কার বাঁশি ঐ বাজে বৃন্দাবনে?
সই লো, সই
ঘরে আমি রইব কেমনে?

রাধু, ব্র্যাণ্ডি লে আও!"

কুমুদিনী বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলে, "বাবা, ও কি বল্‌চ?" মুকুন্দলাল চোখ চেয়ে তাকিয়েই জিভ কেটে চুপ করেন। বুদ্ধি যখন অত্যন্ত বেঠিক তখনো এ-কথা ভোলেননি যে, কুমুদিনীর সামনে মদ চল্‌তে পারে না।

একটু পরে আবার গান ধরলেন,

"শ্যামের বাঁশি কাড়তে হবে,
নইলে আমায় এ বৃন্দাবন ছাড়তে হবে।"

এই এলোমেলো গানের টুকরোগুলো শুনে কুমুর বুক ফেটে যায়,—মায়ের উপর রাগ ক'রে, বাবার পায়ের তলায় মাথা রেখে, যেন মায়ের হ'য়ে মাপ চাওয়া।

মুকুন্দ হঠাৎ ডেকে উঠ্‌লেন, "দেওয়ানজি!"

দেওয়ানজি আস্‌তে তাকে বল্‌লেন, "ঐ যেন ঠক্ ঠক্ শুন্‌তে পাচ্চি।"

দেওয়ানজি বল্‌লেন, "বাতাসে দরজা নাড়া দিচ্চে।"

"বুড়ো এসেচে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র—টাক মাথায়, লাঠি হাতে, চেলির চাদর কাঁধে। দেখে এসো ত। কেবলি ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ করচে। লাঠি, না খড়ম?"

রক্তবমন কিছুক্ষণ শান্ত ছিল। তিনটে রাত্রে আবার আরম্ভ হ'ল। মুকুন্দলাল বিছানার চারিদিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বল্‌লেন, "বড়-বৌ, ঘর যে অন্ধকার! এখনো আলো জ্বালবে না?"

বজ্‌রা থেকে ফিরে আস্‌বার পর মুকুন্দলাল এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ করলেন,—আর এই শেষ।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নন্দরাণী বাড়ির দরজার কাছে মূর্চ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে বিছানায় এনে শোয়ালো। সংসারে কিছুই তাঁর আর রুচ্‌লো না। চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেলো। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সান্ত্বনা নেই। গুরু এসে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাতের লোহা খুললেন না—বল্‌লেন, "আমার হাত দেখে বলেছিল আমার এয়োৎ ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হ'তে পারে?"

দূর সম্পর্কের ক্ষেমা ঠাকুরঝি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন, "যা হবার তাতো হয়েচে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্ত্তা যে যাবার সময় বলে গেছেন, বড়-বৌ, ঘরে কি আলো জ্বালবে না?"

নন্দরাণী বিছানা থেকে উঠে ব'সে দূরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "যাবো, আলো জ্বাল্‌তে যাবো। এবার আর দেরি হবে না।" ব'লে তাঁর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, যেন হাতে প্রদীপ নিয়ে এখনি যাত্রা ক'রে চলেচেন।

সূর্য্য গেছেন উত্তরায়ণে; মাঘ মাস এলো, শুক্ল চতুর্দ্দশী। নন্দরাণী কপালে মোটা ক'রে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসী সাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে মুখে হাসি নিয়ে চ'লে গেলেন।

(ক্রমশ)

পাহাড়িয়া

তিন-দরিয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

-গদ্য-ছন্দ-

ধাব্‌লা পাহাড়ের ঠিক নীচেই
কাঁতি-কালো করাতি-পাহাড়,
তারও নীচে তিনমুখে তিনটে চূড়ো
—মনিয়া-পাহাড়, তুঁতিয়া-পাহাড়, সুর্মি-পাহাড়—
—লাল সবুজ নীল,
রঙ ফেরায় ওরা সকালে বৈকালে দুপুরে।

তিন পাহাড়ের অনেক নীচে,—
ভাঙ্গনের ধারেই, টুংসুং বস্তি,
বস্তি পাহাড়ের অনেক উপরে,—
মশানের কাছেই শালবন,—
—চিতার ধুঁয়াতে ঝাপ্‌সা দিনরাতই—
টুংসুং লামার গুম্ফা উঠ্‌ছে সেখানে।

কথা দিয়েছে বস্তির মেয়েরা
—পাথর তুলে দেবে জনে জনে তিনশো ষাট,
সুরু করেছে সবাই পাথর বহার শক্ত কাজ।

নীচে থেকে উপর পাহাড় অনেকটা পথ,
সেখানে উঠে যায় মেয়েরা রোজই,—
ভারি ভারি পাথর ব'য়ে,
—দেওয়ালের পাথর, দেউলের পাথর
ব'য়ে চলে একে একে,
পিঠে ভার যায় মেয়েরা—
সারি সারি পিপীলিকা যেন।

চড়াই পথ বিষম সরু,—
ঠেকেছে গিয়ে মেঘের গোড়ায়,
—কুন্‌রী-ঝোপের টাট্‌কা সবুজে আড়াল-করা হাঁটাপথ—
বেগানা পথটা গড়ানে পিছল,
খোঁচা খোঁচা পাথর বিছানো,—
চ'লে গেছে মশান ছাড়িয়ে
কত যে উপরে ঠিক নেই;
মরা ঝর্ণা কেটে গেছে পথটা কতকাল হ'ল,—
থেকে থেকে ঝাঁপে পথ রঙ-কুয়াসা,
রোদ পড়ে থেকে থেকে এ পথে,—
পায়ের তলায় পাথর ক'খানা
আগুন হ'য়ে ওঠে।
কতদিন ধ'রে চ'লেছে এ পথে কত না মেয়ে,—
পাথরের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে মশানের ধারেই
সে কত বার তা'র হিসেব নেই।

ব্রতচারিণী বস্তির মেয়েরা,—
ছোটবড় সবাই করছে কঠোর,—
শোধায় না কেউ পূর্ণ হবে ব্রত কতদিনে,
কথাটি নেই, হাসি হাসি মুখ
ক'রে চলেছে কাজ সমাধা টুংসুং গুম্ফার,
আনন্দ পায় এরা ভারি বোঝা ব'য়ে,—
কুয়াসার উপরে উপরে চলে চলায়,
এরা জানে মশান ছাড়িয়ে উপর-বনেতে,
পিয়াশালের নিবিড় ছায়ায়,
উঠ্‌বে একদিন অটুট গুম্ফা,—
টুংসুং বস্তির কামনা-জড়ানো পাথরে পাথরে
আকাশের খুব কাছাকাছি।

পাহাড়িয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বস্তি ছেড়ে একটু তফাতে,
পাইনিয়া বনের ধারেই,
দেখা যায় ভিখ্-ঝর্ণা নেমে এসেছে,—
সে যেন তিন পাহাড়ের আশীর্ব্বাদ
ঝ'রছে দিনরাত ধারা দিয়ে ত্রিধারায়।

এইখানটিতে দিনরাতই
রৌদ্রে-ছায়াতে লতায়-পাতায়,—
মনের কথা চালাচালি করে,
ঝর্ণার জলে অচল পাথরে
কথা হয় যেন কত কী!
তল্লাটের মেয়েরা আসে,
দুর দুর থেকে এইখানে,
মান্‌সিক্ দিতে ঝর্ণাতলায়,
মান্‌সা-পুজোর ডালা ব'য়ে
অপরাহ্নে রোজই আসে
মেয়ে কয়টি একা দোকা।

ভিখ্-ঝর্ণার উপরে নীচে, অরণ্যে পাহাড়ে
আছেন দেবতা একলাটি,
ঝর্ণার বুকে জমাকরা পাষাণ
সেখানে আছেন তিনি চিরদিনই,—
—দাঁড়িয়ে আছেনই সাদা কালো শিল-পাটে পা রেখে—
মানস জানাতে তিনি, মনখানি জান্‌তেও তিনি।

তিনি বনের দেবতা,—
বসেন সকালের ফুলে, সন্ধ্যার ফুলে, রাতের ফুলে;
তিনি জলের দেবতা,—
আছেন ঝর্ণায়, আছেন নদীতে, আছেন সাগরেও;
জন্মমাটির দেবতা তিনি,—
জাগেন স্রোতে-ঘেরা পাথরে,
ঘুমান পদ্মবনের গোড়াতে একলা,
—পক্ষে পক্ষে পুজো নেন্ তিনি বস্তির মেয়ের।

মন জানিয়ে কত কী লেখা নতুন নিশান,—
এপার গাছের নতুন পাতায়,
ওপার গাছের ফুলের ডালে,—
জল ঝরে মাঝে পাথরে পাথরে।
এইখানে দেয় মান্‌সিক বস্তির মেয়েরা,—
—ধরে বেজোড় ফুল, নতুন পুতুল পিটুলীর, বাতিধূপের—
মানস জানিয়ে পূজা করে মনে মনে,—
ফেরে যে যার বস্তিতে একা দোকা,
জলতে থাকে ঝর্ণা-তলায় মান্‌সা-পিদুম—
একটি, দুটি, তিনটি।

বাতাসের মুখেই ধরা
মনের-কথা-জানানো বাতি,—
যত্নে-তোলা বেজোড় ফুল,—
পল্‌কা পিটুলির খেলার পুতুল,—
কত নেভে, কত থাকে জলে,—
কত ভেসে যায়, কত বা শুখায়,—
কত ভেঙ্গে পড়ে, কত পায় ক্ষয়,—
সংখ্যা নেই তা'র!

সাঁজ-সেজুতীর বেলাশেষে
যখন হিম হ'ল রোদ,—
ঘুমিয়ে গেল মোনান্ পাখী সোনালী রূপালী,
—আলিসে-হেলা পলাশ-ডালে
যেন সে ফুলটি জোড়-ভাঙ্গা,—
সন্ধ্যাতারা এল চুপে চুপে,—
পূজার বেলায় মানস-পিদুম্
নামিয়ে রাখ্‌লে বনের ধারেই,—
নিরিবিলি এ-সময় ভিখ্-ঝর্ণাতে
মেয়েদের দেওয়া মান্‌সা-পিদুম
যে-কথা জানায় মানস-দেবতাকে নিরালা পেয়ে,-
বস্তির মেয়ের মনই জানে তা'র সন্ধান।

পাহাড়িয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশে-ধরা তারার পিদ্দম্
নিত্য জ্বলে, নিত্য নেভে,
ঝর্ণায়-দেওয়া মান্‌সা-বাতি
এই জ্বলে, এই জ্বলে না,—
বস্তির মেয়ের মনের কোণে মান্‌সা নিত্যই
মনে মনে জ্ব'লে, মনেতে মেলায়—তিনসন্ধ্যা।

রাত্রিমুখে পরাহু-পাখী ডাকাডাকি করে,—
আঁখ্‌লী-ফুলের কাঁটার বেড়ায়;
দিন হয় শেষ রঙে রঙে ঝড় উঠিয়ে,
পাহাড়ে পাহাড়ে চম্‌কায় রঙ,—
পদ্মরাগ নীলকান্ত অয়স্কান্ত,
ইন্দ্রধনুর রঙের টঙ্কার বাজে মেঘে মেঘে,—
ফুটে ওঠে ফুল শিমুল, পলাশ, করবী, কাঞ্চন,—
ঝলক্ দেয় পাতা হরিৎ-পীং, নীল-পীত, নীলারুণ,—
রঙ ফেরায় দিক্ বিদিক
বহুরূপ, বহুরঙ।

চক্‌বাজারে সিনেমা-হাউস
জ্বালে এ সময়ে বিজ্‌লী-বাতি,
চলে সবাই বস্তির মেয়েরা,—
চলন্ত-ছবির তামাসা দেখ্‌তে,
রঙ্গিণী সব, রঙ্গীন সাজ,
বড় রাস্তায় হেলে দুলে চলে,
—হর্‌দী কম্‌লী শ্যাম্‌লী সুর্‌খী—
ঝিলিমিলি রঙ চম্‌কায় পুঁতির গহনায়,—
ফিরোজী কাঁচের বুক পাটায়,—
ফুলকাটা সাটিনের আঙ্‌রাখায়,
সোনার হারে, গালার চুড়ি মখমলে কম্বলে;
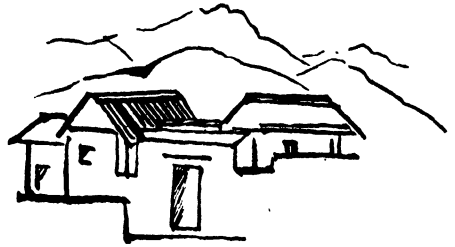
নতুন ক'রে সেজেছে সবাই,
রুখু চুলে বেণী দুলিয়ে চ'লেছে পান খেয়ে;—
থিয়েটারে-শেখা বাংলা গান মুখে মুখে সবারই,

—নয়ানবাণ ভুরুধনুর খিচুড়ি পাকানো গান—
সিনেমা-হাউসের সাইনবোর্ডের কাছেই,—
আধা-পরিষ্কার আধা-ঘোলাটে বিজ্‌লী-বাতির
ফানুস ঘিরে পতঙ্গ যেন ঘোরেফেরে সবাই,
সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো,—
জলন্ত তার-বিজুলীটা,—
আলোর ধাঁধা দিয়ে চায় অন্ধকারে ;
লামার পাহাড়, ভিখ্‌ঝর্ণা
দেখে না আর বস্তির মেয়েরা—
মনের কোণেও !

তিন পাহাড়ের তিন্‌টে রঙ নেভে আস্তে এ সময়ে,—
ওঠে চাঁদ টোল্‌-খাওয়া গোল,
—ত্রিশির ভৈরবের মস্ত চোখ্‌টা চেয়ে দেখে যেন ; —
টুংসুং লামার পাথরের স্তূপটা মশানের ধারেই
দেখায় আকাশের গায়ে কালি দিয়ে টানা ;
অন্ধকারে সবার উপরে ফুটে ওঠে ধব্‌লাগিরি
—শিলা-সাদা, ফেনী-সাদা, ধুতুরী-সাদা।

দুপুর রাতে বিজ্‌লী-বাতি
সিনেমা হাউসে নেভে দপ্‌ করে,—
ঘরে ফেরে বস্তির মেয়েরা,—
চাঁদের আলো ঠাণ্ডা লাগে চোখে,
দোকান পাট বন্ধ এখন,
কাফি-খানা ফেলেছে ঝাঁপ,
রাস্তায় প'ড়েছে ঘরের ছাওয়া স্বর্ম্মি-কালো—
একটা, দুটো, তিনটে ॥

———
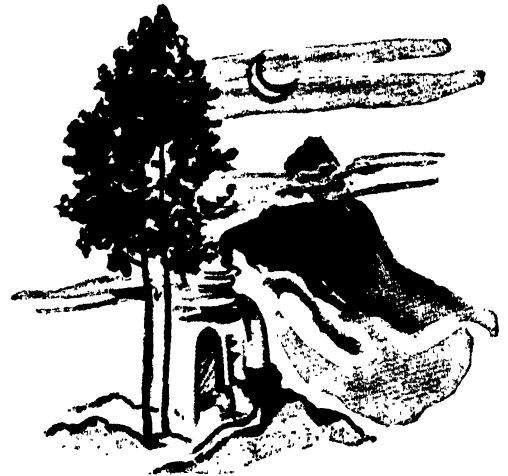
—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা যখন আরম্ভ করা গেল আকাশ থেকে বর্ষার পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েচে; সূর্য্য আমাকে অভিনন্দন করলেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যতদূর গেলুম, রেলগাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেচে। শ্যামলের বাঁশীতে তানের পর তান লাগ্‌চে তার আর বিরাম নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং, বনে বনে রস-পরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেচেন, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগ্‌ল।

প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাবার জন্যেই আমি এসেছিলুম এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তার দরকার কি? বলে, ওটা সৌখীনতা। অর্থাৎ এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যের দলে। তাতে লজ্জা পাবো না। কেননা এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।

হিসাবী লোকেরা একটা কথা বারবার ভুলে যায় যে, প্রচুরের সাধনাতেই প্রয়োজনের সিদ্ধি; এই আষাঢ়ের পৃথিবীতে সেই কথাটাই জানালো। আমি চাই ফসল, যেটুকুতে আমার পেট ভরবে। সেই স্বল্প প্রত্যাশাকে মূর্ত্তিমান দেখি তখনি যখন বর্ষণে অভিষিক্ত মাটির ভাণ্ডারে শ্যামল ঐশ্বর্য্য আমার প্রয়োজনকে অনেক বেশি ছাপিয়ে পড়ে। মুষ্টি ভিক্ষাও জোটেনা যখন ধনের সঙ্কীর্ণতা সেই মুষ্টিকে না ছাড়িয়ে যায়। প্রাণের কারবারে প্রাণের মুনফাটাই লক্ষ্য, এই মুনফাটাই বাহুল্য। আমাদের সন্ন্যাসী মানুষরা এই বাহুল্যটাকে নিন্দা করে; এই বাহুল্যকেই নিয়ে কবিদের উৎসব। খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত যদি থাকে তবেই সাহস ক'রে খরচপত্র চলে এই কথাটা মানি ব'লে আমরা মুনফা চাই। সেটা ভোগের বাহুল্যের জন্যে নয়, সেটা সাহসের আনন্দের জন্যে। মানুষের বুকের পাটা যাতে বাড়ে তাতেই মানুষকে কৃতার্থ করে।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপেই মানুষকে দেখি যার প্রাণের মুনফা নানা খাতায় কেবলি বেড়ে চলেচে। এই জন্যেই পৃথিবীতে এত ঘটা ক'রে সে আলো জ্বাললো। সেই আলোতে সে সকল দিকে প্রকাশমান। অল্প তেলে কেবল একটি মাত্র প্রদীপে ঘরের কাজ চ'লে যায়, কিন্তু পূরো মানুষটা তাতে অপ্রকাশিত থাকে। এই অপ্রকাশ অস্তিত্বের কার্পণ্য, কম ক'রে থাকা। এটা মানব-সত্যের অবসাদ। জীবলোকে মানুষরা জ্যোতিষ্ক জাতীয়; জন্তুরা কেবলমাত্র বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব দীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু মানুষ কেবল যে আত্মরক্ষা করবে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। অস্তিত্বের প্রাচুর্য্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য্য থেকেই এই দীপ্তি। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপই সকল দিকে আপনার রশ্মি বিকীর্ণ করেচে, তাই মানুষ সেখানে কেবল যে টিঁকে আছে তা নয়, টিঁকে থাকার চেয়ে আরো অনেক বেশি ক'রে আছে। পর্য্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্য্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। য়ুরোপে জীবন অপর্য্যাপ্ত।

এটাতে আমি মনে দুঃখ করিনে। কারণ যে দেশেই যে কালেই মানুষ কৃতার্থ হোক্ না কেন সকল দেশের সকল কালের মানুষকেই সে কৃতার্থ করে। য়ুরোপ আজ প্রাণ-প্রাচুর্য্যে সমস্ত পৃথিবীকেই স্পর্শ করেচে। সর্ব্বত্রই মানুষের সুপ্ত শক্তির দ্বারে তার আঘাত এসে পড়্‌ল। প্রভূতের দ্বারাই তার প্রভাব।

য়ুরোপ সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালকে যে স্পর্শ করেচে সে তার কোন্ সত্য দ্বারা ? তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার ক'রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েচে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে। গত বছর য়ুরোপ থেকে আসবার সময় একটী জর্ম্মন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁ'র অল্প বয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আস্‌ছিলেন। মধ্য ভারতের আরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে দুবৎসর তাদের মধ্যে বাস ক'রে তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন ক'রে জান্‌তে চান। এরই জন্যে তাঁরা দুজনে প্রাণ পণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। মানুষ সম্বন্ধে মানুষকে আরো জান্‌তে হবে, সেই আরো জানা বর্ব্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এই রকম সত্ত্ব-বদ্ধ ক'রে জানা, ব্যূহ-বদ্ধ ক'রে সংগ্রহ করা, জানবার সাধনায় মনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করা, এতে ক'রে মানুষ যে কত প্রকাণ্ড বড়ো হয়েচে য়ুরোপে গেলে তা বুঝ্‌তে পারা যায়। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী ক'রে সৃষ্টি ক'রে তুলচে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা' কিছু বাধা আছে তা' দূর করবার জন্যে সে যে-শক্তি প্রয়োগ করচে তাকে যদি আমরা সাম্‌নে মূর্ত্তিমান ক'রে দেখ্‌তে পেতুম তাহলে তার বিরাটরূপে অভিভূত হ'তে হ'ত।

এইখানে য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো, যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব্ব করতে পারে, তেমনি তার এমন একটা দিক আছে যেখানে তার প্রকাশ আচ্ছন্ন। উপনিষদে আছে, যে-সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করেচেন, "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" তাঁরা সর্ব্বগামী সত্যকে সকল দিক থেকে লাভ ক'রে যুক্তাত্মভাবে সমস্তের মধ্যে প্রকাশ করেন। সত্য সর্ব্বগামী ব'লেই মানুষকে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়। বিজ্ঞান বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশ-পথ খুলে দিচ্চে। কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেচে যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী বিপদ হ'য়ে উঠ্‌ল। এইখানে বিপদ তার নিজেরও।

এই জাহাজেই একজন ফরাসী লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। তিনি আমাকে বল্‌ছিলেন যুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপের নবীন যুবকদের মধ্যে বড়ো ক'রে একটা ভাবনা ঢুকেচে। এই কথা তারা বুঝেচে, তাদের আইডিয়ালে একটা ছিদ্র দেখা দিয়েছিল যে-ছিদ্র দিয়ে বিনাশ ঢুক্‌তে পার্‌লে। অর্থাৎ কোথাও তারা সত্য ভ্রষ্ট হ'ল এতদিনে সেটা ধরা পড়েচে।

মানুষের জগৎ অমরাবতী, তার যা সত্য ঐশ্বর্য্য তা দেশে কালে পরিমিত নয়। নিজের জন্য নিয়ত মানুষ এই-যে অমর লোক সৃষ্টি করচে তার মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার অসীম সাহস। কিন্তু বড়োকে গড়্‌বার উপকরণ মানুষের ছোটো যেই চুরি কর্‌তে সুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সঙ্কীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে থাকে তখনই কূল ভাঙে, তখনি বিনাশের বন্যা দুর্দ্দাম হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র নিজের জন্যে হ'লে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেচেন; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্চে নিষ্কাম কর্ম্ম। সে কর্ম্ম দুর্ব্বল হবে না, সে কর্ম্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে কর্ম্মের ফল-কামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

বিজ্ঞান যে-বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্ত্তন করেচে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের,—এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়্‌চে;

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের অমরাবতী নির্ম্মাণের বিশ্বকর্ম্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু এই বিজ্ঞানই কর্ম্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় ক'রে তুল্‌লে সেইখানেই সে হ'ল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই মর্‌বে,—সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানে নি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায় নি। বর্ত্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েচে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল? গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপের বাইরে সর্ব্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হ'য়ে উঠেচে তার প্রমাণ আজ এসিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তাই এসিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধায় শক্তির গর্ব্বে, অর্থের লোভে পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই যে চর্চ্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ করচে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফল্‌ল তখন আজ সে উদ্বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিল, আজ তার নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগল। সে ভাব্‌চে থামব কোথায়? সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে? আমি তা বলিনে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে হবে? তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে সাধনা ধর্ম্মের, কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।

জাভায় যাত্রাকালে এই সমস্ত তর্ক আমার মাথায় কেন এল জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারো। এর কারণ হচ্চে এই যে,—ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেচে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞান-ধর্ম্ম বিস্তার করেছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্য সম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখ্‌বার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখ্‌বার আছে সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্য্যকে সকলদিকে উদ্বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে চিত্রে সঙ্গীতে সাহিত্যে;—তারি চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্ব্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানব চিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব্ব করে এ সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্য্যবান যৌবনের প্রভাব।

১ শ্রাবণ ১৩৩৪।

(ক্রমশঃ)
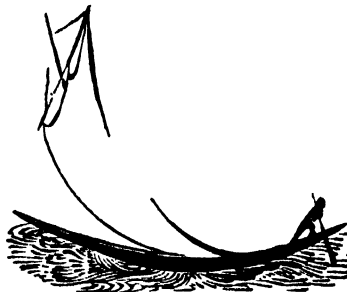
"—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

(১)

আরে ছ্যাঃ! হারু চাষ করে!
Civilisation হ'তে বহুদূরে,
Village-এ আবাদে বাস করে।
আপনার হাতে জল, কাদা, মাটি ঘাঁটে সে,
কাদা ও কিচড়ে সদা খালি পায়ে হাঁটে সে,
বলদের সাথে দিবস কাটায় মাঠে সে,
ধিক !—তা'রে ধিক !
অমার্জ্জ্য তা'র আচার ব্যাভার,
অনার্য্য তা'র চারিদিক !

(২)

ছি, ছি! হারু ফেরি হেঁকে যায়!
সহর ঘুরিয়া দিবা দু'পহরে,
বোঝার বহরে বেঁকে যায়।
বাজারের যত বাজে মাল-গুলা দিন আনায়,
দোরে আনি বেচে আনার জিনিষ তিন আনায়,
কথার ছলনে ভুলায় শিশু ও জেনানায়,
কম পাজি সে!
এত লোভী, ছ'টা পয়সার লোভে—
দু' ক্রোশ হাঁটিতে রাজী সে!

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

(৩)

ধিক ! ধিক ! হারু চাপ্‌রাসী !
প্রভু লাগি জাত বর্জ্জিতে পারে,
অর্জ্জিতে পারে পাপরাশি।
গোলামীতে বাঁধা শোয়া, বসা, ওঠা, হাঁটা তা'র,
সেলামে, সেলামে নাকে ও কপালে ঘাঁটা তা'র,
তবু যা'র খায়, তা'রে ধ'রে ক'ষে চাঁটাবার
মতো রোখ্‌ নাই।
অন্নের দায়ে, আত্মা ও কায়
বিকালো, সে-দিকে চোখ নাই !

(৪)

হারু সন্ন্যাসী ! বেশ ত, বাঃ !
কামনা না যাক্‌, কামানো ঘুচেছে
বেড়ে চলে দাড়ি কেশ,—তোফাঃ !
কিচ্ছু না ক'রে বচ্ছর-ভোর খেতে চান,
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান,
বিনা খরচায়, গাঁজা-চর্চ্চায় মেতে যান,
আহা ! নম' তায়।
পলাতক ইনি ছাড়ি সুতজায়া,
ছাড়ি যত মায়া-মমতায় !

—এই কবিতার ছবি-গুলিও বনবিহারীবাবু কর্ত্তৃক অঙ্কিত—বিঃ সঃ

ভানুসিংহের পত্রাবলী

পত্রের পাত্র

১। ভানুসিংহ

২। একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা

২১

শান্তিনিকেতন।

আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হ'ল। এ নামে আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেবোনা। সিণ্ডারেলার গল্প জানত? তার একপাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগ্‌ল। আমার ভানু নামটা সেই রকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার করতে যায় আমি তখনি বল্‌তে পারব— আচ্ছা আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। যার নাম সুরবালা, সে বল্‌বে সুরো সুরু সুরি কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিল্‌বেনা, যার নাম মাতঙ্গিনী সে বল্‌বে মাতু, মাতি, মাতো কিছুতেই মিল্‌বে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, নগেন্দ্রমোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারি সুবিধে হয়েচে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কানু বিলাসিনী"। তবে তাকে কি ব'লে ঠেকাব? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এল—পশু ছুটি, তারপরে কি করব? তখন কেবল শিউলি বন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাক্‌বে। তারা ত আমার কাছে ইংরেজি শিখ্‌তে চায়না—তা'রা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাটি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুল্‌ব, এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য্যকে মিলিয়ে দেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ না লাগ্‌লে পরে প্রকৃতি জাগ্‌বে কি ক'রে? নীলাকাশের কিরণ-কমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসনগ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দদৃষ্টি না পড়লে পরে সে পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেচি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় কর্‌ব। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে ত পারিনে—সন্ধ্যা যখন আসে তখন ত কাজ বন্ধ হয়, তখন ত আর গাণ্ডীব তুলতে পারিনে। তাই জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই, একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্ত্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়—রক্তে ধরণী পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভুলে যায় যে, এই কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ। যখন অহঙ্কার ক'রে ভাবে আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব, তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট্ পালট্ ক'রে জঞ্জাল জমিয়ে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোলে—অবশেষে এমন হয় যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না যখন সে কাজ মায়ের সংসার ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই যে মিলিয়ে কাজ করা এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে—অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখ্‌তে পারি—তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ ক'রেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ কর্‌তে পারে। যখন তাই সে করে তখন তার সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্ম্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্ত্তি হ'য়ে ওঠে,—যে পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তা হ'লে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চল্‌তে হবে—সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখ্‌চ ত মা আজ পশ্চিমের ঘরে কি রকম প্রলয়ের সম্মার্জ্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে করছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ, নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে। সে আমি-তুমির ছন্দকে একেবারে মানেনি। কিছুদূর পর্য্যন্ত সে বেড়ে উঠ্‌ল। মনে কর্‌ল সে বেড়েই চল্‌বে—এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ একমুহূর্ত্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২২

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে যে-দিন যাত্রা করেছিলুম সে-দিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মত দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বল্‌তে পারিনে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কি রকম আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচ্ছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। সেই জন্যে আমার ভ্রমণ-পথের হাজার মাইলের মধ্যে ছশো মাইল পর্য্যন্ত আমি সবেগে সগর্ব্বে এগতে পেরেছিলুম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এমনি অ্যাজিটেশন্ কর্‌তে লাগ্‌ল যে বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক সভায় কেবল মাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই যে বিচার হয়েছিল তা নয়—বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। যদি বল সে সভায় ত আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হ'চ্চে এই যে, আইনকর্ত্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কি আইন পাশ করেচেন তা তাঁদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সব চেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মুহূর্ত্তে হাওড়া ষ্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে-ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই ক'রে তাঁর তক্তর উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ইলেক্‌ট্রিক পাখার চলচ্চক্র-গুঞ্জন-মুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার করলেন তারই বা কত আশ্বস্ততা। তার পরে কত গড়্ গড়্, খড়্ খড়্, ঝর্ ঝর্, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, ষ্টেশনে ষ্টেশনে কত হাঁক্ ডাক্, হাঁস্‌ফাঁস্, হন্ হন্, হট্ হট্, আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম সহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। এমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখন পিঠাপুরমে পৌছতে মাঝে কেবল একটা ষ্টেশন মাত্র আছে এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্রসভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়্‌ল, আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুর্‌নি, তার বাঁশির ডাক, তার ধূমোদ্গার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচমিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট-

যায়, একঘন্টা যায়, ষ্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হ'য়ে রইল যে, "চরাচরমিদং সর্ব্বং" যে চঞ্চল এ কথাটা মিথ্যা ব'লে বোধ হ'ল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্ ধক্ ধুক্ ধুক্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তার পরে রাত্রি সাড়ে আট্‌টার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মত। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন হে মাদ্রাজে যাচ্ছ ত? সেখান থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখ্‌বার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি,"—আমার মন সেই এঞ্জিনটার মত চুপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, এঞ্জিন বিগ্‌ড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন্ ক'রে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগ্‌ড়লে সুবিধামত আর একটা মন পাই কোথা থেকে? সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে প'ড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে শনিবার একদা তার কৌতুক-হাস্য গোপন ক'রে আমাকে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল, সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত ক'রে তুল্‌লে। এই ত গেল আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয় যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও ত ভাল রেজোল্যুশন্ পাস্ হয়নি। আমরা সবাই স্থির করলুম গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আস্‌বে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগ্‌ল। আমার বিশ্বাস কি জান, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তারা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয়, এই জন্যে বদ্‌নাম করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তার পরে দেখেচে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ ব'লে ঠিক করেছে। যাই হোক্, আমি ওদের কাছে হার মানবার ছেলে নই। ওরা যা করবার করুক্ আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে। বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল ক'রে, হৃদয়টাকে শান্ত কর, জীবনটাকে পূর্ণ কর। তার পরে লক্ষ্যকে ঊর্দ্ধে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে চ'লে যাও—কল্যাণ লাভ কর এবং কল্যাণ দান কর। নিজের বাসনাকে উদ্দাম ক'রে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ-ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক কর। ইতি ২০ অক্টোবর, ১৯১৮।

২৩

শান্তিনিকেতন

আমার ভ্রমণ শেষ হ'ল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেছি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করা দরকার, কিন্তু দেখা গেল সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর সেইটে ভাল ক'রে বুঝে দেখ্‌বার জন্যেই কেবল পরিবর্ত্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই যে মাঠ আমার চোখে পড়চে এর কি দেখ্‌বার যোগ্য রস ফুরিয়ে গেচে? আর এই যে শিশিরার্দ্র সকাল বেলাটি তার কিরণ দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপান-রত লুব্ধ ভ্রমরের মত স্থান দিয়েচে একি কোনো কালে এর বৃন্ত থেকে ঝ'রে পড়বে? আসল কথা, মনটা অসাড় হ'লেই তাকে সাড় দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত কি করলে আমাদের মন অসাড় না হয়—তা হ'লেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি, কেবলি বাইরের জন্যে ছট্‌ফট্ করতে হয় না। আমাদের যা-কিছু সব চেয়ে বড় সম্পদ, সব চেয়ে বড় আনন্দ, তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তা হ'লে আমাদের ভারি মুস্কিল, কেননা বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থেকে ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব ক'রে শান্তি পেতে পারি। নইলে নিজেও অশান্ত হই চারিদিককেও অশান্ত ক'রে তুলি। এই সংসার থেকে যে প্রীতি যে কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে কিছু জিনিষ পাইনি, সে দিক থেকে যা কিছু বাধা আস্‌চে, তারই ফর্দ্দটাকে লম্বা ক'রে তুলে যদি খুঁৎ খুঁৎ করি, ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে থাকি, তা হ'লে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর বাহিরকে আবৃত করে মাত্র। স্থির হব, প্রশান্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব তা হ'লেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে ক'রে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ কর্‌তে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্ব্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র ক'রে চিত্তকে কাঙাল-বৃত্তিতে দীক্ষিত কোরো না—বিধাতার কাছে থেকে যা কিছু দান পেয়েচ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্র-ভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিত-ভাবে রক্ষা কর। শান্তি হ'চ্চে সত্য উপলব্ধি করবার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা—সংসারের অনিবার্য্য আঘাতে ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৫।

২৪

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্‌ ধক্‌ কর্‌তে কর্‌তে চলেচ, কত ষ্টেশন পার হ'য়ে চ'লে গিয়েচ—আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয়ত ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূবদিকের দরজার সাম্‌নে সেই মাঠে রৌদ্র ধূ ধূ করচে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চ'রে বেড়াচ্চে। এক একটা তালগাছ তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগ্‌লার মত দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড় চৌকিতে বসা হ'ল না—খাওয়ার পর এণ্ডুজ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চ'লে গেল। তার পরে নগেনবাবু নামক এখানকার একজন মাষ্টার তাঁর এক মস্ত তর্জ্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আন্‌লেন—তাতেও অনেকটা সময় চ'লে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেছে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে ব'সে আছি। বই কাগজ খাতা দোয়াত কলম ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ্‌ জিনিষে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জ্জনা আছে যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুস্কিল এই যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না, আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ-চাপা দিয়ে জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহিনী," আর সেই "চন্‌কিলা" "সোনেকিতরহ" চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া আর একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে, মন খারাপ কোরো না—লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল ক'রে থাক্‌বে। সকলেই বল্‌বে তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েচ কোন্‌ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্‌ নন্দনবীণার ঝঙ্কার থেকে, কোন্‌ প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্‌ সুর-সুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্‌ মন্দাকিনীর চলোর্ম্মি-কল্লোল থেকে, কোন্‌—কিন্তু আর দরকার নেই এখনকার মত এই কটাতেই চ'লে যাবে—কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্নপ্রায়, অপরাহ্লের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হ'য়ে এসেচে। ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

২৫

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা

মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়চ। যে তোমাকে দেখ্‌চে সেই মনে করচে চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশু মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তারা জানে না প্রায় দু'শো ক্রোশ তফাৎ থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুসি পাঠিয়ে দিচ্চে—এত খুসি যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে বা রাগায়, বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই যে গান গাই "বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মত স্বরলিপি ক'রে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হ'য়ে থাক্‌বে যে বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলচিনে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হ'য়ে ব'সে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড় কাউকে যদি ধ'রে রাখা যায় তা' হলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধ'রে রাখবার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা করচি। বাইরের কাছে যখনই কাঙাল-পনা কর্‌তে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না—সে যতটুকু দেয় তার চেয়ে দাবা ঢের বেশি করে—সে এমন মহাজন যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় কর্‌তে চায়। সে শাইলক্‌, সামান্য টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তার শোধ নেবার দাবী করে। তাই ইচ্ছে করি বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে শিকি পয়সা ধার নেব না। এই আমার মৎলবের কথাটা তোমার কাছে ব'লে রাখ্‌লুম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মৎলব সিদ্ধি হয় তাহলে বেশ মজা হবে। এখানকার খবর সব ভাল, সাহেব গেছে বাঁকিপুরে, দিনু কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মত খাট্‌চি। কিন্তু ভূত যে খুব বেশি খাটে এ অখ্যাতি তার কেন হ'ল বল দেখি? কথাটা সত্য হ'লে তো মরেও শান্তি নেই।

২৬

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমে নি। সবাই মনে করে আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্ম্মরে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপি, ভ্রমর-গুঞ্জনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-সব হ'ল হিংসের কথা। তারা জাঁক ক'রে বল্‌তে চায় যে, তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাতদিন ক'রে আফিসে যায়, আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যবসা করে, তারা এত বড় ভয়ঙ্কর কাজের লোক। আফিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক্‌ আমি কাজ করি কিনা। আচ্ছা, তারা খুব কাজ কর্‌তে পারে আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না কর্‌তে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে? যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অম্‌নি তারা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কি ক'রে যে সময় কাটাবে ভেবেই পায় না। আমার সুবিধা এই যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমত কাজ করি, আবার, যখন কাজ না থাকে তখন খুব কষে কাজ না কর্‌তে পারি— তার কাছে কোথায় লাগে তোমার বাবার কমিটি মীটিং। যখন কাজ না-করার ভিড় পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা ক'রে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখ্‌তে পারিনি। এই গোল-মালের মধ্যে যদি লিখ্‌তে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু মহাভারতেরই মত হ'য়ে উঠ্‌বে। চিঠিতে যে ছবি এঁকেচ খুব ভাল হয়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হচ্চে ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে ব'লে মনে হচ্ছে না; ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় প'ড়ে গেছে, আর "গহনা ওয়ছনা" "চুনারি উনারি"র কোনও ঠিকানা নেই। "কদু"র ভিতর থেকে যে "তুল্‌হীন্‌" বেরিয়ে এসেছিল এ-মেয়ে বোধ হয় সে নয়, এর নাম কি লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

চলচিত্তচঞ্চরী

লেখক—৺সুকুমার রায় চিত্র-শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন (নারদ)

পাত্রগণ

১। সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার পাণ্ডাগণ

সত্যবাহন সমাদ্দার	...	চিন্তাশীল নেতা
ঈশান বাচস্পতি	...	কবি ও ভাবুক নেতা
সোম প্রকাশ	...	উন্নতিশীল যুবক
জনার্দ্দন	...	ঈশানের ধামাধারী
নিকুঞ্জ	...	সত্যবাহনের ঐ

২। শ্রীখণ্ড দেবের আশ্রমচারীগণ

শ্রীখণ্ড দেব আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও সর্ব্বেসর্ব্বা

নবীন মাষ্টার প্রভৃতি আশ্রমবাসী শিক্ষকগণ

রামপদ, বিনয় সাধন প্রভৃতি ছাত্রগণ

৩। ভবদুলাল—আগন্তুক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক।

প্রথম দৃশ্য

সাম্য-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ

[ঈশানবাবু এককোণে বসিয়া সঙ্গীত রচনায় ব্যস্ত। জনার্দ্দন তাহার নিকটেই উপবিষ্ট। সোমপ্রকাশ খুব মোটা মোটা ২।৩টি কেতাব লইয়া তাহারই একটাকে মন দিয়া পড়িতেছে—এমন সময়ে মাল্য হস্তে নিকুঞ্জের প্রবেশ]

জনা। আচ্ছা, শ্রীখণ্ড বাবুরা কেউ এলেন না কেন বলুন দেখি?

নিকুঞ্জ। শুনলাম, ঈশেনবাবু নাকি ওঁদের কি insult করেছেন।

ঈশান। কি রকম! Insult করলাম কি রকম? একটা কথা বললেই হল? এই জনার্দ্দন বাবুই সাক্ষী আছেন—কোথায় insult হ'ল তা উনিই বলুন।

জনা। কই, তেমনত কিছুই বলা হয় নি—খালি স্বার্থপর মর্কট বলা হয়েছিল। তা ওঁরা যেমন অসহিষ্ণু ব্যবহার করছিলেন, তাতে ও'রকম বলা কিছুই অন্যায় হয় নি।

সোম। আর যদি insult করেই থাকে তাতেই বা কি? তার জন্য কি এইটুকু সাম্যভাব ওঁদের থাকবে না যে, অশ্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন?

ঈশান। তাত বটেই। কিন্তু ঐযে ওঁরা একটি দল পাকিয়েছেন, ওতেই ওঁদের সর্ব্বনাশ করেছে।

জনা। অন্তত আজকের মত এই রকম একটা দিনেও কি ওঁরা দলাদলি ভুলতে পারেন না?

সোম। যাই বলুন, এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত যা বলেছেন আমারও সেই মত। আমি বলি, ওঁরা না এসেছেন ভালই হয়েছে।

[সত্যবাহনের শশব্যস্ত প্রবেশ]

সত্য। আসছেন, আসছেন, আপনারা প্রস্তুত থাকুন, এসে পড়লেন ব'লে। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখান ঠিকা

আছে ত? নিকুঞ্জবাবু, আপনি সামনে আসুন। না না থাক্, ঈশানবাবু আপনি একটু এগিয়ে যান।

ঈশান। আমি গেলে চলবে কেন? আমার গানটা আগে হ'য়ে যাক,--

ঈশান বাচস্পতি—ভাবুক কবি, গায়ক ও নেতা

সত্য। না না, ওসব গানটানে কাজ নেই—ওসব আজ থাক্। আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে—আর বাড়িয়ে দরকার নেই।

ঈশান। বেশ ত! আপনার লেখাটাই যে পড়তেই হবে তার মানে কি? ওটাই থাকুক না কেন?

সত্য। আচ্ছা, তাহলে তাই হোক্—আপনাদের গান আর বাজনাই চলুক। আমার লেখা যদি আপনাদের এতই বিরক্তিকর হয়, তা হ'লে দরকার কি? চল সোমপ্রকাশ, আমরা চলে যাই।

সকলে। না না, সে কি, সে কি! তা কি হতে পারে?

সোম। (গদ্‌গদ) দেখুন, আমি মর্ম্মান্তিকভাবে অনুভব কর্‌ছি, আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে দিক্‌বিদিকে কত না আকুতি বিকুতি অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে—

জনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।

নিকুঞ্জ। ঐ এসে পড়েছেন।

সকলে। আসুন, আসুন। স্বাগতং, স্বাগতম্।

[ভবদুলালের প্রবেশ, অভ্যর্থনা ও সঙ্গীত]

গুণী-জনবন্দন লহ ফুল চন্দন—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।
আজি কি উদিল রবি পশ্চিম গগনে,
জাগিল জগত আজি না জানি কি লগনে,
স্বাগত সঙ্গীত গুঞ্জন পবনে—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।
আলা-ভোলা বাবাজীর চেলা তুমি শিষ্য
সৌম্য মুরতি তব অতি সুখদৃশ্য,
মজিয়া হরষরসে আজি গাহে বিশ্ব—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।

সত্য। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা দাওত।

সোম। আজ আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে গোপনে গোপনে —

সকলে। আহা হা, খাতাখানা চাচ্ছেন, সেইটা আগে দাও।

সত্য। (খাতা লইয়া) আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন সেই চৈত্র মাসে আমরা আলাভোলা বাবাজীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওঃ, সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তা আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। দেখ্‌লাম মহা প্রশান্ত আলাভোলা বাবাজী হাস্যোজ্জ্বল মুখে পরম নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে বাবাজীর প্রিয় শিষ্য—একি, সোমপ্রকাশ, এ কোন্ খাতা নিয়ে এসেছ? ধুতি চারখানা, বিছানার চাদর একখানা, বালিশের ওয়াড় একখানা, বাকি একখানা তোয়ালে---এ সব কি?

সোম। কেন? আপনিই ত আমার কাছে রাখ্‌তে দিলেন।

সত্য। বলি, একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়ত, সাপ দিলাম, না ব্যাং দিলাম?—দেখুন দেখি! এত কষ্ট করে রাত জেগে, সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখ্‌লাম, এখন নিয়ে এসেছে কি না কার একটা ধোপার হিসেবের খাতা! এত যে বলি, নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ কর্‌বে, তা কেউ শুন্‌বে না।

ভব। তা দেখুন, ওরকম ভুল অনেক সময়ে হ'য়ে যায়—কর্‌তে গেলাম এক, হ'য়ে গেল আর! আমার সেজো মামা একবার ঘিয়ের কারবার করে ফেল মেরেছিলেন—সেই থেকে কেউ গব্যঘৃত বল্‌লেই তিনি ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। আমি ত তা জানি না; মামারবাড়ী গিয়েছি, মহেশদা বল্‌ল "বলত গব্যঘৃত"। আমি চেঁচিয়ে বল্‌লাম "গ--ব্য--ঘৃ---ত" অমনি দেখি সেজমামা ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে মার্‌তে এয়েছে! দেখুন ত কি অন্যায়! আমি ত ইচ্ছা করে ক্ষেপাই নি!

সত্য। যাক্। আমি যা বল্‌তে চেয়েছিলাম তা এই যে, বাইরের জিনিস যেমন মানুষের ভেতরে ধরা পড়ে, তেমনি ভেতরের জিনিসও সময় সময় বাইরে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গভাবে যে সব জিনিস পাচ্ছি সেগুলোকে এখন বাইরে প্রকাশ করা দরকার।

ভব। ঠিক বলেছেন। এই মনে করুন, যে কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটির রস খেয়ে বাড়ে, সেই কেঁচোই আবার মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে।

সকলে। (মহোৎসাহে) চমৎকার! চমৎকার!

নিকুঞ্জ। দেখেছেন, কেমন সুন্দরভাবে উনি কথাটা গুছিয়ে নিলেন!

ভব। তা হ'লে সমাদ্দার মশাই, আপনি ঐ যেটা পড়বেন বলেছিলেন, আমায় সেটা দেবেন ত। আমি একখানা বড় বই লিখছি, তাতে ওটা ঢুকিয়ে দেব—

সোম। এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। আপনি যদি এ কাজের ভার নেন্, তা'হলে আমাদের ভেতরকার ভাবগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বল্‌তে পারবেন।

জনা। হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে।

ভব। আর আপনার ঐ গানটীও আমায় শিখিয়ে দেবেন, ওটাও আমার বইয়ে ছাপাতে চাই।

ঈশান। নিশ্চয়! নিশ্চয়! ওটা আমার নিজের লেখা। গান লেখা হচ্ছে আমার একটা বাতিক।

সোম। কি রকম আগ্রহ আর উৎসাহ দেখেছেন ওঁর?

ঈশান। তাত হবেই। সকলের উৎসাহ কেন যে হয় না এই ত আশ্চর্য্য।

[গান]

এমন বিমর্ষ কেন?
মুখে নাই হর্ষ কেন?
কেন ভব-ভয়-ভীতি ভাবনা প্রভৃতি
বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?
(হায় হায় হায় বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?)

ভব। [লিখিতে লিখিতে] চমৎকার! এটা আমার বইয়ে দিতেই হবে। আমার কি মুস্কিল জানেন? আমিও পোঁট্রি লিখি, কিন্তু তার সুর বসাতে পারি না। এইত এবার একটা লিখেছিলাম—

বলি ও হরি রামের খুড়ো—
(তুই) মর্‌বিরে মর্‌বি বুড়ো।

মশায়, কত রকম সুর লাগিয়ে দেখলাম—তার একটাও লাগল না। কি করা যায় বলুন ত?

ঈশান। ওর আর করবেন কি? ওটা ছেড়ে দিন না—

ভব। তা অবিশ্যি; তবে twinkle, twinkle little star—এই সুরটা অনেকটা লাগে

[গান]

বলি ও হরিরামের খুড়ো—
(তুই) মরবি রে মর্‌বি বুড়ো।
সর্দ্দি কাশী হল্‌দি জ্বর
ভুগবি কত জল্‌দি মর।

কিন্তু এটাও ঠিক হয় না। ঐযে 'মর্‌বি রে মর্‌বি' ঐ জায়গাটায় আরও জোর দেওয়া দরকার। কি বলেন?

ঈশান। হ্যাঁ, যে রকম গান—একটু জোরজার না করলে সহজে মর্‌বে কেন?

সোম। [জনান্তিকে] কিন্তু শ্রীগণ্ডবাবুদের এসমস্ত কাণ্ড প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

সত্য। উচিত সেত আজ বছর ধরে শুনে আস্‌ছি। উচিত হয়ত বলে ফেললেই হয়? নিকুঞ্জবাবু কি বলেন?

নিকুঞ্জ। নিশ্চয়ই। কিসের কথা হচ্ছিল?

সত্য। ঐ শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের কথা। এবারে "সত্য-সন্ধিৎসায়" কি লিখেছি পড়েন নি বুঝি?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা চমৎকার হয়েছে। পড়ে দিন না—উনি শুনে সুখী হবেন।

সত্য। [পাঠ] এই যে অগণ্য গ্রহ-তারকা মণ্ডিত গগন-পথে ধরিত্রী ধাবমান, ভূধর কন্দর ভ্রাম্যমান—এই যে সাগরের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে দিক্‌দিগন্ত ধ্বনিত ঝঙ্কৃত করিয়া, কি যেন চায়, কি যেন চায়—প্রতিধ্বনি বলিতেছে সাম্য সমীক্ষপন্থা।

নিকুঞ্জ। শুনছেন? ভাষার কেমন সতেজ অথচ—সহজ ভঙ্গী, সেটা লক্ষ্য করেছেন? ওর মধ্যে শ্রীখণ্ডবাবুদের উপর বেশ একটু কটাক্ষ রয়েছে।

জনা। তাহ'লে আশ্রমের কথাটা আগে বলে নিন্—নইলে উনি বুঝবেন কেমন ক'রে।

ঈশান। সেইটিই ত আগে বলা উচিত। সোমপ্রকাশ তুমি বলত হে—বেশ ভাল করে গুছিয়ে বল।

সত্য। আচ্ছা তাহ'লে সোমপ্রকাশই বলুক—(অভিমান)

সোম। কথাটা হয়েছে কি—এই যে ওঁরা একটা আশ্রম করেছেন, তার রকম-সকমগুলো যদি দেখেন—সর্ব্বদাই কেমন একটা—অর্থাৎ, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—কি শিক্ষার দিক দিয়ে, কি অন্যদিক দিয়ে, যেমন ভাবেই দেখুন—আমার কথাটা বুঝতে পার্‌ছেন ত? যেমন, ইয়ের কথাটাই ধরুন না কেন—মানে, সব কথাত আর মুখস্থ করে রাখিনি!

ভব। তা'ত বটেই, এতো আর একজামিন দিতে আসেন নি।

নিকুঞ্জ। সমাদ্দার মশাইকে বল্‌তে দাও না।

সত্য। না, না, আমায় কেন? আমি কি আপনাদের মত তেমন গুছিয়ে ভাল করে বল্‌তে পারি?

সকলে। কেন পার্‌বেন না? খুব পারবেন।

সত্য। আর মশাই, ওসব ছোট কথা—কে কি বল্‌ল আর কে কি কর্‌ল! ওর মধ্যে আমায় কেন?

জনা। আচ্ছা, তা'হলে আর কেউ বলুন না।

সত্য। কি আপদ! আমি কি বল্‌ব না বলছি? তবে, কি রকম ভাব থেকে বল্‌ছি সেটা ত একবার জানান উচিত, তা নয়ত শেষকালে আপনারাই বল্‌বেন সত্যবাহন সমাদ্দার পরনিন্দা কর্‌চে।

জনা। হ্যাঁ, শুধু বল্‌লেই ত হ'লনা, দশদিক বিবেচনা করে বল্‌তে হবে ত?

সত্য। আমার হয়েছে কি, ছেলেবেলা থেকেই কেমন অভ্যাস—পরনিন্দা পরচর্চ্চা এ সব আমি আদবে সইতে পারি না।

জনা। আমারও ঠিক তাই। ওসব এক্কেবারে সইতে পারি না।

সোম। পরনিন্দা ত দূরের কথা, নিজের নিন্দাও সহ্য হয় না।
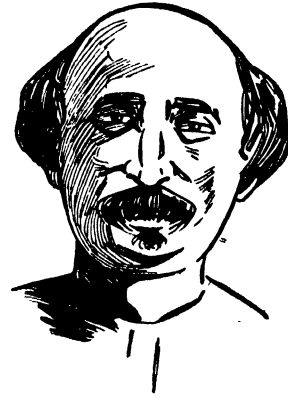
জনার্দ্দন—ঈশানের ধামাধারী

সত্য। কিন্তু তা ব'লে সত্য কি আর গোপন রাখা যায়?

ভব। গোপন কর্‌লে আরও খারাপ। ছেলেবেলায় একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে 'কূ' ক'রে শব্দ করেছিল। মাষ্টার বল্‌লেন, "কে কর্‌ল, কে কর্‌ল?" আমি ভাবলাম আমার অত বল্‌তে যাবার দরকার কি। শেষটায় দেখি, আমাকেই ধরে মার্‌তে লেগেছে। দেখুন দেখি! ওসব কক্ষণো গোপন করতে নেই।

জনা। আমাদেরও তাই হ'য়েছে। কিছু বলি না ব'লে দিন দিন ওরা যেন আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে।

চলচিত্তচঞ্চরী

৺সুকুমার রায়

নিকুঞ্জ। আশ্রমের ছেলেগুলো পর্য্যন্ত যেন কি এক রকম হ'য়ে উঠছে।

জনা। হ্যাঁ, ঐ রামপদটা সেদিন সমাদ্দার মশাইকে কি না বল্‌লে।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ--ঐ কথাটা একবার বলুন দেখি, তাহ'লে বুঝবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

জনা। হ্যাঁ বুঝলেন? ছোকরার এতবড় আস্পর্দ্ধা সমাদ্দার মশাইকে মুখের উপর বলে কি যে,—হ্যাঁ, কি-না বল্‌লে!

নিকুঞ্জ। কি যেন---সেই খুলনার মোকদ্দমার কথা নয় ত?

জনা। আরে না, ঐ যে পিল্‌সুজের বাতি নিয়ে কি একটা কথা।

সোম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে কি একটা সংস্কৃত কথা তার ছ'তিন রকম মানে হয়।

নিকুঞ্জ। ওঁরই কি একটা কথা ওঁরই উপর খাটাতে গিয়েছিল। মোটকথা, তার ও রকম বলা একেবারেই উচিত হয় নি।

ভব। কি আপদ! তা আপনারা এসব সহ্য করেন কেন?

সত্য। সহ্য না করেই বা করি কি? কিছু কি বল্‌বার যো আছে? এই ত সেদিন একটা ছোকরাকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল্‌লাম—"বাপুহে, ও রকম বাঁদরের মত ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বলি, কেবল এয়ারকি করলে ত চল্‌বে না! কর্ত্তব্য বলে যে জিনিস আছে সেটা কি ভুলেও এক-আধবার ভাবতে নেই? এদিকে নিজের মাথাটি যে খেয়ে ব'সেছ"—মশাই বল্‌লে বিশ্বাস করবেন না, এতেই সে একেবারে গজগজিয়ে উঠে আমার কথাগুলো না শুনেই হন্‌হন্ করে চলে গেল!

সোম। এইত দেখুন না, এখানে সকলে সাধু সঙ্গে ব'সে কত সৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে শুনলেও উপকার হয়। তা, ওরা কেউ ভুলেও একবার এদিকে আসুক দেখি, তা আসবে না।

জনা। তা আসবে কেন? যদি দৈবাৎ ভাল কথা কানে ঢুকে যায়!

সত্য। আসল কথা কি জানেন? এ সব হচ্ছে শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত। এই যে শ্রীখণ্ডদেব, লোকটি বেশ একটু অহং-ভাবাপন্ন। এইত দেখুন না, আমাদের এখানে আমি আছি, এঁরা আছেন, তা মাঝে মাঝে আমাদের পরামর্শ নিলেই—

[রামপদর প্রবেশ]

এই দেখুন এক মুর্ত্তিমান এসে হাজির হয়েছে।

নিকুঞ্জ। আরে দেখ্‌ছিস্ আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে আসবার দরকার কি বাপু?

জনা। বলি, একি বাঁদর নাচ—না সঙের খেলা, যে তামাসা দেখতে এয়েছ?

রাম। [স্বগত] কি আপদ! তখনি বলেছি, আমায় ওখানে পাঠাবেন না—

নিকুঞ্জ। কি হে, তুমি সমাদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে বেয়াদবি কর—এই রকম তোমাদের আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়?

রাম। আমি? কই, আমিত—আমার ত মনে পড়ে না, আমি—

সত্য। আমি, আমি, আমি,—কেবল আমি! আমি, আমি, এত আত্মপ্রচার কেন? আর কি বলবার বিষয় নেই?

ঈশান। "আত্মম্ভরী অহঙ্কার আত্মনামে হুহুঙ্কার
তার গতি হবে না হবে না—"

সোম। দেখ, ওরকমটা ভাল নয়—নিজের কথা দশ জনের কাছে ব'লে বেড়াব, এ ইচ্ছাটাই ভাল নয়।

সত্য। আমি যখন খুলনায় চাকরী করতাম, ফাউসন সাহেব নিজে আমায় সার্টিফিকেট্ দিলে—"বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে উৎসাহে, চরিত্রে সাধুতায়, সেকণ্ড টু নন্ (second to none)!! কারুর চাইতে কম নয়। আমি কি সে কথা তোমায় বল্‌তে গিয়েছিলাম?

নিকুঞ্জ। আমার পিসতুতো ভাই সেবার লাট্ সাহেবের সামনে গান করলে আমি কি তা নিয়ে ঢাক পিটিয়েছিলাম ?

ঈশান। আমার তিন Volume ইংরাজী কাব্য 'In Memoriam'. 'O Mandhata !' 'O Mores !' যেবার বেরুল সেবার Bengalee-তে কি লিখেছিল জানেন ত ? We congratulate the distinguished author of this monumental production (Double Demy Octavo 974 pages), who is evidently in possession of a stupendous amount of astounding information !"

এঁরা যদি কথাটা না তুল্‌তেন, আমি কি গায়ে পড়ে গল্প করতে যেতুম ?

সত্যবাহন সমাদ্দার—চিন্তাশীল নেতা

রাম। কি জানি মশাই, আমায় শ্রীখণ্ডবাবু পাঠিয়ে দিলেন—তাই বল্‌তে এলুম।

সত্য। দেখ তর্ক করোনা—তর্ক ক'রে কেউ কোন দিন মানুষ হতে পারে নি।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, ওটা তোমাদের ভারি একটা বদভ্যাস। আজ পর্য্যন্ত তর্ক ক'রে কোন বড় কাজ হয়েছে এ রকম কোথাও শুনেছ ?

ঈশান। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাতে ক'রে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রকে চালাচ্ছে, সে কি তর্ক করে চালাচ্ছে ?

সোম। আমি দেখছি এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতের সকলেরই একমত।

সত্য। আমার সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা বইখানাতে একথা বার বার করে দেখিয়েছি যে তর্ক ক'রে কিছু হবার যো নেই। মনে করুন যেন তর্ক হচ্ছে যে, আফ্রিকা দেশে সেউ-ফল পাওয়া যায় কিনা। মনে করুন যদি সত্যি করে সে ফল থাকে, তবে আপনি বল্‌বার আগেও সে ছিল বলবার পরেও সে থাকবে। আর যদি সে ফল না থাকে, তবে আপনি হ্যাঁ বল্‌লেও নেই, না বল্‌লেও নেই। তবে তর্ক ক'রে লাভটা কি ?

ভব। তাত বটেই—ফোড়া যদি পাকবার হয় তাকে আদুল ক'রেই রাখো—আর পুলটিস্ দিয়েই ঢাকো, সে টন্‌টনিয়ে উঠবেই।

নিকুঞ্জ। আরে মশাই এ সব বলিই বা কাকে—আর বল্লে শোনেই বা কে !

সোম। শুন্‌লেই বা বোঝে কয়জন আর বুঝলেই বা ধর্‌তে পারে কয়জন ? ঐ ধরাটাই আসল কিনা।

[ঈশানের সঙ্গীত]

ধরি ধরি ধর ধর ধরি কিন্তু ধরে কই ?
কারে ধরি কেবা ধরে ধরাধরি করে কই ?
ধরণে ধারণে তারে ধরণী ধরিতে নারে
আঁধার ধারণা মাঝে সে ধারা শিহরে কই ?

জনা। কথাটা বড় খাঁটি। এই যে আমাদের সমীক্ষা-চক্র আর সমসাম্য-সাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ড ভাব, এ সমস্ত ধরেই বা কে, আর ধরতে জানেই বা কে ?

সত্য। ধরা না হয় দূরের কথা, ও বিষয়ে ভাল ভাল বই যে দু'একখানা আছে, সে-গুলো পড়া উচিত। আমি বেশী কিছু বল্‌ছি না—অন্ততঃ আমার সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা, এ দুখানা পড়তে পারে ত।

৺সুকুমার রায়

ভব। তাহ'লে ত পড়ে দেখতে হচ্ছে। কি নাম বল্‌লেন বইটার ?

সত্য। সাম্য-নির্ঘণ্ট, তিন টাকা দুআনা, আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তিন ভলুম, খণ্ড-সিদ্ধান্ত অখণ্ড-সিদ্ধান্ত আর খণ্ডাখণ্ড-সিদ্ধান্ত—সাত টাকা চার আনা। দুখানা বই এক সঙ্গে নিলে সাড়ে নয় টাকা, প্যাকিং চার পয়সা, ডাক মাশুল সাড়ে পাঁচ আনা, এই সব শুদ্ধ ন'টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা।

ভব। তা এটা আপনার কোন এডিশন্ বল্‌লেন ?

ঈশান। আঃ—ফার্ষ্ট্ এডিশন্ মশাই, ফার্ষ্ট্ এডিশন্—এইত সবে সাত বছর হ'ল, এর মধ্যেই কি ?

সত্য। তা আমিত আর অন্যদের মত বিজ্ঞাপনের চটক্ দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটাই না।

ঈশান। হ্যাঁ, উনিত আর নিজে পেটান না—ওঁর পেটাবার লোক আছে। তা ছাড়া এই সব কাগজওয়ালাগুলো এমন হতভাগা, কেউ ওঁর বইয়ের সুখ্যাত করতে চায় না।

সত্য। কেন, সচ্চিন্তা-সন্দীপিকায় বেশ লিখেছিল।

ঈশান। ও হ্যাঁ, আপনার মেজোমামা লিখেছিলেন বুঝি ?

সত্য। মেজোমামা নয়, সেজো মামা। কিহে তোমার এখানে হ্যাঁ ক'রে সব কথা শুন্‌বার দরকার কি বাপু ?

[রামপদ'র প্রস্থান]

ভব। আচ্ছা ঐ যে খণ্ডাখণ্ড কি সব বল্‌ছিলেন, ও-গুলোর আসল ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বল্‌তে পারেন?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা এই বেলা বুঝিয়ে নিন। এবিষয়ে উনিই হচ্ছেন authority।

সত্য। ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে যাকে বলে পৃথগ্‌দর্শন। যেমন কুকুরটা ঘোড়া নয়, ঘোড়াটা গরু নয়, গরুটা মানুষ নয়—এই রকম। এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড খণ্ড—এই সাধারণ ইতর লোকে যেমন মনে করে।

ভব। [স্বগত] দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ছে সাধারণ ইতর লোক!

সত্য। আর অখণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যাকে আমরা বলি "কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষং" অর্থাৎ এই যে নানারকম সব দেখছি এ কেবল দেখবার রকমারি কিনা! আসলে বস্তু হিসাবে ঘোড়াও যা গরুও তা—কারণ বস্তুত আর স্বতন্ত্র নয়—মূলে কেন্দ্রগতভাবে সমস্তই এক অখণ্ড—বুঝলেন না ?

ভব। হ্যাঁ বুঝেছি। মানে কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষং—এইত ?

সত্য। হ্যাঁ, বস্তুমাত্রেই হচ্ছে তার কেন্দ্রগত কতকগুলি গুণের সমষ্টি। মনে করুন, ঘোড়া আর গরু—এদের গুণ-গুলি সব মিলিয়ে-মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন। ঘোড়া চতুষ্পদ, গরু চতুষ্পদ, ঘোড়া পোষ মানে, গরু পোষ মানে—সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড হিসাবে কোন তফাৎ নেই, এখানে ঘোড়াও যা গরুও তা। আবার দেখুন, ঘোড়াও ঘাস খায় গরুও ঘাস খায়—এও বেশ মিলে যাচ্ছে, কেমন ?

ভব। কিন্তু ঘোড়ার ত শিং নাই, গরুর শিং আছে—তা হ'লে সেখান দিয়ে মিল্‌বে কি করে ?

সত্য। সেখানে গাধার সঙ্গে মিল্‌বে। এমনি করে সব পদার্থের সব গুণ নিয়ে যদি কাটাকাটি করা যায়, তবে দেখবেন খণ্ড fraction সব কেটে গিয়ে বাকী থাক্‌বে—এক। তাকেই বলি আমরা অখণ্ড-তত্ত্ব।

ভব। এইবারে বুঝেছি। এই যেমন তাসে তাসে জোড় মিলিয়ে সব গেল কেটে বাকী রইল—গোলামচোর।

সত্য। কিন্তু সাধন করলে দেখা যায়, এর উপরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে সমসাম্যভাব, অর্থাৎ খণ্ডাখণ্ড মীমাংসা। এ অবস্থায় উঠতে পারলে তখন ঠিকমত সমীক্ষা সাধন আরম্ভ হয়।

ভব। "সমীক্ষা" আবার কি ?

সত্য। সাধনের স্তরে উঠে যেটা পাওয়া যায়, তাকে বলে সমীক্ষা—সেটা কি রকম জানেন ?

ভব। থাক্, আজ আর নয়। আমার আবার কেমন মাথার ব্যারাম আছে।

সত্য। না, আমি ওর ভেতরকার জটিল তত্ত্বগুলো কিছু বল্‌ছি না, খালি গোড়ার কথাটা একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি।

অর্থাৎ এটুকু তলিয়ে দেখবেন যে ঘোড়াটা যে অর্থে ঘাস খাচ্ছে গরুটা ঠিক সে অর্থে ঘাস খাচ্ছে কি না—

ভব। তা কি ক'রে খাবে? এ হ'ল ঘোড়া, ও হ'ল গরু,—তবে দুজনের যদি একই মালিক হয়, তবে এ-ও মালিকের অর্থে খাচ্চে, ও-ও মালিকের অর্থে খাচ্চে—

সত্য। না না—আপনি আমার কথাটা ঠিক ধর্‌তে পারেন নি।

ভব। ও—তা হবে। আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কি না। আচ্ছা, আজকে তাহ'লে উঠি। অনেক ভাল ভাল কথা শোনা গেল—বই লেখবার সময়ে কাজে লাগবে।

ঈশান। ওঁকে একখানা নোটিশ দিয়েছেন ত?

জনা। ও, না। এই একখানা নোটিশ নিয়ে যান্ ভবদুলাল বাবু। আজ অমাবস্যা, সন্ধ্যার সময় আমাদের সমীক্ষা-চক্র বস্‌বে।

সোম। আজ ঈশানবাবু চক্রাচার্য্য—ওঃ! ওঁর ইয়ে শুন্‌লে আপনার গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে উঠবে।

ঈশান। এই তত্ত্ব-টত্ত্ব যে সব শুন্‌লেন্ ওগুলো হচ্ছে বাইরের কথা। আসল ভেতরের জিনিস যদি কিছু পেতে চান তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমীক্ষা-সাধন।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমীক্ষা মন্দির

[অন্ধকার ঘরের মাঝখানে লাল বাতি, ধূপধুনা ইত্যাদি। কপালে চন্দন মাখিয়া ঈশান উপবিষ্ট, তাহার পাশে একদিকে সোমপ্রকাশ ও জনার্দ্দন, অপর দিকে নিকুঞ্জ ও দুইটি শূন্য আসন]

[ঈশানের সঙ্গীত ও তৎসঙ্গে সকলের যোগদান]

ঈশান। দেখতে দেখতে সব যেন নিস্তেজ হ'য়ে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল। বোধ হ'ল যেন ভেতরকার খণ্ড খণ্ড ভাবগুলো সব আল্‌গা হ'য়ে যাচ্ছে। যেন চারদিকে কি একটা কাণ্ড হ'চ্ছে, সেটা ভেতরে হ'চ্ছে কি বাইরে হ'চ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল মনে হ'চ্ছে, ঝাপ্‌সা ছায়ার মত কে যেন আমার চারদিকে ঘুর্‌ছে। ঘুর্‌ছে ঘুর্‌ছে আর মনের বাঁধন সব খুলে আস্‌ছে।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

ভব। [সশব্দে খাতা ফেলিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে] বাস্‌রে! কি গরম!

সকলে। স্-স্-স্-স্- - -

ভবদুলাল—চলচিত্তচঞ্চরী রচয়িতা

ভব। এখন সেই মক্ষিকা চক্র হবে বুঝি?

নিকুঞ্জ। এখন কথা বলবেন না—স্থির হয়ে বসুন।

সোম। মক্ষিকা নয়—সমীক্ষা।

ঈশান। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তারপর ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম, "কে"? শুন্‌লাম আমার বুকের ভিতর থেকে ক্ষীণ সরু গলায় কে যেন বল্‌লে "আমি"। বোধ হ'ল যেন ছায়াটা চল্‌তে চল্‌তে থেমে গেল। তখন সাহস ক'রে আবার বল্‌লাম "কে"? অম্‌নি "কে-কে-কে" ব'লে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কে যেন পর্দ্দার মত স'রে গেল—চেয়ে

৺সুকুমার রায়

দেখলাম, আমিই সেই ছায়া, ঘুর্‌ছি ঘুর্‌ছি আর বাঁধন খুল্‌ছে!

জনা। মনের লাটাই ঘুর্‌ছে আর সুতো খুল্‌ছে, আর আত্মা-ঘুড়ি উধাও হ'য়ে শূন্যে উড়ে গোঁৎ খাচ্ছে!

ঈশান। কালের স্রোতে উজান ঠেলে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে চল্‌ছি আর দেখছি যেন কাছের জিনিস সব ঝাপসা হ'য়ে স'রে যাচ্ছে, আর দূরের জিনিসগুলো অন্ধকার ক'রে ঘিরে আস্‌ছে। ভূত, ভবিষ্যৎ সব তাল পাকিয়ে জ'মে উঠছে আর চারিদিক হ'তে একটা বিরাট অন্ধকার হাঁ ক'রে আমায় গিল্‌তে আস্‌ছে। মনে হ'ল একটা প্রকাণ্ড জঠরের মধ্যে অন্ধকারের জারক-রসে অল্পে অল্পে আমায় জীর্ণ ক'রে ফেল্‌ছে আর সৃষ্টি প্রপঞ্চের শিরায় আমি অল্পে অল্পে ছড়িয়ে পড়ছি। অন্ধকার যতই জমাট হ'য়ে উঠছে, ততই আমায় আস্তে আস্তে ঠেল্‌ছে আর বল্‌ছে, "আছ নাকি, আছ নাকি?" আমি প্রাণপণে চীৎকার ক'রে বল্‌লাম--"আছি।" কিন্তু কোনও আওয়াজ হ'ল না—খালি মনে হ'ল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা নিশ্বাসের মত উঠছে আর পড়ছে।

ভব। উঃ! বলেন কি মশাই?

ঈশান। কোথাও আলো নেই শব্দ নেই, কোন স্থূল নেই, বস্তু নেই—খালি একটা অন্ধপ্রাণের ঘূর্ণী ঝড়ের বাঁধন ঠেলে ঠেলে বুদ্‌বুদের মত চারিদিকে ফুলে উঠছে। দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসাব মিল্‌ছে না। অন্ধকারের ভাঁজে ভাঁজে পঞ্চতন্মাত্র সাজান থাকে, এক জায়গায় তার কাঁচা মশলাগুলো ভূতশুদ্ধি না হ'তেই হুড়্ হুড়্ ক'রে স্থূল-পিণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি চীৎকার ক'রে বল্‌তে গেলুম্ "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়েছে—" কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকে বেরোলই না। বেরোল খালি হা হা হা হা একটা বিকট হাসির শব্দ। সেই শব্দে আমার সমীক্ষা-বন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

ভব। আপনি চ'লে আসবার পর আমি দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পার্‌ছে না, আর গুম্‌রে গুম্‌রে ফেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌ছে, "Shake the bottle, shake the bottle".--সত্যি!

ঈশান। কি মশাই আবোল তাবোল বক্‌ছেন!

সোম। দেখুন, এ সব বিষয়ে ফস্ ক'রে কিছু বল্‌তে নেই—আগে ভিতরে ভিতরে ধারণা সঞ্চয় কর্‌তে হয়।

জনা। হ্যাঁ, সব জিনিসে কি আর মেকি চলে?

ভব। ও, ঠিক হয়নি বুঝি? তা আমার ত অভ্যেস নেই—তার উপর ছেলেবেলা থেকেই কেমন মাথা খারাপ। সেই একবার পাগ্‌লা বেড়ালে কাম্‌ড়েছিল, সেই থেকে ঐ রকম। সে কি রকম হ'ল জানেন? আমার মেজো মামা, যিনি ভাগলপুরে চাকরী করেন, তাঁর ঐ পশ্চিমের ঘরটায় টেঁপি, টেঁপির বাপ, টেঁপির মামা, মনোহর চাটুয্যে,---না, মনোহর চাটুয্যে নয়—মহেশ দা, ভোলা,—

ঈশান। তাহ'লে ঐ চলুক, আমি এখন উঠি।

ভব। শুনুন না—সবাই ব'সে ব'সে গল্প কর্‌ছে এমন সময়ে আমরা ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ব'লে বেড়ালটাকে তাড়া ক'রে ঘরের মধ্যে নিতেই বেড়ালটা এক লাফে জানালার উপর যেই না উঠেছে, অমনি আমি দৌড়ে গিয়ে খপ্ ক'রে ধরেছি তার ল্যাজে—আর বেড়ালটা ফ্যাস্ ক'রে আমার হাতের উপর কাম্‌ড়ে দিয়েছে।

[ঈশানের প্রস্থানোদ্যম]

ভব। এই একটু শুনে যান্—গল্পটা ভারি মজার।

ঈশান। দেখুন, এটা হাস্‌বার এবং গল্প করবার জায়গা নয়।

ভব। তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন।

ঈশান। গল্প কি মশাই? সমীক্ষা কি গল্প হ'ল?

জনা। কাকে কি বলে তাই জানেন না, কেন তর্ক করেন মিছিমিছি?

ভব। না, না, তর্ক কর্‌ব কেন? দেখুন তর্ক ক'রে কিছু হবার যো নেই। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এযে তর্ক করে সব চালাচ্ছে, সেকি ভাল ক'রছে? আমি তর্কের জন্য বলিনি।

সত্য। দেখুন, এ আপনাদের ভারি অন্যায়। ভুলচুক কি আর আপনাদের হয় না? অমন কর্‌লে মানুষের শিখবার আগ্রহ থাকবে কেন?

[আশ্রমের ছাত্র বিনয়সাধনের প্রবেশ]

ঈশান। ঐ দেখ, আবার একটি এসে হাজির। তুমি কে হে?

বিনয়। আমি? হঁ্যাঃ, আমার কথা কেন বলেন? আমি আবার একটা মানুষ! হঁ্যাঃ, কি যে বলেন?

ঈশান। বলি, এখানে এয়েছ কি কর্‌তে?

সত্য। কি নাম তোমার?

বিনয়। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবিনয়সাধন। [পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া] ভবদুলালবাবু কার নাম?

সত্য। কেন হে, বেয়াদব? সে খবরে তোমার দরকার কি?

সোম প্রকাশ—উন্নতিশীল যুবক

নিকুঞ্জ। একি এয়ার্কি পেয়েছ? তোমার বাপ ঠাকুর্দার বয়সী ভদ্রলোক সব—ছি, ছি, ছি!

জনা। কি আস্পর্দ্ধা দেখুন ত!

নিকুঞ্জ। হঁ্যা,—কার বাপের নাম কি, শ্বশুরের বয়স কত, ওর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে.!

সত্য। এই এঁর নাম ভবদুলালবাবু। এখন কি বলতে চাও এঁর বিরুদ্ধে বল।

বিনয়। না, না, বিরুদ্ধে বল্‌ব কেন?

সত্য। কাপুরুষ! এইটুকু সৎসাহস নেই—আবার আস্ফালন কর্‌তে এসেছ?

বিনয়। আহা, আমার কথাটাই আগে বল্‌তে দিন--

সত্য। শুন্‌লেন ভবদুলালবাবু? ওর কথাটা আগে বল্‌তে দিতে হবে। আমাদের কথাগুলোর কোন মূল্যই নেই।

নিকুঞ্জ। দশজনে যা শুন্‌বার জন্যে কত আগ্রহ ক'রে আসে, এঁরা সে-সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

সোম। এইজন্য সাধকেরা বলেন যে, মানুষের ভুয়োদর্শনের অভাব হ'লে মানুষ সব করতে পারে।

বিনয়। কি আপদ! মশায় চিঠিখানা দিতে এসেছিলুম তাই দিয়ে যাচ্ছি—এই নিন। আচ্ছা ঝক্‌মারি যা হোক্!

[দ্রুত প্রস্থান]

সোম। মানুষের মনের গতি কি আশ্চর্য্য! একদিকে heredity আর একদিকে environment—এই দুয়ের প্রভাব একসঙ্গে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

ভব। [পত্র পাঠ করিয়া] শ্রীখণ্ডবাবু আমাকে কাল ওখানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঈশান। কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! আবার নিমন্ত্রণ কর্‌তে সাহস পান কোন্ মুখে?

সত্য। না, যাবনা আমরা। সত্যবাহন সমাদ্দার ওসব লোকের সম্পর্ক রাখে না।

ভব। উনি লিখছেন, "কাল ছুটির দিন, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি বসিয়া কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা আছে।"

ঈশান। ঐ, দেখেছেন? "নিরিবিলি বসিয়া"। কেন বাপু, আমরা এক আধ জন ভদ্রলোক থাক্‌লে তোমার আপত্তিটা কি?

জনা। এর থেকেই বোঝা উচিত যে ওঁর মতলবটা ভাল নয়।

নিকুঞ্জ। ঠিক বলেছেন। মতলব যদি ভালই হবে, তবে এত ঢাক্‌ঢাক্ গুড়্‌গুড়্ কেন? নিরিবিলি বস্‌তে চান কেন?

সোম। বুঝলেন ভবদুলালবাবু, আপনি ওখানে যাবেন না। গেলেই বিপদে পড়বেন।

৺সুকুমার রায়

ভব। বল কিহে? ছুরিছোরা মার্‌বে নাকি?

সোম। না, না, বিপদটা কি জানেন? চিন্তাশীল লোকেরা বলেন যে, বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোন অবান্তর স্বরূপের দ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়।

ভব। [পুলকিতভাবে] এ আবার কি বলে শুনুন।

সোম। স্বয়ং Herbert Spencer এ কথা বলেছেন। আপনি Herbert Spencerকে জানেন ত?

ভব। হ্যাঁ.. হার্ব্বার্ট, স্পেন্সার, হাঁচি, টিক্‌টিকি, ভূত প্রেত সব মানি।

সত্য। আপনি ভাববেন না ভবদুলালবাবু, আপনার কোন ভয় নাই। আমি আপনার সঙ্গে যাব, দেখি ওরা কি কর্‌তে পারে।

নিকুঞ্জ। বাস্‌, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঈশান। সেই জুবিলির বছর কি হয়েছিল মনে নেই? শ্রীখণ্ডবাবু ওঁদের ওখানে এক বক্তৃতা দিলেন, আমরা দল বেঁধে শুন্‌তে গেলাম। গিয়ে শুনি, তার আগাগোড়াই কেবল নিজেদের কথা। ওঁদের আশ্রম, ওঁদের সাধন, ওঁদের যত ছাই-ভস্ম, তাই খুব ফলাও ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন।

সত্য। শেষটায় আমি বাধ্য হ'য়ে উঠে তেজের সঙ্গে বল্‌লাম, "লালাজি দেওনাথের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত যে অখণ্ড-সাধন-ধারা প্রবাহিত হ'য়ে আস্‌ছে, তা' যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সে হচ্ছে আমাদের সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।

ঈশান। ওঁরা সে সব ভেঙ্গে চুরে এখন বিজ্ঞানের আগুড়ুম বাগ্‌ড়ুম কর্‌ছেন। আরে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বল্‌লেই কি লোকের চখে ধূলো দেওয়া যায়!

নিকুঞ্জ। বেশীদূর যাবার দরকার কি? ওঁরা কি রকম সব ছেলে তৈরী করছেন তাও দেখুন, আর আমাদের সোম প্রকাশকেও দেখুন।

জনা। একটা আদর্শ ছেলে বল্‌লেই হয়।

সোম। না, না, ছি ছি ছি, কি বল্‌ছেন! আমি এই যেমন লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সুয়েজ প্রণালী, আমায় সেই রকম মনে কর্‌বেন।

জনা। আসল কথা হচ্ছে, আমরা এখন সাধনের যে স্তরে উঠেছি, ওঁরা সে পর্য্যন্ত ধারণা কর্‌তেই পারেন নি।

নিকুঞ্জ। ওঃ! গতবারে যদি আপনি থাক্‌তেন! ঈক্ষা ও সমীক্ষা সম্বন্ধে সমাদ্দার মশাই যা বল্‌লেন শুন্‌লে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ঈশান। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাঁটা দিয়েত উঠত, কিন্তু এখন দুপুর রাত পর্য্যন্ত আপনাদের ঐ আলোচনাই চল্‌বে নাকি!

[সকলের গাত্রোত্থান]

সত্য। তা হ'লে এই কথা রইল, কাল আপনার বাড়ী হ'য়ে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীখণ্ড দেবের আশ্রম

[ছাত্রেরা Semicircle হইয়া দণ্ডায়মান। শিক্ষক নবীনবাবু প্রভৃতি ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। শ্রীখণ্ড দেব ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর বড় বড় বই সাজাইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। একপাশে কতকগুলি অদ্ভুত যন্ত্র ও অর্থহীন Chart প্রভৃতি। দেয়ালে কতকগুলি কাড়ে নানারকম motto লেখা রহিয়াছে।]

নবীন। [জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া] এই মাটি করেছে! সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাহন সমাদ্দারও আসছে দেখ্‌ছি।

শ্রীখণ্ড। আসুক, আসুক। একবার চোখ মেলে সব দেখে যাক্‌। তারপর দেখি, ওর কথা বলবার মুখ থাকে কিনা।

নবীন। এসে একটা গোলমাল না বাধালেই হয়।

শ্রীখণ্ড। তা যদি করে তাহলে দেখিয়ে দেব যে শ্রীখণ্ড লোকটিও বড় কম গোলমেলে নয়।

[সত্যবাহন ও ভব দুলালের প্রবেশ]

সত্য। এই যে, ছেলেগুলো সব হাজির রয়েছে দেখ্ছি।

শ্রীখণ্ড। না; সব আর কোথায়? ছুটিতে অনেকেই বাড়ী গিয়েছে।

সত্য। খালি খুব খারাপ ছেলেগুলো র'য়ে গেছে বুঝি?

শ্রীখণ্ড। খারাপ ছেলে আবার কি মশায়? মানুষ আবার খারাপ কি? খারাপ কেউ নয়। ঘোর অসাম্য বদ্ধ পাষণ্ড যে তাকেও আমরা খারাপ বলি না।

ভব। তাত বটেই। ও-সব বল্তে নেই। আমি একবার আমাদের গোবরা মাতালকে খারাপ লোক বলেছিলাম্, সে এত বড় একটা থান ইঁট নিয়ে আমায় মারতে এসেছিল। ও-রকম কখ্খনো বলবেন না।

সত্য। সে কি মশায়! যে খারাপ তাকে খারাপ বল্ব না? আলবৎ বল্ব। খারাপ ছেলে!

শ্রীখণ্ড। আহা হা, উনি আশ্রমের শিক্ষক—নবীন বাবু।

সত্য। ও, তাই নাকি! যাই হোক্, তুমি কি পড়হে ছোক্‌র?

ছাত্র। শব্দার্থ-খণ্ডিকা, আয়স্কন্ধ-পদ্ধতি, লোকাষ্ট-প্রকরণ, Sinnek's Cosmopœdia, Pall's Extra Cyclic Equilibrium and the Negative Zero—

সত্য। থাক্ থাক্, আর বল্তে হবে না! দেখুন, অত বেশী পড়িয়ে কিছু লাভ হয় না। আমি দেখেছি ভাল বই খান-দুই হ'লেই এদিককার শিক্ষা সব এক রকম হয়ে যায়।

ভব। আমার "চলচিত্তচঞ্চরী" বইখানা আপনাদের লাইব্রেরীতে রাখেন না কেন?

শ্রীখণ্ড। বেশ ত, দিন না এক কপি।

ভব। আচ্ছা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কি, বইটা এখনও বেরোয় নি। মানে খুব বড় বই হচ্ছে কিনা; অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন ত?

শ্রীখণ্ড দেব—আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা নেতা

শ্রীখণ্ড। ও, এখনো ছাপ্তে দেন নি বুঝি?

ভব। না, এই লেখা হ'লেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখ্তে হবে ত? সেটা কি রকম লিখ্ব তাই ভাব্ছি। খুব বড় বই হবে কি না!

শ্রীখণ্ড। কি নাম বল্লেন বইখানার?

ভব। কি নাম বল্লাম? চলচঞ্চল, কি না? দেখুন ত মশাই, সব গুলিয়ে দিলেন—এমন সুন্দর নামটা ভেবেছিলাম।

সত্য। হ্যাঁ, যা বল্ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল বাজারে দু'খানা বই বেরিয়েছে—সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তা'তে শিক্ষাতত্ত্ব আর সাধনতত্ত্ব এই দুটো দিকই সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৺সুকুমার রায়

শ্রীখণ্ড। ঐত,—ও বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিল্‌বে না। আমরা বলি—অখণ্ড শিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে তা'র মধ্যে বেশ একটা সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য থাক্‌বে—যেমন নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস।

সত্য। ঐ ক'রেই ত আপনারা গেলেন। এদিকে ছেলেগুলার শাসন টাসনের দিকে আপনাদের এক ফোঁটা দৃষ্টি নেই।

শ্রীখণ্ড। শাসন আবার কি মশাই? জানেন, ছেলেদের ধমক্ ধামক্ শাসন এতে আমি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করি।

ভব। আমারও ঠিক ঐ রকম। আমি যখন পাটনায় মাষ্টার ছিলুম—একদিন একেবারে বার চোদ্দটা ছেলেকে আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে দেখ্‌লুম সন্ধ্যের সময় ভারি ক্লেশ হ'তে লাগ্‌ল—হাত টন্‌টন্, কাঁধে ব্যথা।

সত্য। যাক্, যে কথা বল্‌ছিলাম। আমরা আজ ক'দিন থেকে বিশেষ ভাবে চিন্তা ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে এদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলো গুরুতর গলদ থেকে যাচ্ছে। কেবল নির্ব্বিকল্প সত্যের অনুরোধেই আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে বাধ্য হচ্ছি। যথা—(পাঠ) প্রথম—সাম্যসাধনাদি অবশ্য সম্পাদনীয়—বিষয় অনৈকাগ্রতা, অনভিনিবেশ, ও চঞ্চলচিত্ততা।

ভব। "চলচিত্ত চঞ্চরী"—মনে হয়েছে।

সত্য। বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—বিবিধ মৌলিক বিষয়ে সম্যক্ শিক্ষাভাবজনিত খণ্ডাখণ্ড বিচারহীনতা। তৃতীয়—বিবেক-বৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃশ্যকারিতা—

ভব। বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

সত্য। হোক দেরী। বিবেকবৃত্তির নানা বৈষম্য ঘটিত—

ভব। ওটা বলা হয়েছে—

সত্য। আঃ—নানা বৈষম্য ঘটিত অবিমৃশ্যকারিতা আত্মপ্রচার-তৎপরতা। চতুর্থ—শ্রদ্ধা গাম্ভীর্য্যাদি পরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব। পঞ্চম—

শ্রীখণ্ড। দেখুন, ও-সব এখন থাক্। আপনাদের ও-সব অভিযোগ আমরা অনেক শুনেছি। তা'র জবাব দেবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তা হলেও সম্যক শিক্ষাভাব ব'লে যেটা বল্‌ছেন সেটা একেবারে অন্যায়। যে-রকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক—Metapsychological Principles অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি—তার সম্বন্ধে এমন অভিযোগের কোন প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

সত্য। একশোবার পারি। তা হ'লে শুন্‌বেন? আপনাদেরই কোন এক ছাত্রের কাছে কোন একটি ভদ্রলোক খণ্ডাখণ্ডের যে ব্যাখ্যা শুন্‌লেন—আমাদের নিকুঞ্জ বাবুর দাদা বল্‌ছিলেন সে একেবারে রাবিশ্—মানেই হয় না।

শ্রীখণ্ড। তাতে কি প্রমাণ হ'ল? ও-ত একটা শোনা কথা।

সত্য। দেখুন, নিকুঞ্জবাবু আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধু। তাঁর দাদাকে অবিশ্বাস করা আর আমাকে মিথ্যা-বাদী বলা একই কথা।

শ্রীখণ্ড। তা হ'লে দেখ্‌ছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ কর্‌তে হয়।

সত্য। দেখুন, উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত ভাবে কোন প্রসঙ্গ করা আমার রীতি বিরুদ্ধ।

ভব। বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

সত্য। আঃ—কেন বাধা দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করি খণ্ডাখণ্ডের যে তত্ত্বপর্য্যায় সেটা আপনারা স্বীকার করেন ত?

শ্রীখণ্ড। আমরা বলি, খণ্ডাখণ্ডটা তত্ত্বই নয়—ওটা তত্ত্বাভাষ। আর সমসাম্য যেটাকে বলেন সেটা সাধন নয়—সেটা হ'চ্ছে একটা রসভাব। আপনারা এ-সব এমনভাবে বলেন যেন খণ্ডাখণ্ড সমসাম্য সব একই কথা। আসলে তা নয়। আপনারা যেখানে বলেন—কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষং, আমরা সেখানে বলি—কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষঞ্চ। কারণ ও-দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আপনারা যা আওড়াচ্ছেন ও-সব সেকেলে পুরোণো কথা—এ-যুগে ও-সব চল্‌বে না। এ-কালের সাধন বল্‌তে আমরা কি বুঝি শুন্‌বেন—? [ছাত্রের প্রতি] বলত, সাধন কাকে বলে।

ছাত্র। নবাগত যুগের সাধন একটা সহজ বৈজ্ঞানিক প্রণালী যার সাহায্যে একটা যে কোন শব্দ বা বস্তুকে

অবলম্বন ক'রে তারই ভিতর থেকে উত্তরোত্তর পর্য্যায়ক্রমে নানা রকম অনুভূতির ধারাকে অব্যাহত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রীখণ্ড। শুনলেন ত? আপনাদের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ। ওটা আবার বলত হে।

ছাত্র। [পুনরাবৃত্তি]

সত্য। দেখুন, কোন কথা ধীরভাবে শুনবেন সে সহিষ্ণুতা আপনার নেই। অকাট্য কর্ত্তব্যের প্রেরণায় আপনারই উপকারের জন্য এ-কথা আজকে আমায় বল্‌তে হ'চ্ছে যে, ঐ অহঙ্কার ও আত্মসর্ব্বস্বতাই আপনার সর্ব্বনাশ করবে। চলুন, ভবদুলাল বাবু।

ভব। এই একটু শুনে যাই। বেশ লাগ্‌ছে মন্দ না।

সত্য। তা হ'লে শুনুন, খুব করে শুনুন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড—[প্রস্থান]

ভব। হ্যাঁ, তারপর সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী—

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, ওটা এই আশ্রমের একটা বিশেষত্ব—একটা Graduated Psycho-thesis of Phonetic Forms. ওটা অবলম্বন ক'রে অবধি আমরা আশ্চর্য্য ফল পাচ্ছি। অথচ আমাদের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পর্য্যন্ত এর সাধন ক'রে থাকে। মনে করুন যে-কোন সাধারণ শব্দ বা বস্তু—কতখানি জোরের কথা একবার ভাবুন ত?

ভব। চমৎকার! আমার চলচিত্তচঞ্চরীতে ওটা লিখ্‌তেই হ'বে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে কোন সাধারণ শব্দ বা বস্তু—একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? "গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে", গো মানে গরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বল্‌লেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং'; "রু" মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্ম্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠ্‌ছে—music of the spheres—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন ক'রে কি অপূর্ব্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ-খণ্ডিকায় এই রকম দেড় হাজার শব্দ আমি খণ্ডন ক'রে দেখিয়েছি। গরুর সূত্রটা বলত হে।

ছাত্রগণ। খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী
শবদে শবদে মন্থিত অরণী,
ত্রিজগত যজ্ঞে শাশ্বত স্বাহা—
নন্দিত কলকল ক্রন্দিত হাহা!
স্তম্ভিত সুখ দুখ মন্থন মোহে
প্রলয় বিলোড়ন লটপট লোহে;
মৃত্যু ভয়াবহ হম্বা হম্বা
রৌরব তরণী তুঁহু জগদম্বা
শ্যামল স্নিগ্ধা নন্দন বরণী
খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী॥

ভব। ঐ গোরুর কথা যা বললেন—আমি দেখেছি মহিষেরও ঠিক তাই। জয়রামের মহিষ একবার আমায় তাড়া করেছিল—তারপর যেই না গুঁতো মেরেছে অম্‌নি দেখি সব বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। তখন মনে হ'ল—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ। আচ্ছা আপনারা ঐ সমীক্ষা-টমীক্ষা করেন না?

শ্রীখণ্ড। ওগুলো মশায়, ক'রে ক'রে বুড়ো হ'য়ে গেলাম। আসল গোড়াপত্তন ঠিক না হ'লে ও-সবে কিছু হয় না। ওদের খণ্ডাখণ্ড আর আমাদের শব্দার্থ-খণ্ডন—দুটোই দেখ্‌লেন ত? আসল কথা ওদের মতলবটা হ'চ্চে একেবারে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবেন। খণ্ডসাধন হ'তে না হ'তেই ওঁরা একলাফে আগ ডালে গিয়ে চ'ড়ে বস্‌তে চান। তাও কি হয় কখন?

নবীন। দেখুন, এরা কিছু শুন্‌বে ব'লে আশা ক'রে আছে। আপনি এদের কিছু বলুন?

ভব। বেশ ত, দেখ বালকগণ, চলচিত্তচঞ্চরী ব'লে আমার একখানা বড় বই হবে—ডবল ডিমাই ৭০০ কি

৺সুকুমার রায়

৮০০ পৃষ্ঠা—দামটা এখনও ঠিক করিনি—একটু কম ক'রেই করব ভাব্‌ছি—আচ্ছা, চার টাকা কর্‌লে কেমন হয়? একটু বেশী হয়, না? আচ্ছা ধরুন ৩।০ টাকা? ঐ বইয়ের মধ্যে নানারকম ভাল ভাল কথা লেখা থাক্‌বে। যেমন মনে কর, এই এক জায়গায় আছে—চুরি করা মহাপাপ—যে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করে তাহাকে চোর বলে। তোমরা না ব'লে কখনও পরের জিনিস নিয়ো না। তবে অবিশ্যি সব সময় ত আর ব'লে নেওয়া যায় না। যেমন, আমি একবার একটা ভদ্রলোককে বল্‌লাম, "মশায় আপনার সোনার ঘড়ীটা আমাকে দেবেন?" সে বল্‌ল, "না দেব না।" ছোটলোক! আমরা ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলাম তার নাম মনে নেই—তার মধ্যে একটা গল্প ছিল —তার সবটা মনে পড়ছে না—ভুবন ব'লে একটা ছেলে তার মাসীর কান কাম্‌ড়ে দিয়েছিল। মনে কর তার নিজের কানত নয়—মাসীর কান। তবে না ব'লে কামড়ে নিল কেন? এর জন্য তার কঠিন শাস্তি হয়েছিল।

শ্রীখণ্ড। আচ্ছা, আজ এ পর্য্যন্তই থাক্‌। আবার আস্‌বেন ত?

ভব। আসব বই কি? রোজ আসব। এইত আজ-কেই আমার সতের পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এ রকম হপ্তাখানেক চল্‌লেই বইখানা জ'মে উঠ্‌বে। আচ্ছা আজ আসি।

[গুন গুন গান করিতে করিতে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[ঈশান, নিকুঞ্জ, জনার্দ্দন ও সোমপ্রকাশ উপবিষ্ট]

[সত্যবাহনের প্রবেশ]

জনা। তারপর সেদিন ওখানে কি হ'ল?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, আপনি কদিন আসেন নি; আমরা শানবার জন্ত ব্যস্ত হ'য়ে আছি।

সত্য। হবে আর কি, হুঁঃ! একথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে শ্রীখণ্ডবাবু একদিন আমাদেরই একজন ছিলেন। আজ আমাদের সংস্পর্শে থাকলে তাঁর কি এমন দশা হ'ত? সামান্য ভদ্রতা পর্য্যন্ত ওঁরা ভুলে গেছেন।

ঈশান। ভবদুলাল বাবুকে ওখানেই রেখে এলেন নাকি?

সত্য। তাঁর কথা আর বল্‌বেন না। তিনি তাঁর গুরুর নামটি একেবারে ডুবিয়েছেন। কি বলব বলুন, তাঁর সাম্‌নে শ্রীখণ্ডবাবু আমায় বার বার কি রকম দারুণ ভাবে অপমান করতে লাগ্‌লেন—উনি তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না—উল্‌টে বরং ওঁদের সঙ্গেই নানা রকম হৃদ্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিকুঞ্জ। ছি, ছি, ছি, এ একেবারে অমার্জ্জনীয়।

সোম। দেখুন, কিসে যে কি হয় তা কি কেউ বল্‌তে পারে? আমরা অসহিষ্ণু হ'য়ে ভাব্‌ছি ভবদুলাল বাবু আমাদের ত্যাগ করেছেন—আমি বলি কে জানে?—হয়ত অলক্ষিতে আমাদের প্রভাব এখনো তাঁর উপর কাজ কর্‌ছে।

সত্য। ও সব কিছু বিশ্বাস নেই হে—সামান্য বিষয়ে যে খাঁটি ও ভেজাল চিন্‌তে পারে না—তার থেকে কি আর আশা করতে বল?

ঈশান। [গান]

কিসে যে কি হয় কে জানে!
কেউ জানে না, কেউ জানে না।
যার কথা সে বুঝেছে সে জানে।

[বাহিরে পদশব্দ ও গান গাহিতে গাহিতে ভবদুলালের প্রবে — Twinkle Twinkle-এর সুর]

ভয় ভয় ভীতি ভাবনা প্রভৃতি—

ঈশান। ওকি রকম বিশ্রী সুরে গাইছেন বলুন ত?

ভব। ওটা আমার একটা নতুন গান।

ঈশান। আপনার গান কি রকম? আমি আজ পাঁচ বছর ওটা গেয়ে আস্‌ছি। আর ওটার ওরকম সুর মোটেই নয়। ওটা এই রকম—(গান)।

ভব। তাই নাকি? ওটা আপনার গান? ঐ যা, ওটাও আমার চলচিত্তচঞ্চরীতে দিয়ে ফেলেছি। তা আপনার নামেই দিয়ে দেব।

নিকুঞ্জ। কি মশায়, আপনার আশ্রমিক পর্ব্ব শেষ হ'ল?

ভব। কি বল্‌লেন? কি পর্ব্বত?

নিকুঞ্জ। বলি আশ্রমের সখটা মিট্‌ল?

ভব। হ্যাঁ, দুদিন বেশ জমেছিল, তারপর ওঁরা কি রকম করতে লাগলেন তাই চ'লে এলাম। আসবার সময় একটা ছেলের কান ম'লে দিয়ে এসেছি।

সোম। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন দূরের জিনিষকে কাছে এনে দেখায় তেম্‌নি কিছুক্ষণ আগে আমার একটা অনুভূতি এসেছিল যে আপনি হয়ত আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

ভব। ওঁদের আশ্রমে একটা দূরবীণ আছে—তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্‌কা ফোস্‌কা মতন পড়ে যায়। বোধ হয় thousand horse power, কি তার চাইতেও বেশী হবে।

ঈশান। এত বুজরুকিও জানে ওরা।

জনা। ওঁকে ভালমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাং বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভব। হ্যাঁ, ব্যাং বল্‌তে মনে হ'ল,—সোমপ্রকাশের কথা ওঁরা কি বলেছেন শোনেন নি বুঝি?

সোম। না, না, কিছু বলেছেন নাকি?

ভব। আমি ওঁদের কাছে সোমপ্রকাশের সুখ্যাত কর্‌ছিলাম, তাই শুনে শ্রীখণ্ডবাবু বল্‌লেন যে আমরা চাই মানুষ তৈরী করতে—কতকগুলো কোলা ব্যাং তৈরী ক'রে কি হবে?

নিকুঞ্জ। আপনি এর কোন প্রতিবাদ করলেন না?

ভব। না—তখন খেয়াল হয় নি।

সোম। মানুষকে চেনা বড় শক্ত। Herbert Latham তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ক্ষমতা এবং অক্ষমতার দুইয়েরই মৌলিক রূপ এক। ওঁরা একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না।

ভব। হাঁ, হাঁ, খুব স্বীকার করেন—এই ত সেদিন আমায় বল্‌ছিলেন যে ঈশেন এবং সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দ্যাখ্‌, আর ও বলে আমায় দ্যাখ্‌। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোসের মতন চেহারা, ওরও তেম্‌নি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা!

সত্য। কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমায় কানকাটা খরগোস বলে!

ভব। না, না, আপনাকে ত তা বলেনি—আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ। কি অভদ্র ভাষা! আমায় কিছু বল্‌লে?

ভব। আমি জিজ্ঞেস্‌ করেছিলুম—তা বল্‌লে, নিকুঞ্জ কোন্‌টা?—ঐ যে ছাগ্‌লা দাড়ি, না যার ডাবা হুঁকোর মত মুখ?

নিকুঞ্জ। আপনি কি বল্লেন?

ভব। আমি বল্‌লাম ডাবা হুঁকো।

নিকুঞ্জ। নাঃ—এক-একটা মানুষ থাকে, তাদের মাথায় খালি গোবর পোরা!

ভব। কি আশ্চর্য্য! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক তাই বলেন। বলেন ওদের মাথায় খালি গোবর—তাও শুকিয়ে ঘুঁটে হ'য়ে গেছে।

সত্য। এ সব আর সহ্য হয় না। মশায়, আপনি ওখানে ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?

ঈশান। আহা, ও কি? উনি আগ্রহ ক'রে আস্‌ছেন সেত ভালই।

জনা। হ্যাঁ, বেস ত, উনি আসুন না।

সত্য। আগ্রহ কি নিগ্রহ কে জানে?

৺সুকুমার রায়

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, অত অনুগ্রহ নাই করলেন।

ভব। হাঃ, হাঃ, হাঃ, ও'টা বেশ বলেছেন। ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গে একজন পড়ত—সেও ঐ রকম কথা গোলমাল করত। দ্রাক্ষাকে বল্‌ত দ্রাহ্মা। ঐ 'কএ মূর্দ্ধণ্য ষএ' ক্ষ আর ' হ এ ম এ' হ্ম, বুঝ্‌লেন না?

নিকুঞ্জ—সত্যবাহনের ঘীমাধারী

সত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি মশায়।

ভব। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফল। দ্রাক্ষা ব'লে এক রকম ফল আছে—মানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু তর্ক ক'রে ত লাভ নাই। মনে করুন যদি বলেন নাই, তা সে আপনি বল্‌লেও আছে, না বল্‌লেও আছে। তা হ'লে তর্ক ক'রে লাভ কি? কি বলেন?

সত্য। আপনার কাছে কোন কথা বলাই বৃথা।

ভব। না না, বৃথা হবে কেন? ওটা আমার চলচিত্তচঞ্চরীতে দিয়েছি ত। আপনার নাম ক'রেই দিয়েছি।

সত্য। আমার নাম করেছেন, কি রকম? আপনি ত সাংঘাতিক লোক দেখ্‌ছি মশায়। দেখুন, ঐ যা'-তা' লিখ্‌বেন আর আমার নামে চালাবেন—এ আমি পছন্দ করি না।

ভব। বাঃ! নাম কর্‌ব না? তা নইলে শেষটায় লোকে আমায় চেপে ধর্‌বে আর আমি জবাব দিতে পার্‌ব না, তখন? সে হচ্ছে না। ঐ ঈশান বাবুর বেলাও তাই। যার যার গান, তার তার নাম।

সত্য। দেখুন, আপনি সহজ কথা বুঝবেন না আবার জেদ করবেন।

ভব। ও, ভুল হয়েছে বুঝি? তা আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। সেই সেবার সেই সজারুতে কাম্‌ড়েছিল—

ঈশান। কি মশায়, সেদিন বল্‌লেন বেড়াল, আর আজ বলছেন সজারু।

ভব। ও, তাই নাকি? বেড়াল বলেছিলাম নাকি? তা হবে। তা, ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখ্‌বার রকমারি কিনা। আসলে বস্তুত আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষম্। কি বলেন? ওটাও দিয়ে দিই, কেমন?

সত্য। দেখুন, যে বিষয়ে আপনার বুঝ্‌বার ক্ষমতা হয়নি সে বিষয়ে এরকম যা তা যদি লেখেন তবে আপনার সঙ্গে আমার জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি।

ভব। কি মুস্কিল! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক ঐ রকম বল্‌লেন। ওঁদেরই কতকগুলো ভাল ভাল কথা সেদিন আমি ছেলেদের কাছে বল্‌ছিলাম, এমন সময় উনি রেগে —"ওসব কি শেখাচ্ছেন" ব'লে একেবারে তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিলেন। তাই ত চ'লে এলাম।

ঈশান। একি মশায়? খাতায় এসব কি লিখেছেন।

ভব। কেন, কি হয়েছে বলুন দেখি?

ঈশান। কি হয়েছে—? এই আপনার চলচিত্তচঞ্চরী? এসব কি? ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ঈশেনবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হাঁ ক'রে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিঃশ্বাস উঠ্‌ছে আর পড়ছে—সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছে—গা ঝিম ঝিম—Nux Vomica 30—

ভব। বাঃ! ও গুলো ত আপনাদেরই কথা। শুধু Nux Vomica-টা আমার লেখা।

[ঘোর উত্তেজনা]

সকলে। দিন দেখি খাতাখানা।

ভব। আঃ—আমার চলচিত্তচঞ্চরী—

সত্য। ধ্যেৎ তেরি চলচিত্তচঞ্চরী—

ভব। ওকি মশায়—টানাটানি করেন কেন? একেত শ্রীখণ্ডবাবু তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন—হাঁ, হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি? দেখুন দেখি মশায়, আমার চলচিত্তচঞ্চরী ছিঁড়ে দিলে!

[ছেঁড়া খাতা সংগ্রহের চেষ্টা]

সত্য। এই ঈশেনবাবুর যত বাড়াবাড়ী। আপনার ওসব গান আর সমীক্ষা ওঁকে শোনাবার কি দরকার ছিল?

ঈশান। আপনি আবার আহ্লাদ ক'রে ওঁর কাছে খণ্ডাখণ্ডের ব্যাখ্যা কর্‌তে গেলেন কেন?

ভব। খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তা কি হয়েছে। আবার লিখ্‌ব—চলচিত্তচঞ্চরী—লাল রংএর মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধান। তার উপরে বড় বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচিত্তচঞ্চরী—Published by ভবদুলাল। একুশ টাকা দাম করব। তখন দেখ্‌ব—আপনার ঐ সাম্যঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত বিসূচিকা কোথায় লাগে।

[গান]

সংসার কটাহ তলে জ্বলে রে জ্বলে!
জ্বলে মহাকালানল জ্বলে জ্বল জ্বল,
সজল কাজল জ্বলে রে জ্বলে।
অলক তিলক জ্বলে ললাটে,
সোনালি লিখন জ্বলে মলাটে,
খেলে কাঁচাকচু জ্বলে চুলকানি
জ্বলে রে জ্বলে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে—পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদ-পত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণ মুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়—কিন্তু আপাতত তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া। সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রং-কে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই। প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেল্‌তে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎসধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক্। আমার এই খোলা জানলাটার কাছে বিশ্রাম-শয্যায় শুয়ে আমি আমার ঐ সাম্‌নের মাঠের দিকে চেয়ে অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখতে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র-উপদেশ ভরা অতি পুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেকদিন বৃষ্টি নেই, রৌদ্রও প্রখর—তাতে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূর-বিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি মাত্র তালগাছ এত বড় সনাতন নিৰ্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্র-ব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই, কিন্তু ঐ একটুকুখানি মাত্র জায়গায় বাণার উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমার সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্। জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরাসন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে, যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দুরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট্ প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে যা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজপত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেনি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্প-পল্লবে নিজেকে বারবার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয়-বট যে অক্ষয়,

তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চির-তারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতি বসন্তেই সে বারেবারে নূতন বেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকত তাহলে এর দ্বারা দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়ে সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সেদিন আমি সেই ঝোড়োদলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডী-মণ্ডপনিবাসীরা এখনো সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করেনি। আমি তাদের ক্ষমার দাবীও করিনে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তি ভঙ্গ করেছি, সেখান-কার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করিনি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রা-লোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেছি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্য-সাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে। সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণ-ভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবক মহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশুমহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েছি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌচেছি—মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছুডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেই জন্যে যৌবন-মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ঐ খানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানি নি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাইনি। কিন্তু এখন দিনশেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেই জন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয় হবে, বাধা-মুক্ত হবে, জড়তা স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ, ১৩২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রখানি কবি, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। প্রমথ বাবুর সৌজন্যে ইহা বিচিত্রায় প্রকাশিত হইল। বিঃ সঃ

চকিত ও নিশ্চিন্ত

শিল্পী—শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস
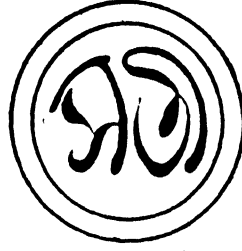
(৬)

যে দিন সুরমা প্রথম জানিল যে তার স্বামী মাতাল ও চরিত্রহীন হইয়াছেন, যে দেবতাকে এতদিন সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছে সে পিশাচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তার মনে হইল, জীবনে যেন আর কোনো অবলম্বনই তার নাই। তার সমস্ত আত্মা গভীরভাবে শিকড় গাড়িয়াছিল তার স্বামীর সত্তায়। এই সর্ব্বনাশ যেন তাহাকে সেই চিরদিনের আশ্রয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া তাহাকে অসীম শূন্যের ভিতর ছাড়িয়া দিল। সে কোনও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না, তার জীবনের আর কোনও অর্থ রহিল না। সে কেবল আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি মর্ম্মান্তিক এ দুঃখ। বুক ফাটিয়া যায় ইহাতে, তবু এতো মুখ ফুটিয়া কারও কাছে বলিবার নয়। আজ তার সর্ব্বস্ব হারাইয়া গিয়াছে, তার প্রতিষ্ঠার আর বিন্দু-মাত্র স্থান নাই। এ লজ্জা, এ অপমান, এ লাঞ্ছনা সে সহিবে কি করিয়া? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে? অন্তরতম সুহৃদের কাছেও যে এ লজ্জার কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

তাই সুরমা সুধু কাঁদিল। তিনদিন সে লুকাইয়া লুকাইয়া কেবলি কাঁদিল, স্বামীকে কিছু বলিল না।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তার বেদনা সহনীয় হইয়া গেল তখন সে মনস্থির করিয়া তার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিল। তার তো আপনার দুঃখে কাঁদিবার সময় নাই। সতী সে, স্বামীকে রক্ষা করিবার ভার যে তাহার। তা' ছাড়া এত দিন পরে আবার যে অভাগ্য সন্তান তার গর্ভে স্থান লই-য়াছে তাহাকে বাঁচাইতে হইবে সবচেয়ে নিদারুণ অপমান হইতে। শিশুর কাছে পিতার কলঙ্ক যে কত বড় লজ্জা কত বড় অপমানের কথা তাহা সুরমা আপনার অন্তর দিয়া অনুভব করিল। সে লজ্জা, সে অপমান তাকেই নিবারণ করিতে হইবে। যদি আবশ্যক হয়, প্রাণ দিয়াও সে তার স্বামীকে পাপ হইতে রক্ষা করিবে।

সেদিন গভীর রাত্রে ভূপতি যখন ফিরিল তখন সুরমা কৃত-সঙ্কল্প হইয়া বসিয়া ছিল।

ভূপতি আসিয়া বলিল, তার আহার হইয়া গিয়াছে, সে আর খাইবে না। সুরমাকে খাইতে বলিলে সে বাড়া ভাত তুলিয়া লইয়া বারান্দায় গিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিল।

ভূপতি স্তব্ধ হইয়া দেখিল।

তার পর সে স্বামীর পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "ওগো একি সর্ব্বনাশ করছো তুমি আমার। আমাকে দয়া কর। এতদিন যে তুমি আমায় বড় আদর দিয়েছ, তোমার ছায়ায় রেখে আমাকে সব দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছ, সামান্য আঁচড়টুকু আমার গায় লাগলে ব্যথা পেয়েছ। আজ তুমি কেমন ক'রে নিজ হাতে আমায় এমন ব্যাথা দিচ্ছ? দয়া কর।"

ভূপতি এ ব্যাপারে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে শুধু নির্ব্বোধের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না বা কিছু করিতে পারিল না। আর তার চরণতলে তার চিরদয়িতা পত্নী মাথা লুকাইয়া, এলা-

য়িত ঘন কেশরাশি তার দুটি পায়ের উপর ছড়াইয়া করুণ স্বরে বিলাপ আবেদন করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর সে সুরমার হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। সুরমা দুই হাতে পা চাপিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রহিল, বলিল, "উঠ্‌বো না আমি, ছাড়বো না পা'। বল তুমি এসব ছাড়বে। যেমনটি ছিলে তেমনি হ'বে, তবে ছাড়বো।"

আম্‌তা আমতা করিয়া ভূপতি বলিল, "কি বলছো তুমি? কে তোমার মাথায় এ সব ঢুকিয়েছে? এ সব মিথ্যে ক'রে বানিয়ে কে ব'লেছে তোমায়?"

পা ছাড়িয়া বসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুরমা বলিল, "কেউ কিছু বলেনি আমায়! সতী যে, তাকে এসব বলবার দরকার করে না। তোমার মনে একটু পাপের ছায়া পড়লে আমার অন্তরতাতে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। তোমার মুখপানে চাইলে আমি তোমার ভিতরটা সব দেখ্‌তে পাই। আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রো না। দুঃখের উপর আর দুঃখ বাড়িও না। ওগো, তুমি যে চিরদিন সত্যবাদী, এ পাপ কি তোমায় আজ মিথ্যাবাদী বানাবে?"

সুরমার চোখের দিকে চাহিয়া আর ভূপতির মিথ্যা বলিতে সাহস হইল না। সে এই সামান্য ক্ষীণপ্রাণ নারীর কাছে আপনাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসহায় বোধ করিল। সুরমার দৃষ্টি সে সহিতে পারিল না, চক্ষু নত করিয়া শুধু বলিল, "যাক গে, সত্যি মিথ্যার বিচার ক'য়ে আর কি হ'বে। তুমি যা শুনেছ তা' ঠিক নয়, আমি কিচ্ছু করি নি, শুধু কয়েকদিন গান শুনতে গিয়েছিলাম"—

সুরমা বলিল, "ছি, ছি, আবার মিথ্যে ব'লছো। আমার কাছে তুমি মিথ্যে ব'লছো? তুমি যে নিজে আমাকে কথা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে সত্যধর্ম্ম শিখিয়েছ! আপনাকে তুমি এত খাট' ক'রো না, তোমার পায়ে পড়ি।"

ভূপতি বলিল, "তা তুমি তাই বুঝে থাক তবে তাই ঠিক। যাক গে, আর না হয় নাই গেলাম। নেও, কেঁদো না, এসো।"

আবার পা ধরিয়া সুরমা বলিল, "তবে তাই বল, আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর আর তুমি যাবে না, আর মদ খাবে না।"

মুখখানা একটু হাসির মত করিয়া ভূপতি সুরমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "আচ্ছা তা নইলে যদি নাই হয় তবে তাই ক'রছি, তোমার গা ছুঁয়েই বলছি আর যাব না। আর মদ খাব না।"

বলিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, "নেও এখন শোবে এসো।" কিছু খাইবার কথা বলিতে একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেন তার সাহস হইল না।

সুরমা উঠিয়া দুয়ারে খিল দিয়া আসিল, তার পর আসিয়া বলিল, "আজকের দিনটা আমায় মাপ কর, আজকে আমি তোমার কাছে শুতে পারছি না, কিছুতেই মন চাচ্ছে না। আজ আমাকে ক্ষমা কর।" বলিয়া সে একটা বালিস মেঝেয় ফেলিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

ইহার উপর কোনও কথা কহিতে ভূপতি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল। বিলাসের সদ্য-আলিঙ্গন-দূষিত তার দেহ স্পর্শ করিতে সুরমার এ সঙ্কোচ দেখিয়া তার রাগ হইল, কিন্তু তবু নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া সে আর কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না।

তারপর দুজনে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, কিন্তু কেহই ঘুমাইল না।

সুরমা শুইয়া শুইয়া নীরবে তার অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল আর তার দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মনে মনে সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিল যেন তার স্বামীর সুমতি হয়, তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার শক্তি যেন হয়।

ভূপতি শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। সুরমা জানিতে পারিলে যে কি বিপরীত কাণ্ড হইবে সেই ভয়ে সে অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছে। সেই আশঙ্কিত ব্যাপারটা এত সহজে নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়ায় সে কতকটা আরাম বোধ করিল। যা'ক, আপদ চুকিয়া গিয়াছে; এতদিনকার লুকাচুরীতে তার প্রাণ হাঁপাইয়া

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

উঠিয়াছিল, সে সব যে মিটিয়া গিয়াছে তাহাতে সে বেশ একটু শান্তি বোধ করিল।

তারপর তার প্রতিজ্ঞার কথা! এ প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিবে! মিছামিছি সুরমাকে কষ্ট দিবে না। সুরমাকে ভূপতি সত্য সত্যই প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তার কান্না ও কাতর আবেদন শুনিয়া তার প্রাণে বাস্তবিকই খুব ঘা লাগিয়াছিল। তাই সে স্থির করিল আর সে সুরমাকে দুঃখ দিবে না। বিলাসের কাছে আর সে যাইবে না। কিন্তু—বিলাসও যে তাকে সত্য সত্যই ভালবাসে! তার কত কথা মনে পড়িল। বিলাসের আদর সোহাগ, তার হাসি কৌতুক, মদ খাওয়া বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য তার তিরস্কার, কান্নাকাটি, ভূপতির অদর্শনে বিলাসের উৎকণ্ঠা—সব মনে পড়িল। কিন্তু যাক সে সব! ও পথে আর নয়!

ভূপতি যদি না যায় তবে বিলাস অবশ্যই আবার অন্য পুরুষকে গ্রহণ করিবে, তাকেও ঠিক তেমনি করিয়া আদর করিবে, অন্যে আসিয়া বিলাসকে প্রেমসম্ভাষণ করিবে। ভাবিতে ভূপতির মনের ভিতর সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। সে কিছুতেই হইতে পারে না।

সেই সময় সুরমা পাশ ফিরিল। ভূপতি আবার তার বর্ত্তমান আবেষ্টনে ফিরিয়া আসিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "যাক্ গে যাক্, হয় হ'বে কি আর ক'রবো। সুরমাকে তাই বলে কষ্ট দেওয়া যায় না।" একথা বলিতেও তার প্রাণের ভিতর একটা দারুণ বেদনা মোচড় দিয়া উঠিল।

ভূপতির আবার মনে হইল সুরমার এতটা বাড়াবাড়ি অন্যায়। সে তো সুরমার কোনও অযত্ন করে নাই—ঠিক আগের মতই সে তাকে ভালবাসে—আগের মতই সে ভূপতির সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তা ভূপতি বাহিরে কোথায় কোন্ দিন কি করে তাতে সুরমার কি-ই এমন আসে যায়। কিন্তু এ সব তাকে কিছু বুঝান যাইবে, এ চিন্তা বৃথা। বিলাসকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

কিন্তু বিলাস যদি না ছাড়ে! সেও তো ভূপতিকে ভালবাসে। তার ভালবাসার তুলনা নাই। সুরমা ভালবাসে তার স্বামীকে, এতো সবাই করিয়া থাকে। কিন্তু বিলাসের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নাই—বিলাস জানে ইচ্ছা করিলেই ভূপতি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তবু সে তাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে। ভূপতির সামান্য সুখের জন্য সে যে-কোনও কষ্ট স্বীকার করিতে পারে। ইহার পরিচয় সম্যক না পাইলেও তার কথা বার্ত্তা কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ভূপতির এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও ছিল না। সুতরাং ভূপতি ছাড়িয়া দিলেই যে বিলাস তাহাকে নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিবে তার নিশ্চয়তা কি? বিলাস হয় তো একথা শুনিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া একটা কাণ্ড কারখানা করিয়া বসিবে। হয়তো আত্মহত্যাও করিতে পারে। আরও কত কিছু ভয়ানক কাণ্ড করিতে পারে। ভাবিতে ভূপতির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সুরমার দিকে চোখ পড়িতে আবার চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল, 'যা'ক কি আর করিব—উপায় নাই। সুরমাকে একথা কিছুতেই বুঝান যাইবে না।'

এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে তার অনেক রাত্রি কাটিল। শেষ রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সুরমা উঠিয়া গিয়াছে। বাহিরে গিয়া সে দেখিল সুরমা স্নান করিয়া প্রতিদিনের মত নিবিষ্টমনে গৃহকর্ম্ম করিতেছে। ভূপতিকে সে স্মিতমুখে সম্ভাষণ করিল, তার মুখ ধোয়া হইলে তাহার খাবার ও চা আনিয়া দিয়া এমন ভাবে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল যেন কিছুই হয় নাই। কাল রাত্রের ব্যাপারটা যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন মাত্র। তার বাহির দেখিয়া কাহারও অনুমান করিবার উপায় ছিল না কি ঝড়টা তার ভিতর বহিয়া গিয়াছে—এবং এখনও থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে।

ভূপতির না ভিতর না বাহির ছিল আগের মত। তার মনের ভিতর ছিল দারুণ বিক্ষোভ, মুখ খানাও শুষ্ক, মেঘাচ্ছন্ন! বিলাসের প্রতি আকর্ষণ ও সুরমার ভয় এই উভয়ের মিশ্রণে তার মনে যে দ্বন্দ্ব কাল রাত হইতে চলিতেছিল তাহা সমানে চলিতে লাগিল। সে বেশীক্ষণ অন্তঃপুরে থাকিল না। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সে চিৎপাত হইয়া ফরাসের উপর শুইয়া তার অন্তরের এ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার আবেগ

সহিতে লাগিল। কিন্তু একথা স্থির রহিল যে বিলাসের কাছে আর যাওয়া হইবে না।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে এককড়ি গিয়া তাহাকে আফিসে খবর দিল যে বিলাসের বড় অসুখ। ভেদ বমি হইয়া সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

আর দ্বিধা রহিল না। আফিস হইতে ছুটি লইয়া ভূপতি তখনি বড় ডাক্তার লইয়া বিলাসের বাড়ী উপস্থিত হইল। বিলাস যদিও অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল, তবু বাস্তবিক তার বেশী কিছু হয় নাই। সামান্য অজীর্ণ, ভূপতি যাইবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে সুস্থির হইল। তারপর কিছুক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিয়া ঠিক আফিস হইতে ফিরিবার সময় ভূপতি বাড়ী ফিরিল।

সুরমা হাসি মুখে তাহাকে সম্ভাষণ করিল। সে নিজ হাতে ভূপতির চাদরটা খুলিয়া আলনায় রাখিয়া ভূপতিকে চুম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইল। হঠাৎ যেন বিভীষিকা দেখিয়া পিছাইয়া গেল, তার পর ধপ্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। আর্ত্তনাদ করিয়া সে বলিল, "আবার তুমি গিয়াছিলে সেখানে? ওঃ!"

ভূপতি যেন কেমনতর হইয়া গেল। সুরমা কি করিয়া টের পাইল? তার কি দিব্যদৃষ্টি আছে? কিন্তু সে নিমিষে আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "কই না! কি অন্যায় তোমার! এমন কথা আমাকে বলছ কি করে?" সে ভারী রাগ দেখাইল।

সুরমা তখন সুস্থির হইয়া উঠিল। স্বামীর কাছে অগ্রসর হইয়া তার কাঁধের উপর হইতে ছোট একটী সোনার ব্রুচ তুলিয়া লইয়া ভূপতির হাতে দিল। ব্রুচের উপর লেখা ছিল "তোমারই"। ভূপতিই এ ব্রুচটা বিলাসকে দিয়াছিল, ইহা সে সদা সর্ব্বদা পরিত। কখন যে কি প্রকারে এই বিশ্বাস-ঘাতক অলঙ্কার বিলাসের কাপড় হইতে খুলিয়া গোপনে আসিয়া ভূপতির কোটের ভিতর বিঁধিয়া বসিয়াছিল তাহা সে বা বিলাস টের পায় নাই। ভূপতি বুঝিল শেষ-বিদায়-আলিঙ্গনের সময় এই সর্ব্বনেশে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।

ভূপতি তখন আমতা আমতা করিয়া বলিল, "অ্যা" হাঁ—আজ আফিসে খবর পেলাম তার কলেরা হ'য়েছে- তাই একবার দেখতে গিয়েছিলাম—মারা যায় সে, একবার দেখতে চেয়েছিল তাই—আর কিছু নয় সুরো!

একথার ভিতর সত্যের খাদ থাকিলেও তাহাতে এখন কুলাইল না। বিশেষ, কলেরার মরণাপন্ন রোগী দেখিতে যাওয়ায় ব্রুচ জামায় বিঁধিয়া যাওয়ার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না। কথাটা বলিয়াই ভূপতি একথা বুঝিতে পারিল এবং আরও অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

সুরমা কেবল ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি বেকুব বলিয়া আপনাকে মনে মনে তিরস্কার করিতে করিতে নিজেই কাপড় চোপড় ছাড়িয়া মুখ ধুইতে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল সুরমা একান্তমনে অভ্যাসমত খাবার ঠিক করিতেছে। তার মুখ একটু গম্ভীর, কিন্তু তা ছাড়া তার যে কিছু হইয়াছে ইহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই।

মুখ ধুইয়া ভূপতি ঘরে ঢুকিয়া সুরমার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এবং এবার আসিলে সে কি বলিবে ও কি করিবে মনে মনে তার মুসাবিদা করিতে লাগিল।

কিন্তু সুরমা অভ্যাসমত খাবার লইয়া আসিল না— আসিল ঝি।

(৭)

ইহার পর সুরমা আর ভূপতিকে কিছু বলিল না। সে কেবল স্বামীর সংসর্গ ও সম্ভাষণ একেবারে পরিত্যাগ করিল। ভূপতি ইহাতে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হইল কিন্তু মোটের উপর সে ইহাতে স্বস্তি পাইল। এতদিন তার ভয় ছিল সুরমা পাছে জানিতে পারে এবং জানিতে পারিলে যে কি ভয়ানক ব্যাপার হইবে তাহা স্মরণ করিতে সে শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু এখন যখন জানাজানিটা হইয়া গেল তখন আর তার সঙ্কোচ রহিল না। যদি ইহার পর সুরমা পুনরায় এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিত তবে সে হয় তো

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

একটু বিপদে পড়িত, কিন্তু সুরমা বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে সে দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। মোটের উপর সে ইহাতে বাঁচিয়া গেল। এখন সে অসঙ্কোচে বাহিরে গতায়াত করিতে লাগিল, এবং ক্রমে রাত্রিতে মত্ত অবস্থায়ও বাড়ী ফিরিতে আর বাধা রহিল না।

যেদিন ভূপতি মত্ত অবস্থায় প্রথম বাড়ী ফিরিল সেদিন তার অবস্থা দেখিয়া সুরমা একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল স্তব্ধ হইয়া গেল। এখন যে কি করিতে হইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। সে সুধু জ্যোতিকে ডাকিয়া দিয়া অন্য ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার পর সে আহার বন্ধ করিল। তিন দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাইল। কিন্তু জ্যোতি ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। সে অনেক বুঝাইল, অনেক অনুনয় করিল, শেষে নিজে খাওয়া বন্ধ করিল। সুরমার কাজেই চতুর্থ দিনে পুনরায় খাইতে হইল। ভূপতি এ-কয়দিন একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক ছিল, কিন্তু স্ত্রীর কাছে গিয়া এ সম্বন্ধে কোনও কথা কওয়া বা তাহাকে অনুরোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুরমা তার সঙ্গে কথা কয় না, সে কাছে গেলেই সরিয়া যায়। ভূপতির এজন্য তার কাছে অগ্রসর হইতে গুরুতর সঙ্কোচ বোধ হইত। অথচ সুরমা যে না খাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিবে এবং হয় তো মরিয়া যাইবে, এ কথা ভাবিতে প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিত। যেদিন সে খবর পাইল সুরমা আহার করিয়াছে সেদিন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং নিশ্চিন্ত মনে সে পথে তিন পেগ হুইস্কী খাইয়া বিলাসের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

উপস্থিত বিপদ কাটিয়া যাওয়ায় যদিও ভূপতি একটু সন্তুষ্ট হইল তবু আর একদিক দিয়া তার মনটা খারাপ হইয়া উঠিল। সুরমা তার সঙ্গে কথা বলে না।

ভূপতির বেতন বৃদ্ধি হইলে সে সেদিন খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিয়া পুরাতন অভ্যাসবশে হঠাৎ সুরমার গায়ে হাত দিয়া কি একটা সোহাগের কথা বলিতে গিয়াছিল, তাহাতে সুরমা ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, "কি সাহসে তুমি আমার গা ছুঁতে এসো! বেশ্যার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে এসে আমায় ছুঁতে লজ্জা করে না। ফের যদি ছোঁও গলায় দড়ি দেব বল্‌ছি।" বলিয়া সে গিয়া স্নান করিয়া বস্ত্র-ত্যাগ করিল।

সুরমার এ-সব ব্যবহার ভূপতির চক্ষে ক্রমে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার ভিতরের পুরুষ এবং স্বামী একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া বলিল, স্ত্রীর এত স্পর্দ্ধা ভাল নয়। তা ছাড়া সে এমনই বা কি করিয়াছে? সে এক নিঃশ্বাসে অনেক এমন বড় বড় নামজাদা লোকের নাম করিতে পারে যারা তার চেয়ে অনেক বেশী অপকার্য্য করে, এবং তাদের স্ত্রীরা তার জন্য কিছুই বলে না। সুরমা কি এক স্বর্গের দেবী যে এই সামান্য কারণে সে এতটা বাড়াবাড়ি করিতে থাকিবে? ইহা ভূপতির পক্ষে দারুণ অপমান! এই বলিয়া সে অন্তরে অন্তরে ফুলিতে লাগিল, কিন্তু এ অপমানের প্রতিকার করিবার কোনও চেষ্টা, এমন কি ভাষায় প্রতিবাদ করিবার পর্য্যন্ত কোনও উদ্যোগ সে করিতে পারিল না। সে কেবল মনে মনে গুমরাইতে এবং বেশী করিয়া হুইস্কী খাইতে লাগিল।

ভূপতি আরও লক্ষ্য করিল যে জ্যোতির সঙ্গে এখন সুরমার বড় বেশী ভাব। এখন সব সময় তার কথাবার্ত্তা জ্যোতির সঙ্গে! আগে যে সব বিষয়ে সুরমা আলোচনা করিত একমাত্র ভূপতির সঙ্গে, তার যে-সব ফরমায়েস হইত ভূপতিরই উপর, এখন সে-সব হয় জ্যোতির সঙ্গে। তা' ছাড়া ভূপতি যখনি আসে তখনই দেখে সুরমা জ্যোতির সঙ্গে মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেছে, সে আসিলেই দুজনের কথা বন্ধ হইয়া যায়, এবং প্রায়ই দুই জনে দুই দিকে চলিয়া যায়। এ-সব দেখিয়া তার বড় রাগ হইত, বিশেষ করিয়া জ্যোতির উপর। কিন্তু কিছু বলিবার তার সাধ্য ছিল না।

একদিন সে বাড়ী আসিয়া দেখিল সুরমা জ্যোতির সঙ্গে বসিয়া খুব নিবিষ্টভাবে কি আলাপ করিতেছে। সে একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিল। বিশেষ কিছু শুনিতে পাইল না, কিন্তু তার মনে হইল তারা ভূপতির সম্বন্ধেই আলাপ করিতেছে।

কথাটা মোটেই ভূপতির সম্বন্ধে হইতেছিল না। জ্যোতি সেই ভিখারিণীর সঙ্গে গিয়া তাড়াতাড়ি একখানা খোলাঘর

ভাড়া করিয়া তার কন্যাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল এবং দাই ডাকাইয়া সে যুবতীর সুপ্রসবের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তার পর হইতে সেই মা ও মেয়ে সেখানেই থাকে, জ্যোতি তাদের খরচ পত্র দেয় এবং তাদের কিছু কিছু উপার্জ্জনের উপায় করিবার চেষ্টা করে। সে একটা যাঁতা এবং কিছু ছোলামটর কিনিয়া তাহাদের দিয়াছিল এবং একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া মেয়েটিকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইতেছিল, যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে তাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল যে ভিক্ষাবৃত্তি ও যথেচ্ছাচারে ইহাদের স্বভাব এমন বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, ইহাদিগকে একেবারে নিজেদের হাতে ছাড়িয়া দিলে ইহাদের কোনওরূপ উন্নতি অসম্ভব। তাই সে রোজ একবার সেখানে গিয়া তাদের দেখা শোনা করিত এবং তাদের শিক্ষা দিত।

তারপর সে পথে ঘাটে ঘুরিয়া কয়েকটি হতভাগ্য শিশু সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সে এই ঘরে আশ্রয় দিয়াছিল। ক্রমে তার প্রতিষ্ঠান বাড়িয়া উঠিল, জ্যোতিকে আরও ঘর লইতে হইল এবং ইহাদের দেখাশোনা ও শিক্ষা কার্য্যের জন্য অনেক সময় ইহাদের সঙ্গে কাটাইতে হইল।

সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, ইহাদের জন্য একটা স্থায়ী বাসস্থান জোগাড় করিতে পারিলে অনেকটা কাজের সুবিধা হয়। সে খুঁজিয়া নারিকেলডাঙ্গায় একটা জমীর সন্ধান করিয়াছিল। হাজার তিনেক টাকা হইলে সে জমীটা লইয়া একটা মাথা গুঁজিবার মত স্থান করিয়া লওয়া যায়। সে সেই জমীটা বায়না করিয়া আসিয়াছে।

এ সমস্ত কাজ জ্যোতি আগাগোড়াই তার বউদিদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া করিয়াছে, এবং এই বাড়ী করিবার প্রস্তাবটা একরকম সুরমারই। তাই সে আজ আসিয়া সুরমাকে তার কৃতকর্ম্মের পরিচয় দিতেছিল। টাকার প্রসঙ্গে সে কেবল একবার মাত্র ভূপতির নাম করিয়াছিল।

ভূপতি গট্ গট্ করিয়া সেখানে আসিয়া বলিল, "কি পরামর্শ হ'চ্ছে দুজনে? আমার সম্বন্ধে কি কথা হ'চ্ছে শুনি।"

জ্যোতি বলিল, "বিশেষ কিছু নয় দাদা, আমার কিছু টাকার দরকার—তিন হাজার, তোমার কাছে চাইতে হ'বে তাই বলছিলাম।"

ভূপতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "তিন হাজার টাকা কি দরকার শুনি।"

"একটা বাড়ী কিনবো।"

"তিন হাজার টাকায় বাড়ী! কলকাতায়! তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি?"

"না দাদা, আমাদের মতন বাড়ী নয়, একটু জমীর উপর খানকয়েক খোলা ঘর।"

"কেন তা' দিয়ে কি হ'বে?"

"কয়েকটি গরীব দুঃখীর থাকবার ব্যবস্থা হবে।"

"হুঁ তা বুঝতে পেরেছি। তিন হাজার টাকা দিয়ে ঘর হ'বে গরীব দুঃখীর থাকবার। কেন টাকা কি খোলাম্‌কুচি? তিন হাজার টাকার তিনটি পয়সাও পাবে না, আর তা ছাড়া তোমার এই সব বাঁদরামো চলবে না। এখন তিন মাস নেই একজামিনের বাকী, তুমি যে সারাদিন টো টো ক'রে সব বাজে ধান্ধায় ঘুরে বেড়াবে সে চলবে না।"

জ্যোতি বলিল, "আমি তো একজামিন দেবো না।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জ্যোতির দিকে চাহিয়া ভূপতি বলিল, "একজামিন দিবি না কি রে?"

জ্যোতি বলিল, "না আমি পড়বো না আর। আমি এই কাজই ক'রবো।"

ভূপতি কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিয়া বলিল, "ও সব বাঁদরামি চলবে না; লক্ষ্মী ছেলের মত পড়বে পড়, নইলে স্পষ্ট বলছি আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না।

চিরস্নেহ-পরায়ণ দাদার মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া জ্যোতি নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া দাদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া শেষে বলিল, "দাদা,—"

ভূপতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাটির দিকে চাহিয়াছিল, সে তীব্র স্বরে বলিল, "আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।

আমার এক কথা—প'ড়বে পড়, না হয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।"

সুরমা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে এ-কথায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কি মাতালের মত বকছো? কাকে কি বলছো তুমি?"—

বাধা দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ভূপতি বলিল, "হাঁ গো হাঁ আমি মাতাল, আমি বদমায়েস, যত সাধু তোমার ঐ দেওর। তা' মাতাল হই বদমায়েস হই, আমি বাড়ীর কর্ত্তা, আমার এই হুকুম।"

বলিয়াই সে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। যদিও সে যথেষ্ট তেজ দেখাইয়া কথাগুলি বলিতেছিল তবু তার প্রাণের ভিতরটা ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, এই ভাবিয়া যে, তার এ কথার এমন মর্ম্মান্তিক উত্তর হইতে পারে, যাহার জবাব সে দিতে পারিবে না। সেখানে দাঁড়াইয়া সুরমা বা জ্যোতির কাছে সে জবাব শুনিবার তার সাহস ছিল না। তাই সে তেজ দেখাইয়া তার ভীরুতা আবরণ করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

তন্ময়

শ্রীলীলাদেবী

আপনার মুখে হেরি তাহার বয়ান
            শিহরি চমকে,
প্রতি অণু ভরি ওঠে উদ্দাম পরাণ
            উছাস্ পুলকে!
হেরিতেছি কার মুখ? আমার না তার?
মুকুর করে কি আজি ছল অনিবার?
    সেই মুখ, সেই চোখ, তেমনি চাহনি
    সেই তো করুণা মাখা অধর তেমনি,
আপনারে আপনি কি করিব প্রণাম;
কেমনে গৌর হ'ল তনু তার শ্যাম?
    চোখ মুছি ফিরে দেখি যদি ভ্রম হয়
    কই ভ্রম? সেই মুখ—এতো ভুল নয়
বিচিত্র মুকুর সখি, কি কলা-কুশল,
আমার এ মুখে দেখি সে মুখ কেবল!

দুই লাউ

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মাচার লাউ ছিল বাঁশের মাচাটিতে
বনের লাউ ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল রাঁধুনীর মনে !
বনের লাউ বলে মাচার লাউ ভাই
মাচাতে কি করেই ছিলে,
মাচার লাউ বলে বনের লাউ, হায়
বনেতে কেন গজাইলে ?
বনের লাউ বলে—না,
আমি, সে কথা ফাঁস না করিব,
মাচার লাউ বলে—ছিঃ
আমি, আর না তোরে শুধাইব।
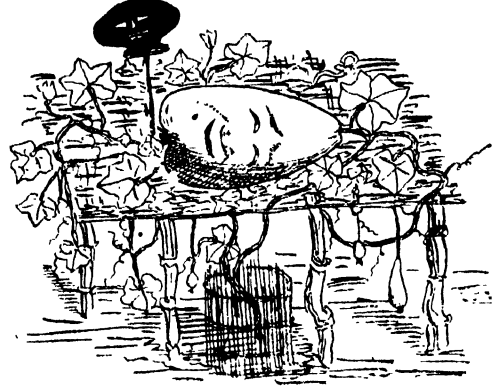
বনের লাউ ভাবে ঝাঁকাতে শুয়ে শুয়ে
বনের লাউ মোটা কত,
মাচার লাউ দেখে বাঁকানো বোঁটা তার
চিকণ টিকীটির মত।
বনের লাউ বলে মাচার লাউ ভাই
বনের লাউ কিবা কালো,
মাচার লাউ বলে বনের লাউ ভাই
মাচার লাউ খেতে ভালো।
বনের লাউ বলে—না,
আমি, চিংড়ী মাছে মজে যাই,
মাচার লাউ বলে—ধ্যেৎ
তুই, কেবলি বীচিতে বোঝাই।

দুই লাউ

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

বনের লাউ বলে গাছের ডালগুলি
জড়াতে সুখ লাগে বেশ,
মাচার লাউ বলে কাঠির বেড়া দিয়ে
ঘেরাও থাকা কি আয়েস !
বনের লাউ বলে ঝড়েতে দোল খাই
চীনের যেন গো ফানুস,
মাচার লাউ বলে রোদেতে গড়াইলে
হাঁ করে দেখে যে মানুষ।
বনের লাউ বলে,—না,
সেথা, হাঁড়িতে চুণ কালি মাখা,
মাচার লাউ বলে,—চুপ্
বনে, ছাগলে টেনে খায় শাখা।

এমনি দুই লাউ দোঁহারে দোষ দেয়
তবু না খচাখচি মেটে,
ঝাঁকার ফাঁকে ফাঁকে দরশে কটমটি
রাগেতে মরে যেন ফেটে।
দুজনে কেহ কারে হারাতে নাহি পারে
হারিতে কেহ নাহি চায়,
দুজনে যথাযথা দাপটি কহে কথা
শাসায়ে ডাকে, কাছে আয় ;
বনের লাউ বলে—না,
আমি, ছুঁতেও করি তোরে 'হেট্',
মাচার লাউ বলে—ইস্,
তোর, বঁটিতে কাটা যাবে পেট।
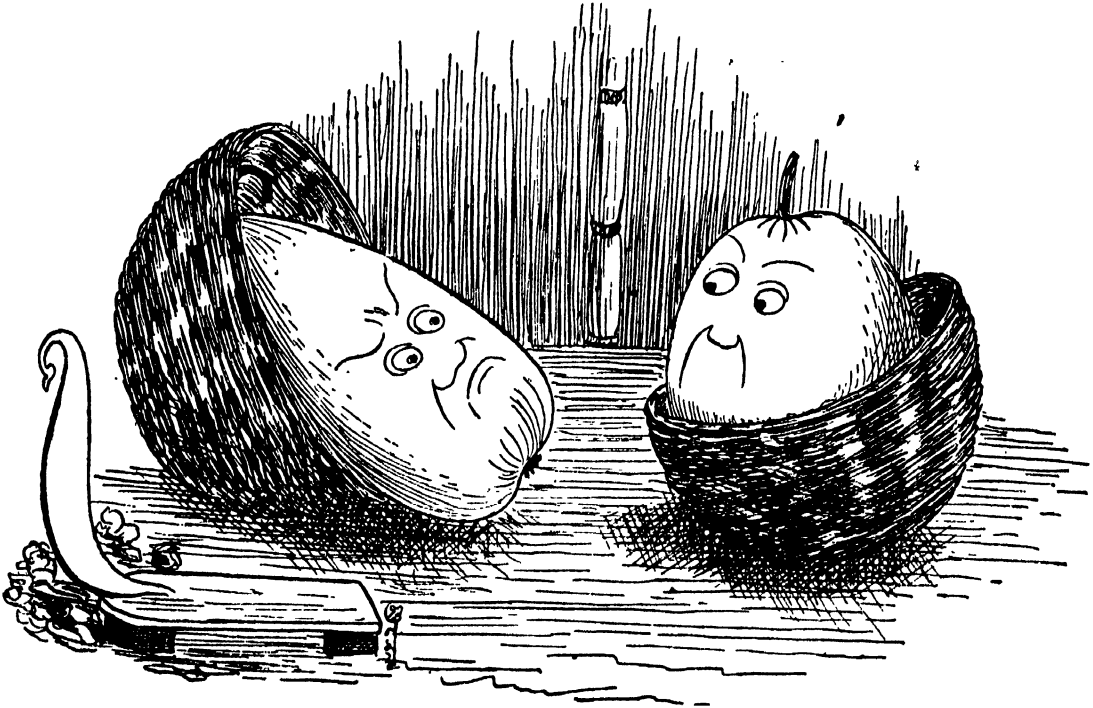
বৈজুর ক্রন্দন

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

চরিত্র-পরিচয়

মিসেস্ হালদার

মিঃ হালদার

বৈজু } চাকর
সাধু

দৃশ্য পরিচয়

বাগান-ঘেরা একতালা একখানা বাড়ী। বাড়ীর খোলা বারান্দায় মিঃ এবং মিসেস্ হালদার বসিয়া চা পান করিতেছিলেন।

প্রকৃতি পরিচয়

শীতের কালের অপরাহ্ণে বাগানের গাছে গাছে মাঠে মাঠে সূর্য্য-তেজের প্রখরতা ক্রমেই মলিন হইয়া আসিতেছিল।

মিসেস্ হালদার

হ্যাঁ ভালকথা ; বৈজু যে আবার দেশে যাবার জন্য ছুটী চাচ্ছিল।

মিঃ হালদার

সে-কি! এইত সেদিন দেশ থেকে ঘুরে এল, এর-মধ্যে আবার দেশে যাবে কি ?

মিসেস্

বল্‌ছিল ছেলের জন্যে আমার বড় মন কেমন কর্‌ছে ক'দিন ধরে, একবার দেশে গিয়ে ছেলেটাকে দেখে আস্‌তে চাই।

মিঃ

আব্দার! পরের চাকুরী কর্ত্তে গেলে কথায় কথায় অত মন কেমন কর্লে চলে না।

মিসেস্

সে যা হয় তুমি ওকে বলে দিও, বড় জ্বালাতন কর্‌ছিল সকাল বেলা আমাকে।

মিঃ

বেশ ছিল—বছরের পর বছর কেটে যেত, দেশে যাবার নামও কর্ত্ত না। এই বছর পাঁচেক আগে বুড়ো বয়সে দেশে গিয়ে একটা বিয়ে করে বস্‌ল, সেই থেকে খালি দেশে যাওয়ার জন্য ছট্‌ফটানি।

মিসেস্

বিয়ে করেও ততটা হয়নি, ছেলে হওয়ার পর থেকেই ঐ রকম হয়েছে।

মিঃ

না, না, এখন ওর দেশে যাওয়া হবে না। আর ও গেলে এদিক চল্‌বেই বা কেমন করে ?

মিসেস্

আর ত কিছু নয়, চলে একরকম যাবেই, খালি খোকা-টাকে নিয়ে ভাবনা। খোকাটা ওর বড় বাধ্য হয়েছে কি না, ওকে চোখে হারায়।

মিঃ

তবে ? তুমি ওকে বলে দিও যে, এখন ও ছুটী পাবে না।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

মিসেস্

আমি কিছু বল্‌তে পার্ব্ব না, যা হয় তুমি বলে দিও।

মিঃ

(উচ্চৈঃস্বরে) বৈজু! বৈজু!

বৈজু

(অন্তরালে) হুজুর!

(বৈজুর প্রবেশ)

মিঃ

তুই নাকি আবার দেশে যেতে চাইচিস্?

বৈজু

হ্যাঁ হুজুর।

মিঃ

এই ত সেদিন দেশ থেকে ঘুরে এলি, এর মধ্যে আবার দেশে যাওয়া কি?

বৈজু

হুজুর, ছেলেটার জন্যে বড় মনটা কেমন কর্চ্ছে কদিন ধরে।

মিঃ

তোর আক্কেল ত খুব! দেখচিস্ খোকা তোকে একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না, কোন আক্কেলে দেশে যেতে চাইচিস্?

বৈজু

হুজুর, আমি কি খোকাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি? তবে মনটা বড়ই ছট্‌ফট্ কর্চ্ছে একবার ছেলেটাকে দেখ্‌বার জন্যে। সেও ঠিক এই খোকার মতন এত বড়ই হয়েছে।

মিঃ

না, এখন দেশে যেতে পাবে না।

বৈজু

হুজুর, শুধু যাব আর আস্‌ব—একহপ্তার ছুটী।

মিঃ

না—যা।

(বৈজুর নতমুখে প্রস্থান)

মিসেস্

তা এক কাজ করুক না।

মিঃ

কি?

মিসেস্

দেশে কাউকে লিখে দিক না, ছেলেকে আর বউকে এখানে রেখে যেতে। সকালবেলা আমাকে বলছিল আমি ছেলেটাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না মেমসাহেব। এবার দেশে গিয়ে তাদের নিয়ে আস্‌ব, তারা এইখানেই থাক্‌বে আপনার কাজকর্ম্ম কর্ব্বে।

মিঃ

তুমি ওর ঐ কথা শুনে একেবারে গলে গেলে যে দেখ্‌ছি। এখানে আবার কতকগুলো লোক বাড়িয়ে কি হবে? বিশেষতঃ খোকারই বয়সী ছেলে, এলেই খোকার খেলার সাথী হবে। এ বয়সে খোকাকে কিছুতেই ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে মিশ্‌তে দেওয়া উচিত নয়।

(এক টেলিগ্রাম্ হস্তে বৈজুর প্রবেশ)

বৈজু

হুজুর, আমার নামে এ কি তার এসেছে দেখুন ত।

মিঃ

(টেলিগ্রাম্ পড়িয়া) By Jove! Extremely bad news. His son is dead!

মিসেস্

সে কি?

বৈজু

কি হুজুর?

মিঃ

'Your son dead come at once.' Read it

(টেলিগ্রাম্ মিসেস্ হালদারের হাতে দিলেন)

বৈজু

কি হুজুর ?

মিঃ

You tell him I don't know what to say. আমি চল্লাম্।

(মিঃ হালদার উঠিয়া গেলেন)

মিসেস্

তোমার দেশ থেকে তার এসেছে।

(বৈজু নীরব)

মিসেস্

তোমার ছেলের খুব ব্যামো, এখুনি তোমায় দেশে যেতে লিখেছে।

(বৈজু নীরব)

ব্যামো!

মিসেস্

খুব বেশী ব্যামো, আজকেই তুমি দেশে চলে যাও।

(নীরব বৈজু)

মিসেস্

কখন তোমার দেশে যাওয়ার ট্রেন ?

বৈজু

(আর্ত্তস্বরে) মেমসাহেব!

মিসেস্

তোমার দেশের গাড়ী ছাড়ে কটায় ?

বৈজু

সন্ধ্যা ছটার সময়।

মিসেস্

এখুনি যাও জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও। কিছু টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়ে যাও।

(বৈজু নতমুখে চলিয়া গেল)

মিসেস্

(উচ্চৈঃস্বরে) সাধু! সাধু!

(সাধুর প্রবেশ)

মিসেস্

বৈজু ছটার ট্রেনে দেশে যাবে ঠাকুরকে বলো এখুনি রান্না চড়িয়ে দিতে, বৈজু যেন খেয়ে যেতে পারে।

(সাধুর প্রস্থান ;

মিঃ হালদার পুনরায় প্রবেশ করিলেন)

মিঃ

কি বল্লে ?

মিসেস্

বল্লাম আজকেই দেশে চলে যেতে। তুমি কিছু টাকা ওর সঙ্গে দিয়ে দাও।

মিঃ

তা না হয় দিচ্ছি, কিন্তু খোকার কি ব্যবস্থা হবে ?

মিসেস্

সে যেমন করে হোক্ ভুলিয়ে রাখতেই হ'বে। তাই বলে ত আর এখন ওকে আট্‌কে রাখা যায় না।

মিঃ

বল্লে কি ?

মিসেস্

বল্লাম তোমার ছেলের বড় বেশী অসুখ, এখুনি দেশে চলে যাও।

মিঃ

কি বিপদ! বেশ ছিল, বুড়ো বয়সে একটা বিয়ে করেই এই সব মুস্কিল।

(ছুটিয়া খোকার প্রবেশ)

খোকা

মা, বৈজু চলে যাবে কেন ?

মিসেস্

যাবে না ? ওর মাকে দেখ্‌তে যাবে না ?

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

খোকা

না। যাবে কেন ?

মিসেস্

ওর মার জন্যে ওর মন কেমন করে না ? যাবে, মাকে দেখে আবার চলে আসবে।

খোকা

না, যাবে না।

মিঃ

ছিঃ খোকা, অমন কর্ত্তে নেই। বৈজু চলে গেলে আমি তোমাকে সাদা দুধের মত একটা কুকুর ছানা কিনে দোব।

খোকা

না। বৈজু যাবে না।

মিসেস্

ছিঃ খোকা, অমন করে না। (মিঃ হালদারের প্রতি) তুমি খোকাকে নিয়ে একটু মোটরে বেড়িয়ে এস। খোকা মোটরে বেড়াতে যাবে ?

খোকা

না। (কাঁদিতে লাগিল)

মিঃ

কি মুস্কিল।

(বৈজু প্রবেশ করিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল।)

মিসেস্

থাক্, থাক্, ও আমার কাছেই থাক। তুমি যাও, তৈরী হয়ে নাও।

বৈজু

একটু থাকুক আমার কাছে।

(খোকাকে কোলে করিয়া বৈজুর প্রস্থান)

মিসেস্

বাজ্‌ল কটা ?

মিঃ

সাড়ে চারটে।

মিসেস্

সাধুকে একবার ডাক না।

মিঃ

সাধু! সাধু!

(সাধুর প্রবেশ)

মিসেস্

রান্না চড়ান হয়েছে ?

সাধু

হ্যাঁ মেমসাহেব।

মিসেস্

বৈজু জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নিয়েছে ?

সাধু

না। আপনাদের কাছ থেকে গিয়ে এতক্ষণ বাগানে ঝাউগাছ তলায় চুপ ক'রে বসেছিল। তারপর খোকার কান্না শুনে এসে খোকাকে নিয়ে গেল।

মিসেস্

এক কাজ কর, তোমাতে আর সেঁথিয়াতে বৈজুর জিনিষপত্তর গুলো গুছিয়ে দাও।

(সাধুর প্রস্থান)

মিসেস্

বৈজু খোকার কতকগুলো পুরোণো জামা চাইছিল, ছেলের জন্যে দেশে নিয়ে যাবে।

মিঃ

আর জামা দিয়ে কি হবে ?

মিসেস্

চায় যদি ত দিতেই হবে।

মিঃ

চাইবে ত বটেই, ছেলের অসুখ শুনে দেশে যাচ্ছে জামা নিতে ভুলে যাবে ?

মিসেস্

কি জানি।

(এমন সময় বাগানে বৈজুর মুখে খোকার ঘুম পাড়ানি গান শোনা গেল)

মিঃ

ওর যাবার ত কোন লক্ষণ দেখ্‌চি না। ঐত খোকাকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে।

মিসেস্

কটা বাজ্‌ল?

মিঃ

পাঁচটা বাজ্‌তে দশ মিনিট।

মিসেস্

সময় ত বেশী নেই।

মিঃ

তুমি যাওনা; গিয়ে একবার দেখ না।

মিসেস্

থাক্, খোকাকে যদি ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পারেত ভালই হ'বে, নৈলে যাবার সময় খোকা একটা কাণ্ড কর্‌বে।

মিঃ

কত টাকা দিতে হ'বে?

মিসেস্

পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দাও।

মিঃ

অত টাকা নিয়ে কি কর্ব্বে?

মিসেস্

এ সময় গিয়ে স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে আস্‌তে হবে ত।

মিঃ

তা বটে। ছোটলোক টাকা হাতে পেলেই শোক অনেকটা ভুলতে পার্ব্বে।

(নতমুখে বৈজুর প্রবেশ)

মিসেস্

কি? খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে এলে?

বৈজু

হ্যাঁ।

মিসেস্

এইবার যাও, শীগ্‌গির শীগ্‌গির গুছিয়ে নাও। তোমার ত আর সময় বেশী নেই।

(বৈজু নীরব)

মিসেস্

কি? কিছু বলতে চাও?

বৈজু

(কম্পিতকণ্ঠে) মেমসাহেব আমি যাব না।

মিসেস্

কেন?

বৈজু

খোকাকে ছেড়ে আমি যেতে পার্ব্বনা মেমসাহেব—আমি যাব না।

(বৈজু আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল)

মিঃ

ওকি? পাগল হলি নাকি? ও রকম করে কাঁদচিস্ কেন?

বৈজু

হুজুর, খোকা কি সহজে ঘুমুতে চায়। এক একবার ঘুমিয়ে পড়ে আবার চম্‌কে জেগে উঠে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে "বৈজু তুমি যাবে না"। যখন আমি কথা দিলাম যে আমি যাবনা, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুল—দুহাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে।

মিসেস্

তা হোক্, তুমি ত শীঘ্র চলে আস্‌বে—যাও।

বৈজু

না মেমসাহেব, খোকাকে আমি ফাঁকি দিতে পার্ব্বনা, আমি যাবনা।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

মিঃ

কিন্তু তোর ছেলের অসুখের কথা একবার ভাব্‌ছিস্‌ নে ?

বৈজু

হুজুর, কতদিন তাকে দেখিনি,—তা আর কি করবো ? খোকা জেগে উঠে যখন দেখ্‌বে আমি চলে গেছি খোকার দু'চোখ দিয়ে জল পড়বে—সে আমি পার্ব্বনা হুজুর ! খোকাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে সে'ও আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে—

(বৈজু আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। মিঃ এবং মিসেস্ হালদার পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন— কিছুক্ষণ সকলে নীরব)

বৈজু

তার চেয়ে আমি যাব না। খোকা জেগে উঠে আমায় দেখে হাসলে আমার ছেলের অসুখ আপনিই ভাল হ'য়ে যাবে—মেমসাহেব, আমি যাব না।

ভাব ও অভাব

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

সনেট

যদি

যদি না কহিতে কথা ; না ফুটিত যদি
নয়নের ভাষা ওই অধর কোনায় ;
হৃদি না উঠিত কাঁপি ; সুখে বেদনায়
বাহুমাল্য না শোভিত কণ্ঠে নিরবধি ;—
যদি না আসিত রাতি ; রহিত স্তবধি
মিলনের লগ্ন শুভ গোধূলি সীমায় ;
বাঁশী না বাজিত সুরে ; মধু পূর্ণিমায়
প্রেম না ফুটিত রূপে জনম লবধি !

মিলনের ক্লান্ত স্মৃতি বাসর প্রভাতে
ফুটিত না সুরে কভু বিদায়ের সাথে।

হয়ত বা বহুদূরে কল্পলোকে আজি,
মুহূর্ত্তটী—বুকে ধরি' অনন্ত বরষ—
ভরিয়া রাখিত মোর কল্পনার সাজি
স্বপনে রাখিত ঢাকি মিলন পরশ।

চিরন্তনী

সে যে জেগেছিল মোর বাঁশরীর সুরে—
আমার নয়ন পাতে ফুটেছিল রূপে,
পরশে সঙ্কোচ ছিল, কথা চুপে চুপে.
দৃষ্টি ছিল কল্পলোকে কোথায় সুদূরে।
সেই রজনীটি মোর এই মর্ত্ত্যপুরে
পরিশ্রান্ত মিলনের তীব্রগন্ধ ধূপে
কোথা মিশে গেল আজি—স্মৃতি অন্ধকূপে
হারানু কবে না জানি ক্ষণিকা বধূরে।

মুহূর্ত্তের জ্বালা শুধু ; যে গিয়েছে যাক,
অতীতের বাঁধা বীণা রহুক নির্ব্বাক।

আমার মানস কুঞ্জে আমি জানি তবু
ব্যর্থ হয় নাই সেই অভিসার রাতি ;
মানসী প্রিয়া সে মোর ভোলে নাই কভু
জ্বালিয়া রেখেছে চির মিলনের বাতি।

শিল্প-গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

একটা অচল শিল্পকে সচল করবার ভার যে ব্যক্তি অতি সহজভাবে সকল সমালোচনা ঠেলে নিয়েছিলেন, তাঁর বিষয় দু'কলমে-যে কিছু লিখ্‌তে পারব তা' ভরসা রাখি না। তবে সোজাসুজি তাঁর কাজ, তাঁর চিন্তা যা' ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌বার ও জান্‌বার সুযোগ পেয়েচি তাই এই প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করব। কৃতকার্য্য হব কিনা জানি না।

যখনকার কথা বলচি তখন ভারতের চিত্রকলা অজন্তা, রামগড়, বাগ্‌, সিগিরিয়া, অনুরাধাপুর, দান্তোল প্রভৃতি ভারতের ও সিংহলের নানাস্থানে শতজীর্ণ কাঁথার মত ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় গুহা-গহ্বরে লুকানো আছে, আর মোগল ছবি ইউরোপের "টুরিষ্ট্‌দের" মারফৎ "কিউরিও" হিসাবে দেশবিদেশে চালান যাচ্চে। দেশে ইংরাজী-শিক্ষাগর্ব্বিত আমাদের মুখে মুখে তখন মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, রসেটি প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের সংবাদ ঘোষিত হচ্চে। বল্‌তে লজ্জা করবার কিছু নেই, এই লেখকও র‍্যাফেলের স্বপ্ন ছেলেবেলায় তখন খুবই দেখ্‌তেন। সস্‌ পেণ্টিং, লাইট্‌ এণ্ড শেড্‌, পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌ প্রভৃতি বুলির খৈ ফুটছে আর্ট স্কুলের ভিতরে ও বাইরে, এবং অজ পাড়াগাঁয়েতেও চলেছে। রবিবর্ম্মার ছবি, বৌবাজারের আর্ট্‌-ষ্টুডিওর লিথোগ্রাফ্‌ ইত্যাদি তখনকার দিনের ছিল খুব ভাল ছবির মাপকাঠি। এ হেন ভারত-চিত্রকলার দুর্দ্দিনে শিল্পলক্ষ্মীর প'ড়ো দেউলে নতুন প্রদীপ জ্বাল্‌লেন বাংলাতে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ কি বত্রিশ হবে। বাজারে গুজব র'টে গেল "লর্ড কার্জ্জন আর হ্যাভেল সাহেব দু'জনে মিলে এই অবনীন্দ্রবাবুর সাহায্যে ভারতবর্ষ থেকে 'ফাইন আর্ট' বিসর্জ্জন দেবার একটা "পলিসি" করেচে—আসলে ভারতবর্ষে "ফাইন আর্ট" (painting) কস্মিনকালে ছিল না, এবং দেশের আর্টের উন্নতি ইউরোপীয় আর্টের নকল ক'রে যাও বা হ'তে পারত, তাও এঁরা হ'তে দেবেন না"। দেশময় খবরের কাগজের পাতায় পাতায় নানান্‌ সমালোচনা চল্‌তে লাগল। হাফ্‌টোনের শৈশবাবস্থায় "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় অস্পষ্ট ছাপার ভিতর তাঁর চিত্র প্রচার হওয়ায় সে সময় দেশের লোকের মনে সে ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হ'য়ে গেল। এ বিষয় "ফিনিসিং-টচ্‌" দিলে বাঙলার সুপণ্ডিত সাহিত্যিক স্বর্গীয় সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের "সাহিত্য"।

ঠিক্‌ যে সময় অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব কলকাতার আর্ট স্কুল ছেড়ে বিলাতে চ'লে গেছেন এবং পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে নিয়ে কলকাতা আর্ট স্কুলে নতুন চিত্রকলা শিক্ষার পত্তন দিচ্ছেন, এই সময় তাঁর কাছে এই লেখকও হাজির হ'য়েছিলেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রতে। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারতচিত্রকলা বিভাগটির নাম "Advanced Design Class" রাখা হ'য়েছিল। তারই এক অংশে দেশী রীতিতে নানা মণ্ডন শিল্প, যথা,—lacquer work, stained glass design, wood carving প্রভৃতি শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। ভারত-চিত্রকলা বিভাগে কোনো বেতনের ব্যবস্থা ছিল না। বরং শিষ্যদের কিছু কিছু বৃত্তিরও তিনি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও কখন কখন ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য ক'রতেন। কিন্তু কিছুদিন ধ'রে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা তাঁর বিভাগে যাবার কোনোই আগ্রহ প্রকাশ ক'রত না। ১৯০৭ সালে লর্ড কিচ্‌নার ও কয়েকজন ইংরাজ ও দেশীয় উৎসাহী মহোদয়ের যোগে তিনি এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রাচ্য শিল্পকলা সমিতি স্থাপনা করেন। সেই সময় এ সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র একত্রিশ। পাঁচ জন দেশীয়

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

সভ্য, বাকি সবই ইউরোপীয়। ১৯০৮ সালে ঐ সমিতির প্রথম চিত্র প্রদর্শনী কলিকাতা আর্ট স্কুলে ঐ হয়। সেই প্রদর্শনীতে প্রথমে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এবং এই লেখক প্রভৃতি মাত্র কয়েকজন শিল্পীর আঁকা দেশীয় ধরণের চিত্র দেখান হ'য়েছিল। এই সমিতির প্রদর্শনীর শিল্পীসংখ্যা ক্রমে ক্রমে প্রতি বৎসর বেড়েই চলেচে—এখন ভারতীয় পদ্ধতির শিল্পীসংখ্যা অন্যূন দুই শতের উপর। এই প্রদর্শনীই অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের শিল্পকলা প্রচারের বিশেষ বাহন।

আমরা শুনেচি তিনি শৈশব থেকেই শিল্পকলার অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'য়েছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে তৎকালে সঙ্গীত চর্চ্চা, শিল্প চর্চ্চা ঘরে ঘরে চল্‌চে। কবিগুরু পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বের কাছে জ্ঞাত ছিলেন না, তাই তখন তিনি তরুণ আত্মীয়দের তাঁর কিরণ-পাতে আলোকিত করবার সুযোগ পেতেন। তার মধ্যে দুজনের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল—একজন বাণী কবি বলেন্দ্রনাথ এবং অপর শিল্পসেবী অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পকলার উৎসাহ দিলেও পরবর্ত্তীকালে ভারত-শিল্পকলার বিকাশের কর্ণধার অবনীন্দ্রনাথই এ বিষয় সন্দেহ নাই।

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে 'কলাভবন' স্থাপনার পূর্ব্বে ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত আমি যখন শান্তিনিকেতনে শিল্প-শিক্ষক নিযুক্ত ছিলুম তখন থেকে এ বিষয় কবিকে বিশেষভাবে এই চিত্রকলার দিকে আকৃষ্ট হ'তে দেখি। অবনীন্দ্রনাথের শৈশবে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে দু'জন চিত্রশিল্পী ছিলেন, একজন কবি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অপরটি ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ যে বিশেষভাবে শিল্পচর্চ্চা ক'রতেন একথা তখন আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন জানা ছিল না—তাঁরা সত্যবাবু এবং হিতুবাবুকেই তাঁদের বাড়ীর আর্টিষ্ট্ ব'লে জানতেন। এঁরা দু'জন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। পূজনীয় স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পেনসিলে আঁকা মূর্ত্তিচিত্রের কথা হয়ত অনেকেই জানেন। আমরা "ভারতী" ও "বালক" পত্রে অবনীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রকাশ ও হিতেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখেচি। তখনও অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে কেহই তত জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে যে চিত্রাঙ্গদার ছবি আঁকিয়েছিলেন তা' থেকে তাঁর এই অসাধারণ সৃজনী শক্তি অঙ্কুরিত হ'তে দেখা যায়।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভারত-শিল্পকলার প্রবর্ত্তনের কথা যে কি ভাবে কখন ঠিক্ তাঁর মনে এসেছিল তা' তিনিই ব'লতে পারেন। তবে যা' তিনি এ বিষয়ে লক্ষ্ণৌয়ের শিল্প প্রদর্শনীতে বক্তৃতাকালে বলেচেন এবং যা' আমাদের পূর্ব্বে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, তা' থেকে এই মনে হয় যে, সেটা একটা তাঁর মনের ভিতরকার তাগিদের মত একদিন সহসা এসেছিল এবং তিনি নির্ভয়ে ভারত শিল্প চর্চ্চায় লেগে গিয়েছিলেন কোনো গুরুর কাছে না শিখেই। তবে তিনি আমাদের শেখানর সময় গোড়ায় গোড়ায় ব'লতেন, "তাইত হে তোমাদের এনাটমি শেখাচ্চি না, শেড্ এণ্ড লাইট শেখাচ্চি না—ভুল পথে নিয়ে যাচ্চি না ত?" কিন্তু তিনি কৌতুকছলেই একথা ব'লতেন, আর এ ভাব তাঁর তখন স্থায়ীভাব ছিল না। তা'ছাড়া তিনি জাপানের নব যুগের সংস্কারক এবং জাতীয় শিল্পের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় ওকাকুরাকে বন্ধুভাবে পাওয়ায় এই মহৎ অনুষ্ঠানে বিশেষ একটা জোর পেয়েছিলেন। ওকাকুরা তাঁকে চাটুকারের মত বাড়িয়ে দিয়ে কখনও উৎসাহ দেন নি—বরং আমরা জানি খুব শক্ত সমালোচনার দ্বারাই তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, তাঁর পথই সমগ্র ভারতের শিল্পতীর্থ যাত্রীদের পথ। রবীন্দ্রনাথ ও ওকাকুরা ছাড়া তাঁর উৎসাহী বন্ধুদের মধ্যে ই, বি, হাভেল সাহেবের নাম গোড়ায়ই উল্লেখ করা উচিত। আমরা শুনেচি, গুণগ্রাহী হাভেল সাহেব তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে ওঠেন এবং তাঁর স্কুলের শিক্ষক স্বর্গীয় হরিনারায়ণ বসু মহাশয়ের দ্বারা অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। অবনীন্দ্রনাথ তখন

ঘরে ব'সে আপনার খেয়ালে বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন ক'রে ধারাবাহিক ছবি ভারত-শিল্পপদ্ধতিতে আঁকছিলেন। সেই চিত্রগুলি দেখে হ্যাভেল সাহেব মোহিত হন এবং তাঁকে তাঁর সহকারীরূপে পাবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠেন। অবনীন্দ্রনাথ চিরকাল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত হ'য়েছিলেন, দাসত্বের ভার তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল; কিন্তু কেবল হ্যাভেল সাহেবকে বন্ধুভাবে লাভ করবার লোভে তাঁর সহকারীরূপে কাজ ক'রতে তিনি প্রবৃত্ত হন।

অবনীন্দ্রনাথ যে শুধু দেশেরই শিল্পকলায় যুগান্তর এনেচেন তা' নয়—সমগ্র পৃথিবীর। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দীতে ইটালীয় শিল্পী র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি কয়েকজনে যেরূপ ইউরোপের শিল্পকলার যুগ পরিবর্ত্তন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে আবার এই ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীতে অবনীন্দ্রনাথও তেমনি নবযুগের সৃষ্টি ক'রলেন। তিনি যে ভাবধারা পরিবর্ত্তন ক'রলেন তা' আমাদের দেশের পক্ষে নূতনও বটে এবং পুরাতনেরও গৌরব বৃদ্ধি করে। "যদ্দৃষ্টম্ তল্লিখিতম্" এই হ'ল আধুনিক বিশ্বচিত্রকলার কথা। কিন্তু তিনি একেবারে ধ্যান-কল্পনার সাহায্যে চিত্রকলা চর্চ্চার প্রবর্ত্তন ক'রে দিলেন;—শিল্পীকে শুধু কারীগর নয়, কবি ক'রে দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

অবনীন্দ্রনাথ কলকাতার আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ হওয়ায় কাগজে প্রতিবাদ হওয়া ছাড়া স্কুলের ছাত্ররা এবং মাষ্টারেরা একযোগে ধর্ম্মঘট ক'রলেন এই ব'লে যে, তাঁকে এনে গভর্মেণ্ট ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে "ফাইন আর্ট" শেখাবার পথ বন্ধ ক'রে দিলে, অতএব এ আর্ট স্কুল পরিত্যাজ্য। অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবও তখন অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতশিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করচেন। তিনি যত ইটালীয় গ্রীক্ প্রভৃতি প্লাস্টারের বড় ছোট মূর্ত্তি স্কুলে মডেলরূপে ব্যবহার হ'ত, সেগুলি নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর জলে বিসর্জ্জন দিলেন এবং যত বিলাতি তৈলচিত্র চিত্রশালায় রাখা ছিল সেগুলিকে একে একে নিলাম ক'রে দিলেন; তার পরিবর্ত্তে অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে প্রাচীন

শিল্প-গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলী চিত্রশালার জন্যে সংগ্রহ ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথও তাঁদের নিজের বাড়ীতে একটি প্রাচীন চিত্রকলার সংগ্রহ ক'রেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের এই প্রাচীন চিত্র সংগ্রহকালে চিত্রকলার বিষয় যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

তাঁর নিকট ভারত-শিল্পকলা জানবার ও শেখবার জন্যে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রথমে এলেন শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। তাঁর কাছে তিনি কিছুদূর অগ্রসর হতে-না-হতেই সেই বছরেই এলেন প্রতিভাবান শিল্পী স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রতে—এবং তার ঠিক পরের বছর এই লেখক। তার অব্যবহিত পরে মহীসুরের দরবারের তরফ থেকে প্রেরিত হ'য়ে এলেন ভেঙ্কাটাপ্পা, আর এলেন, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি আরো কয়েকজন। লঙ্কাদ্বীপ থেকেও সে-সময় একজন এসেছিলেন তাঁর নাম 'নাগাহাওয়াত্তা'। শিষ্যদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ খুবই মধুর। তিনি কখনও শিষ্যদের গুরুমশাই হ'য়ে কঠোর শাসনের দ্বারা ভয় দেখাতেন না, বা খুব বেশী নিজের হাতে এঁকে-জুকে বা সংশোধন ক'রে দিতেন না। তিনি নিজে শিষ্যদের সঙ্গে ব'সে যেতেন ছবি আঁকতে, আর বন্ধু ভাবে গল্প-গুজব করতেন। সেই গল্প-গুজবের মধ্যেই শিষ্যেরা এমন অনেক তথ্য জানতে পারত যা' কোনো কলেজের লেক্‌চারে সম্ভব নয়। তিনি ভারতের, জাপানের, এমেরিকা ও ইউরোপের শিল্প ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কাছে এমন ভাবে বলতেন যা' কখনও আমরা ভুলেও ভাব্‌তে পারতুম না যে তিনি আমাদের শেখ্‌বার জন্যে বিশেষ ভাবে বলছেন। নানান্ সহজ কথার ভিতর দিয়ে তিনি ক্রমশ ক্রমশ শিষ্যদের মানুষ ক'রে তুলতেন, শেখানো নিয়ম আয়ত্ত করাতেন না। ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলা শিল্পকলার মধ্যে যে কতটা দরকার তা' তিনি জান্‌তেন এবং সেইজন্যেই আজ তাঁর শিষ্যরা নিজের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেচে। সে সময় তাঁর প্রবর্ত্তিত নূতন ধরণে আঁকার পদ্ধতিটা আমাদের কাছে নূতনই তিনি রেখে দিয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের উপর চাপাতে চাননি। তিনি জান্‌তেন যে, জাতীয় ঐতিহ্যের চর্চ্চার দ্বারা ক্রমশ তাঁর শিষ্যদের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব নিজের নিজের কাছে ফুটে উঠ্‌বে এবং সেইজন্যে তাদের তিনি সে বিষয় জান্‌বার ও দেখ্‌বার বিষয় যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে Lady Herringham-এর অজন্তা চিত্রাবলী নকল করবার অভিযানে নন্দলাল বসুকে এবং এই লেখককে ১৯০৯-১৯১০ এবং ১৯১০-১৯১১ সালে শীতকালে যেতে হয়। তাঁদের সাহায্যের জন্যে তাঁর আরো কয়েকটি শিষ্যও সে সময় অজন্তা গিয়েছিলেন। * অজন্তায় যাওয়ার ফলে নন্দলাল বসুর শিল্পকলা অজন্তার প্রেরণা লাভ ক'রে উন্মেষিত হ'ল; আর এই লেখকেরও সে সময় তরুণ বয়সেই শিল্প-শিক্ষা মার্জ্জিত হ'য়েছিল সেই বিরাট শিল্পকলা দেখে ও নকল ক'রে।

দেশী ভিত্তিচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি (Frescoe Painting) সম্বন্ধে চর্চ্চা অবনীন্দ্রনাথ নিজে ক'রেছিলেন। জয়পুর থেকে কারীগর আনিয়ে প্রাচীন রাজপুতনার ধরণে দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকার কৌশল শিখেছিলেন। তাঁর কচ ও দেবযানী ছবিটী একটি এই প্রকারের ভিত্তিচিত্র। হ্যাভেল সাহেবের সর্ব্বপ্রথমে লেখা বই The Indian Painting & Sculpture-এ তার একটি সুন্দর প্রতিলিপি আছে। শিষ্যেরা অজন্তা থেকে ঘুরে এলেও বিশেষ ভাবে ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে চেষ্টা কেউই বড় একটা করেন নি। তাঁর দেখাদেখি নন্দলাল বসু ও এই লেখক কয়েকবার মাত্র মাটি দিয়ে দেয়ালের গায়ে ও কাঠের পাটায় আঁকার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার পদ্ধতি কখনও এক ভাবে একই রাস্তায় চলেনি। কখন কাঠের উপর তৈলচিত্রও এঁকেছেন যথা "মৃত্যুশয্যায় সম্রাট সাজাহান"। তবে তাঁর বেশির ভাগ ছবিই কাগজে লেখা। জাপানি ধরণে রেশমের কাপড়ে তিনি আমাদের আঁকতে শিখিয়েছেন, কিন্তু নিজে কখনও জাপানি ধরণে সিল্ক-পেন্টিং করেন নি। বাঙলার পুরাতন পটের ধরণে কাপড়ের উপর তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। তা' ছাড়া তাঁর রঙ গোলবার বা লাগাবার পদ্ধতি

* লেখক প্রণীত "অজন্তা" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

গতানুগতিক tempara, opaque, transparent হিসাবে, অথবা রাজপুত, মোগল, অজন্তা বা কোনো প্রাচীন শিল্পের দেখান রাস্তা ধ'রে চলে না। বরাবরই আমরা দেখ্‌চি তিনি খেলার ছলে রঙ তুলি নিয়ে কাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নানান ধরণ (style) আপনি তাঁর চিত্রপটে গজিয়ে উঠ্‌চে। সেইজন্যেই তাঁর প্রতিভা মাষ্টারী করবার মত একটা মাপকাঠি বা নিয়ম প্রণালী (canon) নিয়ে শিষ্যদের ব্যতিব্যস্ত করেনি। তিনি তাঁর কাজের দ্বারাই শিষ্যদের অভিনব চিন্তা ও ভাব-রাজ্যে নিয়ে যান। তারাও তাই তাঁর নিকট ভাবতে শিখেচে, দেখতে শিখেচে এবং দেখাতেও শিখেচে। এবিষয় বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোনাল্ডশে প্রণীত The Heart of Aryavarta বই থেকে কয়েকটি কথা তুলে দিচ্চি :—

"It is interesting to recall the fact that these two artists, (Dr. A. N. T. and G. N. T.) now generally recognised as the founders of the modern Bengali school of painting, were at this time ignorant—so they have informed me—of the tradition and formulæ embodied in the Silpa Sastras, the Indian classic on fine art. Yet impelled by a curious spiritual *malaise* they embarked upon the work which was so soon to bear fruit. It was though deep down in the subconscious regions of their being the instinct of the old Indian masters was striving to find expression. The atmosphere amid which they worked may be gathered from a description of them given by an acute observer, as aiming at the development of an indigenous school of imaginative painting stimulated by their own example and by the study of the legends of Sanskrit literature. In the family residence of the Tagores in Dwarka Nath Tagore Lane in Calcutta, they gathered round them a group of artists, many of whom—Nanda Lal Bose, O. C. Ganguly, Khsitindra Nath Mazumdar, Asit Kumar Haldar, Surendra Nath Kar, and Mukul Chandra Dey, to mention but a few—have since made names for themselves as exponents of the modern school of Indian painting. The studio where this interesting circle met was described by the same observer as being not so much a school for the encouragement of indigenous art, as a place for the development of taste, for the cultivation of sense of beauty, a love of beautiful things, especially such beautiful things as are expressive of the mind of India in its evolution."

তাঁর কতকগুলি শিষ্য ও শিষ্যের-শিষ্য আজকাল ভারতবর্ষের নানান স্থানে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য নন্দলাল বসু আজকাল শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় এখন বড়োদার কলাভবনে ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপক, শ্রীমান্ মনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত লঙ্কাদ্বীপের মাহিন্দ কলেজের শিল্প-শিক্ষক, শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাহোর মেয়ো স্কুল অব আর্টের সহকারী অধ্যক্ষ, প্রবন্ধ লেখক লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট আর্ট এণ্ড ক্রাফ্‌ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং শ্রীমান্ বীরেশ্বর সেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকার রেওয়াজ আজ ভারতের নানাস্থানে দেখা দিয়েচে। বম্বে আর্টস্কুলেও দেখাদেখি অজন্তার ধরণের ভিত্তিচিত্র আঁকবার আজকাল প্রয়াস চলচে, আর অপরাপর স্থানেও এই ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির প্রচলনের চেষ্টা হচ্চে। অবনীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি, এই ভারত শিল্পকলার আদর, দিন দিন ভারতবর্ষে যত বাড়তে থাকবে ততই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকবে। ১৯০১ সাল থেকে তাঁর একান্ত চিন্তা ও চেষ্টার ফলে তাঁর বন্ধু হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহে যে ভারতীয় শিল্পকলার আদর আজ এই ২৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের দশ দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্চে তাতে ভরসা হয় ভারত শিল্পকলা জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল—এর আর অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। এখন এই বরণীয় শিল্পীর উদার উদাহরণ দেখে দেশের শিল্পী ও বণিকেরাও যদি তাঁরই মত দেশের রুচি ফেরাবার চেষ্টা করেন এবং বসনে ভূষণে তৈজসপত্রে সকল বিষয়ই তাঁর মত দেশীয় বিশেষত্বে মণ্ডিত ক'রে তুলতে পারেন ত দেশের মর্য্যাদা বাড়ে এবং আমরা যে একটা পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যজাতি বেঁচে আছি তা' প্রমাণিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্র শিল্প ছাড়াও দেশের গৃহশিল্প (Cottage Industry) সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির উদ্যোগ করেছেন। তার ফলে Bengal Home Industry-র

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

দোকান আজও ক'লকাতায় বর্ত্তমান আছে। তিনি নিজের বাসগৃহের চেয়ার টেবিল গুলিরও আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে দেশী ছাঁদে সেগুলিকে তৈরী ক'রে দেশী তৈজসপত্রেরও একটা দিক্ খুলে দিয়েচেন। ধনী গৃহের কেদারা প্রভৃতি সাধারণতঃ দেখা যায় বিলাতের ফ্যাসানের উচ্ছিষ্ট, যা' বহুকাল থেকে ইউরোপ অচল ব'লে (out of fashion) পরিত্যাগ করেচে, তাই শোভা পাচ্চে। নূতন ধরণ বা প্রাচীন ভারতীয় ধরণের কোনো জিনিষের প্রবর্ত্তন করা তাঁদের কস্মিনকালে মাথায়ও আসেনি। অবনীন্দ্রনাথের পথ অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিচিত্রা সভার জন্যে যে আসবাব পত্র তৈরী করিয়েছিলেন তা' সত্যই আদর্শ। এই ভাবে নাটকে পট যবনিকা প্রভৃতির ভিতরও যা' কিছু অভিনবত্ব রবীন্দ্রনাথের নাট্যের অভিনয় কালে দেখা যায় তারও গোড়ায় আছেন এই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। অনেকের ধারণা এই যে চিত্রশিল্পীরা কারু-শিল্প সম্বন্ধে চিরকালই অনভিজ্ঞ—কিন্তু তা' সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মাইকেল এঞ্জিলো যে চিত্রকর হয়েও স্থাপত্য-কলায় কত অভিজ্ঞ ছিলেন তার সাক্ষি ইটালীর বড় বড় সুন্দর সুন্দর হর্ম্মাবলী এখনও দিচ্চে। ভাটিকানের ঝাড়বাতির নক্সা র‍্যাফেল ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে জানা যায়। তেমনি অবনীন্দ্রনাথ যেমন চিত্র আঁকতেও পটু তেমনি গহনার জন্যে নক্সা, আসবাবপত্রের জন্যে নক্সা, সকল বিষয়েই ভারত শিল্পীদের পথ প্রদর্শক। তিনি আজ যে দীপ ভারতশিল্পের ভাঙা দেউলে জ্বালিয়ে দিলেন তা' চিরকাল জ্বলবে এবং ভরসা হয় তার কিরণ ক্রমশ ভারতময় বিকীর্ণ হ'য়ে আরো উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌বে।

এখন তিনি ক'লকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতকলা বিষয়ে বক্তা নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁর কায়মনোবাক্যের দ্বারা এতদিন যে দেশের শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশের দশের নিকট আবেদন ক'রে আসচেন, তাঁর সে ডাক আজ সবাইকার কানে পৌছেচে দেখে খুবই আনন্দ হয়। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছেই গোড়ায় গোড়ায় বক্তৃতা দিতেন, ক্রমশ দেশ তাঁকে যখন দেশের শিল্পকলার অগ্রণী ব'লে গণ্য করলে তখন থেকে প্রকাশ্যভাবে বড় বড় সভায়ও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হচ্চে।

"ভারতশিল্প" কেতাবটি এইরূপ বক্তৃতার সমষ্টি এবং ভারত শিল্পের বিষয় বাঙলাভাষার এই প্রথম বই। ভারতশিল্প-কলার বিষয় প্রবন্ধ প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী ও মানসী পত্রিকায় অসংখ্য বেরিয়েচে। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে "বাঙলার ব্রতকথা" বইটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক। প্রাচীন শিল্পকলার যোগসূত্র এই ব্রতকথা ও আলপনার ভিতর বাঙলা দেশে এখনও কিছু পাওয়া যায়। তার প্রচারের দ্বারা তিনি গৃহস্থালী শিল্পকলারও যে একটা দিক খুলে দিয়েচেন সে বিষয় সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে যদিও তাঁর বইটির বহুল প্রচার হয়নি কিন্তু ফরাসীদেশে তার খুব প্রচার হয়েচে—তারা আলপনার নকলে পর্দ্দা চাদর মণ্ডন ক'রে গৃহের শ্রীবৃদ্ধি করচেন। তাঁর ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, পালক, ভূতপত্‌রীর দেশ প্রভৃতি বইয়ের পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। তাঁর ভাষাও তাঁর চিত্রকলারই মত রঙ ও রেখায় রূপকে ফোটায়—যা তাঁর একেবারেই নিজস্ব—যার নকল করাও কারুপক্ষে সহজসাধ্য নয়। ছোট ছোট সহজ কথার ছবি ফোটাতে তিনি একেবারে অদ্বিতীয়। রূপকথার ভাষাতে রূপ ফোটানোর ক্ষমতা বাঙলার লেখকদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ভাষার এই দৈন্য তিনি মিটিয়েচেন। আধুনিক বাঙলা ভাষা যাঁদের লেখনীর দ্বারা আজ এতদূর পুষ্ট হয়ে উঠেচে অবনীন্দ্রনাথও তাদেরই মধ্যে একজন। তাঁর রচিত "ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ" এবং "ভারতশিল্পের এনাটমি" বই দুখানি শিল্পসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডাক্তার উপাধীতে ভূষিত করে দেশের শিল্প ও ভাষারই মর্য্যাদা বাড়িয়েচেন। গভর্মেণ্টও তাঁকে C. I. E. টাইটেল দিয়ে তাঁর মর্য্যাদা যত না বাড়ান দেশের শিল্পকলার ও শিল্পীদেরই আদর ও কদর দেখিয়েচেন। তাঁর মর্য্যাদা শুধু টাইটেল লাগানোর দ্বারাই যে বেড়েচে তা বল্‌লে ভুল হবে। কেননা তাঁর এই সকল অযাচিত টাইটেল পাবারও ঢের পূর্ব্বে থেকেই আমরা দেখেচি দেশ-বিদেশের গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি, রাজন্যবর্গ তাঁর দ্বারিকানাথ

ঠাকুরের গলিস্থ বাসভবনে তাঁর ছবি দেখতে ও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করতে বহুদূর থেকে এসেচেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Prof. W. Rothenstien ভারত ভ্রমণে এসে কলকাতায় বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করবার জন্যে এসেছিলেন। Rothenstien এখন বিলাতের Royal College of Art-এর অধ্যক্ষ। এইরূপ অনেক শিল্পজগতের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেচেন এবং তাঁর সঙ্গে ভাববিনিময়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন। রাশিয়ার সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও শিল্পী নিকোলাশ বোরিক্, পারিনগরীর কারুকুশলা বিদুষী শিল্পী মাদাম কার্প্লে, পোলাণ্ডের অদ্বিতীয় চিত্রকর কাল্‌মিকফ্, নরওয়ের মূর্ত্তিচিত্রবিৎ জুয়েল ম্যাড্‌সেন, জাপানের নবশিল্পের দিক্‌পাল তাইকোয়ান, কাৎসুতা, হিসিতাসান কাম্পো আরাইসান প্রভৃতি বহু দেশের শিল্পাচার্য্যগণ তাঁর কাছে এসেচেন আমরা দেখেচি। তাছাড়া লর্ড হার্ডিং, লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোনাল্ডশে প্রভৃতি লাটসাহেবেরা তাঁর সখ্যতায় মুগ্ধ হয়েচেন।

এখন লেখক বিদায় নেবার সময় ১৩১৯ সালে অবনীন্দ্র-নাথের শান্তিনিকেতন কলাভবনে অভ্যর্থনাকালে যে একটি কবিতা শিল্পীদের তরফ থেকে রচনা ক'রে তাঁর বন্দনা করেছিলেন সেইটি এখানে উদ্ধৃত ক'রে, এবং পুনরায় তাঁকে বন্দনা ক'রে বিদায় প্রার্থনা করচেন :—

চিত্র-কলার কবি তুমি—
আলোক তুলি হাতে,
ভারত বাণীর চিত্তটিরে
জাগাও আপনাতে।
বর্ণ ছটার সুরের মীড়ে,
অঙ্গারেতে ফলাও হীরে
অমর রেখাপাতে।
রূপের দীপে অরূপ আলো
হৃদয় মাঝে তুমিই জ্বালো
রসের বেদনাতে।

দূর্ব্বা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

আদিম শৈশব-যুগ উতরিয়া যবে
ধরিত্রী পশিল নব যৌবন সীমায়,
দিনে দিনে উদ্ঘাটিত তনুর গৌরবে
আচ্ছাদিতে নীল সিন্ধু-বাসে না কুলায়,
উপরে তপন মেলি লোলুপ নয়ন
একদৃষ্টে নেহারিল সে আনগ্ন রূপ,
লজ্জা লোম হরষণে সহসা তখন
অঙ্কুরিল দুর্ব্বারাজি ; ঢাকিল অনুপ
নিম্নভূমি সনে উচ্চ গিরি-সানু-দেশ ;
শ্যামল নিচোলা পৃথ্বী চকিত সম্ভ্রমে
হেরিল সে আপনার নবোদ্গত বেশ।
মর্ম্মভেদী রবি-রশ্মি স্নিগ্ধ হল ক্রমে ;—
নিশি আসি চুপে চুপে চুম্বনে তাহার
পরাল সে পরিচ্ছদে মুকুতার হার।

আন্ধ্‌লি রাইতে

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

ছাওয়ার ভারে আকাশখানি কাজলা কালো,
নিরুদ্দিশে দিন ফুরাল্যো ;
সাঝের আগেই জ্বাল্‌লি বাতি বেদিশ্‌ হয়্যা,
কাপণ ভরা দাহণ লয়্যা—
আপনারি যে বুকের তলায় নিবলো শেষে,
ঘরখানি তোর ডুব্‌লো যে রে
গহিণ ঘন অতল আন্ধে, আগ্‌-রাইতেই,
জ্বাল্‌লি বাতি যার লাইগা, সে না আইতেই।

নিদ্‌-নিথরি রাইতের অকূল পাথার পারে
আঝইরে আর কান্দিস নারে,
বুকের যত রক্ত-রসের জ্বলন লাগা
আভোরে এই একলা জাগা
হৈবো সারা সেকি রে তোর চোখের জলে ?
নিশুৎ রাইতের আন্ধার তলে
দিষ্টি যদি হারায় দিশা, পরাণ খানি—
জাগত্যাছে যে একলা একা,—হরিণ-কাণি।

কালায় কালো-কালিন্দীরা আন্ধ্‌লি নিশা,
নাই কোন দিগ্‌ নাইরে দিশা ;
এমুন রাইতে তোর লাইগা যে ছাড়ল্যো ঘর,
ঠিকণা হারা পথের পর
তার পায়েরি চলন-লাগা শব্দটী সে,
আলখ পথের আপনারি যে
বুকের ধিকি ধোনির মত যাইবো শুনা,
এক পলকে থাম্‌ব্যো তোর এ পহর গুণা।

বিহাণ কালে ভিজা রৈদের কাচা সোণায়
আঙিণাটীর কোণায় কোণায়
ফুটলো হাসি পাখ্‌রি-মেলা ফুলের দলে ;
এমুন সোমে আগুণ তলে—
আইলো সে যে, থাম্‌ল্যো সে যে খ্যানেক কাল,
মুখের তারি হাসির জাল—
চক্‌মকা সে রৈদের পরে পড়ল্যো ছায়্যা,
তুই ক্যাবলি বিভোর চোখে থাক্‌লি চায়্যা।

তারপরে সে আইলো রাইতে জোচ্‌না ভরা,
দিগ্‌বিদিগে কাপণ ধরা—
—বাঁশীর সুরে— যেইখানে যে স্বপন আছে,
—আন্‌ল্যো তোরি বুকের কাছে,
আছিলি হায় আজন্মেরি গান-উপাসী
সেদিন খালি শুনলি বাঁশী ;
গাথলি মালা রৈলো বান্ধা আচল-আড়ে,
রাইত পোয়াইতে আপন হাতে ছিড়লি তারে।

মিলন মাঝে গাহান-হাসির আড়াল যত
আন্ধ্‌লি রাইতে হৈলো গত।
আইজ ক্যাবলি হাতের পরে হাতটী থুয়ায়
কাপণ ভরা একটী ছুয়ায়
পড়ব্যো ঝর্‌য়্যা এক পলকে সরম টুক্‌,
সুখের ভারে আবশ বুক
রাখ্‌রিরে তার কাপণ-লাগা বুকের পরে ;
জাগণ তোর এ নিব্‌বো রাইতের শেষ পহরে।

প্রগতি

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১)

প্রগতি বোল্‌তে আদর্শ কিম্বা প্রেরণা অনুসারে অগ্রসর হওয়া বুঝি।

মানুষই আদর্শ সৃষ্টি করে। মানুষই প্রেরণার আধার। মানুষই অগ্রসর হয়।

অগ্রসর হওয়ার এক নাম পরিবর্ত্তন।

(২)

মানুষের অগ্রস্থতি সরল রেখায় নয়। অতএব পুরাতন জ্যামিতির নিয়ম এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

জীব-জগতের পরিবর্ত্তন চারিধারে হয়। মানুষের পরিবর্ত্তন তারও বাইরে। সেখানে দিক্ নির্ণয় অসম্ভব, দিক্ নেই বোলে। মানুষ তার জ্যামিতি এবং জীবতত্ত্বের অংশটুকু জয় কোরে দিক্ হারিয়ে ফেলে।

জীবের পরিণতি কালের মধ্যেই। জীব-বিজ্ঞানে কালের যথেষ্ট মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। যদিও অভিব্যক্তিবাদই কালপূজার বোধন। মানুষের জীবনে কমা থেকে দাঁড়ি সবই আছে। জীবের স্থিতিই উদ্দেশ্য, মানুষের স্থিতি হচ্ছে মৃত্যু। অতএব জীবতত্ত্বের অভিব্যক্তিবাদ এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

মানুষ জড় ও জীব। তার ওপর মানুষের আত্মা আছে। অতএব জড় ও জীবজগতের নিয়ম এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও, একেবারে ভুল নয়। ভুল সংশোধিত হয়, অসম্পূর্ণতা লুপ্ত হয়, আত্মার সন্ধান পেলে। আত্মার কি নিয়ম জানি না। বোধ হয়, আত্মা নিয়মকর্ত্তা, আপনাতে আপনি অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ স্বাধীন। অতএব পরিবর্ত্তনের পরিণতি মানুষের স্ব-অধীনতা।

(৩)

প্রেরণা পূর্ব্বকালের, আদর্শ উত্তরকালের।

দেবতাও যে মানুষকে ভর করেন এবং মানুষের সব কার্য্যই দৈবিক,—বিশ্বাস কোরতে গেলে স্নানঘরের কলের জল সত্য এবং স্রোতের জলকে মিথ্যা গণ্য কোরতে হয়।

গোমুখীতে তীর্থস্নান না কোরে টালার ট্যাঙ্কের তলায় মাথা রাখলে কাজ চলে, পুণ্য হয় না।

(৪)

আদর্শের উৎপত্তি পুরুষ প্রকৃতির দ্বন্দ্বে। কালও প্রকৃতি। যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজের জড় প্রকৃতি এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে মানুষের গরমিল হয়, তখনই দ্বন্দ্বের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয়।

অশান্তির ফল দিবাস্বপ্ন, Utopia, রামরাজত্ব, সত্য-যুগ।

আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য শক্তি চাই। সব চেয়ে বড় শক্তি মানুষের সহজ প্রবৃত্তি। সহজ প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যে কয়টির সাহায্যে অশান্তি দূরীভূত হওয়া সম্ভব, সেইগুলির ব্যবহার স্থিরীকৃত হলেই ধর্ম্মাচার আরম্ভ হয়। আচারগুলি প্রথম প্রথম আদর্শের সহায় হয়। তার পর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাবের নাম ধর্ম্মবুদ্ধি। তৈরী জিনিষ হাতের কাছে পেলে কে আর খাটতে চায়? তখন মানুষ সব ধার্ম্মিক হ'য়ে ওঠে। আদর্শের পরিণতি ধর্ম্মগত প্রাণ হওয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি আদর্শের কারণ নয়। যে মানুষের মন ধর্ম্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন না হ'ল, সে মন নতুন আদর্শ গড়তে ব্যস্ত হ'ল। অন্যের ধর্ম্মবুদ্ধি, এমন কি নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিও, নতুন আদর্শ-গঠনের অন্তরায়। তখন আবার অশান্তি। এই চল্‌ল চিরকাল।

(৫)

আদর্শ-গঠন এক প্রকারের মূল্য-নির্দ্ধারণ। সে মূল্যের ভিত্তি সংখ্যা হ'লে আপেক্ষিকত্ব মানে কেবল বিয়োগ হ'ত। জীবন সরলরেখা হ'লেও তাই হ'ত, যেমন কগ সরল রেখা

শ্রীধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হ'লে কখ = কগ—খগ। বক্ররেখা হ'লে শুধু বিয়োগ হবে না। তখন একটি বিন্দুর মূল্য নেহাৎ একান্ত, অথচ তার নিকটবর্ত্তী ঐ ধরণের মূল্যবান অনেক বিন্দু রয়েছে।

মানুষ ফুটে ওঠে, চারিধারেরও বাইরে। তাতেও সময় লাগে।

(৬)

মূল্য শুধু সময়ের ওপর স্থাপিত কোরলে, যা কিছু হচ্ছে কি হবে, তাই, যা হয়ে গিয়েছে তার চেয়ে ভাল কিম্বা মন্দ প্রমাণিত হ'ত। বস্তুত তা নয়। অথচ সবই ঘট্‌চে কালের ভেতর। সেইজন্য মূল্যের গুরুত্ব নির্ভর করে কোন্‌টি কালের অতীত এবং কিসের সাহায্যে কালের অতীত হওয়া যায়, তার ওপর। যেমন সা, রে, গা, মা সাধবার পর গানের স্বাধীনতা। বড় খইগুলোই ভাজবার সময় খোলার বাইরে গিয়ে পড়ে। সমাজের ভেতর থেকে সমাজের বাইরে গেলে মানুষ মানুষ হয়। দ্বীপের মধ্যে রবিন্‌সন ক্রুসোর বাহাদুরী হিন্দুসভার সভ্যের মতনই।

(৭)

বুদ্ধি দিয়ে আদর্শ সৃজন কোরলে মানুষ কর্ত্তৃত্ব করবার আত্মপ্রসাদ উপভোগ কোরতে পারে, কিন্তু জীবনটা হয় কল। জীবনের খানিকটা কল, খানিকটা জীব—কিন্তু গোটা জীবন তারও অতিরিক্ত একটি অখণ্ড শক্তি। এই শক্তি আত্মার। আত্মশক্তি, আত্মোপলব্ধির, আত্মানুভূতির ফল। উন্নতি মানে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ।

(৮)

মানুষ বোলতে ব্যক্তি বুঝি। সমাজ কিম্বা দেশের কোন আত্মা নেই। আছে শুধু ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আচার-ব্যবহারের বিশেষত্ব। সমাজ ব্যক্তির সহায় এবং সুবিধা মাত্র। দেশাত্মবোধ আত্মার সংশ্লিষ্ট কোন বস্তু নয়, ব্যক্তিগত মনের তৈরী এবং সেই মনেরই মধ্যে সুবিধাসূচক মন্ত্র মাত্র। ব্যক্তিরই মন ও আত্মা আছে। ব্যক্তিই ইতিহাস সৃষ্টি করে।

(৯)

সমাজের সভ্যতা, ব্যক্তির বৈদগ্ধ্য। বৈদগ্ধ্যই গতি, অগ্রস্থিতি এবং প্রগতির মূলশক্তি। সভ্যতা সেই গতির রুদ্ধ অবস্থা, চরম অবস্থা, অর্থাৎ মৃত্যু। বৈদগ্ধ্য আত্মার বিকাশ। বুদ্ধির দ্বারা সেই বিকাশকে নিয়মে গ্রথিত কোরে বোঝবার প্রয়াসকে সভ্যতা বলা যেতে পারে। বৈদগ্ধ্যে উপনিষদ, সভ্যতায় টীকাভাষ্য। একটিতে মানুষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, আর্টিষ্ট, সম্পূর্ণ মানুষ; অন্যটিতে মানুষ কলের কুলী, যজ্ঞের পুরোহিত, স্কুল-মাষ্টার এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচক ও প্রবন্ধলেখক। একটির দেবতা ব্রহ্মা—রবীন্দ্রনাথ; অন্যটির দেবতা বিষ্ণু—৺ভূদেবচন্দ্র।

(১০)

অতএব সামাজিক উন্নতির কোনো মানে নেই। যে সমাজে আত্মার যতটুকু বিকাশ সম্ভব সে সমাজ ততটুকু উন্নত। নিজের মৃত্যু দিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের অবকাশ দেওয়াই উন্নত সমাজের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবকাশ কিম্বা সুযোগই আসল জিনিষ, সমাজে কয়জন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাঁদের সংখ্যা আসল জিনিষ নয়। 'ঘিলু' কিম্বা আত্মা 'জরীপ' করবার যন্ত্র হয়ত অধ্যাপক বিনয়কুমারের কাছে আছে, আমার কাছে নেই। তুলনামূলক বিচারে আত্মবিকাশের কোন মূল্য নেই। সে জন্য দুঃখ হত না যদি তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিতে অন্য কোন মাপকাঠি টিঁকে থাকত, কিম্বা তার সাহায্যে নতুন কোন 'জরীপ-যন্ত্র' তৈরী করা যেত। হয়ত একটা রবীন্দ্রনাথ দশটা শেলীর মতন, একটা ঋষি কুড়িটা সেণ্ট্‌ ফ্রান্সিসের সমান! কে জানে?

(১১)

আপাতত আমি এই মনে করি।

"সাউথ ৮৭৫১"

—গল্প—

—শ্রীপান্নালাল অধিকারী

রাত্রি প্রায় বারোটা। সন্ধ্যাবেলা থেকে নিত্যকার উৎসব চল্‌ছিল। আলো নিবিয়ে দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময়ে টেলিফোনে কিড়িং কিড়িং করে উঠ্‌লো। রিসিভারটা কানে দিতেই শুনি চমৎকার মিঠে মেয়ে গলা—

—হ্যালো, South 8741.—

—আজ্ঞে না, 8751 —

—ভুল নম্বর দিয়েচে, মাফ করবেন, এত রাত্রে বিরক্ত করলুম।

—Wrong number-এ চিরকালই পেয়ে থাকি হাজারীমল গম্ভীরচাঁদের গদী কিংবা চেতলার আড্ডিদের আড়ৎ। আমি কিছু মনে করবো না, আপনার যা বল্‌বার আছে আমায় বল্‌তে পারেন।

—আপনি বেশ মজার লোক, আপনাকে চিনি না অথচ—

—কিছু দরকার নেই চেন্‌বার, গোপন কথা বল্‌তে হ'লে অচেনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হাঁসের গলা জড়িয়ে দময়ন্তী কত কথাই না বলেছে, তা'তে সুবিধে যে প্রকাশের ভয় নেই।

—হাসালেন দেখ্‌ছি, আমার তো কিছুই বল্‌বার নেই আপনাকে।

—কেন, কোন কবিতাও কি মুখস্থ নেই, "পাখী সব করে রব" কিংবা "দেখ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত তব"? দেখুন, আপনাকে আজ কিছুতেই ছাড়ছিনে, কানে মিঠে আওয়াজ এই আমার প্রথম।

—কেন, আপনার বন্ধুবান্ধবদের—

—অসহ্য! শুন্‌লে আপনার রাত্রে ঘুম হবে না।

—আপনার গলাও তো কোকিলবিনিন্দিত বলে মনে হচ্ছে না, আর আমারও রাত জাগ্‌বার বাসনা নেই।

—আপনার রিসিভারের দোষ; আমার গান শুন্‌লে মত বদ্‌লাতেন।

—তবু যদি নেশা না করতেন।

—আশ্চর্য্য! আপনি আমার তথ্য আবিষ্কার করেছেন, কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে কি?

—বেজায়।

—দয়া করে এক মিনিট দাঁড়ান, টুথপেষ্ট দিয়ে মুখ ধুয়ে ষোলটা এলাচ চিবিয়ে আস্‌ছি।

—কাজ নেই, বাথরুমে পড়ে যাবেন।

—আপনার নামটা বল্‌বেন?

—না।

—বাড়ীর নম্বর?

—কেন?

—এক্ষুণি ট্যাক্‌সি করে গিয়ে আপনার বাড়ীর সাম্‌নে নেবে, মাথায় ভরা কলসীর উপর কুঁজো রেখে কুড়ি পা হেঁটে দেখিয়ে দেবো, নেশা আমার মোটেই হয় নি।

—ধন্যবাদ, এত রাত্রে সার্কাস দেখ্‌বার সখ নেই।

—কাল দেখা হবে কি?

—আশায় থাক্‌তে পারেন।

—আমার নম্বরটা টুকে নিন।

—মনে আছে।

—আট আর সাত পনেরো, তা'তে পাঁচ আর এক ছ'য়ে একুশ, তিন দিয়ে ভাগ করলে রইল সাত, সাতে সপ্ত ঋষি, মনে রাখ্‌বার সুবিধে হবে।

—(হাসিয়া) ভালো ঋষিবর, আপনি ধ্যানস্থ হউন, আমি চল্লুম।

*　*　*　*

পরদিন শনিবার। সন্ধ্যেবেলা থেকে অস্থির হয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, কখন বারোটা বাজবে। আমার

শ্রীপান্নালাল অধিকারী

বাড়ীর খুব কাছেই থাকতো সল্পপের জমীদারের ছেলে নরেন, আমিই ছিলাম তার বড় বন্ধু। সেদিন তার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তার সঙ্গে গেলুম না। বেচারী দুঃখিত হয়ে ফিরে গেল। বলে গেল পরে আবার মোটর পাঠিয়ে দেবে, যত রাত্রিই হয় একবার যেন যাই।

বারোটা বাজ্‌লো। খানিক পরেই কিড়িং-কিড়িং-কিড়িং, কালকের সেই মিঠে গলা।

—হ্যালো, South 8751—

—অভাগাই বটে।

—বেরুননি যে বড়!

—আপনার সাক্ষাতের আশায়।

—আপনার বন্ধুরা নিশ্চয়ই এসে ফিরে গেছেন।

—যেতে দিন, সব ক'টাকে ভোর রাত্রে গিয়ে আমাকেই ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

—লাইফ্‌বোট বিশেষ! ভালো, ঐ গানটা জানেন 'পিয়া বিনু নাহি'? কাল্‌কে তো বল্‌ছিলেন গাইতে পারেন।

—একশো বার। পিয়ারা সাহেব তো ঐ গানটা আমার কাছেই শিখে গ্রামোফোনে দেন; বিশ্বাস না হয়, কার-নবিশের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করবেন।

—বটে, আর 'প্রাণ যে গেল নিয়ে সে ত আর' ও-গান-টাও বোধ হয় স্বর্গীয়া বিনোদিনী দাসী আপনার কাছেই শিখেছিলেন!

—ও গানটা আমি প্রায়ই গেয়ে থাকি, তবে স্বর্গ-গতা যাঁর নাম করলেন তিনি যখন মারা যান তখন আমি শিশু।

—এখন তো আপনি যুবক বলে মনে হচ্ছে, বিয়ে-থা করেন না কেন?

—সাহস হয় না।

—সাহসের যদি কিছু দরকার থাকে, তবে আপনার যিনি সহধর্ম্মিণী হবেন তাঁরই আবশ্যক।

—এক্ষুণি প্রস্তাব করে দেখ্‌বো?

—না।

—কেন?

—আপনার মাত্রা ঠিক থাকে না।

—কোন রাত্রিতেও ত ষোল মাত্রার উপর যায় না।

—ওটা কমিয়ে ফেলুন। যাক্‌, আপনি রবিবাবুর গান ভালবাসেন?

—বিলক্ষণ।

—ঐ গানটা কেমন লাগে—'আজ শুক্লা একাদশী'?

—ঐটে ছাড়া; সাম্‌নের বাড়ীর মেয়েটা রোজ সন্ধ্যে-বেলা ঐ গানটা চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। এমন-কি রবিবাবু শুন্‌লে দুঃখিত হবেন, বইয়ের ও-পাতা-টাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

—বইখানি বোধ হয় আপনার নিজের নয়।

—না, আমার বন্ধু নরেনের বোনের, স্বয়ং গায়িকার।

—ছিঁড়ে ভালো করেননি, আর একখানা কিনে পাঠিয়ে দেবেন। আজ তাহ'লে আসি।

—কাল দেখা হবে তো?

—হতেও পারে।

—দেখুন আমার অবস্থা হলো, 'শুধু বাঁশী শুনেছি' ভাব।

—মেসেজ রেটে আমারি ক্ষতি, প্রত্যেক কলে দু'আনা।

—শ্রীরাধার কি আপশোষ, গোকুলে টেলিফোন ছিল না—নইলে রাত বারোটার সময়ে চাইতেন 'বৃন্দাবন 8751, হ্যালো নন্দঘোষের বাড়ী, একবার শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে দেবেন'।

* * * * *

এই ধরণের আলাপ প্রায় রোজই চল্‌তে লাগ্‌ল। এম্‌নি করে টেলিফোনের তার অবলম্বন করে এই অচেনা সুন্দরীর সঙ্গে এক অদ্ভুত মিলন-লীলা সুরু হলো। যাকে কখনো দেখিনি, কখনো দেখ্‌তে পাব এ-আশা করতে পারছি না; এমন কি যার নাম-ধাম পর্য্যন্ত জানি না, বোধ হয় সেই সময়টায় তাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভাল-বেসে ফেল্‌লুম। সন্ধ্যের পর আর ঘরের বাইরে যেতুম না, পাছে আমার রহস্যময়ী 'রিং' করে উত্তর না পেয়ে ফিরে যান। একে একে সমস্ত বন্ধু সরে পড়লো। আমার প্রিয় সুহৃদ্‌ নরেন পর্য্যন্ত আমার এই পাগ্‌লামীতে বিরক্ত হয়ে আমায় এক রকম পরিত্যাগ করলো। সন্ধ্যে

থেকে কেবলি রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকতুম, আর টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে শত শত প্রণাম জানাতুম। এমন-কি Exchange girls-দের মাইনে বাড়ানোর উমেদারী করে Statesman-এ এক লম্বা চিঠি ছাপিয়ে ফেল্লুম। যেমন চাঁদে পাওয়া বলে, আমাকেও তেম্নি ঐ টেলিফোনে পেয়ে বস্‌লো। আগে ফোনের বিল দেখে মাঝে মাঝে মনে হ'ত, এই অনাবশ্যক খরচটা বন্ধ করে দিই, এখন বিলগুলোকে frame-এ বাঁধিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছে করে। ভাব্‌তাম, এই নির্ব্বাক অথচ আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বাক্যের আধার, ছোট্ট রিসিভারটির ভিতর আমার সাত-রাজার ধন মাণিক লুকিয়ে আছে, একদিন সে নিশ্চয় তার স্বরূপ প্রকাশ করবে। দিনের পর দিন হাসিগল্পের ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত আশা-ভরসা, আমার যা কিছু পাপ-পুণ্য, ব্যথা-আনন্দ, এই অজ্ঞাত প্রেয়সীকে নিবেদন করে চলেছি।

*   *   *   *

একদিন বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে, জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। ঘণ্টার কাঁটা প্রায় একটার কাছাকাছি। সে-দিন আর তার সাক্ষাৎ পাব না বলে মনে হলো। কিন্তু একটা বাজতেই হঠাৎ টেলিফোনের কিড়িং কিড়িং, গলাটা একটু ভারী—

—হ্যালো South 8751.

—শ্রী চাতক।

—এত জলেও তৃষ্ণা মেটেনি ?

—চাতক তিন প্রকার।

—আপনি কোন্ শ্রেণীর ?

—প্রেমের। দেখুন একটা কথা ভাব্‌ছিলুম, একটা সামান্য ভুল থেকে যে-প্রেমের সৃষ্টি তা কি কখনো বাস্তব হতে পারে ?

—কি রকম ?

—যদি সে-দিন ভুল নম্বর না দিত তাহ'লে আমাদের এই প্রণয়,—রাগ করবেন না, আমার দিক দিয়ে ত বটেই,—এই প্রণয়ের সৃষ্টিই হতো না।

—ঐ নম্বরি যদি চেয়ে থাকি ? অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আচমকা কি বলে কথা আরম্ভ করি ! প্রণয়টা যে আপনার একতরফা সেটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাহ'লে !

কড়াং—ব্যস্ বন্ধ ! এত আশ্চর্য্য ব্যাপার, ক্ষমা চাইবারও আমার উপায় নেই। চুপ করে বসে রইলাম, আশা নিশ্চয়ই আবার আস্‌বে। প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার কিড়িং কিড়িং—স্বর অত্যন্ত ভিজে, বাইরের আকাশের মত।

—আপনি এখনো জেগে আছেন ? আমি মনে করলুম রাগ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার উপর অভিমানও করবার আমার উপায় নেই, যেহেতু আপনি আমার নম্বর জানেন না। যাক্ ঘুমোন।

—ঘুম ত আমার অনেকদিনই গেছে।

—কেন সেই 'শুক্লা একাদশীর' গানে নাকি ?

—না, সেই গানটা ছেড়ে মেয়েটা এবার ধরেছে 'দেখা পেলেম ফাল্গুনে'।

—এ-পাতাটাও তাহ'লে ছিঁড়তে হ'লো। আমি দেখ্‌ছি শেষে বইখানির মলাট ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বন্ধুর ভগ্নীর ওপর অত আক্রোশ কেন ? মনে মনে নিশ্চয়ই তাকে খুব ভালবাসেন।

—মোটেই না, আপনি ঐ সন্দেহটা একেবারে করবেন না। যদি ভাল কাউকে বাসি সে টেলিফোনের তারের ও-দিকটায় বসে আছে।

—Exchange girls-দের কথা বল্‌ছেন ? বন্ধুর ভগ্নীর নামটি কি ?

—মীরা। এখনো বেশ জলে হচ্ছে—

—মীরার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ?

—হ্যাঁ চেনা আছে বটে। দেখুন বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে গরম কিছু আছে তো, না থাকে আমার শালটা পাঠিয়ে দিই।

—সার ফিলিপ্ সিড্‌নী আর কি। নামটাই সইতে পারেন না দেখ্‌ছি, মেয়েটি খুব সুন্দরী বোধ হয় ?

শ্রীপান্নালাল অধিকারী

—আরে না, সাধারণত কলেজে-পড়া মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে, ও কিছু নয়। আমি হলফ্ করে বল্‌তে পারি, আপনি তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী। আজ ম্যাডানে একটা নতুন ফিল্‌ম্ ছিল।

—দেখেছি। আপনি রাস্তায় বেরুনোর সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন না বোধ হয়, নিশ্চয়ই মীরাকে দু'বেলা দেখে থাকেন।

—আপনাকে একটা কথা বলি, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। আমার bifocal চশমা, উপরের দিকটা দূরের জিনিষ দেখ্‌বার, নীচের দিকটা কাছের জিনিষ পড়বার। আমি সেটাকে উল্টে নিয়েছি, পাছে মেয়েটাকে দু'বেলা স্পষ্ট দেখ্‌তে হয়। ফিল্‌ম্‌টা কেমন্ লাগ্‌লো? আমার ভালো লাগেনি।

—চশমার কাঁচ ওল্‌টানো ছিল বলে ভালো দেখ্‌তে পান্ নি। আবার ঠিক করে নেবেন, তাহ'লে ফিল্‌ম্ আর মেয়ে দুটোই পছন্দ হবে। Telephone Directory-র পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে 'শঙ্করকুমার' নামটা পড়ে খেয়াল হলো লোকটার সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখি। তা দেখ্‌ছি আপনি মোটেই শঙ্করাচার্য্য নন, বেশ প্রেমে পড়েছেন।

—কার?

—মীরার।

—দোহাই আপনার, আর আমায় জ্বালাবেন না। আমি শপথ করে বল্‌ছি সে মেয়ের প্রেমে পড়িনি, পড়িনি, পড়িনি। আমাকে অন্যায় সন্দেহ করে পথে ভাসিয়ে যাবেন না।

—যে-রকম বৃষ্টি হচ্ছে তাতে সবাইকেই ভাস্‌তে হবে। দেখুন, কিছুদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, কলকাতার বাইরে যেতে পারি। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, বাংলা দেশে একটি মেয়ে আছে যে আপনার সমস্ত খবর রাখ্‌বে। যদি চট্ করে বিয়ে করেন তবে সে খবরটা Statesman-এর Personal column-এ দেবেন, আপনাকে একটা উপহার পাঠাবো। আচ্ছা, আমার গলার স্বরটা বেশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে হচ্ছে কি?

* * * *

তারপর মাস দুয়েক আর কোন সাড়া পাইনি। আমিও প্রায়ই বাড়ী থাক্‌তে পারতুম না। বন্ধুবর নরেনের একটা কঠিন অপারেশন করাতে হয়, প্রায় দু'মাস তার বিছানার পাশে বসে রাত্রি কাটিয়েছি। রোজ সকাল বেলা গিয়ে চাকরকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ রিং করেছিল কিনা, রোজই এক উত্তর 'না'। নরেনের ঘরে ফোনের দিকে তাকিয়ে কত রাত্রি এই কথাটাই মনে হয়েছে, টেলিফোনের তারে যে প্রেমের সৃষ্টি তা ছিন্ন হয়ে যেতে কতক্ষণ। আস্তে আস্তে সমস্ত জিনিসটাকে আমার একটা সুন্দর স্বপ্নের মতন মনে হতে লাগ্‌লো।

নরেনের অসুখ উপলক্ষে নরেনের বাবার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। নরেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু জানা সত্ত্বেও বৃদ্ধ যে আমাকে সন্দেহ করতেন না বরং স্নেহ করতেন, এইটে আমার বড় আশ্চর্য্য লাগ্‌তো। বোধ হয় তার কারণ তিনি যখন টেলিগ্রাম পেয়ে দেশ থেকে এলেন তখন দেখ্‌লেন আমার অক্লান্ত সেবা।

ক্রমে নরেন সেরে উঠ্‌লো। নরেনের পিতা আমার কুলশীলের পরিচয় পেয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করে বস্‌লেন। কিছুদিন প্রেমের রিহার্সাল দিয়ে ঐ রকম একটা জিনিষের জন্যই বোধ হয় আমার মন উন্মুখ হয়েছিল। আর এই দু'মাস মীরাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি যাতে ধীরে ধীরে আমার মনটা তার দিকে একটু আকৃষ্টও হয়ে পড়েছিল। সব চেয়ে ভালো লাগ্‌তো, সেই সেবা-নিরতা কিশোরীর স্নেহময় অন্তরখানি। তার সেই অক্লান্ত সেবার মধ্যে এক মুহূর্ত্তের তরেও উচ্ছৃঙ্খল দাদার প্রতি ঘৃণা কিম্বা বিরক্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

শুভদৃষ্টির সময় মীরার দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে-মুখে এক দুষ্টুমির হাসির রেখা লেগে আছে। ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছিল। বিয়ের আসনে বসে ভাব্‌ছিলুম, ব্যাপারটা কি। পুরুত-ঠাকুর বলছিলেন এক, আমি বলছিলুম অন্য। কন্যাপক্ষের পুরুত বল্‌ছেন— প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ—তাতে বরপক্ষের পুরুত কি একটা

আপত্তি করে বসলেন, দু'জনে তুমুল শাস্ত্রীয় বাগ্‌যুদ্ধ সুরু হলো। ছোট্ট হাতখানি দিয়ে আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে একগাদা চেলীর ঘোমটার ভিতর থেকে অত্যন্ত চাপা-গলায় মীরা বল্লে—হ্যালো সাউথ 8751। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, আমি আনন্দে দিশেহারা হয়ে একটু জোরেই বলে ফেল্‌লুম, এ্যাঁ কি বোকা? পুরুত-ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কি, কি! কে বোকা? আমি বল্‌লুম, আজ্ঞে না,—প্রজাপতি ঋষি—

রূপকথা

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

মেঘের অঙ্গনা আবৃত তনুলতা
মেঘের ঘরে বসি কহিছে রূপকথা।
এক যে রবি ছিল রাজার এক ছেলে
আলোর রথে রথে ভ্রমিত অবহেলে,
গহন কান্তারে, গিরির শিরে শিরে,
সাগর কূলে কূলে, নদীর তীরে তীরে;
খুঁজিয়া সারা হ'ত কার সে মুখখানি,
ভাবিত মনে মনে জেনেও নাহি জানি।

২

পুরাণো বট গাছ শীতল ছায়া তার,
তড়াগ উপরেতে বিছায় মায়া কা'র।
প্রাচীন বাঁধাঘাট, পঙ্কময় জল,
তাহারি বুক ঘেঁসে মোহিয়া ধরাতল,
ফুটিয়া আছে আজো, ফুটে সে প্রতিদিন,
কার সে হাসিরাশি উজলে তনু ক্ষীণ,
ঘেরিয়া থাকে তারে বটের সব পাতা,
দূরেতে থাকি রবি নোয়ায় লাজে মাথা।

৩

মেঘের অঙ্গনা শিহরে তনুলতা,
টুটিল ঘরখানি হ'ল না রূপ-কথা।
আঁখির কোণে কোণে জমিল কত জল,
দামিনী ঝলসিল প্লাবিল ধরাতল;
পুরাণো বাঁধাঘাট তাহারি বুক ঘেঁসে,
বালিকা এলো চুলে চাহিল হেসে হেসে।
তাহারি চোখে চেয়ে, অরুণ-আঁখি মেলে,
সোনার রথে এল রাজার এক ছেলে।

দুরন্ত ছেলে

"বিচিত্রা", আশ্বিন, ১৩৩৪
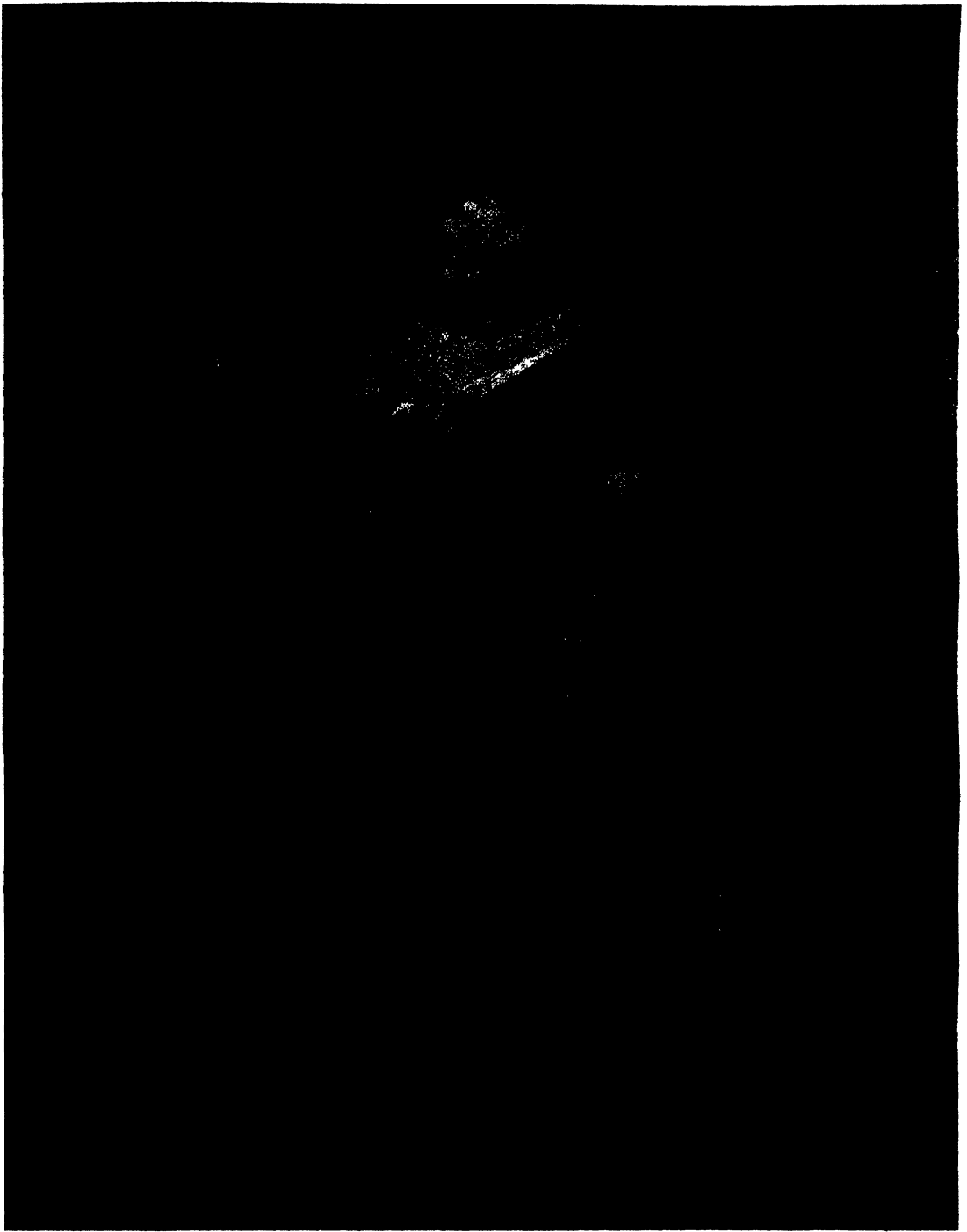
কজরী

শ্রীঅনাথনাথ বসু

একটী অনাদৃত মৃতপ্রায় ব্রতোৎসবের কাহিনী বলিতেছি। এককালে এই ব্রতটী সমগ্র উত্তর ও মধ্য-ভারতের গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া বহু নরনারীর উৎসব-লিপ্সা মিটাইত। এখনও মৃজাপুর ও কাশী অঞ্চলে এবং মধ্য-ভারতে কোথাও কোথাও ইহার অনুষ্ঠান আছে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে সে প্রাণ আর নাই; এই উৎসব আজ আর জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা আজ সভ্য হইয়াছি।

মানুষের উৎসবগুলি যে পরিমাণে তাহার ধর্ম্মবোধের পরিচয় দেয়, বোধ করি সেই পরিমাণেই তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য-বোধেরও সূচনা করে। ভক্ত তাহার দেবতাকে মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; সে পুষ্প, অর্ঘ্য, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা সৌন্দর্য্যসম্ভার দিয়া তাহার প্রিয়কে ঘিরিয়া ফেলে, তাহার রুচি শিক্ষা দীক্ষা ও সৌন্দর্য্য-বোধের অনুপাতে নানা সুন্দর বস্তু দিয়া দেবতার পূজা-উপচার রচনা করে। সুতরাং প্রতি ব্রত, প্রতি উৎসবের দুইটী দিক আছে, একটী ধর্ম্মবোধের বা আধ্যাত্মিক, অপরটী সৌন্দর্য্যবোধের বা aesthetic। ইহাই পূজার তত্ত্বকথা।

মানুষের সভ্যতার ও মানসিক উন্নতির ইতিহাস রচনায় এই জন্যই এই ব্রতোৎসবগুলির আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে এক দিক দিয়া যেমন আদিম মনের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে তেমনি অন্যদিক দিয়া সেই মনেরই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের ধারা যুগের পর যুগ তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষ যে মনোভাব লইয়া দেবতার পূজা আরম্ভ করিয়াছিল সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সে মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; আদিমকালের পূজার আয়োজন যুগের পর যুগ ধরিয়া নব নব সম্ভারে, নব নব সমারোহে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল এবং দীর্ঘকালের ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়ে সেগুলি যে অপরূপ রূপ ধারণ করিতেছিল তাহা সৌন্দর্য্যপিপাসুর চিত্তকে তৃপ্তি দিবার অধিকারে এবং গৌরবে পরিপূর্ণই হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু আমরা এই উৎসবগুলিকে আজ আমাদের গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। আমাদের যুক্তি—এই-গুলির মধ্যে একটা অত্যন্ত স্থূলভাবের ধর্ম্মবোধের পরিচয় আছে যাহা আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধকে পীড়া দেয়। একথা হয়ত' সত্য, কিন্তু এই ব্রতগুলিকে ঘিরিয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সৌন্দর্য্যের আয়োজনকে আমাদের সভ্য-জীবনের প্রাঙ্গণ হইতে নির্ব্বাসন দিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি?

কোন আদিম যুগে নরনারীর সম্ভোগ-লিপ্সার অত্যন্ত স্থূল একটী মূর্ত্তরূপ বসন্তোৎসবের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই কি বসন্তোৎসবের নৃত্যমালা, গীতনৈবেদ্য, পুষ্প-সম্ভারকে আমাদের গৃহদ্বার হইতে বিদায় করিয়া দিতে হইবে? এইগুলির মধ্যে যে স্বতঃ-উৎসারিত সৌন্দর্য্যানুভূতি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কি কোন মূল্যই নাই?

সৃষ্টি ও জন্মরহস্য চিরদিনই মানুষের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে। যে অদৃশ্য শক্তির বলে বিশ্বজগতে ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা চলিতেছে তাহার নিকট মানুষ চিরদিনই মাথা নত করিয়াছে এবং তাহাকে পূজা করিয়াছে; এই শক্তির প্রসাদকামনায় বহু বলি, অর্ঘ্য, নৈবেদ্যও সে দিয়াছে। আমাদের মধ্যে বহু ব্রত-উৎসবের জন্মকথা এই শক্তির প্রসাদলাভ চেষ্টার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে। যে ওষধি আমাদের অন্ন জোগাইতেছে, আমাদের দেহ পুষ্ট করিতেছে, কোন্ শক্তির বলে তাহার প্রাণসঞ্চার হয়, তাহা মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়াই একদিন সে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে দেবশক্তির আরোপ করিয়াছে; যে ভূমি তাহাকে ধারণ করিয়াছে তাহাকে মাতারূপে কল্পনা

করিয়াছে এবং এই মাতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টায় নানা পূজা দিয়াছে। এইরূপেই বহু ওষধি-দেবতার (Vegetation Deity) পরিকল্পনা হইয়াছে এবং বহু ব্রত-অনুষ্ঠানের জন্ম হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে উপাসকের জ্ঞান-দৃষ্টির এবং সৌন্দর্য্য-বোধের ক্রমবিকাশের সহিত এই ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি নব নব কল্পনাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে সেগুলির দেহান্তর না ঘটিলেও রূপান্তর ঘটিয়াছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যের তাপে বিশ্বপ্রকৃতি রসহীন, শুষ্ক, মরুপ্রায় হইয়া ওঠে; যেন তখন শ্যামলতা লাভের জন্য পৃথিবীর রৌদ্রদগ্ধ তপস্যা চলিতেছে। মানুষের মনও তখন প্রকৃতির এই নীরস শুষ্কতায় কাতর হইয়া ওঠে।

তাহার পর আকাশ নীল-নব মেঘে ভরিয়া যায়, মেঘমেদুর অম্বরে বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিয়া ওঠে, বর্ষা নাবে, শুষ্ক তৃষ্ণার্ত্ত পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটে, বক্ষ শীতল হয়। তখন আবার চারিদিক শ্যামল, সজীব, প্রাণবান্ হইয়া ওঠে। পৃথিবী নবরসসঞ্চারে নব নব তৃণপল্লবের জন্ম দেয়, শুষ্কপ্রায় ক্ষীণস্রোতা শীর্ণা নদী পরিপূর্ণ হইয়া দু'কূল ছাপাইয়া বহিয়া যায়। বর্ষার স্নিগ্ধ ধারায় স্নান করিয়া সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি নবীন শ্যামরূপ ধারণ করে।

বর্ষাই ভারতের বসন্ত ঋতু।

প্রকৃতির যে নিয়মে ঋতুচক্রের এই লীলা, সৃষ্টির মধ্যে এই শুষ্কতা ও শ্যামলতার জরা ও যৌবনের খেলা চলিতেছে, মানুষ তাহার রহস্য সন্ধান করিয়া পায় নাই, তাই সেদিন এই সমস্তই তাহার নিকট বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছিল। প্রকৃতির শ্যামলতা তাহার অন্ন দিবে, তাই এই শ্যামলতাকে কামনা করিয়া সে ব্যাকুল আগ্রহে পূজা অর্ঘ্য দিত, এবং যখন এই ঈপ্সিত শ্যামলতা সৃষ্টির মধ্যে দেখা দিত তখন তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন ভাবিয়া সে উৎসব করিত, নৃত্যগীতে প্রকৃতি-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিত।

এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বদেশে শস্যের জন্মোৎসব এইরূপ নানা নৃত্যগীত দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত এবং তখন বহু ব্রত অনুষ্ঠান এই শস্যপূজার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিল;—আজ তাহার হয়ত' কোন পরিচয়ই নাই, সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সহিত এই জন্ম-ইতিহাস একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হীনকুলজাত লোক যখন সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করে তখন তাহার জন্ম-ইতিহাস নূতনভাবে রচিত হয়, তাহার জন্মে আভিজাত্য পরিকল্পিত হয়। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। তেমনি যে ব্রতের জন্ম হয়ত প্রকৃতির কোন বিশেষ বিকাশের রহস্য-যবনিকা উন্মোচনের অক্ষমতার সহিত জড়িত ছিল, পরবর্ত্তীকালে নবীন সৌন্দর্য্য-সম্পাতে ও পরিকল্পনাস্পর্শে তাহার জন্ম-কাহিনীর আমূল পরিবর্ত্তন হয়, নূতন অর্থে এবং ঐশ্বর্য্যে তাহা সম্পূর্ণ নূতন ব্রতেই পরিণত হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন স্থানে এখন কজরী নামে যে ব্রতটী নৃত্য ও গীত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহা এককালে এই বর্ষাপ্রকৃতির শ্যামলতার পূজাই ছিল। তাহার নামের মধ্যেই সে পরিচয় রহিয়াছে। 'কজরী' 'কজ্জলী' শব্দের অপভ্রংশ। প্রকৃতির কজ্জল শ্যামরূপে পূজা এই 'কজরী' ব্রত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ব্রতের অর্থ ভিন্নতর নূতনতর হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমান কালে কজরী ব্রত ভ্রাতার কল্যাণ কামনায় ভগিনীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

নবোদ্ভিন্ন ধান্য-যবের গাছের মধ্যে যে শ্যামলতার দেবী অধিষ্ঠিতা তাঁহারই পূজায় কজরীব্রতের আরম্ভ। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়ার দিন প্রভাতে পুরনারীরা নদীর স্নিগ্ধ নীরে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া একটী পত্রপুটে বিশুদ্ধ মৃত্তিকায় ধান্য বা যবের বীজ বপন করেন; তাহার পর তাহাতে জল সিঞ্চন করিয়া আবর্জ্জনা-মুক্ত পবিত্র স্থানে অন্ধকারের মধ্যে রাখিয়া দেন। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহারা এই পত্রপুটগুলি নদীতীরে লইয়া যান্। পত্রপুটগুলিকে "ভুজরিয়া" বলে। ভগ্নিগণ পত্রপুট নদীর জলে ভাসাইয়া দিলে ভ্রাতারা সেগুলি তুলিয়া আনেন; ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কেহ ভুজরিয়াগুলিকে স্পর্শ করিলে ব্রতচারিণীর ব্রতভঙ্গ হয়; সুতরাং ভুজরিয়া বিসর্জ্জনের সময় ভগ্নীর ব্রতরক্ষার জন্য ভ্রাতারা সেখানে উপস্থিত থাকেন। এই 'ভুজরিয়া' রক্ষা করিতে গিয়া প্রাচীনকালে

কজ্জরী

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কত রক্তপাত হইত। বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত আল্‌হার গানের একটী অংশ—কীর্ত্তিসাগরের তীরে ভুজরিয়ার লড়াই। মহোবার রাজকুমারী পরমালদুহিতা চন্দ্রাবতীর ভুজরিয়া রক্ষা করিবার জন্য বিখ্যাত কীর্ত্তিসাগরের তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত মহোবার সৈন্যের যে যুদ্ধ হয় তাহারই স্মরণে এখনো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নাটগণ এই আল্‌হার গান গায়। এখনো মহোবার লোক কীর্ত্তিসাগরের তীরে কোন্‌খানে সে যুদ্ধ হয়, কোন্‌খানে কোন্ সেনাপতি মহোবার নারীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দেন্ তাহা দেখাইয়া গৌরব অনুভব করে। আজও তাহারা সেই ভীষণ যুদ্ধে কীর্ত্তিসাগরের জল কেমন করিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছিল, ধরিত্রী শোণিতকলুষিত হইয়াছিল, উৎসবাগত নরনারীর হরিৎ-বর্ণের পরিচ্ছদ রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল তাহাই কীর্ত্তন করিয়া অশ্রুপাত করে। সে সকল স্থান এখনো মহোবার নরনারীর নিকট বহুস্মৃতিপূত তীর্থের মত পবিত্র হইয়া আছে।

ভুজরিয়া বিসর্জ্জনের পর ভ্রাতারা সেগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া ভগ্নীর হস্তে দেন, তখন ভগ্নীরা মৃত্তিকা ধুইয়া সেই ধান্যযবের ছোট ছোট চারাগুলি গৃহে লইয়া যান্; তাহার পর ভ্রাতার কর্ণে তাহারই দুই একটী গুঁজিয়া দিয়া তাহার হস্তে রাখী বাঁধিয়া দেন। শ্রাবণী পূর্ণিমা এইজন্যই রাখীপূর্ণিমা নামে পরিচিত।

'রাখী' শব্দটী রক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ ভ্রাতাকে রক্ষা করুন্, তাঁহার সমস্ত অকল্যাণ দূর করুন্ ভগিনীগণ ভ্রাতার হস্তে 'রাখী'র মাঙ্গলিক সূত্র বাঁধিয়া দিয়া তাহাই প্রার্থনা করেন। ভ্রাতারাও তখন ভগিনীকে 'চোলী' (অঙ্গবস্ত্র) উপহার দিয়া তাঁহাকে সমস্ত অপমান হইতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া আশীর্ব্বাদ বা প্রণাম করেন। অনাত্মীয় পুরুষকে ভুজরিয়া ও রাখী দান করিলে তাহার সহিত ধর্ম্মভ্রাতার সম্পর্ক পাতান হয়। এইভাবে বহু অনাত্মীয় নরনারীর মধ্যে যে ধর্ম্মসম্বন্ধ পাতান হয় তাহা রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন অংশেই শিথিল নয়।

এই রাখীপূর্ণিমাই ঝুলন-পূর্ণিমা। বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে কৃষ্ণলীলার ঝুলন বা হিন্দোল-লীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। দুল্ ধাতু হইতে বাংলা ঝুল্ এবং ঝুলন এবং সংস্কৃত হিন্দোল শব্দ আসিয়াছে। আজকাল ঝুলন-পূর্ণিমা আমাদের হৃদয়ে শুধু কৃষ্ণলীলার স্মৃতিই জাগাইয়া দেয়; কিন্তু এই হিন্দো-লোৎসবের মধ্যে একটী অতি প্রাচীনকালের উৎসবস্মৃতি লুক্কায়িত আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা আদিমকালের একটী জ্যোতিষিক ঘটনার প্রতীক। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে যে হিন্দোল আছে তাহারই বিজ্ঞাপনের জন্য এককালে ভাদ্রমাসে এবং বর্ত্তমানে শ্রাবণ মাসে এই উৎসবের অনুষ্ঠান। একথা হয়ত' অসম্ভব নহে এবং এইজন্যই হয়ত' যখন সূর্য্য এবং কৃষ্ণের অভেদত্ব স্বীকার করিয়া সৌর উৎসবগুলিকে বৈষ্ণব উৎসবে রূপান্তরিত করা হয় তখন এই হিন্দোল উৎসব বৈষ্ণব উৎসবে পরিণত হইল। তবে একদিন এই ঝুলন-পূর্ণিমা বিশেষ করিয়া 'কজ্জরী' ব্রতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। জ্যোতিষিক দেবতা এবং ওষধি দেবতার মধ্যে একটী নিগূঢ় যোগ আছে। সূর্য্যদেবতার কল্যাণেই পৃথিবীতে ওষধি বনস্পতির জন্ম হয় এ তথ্য হয়ত' অতি প্রাচীনকালেই মানুষে জানিয়াছিল—এইজন্যই হয়ত' সূর্য্যোৎসব এবং শস্য-জন্মোৎসব এককালে একাঙ্গীন ভাবে মিলিয়া গিয়াছিল এবং উভয়েই পরবর্ত্তীকালে কৃষ্ণলীলার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। জনসাধারণের আচরিত বহু অকুলীন ব্রত নব নব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে নূতন কৌলীন্য লাভ করিয়াছে, ব্রতোৎসবের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

ভ্রাতৃ-অর্চ্চনার পর ভগিনীরা ঝোলায় উঠিয়া গান গাহেন। নগরের উপকণ্ঠে উপবনে ঝোলা টাঙ্গাইয়া এই ঝুলন উৎসব আরম্ভ হয়। পূর্ণিমা হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত উৎসব চলে; অনেকে অবশ্য সারা মাসই উৎসব করে। তখন নৃত্যগীতে উপবনগুলি মুখরিত হইয়া ওঠে।

এই গীতই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত কজ্জরী গীত। আমাদের বাংলা দেশের বাউল কীর্ত্তনেরই মত কজ্জরী এক বিশেষ প্রকারের সঙ্গীত এবং বাউল কীর্ত্তনেরই মত সেগুলি একান্ত জনসাধারণের জিনিষ। সেগুলিরই মত ইহাদের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের দরদ আছে যাহা লোকচিত্ত তৃপ্ত করিতে পারে। কজ্জরী নবশ্যামলতার

আবাহন-মন্ত্র, তাই ইহার সুরের মধ্যে এমন এক প্রকারের উচ্ছ্বাস, মাদকতা এবং হিল্লোল আছে যাহার সহিত ঝুলনের হিন্দোল এবং চারিপাশের প্রকৃতির নবজন্মের উচ্ছ্বসিত উদ্দামতার সুর ঠিক মেলে।

কজরীতে যে সকল গান গাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই কৃষ্ণরাধার মিলনবিরহের কাহিনী লইয়া। মানুষের মনে সুন্দরকে পাইবার জন্য যে চিরন্তন বিরহব্যথা জাগিয়া আছে—যাহা কৃষ্ণরাধার রূপকের মধ্যে ভক্তহৃদয়ের নিকট অম্লান ভাবে ফুটিয়া আছে, কজরীর অধিকাংশ গীতে তাহারই সুর বাজিয়া ওঠে। শ্রাবণ আসিল, চারিদিক মেঘে আঁধার হইয়া গেল, আকাশে মেঘগর্জ্জন হইতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে, ময়ুর উতলা হইয়া নৃত্য করিতেছে, পাপিয়া চাতক প্রাণ খুলিয়া গান করিতেছে---কিন্তু বিরহিণী আমি, আমার অন্তরে সে রস কোথায়, আমার প্রিয় আজ কোথায়, ইহাই কজরী গানের বিশেষ সুর।

ইংরেজ নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ এই উৎসবটীকে অশ্লীল বলিয়াছেন; আমাদের দেশের বহু উৎসবগুলিকেই তাঁহারা এইভাবে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন; ঝুলন, হোলী,—তাহাদের গানগুলি সকলই তাঁহাদের নিকট অশ্লীল। মিলনবিরহের গানগুলি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই মানুষের অন্তরতম ভাবগুলি প্রকাশ করিয়াছে; তাহার মধ্যে কোন অশ্লীলতাই নাই। তবে একথা সত্য এই উৎসবের মাতামাতি কোন কোন সময়ে সংযমের সূক্ষ্ম-সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যাইত। জীবন-সংগ্রামের অবকাশে গ্রাম্য নরনারীর সহজ সরল উচ্ছ্বাসময় উৎসবায়োজনের ও আমাদের সভ্যজীবনের উৎসব-আদর্শের মধ্যে এমন একটি বিরাট পার্থক্য আছে যাহার ফলে আমরা তাহাদের উৎসবের প্রকৃত স্বরূপটী বুঝিতে পারি না, এবং সেইজন্য সেগুলি আমাদের নিকট অবিচার লাভ করে।

কজরী যে প্রকৃতির শ্যামলতার উৎসব তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। ভুজরিয়া বিসর্জ্জন করিবার সময় সকলকেই হরিৎবর্ণের পরিচ্ছদ পরিতে হয়। পুরনারীদের বস্ত্র, চোলী, ওড়না সকলই সেদিন সবুজ রঙে রঞ্জিত হয়; পুরুষেরাও সেদিন সবুজ কাপড়, পাগড়ী পরে; এমন কি প্রাচীনকালে যে যোদ্ধারা ভুজরিয়া রক্ষা করিতে আসিত তাহাদের অশ্বগুলি পর্য্যন্ত হরিৎবর্ণে রঞ্জিত হইত। ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই কজরী উৎসবের দিন এমন করিয়া সবুজ হইয়া গান গাহিত, নৃত্য উৎসব করিত। এখনকার দিনেও পুরুষেরা সেদিন অন্তত তাহাদের পাগড়ীটা সবুজ রঙে রাঙাইয়া লইয়া যায়।

এইভাবেই একদিন কজরী উৎসব সম্পন্ন হইত। আজিকার সভ্যতার যুগে এই উৎসব ও ব্রত পরিত্যক্ত হইয়াছে; ভগ্নিদের ভ্রাতৃঅর্চ্চনাও আজ বিরল হইয়া উঠিয়াছে। আজ যখন মানুষ প্রকৃতির সকল রহস্য জানিতে পারিয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছে—তখন প্রকৃতির শ্যামল নবীনতার মধ্যে প্রাণের বিকাশকে কোনপ্রকার উৎসবের দ্বারা আবাহন করিবার কোন সার্থকতাই আর তাহার কাছে নাই। বোধ করি জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আমরা বিজ্ঞতর হইয়াছি। এই বিজ্ঞতার মধ্যে সহজ আনন্দ-উৎসবের আর কোন স্থান নাই; তাই কজরী গীতও নাই, ঝুলনের দোলও নাই, নৃত্যও নাই। আধুনিক সভ্যতার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

নৃত্য

শ্রীসাহানা দেবী

বোলপুর শান্তিনিকেতনে, দোলপূর্ণিমার দিন এবার কবিবরের নবরচিত 'নটরাজ' আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালিকাদের দ্বারা নৃত্যে অভিনীত হয়। জিনিষটি সম্পূর্ণ নতুন রকমের। ভারি হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। নৃত্যের ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে প্রকৃতির ছয়টি ঋতুর রূপ-প্রকাশই এই 'নটরাজ'-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃতির মনোভাবকে মানুষের অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে প্রকট ক'রে তোলার কল্পনা, এক কবি ছাড়া অপরে সম্ভব নয় ব'লেই, তিনি তাকে কাব্যে ও সুরে বন্দী ক'রে নৃত্যের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের কয়েকটি বালিকা অদ্ভুত নৈপুণ্যে কবিকল্পনার এই সৃষ্টিকে মূর্ত্ত ক'রে তুলে আমাদের স্তম্ভিত ও বিস্মিত ক'রে দিয়েছিল।

'নটরাজ'-এ প্রত্যেক ঋতুর গানের সঙ্গে নাচ ও একটি ক'রে কবিতা পড়া হয়েছিল। Chorus-এ নৃত্য কেবল দু'চারটি ছিল; নইলে প্রত্যেকটি ঋতুরই একটি solo নৃত্য chorus গানের সঙ্গে হয়েছিল। প্রতি নৃত্যের পূর্ব্বে কবি নিজেই কবিতা পাঠ করেছিলেন। Chorus গীতের সঙ্গে solo নৃত্যের অবতারণা বোধ হয় কবিরই প্রথম সৃষ্টি।

মুসলমান রেনেসাঁসের (Renaissance) পর থেকে উচ্চশ্রেণীর নৃত্যভঙ্গী প্রায়ই বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করবার একটা সাধারণ রীতি বা ধারা চ'লে আসছে দেখা যায়। উদাহরণ—বাঈনাচ। এই বাঈ নাচে আমরা দুটি রূপের প্রচলন দেখ্‌তে পাই। একটি তালের মাহাত্ম্যকে সুরের সাহায্যে অঙ্গের ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা, অপরটি, মানুষের মনোগত (সচরাচর প্রেমের) বিচিত্র ভাবের লহরী-লীলাকে সুর ও তালের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুনিপুণ ভঙ্গির সাহায্যে প্রস্ফুটিত করে তোলা।

বাঈ নাচই সর্ব্বোচ্চাঙ্গের নৃত্য,—প্রচলিত মতানুসারে। শুনেছি মাদুরা, তাঞ্জোর, প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে মন্দিরের নৃত্য (Temple dance) নাকি অপূর্ব্ব। দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। মণিপুরের নাচও প্রসিদ্ধ। তবে, এ-সব দেশের নৃত্যের ভঙ্গী আজকাল প্রায় মুমূর্ষু বললেই হয়। অজন্তার চিত্রে কয়েকটি কী মনোজ্ঞ নৃত্যের ভঙ্গীই দেখ্‌তে পাওয়া যায়! দেখ্‌লে কেবলি মনে হয়—এ যেন আমাদের একান্তই নিজস্ব, একান্তই আপনার বস্তু! চিত্রের প্রতি মর্ম্মস্পর্শী রেখায় যেন তাকে চিরঞ্জীব ক'রে রেখেছে। এই চিত্রের মধ্যে প্রাণের গভীর স্পর্শ, আজ আমাদের অন্তরে স্বচ্ছ সলিলের মতোই সুস্পষ্ট হ'য়ে প্রতিভাত হয়,—যা দেখ্‌বা মাত্র প্রাণ আপনা হতেই গেয়ে ওঠে—"এ তো আমাদের,—আমাদেরই এ—! একেই বুঝি এতকাল না জেনে খুঁজেছিলাম, চেয়েছিলাম! এ আমাদেরই যেন আগে ছিল—কেবল কবে, কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গোপনের আশ্রয় নিয়েছিল—!" এ-সব প্রাণস্পর্শী ভঙ্গী লুপ্তপ্রায় আজ এই বাঈ নাচের প্রতিপত্তির প্রভাবে।

বাঈ নাচের আবেদন মানুষের প্রাণে কোনও গভীর খোরাক যোগাতে পারে ব'লে মনে হয় না। তার ভঙ্গিমাতে প্রাণের সাড়ার বড়ই অভাব বোধ হয়। সে নৃত্যে আনন্দ দেয়, কিন্তু সুধা-বর্ষণ করে না। সে নৃত্যে চিত্তকে লুব্ধই করে, অন্তরকে ভ'রে দিতে পারে না। সে নৃত্যে আনন্দের চঞ্চলতাই বেশি—গভীরতা নেই। সে নাচে মোহের স্বপ্নজাল সৃষ্টি করতে পারে, হৃদয়ে গভীর অনুভূতির ছাপ দিতে পারে না। তবু, বাঈ নাচ যে আর্টের একটি সম্পদ, এ অস্বীকার করার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই।

আমাদের দেশে আজকাল নৃত্যের স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। নৃত্যের উপলব্ধি বড়ই অসার স্তরে এসে পৌঁচেছে। নৃত্যের নামেই আমরা চমকে উঠি—কানে আঙুল দিই—কেননা নৃত্যের আসর যে আজকাল কেবল দুর্গন্ধময় গলির বিলাস-ভবনে! নৃত্যের স্মৃতিও তাই

আমাদের মনে বড়ই অপবিত্র। নৃত্যের কী অপমান তাই ভাবি! দেবদেবীর পূজার মন্দির থেকে একেবারে কোথায় কোন নীচে ভোগের লীলা-নিকেতনে সে নেমে এসেছে! শুনেছি, পূর্ব্বে আমাদের দেশেও দেবালয়ে নৃত্য দেবপূজারই একটি অঙ্গ ছিল। দাক্ষিণাত্যে মন্দিরের নৃত্যের আদর্শ এখনও বড়। কারণ একমাত্র ভোগ তৃপ্তির হীনকার্য্যে ব্যাপৃত না রেখে, সাধনার এই পবিত্র বস্তু দেবতার চরণে পূজার ফুলের অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন ক'রে ধন্য হবার অভিলাষ আজও তারা করতে জানে। কিন্তু সচরাচর এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে কী হীনতায় না বন্দী করে রাখা হয়েছে! তাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, মুক্তির কোনও সম্ভাবনা কি এখন আর নেই? আমরাই যে তাকে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি আমাদের অঙ্গনের দ্বারে প্রবেশের অধিকার না দিয়ে। মুক্ত কি তাকে আর করা চলে না কোনও প্রকারেই? নৃত্য সুধু লালসা-তৃপ্তির চমকপ্রদ বস্তুই নয়, একটি মস্ত বড় আর্ট, এ-কথা তো বুঝবার সময় এসেছে। চিত্র বা সঙ্গীত-কলার মতো আমাদের দেশের আর্টের সভায় তাকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবার সময় কি এখনও হয়নি? এবার 'নটীর পূজার' নৃত্যে শ্রীমতী গৌরী দেবী যে অসামান্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে নৃত্যকলার অপূর্ব্ব মহিমা বিকীর্ণ করেছিলেন, তা থেকে আর্টের জগতে নৃত্যের আসন কি তিনি অনেক উচ্চ স্তরে নিয়ে বিছিয়ে দেন নি? নৃত্যের ভিতর দিয়ে ভক্তি ও স্তুতির অকৃত্রিম ভাবের প্রকাশকে কী নৈপুণ্যের দ্বারাই না তিনি দেখিয়েছেন! সমস্ত মন, সমস্ত অন্তরাত্মা কেবল ভক্তিভরে বিধাতার চরণে নুয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোনও ভাবই মনে আসবার অবকাশ পায়নি! নৃত্যের সাহচর্য্যে মানুষের অন্তরকে এরূপ অমিশ্র ভক্তিরসে আপ্লুত বা অনুপ্রাণিত করবার শক্তি ও প্রেরণা—সাধনার লভ্য স্বর্গীয় দান,—তা বুঝবার সময় যেন এবার হয়েছে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে নৃত্যের সমাদর ঘরে ঘরে। বাল্য-কাল থেকে তাদের এ-বিষয়ে রীতিমতো শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশ অবশ্য বহু বিষয়েই তাদের দেশ থেকে পিছিয়ে আছে; তাদের সঙ্গে তুলনা যে ক'রছি, তা নয়। কেবল এটুকু বলতে চাই যে, আর্টের রাজ্যে নৃত্য যে একটি মস্ত বড় সম্পদ সেটা তারা তাদের সাধনার দ্বারা বোঝাতে ও দেখাতে পেরেছে। নৃত্যকলার গৌরবমুকুটমণি শ্রীমতী আনা পাল্‌ভোভার অত্যাশ্চর্য্য নৃত্যকৌশল যিনি দেখেছেন, তিনি এ-কথা স্বীকার না ক'রে পারবেন না। এমনই আরো কত বড় বড় নৃত্যপটু নারী য়ুরোপে আছেন, যাঁদের সন্ধানও অনেক সময় আমরা জানতে পারি না। তবে এটা আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছি যে, তাদের দেশে নৃত্যের উপলব্ধি (appreciation) খুবই বড় ও সার্ব্বজনীন। নৃত্যের মহিমা সম্বন্ধে তাদের মন খুবই সচেতন, তাই তাদের শত শত নরনারী এই সাধনাকে বরণ ক'রে, তারই সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রে তাকে আরো মূর্ত্ত ক'রে তোলার জন্য কী অপরিসীম পরিশ্রমই না করছে। শুধু য়ুরোপে কেন, আমেরিকা, জাপান, চীন ইত্যাদি প্রায় সব দেশই, নৃত্যের উচ্চত্ব উপলব্ধি করেছেন। কারণ সে সব দেশেও, নৃত্যকে কেবল লঘু পঙ্কিল দৃষ্টিতে দেখা হয় না, তার মর্য্যাদা ও মূল্যের গভীরতা সম্বন্ধে সে দেশের লোকের মন যথেষ্ট সজাগ। ভারতবর্ষে একমাত্র গুজরাটীদের নৃত্যের আদর্শ এখনও খুবই উন্নত শুনতে পাই। তাদের মধ্যে সভ্য-সমাজে,—ভদ্র পরিবারের শুধু ছোট মেয়েরা নয়, বিবাহিতা ভদ্রমহিলারাও জনসাধারণের নিকট অনায়াসে নৃত্য ক'রে থাকেন। যদিও সে নৃত্য খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়, তবুও, মনের এই ঔদার্য্য যে অনেকটা আশাপ্রদ, এ-কথা উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না।

আমরা সকলেই জানি, কোনও বড় জিনিষ লাভ করতে গেলেই তার যোগ্য মূল্য দিতেই হবে। সাধনা ও অধ্যবসায় ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠ সম্পদই লাভ করা যায় না। কিন্তু এ দেশের মত বোধ হয় কোনো দেশেই নৃত্যের পরিচর্য্যা এমন জঘন্য আবর্জ্জনার স্তূপে হয় না! এই যে সাধনা, এই যে সৃষ্টির একটা বৃহৎ প্রচেষ্টা,—এর সম্মান আমাদের অন্তরে কোথায়? শুধু তাই নয়, এই মনোরম সৃষ্টি-উপলব্ধির আনন্দকে আমরা কোথায় বেঁধে রেখেছি

নৃত্য

শ্রীসাহানা দেবী

সে যে ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারই তরল প্রবাহে ভেসে চলে যায়, অন্তরের মর্ম্ম-তারে গুঞ্জনধ্বনি তোলে না! কারণ আমাদের মন এতকাল নৃত্যের কাছ থেকে কেবল বিলাসেরই খোরাক চেয়ে এসেছে বলেই তার অভিব্যক্তি শুধু সেই একদিকেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে। এ-দেশে নৃত্যের দর্শকমণ্ডলী নৃত্যের মধ্যে শুধু বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্থূলতাকেই দেখ্‌তে চেয়েছে, তাই তার আবেদন এত অগভীর ও নিম্ন শ্রেণীর হ'য়ে নিম্ন স্তরেই প'ড়ে আছে।

মানুষের মন সর্ব্বদা বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে বলেই আশা করা যায় নৃত্যের আসনও বৃহত্তর পংক্তিতে বিছাবার সুযোগ আসবে। নৃত্যের উচ্চত্বকে এতকাল খর্ব্ব ক'রে আসা হয়েছে—কেবল চাওয়ার দীনতায় ও দৃষ্টির হীনতায়। আজ তাই সকলের অন্তরের ক্রম-উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের সভায় আমাদের দাবী আরো অনেক বড় অনেক উঁচু ও অনেক পবিত্র হ'য়ে ওঠার কথা। মানুষের মন যখন আর অল্পতে সন্তুষ্ট নয়, তখন নৃত্যের নিকটই বা অল্প পাওয়ায় তুষ্ট থাকতে রাজী হবে কেন? তার কাছেও যে বলবার, চাইবার ও আশা করবার দিন এসেছে—"নাল্পে সুখমস্তি!"—অল্পে আর সুখ নেই। তাকেও এখন বিশ্বের সভাতলে গৌরব মূর্ত্তিতে আসবার জন্য আহ্বান করতে হবে। তার অপরূপ রূপের স্বর্গীয় মাধুরীতে আমাদের অতৃপ্ত নয়ন ও মনে তৃপ্তির সুষমার প্রলেপ দিতে হবে। লিপ্সার নীচ দৃষ্টি থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে মহত্ত্বের ও সম্মানের ঊর্দ্ধদৃষ্টি দিয়ে আকর্ষণ করতে হবে। লালসা মেটাবার দিন এবার গত। তাকে জান্‌তে হবে, বুঝতে হবে যে দর্শকের মনে সৃষ্টিরসের নিত্য নতুন উপলব্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির উৎস খুলে মন্ত্রমুগ্ধ ও স্তম্ভিত ক'রে জগৎ-কলার আসরে স্থান বেছে নেবার দিন এবার আগত। ভুবন-গৃহের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে তাকেও এবার দান দিতে হবে। জীবন, যৌবন নিয়ে ছেলেখেলার দিন ফুরিয়েছে—এ-কথাকে স্মরণপথে আনবার শুভদিন এবার তার এসেছে। মানবের মনের সঙ্গে নৃত্যের মনপ্রাণও জেগে উঠুক তার মোহের নিদ্রা ত্যাগ ক'রে। তার অন্তরতম প্রদেশের নিহিত প্রকৃত সত্যটি এবার রূপ ধ'রে সাড়া দিক তারই প্রকৃত স্বরে। যাদুকরী এবার ছলনার বেশ পরিত্যাগ ক'রে সত্যস্বরূপে দেখা দিয়ে চঞ্চল মনের মোহের ইন্দ্রজাল দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে, আশ্বস্ত করুক আমাদের হৃদয়কে—"ও যে আমার ছলপরা কৃত্রিম রূপ! এই আমি আমার প্রকৃত রূপে অবতীর্ণ!"—বিশ্রব্ধ বিস্ময়ে, আমাদের অন্তরাত্মা নত হ'য়ে, ভক্তিসহকারে তার বন্দনায়, পূজায় প্রবৃত্ত হোক।

নৃত্য সম্বন্ধে অনেক আলো সম্প্রতি, কবির 'নটীর পূজা' ও 'নটরাজ'-এর নৃত্য দর্শনে পেয়েছি। নৃত্যের এই বেশ-পরিবর্ত্তনে আমাদের প্রত্যেকেরই মনে অতুলনীয় বৈভবের সৌন্দর্য্যরশ্মি সৃষ্টি করেছিল। মনে হয়েছিল নৃত্যকে যেন দেবীরূপে নতুন আলোকে মণ্ডিত দেখ্‌লাম! মনে হয়েছিল, এত রূপ, এমন পবিত্র নীরন্ধ্র সৌরভ, এমন হৃদয় আলো-করা বিমল জ্যোতি কোথায়, কোন গভীর গহ্বরে আড়াল পড়েছিল! বারবারই মন বলেছে—একি দীপ্তি! একি তৃপ্তি! এ তৃপ্তি, সেই ক্ষণিকের স্রোতে ভেসে যাওয়া, ভুলে যাওয়া তৃপ্তি নয়। এ তৃপ্তি প্রতি মুহূর্ত্তকে, নতুন রসে সিঞ্চিত ক'রে, আনন্দের গভীরতা কেবলই বাড়িয়ে চ'লে অসীম মেশার তৃপ্তি। তবে নৃত্যকে আমরা আগে ঠিক যে-ভাবে দেখ্‌তে বা পেতে চাইতাম, তার থেকে এখন কিছু শুভ্র সুন্দর বেশে তাকে গ্রহণ করতে মন না-ও আপত্তি করতে পারে, এ-কথাটি বোধ হয় ভরসা ক'রে বলা চলে। কারণ, আমরা সেদিকে অনেকটা প্রস্তুত না হ'য়ে থাকলে "নটীর পূজা" বা "নটরাজ"-এর নৃত্যতে দর্শকমণ্ডলীর মন এমন গভীরভাবে সাড়া দিতে পারত না। হয় তো কিছুদিন পূর্ব্বে এ-প্রশ্ন উত্থাপনের কথা শুনলে তাঁদেরই মধ্যে অনেকেই (মনে যাই থাক) শিউরে উঠ্‌তে দ্বিধা বোধ করতেন বলে মনে হয় না। তবে অনেক জটিল প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান কালের গতির প্রবাহে সহজ সরল ও সুসাধ্য হ'য়ে আসে বলেই যা কিছু ভরসা। প্রায় ত্রিশ বছর আগে সঙ্গীতের আরাধনা এমন সার্ব্বজনীন ভাবে সুরু হবে কেই বা ভেবেছিল? তখন এ কল্পনাও স্বপ্নাতীত ছিল। কারণ সঙ্গীতের গৃহও তো তখন, —নৃত্যের পাশে না হোক, কাছেই ছিল বললেও অত্যুক্তি

হয় না। সে আজ এগিয়ে উঠে এসেছে ভদ্রসমাজে, অনেক বাধাবিঘ্ন, ঘাতপ্রতিঘাত অতিক্রম ক'রে। তার আসল মহিমার গৌরব স্থানের উপর নির্ভর করে—এ-কথা সকলেই জানে। য়ুরোপে তো বটেই, অন্যান্য দেশেও, নৃত্য সঙ্গীতের পাশেই স্থান পেয়ে এসেছে—কেবল আমাদের দেশ ছাড়া। তাই মনে হয় আমাদের দেশেও সে শুভদিনের হয়তো আর দেরী নেই—কে জানে! কে বলতে পারে!

যা সত্য, তা কখনও লুপ্ত হয় না,—চিরকালই শুনে এসেছি। নৃত্যের সৃষ্টিতে তার ভঙ্গিমা ও ব্যঞ্জনার মধ্যে, আজ বলে নয়, বহুপূর্ব্বেই সত্যরসের আস্বাদ পাওয়া গিয়েছে,—তাই তা বিলুপ্ত, এ-কথা মানতে অন্তর কিছুতেই রাজী হয় না। কেননা যুগ পরিবর্ত্তনের সময়ে, অনেক সৃষ্টির মাহাত্ম্যই অতীতের কালগর্ভে চাপা পড়ে দেখা যায়; তাই বলেই তা বিনাশপ্রাপ্ত, এ-কথা মানা সম্ভব নয়। কারণ যুগে যুগে, মানুষের মনে ও দৃষ্টিতে সেই বিগত বিভবের প্রতিচ্ছবি, নব নব রূপ, রস ও গন্ধে আবার ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। কালের নীরধির অতল গর্ভে যা অন্তর্হিত হয়, তা যথার্থ যায় না। নীলাম্বুর তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাকে এক কূল থেকে নিয়ে অন্য কূলে ভিড়িয়ে দেয়—এই পর্য্যন্ত! জগতের ভাণ্ডারে শেষের হিসাবে কোনও খরচই জমা করা হয় না।

বৌদ্ধযুগে, নৃত্যের বিকাশধারা যে উচ্চ আদর্শে পরিণতি নিয়েছিল, তার প্রমাণ, অজন্তার নানাবিধ চিত্র ও বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ থেকে পাওয়া যায়। নৃত্যকে তারা শুধু মঞ্জীরের গুঞ্জন-তালের মধ্যেই খোঁজেনি। তার প্রতি ভঙ্গিমাকে অনুভূতির জীবন্ত স্পর্শে মূর্ত্ত ক'রে তুলবার সন্ধান জেনেছিল। নৃত্যের প্রতিমা তাদের অন্তরে শুধু পাষাণ মূর্ত্তিই ছিল না—ঐকান্তিক পূজার একাগ্রতার ভিতর দিয়ে তারা তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, এটা খুবই স্পষ্ট বোঝা যায়। মুসলমান যুগ থেকে নৃত্যকে, ভোগের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে পদার্পণ করে নেমে আসতে দেখা যায়। তখন থেকেই এই বাঈ নাচের উদ্ভব। কেবল একটি গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, ধীরে ধীরে প্রাণ ও প্রেরণাহীন স্তরে নৃত্য তার অপরূপ সৃষ্টিশক্তিকে হারিয়ে ফেলে। সেই অবধি আজও সে সেই একই অবস্থায় প'ড়ে আছে।

নৃত্যশিক্ষার ভার যাদের উপর, তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত (uncultured) লোক ব'লে তাদের শিক্ষা দেবার প্রণালীতে যা হয়ে আসছে (traditional)—তার বেশি আর দেবার কিছু, বা প্রেরণার কোনও রসই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা থাকে না। তারা শুধু Technique-টিরই চর্চ্চা করতে ভালবাসে বা জানে, এবং তাকেই কেবল চায়। অর্থাৎ যন্ত্রী থেকে যন্ত্রই তাদের কাছে বেশি প্রিয়। তাই শুধু সেই যন্ত্রের অনুশীলনেই কেবল ব্যস্ত ও সচেষ্ট হ'য়ে তার ভিতরকার আসল সত্ত্বা যে প্রাণ বা জীবনী-শক্তি, তাকে একেবারেই বিস্মৃত হয়। তাই তাদের শিক্ষা গ্রহণের ফলে, নৃত্যের ব্যঞ্জনা শিক্ষিত (cultured) সম্প্রদায়ের কাছে এত অর্থশূন্য অর্থাৎ expressionless মনে হয়। কারণ এ-সব ওস্তাদদের কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হ'য়ে যারা সেই শিক্ষার অনুবর্ত্তনে নিযুক্ত থাকে, তারাও যে অশিক্ষিতাই। কাজেই, দর্শকবৃন্দ নৃত্য থেকে কোনও স্বর্গীয় প্রেরণা সংগ্রহে বঞ্চিত হ'য়ে, নিজেদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ নির্ণয় ক'রে, তাকে নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন। ফলে সেই হ'তে আজও নৃত্যরাণী ভদ্রসমাজের মনে অশুচি, অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য হয়ে আছে এবং সেই থেকে এখনও তার নাম শ্রবণে আমরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কানে আঙুল দিই!

নৃত্যের ভিতর যে যথেষ্ট গ্রহণীয় সামগ্রী আছে, এ-খোঁজ আমরা পেয়েছি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে নৃত্য যে প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করতে জানে তার প্রমাণ "নটীর পূজা" ও "নটরাজে"র নৃত্যমাধুর্য্য। আমাদের হৃদয়কে সৃষ্টির অভাবনীয় সৌন্দর্য্যের মহনীয় প্রেরণায় রঙীন আল্পনা বুলাবার ক্ষমতা নৃত্যকলার প্রভূত পরিমাণেই আছে। শুধু "নটীর পূজা" বা "নটরাজ"-এই নয়, পৃথিবীর চারিপাশে দৃষ্টি ফেরালেই সে শক্তির প্রাচুর্য্য বুঝতে বেশি কষ্ট পেতে হয় না। অথচ এই

শ্রীসাহানা দেবী

অবর্ণনীয় শক্তি-সাধনার কোনও প্রচেষ্টা না দেখ্‌তে পাওয়া যে কত বড় ক্ষোভের কথা তাই ভাবি। তাই বারবার মনে হয়, শিক্ষিত লোকের হাতে এই শক্তির পরিস্ফুরণ, আরো কত সম্পদৈশ্বর্য্যেই গরীয়ান্‌ হ'য়ে উঠ্‌বার সম্ভাবনা! তাঁদের হাতে নৃত্য যে প্রাণ পাবে, সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌বে, তার ভঙ্গির লহরে লহরে যে নতুন নতুন অর্ঘ্যের অঞ্জলি উৎসৃষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে—এ বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ জাগতে পারে না।

শান্তিনিকেতনে বালিকাদের নৃত্যের কোনও শিক্ষাই দেওয়া হয় নাই। তাদের নিজেদের অন্তরের উপলব্ধিকে নৃত্যে মূর্ত্তিদান দিতে সক্ষম হয়েছিল শুধু culture-এর গুণেই। নাচের Technique-টি ভাল রকম শিখ্‌তে পেলে ঐ নৃত্যের ভিতর দিয়ে আরো কত সৃষ্টি করাই তাদের পক্ষে সম্ভব হোত! কিছু না জেনে, না শিখে; যারা এতটা রসের আমদানী করতে পেরেছে, ভালমত শিক্ষা পেলে তাদের একটা বড় রকম সৃষ্টিশক্তির উৎস যে খুলে যেতে পারত এ-বিষয় কোনও সংশয় কি থাকতে পারে? তাই মনে হয় নাচের Technique-টি ভাল ক'রে শিক্ষা করা দরকার তারই বিকাশের সহায়তার জন্য। Technique ভাল রকম জানা থাকলে সৃষ্টির সুযোগ (scope) ঢের বেশি পাওয়া যায়।

এখনও ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে নৃত্যের ভাল ভাল শিক্ষক পাওয়া যায়। অল্প বয়স থেকে বালিকাদের শিক্ষা দিতে পারলে, ক্রমে তাদের বয়োবৃদ্ধি ও culture-এর সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী সৃষ্টির একটা সুযোগ পায়। তা'ছাড়া, ছোট থেকে নাচ আরম্ভ করলে আমাদের অনুদার ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতেও ক্রমে স'য়ে আসবে। কেননা, তাদের বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকের সচকিত দৃষ্টিও অভ্যস্ত হ'য়ে আসবার অনেকটা সময় পাবে। নতুবা ছোটবড় প্রত্যেককেই নাচ সুরু ক'রে দেবার আর্জ্জি আমার যে সমাজের অনুশাসনে মঞ্জুর হবার কোনও সম্ভাবনা নেই—তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ত্রিশ বৎসর আগে সঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন অনেকের ধারণা অচেতন ছিল, তেমনি নৃত্য সম্বন্ধেও যদি আজ অনেকের কল্পনা অজ্ঞ থেকে থাকে তো আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কোনও কারণই খুঁজে পাই না। তার জাগরণের সাড়া অনেকেই অন্তরে পেয়ে থাকলেও বাইরে প্রকাশ করবার ক্ষমতা হয়ত এখনও অর্জ্জন করতে পেরে ওঠেন নি। সে জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া তো চলে না, কেননা মনের ও অনুভবের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অনেকটা খুলে গেলেও, সংস্কারের প্রভাবে বাইরের দৃষ্টি এখনও যে আবৃত, এ-কথা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। তবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নৃত্য আবার উঠ্‌বেই—এবং সে উত্থান অদূরেই।

যাদুকরী

—গল্প—

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

১

প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে অবস্থিত, ক্ষুদ্র, জীর্ণ রান্নাঘর খানির মধ্য হইতে ভাতের ফ্যান্ গলাইতে গলাইতে জগদম্বা ডাকিল,—"ওরে, ও খাঁদা—খাঁদা,—ওরে কোথা গেলি রে?"

অনুসন্ধানের ডাক শেষ হইবার অনেকক্ষণ পরে, সেই ঘরেরই ঠিক পিছনে, খিড়কীর পুকুরঘাট হইতে সাড়া আসিল,—"কেন গো;——যাঃ, খুলে গেল! ওরে বাস্‌রে!—বেচা, দেখলি নি ক?"

হাত দুইতিন অন্তরে দণ্ডায়মান্ হাড়িদের বেচারামের হস্তেও সুতা-খাটানো ধনুকের মত বাঁকা একখণ্ড কঞ্চি শোভা পাইতেছিল, এবং তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষুদ্র খড়ের ফাৎনাটীর প্রতি এমনই ঐকান্তিক একাগ্রতার সহিত নিবদ্ধ ছিল যে, সে খাঁদার 'ওরে বাস্‌রে'র কারণ বিন্দুমাত্র না লক্ষ্য করিয়াও, চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—"দেখেছি মাইরি, খুব বড় মাছ! বোধ হয় পোনা—তা'ই উঠ্‌লো না রে ভাই!"

অধিকতর উত্তেজিত এবং চাপা গলায় খাঁদা বলিল,—"উঠ্‌লো না কি রে? তুই কিচ্ছু দেখিস্ নি। আর একটু হ'লে সুতো ছিঁড়ে নিয়ে যেতো, তা' জানিস্?"

এই শিশু-শিকারীযুগল আজ এই পুষ্করিণীর পলায়িত মৎস্যের আয়তন এবং তাহার সুতা ছিঁড়িবার শক্তি সম্বন্ধে যে প্রকাণ্ড ধারণাটুকু উপলব্ধি করিয়া লইয়াছিল, সেটুকু তাহাদের নিঃশেষে দূর হইবে সেদিন, যেদিন তাহারা ভাঙ্গা কঞ্চি ত্যাগ করিয়া সত্যিকারের আসল ছিপ্ ধরিতে শিখিবে; এবং সেইদিন তাহারা বুঝিবে যে, কল্‌মীর দল বা নিমজ্জিত কঞ্চি বা তালের বাগ্‌ড়ায় লাগিয়া সুতা-ছেঁড়া ভিন্ন মৎস্য-জাতীয় কোন প্রকার জীবকর্ত্তৃক তদ্রূপকার্য্য সংঘটিত হওয়া, এই হিঞ্চে-কল্‌মী-পূর্ণ নিরামিষ জলাশয়টীতে একান্তই অসম্ভব।

ফ্যান্ ফেলিতে আসিয়া জগদম্বা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওরে অলপ্পেয়ে! অ্যাঁ! সেই থেকে এই পচা জলের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছিস্? দাঁড়াত,—চুলোর দোরে দি তোর ছিপ-সুতো! কত ক'রে এই না তোকে জ্বর থেকে তুলিছি! আবার পড়্‌বার মৎলব কচ্ছিস্ বটে?—আয় বল্‌চি—উঠে আয় এক্ষুণি!"

জলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া খাঁদা কিছু-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথা কহিতে বোধ হয় সাহস করিল না, পাছে তাহার পলায়িত পোনা, অথবা তাহারি কোন আত্মীয়-স্বজন বা জ্ঞাতি-বান্ধব, বঁড়সীর কাছে আসিয়া কথার গোলমালে আবার পালাইয়া যায়!

"উঠ্‌ছিস্ না যে বড়,—শীগ্‌গীর উঠে আয় পোড়ার-মুখো!—আঁটকুড়ীর বেটী ছেলে বিইয়ে রেখে গিয়ে কী ফ্যাঁসাদেই আমায় ফেলেছে গো!—তবুও জলে দাঁড়িয়ে রইলি? ওরে মুখপোড়া, এ পুকুরে কি মাছ আছে,—না তুই মাছ ধর্‌তে পারিস? শীগ্‌গীর উঠে আয় বল্‌চি!"

উত্তর না দিলেও আর চলে না, দিলেও এদিকে বড়মাছ হয় ত পালাইয়া যায়। সুতরাং উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া, দৃষ্টিটা জলের দিকেই স্থির রাখিয়া, কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাবে খাঁদা শুধু বলিল,—"আঃ!"

"দাঁড়া ত মুখপোড়া, তোর 'আঃ' আমি বার কচ্চি" বলিয়া জগদম্বা দৌহিত্রের হাত হইতে কঞ্চিগাছটা ছিনাইয়া লইল এবং তাহার নড়া ধরিয়া বাটীর মধ্যে উঠাইয়া আনিল।

গোয়ালের আড়ার উপর কঞ্চিগাছটা রাখিতে রাখিতে জগদম্বা বলিল,—"আহা, বাবুর ছিপের কিবে রূপ গো!"

খাঁদা রান্নাঘরের ভাঙ্গা খুঁটিটা জড়াইয়া ধরিয়া রাগে ফুলিতেছিল।

"শুকনো কঞ্চি ক'গাছা কুড়িয়ে মরাইতলায় রেখেছিলুম উনুন্ ধরাবো বলে, নক্ষীছাড়া দস্যি দু'বেলা মাছ ধ'রে ধ'রে দিলে সেগুলো শেষ ক'রে! তোর মাছ ধরার নিকুচি করেচে! এই, আড়ার ওপর তুলে রাখলুম, এইবার দেখি, কেমন ক'রে তুই ছিপ্ পাড়িস্।"

এত বড় অত্যাচার খাঁদার আর সহ্য হইল না। ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে আসিয়া, দিদিমাকে খিম্‌চাইয়া, আঁচড়াইয়া, কাপড় ধরিয়া টানা-হিঁচড়া করিতে করিতে বলিল,—"পোড়ারমুখী কোথাকার, হতভাগী কোথাকার, আমার ছিপ্ দে বল্‌চি, শূয়ার, ইষ্টুপিড্!"

"দাঁড়া ত অলপ্পেয়ে, ছিপ্ দেওয়াচ্চি তোকে!—ওমা! একটু সুতো কেটে কাট্‌নায় রাখবার যো নেই! যা মেহন্নত্ ক'রে সুতো কাটা! বামুনের হাতে কখনো একটা পৈতে দিতে পারি না! নক্ষীছাড়া দশবার ক'রে গিয়ে সুতোটুকু ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আস্‌ছে! এক গাদা আল্‌পিন্ ছিল নীলার বাক্সটার ভেতর, তা'র একটাও নেই! মুখপোড়া সবগুলোকে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বঁড়শী করেছে! ভারি মাছ ধরিয়ে মদ্দ হ'য়েছেন,—গেল যাঃ!"

বনমালী মুকুজ্জ্যের মেয়ে রাজবালা আগুন লইবার জন্য দু'খানি ঘুঁটে হাতে করিয়া আসিয়া রান্নাঘরের ছাঁচ-তলায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে মামী?"

"হওয়ার কথা আর বলিস্ নি মা। নই পুকুরের পচা পাঁকের ওপর দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিলেন, তুলে এনেছি, তাই গোপালের আমার 'আগ্' হ'য়েছে!—দাঁড়িয়ে রইলি কেন মা, দাওয়ার ওপর একটু উঠে বোস্, এই ভাত ক'টা বেড়ে নিয়ে, হাত ধুয়ে আগুন তুলে দি'।—এস গো দাদাঠাকুর, ভাত খাবে এস। বাল্‌তির জলে ভাল ক'রে হাত দুটা ধুয়ে এস। এস—খেয়ে দেয়ে নিয়ে, তারপর ব'সে ব'সে রাগ কোরো এখন।"

"বেরো বল্‌চি, আমি খাব না, তোর কথা বল্‌তে হ'বে না। পোড়ারমুখী কোথাকার।"

"পোড়ারমুখীর কাছে থাকিস্ কেন? পোড়ারমুখী না হ'লে যে এদিকে আবার হয় না। যেতে পারিস্ না বাপের কাছে? যা', দূর হ'য়ে যা,—বাপের কাছে গিয়ে থাক্‌গে যা। আমিত পোড়ারমুখী, সুন্দরী ভাল মা হ'য়েছে, থাক্‌তে পারিস্ না গিয়ে সেখানে? আমার এ সব পেড়ার্ ভোগ করবার ত দরকার নেই। যা', বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

মুখ গোঁজ করিয়া খাঁদা বলিল,—"বেরোব না, পোড়ার-মুখী কোথাকার! তুই বেরো। তোর বাড়ী?"

"আমার নয় ত কা'র—তোমার?"

"হ্যাঁ আমার।" খাঁদুর চোখে দু'এক ফোঁটা জলও ঝরিতেছিল, একটু থামিয়া আবার বলিল,—"এ ত তোমার বরের বাড়ী।"

রাজ ও জগদম্বা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গোপনে হাসিল। জগদম্বা খাঁদার সামনে আসিয়া বলিল,—"তা'হলেও তোরত আর নয়। তুইত আর আমার বর ন'স। বলেছিলুম বটে,—তা এরকম হাড়-জ্বালানো বরে আমার আর কাজ নেই!"

খাঁদার রাগ দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। ভাঙ্গা খুঁটিটাকে দু'হাতে জোরে নাড়াইতে নাড়াইতে, ভ্যাংচাইয়া বলিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা,—পোড়ার-মুখী কোথাকার!"

রাজবালা বলিল,—"মামী বুঝি খাঁদুকে বিয়ে করবে বলেছিলে?"

আগুন শুদ্ধ ঘুঁটেখানি রাজর হাতের কাছে রাখিয়া জগদম্বা বলিল,—হ্যাঁ মা। সেদিন বল্‌ছিল, 'সকলের বর আছে, তোমার নেই কেন দিদি মা?' আমি বল্লুম,—'আমারও ছিল রে, মরে গেছে।' ও বল্লে,—"আবার বর কর না কেন।" আমি বল্লুম, 'একবার বিয়ে হ'লে আর কি হ'তে আছে?' ও বল্লে, 'কেন, মা তো ম'রে গেছে, তা বাবা ত আবার বিয়ে কল্লে।' তা, আমি বল্লুম, 'তুই যদি আমার বর হোস, ত না হয় তোকেই আবার বিয়ে করি।' তা, ও তা'তে রাজী হ'ল।—তা, বলেছিলুম বটে যে, ওকেই আবার বিয়ে করবো, কিন্তু এরকম কথার অবাধ্য বর নিয়ে আমি কি করবো, তোরাই বল্‌ত মা রাজ" বলিয়া রাজর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। রাজও হাসিল। তারপর, আগুন লইয়া যাইতে

খাইতে রাজ বলিল,—"যাও মাণিক, ভাত খাওগে। দিদিমা যা' বলে, শুনতে হয়। তুমি যে নক্ষী ছেলে।"

জগদম্বা কড়া হইতে বাটী করিয়া খানিকটা দুধ লইয়া থালার কাছে রাখিল এবং খাঁদাকে জোর করিয়া কোলে তুলিয়া থালার কাছে বসাইয়া বলিল,—"মাণিক আমার, সোনা আমার, যাদু আমার, এই কতখানি সর দিয়েছি ভাখ্ একবার। তুই যে আমার ছিষ্টিধর, আমার বংশের দুলাল, আমার নয়নের—"

"রাজ মাসীর কাছে কেন বিয়ের কথা বল্লি?"

"আচ্ছা, আর বলবো না। দেখ্ দেখি বাবা, জলে দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটো একেবারে ঠাণ্ডা হিম্ হ'য়ে গেছে! চারিদিকে জর জাড়ি হচ্ছে, আবার পড়লে, আর কি তোকে বাঁচাতে পারবো! কথা শোন না কেন বাবা! নাও, শীগ্গীর খেয়ে দেয়ে নিয়ে, চল, পাঠশালায় দিয়ে আসি। ছেলেরা সব বই সেলেট্ নিয়ে কখন্ গেছে! তা'রা ভাব্বে, 'ওমা' খাঁদাটার রোজ আস্তে দেরী হয়।"

২

ছোট্ট একটু আখ্যায়িকা, একরত্তি তা'র পূর্ব্ব-কথা। বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়।

একমাত্র কন্যা লীলাবতীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন পাগল স্বামীর মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুতে হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর লোপ ব্যতীত সংসারে জগদম্বা আর কিছুরই পরিবর্ত্তন জানিতে পারিল না। বরং দিনরাত দুরন্ত পাগলকে লইয়া ঘর করার যে একটা মহা আতঙ্ক ছিল, তাহার শেষ হইয়া গেল। সংসারে 'ন-মাতা, ন-পিতা, ন-ভ্রাতা'। গ্রাসাচ্ছাদনের কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী এবং কন্যা লীলাবতী এই দুইটী বস্তু অবলম্বন করিয়া বিধবা তাহার দিন কাটাইতে লাগিল।

লীলা বড় হইল। জগদম্বা তাহার বিবাহ দিল। বুক ছিঁড়িয়া তাহাকে শ্বশুরবাটী পাঠাইল। শ্বশুরের সংসারও লীলায় ফাঁকা; অর্থাৎ, শ্বশুর আর স্বামী, স্বামী আর শ্বশুর। বছর খানেক পরে সেই শ্বশুরেরও যখন তিরোভাব হইল, তখন প্রমথনাথ নিজের গৃহে তালাচাবি বন্ধ করিয়া স্ত্রীকে লইয়া শ্বশ্রালয়ে আসিয়া আবির্ভূত হইল।

তাহার পর লীলা একটী ফুট্ফুটে সন্তানের জননী হইল। কিন্তু খাঁদুর জন্মের পর, লীলার শরীর এমন ভাঙ্গিয়া পড়িল যে আর তাহা শোধরাইল না। খাঁদু দিদিমার কোলেই মানুষ হইতে লাগিল, আর লীলা তাহার নানাপ্রকার রোগ লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। এই অবস্থায় বছর তিনেক পরে, লীলা আর একটী কন্যা প্রসব করিল এবং ছয়দিনের দিন আঁতুড় ঘরেই স-কন্যা লীলার ইহলীলার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল।

নদীর ধারে স্ত্রীর শেষ গতি সম্পন্ন করিয়া প্রমথ নির্ব্বাপিত চিতা হইতে খানিকটা ভস্ম সঙ্গে করিয়া আনিল, এবং তাহা একটী পাত্রে রাখিয়া, তাহা সদরবাটীর আমগাছতলায় প্রোথিত করিয়া, মিস্ত্রী ডাকাইয়া, তদুপরি একটী বেদী নির্ম্মাণ করাইল। পাড়া-প্রতিবাসীদের কোন প্রকার আনন্দ-উৎসবে যোগদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিল; দু'একটী শোকের কবিতা লিখিল; এবং কলিকাতা হইতে 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেম' আনাইয়া, দিনের অধিকাংশ সময়ই তাহা হস্তে লইয়া স্ত্রীর বেদীপার্শ্বে কাটাইতে আরম্ভ করিল। বন্ধুদের মধ্যে যাহারা পুনরায় দার-পরিগ্রহের কথা বলিতে আসিয়াছিল, প্রমথ তাহাদের সহিত ঘৃণায় একেবারেই বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

বৎসরাধিক কাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবার পর, হঠাৎ প্রমথর পরিবর্ত্তন দেখা দিল; এবং ধর্ম্মে, অর্থাৎ সংসার ধর্ম্মে, পুনরায় তাহার মতিগতি সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল।

তাহার পর যাহা হইয়া থাকে। মাসকতক ধরিয়া এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন, ক্রোশ দুই তিন দূরবর্ত্তী মাধবপুরে গোঁসাইবাড়ী একটী বয়স্থা কন্যা দেখিয়া আসিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কন্যাটীর পাণিপীড়ন করিয়া প্রাচীন সনাতন প্রথার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিল।

স্ত্রী বিন্দুবালা বিবাহের পর এই দেড় বৎসর কাল পিত্রালয়েই আছে। প্রমথ নিজের গ্রামের জমীদারসেরেস্তায় একটী কর্ম্মের যোগাড় করিয়া লইয়াছে। বহুদিন পরিত্যক্ত পৈত্রিক জীর্ণ ভদ্রাসনের আবার সংস্কার হইতেছে

এইবার স্ত্রীকে আনিয়া আবার নূতন করিয়া গৃহস্থালী পাতিয়া সংসারধর্ম্ম করিবার সর্ব্বপ্রকার আয়োজনই প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

এইটুকু মাত্রই এই ক্ষুদ্র কাহিনীর অতীত ইতিহাস।

৩

আহারাদি সারিয়া, খাঁদাকে পাঠশালায় রাখিয়া আসিয়া, জগদম্বা তুলার পাঁজ লইয়া টেকোয় সুতা কাটিতে কাটিতে অতীত ও বর্ত্তমানের অনেক কথাই চিন্তা করিতেছিল। উমার মা আসিয়া, খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া বলিল,—"বৌদি', দিদি কাল মাধবপুরে শিম্যি-বাড়ী গিয়েছিল। প্রমথর নতুন বৌকে দেখে এল। দিদি বল্লে,—'হ্যাঁ, সুন্দরী যা'কে বল্‌তে হয়! রূপ উথ্‌লে পড়ছে! তবে ধাড়ী মেয়ে বাপু। ওরা যা'ই বলুক, সতের আঠার বছরের কম কিছুতেই নয়।''

"মাধবপুরে বুঝি হেমার শিম্যি আছে?''

"ঐ একঘর নাপিত,—তা'ও সব মরে-হেজে গেছে। —তা' বো'য়ের চোখে মুখে কথা! খুব গিন্নী, খুব বান্নী, বলিয়ে-কইয়ে, লিখিয়ে-পড়িয়ে,—একেবারে পাকা-পোক্ত, ফিট্-ফাইন্।''

"তা, পেরমথর ভালই হ'য়েছে। এতদিন ত সংসার কা'কে বলে তা' জানতে হয় নি। আসনে বসে, তৈরী ভাত দু'বেলা খেয়েছে, আর কেবল বেড়িয়ে বেড়িয়েছে। এখন ত আর তা' হ'বে না। এখন চাকরীও ক'ত্তে হ'বে, পয়সা উপায়ও ক'ত্তে হ'বে, হাট-বাজারও ক'ত্তে হ'বে। সংসারের সবই এখন নিজেকে ক'ত্তে হ'বে। আর, তখন যদি একদিন বলিছি,—'বাবা, নীলা আজ দু'টী পত্তি করবে, একবার জেলেবাড়ী গিয়ে দেখ না যদি কিছু জাওলা মাছ-টাছ পাও,'—অম্নি হুমকী দিয়ে এসেছে—'হুঁঃ, আমি যা'ব জেলেপাড়ায় মাছ খুঁজ্‌তে!' পরের খোসামোদ ক'রে, ঠাকুরঝি, চিরকাল হাঠ ক'রে আনিয়েছি—পেরমথ কখন একদিন হাঠে গিয়ে হাঠ ক'রে এনেছে! কখন কুটোটি নেড়ে সংসারের কোন উপ্‌গার করে নি। সব কথাই হৃদে গাঁথা আছে উমার মা। তা', সুন্দরী বৌ হ'য়েছে, সুখ হ'য়েছে, ভালই হ'য়েছে,—তবে তা' শুনে ত আর আমার বুকের জ্বালা জুড়ুবে না আমার নীলা যেদিন গেছে, সেদিন থেকে আমার বুকের জ্বলুনির আর বিরাম নেই।''

"বলেচে,—'ন-গাঁয়ের বাড়ীর ঘর-দোর সব মেরামত হচ্ছে। ওমাসের দোসরা তারিখে যা'ব। ওখান থেকে ত কাছেই,—একদিন মাকে দেখ্‌তে যাব। তাঁর পায়ের ধূলো—

"মুখে মুড়ো জ্বেলে দি তা'র! আস্পদ্দার কথা দেখ? 'মাঁকেঁ দেঁখঁতেঁ যাঁবোঁ'! গভ্‌ভোধারিণী মা! একবার এলে মজাটা——

"দিদ্‌মা উ!"

"কিরে খেঁদো, এরি মধ্যে চলে এলি কেন পাঠশালা থেকে? এই ত তোকে রেখে আস্‌ছি!"

"খি"

"খি কি রে?"

"দে"

"সত্যি না মিছে? এইত একরাশ গিলে এলি!"

তাড়াতাড়ি সিলেট বই দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিয়া, টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে, খাঁদা বলিল, "সত্যি গো সত্যি, খাবার দিয়েই দেখ না; তখন ভাল ক'রে খেতে দিলে কই?"

উমার মা বলিল,—"না না, সত্যিই হ'বে বোধ হয়, তা' না হ'লে আর তাড়াতাড়ি চ'লে আসে বৌদি'?''

"মনেও কোরো না ঠাকুরঝি! নিত্যিই ওএইরকম ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে! মশাই বলে যে, 'আপনি যতক্ষণ ব'সে থাকেন, খুড়ী-ঠাকরুণ, ততক্ষণ চুপ্‌টী ক'রে খাঁদু আপনার বেশ ব'সে থাকে, তারপর আপনি উঠে গেলেই, ও আর থাক্‌তে চায় না।' এ কি মুস্কিল ভাই! আমি গিয়ে কি সারাদিন পাঠশালায় ব'সে থাকতে পারি? পেরথম্ পেরথম্ ত তা'ও ভাই করিছি। সেই জলখাবারের ছুটী পর্য্যন্ত ব'সে থেকে, ছুটী হ'লে পরে, ওকে একেবারে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসতুম্। এখন ওকে রেখে বাড়ী আস্‌তে না আস্‌তেই, ও এসে হাজির! হয় ক্ষিদে, নয় জলতেষ্টা, না হয় ঐ রকম একটা কিছু। বল কেন ঠাকুরঝি, কি করি যে এ ছেলেকে নিয়ে, তা জানিনে।"

"ব'স্‌বে ব'স্‌বে, এইরকম ক'ত্তে ক'ত্তেই মন ব'স্‌বে। আর ওর বয়েসই বা কি বৌদি?"

"তা' হ'লেও, এখন থেকে মন বসাতে ন' পার্‌লে——হ্যাঁরে, আবার ঐ কতকগুলো কস্‌টে খেজুর নিয়ে এলি? খাস্ নি বাবা, পেট্ কাম্‌ড়ে সারা হ'য়ে যাবি!"

খেজুরগুলি পৈঠার উপর রাখিয়া খাঁদা বলিল,—"কস্‌টে নয় গো, দেখ না কেমন পাকা পাকা। খাবে দিদ্‌মা?"

"হ্যাঁ, ঐ আঁস্তাকুড়ের খেজুর আমায় খেতে হ'বে বৈ কি!"

"আঁস্তাকুড়ের নয় গো। বেচাদের গাছের—মাইরি।"

"তা ভাল, ঐখানেই থাক্ অমনি, ও আর খেওনা মাণিক। উমার মা, ভাই, গা-টা আবার শীত্-শীত্ ক'রে আস্‌ছে, জ্বর আবার আজও এল দেখ্‌ছি!"

"বৌদি, নিত্যি যখন এরকম জ্বর হচ্ছে, তখন ভাল দেখে একটা ওষুধ-টোষুধ খাও। ঐ আমার উমার জন্যে——

"হ্যাঁ, নীলাকে খেয়ে ব'সে আছি, আমাকে এখন পাঁচ রকম ওষুধ-বিষুধ খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা ক'ত্তে হ'বে বৈ-কি!"

"তা কি কর্ব্বে বল। ছেলেটার জন্যেও ত বাঁচ্‌তে হবে। তা' না হ'লে, ওকে আর কে দেখ্‌বে বল?"

"যা'র ছেলে সেই নিয়ে যাবে উমার মা। তুমি মনে করেছ, খেঁদোকে আমার কাছে রাখবে,—মনেও তা কোরো না। এই কবে এসে নিয়ে যায় একদিন!—এরি মধ্যে শাসিয়ে দশখানা চিঠি দিয়েছেন—'আর আপনার কাছে শ্রীমান্‌কে রাখা চলিবে না, যেহেতু তাহার পড়াশুনার সময় আসিয়াছে। এই সময় অবহেলায় নষ্ট হইলে, লেখা-পড়া হওয়া কঠিন হইবে।' তারপর, আরও কত কি,—হ্যাঁ—'ওখানে থাকিলে বালকের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে না।' সে কতভাবেরই কথা উমার মা! তা, বালকের স্বাস্থ্য এখানে কি ক'রে আর ভাল থাক্‌বে বল? মা'র পেট থেকে প'ড়ে অব্দি ত সুন্দরী বৌয়ের কাছেই ছিল এতদিন, এখন এখানে থাকলে ত স্বাস্থ্য খারাপ হ'বেই। শ্রীমানকে আর এখানে রাখা কি ক'রে—নাঃ, উমার মা, আর ব'সে থাকা হ'ল না, লেপ মুড়ি দিতে হ'ল। খাঁদু, কোথাও যেওনা বাবা, বাড়ীতে ব'সে খেলা করো।"

৪

সেদিন রাত্রে দৌহিত্র ও মাতামহীতে শুইয়া শুইয়া কথা হইতেছিল; জগদম্বার জ্বর বোধ হয় ছাড়িয়া আসিতে-ছিল। খাঁদুকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"আচ্ছা খাঁদু, আমি যদি ম'রে যাই বাবা, তুই কা'র কাছে থাকবি?"

"তুমি মরবে কেন?"

"আমি কি আর চিরকালই বাঁচ্‌বো বাবা? দেখ্‌ছিস্ না, রোজ রোজই জ্বর হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। হয় ত কবে একদিন টুপ্ ক'রে ম'রে যাবো।"

"না দিদ্‌মা, তুমি মোরো না!"

"বেঁচে থেকে কি হ'বে বল্? তুই ত আর একটী কথা আমার শুনিস্ না! আচ্ছা, সত্যি হঠাৎ যদি ম'রেই যাই, তা' হ'লে কি কর্ব্বি তখন তুই?"

"তক্ষুণি বেচাদের বাড়ী ছুটে যাব। কিন্তু কি ক'রে জান্‌তে পারবো দিদ্‌মা যে তুমি ম'রে গেছ? চোক তা'হলে ত আর চাইবে না,—খুব ডাক্‌লেও না?"

"না। তা, হাড়ী-বাড়ী ছুটে গিয়ে কি কর্‌বি বল্? ঐ রাঙ্গমাসীদের বাড়ী গিয়ে খবর দিবি, ঐ ফটিক মামাদের ছুটে গিয়ে বল্‌বি, ঐ—"

বাধা দিয়া খাঁদু বলিল,—"আচ্ছা, দিদ্‌মা, যদি এম্‌নি রাত্তির বেলায় ম'রে যাও, তা' হ'লে কি হ'বে? কি ক'রে অন্ধকারে একলা বেরুবো? সে বড় মুস্কিল হবে দিদ্‌মা! তুমিও চোক বুজে থাক্‌বে, কথা ক'বে না, আর আমিও বেরুতে পারবো না!"

"সেই ত বাবা, সেই কথাই ত ভাব্‌চি।"

"দেখ দিদ্‌মা, তুমি শোবার সময় রাত্তিরে ওপরকার খিল্‌টা আর দিওনাক। ওপরের খিল্‌টা দে'য়া থাক্‌লে দিদ্‌মা, আমি ত নাগাল পাব না! শুধু নীচের খিল্‌টা দে'য়া থাক্‌লে, টপ্ ক'রে খুলে ফেল্‌বো। ফেলেই, দাওয়ায় বেরিয়ে খুব চেঁচিয়ে 'বেচা বেচা' ব'লে ডাক্‌বে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

তারপর ওরা ত শুন্‌তে পেলেই ছুটে আস্‌বে। এলেই বল্‌বো,—ওরা রাজমাসীদের খবর দেবে।”

খাঁদুর ছোট মাথাটিতে নিজের শীর্ণ উত্তপ্ত হাত বুলাইতে বুলাইতে জগদম্বা বলিল,—“না বাবা, অত তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না ধন। মরি যদি ত দিনের বেলাতেই মরবো?”

“তখন যদি পাঠশালায় থাকি দিদ্‌মা?”

“তোমায় ডাকিয়ে আনবো মাণিক” বলিয়া জগদম্বা আরও কোলের কাছে খাঁদুকে টানিয়া, তাহার পিঠে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—“আচ্ছা খাঁদু, এই ছ’মাস ধ’রে যে বাবা পাঠশালায় যাচ্ছিস্‌, শিখ্‌তে টিক্‌তে পেরেছিস্‌ কিছু?”

“হুঁ”।

“কি শিখেছিস্‌ বল্‌ দেখি একবার। তোর বাপও খালি লিখ্‌ছে, এখানে থাকলে তোর পড়া-শুনো কিছু হবে না। তোকে আমার কাছে আর বেশীদিন রাখবে না বাবা। এই কবে এসে হয়ত একদিন নিয়ে যায়!”

“ইস্‌—গেলে ত? আমিত এখানে খুব ভাল পড়া শিখ্‌ছি,—তা’ হ’লেও নিয়ে যাবে?”

“আচ্ছা, কি শিখিছিস্‌ বল দেখি?”

“বোলবো,—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ ক খ ঙ জ—

“তা’ হ’লে ত খুবই শিখিছিস্‌ দেখ্‌চি বাবা! একেবারে বর্গীয় জ পর্য্যন্ত শিখে ফেলেছিস্‌?”

“হ্যাঁ দিদ্‌মা! আবার সট্‌কে বলবো দেখবে?—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, উনিশ, তের, পনর—

নাতি দিদিমাতে এই প্রকার গভীর বিষয়ের আলোচনা চলিতে চলিতে একসময় খাঁদু ঘুমাইয়া পড়িল। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘনাইয়া দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত জগদম্বার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। বাহিরে তখন ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রাবণের মেঘাবৃত নৈশ আকাশে কোথাও একরত্তি আলোর আভাস মাত্র ছিল না। চারিদিকে বিকট ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, এক-একবার দমকা বাতাস আসিয়া ঘরের চাল ও গাছপালাকে কাঁপাইয়া ও দোলাইয়া দিয়া যাইতেছিল। অন্ধকারের রাজ্যে বাতাস এবং বৃষ্টির যেন রাক্ষুসে খেলা চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার দূরের কোনো গ্রাম হইতে কোনো কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ চৌকিদারের চৌকির হাঁক্‌ বিকট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রকৃতির এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে জগদম্বার সমস্ত অন্তর আজ কি-যেন একটা আতঙ্কে থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়, বোধ হয় কি একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখিয়া, খাঁদু অস্ফুটে ডাকিয়া উঠিল,—“দিদ্‌মা গো!’ জগদম্বা তাহাকে একেবারে বুকের সহিত মিশাইয়া চাপিয়া ধরিল, তা’রপর প্রায় সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরের দিকে জগদম্বা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে যখন খাঁদু তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া তুলিয়া দিল, তখন উঠান রোদে ভরিয়া গিয়াছিল এবং গরু ছাড়িয়া দিবার জন্য দূরে উচ্চ কণ্ঠরব শোনা যাইতেছিল।

৫

আজ আটদিন হইল প্রমথ আসিয়া খাঁদুকে নবগ্রাম লইয়া গিয়াছে। জগদম্বাকেও যাইবার জন্য বিশেষরূপে পিড়াপিড়ী করিয়াছিল, ফলে প্রমথকে কতকগুলি কড়া কথা শুনিতে হইয়াছিল।

জগদম্বার জ্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজকাল জ্বর আবার আসে। তবে দিনের বেলা তাহার জ্বর আসিতে কেহ দেখে নাই। জগদম্বা বলে, রাত্রে আসে। রাজবালা এখন আগুন লইতে আসিয়া প্রায় প্রত্যহই ফিরিয়া যায়, আগুন পায় না।

জগদম্বা বলে,—“উনুনে আর কি জন্যে আগুন দোবো মা, ভাত খাবে কে?-রোজই রাতে জ্বর হয়।” সুতরাং জগদম্বা উনুনে আগুন দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সারা রাত্রি ধরিয়া যাহার জ্বর হয়, সে প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিতেও পারে, গরু-বাছুরের সেবাও করিতে পারে, এবং অন্যান্য যাবতীয় গৃহকার্য্য করিতেও তাহার বাধে না,—পারে না শুধু রাঁধিয়া দু’টী ভাত খাইতে, আর অবসর সময়ে আগেকার দিনের মত পাড়া প্রতিবাসীদের বাড়ী বেড়াইতে।

ঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া যেটুকু সময় থাকে, হয় সেটুকু শুইয়া থাকে, নয় ত বসিয়া বসিয়া সুতা কাটে। সুতা কিন্তু আগের দিনের মত ভাল কাটা হয় না। হয় তাহা মোটা বেরোয়, নয় ত বা ঘন ঘন ছিঁড়িয়া যায়।

সেদিন দুপুরবেলা বসিয়া বসিয়া জগদম্বা সুতা কাটিতেছিল। উমার মা আসিয়া বসিল। দু'এক কথার পর বলিল,—"শরীরটা তোমার বৌদি' বড্ড খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে! তখন অত ভুগ্‌ছিলে,—জ্বরের ওপর জ্বর—তা'তেও কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই হ'য়ে যাও নি। এই পাঁচ সাত দিনেই যেন একেবারে তোমায় ভেঙ্গে দিয়েছে! আচ্ছা, কখন্ তোমার জ্বর আসে বৌদি'? তুমি বাপু একটা ওষুদ্ টোষুদ্ খাও, নইলে চল্‌বে না।"

"খাব এইবার।"

"হ্যাঁ, তাই খাও, নইলে—হ্যাঁ, খাঁদুর আর কোন খবর্ টবর্ পাওনি বৌদি'? কারুকে ন'গাঁয়ে পাঠাওনি?"

"হ্যাঁ, মর্‌চি নিজের জ্বালায়,—খাঁদুর খবর! ওটাকে নিয়ে গেছে, না বেঁচিছি।"

"ছেলেটা জ্বর নিয়ে গেল, কেমন রইল—

"যেমন থাকে থাক্ বোন্, আমার আর ওসব ঝক্কি ভাল লাগে না। তা'র জন্যে কি আমায় কম জ্বালাতন হ'তে হ'ত? এই দেখনা, ক'দিন নেই ত,—এই কত সুতোর নলি হ'য়েছে! সে থাকলে কি এর একটুও থাক্‌তো? আর বাড়ীঘর নৈরেকার কর্‌বার শিরোমণি ছিল! কঞ্চি কেটে, বাঁশ কেটে, ছাই-ভস্ম, কাদা-মাটি, ইট-পাট্‌কেল্, সুতো, দড়ি, ন্যাকড়া, কাগজে ঘর-দোর একেবারে একাকার ক'রে রাখতো! আর তা' ছাড়া, তা'র জন্যে কি কোন কাজ ক'ত্তে পেতুম, উমার মা? দুদণ্ড ভগবানের নাম ক'ত্তেই যার সময় পেতুম না! দিনের মধ্যে হাজার বার তা'র 'দিদ্‌মা গো'র সাড়া দিতে দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ত! শত্তুরকে নিয়ে গেছে—না বেঁচেছি!"

আরও খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর উমার মা উঠিয়া গেল। জগদম্বাও সুতা কাটা বন্ধ করিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া শুইয়া পড়িল। আল্‌নায় খাঁদুর একখানি নীল রংকরা ধুতি ঝুলিতেছিল। এবার পূজার সময় দোকানে ঐরকম কাপড় দেখিয়া খাঁদু বড় বায়না ধরিয়াছিল, তা'ই জগদম্বা এগার-আনা পয়সা দিয়া তাহা কিনিয়া দিয়াছিল। জগদম্বা উঠিয়া সেখানি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া কোঁচাইয়া আবার আল্‌নার উপর রাখিয়া দিল। তা'র পর নিজের মনেই বলিল,—"আহা, কাপড়খানার জন্যে ম'রে যায়, তা' পরতে পাবে না, ফেলে গেল! আর এই দেখ, বই সেলেট্ পর্য্যন্ত নিয়ে যায় নি! তাড়াতাড়ি ছেলেকে নিয়ে যেতে পারলে যেন হয়" বলিয়া সেগুলিও গোছাইয়া ভাঙ্গা তোরঙ্গটার মধ্যে রাখিতে রাখিতে বলিল,—"দেখেছ একবার, সেদিন কান্নাকাটি ক'রে, পয়সা দু'আনা নিয়ে গিয়ে এই খাতা আর পেনসিল্ কেনা হ'য়েছে, আর এই সব ছাঁই-পাঁশ, চিত্তির্ বিচিত্তির্, আঁক্-জোঁক্ কেটে কাগজগুলো সব নষ্ট করেচে! আহা, বাছা নিয়ে যেতেও পারলে না!"

লীলা, প্রমথ ও খাঁদুর একসঙ্গে একখানি ফটো ছিল। জগদম্বার শূন্য বাক্সের মধ্যে লক্ষ্মীর কৌটা ও এই ফটোখানি থাকিত। মধ্যে মধ্যে জগদম্বা ছবিখানি বাহির করিত। আজ সকালে সেখানি বাহির করিয়া বিছানার তলায় রাখিয়াছিল। সেখানি এখন হাতে করিয়া আবার শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

উঠান হইতে কে ডাকিল,—"খুড়ীমা ঘরে আছ নাকি গো?"

তাড়াতাড়ি বুকের উপর হইতে ছবিখানি সরাইয়া বালিসের তলায় রাখিয়া উঠিয়া বসিল, এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কে রে, বোষ্টুম বৌ?—আচ্ছা, তোর আক্কেল কি বল্ দেখি? আজ চার দিন হোল, তোর মোটে দেখাই নেই। যখনই যাই, তখনি গিয়ে দেখি ঘরে তালা বন্ধ। কোথায় ছিলি এত দিন?"

বোষ্টুম বৌ দুয়ারের বাহিরে বসিয়া বলিল,—"সে কথা আর বোলো না মা। মনে কোরো না যে বোষ্টুম বৌ যায় নি। ন'গাঁ, মণিপুর, আজাগাঁ—ভিক্ষের জন্যে এ ত' আমাকে নিত্যিই যেতে হয় মা। ন'গাঁয়ে তা'র পর্‌দিনই আমি গিয়েছিলুম,—খবরও এনেছি, কিন্তু খুড়ী-ঠাকরুণ গাঁয়ে আর এসে পৌছুতে পারি নি। পথেতেই মা এমন

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জ্বর এলো যে আর দাঁড়াতে পাল্লুম না। ঐ মণিপুরে ভাসুর পোর ঘরেই কষ্টে স্থষ্টে গিয়ে পড়লুম। তারপর, রাত্তির থেকে একেবারে বেধড়ক জ্বর! এই তিন দিন পরে আজ সকালে জ্বরটা ছেড়েছে খুড়ীমা। তাই ভাবলুম, আহা, খুড়ীমা ভেবে সারা হচ্ছে, আস্তে আস্তে এইটুক্ গিয়ে খবরটা একবার দিয়ে আসি। নইলে পরে—

"ছেলেটা কেমন আছে বল্ দেখি ?"

"না, খাঁদু তোমার ভাল আছে। ডাক্তার দেখাচ্চে, ওষুধ-পত্তর খাচ্চে—

"ওষুধ-পত্তর খাচ্চে! তাহ'লে এখনো অসুখ সারে নি ?"

"না, অসুখ সেরে গেছে। সেই দিন পত্তি করেছে।"

"তা' পেরমথ তোকে চিনতে পারলে ত ? খাঁদু তোকে দেখে কিছু বল্লে না ?"

"জামাইবাবু তখন ঘরে ছিল না, কাচারী গ্যাছ্লো। বৌটীত আর আমাকে চেনে না। খুব রূপসী বৌ হ'য়েছে জামাইবাবু এবার! রূপ আর গায়ে ধরে না! তা' আমি যেমন ভিক্ষে কত্তে গিছি, ভিক্ষে চাইলুম্। বৌটী ব'ল্লে,—'ভিক্ষে দিতে নেই গো, ছেলের আমার অসুখ'। দেখ্লুম—খাঁদুকে কোলে ক'রে বিছানার ওপর ব'সে ব'সে বাতাস্ কচ্চে। একগাছি—

বাধা দিয়া জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিল,—"খাঁদুকে কোলে ক'রে ব'সে বাতাস কচ্চে ?"

"হ্যাঁ গো। একগাছি সোনার হার খাঁদুর গলায় পরান। বোধ হয়, বৌয়েরই হার,—দু'নলি ক'রে পরিয়ে দিয়েছে। মাথার শিওরে—

"নিজের হার খাঁদুর গলায় পরিয়ে দিয়েছে!"

"হ্যাঁ। মাথার শিওরে একখানা রেকাবিতে বেদানা, বিলাতী খেঁজুর, বিস্কুট্, আরও সব কি র'য়েছে।"

"তুই আর কা'রো বাড়ী গিয়ে পড়িস্ নি ত ?"

"কি যে বলে খুড়ীমা তা'র ঠিক নেইক পাঁচ বছর বয়েস থেকে মায়ের সঙ্গে ন'গাঁয়ে ভিক্ষেয় যাচ্চি। জামাই-বাবুদের বাড়ী আর আমি চিনি না! একেবারে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের নাগোয়া বাড়ী!"

"হ্যাঁ, সেই বাড়ীই বটে। তা' খাঁদু তোকে দেখ্তে পেলে না ?"

"তোমার খাঁদুও ত আমায় তেমন চেনে না গো! তারপর, আমি একটু জল চাইলুম। এক ডেলা মিছরী আর এক ঘটি জল দিয়ে বৌটী বল্লে,—"এস বাছা আর একদিন। ছেলের আমার অসুখ সারলে একদিন এসে ভিক্ষে নিয়ে যেও। ক'দিনের পর আজ দু'টী পত্তি দিয়িছি মা, আজ আর ভিক্ষেটা দেবো না। এখনো ওষুধ—।"

"দিদ্মা!"

চমকের প্রথম বেগ্ কাটিতে না কাটিতে, জগদম্বা দেখিল, নূতন ভেল্ভেটের স্যুট্ ও সোনার হারে সজ্জিত হইয়া খাঁদু উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—"শীগ্গীর উঠে এসে দেখ না, কে আস্চে! গরুর গাড়ী ক'রে তোমাকে—"

কথার শেষ হইল না। সঙ্গে সঙ্গেই একটী ষোল সতের বৎসরের মেয়ে, লাল পাড়ের একখানি সাড়ী পরিয়া উঠান আলো করিয়া প্রবেশ করিল এবং দাওয়ার উপর উঠিয়া তাহার অনাবৃত মুখ জগদম্বার পায়ের উপর রাখিয়া বলিল,—"কি অপরাধ করেছি মা, যে মেয়েকে তোমার এত শাস্তি দেবে ?"

বোষ্টুম বৌ অবাক হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার বাক্ ফুটিল—"ও খুড়ীমা, জামাইবাবুর নতুন বৌ যে গো!"

বিন্দু তেমনি ভাবেই জগদম্বার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল,—"দিদি সগ্গে গেছে, কিন্তু আমিও ত তোমার মেয়ে মা। কি অপরাধে মায়ের সেবা থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করবে ? পেটে জন্মাইনি, তা' সে অপরাধ আমার, না ভগবানের, তুমিই তা' আমাকে ব'লে দাও। তুমি মাথার ওপর না থাকলে, আমি খাঁদুকে কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলবো ? তাই, তোমার খাঁদুই তোমাকে আজ নিতে এসেছে মা; বল, তার বাড়ীতে তুমি যা'বে কি না ?"

রক্তশূন্য শীর্ণ হাতখানি দিয়া বিন্দুকে ধরিয়া উঠাইয়া জগদম্বা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানকার বাড়ী ঘর—?"

বিন্দু খাঁদুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল,—"সে সব-ব্যবস্থাই আমি ক'রতে পারবো মা ; তুমি শুধু তোমার ওপর আমায় মেয়ের অধিকারটুকু দাও।"

জগদম্বা বলিল,—"দেবার আগেই, সে ত তুমি জোর ক'রে আদায় ক'রে নিয়েছ! খাঁদু আমার যখন তোমায় ভালবেসেছে, মা ব'লে যখন তোমার কোলে তা'র জায়গা ক'রে নিয়েছে, মেয়ের দাবা তখন ত মা তোমার আপ্‌না হ'তেই জন্মে গেছে!"

* * * *

পরদিন প্রাতে একহাতে তসরের কাপড় ও হরিনামের মালা এবং আর এক হাতে সুতার নলি, টেকো, তুলার পাঁজ প্রভৃতির পুঁটুলি লইয়া, সকলের আগেই যখন জগদম্বা গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়া বসিল, তখন সদর দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বিন্দু উমার মা'র হাতে বাড়ীর চাবি দিয়া বলিল,—"তা'হলে এই দু'চারটে দিন একটু দেখো পিসিমা ; এরি মধ্যেই লোক পাঠিয়ে আমি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বো।"

সেই সময় বোষ্টম-বৌ আসিয়া পিছন হইতে বলিল,—"মাকে পাক্‌ড়া ক'রে শুধু নিয়ে গেলেই ত হ'বে না দিদিমণি, আমার ভিক্ষের কথাটা মনে আছে ত?"

পিছন ফিরিয়া বিন্দু বলিল,—"হ্যাঁ দিদি, আছে বৈ কি" বলিয়া আঁচল হইতে একটী টাকা খুলিয়া বোষ্টুম বৌয়ের হাতে দিল।

"কি আর বলবো দিদিমণি, তোমার মত এম্‌নি মন যেন সকলকারই হয়। রাধারাণী তোমার ভাল করুন।"

খাঁদুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিন্দু বলিল,—"আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আজ যেমন আনন্দ পেলুম, এই রকম আনন্দ যেন চিরকাল তোমার রাধারাণী দেন।"

খাঁদু তখন বিন্দুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল,—"গোয়ালের আড়া থেকে আমার ছিপ্‌ গাছটা পেড়ে দেবে?—নিয়ে যাবো।"

ভিক্ষা

হুমায়ুন কবির

তোমার কুসুমরাশি—আমি তার একটী পল্লব
নীরবে মাগিয়াছিনু। আকাশের কত শত তারা,—
তাহারি একটী যদি মোর প্রাণে তোলে গীতিরব,
আমার অন্তর ভরি' সঙ্গোপনে ঢালে সুধাধারা,
আকাশ করে না রোষ। তোমার কাননে আসি আমি
একটী কুসুম যদি হৃদয়ে লুকায়ে নিয়ে যাই,
কেহ জানিবে না কথা, অকস্মাৎ যাবে নাকো থামি'
দক্ষিণ পবন বনে, শুক্লা শশি চাহিবে বৃথাই!
তুমি জানিবে না কিছু, শুধু মোর জীবন ভরিয়া
উঠিবে বাজিয়া বাঁশী, পরাণের আঁধার হরিয়া
আলোক উঠিবে হাসি'; ভেসে চলে যাবে মেঘদল,
ঝলিবে নয়ন কোণে মুক্তাবিন্দুসম অশ্রুজল!
হৃদয়ের বেদনায় হৃদয়ে উঠিবে বাজি গান
হতাশা ভুলিয়া গিয়া স্বপ্ন শুধু দেখিবে পরাণ!

ইন্দোচীন-প্রসঙ্গ

(৪)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

প্রাচীন যশোধরপুরের প্রাচীরের বাইরে যে-সব ভগ্নাবশেষ আছে তার ভিতর টা-প্রোম (Ta-prohm) এবং প্রা-খানই (Pra Khan) উল্লেখ যোগ্য। যশোধরপুরের বিজয়-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমরা টা-প্রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বিজয়-দ্বারের অনতিদূরেই প্রধান সড়ক। দেখ্‌লেই মনে হয় প্রাচীনকালে এটী ছিল রাজপথ। যশোধরপুরের পাশ দিয়ে এটী বরাবর উত্তরমুখে গিয়েছে। এই পথ দিয়েই কম্বোজের উত্তরভাগের নানাস্থানে এবং প্রত্যন্ত দেশ সমূহে পৌঁছা যায়। এই রাজপথের দুই পাশে এখনো নানা স্থানে পুরাণো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই সব মন্দিরের অধিনায়কদের উপর যে সেকালে রাজপথ-সংরক্ষণের কর্ত্তব্য ন্যস্ত ছিল, এবং দেশের বিপন্ন অবস্থায় অস্ত্রধারণ ক'রে তাঁরা দেশ রক্ষার ভার কতকটা নিতেন তা' স্বতঃই মনে হয়।

পুরাণো পথ বেয়ে যেতে ইতিহাসের অনেক কথাই মনে পড়ে। এই পথ দিয়ে কম্বোজের কত অভিযানই না গিয়েছে! একদিন যখন কম্বোজ-সেনানী দিগ্বিজয় ক'রে এই পথে ফিরত, তখন যশোধরপুরের পুরবাসিনীরা নগরের

টা-প্রোম — মন্দিরগাত্রের শিল্পকার্য্য

বিজয়-দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে কত মঙ্গলঘণ্টাই না বাজিয়েছেন—বিজয়ী বাহিনীর উপর কত পুষ্পবর্ষণই না করেছেন। যুদ্ধ-প্রত্যাগত দয়িতের মিলন প্রতীক্ষায় তাঁরা এসে এই নিবিড় বনে আচ্ছন্ন। প্রাচীন অশ্বত্থ বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে তার বর্ত্তমান দুরবস্থার অভিব্যক্তি স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।
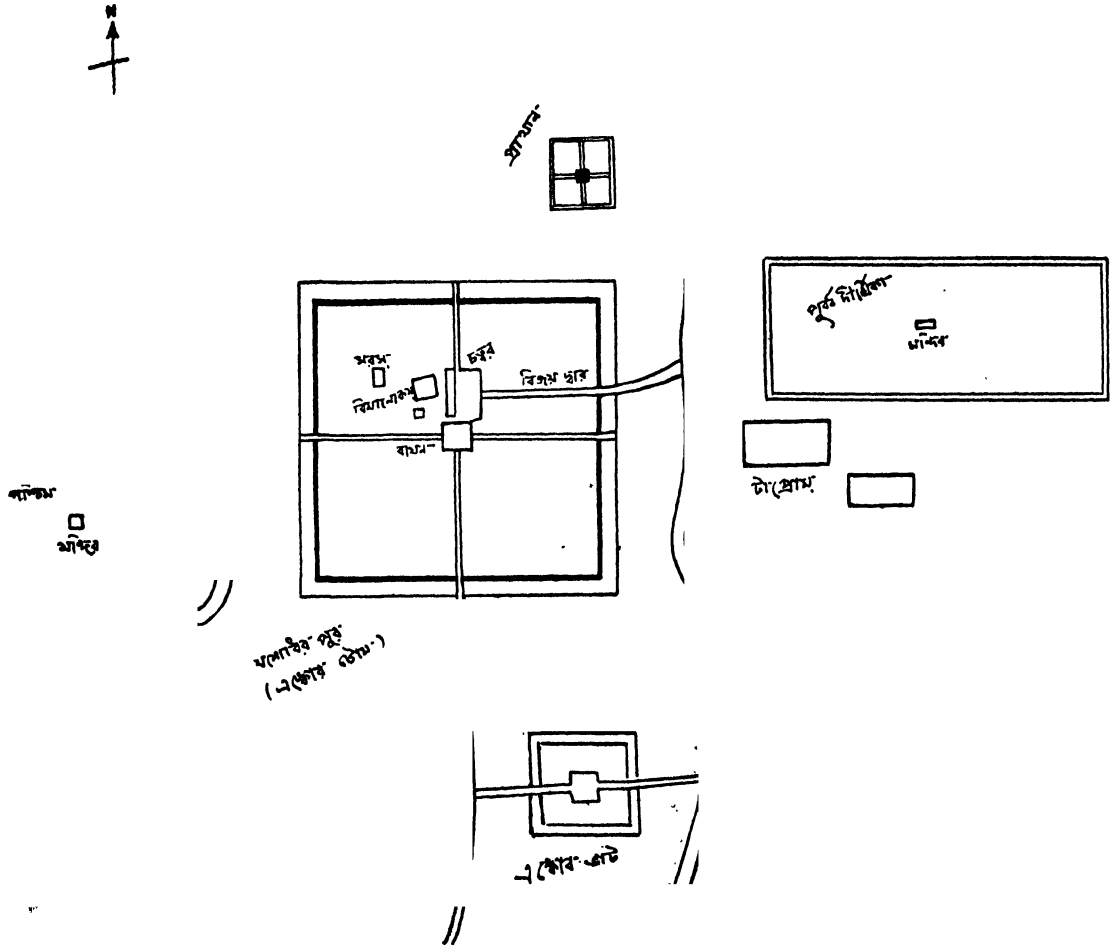
প্রাচীন যশোধরপুরের (বা এঙ্কোরের) নক্সা

রাজপথের পাশে দাঁড়াতেন ;—অনেকের বুক উৎসাহে ও আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ত, অনেকে দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ে সাশ্রুনেত্রে ঘরে ফিরে যেতেন। সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা-হর্ষ-উদ্বেগ-প্লাবিত রাজপথ আজ জনকোলাহল-শূন্য—তার দু'ধার

এই অশ্বত্থ গাছের পাশ দিয়ে বনানী ভেদ ক'রে সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে আমরা টা-প্রোমের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে চল্‌লাম। নগরের বিজয়-দ্বার থেকে টা-প্রোম বেশী দূরে নয় ; নগর-প্রাকার থেকে এক মাইলের বেশী হবে না—পূর্ব্বদিকে।

ইন্দোচীন ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী
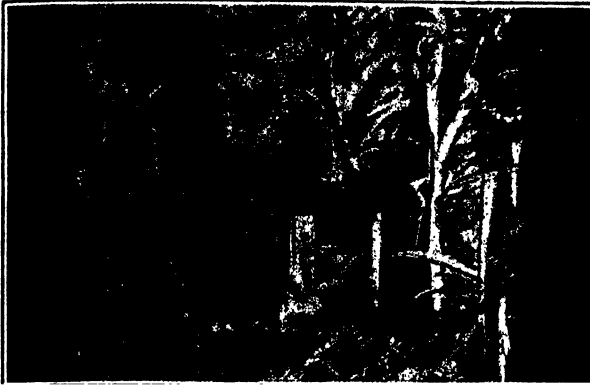
প্রা-খান—পূর্ব্বাংশ

টা-প্রোমের উত্তরে পুরাকালের বিশাল দীর্ঘিকা;—দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পুরাতন দুর্গের জীর্ণস্তূপ। টা-প্রোম মন্দির কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল তা' বলা যায় না। তবে প্রোম-যে "ব্রহ্ম" কথার রূপান্তর তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। টা-প্রোম মন্দির রাজা জয়বর্ম্মণের রাজত্বকালে (১১৮৬-১২২১ খৃঃ অঃ অনুমান) নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। তখন কম্বোজের গৌরবের যুগ চল্‌ছে। জয়বর্ম্মণ নিজে বৌদ্ধমতাবলম্বী না হ'লেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ক'রতেন। কম্বোজের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। টা-প্রোম মন্দিরে যে সংস্কৃত লেখা পাওয়া গিয়েছে তা'তে জানা যায় যে, তিনি কম্বোজের নানাস্থানে শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে-ছিলেন। এ ছাড়া বহু দেবমন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। টা-প্রোম মন্দির তাঁর মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল, এবং এই মন্দির পরিচালনার ভার পড়েছিল রাজকুমার সূর্য্যকুমারের উপর।

টা-প্রোম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রায় এক বর্গ মাইল স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। চারিদিকে পরিখা। প্রাচীন সেতু অতিক্রম ক'রে পূর্ব্বদ্বার দিয়ে টা-প্রোমের ভিতর প্রবেশ কর্‌লাম। পূর্ব্বে এই সেতুর দু'ধারে যে সুন্দর বেষ্টনী ছিল তা' এখন ধ্বংস হয়েছে। মন্দিরের বাইরের প্রাচীরও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। প্রকৃতির অত্যাচার থেকে মন্দির উদ্ধার করবার এ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা হয় নি। কোথাও লতাগুল্মে ভগ্ন-চূড়া আচ্ছাদিত হ'য়ে রয়েছে—কোথাও বা তোরণ ভেদ ক'রে অশ্বত্থগাছ উঠেছে। মন্দির প্রাঙ্গণ বনে পরিণত হয়েছে। এখানে কোনো দেব দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায় নি। তবে মন্দিরগাত্রের ক্ষোদিত চিত্রে হিন্দুধর্ম্মের অনেক পৌরাণিক কাহিনী অঙ্কিত র'য়েছে। জয়বর্ম্মণের প্রস্তরলেখা থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে এই মন্দিরে এক সময় ষাট-সত্তর হাজার লোক পূজা দিতে আস্‌ত। মন্দিরের ভার ন্যস্ত হয়েছিল—আঠারো জন প্রধান পুরোহিত বা অধিকারীর ওপর। তাঁদের অধীনে ২৭৪০ জন সাধারণ এবং ২২৩২ জন সহকারী পুরোহিত এই মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তেন। এ ছাড়া মন্দিরে ৬১৫ জন সেবাদাসী ছিল।

টা-প্রোমের মন্দির থেকে বেরিয়ে বনপথ দিয়ে আমরা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে চল্‌লাম। এটা টা-প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত—দুর্গম অরণ্য এ'কে ঘিরে আছে। এর বর্ত্তমান নাম বান্তেই-কেদে (Banteai Kedei) বা পন্তেই-কেদে (Ponteai Kedei)। দুর্গে

বাকুয়ন—ক্ষোদিত-চিত্র

প্রবেশ করবার জন্য কোন সুগম পথ না পেয়ে আমরা দুর্গ-প্রাকার প্রদক্ষিণ করেই ফিরতে বাধ্য হ'লাম। পুনরায় বনপথ বেয়ে প্রধান সড়কে এসে পড়লাম।

এঙ্কোর-ভাটে ফিরবার পূর্ব্বে উত্তর ভাগের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসাই শ্রেয়ঃ। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য টা-প্রোমের নিকটবর্ত্তী দীর্ঘিকা এবং যশোধরপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত প্রা-খান (Prah-Khan)। প্রধান সড়ক বেয়ে উত্তর মুখে যেতে দীর্ঘিকা ও প্রা-খান পথে পড়ে। দীর্ঘিকা টা-প্রোমের পাশে, নগরের বিজয়-দ্বার থেকে খুব

এই দুই দীর্ঘিকাই যশোধরপুরের জল সরবরাহ ক'রত। দু'টী দীর্ঘিকারই মাঝখানে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। পূর্ব্ব দীর্ঘিকার মাঝখানে যে মন্দির আছে (Mebon of the Eastern Baray) সেটী রাজেন্দ্রবর্ম্মণের রাজত্বকালে (৯৪৪-৯৪৭ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হয়েছিল। পশ্চিম দীর্ঘিকার মন্দির (Mebon of the Western Baray) খুব সম্ভবত রাজা যশোবর্ম্মণের সময় (৮৮৯ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হয়। মন্দিরগুলি এখন ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত হয়েছে। দু'টী মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনুমান হয়।

বাফুয়ন

বেশী দূরে নয়। এই দীর্ঘিকাকে পূর্ব্ব বারাই (Eastern Baray) বলা হয়। এ ছাড়া আর একটি দীর্ঘিকা যশোধর-পুরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বর্ত্তমান। এটীকে পশ্চিম বারাই (Western Baray) বলে। আমরা এই দুই দীর্ঘিকার নাম দোব পূর্ব্ব ও পশ্চিম দীর্ঘিকা। দুইটীই আয়তনে বিশাল এবং স্থানে স্থানে এখনও বেশ গভীর। প্রায় সারা বছরই ঐ সব স্থানে জল থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুকিয়ে গেলেও দীর্ঘিকা এখনো সম্পূর্ণ ভরাট হয় নি। জলকষ্টের সময়

পূর্ব্ব দীর্ঘিকার ধার বেয়ে আমরা প্রা-খানে পৌঁছলাম। পূর্ব্বেই বলেছি প্রা-খান খুব প্রাচীন। যশোধরপুর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এর নির্ম্মাণ হয়। রাজা জয়বর্ম্মণ (৮০২-৮৬৯ খৃঃ অঃ) প্রা-খানে বসবাস করতেন। তাঁর অধস্তন তিন পুরুষ পরে যশোবর্ম্মণ নূতন রাজপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন। অনুমান হয় প্রা-খান বায়ন মন্দিরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়েছিল। যশোধরপুরের উত্তর-দ্বার দিয়ে বেরিয়েও প্রা-খানে পৌঁছান যায়। প্রা-খান নগর প্রাচীরের বাইরে ঠিক নৈঋত কোণে অবস্থিত। এ রাজপুরীও

ইন্দোচীন ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

কম্বোজের স্থপতিদের চিরন্তন প্রণালীতে নির্ম্মিত হ'য়েছিল। চারদিকে প্রাচীর—তা'র বাইরে পরিখা। এই পরিখা সেতুর ওপর দিয়ে পার হ'তে হয়। প্রাচীরের ভেতরে রাজপুরীর অবস্থান। এখন তা অবশ্য ধ্বংসে পরিণত। প্রা-খানের উদ্ধার-কার্য্য এখনো আরম্ভ হয় নি। সিংহদ্বার বর্ত্তমান আছে। তবে রাজপুরীতে প্রবেশ করবার পথ এমন দুর্গম হ'য়ে পড়েছে যে, দু'পাশে বন পরিষ্কার ক'রে নূতন পথ তৈরী করতে হয়েছে। প্রা-খানের সব অংশ দেখা সম্ভবপর নহে। যতটা আমরা দেখ্‌তে পেলাম তা'তে কম্বোজের গরিমাময় যুগের কথাই মনে হচ্ছে পুরাতন কম্বোজের সবচেয়ে বড় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কম্বোজের হিন্দু ইতিহাসের শেষভাগে এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। তাই এখনো সেটী ধ্বংস হয় নি—সগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এঙ্কোর-ভাট রাজা সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকাল ১১১২-১১৬২ খৃঃ অঃ। এই সুদীর্ঘকালের ভেতর তিনি নানাভাবে কম্বোজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি হচ্ছে এঙ্কোর-ভাট। ভাট কথার অর্থ মন্দির। এঙ্কোর-ভাট বিষ্ণু মন্দির। রাজা সূর্য্যবর্ম্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন

এঙ্কোর-ভাট
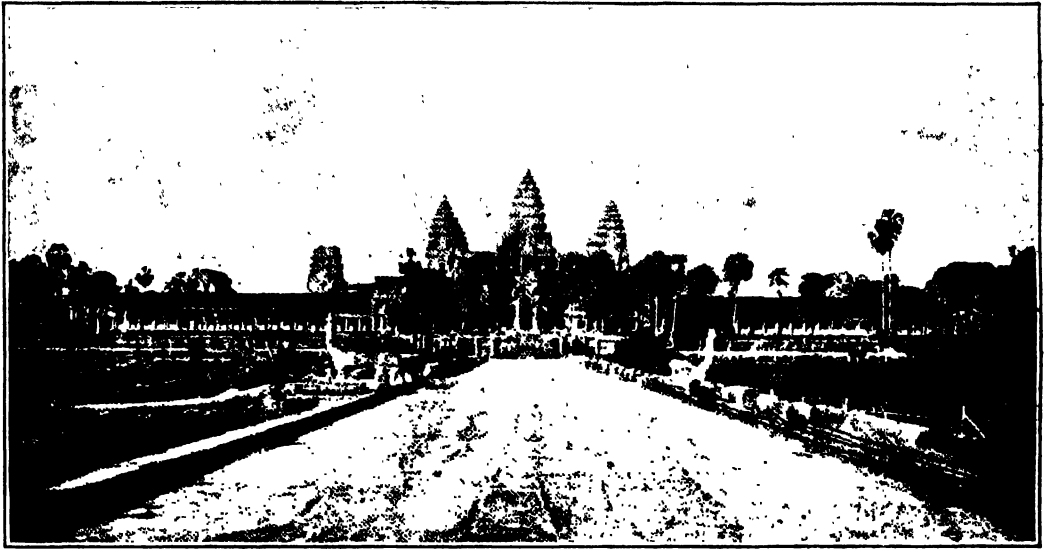
হ'ল। যে যুগে বায়ন নির্ম্মিত হয়েছিল, সেই যুগেই প্রা-খানের প্রতিষ্ঠা। প্রা-খানের ভাস্কর্য্য ও খোদিত-চিত্রের ভেতর আমরা সেই যুগের দক্ষতারই পরিচয় পাই।

প্রা-খান দেখে আমরা যশোধরপুরের উত্তর-দ্বার দিয়ে নগর অতিক্রম ক'রে পুনরায় বায়নের পাশ দিয়ে এঙ্কোর-ভাটের দ্বারে ফিরে এলাম। এঙ্কোর-ভাট ভাল ক'রে দেখ্‌তে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই এঙ্কোরে আমরা যে সপ্তাহকাল ছিলাম তার ভেতর শেষ তিন দিন আমরা এঙ্কোর-ভাটই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি। এঙ্কোর-ভাটই —এবং সেই জন্য তাঁ'র উপাধি ছিল "পরমবিষ্ণু-লোক"। এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁর রাজত্বকালে আরম্ভ হ'লেও শেষ হ'তে অনেক সময় লেগেছিল। মন্দিরের অনেক অংশ এখনো অসম্পূর্ণ আছে, এবং তা' দেখে মনে হয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও (১২২১ খৃঃ অঃ) মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই কম্বোজে বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব সুরু হয় এবং এর অল্পদিন পরেই কম্বোজে হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়। তাই এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ
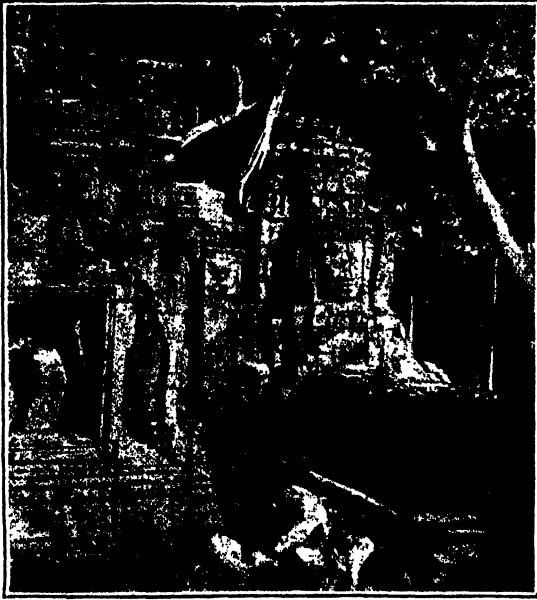
বায়ন-তোরণের অংশ

কার্য্যও আর শেষ হয় নি। এ ছাড়া এঙ্কোরে আরও অনেক মন্দির অসমাপ্ত রয়েছে।

এঙ্কোর-ভাটের পাঁচটী চূড়ার ভেতর দু'টী অসম্পূর্ণ; কিন্তু তবুও মন্দিরের সবটা দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। যশোধরপুরের প্রাকার থেকে এঙ্কোর-ভাট খুব বেশী দূরে অবস্থিত নয়। সুবৃহৎ পরিখা সেতুর ওপর দিয়ে পার হ'য়ে মন্দিরের চত্বরে পৌঁছতে হয়। এই পরিখাটি সুগভীর। এখনো জলে ভরা। দু' একটী অংশমাত্র ভরাট হয়েছে। সেতুর কার্য্য শেষ হ'তে পারে নি ব'লে অনুমান হয়। সেতুর দু'দিকের বেষ্টনী অসমাপ্ত র'য়ে গেছে। সুপ্রশস্ত মন্দির চত্বর। খণ্ড খণ্ড প্রস্তর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে। স্থপতি সে-গুলিকে মন্দিরের কার্য্যে লাগাবার যে আর সময় পায়নি তা' দেখলেই মনে হয়।

মন্দির নানা স্তরে বিভক্ত। প্রধান প্রতিষ্ঠানে পৌঁছতে গেলে বহু চত্বর ও অলিন্দ অতিক্রম ক'রে উচ্চ সোপান বেয়ে উঠ্‌তে হয়। প্রতি চত্বরে দেব-সেবার জল রাখবার জন্য দ্রোণী ছিল। মন্দিরে প্রধান প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও বহু ছোট প্রতিষ্ঠান ছিল। মন্দিরের প্রাচীর গাত্র ক্ষোদিত চিত্রে পরিশোভিত। কোথাও রামায়ণের কাহিনী, কোথাও পৌরাণিক কথা, কোথাও নরকের চিত্র এবং কোথাও বা মহাভারত এবং হরিবংশের ধর্ম্ম-কাহিনী ভাস্করের সুনিপুণ হস্তে মূর্ত্তি পেয়েছে। প্রতি তোরণ নানা ভাস্কর্য্যে শোভিত। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন কম্বোজের শিল্পীদের মনের পটে তা'দের অদূর ভবিষ্যতের বিষাদকাহিনী প্রতিভাত হয়েছিল। তাই এঙ্কোরের এই শেষ কীর্ত্তির ভেতর তা'দের প্রতিভার চরম পরিচয় দিয়ে গেছে। বায়নে যে কলানৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় তা' অনেকস্থলে এঙ্কোর-ভাটের চেয়ে উচ্চাঙ্গের হ'লেও এঙ্কোর-ভাটে নানা শক্তির একত্র সমাবেশ হয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে এঙ্কোর-ভাটের অনতিদূরে অল্পদিন থেকে একটী বৌদ্ধভিক্ষুসংঘ স্থাপিত হয়েছে। এঙ্কোর যখন শ্যামদেশের অন্তর্ভূত হয় তখন থেকেই বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি একটু বেড়েছে। এঙ্কোর-ভাটেও এ'দের হাত কিছু পড়েছে এবং মন্দিরের দু' একটী কক্ষে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এ স্থাপনার ভেতর কোন প্রাণের সাড়া নাই।

কিছুদিন থেকে সাইগণের ভারতীয় বণিকদের ভেতর একটু ধর্ম্মভাব জেগেছে এবং তাঁরা কিছু অর্থব্যয় ক'রে এঙ্কোর-ভাটে নিয়মিত ভাবে প্রদীপ জ্বালবার ব্যবস্থা করেছেন। যে প্রদীপ সাতশো বছর ধ'রে নির্ব্বাপিত ছিল তা' আবার জ্বলেছে। তাই আশা হয় ভারতসন্তানদের চেষ্টায় আবার এঙ্কোরের ভাঙ্গা মন্দিরে নূতন ক'রে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে। মন্দির-চত্বর হয়ত আবার ভারত-সন্তানের কলধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

এঙ্কোর-ভাট দেখেই আমাদের এঙ্কোর দেখা শেষ ক'রতে হ'ল। ভারতের প্রাচীন ঔপনিবেশিকদের যে কীর্ত্তি ছ'মাস ধ'রে দেখ্‌লেও চোখ তৃপ্ত হয় না আমাদের বাধ্য হ'য়ে তা' এক সপ্তাহে শেষ ক'রতে হ'য়েছে। তবে যা দেখেছি তা'তে স্তম্ভিত হ'য়েছি। হাজার বছর পূর্ব্বে ভারত-সন্তানেরা এই সাগর পারে এসে ভারত-মাতার যে বিজয়-স্তম্ভ স্থাপনা ক'রেছিলেন তা' কালের অনেক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

অত্যাচার সহ্য ক'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে—শুধু ভারতের গৌরব কাহিনীর কথাই মনে ক'রিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্র পারের বর্ব্বরজাতিদিগকে তাঁরা কার্য্যদক্ষ ক'রেছিলেন। তা'দের ভেতর স্থপতির ও শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছিল—কলা-নৈপুণ্য তা'দের কাজের ভেতর ফুটে উঠেছিল। অভ্যাগত দীক্ষাগুরুর নিকট তা'রা শিক্ষালাভ ক'রেছিল ও সে শিক্ষাকে ফলবতী ক'রতে পেরেছিল। তা'ই তা'দের নামও স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

এঙ্কোরের কীর্ত্তি দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়—তা'র প্রধান কারণ যে এর প্রতি মন্দির ও রাজপ্রাসাদ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সব প্রস্তর প্রায় ৪০ মাইল দুরবর্ত্তী পাহাড় থেকে সংগৃহীত হ'য়েছিল। পাহাড়ের যে স্থান থেকে প্রস্তর সংগৃহীত হ'ত তা' খুঁজে বের করা হয়েছে। যশোধরপুর ও এঙ্কোর-ভাট নির্ম্মাণ ক'রবার জন্য প্রস্তর সংগ্রহ ক'রতে যে লোকবলের আয়োজন ক'রতে হ'য়েছিল তা' শুধু বিশেষ পরাক্রমশালী রাজার পক্ষেই সম্ভবপর।

সে-রাজার ঐশ্বর্য্য আজ শুধু কল্পনার বস্তু। শুধু প্রস্তরফলকে তা'র গৌরব আজ নিবদ্ধ। কম্বোজের দুর্ভেদ্য বনানীর ভেতর তা'র কীর্ত্তিস্তম্ভ আজ লুক্কায়িত। মানুষের কত অভিযান কম্বোজের বুকের ওপর দিয়ে গিয়েছে। নিত্য নূতন জাত তা'র বুকের ওপর নূতন আবাসস্থল তৈরী ক'রেছে—নূতন নগর নির্ম্মাণ ক'রেছে। কিন্তু তেমন আর ক'রতে পারে নি। প্রাচীন যশোধরপুরের শ্রী এতটুকুও তা'রা ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা করে নি। বিপ্লবের দিনে এ-যশোধরপুরের মন্দিরে মন্দিরে পূজারীর হাত থেকে যে পূজার শঙ্খ লুটিয়ে ধূলায় পড়েছিল তা' আর বাজে নি! মন্দির-চূড়ার কাজ ক'রতে ক'রতে স্থপতি সেখানে থেমে গিয়েছিল—সে কাজ সমাপ্ত ক'রবার জন্য আর কেউ সেখানে হাত দেয় নি। চিত্রকর তা'র ক্ষোদিত চিত্র অর্দ্ধসমাপ্ত রেখে গেছে। কোথাও বা মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শুধু আরম্ভ হ'য়েছিল—তা' আর শেষ হয় নি। নির্ম্মাণকল্পে যে-প্রস্তর সংগ্রহ করা হ'য়েছিল তা' মন্দির-প্রাঙ্গণে স্তূপাকার হ'য়ে রয়েছে। সাতশো বছর পূর্ব্বে যেখানে সে-গুলি ছিল সেখানেই রয়েছে—

এঙ্কোর-ভাট—ক্ষোদিত চিত্র

কা'রো হাত তা'তে পড়ে নি। যা'দের কলধ্বনিতে যশোধরপুর একদিন মুখরিত হ'ত তা'দের এমন কেউ নেই—যে এ-ভগ্নপুরীতে একটী প্রদীপ দেয়। কোন্ দেবতার অভিশাপে কম্বোজের এ-মহানগরীর যে এই শোচনীয় দশা হ'য়েছে তা' মানুষ বল্‌তে পারে না।

আবার যদি কোন ভারত-সন্তান কম্বোজের এই সমুদ্রতীরে পদার্পণ করেন, অনুরোধ করি, যেন তিনি এই বনপথ বেয়ে এসে যশোধরপুরীর মন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁর পূজা দিয়ে যান। সাতশো বছর ধ'রে কোন ভারতীয় পর্য্যটক এ-পথে আসেন নি—ভারতের এ-কীর্ত্তিস্তম্ভের উদ্দেশ্যে তাঁর নমস্কারও জানিয়ে যান নি। ভারতের এ 'অতীত গৌরব কাহিনী'কে যদি নূতন ক'রে শোনাতে চান্—উৎসাহের আগুন যদি আবার ছড়িয়ে দিতে চান্—অনুরোধ করি কম্বোজের এই জনহীন পথ বেয়ে যেন তাঁরা দুর্ভেদ্য বনানীর ভেতর তাঁদের কৃতী পূর্ব্ব-পুরুষের স্মৃতি-রেখা দর্শন ক'রে যান। ভারত ইতিহাসের এক বড় গৌরবের কাহিনী তা'র ভেতর নিহিত রয়েছে।

এ যুগের ওমর

সেই নিরালা:পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায় ;
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু-স্বর---
সেই-তো সখি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর।

—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণবধের পর অর্জ্জুন শোক, বিষাদ ও আত্মগ্লানিতে নিতান্ত মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁ'কে সাব্যস্ত ক'রতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে অনেক বেগ পেতে হ'য়েছিল। আমাদের বঙ্গসাহিত্য-রণক্ষেত্রের স্বয়ং-নির্ব্বাচিত গাণ্ডীবী বৃদ্ধ সাহিত্যগুরুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ ক'রে, সেরূপ বিষাদগ্রস্ত হ'য়েছেন কিনা জানিনে। যদি হ'য়ে থাকেন তাঁ'কে আশ্বস্ত ক'রতে পারি, তিনি নিশ্চিন্ত হোন। তাঁ'র হাতের গাণ্ডীব-টঙ্কারে তাঁ'র নিজের কানে তালা ও শিশু-দর্শকদের চমক লাগলেও তা' বস্তুত লালশালুমণ্ডিত বংশখণ্ডনির্ম্মিত ক্রীড়াগাণ্ডীবমাত্র। বৃদ্ধ রণগুরুর সুশুভ্র কেশরাজি বা সুশুভ্রতর যশোরাশি তাঁ'র বাণনিক্ষেপে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। কিছুদিন হ'তে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রের অঙ্গণে আর্টের স্বাধীনতার নামে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার যে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হ'য়েছে, তা' সকলেই লক্ষ্য ক'রেছেন। স্বাধীনতার অর্জ্জন ও পরিচালনে যে সুদৃঢ় সংযম ও বলিষ্ঠ সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন তা'র অভাব বশতই এইরূপ বিপরীত ব্যাপারের উদ্ভব হ'য়েছে। যৌন-সম্মিলনের যে-অংশ, মানুষ, স্বাভাবিক শ্রী বশতঃ চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে এসেছে,—বর্ব্বর পরুষহস্তে তা'র আবরণ উন্মোচন ক'রে এঁ'রা বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে উঠেছেন। এঁ'দের কেউবা, আপনাকে আর্ট-জগতের নূতন মহাদেশ আবিষ্কার-কর্ত্তা কলম্বস্ ব'লে মনে ক'রেছেন; কারো ভাব বা দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহের মতো। শুনেছি সেকেন্দর সাহ সমস্ত পৃথিবী জয় করার পর "আর একটা পৃথিবী নেই" ব'লে দুঃখ ক'রেছিলেন। এঁ'রাও মানবের যুগ-পরম্পরাব্যাপী সাধন-সঞ্চিত, সুকুমার-সন্তর্পণে রক্ষিত পবিত্র ভাবগুলির গায়ে যে-ভাবে পঙ্কলেপনের হোলি-খেলা সুরু ক'রেছেন, তা'তে ঐরূপ দুঃখ করার আর বেশী বিলম্ব আছে ব'লে মনে হয় না! এঁ'রাও অচিরে রণজিৎসিংহের মত ব'ল্‌তে পারবেন—"বাস্, সব কালো হো গিয়া"—অবশ্য, যদি ইতিমধ্যে মানব-ইতিহাসের ভগবান যোগনিদ্রা হ'তে জাগ্রত হ'য়ে—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—গীতার এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য পালন না ক'রে বসেন!

যা' হোক্ সাহিত্য-রাজ্যের এই শোচনীয় অনাচারে সাহিত্য ও সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই একান্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছেন। অনেকে এই উচ্ছৃঙ্খল অনার্য্য আচরণের প্রতিবাদও ক'রেছেন। তবে প্রতিবাদটা বেশীর ভাগ সমাজনীতির পক্ষ হ'তেই হ'য়েছে। যাঁরা আর্টের নামে সাত-খুন মাপ হয় মনে করেন, আমি সে-দলের লোক নই। আর্টের উপদ্রবে সমাজের অকল্যাণ-আশঙ্কা ঘ'টলে, আর্টকে সংযত করার অধিকার—সামাজিকদের আছে এ-কথা আমি পূরাদস্তুর বিশ্বাস করি। তথাপি, আমি মনে করি যে, এ-ক্ষেত্রে প্রতিবাদটা আর্টের নিজের তরফ হ'তে হ'লে, বেশী ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা। কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীমান অমলচন্দ্র হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে, সে-কাজ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন ক'রেছেন। শ্রীমানের প্রবন্ধে ধার যতই থাকুক্ না কেন, "সাহিত্যিক"-পদমর্য্যাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি মর্য্যাদা ও বয়ো-মর্য্যাদার ভার না থাকায়, উহা যথাযোগ্য সমাদর লাভ ক'রেছে ব'লে মনে হয় না।

সাহিত্য-সমাজের এই বারোয়ারি অনাচার রবীন্দ্রনাথ কেন নীরবে উপেক্ষা ক'রছেন, সে-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠ্‌ত। বাংলা-সাহিত্যের চেয়ে ব্যাপকতর বিষয়ে সত্যের সন্ধান ও প্রচারে তিনি ব্যাপৃত আছেন বলে, হয়তো,

এদিকে তাঁ'র নজর পড়েনি, এই কথা মনে ক'রতেম। কিন্তু মনের প্রচ্ছন্ন কোণে এ-গোপন-আশা বরাবরই পোষণ ক'রে এসেছি যে, একদিন তাঁ'র নজর এ-দিকে প'ড়বেই, এবং এই তথাকথিত আর্টের প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট হ'তে বিলম্ব হ'বে না। সকলেই জানেন গত শ্রাবণ মাসের "বিচিত্রা"য় রবীন্দ্রনাথ রসলোকের অমল-শুভ্র আলোকে ফেলে' বাংলা-সাহিত্যের নূতন ধারার মর্ম্মগত কদর্য্য স্বরূপটা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতের বজ্র কুসুমাবৃত হ'লেও উহা বজ্র এবং তা'র আঘাতও যেমন অমোঘ, তা'র বেদনাও তেমনি মর্ম্মন্তুদ। নূতনপন্থীরা চমক ভেঙ্গে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে ব'ল্‌ছেন—"একি হোলো! Et tu Brute"! এক অদ্ভুত আত্মম্ভরিতার মোহে তাঁ'রা মনে ক'রতেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা ও ভাব-জগতে যে চিরন্তন সংগ্রাম সুরু ক'রে গেছেন, তাঁরাই উত্তরাধিকারসূত্রে তা'রই ধ্বজা বহন ক'রে চ'লেছেন। হঠাৎ তাঁ'দের সে মোহ টুটে যাওয়া যে নিরতিশয় মর্ম্মভেদী সকরুণ ব্যাপার, সে-কথা স্বীকার ক'রতেই হ'বে। মহাত্মাজীর বার্দ্দোলী-সিদ্ধান্তের পর অসহযোগ-সংগ্রামের অনেক বড় বড় মহারথীর যে-দশা দাঁড়িয়েছিল, এঁদেরও অবস্থা অনেকটা সেই রকম।

নূতন পন্থীদের দলের প্রধান সেনাপতি হ'য়ে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম এ, ডি-এল্‌, ভাদ্রের "বিচিত্রায়" রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ক'রেছেন। কিন্তু সেনাপতিপ্রবর নিজের ও তাঁ'র সেনার যে শোচনীয় দশা বর্ণনা ক'রেছেন তা'তে, তাঁ'দের উপর অস্ত্রক্ষেপ করা ক্ষাত্রনীতিসম্মত হ'বে কিনা ঘোর সন্দেহস্থল। নরেশবাবুর আত্মদশা-বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত ক'রে দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন :—"কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণাচার্য্যকে আপনার বিরুদ্ধে রথারূঢ় দেখিয়া গাণ্ডীবীর ক্লৈব্যের উদয় হইয়াছিল। যাঁহাকে নিত্য নূতন রসের পূজারী, নূতন ধারার মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নবসাহিত্য এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহার হাতে আঘাত খাইয়া সে যদি হঠাৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে তবে তাহা বিচিত্র নয়।" অর্জ্জুনের "সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতে" ইত্যাদি আরো বহুবিধ দুরবস্থা ঘ'টেছিল। "নব-সাহিত্যের" অর্থাৎ "নব-সাহিত্যের নব-রত্নের" সে-সব ঘটেছে কিনা নরেশবাবু খোলসা জানান নি। বোধ হয় এক "ক্লৈব্যের" মধ্যেই সে-সব উহ্য রেখে দিয়েছেন। ও-শব্দটি আবার বহুব্যাপকার্থবাচী। যা' হোক্‌, অর্জ্জুনের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দূর করার জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানকে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গোটা অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাখানি extempore রচনা ক'রে শোনাতে হ'য়েছিল, তবেই নাকি অর্জ্জুনের ক্লৈব্যের অপগম ঘটে। শাস্ত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনও অবতারের আবির্ভাবের উল্লেখ না থাকায় নরেশবাবুর বোধ হয় সে সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। কাজেই তাঁ'র লেখাটিতে "ক্লৈব্য" "বিভ্রান্ত ও বিচলিত" হওয়া প্রভৃতির লক্ষণ আগাগোড়া দেদীপ্যমান হ'য়েই ফুটে আছে।

কথাটা অপ্রিয় নিশ্চয়ই—কিন্তু অসত্য মোটেই নয়। প্রমাণের অভাব নেই।

প্রথম প্রমাণ :—খামখা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবতারণা ক'রে অর্জ্জুন সেজে নরেশবাবুর গাণ্ডীবহস্তে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতের মিল না হ'লে তিনি অনায়াসেই তো জিজ্ঞাসু শিষ্যের মত আপনার সংশয় জানাতে পারতেন। পরস্পরের সম্বন্ধ-বিবেচনায় সেইটেই তো শোভন ও সঙ্গত হোতো। দ্রোণাচার্য্য-অর্জ্জুনের যুদ্ধ-কল্পনা এরূপ ক্ষেত্রে, দেশ-কাল-পাত্র-জ্ঞানশূন্য কল্পনার উৎকট বিকার মাত্র।

দ্বিতীয় প্রমাণ :—সাহিত্যিক প্রতিপক্ষগণের প্রতি "উন্মত্তের মত" "ইটপাটকেল যা' খুসী" প্রভৃতি নানাবিধ সুরুচিবহির্ভূত ভাষাপ্রয়োগ। সাহিত্যিক বা সামাজিক কোনও আদর্শেই ও-গুলি শিষ্টাচারসম্মত নয়। Mathew Arnold যাকে লেখার urbanity (আভিজাত্য) ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন তা' শিষ্ট সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের প্রতি ধৈর্য্যের অভাবে নিজের অন্তরের সাহিত্যের আদর্শই ক্ষুণ্ণ হ

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

এবং উহা যথার্থ মানসিক বলের অভাব সূচনা করে। সত্যনির্ণয়েরও উহা প্রকৃষ্ট পথ নয়।

তৃতীয় প্রমাণ :—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও যথার্থ বিনয়নম্র শ্রদ্ধার ভাবের ন্যূনতা। অবশ্য অন্যান্য প্রতিপক্ষদের তুলনায় নরেশবাবু তাঁ'র সম্বন্ধে অনেক বেশী ভাষার সংযম রক্ষা ক'রে চ'লেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবের অসংযম অনেক সময় ভাষার আড়াল হ'তেও ফুটে বেরিয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হ'বে। নরেশবাবু লিখেছেন—"তাঁ'র সাহিত্য-ধর্ম্ম-প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁ'কেও অনবরত খোঁচা মারিতেছে তা' স্পষ্ট দেখা যায়। তবু সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে যে এই সব কথা একেবারে অবান্তর রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে-কথাটা নিজের কাছে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে "অনবরত খোঁচা মারিতেছে", "একেবারে অস্বীকার", "বাধ্য হইয়াছেন" এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সোজা কথায় নরেশবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তিও তাঁ'র পূর্ব্বগামীদের মতই—সমাজনীতির দিক হ'তে। তবে তিনি নাকি সাহিত্য-রসজ্ঞ-শিরোমণি, কাজেই তাঁ'কে পদমর্য্যাদার খাতিরে আসল আপত্তিটাকে সাহিত্যিক আপত্তির সাজ পরিয়ে সাহিত্য-সমাজে বের ক'রতে হ'য়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী তো বটেই—মিথ্যা-প্রচারও সম্ভবতঃ ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর অভিযোগ ইতঃপূর্ব্বে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না।

যা' হোক্ রবীন্দ্রনাথ যে-উক্তিটির দ্বারা এরূপ গুরুতর অপরাধ ক'রেছেন তা' দেখার ঔৎসুক্য পাঠকদের স্বভাবতই হ'তে পারে। সে উক্তিটি এই—"সাহিত্যে যৌন-সমস্যার তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে তা'র সমাধান হবে না—তা'র সমাধান কলারসের দিক থেকে।" ভাবটাও কাটা-ছাটা পরিষ্কার, ভাষাও নির্ম্মল স্বচ্ছ। কোথাও আব্‌ছায়া বা ধোঁয়াটে কিছুমাত্র নাই। অথচ ওর মধ্য হ'তেই "খোঁচা মারিতেছে" প্রভৃতি হরেকরকমের জিনিষ নরেশবাবুর অদ্ভুত ভেল্কিবাজীতে বেরিয়ে প'ড়ল। শাস্ত্রে ব'লে শব্দ ব্রহ্ম—এক ওঁ-শব্দ হ'তেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ। আশ্চর্য্য কিছুই নাই!

নরেশবাবু যদি ক্ষমা করেন, তা'হ'লে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি যে-সব আপত্তি তুলেছেন অতি সহজেই তা'র মীমাংসার পথ বাৎলিয়ে দিতে পারি। একেবারে অমোঘ মুষ্টিযোগ। তিনি শুদ্ধাচারে শুদ্ধাসনে ব'সে নিবিষ্ট শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অষ্টোত্তর শতবার পাঠ করুন, তাঁ'র সকল আপত্তির উত্তর তাঁ'র আপনার মনের মধ্যেই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে। কথাটা পরিহাসের মতো শোনালেও মোটেই পরিহাস নয়। যে-কেহ দু'টি প্রবন্ধ অভিনিবেশসহকারে প'ড়বেন, তিনিই এ-কথার সত্যতা উপলব্ধি ক'রবেন। কিন্তু নরেশবাবু রাজী হ'লেও "বিচিত্রা"র সম্পাদকপ্রবর যে রাজী হবেন, সে সম্ভাবনা কম। তাঁ'র যে আবার কাগজ পোরাবার গরজ আছে।

নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প'ড়েছেন স্কুলমাষ্টার ও উকীলের চোখ দিয়ে, রসজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে নয়। তাঁ'র প্রবন্ধে ছত্রে ছত্রে তা'র পরিচয় আছে। প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের 'ষ্টাইল' সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছেন এবং কবিবরের ওরূপ ষ্টাইলে লেখা যে, লেখকের পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয় হ'য়েছে সে-কথাটাও জানাতে ভোলেন নি। তাঁ'র উক্তিটা এই—"রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র সিদ্ধান্তটি যুক্তির উপর নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র শ্রেণীবদ্ধ কাব্যস্তূপের উপর বসাইয়া দিয়াছেন এমনভাবে, যে পড়িয়া মনে হয় তাঁ'র পূর্ব্বকথাগুলি যুক্তির, কিন্তু হাতড়াইয়া দেখিতে গেলে ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু পাওয়া যায় না। যুক্তির একটা পাকা জবাব যুক্তি দিয়া দেওয়া যায় কিন্তু কাব্যের উপরে যুক্তির বাণ কেবলি একটা ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে, কোনও কঠিন লক্ষ্যের সন্ধান পায় না।" শ্রীমল্লেখককৃত টিপ্পনী এই :—"নিয়মিতভাবে"

কথাটার তাৎপর্য্য কি? কিসের বা কার নিয়ম? Deductive ও Inductive Logic-এর কি? "কেবলমাত্র" কথাটার ইঙ্গিত কি? "কাব্যস্তূপ" কি "মানসী" "সোনার তরী" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের স্তূপ? তা'র উপর উপবিষ্ট সিদ্ধান্ত একটি পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য বটে। "পূর্ব্বকথাগুলি" কোন্ কথাগুলি—সন্ধান মিল্ল না। "কাব্যের উপর" "যুক্তির বাণ" প্রয়োগ ক'রলে তা' যে "ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে", সে ধোঁয়া, বাণের, না কাব্যের, না উভয়ের রাসায়নিক সংযোগের ফল? হায় রে! লক্ষণেরও ঠিক এই বিপদ হ'য়েছিল —মেঘাবলুপ্ত ইন্দ্রজিতের গায়ে বাণ নিক্ষেপ ক'রে।

ষ্টাইলের বিভিন্নতা বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং উহা খাঁটি হ'লে ব্যক্তিত্বের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নে লাঞ্ছিত হ'য়ে উঠে। সাহিত্যিক প্রবন্ধ সাহিত্যরসাভিষিক্ত ষ্টাইলে রচিত হওয়াই সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাই ক'রেছেন এবং তাঁ'র প্রতিভার কিরণে "সাহিত্যধর্ম্ম" প্রবন্ধটি সার্থক রসরচনারূপে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞার ষ্টাইলে ওটা লিখ্‌তেন তা'হলে তিনি যে চমৎকার যুক্তিগর্ভ বা যুক্তিসর্ব্বস্ব একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতার সৃষ্টি ক'রে তুল্‌তে পারতেন তা' নিঃসন্দেহ। এক দুই ভাবে নম্বরওয়ারি যুক্তিগুলি সাজিয়ে প্রবন্ধটি রচিত হ'লে নরেশবাবুর ভিতরের বেত্রহস্ত গুরুমশায় নিশ্চয়ই খুব খুসী হ'য়ে উঠ্‌তেন। কিন্তু হায় Petitio Principii! হায় Excluded middle! তোমরা যে মগজের অস্ত্রশালায় প'ড়ে প'ড়ে মরিচা সঞ্চয় ক'রতে থাক্‌লে! কাব্যস্তূপের আবরণে যুক্তিগুলি ঢাকা থাকায় অস্ত্রপ্রয়োগের সুবিধা হ'লো না। গুরুমশায়ের রাগতো খুব স্বাভাবিক! অনেকে কাগজে কলমে যুক্তির ফাঁক অতি সহজেই ধ'রে ফেল্‌তে পারেন, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে ঘটনাপুঞ্জের মর্ম্মনিহিত যুক্তিগুলি কিছুতেই তাঁ'দের নজরে পড়ে না; ফলে নানাবিধ বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রে ব'সেন। কিন্তু যুক্তিগুলি কাব্যালঙ্কারের সৌন্দর্য্যে ভূষিত হ'লেই যে একেবারে নষ্টাৎ হ'য়ে যাবে, কাব্যালঙ্কার যে এত বড় ভস্মলোচন তা' পূর্ব্বে জানতেম না। রবীন্দ্রনাথের রচনাটি ফুলের মালার মতই সুন্দর বটে, কিন্তু তা' যে বিনি-সূতায় গাঁথা—তা'র ভিতরে যুক্তির কঠোর ডোর নেই, এ-কথা নরেশ বাবু কি ক'রে জান্‌লেন?

নরেশবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি তাঁ'র নিজের ভাষায় এইরূপ:—"তা'ছাড়া সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া তিনি যে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই।" এই আপত্তিটিতে নৈয়ায়িক ও উকীল দুয়েরই গন্ধ পাওয়া যায়। "বাদীর আরজীতে মোকদ্দমার কারণ খোলসা বুঝা যায় না—সুতরাং cause of action-এর অভাব হেতু বাদীর দাবী ডিসমিস করিতে আজ্ঞা হয়" কয়েক পৃষ্ঠা ধ'রে বহু বাগাড়ম্বরসহকারে নরেশবাবু এই দরখাস্তই পেশ ক'রেছেন। তিনি যে পরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে "সীমানা নির্দ্দেশ" করেন নি ব'লে পুনঃপুনঃ অভিযোগ ক'রেছেন, বলা বাহুল্য, তা'ও এই মূল অভিযোগেরই সামিল।

যাই হোক্ নরেশবাবুর এই অভিযোগের ভিত্তিটা কেমন মজ্‌বুত একবার দেখা দরকার। তাঁ'র যুক্তি-প্রণালীটা এইরূপ:—

(১) তিনি (রবীন্দ্রনাথ) "সমগ্র" আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "সমগ্র" সাহিত্য তা'র লক্ষ্যবস্তু হইতে পারে না—কারণ "খড়্গ-হস্ত শুচিধর্ম্মী" অনুরূপা দেবীর মতন সাহিত্যিকও আছেন।

(২) "বিদেশের আমদানী" কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ "কেবল কয়েকখানি অনুবাদ-গ্রন্থ ছাড়া কোন লেখকই তাঁহাদের বই বিদেশের আমদানী বলিয়া প্রচার করেন নাই এবং এমন অনেকে আছেন যাঁ'রা তাঁ'দের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জলমাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন—যাঁহাদের হয়তো কবি এই সমালোচনায় বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না—তা'ছাড়া "বিদেশের আমদানী" কথাটা পরিচয় হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না—কেননা, একহিসাবে রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যই অল্প-বিস্তর বিলাতী আমদানী।"

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি গর্দ্দভের কথা মনে প'ড়ে ভয় হ'চ্ছে যে-হতভাগ্য দুদিকের দুই সমান লোভনীয় সবুজ কচি ঘাসের আঁটির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে' শেষে অনাহারে গর্দ্দভলীলা সাঙ্গ ক'রেছিল—সমালোচকের মুখপ্রিয় এত হরেক রকমের উপাদেয় সামগ্রী নরেশবাবু এই অল্প পরিসরটুকুর মধ্যে সাজিয়ে রেখেছেন! [পাঠকেরা উক্ত ঈশপ-কীর্ত্তিত-যশা চতুষ্পদের সহিত এ-পক্ষ লেখকের বুদ্ধির তুলনা ক'রলে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবেন না, কারণ, সেটা প্রমাণ হ'য়ে গেছে এই লেখাটায় হাত দিয়ে] এ-বিপদে চারদিক হ'তে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যে কোনও একদিকে ছুটে যাওয়াই বাঁচার একমাত্র উপায়!

প্রথমে "সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া" ব্যাপারটা দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ তো দেখ্‌ছি "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে" এইটুকুমাত্র লিখেছেন। বাহির হ'তে হাওয়ায় উড়ে আসার যখন সম্ভাবনামাত্র নেই, তখন নরেশবাবুর নিজের মগজ হ'তেই "সমগ্র" "বেষ্টন করিয়া" প্রভৃতি কথা এসেছে, এ-কথা মান্‌তেই হবে। কিন্তু নরেশবাবুর মগজই বা হঠাৎ এমন অঘটনঘটনপটীয়ান হ'য়ে উঠ্‌লেন কেন, সেটাও একটা ভাব্‌বার কথা। সকলই সেই মহামায়ার খেলা—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তি-রূপেন সংস্থিতা"! নরেশবাবুর স্মৃতি-বিভ্রম ঘ'টেছে। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

বাল্যকালে নিশ্চয়ই নরেশবাবু বাংলা ব্যাকরণে অধি-করণ কারকের অধ্যায়ে অধিকরণ কারকে "এ-কার" বিভক্তি এবং সামীপ্য, একদেশ, বিষয়, ব্যাপ্তি এই সব অর্থে অধিকরণ কারক হওয়ার কথা উদাহরণসমেত প'ড়েছিলেন। এতদিন পরে আর সব ধুয়ে মুছে গিয়ে কেবল এইটুকু মনে আছে যে, অধিকরণে "এ-কার" বিভক্তি হয় এবং ব্যাপ্তি অর্থে অধিকরণ কারক হয়,—যেমন তিলে তৈল আছে অর্থাৎ তিল ব্যাপিয়া তৈল আছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত "সাহিত্যে"-শব্দের অর্থ, "তিলে তৈল আছে" এই উদাহরণ খাটিয়ে, "সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া" ক'রে বসেছেন।

তারপর "বিদেশী আমদানী" সম্বন্ধে নরেশবাবু যা' মন্তব্য ক'রেছেন তা'র যুক্তিটা খুব পাকা সন্দেহ নেই। কোনও বিষয় কেউ স্বীকার না ক'রলেই বা কোনও বিষয় কেউ দাবী ক'রে বস্‌লেই যে, সেটাকে বেদবাক্য ব'লে মান্‌তে হবে, কোনও দেশের কোনও যুক্তি বা প্রমাণশাস্ত্রে তো এ-কথা ব'লে না। তবে এ-সব কথা যদি আপ্তবাক্য হয়, তা'হলে স্বতন্ত্র কথা। আর, রাম-মোহন রায়ের পরবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যই যে অল্প-বিস্তর বিদেশী আমদানী এ-কথাটাই বা কেমন টেকসই দেখা যাক্। কেবলমাত্র কয়েকটী নাম উল্লেখ ক'রলেই কথাটা যে কিরূপ ভিত্তিহীন তা' হাতে হাতে ধরা প'ড়বে। ঈশ্বরগুপ্ত, নিধুবাবু, রাম বসু—কবিওয়ালার দলের রচিত সাহিত্য, "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম্ প্যাঁচার নক্সা", নাটকে রামনারায়ণের নাটকাবলী—এই সকল সাহিত্যের কথা মনে ক'রলে নরেশবাবু নিজের কথার মূল্য স্বয়ংই নিরূপণ ক'রতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু ঘোষণা ক'রেছেন যে, রবীন্দ্র-নাথের অনেক কবিতার মর্ম্মবাণী বুঝ্‌তে হ'লে বিদেশী কবিতা-জ্ঞানের দো-ভাষীর সাহায্য দরকার। কথাটা মোটেই সত্য নয়। প্রত্যক্ষের চেয়ে বড় প্রমাণ নেই। আমি ঠিক বিপরীত রকমই বহু স্থলে দেখেছি। আসল কথা, রসিক জনেই কাব্যরসের মর্ম্ম বুঝে—সেজন্য বহু-ভাষাজ্ঞানের কোনই প্রয়োজন হয় না।

কবিতারসমাধুর্য্যং কবি বেত্তি ন কোবিদঃ।
ভবানী ভ্রূকুটীভঙ্গীর্ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ॥

নরেশবাবু তাঁ'র প্রবন্ধে মাঝে মাঝে ব্যাসকূট বা ধাঁধা বা ঐরূপ কিছু একটা সাজিয়ে রেখেছেন, বোধ হয় পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি পরখের জন্য। একটা নমুনা দিই :—

"বিদেশের আমদানী" কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা............"

ঠিক পরবর্ত্তী বাক্যটি এই :—

"তা'ছাড়া 'বিদেশের আম্‌দানী' কথাটা পরিচয়হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না——কেননা.........।"

দুইটি বাক্যের কেবলমাত্র হেতু নির্দ্দেশের অপ্রধান অংশ ছেড়ে দিয়ে প্রধান ও মূল বাক্য দুটী একত্র ক'রলে এইরূপ দাঁড়ায় :—"'বিদেশের আম্‌দানী' কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, তা'ছাড়া 'বিদেশের আম্‌দানী' পরিচয়হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না"—একটা সমভাব-বিশিষ্ট—ইংরাজীতে যা'কে parallel passage ব'লে—হেঁয়ালি মনে প'ড়ছে ; বহু বাল্যকালে শ্রুত।

"বিষ্ণুপদ সেবা ক'রে বৈষ্ণব সে নয়,
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়।
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু-চারি দিবসে,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।

মূর্খত্বটাকে মেনে নিয়ে গোড়ায় হার মানাই ভাল—চল্লিশ বৎসর ধ'রে ও-জিনিষটার জের টেনে ওটাকে স্ফীত ক'রে তোলার প্রতি কোনও লোভ নাই।

এতক্ষণ এই প্যারার বড় বড় রত্নগুলির পরিচয় দিতে ব্যস্ত থাকায় একটি ছোট রত্নের প্রতি নজর প'ড়ে নি। রত্নটি ছোট বটে কিন্তু দামী জিনিষ।

"এবং এমন অনেকে আছেন যাঁ'রা তাঁ'দের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জলমাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন,—যাঁহাদের হয়তো কবি এই সমালোচনার বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না।"

অর্থাৎ তাঁ'দের খাঁটি কাশ্মীরী শালকে রবীন্দ্রনাথ (হয়তো) জর্ম্মণ শাল ব'লে মনে করেন" এই অপূর্ব্ব অনুমানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অ[illegible]প্রবণতার উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হ'য়েছে না তাঁ'র খাঁটি-মেকি, আসল-নকল বিচারশক্তির অভাব প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ?

নরেশবাবুর নিকট হ'তে "বিষয়বস্তু নির্দ্দেশ" সম্বন্ধে একটা হাতে-কলমে শিক্ষা অর্থাৎ Practical Demonstration নিলে মন্দ হয় না।

তাঁ'র প্রথম প্যারাটাই ধরা যাক্ :—

"বাংলা সাহিত্যে কিছুকাল হইল ইত্যাদি।"

প্রথমেই দেখ্‌ছি "বাঙ্গলা সাহিত্যে"। ঠিক ঐ কথাটির জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছিলেন—তবে পণ্ডিতমশায়ের নিজের ছেলের পক্ষে "মাকড় মারলে ধোকড় হয়" এরূপ যদি কোনও শাস্ত্রবিধি থাকে তা'হলে স্বতন্ত্র কথা! কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে। তাঁর এই "সাহিত্য" শব্দের এলাকার মধ্যে "খড়্গহস্ত শুচিধর্ম্মী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর" বইগুলি প'ড়ে কি ? তার পর দেখ্‌ছি "কিছুকাল হইল"। "কিছু," শব্দটি তো মূর্ত্তিমান "অনির্দ্দেশ"। তার পর দেখ্‌ছি "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাবগঙ্গার ভগীরথ।" কলির এই ঠাকুর তো কেবল একটিমাত্র ভাবগঙ্গা নয়, অনেকে ভাবগঙ্গার ধারাই মর্ত্ত্যলোকে বহিয়ে দিয়েছেন। তার পর "ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে" ইতি ভণিতায় যা' ঘোষণা ক'রছেন তা'তেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিশেষ কিছু মিলে না। কারণ, "সাবেক মামুলী" এই বিশেষণ দু'টি চঞ্চল কালপ্রবাহে নিত্যই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। আজ যা "সাবেক মামুলী" বঙ্কিমবাবুর সময় তা' হয়তো "নূতন" ছিল—আবার বঙ্কিমবাবুর সময়ের "সাবেক মামুলী" রামমোহন রায়ের সময় সবেমাত্র রঙ্গশালায় প্রবেশ ক'রছে।

আসল কথা, সাধারণ সাহিত্য-রচনায় কেউ "বিষয়বস্তু নির্দ্দেশের" জন্য তেমন মাথা ঘামায় না। আর মাথা ঘামালেও, মাথার ঘামে নদী ব'য়ে যেতে পারে, কিন্তু লেখার ধারা অচল হ'য়েই থাকবে। এরূপ রচনার ক্ষেত্রে পাঠকদের বোধগম্য হওয়াটাই একমাত্র মাপকাটি।

নরেশবাবু "বিষয়বস্তু নির্দ্দেশের" পালা সাঙ্গ ক'রেছেন ভেবে একটু আশ্বস্ত হ'য়েছিলেম। কিন্তু এ-যে দেখ্‌ছি "ভাট কহে মহাশয়, বাণী যদি শেষ হয়, তথাপিও না হয় বর্ণন।" সুতরাং আবার তল্পীতল্পা বাঁধ্‌তে হ'লো।

নরেশবাবু উচ্যতে :—"বে-আব্রুতা" ও যৌন সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াও কবি বিষয় নির্ণয় সুকর করেন নাই"। কেননা যৌন সম্বন্ধের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হ'তে বরাবর আছে এবং সব চেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথের বিরাট গ্রন্থাবলীতে! আর আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই। দেশেভেদে, কালভেদে, ব্যক্তিভেদে তা বিভিন্ন। নরেশবাবুর নিজের কথা এই :—"বে-আব্রু কাহাকে ব'লে এ-সম্বন্ধে মত ও রুচির ভেদ,
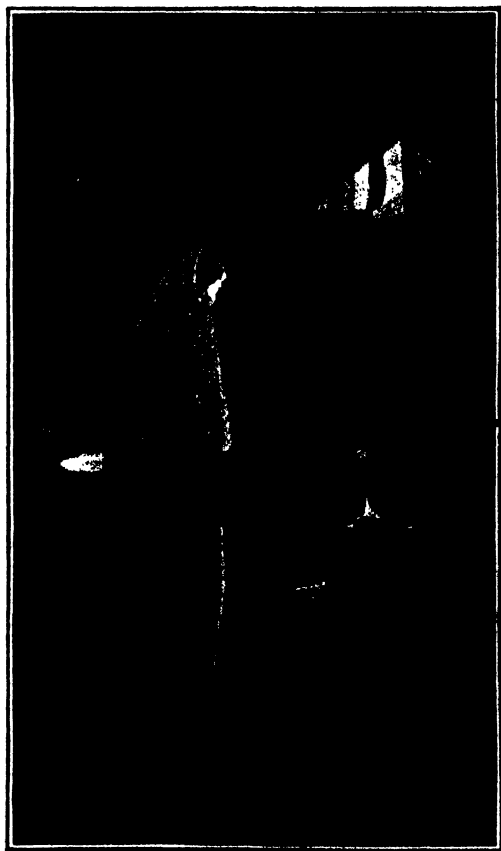
শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিতর তো আছেই, একই যুগে ও দেশে বিভিন্ন মানুষের ভিতরও আছে।" উল্লিখিত অংশের "ভিন্ন ভিন্ন মানুষের" ও "বিভিন্ন মানুষের" মধ্যে ভিন্নতা উদ্ভিন্ন করা নরেশবাবু ভিন্ন আর কারো সাধ্যায়ত্ত কিনা জানি না।

যা' হোক্ "বে-আব্রুতা"র অনুসরণ করতে করতে নরেশবাবু ভূলোক ছেড়ে একেবারে ভুবর্লোক অর্থাৎ সাহিত্য-লোকে উত্তীর্ণ হ'লেন। সেখানেও দেখেন সমান অরাজক অবস্থা। সীমানা নিয়ে সমান মারামারি। এই উপলক্ষ্যে "চোখের বালি", "ঘরে বাইরে", "শ্রীকান্ত" "চরিত্রহীন" প্রভৃতি গ্রন্থের নাম কীর্ত্তন ক'রে নরেশবাবু রায় প্রকাশ ক'রে দিলেন যে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেন নাই। পাছে কবির প্রতি অবিচার করা হয় এই আশঙ্কায়, নরেশবাবু সাবধান হ'য়ে জানিয়ে দিচ্ছেন—"কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন,. ততক্ষণ শীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন, তখনই তিনি বে-আব্রু।" প্রতিপক্ষের উকীল-ভাবে উক্ত কথা ব'লে পুনরায় হাকিম সেজে নরেশবাবু রায় প্রকাশ ক'রলেন—"তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য সম্রাট।" যাহা হোক এই ভাবে নরেশবাবু বহু বাগাড়ম্বরসহকারে প্রতিপন্ন ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন যে, আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে সীমানা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনও "অভ্রান্ত নির্দ্দেশ" দেন নাই। আর একটি সিদ্ধান্ত তিনি ইঙ্গিতে প্রতিপন্ন করেছেন যে বাস্তবিকপক্ষে আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে কোনও সীমারেখা নাই, কারণ দেশভেদে, কালভেদে উহার ধারণা বিভিন্ন।

লেখকের প্রবন্ধের এই অংশ পুনরুক্তি দোষে বিশেষরূপে পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যে সীমারেখা সম্বন্ধে কোনও "অভ্রান্ত-নির্দ্দেশ" দেন্‌নি এই কথাটা হরেক রকম ভঙ্গীতে জানিয়েছেন এবং সব শেষে "সে-সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তা'র বাহিরে কোন্ বই, ভিতরেই বা কোন্ বই" এ কথা কবি স্পষ্ট জানিয়ে দেন্-নি ব'লে অনুযোগ করেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ঐ সকল বই ও গ্রন্থকারদের নামের সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দাবী ক'রেছেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র প্রবন্ধের শেষে ঐ-সব নাম-সম্বলিত "ক"-"খ"-চিহ্নিত Schedule যদি দিতেন তা'হলে বড় ভাল করতেন; অনেক লেখকের সন্দেহ দোলায়মান চিত্তকে সুস্থির ক'রতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনও সীমানা নির্দ্দেশ ক'রেছেন কিনা সে-কথা পরে আলোচনা ক'রবো। অবান্তরভাবে দু'-একটা কথা বলা দরকার। "লেখক যতক্ষণ কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ শীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিনি বে-আব্রু" নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের কতক কথায়, এই মতটা কবির ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। কথাগুলির উল্লেখ ক'রলে নরেশবাবুর ঐরূপ ভুলের কারণটা সহজে ধরা প'ড়ত। যা' হোক্, রবীন্দ্রনাথের ভুল মতগুলিও যে ওরূপ কিম্ভুত-কিমাকার হ'তে পারে না, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তা' বুঝতে পারবেন। যাকে নরেশবাবু "মানসিক অভিসার" ব'লেছেন তা'ও একান্ত "বে-আব্রু" হ'তে পারে যদি তা' নিরবচ্ছিন্ন লালসার রঙে অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠে।

তার পর "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন',—নরেশবাবু এই কিম্বদন্তী বহন ক'রে এনেছেন। উক্ত কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন ক'রেছেন এ-কথা খুবই সত্য; ও-গুলিতে দেহের প্রসঙ্গও কিছু আছে এ-কথাও সত্য; কিন্তু "দৈহিক ব্যাপার লইয়া" যে উক্ত "অপূর্ব্ব রস" উদ্বোধন ক'রেছেন এ-কথা একেবারেই যথার্থ নয়। বস্তুতঃ "দৈহিক ব্যাপার লইয়া" যে-রস উদ্বোধন করা সম্ভবপর, তা'র সম্বন্ধে "অপূর্ব্ব" বিশেষণটি

কোনও সময়েই প্রয়োগ করা যায় না। নরেশবাবুর উল্লিখিত কবিতাগুলির সবিস্তার বিশ্লেষণের স্থান এখানে নেই; নইলে উক্ত কবিতাগুলিতে দৈহিক ব্যাপার যে নিতান্ত গৌণ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, এ-কথা অতি সহজে যে কেউ বুঝ্‌তে পারতেন। যা' হোক্‌, কবিতা কয়টি থেকে কয়েক ছত্র ক'রে উদ্ধৃত ক'রে দিলেই আমার দাবীটা যে অমূলক নয় তা' প্রতিপন্ন হ'বে।

১। "হৃদয়-যমুনা"—শেষ কয়টি ছত্র এই :—

"নাহি রাত্রি দিনমান, আদি-অন্ত পরিমাণ
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে;
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।"

নরেশবাবুর ভুল হয়নি তো? তিনি আর কারো "হৃদয়-যমুনা" নামক কোনও কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির গোল ক'রে বসেন নি তো?

২। "স্তন"—"স্তন"-শীর্ষক দু'টি কবিতা আছে। দু'য়েরি কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :—

(ক) "হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর,
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।"

(খ) "উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্তভূমি ক'রেছে উজ্জ্বল;

* * * *

ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।"

৩। তার পর "বিজয়িনী"। তা'র শেষ কয় ছত্র এই :—

"ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদু-মন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব। সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে! পরক্ষণে ভূমি'পরে
জানু পাতি বসি' নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্প-ধনু পুষ্প-শর-ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'! নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত-প্রসন্ন বয়ানে।"

"কড়ি ও কোমলের"—

"অতনু ঢাকিল মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।"

এই দুই ছত্রে যে ভাবের উন্মেষ, এই 'বিজয়িনী" কবিতায় তা'র পূর্ণতম বিকাশ।

৪। তার পর "চিত্রাঙ্গদা"। এই কাব্য-গ্রন্থখানিকে নরেশবাবু যে একটি কবিতা ব'লে ভুল ক'রেছেন, সেই ভুলের মধ্যেই তাঁ'র এই অদ্ভুত মতের নিদানতত্ত্ব মিলতে পারে। খুব সম্ভব তিনি নিজে এ-সব কিছুই পড়েননি, কোনও বেওয়ারিশ কিম্বদন্তীর উপর তাঁ'র সমালোচনার ইমারত খাড়া ক'রেছেন। অনেক লোক যেমন এমন সব বড়লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবী ক'রে বসেন, যাঁদের সঙ্গে কোনও জন্মে তাঁ'দের কোনও পরিচয় নেই, নরেশবাবুও কি তেমনি এই সব কবিতা ও কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দাবী ক'রেছেন—একই মনস্তত্ত্ব হ'তে? "চিত্রাঙ্গদা'-র এক স্থানের একটু সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলেই আমি যে কোনও অত্যুক্তির অপরাধে অপরাধী নই, পাঠকেরা তা' বুঝ্‌তে পারবেন।

আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
চাও।" সেই জন্ম-জন্মান্তের সেবিকার পানে

পুনশ্চ :—

বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি
তবু যেন পাইনি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন-রত্ন, আলিঙ্গন-সুধা
নিজে কিছু চাহ না, লহ না।

* * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত
শিল্প-যবনিকা।

কবি এই কাব্যে সৌন্দর্য্যের সুধা দেহ-পাত্রে আকণ্ঠ পূরিয়া পান করাইয়াছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে কেবল দেহাতীতের অসীম আকাঙ্ক্ষাকে জীবন্তভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য। বিদ্যাপতির "সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়" গানটি যে অসীমের রসে ভরপুর, "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে তা'রই প্রবাহ বেয়ে চ'লেছে।

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু—
তবু হিয়া জুড়ন না গেল"

এই ছত্রটিতে নরেশবাবু যদি কেবল বুকে বুকে সংস্পর্শ নামক "দৈহিক ব্যাপার" মাত্রই অনুভব করেন, তা'হলে যে তীর্থযাত্রী পুরীধামে জগবন্ধুর স্থানে আপনার বাড়ীর লাউমাচাখানি দেখেছিল, নরেশবাবুর চেয়ে সে যে বেশী অন্যায় ক'রেছিল, এ-কথা কিছুতেই বলা যায় না। তিনি অনর্থক কষ্ট ক'রে সাহিত্য-তীর্থযাত্রা না ক'রে যদি আপনার বাড়ীতে ব'সে লাউমাচাখানির সেবা ক'রতেন, তা'হলে মোক্ষফল না পেলেও যে বড় বড় লাউফল-প্রাপ্তি তাঁ'র ঘ'টত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যা' হোক্ উপরি উদ্ধৃত কবিতা-ছত্রগুলি প'ড়েও নরেশবাবু যদি মত পরিবর্ত্তন ক'রতে না পারেন, তা'হ'লে নিশ্চয় বুঝ্‌তে হবে, নরেশবাবুর মত নামক পদার্থটি বদ্‌লায় তাঁ'র নিজের কোনও গোপন খেয়ালে,—সত্য-মিথ্যার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখে নয়।

এইবার আসল বিষয়ে অবতরণ করা যাক—সেই বহুপূর্ব্বের "আব্রু ও বে-আব্রু"-র মধ্যে সীমা নির্দ্দেশের বিষয়। প্রথমেই দেখি, "এ-বিষয়ে কবিবর আমাদিগকে কোনও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেন নাই" ব'লে নরেশবাবু আপশোষ ক'রেছেন। আপশোষেরই তো কথা সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁ'র প্রবন্ধে নরেশবাবু এত সহজে এত "অভ্রান্ত" নির্দ্দেশ ছড়িয়ে গিয়েছেন যে, তাঁ'র পক্ষে বুঝাই কঠিন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উক্ত সহজ কাজ এরূপ দুঃসাধ্য কেন। যা' হোক ভেবে দেখুন হয়তো বুঝ্‌লেও বুঝ্‌তে পারেন।

যা' হোক্, "অভ্রান্ত" নির্দ্দেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা না রাখ্‌লেও রবীন্দ্রনাথ একটা নির্দ্দেশ দিয়েছেন এবং হয়তো সেটা "অভ্রান্ত" হ'তেও পারে।

"যা'কে সীমায় বাঁধ্‌তে পারি তা'র সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু যা' সীমার বাহিরে, যা'কে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তা'কে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই।......আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে, কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপ-কলায়।"

* * * *

"মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তা'র কলা-লোকের অমরাবতীতে স্থান দেয়নি।"

* * * *

"প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর-বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটিতে সে দীপ্তি নাই।"

* * * *

"আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তা'দের উভয়ের প্রবৃত্তিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না।"

উপরে যে কয়টি অংশ তোলা গেল তা'হতেই স্পষ্ট বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ আব্রু ও বে-আব্রুতার মধ্যে কি লক্ষণ অনুসারে সীমারেখা নির্দ্দেশ ক'রতে চান। যে-জিনিষ সেরে-মণে ওজন করা যায় না, ফুটে ইঞ্চিতে মাপা চলে না—ঘণ্টায়-মিনিটে যা'র হিসাব হয় না—তা'র সম্বন্ধে এর চেয়ে সুস্পষ্টতর নির্দ্দেশ আর যে কি হ'তে পারে তা' আমার ধারণায় আসে না। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত লক্ষণ মিলিয়ে যে-কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি বাংলা-সাহিত্যের কোন্ কোন্ বই বে-আব্রুর কোটায় পড়ে তা' অনায়াসে নির্ণয় ক'রতে পারেন। সেজন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তা-দের নামের ফিরিস্তীর কোনই প্রয়োজন দেখি না।

কিন্তু গোড়াতেই যদি গলদ ঘটে,—যে বোধের উপর সাহিত্য ও রূপ-কলার প্রতিষ্ঠা যদি তা'রই অভাব থাকে,—তা'হলে সে-ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্য ও রূপ-কলার মায়া কাটানোই ভগবানের অমোঘ নির্দ্দেশ। বিপুলা বসুন্ধরায় তাঁ'র মানস-প্রকৃতির যোগ্যস্থানও ভগবান স্থির ক'রে রেখেছেন।

সব চেয়ে অদ্ভুত রহস্য এই যে, নরেশবাবু এতক্ষণ ধ'রে আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে সীমানা-নির্দ্দেশের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে হঠাৎ পরম অমায়িকভাবে, নিশ্চিন্তচিত্তে প্রত্যাদেশ প্রচার ক'রে বস্‌লেন—

"বর্ত্তমান বাঙ্গলা-সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্যই জন্মিয়াছে যা'র সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাহা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই।"

উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে "অবশ্যই", "অসঙ্কোচে" প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ উপভোগ্য। নরেশবাবু যে-সব বইকে তালাক্ দিয়ে দিলেন তা'দের নামের ফিরিস্তা দেন নাই। সুতরাং তাঁ'র নিজের নজীর অনুসারে "বিষয়বস্তু-নির্দ্দেশ" নাই ব'লে তাঁ'র মাম্‌লাও ডিস্‌মিস্ হওয়ার যোগ্য। তবে যদি "অভ্রান্ত" কোনও "নির্দ্দেশ" দিয়ে থাকেন তা'হ'লে স্বতন্ত্র কথা। সুতরাং তাঁ'র "অভ্রান্ত" নির্দ্দেশটা একবার দেখ্‌তে হয়।

তিনি যে-সব বই-এর ধোপা-নাপিত বন্ধ ক'রতে চান তা'দের একটু পরিচয় দিয়েছেন। "তাহা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই।"

উল্লিখিত বাক্যটিতে প্রথম "তাহা" "যার" এই সর্ব্বনামের বদলে ব'সেছে এবং "যার" ব'সেছে, পূর্ব্ব ছত্রের "বই"-এর বদলে। কিন্তু শেষের "তাহা" কা'র বদলে ব'সেছে? ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী "নিকৃষ্ট বৃত্তি"-রই তো ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে হওয়া সঙ্গত। তা'হলে অর্থ হয় "নিকৃষ্ট বৃত্তি লইয়া রস উদ্বোধন ক'রে নাই"; যদি দূরবর্ত্তী "শারীর ব্যাপারের" বদলে ব'সে থাকে তা'হলে অর্থ হয় শারীর ব্যাপার নিয়ে "ঘাঁটাঘাটি" ক'রছে, কিন্তু "রস উদ্বোধন" করে নাই। "ঘাঁটাঘাটি" শব্দটি রুচি-পীড়াজনক এবং বীভৎস-রসদ্যোতক ব'লে অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে শিষ্ট-সাহিত্যে বর্জ্জনীয়। আর ঐ সকল "বই"-এর যখন হু'খানি ক'রে হাত নেই তখন উহার ব্যবহারও হ'য়েছে নরেশবাবুর বহুনিন্দিত রূপকভাবে। "শারীর ব্যাপার লইয়া" আলোচনা কি প্রণালীতে কোন্ মাত্রায় ক'রলে "ঘাঁটাঘাটি" হ'য়ে উঠে নরেশবাবু তা'ও খোলসা বলেন নি। সুতরাং তাঁ'র নির্দ্দেশ "অভ্রান্ত" হ'তে পারে কিন্তু তা' মোটেই নির্দ্দেশ নয়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা দরকার। নরেশবাবু প্রজনন প্রবৃত্তিকে "নিকৃষ্ট বৃত্তি" ব'লেছেন। "সমাজনীতি"-র ভূত রোজার ঘাড়ে ভর ক'রেছে দেখ্‌ছি। কিন্তু উহা কি যথার্থই নিকৃষ্ট? দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে উহা পরমধর্ম্ম ব'লে গণ্য হ'তে পারে। যে-দেশে লোক-সংখ্যা বাড়ান অত্যাবশ্যক, সেখানে ইহা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। প্রাচীনকালে এ-দেশে কত রকমের পুত্র শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত ছিল নরেশবাবু তা' অবশ্যই জানেন। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে কত সতর্ক! "যৌন-মিলনে"র যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা' প্রজনার্থ নয়, কেননা সেখানে সে পশু", এই 'পশু' শব্দ সম্বন্ধে পাছে কেউ ভুল বুঝে সেই জন্য পরে লিখ্‌ছেন—"উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার ক'রেছি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে।"

যাই হোক্, এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলা-সাহিত্যে যে কলারসবিরোধী পঙ্কিলতা প্রবেশ ক'রেছে, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশবাবু একমত। সুতরাং হঠাৎ নরেশবাবুর সমরাভিযান বিশেষ রহস্যপূর্ণ। ভয়ে মানুষ অনেক সময় উগ্র হ'য়ে উঠে। নরেশবাবুর মনে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যীভূত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কোনও অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা নেই তো? মনস্তত্ত্ববিদেরা স্থির ক'রবেন।

বাল্যকাল হ'তে "জগা-খিচুড়ী" নামক সুখাদ্যের না শুনে আস্‌ছি। জিনিষটি অপূর্ব্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু এ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

পর্য্যন্ত চেখে দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি। কি কি উপাদানে সে চিজ প্রস্তুত হয়, চেষ্টা ক'রেও তা'র সন্ধান মিলেনি। খুব সম্ভব, উপাদানের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, কেবলমাত্র পাচকের হাতের গুণে উক্ত অপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্টিলাভ করে। এতদিন পরে নরেশবাবুর কল্যাণে আমার জিহ্বা-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। নরেশবাবুর বোধ হয়, সেই প্রথিত-যশা জগবন্ধু (বা জগন্নাথ) পাচকের নিকটই 'হাতে-হাতা' হয়েছে। এটা অবশ্য অনুমান মাত্র। যা' হোক্, নরেশ-বাবুর প্রস্তুত 'জগা-খিচুড়ী' পাঠকগণের সঙ্গেই ভোগ করা উচিত। তাঁ'রা যে, পাচকের হাতের তারিফ ক'রবেন, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত উপাদান :—

(১) যৌন-মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা' 'প্রজননার্থং' নয় কেননা সেখানে সে পশু। সার্থকতা তা'র প্রেমে, এইখানে সে মানুষ।"

(২) "বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হোলো বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞান ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।"

পাচকের হাতের গুণের নমুনা :—

"দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁ'র মত এই যে রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর (বিজ্ঞানের) সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।"

বলা বাহুল্য, প্রথম উদ্ধৃত অংশটিতেই রবীন্দ্রনাথ যৌন-মিলনের "দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁ'র মত" উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে দৈহিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কথাই ব'লেছেন, কিন্তু নরেশবাবুর হাতের গুণে দু'টিতে মিশে অপূর্ব্ব 'জগা-খিচুড়ী' প্রস্তুত হ'য়েছে।

এর পরই নরেশবাবু একটি অপূর্ব্ব অনুমানে উপস্থিত হ'য়েছেন। "এই কথাটা (কথাটা রবীন্দ্রনাথের নয়, নরেশবাবুর নিজের মনগড়া) পরবর্ত্তী কথার সঙ্গে সমন্বয় করিলে তাঁ'র সিদ্ধান্তটা এই বলিয়া মনে হয় যে, যৌন-মিলনের এই দিকটা লইয়া যে-সাহিত্য আলোচনা করে সেইটাই 'বিদেশের আমদানী বে-আব্রুতা' এবং তা'র উপরই তিনি কষাঘাত ক'রেছেন।" উদ্ধৃত অংশে "এই দিকটা" শব্দ দু'টি নরেশবাবু যৌন-মিলনের "দৈহিক সম্বন্ধের দিকটা" অর্থেই প্রয়োগ ক'রছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিভাঁজ আদিরসাশ্রিত সাহিত্যটা যে এ-দেশের একটি সনাতন জিনিষ, রবীন্দ্রনাথের এ-বোধটুকুও নাই মনে ক'রলে, নিশ্চয়ই তাঁ'র এদেশী সাহিত্যের জ্ঞানের পরিসর সম্বন্ধে একটু বেশী মাত্রায় অবিচার করা হয়। অন্তত "বিদ্যাসুন্দর" বইখানি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ একটু আধটু জ্ঞান আছে, নরেশবাবু তাঁ'র হাতের ন্যায়দণ্ডকে বিন্দুমাত্র না হেলিয়েও বোধ হয় এই ছোট দাবীটুকু মঞ্জুর ক'রতে পারতেন।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন্ জিনিষটিকে হালের বিদেশী আমদানী বলেছেন সে-সম্বন্ধে নরেশবাবুর কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বোধ হয়, "কাব্যের উপরে যুক্তির বাণ" প্রয়োগ ক'রে তিনি যে "ধোঁয়া"র সৃষ্টি করেছিলেন সেই ধোঁয়াই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

রবীন্দ্রনাথ "সাধারণ সত্য" ও "সার্থক সত্যে"-র পার্থক্য পদ্মফুল ও কাঁকরের উপমা দিয়ে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন তিনি ঐ উপমাটুকুর উপরই তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন নি। সার্থক উপমা সত্যোপলব্ধির যে কিরূপ সহায়তা করে সে-কথা সুবিদিত। কিন্তু নরেশবাবু এই উপমাটিকে নিয়ে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। তাঁ'র প্রত্যেক কথা আলোচনা ক'রে দেখার স্থান, সময়, প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন এই চারেরই একান্ত অভাব। তবে পথ-চল্‌তিভাবে একটু ছুঁয়ে গেলে ক্ষতি নাই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রা কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত।"

নরেশবাবু এইটুকু উদ্ধৃত করার সময় "সুনিশ্চিত" শব্দের পর বন্ধনীর হেপাজতে এবং অগ্র-পশ্চাৎ জিজ্ঞাসা

চিহ্নের পাহারায় প্রশ্ন ক'রেছেন—(? ইহা কি সার্থকের সঙ্গে একার্থবাচক ?)। এই বেতালের প্রশ্নের রাজার উত্তর এই যে,—"নিশ্চয়ই"। "সুনিশ্চিত" শব্দের যদি কোনও অর্থ থাকে তা'হ'লে তা' সুনিশ্চিত এই যে, তা'র মধ্যে আমরা তা'র সম্পূর্ণটাকে দেখি। যে-জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে যত কম দেখি তা' সেই পরিমাণেই অনিশ্চিত হ'য়ে প'ড়ে। ইতঃপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি, সেই জিনিষই সার্থক। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে সুনিশ্চিত ও সার্থক একার্থবাচক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে বাতিল ক'রে নিজেই পদ্ম ও কাঁকরের পার্থক্যের কারণ প্রচার ক'রেছেন যে, "পদ্ম আমাদের আনন্দ দেয় আমাদের রূপবোধকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আর কাঁকর আমাদের পীড়া দেয়—সম্পূর্ণের প্রকাশ ও অপ্রকাশ এ-বিষয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।" কাঁকর চোখে, ভাতে বা জুতার মধ্যে না ঢুক্‌লে পীড়া দেয় এ-কথা প্রমাণসাপেক্ষ। আর পদ্ম সুন্দর ব'লে আনন্দ দেয়, এ-কথা বল্‌লে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের অপরাধের মধ্যে এই যে, তিনি পদ্ম কেন রূপবোধকে পরিতৃপ্ত ক'রে আনন্দ দেয়, সে-কথাটা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'র সিদ্ধান্ত ভুল হ'লেও হোতে পারে, কিন্তু তা' মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তার পর হঠাৎ নরেশবাবুর বিশ্বতোব্যাপী দৃষ্টি খুলে গেছে। তিনি লিখ্‌ছেন—"যে-ব্যক্তি এই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাঁকরকে sub-specie—acternitatis দেখিতে পারিয়াছে, সে তা'র সার্থকতা লইয়া রসরচনা অনায়াসেই কবিতে পারে—ইত্যাদি।" ছেলেদের বর্ণজ্ঞান শিখাবার জন্য বর্ণপরিচয়াদি বই রচিত হ'য়ে থাকে; কিন্তু সে কেবল সাধারণ ছেলেদের জন্য। প্রহ্লাদ 'ক' দেখেই "কৃষ্ণ" স্মরণে কেঁদে আকুল হ'য়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ যদি শিশুরাজ্যে প্রহ্লাদের বন্যা আসে, তা'হলে পাঠশালা বল, স্কুল-কলেজ বল, বিশ্ববিদ্যালয় বল সকলেরই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে সন্দেহ নেই।

তার পর খানিকক্ষণ ধ'রে নরেশবাবু খামখা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যা' হোক্ এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিষটাকে কাজে খাটাই তা'কে যথার্থ ক'রে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়।" সোজা কথায়, কোন জিনিষকে কাজে খাটালে নজরটা সেই কাজের উপর গিয়েই সম্পূর্ণ প'ড়ে; তা'র মাপেই জিনিষটার মূল্য নিরূপণ হয়। জিনিষটা তা'র আপনার স্বরূপে যে কি, সে-দিকে মোটেই দৃষ্টি পড়ে না। কথাটা একেবারেই নূতন নয়। ভক্তি ও রসশাস্ত্রের এটা একেবারে প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—First axiom। যথার্থ প্রেম-ভক্তি একেবারে অহেতুক, রসিক বৈষ্ণব মাত্রেই তা' জানেন। আর সৌন্দর্য্য-তত্ত্বটা রস-তত্ত্বেরই সামিল। কিন্তু এমনতো হ'য়ে থাকে, সুন্দর অথচ আমাদের কাজে লাগে—রবীন্দ্রনাথের কথায়, "আর একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ।" যে আমার সংসারযাত্রার প্রধান সহায়, তা'কেই হয়তো মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের মতে এরূপ হ'লেও ক্ষতি নেই। দুটো ভাবই পাশাপাশি থাক্‌তে পারে। কাজে লাগে ব'লে সুন্দরের সৌন্দর্য্য কণামাত্র কমে না। সংসারযাত্রার সহায় ব'লে প্রেমপাত্র বা প্রেমপাত্রী প্রেমের যোগ্যতা বিন্দুমাত্র হারায় না। কিন্তু এ নিয়ম খাটে কেবল সুস্থ-সবলচিত্তের পক্ষে। চিত্তের সে সবলতা না থাক্‌লে তা'কে "শুচি বায়ু"তে পেয়ে বসে। সংক্ষেপে এই তত্ত্ব বুঝিয়ে ঐরূপ "শুচি বায়ু"র উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণ ক'টিতে যে একটু মৃদু ব্যঙ্গরস আছে, তা' প্রচ্ছন্ন হ'লেও সুস্পষ্ট—জুঁই ফুলের মৃদু বাসটুকুর মত। কিন্তু আমাদের সমালোচক-মশায় উদাহরণ কয়টি দেখেই, তাঁ'র সমস্ত দৃষ্টিশক্তি "নৈয়ায়িকের" দৃষ্টিশক্তিতে পরিণত ক'রে সেগুলির ফাঁক ধরার কাজে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছেন। কাজেই "শুচি বায়ু" এই ছোট কথাটি তাঁ'র নজরে পড়েনি—ঠিক সেই বৈদ্য-প্রবরের মতো যিনি চক্ষুরোগীর "কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ"-এর ব্যবস্থা ক'রে ব'সেছিলেন,—রোগী পাওয়ার আনন্দে বই-এর পাতাটা উল্‌টিয়ে, সেটা যে গো-চিকিৎসা-প্রকরণ, সেটা দেখ্‌তে ঈষৎ একটু ভুল হওয়ায়।

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে কোথায় কোথায় "ফাঁক" আছে ছিদ্রান্বেষী নৈয়ায়িকমশায় তা' ফাঁস ক'রে হঠাৎ আবার উজান বেয়ে গিয়ে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের যে দুটো দিক আছে, তা'র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, কর্ম্মসূত্রের বন্ধনে জীবকে বারংবার সংসারে গতায়াত ক'রতে হয়। কুক্ষণে নরেশবাবুর প্রবন্ধ আলোচনা করার কর্ম্ম ঘাড়ে নিয়েছিলেম। এই দুষ্কর্ম্মের বন্ধন যতক্ষণ না ভোগের দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষয় হ'য়ে যায়, ততক্ষণ এইরূপই চলবে। দুঃখ করা বৃথা!

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ—

"সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিত-বুদ্ধির দিক থেকে তা'র সমাধান হবে না—তার সমাধান কলা রসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌন-মিলনের মধ্যে যে দুটী মহল আছে মানুষ তা'র কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় এই হোলো বিচার্য্য।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নিত্যানিত্য বস্তু এবং প্রধানতঃ যৌন-মিলনের দুটো দিকের কোনটা সাহিত্যের নিত্যরসের বিষয় হ'তে পারে, এই বিষয়ের একটু আলোচনা ক'রেছেন। তাঁ'র প্রবন্ধের গোড়ায়ও এ-বিষয়ে একটু ইঙ্গিত ক'রে গেছেন। মোটের উপর তাঁ'র সিদ্ধান্তটী এইরূপ —যে জিনিষের আপনার মধ্যে তা'র চরম পরিণাম নাই, যা অন্য কোনও উদ্দেশ্যের সোপান মাত্র, তা' সার্থক সত্য নয়। কলারস কেবলমাত্র সার্থক সত্যকেই আশ্রয় ও অলঙ্কৃত করে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে দৈহিক ব্যাপারের মধ্যে তা'র চরম পরিণাম নেই—তা'র উদ্দেশ্য ও পরিণাম জীব-সৃষ্টিতে। প্রেমের নিজের মধ্যে সেই চরম পরিণাম আছে। কাজেই—প্রেমই সার্থক সত্য, দৈহিক মিলন নয়। সুতরাং কলারস প্রেমকেই আশ্রয় করে। কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ দেহী জীব। কাজেই অন্তরের প্রেমের মিলন বাহিরের দেহের মিলনে আপনাকে প্রকাশ্য ক'রতে চায় ও ক'রে থাকে। তখন অন্তরের প্রেমের অপূর্ব্ব আলোকে দেহের মিলনও ভাস্বর হ'য়ে উঠে। ঐরূপ প্রেমালোকদীপ্ত দৈহিক মিলন কলারসের আশ্রয় হ'তে পারে তখন প্রেমের সাহচর্য্যে সেও কলালোকে নিত্যত্ব লাভ ক'রতে সক্ষম হয়। প্রেমবিচ্ছিন্ন দৈহিক মিলনের মধ্যে সেই কলা-রসের নিত্যত্ব নাই। সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ তা' কিছু দিনের জন্য বাহবা পেতে পারে বটে, কিন্তু তা'র মধ্যে নিত্য কালের মানবের উপভোগ-যোগ্য রস নেই। দু' কারণে প্রেম-বিচ্ছিন্ন দৈহিক মিলনের প্রসঙ্গ সাহিত্যে সমাদর লাভ করে—প্রথম লালসা উদ্দীপন হেতু, যেমন ইংলণ্ডে Restoration যুগে; দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তৃপ্তির সহায়তা হেতু, যেমন বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যেও সম্প্রতি ঐ বিকার প্রবেশ ক'রেছে এবং বিস্তারলাভ ক'রেছে। ওরূপ বিকার-গ্রস্ত সাহিত্য আপাততঃ যতই সমাদর লাভ করুক না কেন, ওর মধ্যে সাহিত্যিক নিত্যরস নেই।

এই তো গেল রবীন্দ্রনাথের কথা। এত অল্প পরিসরের মধ্যে এত বড় গভীর সত্য পরিস্ফুট ক'রে তোলা সাধারণ ক্ষমতার কাজ নয়। সমালোচক মশায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে যত কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, সুধীও সুধীর পাঠক তা'র উত্তর ঐটুকুর মধ্যেই পাচ্ছেন। কিন্তু তা' ব'লে নিশ্চিন্ত হ'লে আমার ভোগ টুটে কৈ?

এইবার নরেশবাবুর আপত্তি শোনা যাক। গোড়াতেই একটা কথা জেনে রাখা ভাল। নরেশবাবু যে প্রতিপক্ষের মতখণ্ডনজনিত বিমল আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে প্রতিপক্ষ তিনি স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের মত ব'লে তিনি যে-গুলিকে খাড়া ক'রে তুলেছেন, তা'র কারখানা তাঁ'র নিজের মগজের মধ্যে। অনেক বালক যেমন সঙ্গীর অভাবে একাই দু'পক্ষের হ'য়ে তাস সাজিয়ে নিয়ে, প্রতিপক্ষকে খেলায় হারিয়ে দেওয়ার গর্ব্ব অনুভব করে, এও কতকটা সেইরূপ।

নরেশবাবু প্রথমেই রায় প্রকাশ ক'রেছেন—"এই যুক্তির ধারার মধ্যে অনেকগুলি ফাঁক আছে।" থাকার কথাই তো; কারণ তা'রা ফাঁক সমেতই তো নরেশবাবুর কার-খানা হ'তে বেরিয়েছে। যা'হোক, নরেশবাবু কি বলেন শোনা উচিত। "প্রথমতঃ প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া কাজ হিসাবে সার্থকতা অসার্থকতার নির্ণয় হয় না।" হয়,

সে কথাতো কেউ বলেনি। অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মাত্রেই কাব্য হিসাবে সার্থক এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ মাত্রেই কাব্য হিসাবে অসার্থক, রবীন্দ্রনাথ কোথাও তো একথা বলেন নি। তিনি তো বরং ব'লেছেন—"যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের এক শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বু-বনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনা ভার নিল।"

তারপর নরেশবাবু ব'লছেন,—দ্বিতীয়তঃ যৌন সম্বন্ধের যে-দিকটা তিনি পশুধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে চিরকালই রসের বিচারে অসার্থক একথা বলা ঠিক নয়।"

"চিরকাল কথাটার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেম না। কোন্ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা সার্থক ছিল এবং কবে হোতে অসার্থক হোতে সুরু হোলো, নরেশবাবু তা' জানান নি।

অথ নরেশবাবু—"কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়াছে; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্র রচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে।"

"মানসিক প্রেম" পদার্থটা কি বুঝিলাম না। "শারীরিক প্রেম" নামে আর কোনরূপ প্রেম আছে নাকি? মাংসের প্রতি মাংসাশীর যে টান স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের রক্তমাংসের দেহের প্রতি সেইরূপ যে অন্ধ টান তাকেই কি তিনি "শারীরিক" প্রেম মনে করেন? "প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ" থাকা ব্যাপারটাই বা কি?

রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন কোথাও ভুলক্রমে দেহটাকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন এরূপ তো মনে পড়ে না। তাঁর নিজের কথা এই—"প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে।" বাহির অর্থে যে দেহ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্থানান্তরে তিনি লিখেছেন—

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।"

শুনেছি সেকালের কোনও ইংরাজী-অনভিজ্ঞ উকীল বড় বড় ইংরাজী আইনের বই নিয়ে আদালতে যেতেন। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিয়েছিলেন—To frighten the Judge!" বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই নরেশবাবু এই প্রসঙ্গে কালিদাসের "মেঘদূত, ঋতুসংহার" ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর নামোল্লেখ ক'রেছেন। মেঘদূত সম্বন্ধে নীরব থাকাই কর্ত্তব্য ছিল, তবুও নরেশবাবুকে কেবল একটীমাত্র অনুরোধ করি—যেখানে বিরহে প্রেমিকের "বলয়ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠ" অবস্থা ঘটে, সেখানে প্রেমের গভীরতা যে কতখানি, তিনি যেন একবার ভেবে দেখেন।

"ঋতু সংহারে" ঋতুর বর্ণনাটাই কাব্য হিসাবে সার্থক—সম্ভোগ মিলনের ছবিটা নয়। বড় কবির রচিত কাব্যের সকল অংশই যে কাব্য হিসাবে সার্থক, এ-কথা তিনি কি ক'রে জানলেন? বিদ্যাপতির নামে কতকগুলি সম্ভোগ-মিলনের-পদ প্রচলিত আছে সন্দেহ নেই; তার সকলগুলিই যে বিদ্যাপতির রচিত সে-কথাও জোর ক'রে বলা যায় না। আর বৈষ্ণব কবিদের রচিত সম্ভোগ মিলনের পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে হ'লে একটু সন্তর্পণেই করা উচিত। কোনও প্রকৃত রসিক বৈষ্ণব সে সকল ব্যাপারকে প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধীয় লীলা ব'লে মনে করেন না। শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী তাঁর "উজ্জ্বল নীলমণি"—নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং এই সব পদাবলী শুনে মহাভাব প্রাপ্ত হ'তেন। শ্রীজীব গোস্বামীর মতো নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও এই-সব রস গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা ভাষ্য ক'রেছেন। সে-কথা ছেড়ে দিয়ে লৌকিক ভাবে দেখলেও, বিদ্যাপতির যে-সব পদ রসলোকে অমরত্ব লাভ ক'রেছে, তা'র একটীও সম্ভোগ মিলন বর্ণনাত্মক নয়। গোটা কয়েক নাম ক'রলেই সকলেই সে-কথা স্বীকার করবেন। "সজনি ভাল করি পেখন না ভেল"; "মাধব! তব বিধুবদনা"; "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই"; "সজল নয়ন করি, পিয়াপথ হেরি হেরি, তিল এক হয় যুগ চারি"; "সখি হামারি দুখের নাহি ওর"; "স্বজনি কো কহই আও মাধাই, কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার"; "আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু"; "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর"; "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়"। বিদ্যাপতির ভাণ্ডারে রস-হিসাবে

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

সার্থক আরো বহু পদাবলী আছে। নিছক সম্ভোগ-মিলনে যে নিত্যরস থাকতে পারে না, রসজ্ঞ সমালোচক স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী কথায় তা' সুন্দর ব্যক্ত ক'রেছিলেন। গীতগোবিন্দ কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন—"গীতগোবিন্দ কাব্যে গীত থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু গোবিন্দ নাই।"

আর চণ্ডীদাসের নামের সহিত সম্ভোগ-মিলনের ভাব এক সঙ্গে মনে আসাই যাকে ইংরাজীতে বলে Sacrilege, বৈষ্ণবেরা যাকে বলে থাকেন "সেবাপরাধ" তাই—এখানে অবশ্য সাহিত্য-সেবাপরাধ। এ অপরাধ জ্ঞানকৃত হ'লে তার প্রায়শ্চিত্ত নেই, অজ্ঞানকৃত হ'লে তা'র একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত রসিক গুরুর নিকট হ'তে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সম্বন্ধে উপদেশ নেওয়া। তবে ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন ফল লাভ সম্ভব নয়। চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব প্রেম-পদাবলীর একটীও আমি এখানে তুলব না। সত্য কথা ব'লতে গেলে যে-ব্যক্তি সম্ভোগ মিলন প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর উল্লেখ করেন তাঁর নিকট ঐগুলির উল্লেখ ইচ্ছা করলেও আমার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে না! নরেশবাবু যদি পারেন আমাকে ক্ষমা করবেন। তবে চণ্ডীদাসের প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন সেটুকু তুলে দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে :—"সে-ভাব (প্রেম সাধনার ভাব) তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে-ভাব এখনকার সময়েরও ভাব নহে, সে-ভাবের সময় ভবিষ্যতে আসিবে।" চণ্ডীদাসের প্রতিভার মর্ম্ম-কথার পরিচয় তাঁর একটী পদে ফুটে উঠেছে :—

"রজনী দিবসে, হব পরবশে, স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব, ভাবিনী ভাবের দেহা।"

এই "ভাবিনী ভাবের দেহা" কথাটির যা মর্ম্মগত সত্য তারই উপলব্ধি সম্বন্ধে অসাড়তার ফলেই বর্ত্তমানে সাহিত্যে যত কিছু বিড়ম্বনা। একি মানবজাতির মর্ম্মস্নায়ুর পক্ষাঘাতের লক্ষণ?

নরেশবাবু এরপর আবার রসকলায় দৈহিক ব্যাপারের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা সুরু ক'রেছেন। তিনি এ-আলোচনা অনন্তকাল ধ'রে করুন—আমি কিন্তু "পাদমেকং ন গচ্ছামি" স্থির ক'রেছি। নরেশবাবুর পাঠকবর্গের প্রতি তাঁর যদি অনুকম্পা না থাকে সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই; কিন্তু আমার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি আমার তো একটু দরদ আছে। ক্রমাগত একই খাদ্য পুষ্টি-লাভের পক্ষে অনুকূল নয়, এ একটী পরীক্ষিত সত্য।

এই প্রসঙ্গে একটী সাধু সঙ্কল্প মনে উদিত হ'য়েছে—গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সন্ধিস্থাপনের জন্য একবার বিধিমত চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। আসলে যে কোনও বিবাদের কারণ নাই, নরেশবাবুর মোহ কেটে গেলে, তিনিও তা' জলের মত বুঝ্‌তে পারবেন। নরেশবাবু ও রবীন্দ্রনাথের লেখা হ'তে একটু একটু তুলে দিলেই পাঠকেরা বুঝ্‌তে পারবেন যে, রবীন্দ্রনাথের যে-উক্তিতে নরেশবাবু সমরসজ্জা ক'রেছেন, নরেশবাবু নিজেও সেই কথাই ব'লেছেন—অবশ্য তাঁর অভ্যস্ত ভাষা ও ভঙ্গীতে।

নরেশবাবুর উক্তি :—

"যৌন সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া পাঠকের চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করা···নিত্য অনিত্য কোনও রূপ রসই নয়·········"

রবীন্দ্রনাথের উক্তি :—

"·········বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটীতে সেই দীপ্তি নাই।

(নরেশবাবুর উল্লিখিত যৌন সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার)

"যৌন মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা' 'প্রজনার্থং' নয় কেননা সেখানে সে পশু।" (পুনরায় নরেশবাবুর উল্লিখিত শারীর ব্যাপার)

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখনকার কেউ কেউ মনে করেন নিত্য-পদার্থ;"

নরেশবাবুর লেখাতে "ঘাঁটাঘাটি" শব্দের যা অর্থ, 'বে-আব্রুতা'রও ঠিক সেই তাৎপর্য্য। খুব সম্ভব ঘাঁটাঘাটি শব্দটী সংস্কৃত উদ্ঘাটন শব্দ থেকে জাত। উদ্ঘাটন—আবরণ উন্মোচন—বে-আব্রুতা।

সুতরাং দেখা গেল আসল বিষয়ে উভয়ের মতের মিল আছে। কেবল একটী বিষয়ে অনৈক্য দেখা যায়—তা'ও সহজেই মিটে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই

বে-আব্রুতার জন্ম—য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থতা চেষ্টার অন্ধ অনুকরণে। নরেশবাবু মনে করেন ওটি পাঠকদের মনে রিরংসা উদ্দীপনের ইচ্ছা থেকে সঞ্জাত। সেনাপতি মহাশয় তাঁর নিজের দলের সৈন্যগণকে প্রতিপক্ষের চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের ভাল ক'রে চিনেন। সুতরাং, আশা করি, রবীন্দ্রনাথ নরেশবাবুর "সংশোধন"টুকু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ক'রবেন। অনর্থক ভদ্রসন্তানদের "রিরংসা উদ্দীপন চেষ্টার গৌরব হ'তে বঞ্চিত করা রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ লোকের পক্ষে উচিত হয় না।

এর পর নরেশবাবু পুনরায় সেই সীমানা নির্দ্দেশের মাম্‌লা তুলেছেন। "যাহা রসরচনা ও যাহা কেবলমাত্র কদর্য্য ইন্দ্রিয়বিলাস তা'র মধ্যে প্রকৃত সীমা-নির্দ্দেশটাই আসল কথা। .... রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমারেখা টানিতে চান বুঝা গেল না।" কাজেই নরেশবাবুকে সে গুরুতর কাজের ভার নিজের হাতেই নিতে হোলো। নরেশবাবু রীতিমত পিলারবন্দী ক'রে এরূপ সীমা নির্দ্দেশ ক'রছেন:—"যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায় সেটা আবৃত হোক, অনাবৃত হোক, তাহা আর্ট—আর যাহা রসবোধে সাড়া দেয় না, কেবল মানুষের পাশুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তাহা আর্ট নয়।........ এই যে প্রভেদ ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করিবেন কিন্তু অরসিককে অন্য কোনও বাহ্যলক্ষণ দিয়া বুঝাইবার কোনও উপায় নাই।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নরেশবাবুর মতে রসরচনা ও কদর্য্য ইন্দ্রিয়-বিলাসের মধ্যে প্রভেদ একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ যা'র অস্তিত্ব রসজ্ঞের রসের উপলব্ধিতে,—যে তা' বাহ্য লক্ষণ দিয়ে বুঝতে চায় সে লোক রসিক নয়। দেখা যাক্ রবীন্দ্রনাথ কিরূপ প্রভেদ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—

"আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মিটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়"

যদি আধ্যাত্মিক ব'লে জগতে কিছু থাকে—তা'হ'লে উপরি উদ্ধৃত অংশের প্রতি অনু-পরমাণু আধ্যাত্মিক। এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভেদ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও নরেশবাবুর মন ওঠেনি, তিনি অভিযোগ ক'রেছেন—"রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমারেখা টানিতে চান বুঝা গেল না।" সুতরাং মনে হয় তিনি বোধ হয় একটা বাহ্য লক্ষণ দাবী করছেন। নতুবা তাঁ'র অভিযোগের কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। আর বাহ্য লক্ষণ যে দাবী করে, তা'র সংজ্ঞা নরেশবাবু নিজেই নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং—তাঁর নিজের প্রদত্ত ছাড়পত্রের (Passport) বলেই তিনি যে অরসিকের গোলকধামে উত্তীর্ণ হয়েছেন, একথা নরেশবাবুকে মান্‌তেই হবে।

আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। নরেশবাবু "রসবোধে সাড়া জাগায়" এবং "গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ" ব'লে যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা' ছাড়িয়েও আরও গভীরতর মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে "রসবোধে সাড়া জাগাবার" নিদানতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা ক'রেছেন। এ-সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট প্রভেদটা যে 'বাহ্য' প্রভেদ মাত্র, নরেশবাবু এইরূপ 'রুল' জারি ক'রেছেন। হয়তো বা "চৈতন্য রামানন্দ সংবাদে" উল্লিখিত মহাপ্রভুর ভাবে ভাবিত হ'য়ে নরেশবাবু "এহ বাহ্য" "এহ বাহ্য" শব্দের নির্দ্দেশ দ্বারা রায় রামানন্দকে—শ্রীবিষ্ণু!—রবীন্দ্রনাথকে রসলোকের অন্তরতম বৈকুণ্ঠের পথ প্রদর্শন ক'রেছেন। কিন্তু এ-সব মহাপ্রভুজনসুলভ ব্যাপারে মাদৃশ প্রাকৃত জনের নীরব থাকাই শ্রেয়।

তবে একটী ছোট কথা জানালে ক্ষতি নেই। রবীন্দ্রনাথ কেবল রসবোধের আব্রু ও আভিজাত্যের কথাই ব'লেছেন—সাড়ী জ্যাকেট ব্লাউস পেটিকোটের কথা তাঁর মনের ত্রিসীমানার ধার দিয়েও যায় নি। তাঁর কথাটা এই—"মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে, সেইটেই নিত্য—যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য।" সুতরাং নরেশবাবুর নগ্ন-নারীমূর্ত্তি, Venus of Milo প্রভৃতির উল্লেখ নিতান্তই অসংবদ্ধ আলাপ মাত্র।*

আসলে আব্রু জিনিষটা অন্তরের—যাকে সংস্কৃত কবিরা

* মুদ্রাকর সাবধান হবেন—"আলাপ স্থানে যেন প্রলাপ ছাপা না হয়"।

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

"স্ত্রী" বল্লেন এবং যা "শ্রী"র কমলাসন। এই প্রসঙ্গে লর্ড বায়রণের উল্লিখিত তাঁর নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সকলেই জানেন মানব জাতির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা বশতঃ তিনি ভাষায় ও আচরণে সংযম রক্ষা ক'রে চলা আবশ্যক মনে ক'রতেন না। বড় বড় নামজাদা সাধু পুরুষের সঙ্গে আচরণেও এর ব্যতিক্রম ঘট্‌ত না। অনেকে মুখে রাগ প্রকাশ ক'রতেন বটে, কিন্তু কারো কাছে কোনও দিন বায়রণের এজন্য যথার্থ লজ্জা অনুভবের কারণ ঘটে নি। কেবল একবার মাত্র এর অন্যথা ঘটেছিল —শেলীর নিকটে। তাঁর একটী অসংযত বে-আব্রু কথায় শেলীর সমস্ত দেহে এমন একটী সকরুণ বেদনা ও কুণ্ঠার ভাবের বিকাশ হ'য়েছিল যে তাঁর মতো দুর্দ্ধর্ষ সিংহকেও মাথা নত ক'রতে হয়েছিল। শেলীর অন্তরপ্রকৃতির রসবোধের চেতনা একান্ত সুকুমার ছিল ব'লেই তিনি এরূপ পীড়া অনুভব ক'রেছিলেন। নতুবা শেলী যে, সাধারণ সামাজিক যৌননীতির ধার ধারতেন না একথা সর্ব্বজনবিদিত।

তারপর দুইটী প্যারা ধ'রে ভিক্টোরিয়া যুগের শ্লীল সাহিত্য, অপাংক্তেয় বিষয়-সংশ্লিষ্ট-রসবিচিত্র য়ুরোপীয় সাহিত্য ও তস্য বিকৃত পদাঙ্কানুসারী য়ুরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা ছলে, পুনঃ পুনঃ "বাহ্‌" এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র জপ ক'রতে ক'রতে নরেশবাবু "অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়" —অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে। প্রথমেই তিনি বল্‌ছেন "—বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে একথা সত্য।"

ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে অন্বয় ক'রলে "এই" এই সর্ব্বনামটী পূর্ব্ব প্যারায় যে প্রেরণার উল্লেখ আছে তাকেই বুঝায়। অর্থাৎ "তাঁদের বিকৃত পদাঙ্কের অনুসরণে ইউরোপে বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে—" এই অংশটাকেই লক্ষ্য ক'রছে। বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে—একথা সত্য।

ব্যাকরণের নিয়মের উপর একান্ত নির্ভর সব সময়ে নিরাপদ নয়। সুতরাং সুধী সমাজে—"আভ্যন্তরীণ প্রমাণ" ব'লে যে প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়, তা'র সাহায্যে ব্যাকরণানুযায়ী সিদ্ধান্তটী যাচাই ক'রে দেখা ভাল। প্রবন্ধে স্থানাভাব, সুতরাং সে ভার আমি পাঠকদের উপরই দিচ্ছি। উক্ত প্রমাণ প্রয়োগের ফলে তাঁদের ধ্রুব প্রতীতি জন্মাবে যে, নরেশবাবু যা' লিখেছেন, তা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

নরেশবাবু তাঁর সৈন্যদলের দিগ্বিজয়ের কাহিনী নিম্নলিখিতভাবে সদম্ভে প্রচার ক'রেছেন :—"উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রদেশ শিষ্ট সাহিত্যের সীমা-বহির্ভূত বলিয়া বর্জ্জিত ছিল তা'র ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক নূতন রস সৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন।" "বিষয় বস্তু নির্দ্দেশের" অভাব বশতঃ কথাটা সম্পূর্ণ বোধগম্য হ'লো না। প্রথম প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠে—"একই বা কে এবং অধিকই বা কোন্ ব্যক্তি?" এটার যথাযথ উত্তর পেলে নরেশবাবুর প্রবন্ধের মর্ম্মার্থ জলের মতন পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—"নূতন" শব্দটী রসের বিশেষণ না আয়োজনের? যদি "রস" উহার লক্ষ্য হয়, তা'হ'লে কারো বোধ হয় কোনও আপত্তির কারণ থাক্‌তে পারে না। কারণ, এ রস যে চিরন্তন কলারস হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা 'নূতন' রস, সে বিষয়ে কারো কোনও সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকতে পারে না।

পুনশ্চ :—"তা'র মধ্যে কতকটা যৌন সম্বন্ধের পূর্ব্বনিষিদ্ধ দেশ হইতে সংগৃহীত।" এখানেও বিষয়-বস্তু নির্দ্দেশের সম্পূর্ণ অভাব। যৌন সম্বন্ধ দু'রকমের হ'তে পারে। প্রথম শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত; দ্বিতীয় শাস্ত্র ও সমাজ-নিষিদ্ধ। শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত যৌন সম্বন্ধের আর এক নাম বিবাহ। বিবাহের নিষিদ্ধ দেশ, দেশ ও ধর্ম্মানুসারে—অসবর্ণ বিবাহ, সগোত্র বিবাহ, শ্যালিকা বিবাহ ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকার যৌন সম্বন্ধের নিষিদ্ধ দেশ —পরস্ত্রীগমন, Incestuous relation প্রভৃতি। এই উভয়বিধ নিষিদ্ধ দেশের কোন্ দেশের তাল তরু হতে তাঁদের নূতন রস সংগৃহীত হ'য়েছে, বিষয় নির্দ্দেশের অভাবে সেটা ঠিক বুঝা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে নাকি অদৃশ্য অক্ষরে ভালমন্দ নির্ব্বিচারে এই নব সাহিত্যিক-দলের সকলের সৃষ্ট সকলবিধ

রসকেই "অনিত্য" ব'লে "ভাসিয়ে" দিয়েছেন। এই নূতন রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) জানলে তা ভাস্‌বে কি ডুব্‌বে এবং কিসে ভাস্‌বে, তা' বৈজ্ঞানিক ব'লে দিতে পারবেন। এজন্য নরেশবাবুর বড় গোসা জন্মেছে। "সাহিত্য ধর্ম্ম"-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তবিধ অপরাধের কোনও রূপ প্রমাণ না পাওয়ায়, এ-পক্ষ লেখককে বিনীতভাবে নিবেদন ক'রতে হয় যে, নরেশবাবুর মানসিক উত্তাপের পরিমাণ ১০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী জেনেও, আমি তাঁর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশে একান্ত অসমর্থ। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের ডাক্তার জন্‌সনের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা ক'রে নরেশবাবু যে-রসের সৃষ্টি ক'রেছেন তা'র যথার্থ নিকাশের ক্ষেত্র মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা নয়, মানুষের মুখমণ্ডল।

সাময়িক উত্তেজনা মাঝে-মাঝে সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তা'র প্রকৃতি অভিভূত ক'রে ফেলে, এই সত্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্তের "পাঁঠা" ও "তপসে মাছ" সম্বন্ধীয় কবিতা দু'টির উল্লেখ করেছেন। নরেশবাবু অবশ্য তা'র প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ খুব সম্ভব ভালই হ'য়েছে—ঠিক মতো বুঝ্‌তে পারি নি ব'লে নিশ্চয় ক'রে কিছু ব'লতে পারলেম না। তবে আমি যদি নরেশবাবু হ'তেম, তা' হ'লে এইরূপ লিখতেম;—আজকাল কলিকাতার বাজারে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের মত নধর পুষ্ট কচি পাঁটার অভাব ঘটায় এবং ষ্টীমার প্রভৃতির উপদ্রবে ও Septic tank-এর ময়লার দৌরাত্ম্যে তপসে মাছের পূর্ব্বের স্বাদ না থাকায় উহারা রসসৃষ্টি ক'রতে অক্ষম হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডের "Roast pig"-এর স্বাদ বিন্দুমাত্র নূতন না হওয়ায়, উহা ইংরাজদের রসসৃষ্টির কাজ সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।" বোধ হয় এরূপ প্রতিবাদেও ফলের ইতর-বিশেষ বেশী কিছু হোতো না।

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের যৌবন কালের রচিত এবং নরেশবাবুর যৌবনকালে বহুল প্রচলিত, কিন্তু অধুনা বিস্মৃতপ্রায়, কবিতা ও গানের উল্লেখ ক'রে মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন—"তাহা হইতে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তা'র বিষয়-বস্তু রসহিসাবে অচল--ইহাও বলা যায় না যে, সে কবিতা ও গানগুলি সত্যসত্যই সার্থক রসরচনা নয়।" স্থায়ী বা নিত্য রসের আশ্রয়ীভূত বিষয়-বস্তুর অভাবই যে কবিতা ও গান অচল হওয়ার একমাত্র কারণ, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ তো কোথাও বলেন নি। উহা অন্যতম কারণ মাত্র। আরও পাঁচটা কারণে ওরূপ ঘটা সম্ভব। নরেশবাবুর মতো নৈয়ায়িকের ওরূপ ভুল হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।

নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের "বিদেশের আমদানী" বিশেষণটার জন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং সাভিমানে জানাচ্ছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে ওরূপ কটাক্ষপাত কোনও মতেই প্রত্যাশা করেন নি। আলো যে জানালা দিয়েই আসুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, যদি তাতে অন্তরের মণিরত্ন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে; আর পদ্ম সরোবরের নিজের দেওয়া আলোতে না ফুটে আকাশের আলোতে ফুটে উঠে ব'লে কেউ তাকে দোষ দেয় না। এই দুই উপমা দ্বারা নরেশবাবু নিজের কথাটা ফুটিয়ে তুলেছেন। কোনও দিকের কোনও বিশেষ জানালা বা কোনও বিশেষ স্থানের বিশেষ আলোর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনও পক্ষপাত আছে, এ-কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও কোনও দিন বলে নি। বরঞ্চ, পশ্চিমের জানালাটার দিকেই ইদানীং তাঁর কিছু পক্ষপাত হয়েছে, সম্প্রতি সেইরূপ অপবাদই পেট্রিয়টদের মুখে শোনা যায়। যা'হোক্ একথা বিশ্ববিদিত যে, তাঁর 'বিশ্বভারতীর' একমাত্র কাজ পৃথিবীর সব দেশের সব দিকের সকল জানালা দরোজা সম্পূর্ণ খোলা ও চিরদিন খুলে রাখা। তাঁর একমাত্র আপত্তি, সম্মোহন ক্রিয়াধীন (Hypnotised) ব্যক্তিরা যে-সে-জিনিষকে আলো, মণিরত্ন, পদ্মফুল প্রভৃতি ব'লে ভুল করেছে ব'লে। তিনি সেই সম্মোহনের নেশাটুকুই ছুটিয়ে দিতে চান।

তা'র পর নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক কৌতুহল নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় কটাক্ষের কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"তাছাড়া এ-সাহিত্যের সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা হইতে অনুমান হয় যে, এ-সাহিত্য কতকগুলি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত সত্যকে আশ্রয় করিয়া—কোনও রূপরসের বিচার না করিয়া--বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে।"

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

এদেশের লোকে বিজ্ঞান আলোচনা ক'রে থাকে, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞানলব্ধ তথ্য সাহিত্যে চালিয়ে থাকে, এদেশের লোকের সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর অপবাদের কথা রবীন্দ্রনাথ কোথায় করলেন? তাঁর নিজের কথাটা তো ঠিক অন্য-রূপ :---

"যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতুহল-বৃত্তি দুঃশাসন মূর্ত্তি ধ'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্র হরণের অধিকার দাবী করছে, সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে বাহিরে, বুদ্ধিতে ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনও খানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্ল্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দিবে?"

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ ক'রেছেন যে, কোনও এক বক্তা (শ্রীমান অমলচন্দ্র হোম নাকি?) তাঁর (নরেশবাবুর) বইগুলি সম্বন্ধে Criminolgy-র উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে অপবাদ দিয়াছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর একখানি মাত্র বই-এর একস্থলে মাত্র Criminolgy এই শব্দটী আছে এবং একটিমাত্র অবান্তর স্ত্রীচরিত্রে উক্ত বিজ্ঞানের কিছু আলোচনা আছে; এ-ছাড়া তাঁর আর কোনও বই-এ এ-জিনিষের নাম গন্ধও নাই।* রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর লক্ষ্যীভূত বইগুলির নামের ফিরিস্তী দিতেন তা'হ'লে বোধ হয়, নরেশবাবু প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে, উক্ত বক্তার মত রবীন্দ্রনাথের কথার ভিত্তিও অতি ক্ষীণ এবং অনিশ্চিত। ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে মানুষকে সাবধান ক'রে দেয়—যাকে ইংরাজীতে বলে Presentiment! বোধ হয় সেই জন্যই উক্ত নামের ফিরিস্তী তাঁর প্রবন্ধের একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ এ-কথা জানা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তা' তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথার ভিত্তি "অতি ক্ষীণ ও অনিশ্চিত" এ-প্রমাণ ক'রে দিতে পারতেন মনে ক'রেও নরেশবাবুর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় নি। কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্পর্দ্ধাসহকারে সম্মুখ সমরে আহ্বান ক'রেছেন, যাকে ইংরাজীতে Challenge করা বলে। সেই Challenge-এর একটু নমুনার রস পাঠক-দের পক্ষে উপভোগ্য হবে মনে হয়। "যে-সব লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি বিজ্ঞাপনের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা নয়—জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা যিনি অস্বীকার করিতে চান, নির্দ্দিষ্ট বিষয় হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া যদি তিনি তাঁর কথা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, তবে তার সম্যক উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।" যতগোল "সাহিত্য-পদবাচ্য" কথাটীর "বাচ্য" শব্দটুকু নিয়ে। যাহা যথার্থই—"সাহিত্য-পদবাচ্য" নয় তা'ও সাময়িক উত্তেজনাহেতু সাহিত্য ব'লে সমাদর লাভ ক'রে থাকে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি তো ঠিক ঐখানে। যা' যথার্থই জীবনের প্রত্যক্ষ-দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা' সত্যই সাহিত্যের রসপূর্ণ, তা'কে নরেশ-বাবুর কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বী খামখা কেন যে "বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা" ব'লে বস্‌বেন, সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পারলেম না। অন্ততঃ চোখে ঠিক দেখতে পায় এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নরেশবাবুর খাড়া করা উচিত ছিল; নতুবা তাঁর বিজয়-গৌরব যে ম্লান হ'য়ে পড়বে।

আর "প্রত্যক্ষ-দর্শন ও আলোচনার" উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেই যে তা' সাহিত্য হ'য়ে উঠ্‌বে এমন কোনও ধরাবাঁধা কথা নাই। সেই আলো ফেলে সব দেখা যায়, যাকে Wordsworth ব'লেছেন "The light that never was on sea or land"—সেই কলালোকের আলো--- আর যায় ভাবরসিকের অন্তরের রসে অভিষিক্ত হওয়া। নতুবা কলা-সৃষ্টি সম্ভব নয়। আজ এই কলা-সৃষ্টি সম্পর্কে নরেশবাবু যে, "আলোচনা" শব্দটীর পুনঃপুনঃ প্রয়োগ ক'রেছেন তাহা হাস্যজনকরূপে অপপ্রয়োগ। "আলোচনা" 'পর্য্যবেক্ষণের" ছোট ও "গবেষণা"র যমজ বোন্ এবং

*কেবল মাত্র ইহার দ্বারাই প্রতিপক্ষের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হয় না যে খবরে অভ্যস্ত জ্ঞান অজ্ঞাত সারে রচনায় প্রবেশ করতে পারে ও করে থাকে। তাহারা যদি বিদেশী বইএর অনুসরণ হয় তাহলে মূল গ্রন্থকার কি করেছেন না করেছেন সে কথা তাঁর জানা নাও থাকতে পারে।

"সিদ্ধান্তের" দিদি---সাহিত্য-কলার সহিত তা'র কোনওরূপ আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা নেই !

রবীন্দ্রনাথ "হাট ও হট্টগোল" সম্বন্ধে যে-কথা ব্যঙ্গাত্মকভাবে ব'লেছেন, সেটা যে তাঁ'র মতো দীর্ঘ-প্রবাসী ও নির্জ্জন নিবাসীর পক্ষে নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা তা' নরেশবাবু সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন ক'রে দিয়েছেন ! তবুও তো নরেশবাবু বোধ হয় খবর রাখেন না রবীন্দ্রনাথ একান্ত অবজ্ঞাভরেই হাটকে দূরে-দূরে রেখেই চ'লে থাকেন। তা' নইলে তিনি কদাচই লিখতেন না :---

"আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা
থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু সা।"

উপসংহারে নরেশবাবু মহাশয় হট্টগোল যে হাটের পূর্ব্বগামী, ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস হ'তে সে-কথা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন ক'রে (এ-দেশের ইতিহাসেও উদাহরণ মিলতো যেমন রামরূপ হাটের যাট হাজার বছর পূর্ব্বে রামায়ণরূপ হট্টগোলের সৃষ্টি) সর্ব্বশেষে জোর-গলায় ঘোষণা করেছেন :---

এ-দেশে যদি হাট নাও বসে থাকে, আমরা পশ্চিমের হাট হ'তে হট্টগোল সওদা ক'রে গ্রামোফোনে ধরে এনে বীণাপানির বাণীকুঞ্জে ও মানস সরোবরের কূলে পাঁচ পাঁচ হাত অন্তর একটী ক'রে বসিয়ে দিব। আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে আমাদের এই জন্মগত অধিকার (Birth-right) হ'তে কে আমাদের বঞ্চিত ক'রতে পারে ?

হায় রবীন্দ্রনাথ ! যা-না লেখার জন্য চতুরাননের নিকট এত মর্ম্মান্তিক কাতর মিনতি, চতুরানন 'শিরসি' কি ঠিক্ তাই-ই লিখে বসলেন !

সঞ্চয়

খসম লাইগ্যা

পিয়ারের খসম, খসম আমার আইলানা
কইয়া গেলা কাইলার হাটে যাই।
তিন দিন বাদে আস্‌বে গো খসম
আমার মান্‌ষের উদ্দেশ নাই।
কোন বাঘ ভালুকের দ্যাশে বা গ্যালা
তুমি জান বাঁচাইতে পাল্লানা॥
যখন আমার মন হয় উতালা,
ঘরের পাশে কাঁদি গো ব'সে ঐ কদুগাছতলা,
ও আমার কদু গাছে ধর্‌ছে গো কদু
তুমি ছালুম চাইখা গ্যালানা॥

যখন আমি গোসল করবার যাই,
আমার দুচোখ দিয়ে ঝরে গো পানি
আমার খসম বাড়ী নাই।
তোমার বিবিজানের বিচ্ছেদের ছুরাত্
তুমি আপন চক্ষে দ্যাখ্‌লানা॥

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

খসম—স্বামী, কাইলা—সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম, ছালুন—ব্যঞ্জন, ছুরাত্—রূপ।

এই পল্লী-গানটী জিলা পাবনা, দৌলতপুর গ্রাম নিবাসী বন্ধুবর আব্দল কাদের সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। ইহা সিরাজগঞ্জের কৃষক ও মজুরগণের মুখে প্রায়ই শ্রুত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় ইহা সত্য ঘটনা অবলম্বনে জনৈক অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা রচিত। ইহার মধ্যে গ্রাম্য বিরহ-বেদনার ভাব ও ছবি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পারুল-প্রসঙ্গ

"ও কি তোমাদের মত উপায় ক'রে খাবে নাকি ?"

"উপায় ক'রে না খাক্—তা' ব'লে মাছ দুধ চুরি ক'রে খাওয়াটা—"

"আমার ভাগের মাছ দুধ আমি ওকে খাওয়াব !"

"সে ত খাওয়াচ্ছই—তা'ছাড়াও যে চুরি করে। এ রকম রোজ রোজ—"

"বাড়িয়ে বলা কেমন তোমার স্বভাব। রোজ রোজ খায় ?"

"যাই হোক্—আমি বেরালকে মাছ দুধ গেলাতে পারব না।. পয়সা আমার এত সস্তা নয়।"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বিনোদ সমীপবর্ত্তিনী মেনি মার্জ্জারীকে লক্ষ্য করিয়া চটিজুতা ছুঁড়িল। মেনি একটি ক্ষুদ্র লম্ফ দিয়া মারটা এড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পারুলবালাও চক্ষে আঁচল দিয়া উঠিয়া গেলেন। বিনোদ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ আর এ-ভাবে থাকিবে ? অবশেষে তাহাকেও উঠিতে হইল। সে আসিয়া দেখে পশ্চিম বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অভিমানে পারুল বালা ভূমি-শয্যা লইয়াছেন।

বিনোদ জিনিসটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে একটু হাসিয়া বলিল—"কি করছ ছেলেমানুষি ! আমি কি সত্যি সত্যি তোমার বেরাল তাড়িয়ে দিচ্ছি !"

পারুল নিরুত্তর।

বিনোদ আবার কহিল—"চল চল – তোমার বেরালকে মাছ দুধই খাওয়ান যাক্।"

পারুল—"হ্যাঁ, সে তোমার মাছ দুধ খাওয়ার জন্যে ব'সে আছে কি না ? তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না ?"

"আচ্ছা আমি খুঁজে আন্‌ছি তাকে—কোথায় আর যাবে ?" বিনোদ লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া গেল।

এদিক ওদিক রাস্তা ঘাট জামগাছতলা প্রভৃতি চারিদিক খুঁজিল, কিন্তু মেনির দেখা পাইল না। নিরাশ হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই শুইয়া আছে !—"কই দেখ্‌তে পেলাম না ত বাইরে। সে আস্‌বে ঠিক। চল, ভাত খাইগে চল।"

"চল, তোমাকে ভাত দিই, আমার আজ ক্ষিদে নেই।"

"Hunger strike করবে না কি !"

পারুল আসিয়া রান্নাঘরে যাহা দেখিল—তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—কড়ায় একটুও দুধ নাই—ভাজামাছগুলি অন্তর্হিত—ডালের বাটিটা উল্‌টান।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া পারুল ত অপ্রস্তুত !

বিনোদ এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করা নিরাপদ নয় ভাবিয়া যাহা পাইল খাইতে বসিয়া গেল।

পারুলবালাও খাইলেন !

উভয়ে শুইতে গিয়া দেখে মেনি কুণ্ডলি পাকাইয়া আরাম করিয়া তাহাদের বিছানায় ঘুমাইতেছে।

"বনফুল"

ভার্য্যা

(আসিয়াছেন)

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

৬

দেওঘরের কার্স্‌টেয়ার্স্‌ টাউনে সুকুমার বসুর গৃহ। সুকুমারের গৃহ প্রশস্ত, কিন্তু সে হিসাবে পরিজনবর্গ অল্প। বিধবা জননী, সে নিজে, তাহার স্ত্রী, দুটি শিশু পুত্র এবং অনূঢ়া ভগিনী শোভা—এই লইয়া তাহার সংসার।

ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ই, আই রেলওয়ের কোনো ইংরাজ উচ্চ-কর্ম্মচারীকে মধুপুর রেল ষ্টেশনের তিন চার মাইল দূরে লাইনের ধারে সর্প দংশন করে। উক্ত কর্ম্মচারীর সঙ্গে ছিলেন সুকুমারের পিতামহ মহেশচন্দ্র। তিনি রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে সামান্য বেতনের চাকরী করিতেন। যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে সাহেব অভিভূত হইয়া পড়িলে প্রত্যুৎপন্নমতি মহেশচন্দ্র সাহেবের আহত স্থলের ঊর্দ্ধে দৃঢ়রূপে রজ্জু বাঁধিয়া, আহত স্থল ছুরী দিয়া কাটিয়া, তথায় মুখ দিয়া কতকটা রক্ত শোষণ করিয়া ফেলিয়া ট্রলি করিয়া, সহেবকে মধুপুরে লইয়া আসেন। সাহেব প্রাণ রক্ষা পাইয়া মহেশচন্দ্রের উপকারের কথা ভুলিলেন না। সৎসাহস ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার স্বরূপ মহেশচন্দ্র কোম্পানী হইতে পারিতোষিক লাভ ত করিলেনই, অধিকন্তু সামান্য বেতনের চাকরি হইতে মুক্তি পাইয়া রেলওয়ের অধীনে ঠিকাদারীতে প্রবেশ করিলেন। উপরওয়ালার কৃপাদৃষ্টির সহিত লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি মিলিত হইল; অল্পকালের মধ্যে মহেশচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেওঘরে বাড়ী করিলেন। একমাত্র পুত্রের মতি-গতি উপলব্ধি করিয়া মহেশচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় ঠিকাদারী বন্ধ করিলেন, এবং উপার্জ্জিত বিষয়-সম্পত্তির এরূপ পাকা ব্যবস্থা করিলেন যাহার ফলে পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল ব্যয় এবং অপচয় সহ্য করিয়াও পৌত্র সুকুমারের হস্তে এমন অর্থাবশেষ পৌঁছিয়াছে যদ্দ্বারা, সাড়ম্বরে না হইলেও, স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা চলিয়া যাইতে পারে।

মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর পুত্র বিহারীলাল সুকুমারের অধ্যয়নের অছিলায় কলিকাতায় মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটি বাসা ভাড়া করিয়া অসঙ্গত জীবন যাপনের সুবিধা করিলেন; এবং আট দশ বৎসর বিনা অগ্নিতে পত্নী গিরিবালাকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে একদিন যখন উৎকট মদ্যপানের ফলে ইহ-লীলা শেষ করিলেন, ততদিনে সুকুমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি লাভের প্রবেশ-দ্বারে উপর্য্যুপরি তিনবার মাথা ঠুকিয়াছিল। স্বামীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত এবং পুত্রের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া গিরিবালা কলিকাতার বাস তুলিয়া দিয়া দেওঘরের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। এ ঘটনায় ক্ষতি হইল একমাত্র শোভার; কারণ তাহার যাহা বন্ধ হইল, বাস্তবিকই তাহা লেখা-পড়া,—তাহার দাদার মত লেখা-পড়ার বৃথা অভিনয় নয়।

কলেজে অধ্যয়ন কালে সহপাঠী বিনয়কুমারের সহিত সুকুমারের পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্ব হইতে সৌহৃদ্যে এবং সৌহৃদ্য হইতে সখ্যে পরিণত হইয়া অবশেষে এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, বহুকালব্যাপী নানাবিধ বিচ্ছেদ, ব্যতিক্রমেও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সুকুমারের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া বিনয় প্রায় মাসাবধি সুকুমারের গৃহে অতিথি হইয়া যাপন করিতেছে। দেওঘরে আসিয়া দুই-তিন দিন পরেই সে স্বতন্ত্র বাসস্থানের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, কিন্তু সুকুমারের পরিবারে সে কথা একেবারেই আমল পায় নাই। গিরিবালা বলিয়াছিলেন, "বাবা, সুকুমার আমার একমাত্র ছেলে। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্মে তার দোসর হ'তে তা হ'লে কি আমি সুখী হতাম না? তোমাকে যে আমি পেটে ধরিনি, এইটুকুই আমার দুঃখ!" সুকুমারেরর স্ত্রী শৈলজা বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরপো, আপনি এ-কথা প্রমাণ করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন যে, আপনি আমাদের আত্মীয় নন?" সুকুমার হাসিয়া বলিয়াছিল, "আলাদা বাসা যদি নিতান্তই নাও বিনু, তাহ'লে এমন বড় দেখে নিয়ো যাতে আমরাও সকলে গিয়ে তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারি। তাতে আশা করি, তোমার আপত্তি হবে না?" অগত্যা বিনয়ভূষণকে স্বতন্ত্র বাসার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। গৃহ সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ চামেলী-লতার ঝাড়ের পাশে, মধ্যে একটা বেতের টেবিল লইয়া, বিনয় ও সুকুমার চায়ের প্রত্যাশায় মুখোমুখী বসিয়া গল্প করিতেছিল। পাশে একটা উঁচু চার-কোণা কাঠের টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। দুই হাতে দুই প্লেট্ খাবার লইয়া আসিয়া বেতের টেবিলের উপর রাখিয়া শোভা টি-পটের ঢাক্‌না খুলিয়া চামচ্ দিয়া চায়ের জল নাড়িয়া দেখিল, জল প্রস্তুত হইয়াছে। তখন সে চা তৈয়ারী করিতে ব্যাপৃত হইল।

অদূরে একটা ইজেলের উপর ক্যান্‌ভাসে শোভার ছবি খানিকটা অঙ্কিত রহিয়াছে,-- যতটা কমলার আঁকা হইয়াছে, প্রায় ততটাই। যে-দিন সকালে কমলার ছবি আঁকা সুরু হয়, সেইদিন বৈকাল হইতেই বিনয় শোভার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করে। শোভার ছবি আঁকিবার প্রস্তাবকে নিতান্ত অকারণ পরিশ্রম ও অনাবশ্যক ব্যয় বলিয়া সকলে প্রবলভাবে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু বিনয় কাহারো কথা শুনে নাই। সুকুমার যখন বলিয়াছিল, "অনর্থক শোভার ছবি এঁকে কি লাভ হবে বিনু?" তখন সে সহাস্য মুখে উত্তর দিয়াছিল, "আর কিছু লাভ হোক আর না হোক, দুটো ছবির মধ্যে কোন্‌টা ভাল হবে তা ত' বোঝা যাবে—যেটা অনর্থক আঁকব সেটা,--না, যেটা অর্থের জন্য আঁক্‌বো, সেটা।"

এইরূপে বিনয়ের দুইটি ক্যান্‌ভাসে সকালে বিকালে ধীরে ধীরে দুইটি ফুল ফুটিয়া উঠিতেছিল। একটিকে যদি রজনীগন্ধা বলিতে হয়, তাহা হইলে অপরটি নিশ্চয়ই অপরাজিতা;—কারণ শোভার দেহের বর্ণ ঘন-পল্লবাশ্রিত ছায়ার মত শ্যামল। কিন্তু পুষ্পোদ্যানে অপরাজিতার যে স্থান, সৌন্দর্য্যের স্তর-মালায় শোভার স্থান ঠিক ততটাই উচ্চে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়,—"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ",—মনে হয়, গঠনের সৌষ্ঠব দেহের বর্ণকে এতখানিও পরাজিত করিতে পারে!

"বিনুদা, আর এক পেয়ালা চা দোবো?"

শূন্য পেয়ালাটা শোভার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বিনয় বলিল, "নিশ্চয় দেবে। এত ভাল চা ক'রে মাত্র এক পেয়ালা দিলে মহাপাপ হয় তা জেনো!"

শোভার মুখে সলজ্জ মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। টি-পট্ হইতে বিনয়ের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে সে বলিল, "কোনো দিনই ত আপনি বলেননা যে খারাপ হয়েচে।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "তার একমাত্র কারণ কোনো দিনই খারাপ হয় না। একদিন একটু খারাপ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ আমাকে দাও?"

শোভা বলিল, "খারাপ হ'লেও আপনি সুখ্যাতি করবেন।"

মুখে অত্যধিক বিস্ময়ের ভাব আনিয়া বিনয় বলিল, "খারাপ হ'লেও সুখ্যাতি কর্‌বো? কেন, বলত শোভা? —আমাকে এতটা কপটচারী ব'লে কেন তোমার মনে হল?"

আবার শোভার মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "এর মধ্যে কয়েকদিন চা খারাপ হয়েছিল, কিন্তু সে-সব দিনেও আপনি সুখ্যাতি করেছিলেন।"

শোভার উত্তর শুনিয়া সুকুমার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এর আর জবাব নেই!"

বিনয় বলিল, "জবাব আছে ভাই।" তাহার পর শোভাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শোভা!"

সুকুমারের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে শোভা বলিল, "বলুন।"

"একটা কথা আছে জান ত'?

"কি কথা?"

"আপ্ রুচি খানা?"

"জানি; আপনিই একদিন বলেছিলেন।"

"তা হ'লে তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি মিল্বে, এর কি মানে আছে বল? তোমার যেদিন খারাপ লেগেছিল, আমার হয় ত সে দিন ভালো লেগেছিল।"

শোভা বলিল, "আমার রুচির সঙ্গে আপনার রুচি যদি না মেলে তা হ'লে আমার যে-দিন ভালো লাগে সেদিন ত আপনার খারাপ লাগা উচিত। কিন্তু সেদিনও আপনার ভাল লাগে কেন?"

সুকুমার হাসিয়া উঠিয়া সোল্লাসে বলিল, "চমৎকার! এর সত্যিই কোনো জবাব নেই!"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "সেদিন আমার ভাল লাগে চা ভাল হয় ব'লে—আর অন্যদিন আমার ভাল লাগে তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি না মিল্তে পারে ব'লে।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শোভা বলিল, "তা হ'লে আপনার খারাপ লাগ্বে কোন্ দিন?"

"বোধহয় এমন কোনো দিন, যে-দিন তোমার না লাগ্বে ভালো, না লাগ্বে খারাপ!" বলিয়া বিনয় উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুকুমার বলিল, "হারলে চল্বেনা শোভা! এর একটা ভালো রকম উত্তর দেওয়া চাই।"

কিন্তু উত্তর দিবার অবসর পাওয়া গেল না, বাহিরে রাজপথে গেটের সম্মুখে একটা বৃহৎ মোটরকার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দৃষ্টি পড়িল প্রথমে শোভার; সে বলিল, "দাদা, দেখ কারা এসেছেন।"

সুকুমার ও বিনয় যখন চাহিয়া দেখিল তখন দ্বিজনাথ মিত্র গাড়ীর দ্বার খুলিয়া অবতরণোদ্যত হইয়াছেন, এবং কমলা গাড়ীতে বসিয়া আছে।

"সুকু, দ্বিজনাথবাবুরা এসেছেন, তুমি ডেকে আন্বে চল" বলিয়া বিনয় ত্বরিতপদে গেটের দিকে অগ্রসর হইল।

বিনয় ও সুকুমার সাদর অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিজনাথ ও কমলাকে লইয়া আসিল।

শোভা দ্বিজনাথকে প্রণাম করিয়া কমলার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আসাতে কত-যে খুসী হয়েছি তা আর কি বলব! চল ভাই, বাড়ীর ভেতর চল।"

কমলা সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি ত তোমার কথা ঠিক জান্তাম না ভাই। আমিও তোমাকে হঠাৎ দেখে ভারী খুসী হয়েছি।" তাহার পর অদূরবর্ত্তী ইজেলের উপর ক্যান্ভাসে দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "ও ছবি বিনয় বাবু আঁকচেন বুঝি?—চলত দেখে আসি।"

ছবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল, "তোমার ছবি?"

"হ্যাঁ।"

একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে ক্ষণকাল দেখিয়া কমলা বলিল, "চমৎকার হচ্ছে!"

মৃদু হাসিয়া শোভা বলিল, "চমৎকার হচ্ছে?—তা কি ক'রে হবে ভাই? আসলই যে চমৎকার নয়।"

একবার নিমেষের জন্য শোভাকে নিরীক্ষণ করিয়া কমলা বলিল, "আসলটি ত' চমৎকার!"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "সে কি কমলা? কালো তোমার ভালো লাগে?"

কমলা হাসিয়া বলিল, "তোমার মত কালো ভালো লাগে।"

শোভা বলিল, "তোমার মত সুন্দরের মুখ থেকে এ কথা শুন্লেও একটু ভরসা হয়!" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মৃদু হাসিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"যে জিনিস আমার নিজের মধ্যে নেই আমার বাপ-মা স্নেহ ক'রে আমার সেই নাম দিয়েছেন;—আমার নাম শোভা।" বলিয়া শোভা হাসিতে লাগিল।

কমলা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, তোমার বাপ-মা বুঝেই তোমার নাম দিয়েছিলেন। তোমাকে দেখলে মনে হয় ওই জিনিসটাই তোমার খুব বেশী পরিমাণে আছে।" তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "শোভা, তোমার ছবিটা বিনয়বাবু কবে আরম্ভ করেছেন?"

শোভা বলিল, "যেদিন সকালে তোমার ছবি আরম্ভ করেছেন, ঠিক সেই দিন বিকেলে।"

একটু বিস্মিত স্বরে কমলা বলিল, "ঠিক একই দিনে? কেন, বলত?"

শোভা বলিল, "তাঁর খেয়াল! বল্‌লেন, দুটো ছবি একসঙ্গে আরম্ভ ক'রে দেখা যাক্ কোনটা ভালো হয়। এ-ও কি দেখ্‌তে হবে ভাই? ভালো কোন্‌টা হবে তা'ত বোঝাই যাচ্ছে।"

কমলা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। আর কিছু-ক্ষণ শোভার ছবি দেখিয়া বলিল, "চল ভাই, বাড়ীর ভেতর যাবে বলছিলে,—চল।"

যাইতে যাইতে শোভা বলিল, "তুমি আমার কথা আজ জান্‌লে; আমি কিন্তু এ কয়েক দিন ধ'রে তোমার কত কথাই শুনেছি।"

কমলা সবিস্ময়ে বলিল, "আমার কথা?—কার কাছে? —বিনয় বাবুর কাছে?"

"হ্যাঁ, বিনুদার কাছে।"

"কিন্তু তিনি—তিনি আমার কথা বিশেষ কিছু জানেন না ত।—"

"সে কি আর তেমন কোনো কথা?—এম্‌নি সব।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "ও।"

বারাণ্ডায় উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহারা দুইজনে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন দ্বিজনাথ সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের বাড়ীর নাম 'কোব্রা হাউস্' হ'ল কেন? নামটি একটু অ-সাধারণ ব'লে বাড়ী খুঁজে বার করতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি।"

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে কাহিনী বলা হইয়াছিল, সুকুমার তখন সেই কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

"নটরাজ"

শেষ মিনতি

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
কোন্ শূন্য হ'তে এল কাব বাবতা ?
নযন কিসেব প্রতীক্ষাবত,
বিদায় বিষাদে উদাস মত,
ঘন কুন্তল-ভাব ললাটে নত
ক্লান্ত তডিৎ-বধু তন্দ্রাগতা।
কেশব-কীর্ণ কদম্ব বনে,
মর্ম্মবি' মুখবিল মৃদু পবনে,
বর্ষণ-হর্ষ-ভবা ধবণীব
বিবহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য্য মানো, ওগো, ধৈর্য্য মানো,
ববমাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান,
ফুলগন্ধ-নিবেদন-বেদন সুন্দব
মালতী তব চবণে প্রণতা॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব — স্ববলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্ণা ধা I
কে ন

II ধপা -ধপা পগা মা। পা -া পণা পধা I পা -া -া -া। -গা -মা -পা -ধা I
পা ন থ এ চ ন চ ল তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। ধপা -র্সা সণা ধা I
০ ০ কে ন

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I পধা ধপা পগা মা। পা -া পণা ণধা I পা -া -া -ধপা। -মপা পমা জ্ঞা রা I
পা ন্ থ এ চ ন্ চ ল তা ০ ০ ০০ ০ ০ কে ন

I রসা -া রা রা। রা -গা মা মা I পা -া -া -া। -া -া না -া I
পা ন্ থ এ চ ন্ চ ল তা ০ ০ ০ ০ ০ কো ন্

I না -া নর্সা র্সনা। র্সা -া র্সনা র্সা I র্সনাঃ -র্সর্রঃ র্রর্সা ণধা। র্সণা -া ধা পা II
শূ ০ ন্য হ তে ০ এ ল কা র্ বা র তা ০ "কে ন"

-া -া I

II পমা ণা ধা ধা। ধা -া ধা না I না -া র্সা র্সনা। র্সা -া র্সা -না I
ন য় ন কি সে ০ র প্র তী ০ ক্ষা র ত ০ বি ০

I র্সা -া -জ্ঞা -া। -া -া -া জ্ঞর্রা I র্রনা -া র্সা -া। -া -া না -র্সা I
দা ০ ০ ০ ০ ০ য়্ বি যা ০ দে ০ ০ ০ উ ০

I সরা -া -া -ধা। -র্সণা -া -া ধা I ধপা -া -া -া। -া -া -া -া I
দা ০ ০ ০ ০ ০ স্ ম ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পমা ণা ধা ধা। ধা -া ধা না I না -া র্সা র্সনা। র্সা -া র্সা -না I
ন য় ন কি সে ০ র প্র তী ০ ক্ষা র ত ০ বি ০

I র্সা -া -জ্ঞা -া। -া -া -া জ্ঞর্রা I র্রনা -া র্সা -া। -া -া না -র্সা I
দা ০ ০ ০ ০ য়্ বি ০ যা ০ দে ০ ০ ০ উ ০

I র্সর্া -া -া ধ্া । -সণা -া -া ধা I ধপা -া -া -া । -া -া পা না I
দ্রা ० ० ० ० ० স্ ম ত ० ० ० ० ० ঘ ন

I না -া না না । না -া না না I না -া নসা র্সনা । র্রর্সা -া পা না I
কু ন্ ত ল ভা ० র ল লা ० টে ন ত ० ঘ ন

I না -া না না । না -া না না I না -া নর্সা র্সনা । র্রর্সা -া -া -া I
কু ন্ ত ল ভা ० র ল লা ० টে ন ত ० ० ०

I সা -া সা সা । রা রা রগা গরা I গা -া মা পা । পগা -মা -পা -ধা I
ক্লা ন ত ত ড়ি ত ব ধূ ত ন্ দ্রা গ তা ० ० ০

I ধপা -র্সা -া -া । -া -া ণা ধা I
० ० ० ० ० ० "কে ন"

-া -া I

II সা -া সা সা । সরা -া গা গরা I গা -া মা মগা । মা -া -া -া I
কে ० শ র কী র্ ণ ক দ ম্ ব ব নে ० ०

I মা -া মপা পমা । পা পা পধা ধপা I ধা ধা ণা ণা । ণধা -া -া -া I
ম র্ ম রি মু খ রি ল মৃ দু প ব নে ० ० ०

I সা -া সা সা । সরা -া গা গরা I গা -া মা মগা । মা -া -া -া I
কে ० শ র কী র্ ণ ক দ ম্ ব ব নে ० ० ०

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I মা -া মপা পমা । পা পা পধা ধপা I ধা ধা ণা ণা । ণধা -া -া -া I
ম র্ ম রি মু খ রি ল মৃ দু প ব নে ০ ০ ০

I না -া না -া । না -া না না I ধনা -া নর্সা র্সনা । র্সর্সা -া -া -া I
ব র্ ষ ণ হ র্ ষ ভ রা ০ ধ র ণী ০ ০ র্

I পা ধা ণা র্রা । র্সা -া ণধা পা I পধা ধপা মা মগা । মা -া -া -া I
বি র হ বি শ ঙ্ কি ত ক রু ণ ক থা ০ ০ ০

I সা -া র্সর্গা র্গা । গা -া গা র্গা I র্গর্মা -র্মা র্গর্মা র্গা । র্রসা -া না র্সা I
ধৈ ০ র্য্য মা নো ০ ও গো ধৈ ০ র্য্য মা নো ০ ব র

I র্সনা -া সা র্সনা । র্সা -া না সা I র্সনাঃ -সরঃ র্রর্সা ণধা । র্সণা -ধা পা ধা I
মা ০ ল্য গ লে ০ ত ব ত য়্ নি ম্লা ন ০ আ জো

I ণা -ধর্রা -র্রর্সা ণধা । ধপা -া মা গা I মা -ধা ধা ধা । ধা -া পধা মা I
হ য় নি ম্লা ন ০ ফু ল গ ন্ ধ নি বে ০ দ ন

I ধা -ণা ণধা র্সা । র্সণা -ধা পা পা I পা -া পধা ধপা । পধা ধপা মা গা I
বে ০ দ ন সু ন্ দ র মা ০ ল তী ত ব চ র

I মা -া পা পা । পগা -মা -পা -ধা I -পা -র্সা -া -া । -া -া ণা ধা IIII
ণে ০ প্র ণ তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "কে ন"

সহযোগী সাহিত্য

যোহান বোয়ার

হুমায়ুন কবির

সাহিত্যের মাপকাঠি লইয়া অনেক বিচার চলিয়াছে ও চলিবে। কেহ বলিয়াছেন সাহিত্য কেবলমাত্র প্রকাশেই সার্থক, সৌন্দর্য্য আপনাতেই পরিপূর্ণ, বাস্তব জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে সৌন্দর্য্যের কোন নিরপেক্ষ বা absolute লক্ষণ নাই। একজনের চক্ষে যাহা সুন্দর, আরেকজন তাহাকেই কুৎসিত বলিতে পারেন, দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সৌন্দর্য্য বোধেরও ভেদ পরিলক্ষিত হয়। আবার কেহ বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের কাজ জীবনকে প্রতিফলিত করা মাত্র, সংসারের সকল ভাল মন্দ, সকল সুন্দর-অসুন্দরেরই স্থান সাহিত্যের প্রকাশের মধ্যে রহিয়াছে।

কেবলমাত্র জীবনের প্রতিবিম্ব দিয়াই সাহিত্য-রচনা যদি সম্ভব হইত, তবে সে সাহিত্য সৃষ্টির কোন সার্থকতা থাকিত না। কারণ আমরা বাস্তবজগতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সুন্দর ও অসুন্দরের সহস্র প্রকাশ প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, সেই প্রত্যক্ষ প্রকাশকে ছাড়িয়া সাহিত্যের পরোক্ষে প্রকাশ লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এখানে রসবেত্তা আসিয়া বলিবেন যে, জীবনের এই ভালমন্দের ছবি যখন আবেগ ও কামনার রঙে রঞ্জিত হয়, সুখ-দুঃখের স্পর্শ লাগিয়া হাসির মাণিক ও অশ্রুর মুকুতায় যখন তাহা ঝলমল করিতে থাকে, তখনই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। তাঁহার মতে সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব মাত্র নহে—তাহা জীবনের চিত্র। আলোক-চিত্রের সহিত কলাচিত্রের প্রভেদ এইখানে যে আলোক-চিত্র বিশ্বস্তভাবে সকল কিছুই প্রতিফলিত করে, মূলের সঙ্গে কিছুই যোগ বা বিয়োগ করে না। কিন্তু সে প্রতিলিপির মধ্যে জীবনের স্পর্শ নাই। কিন্তু কলাচিত্র মানুষের অন্তরের বেদনা-আনন্দের রঙে রাঙিয়া বাহির হইয়া আসে, সে ছবিতে হয়ত বাস্তবের কোন কোন অংশ বাদ পড়িতে পারে, কোথাও আলোক হয়ত একটু বেশী উজ্জ্বল হইয়া ধরা দেয়, কোথাও ছায়া গভীরতর হইয়া প্রকাশ পায়—কিন্তু সেখানে প্রাণের স্পর্শ রহিয়াছে। এই প্রাণের স্পর্শ অনুভূতির তীব্রতা ও আবেগের প্রাচুর্য্যেই সাহিত্যের প্রাণ।

কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র ভাবাকুল প্রাণীই নহে—মানুষ বুদ্ধিজীবিও বটে। তাই কেবল মাত্র তাহার আবেগ ও অনুভূতিতে সাড়া দিয়া সাহিত্য কখনোই পূর্ণ হইতে পারে না। ইচ্ছা, আবেগ ও জ্ঞান লইয়া মানুষের জীবন। কোন বিষয়কে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিলে আমরা তাহার জ্ঞান লাভ করি ; এই জ্ঞানের ফলে যে সুখ বা দুঃখ অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, তাহাই আবেগের রঙে তাহাকে রঞ্জিত করে। সুখ আমরা পাইতে চাহি, দুঃখ আমরা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করি, তাই সুখ-দুঃখ অনুভূতির ফলে আমাদের ইচ্ছার জন্ম। ইচ্ছার তৃপ্তিতেই সুখ, অপরিপূর্ণ কামনাতেই জীবনে বেদনার আগুন জ্বলিয়া ওঠে। মানুষের সকল কামনা এবং ইচ্ছা যদি সহজ এবং সরল হইত, তবে জীবনে এত বেদনা পুঞ্জিত হইয়া উঠিত না, হয়ত বা জীবনের গভীরতা ও মাধুর্য্যও আমরা এমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। আমরা যে কি চাই, নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি না, হয়ত অন্তরের একদিক যাহা কামনা করিয়া উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ের আর এক দিক তাহারি বিতৃষ্ণায় তাহাকে এড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। হয়ত হৃদয় যাহা চাহে, বুদ্ধি তাহাকে অস্বীকার করে, আবেগের সঙ্গে জ্ঞানের সংঘর্ষে জীবন কণ্টকিত হইয়া উঠে।

হুমায়ুন কবির

ধর্ম্মবোধ এবং নীতিজ্ঞান, সামাজিক সংগঠনের ফলেই হোক, অথবা মানুষের অন্তর্নিহিত বলিয়াই হোক, আজ আমাদের জীবনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার লক্ষণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহকে বিধি ও নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা। হয়ত প্রবৃত্তি যাহা কামনা করিতেছে, নীতিজ্ঞান আসিয়া তাহা বর্জ্জন করিতে বলিতেছে, ঘটনা সংস্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিবোধ ও প্রবৃত্তির ব্যাকুলতা দুইই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কখন যে কোনটী কাহাকে ছাপাইয়া যায় কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারে না। প্রবৃত্তিসমূহের কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিলে নীতি-বোধের প্রকাশও আর সহজ থাকে না—আমরা সে-রকম লোককে বলি রুচিবাগীশ। আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় যে নীতি ও ধর্ম্মবোধকে অস্বীকার করে, সেও সহজ পথ বাছিয়া লইয়া পশুত্ব অর্জ্জন করিয়া বসে। এই দুইয়ের সংঘাত হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া, তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য সম্পাদন মানবজীনের কঠিনতম সমস্যা।

এইখানে সাহিত্যে নীতির কথা উঠিয়া পড়ে। কেহ কেহ বলিবেন যে, সাহিত্যকে যদি কেবল নীতিমূলকই হইতে হয়, তবে সাহিত্য এবং নীতিশিক্ষার মধ্যে প্রভেদ কোথায়? নীতিশিক্ষা দানই যদি আর্টের চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে শিশুপাঠ্য নীতিকথার চেয়ে আর্টের শ্রেষ্ঠতর প্রকাশ আর কিছুই নাই, কারণ তাহাতে নীতির প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটী কথাও নাই। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে বাহুল্যটুকু সমস্ত হৃদয়কে মাধুর্য্যে পরিপ্লুত করিয়া দেয়, তাহাই আর্টের প্রাণ। আর্টের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা দান নহে। রূপকার ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবনের এমন একটী সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন, যাহাতে আমাদের সকল হৃদয় বেদনায় দুলিয়া উঠে, আনন্দে সাড়া দেয়, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিতে চায়! Galsworthy বলিয়াছেন যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আনন্দ-বেদনায় জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই সেই সমস্যার মধ্যে একটী সত্য নিহিত রহিয়াছে। সাহিত্যিকের কাজ সেই সমস্যাকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা যাহাতে সেই অন্তর্নিহিত সত্যটী প্রকাশ হইয়া পড়ে। যখনই আমরা বলি যে সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্বমাত্র নহে, তাহা সাহিত্যিকের অন্তরের সুখ-দুঃখের রঙে রঞ্জিত জীবনের ছবি, তখনই আমরা স্বীকার করিয়া লই যে সাহিত্যিকের নীতিবোধ, তাঁহার সহানুভূতি এবং তাঁহার বিচারবৃত্তি এই সমস্যাকে এমন ভাবে সাজাইবে যাহাতে আমরা তাহার মধ্যে তাঁহার অন্তরের প্রকাশ দেখিতে পাইব। জীবনের ছবি আঁকিয়া শিক্ষাদান সাহিত্যিকের ধর্ম্ম, নীতি প্রচার করিতে গেলে সাহিত্যের অপকর্ষ ব্যতীত নীতিরও কোন সুবিধা হইবে না।

বোয়ারের সকল রচনাও তাই উদ্দেশ্য মূলক। নীতিশিক্ষাদান করিতে বোয়ার সাহিত্য রচনা করেন নাই; কিন্তু যে আদর্শের আলোকে তাঁহার সকল জীবন উদ্ভাসিত, মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্বন্ধেই তিনি সেই প্রকাশ মূর্ত্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাই তাঁহার সকল রচনায় তাঁহার জীবনের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন,—মানুষের অন্তরের আবেগ, আদর্শের ক্ষুধা ও বুদ্ধির সাধনা সকলি তাঁহার সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। তিনি ঔপন্যাসিক, তাই মানুষের হৃদয়কে তিনি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন দুই দিক দিয়া। হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তি আমরা যেমন তাঁহার রচনায় খুঁজিয়া পাই, ঠিক তেমনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তাঁহার রচনায় চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করে। আধুনিক জগতে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাকে তিনি আর্টের জগতে নূতন রূপ দিয়াছেন; যাহা কেবলমাত্র বুদ্ধির শুভ্র-শীতল আলোকে আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহিতাম, তাহাকেই তিনি জীবনের অনিশ্চয়তা এবং জীবনের গতিভঙ্গি দিয়া, আশা আশঙ্কা আবেগের অস্থির আলোকে নূতন করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। জীবনের সত্য নির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট বা সীমাবদ্ধ নহে, হইতে পারে না। কারণ জীবন গতিশীল, এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনন্ত চাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে এমন

সত্য কী আছে যাহাকে ধরিয়া আমাদের জীবনের গতি আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি,—তাহারি সন্ধানে বোয়ারের সাহিত্য-সাধনা প্রাণময়, ব্যাকুল, চঞ্চল।

যোহান বোয়ার

[কল্লোলের সৌজন্যে]

বহুদিন পর্য্যন্ত উপন্যাস বলিতে কেবলমাত্র প্রেম কাহিনীই বুঝাইয়াছে। দুইটী তরুণ নরনারী পরস্পরকে ভালবাসিল, এবং ঘটনা সংস্থান বা সমাজের বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া তাহাদের মিলন হইল কি, হইল না,—এক সময় ইহা ছাড়া যে উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় আর কিছু থাকিতে পারে, তাহা কেহ ভাবে নাই। অন্তরের আবেগের কাহিনী কহিয়া আমাদের হৃদয়ের

হুমায়ুন কবির

অনুভূতিকে আঘাত করাই উপন্যাসের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতন বোয়ার এ বাধা অস্বীকার করিয়াছেন। প্রেম জীবনের একটী প্রধান উপাদান হইলেও তাহা যে জীবনের একমাত্র উপাদান, আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক তাহা স্বীকার করেন নাই। আমাদের আবেগের রূপ বিচিত্র, বিচিত্র আধারকে আশ্রয় করিয়া মানুষ স্বর্গ রচনা করিয়া থাকে, প্রেমের লীলাপ্রকাশ ব্যতীত মানুষের জীবনের আরো অনেক দিক রহিয়াছে। জ্ঞানের পিপাসা, বিপদের মোহ মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে, তাই মানুষ কেবলমাত্র প্রেমিক নহে, সে পথিকও বটে, সে দুঃসাহসী। মানুষের প্রেমও কেবলমাত্র নর নারীর যৌনপ্রেমে পর্য্যবসিত নহে। মাতার সন্তানের জন্য যে আবেগাকুল করুণা, বন্ধুর জন্য বন্ধুর যে প্রীতি, তাহাও প্রেমের অঙ্গীভূত। দুইটী নর-নারীর মিলন হইলে সেখানে তাহাদের জীবন শেষ হইয়া গেল না—বস্তুতঃ সেখানেই তাহাদের জীবন-যাত্রার আরম্ভ। পরস্পরের সহযোগিতায় ও সাহচর্য্যে তাহারা কেমন করিয়া পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সম্পাদন করিল, পরস্পরের চিন্তা ও আদর্শের সংস্পর্শে জীবনের গতির কি পরিবর্ত্তন হইল,—তাহা লক্ষ্য করাও আজ ঔপন্যাসিকের কাজ। কবে কোন চিন্তার ধারা আসিয়া অন্তর স্পর্শ করিল, সমগ্র জীবনের গতি কেমন করিয়া বদলাইয়া গেল, তাহার কাহিনী আমাদের বুদ্ধি ও আবেগকে যেমন করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। আধুনিক যুগে উপন্যাস তাই কেবলমাত্র ভাব-জীবনের কাহিনী নহে, তাহা চিন্তা-জীবনেরও ইতিহাস।

বোয়ারের রচনার দুয়েকটী বিশেষ ভঙ্গির আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহার উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব এইখানে যে, যে মাপকাঠি দিয়াই আমরা তাঁহার রচনার বিচার করিতে চাহি না কেন, তাহাতেই তাঁহার সাহিত্য শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের আসনে স্থান পাইবে। ললিতকলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশের লক্ষণ এই যে, যেখানে যেদিক দিয়াই আমরা তাহার পরীক্ষা করি না কেন, কষ্টিপাথরে সোনার রেখাই ফুটিয়া উঠে। তাহার কারণ এই যে সাহিত্য বিচারের সকল লক্ষণই derivative। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া বিনা বিচারে মানুষের মন যুগযুগান্ত ধরিয়া যাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সকল লক্ষণ অমরতার কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়, তাহাকেই আমরা সাহিত্যের মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করি। মানব-মনের ধর্ম্মই এই যে আমাদের আবেগ ও অনুভূতি প্রথমে যাহাকে আনন্দে বরণ করিয়া লয় তাহাকেই বিচার করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া আমরা গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাই, ভাল লাগিলে পরে তখন খুঁজিতে বসি কেন ভাল লাগিল। সাহিত্যের বিচারেও এ কথা সত্য।

কেবলমাত্র প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিশ্ব-সাহিত্যে বোয়ারের স্থান অতি উচ্চে। মানুষের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, আশা ও আশঙ্কার এমন উদ্বেল প্রকাশে তাঁহার সাহিত্য প্রাণবান যে আমাদের অন্তরের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার তন্ত্রী তাহাতে সাড়া দিয়া ওঠে। Tolstoy বলিয়াছেন, ললিতকলার লক্ষণ এই যে রূপকার আপনার অন্তরে যে আবেগ উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রকাশ-ভঙ্গির কৌশলে অপরের অন্তরেও তাহা তিনি সঞ্চারিত করিতে পারেন। এই সঞ্চার করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে রূপকারের নিজের আবেগের তীব্রতার উপর। বোয়ার তাঁহার রচনায় যে আবেগকেই প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাকেই এমন গভীর ভাবে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাঁহার সকল জীবন তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। এইখানে তাঁহার কবি হৃদয়ের পরিচয়। কল্পনার তীব্রতা ও সহানুভূতির প্রাচুর্য্যে অপরের বেদনা তাঁহার আপনার হৃদয়ে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহার মানস-সৃষ্টিতে তিনি সেই বেদনা ও আনন্দকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অন্তরও সাড়া দেয়।

কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গির কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র বাস্তবের দিক দিয়া তাঁহার রচনা অনুপম। জীবনের সকল ব্যর্থতা, সকল বেদনার ইতিহাস কবি বোয়ারের হৃদয়ের কাছে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন ঔপন্যাসিক বোয়ার। চরিত্র সৃষ্টি ঔপন্যাসিকের কঠিনতম

পরীক্ষা, এবং তাহার সাফল্যেই তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা। যে বেদনা ও আনন্দের সন্ধান তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, গীতি-কবির মতন কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের প্রকাশে তাহাকে তিনি সঙ্গীত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই, রক্ত মাংসের মানুষ গড়িয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি ও ব্যর্থতার মধ্যে তাহাকে তিনি রূপ দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তাই কেবলমাত্র তাঁহার হৃদয়ের আবেগের প্রতিচ্ছবি নহে, তাহারাও আমাদেরই মত মানুষ, আমাদের মতনই তাহারা আপনার ব্যক্তিত্ব লইয়া প্রত্যেকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র। আমাদের মতনই তাহারা জীবনের অর্থ খুঁজিতে প্রয়াস পায়, আমাদেরই মত তাহারা ভালবাসে এবং ভালবাসিয়া প্রতিদান না পাইলে আমাদের মতনই বেদনায় মূহ্যমান হইয়া পড়ে।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য সম্পাদনে বোয়ার অতুলন। তাঁহার পুরুষ ও নারী প্রকৃতিরই কোলে মানুষ হইয়াছে; জ্ঞানের পিপাসা, ধন সম্মানের পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেও তাহারা যে মাটীর ছেলে, মাটীর মেয়ে, একথা তাহারা কখনো ভুলিয়া যায় নাই। যখনই অন্তরের আলোড়নে জীবন বন্ধুর হইয়া উঠিয়াছে, কণ্টকিত জীবন-তরুর আঘাতে হৃদয় দীর্ণ হইয়া পড়িতে চাহিয়াছে, তখনই প্রকৃতির বিরাম শান্তি ও সৌম্য নিস্তব্ধতার মধ্যে আসিয়া তাহারা সান্ত্বনার প্রলেপ-পরশ পাইয়াছে। প্রকৃতির সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য ও বিপুলতম বিরাটতা উভয়ই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, নীরব বিস্ময়ে উভয়কেই তাঁহার হৃদয় গ্রহণ করিয়াছে।

ঔপন্যাসিক ও কবি বোয়ারকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন ভাবদ্রষ্টা বোয়ার। এই বিংশ শতাব্দীর জীবনের আবেগ ও আন্দোলন, অতৃপ্তি ও বিক্ষোভকে এমন করিয়া আর কেহ রূপ দিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। মানুষের জ্ঞানের রাজ্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, দিন দিন প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে নব নব রত্ন আহরণ করিয়া আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে চাহি, বিলাসের উপকরণ ও ঐশ্বর্য্যেরও অন্ত নাই, কিন্তু মানুষের মন সে সকলকে তুচ্ছ করিয়া শান্তি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া মরে। সৈন্যসম্ভারে মানুষের আত্মা সুখী হয় না, জ্ঞানের মদিরা পান করিয়া পিপাসা বাড়িয়াই চলে, ক্ষমতার ফেনিল-তায় সে খিন্ন হইয়া পড়ে। জীবনের অর্থ খুঁজিবার এই যে প্রয়াস, মানুষের আদর্শ কোথায়, তাহার সকল সাধনার পরিণতি কিসে,—বোয়ার এই সব যেমন করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন, এই সন্ধানের আকুলতায় তাঁহার রচনা যেমন ভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহারি মধ্যে আমাদের অন্তরের চিরন্তন প্রশ্নের প্রকাশ দেখিতে পাই। তাঁহার সঙ্গে সহানুভূতিতে আমাদের হৃদয় সাড়া দিয়া উঠে, একই মানুষের যে প্রাণ আমাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে, তাহার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই, তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে শিখি।

মানুষকে বোয়ার ভালবাসিয়াছেন। মানুষের মহত্ব, মানবাত্মার বিপুল সাধনা তাঁহাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানিয়াছে। আমরা হাসি, কাঁদি, ঘর বাঁধি, ঘর ভাঙি, কিন্তু আমাদের অন্তরের কোন্ দুর্জ্জয় বিপুল আবেগ যে আমাদিগকে এ সব করাইতেছে, আমরা নিজেরাই তাহা জানি না। সমস্ত অন্তর দিয়া যাহা কিছু আমরা চাই, সমস্ত হৃদয় যাহার অভাবে কাঁদিয়া উঠে, তাহাও আমাদের মেলে না! তবু সহস্র বাধা বিপত্তি, ব্যর্থতা হতাশাকে জয় করিয়া আমরা অন্ধ নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করি, হার মানিয়া কখনো বসিয়া থাকি না। জীবনের পাত্র যখন শুকাইয়া যায়, দিনের আলোক যখন আমাদের নয়নে নিভিয়া আসে, তখনো আমরা আশা করি, আকাঙ্ক্ষা করি, বেদনা পাই। সকল ব্যথা, সকল আঘাত, সকল ব্যর্থতার চেয়ে মহৎ, সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে দুর্ব্বার এই যে জীবন-কণা আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, তাহাকেই বোয়ার রূপ দিতে চাহিয়াছন, জীবনের সেই চিরন্তন মূর্ত্তিই তাঁহার উপন্যাসের কায়া ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের অদম্য পিপাসা, অপ্রকাশকে প্রকাশ করিবার আকুল আকুতিতে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিবার যে বিপুল প্রয়াস, তাহাতে বোয়ারের রচনা কেবলমাত্র মধুরই হইয়া উঠে নাই, সুখদুঃখের আঘাত-সংঘাতে তাহা মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

মানবাত্মার এই দুর্জ্জয় দুঃসাহস, অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোকের সন্ধানে মানুষের এই যুগযুগব্যাপী অভিযান

হুমায়ুন কবির

বোয়ারকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার সকল চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই তাঁহার সকল রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে মানবাত্মার দেবত্ব—the deification of the human spirit. পশু পূর্ব্বপুরুষের রক্তের উত্তরাধিকার পরিত্যাগ করিয়া, পারিপার্শ্বিক জগতের সকল ক্রূরতা, সকল নিষ্ঠুরতার আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া মানুষের অন্তরে যে কখন আদর্শের ছায়াপাত হইল, কে জানে। কিন্তু তাহারি জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া প্রবৃত্তিকে লঙ্ঘন করিয়া আপনার জীবনের গতি চালিত করিয়াছে, স্বভাবকে জয় করিয়া মানবত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই যে আপনার সংস্কারকে জয় করিবার মহত্ব, তাহারি জয়গান বোয়ার গাহিয়াছেন, তাহারি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাঁহার রচনা মুখর। সকল চরিত্র সৃষ্টি, সকল ঘটনাসংস্থান, প্রেম-প্রীতি, হিংসা-দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা-বিরাগ, আশা-নিরাশার সকল কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে এই একই বাণী—মানুষকে আপনার আবেষ্টন জয় করিয়া তাহাকে ছাপাইয়া উঠিয়া মহত্তর জীবন স্থাপন করিতে হইবে। সেই আদর্শের স্বপ্নই তাহার স্বর্গ, সেই আদর্শের মূর্ত্তপ্রকাশই তাহার ভগবান।

কিন্তু তাই বলিয়া সংসারের বেদনা, সংসারে ক্ষুদ্রতার কথা বোয়ার ভুলিয়া যান নাই। আদর্শবাদীর আদর্শের উদ্ভাসিত আলোক যে জগতে পড়িয়াছে, সে আমাদের এই সুখদুঃখ আনন্দবেদনার জগৎ। সংসারের বেদনাকে, আঘাত-সংঘাতকে তিনি তুচ্ছ করিয়া দেখেন নাই; যেখানে যাহা কিছু খুঁত, যাহা কিছু ত্রুটী, নির্ম্মম করে পাষাণে তাহা তিনি খুদিয়া তুলিয়াছেন। সংসারে মায়ের বুকে শিশু মরিতেছে, নিষ্ঠুরের অন্যায় উৎপীড়নে হতভাগ্যের জীবনের ধারা শুকাইয়া যাইতেছে, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধিয়া মানুষ ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তার পরিচয় দিতেছে,—ইহাও যেমন সত্য,—তেমনি অন্যদিকে মানুষের আত্মা মানুষের জন্য কাঁদিতেছে, আপনার জীবনের সকল সুখ, সকল আশা হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ অপরের দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে, তাহাও কি সত্য নয়? মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে, রঙের পরে রঙ মিশাইয়া যে ছবি আঁকিয়াছে তাহাতে কালিমার রেখাভাষ দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে, আবার কখনো বা আপনার অন্তরের আনন্দ গীতিমুখে উৎসারিত করিয়াছে। এই যে এষণা, এই যে গভীর সৌন্দর্য্য-প্রীতি, এই যে অনুভূতির তীব্রতা,—ইহাই যুগে যুগে মানুষকে অমর করিয়াছে। মানুষ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া আদর্শের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া তবে সুখী হইতে পারিয়াছে।

ঘটনার আবেষ্টনকে, পারিপার্শ্বিক জগতের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিবার এই যে সাধনা তাহাই মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দরিদ্রকে পদে পদে বাধা সহ্য করিয়া চলিতে হয়, হৃদয়ের সকল আশা তাহার স্বপ্নই থাকিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে কি তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ করে? বাস্তব-জগতে তাহার জীবনে যাহা সম্ভব হইল না, স্বপ্ন গাঁথিয়া গাঁথিয়া আপনার মানস-জগতে তাহাই সে উপভোগ করে, তাহার মানুষ-হৃদয় সকল সংকীর্ণতাকে অস্বীকার করিয়া, সকল বাধা জয় করিয়া জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। তাঁহার Emigrants-এ তিনি দরিদ্রের জীবনে এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—দারিদ্র্য হইতে মুক্তি, অধীনতা হইতে মুক্তি, সকল দীনতা হীনতা হইতে মুক্তি—এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। স্বদেশে যাহাদের মানুষের অধিকার মিলিল না, শত স্মৃতি-মধুর পরিচিত ভুবন ছাড়িয়া তাহারা নূতন জগতের সন্ধানে নূতন পথে যাত্রা করিল। দেহের রক্ত জল করিয়া যাহারা দেশকে গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহাদের পরিশ্রমের ফলেই মানুষের সভ্যতা, সেই শ্রমজীবি ও কৃষক যুগ-যুগান্তর ভরিয়া অনাদর অবহেলাই পাইয়া আসিয়াছে। তাহাদের অন্নে পরিপুষ্ট, তাহাদের বসনে সজ্জিত, তাহাদেরি পরিশ্রমে সৃষ্ট বিলাসের শত উপকরণে পরিতৃপ্ত সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, মানুষের অধিকার তাহাদিগকে দেয় নাই কিন্তু তাহারাও তো আমাদের মতনই মানুষ, আমাদের মতনই তাহাদের হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হইয়া উঠে, আমাদের মতনই তাহারা আদর্শের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া জীবনের পূর্ণতা খুঁজিয়া মরে। বহু যুগব্যাপী দাসত্ব অস্বীকার করিয়া আজ তাহারা আপনাদের মনুষ্যত্বের গৌরব, মনুষ্যত্বের

অধিকার চাহিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিবে? অর্থই জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্ভ্রমের মূল, তাই সেই অর্থ-সম্পদ আহরণ করিতে Emigrants-এ Kal, Morten, Per দেশ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু সকলেই যে কেবল অর্থ আহরণের জন্য যাত্রী সাজিল, তাহা নহে। স্বদেশের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে যাহাকে যে অধীনতা বা বিধিনিষেধের গণ্ডী পীড়া দিয়াছে, সে তাহারই হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুদূর বিদেশে যাত্রা করিল। এ বিদেশ কোন ভৌগলিক দেশ নহে, তাহা মানবের অন্তরের সুদূর গহনপুরী, যেখানে ছিন্ন কুসুম আবার ফুটিয়া উঠে, দীর্ণ হৃদয়ের অশ্রুজলের তলে হাসির আভাস শরতের বৃষ্টিস্নাত কুসুমের পরে রৌদ্রকরের মতন ঝলসিতে থাকে। তাই যখন তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া দেখিল ইহাও তাহাদের আকাঙ্খিত সেই স্বপ্নস্বর্গ নহে, তখন তাহাদের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, অতৃপ্তিতে সকল অন্তর ভরিয়া গেল। স্বদেশের জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল।

মানুষের সমাজে নূতন সাম্য, নূতন মৈত্রীর বন্ধন গড়িয়া তুলিবার যে ছবি বোয়ার Emigrants-এ আঁকিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। সভ্যতা যে কেমন করিয়া সম্ভব হয়, কত স্বার্থত্যাগ, কত সাধনা, কত প্রয়াস যে তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বোয়ার তাহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। যাহারা এমন করিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে, তাহারা বীর, তাহারা মহৎ, কিন্তু তাহাদের মহত্ত্ব, তাহাদের বীর্য্য রক্তস্রোতে ধরণীকে ভাসাইয়া নহে,—প্রতিদিবসের ক্ষুদ্র অত্যাচার সহিয়া, শত অপরাধ, শত অপমান ক্ষমা করিয়া তাহাদের বীরত্বের প্রকাশ। দৈনন্দিন জীবনের এই যে তুচ্ছ বিরক্তিকর সহস্র ঘটনা, তাহাকে জয় করিয়া জীবনের পথে চলিবার সাধনা যে কত কঠিন তাহা সহজে চোখে ধরা পড়ে না। অকস্মাৎ বিকশিত ধূমকেতুর দীপ্তি সেখানে নাই, সেখানে রহিয়াছে গৃহপ্রদীপের কল্যাণ, গৃহ-প্রদীপের প্রতিদিন ধরিয়া আলোক বিকীরণ।

অর্থ তাহারা উপার্জ্জন করিল, ক্ষমতা ও সম্ভ্রম তাহাদের জুটিল, কিন্তু হৃদয় কি তাহাতে তৃপ্তি পায়? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একদিন যাহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার যখন দেহের ক্ষুধা মিটিল, তখনো ত তাহার অন্তরের ক্ষুধা মেটে নাই। বিলাসের প্রাচুর্য্যে যখন সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে, তখনো সে সুখ খুঁজিয়া পায় নাই, তখনো তাহার হৃদয়ের কোণে যে কি অপূর্ণতা রহিয়াছে—তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার তাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু দিবা-রাত্রী প্রচ্ছন্ন কণ্টকের মতন তাহা তাহার অন্তরে বিঁধিতেছে। সমস্ত হৃদয় যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, তাহারি সিদ্ধিতে মন বিবশ হইয়া পড়ে, প্রিয়হারা বঞ্চিতের মতন বুভুক্ষু ক্ষুধায় কাঁদিয়া মরে,—মানব মনের এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অর্থ কি কেহ খুঁজিয়া পাইয়াছে? স্বদেশের জন্য মন যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই স্বদেশে ফিরিয়া মন আবার বিদেশের জন্য কাঁদিয়া উঠে, সান্ত্বনা মানে না।

বোয়ার মানুষের জীবনকে গতিরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সকল পাওয়াকে, ছাড়াইয়া মহত্তর, বিপুলতর, অস্পষ্টতর যে এক বিরাট অসীম আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে অনুভব করিয়া আমরা তাহাকে উপলব্ধি করিতে চাহি। সে আছে জানিয়া তাহারি বিরহে আমাদের চোখে নিখিল জগত ভরিয়া অসীম রোদন আকুল হইয়া উঠে। জীবনের যে উৎসলীলা আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে, তাহার গোপন সঞ্চার সৃষ্টির কোন্ অতল তলে তাহাও আমরা জানি না—জানিবার সাধনায় ব্যাকুল হইয়া উঠি। আরও আলোর জন্য আমাদের হৃদয় কাঁদিতে থাকে, আরও প্রীতি, আরও করুণার জন্য আমাদের হৃদয় ভিখারী, আরও স্বাধীনতার জন্য আমাদের আত্মা পিয়াসী, কিন্তু এ সকল ক্রন্দনের মূলে রহিয়াছে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিবার সাধনা! মানবাত্মার এ ক্রন্দন স্বদেশ বিদেশের জন্য নয়, ধনমান, সম্ভ্রমের জন্য নয়, প্রেমপ্রীতির স্নিগ্ধছায়া-ঘন গৃহ-কোণের জন্য নয়,—এ ক্রন্দন সকল পাওয়ার অতীত এক অব্যক্ত অপ্রকাশের জন্য, এ ক্রন্দন মানবাত্মার আপনার ভগবানকে খুঁজিয়া পাইবার তপস্যা। এই যে অসীমের সন্ধান, ইহাই মানবাত্মার মহত্তম সাধনা—ইহাই তাহার ধর্ম্ম। *

* আগামী সংখ্যায় লেখক বোয়ার রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিবেন। বিঃ সঃ

নূতন ধরণের সরস্বতী মূর্ত্তি

গেল সরস্বতী পূজোর পরদিন বিকেলে আমরা যেমন বেরিয়ে থাকি তেম্নি বেড়াতে বেরিয়ে দেখি যে রাস্তায় সরস্বতীর নানা রকমের মূর্ত্তি নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেবার জন্য মিসিল্ চলেছে। সরস্বতীর দেবী মানুষী ও বিদ্যাধরী ধরণের কত মূর্ত্তি যে দেখা গেল তার আর ঠিকানা নেই। কেউ প্রাচীন ধরণের আকর্ণ বিস্তৃত চোখ দিয়েছেন, দেবীর হাতের বীণা হাতেই রয়েছে বটে কিন্তু বাজাবার কোনই ভঙ্গী নেই,—এম্নি মূর্ত্তিই বেশী। আবার শুন্তে পেলাম প্রাচীনের মধ্যে নূতন কিছু কর্‌তে যেয়ে কেউ নাকি দেবীকে চারখানা হাত দিয়েছেন, আর কেউ নাকি দেবীর হাতে বীণার বদলে অসি দিয়ে কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীর রস-চর্চ্চার দিকটাকে আমল দিতে চান নি। আরেক দিকে, আজকাল কার্ত্তিক যেমন বাবু হয়েছেন, তাঁর এ বোনটিরও সেদিকে নজর পড়েছে। তাই বহু বাবু সরস্বতীর আমদানি দেখা গেল। শুধু মানুষের মত চক্ষু নয়; এ মূর্ত্তিগুলির নমুনা দেখে মনে হ'ল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট" বাণীটি বেশ সাফা হয়ে উঠেছে। লোকের রুচি-মাফিক্ রসদ জোগাতে গিয়ে কুমারটুলীর কারীগরদের কি দুর্দ্দশা হয়েছে, তা' বাস্তবিকই ভেবে দেখবার মত।

বৈচিত্র্যহীন মূর্ত্তি দেখে দেখে বিশেষ লক্ষ্য না ক'রেই আমরা রাস্তা চল্‌ছিলাম। হঠাৎ গোলদীঘির ধারে ভিড়ের মধ্যে খানিকটে দূর থেকেই একটি মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল। আমরা এগিয়ে কাছে না গিয়ে পার্‌লাম না। এ মূর্ত্তিটি দেখে মনে হ'ল এ না দেখ্‌লে এবারকার সরস্বতী পুজোই ব্যর্থ হয়ে যেত। অতি চমৎকার এই মূর্ত্তিটী; একেবারে সাদা—কোথাও কোন রঙের বালাই ছিল না। বস্‌বার ভঙ্গিটি নতুন, বীণা বাজাবার ভঙ্গিটি নতুন, মুখের সে ভাব-তন্ময়তা আর কোথাও দেখেছি বলেত মনেই হয় না। হাঁসটি যে ভঙ্গিতে বসে আছে তাতে স্বাভাবিকতার সঙ্গে কারুকৌশলের বেশ মিল হয়েছে। তারপর যে চৌদোল বা মন্দিরের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিটি স্থাপন করা হয়েছে তাতে অতি সুন্দর প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের আভাস আছে। একটি বিষয় আমাদের কাছে একটু বেমানান মনে হয়েছে। দেবীর পিছনের দিকে (background) যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা' বেশ সুন্দর হ'লেও পাশ্চাত্য ধরণের হয়েছে বলে এই ভারতীয় পদ্ধতির মধ্যে একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল। মোটামুটি, এমন প্রকৃত শিল্পের কাজ যা দেখবা মাত্র মনকে কেড়ে নেয় তা আধুনিক কোন মূর্ত্তিতে আমরা দেখিনি। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম্ কল্‌কাতার আর্ট স্কুলের হোষ্টেলের ছাত্রেরা নিজেরাই এই অনবদ্য মূর্ত্তিটি গড়েছেন।

দেবী মূর্ত্তির কল্পনা সম্বন্ধে খানিকটে বলা দরকার। আমরা যে সব সরস্বতী দেখ্‌তে পাই তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে যেন একটি ছবি করে তোলা হয়। যা ভারতীয় রূপ রচনার প্রাণ সেই ভাব-যোজনার কোন সন্ধানই তাতে মিলে না। এইজন্য আমাদের সেকেলে লৌকিক ধরণে যারা মূর্ত্তি রচনা করে তাদের হাতের শিল্প আমাদের মনে বড় একটা সাড়া দেয় না। কৃষ্ণনগরের কুমোরদের তৈরী মূর্ত্তিও সুধু মানুষী ভাব দেখাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে উঠেছে। প্রাচীনের যেখানে প্রাণ ও সৌন্দর্য্য তাকে আমরা বর্ত্তমানের জীবন-ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌লেই আমাদের প্রাণে একটা সাড়া আস্‌বে। আর্ট স্কুলের হোষ্টেলের ছাত্রেরা তাই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়েও প্রাচীন ভারতের অবদান ও প্রাণ-ধারার সঙ্গে যোগ স্থাপন কর্‌তে পেরেছেন বলেই এই মূর্ত্তি রচনা সম্ভবপর হয়েছে। বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি ও প্রজ্ঞাপরিমিতার ভাবটিকে হিন্দু সরস্বতী কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে একটি নূতন

ধরণ করা হয়েছে। এতে হয়ত কোন কোন পণ্ডিত আপত্তি তুলবেন। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরস্বতী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন—আশা করি তিনি ভারতীয় শিল্পের নব-গতির অগ্রগামী হিসাবে এ মূর্ত্তিটির একটু আমল দিবেন। হিন্দু দেবীর মধ্যে বৌদ্ধ দেবীর ভাব যোজনা করতে যদি কারু আপত্তি হয়, তবে আমরা একথা বলতে বাধ্য যে শুধু ওরূপ করাতেই মূর্ত্তির ভাব, মাধুর্য্য ও লাবণ্য যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছে—খালি শিল্পশাস্ত্রের বিধান ও গুরুগম্ভীর ধ্যানের মন্ত্রের খাতিরে এরূপ প্রাণবান্ শিল্প-সুষমা হারাতে আমরা রাজী নই।

সমস্ত নতুন ব্যাপারে যা হয়ে থাকে এ মূর্ত্তি নিয়েও তাই হয়েছিল—অনেক বাধা ও আপত্তির মধ্য দিয়ে কাজ অগ্রসর হয়েছিল। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা বিশেষ করে যবদ্বীপের বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির চিত্র দেখে তাঁদের পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছিলেন। দেশে এ ধরণের মূর্ত্তি গড়া হয় না বলে সব কিছুতেই নিজেদের মাথা খাটাতে হয়েছিল। গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে যে পদ্ধতিতে শেখান হয় তার সঙ্গে এ পদ্ধতির মিল নেই বলেও ছাত্রদের অনেকটা বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের দেশে মূর্ত্তি গড়তে তাতে রঙ্ দেওয়া চাই, তুলি দিয়ে চোখ এঁকে দেওয়া চাই। এঁরা এসব কিছুই করেননি বলে প্রাচীন পদ্ধতির পুরুত ঠাকুর নাকি পূজা করতেই রাজী হননি, তাঁকে বহু সাধ্য সাধনা ক'রে তবে এ চক্ষুহীন (?) মূর্ত্তিটির পূজা নির্ব্বাহ হয়েছিল!

ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের রাস্কিন শ্রীযুক্ত হ্যাভেল-সাহেবের অবদান আর্ট স্কুল হতে একেবারে লুপ্ত হয় নি। তাই বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রাউন সাহেব ছেলেদের এ মূর্ত্তি দেখে খুব খুসী হয়েছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে এতদিন তিনি যা শিখিয়েছিলেন আজ তা সার্থক হয়েছে।

নূতন ধরণের সরস্বতী মূর্ত্তি

যাঁরাই এই মূর্ত্তিটি দেখেছিলেন তাঁরা সবাই একে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে মানা করেছিলেন। ছাত্রদের কাছেই শুনতে পেলাম "ভারতবর্ষের" সম্পাদক মহাশয়ও মূর্ত্তিটিকে কোথাও

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

রাখবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিলেন। আমরা যখন রাস্তায় দেখ্‌লাম তখনও ছাত্রদের এ মতি দেখে খানিকটে দুঃখিতই হয়েছিলাম। এরূপ ধরণের মূর্ত্তির প্রথম চেষ্টা বলেই এর মূল্য আছে। ছাত্ররা নিজেরাই যখন এটাকে নষ্ট কর্‌লেন তখন অগত্যা ফটো ছাড়া এর চিহ্ন রাখবার অন্য উপায় নেই। এই মূর্ত্তিটির যেসব ফটো রাখা হয়েছে দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি বেশী ভাল হয় নি, তবু আশা করা যায় তা দেখেও অনুমান করা শক্ত হবে না যে মূর্ত্তিটি কিরূপ চমৎকার হয়েছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু

—

গ্রন্থ বনাম সংবাদ-পত্র

সাড়ে নয়টা দশটার সময় যাহারা পান মুখে ও খবরের কাগজ বগলে, হাওড়া পুলের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কলিকাতার দিকে আসে, তাহাদের নিকট-আত্মীয়েরা খাস ইংলণ্ডেও দুর্লভ নহে। গত ১৫ই জুলাই, গ্রন্থবিক্রেতাদের সম্মেলনে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ব্রিমলে বাউয়েস্ এই শ্রেণীর জীবদিগকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিয়াছেন। সকাল বেলায় ট্রেণ হইতে নামিয়াই ইহারা যখন বাস্ ধরিতে ছুটে, তখন দেখা যায় প্রত্যেকের হাতেই একখানা করিয়া খবরের কাগজ। আবার সন্ধ্যার সময় কোন গতিকে ট্রেণে উঠিয়াই ইহারা পুনরায় একখানা খবরের কাগজ কিনিয়া, অবসন্নভাবে তাহার উপর চোখ বুলাইতে থাকে। এই দুবেলা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস, ইহা কি স্বাস্থ্যকর? ভাইস্ চ্যান্সেলার মহাশয়ের মতে ইহা মানসিক পক্ষাঘাতের পরিচায়ক। শুধু খবরের কাগজই যাহাদের মানসিক দানাপানির সংস্থান করে, তাহাদের মনের অবস্থা যে কি রকম তাহা একটু ভাবিবার বিষয়।

মিঃ বাউয়েসের মতে এই রোগের প্রতিকার হইল বই কেনা ও পড়া। যদি জ্ঞানার্জ্জনই অধ্যয়নের লক্ষ্য হয়, তবে নিকৃষ্টতম পুস্তকও প্রথম শ্রেণীর সংবাদ-পত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। মিঃ বাউয়েসের এই সমস্ত মন্তব্য একটু হাল্কা ধরণের; সুতরাং খুব গম্ভীরভাবে ইহার আলোচনা করিলে হয়ত একটু ভুল করা হইবে। তবু খবরের কাগজের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা আন্তরিক; এবং বিষয়ে তিনি একক নহেন। এই ধরণের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

এখন প্রশ্ন এই, আমরা খবরের কাগজ পড়ি কেন? জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কি? সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই যে, মনটা "ফরওয়ার্ড" বা "অমৃত বাজার পত্রিকা"র জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, সেটা কি ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের আশায়, না গল্প শুনিবার লোভে? আসলে এই গল্প শোনার প্রবৃত্তিই হইল আমাদের খবরের কাগজ পড়ার মূল প্রেরণা। ছোটবেলায় আমরা ঠাকুরমার মুখে রূপকথা শুনিতাম। এখন সংবাদ-পত্রই আমাদের ঠাকুরমা। এই ঠাকুরমার ভাণ্ডার অফুরন্ত! আজ কাপ্তেন লুঙ্গেসারের এরোপ্লেন; কাল কেভিন ওহিগিন্‌সের মৃত্যু; তার পরদিন হয়ত ডারবির ঘোড়দৌড় কিংবা মোহনবাগানের খেলা, বা পলাশীর দ্বিতীয় যুদ্ধ অথবা স্যাকো ও ভ্যানজেটির বিচার। ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্য নূতন কাহিনীর অভাব বা অপ্রাচুর্য্য নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়াম্ ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্ত গ্রন্থ মিলিয়াও আমাদের এই পিপাসা মিটাইতে পারে না। সুতরাং সাধারণ লোককে সংবাদপত্র না পড়িয়া গ্রন্থ পড়িতে বলা যেরূপ সঙ্গত, শিশুকে রূপকথার পরিবর্ত্তে অতি-প্রাকৃতের উৎপত্তি ও বিবর্ত্তন সম্বন্ধে ফ্রেজারের বই পড়িতে বলা ঠিক সেইরূপই সঙ্গত।

তারপর শুধু গল্প শোনাই নয়। অধিকাংশ মানুষেরই অপর মানুষের জীবন সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল আছে। এই কৌতূহল ভাল কি মন্দ জানি না। তবে ইহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ ইহার ভিত্তি আমাদের সহজাত চরিত্রের উপর। অপরের নানা কাজের মধ্যে উঁকি মারা, নানা মতলবের উপর আড়ি পাতা একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। এই ব্যাধির বশেই আমরা ইতিহাস পড়ি, জীবনচরিত পড়ি, উপন্যাস পড়ি; এবং এই জন্যই সকাল-সন্ধ্যায় সংবাদপত্র না হইলে

আমাদের চলে না। আর এটা কি এতই নিন্দনীয়? জীবনের কাজে বিজ্ঞানের তথ্য ও যুক্তির দীর্ঘ এবং ভয়াবহ তালিকার চেয়ে মানবচরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ও অশ্রুসিক্ত পরিচয় কি একেবারেই হীনতর? নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

তারপর জ্ঞানার্জ্জনের কথা ধরাই যাক্। অবশ্য ইহা ঠিক যে কোন না কোন বিষয়ে প্রত্যেক মানুষেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ ও অন্তরঙ্গ জ্ঞান থাকা দরকার। এইজন্য বইপড়া উচিত। সংবাদপত্র যদি এই ক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রতিযোগিতা করে তবে তাহা ক্ষতিকর। কিন্তু তাহা কি করে? অধিকাংশ মানুষই নিজের নেশাটা বেশ ভাল করিয়াই বুঝে; সেজন্য সংবাদপত্রের মুখাপেক্ষা করে না। কিন্তু নিজের গণ্ডীর বাহিরে অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকাটা সকলেই চায় এবং তাহা সকলেরই দরকার। সেজন্য বিরাট গ্রন্থ পড়িবার অবসর কোথায়, রুচি কোথায়? ধরা যাউক্ আমরা জগদীশ বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধে বা আইনষ্টাইনের থিওরী সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহি। এই জ্ঞান আহরণের জন্য কি আচার্য্য মহাশয়ের বা এডিংটন সাহেবের মৌলিক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতে হইবে? এরূপ উপদেশ দেওয়া চূড়ান্ত ভণ্ডামি ও বোকামি। সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই খবরের কাগজ পড়ে। সেখানে তাহার যতটুকু দরকার তাহা সে পায়; শুধু পায় না, বেশ সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবেই পায়। এইটাই হইল আসল কথা। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রাজত্ব ন্যায়শাস্ত্রের অশরীরি রাজত্ব। সেখানে মানবহৃদয়ের স্বাদ স্পর্শ বা গন্ধ কিছু নাই। কর্ম্মক্লান্ত মন সেখানে হাঁপাইয়া উঠে। সংবাদপত্র লেখকের বাহাদুরী এই যে তিনি বিজ্ঞানের তথ্যও বেশ একটু ভঙ্গীর সহিত বলিতে জানেন। ওই ভঙ্গীর মধ্যে তাঁহার চরিত্রের ছাপ থাকিয়া যায়। আমরা তাঁহার লেখা পড়ি। পড়িয়া শুধু যে জ্ঞানার্জ্জন করি তাহা নয়; একটা গোটা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। মস্তিষ্কের ক্ষতিটা হৃদয়ের লাভে পুরিয়া উঠে। সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কার্ল মার্ক্‌সের বা ক্রট্‌ষ্কির গ্রন্থ পড়ার ধৈর্য্য বা সামর্থ্য কটা লোকের আছে? কিন্তু দৈনিক বা মাসিক পত্রে এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ যদি এই বিষয়ে লেখেন তবে জ্ঞান ত মিলিবেই, উপরন্তু এইচ্, জি, ওয়েল্‌সকেও পাওয়া যাইবে। এই লাভের তুলনা নাই। সংবাদপত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানবীকরণে সাহায্য করে। এই জন্যই আমরা সংবাদপত্র পড়ি। বর্ত্তমান কালে গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যের জন্য বা তাহাদের ভালমন্দ বুঝি না বলিয়াই যে আমরা সংবাদপত্র পছন্দ করি, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের এই যুক্তি ঠিক নয়। আমাদের সংবাদপত্র-প্রীতি আরও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভিত্তি হইল মানবতা।

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

রীম্‌সের বিখ্যাত ভজনালয়ের পুনর্গঠন

ফ্রান্সের অন্তঃপাতি রীম্‌সের বিখ্যাত ভজনালয়ের কথা বোধ হয় সকলেই কিছু না কিছু শুনিয়া থাকিবেন। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় এবং এত সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট গীর্জ্জা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানদের দৃষ্টি এই গীর্জ্জাটীর উপর পতিত হয় এবং চার বৎসরের উপর্য্যুপরি গোলাবর্ষণের ফলে উহা প্রায় চূর্ণ করিয়া ফেলা হয়। যুদ্ধ-বিরতির পর আবার উহার পুনর্গঠনের ভার হাতে লওয়া হয় এবং মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টের তিরোধানের সাম্বাৎসরিক দিন, ২৫শে মে এই ভজনালয়ে আবার প্রথম উপাসনা আরম্ভ করা হইয়াছে।

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চারিদিকে সহরের উপর গোলাবর্ষণের ফলে সহর প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়। বিশাল ভজনালয়ের উপাসনাতে যোগদান করিবার লোক সহরে ছিল না। এই ভীষণ গোলাবৃষ্টির মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ পাদ্রীসাহেব মাত্র একজন উপাসককে লইয়া গীর্জ্জায় প্রার্থনাদি করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিক গোলাবর্ষণের আওয়াজের ফলে প্রার্থনায় তাঁহার অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতেছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি গীর্জ্জার উপর গোলা পড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরোপাসনা করিয়াছিলেন। সেই রাত্রের মধ্যেই গোলা ফাটিয়া সমস্ত গীর্জ্জাটীতে আগুন লাগিয়া যায় এবং গীর্জ্জার মধ্যকার সমস্ত কাঠের কাজ একেবারে ভস্মীভূত

রীম্‌স্‌ ভজনালয়ের পুনর্গঠন

শ্রীহিমাংশু বসু

হইয়া যায়। যুদ্ধ শান্তির পর ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার গীর্জ্জাটীকে খাড়া করা হইয়াছে এবং আবার এই স্থানে নিয়মিতভাবে উপাসনাদি আরম্ভ হইয়াছে। এই গীর্জ্জাটীর পুনর্নির্ম্মাণে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশই যোগাইয়াছে। বিখ্যাত ধনকুবের জন্, ডি, রক্‌ফেলার ৬০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন, ডেনমার্ক হইতে ১২ লক্ষ, নরওয়ে হইতে ২ লক্ষ এবং ইংলণ্ড হইতে ৪ লক্ষ ফ্রাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, এতদ্ব্যতীত ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন। অদ্যাবধি প্রায় ১ কোটী ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ হইয়াছে; আরও কত খরচ হইবে তাহা বলা দুষ্কর।

রীম্‌স্‌ ভজনালয়
(গোলাবর্ষণ হইবার কয়েকদিন পরের দৃশ্য)

মধ্যযুগের স্থপতি-বিদ্যার নিদর্শন এই বিরাট ভজনালয়টী ধ্বংশের পূর্ব্বে এবং পরে যিনি দেখেন নাই, পুনর্নির্ম্মাণে কেন যে ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ। বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া গীর্জ্জার দারুময় কারুকার্য্য সকলের যে নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল তাহা বিগত যুদ্ধের সময় পর্য্যন্তও পরিসমাপ্ত হয় নাই; এমন সময় আগুন লাগিয়া উহা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বেই জার্ম্মানরা গীর্জ্জাটীতে একটী অস্থায়ী হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া, হাঁসপাতালের ব্যবহারের জন্য প্রায় ১০০ শত লোকের শয়নোপযোগী খড় মজুত রাখিয়াছিল। এই খড়, গীর্জ্জায় মজুত টেবিল চেয়ার ইত্যাদির সহিত মিলিয়া ঐদিনকার অগ্নিকাণ্ডে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। ছাদের ওক্ কাঠের কড়ি বরগাগুলিও মন্দ রসদ যোগায় নাই। এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডটী দুই দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। দারুণ উত্তাপে ছাদের সীসার আবরণটী গলিয়া গিয়া নর্দ্দামা ইত্যাদি দিয়া গলিত সীসা মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আগুন নিভিবার পর দেখা গেল যে, কেবলমাত্র দেওয়ালগুলি ও ছাদের কিয়দংশ খাড়া রহিয়াছে! আটটী ঘণ্টাবিশিষ্ট ঘণ্টাঘরটী পড়িয়া গিয়াছে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর যে সব রঙীন ও নক্সা-করা কাচের দরজা জানালাগুলি ছিল সব চুরমার হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন যে সব পাথরের মূর্ত্তি গীর্জ্জার শোভাবর্দ্ধন করিত উহা সবই উত্তাপে ফাটিয়া গিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এক কথায় সমস্ত ইউরোপের কেন্দ্রীভূত মধ্যযুগের শিল্প ও চারুকলার নিদর্শন সবই দুইদিনের অগ্নিকাণ্ডে রসাতলে গিয়াছে। মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বরাবরই এই গীর্জ্জাটীর উপর সমভাবে গোলাবর্ষণ চলিয়াছিল। এই গোলাবর্ষণ এত ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল যে ১৯১৭ সালে বড় বড় কামান হইতে ঠিক

গীর্জ্জাঘরের উপর প্রায় ২৮৭টি গোলা বর্ষিত হইয়াছিল এবং ইহা ছাড়াও অনির্দ্দিষ্ট গোলাগুলির বর্ষণ ইহার উপর যে কত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে গীর্জ্জার দেওয়ালগুলি খাড়া ছিল তাহা হইতেই বুঝা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিরূপ দক্ষ কারিগর দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপ গোলাবর্ষণের ফলে দেওয়াল-গুলির পাথর একটী একটী করিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। যখন জার্ম্মানরা রীম্‌স্ ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন কেবলমাত্র দেওয়ালের বাহিরের ভগ্নপ্রায় দৃশ্য ছাড়া গীর্জ্জার আর কিছুই চোখে পড়িত না। দূর হইতে দেখিলে তখনও মনে হইত যেন গীর্জ্জাটী স্বাভাবিক অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু কাছে আসিলেই প্রকৃত অবস্থা পরিস্ফুট হইত। দেওয়াল এবং খিলানগুলিব অধিকাংশই আঘাতের পর আঘাত খাইয়া চুরমার হইয়া যায়। যেগুলির মাথা তখনও দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফাটল ও গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। দরজা জানালায় কাঁচের কোন চিহ্নই ছিল না। চারিটী প্রধান থামের মধ্যে একটী একেবারেই চুরমার হইয়া যায়। মেঝের উপর গোলা পড়িয়া ফাটিয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ গুহার সৃষ্টি করিয়াছিল। গীর্জ্জার চতুর্দ্দিকে ৩৫টী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও খৃষ্ট শিষ্যের যে পাথরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহার প্রায় অধিকাংশই চূর্ণ বিচূর্ণ বা হতশ্রী হইয়া গিয়াছিল।
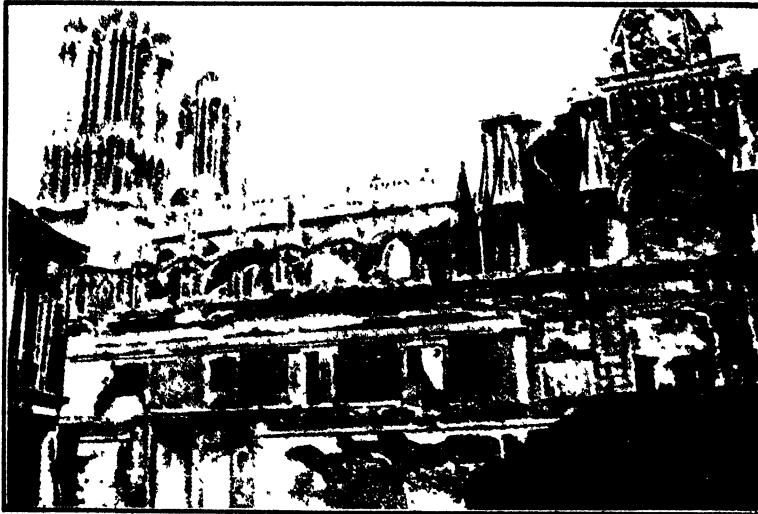
রীম্‌স্ ভজনালয়
(গোলাবর্ষণ হইবার একমাস পরের দৃশ্য)

যুদ্ধের পর সমস্ত খৃষ্টীয় জগতের দৃষ্টি এই পুরাতন গীর্জ্জার পুনর্গঠনের দিকে আকৃষ্ট হয়। দুই বৎসর কেবল মেঝে প্রস্তুত ও দেওয়ালগুলির পাথর সন্নিবেশিত করিতেই কাটিয়া গেল। তাহার পর কড়ি বরগা লাগান, খিলান তৈয়ারী এবং ছাদ তৈয়ার কার্য্যে হাত দেওয়া হইল। ছাদের কড়ি বরগা ইত্যাদি প্রধানতঃ ওক্ কাষ্ঠের উপর সিসা দিয়া মুড়িয়াই লাগান ছিল, কিন্তু ঐ ভাবে আবার উহার গঠন আধুনিক ইঞ্জিনিয়রদের মনঃপূত না হওয়ায় বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনিয়র মসিঁয়ে দিনোঁর স্কিম্ অনুসারে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে ফেরো-কন্‌ক্রীটের কড়ি বরগা লাগাইয়া আবার ছাদ তৈয়ার করা হয়। আবার যদি ওক্ কাষ্ঠের কড়ি বরগা দ্বারাই কাজ করিতে হইত তাহা হইলে আবশ্যক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেই ৫ বৎসর লাগিয়া যাইত এবং তাহার মূল্যও সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া পড়িত। ফেরো-কন্‌ক্রীটের আর একটা সুবিধা এই যে ইহার যে-কোন অংশ দরকার মত সমস্তটী না খুলিয়াই বদ্‌লান যাইতে পারে এবং আগুন বা শীত-গ্রীষ্ম ইহার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারে না। ছাদটী তৈয়ার করিতে প্রায় ১৩ মাস লাগিয়াছিল। দরজা জানালার রঙীন বা বিচিত্রিত কাঁচগুলির পুনঃস্থাপনা আর সম্ভবপর হয় নাই কারণ সেইরূপ জিনিষ আজকাল আর পাওয়া যায় না। পুরাতন কাঁচের টুক্‌রাগুলি সংগ্রহ করিয়া উহাই জুড়িয়া জুড়িয়া

লাগান হইয়াছে এবং যে সব টুক্‌রা পাওয়া যায় নাই তাহাদের স্থানে যতদূর সম্ভব সেইরূপ নূতন কাঁচ দিয়া যাহাতে পূর্ব্বেকার মত দেখায় সেইরূপ ভাবে কোনপ্রকারে সংযোগ করা হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য মসিঁয়ে জ্যাক্‌স্ সাইম্‌ন্‌কে অনেক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইঁহারা বংশপরম্পরায় এই গীর্জ্জার দরজা জানালার কাঁচ-গুলির প্রায় ২০০ শত বৎসর ধরিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। গীর্জ্জার বাহিরের চত্বরে যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল তাহার ছাঁচ ও ছবি প্রস্তুত করিয়া প্যারিসের ট্রকেডারোতে ও যাদুঘরে রাখা হইয়াছে।

"হিমাংশু"

নানা-কথা

অতীব দুঃখের বিষয় রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের কতটা যে ক্ষতি হইল তাহা বলা যায় না। তিনি কর্ম্মী রূপে বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক রূপে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক রোগ প্রপীড়িত জনসাধারণের সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংঘবদ্ধ রূপে কার্য্য করিবার ক্ষমতা যে অন্যজাতির অপেক্ষা বাঙ্গালীরও কম নয়, একথা তিনি সভ্যজগতের সমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতিকে তিনি উদাহরণ দ্বারা শিখাইয়াছেন যে স্বার্থপ্রতিষ্ঠার ভাব বিসর্জ্জন না দিলে কার্য্যসফলতা দুর্লভ। এই ত্যাগ-মন্ত্রে যে-কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন একজন। পরে সারদানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া সন্যাসী-পরিব্রাজক রূপে পৃথিবীর নানা স্থানে তিনি বেদান্ত প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার কার্য্যসীমা বঙ্গদেশেই বিশেষরূপে নিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু স্বামী সারদানন্দকে শুধু কর্ম্মযোগী রূপে দেখিলেই চলিবে না। তাহাতে তাঁহার প্রতি যত না হউক, আমাদের নিজেদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইবে। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। সুললিত ভাষা এবং মার্জ্জিত ভঙ্গী ছিল তাঁহার রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার রচনায় কোথাও ভাবের লঘুত্ব অথবা ওজস্বিতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাহার কারণ, সারদানন্দের ভিতরে গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত প্রকৃত ভাবুকতার সংমিশ্রণ হইয়াছিল। সাহিত্য-সাধনাও ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ—একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। তাঁহার রচিত 'ভারতে শক্তিপূজা' শুধু বঙ্গ সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার শেষ গ্রন্থ "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" তাঁহাকে বাংলাদেশে অমর করিয়া রাখিবে। ইংরাজীতে লিখিত তন্ত্রশাস্ত্রের উপর কতকগুলি প্রবন্ধ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিনি মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদীনে' প্রকাশিত করেন। সেগুলি য়ুরোপীয় বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

তাঁহার স্মরণে বাঙ্গালীর কল্যাণ হউক।

রবীন্দ্রনাথ যখন গতবার য়ুরোপ যাত্রা করেন তখন বিশ্বভারতীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার মহলানবিশ সস্ত্রীক তাঁহার অনুগমন করেন। মহলানবিশ-দম্পতি কবির সহিত য়ুরোপের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। কবির দেশে প্রত্যাগমনের পরেও মহলা-নবিশ মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্যের জন্য লণ্ডনে আরও কিছুদিন থাকিতে হয়। নানা দেশে সম্মান লাভ করিয়া শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার এবং তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নির্ম্মলা মহলানবিশ সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'জাভাযাত্রীর পত্র' শ্রীমতী নির্ম্মলা মহলানবিশকে লিখিত।

*   *   *

কবির প্রতিভার প্রথম উন্মেষের সময় 'মায়ার খেলা' রচিত হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি যে সুর তুলিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী তাহা আজও ভুলে নাই; আজও সে সুর তাহাদের প্রাণে প্রতিধ্বনি সৃজন করে। তাহার প্রমাণ তিনদিন ধরিয়া কলিকাতার 'এম্পায়ার থিয়েটারে' 'মায়ার খেলা' দেখিবার জন্য জনসমাগম। শেষ রজনীতে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিৎ শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল।

*   *   *

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ বাৎসরিক অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটীতে মিরাটে হইবে স্থির হইয়াছে। এই সম্মিলন বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের ও আদরের বস্তু। ইহা আমাদের জাতীয় একতা ও অন্তরঙ্গতার প্রতীক স্বরূপ। মৌলিক প্রবন্ধপাঠ ও তদ্বি-ষয়ক আলোচনা এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানটির প্রতি বাঙ্গালীমাত্রেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এ সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে হইলে শ্রী হরি মোহন মুখোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন, দুর্গাবাড়ী, সদর বাজার, মিরাট,—এই ঠিকানায় লিখিলে চলিবে।

*   *   *   *   *   *

'বিচিত্রা'র এবারকার প্রচ্ছদপট বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের পরিকল্পনা

আহ্বান

আমার তরে পথের পরে কোথায় তুমি থাকো
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখো
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইসারা পেয়ে গেছি মিলন আশে
শিশির-ধোওয়া আলোতে ছোঁওয়া শিউলি-ছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলী-কল ভাবে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে সেথায় সারা বেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে॥
কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাকো,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরী।
সরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলিনাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেই খানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।
পাষাণ ভিৎ টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক ফাটি'
ধূলায় চাপা অনলশিখা কাঁপারে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি',
সেথায় ভেরী বাজাও বারে বারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৪]

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের য়ুনিভার্সিটি

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত "য়ুনিভার্সিটি" বা "কলেজ" আছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় তত নাই। এই সমস্ত য়ুনিভার্সিটিতে অগণিত ছাত্র পড়ে, ইহাদের সংস্থিতি ও সম্প্রসারণের জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা হয়, ইহাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন —এই সকল কথা যাঁহারা ঐ দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যুক্তরাজ্যে "য়ুনিভার্সিটি" বলিতে সত্য সত্য কি বুঝায়, তাহা অনেকেই জানেন না। লর্ড ব্রাইস্ আমেরিকার য়ুনিভার্সিটির প্রশংসা করিলেও য়ুরোপে, বিশেষতঃ বিলাতে, আমেরিকার "য়ুনিভার্সিটি" কথায় অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যাঁহারা অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজের কথা মনে রাখিয়া আমেরিকার য়ুনিভার্সিটির বিচার করেন, তাঁহারা যথার্থই দেখিতে পান যে শুদ্ধ সাহিত্য ও জ্ঞানের চর্চ্চার দিকে আমেরিকার "কলেজ" বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঝোঁক খুব কম; এই সকল কলেজে humanist বা classical scholar-রা খুব বেশী উৎসাহ পান না। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা বিজ্ঞান (Science of Law) ইত্যাদি বিষয়ের চর্চ্চা এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে য়ুরোপ হইতেও বহু ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিতে যায়। তথাপি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও ব্যবসায়াত্মক বিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করিলেও, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেখানে ডিগ্রীলাভের জন্য যে শিক্ষা (Under-graduate education) দেওয়া হয় তাহা খুব সন্তোষজনক নহে। মার্কিণরা নিজেরাই এ-কথা স্বীকার করিয়া থাকেন।

"কন্টেম্পরেরী রিভিউ" পত্রের গত মার্চ্চসংখ্যায় এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে কি বুঝায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের লেখক বলেন যে আমেরিকার

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের য়ুনিভার্সিটি

কলেজগুলির শিক্ষাটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত তো নহেই, পরন্তু, ইহার অর্দ্ধেক কাজই যেন স্কুলের কাজ মাত্র। পাঠ্যবিষয়ের সংখ্যাও এত বেশী যে ছাত্ররা পল্লবগ্রাহী না হইয়াই পারে না। এই শিক্ষায় গভীর হইতে গভীরতর জ্ঞানলাভে কোন প্রকার সাহায্যই করে না। অতিশয় পরিশ্রমসহকারে-যে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে হয় ছাত্ররা তাহা অনুভব করে না; মনের অনুশীলন কিম্বা মেধার উৎকর্ষসাধনও সম্যক্‌রূপে হয় না। সুতরাং কলেজগুলিতে যে চারি বৎসর সাধ্যবসায় অধ্যয়নের কালে ছাত্রগণ নব নব জ্ঞানলাভের প্রেরণা পাইবে কিম্বা তাহাদের কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যাইত তাহার কিছুই হয় না। এই সমস্ত কলেজের সংস্থিতি প্রসারণের জন্য যে অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে তৎপরিমাণে ফল কিছুই পাওয়া যাইতেছে না।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারার্থে তীব্র আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু সংস্কার করিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান স্বরূপটি কি তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক। উক্ত পত্রের প্রবন্ধ-লেখকের মতে :—

(১) আমেরিকার প্রত্যেক কলেজে ছাত্রসংখ্যা অতিশয় বেশী। খুব বেশীসংখ্যক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে গেলে সেই শিক্ষা যে অত্যন্ত উঁচু দরের হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রতিভাশালী ছাত্রদের তাহাতে ক্ষতি হয়।

(২) নানা দেশের নানা লোক সেখানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। স্বদেশের কাল্‌চার্‌ বা শিক্ষার ধারা তাহারা ভুলিয়া গিয়া আমেরিকার জীবনের সঙ্গে তাহাদের জীবন মিশাইয়া দিতেছে। তাহাদের কাল্‌চারের কোন বনিয়াদ গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কলা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের চর্চ্চায় তাহারা কোন প্রেরণা পায় না।

(৩) ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হইলেও, লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়া পড়িতেছে। চিকাগোর কোন রুশীয় বালককে ইংরেজী সাহিত্যের ভাষা বাঙালী ছাত্রেরই মত বৈদেশিক ভাষারূপে শিখিতে হয়, যদিও কথাবার্ত্তায় কোন রকমে ইংরেজীতে মনের ভাব সে প্রকাশ করিতে পারে। এইজন্যই আমেরিকার য়ুনিভার্সিটির অনেক কৃতবিদ্য গ্র্যাজুয়েটেরও ইংরেজী জ্ঞান খুব সন্তোষজনক নহে। অবশ্য এই ভাষার বাধা সকল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই।

(৪) বিলাতের ছাত্রদের যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, মার্কিণ ছাত্রদের ততটা করিতে হয় না— মার্কিণ ছাত্ররা বিলাতের ছাত্রদের মত গ্রন্থকীট হয় না। ছাত্রদের গৃহে কিছু শিখিতে হইবে তাহা মার্কিণ শিক্ষকরা মনে করেন না।

(৫) বিলাতের ছাত্ররা classics-এ যতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, মার্কিণ ছাত্ররা ততটা পারে না। পরন্তু, প্রকৃতিবিজ্ঞান কিম্বা রসায়নে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তত বেশী নহে।

(৬) আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ত্রুটীর জন্য প্রবেশিকা স্কুলগুলিও অনেকটা দায়ী—এই সমস্ত স্কুলে ভাল শিক্ষাদান হয় না।

(৭) আমেরিকার ছাত্ররা পড়ার চেয়ে খেলায় বেশী সময় দেয়। খেলার শিক্ষককে প্রফেসরের সমান বেতন দেওয়া হয়।

(৮) আমেরিকার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে—এই শিক্ষার প্রতি তাহাদের প্রবল আকর্ষণ। তাহারা মনে করে, ডিগ্রিলাভ না করিলে সমাজে উচ্চ আসন লাভ কিম্বা যথোচিত অর্থোপার্জ্জন করা যায় না। তা'ছাড়া জ্ঞানের আদর্শদ্বারাও অনেকে অনুপ্রাণিত হয়। তাহারা মনে করে কলেজের শিক্ষালাভ না করিলে জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যায়।

(৯) যে কারণে হোক্‌, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে; ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিকই তো ছাত্রসংখ্যা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে, শিক্ষার উৎকর্ষ হইতে পারে না।

(১০) কোন কোন প্রদেশে (State-এ) সরকারী য়ুনিভার্সিটি-গুলিকে সরকারের রাজকীয় প্রয়োজনসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। সরকার এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে হাই-স্কুলগুলি হইতে প্রেরিত ছাত্রকে য়ুনিভার্সিটি ভর্ত্তি করিতে বাধ্য, যদিও ঐ স্কুলগুলির উপর য়ুনিভার্সিটির কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আরও চমৎকার কথা এই যে, হাইস্কুলের ছাত্রদের কোন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় না। স্কুলের কোর্স বা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য শেষ করিলেই ছাত্ররা হেডমাষ্টারের নিকট হইতে এক সার্টিফিকেট্‌ পায় এবং সেই সার্টিফিকেট দেখাইলেই য়ুনিভার্সিটি তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিতে বাধ্য। ফলে, দলে দলে অনুপযুক্ত ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, শিক্ষার আদর্শ ও মান ছোট হইয়া যায়।

(১১) মার্কিণ ছাত্রদের কলেজি-শিক্ষালাভের অনুপযুক্ততা এবং তাহাদের সংখ্যাধিক্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে তাহাতে য়ুরোপের মত উঁচুদরের শিক্ষা আমেরিকায় আশাই করা যায় না। সেইজন্য উচ্চদরের অধ্যাপকও পাওয়া যায় না।

সে যাহা হউক, উক্ত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি যেন সমাজকে কি করিয়া সেবা করিতে হইবে তাহারই শিক্ষা দিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত, এ-কথা না বলিয়া

ছিল না। কতকগুলি স্থানে প্রক্ষেপকের অঙ্গুলির ছাপ সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। কতকগুলি আবার সন্দেহজনক, প্রক্ষেপ হইতেও পারে-নাও পারে।

দ্বিতীয় যুগে যে রাজ-ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রামচন্দ্র ও জনকের চরিত্রে উজ্জ্বল, সেই রাজধর্ম্মের বিকারও রামায়ণ মহাভারত মনুসংহিতার প্রক্ষেপে বিদ্যমান। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব্বে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে অতি-বিস্তারের সহিত ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি আলোচিত হইয়াছে। আর এই পর্ব্বেই প্রক্ষেপকার তাঁহার বিকৃত নীতি সকল প্রবেশ করাইবার উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এমন সকল হেয় উপদেশ দিতেছেন যে, আদি মহাভারতকারের কল্পনায় তাহা থাকিতে পারে না। এই সকল নির্লজ্জ প্রক্ষেপের কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এই সমস্ত মতবাদের দ্বারা আমাদের অতীত ইতিহাসে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি যে কুটিলতা-মলিন ছিল এমন ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি অত্যন্ত উচ্চ আদর্শ ও অত্যন্ত নীচবৃত্তি সমর্থিত হইয়াছে। এক পাতায় যাহা বরেণ্য বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে, অপর পৃষ্ঠায় তাহাই অকার্য্য, বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। মহাভারতের মূলে যে আদর্শ তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহা সর্ব্বলোকবিদিত। যে সকল কদাচার সমর্থিত হইয়াছে ও দুর্নীতি ধর্ম্মনীতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু আলোচনা করিব। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, তাহার একস্থানে ভরদ্বাজ নামক কাহারও মত বলিয়া ভীষ্ম যাহা উপদেশ দিতেছেন তাহা এই:-

"শূন্য গৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার (নির্ধন রাজার) অতীব কর্ত্তব্য।" "মঙ্গলার্থী ব্যক্তি (রাজা) অঞ্জলী-বন্ধন, শপথ, মিষ্টবাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রু-মোচন করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিবে। যতদিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে ততদিন শত্রুকে স্কন্ধে বহন ও সময় অনুকূল হইলে তাহাকে প্রস্তর-নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে।" (মহাভারত ১২ পর্ব্ব, ১৪০ অধ্যায়)। আবার কোনও ঋষির বা শাস্ত্র-প্রণেতার দোহাই না দিয়া প্রক্ষেপকারী কতকগুলি নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মের উপদেশ ভীষ্মের মুখেই দিয়াছেন। ১৩০ অধ্যায়ে দুরবস্থায় পতিত রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সকল উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে তাহার কদর্য্যতা এত বেশী যে, যিনি প্রক্ষেপটি করিয়াছেন, তিনিও কৃপাপূর্ব্বক এইটুকু ভূমিকা না করিয়া পারেন নাই যে, "তুমি (যুধিষ্ঠির) এক্ষণে আমাকে (ভীষ্ম) অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত। এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই।" এইরূপ ভূমিকা করিয়া যে সকল উপায় বিবৃত হইয়াছে তাহাতে না সমাজ না ধর্ম্ম টিকিতে পারে। হিংসাই এস্থলে পৃথিবীতে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। স্বার্থ-রক্ষাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বার্থ-সাধনের জন্য ধন আবশ্যক, অতএব রাজা যে-কোনও প্রকারে ধন সংগ্রহ করিবে। বলপূর্ব্বক, ছল পূর্ব্বক, অত্যাচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, কেন না কোষই রাজার বলের মূল, বল ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। অথবা প্রজা-পালন করিতে হইলে ধর্ম্ম-রক্ষা করা চাই। তজ্জন্য বল চাই, বলের জন্য কোষ অর্থাৎ ধন চাই। "অতএব ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনবান ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবে।"

এই সকল উক্তি হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, কুপরামর্শ দিবার এবং অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া সমাজ নষ্ট করিবার মত লোক এখনকার ন্যায় আলোচ্য যুগেও ছিল। এমন কি তাঁহারা বহুল প্রচারিত ধর্ম্ম ও নীতি গ্রন্থের মধ্যেও কৌশলে ও প্রচ্ছন্নভাবে এই সকল দুর্নীতিপূর্ণ বাক্য প্রবেশ করাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই সকল দুর্নীতিই যে রাজনীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। ভারতবর্ষে যাঁহারা দুর্নীতিক শাস্ত্রের রূপ দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কৌটিল্যই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

Printed at the Modern Art Press, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51, Pataldanga Street, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড	কার্ত্তিক, ১৩৩৫	পঞ্চম সংখ্যা

চিরন্তন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধূলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চল্‌তেছিল হেঁকে।
হেন কালে নেবুর ডালে স্নিগ্ধ ছায়ায় উঠ্‌ল কোকিল ডেকে
পথ-কোণের ঘন বনের থেকে।

এই পাখীটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলে বেলায় গঙ্গাতীরে আপন মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলাম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্ব্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল—"তুমি আমার প্রিয়।"

সেই ধ্বনিটি কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে
জলের কলরবে
ওপার পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।
আজ এই পরবাসে
সেই ধ্বনিটি ক্ষুব্ধ পথের পাশে
গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিল আপন বাণী।
বনচ্ছায়ার শীতল শান্তিখানি
প্রভাত আলোর সঙ্গে করে নিবিড় কানাকানি
ঐ বাণীটির বিমল সুরে গভীর রমণীয়
"তুমি আমার প্রিয়।"

এরি পাশেই নিত্য হানাহানি ;
প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি
সরল বিশ্বাস ;
কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্ব্বনাশ।
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথিব্যাপী মানব বিভীষিকা
জ্বালায় মানব-লোকালয়ে প্রলয়-বহ্নি শিখা,
লোভের জালে বিশ্বজগৎ ঘেরে,
ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে।

হেনকালে স্নিগ্ধ ছায়ায় হঠাৎ কোকিল ডাকে
ফুল্ল অশোকশাখে ;
পরশ করে প্রাণে
যে শান্তিটি সব প্রথমে, যে শান্তিটি সবার অবসানে,
যে শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্ব্বচনীয়,
"তুমি আমার প্রিয়।"
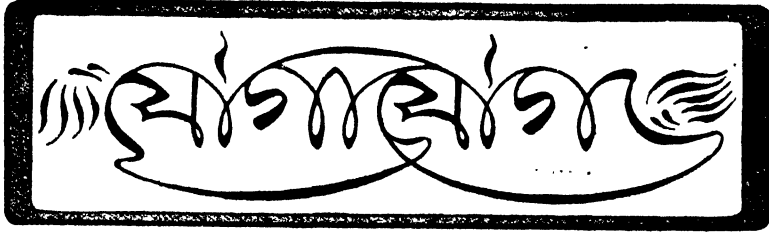
—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

এক দিন মধুসূদনকে সকলেই যেমন ভয় করত, শ্যামাসুন্দরীরও ভয় ছিল তেমনি। ভিতরে ভিতরে মধুসূদন তার দিকে কখনো কখনো যেন টলেছে, শ্যামাসুন্দরী তা আন্দাজ করেছিল। কিন্তু কোন দিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে যে ওর কাছে যাওয়া যায় তা ঠাহর করতে পারত না। হাৎড়ে হাৎড়ে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে, প্রত্যেক বার ফিরেছে ধাক্কা খেয়ে। মধুসূদন একনিষ্ঠ হ'য়ে ব্যবসা গ'ড়ে তুলছিল, কাঞ্চনের সাধনায় কামিনীকে সে অত্যন্তই তুচ্ছ করেছে, মেয়েরা সেই জন্যে ওকে অত্যন্তই ভয় করত। কিন্তু এই ভয়েরও একটা আকর্ষণ আছে। রুক্ষ রুক্ষ বক্ষ এবং সঙ্কুচিত ব্যবহার নিয়েই শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ একটা আবরণের আড়ালে মুগ্ধ মনে মধুসূদনের কাছে কাছে ফিরেছে। এক একবার যখন অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিয়েছে, সেই সময়েই যথার্থ ভয়ের কারণ ঘটেচে। তার অনতিপরেই কিছুদিন ধ'রে বিপরীত দিক থেকে মধুসূদন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ওর জীবনে মেয়েরা একেবারেই হেয়। তাই এতকাল শ্যামাসুন্দরী নিজেকে খুবই সংযত ক'রে রেখেছিল।

মধুসূদনের বিয়ের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। কুমুকে মধুসূদন যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতোই অবজ্ঞা করত, তা' হ'লে সেটা একরকম সহ্য হ'ত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখ্‌লে রাশ আলগা দিয়ে মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠ্‌তে পারে, তখন সংযম রক্ষা তার পক্ষে আর সহজ রইল না। এ কয়দিন সাহস ক'রে যখন-তখন একটু একটু এগিয়ে আসছিল, দেখেছিল এগিয়ে আসা চলে। মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প বাধা পেয়েছে, কিন্তু সেও দেখ্‌লে কেটে যায়। মধুসূদনের দুর্ব্বলতা ধরা পড়েচে, সেই জন্যেই শ্যামার নিজের মধ্যেও ধৈর্য্য বাঁধ মানতে আর পারে না। কুমু চ'লে আসবার আগের রাত্রে মধুসূদন শ্যামাকে যত কাছে টেনেছিল এমন তো আর কখনোই হয়নি। তার পরেই ওর ভয় হোলো পাছে উল্টো ধাক্কাটা জোরে এসে লাগে। কিন্তু এটুকু শ্যামা বুঝে নিয়েচে যে, ভীরুতা যদি না করে তবে ভয়ের কারণ আপনি কেটে যাবে।

সকালেই মধুসূদন বেরিয়ে গিয়েছিল, বেলা একটা পেরিয়ে বাড়ি এসেচে। ইদানীং অনেক কাল ধ'রে ওর স্নানাহারের নিয়মের এমন ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজ বড়ই ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে বাড়িতে যেই এল, প্রথম কথাই মনে হ'ল, কুমু তার দাদার ওখানে চ'লে গেছে এবং খুসি হ'য়েই চ'লে গেছে। এতকাল মধুসূদন আপনাতে আপনি খাড়া ছিল, কখন্ এক সময়ে ঢিল দিয়েচে, শরীর মনের আতুরতার সময় কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আশ্রয় করবার সুপ্ত ইচ্ছা ওর মনে উঠেছে জেগে, সেই জন্যেই অনায়াসে কুমুর চ'লে যাওয়াতে ওর এমন ধিক্কার লাগল। আজ ওর খাবার সময়ে শ্যামাসুন্দরী ইচ্ছা ক'রেই কাছে এসে বসেনি; কি জানি কাল রাত্রে নিজেকে ধরা দেবার পরে মধুসূদন নিজের উপর পাছে বিরক্ত হ'য়ে থাকে। খাবার পর মধুসূদন

শূন্য শোবার ঘরে এসে একটুখানি চুপ ক'রে থাক্‌ল, তার পরে নিজেই শ্যামাকে ডেকে পাঠালে। শ্যামা লাল রঙের একটা বিলিতি শাল গায়ে দিয়ে যেন একটু সঙ্কুচিত ভাবে ঘরে ঢুকে এক ধারে নত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। মধুসূদন ডাকলে, "এসো, এইখানে এসো, বোসো।"

শ্যামা শিওরের কাছে ব'সে "তোমাকে যে বড়ো রোগা দেখাচ্চে আজ" ব'লে একটু ঝুঁকে প'ড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মধুসূদন বল্‌লে, "আঃ, তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা।"

রাত্রে মধুসূদন যখন শুতে এলো শ্যামাসুন্দরী অনাহূত ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "আহা, তুমি একলা।"

শ্যামাসুন্দরী একটু যেন স্পর্দ্ধার সঙ্গেই কোনো আর আবরণ রাখতে দিলে না। যেন অসঙ্কোচে সবাইকে সাক্ষী রেখেই ও আপনার অধিকার পাকা ক'রে তুল্‌তে চায়। সময় বেশি নেই, কবে আবার কুমু এসে পড়বে, তার মধ্যে দখল সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দখলটা প্রকাশ্য হ'লে তার জোর আছে, কোনোখানে লজ্জা রাখলে চল্‌বে না। অবস্থাটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাসী চাকরদের মধ্যেও জানাজানি হোলো। মধুসূদনের মনে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যত বড়ো জোরে চাপা ছিল, তত বড়ো জোরেই তা' অবারিত হোলো, কাউকে কেয়ার করলে না, মত্ততা খুব স্থূল ভাবেই সংসারে প্রকাশ ক'রে দিলে।

নবীন মোতির মা দুজনেই বুঝলে এ বান আর ঠেকানো যাবে না।

"দিদিকে কি ডেকে আন্‌বে না? আর কি দেরি করা ভালো?"

"সেই কথাই তো ভাবচি। দাদার হুকুম নইলে তো উপায় নেই। দেখি চেষ্টা ক'রে।"

যে দিন সকালে কৌশলে দাদার কাছে কথাটা পাড়বে ব'লে নবীন এলো, দেখে যে দাদা বেরোবার জন্যে প্রস্তুত, দরজায় কাছে গাড়ি তৈরি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথাও বেরুচ্চ নাকি?"

মধুসূদন একটু সঙ্কোচ কাটিয়ে বল্‌লে, "সেই গণৎকার বেঙ্কট স্বামীর কাছে।"

নবীনের কাছে দুর্ব্বলতা চাপা রাখতেই চেয়েছিল। হঠাৎ মনে হোলো ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই সুবিধা হ'তে পারে। তাই বল্‌লে, "চলো আমার সঙ্গে।"

নবীন ভাবলে, সর্ব্বনাশ! বল্‌লে, "দেখে আসিগে সে বাড়িতে আছে কি না। আমার তো বোধ হচ্চে সে দেশে চ'লে গেছে, অন্তত সেই রকম তো কথা।"

মধুসূদন বল্‌লে, "তা' বেশ তো, দেখে আসা যাক্ না।"

নবীন নিরুপায় হ'য়ে সঙ্গে চল্‌ল, কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণলে।

গণৎকারের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই নবীন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে একটু উঁকি মেরেই বল্‌লে, "বোধ হচ্চে কেউ যেন বাড়িতে নেই।"

যেমন বলা, সেই মুহূর্ত্তেই স্বয়ং বেঙ্কটস্বামী দাঁতন চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল। নবীন দ্রুত তার গা ঘেঁষে প্রণাম ক'রে বল্‌লে, "সাবধানে কথা কবেন।"

সেই এঁদো ঘরে তক্তপোষে সবাই বসল। নবীন বসল মধুসূদনের পিছনে। মধুসূদন কিছু বলবার আগেই নবীন ব'লে বস্‌ল, "মহারাজের সময় বড়ো খারাপ যাচ্চে, কবে গ্রহ শান্তি হবে ব'লে দাও শাস্ত্রীজি।"

মধুসূদন নবীনের এই ফাঁস-ক'রে-দেওয়া প্রশ্নে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে তার উরুতে খুব একটা টিপনা দিলে।

বেঙ্কট স্বামী রাশিচক্র কেটে একেবারে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলে মধুসূদনের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি প'ড়েচে।

গ্রহের নাম জেনে মধুসূদনের কোনো লাভ নেই, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা শক্ত। যে-যে মানুষ ওর সঙ্গে শত্রুতা করচে স্পষ্ট ক'রে তাদেরই পরিচয় চাই, বর্ণমালার যে বর্গেই পড়ুক নাম বের করতে হবে। নবীনের মুস্কিল এই যে, সে মধুসূদনের আপিসের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ইসারাতেও সাহায্য খাটবে না। বেঙ্কট স্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায় আর মধুসূদনের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়। আজকের দিনে নামের বেলায় ভৃগুমুনি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পূর্ণ নীরব। হঠাৎ শাস্ত্রী ব'লে বস্‌ল, শক্রতা করচে এক জন স্ত্রীলোক।

নবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই স্ত্রীলোকটি যে শ্যামাসুন্দরী এইটে কোনো মতে খাড়া করতে পারলে আর ভাবনা নেই। মধুসূদন নাম চায়। শাস্ত্রী তখন বর্ণমালার বর্গ সুরু করলে। কবর্গ শব্দটা ব'লে যেন অদৃশ্য ভৃগুমুনির দিকে কান পেতে রইল—কটাক্ষে দেখতে লাগল মধুসূদনের দিকে। কবর্গ শুনেই মধুসূদনের মুখে ঈষৎ একটু চমক দিলে। ওদিকে পিছন থেকে "না" সঙ্কেত ক'রে নবীন ডাইনে বাঁয়ে লাগালো ঘাড়-নাড়া। নবীনের জানাই নেই যে মাদ্রাজে এ সঙ্কেতের উল্টো মানে। বেঙ্কট স্বামীর আর সন্দেহ রইল না—জোর গলায় বল্‌লে, ক বর্গ। মধুসূদনের মুখ দেখে ঠিক বুঝেছিল ক বর্গের প্রথম বর্ণটাই। তাই কথাটাকে আরো একটু ব্যাখ্যা ক'রে শাস্ত্রী বললে, এই কয়ের মধ্যেই মধুসূদনের সমস্ত কু।

এর পরে পুরো নাম জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি না ক'রে ব্যগ্র হ'য়ে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলে, "এর প্রতিকার ?"

বেঙ্কটস্বামী গম্ভীর ভাবে ব'লে দিলে, "কণ্টকেনৈব কণ্টকং"—অর্থাৎ উদ্ধার করবে অন্য এক জন স্ত্রীলোক।

মধুসূদন চকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বেঙ্কটস্বামী মানব চরিত্র-বিদ্যার চর্চ্চা করেচে।

নবীন অস্থির হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজি, ঘোড়দৌড়ে মহারাজার ঘোড়াটা কি জিতেছে ?"

বেঙ্কটস্বামী জানে অধিকাংশ ঘোড়াই জেতে না, একটু হিসাবের ভাণ ক'রে ব'লে দিলে—"লোকসান দেখতে পাচ্চি।"

কিছুকাল আগেই মধুসূদনের ঘোড়া মস্ত জিৎ জিতেছে। মধুসূদনকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ ক'রে নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজি, আমার কন্যাটার কি গতি হবে ?" বলা বাহুল্য, নবীনের কন্যা নেই।

বেঙ্কটস্বামী নিশ্চয় ঠাওরালে পাত্র খুঁজচে। নবীনের চেহারা দেখেই বুঝলে, মেয়েটি অপ্সরা নয়। ব'লে দিলে পাত্র শীঘ্র মিলবে না, অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে।

মধুসূদনকে একটু অবসর না দিয়ে পরে পরে দশ বারোটা অসঙ্গত প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর বের ক'রে নিয়ে নবীন বল্‌লে, "দাদা আর কেন ? এখন চলো।"

গাড়িতে উঠেই নবীন ব'লে উঠ্‌ল, "দাদা, ওর সমস্ত চালাকি। ভণ্ড কোথাকার !"

"কিন্তু সে দিন যে—"

"সে দিন ও আগে থাকৃতে খবর নিয়েছিল।"

"কেমন ক'রে জানলে যে আমি আসব ?"

"আমারই বোকামি। ঘাট হ'য়েচে ওর কাছে তোমাকে এনেছিলুম।"

জ্যোতিষীর প্রতারণার প্রমাণ যতই পাক, কবর্গের কু মধুসূদনের মনে বিঁধে রইল। ভেবে দেখ্‌লে যে, নক্ষত্র অনাদর ক'রে খুচরো প্রশ্নের যা' তা' জবাব দেয়, কিন্তু আদত প্রশ্নের জবাবে ভুল হয় না। মধুসূদন যার প্রত্যাশাই করেনি সেই দুঃসময় ওর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এল। এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কি হবে ?

নবীন আস্তে আস্তে কথা পাড়ল, "দাদা, তুই সপ্তাহ তো কেটে গেল, এইবারে বৌরাণীকে আনিয়ে নিই।"

"কেন, তাড়া কিসের ? দেখ নবীন, তোমাকে ব'লে রাখ্‌লুম আর কখনোই এ সব কথা আমার কাছে তুলবে না। যে দিন আমার খুসি আমি আনিয়ে নেব।"

নবীন দাদাকে চেনে, বুঝ্‌লে এ কথাটা খতম হ'য়ে গেল।

তবু সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "মেজবৌ যদি বৌরাণীকে দেখ্‌তে চায় তা' হ'লে কি দোষ আছে ?"

মধুসূদন অবজ্ঞা ক'রে সংক্ষেপে বললে, "যাক না !"

(ক্রমশঃ)

আনন্দের সন্ধান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে করা যাক্ আমরা কাব্য পড়চি; সে কাব্যের ভাষা ভাল জানিনে। বানান, শব্দরূপ, অলঙ্কার, ছন্দের নিয়ম আলোচনা ক'রে ক'রে বহু কষ্টে একপা একপা ক'রে অগ্রসর হ'তে হচ্চে। প্রত্যেক শব্দটাকে স্বতন্ত্র ক'রে—তার অর্থ এবং রূপ নির্দ্ধারণ কর্ত্তে গিয়ে মনে হয় এই রকম শব্দযোজনা কি ভয়ঙ্কর দুঃসাধ্য! তখন মনে হয় কাব্য জিনিষটা ব্যাকরণ অলঙ্কারের বন্ধনে জর্জ্জরিত, এ একটা কৃচ্ছ্রসাধনেরই ক্ষেত্র; দুঃখ হতেই এর উৎপত্তি এবং পাঠককে দুঃখ দেওয়াই এর লক্ষ্য।

এমন সময় যদি কোন রসজ্ঞের দেখা পাই, তবে তার ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারি যে কাব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা ধারণাটা ভুল ধারণা। তখন বুঝতে পারি কাব্যের মধ্যে দুর্গম নিয়ম, দুঃসাধ্য কৌশল, বিষম ক্লান্তির পরিশ্রম, এগুলো মায়া বল্‌লেই হয়। এগুলো ততক্ষণ প্রতীয়মান হয়, যতক্ষণ কাব্যের সত্যকে আমরা না পাই। কবির আনন্দকে যখনি দেখি সেই মুহূর্ত্তেই এই সমস্ত নিয়ম কৌশল পরিশ্রম আর দেখ্‌তেই পাইনে।

কিন্তু যে হতভাগ্য সেই আনন্দে পৌঁছতে পারল না, যে ব্যক্তি প্রভূত বাধার রণক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গে শব্দের সংগ্রাম দেখ্‌চে, সে স্বভাবতই বলতে পারে যে, "তুমি যে আনন্দের কথা বল্‌চ কাব্যপদার্থের মধ্যে কোথাও তার প্রমাণ নেই। ওটা তোমার নিজেরই একটা সৌখীন কল্পনা; তুমি নিতান্ত চোখ বুজে এর দুঃখরূপটা দেখ্‌চ না, সেটা তোমার চিত্তের অসাড়তা।" তা হোক্, যে সন্দিগ্ধ সে আপন সন্দেহ নিয়েই থাকুক, কিন্তু মোটের উপর আমরা এই বুঝি যে, কাব্য সম্বন্ধে কাব্যরসিকের সাক্ষ্য হচ্চে চূড়ান্ত।

তেম্‌নি ক'রেই তাঁর কথা আমরা মেনে নেব যিনি বলেচেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" তিনি জগতের আনন্দরূপ দেখেচেন, আমরা তেমন ক'রে দেখতে পাইনি। কিন্তু যে লোক দেখেনি তার সাক্ষ্যটাই কি প্রামাণ্য?

এই বিশাল বিশ্ব-সৃষ্টিকে যারা বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌তে লেগেছে তারা নিয়মের পর নিয়ম দেখ্‌চে। এর মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার কোনো আনন্দ ত পরীক্ষাগারের কোনো যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়েনি, নিয়মে নিয়মে একেবারে ঠাসা, কোথাও তার একটু ফাঁক নেই। এই সব সারবন্দী সাক্ষীর দল, যাদের হাতে পায়ে নিয়মের লোহার বেড়ি—এদের কাছ থেকে ত আনন্দের প্রমাণ মিল্‌বে না।

এমন সময়ে যিনি দেখ্‌লেন তিনি এক দৃষ্টিতেই দেখ্‌লেন, তিনি ব'লে বসলেন, আদি অন্তে মধ্যে এই সৃষ্টির অর্থ আনন্দ। তিনি অন্তরের মধ্যে সৃষ্টির ঠিক রসটি পেয়েছেন, তাই তিনি এক কথায় বলে' দিলেন—"যেটাকে তুমি বোধ কর্‌চ নিয়মের বন্দীশালা, সেইটেই আনন্দ নিকেতন।"

বড় দুঃখের এবং পরম আনন্দের এই দুই অভিজ্ঞতা পরস্পর-বিরোধী। এক জায়গায় চোখ কানের সুস্পষ্ট প্রমাণ, আর এক জায়গায় চিত্তের অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধি। এর মধ্যে কোন্‌টি চরম সেটা জানা চাই।

তর্কের কথা থাক্। বিশ্ব-নিয়মের ভিতর দিয়ে আনন্দের রূপ কি দেখিনি? নক্ষত্রখচিত নিশীথরাত্রে, বসন্তের পুষ্পিত কাননে, পাখীর পাখায় এবং কণ্ঠে, মানুষের প্রেম এবং আত্মত্যাগে? এই সব দেখা যখনি ঠিক মত দেখেচি তখনি ভিতর থেকে মন বলেচে, কদর্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অপবিত্রতা সমস্তকে অতিক্রম ক'রে এই সত্যই সত্য। কিন্তু যাঁরা জগতের আনন্দরূপের কথা বলেচেন, তাঁরা কেবল মাত্র এই বাইরের প্রমাণ থেকে বলেননি। তাঁদের কাছে নিজের অন্তরতম স্বত-উৎসারিত অমৃতরসের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আস্বাদন থেকেই বিশ্বের চরম রস-ধারা পড়ে।

যাই হ'ক, তুই দল সাক্ষীর দ্বন্দ্ব, যা আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেই দ্বন্দ্বের একটা কারণ আছে। অনন্তের প্রকাশ অন্তের মধ্যে, অমৃতের প্রকাশ মৃত্যুর মধ্যে; যেমনতর, কাব্যের প্রকাশের বাহনটা হচ্ছে ব্যাকরণ। আমরা প্রকাশের উপকরণকে প্রকাশের সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে এমন একটা জিনিষ দেখ্‌তে পাই যেটা নিরর্থক, যেটা কষ্টকর, যেটা থেকে কোনো মতে নিষ্কৃতি পাওয়াই মুক্তি।

প্রকাশের সত্য থেকে প্রকাশের বাহনকে বিচ্ছিন্ন করলে আমরা যে জগৎকে দেখি সেটাই হচ্ছে মৃত্যুর জগৎ, শক্তির জগৎ। তুটিকে সম্মিলিত ক'রে যে জগৎ দেখি সেই হচ্চে অমৃতের জগৎ, আনন্দের জগৎ।

জরামৃত্যুর জগতে মানুষ যে-শক্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে কাজ করচে সে হচ্চে বাসনার শক্তি। প্রকৃতি এই শক্তির তাড়া দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করে। তাই এই শক্তির নাম প্রবৃত্তি। প্রকৃতির ক্ষেত্রে আমাদের যত কিছু কাজ সেই সব কাজে এই শক্তি আমাদের প্রবৃত্ত করায়। অথচ এম্‌নি মায়া যে, আমাদের মনে হয় এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই যেন আমাদের স্বাধীনতা। প্রবলের ভয়ে আমরা যেখানে তার কাছে দাসত্ব স্বীকার করছি সেখানে আমরা যেমন ভয়েরই অধীন, তেমনি অত্যাচারের দ্বারা যেখানে আমরা দশের উপর প্রভুত্ব করচি সেখানেও আমরা ক্ষমতা-লালসার অধীন। তুই অধীনতাই প্রকৃতির অধীনতা, অর্থাৎ বাইরের অধীনতা, অতএব এ'কে স্বাধীনতা বলাই চলে না। এম্‌নি ক'রে মৃত্যুর রাজত্বে মানুষ যে উত্তেজনায় চল্‌চে সে প্রবৃত্তির উত্তেজনা।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে যিনি আছেন এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের তফাৎ হচ্চে। বাইরের কোনো তাড়নায় তাড়িত হ'য়ে তিনি কিছু করচেন না। তাই উপনিষৎ যখন তাঁর কর্ত্তৃস্বরূপের কথা বলচেন তখন তাঁকে বলেচেন স্বয়ম্ভু, পরিভূ। এই আত্মার ইচ্ছা প্রকাশ করাকেই বলে আনন্দ, এই "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"।

এই আনন্দ আপন ইচ্ছাতেই আপনি বন্ধন স্বীকার করে, কারণ নিয়ম-বন্ধনের মধ্যেই আত্মার প্রকাশ। সুতরাং এখানে মুখ্য সত্যটি হচ্চে সেই ইচ্ছা, গৌণ হচ্চে নিয়ম-বন্ধন। সেই জন্যে আনন্দের জগতে যে আছে তার কাছে নিয়ম সেই ইচ্ছার পশ্চাতে নিজেকে সঙ্কৃত ক'রে রাখে; যেমন কাব্যের আনন্দরূপ যারা দেখে তাদের কাছে ব্যাকরণ অলঙ্কারের নিয়মরূপটি আনন্দের পশ্চাতে অভিভূত ও অগোচর হ'য়ে থাকে।

এই আনন্দের জগৎ হচ্চে ত্যাগের দ্বারা আত্মপ্রকাশের জগৎ। এখানে আত্মার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য আত্মোৎসর্জ্জনের দ্বারা নিজেকে নিয়ম-ব্যক্ত করে। তাই অমৃতলোকে আমাদের অধিকার প্রবৃত্তির উল্টা পথে, ত্যাগের পথে।

এই জন্যে অমৃতের সাধনা কেবলমাত্র ধ্যান করা মন্ত্রোচ্চারণ করা নয়। প্রতিদিন এমন একটি কর্ম্মধারা আশ্রয় করা যেটির দ্বারা নিজেকে দান করতে পারি। এমন কোন কাজ করা, ধন মান খ্যাতির দ্বারা যার কোন মজুরি মিলবে না—যা সম্পূর্ণই নিজেকে ত্যাগ। এই প্রত্যহ ত্যাগের অভ্যাসেই মৃত্যুর বন্ধন ক্ষয় হয়, অমৃতের উপলব্ধি উজ্জ্বল হয়, এই ত্যাগের দ্বারাই আত্মাকে জানি।

এই বাধা-নির্ম্মুক্ত আত্মাকে নিজের মধ্যে যে পরিমাণে জান্‌ব সেই পরিমাণেই সুখদুঃখের দ্বন্দ্বক্ষেত্র থেকে আনন্দের ক্ষেত্রে পৌঁছব, সেই পরিমাণেই জান্‌তে পারব, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। তখন সুখদুঃখের অভিঘাত এবং নিয়মের বন্ধন যে থাক্‌বে না তা নয়, কিন্তু ওস্তাদের অঙ্গুলিতে সেতারের তারের আঘাত যেমন থাকে অথচ সে আঘাত যেমন সঙ্গীতে পরিণত হ'তে থাকে—তেমনি হয়েই থাক্‌বে।

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৩

বসন্ত যখন আসে তখন এমনি ক'রেই আসে। তখন ফুল যত ফোটে কুঁড়ি ঝ'রে যায় তার বেশী, যত ফুল সফল হয় তার বেশী ফুল হয় নিষ্ফল। "বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের খেলা রে? দেখিস্ নে কি ঝরা ফুলের মরা ফুলের মেলা রে?" লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী তবু; অপরিসীম লাভ, সেই অপরিসীমতাকে বলি বসন্ত। জীবনের চেয়ে জরা ব্যাধি মৃত্যুই বেশী; তবু অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।

জার্ম্মেনীতে এসে দেখতে পাচ্ছি জাতির জীবনে বসন্ত এসেছে। জার্ম্মানদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে কিছুদিন আগে এরা যুদ্ধে হেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে এবং এখনো এরা অংশত পরাধীন ও অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত। মুখে হাসি নেই এমন মানুষ আছে কি না খোঁজ নিতে হয়, এবং সকলেরই স্বাস্থ্য অনবদ্য। অথচ যুদ্ধে এরা প্রত্যেকেই ধন জন হারিয়েছে এবং মার্ক্‌মুদ্রার পতনকালে এদের অধিকাংশের সর্ব্বস্ব গেছে। কিন্তু সর্ব্বস্ব গেলেও যদি যৌবন থাকে তবে সর্ব্বস্ব ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। জার্ম্মেনীর লোক ধন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু যৌবন দেয়নি। তাই এমন অবিশ্রান্ত যৌবনচর্চ্চা চলেছে ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে। যারা গেছে তাদের স্থান পূরণ করছে যারা এসেছে তারা, শিল্পে বিজ্ঞানে ক্রীড়ায় কৌতুকে নবীন জার্ম্মেনীর পরাক্রম দেখে মনে হয় না যে প্রবীণ জার্ম্মেনী বেঁচে থাক্‌লে এর বেশী পরাক্রান্ত হ'তে পার্‌ত।

বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ঝরাতে হয় লাখে লাখে, সমাজকে তেমনি মানুষ খোয়াতে হয় লাখে লাখে! প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সর্ত্ত এই যে প্রকৃতি আমাদের যা দেবে তা আমরা পালা ক'রে ভোগ কর্‌বো। আমাদের এক দলকে মর্‌তে হবে আরেক দলকে বাঁচতে দেবার জন্যে। মৃত্যুর মধ্যে যে তত্ত্ব আছে সে আর কিছু নয়, সে এই—যারা জন্মায়নি তাদেরকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে যারা জন্মেছে তারা মরবে। সমাজকে তাই হয় দুর্ভিক্ষের জন্যে নয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে হয়—দুর্ভিক্ষের মরা তিলে তিলে, যুদ্ধের মরা এক নিমেষে।* দুর্ভিক্ষে যারা মরে তারা আগে থাক্‌তে দুর্ব্বল, তারা সাধারণতঃ বৃদ্ধ কিম্বা শিশু কিম্বা স্ত্রীলোক। আর যুদ্ধে যারা মরে তারা যুবা, সব চেয়ে বলবান, সব চেয়ে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। যে সমাজের যৌবন অফুরন্ত সে সমাজ যুবাকেই মর্‌তে পাঠায় যুবাকে স্থান ছেড়ে

* যে সমাজ দুর্ভিক্ষও চায় না যুদ্ধও চায় না সে সমাজের তৃতীয় পন্থা জন্মশাসন। গান্ধীমার্কা জন্মশাসনে দুর্ভিক্ষের ভাব আছে—অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার মৃত্যু। টোপর্‌মার্কা জন্মশাসনে যুদ্ধের ভাব আছে—অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার হত্যা। কিন্তু যে সমাজ না চায় দুর্ভিক্ষ না চায় যুদ্ধ না চায় কোনো প্রকার জন্মশাসন, সে সমাজের আব্‌দার প্রকৃতির অসহ্য।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

দেবার জন্যে, সে সমাজ কোনোদিন যুবার অভাব বোধ করে না। আর যে সমাজের যৌবন অল্প তার ব্যবস্থা অন্যরকম, সে সমাজের যৌবন শুকিয়ে শুকিয়ে লোলচর্ম্ম হ'লে পরে যখন তার মৃত্যু আসে তখন এক স্থবিরের স্থান পূরণ করতে থুড় থুড় ক'রে অগ্রসর হয় আরেক স্থবির। ঠাকুরদা মশায়ের পরে জ্যাঠামশায়, তার পরে বাবা মশায়, তার পরে কাকা মশায়, তার পরে দাদা, তার পরে আমি। চুল না পাক্‌লে রাজত্ব কর্‌বার অধিকার কারুর নেই। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই বার্দ্ধক্য চর্চ্চা কর্‌তে হয়।

কিন্তু ইউরোপে দেখছি বিপরীত ব্যাপার। যৌবন রক্ষা কর্‌বার জন্যে মহাস্থবিরেরা monkey glandএর শরণ নিচ্ছেন, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারা বালক বালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি গায় খোলা জায়গায় সাঁতার কাটছেন, নৌকা চালাচ্ছেন, কঠিন কাঠের তক্তার উপরে প'ড়ে প'ড়ে মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণে সিদ্ধ হচ্ছেন। এটাও একটা ফ্যাসান, কিন্তু ফ্যাসান তো weather cockএর মতো দেখিয়ে দেয় বাতাস কোন দিক থেকে বইছে। যুদ্ধের আগে জার্ম্মেনীতে প্রত্যেক পুরুষকেই রণশিক্ষা কর্‌তে হতো। এখন তার উপায় নেই, কিন্তু সংস্কার যায় কোথায়? জার্ম্মানদের বহু-কালাগত আদর্শ মানুষকে হ'তে হবে "blood and iron"। পুরুষদের সঙ্গে এখন মেয়েরাও যোগ দিয়েছে, জাতীয় দুর্দ্দশা স্মরণ ক'রে কেউ তাদের বাধা দিতেও পার্‌ছে না। চার্চ্চ একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল। ওরা বল্লে, অমন কর্‌লে চার্চ্চ্‌ মান্‌বো না। তখন চার্চ্চ্‌ হাল ছেড়ে দিলে। জার্ম্মানদের মতো গোঁড়া খৃষ্টান জাতি নিতান্ত দায়ে না ঠেক্‌লে এ অনাচার সহ্য করতো না।

যারা যুদ্ধে প্রাণ দেয় তারা দেশের সব চেয়ে প্রাণবান পুরুষ। যাঁরা বেঁচে থাকে তারা বালবৃদ্ধবনিতা। তবু তাদেরি ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টির উদ্গম যখন হয় তখন অবাক হ'য়ে দেখি এ সৃষ্টিও আগেরি মতো পরাক্রান্ত। তখন মনে হয় একে পরাক্রান্ত হবার সুযোগ দেবার জন্যেই আগের সৃষ্টিকে ধ্বংস হ'তে হলো। জীবনকে আমরা ব'লে থাকি লীলা, এরা ব'লে থাকে সংগ্রাম। একই কথা। কেননা লীলা যেমন নবনবোন্মেষ, সংগ্রামও তেমনি নূতন সৃষ্টির জন্যে পুরাতনের ধ্বংস। বহু শতাব্দী ধ'রে দেখা যাচ্ছে প্রতি পুরুষে (generationএ) ফ্রান্স্ একবার ক'রে নিঃক্ষত্রিয় হয়, তার বলবান পুরুষরা প্রাণ দেয়, তার সুন্দরী নারীরা nun হ'য়ে যায়। তবু ভস্মের ভিতর থেকে আগুন জ্ব'লে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্ত্তি পুরাতন ফ্রান্সের গৌরবকে ম্লান ক'রে দেয়। "হইলে হইতে পারিত" কথাটা অক্ষম দেশের পক্ষে প্রযুজ্য; ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফ্রান্স্ যা হ'য়েছে তাই এত আশ্চর্য্য যে, এই হওয়াটার খাতিরে তার "হইলে হইতে পারা"টা চিরকালের মতো না-হওয়া থেকে গেল। যা হ'তে পার্‌তুম তাই যদি হতুম, তবে যা হয়েছি তা হ'তে পারতুম না। বাস্তবটা এমন শোচনীয় নয় যে সম্ভাব্যতার জন্যে হাহুতাশ কর্‌বো। স্বর্গ থাক্‌লে মর্ত্ত্য যদি না থাকে তবে চাইনে স্বর্গ।

মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন ক'রে দিয়ে জার্ম্মানী নতুন দিনের আলোয় নতুন ক'রে বাঁচ্‌ছে। তার ধনবল নেই, সৈন্যবল নেই, কিন্তু তার লক্ষ লক্ষ বালকবালিকা যুবক যুবতী প্রৌঢ়প্রৌঢ়া যেরূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবনচর্চ্চা কর্‌ছে তা দেখে মনে হয় ভাবীকালের জার্ম্মান জাতিকে নিয়ে আবার বিপদ বাধ্‌বে। জার্ম্মেনী যা করছে তার কোথাও কিছু কাঁচা রাখ্‌ছে না। পৃথিবীর যেখানে যে বিষয়ে যে বই প্রকাশিত হয় জার্ম্মেনী তার অনুবাদ ক'রে পড়ে, অতি ক্ষুদ্র শহরের অতি ক্ষুদ্র দোকানেও আমি ভারতীয় আর্টের উপরে লেখা বৃহৎ বই এবং মহাত্মা গান্ধীর Young Indiaর অনুবাদ দেখ্‌লুম! তা ব'লে ভারতবর্ষের প্রতি জার্ম্মানীর পক্ষপাত নেই, Sigrid Undsetএর নূতনতম বইয়ের অনুবাদও সে দোকানে ছিল এবং যে বই অল্পদিন আগে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে সে বই অনুবাদ কর্‌তে জার্ম্মেনীর বিলম্ব হয়নি। জার্ম্মেনীর ছোট ছোট শহরেও যেসব মিউজিয়াম আছে সেগুলিতে পৃথিবীর কোন দেশ বাদ পড়েনি। জার্ম্মেনীর শিক্ষাপ্রণালীর গুণে দেশের ইতর সাধারণও পৃথিবীর কোন দেশে কোন বিষয়ে কতটা উন্নতি হয়েছে সে খবর রাখে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এমন সর্ব্বজ্ঞ নয়।

কিন্তু আমাকে সব চেয়ে চমৎকৃত করেছে দু'টি বিষয়। প্রথমত, জার্ম্মেনীর যে ক'টি ছোট ও বড় গ্রাম ও শহর দেখ্‌লুম সে ক'টিতে slum নেই, বরং মজুরদের বাড়ীগুলি আমাদের মধ্যবিত্তদের বাড়ীর তুলনায় অনেক উপভোগ্য। জার্ম্মেনীর গরীব লোকদের অবস্থা ইংলণ্ডের গরীব লোকদের চেয়ে অনেক ভালো। জার্ম্মানীর জাতীয় দুর্দ্দশার দিনে তার শক্তিকে অপচয় থেকে রক্ষা করেছে তার অন্তর্ব্বিবাদের স্বল্পতা। তা ছাড়া জার্ম্মেনী প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে slumএর কিছু সোদর সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়ত, জার্ম্মেনীর সৌন্দর্য্যবোধ এমন বনেদী যে কলকারখানার সঙ্গে কদর্য্যতাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। ফ্যাক্টরিগুলো যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম বা শহরের চতুঃসীমায় বাগান ক'রে দেওয়া হয়েছে কিম্বা বাড়ীর সঙ্গে একটি বাগান করতে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা যে-সব বাড়ীতে থাকে সে-সব বাড়ীরও সুন্দর গড়ন সুন্দর রং; কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই আছে। হোটেল বা রেস্তরাঁর দেয়ালেও ওয়াল্ পেপারের বদলে একপ্রকার আল্পনা। ষ্টেট্ থেকে অপেরা হাউস্ ও থিয়েটার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক শহরে। গান বাজ্‌নার একটি আবহাওয়া সর্ব্বত্র বোধ করা যায়। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক বোবা-কালা, এবং সিনেমা দেখে দেখে তাদের চোখও গেছে। কিন্তু জার্ম্মেনীর সকলেই গান বাজ্‌নায় যোগ দেয়। আর জার্ম্মেনীতে ছবি আঁকার ঝোঁক নিয়ে যত লোক বেড়ায় ফোটো তোলার বাতিক নিয়ে তত লোক বেড়ায় না।

বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দুটি জাতির আছে, আমেরিকান আর জার্ম্মান। কিন্তু আমেরিকান যখন বেড়ায়, তখন ভেসে ভেসে বেড়ায়, দিনের দু'চার ঘণ্টায় দু'শো মাইল দেখে নিয়ে বাকী সময়টায় বার বার খায় দায় নাচে খেলে। তার জন্যে সব চেয়ে দামী রেল জাহাজ, সব চেয়ে আরামের মোটর কোচ, সব চেয়ে বড় হোটেল। ভ্রমণ করবার সময় যাতে সে বিশ্রাম সুখ পায় সেইদিকেই তার দৃষ্টি। কিন্তু জার্ম্মান যখন বেড়ায় তখন পায়ে হেঁটে বেড়ায়, ফোর্থ ক্লাস্ রেল গাড়ীতে চড়ে, নিজের পিঠে বাঁধা "ruck sack" থেকে কিছু "wurst" বার ক'রে খায়, সস্তা সরাইতে গিয়ে পেট ভ'রে এক ঘড়া সস্তা beer পান করে, বিশ্রাম করতে করতে ছবি আঁকে, আর চল্‌তে চল্‌তে প্রাণ খুলে গান গায়। জার্ম্মেনী দেশটি আমাদের যে কোনো প্রদেশের চেয়ে বড়। তার উত্তরটা প্রোটেষ্টাণ্ট্‌প্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিক-প্রধান। তার প্রত্যেক জেলার নিজস্ব ইতিহাস আছে, প্রত্যেক জেলাই ছিল স্বতন্ত্র। জার্ম্মানীকে একটি ছোট স্কেলের ভারতবর্ষ বল্‌তে পারা যায়, তেমনি বহুধা বিভক্ত। তাই জার্ম্মানরা চায় নিজেদের দেশের অলিতে গলিতে ঘুরে নিজের দেশকে সমগ্র ভাবে জান্‌তে। তাদের এই বেড়ানোর নেশার পেছনে তাদের এই উদ্দেশ্যটি আছে। যুদ্ধে হেরে জার্ম্মেনী এক হয়েছে। আগে ছিল প্রাশিয়ার একাধিপত্য। তবু প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণ মরেনি এবং প্রোটেষ্টাণ্টে ক্যাথলিকে বিরোধ আছে।

জার্ম্মানরা ইংরেজদের মতো প্রধানত প্রোটেষ্টাণ্ট বা ফরাসীদের মতো প্রধানত ক্যাথলিক নয়। এদের দুই সম্প্রদায়ই সমান প্রবল। আমি উত্তর জার্ম্মেনী দেখিনি, এ যাত্রায় দেখ্‌বোও না। রাইন ল্যাণ্ড্‌ ও ব্যাভেরিয়ার সর্ব্বত্র ক্যাথলিক প্রভাব লক্ষ্য করছি। গির্জ্জার যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি গির্জ্জার বাইরে ও ভিতরে মূর্ত্তি ও চিত্রেরও সংখ্যা নেই। এখনো লোকে সে-সব প্রতিমার কাছে দীপ জ্বালে, ফুল রাখে, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায়, মনস্কামনা জানায়। খ্রীষ্টিয়ানিটি বহুদূর থেকে এলেও ইউরোপের হৃদয় অধিকার করেছে। মূর্ত্তি ও চিত্রগুলি সচরাচর ক্রুস্-বিদ্ধ যীশুর কিম্বা যীশুজননী মেরীর। যীশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু— এই দুটি বিষয় নিয়ে অসংখ্য চিত্রকর চিত্র এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্ত্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সঙ্গীত-কার গান রচনা করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আর্ট্ প্রধানত এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেনেশাঁসের পরে ইউরোপ নিজেকে চিন্‌ল, বিষয়ের দারিদ্র্য রইল না, এবং ইউরোপীয় আর্ট গির্জ্জার আঁচল ছাড়্‌ল। খ্রীষ্টিয়ানিটি যে ইউরোপের অন্তরের

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

অন্তঃস্থলে পৌঁছায়নি তার প্রমাণ খ্রীষ্টিয়ানিটিকে ইউরোপ আপন ইচ্ছামতো ভাঙ্‌তে গড়্‌তে পারেনি, যেমনটি পেয়েছিল তেমনটি রাখ্‌তে চেষ্টা করেছে। সুন্দর সামগ্রী উপহার রূপে পেলে লোকে সাজিয়ে রাখ্‌তেই ব্যস্ত হয়।

খ্রীষ্টিয়ানিটিকে তার বাড়ীর পাশের আরব পারস্যের লোক গ্রহণ কর্‌লে না; এমন কি তার বাড়ীর লোক ইহুদীরা পর্য্যন্ত অসম্মান কর্‌লে; কিন্তু দূর থেকে ইউরোপ ডেকে নিয়ে মান দিলে। কেন এমন ঘট্‌ল? সম্ভবত ইউরোপের পরিপূরক রূপে এশিয়াকে দরকার ছিল। কিম্বা ইউরোপীয় চরিত্রের পরিপূরক রূপে যীশুর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তটির প্রয়োজন ছিল। জার্ম্মেনীর যেখানে যাই সেখানে দেখি যীশুর ক্রুশ্‌বিদ্ধ করুণ মূর্ত্তিটি বাণবিদ্ধ পাখীর মতো দুটি ডানা নুইয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন বিনা কথায় বল্‌তে চায়, "আমার দুঃখ দেখে কি তোমাদের মায়া হয় না? তোমরা এখনো পাপ কর্‌ছো?" ভোগলোলুপ ইউরোপকে ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিল। শুধু কথায় তার মন ভিজ্‌ত না, একটি দৃষ্টান্ত তাকে মুগ্ধ কর্‌লে। আমার কিন্তু এ দৃশ্য ভালো লাগে না—কসাইয়ের দোকানে গোরু ভেড়ার ধড় ঝুলছে, তার ঠিক সাম্‌নে গির্জ্জার দেয়ালে যীশুর শব-মূর্ত্তি ঝুলছে, এ যেন যীশুকে বিদ্রূপ করা। মনে হয় যেন ইউরোপের লোক পরস্পরকে যীশুর দোহাই দিতে চায় এই জন্য যে তাদের কারুর পক্ষে যীশুর আদর্শ অন্তরের দিক থেকে সত্য নয়, অথচ বাইরের দিক থেকে সে আদর্শের প্রয়োজন আছে।

চোখে দেখ্‌তে জার্ম্মান ও ইংরেজ একই রকম, ফরাসীও ভিন্ন নয়। ইউরোপের সব জায়গায় একই পোষাক একই খানা একই আদব-কায়দা—সব জাতির বহিরঙ্গ একই। স্থান ও পাত্র ভেদে যেটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটুকু ধর্ত্তব্য নয়। জার্ম্মানিদের ধারণা তারা ভয়ানক কেজো মানুষ। তাই তারা মাথা মুড়ায়, plus fours কিম্বা breeches পরে সাধারণত। তাদের মেয়েদেরও মোটা কাপড়ের প্রতি টান—খদ্দর পরা মেয়ে অহরহ দেখ্‌ছি। জার্ম্মান মেয়েরা কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষের দোসর। তারা গোরু ঘোড়ার গাড়ী হাঁকায় ও পিঠে বোঝা বেঁধে হাঁটে। ফরাসী মেয়েদের দেখ্‌লে যেমন মনে হয় সারাক্ষণ পুষিমেনির মতো শরীরটিকে ঘ'ষে মেজে সাজিয়ে রেখেছে, জার্ম্মান মেয়েদের দেখ্‌লে তেমন মনে হয় না। আবার ইংরেজ পুরুষদের দেখ্‌লে যেমন মনে হয় মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো অবধি ফিট্‌ফাট্‌, জার্ম্মান পুরুষদের দেখলে তেমন মনে হয় না। জার্ম্মানরা কেজো মানুষ, smart হবার মতো সৌখীনতা তাদের সাজে না। সাজসজ্জায় তারা ভোলানাথ—তালি দেওয়া চামড়ার হাফপ্যাণ্ট্‌ প'রে পা দেখিয়ে রাস্তায় ব'ার হ'লে লণ্ডনে ভিড় জ'মে যেত, মিউনিকে কেউ কিছু ভাবে না।

ধম্মা

—গল্প—

—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কাজলা একলাটি একটি মিট্‌মিটে প্রদীপের সামনে ব'সে পাট কাট্‌ছিল আর ঢুল্‌ছিল। রাত তখন দেড়টা হবে।

জানালায় খুট্‌খুট্‌ ক'রে মৃদু শব্দ হওয়ায় মুখ তুলে বললে,—"কে?"

"আমি"।

"ইস্ কি ভাগ্যি! আজ যে বড় সকাল সকাল?"

"দোর খোল্"।

প্রদীপটা উস্‌কে হাতে ক'রে দোর খুলতে গেল।

বাড়ী ঢুকেই ধম্মা নিজের হাতে দোরটা বন্ধ করলে। উঠানের চার দিক ঘুরে দেখে বল্‌লে, "আলোটা উঁচু ক'রে ধর্—আমড়া গাছটা দেখে নি।"

তারপর নেবু গাছটার ঝোঁপের মধ্যে হাতের বড়শাটার দু'চার খোঁচা দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

কাজলা মুখ টিপে হেসে বললে—"মদ্দোর মদ্দামিও আছে—ভয়ও আছে!"

"ভয় আবার নেই কার,—তোর নেই?"

কাজলা জোরে মাথা নেড়ে বললে—"না—ভয় নেই,—ভাবনা আছে।"

পরে হাসি মুখে বললে—"ভীতু লোকের সঙ্গে থাকলে একটু হয় বই কি!"

ধম্মা তার মাথার কাপড় টেনে—খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললে—"আরে ব্বাস্—সদ্দারনী বটে! তা তোর আবার ভাবনাটা কি,—এই তো পাট কাটতে শিখেছিস্ দেখছি!"

"না—সদ্দার—তামাসা রাখ্! তোর দুটি পায়ে পড়ি ও-কাজ আর করিসনি। কোন্ দিন কি ঘট্‌বে—জন্মটা মিছে হ'য়ে যাবে,—আমিও জ্যান্তে ম'রে থাকবো।"

"আমি কি করি রে কাজলি—আমাকে যে করায়,—এখন নেশায় পেয়ে বসেছে! জন্মটাতো সেই দিনই গেছে—যেদিন গদিতে ডেকে নেগে ভাইটেকে ছটা টাকার জন্যে বুকে বাঁশ ড'লে মারলে,—উঃ! তখন তো এমন ছিলুম না,—কেবল হাত জোড় ক'রে ছিলুম—পায়ে ধরেছিলুম। কি ভুলই করেছিলুম,—ম'রে ছিলুম রে!"

ধম্মার কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ফুলে উঠলো,—রক্ত চক্ষু ঘুরতে লাগলো।—কুপিত সিংহের প্রতিচ্ছবি!

কাজলা তাড়াতাড়ি তার চখে মুখে ভিজে গামছা চেপে ধরলে।

একটু পরে মুখ সরিয়ে নিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"সেই তো খুন চাপ্‌লো! তার ভাইকে তারি সামনে মেরে তবে মনে হল —"আমি আছি!" বাঁশ ডলতে কিন্তু হাত সরলো না! তার পরেই তো এখানে চ'লে আসি।"

নিমেষ নীরব থেকে—

"এখন গদির টাকা নদীতে লুটি। ছ'টাকার তরে ভাই গেছে, তাই টাকার দান্‌ছত্তর খুলেছি—ছড়াই!"

এই ব'লে গর্ব্ব মিশ্রিত আত্মপ্রসাদের একটা বিকট হাসি হেসে উঠলো। পরক্ষণেই ব্যথিত সুরে বল্‌লে—"কিন্তু ভাই তো ফিরে পেলুম না!"

দীর্ঘশ্বাস আপনিই ব'য়ে গেল।

কাজলা অবসর বুঝে কেবল বললে —"তবে?"

"ভাবিনা তা নয় কাজলি,—পারি না ভাই। বলেছি তো—নেশা ধ'রে গেছে,—রাত এগারোটা হ'লেই ছট্‌ফটানি ধরে—ছুটে বেরুই! আর কি জানিস্? দলের লোকেই বা কি বলবে! দিনু, দেবা, রতনা—না-মরদ্ বলবে।"

"তারা বললে তো ব'য়ে গেল,—স্বস্তি তো থাকবে।"

ধম্মা হাসলে, বললে—"তুই মেয়ে মানুষ—বুঝবিনি। যে পারে সে নামটাই রেখে যায়।" দু'বার বুকটা চাপড়ে—"এ সব তো পুড়ে যায় রে,—নামটাই তো সব—সেইটাই থাকে, তোর গুরুঠাকুর বলে না—নামের চেয়ে বড় কিছু

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেই ?"

"সে তো ভগবানের নাম।"

"সবারই তাইরে—সবারই তাই।"

থানার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজলো। কাজলা ব্যস্ত হ'য়ে বললে—"ইস্ করছি কি ?—নে হাত মুখ ধো, আমি ভাত বেড়ে আনি।"

* * * *

কাজলার রূপ ছিল—রং ছিল না। চোখ দুটি ছিল করুণা মাখানো—তুলি দিয়ে টানা। কণ্ঠ ছিল শ্রবণ-মধুর, চুল ছিল অসামান্য; এলানো অবস্থায় নজরে পড়লে ভদ্র-লোকেরও ভুল হ'ত, না চেয়ে কেউ চ'লে যেতে পারত না। তার ব্যবহারে আর সেবায় পাড়ার মেয়েরা মুগ্ধ ছিল। সকলেই তাকে ভালো বাস্তো—চাইতো।

ধম্মা ছিল ছেয়ালো বলিষ্ঠ গঠনের শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ—বিনম্র। একশো জোয়ানের মাঝ থেকে তাকে সর্দ্দার ব'লে বেছে নেওয়া শক্ত ছিল না।

প্রকৃতিতে পরিচয় পাওয়া যেত না যে সে জলদস্যু। দিনে মজুরি করে—ঘর ছায়, বেড়া বাঁধে, মাটি কোপায়, কাট চেলায়।

কাজলা সামনে ব'সে খাওয়াচ্ছিলো। খাওয়া প্রায় শেষ হ'লে ধম্মা বললে—"কই তুই খাবিনি ?"

না।

কেনো ?

এম্নি।

তবু শুনি ?

খিদে নেই,—আবার কি!

আগে বলিসনি কেনো ?

বললে কি হ'ত ?

আমিও খেতুম না!

ইস্—ভারি যে! তুই খাবিনি কেনো, তুই তো আর কারুর খোঁজ রাখ্তে যাসনা!

ধম্মা অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল,—"বুঝলুম না!"

"আজ গিয়ে দেখি কাকিমা তিনপোর বেলায় মায়ে ঝিয়ে মুড়ি আর কলমি শাক সিদ্ধ খেতে বসেছে। আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বললে—"এ বেশ লাগে রে কাজল, আমরা মাঝে মাঝে খাই।"

বললুম—তা তো দেখতে পাচ্ছি,—তুমিও যত খেলে দিদিমণিও তত খেলে।

কাকিমা বললে ওর না খাওয়াই ভালো, যে রকম বাড়চে—উপোস করাই উচিত! বাড় আছে—বের উপায় নেই! আমার দিন-রাত সমান করলে!

—মথুরাদিদি পাতে হাত দে' মুখগুঁজে ধ'সে রইল। কাকিমা তাড়াতাড়ি পাথরখানি নিয়ে পুকুরে চ'লে গেল। দেখি—চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছে!"

কাজলার গলা ধ'রে এসেছিল, চোখ মুছে বললে "দিদি-মণিকে যে ডেকে এনে কিছু খাওয়াব, কি কিছু দিয়ে আসবো তার উপায় নেই। আমাদের কোনো জিনিষ কাকিমা ছুঁতে দেবে না। মথুরাকে মানুষ করেছি—এ কি সওয়া যায়, না—দেখা যায়!"

কাজলা ঢোক্ গিলে চোখ মুছলে।

ধম্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"কাজলা কাঁদিসনি, মা কালী ছাড়া মানুষে কিছু করতে পারবে না। কত উপায়ে কত লোকের দায় ঘোচালুম, ওখানে যে কোনো উপায়ই কাজ করে না কাজলি! এমন শক্ত বামুনের মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি। সেদিন বললেন—ধম্মদাস—আমাদের এই ভিটেটুকু বেচে দে বাবা—তোদের মথুরার বিয়েটা দিয়ে জুড়ুই! আর আমি দেখতে পারছি না, লোকের কথাও শুনতে পারছিনা।

বললুম—তার পর জুড়ুবার জায়গাটা থাকবে কোথায় কাকিমা!

হাসতে হাসতে বললেন—যাদের মা গঙ্গার কোলে বাস, তাদের জুড়োবার জায়গার অভাব নেই রে—তুই আমার জন্যে ভাবিসনি বাবা। কেবল ও-ই তো আমার পথের বাধা হ'য়ে রয়েছে।"

যে ধম্মা সোঁদর বনেও বাস ক'রে আসে, কতবার বাঘের সঙ্গে সামনা সামনি হয়েছে—গায়ের একটা রোঁ খাড়া হয়নি, কাকিমার কথা শুনে সেই ধম্মা শিউরে উঠে-ছিল! দুনিয়ার মধ্যে ঐ বামুনের মেয়েটিকেই ভয় করি

ভাই,—ইস্পাতের খাঁড়া ব'লে মনে হয়। ওঁর সামনে কথা বেরোয় না।”

কাজলার চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল, সে একদৃষ্টে ধম্মার দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল। বললে, “আবার অমন সাঁচ্চা মেয়েমানুষও দেশে নেই,—দয়া ধম্মও তেমনি। কোথাকার একটা কুকুর মরমর হ'য়ে গঙ্গার ঘাটে এসে প'ড়ে ছিল,—তাকে রোজ নিজের ভাতের আদ্ধেক খাইয়ে আসতেন। গরমের দিন ছিল—পাঁচবার তাকে জল খাওয়াতে যেতেন,—এ আমি চোখে দেখেছি।”

ধম্মা চুপ ক'রে কি ভাবছিল, দু একটা কথা কানে গিয়েছিল মাত্র। বল্লে, “ভয় তো খাঁটিকেই—গোখরো সাপের বিষ যে! আচ্ছা এই পুজোটা বাদ—”

“তার মানে?”

“বিন্দুবাসিনী তলার একশো বচরের পুজো—এবার বুঝি প'ড়ে যায়,—চণ্ডীমণ্ডপের চালও গেছে। রায় মশাই মা মা, করছেন আর ছেলের মত কাঁদছেন—ব্রাহ্মণের কোন উপায় নেই। মার হুকুমটা সেরে—”

“তার পর?”

“তার পর দিদিমণির বিয়ের তরে মার কাছে ভালো জাতের টাকার উপায় চাইবো—” ব'লে হাসলে।

“এই কথা?”

“হাঁ, দেখে নিস্।”

“যে-টাকা কাকিমা ছোঁয় না—তা আর আনবিনি?”

“তাই তো ভাবছি। টাকারও যে জাত আছে তা জানতুম না।—খা এইবার—”

ধম্মা দাওয়ায় আঁচাতে গেল।

খানিক পরে কাজলা এঁটো নিয়ে, পাথর হাতে ক'রে এসে দেখে—ধম্মা আকাশের দিকে চেয়ে ডান হাত উঁচু ক'রে পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে,—আঁচায়নি।

কাজলাকে দেখে সে চমকে কেঁপে উঠলো!

—“উঃ—ভয় পেয়েছিলুম রে! দেখলি,—মনে মনে ভালো হবার ইচ্ছের লড়াই লেগেছিল,—তাইতেই এই। ভালো হওয়া মানেই না-মরদ হওয়া রে,—ছিঃ! কেবল ভয়ের পুজো করতে বেঁচে ম'রে থাকা!”

“তাই নাকি! কাকিমা?”

ধম্মা আর কথা কইলে না, হাত মুখ ধুয়ে ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

২

শিবানী দেবী ছিলেন চাটুয্যেদের ছোট বোউ। আট মাসের মেয়ে কোলে ক'রে বিধবা হবার পর, সনাতন প্রথা অনুসারে দু'বেলা সংসারের রাঁধা বাড়া—যার যেমন ফরমাজ, ছেলে মেয়েদের দেখা শোনা, খাওয়ানো ধোয়ানো প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে তাঁর ওপরেই চাপে—কারণ কাজকর্ম্মে থাকলে শোকতাপ ভুলে থাকতে পারবেন। একাদশীতেও ব্যবস্থা বদলায় না; কাজে কম্মে থাকলে উপবাস নাকি গায়ে লাগে না! বিধবাদের শুভকামী বিচক্ষণ লোকদের বহু বিবেচনার ফল—এই সব বিধি ব্যবস্থার কোনোটি হ'তে তিনি বঞ্চিত হন নি। সে বাড়ীর মেয়েপুরুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিটা কিছু অসাধারণ ব'লে প্রসিদ্ধও ছিল।

বড় ঠাকুরঝির মাথাঘোরা রোগ,—সুতরাং সকালে মিছরির সরবৎ খান। ছোটবউকে তা ঠিক্ ক'রে রাখতে হয়।

ছোট বউকে আহ্নিক সেরে নিতে দেখে তিনি বল্‌লেন—“দেখ ছোট বউ—ইহকাল তো পুড়েইছে—পরকালটা পোড়ানো কেনো! তুমি এখন কালাশৌচের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ অদ্বিতীয়) অধিকারী, এখন একবছর তোমার ও সবে অধিকার নেই; পাপ আর বাড়িও না।”

শিবানী পূজা পাঠ বন্ধ ক'রে কালাশৌচের হাঁড়ি আর অপোগণ্ড পালনের অধিকারই স্বীকার করলেন। সবই মুখ বুজে।

মুস্কিল হল—সকলকে খাইয়ে শেষে নিজের প্রায়ই কিছু থাকে না। সেদিন একগাল মুড়ি না হয় একটু গুড় আর জল। অনাহারে অনাহারে স্তনদুগ্ধ শুকিয়ে গেল। মেয়েটা কারো কোল তো পায়ই না—দাওয়ায় প'ড়ে খিদেয় চেঁচায়—কেউ চেয়েও দেখে না,—তোলেও না,—কারণ বাপ খেগো অলুক্ষুণে মেয়ে, আপদ! সবাই ধমকায় আর থামাতে

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলে। বলে—"প্রাতঃবাক্যে বাড়ীতে আরও তো ছেলে মেয়ে রয়েছে—কারুর অমন রাক্ষুসে গলা শুনেছ!—শুনলে বুক কেঁপে ওঠে গো! আবার কাকে খাবে—" ইত্যাদি।

কাজলার আসা যাওয়া সব বাড়ীতেই,—এ বাড়ীতেও ছিল। নিকট প্রতিবেশী,—কান্না কানে যায় আর ছটফট্ করে—ছুটে আসে। ছোট কাকিমার অবস্থা চোখে দেখে—সবই বোঝে, ভাবে—জ্যান্ত মানুষ কি ক'রে মুখ বুজে এতো সয়! মেয়েটা গেলে ওর আর থাকবে কে! ও-তো গেলো ব'লে!

বুকটা কেমন ক'রে ওঠে,—তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে আনে।

এটা বাড়ীর কেউ চায় না—কারুর ভালোও লাগে না। কিন্তু কাজলা ধম্মার বউ,—

কাজেই ঠাকুরঝি হেসে বলেন—"ভাগ্যিস তুই ছিলি, ও মেয়ের গায়ে কারুর হাত দেবার জো নেই—ককিয়েই আছে, কিছুতে বাগ মানে না—বংশ ছাড়া! মেয়েটাকে দেখা—তাও উনি পারেন না! কে বলবে বলো?" ইত্যাদি।

শিবানী শোনে—পাথরের শোনা।

তখনো বাপ মা বেঁচে! গরীব হ'লেও মানুষ তো! এই সাংঘাতিক আঘাতের পর মেয়েকে একবার নিয়ে যাবার জন্যে তাঁরা অনেক লেখালেখি, অনুনয় বিনয় করলেন। এ অবস্থায় অভাগীরা স্বভাবতই বাপ মা খোঁজে। জগতের আলো তো তার নিবেই গেছে!

জবাব পান—"যাবার কোনো দরকার দেখছি না, ছোট বউ ভালই আছেন, তার কোনরূপ চিন্তা চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই, একটুও অধীর হন নি। মেয়েকে যদি দেখতে ইচ্ছা হয়—এসে দেখে যেতে পারেন।"—ইত্যাদি।

তাঁরা যেন মেয়ের নূতন নিরাভরণ-ঐশ্বর্য্যটা দেখবার জন্যে লালায়িত হ'য়ে প্রস্তাবটা করেছিলেন।

দিন যায়—মাস কাটে। বুদ্ধিমানেরা ভগবানকেও ভাবিয়ে তোলেন,—ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি উপায় খুঁজে পান না।

শেষে শিবানীর শরীরে বসন্ত দেখা দিলে। এতদিনে "মার অনুগ্রহ" নামটা বুঝি সার্থক হল!

কিন্তু শুনতে হ'ল—"সকল রকমে জ্বালালে গা! এখন এ আপদ ফেলি কোথায়! বাপ মার দরদ যে বড়! নিয়ে যাক না! ছোট লোক মিন্‌সে খবরটা পর্য্যন্ত নেয় না।"

পাশের দু'কাঠা জমিতে জঙ্গলের মাঝে দু'খানা চালা ছিল। একখানাতে গরু বাছুর থাকতো, একখানায় কেওড়া কাঠের তক্তপোষ পাতা। ছেলেদের পড়বার ঘর। কেউ এলে সেইখানেই বসে।

—"অমন ঘরখানা ওঁর কপালেই নাচছিল!" ছোঁয়াচে রোগ—গরু বাছুর বাড়ীর লক্ষ্মী—মা ভগবতী। পাশের ঘরে রাখতে ভরসা হ'ল না,—দুধ দিচ্চেন সবাই খায়।

বড়ঠাকুরঝির আবার মূর্চ্ছাগত বাই, ছোটঠাকুরঝির ওপর হাত তো কড়ির আনলা,—হাত পোরা মাদুলি,—ও রুগীর ঘরে তাঁর ঢোক্‌বার জো নেই, মাদুলি মাটি হ'য়ে যাবে, নিষেধ আছে। বউয়েরা সব সন্তান-সম্ভবা।

এ সবই "মার অনুগ্রহ"। শিবানী অনেকদিন পরে আরামের নিশ্বাস ফেলে ছেঁড়া মাদুরে এসে শুলেন। এক কলসী গঙ্গা জল আর একটা কানাভাঙা পেতলের ঘটিও পেলেন।

পাড়ার মুখ্‌খু সধবা বিধবারা থাকতে পারলেন না, তাঁরা এসে দেখ্‌তে শুন্‌তে লাগলেন।

"—সব বাহাদুরি!"

কাজলা মেয়েটিকে নিজের ঘরে নিয়ে রাখলে। মার অনুগ্রহ!

"এদ্দিন সব ছিলেন কোথায়! এদ্দিন ক'রেছিল কারা! করতে পারেন নি!"

ছোট বউ কিন্তু সেরে উঠলেন।

বাঁচা কেবল জ্বালাতে। গেলে—জ্বালাবে কে!

* * *

জগতে অনেক ঘটনা ঘটে যা ভালো হ'লেও ভোগায়।

ছোট বাবু দেবসুন্দর সওদাগরী আপিসে কাজ করতেন। সে-আপিসে দশ বছর চাকরি ক'রে মলে স্ত্রীকে কিছু মাসোহারা দেওয়ার নিয়ম ছিল। শিবানীর

নামে মাসে মাসে দশটাকা ক'রে আসতো, অবশ্য শিবানী সে কথা জানতেন না।

কেন—তা ভগবানই জানেন, সে মাসে আপিসের লোক এসে শিবানীর সই নিয়ে টাকা তাঁর হাতেই দিয়ে যায়, আর মাসে মাসে দিয়ে যাবে ব'লে যায়।

স্বামীর টাকা বিধবার যে কি বস্তু, বিশেষ এ অবস্থায় এ ভাবে পাওয়া, তা' বলাই নিষ্প্রয়োজন। কেবল সেই দিন তাঁর চোখ ফেটে জল গড়াতে পাঁচজনে দেখেছিল। চোখ মুছে, টাকা কয়টি মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধেন। সারাদিন দোরে খিল দে প'ড়ে ছিলেন।—বুঝি দুঃখ উপভোগ!

বৈকালে বড়ঠাকুরঝি দু'খানা পুরানো থালা কয়েকটা ঘটিবাটি এনে দাওয়ায় রেখে ব'লে গেলেন—"এই তোমার ভাগের বাসন-কোসন নাও। তুমি যাই কর না, ভাইয়েরা আমার শিবতুল্য,—একটা ঘড়াও দিতে বলেছে। মঙ্গলার খোল্ ভিজছে—এর পর দিয়ে যাবো'খন। যা হোক্, ভালো কার্ত্তি রাখলি ছোট্‌কি!" সবটা কানে এলো না—প্রাণে অবশ্য এলো।

ছোট বউ নির্ব্বাক। বিধবা হওয়া ছাড়া আবার কি নূতন অপরাধ হল!

ছোট বউ বিবাহিত জীবনের শুভপ্রারম্ভ থেকেই বুঝেছিলেন—সত্যটা বললেই সত্য সম্মান পায় না—সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, বক্তাও রেহাই পায় না। তাই ঘৃণা মিশ্রিত নীরবতা বরণ ক'রে নিয়েছিলেন; তারি দৃঢ়তাটা 'তেজ' আখ্যা পেয়েছিল।

তিনি নীরবেই নির্ব্বাসন নিলেন। উপায় কি? বহু দুশ্চিন্তার মধ্যে একটুও যে স্বস্তির স্বাদ ছিল না এবং এটাও যে "মার অনুগ্রহ" নয়, এমন কথা বলা কঠিন।

দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনের মধ্যে তাঁর এক যুগ কেটে গেছে সহিষ্ণুতা আর দৃঢ়তা মাত্র সম্বলে।

ইতিমধ্যে তিনি সেবায় শুশ্রূষায় অনেকেরই, বিশেষতঃ ইতর সাধারণের মা হ'য়ে পড়েছেন।

কিন্তু মথুরা তেরো উত্তীর্ণ হয়, তার বিবাহের চিন্তা সম্প্রতি তাঁকে অহরহ বিঁধতে আরম্ভ করেছে।—"ভগবান লজ্জা রাখো, তোমার মুখ চেয়েই প'ড়ে আছি।"

পরমাত্মীয়েরা প্রচার ক'রে রেখেছেন—"দেবসুন্দর তো উপরি কম প্লেতো না, সে সব টাকা গেলো কোথায়,- শোনো কেনো—সব আছে,—সব আছে। কোথায় আছে তাও আমরা জানি। তেজ আর কিসের?"

কাজলার কাকিমার পরিচয় সংক্ষেপত এই।

৩

এ কয়-দিন ধম্মা দিন রাত খাটছে। সকালে তাড়াতাড়ি নারকেল আর মুড়িগুড় খেয়ে গ্রামের পূজা-বাড়ীগুলি ঘুরে আসে। সেখানে যা কাজ থাকে সত্বর কিছু কিছু সেরে ওপাড়ার রায়েদের বাড়ী গিয়ে দম নেয়। সেখানকার খাটুনির সব কাজই তার। তাঁরা নিতান্ত গরীব, লোক বল ও নেই! শেষ চৌধুরীবাড়ী ছোটে—এঁরা জমিদার, পূজাও খুব ঘটার, লোকেরও অভাব নেই। তবু যায়,—শরীর আর কিসের জন্য, শক্তিই বা কেন, যদি মায়ের সেবায় না লাগে।

আজ তাঁদের সতেরোটা নারকোল গাছে উঠে দেড়শো নারকোল পেড়ে—বুক ছ'ড়ে এসেছে।

বাড়ী ফিরেই বললে—"কাজলি এক কোষ তেল দে দিকি, নারকোল পাড়তে উঠে বুকটা বড় ছ'ড়ে গেছে,—জ্বলছে।"

কজলা তাড়াতাড় তেল এনে নিজেই বুকে মালিস ক'রে দিতে দিতে বললে—"কই, নারকোল গাছে উঠতে তো কখোনো দেখিনি।"

"দরকার পড়লে শক্তটা আর কি—পুরুষ মানুষ সব পারে।"

"আজ আর কাজে যাওয়া হবে না কিন্তু, নেয়ে খেয়ে ঘুমো।"

"মথুরাদিদির কাপড় চাই না? আজ গেলেই আমার বারোটাকার কাজ পুরো হবে। শরীর আমার ভালই আছে।"

মথুরার কাপড়ের কথায় কাজলা আনন্দে সব ভুলে গেল, বললে—"সে কাপড়ের এমন ছিরি, মথুরা পরলে ঠিক মা লক্ষ্মীটির মত দেখাবে! জোলা মিন্‌সে কাল নিয়ে আসবে বলেছে।"

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"টাকাটা বলাইদার কাছ থেকে তুই এনে রাখিস তবে। কাকিমাকে জানিয়ে যাস্—তিনি না সোবে করেন।"

"সে ভয় নেই,—কাকিমা ও-ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখে এসেছেন—তুই বলাইদার কাটের টালে কাট চেলাচ্ছিস। আমাকে হেসে বললেন—ছেলের আবার একি সখ চাপলো!—

—সব শুনে, জলে তাঁর চোখ টল্‌টল্ করতে লাগলো। বললেন—গেল পুজোর কাপড় মথুরাকে আমি পরতে দিইনি, সে ঠাকুর দেখতে পর্য্যন্ত যায়নি, তাতে কি আমার ছেলেকে কম কষ্ট দিয়েছি, তাই না বাছার এই খাটুনি।

—কাকিমার চোখ দে, টস্ টস্ ক'রে জল পড়লো। মুছলেও কমে না! বললেন—আমিও তাতে কম কষ্ট পাইনি মা, সেই পর্য্যন্ত ছেলের সঙ্গে মুখতুলে কথা কইতে পারি না।"

"আর শোনাসনি কাজলি।" ধম্মা মুখ ফিরে ঢোক গিললে, "তাঁর দোষ কি কিন্তু কত বড় ঘা মেরে মানুষ আমাকে এমন বানিয়েছে তা যে ভুলতে পারি না। ছ'-টাকায় ভাই বেচেই না—" বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল!

"যা হবার ছিল হ'য়ে গেছে" এই ব'লেই কাজলার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—"এখন ভাই তো দেখছিস্!"

সিংহকে যেন সজোরে খোঁচা দেওয়া হল,—ধম্মার মাথায় আগুন লেগে গেল। সে গর্জ্জে উঠলো—

"কি বললি! খবরদার,—ফের শুনলে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো! ভদ্দোর লোকের কথা ভদ্দোর লোকে বুঝবে, সে কি আমার ভদ্দোর লোকের ভাই ছিলো!"......

সে-গর্জ্জন কাকিমার চালায় পৌঁছে প্রতিধ্বনি তুলেছিল, তিনি রাঁধতে রাঁধতে ছুটে এলেন—

"কি রে কাজলি—ছেলেকে কি বলেছিস্?"

কাজলা অপরাধীর মত জড়সড় হ'য়ে গিয়েছিল, কথাটা যে কোথায় গিয়ে কতটা আঘাত করতে পারে সে অতশত ভাবেনি।

সে কেঁদে ফেললে—"আমি বুঝতে পারিনি কাকিমা, জেনে শুনে আমি কি ওকে কষ্ট দিতে পারি!—ওর তা বিশ্বাস হয়!"

কাকিমার সামনে ধম্মার এ মূর্ত্তি কোনোদিন প্রকাশ পায়নি। সে সেইখানেই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে পড়লো,—রাগ, লজ্জা, ক্ষোভ, বেদনা একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে দুধারের পাঁজরা হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো, সে কাঁদছে।

কাকিমা দ্রুত গিয়ে তার মাথায়, পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, "তুইও আমাকে কাঁদাবি ধম্মদাস!—ছি বাবা ওঠ্, নেয়ে আয়। ত্যাখ দিকি চেয়ে মেয়ে আমার কতটুকু হ'য়ে গেছে!—ও কি বুঝে বলেছে কিছু!" আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন।

অভিমান এসে ভাষা যোগালে! "তুমি নাকি আমার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারনা! তবে আর আমি এখানে প'ড়ে আছি কেন? এখানে আমার কে আছে, কি ঐশ্বয্যি আছে কাকিমা—"

এ আবার কি কথা! সব তাঁর মনে পড়ে গেল, বললেন—"কিন্তু আমার ঐশ্বয্যি যে তোরা,—তোরা যে আমার ভগবানের দেওয়া সামিগ্রী, আমি কার ভরসায় তেরো বছর কাটালুম ধম্মদাস! পাছে কোন্‌দিন কি ঘটে—তোর কিছু দেখতে হয়, তোকে খোয়াতে হয়, তাই না তোর ওপর এমান পাষাণীর মত কঠিন ব্যবহার ক'রে এসেছি! এই ভাবনা এই তেরো বছর ব'য়ে আসছে। রাতে কারুর সাড়া পেলে, কি একটু শব্দ হ'লে বুকটা ধড়াস্ ক'রে ওঠে, সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে যায়! আমার সব পুজো আহ্নিকই মিছে রে ধম্মদাস,—তোর সুমতি তোর মঙ্গলই চেয়ে এসেছি। কেবল তোর পয়সাটি ছুঁইনি, পুণ্যির জন্যে নয় ধম্মদাস! যদি তাতে তোর মনে লাগে—তুই ও-কাজটি ছাড়িস্। যে মথুরা তোদেরই, কেবল বিইয়েছিলুম আমি, তোর দেওয়া কাপড় তাকে পরতে দিইনি! এত বড় শক্ত সাজা অতি বড় শত্তুরেও দিতে পারতো না। আমি কিন্তু সেই সাজাই তোকে দিয়েছি, আর নিজে তা নিয়েছি—দিনরাত; মেয়ে মানুষ, ও-ছাড়া আমার আর উপায়ও ছিল না, ভেবেও কিছু পাইনি।"

সকলে নীরব! সহসা—

"আচ্ছা—পায়ের ধূলো দাওতো মা, গঙ্গাস্নান ক'রে আসি।

কাজলি এসেই ভাত চাই, খিদে লেগেছে!"

যেন সে-মানুষ নয়।

কাজলার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই দুজনের চোখেই নির্ম্মল হাস্যের উজ্জ্বল রেখাপাত!

ধম্মা গামছাখানা টেনে নিয়ে নাইতে চলে গেল।

"তুমি না এলে আজ কি হ'ত কাকিমা!"

"কি আবার হ'ত—ও তেমন ছেলে নয়। ওকে পাগল ক'রে দিয়েছে। ও কি কিছু করে—ভুলে থাকবার তরে সময় কাটায়। কিছু রেখেছে কি,—কারুর দুঃখকষ্ট সইতে পারে কি!"

"এমন ছাড়লে যে বাঁচি—আর যে ভাবতে পারি না।"

"ছেড়েছে।"

"আমার তো বিশ্বাস হয় না মা।"

"তুই দেখিস।"

"তোমার কথা মিথ্যে হয় না—তা জানি।"—তারপর হাসতে হাসতে বললে—"তুমি আজ কি করলে বল দিকি কাকিমা! রাঁধতে রাঁধতে এঁটো হাতে এসে সব ছুঁয়ে লেপে এক করলে যে! এখন আবার নাইতে হবে,—বিধবা মানুষ—"

"কেনো, তাতে কি হয়েছে, ছেলেকে ছুঁলে কি দোষ আছে রে পাগলি! যাদের আছে তাদের আছে, আমার নেই, নাইবো কেনো?"

"তবে আমিও পায়ের ধুলোটা নি।"

"তোদের এ আবার কি হ'ল।"

কাজলা তাঁর পায়ে মাথা ঠেকালে।

মথুরার হাঁক কানে এলো—"চচ্চড়ি যে চুঁয়ে পুড়ে আগুন ধ'রে গেল!"

শিবানী ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কথায় কথায় সামান্য কারণে কি যেন একটা ওলট পালট ঘ'টে গেল। একটা দমকা ঝাপটায় সকলের মনের সব ময়লা মুহূর্ত্তে উড়িয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ স্বচ্ছতা এনে দিলে।

* * * *

পঞ্চমীর পুজো-মাখানো জ্যোৎস্নাটুকু দেখতে দেখতে ডুবে গেল।

এতক্ষণ মথুরার বিবাহের উপায় চিন্তা চলছিল। ধম্মা বললে "কাকিমার কি একখানি গয়নাও আর নেই?"

"তুই যে আজ নতুন লোক হলি! সে বছর মথুরার যখন বিকার হয়—যাতে একচল্লিশ দিন মেয়ে এই যায় এই যায়—মনে নেই?—মতি বাবু বলায় ভাসুর যাতে বলেছিলেন, টাকা না বার্ করেন—গয়না তো আছে!—কাকিমার মাকড়ি, বালা, কণ্ঠমালা বেচেই তো মজুমদারকে দেখানো হয়।"

ধম্মদাস উদাস ভাবে বললে—"এদ্দিন যদি কাট চেলাতুম, রোজ দুটাকার কাজ করতে পারতুম রে। আচ্ছা ভাবিসনি,—মা আছেন।"

"কাকিমাকে দেখে যে ভাবতে হয়—ইস্পাতে যেন ঘুণ ধরতে সুরু হয়েছে।"

ধম্মা অন্যমনস্কভাবে—"হু" আচ্ছা"—ব'লেই উঠে দাঁড়ালো।

—"দোরটায় খিল দিয়ে নে।"

"আবার কি?"

"এমনি একটু ঘুরে আসি।"

"তবে কাকিমাকে মিথ্যেবাদী বানাবি!"

"কেনো?"

"কাকিমা যে আমাকে বললে—ছেড়েছে তুই দেখিস!"

"বলেছেন নাকি!"

তারপর হেসে বললে—"কাকিমা অন্তর্য্যামী!—

আজ অন্য কাজ আছে রে, সে সব নয়। রতনা খবর দিলে একজন আড়কাটি সেখো সেজে চার পাঁচটি মেয়েকে কালীঘাট দেখাবার ছলে বর্দ্ধমান থেকে এনে বালীর খালের মধ্যে নৌকোয় রেখেছে! আজ রাতে মেটেবুরুজের কুলি ডিপোয় চালান দেবে,—মরিসসে না ডেমেরায় পাঠাবে।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি বউ কোলের ছেলে ফেলে এসেছে—বড় কাঁদছে। দেখে আসি তাদের যদি উপায় করতে পারি।”

মুহূর্ত্ত নীরব থেকে, উদাস ভাবে বললে “কাকিমা বলেছেন,—সত্যি ?—ঠিক্ বলেছেন রে ! আচ্ছা—

—জ্যোৎস্না ডুবেছে, এইবার তারা বেরুবে, আর আমি দাঁড়াবোনা।”

নিমিষে বেরিয়ে গেল।

এ আবার কি ! কাজলা কথা কবার সময় পেলে না ; তার অন্তরটা কেবল “দুর্গা দুর্গা” ক’রে উঠলো।

৪

ভবানী চৌধুরীমশাই গ্রামের জমিদার,—সে-কালের বাবুদের নমুনার শেষ চিহ্নের মতই ছিলেন। দুধের সঙ্গে আফিন্ জ্বাল দিয়ে সরখানি খেতেন। দুহাতে তিনটে হীরের আংটি,—নধর শরীর, বাবরি চুল, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিতান্ত আবশ্যক না হ’লে গ্রামের বাইরে পা বাড়াতেন না। মাত্র পূজার পঞ্চমীর দিনটি প্রতি বৎসরই নিজে কলকাতায় যেতেন—কারেন্সিতে নোট ভাঙাতে, আর বস্ত্রাদি কিনতে—পূজার বাজার করতে।

এবারও গিয়েছিলেন।

সুখের শরীর, তার ওপর আজ ঘোরাঘুরিটে অত্যধিক হওয়ায় বড়ই ক্লান্ত হ’য়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যাও হ’ল—এখনো বাজারের অনেক বাকি, সুতরাং আমলাদের উপর সে সব ভার দিয়ে নৌকোয় ব’সে গঙ্গার হাওয়ায় শ্রান্তিমুক্ত হবার তরে একখানা গাড়ী ভাড়া ক’রে জগন্নাথ ঘাটে চ’লে আসেন। ব’লে আসেন, “আমি নৌকোয় থাকবো, তোমরা সত্বর বাজার সেরে চ’লে এসো।”

নিজের সঙ্গে ছিল মাত্র টাকা শো ছয়েকের কাপড়, আতর, গোলাপ, বড়বাজারের সের পাঁচেক বাতাবি সন্দেশ আর নোটে নগদে খুজরোয়—হাজার দুই টাকা।

ছিরু খানসামা সঙ্গে এসে নৌকো ভাড়া ক’রে তাতে জিনিষপত্র তুলে দিয়ে, সুজুনী বিছিয়ে, ফুর্শিতে এক ছিলিম তাওয়াদার তামাক সেজে দিয়ে, তাঁকে বিশ্রাম করতে ব’লে চ’লে গেল। চৌধুরী মশাই ব’লে দিলেন, “শীগগির আস্‌বি। ফোজদুরী বালাখানার সের দশেক তামাক নিতে যেন ভুল না হয়।”

পিরান খুলে, মুখ হাত পা ধুয়ে, গা মুছে স্নিগ্ধ হ’য়ে, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে—চৌধুরীমশাই এ বেলা কাঁচা-আফিন্‌ই খেতে বাধ্য হলেন। শরীর শ্রান্ত থাকায় একটু বেশীই খেলেন। পরে খানকতক সন্দেশ মুখে দিয়ে জল খেয়ে চক্ষু বুজে আরামে তামাক টানতে টানতে ক্লান্ত শরীর সহজেই শয্যা নিলে।

নাসিকাধ্বনি শুনে দাঁড়িমাঝিরা মুখ চাওয়া-চাউই ক’রে হাসলে। একজন এসে তাওয়াদার ছিলিমটি তুলে নিয়ে গিয়ে টানতে আরম্ভ ক’রে দিলে।

* * * *

রাত তখন বারোটা। পঞ্চমীর পাতলা জ্যোৎস্নাটুকু ডুবে গেছে। অতবড় কলকাতা সহরের সোরগোল্ সারাদিনের অসীম চাঞ্চল্যের কসরতের পর এড়িয়ে প’ড়ে একটু ফুরশৎ পেয়ে যেন ঝিমুচ্ছে। কেবল আকাশের তারা আর জাহাজের আলোগুলি এই ফাঁকে নিঃশব্দে গঙ্গাবক্ষে নেবে পড়েছে। তাদের আনন্দস্নান আর মৃদু জলকল্লোল নিশীথিনীর শূন্যবক্ষে—নিস্তব্ধতার নিকষে একটা নিবিড় সুর একটানা টেনে চলেছে, যাতে মাধুর্য্যও আছে, আবার যার একান্ততায় গা’ও ছম্‌ছম্ করে। তার মাঝে বেসুরো শব্দ কানে এলেই চমকে উঠ্‌তে হয়।

আড়কাটির কবল থেকে মেয়েগুলিকে মুক্ত ক’রে—রতনার সঙ্গে আর তিনজন সঙ্গীর মার্ফৎ তাদের রওনা ক’রে দিয়ে ধম্মা বড়গঙ্গার মুখে একটা বয়ায় ছিপ্‌খানা বেঁধে আড়কাটির লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। ছিপ খানার জলের রং, সহজে কারো চোখে পড়েনা।

খাটুনি আজ অতিরিক্ত হয়েছে, জুয়ার এলেই ফিরবে—দক্ষিণ হাওয়াও দিয়েছে।

সহসা নিস্তব্ধ রজনীর বুকখানা চিরে বলির জীবের কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর ধ্বনির মত কোন্ অসহায়ের একটা হৃদয়ভেদী অন্তিম আবেদন দক্ষিণে হাওয়ায় ভর ক’রে ধম্মার কানে

ঢুকে প্রাণের মধ্যে লুটিয়ে প'ড়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো! সে তড়াক্ ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ব'লে উঠলো "রশি খোল্।"

হুকুমটা যেন ধর্ম্মরাজ্যের কাছ থেকে এলো!—"আওয়াজটা দখি্ন থেকে এলো না? উঃ, চার চারটে দাঁড় খালি! পুষিয়ে নিতে হবে—প্রাণ-পণ ভাই! এখনি ব্রহ্মহত্যা হ'য়ে যাবে, গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে পারবোনা!"

"কেনো সদ্দার?—কে সদ্দার?"

"গলাটা যেন চৌধুরী মশায়ের, আজ পঞ্চমী না? তাঁকে আজ বেরুতেও দেখেছি।—

—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে রে! রাজগঞ্জের দল—ওরা জলেই ফেলে দেয়! নে জোয়ানরা, দু ঘা মেরে নে ভাই!"

ভেটেল পেয়ে ছিপ ক্ষিপ্ত সর্পের মত ছুটলো!

তিন রশি তফাৎ থেকেই ধম্মা সঙ্গীদের হুকুম করলে—

—"দাঁড় তোল্—সড়কি!"

পরেই "খবরদার" কথাটা এমন বজ্রনির্ঘোষে তার মুখ থেকে বেরুলো, বোধ হল যেন আকাশের সব তারাগুলো ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়লো।

'জয় কালি!'

নিমেষে ছিপও নৌকা স্পর্শ করলে। সঙ্গে সঙ্গে এক জনের পায়ে সড়কি গিয়ে লাগলো।

সে নৌকোর দাঁড়ি-মাঝিরা তখন ছইয়ের ভিতর ঢুকে ছিল। ঘটনাটা এত ক্ষিপ্রগতিতে ঘ'টে গেল যে সহসা বহু লোক দেখে বা পুলিশের ছিপ্ ভেবে তারা ভীত বিমূঢ়ের মত ঝুপ্ ঝাপ্ ক'রে গঙ্গায় লাফ মারলে।

"মারিস্নি—যেতে দে," ব'লেই ধম্মা নৌকায় উঠে পড়লো।

"ওরে, চৌধুরী মশাই তো,—হাত পা বাঁধা,—শীগগির একখানা—উঃ, বড় সময়ে মা পৌঁছে দেছেন!"

চৌধুরী মশাই অজ্ঞান অবস্থায়।

"নৌকোর গলুই ছিপে বেঁধে ঘুরিয়ে নে। জুয়ারও এসে গেছে, শাল্‌কে পর্য্যন্ত এমনি যাক, জিরিয়ে নে জোয়ান। মা কালী মুখ রক্ষে করেছেন।"

চৌধুরী মশাইর মাথায় মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে করতে সংজ্ঞা আসে, চোখ চান না।

বলেন—"সব নে বাবা, আরো পাঁচহাজার বাড়ী পৌঁছেই দেবো—ব্রাহ্মণকে প্রাণে মারিস্ নি বাবা। ইত্যাদি।"

বহু আশ্বাস ও অভয় দেবার পর চৌধুরী মশাই চোখ খোলেন। তবুও মাঝে মাঝে আসন্ন অপঘাত আর মৃত্যু-দূতের ছায়া চোখ থেকে মোছেনা—কেঁপে ওঠেন। এই ভাবে ঘণ্টা খানেক কাটবার পর ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস আসে, কতকটা প্রকৃতিস্থ হন।

ঘাটে তাঁর ছেলে শৈলেন লোকজন নিয়ে চিন্তাকুলচিত্তে অপেক্ষা করছিল। নিজের গ্রাম আর আপন জনদের দেখে তাঁর পূর্ব্ব শক্তি অনেকটা ফিরে এল, নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। "এই ধর্ম্মদাসের জন্যে আজ—"ব'লেই ছেলের গলা জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন।

ধম্মদাসকে বললেন—"দরকার আছে তাই শুধু এই কাপড়ের গাঁটগুলি আর আমার গুড়গুড়িটা নামিয়ে দে বাবা। আর যা সব তোর রইল, তুই আমার জীবনদাতা—কাল একবার দেখা করিস বাবা।"

"ওকি বলছেন হুজুর, আমি কি এ গাঁয়ের কেউ নই। আপনাকে যে মা কালী ফিরিয়ে আনতে দিয়েছেন এর চেয়ে বেশী কিছু চাই না, কাল কি আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারতুম বাবু।—

—"যারা কুঁড়েয় প'ড়ে থাকে, খায় কি না খায়, কেউ খোঁজ রাখে না, আপনারা তাদের বুঝতে পারবেন না, চলুন পঁউছে দিয়ে আসি।"

চৌধুরী মশাই একটিও কথা কইতে পারলেন না, কেবল বললেন—"চল বাবা।"

যেতে যেতে চৌধুরী মশাই বললেন, "বাবা, তুই আমার প্রাণ দিয়েছিস্--জীবনদাতা—তোকে আমার অদেয় কিছু নেই এ কথাটি মনে রাখিস। তোকে তোর ইচ্ছামত কিছু না দিলে আমি যে কোন কাজে শান্তি পাব না ধম্মদাস—না পূজায়, না মাকে ডেকে।—অন্তর সাড়া দেবেনা, মায়ের নামও গলায় বাধবে।"

"কি চাইব—দুঃখকষ্ট আমাদের যে কোনো সাধই রাখতে দেয়নি হুজুর! আচ্ছা এখন মার পূজা তো আগে সারুন গে, তারপর—"

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কবে দেখতে পাবো !"

"দেখলেই দেখতে পাবেন হুজুর ! ফি বছইরত' পূজা বাড়ীতে ধম্মার কাজ—পাতফেলা আর এটো নেওয়া।"

চৌধুরী মশাই লজ্জায় কথা কইতে পারলেন না, শেষে বললেন— "ধর্ম্মদাস আমাদের অবস্থাই আমাদের অপরাধে অভ্যস্ত ক'রে রেখেছে।"—

ধম্মা আর শুনলে না। "বড় কষ্ট গেছে, আরাম করুনগে হুজুর।" ব'লেই দ্রুত চ'লে গেল।

৫

আজ ত্রয়োদশী। চৌধুরীমশাই ধম্মাকে আটকেছেন। তাকে কিছু নিতেই হবে।

অনেক কথা হ'ল। জীবনে কাকীমার চেয়ে বড় কিছু আর আপনার ব'লে গর্ব্ব করবার তার কাছে ছিল না। যারা শক্তি ধরে তারা শক্তিরই পূজা করে।

"কাকিমা আমার টাকা ছোঁবেন না,—তাঁর মেয়ের বিয়ের উপায় নেই—তবু না। মথুরা কিন্তু তেরো পেরুলো। এখন মজুরি কোরে এ কাজ করতে দু বছর লাগে। তা ছাড়া উপায়ও দেখছি না। তা আমি যদি কিছু না নিলে দুঃখিত হন তো এই অসহায়ার ওই মেয়েটির বিয়েটা দিয়ে দিন। এটা বাঁচাবাঁচির কথা নয় বাবু,—সে মা কালী জানেন, এটা ভিক্ষে করছি হুজুর।"

একটু নীরব থেকে—"কাকামা না হেসে ছেলের সঙ্গে কথা কইতেন না, এখন স'রে স'রে থাকেন, পাছে আমার লাগে।" বলতে বলতে ধম্মার গলা ভার হ'য়ে চোখে জল বেরিয়ে এল।

সব শুনে চৌধুরী মশাই কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে ধম্মার দিকে চেয়ে থেকে বললেন—

"তাতে তোকে আমার কি দেওয়া হ'ল—তোর লাভ ?

"সব লাভ কি চোখে দেখা যায় হুজুর ?—এই যে এত খরচ করে মার পূজো করলেন আপনার লাভটা কি দেখাতে পারেন হুজুর ?—সেই আর কি !"

চৌধুরী মশাই মনে মনে লজ্জিত হলেন, বললেন "তাই হবে ধম্মদাস।"

"কিন্তু সব ভার আপনাকে নিয়ে এ কাজটি ক'রে দিতে হবে, মেয়েটি যাতে সুখে থাকে। তা হ'লেই আমি লাখ্ টাকা পাবো।"

"আচ্ছা তাই হবে বাবা। আর এই অগ্রানেই যাতে দিতে পারি তার চেষ্টাও পাবো।"

ধম্মা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় হ'ল।

চৌধুরীমশায়ের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো, তিনি উদাস ভাবে বিমর্ষ মুখে ভাবতে লাগলেন—"জীবনে অনেক কাজই করেছি—তার মধ্যে এমন কাজ একটিও নেই !"

তাইতো "মেয়েটা যাতে সুখে থাকে"—সে কি আমার হাত। ভাবতে লাগলেন।

*　　*　　*　　*

সতেরো অগ্রান মথুরার বিবাহ হ'য়ে গেছে। দেখে সকলেই অবাক—পাত্র চৌধুরীমশায়ের একমাত্র পুত্র শৈলেন্দ্র।

জমিদার মশাইকে সকলে ধন্য ধন্য করছে। কেবল বড়ঠাকুরঝি বলছেন—"আমার ভাইঝি কুমু থাকতে কিনা—" ইত্যাদি। "তা আমাদের বাড়ীতে ও বর মানাতো না—মোটে একটি পাস্ !—ভায়েরা আমার—হুঁঃ। বলিনি সেজ বউ, টাকার ছালার ওপর ব'সে আছে। কি চাপা মেয়ে বাবা ! কবে মোরবো কেবল জানিনা লো !"

সেজভাজঠাকরুণ পাসের কথায় জ্ব'লে যান, বলেন "ছাই পাস, বুদ্ধির চাপেই সব মলেন, কোথাও যেতে জানেন, না কথা কইতে জানেন ! মেয়েটার যেমন অদেষ্ট। শেষ একটা বাইস্ম্যান্ জুটবে !"

ভাসুর দুদিন আগে থেকে বাড়ী আসেন নি।

"লাটসায়েবের মেমের নাকি কি কাজ পড়েছে যা আর আর কারুর সাদ্দি নেই করে। চাকরি তো আর ছেড়ে দিতে পারে না। লাট্নীর আবার আর কারুর কাজ পছন্দ হয় না।"—ইত্যাদি—বড়ঠাকুরঝির উক্তি।

*　　*　　*　　*

ধম্মা একদিন হাসতে হাসতে বললে—"মা গঙ্গার কোলে জ্বালা জুড়োবার জায়গা খোঁজবার জন্যে আর তাড়াতাড়ি করবে না ত কাকিমা ?"

"রোস্ বাবা—মথুরার একটি ছেলে দেখে যাব না রে !"

"তা বই কি কাকিমা" ব'লেই কাজলা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে হেসে লুটিয়ে পোড়লো !

সোনা-লোহা

—গল্প—

—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজা উড্‌মণ্ড্‌ ষ্ট্রীটে লোহার দোকান,—পাঁচ পুরুষের কারবার। বাঙালীর ঘরে সাধারণত যা হয় না, এ তাই হয়েচে, সওয়া শ বছর ধ'রে একটানা উন্নতির ফলে অবস্থা ক্রমশ এমন দাঁড়িয়েচে যে কমলার কৃপা বর্ষণ এখন আর খুচরা হিসাবে হয় না,—একেবারে পায়কেরি হিসাবে হয়।

বর্ত্তমান সত্ত্বাধিকারী গৌরকৃষ্ণ মিত্র কারবারের ষোলো-আনা মালিক। বৃদ্ধ-প্রপিতামহর আমল থেকে ক্রমান্বয়ে শাণিত হ'য়ে হ'য়ে ব্যবসা-বুদ্ধি এঁর মাথায় এমন সুতীক্ষ্ণ হয়েচে যে, জার্ম্মাণ যুদ্ধের কিছুকাল পরে মন্দা বাজারে সমস্ত ব্যবসাদার যখন লোকসান দিয়েছিল, ইনি সে সময়ে ক'রেছিলেন ভবিষ্যৎ লাভের ব্যবস্থা। ইনি জান্‌তেন শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা ফুসফুসের মত, ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা কারবার চলে; ভাঁটার সময় নৌকো বেঁধে রেখে জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

বিপত্নীক হবার বছর দুই পরে গৌরকৃষ্ণ তাঁর একমাত্র পুত্র নিতাইকৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছিলেন। পুত্রবধূর নাম তটিনী। পাঁচ পুরুষের লোহা বাঁধানো সংসারে তটিনীরই মত সে এক দিন প্রবেশ করেছিল শিক্ষা এবং লাবণ্যের যুগল তটের মধ্যবর্ত্তিনী হ'য়ে। পূর্ব্বেকার গৃহিনীরা দেখতে ছিলেন লোহার মত, স্বামীদের কাছে ব্যবহারও পেতেন লোহার মত, নাম তাঁদের ছিল যোগমায়া মহামায়া শ্রেণীর, পরতেন তাঁরা মোটা সূতোর কাপড়, আর বাউটি চন্দ্রহার প্রভৃতি অলঙ্কার। সমস্ত দিন দোকানে লোহা পিটিয়ে কর্ত্তাদের মেজাজ থাকৃত কড়া—বাড়ি এসে তার চোট পড়ত সাদা'মাটা কালোকোলো গৃহিনীদের উপর। গৃহিনীরা দুবেলা পেটভরা খোরাক পেয়ে মনে করতেন পেটে খেলে পিঠে সয়।

তটিনীর প্রবেশ থেকে সংসারে এ ধারাটা একেবারে গেল বদলে। বিদুষী, সুন্দরী, গৌরবর্ণা, লতার মত ছিপ্‌ছিপে ডেপুটি কন্যা তটিনীকে লোহার শিকলে বাঁধা গেল না, সকলে উৎসাহে লেগে গেল তার জন্যে সোনার খাঁচা তৈরি করতে। সংসারে যেন একটা নূতন উদ্দীপনা এল। শ্বশুর গৌরকৃষ্ণ সকাল সকাল দোকান থেকে ফিরে গাড়ি ক'রে পুত্রবধূকে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে হাওয়া খেতে যান; সন্ধ্যার পর স্বামী নিতাইকৃষ্ণ মুরগীহাটা থেকে সৌখীন সামগ্রী কিনে পকেটে পুরে বাড়ি ফেরে। দোকানে টন, হন্দর, মনের হিসাবে কারবার চলে; বাড়িতে ভরি, আনা, রতির অঙ্ক আরম্ভ হ'য়ে গেল। গৌরকৃষ্ণ বহুকাল-অব্যবহৃত পাঠশালায়-শেখা শুভঙ্করীর শ্লোক মনে মনে আবৃত্তি করেন,

স্বর্ণের যতেক ভরি প্রশ্নেতে কহিবে,
টাকা প্রতি তের কড়া এক ক্রান্তি হবে।
আনাতে আড়াই ক্রান্তি শুভঙ্কর ভণে,
ভরি দরে রতি কম আনন্দিত মনে।

আর আনন্দিত মনে স্বর্ণকারকে বলেন, "ওহে গোকুল, গেল বারে বউমার চুড়ি বড় হাল্কা গড়েছিলে, এবার বেশ ভারি ক'রে গোড়ো।"

গোকুল বলে, "কি করি কর্ত্তা, বউমার হাত যে বড় কাহিল।"

গৌরকৃষ্ণ বলেন, "বউমার হাতই যেন কাহিল। বউমার শ্বশুর ত কাহিল নয়; ভারি ক'রে গোড়ো।"

অন্তরালে তটিনীর চক্ষু ভক্তি ও প্রীতিতে সজল হ'য়ে আসে।

সোনার একটা যেন নেশা লেগে গেল। বাণীর পয়সা বাড়বে বুঝে গোকুল আপত্তির বাণী থামিয়ে দিয়ে বেশ ভারি ক'রে ক'রে অলঙ্কার গ'ড়ে আন্‌তে আরম্ভ করলে। সে প্রতি বার নূতন নূতন দোকানের ক্যাটালগ্‌ নিয়ে আসে—গৌরকৃষ্ণ দেখে বলেন, "এ বইটা গেল বারে আননি কেন? তা হ'লে এই নক্সাটাই পছন্দ করতাম।" তার পর লাল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পেন্সিল দিয়ে মোটা ক'রে দাগ কেটে দেন ; সপ্তাহখানেক পরে ভরি পনেরো-ষোলো সোনার দেহ ধারণ ক'রে সেই নক্সা গৌরকৃষ্ণের হাতে এসে পৌঁছোয়।

পাঁচ পুরুষের সঞ্চিত লোহার মানস-মেঘে সোনার বিদ্যুৎ-রেখা ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ল। নেশা লাগ্‌ল।

তটিনী হাসি মুখে বলে—"বাবা, গয়নাগুলো একটু বেশি বড়, আর বেশি ভারি হচ্চে।"

মুখে গৌরকৃষ্ণ বলেন, "আচ্ছা মা, গোকুলকে এবার সে কথা বল্‌তে হবে।" কাজে কিন্তু গোকুলকে কিছু না ব'লে পাচিকাকে বলেন তটিনীর ঘি-দুধের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে।

ব্যাপার দেখে নিতাইকৃষ্ণ হাসে, আর বলে, "আমাদের দোকানে বেশি টাকার লোহা আছে, না তোমার বাক্সয় বেশি টাকার সোনা আছে বলা কঠিন সেজ বউ।" জেঠতুত খুড়তুতর ইজমালি হিসাবে তটিনী সেজ বউ।

তটিনী হেসে বলে, "আর কিছুদিন এই ভাবে চল্‌লে ওজন নিয়েও সেই সমস্যা উপস্থিত হবে। বাবা চান তাঁর একটি সোনার পুত্রবধূ হয়। গোকুলকে ফরমাস্ দিয়ে একেবারে একটি নিরেট প্রমাণ সাইজের সোনার প্রতিমা গ'ড়ে নিলেই পারেন।"

লোহার কারবারী নিতাইকৃষ্ণের মুখে সৌখীন ভাষায় উত্তর যোগায় না ;—মন কিন্তু তার বলে, "সোনার প্রতিমা গড়াতে হবে কেন? সোনার প্রতিমা পেয়েই ত' বাবার এই সোনার খেয়াল হয়েচে।"

২

লোহার আয় আর সোনার ওজন,—দুই-ই উচ্চ মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে গৌরকৃষ্ণ যখন ইহলোক পরিত্যাগ করলেন, তখন তটিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েচে। ছেলেটির বয়স সাত বৎসর, মেয়েটির চার। ছেলের নাম অশোকনাথ, মেয়ের অমিয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে এ পরিবারের পুরুষদের কৃষ্ণ যোগে নামকরণ হয়েচে। পৌত্রের নামকরণের সময়ে গৌরকৃষ্ণ পুত্রবধূর কাছ থেকে পছন্দসই নামের একটা তালিকা চেয়েছিলেন ; পুত্রবধূর সর্ব্ববিষয়ে সুরুচি সম্বন্ধে তাঁর অনপনেয় বিশ্বাস ছিল। তটিনী মাত্র দুটি নাম প্রস্তাব করেছিল, অশোকনাথ এবং প্রেমসুন্দর। 'কৃষ্ণের' স্থানে একেবারে সুন্দর ক'রে একটা অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন না ঘটিয়ে গৌরকৃষ্ণ 'অশোকনাথ' মনোনীত করেছিলেন। পৌত্রীর নামকরণের সময়ে তিনি তটিনীর নির্ব্বাচিত অমিয়া নামের সহিত 'বালা' যোগ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। ইতস্তত ক'রে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে তটিনী বলেছিল, "মন্দ হয় না বাবা, একটু বড় হ'য়ে এক রকম ভালই হয়। কিন্তু আজকাল বালা ঠিক—।" পুত্রবধূকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হেসে উঠে গৌরকৃষ্ণ বলেছিলেন, "বুঝেচি বউমা, বালা আজকাল হাতেও চলে না, নামেও চলে না। আচ্ছা, অমিয়া বালা না হয় থাক্, কিন্তু আমার দেওয়া সোনার বালাটা তুমি একেবারে বাদ দিয়ো না।"

সেই দিনই তটিনী বাক্স থেকে আঠারো ভরির অমৃত পাকের নিরেট বালা বার ক'রে হাতে পরেছিল, এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পরও এ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও হাত থেকে খোলেনি—এমন কি অত্যন্ত সৌখীন গৃহে নিমন্ত্রণ রাখতে যাবার সময়ও নয়।

শুধু পুত্র কন্যার নামেই নয়,—বেশ-ভূষা, লেখা-পড়া, চাল-চলন, পান-আহার, এমন কি ধ্যান-ধারণায় পর্য্যন্ত এমন একটা পরিবর্ত্তনের বিপ্লব ঘ'টে গেছে যে তটিনীর শাশুড়ীর যুগ যে তটিনীর নিজের যুগেরই অব্যবহিত অতীত, এ বিশ্বাস করা কঠিন। বৈসাদৃশ্যে এবং যোগ-শূন্যতায় এই ভূত কাল যেন মানুষের ভূতকেও অতিক্রম ক'রে গেছে।

এ পর্য্যন্ত এ বংশে কেউ ধারাপাত এবং শুভঙ্করী ছাড়িয়ে পাটীগণিতে প্রবেশ করেনি ; পাঠশালা থেকে একেবারে প্রমোশন হ'ত লোহার দোকানে। সেখানে মণ-কষা নির্ভুল হ'লেই সকলের মন নিরুদ্বেগ থাকৃত। রঘু-শকুন্তলা-মিরাণ্ডা-ডেস্‌ডেমোনার সঙ্গে অপরিচয় যে মানুষের জীবনের পক্ষে একটা ত্রুটি—এ কথা কেউ জান্‌ত না, তাই সে কথা কেউ ভাবতও না। সেই বংশের সপ্তম পুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যখন তটিনী ধারাপাত শুভঙ্করীর পর পাটীগণিতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, তখন নিতাইকৃষ্ণ দেখলে লক্ষণ শুভ

নয় ; বললে, "অশোককে এবার আমার দোকানে দাও সেজ বউ। লেখা পড়া বেশি চালালে কারবার চলবে কেন ?"

তটিনী হাসি মুখে বললে, "তোমাদের বংশে লোহার কারবার ত' অনেক দিন চলল, এবার বিদ্যের কারবার একটু চলুক না ? লক্ষ্মীর উপাসনার সঙ্গে সরস্বতীর আরাধনাও আরম্ভ হোক্।"

যুক্ত কর কপালে ছুঁইয়ে নিতাইকৃষ্ণ বললে, "তা হয় না সেজ বউ। ও দুটি ভগ্নীতে বড়ই বিরোধ। বিদ্যে বেশি হ'লে, বুদ্ধি ক'মে যায়।"

তটিনী বললে, "সে কূট বুদ্ধি।"

নিতাই বললে, "সেই বুদ্ধির জোরেই কারবার চলে।"

বিপদ দেখে তটিনী বললে 'আচ্ছা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অশোক পড়ুক ত'। তারপর তোমার সঙ্গে কথা রইল, সে যদি প্রথম বারেই প্রবেশিকা পাশ না করতে পারে, তা হ'লে কলেজে প্রবেশ না ক'রে তোমার দোকানেই প্রবেশ করবে।"

একটু হেসে নিতাইকৃষ্ণ বললে, "এ-যে খুব ভরসার কথা দিয়ে রাখলে তা'ত মনে হচ্চে না সেজ বউ। যে রকম ব্যবস্থা ক'রে অশোককে পড়াতে আরম্ভ করেচ, তাতে তাকে এম এ পাশ করিয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য না ক'রে যে তুমি ছাড়বে তা' কিছুতে আমার মনে হয় না।"

তটিনী হাসতে লাগল ; বললে, "ভাল করনি তোমরা আমাকে তোমাদের সংসারে এনে। লোহাকে তোমরা এত বেশি চিনেছ যে, আর সমস্ত জিনিষই তোমাদের হাতে হাল্কা ঠেকে।"

নিতাই বললে "সেটা লোহার গুণে কি আমাদের হাতের দোষে তা ঠিক বলা যায় না।"

"বোধ হয় আমার অদৃষ্ট দোষে।" ব'লে তটিনী প্রস্থান করলে।

৩

কিছু দিন পরে তটিনীর নিমন্ত্রণ হ'ল তার এক বাল্য-সঙ্গিনীর গৃহে, ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। সঙ্গিনীর নাম হেমলতা রায়, আলিপুরে বিস্তৃত কম্পাউণ্ড নিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ী ; নিত্য ব্যবহারের জন্ম তিনখানা মূল্যবান মোটরকার। দাস-দাসী, আয়া-বেয়ারা, বয়-খানসামা, মালা-দরোয়ান কিছুরই ত্রুটি নেই। স্বামী মিষ্টার ডি, রয় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার,—জমিদারি এবং ব্যারিষ্টারি থেকে তাঁর মাসিক আয় হাজার বিশেক টাকার কাছাকাছি।

রাত্রি আটটার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আহার শেষ হ'য়ে গেল। সাড়ে আটটা থেকে বায়োস্কোপ্ আরম্ভ হবে, ইতিমধ্যে সকলে বেরিয়ে পড়ল মুক্ত প্রাঙ্গণে। স্থানে স্থানে আট দশখানা ক'রে চেয়ার পাতা, দিকে দিকে উঁচু লোহার পোষ্টের উপর পূর্ণ চন্দ্রের মত বিজলী বাতি জ্বলছে, এক জায়গায় একটা নামজাদা ফিরিঙ্গির দল ষ্ট্রীং ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। গৃহিণী হেমলতা প্রসন্ন মুখে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে সুমধুর বাক্যে এবং সুমিষ্ট হাস্যে অতিথিবর্গকে পরিতুষ্ট করছেন। নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে সাত আট জন ছিল তটিনীর স্কুল জীবনের সঙ্গিনী ;—তাদের সঙ্গে তটিনী একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন জায়গায় এসে বসল।

মেয়েদের মধ্যে এক জনের নাম প্রমীলা লাহিড়ী। এর স্বামী মিষ্টার জে, লাহিড়ী, কণ্ট্রাক্টরী করে। অভাবের তাড়নায় এবং স্বামীর উৎপীড়নে প্রমীলার মুখে এমন একটা ছাপ পড়েছে যে দেখলেই মনে হয় সে যেন একটা বিষধর সাপের মত সুযোগ পেলেই সংসারটাকে ছুবলোতে প্রস্তুত—হিংসা দ্বেষ ঘৃণায় এতই জর্জ্জরিত।

তটিনীর সাজ সজ্জা গহনা পত্রের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমীলা বললে, "তটি, তোর পছন্দ আজকাল কি coarse হ'য়ে গেছে রে! এত মোটা মোটা সোনার গয়না আজকাল কেউ পরে ?"

নমিতা চ্যাটার্জী হেসে উঠল ; বললে, "ঠিক্, বলেছিস্। Almost vulgar!"

সোনার ওজন হিসেবে ধরতে গেলে এ মেয়েটির রিফাইন্‌মেণ্ট খুব বেশি ; দু হাতে দু গাছা লিক্‌লিকে চুড়ি আর কানে এক জোড়া হাল্কা দুল ছাড়া দেহে সোনা কিম্বা আর কিছুরই কোনো উৎপাত ছিল না।

উষা বসু বললে, "বছর দশ-পনেরো আগে বাঙালীর মেয়েরা সোনা-রূপোর মুটে ছিল,—কিন্তু এতদিন পরে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের মধ্যে যে আবার সেই primitive যুগের specimen পাব তা জানতাম না।" তারপর তটিনীর মোটা বালায় হাত দিয়ে বল্‌লে, উঃ, যেন handcuff ! মা গো মা ! সেই আমিবৃত্তি পাক্‌।" বিস্ময় ঘৃণা করুণা মিশ্রিত অবজ্ঞার একটা মিহি টান সূক্ষ্ম হ'য়ে মিলিয়ে গেল।

প্রমীলা বল্‌লে, "ও বুঝি তোর শাশুড়ীর হাতের ?"

তটিনী মৃদু হেসে বল্‌লে, "আমার শ্বশুর গড়িয়ে দিয়েছিলেন।' এই অলঙ্কার আলোচনার কৌতুকের দিকটা সে বেশ উপভোগ করছিল—সময়ে সময়ে মনে পড়ছিল কথামালার প্রথম গল্পটা।

উষা বল্‌লে, "শ্বশুর ত মারা গেছে, তবে ও সোনার ঢিবি গলিয়ে ফেলিসনে কেন ?"

তটিনী বল্‌লে, "Primitive যুগের এ-ও বোধ হয় একটা দোষ। যারা সোনা রূপো বয়, শ্বশুরের স্মৃতি বহন করবার শক্তিও তাদের বোধ হয় থাকে। আজকালকার refined মেয়েদের মত তারা অত delicate নয় !" শ্বশুরের কথা মনে প'ড়ে তটিনীর চোখে জল এল—মনে পড়ে গেল সেই স্নেহ-গভীর কথা—'গোকুল, বউমার হাতই যেন কাহিল, বউমার শ্বশুর ত কাহিল নয়—ভারী ক'রে গোড়ো।'

তটিনীর কথার উত্তর দিলে প্রমীলা ; বল্‌লে, "কিন্তু শুধু শ্বশুর বেচারারই ত' দোষ নয়—স্বামীও ত সেই শ্বশুরেরই ছেলে। জানি আমি ওদের—লোহার বিম বরগার দোকান আছে। ভারী মোটামুটি চাল, culture নেই, refinement নেই, education নেই, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না। বাড়ীতে হাঁটুর ওপর কাপড় পরে, আর দোকানে খালি গায়ে কাঠের বাক্স সাম্‌নে নিয়ে ব'সে থাকে।"

এই অনাবশ্যক মাত্রাতিরিক্ত দুর্ব্বাক্য বর্ষণে সকলেই একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেল, এমন কি উষা বসু পর্য্যন্ত। এ পর্য্যন্ত তটিনী যে ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে আস্‌ছিল, এই নির্ম্মম স্বামী-নিন্দায় তা আর কোনো মতেই বজায় রাখ্‌তে পারলে না ; আরক্ত মুখে কম্পিতকণ্ঠে সে বল্‌লে, "খালি গায়ে কাঠের বাক্স সামনে নিয়ে ব'সে থাকেন কিনা জানি নে, কিন্তু কোনো কোনো ঠিকেদার চাঁদনি বাজারের বিলিতি সুট্‌ প'রে দু চারখানা লোহারই বিম বরগা ধারে পাবার প্রত্যাশায় তাঁর দোকানে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকে তা জানি।"

রহস্যের সমাধান হ'য়ে গেল। সকলেই বুঝ্‌তে পারলে এ একেবারে অকারণ নয়—উভয়ের স্বামীর মধ্যে পূর্ব্বেকার কোনো একটা ঘটনা অবলম্বন ক'রে—এ পুরোদস্তুর বচসা। তখন নিমেষের মধ্যে সকলের মন থেকে প্রমীলার প্রতি কোপ আর তটিনীর প্রতি করুণা অন্তর্হিত হ'ল।

উষা পুনরায় প্রমীলার পক্ষ অবলম্বন ক'রে কঠোর স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু যাই বল তটিনী, সত্য কথা তোমার সহ্য করাই উচিত ছিল। তোমার স্বামী যে এক জন লোহা-ওয়ালা তা'তে ত' আর সন্দেহ নেই—সোসাইটিতে তোমার স্বামীর এমন কি position যাতে তুমি এত লম্বা লম্বা কথা আমাদের শোনাতে পার ?"

তটিনীর দুই চক্ষের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল ; চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "তোমাদের সোসাইটিতে আমার লোহা-ওয়ালা স্বামীর ঠিক সেই position, নিউইয়র্কের সোসাইটিতে কেরোসিন তেল-ওয়ালা রক্‌ফেলারের যে position। আমার স্বামী তাঁর কাঠের বাক্সের এক কোণে হাত দিয়ে তোমাদের দু জনের স্বামীকে কিনে নিয়ে তাঁর কোটের দু দিকের দুই পকেটে ফেলে রাখ্‌তে পারেন, এ জেনে রাখো !"

ক্রোধে অপমানে কে কি বল্‌বে ভেবে পেলে না—প্রতিবাদ এবং অসন্তোষের একটা অর্থহীন গুঞ্জন শুধু জেগে উঠ্‌ল। সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে তটিনী কম্পাউণ্ডের যে দিকে লাইন বেঁধে গাড়ি সব অপেক্ষা করছিল সেই দিকে অগ্রসর হ'ল।

শুন্‌তে পেয়ে হেমলতা ছুটে গিয়ে যখন তটিনীর মোটর কারের ধারে উপস্থিত হ'ল তখন তটিনী সবেমাত্র গাড়িতে উঠে বসেছে।

হেমলতা প্রথমে সোফারের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "তুমি একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর।" সোফার গাড়ি থেকে নেমে দূরে গিয়ে দাঁড়ালে, তটিনীর বাম বাহু ধ'রে হেমলতা বল্‌লে, "আয় তটি, নেবে আয়—বায়স্কোপ না দেখে তোর

যাওয়া হবে না। আমি সব শুনেছি—আমার যদি বাড়ি না হ'ত, এর প্রতিকার আমি নিশ্চয়ই করতাম। আয়, নেবে আয়।"

আরক্ত মুখে মাথা নেড়ে তটিনী বল্‌লে, "না ভাই, আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে গেছে! আমার স্বামীকে তারা বড় অপমান করেছে। তাঁকে বলেছে লোহা-ওয়ালা, uncultured, uneducated, অভদ্র!" দুঃখে, অপমানে, ক্রোধে তটিনীর দুই চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল ঝ'রে পড়্‌ল।

কঠিন কণ্ঠে হেমলতা বল্‌লে, "Brutes!—এত কথা আমি শুনি নি। এ হিংসে ছাড়া অন্য কিছুই নয়—তোর এত টাকা হয়েচে—তারই এ হিংসে। আমি যদি সেখানে থাক্‌তাম, নিজের বাড়ী ব'লেও ছাড়তাম না।—তুই চল্ তটি, আমার পাশে তুই বস্‌বি, দেখি তোকে কে কি বলে! আমার এক জন guestকে protect করবার নিশ্চয়ই আমার অধিকার আছে।"

মিনতির সুরে তটিনী বল্‌লে, "বুঝ্‌তে পারছিস্ নে ভাই? মনটা খিঁচ্‌ড়েগেছে। তোর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি তার সোনার থালা বাটি যেন চিরদিন বজায় থাকে।—আমাকে আজ যেতে দে!"

দুঃখিত স্বরে হেমলতা বল্‌লে, "আচ্ছা, তবে যা।" তারপর তটিনীর হাতের উপর হাত রেখে বল্‌লে, "কিন্তু আমার ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছিস্‌নে ত?"

সজোরে হেমলতার হাত চেপে ধ'রে তটিনী বল্লে, "পাগল হয়েচিস্ টুনি? তোর জন্যেই ত' তবু একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছি!"

"নিতাইবাবুকে আর ছেলে মেয়ে দুটিকে সঙ্গে আনিস্‌নি কেন?"

তটিনী বল্‌লে, "যে ভয় ক'রে তাঁকে আনিনি তা'ত ঘটেই গেল। তবু না এনে ভালই হয়েচে; আর একটা scene হয় ত avoided হ'ল। মিষ্টার লাহিড়ী ত' এসেছেন, দেখলুম।"

হেমলতা বল্‌লে, "কিন্তু মিষ্টার রয়-ও এ বাড়ীতে উপস্থিত আছেন সে কথা ভুলে যাচ্ছিস্।"

তটিনী শুধু একটু হাস্‌লে—কিছু বল্‌লে না।

মাঠ দিয়ে যেতে যেতে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তটিনীর ধমনীর মধ্যে উত্তপ্ত রক্তস্রোত একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে এল, দু দিকের কপাল দপ দপ্ করছিল একটু কম পড়ল, বুদ্ধি চৈতন্য অনুভূতি স্বাভাবিক ধারায় কতকটা প্রত্যাবর্ত্তন করলে। লক্ষ্মীবান শ্বশুরের অনাধুনিক সংসারে প্রবেশ ক'রে তার শিক্ষা দীক্ষা জীবন ধারায় গঠিত যে সংস্কার অনেকটা রূপান্তরিত হ'য়ে এসেছিল, প্রমীলা-দলের কাছ থেকে তীব্র খোঁচা খেয়ে আবার তা অনেকটা পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। তার মনে হ'ল অতি কঠোর ভাবে প্রমীলারা যে কথা বলেছে, যতই অসহ্য হ'ক, তার মধ্যে সত্য একটু আছেই। এই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্ণীর সঙ্ঘের মধ্যে তার স্বামীর position কোথায়?—এদের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা চালাবারও মত তার স্বামীর কি শিক্ষা সন্ধান আছে? রকফেলারের সঙ্গে সে তার স্বামীর তুলনা ক'রে এল; কিন্তু রক্‌ফেলারের সঙ্গে তার স্বামীর তুলনা করা যায় রাগ করে,—আর যায় রঙ্গ ক'রে; যা হয়ত প্রমীলার দল এতক্ষণ ভাল ক'রেই করছে। উষা যে বলেছিল তার স্বামী লোহাওয়ালা, তাতেই বা আপত্তি করবার কি আছে যদি না নিজেরই মনে লোহার হীনতা সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস থাকে। তার স্বামী উচ্চ-শিক্ষিত নয়, মার্জ্জিত নয়, তা ঠিক, কিন্তু তার স্বামীর যে পদার্থে এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি তার কাছে ডুবে গেছে, তার খবর প্রমীলারা কি ক'রে জানবে? যারা সরসতার খবর রাখে না তারা মেঘের কালো রং দেখে ত নিন্দে করবেই।

হতাশায় দুঃখে তটিনী গাড়ির একটা কোণে ঢ'লে পড়ল। কি করা যায়!

৪

গাড়ি তখন মাঠ ছাড়িয়ে সহরের একটা জনসঙ্কুল পথ দিয়ে কতকটা ধীর গতিতে চলেছিল। তটিনীর চোখে পড়ল একটা অলঙ্কারের দোকান। রাস্তার ধারে আট দশখানা বড় বড় কাঁচের দরজা—তার ফ্রেমে চক্‌চকে মেহগিনী পালিশ; দরজায় দরজায় পিতলের কব্জা, হাতল প্রভৃতি সুমার্জ্জিত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হ'য়ে সোনার মত ঝক্ ঝক্ করছে, ভিতরে কালো কাঠের কাঁচের আলমারি, কাঁচের শো-কেস সারি সারি সাজানো ; তার ভিতরে হীরা, চুনি, পান্না, মুক্তার অলঙ্কার চক্‌মক্ করছে ; সারা দোকানটা জুড়ে বিজলী বাতির অগ্নিময়ী লীলা—ছাত থেকে ঝুলছে, দেওয়াল ছেড়ে বেরিয়েচে, শো-কেস আলমারির ভিতর জ্বলছে, যেন সমস্ত দোকানটা একটা বড় জড়োয়া গহনা। দোকানের সম্মুখে রাস্তায় চার পাঁচখানা দামী মোটর গাড়ি—দোকানের ভিতরে ক্রেতার ভিড়—এক জায়গায় সাত আট জন স্ত্রীলোক অলঙ্কার হাতে নিয়ে পরীক্ষা করচে, বোধ হয় প্রমীলা জাতীয়ই হবে।

"তুলসী !"

শোফার বল্‌লে, "মা ?"

"গাড়ি ঘুরিয়ে ওই গয়নার দোকানের সামনে লাগাও !"

"যে আজ্ঞে।"

দোকানের প্রবেশ পথে গাড়ি দাঁড়ালে তটিনী গাড়ি থেকে নেমে দোকানের দিকে অগ্রসর হ'ল। দ্বারে সুসজ্জিত দারোয়ান টুলের উপর ব'সে ছিল, তটিনীর গাড়ি সজ্জা আর আকৃতি দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তটিনী দোকানে প্রবেশ করলে দোকান যেন একটা নব সম্পদ, নূতন শ্রী লাভ ক'রে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল ; তার অপরূপ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখে দোকানের লোকেরা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল।

তিন দিক থেকে তিনজন কর্ম্মচারী ছুটে এল ; একজন একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে বল্‌লে, "আদেশ করুন।"

তটিনী বল্‌লে, "অনুগ্রহ ক'রে আমার ঠিকানাটা লিখে নিন। কাল সকালে আমার চাই—এক সেট্ হীরের চুড়ি, এক ছড়া হীরে-বসানো হার আর এক জোড়া হীরের ইয়ারিং। কয়েকরকম প্যাটার্ণ নিয়ে যাবেন, কিন্তু হীরে ছাড়া অন্য রকম পাথর থাক্‌লে চল্‌বে না।"

"যে আজ্ঞে। কত টাকা দামের মত হবে ?"

একটু ভেবে তটিনী বল্‌লে, "হাজার পাঁচেকের বেশি না হ'লেই ভাল।"

"বেশ ভাল জিনিসই হবে।" ব'লে কর্ম্মচারী তটিনীর ঠিকানা লিখে নিলে।

যাবার জন্যে তটিনী উঠে দাঁড়ালো—কিন্তু না গিয়ে সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে চারদিক দেখ্‌তে লাগ্‌ল, যেন আবিষ্টের মত। অলঙ্কারের দিকে তার তত দৃষ্টি ছিল না, যত ছিল দোকানের সাজ-সজ্জা-সরঞ্জামের দিকে।

কর্ম্মচারী বল্‌লে, "আসুন না মা, দোকানটা একটু ঘুরে দেখে যান।"

কর্ম্মচারীর কথায় হঠাৎ যেন মোহমুক্ত হ'য়ে তটিনী বল্‌লে, "থাক—আর একদিন আস্‌ব।"

তটিনী গাড়িতে গিয়ে বস্‌লে একজন কর্ম্মচারী পাঁচ সাত রকমের ক্যাটালগ্ দিয়ে গেল। তটিনী সাগ্রহে সেগুলো নিজের হাতে নিয়ে পথের সেই অনুজ্জ্বল আলোকেই পাতা উল্টে উল্টে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

গৃহে পৌঁছে তটিনী একেবারে সোজা তার স্বামীর কাছে উপস্থিত হ'ল। নিতাইকৃষ্ণ তখন আহার সমাধা ক'রে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়ায় মনোনিবেশ করেছে। আলো নেভানো ছিল—তটিনী এসেই জ্বেলে দিলে।

নিতাই বল্‌লে, "সেজবউ, তুমি বেশি জ্বলে উঠ্‌লে, না আলোটা বেশি জ্বলে উঠ্‌ল তা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে !"

কথাটার মধ্যে পরিহাসের চেয়ে সত্যই বোধ হয় বেশি ছিল। তড়িতের ঘর্ষণে আলোর তার যেমন দীপ্ত হ'য়ে থাকে, প্রমীলা দলের সংঘর্ষণে তটিনী তেমনি উদ্দীপ্ত হ'য়ে ছিল। সুন্দরী স্ত্রীলোক ক্রুদ্ধ হ'লে নবতর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে, সুন্দরী স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাদের কারবার আছে একথা তারা সকলেই জানে।

স্বামীর রসিকতার কোনো উত্তর না দিয়ে তটিনী বল্‌লে, "শোন, তোমাকে একটা জহরতের দোকান করতে হবে !"

এই যে তার এত বড় প্রাণের কথা, দুঃখ-বেদনা-অপমান গ্লানির কথা, পথে জহরতের দোকান চোখে পড়া মাত্র যে কথা তার প্রাণে জেগেচে—তার জন্যে সে একটু উপক্রম-উপক্রমণিকা করলে না, কিছুমাত্র ভণিতা-ভূমিকা করলে না, একেবারে ব'লে বস্‌ল, "জহরতের দোকান করতে হবে।"

বিস্মিত ভাবে নিতাই বল্‌লে, "জহরতের দোকান ? এ আবার তোমার কি খেয়াল হল সেজবউ ?"

"না, না, খেয়াল নয়—সত্যিই করতে হবে।" ব'লে তটিনী স্বামীর পাশে চেয়ারের হাতলের উপর ব'সে প'ড়ে তার ডান হাতখানা স্বামীর কাঁধে জড়িয়ে দিলে। নারী তার কুহকজাল বিস্তার ক'রে পুরুষকে আক্রমণ করলে।

নিতাই বল্‌লে, "দেখ, আমরা লোহার ব্যাপারী—লোহারই ধাত আমরা বুঝি—সোনার হদিস আলাদা। ওতে কি আমরা সুবিধে করতে পারব ?"

"পারবে। সব ব্যবসার মূল মন্ত্র এক। যে কয়লার কারবার ভাল চালাতে পারে, সে কাপড়ের কারবারও ভাল চালাতে পারে। তুমি যে লোহার কারবার ভাল চালাচ্ছ, সে লোহার গুণে নয়, তোমার নিজের গুণে। লোহা তোমার হাতে সোনা হয়েছে।"

"কিন্তু সোনা যদি সেই হাতে আবার লোহা হয় ?"

"তখন আবার লোহার কারবার চালিয়ো।"

"তা কি আর চল্‌বে ? একবার চাল বদ্‌লে গেলে কি আর চাল ফেরানো যায় ?—তা ছাড়া সোনারুপোর দোকান করলে লোকে বল্‌বে নিতাই মিত্তির সেক্‌রা হ'য়ে গেল।"

তটিনীর দুই চক্ষের মধ্যে দুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্ব'লে উঠ্‌ল।—"আর এতে যে তোমাকে লোকে লোহাওয়ালা বলছে ?"

নিতাই চম্‌কে উঠ্‌ল! বুঝ্‌লে যে কথায় কেঁচো আছে মনে ক'রে এতক্ষণ রসিকতা করছিল তা'র মধ্যে কেউটে সাপ! সভয়ে বল্‌লে, "কে বলছে লোহাওয়ালা ?"

তটিনী তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা ব'লে গেল—প্রমীলা থেকে আরম্ভ ক'রে গহনার দোকানে প্রবেশ পর্য্যন্ত সমস্ত। বল্‌তে বল্‌তে কখনো ক্রোধে তার দেহ কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, কখনো অপমানে অশ্রু ঝ'রে পড়ল, কখনো দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো। সহসা নিতাইয়ের ডান হাত চেপে ধ'রে সে অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লে, "আমি বলছি কর! ভাল হবে। এক মণ লোহা বিক্রি ক'রে যে লাভ কর, এক রতি সোনা বিক্রি ক'রে সেই লাভ হবে।"

সেই বজ্রগভীর বাণী, সেই মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি, সেই উদ্বেল-উচ্ছ্বসিত দেহ-চাবঞ্চল্য,—সেই আরক্তমধুর মুখকান্তি!—এই তীক্ষ্ণ প্রদীপ্ত অস্ত্রজালের সম্মুখে নিতাইকৃষ্ণ পরাভব স্বীকার করলে; বললে "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌বার আগে রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লে, তটিনী যেন পরশ-পাথর হয়েছে—লোহার দোকানে গিয়ে যে লোহাকে স্পর্শ করছে তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে পীতবর্ণ ধারণ ক'রে সোনায় পরিণত হচ্চে!

৫

সকালে ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নের কথা মনে প'ড়ে মনে হ'ল শুভলক্ষণ। স্থির হ'ল সোনার দোকান হবে।

তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে তটিনী লেগে গেল দোকান গ'ড়ে তুল্‌তে। কলকাতার সমস্ত অলঙ্কারের দোকান থেকে ক্যাটালগ সংগ্রহ ক'রে আর্ট পেপারে তিন চার রকম ক্যাটালগ্‌ ছাপা হতে লাগ্‌ল; সমস্ত মাসিক সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রে খুব ঘটা ক'রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল হ্যাণ্ডবিলে হ্যাণ্ড্‌বিলে সহরের লোক উত্ত্যক্ত হ'য়ে উঠল; পথে বার হ'লে পাঁচ মিনিট কাল "এন্‌, কে, মিত্র জুয়েলারের" বিজ্ঞাপন থেকে চক্ষুকে মুক্ত রাখবার উপায় নেই, দেওয়ালে, বাস-ট্রামগাড়ির পিছনে, ল্যাম্প পোষ্টে—সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া; দুহাজার টাকা সেলামী আর পাঁচশো টাকা মাস ভাড়া দিয়ে প্রশস্ত রাজপথের উপর দোকান নেওয়া হ'ল; তার পুরোনো দরজা জানলা বদল ক'রে নূতন দরজা জানলা হ'তে লাগ্‌ল; বিখ্যাত ফার্‌নিচারের দোকানে আলমারি শো-কেস্‌, চেয়ার প্রভৃতির অর্ডার দেওয়া হ'ল; কয়েকটা ভাল অলঙ্কারের দোকান থেকে কয়েকজন দক্ষ কর্ম্মচারীকে দ্বিগুণ মাইনে স্বীকার ক'রে ভাঙিয়ে নিয়ে এসে সোনারূপো হীরে জহরৎ কেনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

অবশেষে মাস তিনেক পরে দোকান প্রস্তুত হ'ল। দিনের মধ্যে সাত আট ঘণ্টা ক'রে দোকানে অতিবাহিত ক'রে আট দশ দিন ধ'রে তটিনী নিজে হাতে দোকান সাজালে। বিয়ের একটা লগ্ন-দিন দেখে দোকান খোলা হ'ল। সেদিন তটিনী বহুব্যয়ে একটা বিপুল উৎসবের আয়োজন করলে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বহু বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত হ'ল। প্রমীলা উষারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল—কিন্তু তারা আসে নি।

দোকানের জৌলশ দেখে সহরের অন্য দোকানদারদের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল।

লোহার দোকান থেকে তিন চার জন দক্ষ কর্ম্মচারীকে তটিনী সোনার দোকানে নিয়ে এল। তারা গদি থেকে উঠে এসে চল্লিশ টাকা জোড়া চেয়ারে বসল। তটিনী তাদের ফিতে-বাঁধা পিরাণের বদলে চুড়িদার পাঞ্জাবি করিয়ে দিলে। ম্যানেজারকে বিলিতি স্যুট্ পরতে হয়। বেলা এগারটার সময় নিতাইকৃষ্ণ সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে মূল্যবান কাঁচিধুতি প'রে উৎকৃষ্ট লপেটা জুতা পায়ে দিয়ে দোকানে যায়। হাতে তার তিনটে হীরের আংটি—পাঞ্জাবিতে মোতির বোতাম।

সোনার দোকানে যে পরিমাণ মাজা-ঘষা আরম্ভ হ'য়ে গেল, লোহার দোকানে সেই পরিমাণে মরচে পড়তে লাগ্‌ল। অবশেষে বছর দেড়েক পরে একদিন নিতাই দশ হাজার টাকায় লোহার দোকান বেচে দিলে।

সোনার দোকানে লাভ লোকসানের হিসাব ধরা যায় না। সকলে বলে, কারবারের প্রথম অবস্থায় লোকসানকে লোকসান ব'লে ধরতে নেই।

৬

বছর সাতেক পরের কথা।

আষাঢ় মাস,—তিনদিন অবিশ্রান্ত দুর্যোগের পর আকাশ পরিষ্কার হয়েচে। তটিনী তার শয়নকক্ষে একটা আলমারি খুলে কি একটা জিনিস খুঁজছিল, নিতাইকৃষ্ণ প্রবেশ ক'রে কাছে এসে দাঁড়ালো।

স্বামীর উদ্বেগ-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তটিনী বল্‌লে, "কিছু বল্‌বে?"

নিতাই ভীত ভাবে বল্‌লে, "একটা কথা তোমাকে কয়েকদিন থেকে বল্‌ব বল্‌ব মনে করচি সেজবউ, কিন্তু বল্‌তে পারছিনে!"

একটু হেসে তটিনী বল্‌লে, "কেন, তুমি কি আমাকে এতই ভয় কর?"

নিতাই বল্‌লে, "তোমাকে ভয় করিনে সেজবউ, তুমি দুঃখ পাবে কষ্ট পাবে তাই ভয় করি।"

তটিনী বল্‌লে, "যে দুঃখ যে কষ্ট পেতেই হবে তাকে ভয় ক'রে কি ফল বল? আমি জানি কি বল্‌তে তুমি ভয় পাচ্ছ। দোকান চল্‌ছে না- দোকান তুলে দিতে হবে, তাই বল্‌ছ ত?"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিতাই বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

তটিনী বল্‌লে, "কিন্তু এর জন্যে তুমি ভয় করছ কেন? এর জন্যে ত' আমার ভয় পাবার কথা—আমারই তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার কথা।"

ব্যস্ত হ'য়ে নিতাই বল্‌লে, "সে কি কথা সেজবউ! তোমার কি দোষ? তুমি ত' চমৎকার দোকান গ'ড়ে দিয়েছিলে, আমিই চালাতে পারলাম না—হদিস্ ধরতে পারলাম না।"

তটিনী বল্‌লে, "সে যাই হ'ক, যে জিনিষ চলছে না তাকে বন্ধ ক'রে দেওয়াই ঠিক। লোহাই তোমাদের বাড়ির লক্ষ্মী, আবার লোহার কারবার চালাও। তোমারি দোকানই শুধু ফেল্ হয় নি—তোমার ছেলেও ম্যাট্রিকে ফেল হয়েচে। তোমাদের মজ্জার মধ্যে ব্যবসাবুদ্ধি এত বেশি রয়েছে যে এক পুরুষেই বিদ্যে বেশি হবার আশা নেই। লোহার দোকান ক'রে তুমি অশোককে বসিয়ে দাও। দেখো আবার সব বজায় হবে।"

নিতাই বল্‌লে, "লোহার দোকান ত আমি এখনি আবার গ'ড়ে তুলতে পারি সেজবউ! কিন্তু টাকা কই। সোনার দোকানের যা অবস্থা তাতে ত দেখছি মাথায় মাথায় এসেছে। দোকান বিক্রি ক'রে দেনা শোধ করলে হাতে একটা পয়সাও থাক্‌বে ব'লে মনে হয় না।"

প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে তটিনী বল্‌লে, "টাকার ভাবনা তুমি ভেবো না, সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো।" নিজের হাত তুলে ধ'রে বলে, "তোমার দরুণ এই লোহা গাছা আর বাবার দেওয়া এই বালা জোড়া রেখে বাকি সমস্ত সোনা আমি লোহা ক'রে দোবো। আমার শ্বশুরের পুণ্যে আবার সমস্ত ফিরে আস্‌বে। তিনি বোধ হয় এই ব্যাপারটা হবে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন ব'লেই এত সোনা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সোনার স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে।"

একটা কথার এখনো নিষ্পত্তি হয়নি—সেইটেই নিতাইকে বেশি উদ্বিগ্ন করেছিল। সে বললে, "আর প্রমীলা উষা? তারা যে দোকান তুলে দিলে ঠাট্টা তামাসা করবে?"

"করুক। সে অহঙ্কারও আমার ভেঙে গেছে। এমনি ক'রেই ভগবান আমাদের অনেক কঠিন জিনিস চূর্ণ করেন।"

তটিনীর প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিতাইয়ের মনে হ'ল, লক্ষ্মী এখনো ছেড়ে যাননি!

কৃত্তিকা

প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ওগো মোর জীবনের কৃত্তিকা মণ্ডল,
এবার বিদায় দাও; প্রতিদিন সাঁঝে
পশ্চিম দিগ্বধূ যবে গভীর কুন্তল
বিনায়ে বাঁধিত একা আধো ত্রাসে লাজে
তোমরা যে দিতে দেখা স্নিগ্ধ অচপল
বকুলবীথির শিরে; রাত্রি যত বাজে
জাগিতে পলকহীন, সপ্তর্ষি সুধীরে
নামিত স্নানের লাগি' মানসের তীরে॥

এবার কোথায় দেখা হবে কে তা জানে,
কোন্ দূর বনান্তরে, কোন্ নদীতীরে!
গ্রীষ্মক্ষীণ হ্রদে হেথা দিবা অবসানে
সূর্য্যাস্তবরণচ্ছটা নামিয়াছে নীরে,
যেন দেববালিকারা রত সন্ধ্যাস্নানে;
—সন্ধ্যাতারা সকৌতুকী চেয়ে আছে ধীরে

কবীর

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

জগৎ মাঝে একটি রূপের
হচ্ছে আনাগোনা—
গুরুরূপে মন্ত্র দেওয়া
শিষ্যরূপে শোনা।

মন্‌ রে আমার ভোলা—তোরে
বোঝাই কিসে বল্‌—
বাব্‌লা কাঁটা রোপন ক'রে—
তুল্‌বি দ্রাক্ষাফল!

* * *

আজো চিন্‌লিনা তোর প্রভু,
তুই বড়াই করিস তবু?
ছল চাতুরি তর্ক ফেরে
মিলন কি হয় কভু!

* * *

শাস্ত্র প'ড়ে রইলি ভুলে,
নাইক ধরম সেথা;
প্রেমটা আসল শাস্ত্র ছাড়া
খুঁজলে মিলে হেথা।

* * *

তোমার সুধার সিন্ধুনীরে
ডুব দিয়েছি আমি—
চাওয়ার দুঃখ ঘুচ্‌ল আমার
ওগো জীবন স্বামী।
লুকিয়ে বাড়ে বৃক্ষ বিশাল
বীজের মধ্যে থাকি,
চাওয়ার মধ্যে রোগটা বিষম
তেমনি বাড়ে নাকি!

শয্যাখানি রইল পাতা

শুই বা কেমন ক'রে ?

প্রিয় যে মোর আছেই জেগে

রাত্রি দিবস ধ'রে।

সব্‌খনে সে ডাকছে মোরে,

শুন্‌ছি সে কি আমি ?

পরের সাথেই রঙ্গে আমার

কাটছে দিবস যামী।

কবীর কহে—শোন্‌রে সখি,

শোন্‌রে চতুরিকা—

প্রেম বিনা যে প্রিয়ের মিলন

নাইক ভালে লিখা।

প্রাণের বীণে লহর তুলে

আসছে বঁধু আজ—

আননখানি ঘোমটা ঢাকা

একি রে তোর লাজ !

আকুল হৃদি আস্‌ছে নিয়ে

সজল চোখের পাতা,

হাতের মালা—শতেক যুগের

মিলন-তৃষায় গাঁথা।

আসছে বঁধু তোর দুয়ারে

কিসের ভিক্ষা মাগি,

উজল আজি আঙিনা—তার

চরণ-পরশ লাগি।

প্রেমাস্পদা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে রমণী, বিশ্বভুবনের ভূষণে তুমি ভূষিতা, অবসন্ন তোমার দাস,—
বিরহে বিষাদে বিমর্ষ,
তাকে আরোগ্যের অমৃত ঔষধি দাও।

ওগো আমার কপোতিকা, আমার প্রাণপুত্তলি, বলো দেখি আমার দুঃখ
কে জানে ?

এমন পাষাণ চিত্ত কার, হে নারী, তোমাকে দেখে যার মন ভালবাসায়
না ব্যথিত হয় ?

বৃষ্টির পরে আকাশে-ছড়িয়ে-পড়া তারা গুলি জ্বল জ্বল করে,
মনে হয় ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় ওরা অ[illegible]ত,
আমার উষ্ণীষের ফুলও শিথিল হ'ল সেই পীড়নে।

তোমার কবরীর দিকে তাকিয়ে তারাগুলির
এই দশা ॥

জাভায় অবস্থান কালে কোনো সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পাঠ হইয়া গেলে স্থানীয় অধিবাসিগণ কবিকে কয়েকটি গান গাহিয়া শুনান। উল্লিখিত গানটি, তন্মধ্যে একটি গানের কবি কর্ত্তৃক গদ্য-ছন্দে অনুবাদ। বি, স।

তুচ্ছ কথা

—কথিকা—

—শ্রীসুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সময় সময় কত সামান্য তুচ্ছ একটা ব্যাপার মানুষকে একেবারে বদ্‌লে দেয় তার আদর্শ, মনোভাব, জীবনের গতি,—সমস্ত।

সেদিন মনটা বড় খারাপ ছিল, কিছু ভাল লাগ্‌ছিল না, পৃথিবীর সব কিছুর উপরেই বিরক্তি ধ'রে গিয়েছিল, এমন কি জীবনের উপর পর্য্যন্ত কিছুমাত্র মায়া ছিল না; এক কথায় বড় নিরাশ হ'য়ে পড়েছিলুম। একা পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে নিরুদ্দেশ ভাবে চলেছিলুম। নানা রকমের দমিয়ে-দেওয়া ভাবনায় মনটা বিষিয়ে ছিল; ব্যর্থতার দারুণ বেদনায় মুস্‌ড়ে পড়েছিলুম।

চোখ তুলে সাম্‌নের দিকে চাইলুম, দেখি দু'ধারে দেবদারুর সারি, মাঝখানে লালমাটির পায়ে-চলার পথ, কতদূর চ'লে গেছে, কে জানে! মনে হয় যেন পথ চলেছে কোন্‌ অনাদি কাল থেকে কোন্‌ অজানা প্রিয়ার উদ্দেশে; চলার যেন তার শেষ নেই।

হঠাৎ চোখে পড়্‌ল পথের পাশে ধানক্ষেতের উপর কয়েকটি চড়াই পাখী খেলা করছে। তাদের একটির ওপর বিশেষ ভাবে চোখ পড়্‌ল তার চলাফেরার ভঙ্গীটির জন্যে। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ছোট্ট বুকখানি ফুলিয়ে, ঘাড়ের রোঁয়া উঁচু ক'রে, ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র যোদ্ধা চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে; ভাবটা তার, জগতে কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না, কোন কিছুতেই সে দমে না।

আকাশের দিকে নজর পড়্‌ল, দেখি মাথার ঠিক্‌ উপরেই একটা বাজপাখী চক্কর দিয়ে উড়্‌ছে; হয়ত ওই ক্ষুদ্র যোদ্ধাটিকে ছোঁ মারবার মতলোবেই। দেখে, হঠাৎ যেন আমার চোখ ফুটে গেল। চড়াইটিকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লুম, "বন্ধু, আজ তুমি আমায় যে শিক্ষা দিলে তা' আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে।" নিজের মুস্‌ড়ে পড়ার জন্য হাসি এলো, নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তুল্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের সমস্ত দুর্ভাবনা কোথায় যেন পালিয়ে গেল। ফুর্ত্তিতে মনটা ভ'রে উঠ্‌ল। আবার নূতন ক'রেই যেন জীবনের মাধুর্য্য ফিরে পেলুম। কাজ করবার শক্তি এলো, প্রেরণা এলো।

সেও আমার ওপর ঘুরে বেড়াক্‌, আমার জীবনের বাজপাখী। জীবন-সংগ্রামে আমিও যুঝে যাবো, জাহান্নমে যাক্‌ যা কিছু বাধা, যা কিছু বিঘ্ন! *

* টুর্গেনিভ থেকে।

অগ্রহায়ণ-সংখ্যায়

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের সম্পূর্ণ নাটিকা

আপদ বিদায়

পত্র-লিখন

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষের চিত্র-সংগ্রহ হইতে

রাজপুত-পাহাড়ী চিত্র-শিল্প

শ্রীরমেশ বসু

ভারতবর্ষে সভ্যতা যত রকমে আপনার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়েছে তার মধ্যে চিত্র-বিদ্যাও একটি। অতি প্রাচীন কাল থেকে এদেশে চিত্র এবং সে সম্বন্ধে রচিত শাস্ত্র প্রচলিত ছিল। চিত্র-শিল্পের উপর বাইরের কোন প্রভাব প্রবল হ'তে পারেনি, যদিও ইউরোপীয় সমালোচকেরা ব'লে থাকেন ভারতীয় চিত্রে পারস্যের এমন কি চীনেরও নাকি অল্প-স্বল্প ছাপ পড়েছিল। কিন্তু প্রাচীনতম চিত্রের যে নিদর্শন ও ধারা বাঘ, রামগড়, অজন্তা, সিত্তন্নবাসল এবং সিংহলের সিগিরিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বুঝ্‌তে পারা যায় বহুকাল থেকে এ দেশে চিত্রের চর্চ্চা হয়েছিল, কারণ তা না হ'লে হঠাৎ ওরূপ উঁচু দরের কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আর এগুলি সাধারণ অশিক্ষিত চিত্রকরদের আঁকা লৌকিক শিল্প নয়, এর দ্বারা তখনকার সভ্যতার ও পরিমার্জ্জিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উন্নতির জন্যই যেখানে যেখানে ভারতবাসী বৌদ্ধ শ্রমণেরা গিয়েছিলেন, এশিয়ার সেই সেই দেশে এই চিত্রের প্রভাব পড়েছিলে দেখা যায়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দ অবধি চ'লে এসে হঠাৎ যেন বৌদ্ধচিত্রের ইতিহাস থেমে গেল।

বোধ হয় মধ্য-যুগে হিন্দু ধর্ম্মের নব সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের জায়গায় মূর্ত্তির প্রচলন বেশী হয়েছিল। সেই জন্য তখনকার হিন্দুসমাজে চিত্রবিদ্যা জনসাধারণের কাছেই আদৃত হ'ত। এই সময়ে জৈনেরা তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থে—তালপাতার ও কাগজের চিত্র আঁক্‌বার ব্যবস্থা করেছিল। মোটামুটি মুসলমান আমলের গোড়ার দিকে যে চিত্র দেখা যায় তা জৈনদের এবং তা এই জনসাধারণের শিল্প। এগুলি পশ্চিম-ভারতের এবং বিশেষভাবে গুজরাট অঞ্চলের। মুখ, চোখ, নাক এগুলিতে এমন ক'রে আঁকা হয়েছে যা দেখ্‌লে কিছুতেই প্রাচীন উন্নত অবদানের সঙ্গে এর যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। সর্ব্বপ্রথম ডাঃ হার্টমান ও পরে ডাঃ কুমারস্বামী এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।* প্রাচীন জৈন চিত্রে খুব বেশী পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, সবই প্রায় এক রকমের। ডাঃ কুমারস্বামী পাটন ভাণ্ডারে তালপাতায় লেখা জৈনশাস্ত্র কল্পসূত্রের সবচেয়ে পুরানো পুঁথির কথা বলেছেন, এর তারিখ ১২৩৭ খৃঃ, আরেকখানা জৈন পুঁথি ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে আছে, তার তারিখ ১৪২৭ খৃঃ, আর কল্‌কাতায় শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে যে কল্পসূত্রের পুঁথি আছে তা' ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের। মধ্যযুগের গুজরাটী হিন্দুরা জৈনদের নিকট থেকে চিত্রকলা নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে সুরু করলেন। তার চিহ্ন এখন কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী লিখিত "বসন্তবিলাস" নামে একখানা কাব্যের চিত্রিত পুঁথির পরিচয় শ্রীযুক্ত এন্, সি, মেহ্‌তা দিয়েছেন ("রূপম্"—১৯২৫), আর লাহোর মিউজিয়মে "লোর এবং চন্দা" উপাখ্যানের পুঁথি আছে এই চিত্রগুলি একদিকে জৈন আরেকদিকে আদি-রাজপুত চিত্রের মাঝামাঝি সময়কার।

রাজপুত শিল্প

রাজপুত চিত্রকলার জন্ম কবে ও কোথায় হয়েছিল সে সব কথা এখনও ঠিক ক'রে বোঝবার উপায় নেই। হিন্দু শিল্পের যে অংশ রাজপুত নামে অভিহিত হয়েছে, তার উৎপত্তি যে রাজপুতানা-মধ্যভারতের কোথাও হয়েছিল, সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা আবশ্যক করে না। বিশেষজ্ঞদের মতে খুব সম্ভবতঃ রাজপুতানায় না হ'য়ে বুন্দেলখণ্ডে রাজপুত শিল্পের জন্ম হয়েছিল। কারণ যাকে আদি

---

* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (Artibus Asie, 1927)

রাজপুত (Rajput Primitives) বলা যায় তার অনেক-গুলি লক্ষণ—যথা, স্থাপত্য ও বেশভূষার ধরণ—বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত দাতিয়া বা ওর্ছার সঙ্গে মেলে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বুন্দেলখণ্ডের নানা জায়গায় যে সব ভিত্তি-চিত্র এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আদি রাজপুত চিত্রের তুলনা ক'রে দেখ্‌লেই একথা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায়।

নিজ রাজপুতনায় যে সব প্রাচীনতম ছবি রচিত হ'ত তার স্থানীয় নাম রাজস্থানী। এখানকার বিকানীর, আম্বের ও উদয়পুরে প্রাচীন ভিত্তিচিত্র পাওয়া গিয়েছে। এগুলি ছাড়া অন্য যে কয়খানি কাগজে চিত্রিত ছবি পাওয়া গিয়েছে তার ভিতর রাগমালা চিত্রাবলীই প্রধান। এগুলি এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়েছে। এর নমুনা এখন আমেরিকার বোষ্টন-চারুশিল্প-সংগ্রহালয়ে, কলিকাতার শ্রীযুত

রাগমালার একটি চিত্র (রাজপুত)

শ্রীরমেশ বসু

অজিত ঘোষের সংগ্রহে এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। এগুলির তারিখ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দী ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়, আরও আগেরও হ'তে পারে। রাজস্থানের নানা রাজ্যে চিত্র-চর্চ্চা হত, কিন্তু সব চেয়ে জয়পুরেরই নাম বেশী, এইজন্য মোটামুটি রাজস্থানীয় শৈলী "জয়পুর কলম" নামেই পরিচিত।

আদি-রাজপুত চিত্রকরগণের কাজের যে সব নমুনা পাওয়া গিয়েছে তা' থেকে মনে হয় ইহা সাধারণ লোক-শিল্পের (Folk-art) অন্তর্গত। এগুলিতে রঙের সমাবেশের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। রেখার ভঙ্গি ও অঙ্কন-কৌশলের পরিচয় বড় একটা দেখা যায় না। তবে এগুলিতে যে একটা সজীবতার লক্ষণ আছে তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। মানুষ ও প্রকৃতি যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে।

রাজপুত চিত্র

আদি-রাজপুত বা রাজস্থানী চিত্রের যে সব নমুনা এখনও দেখা যায় তা মুঘল-আমলের আগেকার না হ'লেও তাতে প্রাচীন পদ্ধতির ছাপ অতি স্পষ্ট ভাবেই রয়েছে। আজকাল সাধারণতঃ যা রাজপুতচিত্র নামে পরিচিত তা এই মুঘল-যুগে যেন দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করেছিল। আগে যা' লোক-শিল্প হিসাবে গণ্য ছিল এখন তা' রাজা-রাজ্ড়ার আশ্রয়ে দ্রুত উন্নতিলাভ কর্‌ল। আগেকার চিত্রগুলিতে রঙ্ খেলাবার বাহাদুরী ছিল, এখন রঙের কোমলতা ও অঙ্কন-পটুতার দিকে চিত্রকরদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। এর ফলে রাজপুতশিল্পের দ্বিতীয় যুগের পতন হ'ল। এই দুই যুগের মাঝখানে অর্থাৎ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দের গোড়ায় এমন কতকগুলি ছবি দেখা যায় যাতে শিল্পীর হাত ক্রমে সুপটু হচ্ছে বুঝ্‌তে পারা যায়। এরূপ ছবির একটি ভাল নমুনা হিসাবে ঘোষ-সংগ্রহ থেকে রাগমালার একটি চিত্র এই প্রবন্ধে দেখানো হ'ল। দক্ষিণ ভারত থেকে ডাঃ কুমার স্বামীও পেয়েছেন। ("রূপম্"—নং ৩১)

একদিকে দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের সভায় হিন্দু চিত্রকরদের ডাক পড়্‌ল, তারা সম্রাটের আদেশে ও মুসলমান শিল্পীদের সাহচর্য্যে পারস্য ও ভারতের চিত্র-রচনা-পদ্ধতি মিশিয়ে এক নতুন শৈলীর সৃষ্টি কর্‌ল যা মুঘল চিত্রকলা নামে পরিচিত, আবার অন্যদিকে রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য হিন্দু শিল্পীরা যেন নব প্রেরণা লাভ ক'রে হিন্দুজীবন ও হিন্দুশাস্ত্রের অনেক ব্যাপার এবং কাহিনীকে রূপায়িত ক'রে তুল্‌ল। ভারতীয় শিল্পীরা স্বভাবতই তাদের গ্রহণশক্তির পরিচয় যুগে যুগেই দিয়াছে; এ যুগেও তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যে শিল্পীরা মুঘল-দরবারে কাজ কর্‌তে গেল, তারা তাদের প্রাচীন অবদানকে একেবারেই ভুলে যেতে পার্‌ল না, আবার যারা হিন্দু রাজসভায় কাজ কর্‌তে লাগ্‌ল তারাও মুঘল শিল্পের মনোহারিতার উপায় ও উপায়ন গুলিকে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে রাজপুত শিল্পের সমৃদ্ধিই বাড়াল।

রাজপুত শিল্পের উন্নতির পথে প্রথমটা তাই যেন একটা হিন্দু-মুঘল-মিশ্র ধরণ দেখা যায়। এ রকমের ছবিও এখন খুব বেশী পাওয়া যায় না। বোষ্টনের মিউজিয়মে রক্ষিত হিন্দী কবি কেশবদাসের "রসিকপ্রিয়া" নামক পুঁথির একখানি চিত্রিত প্রতিলিপি, এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহের কয়েকখানা ছবি—যথা, স্নানদৃশ্য ও মথুরা যাত্রা—ঐরূপ মিশ্র পদ্ধতিতে অঙ্কিত। এই সব ছবির কোন কোন গুলিতে মুঘল-দরবারে অঙ্কিত হাম্‌জা ও রজমনামার ছবির কিছু কিছু ধরণ মিলে যায়।

মুঘল চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত চিত্রও পা ফেলে চল্‌তে লাগ্‌ল। হিন্দু শিল্পীরা মুসলমানদের কাছ থেকে চিত্রের কোন কোন কায়দা আদায় ক'রে নিয়েছিল মাত্র, কিন্তু শিল্পের প্রাণকে অন্ধ অনুকরণের দ্বারা বধ ক'রে ফেলেনি। তাই দেখা যায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুত শিল্প ক্রমে স্বপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, এমন কি কোন কোন রকমে মুঘল শিল্পকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কি বর্ণ-যোজনায়, কি রেখাঙ্কনে, একটি অপূর্ব্ব সুষমার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ের রাজপুত চিত্র দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় যেন শিল্পীরা রূপ-সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হ'য়েই তুলি চালনা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে ইতিহাস নামে যে পদার্থ ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের জন্য পরিবেশন করা হয়, তা থেকে কি বোঝ্‌বার

কোনই উপায় আছে যে রাজপুতেরা সুধু যুদ্ধই করত না, তারা ভাট-চারণদের রচিত বীর গাথা যেমনি পছন্দ করত, তেমনি তারা আবার শিল্প-রসিকও ছিল ? বাস্তবিক, রাজস্থানে মূর্ত্তি-রচনা খুব পরিপাট্য লাভ না করলেও তার চিত্রশিল্পের গৌরব রাখ্‌বার স্থান নেই। যাঁরা এখনকার মাড়োয়ারীদের দেখে প্রাচীন রাজপুতদের সভ্যতার পরিমাপ ক'রে থাকেন তাঁদের আমরা সুধু একবার রাজপুত চিত্র একটু ভাল ক'রে দেখ্‌তে বলি।

রাজপুত শিল্পীর হাত ভিত্তিচিত্র (frescoe), প্রতিমূর্ত্তি (portrait) এবং চিত্রক (miniature) রচনায় কিরূপ দক্ষ ছিল তার নমুনা এখন পৃথিবীর নানা চিত্রশালায় ও সংগ্রাহকদের নিজস্ব ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। ইউরোপে আগে মুঘল চিত্রের রপ্তানি হওয়ায় বহুদিন অবধি কেউ রাজপুত চিত্রের খবর ও বিশিষ্টতার কথা জান্‌তই না। প্রধানতঃ ডাক্তার কুমারস্বামীর চেষ্টায় পাশ্চাত্যে রাজপুত

রাজা পৃথ্বীসিংহ (চম্বা)

শ্রীরমেশ বসু

শিল্পের গৌরব ঘোষিত হয়েছে, তার পর বহু শিল্প সংগ্রাহক ও সমালোচক এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, এবং নতুন নতুন নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

রাজপুতানায় যে ভিত্তিচিত্র আঁকা হ'ত তার সন্ধান এখন নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে এগুলি বেশ বড় আকারের হ'ত। আম্বের, উদয়পুর, বিকানীর, পালিতানা প্রভৃতি স্থানে ভিত্তিচিত্র এখনও দেখা যায়। জয়পুরের মহারাজার প্রাসাদের নানা স্থানে যে সব চিত্র আছে তাহা বোধ হয় সুপ্রসিদ্ধ জয়সিংহের (২য়) সময়কার। বিকানীরের প্রাচীন প্রাসাদের গায়ের ছবিগুলির কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে মেঘ ও সারসের চিত্রটি প্রশংসনীয়। পরবর্ত্তী কালেও রাজপুতানার নানা জায়গায় ঐরূপ চিত্র আঁকা হ'ত।

রাজা ও ঠাকুরদের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র সাহায্যে স্থায়ী ক'রে রাখ্‌বার প্রথা মুঘলদের দেখাদেখিই বোধ হয় বেশী ক'রে চল্‌তি হয়। জয়পুরের রাজাদের মানুষ-সমান প্রতিমূর্ত্তি পটে আঁকা হ'ত, এগুলি এখনও জয়পুরে রয়েছে। নানা চিত্র-সংগ্রহে আরও অনেক প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া অন্য রকমের চিত্রও কাপড়ের উপর আঁকা হ'ত, তার খুব ভাল নমুনা হচ্ছে জয়পুরের মহারাজার পোথিখানায় রক্ষিত রাসলীলার বিরাট পট-চিত্র এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক দুখানি পট।

মুসলমান আমলের আগে এদেশে কাগজ ছিল না, তাই তখন গৃহভিত্তিতে বা কাপড়ের উপর ছবি আঁকা হ'ত, সে গুলির আকার হ'ত বড় রকমের; পরে যখন কাগজ খুব চ'লে গেল, তখন ছোট আকারের চিত্রক আঁক্‌বার রেওয়াজ হ'ল। এই চিত্রক দু' রকমের—এক, কাগজে-তৈরি বইয়ের শোভা বাড়াবার জন্য, আর, কাগজ-জুড়ে তৈরি করা আলাদা আলাদা ফলকের উপর অঙ্কিত। এই ধরণের চিত্র এত সুন্দর ও সজীব বোধ হয়, যে রাজপুত শিল্প সম্বন্ধে এক কথায় এই বলা যেতে পারে যে এগুলির জন্যই শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত শক্তি ও কলা-কৌশল নিঃশেষে প্রয়োগ করেছিলেন। চিত্রিত পুস্তকের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া গিয়েছে; কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে হিন্দ কবি বিহারীলালের "সৎসঈ" (সপ্তশতী) এবং উর্দ্দু অক্ষরে লেখা একখানা ভাগবত পুরাণের পুঁথিতে রাজপুত চিত্রকের পরিচয় পাওয়া যায়। আর, কাগজের ফলকের উপর চিত্রিত ছবি এখন বড় বড় সব সংগ্রহালয়েই রক্ষিত হয়েছে। যুক্ত প্রদেশের রায় রাজেশ্বর বলীর সংগ্রহে খুব সুন্দর ঋতু-বর্ণনার চিত্র, অজিত ঘোষ সংগ্রহ ও কলিকাতা যাদুঘরের রাগমালা-চিত্রাবলী সবাই প্রশংসা ক'রে থাকেন।

পাহাড়ী চিত্র

মুসলমান আমলে হিন্দুর রচিত চিত্রকলা প্রথম রাজপুতানা অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছিল ব'লে প্রথম সকল হিন্দু-চিত্রই রাজপুত শিল্প নামে অভিহিত হয়েছিল। ক্রমে বুঝ্‌তে পারা গেল যে পাঞ্জাবের পাহাড়ী রাজ্যগুলিতে হিন্দু রাজ-দরবারে চিত্র-চর্চ্চা এমন উন্নতি লাভ করেছিল যে এখন সেগুলির নাম আলাদা ক'রে পাহাড়ী শৈলী ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু অবদান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক্ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি অবধি এই সব পাহাড়ী রাজ্যগুলিতে আশ্রয় পেয়ে এক অসাধারণ সুকুমার চিত্রকলার জন্ম দিয়েছিল। একদিকে রাজপুত রাজ্যগুলি থেকে অন্যদিকে মুঘল দরবার থেকে—বিশেষ ক'রে যখন সম্রাট্ আওরংজীব সকল শিল্পকলার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা কর্‌তে চেয়েছিলেন—হিন্দু শিল্পীরা প্রাণভয়ে বা জীবিকা-অর্জ্জনের আশায় ঐ সব পাহাড়ী রাজ্যে গিয়েছিলেন। অল্প দিনের ভিতরেই তাঁরা পাহাড়ের উপরে ব'সে যে রকম ছবি আঁক্‌তে লাগ্‌লেন তা তাঁদের সমতল প্রদেশে আঁকা ছবি থেকে কিছু কিছু তফাৎ হ'তে লাগ্‌ল।

অন্য সব রাজ্যের চেয়ে কাংড়াতেই বোধ হয় চিত্রশিল্পের সমাদর বেশী হয়েছিল, তাই এখানকার কাজও তেমন ভাল হয়েছিল। যখন পাহাড়ী চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেল তখন যে কোন চিত্রকে কাংড়া শৈলীর মনে করা হ'তে লাগ্‌ল; অন্য কোন পাহাড়ী রাজ্যেও চিত্র-চর্চ্চা হ'ত কিনা সে খবর তখনও মেলেনি। ক্রমে দেখা গেল কাংড়া ছাড়া কাশ্মীর থেকে টেহরী-গঢ়োয়াল অবধি আরও অনেক জায়গায় হিন্দু দীরবারে এই শিল্পের আদর ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এই

সব রাজ্যের নাম—জম্মু, চম্বা, নূরপুর, বসোহলী, কিশ্‌ত্‌ওয়ার, নাহন, গঢ়োয়াল (শ্রীনগর-টেহরী), মণ্ডী প্রভৃতি। এই সব শৈলীর মধ্যে কাংড়া, জম্মু, চম্বা, বসোহলী এবং গঢ়োয়াল এ গুলির নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে।

মুসলমান দরবারের চিত্রকরেরা হয় নিজের নাম চিত্রে লিখে রাখ্‌তেন, অথবা যে দরবারের ছবি তার মালিকের নাম বা মোহরের ছাপ দেওয়া থাকৃত। এতে কোন ধরণের ছবি কার আঁকা বা কোন্ সময়ে আঁকা তার একটা ঠিকানা পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সারা রাজপুত-অন্ন স্থানেই চিত্রকলা কাংড়ার মত এত উন্নতি ও প্রসার লাভ করেছিল। এই দুই পাহাড়া রাজ্যের চিত্রগুলি যেন রেখাবদ্ধ সঙ্গীত বা সাকার রূপ-স্বপ্ন; মানুষ, প্রকৃতি ও পশু-পাখী মিলে রং ও রেখায় এমন এক-একটি ব্যঞ্জনার আভাস দেয়, যাতে মানবের চোখ এবং চিত্ত দুই-ই পরম তৃপ্তিতে ভ'রে যায়। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-শিল্পের মত এই চিত্র-শিল্পও সুধু যা চোখে দেখা যায় তাই প্রকাশ করে না, মানুষকে তা' রস-লোকে নবজন্ম দান করে।

গ্রামদৃশ্য

পাহাড়ী চিত্র-ইতিহাসে আমরা মাত্র দু একজন চিত্রকরের নাম জান্‌তে পারি, আর কোন্ ছবি কোন্ জায়গায় বা সময়ে আঁকা হয়েছিল তার জন্য বহু ভ্রমণ ও গবেষণা দরকার হয়। বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এ বিষয়ে মারাত্মক রকমের ভুল করেছেন।

কাংড়া

ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে কাংড়ার স্থান একান্ত গৌরব ও বিশিষ্টতাময়। এক গাঢ়োয়াল বাদে বোধ হয় আর খুব

কাংড়া চিত্রের ইতিহাসেও বিচিত্রতা আছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সব রকমের চিত্রের নমুনাই কাংড়া থেকে পাওয়া গিয়েছে। ভিত্তি-চিত্র, চিত্রিত পুঁথি, প্রতিমূর্ত্তি, চিত্রক ত পাওয়া গিয়েছেই, এখানে আরেখণ-চিত্রের (drawing) যা নমুনা মিলেছে তার তুলনা পাওয়া ভার। কল্‌কাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ কাংড়া জেলার কোন কোন মন্দিরে ভিত্তিচিত্রের সন্ধান দিয়েছেন, সেগুলোর ফটো বা প্রতিলিপি

শ্রীরমেশ বসু

এখনও হয়নি; সে গুলো তৈরি হ'লে কাংড়া শিল্পের আরও নতুন নিদর্শন মিল্‌বে। চিত্রিত পুঁথির মধ্যে সম্রাট্ শাহ্‌জাহনের সভা-কবি সুন্দরদাসের (যাঁর উপাধি ছিল মহাকবি রায়) লিখিত "সুন্দর-শৃঙ্গার" নামে একখানা রস-শাস্ত্রের পুঁথির কয়েকখানা পাতা শ্রীযুক্ত ঘোষ পেয়েছেন; এই পুঁথিখানাকে কেউ মনে করেন সপ্তদশ শতাব্দের, কেউ ভুল ক'রে মনে করেন উনবিংশ শতাব্দের। কাংড়ার প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পাওয়া গিয়েছে, তার নমুনা এখন নানা সংগ্রহেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু কাংড়ার সব চেয়ে যা চমৎকার তা' হচ্ছে তার চিত্রক—যার জন্য সারা পৃথিবীময় আজ তার নাম অতি সূক্ষ্ম ও কোমল স্পর্শ চিত্রকে এমন জীবন্ত ক'রে তোলে যেন উহা আমাদের সাম্‌নে কথা বল্‌তে থাকে। কাংড়া চিত্রের উৎকৃষ্ট নমুনা কল্‌কাতার শ্রীযুক্ত অনুঘোষ ও শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে, লাহোরের এবং চম্বার ভুরিসিংহ মিউজিয়মে, বোষ্টনের মিউজিয়মে আছে। শ্রীযুক্ত অনু ঘোষের সংগ্রহের প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের চিত্রাবলী সংখ্যায় ও সৌন্দর্য্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার আরেখন চিত্রগুলি দেখে বুঝ্‌তে পারা যায় কোন রং না ফলিয়ে সুধু রেখার টানে কি অনবদ্য রূপ-ভঙ্গিই না প্রকাশ করা যায়। বোষ্টনের মিউজিয়মে ও কল্‌কতার ঘোষ-সংগ্রহে নল-দময়ন্তী-বিষয়ক আরেখন-চিত্র আছে, ঐ সংগ্রহে আরও অন্য রকমের আরেখন চিত্রও আছে।

জম্মু

জম্মু-রাজ্যে যে ধরণের চিত্র প্রচলিত হয়েছিল তার আপন ইতিহাস ও বিশেষত্ব আছে। অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দ থেকে এই শৈলীর চলন হ'য়েছিল ব'লে মনে করা হয়। জম্মু থেকে যে সব প্রাচীন ছবি পাওয়া গিয়েছে, তার একটি বিশেষত্ব এই যে এগুলি আকারে বেশ বড়, এরকম বড় ছবি রাজপুত-পাহাড়ী চিত্রের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। এর নমুনা হচ্ছে রামায়ণের আখ্যায়িকার অন্তর্গত লঙ্কা আক্রমণের ছবিগুলি; এগুলি এখন বোষ্টনের মিউজিয়মে ও কল্‌কাতার ঘোষ-সংগ্রহে রক্ষিত আছে। প্রাচীন ছবিগুলিতে সৌকুমার্য্যের দিকে খুব বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, বরং কেমন একটা দৃঢ় ভাব ফুটে উঠেছে; আর, খুব জোর উজ্জ্বল ধাতব রং ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্রমে চর্চ্চার ফলে শিল্পীদের হাত অনেকটা খুলে গিয়েছিল। তখন তাঁরা অন্য-অন্য শৈলীর শিল্পীদের মত চিত্রক রচনায় মন দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ-লীলা এবং আরও কোন-কোন বিষয়ের বেশ ভাল ছবি পরবর্ত্তী কালে তৈরি হয়েছিল। বিশেষ ক'রে নায়িকা-চিত্র আঁকতে যেয়ে শিল্পীরা স্ত্রীলোকের রূপের একটা নতুন ভঙ্গি দেখিয়েছেন। এই ব্যাপারে কাংড়া শৈলীর সঙ্গে এই শৈলীর পার্থক্য খুব সহজেই চোখে পড়ে।

চম্বা

যতদূর বুঝ্‌তে পারা যায় তাতে মনে হয় অন্য সব পাহাড়ী শৈলীর চেয়ে চম্বার শিল্পীরা প্রতিমূর্ত্তি-চিত্র রচনায় বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন, আর, এই সব ছবি বেশ ভালও হয়েছিল। চম্বার চিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে এতে রাজাদের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে রাণী ও যুবরাজের চেহারাও অনেক সময়ে আঁকা হ'ত। রাজাদের এরূপ পারিবারিক চিত্র অন্যত্র কম দেখা যায়। এখনকার চম্বায় যে ভুরি-সিংহ মিউজিয়ম আছে সেখানেও কল্‌কাতার ঘোষ-সংগ্রহে এই শৈলীর ছবি আছে।

চম্বার অন্য-অন্য বিষয়ের ছবি সনাক্ত করা এক বিষম ব্যাপার। আগে যে সব বহু ছবি চম্বার ব'লে মনে করা হ'ত এখন বোঝা যাচ্ছে যে সেগুলো খুব সম্ভব চম্বার নয়—কাংড়ারই হবে ব'লে অনেকে মনে করেন।

বসোহলী

বহু পাহাড়ী শৈলীর মাঝখান থেকে যার কাজকে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তফাৎ ক'রে বুঝ্‌তে একটুও কষ্ট হয় না, তা' হচ্ছে এই বসোহলীর চিত্র। এতে প্রায় সব নমুনাতেই এমন একটা কাঠিন্যের পরিচয় পাওয়া যায় যে একে যেন আদিম ধরণের ব'লে মনে কর্‌লে কোন দোষ হয় না। মানুষের মুখ-চোখের গড়ন ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই এর বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে। স্ত্রীলোকের এ ধরণের রূপ

আর কোনও শৈলীর মধ্যে দেখা যায় না। আবার, ছবির রূপ বাড়াবার জন্য গুব্‌রে পোকার পাথার খুব ছোট ছোট টুক্‌রা ছবির গায়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ত।

রাধাকৃষ্ণ (কাংড়া)

এই পদ্ধতির চিত্রের মধ্যে বোষ্টন মিউজিয়ম ও কল্‌কাতার ঘোষ-সংগ্রহের রাগমালা-চিত্রাবলী এবং এর পরের সংগ্রহের গীত-গোবিন্দ-চিত্রাবলীই প্রধান। ফ্রেঞ্চ সাহেবের সংগ্রহে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর চিত্র আছে।

গড়োয়াল

পাহাড়ী চিত্রের নাম যে দুই শৈলীদ্বারা বিশেষভাবে গৌরবান্বিত হয়েছে তা' কাংড়ার ও গড়োয়ালের। কাংড়ার নাম খুব বেশী ক'রে প্রচারিত হ'য়ে পড়াতে গড়োয়ালের খ্যাতি অনেকটা ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার কুমার স্বামী রাজপুত চিত্র সম্বন্ধীয় তাঁর প্রথম গ্রন্থে বলেছিলেন যে এই দুই শৈলীর মধ্যে এমন একটা যোগ আছে যে গড়োয়ালকে কাংড়ার একটা অঙ্গ বলা যেতে পারে।

শ্রীরমেশ বসু

এ মত এখন অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়েছে, এমন কি, পাঞ্জাবের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে এরূপ অনেক ছবি আগে কাংড়ার মনে করা হ'ত, এখন বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাচ্ছে সেগুলো গঢ়োয়ালের ছবি। গঢ়োয়াল শৈলী এবং উহার শ্রেষ্ঠ শিল্পী মোলারাম সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীযুত মুকন্দীলালের কল্যাণে জানা গিয়েছে ("রূপম্"—সংখ্যা ৮ ; "বিশাল ভারত" ১ম সং—১৯২৮)। *

একটু লক্ষ্য কর্‌লেই গঢ়োয়াল শিল্পের বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। এখানকার শিল্পীরা মানব-জীবনের সুখ-সোহাগের চিত্রই বেশী ক'রে এঁকেছেন। এই জন্য তাঁদের কাজে একটা অনন্যসাধারণ পেলবতার ছাপ পড়েছে। স্ত্রীলোকের রূপ প্রকাশের ভঙ্গিতেও নতুনত্ব আছে। বিশেষ ক'রে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকৃতে গঢ়োয়ালের শিল্পীর কাছে অন্য সব এমন কি কাংড়ার ওস্তাদরাও এগুতে পারেন নি। নর-নারীর মোহময় প্রেমলীলার সঙ্গীরূপে হিমালয়ের উপত্যকা-ভূমির সুপ্রচুর ও সুবিচিত্র বনরাজির ও প্রফুল্ল পাতা-পুষ্পের কারুকার্য্য দেখে প্রকৃতিকে যেমন কাব্যময় মনে হয়, চিত্রকেও সেই জীবন্ত কাব্যের 'বর্ণিত' রূপ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। রংয়ের দিক থেকে বিবেচনা ক'রে দেখলে অন্যান্য রংয়ের সঙ্গে সাদা রংয়ের প্রাচুর্য্যে কি বাহার হ'তে পারে তা' গঢ়োয়ালী চিত্রে সুন্দর ধরা পড়েছে।

অন্যান্য শৈলীর বিশেষ কোন ইতিহাস বা কোন বিশেষ চিত্রকরের ইতিহাস জানা যায় নি কিন্তু সুখের বিষয় কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মোলারামের কথা পরে লেখা গেল। ইনি ছাড়া আরও দুজন চিত্রকরের নাম শ্রীযুত মেহ্‌তা আমাদের জানিয়েছেন যাঁদের চিত্র এখন টিহরী-দরবারে রক্ষিত আছে। এই দুইজন শিল্পীর নাম মান্‌কু আর চৈতু। কিন্তু শ্রীযুত মুকন্দীলালের মতে এঁরা গঢ়োয়ালের শিল্পী মোটেই নন, হয়ত টিহরীর কোন কোন রাণীর বাপের রাজ্য পাঞ্জাবের অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এইখানে এসেছিলেন।

* গত ভাদ্র মাসের বিচিত্রায় মোলারামের একটি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

মোলারাম

মোলারাম ও তাঁর বংশীয়দের ইতিহাসই গঢ়োয়াল চিত্রের ইতিহাস। এখনও তাঁর বংশীয়েরা গঢ়োয়ালে আছেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা আগে দিল্লীর দরবারে ছিলেন। দিল্লীতে যখন সম্রাট আওরংজীব নিজের ভাইদের মার্‌তে সুরু কর্‌লেন তখন দারা শিকোহের পুত্র সুলেমান শিকোহ্‌ প্রাণ ও লোকজন নিয়ে পালিয়ে গঢ়োয়ালের রাজা মহীপৎশাহের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই রাজা সম্রাটের ভয়ে সুলেমানকে ধরিয়ে দেন। সুলেমানের সঙ্গে যে সব পাত্র-মিত্র ছিল তার ভিতরে ছিলেন মোলারামের পূর্ব্বপুরুষ বন-ওয়ারি দাস, তাঁর ছেলে শ্যামদাস ও নাতি হরদাস। মোলারাম তাঁর নিজের ঐতিহাসিক কাব্যে এই সব কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা চিত্রকর ছিলেন কিনা সে কথা তিনি পরিষ্কার কিছু লেখেন নি, তবে তাঁর বংশকে লোকে 'মুসব্বর' বা চিত্রকরের বংশ বলে।

মোলারাম খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৬০ থেকে ১৮৩৩ সাল তক জীবিত ছিলেন। এই সময় সকল পাহাড়ী শৈলীর পক্ষেই গৌরবের যুগ ছিল বলা যায়। তিনি যে কাব্য লিখেছিলেন তা আগেই উল্লেখ করা গিয়েছে। তাঁর চিত্রশালা ছিল একথাও তিনি বলেছেন। গঢ়োয়ালের রাজা তাঁকে ৬০ খানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছিলেন এবং রোজ ৫ টাকা ক'রে বেতন দিতেন। ১৮১৫ খৃঃ গঢ়োয়ালের অর্দ্ধেকটা গোর্‌খারা দখল ক'রে নেয়, কিন্তু তারা জায়গীর বজায় রেখেছিল। নেপালেও মোলারামের খুব নাম হয়েছিল, কারণ গোর্‌খা রাজ-প্রতিনিধি হস্তীদল মোলারামের চিত্র দেখে বলেছিলেন—

"কান্তিপুর মেঁ তুহারী কীরতি সুনত রহে।
অব্‌ আঁখ নিহারী চিত্র বিচিত্র তুহারে দেখে॥"

মোলারামের শিল্প-প্রতিভা এখন দেশে-বিদেশে উপযুক্ত সম্মান লাভ করেছে। তাঁর হাতের কাজ যিনি সংগ্রহ

কর্‌তে পেরেছেন তিনিই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে ক'রে থাকেন। খুব ভাল ভাল ছবিগুলি এখন বোষ্টন মিউজিয়মে ও শ্রীযুত মুকন্দীলাল, শ্রীযুত অজিত ঘোষের কাছে এবং টিহরীর দরবারে আছে। তাঁর বংশধর বালকরাম সাহের কাছেও কিছু আছে। আর তাঁর চিত্রশালায় প্রস্তুত অন্যান্য ছবি কাশীর ভারত-কলা-পরিষদে এবং পাটনা ও আলমোড়ার কোথাও কোথাও রয়েছে। মোলারামের বংশীয়েরাও ছবি আঁক্‌তেন। তবে তা অত সুন্দর হয়নি। শ্রীযুত মুকন্দীলালের মতে এঁদের কাছে প্রায় এক হাজার ছবি ছিল। এই বংশীয় কয়েকজন পাগল হওয়ায় ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, এক পাগল ত সত্যি সত্যি ছবি দিয়ে বিছানা ও ফরাস তৈরি ক'রে তার উপর বস্‌ত ও ঘুমোত! এর চেয়ে বেশী সৌন্দর্য্যজ্ঞান কোন সুস্থ ব্যক্তির কখনও দেখা গিয়েছে কি?

শিখ্

পাহাড়ী শিল্পের সঙ্গে শিখ্‌দের মধ্যে প্রচলিত চিত্রের কি সম্বন্ধ তা অনেক দিন বুঝ্‌তে পারা যায় নি। এখন নানা দিক থেকে মাল-মশলা পাওয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা সম্ভব হয়েছে। পাঞ্জাবের পাহাড়ী হিন্দু রাজ্যগুলি যখন শিখ্‌দের আওতায় পড়ে দুর্ব্বল হ'য়ে গেল তখন বহু পাহাড়ী শিল্পী শিখ্ দরবারে চ'লে যায়। তারা আগে যেমন মুঘল দরবারে মোগ্‌লাই পছন্দ মত ছবি আঁক্‌ত, এখন তেম্‌নি শিখ্ দরবারে শিখ্ রুচির মতন ক'রেই ছবি আঁক্‌তে লাগ্‌ল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে (১৮০৩—৩৯) শিখ্‌দের পক্ষে গৌরবের যুগ, তখনই শিখ্‌দের মধ্যে চিত্রের পসার দেখা যায়।

পাহাড়ী শিল্পীরা যে শিখ্‌দের কাছে আদর পেয়েছিল তার অভ্রান্ত প্রমাণ লাহোরের নানা জায়গায় আছে। তখনকার অনেক পুরানো বাড়ীতে—যথা, মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমাধি, বাউলী সাহিব, ভাই বস্তিরামের ধর্ম্মশালা—ভিত্তিচিত্রাবলী আঁকা রয়েছে। হিন্দু-চিত্রের সাধারণ বিষয় গুলি ছাড়া এগুলির বিশেষত্ব এই যে এগুলিতে শিখ্ গুরু-দের সম্পর্কিত ঘটনার অনেক ছবি আছে। তবে এগুলি খুব উঁচু দরের কাজ নয়। সম্প্রতি শ্রীযুত রূপকৃষ্ণ লাহোরের দুর্গের অন্তর্গত শিশ্‌মহলের যে সব সুন্দর ভিত্তিচিত্র আছে সেগুলির সন্ধান ও পরিচয় দিয়েছেন ("রূপম্"—সংখ্যা ২৭-২৮)। এগুলি দেখ্‌লে কারুই সন্দেহ থাকে না যে শিখ্‌দরবারে পাহাড়ী শৈলীর কদর হয়েছিল। ঝুলন, হোলি, গোপীদের নৃত্য এবং বসন্তোৎসবের ছবি কয়েকখানা দেখ্‌লে আর সন্দেহ থাকে না যে এগুলি কাংড়ার কারু-করদেরই কাজ।

প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণেও শিখ্‌দের আগ্রহ দেখা যায়। এ বিষয়ে রাজপুত-পাহাড়ী চিত্রের সঙ্গে শিখ্‌চিত্রে যে পার্থক্য আছে তা' সুধু আকারগত। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় থেকেই এদিকে শিখ্‌দের দৃষ্টি পড়ে। শিখ্ শিল্পের এই ধরণের নমুনা কল্‌কাতার ঘোষ-সংগ্রহে আছে। শিখ্‌রা যখন আগের নিরীহ ভাব ত্যাগ ক'রে যোদ্ধারূপে পরিণত হ'ল তখন তাদের শিকার ও বীরত্বের অন্য রকমের ছবিও হ'তে লাগ্‌ল; এরূপ ছবি উইলিয়ম রোদেনষ্টাইন্ সাহেবের কাছে আছে।

গত শতাব্দের শেষের দিকে পাঞ্জাবে যে সব শিল্পীর কথা জানা যায় তারা ভারতীয়তা বর্জ্জন দিয়ে বসেছিল। কাপুর সিং প্রভৃতির কাজে পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রভাব দেখা যায়। এই সময়ের কিছু আগে থেকেই হিন্দু চিত্রশিল্প প্রাণহীন হ'য়ে পড়ায় তার ইতিহাসও স্তব্ধতা অবলম্বন করে।

ঠেলাগাড়ী

—গল্প—

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি রোদ তখনও ভাল রকম ওঠেনি—খিড়্‌কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটা-কতক শালিখ পাখীতে কিচ্‌কিচ্‌ ও ঝটাপটি বাধিয়েচে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া কর্চ্ছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরের ঝুলন্ত শিকায় বড় জাম বাটীতে টাঙানো আছে—তা কোন্ অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায় বা মুখ ধোবার পূর্ব্বে তাহা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ির ঘড়্‌ঘড় শব্দ উঠ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিন্‌রিনে গলায় ডাক শোনা গেল—

—টুনি-ই-ই-দা-আ-আ- ও টুনি-ই

অম্‌নি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখি হ'য়ে কি একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে? এখনো কাগ পক্ষীর ঘুম ভাঙ্গেনি অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার করে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্দে নেই, দুপুর নেই, সব সময় ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড়্‌ঘড়্‌ ক'রে বেড়াতে দিচ্চ ওর পরকালটা যে ঝরঝরে হ'য়ে গেলো—যা এখন যা, টুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড়্‌ঘড়্‌ সহ্যি হয় বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা—

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূরে থেকে দূরে অস্পষ্ট হ'য়ে যেতো, তারপর হাত মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কী দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে গেল—ও টুনি দা?...আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি স্থান ও তাঁহার দৃষ্টির গতির দিক নির্ণয় ক'রে নিয়েই ঝট্‌ ক'রে খিড়্‌কী দোরটা খুলে বার হ'য়ে এলুম। সকালের পদ্মের মত নির্ম্মল প্রফুল্ল, তরুণ নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

আস্‌বিনে টুনি দা?

এই উঠ্‌লাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না?

লখাই চোখের ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—কোথায়?

কিছু বল্‌বে না জেঠাইমা, আয় তুই—

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনে প্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হ'ল না।

তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনি দা—আমি চাল্‌তে তলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়্‌বি তো টুনি দা?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেড়িয়ে গেলুম। তেঁতুল তলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোনো ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসি মুখে বল্লে—আয় পটু-দা, নিতাই-দা—আমি গাড়ী এনেচি—ত্থাখ্‌ ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড়—গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল। চড়ল সকলেই। পটু বল্লে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী যাবি নরু?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বল্লে—যাস্ তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সাম্‌নে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে?

নরু বল্লে—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ী পটু-দা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মাত্তে—বল্লে, রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতুম ঠিক। যদি এর পর গাড়ী কেড়ে রাখে?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় ব'সে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হোত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যত ভেবে দেখ্‌বার বয়স হয়নি। সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বল্‌তে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়—বলে, সে নৌকোর মাঝির সর্দ্দার হবে, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইষ্টীমার যারা চালায়, তাদের

কি বলে ? তাও হ'তে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ক—বলতাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হবো। মহকুমায় হাকিম হবো।

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ী ফিরতো। বাবা যেদিকটা বসে, সেদিকটায় না গিয়ে চুপি চুপি অন্যদিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বল্‌তো—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েচ কোন্ সকালে—আর এই দুপুর ঘুরে গেল এখন তুমি—। খোকা বলে—চুপ্ চুপ্—না, আমি তো ঐ ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ব'সে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনি-দা—কোথাও তো যাইনি মা ? সত্যি—

কি জানি কেন ওকে বড় ভাল বাসতাম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্ততঃ ওর সঙ্গে না দেখা ক'রে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ী না হ'য়ে পাড়ায় অন্য কোথায় বেরুতো না।

এক এক দিন আমাদের বাড়ীর সাম্‌নের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে, এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত ক'রে বোল্লাম চড়্ চড়্ গাড়ীতে, আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি—তা কিছুতে চড়লো না—বল্লে, মা বকবে, তেল আন্‌তে যাচ্ছি—আয় চড়্‌বি টুনি-দা ?

তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা ?

আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্চি—সব যা দুষ্টু। আস্‌বি টুনিদা ?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হতো না কোনো মতেই। আমি চড়তুম। মহা খুসির সঙ্গে খোকা চৈত্র বৈশাখের মধ্যাহ্নসূর্য্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ক'রে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত। সূর্য্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচিমুখ রাঙিয়ে দিতেন—ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলি ধরণের ছিল ব'লে পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠ্‌তো না—সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য কর্ত্তে হ'ত। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্ব্বিবাদে জারী কর্ত্ত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারী গরম। চৈত্র বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধূলো তেতে আগুন হয়েচে—পঞ্চানন্দ তলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাট্‌চে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলা গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ উঠ্‌ল। অনু বল্লে—ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলা গাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—

যাত্রা কবে বস্‌বে রে টুনি দা ?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাস্‌ল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বল্লে—চড়বি পটু-দা ?

পটু ঘাড় নেড়ে বল্লে—চড়বো, টান্‌বে কে ?

খোকা খুব খুসি হয়ে বল্লে—কেন আমি ?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে!

পটু বল্লে—দূর, তুই বুঝি আমায় টান্‌তে পারিস ? টান্ দিকি কেমন—হয়না আর আমাকে—

বসো না ? টান্‌তে কেমন পারিনে ?

পটুর পালা শেষ হ'য়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বীরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠ্‌লো গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টান্‌তে টান্‌তে খোকা হয়রান হ'য়ে পড়্‌লেও সে উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়ালে সকলকে। সকলের শেষ হ'য়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমায় একটু এইবার টানো ?

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি সুরু কর্ল্লে। ভাবে বুঝা গেল তাকে কেউ টান্‌তে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা ক'রে তার গাড়ীতে চ'ড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েচে এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন্ দাবী আছে ? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম আর আমার পালায় বুঝি কেউ—

আমার ইচ্ছে হোল তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুণই হোক্—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চ'লে গেল। এদের মধ্যে পূর্ব্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর গেলে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইট্ নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে মেরে বস্‌লো।

গাড়ীখানার তলা তখুনি মচ ক'রে দেশালাইয়ের বাক্সের মত ভেঙে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক্ হ'য়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপরে সে চাইলে আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝিতে-পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মত বিঁধ্‌লো। ভাবটা এই রকম যে তুইও টুনি-দা এরি মধ্যে ?

কিন্তু সে কোনো কথা কাউকে না ব'লে ভাঙ্গা গাড়ীটার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখতে লাগ্‌লো। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে স'রে পড়েছিল !

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়েচেড়ে দেখ্‌লে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি ক'রে সরানো যায়। পাশে একটা ছোট বাকস ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলা থোলা বাকস্ ফুল দুলছিল—তারই পাশে গাব্-ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভাল ঘুম হোল না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব করে ফেল্‌তাম, তো বেশ হোত, কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকতে লাগ্‌লো। খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেচে।

দু'তিন দিন ক'রে সপ্তাহ খানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে মামার বাড়ী চ'লে গেলাম ছোট মাসীমার বিয়েতে। ফির্‌তে হোয়ে গেল আট দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিং-কাশিতে মারা গিয়েচে। ফির্‌বার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলচে—আমায় দেখে বল্লে—টুনি তোরা দেশে এলি ? আমি কোনো কথা বল্‌বার আগেই তার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো—তবুও এসেচিস্ তুই টুনি—আর কি কেউ আস্‌বে এ বাড়ী বেড়াতে ? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েচে রে !...বোস্ বোস্, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেবো, খাবি নুন্ দিয়ে ? ওই পেকে পেকে থাকে কেউ খায় না—খোকা কত খেতো—খা না ব'সে ব'সে !

শরতের অপরাহ্ণ। নির্ম্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কি পাখী উড়ে চলেচে। কার্ণিস্-ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক, উঠানের ছায়া-স্নিগ্ধ বাতাস শুক্‌নো কুলের গন্ধে ভরপুর।

খোকার সেই ঠেলাগাড়ীখানা দেখ্‌লাম কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্য্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয় নি।

বহু কালের কথা হোলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাব্‌লেই দেখ্‌তে পাই, কতকাল আগেকার আট বৎসরের সে ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়ীটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্চে। নির্জ্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালে-দের জামরুল বাগানের ছায়ায়, আমাদের বড় মাঁদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে, আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে নিয়ে আস্‌চে—নারিকেল তলা বেয়ে, পটুদের বড় দো-ফলা আম গাছটার তলা বেয়ে, যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্ত্তি বাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

রতি ও আরতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আমি কবি, অন্তহীন রূপের পূজারী—
আমারো যে আছে প্রিয়া, হৃদয়ের চির-তৃষাহারী
এ কথা বুঝাই কারে, বুঝাতে কি পারি ?

যে রূপসী আলুলিয়া কেশপাশ তরল তিমিরে,
না রাখি' চরণ-চিহ্ন পীত-পাণ্ডু সিকতায় সন্ধ্যাকালে ফিরে সিন্ধুতীরে ;—
মৃদুমন্দ জলোচ্ছ্বাস অলক্ষিতে বেলা-বালুকায়
দুগ্ধফেন-শুভ্র ধারে পদে পদে এঁকে দেয় আলিপনা বুদ্বুদ-মালায়,
মাঝে মাঝে শুক্তিস্তরে ঝলসিয়া উঠে যার চরণ-নখর ;
আনমিয়া তনু যবে আঙুলে পরশ করে শীকর-নিকর,
খসি' পড়ে কটি হ'তে সুবিচিত্র ঝিনুক-মেখলা—
অমনি দিগন্তে হোথা সলিল-শয়ন তলে হেসে উঠে নব শশিকলা !
—হেন রূপ যে করে সন্ধান,
সে কেমনে ভালোবাসে ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, আঁখিকোণে কাজলের টান !
সে কেমনে রুধি' বাতায়ন,
শিয়রে প্রদীপ জ্বালি' চেয়ে থাকে সতৃষ্ণ-নয়ন—
রোমাবলী-সম কেশ শোভে যেথা গ্রীবাতটে কবরীর মূলে,
পাশে তারি এক বিন্দু আলো যেন কনকের দুলখানি দুলে !
পদনখ হ'তে তার অলক-অবধি
একটি সে নারীদেহে তরঙ্গিয়া উঠে যেই লাবণ্যের নদী—
তাহারি মাঝারে
মনের মাণিকখানি হারাইয়া বসে' থাকে তটের কিনারে !
এ রহস্য বুঝাতে কি পারি—
হৃদয় হরিল তার কি কুহকে সামান্যা সে প্রণয়িনী নারী ?

রজনীর অন্ধকারে যে পিপাসা স্বপ্ন রচি' ঊর্দ্ধাকাশে জ্বলে বহ্নিহীন,
ভস্মাবৃত ছায়াপথে কভু বা বিলীন,—

রতি ও আরতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সে পিপাসা জাগে যদি মর্ত্ত্যমরু-মৃগতৃষ্ণিকায়,
তখন সে বারিহীন সিন্ধু-সিকতায়
নৃত্য করে মায়াবিনী স্বপ্ন-নিশাচরী—
বায়ুর দর্পণে তার ছায়া কাঁপে, ঘননীল দীর্ঘ নীলাম্বরী
দেখা যায় বালু-প্রান্তে—নদী যেন, সুনীল-সলিলা !
রূপসীর সেই নৃত্যলীলা
মৃত্যু হানে !—নিশীথের স্নিগ্ধ তারাহারে
যে আঁখি জুড়ায়, সে কি ধরণীর বালুকা-পাথারে
চেয়ে থাকে মধ্যাহ্নের মরীচি-মালায় ?
কাজলের লাগি' সে যে মৃৎ-পাত্রে প্রদীপ জ্বালায় !
বল দেখি, কমলের বঁধু অলি, না সে ওই আকাশের রবি ?
রূপ যে স্বপন তার—কামনার ধন নয়, বাসনার ছবি,
রূপসীর করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালোবাসে কবি।
রূপ নহে সেই রস, রতি নয়—সে শুধু আরতি,
মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি !
সে ত' নহে ভোগ-প্রয়োজন,
সে নয় প্রাণের ক্ষুধা, প্রেম নয়, নয় সে যে দেহ-পদ্মে মধু-আস্বাদন—
দুহুঁ দোঁহা ভুলে শুধু, দুই-আমি এক-আমি হয়,
আত্মরস-রসাতলে স্বর্গ মর্ত্ত্য নিখিলের লয় !
আঁখির অমৃত-বর্ত্তি বলি যারে, চাহি' তার মুখে সেইক্ষণে
আঁখি যে মুদিয়া আসে, চেতনা হারায়ে যায় প্রাণের গহনে—
তাই তার রূপে কিবা কাজ ?
'কালা কিম্বা গোরা' ভুলি—তনু-মন সমপিতে নাহি পাই লাজ।

* * *

তবু তার রূপ চাই ? কবিচিত্তে রূপের পিপাসা
ঘুচিতে পারে না কভু ?—আছে তার হেন ভালোবাসা !
প্রাণ যার স্নান করি' উঠিয়াছে প্রীতি-সরোবরে,
সকলি সুন্দর হেরি' গাহে গাথা কলগুঞ্জস্বরে—
সে যে ঋষি, কণ্ঠে তার অসম্বদ্ধ বাণী,
আনন্দের রসাবেশে অবশ পরাণি !
বায়ু মধু, আলো মধু, নদী বহে মধু-জলধার—
সে ত' নহে রূপ-পূজা, আত্মার শৈশবে সে যে আত্মহারা প্রীতির প্রসার !

কবি তায় ভুলিবে কি ? মনোরথ-রশ্মি সংহরিয়া,
পান করি' প্রীতি-রস তৃপ্ত হবে তার সেই স্বপ্নাতুর হিয়া ?
—এ হেন সংশয়
জাগে মনে সবাকার, তবু সে কি সত্য মনে হয় ?
যে প্রতিভা শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে রূপ দেয় চঞ্চলে তরলে—
ছায়ারে দানিছে কায়া, শূন্য হ'তে টানিয়া সবলে,
সুসম্পূর্ণ করি' তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে,
তার প্রিয়া রূপহীনা—হেন অপবাদ কভু তারে কি সম্ভবে !

যেই আমি আমা হ'তে মুক্তি চাই কল্পনার নিশীথ-স্বপনে,
সেই আমি বাঁধি পুন আপনারে চেতনার জাগ্রৎ ভুবনে।
জানি সে প্রেয়সী মোর আমারি যে, আর কারো নয়,
—সে বাঁধনে নাহি মুক্তি-ভয় ;
আমারি ঐশ্বর্য্য তাই হেরি আমি তার দেহমাঝে,
তাই সে সুন্দর হেন, সাজিয়াছে মোর দেওয়া ফুল্ল ফুলসাজে !
আমি, আমি, আমি—
আমিময় হেরি তারে ! আমি-হারা কল্পনার স্রোত গেছে থামি'
তাহারি তনুরে ঘিরে' ; পরায়েছি দু'চরণে তার
গানের মঞ্জীরখানি স্তব্ধ করি' সকল ঝঙ্কার !
যে আঁখি ধরিতে চায় অসীমের সৃষ্টি-সীমা একটি পলকে,
সে আঁখি যে রুদ্ধ হয় তার সেই অতি ক্ষুদ্র ললাট-ফলকে,
একমাত্র তারে হেরি, আর যেন কেহ কোথা নাই !—
অধরে বাসন্তী-ঊষা, সিন্দূরে বালার্ক-ভাতি, নেত্রে তার নীলাকাশ
দেখিবারে পাই !
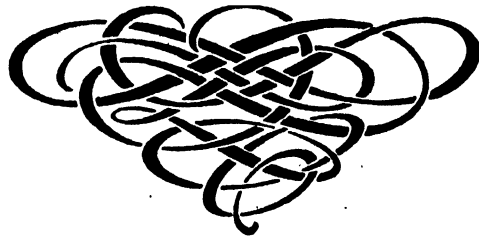
মন্দাকিনীর বাঁধ

—গল্প—

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ—সে কি ঠেলা যায়? তাই বলিতেছি।

মারাত্মক রোগে শ্রীপতি তখন শয্যাশায়ী, চিকিৎসার ভার আমার উপর।

জানিতাম পরিত্রাণ নাই, তবু দিনের পর দিন ঔষধ দিয়া মন বোঝানো আর আশা দিয়া মন ভুলানো যে কতদূর বিড়ম্বনা, বন্ধুর চিকিৎসা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন। শ্রীপতি বুঝিত,তাহার ঠোঁট দুটির উপর বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিত।

বিকারের ঘোরে কত কি সে বকিয়া গিয়াছে, আমি শুনিয়াছি, অর্থ বুঝি নাই। কিন্তু বেশ মনে হইত কথাগুলি তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের প্রলাপ নহে। তাহার ভিতরকার চৈতন্য যেন কোন দেহাতিরিক্ত সত্তার স্পর্শ অনুভব করিতেছে, সেখানে আত্মায় আত্মার মিলন। কতবার তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, কে তুমি? ও রূপ যে কৃত্রিম! চিরযুগের ভোলা তোমার মায়ায় পাগল। মন্দাকিনী চিরচঞ্চলা, তাকে বেঁধে রাখে সাধ্য কার?

আমি তাহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। মৃত্যুর পুর্ব্বে একদিন আমায় ডাকিয়া সে নিজেই বলিয়াছিল, —ডাক্তার, আমার নামে একটা অপবাদ রটেছিল, জান?

আমি বাধা দিলাম, কিন্তু তাহাকে নিরস্ত করা গেল না। সে বলিয়া গেল,—রটেছিল যে আমি সুরথ ষ্টেটে মন্দাকিনী বাঁধের টাকা ভেঙে পালিয়ে এসেছিলাম। মিথ্যা কথা।

আমি কহিলাম, নিশ্চিন্ত থাকো শ্রীপতি। তোমায় যারা চেনে ও কথা তারা কখনো বিশ্বাস করতে পারে না।

শ্রীপতি বলিল, কলঙ্ক আমি স্বেচ্ছায় মাথায় নিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বেঁচে থাকতে আমার কথা কাউকে জানতে দেব না। কিন্তু এখন ত' বেঁচে থাকার গণ্ডী পেরিয়ে চলেছি। ঐ মিথ্যাটা আর ঘাড়ে ক'রে বইতে পার্‌বো না, তাতে আত্মার তৃপ্তি হবে না।

বালিসের নীচে হইতে চাবি লইয়া সে আমাকে হাত বাক্সটি খুলিয়া ধরিতে বলিল। তাহার কথা মত লাল ফিতা দিয়া বাঁধা কয়েক খণ্ড কাগজ বাহির করিলাম। সে কহিল, ও গুলি নাও, প'ড়ে দেখো। কিন্তু এখন নয়, আমার মৃত্যুর পর। একটু গুছিয়ে সাজিয়ে বের ক'রো। ভূমিকা মন্তব্য করতে চাও কর্‌তে পার, কিন্তু দোহাই তোমার, আমার দোষের একটি বর্ণও যেন বাদ দিও না। পড়লেই বুঝতে পারবে, তস্করূপের চাইতেও ঢের বড় রকমের আর একটা বোঝা আমার পথের সম্বল হ'য়ে রইলো।

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিয়াছিল, জানালার দিকে ফিরিয়া আমি অশ্রু গোপন করিলাম।

তাহার মৃত্যুর পর জনৈক সাহিত্যিক বন্ধুর শরণ লইয়াছিলাম, আমার সহিত যেমন, শ্রীপতির সঙ্গেও তাহার তেমনি ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাগজগুলি পড়িয়া আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—দেখ ডাক্তার, আর্টে কার্য্য কারণের সামঞ্জস্য না রাখাই নিয়ম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিয়ম অনিয়ম, কেন না, শ্রীপতি আর্টিষ্ট নহে। সুতরাং তাহার জীবনের ইতিহাসে আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে। বিলাত হইতে শ্রীপতি ফিরিয়াছিল ইঞ্জিনিয়র হইয়া। সে কল ঘুরাইতে জানিত, জানিত না সময় ও সুযোগমত ভাগ্য-চক্রের হাতলে হাত দিতে। ফলে, পাঁচ বৎসর ধরিয়া অনেক আশাই সে কুয়াশার মত কাটিয়া যাইতে দেখিয়াছে। তারপর তাহাকে চাকরি লইয়া যাইতে হইল সুরথ ষ্টেটের খাল কাটিতে ও মন্দাকিনীর বাঁধ গাঁথিয়া তুলিতে। এখানেও অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! খাল সে কাটিল, বাঁধও দিল,—কিন্তু কুমীর আসার পথ বন্ধ করিতে পারিল কৈ?"

বন্ধুর কথা শুনিয়া মনে পড়িয়া গেল সেই দিন, যে দিন শ্রীপতি সুরথে যাত্রা করিয়াছিল। বিদায়কালে তাহাকে বলিয়াছিলাম, না গেলেই বোধ করি ভালো করতে। অনেক দূর, একেবারে বনবাস।

শ্রীপতি কহিল, তিন কূলে আমার কে আছে ভাই, যাকে নিয়ে গৃহে বাস কর্‌বো? বনের সৃষ্টি ত আমার মত লোকের জন্য।

তবু বলিলাম, রাজা রাজ্‌ড়া বড় খামখেয়ালি। ওদের চাকরির মানে বোঝ ত?

শ্রীপতি হাসিয়া বলিয়াছিল, বিলক্ষণ। তা আর বুঝি না?

হাঁ, সে বুঝিয়াছিল। কিন্তু তখন বড় দেরি হইয়া গিয়াছে—আর উপায় নাই।

সুরথে পৌঁছিবার পর সে একখানি পত্র আমাকে লিখিয়াছিল। কিন্তু সেইখানাই শেষ। সে যে প্রসিদ্ধ পয়ঃ প্রণালী খনন করিতে গিয়াছিল তাহা লইয়া পরে সংবাদ পত্রে অনেক লেখালেখি দেখিয়াছি, সে-সব কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি নাই। বছর দুই পর ফিরিয়া আসিয়া সে যখন আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে রুগ্ন। তাই সে-সম্বন্ধে আর তাহার সহিত আলোচনার সুযোগ ঘটিল না।

শ্রীপতি আজ স্বর্গে—নিন্দা স্তুতির অতীত। দোষ যদি সে করিয়া থাকে—কে না দোষ করে?—তবে সে-দোষ চন্দ্রে কলঙ্ক! তাহাকে মধুর করিয়াছে, কলুষিত করে নাই।

* * * * * * * * *

শ্রীপতির কথা

সুধা হাতে এসেছিল সে—সাগর পারে মোহিনীরূপে। অমৃতের পিয়াসীরা সারি সারি বসেছিল মুগ্ধ হ'য়ে, পাগল হ'লো খ্যাপা ভোলা। তোমরা হয়ত বলবে, ছেলে ভুলানো পুতুল দেখে যার লোভ জেগে ওঠে তার লোভের আবার দাম? খ্যাপাকে ঘৃণা করতে চাও কর, কিন্তু একটু ভেবে দেখ—ঐটাই কি বিশ্বের নিত্য সত্য নয়? মানুষ যে তার মনকে মোহের জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত ক'রে রেখেছে। সে রূপ দেখে ভুলতে চায়, প্রাণের সন্ধান চায় না। তা' যদি চাইতো তা' হ'লে মানুষের চোখে রূপের নেশা এমন জোর ক'রে চেপে বস্‌তো না, তার কাব্যে গানে কুৎসিতেরও একটা স্থান থাকতো।

* * * সাহিত্যিক বন্ধু বলেন, আর্টের লজিক সম্বন্ধে শ্রীপতি অজ্ঞ। রূপই আর্টের প্রাণ; নীরূপের প্রাণ নাই। নীরূপের প্রতি বিরূপ বলিয়াই না আর্টের এত আদর! * * *

প্যারিসের বুলিভার্ডে একটি পাইন গাছের তলায় নির্জ্জনে ব'সে অসিতের সঙ্গে গল্প করছিলাম। বিলাতের পড়া শুনা সাঙ্গ ক'রে উভয়ে মহাদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি। এর পর দেশে ফিরে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হবে, সেই ভাবনাটা তখন দৈত্যপুরীর মত মাথা তুলে আমাদের প্রতি অবজ্ঞার অট্টহাসি বর্ষণ করছিল। দেখছি শুনছি সব, কিন্তু মুখে আমাদের এক কথা—কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়।

হঠাৎ আমাদের গল্প কখন যে থেমে গিয়েছিল তা আমরা টের পাইনি। দুজনে এক সময় একই দিকে চেয়ে দেখছি একটি সুন্দরী যুবতীকে—সে ভারতীয়, উজ্জ্বল সোনালি রং-এর একখানি সাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। অনাবৃত বাহু দুটি শাখার মত বিলম্বিত, সে যেন বর্ণের তরলতা দিয়ে গড়া। কানে হীরার দুল।

দূরে মোটর দাঁড়িয়ে, সে নেমে বেড়াচ্ছিল। আমাদের দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা কি ভারত-বাসী?

আমরা দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, হাঁ। আমরা বাঙালী।

যুবতী একটি বেঞ্চে ব'সে পড়লো। আমাদের বসতে ইঙ্গিত ক'রে বললে, এ দেশের গ্রীষ্মকাল বড় চমৎকার, তাপের মধ্যেও বেশ একটু আরাম আছে।

সন্ধ্যাসমীরণে পাইনের সুঘ্রাণ তখন যেন একটু পুলকের আবেশ এনে দিচ্ছিল। অসিত তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা জুড়ে দিলে, আমি মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলাম। যুবতীর টানা চোখে, মুখের ঈষৎ বক্র রেখায় আনন্দের হিন্দোল হেলছে, দুলছে—ঠিক যেন তার দুলের মত।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শুনলাম, সে চিত্রশিল্পী। লণ্ডনের আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী দেখবার জন্য বিলাতে গিয়ে মাসাবধি কাল ছিল, দিন দুই হ'ল প্যারিসে এক নাম-করা হোটেলে এসে উঠেছে। যে মহিলাটি তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, কাল থেকে তিনি অসুস্থ, তাই তাকে একলা বেরুতে হচ্ছে। কিন্তু, এদেশ এমন যে ফ্রেঞ্চ ভাষা না জানলে পথে ঘাটে নানারূপ অসুবিধা। একটি জনাকীর্ণ সহরও যে এমনধারা নির্জ্জন কারা হ'য়ে ওঠে তা কি কেউ ধারণা করতে পারে?

অসিত অমনি ব'লে উঠলো—বেশ ত। আমরা এখানে যে কয়দিন আছি, যদি অনুমতি করেন তা হ'লে এর মধ্যে আপনাকে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাতে পারবো। তার বিনিময়ে—

সে হেসে উঠলো, কী মধুর হাসি! যেন এক পাগলা-ঝোরা হঠাৎ মুক্ত হ'য়ে ধারায় ধারায় নেমে এলো। সে বললে, আপনাদের দেখছি পাশ্চাত্যের হাওয়া লেগেছে। বিনিময় ছাড়া তৃণটিও উল্টোবেন না।

অসিতও হেসে বললে, বেশি কিছু ত চাই না। আপনার আঁকা কয়েকখানা ছবি দেখাবেন, সেই আমাদের পুরস্কার।

যুবতী খুশী হ'য়ে বললে, পুরস্কারের লোভ করলে অনেক সময় প্রতারিত হ'তে হয়। দেখবেন, তখন যেন আমায় দোষ দেবেন না।

সে দিন আমার সঙ্গে তার একটিও কথা হয় নি, কিন্তু মাঝে মাঝে সে যখন তার ঘন কৃষ্ণ চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যে ক্ষোভের কারণ মোটেই নেই। যাবার বেলায় সে বললে, হোটেলে কুমারী নন্দিনীর খোঁজ করবেন। তারপর আমার দিকে একটি-বার চেয়ে হেসে অসিতকে ব'লে গেল, আপনার এই বন্ধুটিকে সঙ্গে নিতে ভুলবেন না যেন। উনি দেখছি বিলক্ষণ লাজুক।

ফেরবার পথে অসিত হাসতে হাসতে বলেছিল, শ্রীপতি তুই জিতেছিস।

আমি বিরক্ত হ'য়ে বললাম,—আঃ, কি যে বলিস্!

কিন্তু অসিতের পরিহাস সত্যে পরিণত হয়েছিল দুদিনের মধ্যে। একসঙ্গে ভ্রমণে কথায় আলোচনায় আমার বাধো-বাধো ভাবটা যে কখন কেটে গিয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝতে পারিনি। জীবন-সংগ্রামের দানবীয় বিভীষিকা মন থেকে স'রে গেল। সেখানে জেগে উঠলো একটা সজীব আশা, আনন্দে যার স্ফুরণ, ভাষায় যার অভিব্যক্তি, নব বসন্তের মত যার উতলা বাতাস জড় সৃষ্টিকেও মুখর ক'রে তোলে। নন্দিনী একেবারে অবাক হ'য়ে গেল। এ যে পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন! তার ভিতর সত্যকার মানুষটিতে আমার এই দৈব প্রেরণার সাড়া কি জেগেছিল? সে খুব উৎসাহের সহিত যেন বিশেষ ক'রে আমাকেই তার ছবিগুলি দেখাতে লাগ্‌লো। অসিত উপযাচক হ'য়ে এগিয়ে এসে প্রদর্শনীতে নন্দিনী যে সব প্রশংসা পেয়েছে তারই প্রতিধ্বনি করতো। কিন্তু আমি বেশ বুঝতাম, সে ও-সব চায় না। সে চায়, আমার কাছে তার দোষ গুণ বিচার। আমার মুখের একটি কথাও যেন জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মতামতের তুলনায় ঢের বেশি মূল্যবান!

সে ক'দিন অসিত আমার সঙ্গে খুব সন্তর্পনে ব্যবহার করেছিল—রাগও করেনি, ব্যঙ্গও না। আমি যখন নন্দিনীর সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকতাম, সে তখন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্য্যায়ক্রমে আমার ও তার উপর রেখে কিসের সন্ধান করতো—তাতে সময় সময় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতাম বটে, নন্দিনী কিন্তু মোটেই বিচলিত হ'ত না। এক দিন সে তাকে পরিহাস ক'রে বলেছিল, "আপনার ও আপনার বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ কি জানেন? আপনি হচ্ছেন একটি কলের গান। চাবি দিলেই ইচ্ছামত সুরটি আদায় করা যায়। আর আপনার বন্ধু একটি আলোর ঝরণা, কারুর ইচ্ছা অনিচ্ছার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার উষ্ণ রশ্মির স্পর্শে ঘুমন্ত কোকিলটি পর্য্যন্ত আপনা-আপনি জেগে উঠে গান গাইতে থাকে।

বাড়ী ফিরে অসিত আমাকে বললে, ঢের হয়েছে শ্রীপতি। চল্, আজ রাত্রের এক্‌স্‌প্রেসে জার্ম্মানিতে স'রে পড়ি।

আমি ব'লে ফেললাম, এমন হঠাৎ! তাও কি হয়?

সে বিদ্রূপ ক'রে বললে, কেন, বিদায় নিতে হবে নাকি?

আমি বললাম, দোষ কি?

তীব্র কটাক্ষ ক'রে সে আবার বললে, দেখছি, কুহকিনী তোকে একেবারে মজিয়েছে।

আমি বিষম চ'টে গিয়ে বললাম, এক জন ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে ও রকম অসংযত ভাষা প্রয়োগ করতে লজ্জা হ'ল না অসিত? ছিঃ!

সে স্থির ভাবে বললে, ও ভাষা ব্যবহার করতাম না যদি দৈবাৎ সে দিন ওর পূর্ব্ব ইতিহাস জান্‌তে না পারতাম। এখন বুঝছি, এ সব ওর ভাণ। এমনি মায়ায় প'ড়েই এক জন নবীন চিত্রকর ওর জন্য আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু তোমায় সে কথা বলা বৃথা।

আমি তার একটি বর্ণও বিশ্বাস করলাম না। অকথা কুকথা অনেক শুনিয়ে বললাম, তুমি ক্রুর, তুমি হিংসুটে। নন্দিনীর শ্রদ্ধা তোমার চেয়ে আমার উপর বেশি ব'লে ঈর্ষা করচো, তুমি বন্ধুর অযোগ্য।

সে আর কথাটি মাত্র না ব'লে জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হ'য়ে গেল, আমাকে আমার অদৃষ্টের হাতে সঁপে দিয়ে।

অসিত চ'লে গেল, কিন্তু তার কথাগুলি আমার অন্তরে বঁড়শীর মত বিঁধে ছিল। আমি কেবলি ভাবতে লাগলাম,—ভাণ? তাও কি সম্ভব? নন্দিনীও যদি ভাণ ক'রে থাকে তা হ'লে বিশ্বাসের খুঁটি নিঃসঙ্কোচে পুঁতে রাখা যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান এক বিন্দুও নেই। সারারাত্রি আমি চোখের পলক ফেল্‌তে পারলাম না। পরদিন সকালে উঠে নিমেষ মধ্যে গিয়ে উঠলাম নন্দিনীর হোটেলে। সে তখন হাত মুখ ধুয়ে সবেমাত্র বসবার কামরায় ঢুকছিল, আমার চেহারা দেখে বিস্মিত হ'য়ে বললে, কি হয়েছে মিষ্টার রায়? কোনো দুঃসংবাদ নয় ত?

আমি কোচখানার উপর ব'সে পড়লাম। তারপর অসিতের সঙ্গে আমার কাল যা' ঘ'টে গেছে, তা' আগা-গোড়া বললাম; এতটুকু গোপন করলাম না। সে মনো-যোগের সহিত আমার কথা শুনে যাচ্ছিল, শুনতে শুনতে তার মুখখানির উপর যে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটছিল তাও আমি বেশ লক্ষ্য করলাম। তার ঠোঁট দুটিতে রক্তের লেশ মাত্র রইলো না; ঈষৎ স্নায়বিক শিহরণ লম্বা আঙুলের ডগা দিয়ে বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে একটু হেসে বললে, উপদেশ শুনে আপনার সাবধান হওয়াই সঙ্গত।

আমি বললাম, নন্দিনী, ভালোবাসা উপদেশের দাস নয়।

সে বললে, যে উপদেশের দাস নয় জান্‌বেন সে, অনর্থের প্রভু। আপনার বন্ধু মিথ্যা কথা বলেননি। এক যুবা চিত্রকরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে ছিল গরীব, বেজায় কালো আর কুৎসিত, আমায় ভালোবাসতো; কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করতাম। একদিন নিভৃতে সে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করলে। আমি বিদ্রূপ ক'রে জবাব দিলাম, প্রেমই যার একমাত্র সম্পদ, তার পক্ষে আমায় বিবাহ করবার কল্পনাও একটা অসম্ভব স্পর্দ্ধা। কাতর-ভাবে কিছুক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললে—নন্দিনী, রূপের আগুনে তোমার হৃদয় পুড়ে গেছে। এ শাপ যারই হোক, আমি তোমার মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করবো। বাতুল! অবজ্ঞার হাসি হেসে চ'লে এলাম। পরদিন সে আমায় একখানা ছবি পাঠিয়ে দিলে, সুতো দিয়ে গুটিয়ে বাঁধা। খুলে দেখি গঙ্গাবতরণের চিত্র। চমৎকার ছবি—কিন্তু একি! এ যে রক্তগঙ্গা! বিস্মিত হ'য়ে দেখলাম, গঙ্গার উৎপত্তি শিবের জটায় নয়, ভগীরথের বক্ষরক্ত নেমে আসছে ঝলকে ঝলকে গঙ্গার প্রবাহে। হাত থেকে ছবি-খানা খ'সে পড়লো—বুঝলাম, ও ছবি সে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে এঁকেছিল।

নন্দিনীর কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল, সেই আত্মঘাতী যুবকের পাশে স্থান দিয়ে সে যেন আমারি নির্বুদ্ধিতার প্রতি কটাক্ষ করছে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে মুখের উপর পরিবর্ত্তনশীল রেখাগুলিতে কি যে সে অনুমান ক'রে নিলে, তা সেই জানে—হঠাৎ ব'লে উঠলো, তোমার কি কিছু বলবার নেই?

এক মুহূর্ত্তে আমি যেন চেতনা ফিরে পেলাম। বললাম না, নন্দিনী।

সে বললে, রাগ কর—ঘৃণা কর—তিরস্কার কর!

ঘাড় নেড়ে বললাম, চিত্রকর যে কাজ প্রাণ দিয়েও পারে নি আমার দুটো মুখের কথায় তা কখনো হবার নয়।

মন্দাকিনীর বাঁধ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেখলাম, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

ফিরে এসে ষ্টিমারে প্যাসেজ্ নিলাম এবং পরদিন ভারতযাত্রা করলাম।

> সাহিত্যিক বন্ধু বলেন, রসশাস্ত্রে নায়িকার এই ভাবটিকে বলা হইয়াছে, নির্ব্বেদ। আত্মধিক্কার শুধু পরের প্রশস্তি লাভের জন্য। শ্রীপতি তাহা বুঝে নাই। বুঝিলে পরিণাম শুভ হইত। * * *

দূর আকাশে উড়তে উড়তে পাখী মনে করে কি না জানি না যে, তার সঙ্গে পৃথিবীর সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়ে গেছে, কিন্তু এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি, প্যারিসের হোটেলে সেই যা ঘটেছিল, তার পর নন্দিনীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবার কল্পনাও আমার মনে জেগে ওঠেনি। তার সেই রূপ আমি যে কখনো ভুলেছিলাম, এমন নয়। সে ছিল যেন মৃত্যুর পরপারে, আকাঙ্ক্ষা তাকে স্পর্শ করছে না—শুধু মর্ম্মান্তিক হা হুতাশ দিয়ে ঘেরা!

পাঁচ বৎসর পর আবার যখন তাকে দেখলাম, সে তখন মহারাণী নন্দিনী, আর আমি সেই ষ্টেটেরই ইঞ্জিনিয়র—মন্দাকিনীর বাঁধ প্রস্তুত করবার জন্য সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে নন্দিনীর স্বামী সুরথের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ গতাসু হয়েছিলেন। সেই সিংহাসন এখন অধিকার করছেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মহারাজ ইন্দ্রজিৎ সিং।

আমি তাকে দেখেই চিনেছিলাম। এক যোজন দূর থেকে দেখলেও চিনতে পারতাম। সকাল বেলা মাঠে প্রণালীর কাজ পর্য্যবেক্ষণ করছি, অদূরে রাস্তায় একখানি মোটর এসে দাঁড়ালো, আর ভিতর থেকে নেমে এলো, নন্দিনী! সকলে সসম্ভ্রমে ব'লে উঠলো—মহারাণী, মহারাণী এসেছেন।

আমি নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইলাম, অগ্রসরও হলাম না, অভ্যর্থনাও করলাম না। সে আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। পরনে বিধবার শুভ্র বস্ত্র, হাতে দুগাছি চুড়ি। তার শরীর শীর্ণ, মুখখানি কেমন যেন একটু লম্বা হ'য়ে ঝুলে পড়েছে আর বর্ণ ঘোর লাল।

সে আমায় সম্বোধন ক'রে বললে, আপনি এখানে এসেছেন তা শুনেছি। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত?

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জবাব দিলাম, না মহারাণী।

মহারাণীকে মহারাণী বললে কি তার মনে ব্যথা লাগে? না, আমার সম্ভ্রমের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত শ্লেষ ছিল? সে মুখ নামিয়ে নিলে, তার অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠলো। কিন্তু নিজেকে তখনি সামলে নিয়ে সে বললে, প্রণালীর কাজ আমায় দেখাবেন কি?

আমি তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখাতে লাগলাম—নদীর বাঁধ, জল-নিকাশের পথ। বুঝিয়ে দিলাম, কেমন ক'রে সমুদায় অনুর্ব্বর দেশটি শস্যশ্যামল হ'য়ে উঠবে।

আমার কাজের মধ্যে সে যেন বীরত্বের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে এমনিভাবে সে বললে,—জানেন, মন্দাকিনীর বাঁধ দিতে ইতিপূর্ব্বে আর কেউ সাহস করেন নি।

তার চোখে মুখে আনন্দ ফুটে উঠছিল। মোটরে উঠবার সময় আমার দিকে ফিরে সে বললে, বিকাল বেলা আপনার চা-পানের অবসর হবে কি?

আমি ইতস্তত করছি, সে বললে,—যাবেন। আমার অনুরোধ।

নন্দিনী অপেক্ষা করছিল। আমি গিয়ে উপস্থিত হ'তে সে উঠে এসে আমায় অভ্যর্থনা ক'রে বসালো। এ কথা সে কথা নিজ থেকে পাড়তে লাগলো, অতীতের কথাও বাদ দিলে না। পরিশেষে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি বিবাহ করেছেন?

আমি বললাম, না।

তার চোখ দুটো দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে তখনি আবার নিভে গেল। সে বললে, আপনি বোধ করি জানেন না যে প্যারিসে আপনার সঙ্গে দেখা হবার পূর্ব্বে আমাদের বিবাহ স্থির হ'য়ে গিয়েছিল। কোনো কারণে কথাটা তখন আমাদের গোপন রাখতে হয়। মহারাজ আমায় দেখেছিলেন লণ্ডনের প্রদর্শনীতে। লণ্ডনেই তিনি প্রস্তাব করেন, পরে দেশে ফিরে বিবাহ হয়।

এতকাল পর সে কথা কেন? আমি ত তার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ চাই নি। সে কি মনে করেছে যে

আমার এই অনুচ্চ অবস্থার সঙ্গে তার কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ আছে? তাই যদি হয় তা হ'লে একদিন যে বিশ্বাস আমি হারিয়েছি আর তা ফিরে পাব না।—তার কথায়ও না।

* * * সাহিত্যিক বন্ধু বলিলেন, স্বামীর প্রতি শ্রীপতির অশ্রদ্ধা সম্পূর্ণ অহেতুক। সক্রেটিসের মতে, যুক্তির প্রমাদ ও ঐরূপ বিরাগ, দুয়েরই মূল কারণ এক। এ বিষয় জীব জন্তুর instinct অভ্রান্ত—প্রত্যাখ্যাত হইয়াও নির্ব্বিকার চিত্তে অন্যত্র ভাগ্যের সন্ধান করিয়া থাকে। * * *

প্রাসাদের হাতায় আলাদা এক বাড়ীতে নন্দিনী থাক্‌তো। ছোট বাড়ী, সাদাসিধা সামান্য কিছু আসবাব পত্রে সাজানো। মহারাজের আপত্তি সত্ত্বেও স্বামীর মৃত্যুর পর সে না কি অন্তঃপুর ছেড়ে এখানে উঠে এসেছিল। লোকে বল্‌তো, যে অন্তঃপুরে একদিন তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, আজ কি আর সেখানে থেকে দেবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা চলে? নন্দিনীর প্রশংসা ছিল তাদের শতমুখে। শুনে অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম রাজ-দরবারের সিংহাসনে স্থান না থাক্‌লেও প্রজাদের অন্তররাজ্যে নন্দিনীর অধিকার অক্ষুণ্ণ—এবং সেজন্য স্বয়ং মহারাজও তাকে বিশেষ খাতির ক'রে চলেন।

নন্দিনীর নিমন্ত্রণে মাঝে মাঝে আমাকে তার বাড়ীতে আস্‌তে হ'ত। তার অকাল বৈধব্য আমার মনে করুণার ধারা মুক্ত ক'রে দিয়েছিল, তাতে ক'রে আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাসের কালিমা কখন যে ধুয়ে গিয়েছিল তা আমি টের পাই নি। বাঁধের কাজ রীতিমত চলছিল এবং একাজে তার উৎসাহ ছিল সকলের চেয়ে বেশি। মন্দাকিনীর এপার ওপার জুড়ে ঐ যে পাষাণ-প্রাচীরটি গেঁথে তোলা হচ্ছিল, তা ছিল শুধু মন্দাকিনীর নয়, আমাদেরও—মালমসলার যোগে উভয়ের সম্বন্ধ যেন আবার নিবিড় ক'রে বেঁধে দিচ্ছিল। এই বাঁধটি তার গোটা মনকে উৎকণ্ঠায় ভ'রে তুলেছিল—মাঝে মাঝে সে ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌তো, যেন এর দুজ্ঞের্য় রহস্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ সে দূরবীনে দেখতে পেয়েছে। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করতো,—সত্যই কি ও বাঁধ ভাঙবে না? বান এলেও না?

আমি আশ্বাস দিয়ে বলতাম, না। এ বাঁধ ভাঙবার নয়।

যেন ভবিষ্যতের লক্ষ্যভেদ করছে এমনি ক'রে সে ব'লে যেত,—মন্দাকিনী বড় ভয়ঙ্কর নদী। কেউ জানে না কখন আসবে ওর বান। এই নেই, এই গেছে ওর দুকূল ভেসে। তবু বিশ্বাস করেন? কি দৃঢ় আপনার মন!

কিন্তু নন্দিনীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, তার বাড়ীতে যাওয়া-আসা যে রাজবাড়ীতে কারো কারো একটি আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠেছিল, আমি তা একটি দিনের জন্যও টের পাই নি। জানলাম দৈবক্রমে একদিন—সেদিন নন্দিনীর বাড়ীতে গিয়ে দেখি, মহারাজ ইন্দ্রজিতের শুভাগমন হয়েছে। মহারাজের মুখখানি আমায় দেখে লাল হ'য়ে উঠলো, ভদ্রতার সম্ভাষণটুকু পর্য্যন্ত তিনি আমায় করলেন না। কিন্তু নন্দিনীর কাণ্ড দেখে আমি সত্যসত্যই অবাক হ'য়ে গেলাম—এমন অন্তরঙ্গভাবে অভ্যর্থনা সে আমায় কোনোদিন করে নি। এগিয়ে এসে হাত ধ'রে সে ব'লে উঠলো, এস শ্রীপতি। এতক্ষণ কোথা ছিলে?—তারপর মহারাজের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললে, ইন্দ্রজিৎ, শ্রীপতি শুধু তোমার ইঞ্জিনিয়র নয়। উনি আমার একজন পরম বন্ধু।

মহারাজ আমার দিকে তাকালেন—সে দৃষ্টি যেন বিষে ভরা। বিড়্ বিড়্ ক'রে নন্দিনীকে কি কথা ব'লে তৎক্ষণাৎ চ'লে গেলেন।

তারপর নন্দিনীর যা হাসি। এমন প্রাণখোলা হাসি এখানে এসে অবধি তার একদিনও দেখি নি।

শঙ্কায় আমার মন অধীর হ'য়ে উঠেছিল। ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব কি?

সে তেমনি হাসতে হাসতে বললে, মূর্খের দল...কেমন জব্দ করেছি? যত পারে করুক আমাদের নিন্দা। দেখুক, নিন্দার ভয় আমি করি না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। খানিক নীরব থেকে একটু ঢোঁক গিলে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বললাম, ভেবে দেখ—যাদের মাঝে বাস করছো তাদের নিন্দা কি অমন ক'রে উড়িয়ে দেওয়া চলে ?

নন্দিনী হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, বললে, তা জানি। কিন্তু কোন্‌টা সত্য ? বিবাহের পর থেকে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর অত্যাচার, দিনের পর দিন নরকযন্ত্রণা—সেইটা, না এদের এই কুৎসা ? সত্যিকার নরক সহ্য করেছি, আর মিথ্যা নিন্দা পার্‌বো না ? আমার কর্ম্মের ফল আজও ভোগ করছি—যাক্, সে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। যে যা চায় তার বেশি সে দাবী করতে পারে না। আমি চেয়েছিলাম মর্য্যাদা, সম্মান, প্রতিপত্তি। সে-সব পেয়েছি। মহারাজ ইন্দ্রজিতের সাধ্য কি যে তার তিলমাত্র হ্রাস করে ?

যে কারণে হোক এই রাজবংশের প্রতি গভীর ঘৃণা নন্দিনীর অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, আর মহারাজ ইন্দ্রজিৎ সেই বংশেরই সম্ভ্রম নিখুঁৎ রাখতে অভিলাষী। একথা আমি বেশ অনুমান করতে পেরেছিলাম। বিষয়টি তাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করায় নন্দিনী নেহাৎ তাচ্ছিল্য ক'রে জবাব দিলে, আমার সঙ্গে কারবারে ওরা যে সাধুতার পরিচয় দিয়েছিল, তাতে ওদের বংশের সম্ভ্রম বাঁধা রেখে ছেঁড়া কাপড়খানা দিতেও আমি রাজি নই।

তখন থেকে তার বাড়ী যাওয়া আসা, আগেকার মত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে মেলা মেশা আমি একরকম বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। নন্দিনী কিন্তু আমায় ভুল বুঝেছিল। একদিন আমায় ডেকে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আর আস না কেন শ্রীপতি ? তুমি কি ভয় করছ ?

আমি বললাম, কিসের ?

সে বললে, চাকরি যাবার ?

সে ভয় আমার কোনোদিন ছিল না। কিন্তু নন্দিনীকে নিন্দার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য ঐ কাপুরুষতাকেও আমি স্বীকার ক'রে নিলাম।

সে বললে, মন্দাকিনীর বাঁধ তৈরি করবার চেষ্টা কতবার হয়েছিল। কেউ যা পারে নি, তুমি তাই করেছ। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রজারা ঢেলে দিয়েছে। তোমায় তাড়িয়ে দেবে এমন দুঃসাহস কারো নেই—মহারাজেরও নয়।

একথা যথার্থ—আমি তা বিলক্ষণ জানতাম। ইতিমধ্যে যখনই মহারাজ ইন্দ্রজিৎ বাঁধ পরিদর্শন করতে আসতেন, তখনি তিনি সকলের সামনে আমার কর্ম্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। কয়েকবার অন্য স্থান থেকে দক্ষ ইঞ্জিনিয়র এনে আমার ত্রুটি ধরবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নি। তাদের সকলের কাছে আমি এটা বেশ প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলাম যে আমার কারিগরি ছেলেখেলা নয়, মন্দাকিনীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসও সে রোধ করতে পারে।

সেদিন মহারাজ যেন কতই খুশী হ'য়ে ব'লে গিয়েছিলেন, সকলেই আপনার কাজে মুগ্ধ। জানবেন, বাঁধটি শেষ করতে পারলে আপনার প্রচুর পুরস্কার।

তখন কি জানতাম, তাঁর ঐ পুরস্কারের জল্পনা কত ভয়ঙ্কর !

কিন্তু নন্দিনীর সেই পুরানো আশঙ্কা মাঝে মাঝে এমনি আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠ্‌তো যে, তার ঢেউ আমাকেও চঞ্চল ক'রে তুলতে ছাড়্‌তো না। আমার মনে তার কথাগুলো যেন প্রতিধ্বনি করতো—তাইত, পারবো কি ? ও যে এক জীবন্ত নদী—ওর জল এই আছে এই নেই !

বহুদূরে পাহাড় থেকে মন্দাকিনী নেমে এসেছে—বালুকাময় প্রশস্ত নদী। তার গর্ভে এপার ওপার জোড়া বাঁধ, প্রণালীর মধ্যে জল নিঃসারণ করবার জন্য। নন্দিনীকে ডেকে এনে আমি একদিন এর শক্তির পরীক্ষা দিয়েছিলাম, ফটকগুলি ফেলে দিয়ে বানের জল রোধ ক'রে। সিন্ধুর মত উঁচু হ'য়ে নদী ফেঁপে উঠেছে। বাঁধের উপর দিয়ে অতিরিক্ত জলধারা প্রপাতের সৃষ্টি ক'রে বালি কাঁকর সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—একটানা স্রোতে, ঝরঝর শব্দে !

নন্দিনী বললে, ভয় নেই—আর ভয় নেই।

উঁচু পাড়ের উপর বেড়াতে বেড়াতে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছিলাম। সেখান থেকে বাঁধটিকে দেখা যাচ্ছিল নদীর নীবিবন্ধের মত। সূর্য্য ডুবু-ডুবু। গৃহস্থের কুটির হ'তে ধোঁয়াগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

মুক্ত প্রান্তরে নন্দিনী অনেকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে রইল। কি ভাবলে জানি না, বল্‌লে—ঐ কুঁড়ে ঘরখানিতে ওরা বাস করছে, আর পাশেই এই নদী। একে ওরা জানে না, শুধু দেখেছে—কখনো ভাবে নি, কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে ওকে ধ'রে রাখা চলে। কেন দিলে বাঁধ শ্রীপতি? কী তুচ্ছ ওদের ছোট ছোট মাঠ!

তার কথার অর্থ ভালো ধরতে না পারলেও আমি এটুকু বুঝেছিলাম যে সব রকম কৃত্রিমতার প্রতি একটা বিদ্বেষ তার অন্তরে আগুন জ্বেলে দিয়েছে—ভালো মন্দটি পর্য্যন্ত বাছাই করছে না। বল্‌লাম—নন্দিনী, নদীর সাধ্য নেই, কিন্তু তোমার মুখের একটি কথা আজই ও বাঁধ ভাসিয়ে দিতে পারে।

একটু হেসে সে বললে, না শ্রীপতি। অনেক দূর চ'লে গেছ। এখন এগোও, কেবল এগোও।

হাঁ, এগিয়েই চলেছিলাম, এবং যতই এগোচ্ছিলাম ততই আমরা নিজেদের নিরঙ্কুশ কল্পনা করছিলাম। ঐ বাঁধটি ছিল যেন আমাদের ভিতরকার সম্বন্ধেরই একটি প্রতীক। পূর্ব্বে যা আমায় নন্দিনীর কাছ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছিল, সেই রাজবংশের সম্ভ্রমকেও এখন আর আমি একটা বিশেষ অন্তরায় ব'লে মানতাম না। নন্দিনী এদের কে? পথ ভুলে এসে এখানে আটক পড়েছে বৈ ত নয়! মাঝে-মাঝে মনে হ'ত, আমি এসেছি এক রূপকথার রাজপুত্রের মত, এই রাক্ষসপুরী থেকে তাকে উদ্ধার করতে।

কিন্তু সেই বাঁধের গোড়া শিথিল করবার জন্য এক অদৃশ্য হস্তের গোপন আয়োজন চলছিল, সে-কথা আমিও জানতাম না, নন্দিনীও নয়। মহারাজ ইন্দ্রজিৎ যখন সাক্ষাৎ-ভাবে বিরুদ্ধাচারণ ক'রেও বিফল হলেন, তখন তিনি এক অসামরিক পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে আমার উরু-ভঙ্গের চক্রান্ত করতে লাগলেন। আমারি জন কত লোককে হাত ক'রে একদিন রাত্রে তিনি বাঁধটিকে ভেঙে ফেলবার উদ্যোগ করছিলেন, এক বিশ্বস্ত অনুচর এসে তখনি আমায় সেই খবর দিয়ে গেল।

আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম। পরক্ষণে ছুটে বেরুতে যাচ্ছি, লোকটি আমার হাত ধ'রে বললে, দোহাই আপনার। ওখানে যাবেন না। এ সময় ওরা খুন করতেও ছাড়বে না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। অদূরে মন্দাকিনীর বাঁধ—ম্লান জ্যোৎস্নায় বানের জল ঝিকমিক করছিল। বাঁধের ধারে কয়েকজন লোক—তাদের হাতে হাতিয়ার! বাঁধ ভেঙে ওরা আমার ধ্বংসের পথ মুক্ত করবে। হায়রে কপাল! আমার আজকের কীর্ত্তিই যে কাল হ'য়ে দাঁড়াবে আমার কলঙ্ক—লাঞ্ছনা!

আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না ক'রে ছুটতে লাগলাম রাজবাড়ীর দিকে। দোতলার একটি ঘরে নন্দিনী তখনো জেগে। নিশীথে গোপনে কোন দিন আমি এমনি ক'রেই তার কাছে এসে হাজির হব, এ কথাটি যেন তার জানা ছিল, এবং পাছে আমি না নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাই সে-জন্যই যেন সে ব'সে ছিল আমার প্রতীক্ষায়। এত রাত্রে আমায় দেখে সে কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলে না। তার চোখে মুখে বিষাদের রেখা ফুটে উঠেছিল—সে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি?

বারান্দার যে স্থান থেকে নদী স্পষ্ট দেখা যায় আমি তার হাত ধ'রে সেইখানে নিয়ে গেলাম। মুখে কিছু বললাম না, শুধু আঙুল দিয়ে সেই বাঁধের দিকে ইসারা করলাম।

সে বুঝলে। বল্‌লে, বাঁধ ভাঙছে। এখন উপায়?

আমি ব'লে উঠলাম, বাঁধ যায় যাক্। ওর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?

সে বললে, পালাও শ্রীপতি। কাল ওরা তোমায় দণ্ড দেবে।

আমি বলিলাম, নন্দিনী, আমি তোমায় ভালোবাসি··· সেই আগের মতন···তুমি চল আমার সঙ্গে। ওরা সব পারবে, কিন্তু আমার কাছ থেকে তোমায় ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।

আমি নত হ'য়ে তার হাতখানি চেপে ধরেছিলাম—সে হাত কী ঠাণ্ডা! সে মুখ ফিরিয়ে নিলে, বললে—তা হয় না শ্রীপতি!

মিনতি ক'রে বললাম, মিলনে আজ আমাদের ত কোনো বাধা নেই নন্দিনী। মাঝের কয়টা বছর ভুলে যাও।

নন্দিনীর চোখে জল দেখা দিল। কষ্টে অশ্রু সংবরণ ক'রে সে বললে, ভুলতে কি পারি শ্রীপতি? কাল তার ছাপ রেখে গেছে। সে চিহ্ন কখনো মুছে যাবার নয়।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এই ব'লে সে চ'লে যাচ্ছিল, আমি কাতর কণ্ঠে ডাকলাম, নন্দিনী, কথা শোন—যেও না।

সে ফিরে ব'লে গেল,—বোস। আমি আসছি।

আমার মনের ভিতর তুমুল দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। যতক্ষণ ব'সে ছিলাম আমি কেবল নন্দিনীর কথাগুলি চিন্তা করতে লাগলাম। কালের ছাপ কি অক্ষয়? সব সত্য হরণ করতে পারে সে—পারে না কি শুধু নিজের নিঃশব্দ পদচিহ্ন মুছে ফেলতে?

নন্দিনী যখন ফিরে এলো, তাকে দেখে আমি ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠলাম—আমার মুখের চীৎকার মুখেই থেকে গেল। এ কি নন্দিনী? কোথায় তার সেই কালো কেশের শোভা? কোথায় তার গোলাপ ফুলের মত রং? মাথায় চুল নেই, মুখের রং বিশ্রী রকমের সাদা—একটা কদর্য্য রোগ সে তার পরচুলের তলে চাপা দিয়ে রেখেছিল!

নিমেষ মধ্যে আমি তার অন্তর্দাতনা বুঝতে পেরেছিলাম। স্বামীকে সে কেন এত ঘৃণা করতো আর তার বংশকেই বা ধিক্কার দিত কেন, সে কথা জানতে এখন আর আমার বাকি রইল না। আমার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। দুহাতে চোখ ঢেকে আমি বললাম, হায় হায়! এই তোমার দুর্দ্দশা? জানতাম না, সেই যে ছিল ভালো!

সে বললে, তোমায় কি আমি প্রতারণা করতে পারি?

আমি মুখ তুলে তার পানে চাইতে পারলাম না, নন্দিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। হাত ধ'রে করুণ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ব'লে গেল,—শ্রীপতি, নারী তার রূপ তার বেশভূষা ভালোবাসে নিজের জন্য নয়। অন্তরে প্রবেশ করবার ঐ তার ছাড়পত্র। তোমায় দেবার মত আজ আমার কোন সম্পদ নেই।

অসহায় শিশুর মত সে আমার পাশে ব'সে কাঁদতে লাগলো। কোথায় গেল তার দৃঢ়তা—সেই নির্ভীক সাহস? সে যেন ছোট্ট একটি পাখী, ঝোড়ো হাওয়ায় পালকগুলি সব ছিন্ন-ভিন্ন। তার দিকে চেয়ে, তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার মনে যে কি হচ্ছিল তা বলতে পারি না। মুখে আমার কথা ছিল না, দুই চোখ দিয়ে শুধু ঝরণার ধারা বয়ে যেতে লাগ্‌লো।

খানিক পরে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে নন্দিনী ব'লে উঠলো,—শ্রীপতি, মন্দাকিনীর বাঁধ ভেঙে গেছে! আর দেরী নয়—পালাও!

রেল-ষ্টেশনের পথ মন্দাকিনীর ধার দিয়ে—আমি চলেছিলাম বাঁধের দিকে চেয়ে। বাঁধ ভেঙে কলকল ক'রে জল নেমে আস্‌ছে—জনপ্রাণী সেখানে নেই। কোথায় তারা? মনে হ'ল তারা যেন সব প্রকৃতির গুপ্ত শক্তি, মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল, আবার মাটিতে মিলিয়ে গেছে! এ যে চলন্ত জীবন্ত অনন্ত নদী! নন্দিনী ঠিক বলেছিল। তোমায় বেঁধে রাখতে চায় কোন খ্যাপা? কালকের জল আজ নেই, আজকের কণামাত্র কাল থাকবে না! বাঁধ ভেঙে গেছে—আছে শুধু তার কঙ্কাল!

একটু একটু ভোর হ'য়ে এসেছে। আমি রেল গাড়ীর একটি কামরায় উঠে বসেছিলাম। গাড়ী ছাড়বার আর বিলম্ব নেই। প্লাটফরমের দিকে চেয়ে দেখি, নন্দিনী! আপাদমস্তক একখানি সাদা ওড়না দিয়ে ঢাকা, শুধু মুখখানি ভোরের আলোয় দেখা যাচ্ছিল, বিষাদের প্রতিচ্ছবির মত!

সে বললে,—শ্রীপতি, তোমার মনে একটু স্থান রেখে দিও আমার জন্য। ঐটুকু আমার সান্ত্বনা।

আমার চোখ দুটি আবার জলে ভ'রে উঠলো। আমার কাছে চিরদিন সে যে সেই আদিযুগের মোহিনী!

গাড়ী ছেড়ে দিলে। রুমাল নাড়তে নাড়তে সে বললে, বিদায়!

যতদূর দৃষ্টি যায় আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। ক্রমে প্লাটফরম অদৃশ্য হ'য়ে এলো। সে তখনো রুমাল নাড়ছিল।

* * * *

শ্রীপতির কাহিনী শেষ হইলে বন্ধুবর কহিলেন, সাহিত্যে বিচ্ছেদ মিলন হইতে স্বতন্ত্র নহে। বিচ্ছেদের মাঝে মিলনের আভাস এবং মিলনের মাঝে বিরহের বেদনা যেমন, উভয়ের মধ্যে আবার রূপের ঝঙ্কার তেমনি বাজিয়া থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যখন সেই রূপই রহিল না তখন বিয়োগ হইবে কাহাকে লইয়া? সুতরাং, অন্ত যদি ইহার একটা করিতেই হয় তবে বলিব, বিয়োগান্ত নয় মিলনান্তও নয়—এ একটা প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!

আঁখির মিলন

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

দুজনে যখন দেখা হোল চোখে চোখে,—
নহে ফুলবনে,—নির্জ্জনে নদীতীরে ;
কবিবর্ণিত নহে কল্পনালোকে—
স্বপ্ন-আলোক রাখেনি তাদেরে ঘিরে ;
জ্যোৎস্না আলোয় রচেনি ক' মায়াপুরী—
মিলনের কিছু ছিল না ক' আয়োজন,
বসন্তসখা করেনি ক' কারিকুরি
এই সে ধরনী ছিল চির পুরাতন।

শত দীপালোকে উজ্জ্বল সভাতল
জন-মুখরিত কল-কোলাহল মাঝে—
সহসা নয়ন বিস্ময়বিহ্বল
মিলিল দুইটি চকিত চাহনি মাঝে ;
মুহূর্ত্তকাল স্থির হোল দুটি আঁখি
পলকে সরমে আসিতে চাহিল নেমে,—
কি জানি—কি ভাবে--কে তারে ধরিল রাখি',—
চকিত দৃষ্টি আধ-পথে গেল থেমে।

দোঁহে দোঁহা পানে বিস্ময়ে চেয়ে রয়
কেহ পরিচিত নহে ক' কাহারো কাছে,
অপরিচয়ের মাঝে তবু মনে হয়
এ নূতন নয়—কি যেন বাঁধন আছে !
এ নূতন নয়—এ নূতন নয় ওরে—
এ চাহনি যেন কবে কার দেখা শোনা,
মনে হয় তাই—এ চির জীবন ধ'রে
এরি তরে বুঝি করিয়াছি আনাগোনা।

আঁখির মিলন

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

বাহির জগৎ লুপ্ত হইয়া গেছে—
অন্তর শুধু দৃষ্টিতে দেছে ধরা,
মুখে নেই ভাষা—চোখে ভাষা ধরা দেছে
নির্ব্বাক—তবু কত যে বাক্যভরা ;
এ কথা ভাবে না,—দুজনে যে কত পর
কি ভাবে বিভোর মৌন মুগ্ধ প্রাণ !
তাদের মিলন ? স্বপ্নের অগোচর,
মাঝখানে জাগে কি বিরাট্ ব্যবধান !

ভাঙিল স্বপন ;—স্পন্দন এল দেহে
নুইয়া পাড়ল চারিটি আঁখির পাতা,
উৎসব শেষে ফিরিল যে যার গেহে
দুটি বুকে নিয়ে কি অজানা ব্যাকুলতা !
রাত্রির সেই গভীর আঁধার বুকে
নিরালা শয়নে নিদ্রিত দুটি প্রাণ
দেখিছে স্বপন,—আর দুটি কালো চোখে
জাগিয়া রয়েছে কী নীরব অভিমান !

সারাদিন কাজে,—সারা নিশা ঘুম ঘোরে
সেই দুটি দিঠি ফেরে দুজনারি পিছু,
হয়তো এ দেখা— এ দেখাই চিরতরে—
হয় তো জীবনে বাকী রবে সব কিছু ;
কি যে পরিচয় ? কে যে ব'লে দেবে হায়,—
রবে দুইজনে চির রহস্যে ভরা !
দেখিতে কেমন ? কে দেখেছে চেয়ে তায়
দেখেছে কেবল কালো দুটি আঁখি-তারা ।

শয়নে—স্বপনে—নিদ্রায়—জাগরণে
সেই সে দৃষ্টি অনিমিখে চেয়ে আছে,
কে জানে কোথায়—কত দূরে দুইজনে—
তবু মনে হয় যেন তারা কত কাছে ;
মহাসাগরের অনুকূল স্রোতে ভেসে—
মুহূর্ত্ততরে এসেছিল কাছাকাছি,—
চ'লে গেল পুন কোন্ অজানার দেশে,
স্মৃতিটুকু শুধু রয়ে গেল বুকে বাঁচি' ।

যে-কে-সে

—গল্প—

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

লাল দীঘি,—উত্তর-পশ্চিম কোণে অন্ধকূপ !

ছবিটার বিশেষ কোনো অর্থ আছে ব'লে কারোই কোনোদিন মনে হয়নি,—জিরিয়ে জিরিয়ে অর্থ করবার মতো সময়ও কারো সস্তা নয়। মোড়ের মাথায় ট্রাম থেকে নেমেই অন্ধকার খোপ্‌রিতে গিয়ে মাথা গলাতে হয় ! বাইরে যে একটা প্রকাণ্ড আকাশ আছে—মনে করবার মতো কারো ফুরসৎ নেই। না থাক্, তাতে কারো কিছু ক্ষতি হয়েছে ব'লেও মনে করে না কেউ।

বাঁধা রাস্তা, ছোট পৃথিবী, বোবা আশা,—স্বল্পায়ু কেরাণীরা আছে বেশ। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে বউবাজারে প'ড়ে সোজা ডালহৌসি স্কোয়ারে গিয়ে ওঠা,—সমস্তটা পথ বিনয়ের [illegible] হ'য়ে আছে। ফিয়ার্ লেনের কাছে সেই বুড়ো রিক্সাওয়ালাটা কিরায়ার আশায় ব'সে ব'সে ঝিমোয়; চিৎপুরের মোড়টা পেরতেই সেই খোঁড়া ভিক্ষুকটা তেম্‌নি হাত পেতে ভিক্ষা চায় সেই একঘেয়ে সুরে,—কতদিন থেকে যে এমনি বলছে তার হদিস্ নেই,—না বদ্‌লেছে একটা কথা, না বা সুরের একটা টান ! আর কত দূর এগিয়ে এলেই কতগুলি অসহায় রোগা, পাণ্ডুর মুখ, পানে-ঠাসা তোব্‌ড়ানো গাল, চাল্‌শে চোখ, পাঁশুটে কপাল,—মুখের আগাগোড়ায় এমন একটা ঘোলাটে, ফ্যাকাসে ভাব ! সেই সস্তা রসিকতা, বাজে ফাজ্‌লামো, সেই ব'সে ব'সে কলম-চালানো,—পুরানো, পচা, ভেজাল !—এত বড় পৃথিবীতে ওদের আর কিছুই করবার নেই।

সেই ভিখিরিটার কাছে ওর কান্নার যেমন অর্থ নেই,—তেম্‌নিই।

দিন যায়,—ঐর মধ্যে এইটুকুই শুধু লাভ যে মাস ফুরোয়। ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে চেয়ে ওরা প্রত্যেকটি দিন গোণে,—সপ্তাহের আর ছ'টা কালো দিনের ওপর চোখ বুলিয়ে যেই রবিবারের লাল দিনটির কাছাকাছি আসে অমনি চোখ যেন খুসিতে ডাগর হ'য়ে ওঠে,—সেই দিনটির সম্ভাবনায় ওরা ব'সে ব'সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে,—শনিবার আপিস্ থেকে গিয়েই বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে ঠেসে ঘুম দিতে পারবে ভেবে তৃপ্তির শেষ থাকে না, কেন না রবিবার সকালে কেউ আর আপিসের দোহাই দিয়ে ঘুম ভাঙাতে গা ঠেল্‌বে না,—বাঁচা যাবে !

কিন্তু দিন কি সত্যিই কাটে ? তার বেদনা হয় ত' রাত্রির আকাশে তারার চোখে ফুটে ওঠে। কিন্তু, আকাশে তারা ওঠে,—এই খবর ক'টা কেরাণীই রাখে শুনি ?

আপিসে ঢুকেই নিজের চেয়ারটা টেনে বস্‌তে যেতেই—সেই মুখ ! একদিনো নড়চড় হয় না। সেই, সুতোয় বাঁধা নিকেলের চশ্‌মাটা নাকের ডগায় এসে ঠেকেছে, সেই কুঞ্চিত কুৎসিত মুখের ওপর একটা বীভৎস বিবর্ণতা, নীচের পুরু ঠোঁটটা চেপে রেখে দু'টো অপরিষ্কার লম্বা দাঁত চোখা হ'য়ে ঝুলে রয়েছে, বাঁ গালে প্রকাণ্ড একটা মাংসের ঢিপি, তার মাথায় বড় একটা আঁচিল,—ঐ মুখটা দেখ্‌লেই বিনয়ের সমস্ত গা কালিয়ে আসে; মনে হয়, ওঁর টুঁটিটা ক্যাঁক্ ক'রে চেপে ধ'রে ওঁকে একেবারে সাবাড় ক'রে দেয় ! বেঁচে থেকে ওঁর লাভ কি,—কি দরকার ? কৃপণ কুষ্ঠিত আকাশের যেটুকু করুণ আলো এ ঘরটিতে এসে পড়েছে, হাত বাড়িয়ে তাকে লুফে নেবার অধিকার ওঁকে কে দিল ? সাম্‌নে থেকে উনি স'রে গেলে বিনয় যেন ভালো ক'রে আরো একটু নিশ্বাস নিতে পারবে, খোলা জান্‌লা দিয়ে এক টুক্‌রো নীল আকাশ ওর দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত্তেই যেন চেনা ক'রে ফেল্‌বে। বুড়ো শিববাবুকে ওর মনে হয় যেন শ্মশান থেকে উঠে এসে চেয়ারে ব'সে একটু হাঁফ নিচ্ছেন !

অথচ লোকটার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভব্যতা নেই। ষাট ছোঁয়-ছোঁয়, কিন্তু ওঁর চরিত্রে না আছে বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য, না বা বয়সোচিত ব্যবধান। যৌবনে লোকটা দেদার খরচ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ক'রে ক'রে এখন একেবারে ফতুর দেউলে হ'য়ে গেছেন,—শুধু স্বাস্থ্যেই নয়, সহজ সামাজিক শ্লীলতায়ও। সমস্তটা মুখ ব্যাভিচারে চিম্‌সে হ'য়েও ধারালো আছে, দু'টো চোখে সমস্ত দুঃখের অন্তরালেও একটা অকৃত্রিম ধূর্ত্ততা, বুকের পাঁজরগুলি জ্বলে' জ্বলে' শেষ হ'য়ে এলেও ওদের তলাকার আগুন এখনো নেভেনি। হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তোলা, সার্টে একটাও বোতাম নেই, মুখে তাড়ির গন্ধ, থক্ থক্ ক'রে কেশে মেঝের ওপরই থুতু ফেলেন, আর সময় নেই অসময় নেই পকেট থেকে চাকা চাকা তালের মিছ্‌রি বার ক'রে কড়্‌মড়্ ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে খান,—কোনোদিন পকেটে ক'রে ক্যাঁকড়া-ভাজাও নিয়ে আসেন, দুটি মুড়ি-ও।

যৌবনে কা'কে নাকি উনি ভালোবেসেছিলেন! সে কথা জাঁক ক'রে বল্‌তে ওঁর একটুও লজ্জা নেই, বরং যেন খুব মজা পাচ্ছেন চোখ-মুখের এম্‌নি একটা ভাব করেন। বলেন—ভালোবেসেছিলাম বটে, কিন্তু তাকে মর্য্যাদা দেবার মতো আমার সাধনা ছিল না, সাধ্যও ছিল না।

ওঁর সারা মুখে প্রতিহিংসার একটা কঠোর উগ্রতা আছে। সমুখের দাঁত দু'টো অত তীক্ষ্ণ হ'য়ে ঝুলে রয়েছে ব'লেই হয় ত'। চোখ বুজে' ওর কথা ভাব্‌লে খালি ঐ হিংস্র দাঁত দুটোই চোখে পড়ে।

বলেন—সাধে কি আর বাপ-মা সখ্ ক'রে আমার নাম শিব রেখেছিলেন?—শুধু ভাঙ্ খেয়ে টং হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বার জন্যই নয় হে—

গলা খাঁখ্‌রে পরে বলেন—কাঁধ দু'টোতে যে সতীর দেহভার ব'য়ে বেড়াবার ক্ষমতা ছিল তাও ওঁরা জান্‌তেন নিশ্চয়। কিন্তু সে মেহনৎ আর করতে হ'ল না। সেই কাঁধে আজকাল আপিসের ফাইল ব'য়ে বেড়াচ্ছি। বাঁচা গেছে। যাই বল ভাই, মরা মানুষের ওজন আছে কিন্তু।

সবাই উৎসুক হ'য়ে বলে—ব্যাপারখানা কি, শিব-দা? মদন-ভস্ম?

—ব্যাপারখানা সুরুতেই ভারি গুরুতর। দশ বছর প্রণয়ের রিহার্সেল দিয়ে দিয়ে ঠিক বিয়ের আগে সুরমা দেখা কর্‌তে এল,—করজোড়ে নিবেদন কর্‌লে,—আপনি আমার দাদা, আপনাকে চিরকাল দাদার মতই পূজো ক'রে এসেছি। বল্লাম—সে কি সুরমা? সেদিনো যে কবিতায় প্রেমনিবেদন ক'রে চিঠি লিখেছ? সুরমা বল্লে—ওসব ছোট বোনজ্ঞানে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। বল্লাম,—বেশ। শেষকালে আমাকে তোমার স্বামীর কাছে শালা বানিয়ে রেখে গেলে?

সবাইর হাসি ও আগ্রহ আরো বেড়ে গেল, গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—চ'লে গেল সুরমা?

—সহজে কি যেতে চায় ভাই?—প্রণাম ক'রে যাবে। বল্লাম—সন্ধ্যাবেলা হাত পা ধুয়ে তক্তপোষের ওপর ব'সে আছি, পায়ে ধুলো ত' নেই; দাঁড়াও. বাইরে থেকে খালি পায়ে একটু ঘুরে আসি গে। ঘুরে এসে দেখি সুরমা ঘরে নেই। তখন মাইরি একটা সনেট্ লিখ্‌তে ইচ্ছে হয়েছিল, বুকটা একেবারে ফুটো হ'য়ে গেছে কি না,—সনেট্ লেখবার তুরীয় অবস্থা।

—তার পর?

—এর আবার তার পর কি? বছর কয়েক পরে নারেঙ্গাবাদ-এ দেখা। দেখ্‌লাম,—খাসা মোটা হয়েছে,—দিব্যি টাবা নেবু। একেবারে একটি নধর ঢোল, কিম্বা তারো রাজসংস্করণ—পিপে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ভগ্নীপোত্‌টির নাম শুন্‌লাম, কন্দর্পারি। নাম শুনে কিন্তু বিশেষ ভরসা হ'ল না, ভাই। কেন না, নামের সঙ্গতি রাখ্‌তে গিয়ে তাঁকে যদি সতীদেহ কাঁধে ক'রে বেড়াতে হয়, তা' হ'লেই হয়েছে!

সমস্ত নির্ম্মম ব্যঙ্গোক্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন একটি নিরানন্দতা আছে। ওঁর বিষাক্ত বীভৎস মুখের পানে চেয়ে সবারই একটা ভয়াবহ বিতৃষ্ণা জাগে বটে, কিন্তু কেমন একটা করুণাও হয়। ওঁকে ঘৃণা করা অসম্ভব।

ব'লে চলেন—কিন্তু ভগ্নীপোত্‌টির আমার সেই দায়িত্ব বইতে হ'ল না। ছোট বোন্‌টিকে পটল-সেদ্ধ খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে নিজে আল্‌গোছে একদিন পটল তুল্‌লেন। সেদিন সত্যিই স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লাম, বিনয়। ভাব্‌লাম, ওর বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিয়ের লগ্ন এসে পৌঁচেছে।

মুখের প্রত্যেকটি কর্কশ রেখা চোখকে বিদ্ধ করে। সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে ওঁর কথাগুলি যেন গিল্‌তে থাকে, কারু জিভের ডগায়ই প্রতিবাদের ভাষা জুয়ায় না।

একটু থেমে শিববাবু ফের বলেন—উনপঞ্চাশ বছরে বাত আর বউ ঘরে আন্‌লাম। তার পরের ইতিহাসটা আগের মত ক্ষিপ্ত না হ'লেও নেহাৎই সংক্ষিপ্ত। বউ বাতের ছুতোয় শয্যাশায়ী হ'য়ে রইলেন, বড় বড় ছেলে দু'টো মারা পড়্‌ল, একটা ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাত থেকে প'ড়ে—আরেকটা কালী-পূজোয় হাউই ছুঁড়্‌তে। একটা মেয়ে হয়েছে—একটুকুন, পাঁচ বছর বয়েস—কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত অবশ। শামুকের মতো বুকে হেঁটে হেঁটে চলে,—দেখ্‌তে সে ভারি মজার! মেঝের ঘষায় বুকে ঘা পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। তোমরা একদিন যেয়ো আমার বাড়ী। আমার মেয়ের বুকে-হাঁটা দেখে আস্‌বে। পয়সা দিয়ে দেখবার মতো। সত্যি।—শুধু কি তাই? ওর নাম রেখেছি ফুৎফুৎ। যদি বলি—ফুৎফুৎ, মা আমার! গালভরা হাসি ওর দেখে কে? ছোট ছোট দু'খানি হাত বাড়িয়ে আমার দাড়ি ধর্‌তে চায়। পারে না। ওর মুখের সাম্‌নে উবু হ'য়ে ব'সে ওর এই নিষ্ফল চেষ্টাটি উপভোগ করি। তোমরা যেয়ো একদিন।

শিববাবুর স্ত্রী বিছানায় শুয়ে শুয়েই পাড়া মাথায় করতে থাকেন। তখন অফিস-ফেরৎ শিববাবু মাত্র বাড়ী ঢুকেছেন।

—বলি, তোমার কি হায়া হবে না কোনোদিন? আমাকে তুমি এমনি শুইয়ে-শুইয়েই মার্‌বে নাকি? আমার সারা পিঠে ঘা হ'য়ে গেল সেদিকে ত' আজো নজর পড়্‌ল না? বুড়ো হ'য়ে কি চোখে ছানি পড়েছে? উঠে খেতে পারি না ব'লে কি উপোস ক'রে ক'রেই আম্‌সি হ'য়ে যেতে হবে? দাঁত বার ক'রে হাস্‌তে হয়, ত' কেওড়াতলায় গিয়ে হাস গে।

সুর ক্রমেই সপ্তমে চড়তে থাকে।

শিববাবু বলেন—তোমার আর আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো জিভ্‌টা যে কবে অসাড় হবে আমি ব'সে ব'সে তাই খালি ভাবি।

স্ত্রী আর্ত্ত চীৎকার ক'রে ওঠেন—দাও না, তাই দাও না, টুঁটিটা ধর না টিপে, জিভ্‌টা বেরিয়ে পড়ুক।

শিববাবু হেসে বলেন—ছি! স্ত্রীলোকের একচেটে অধিকার সেই বৈধব্য থেকে তুমিই বা বঞ্চিত হবে কেন? আর ক'টা দিনই বা সবুর করতে হবে?

ব'লে শিববাবু মাটি থেকে বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে আগুন দেবার চেষ্টা করেন। ধরাতে কি পারে ছাই!—রোজই এমনি হয়! মেয়েটাকে উপুড় ক'রে নামিয়ে রেখে চুপ ক'রে ফ্যানের টগ্‌বগ্‌ শোনেন। শোনেন-ই।

কোনো রকমে ভাত ডাল নামিয়ে একটা থালায় ক'রে খানিকটা নিয়ে স্ত্রীর মুখের কাছে এনে ধরেন। বলেন—প্রিয়ে, খাও।

স্ত্রী মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠেন—তোমার হাতের ছোঁয়া আমি খাব না। ব'লে মুখ সিঁটকোন।

স্বামী বলেন—আমার হাতের চড়-চাপড়ো ত' আর কম খাও নি। হাতের এ দুটো গরম ভাতও তোমার সইবে।

স্ত্রী তেড়ে বল্লেন—ফেলে দাও আস্তাকুঁড়ে।

মুখের কাছে থালাটা আরো একটু ঠেলে নিয়ে স্বামী বল্লেন—তাই ত' ফেল্‌ছি। হাঁ কর।

স্ত্রী দাঁতে দাঁত দিয়ে রইলেন।

শিববাবু বল্লেন—তোমাকে যতই কেন না ঘেন্না করি, এক বিষয়ে তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে,—তুমি মোটা নও ব'লে। ঢ্যাঙা আর ছিপ্‌ছিপে গড়ন আমার ভারি পছন্দ। তোমার এই অসুখটিকে তাই আমি অহরহ ধন্যবাদ দিই। নইলে, আমার কপালে তুমি একটি আস্ত পিপে হ'য়ে দাঁড়ালেই হ'ত আর কি! সন্ন্যেসী হ'তে হ'ত।

স্ত্রী মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন—চেলাকাঠ আর ঝাঁটার কাঠি দুইই ঢ্যাঙা আর ছিপ্‌ছিপে—

—সত্যি! এই উপমাটার জন্য তুমি ফুল্-মার্ক পেতে পার,—তোমার সঙ্গে ও দু'টোর যে খুব ভাল সাদৃশ্য আছে এ কথা আমার আগে মনেই হয়নি। নাও, খেয়ে নাও। কেন না রাগটা জুড়িয়ে খেতে গেলে দেখ্‌বে কপালদোষে ভাতটাও জুড়িয়ে গেছে। সে বোকামিটা তোমাদের ধাতে আছে কিনা।

যে-কে-সে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভাতের থালাটা বিছানার ওপর রেখেই শিববাবু উঠে এলেন।

স্ত্রী ভাব্‌লেন,—প্রতিশোধ একটা নিতে হবেই। কিন্তু না খেয়েই নয়। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, রাগের চেয়ে ক্ষুধার ধারই বেশি।

বিছানাটার কাছেই শিববাবুর সেই বোতামহীন ডোরাকাটা সার্টটা প'ড়ে ছিল। খেয়ে না আঁচিয়ে সেই সার্টটাতেই হাতের এঁটো রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মুছ লেন। কাল কি প'রে আপিসে যান, দেখা যাবে।

পাশের ঘরে শিববাবু মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে পায়চারি করছিলেন। আকাশে হয় ত' কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ছিল, ফাল্গুনের রাতে কুঁড়ির অন্তরালে কত কিশোরী রজনীগন্ধা হয় ত' প্রফুল্ল যৌবনের স্বপ্ন দেখ্‌ছিল,—কত কি হচ্ছিল, তার কি কিছু হিসেব আছে? অগুন্তি আশা, অফুরন্ত অন্ধকার, অঢেল অশ্রুজল! কিন্তু শিববাবু ভাবছিলেন মদের দোকানে গত মাসের দেনাটার কথা,—সব চুকিয়ে না দিতে পারলে গলায় একটি ফোঁটাও গল্‌বে না। কত বাকি আর মাস ফুরোতে?

দেশ্‌লাইটা জেলে ভালো ক'রে ক্যালেণ্ডারে তারিখটা দেখ্‌লেন। মোটে সাতুই আজ।

হঠাৎ আপিসে সেদিন শিববাবু বিনয়কে প্রশ্ন করলেন—আপনি বিয়ে করেছেন?

বিনয় বল্লে—করেছি বৈ কি। বিয়ে আবার কে না করে?

—বলেন কি! আপনাকে খুন করব, বিনয়বাবু!

বিনয় হেসে বল্লে—কেন? বিয়ে করেছি ব'লে?

শিববাবু শূন্যে একটা ঘুসি মেরে বল্লেন—নিশ্চয়ই। তেত্রিশ টাকার কেরাণীর আবার বিয়ে কি।

বিনয় বল্লে—পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই বুঝি টাকায় ধার্য্য হয়, শিববাবু? বিবাহ কি শুধু একটা বিলাস?

শিববাবু ভ্রুকুটি ক'রে বল্লেন—কে বলে নয়? অর্থটাই সেখানে প্রকাণ্ড উপসর্গ। কাটুন উপসর্গ,—থাকে কি তা' হ'লে? শুধু লাস। লাস-বাহক হওয়াটা খুব সুখের নয়।

বিনয় বল্লে—আপনি কি বল্‌তে চান, টাকাই ভালবাসার কম্পাসের কাঁটা? তেত্রিশ টাকার কেরাণীকে বুঝি কেউ ভালোবাস্‌তে পার্‌বে না?

শিববাবু অবাক হ'য়ে বল্লেন—আপনাদের দিনে ভালোবাসার বাজার-দর প'ড়ে গেছে বুঝি। তেত্রিশ টাকা?—বল কি হে? ভারি সস্তা ত'। মেলে ঐ দরে?

—এ আপনার বড় বাড়াবাড়ি, শিববাবু। সব জিনিস উড়িয়ে দেওয়াই আপনার ফাসান্। হরিশ্চন্দ্র যখন ভিক্ষুক হ'য়ে পথে বেরুলেন তখন শৈব্যার ভালোবাসা টিঁকিয়ে রাখ্‌বার জন্য তাঁর ট্যাঁকে তেত্রিশটা আধ্‌লাও ছিল না। ভুলে গেছেন বুঝি?

—কিছুই ভুলিনি ভাই। কিন্তু আজকালকার শৈব্যারা যে বেজায় সভ্য হ'য়ে পড়েছে। কত তেত্রিশ টাকায় একখানা রোল্‌স্‌রয়্‌স্ হয় মুখে মুখে হিসেব কষ্‌তে পার?

—ছাই রোল্‌স্‌রয়্‌স্! এক ফোঁটা অশ্রুজল শুধু।

মুখ গম্ভীর ক'রে শিববাবু বল্লে—আপনার ফাঁসির আরেকটা চার্জ্জ পাওয়া গেল, বিনয়বাবু! আপনি আজকাল নিশ্চয়ই কোনো ছিঁচ্‌কাঁদুনে কবিতা পড়্‌ছেন। কেরাণীর আবার ও বালাই কেন? চালাবেন কলম, শুয়ে শুয়ে বউএর মেরুদণ্ডে ঘা হ'লে লাগাবেন মলম। খালি এই দুই কাজই ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি।

খানিক থেমে ফের বল্লেন—ধরুন, আপনারো একটা উপসর্গ আছে,—আপনি গ্রাজুয়েট্। কাটুন আপনার উপসর্গ,—কি থাকে? নয়, নয়, নয়! তেত্রিশ টাকাও নয়।

তর্কের খাতিরেই হয় ত' তর্ক করা,—নইলে বিনয় কি জানে না সব?

জীবনে যে সব বাড়্তি আশা ছিল সব কেটে কুটে মানানসই ক'রে 'এই তেত্রিশটাকার কেরাণীগিরির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। টিকে থাক্‌বার জন্য আলো আর হাওয়াটুকুও হিসেব ক'রে কিনে নিতে হয়,—দোকানি একটি কাণাকড়িও ভুল চুক করে না। যে সমস্ত চোখা ও ধারালো আকাঙ্ক্ষা ছিল ভাগ্য তার লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সব ভোঁতা ক'রে দিয়েছে। পরিচিত জুতোর মধ্যে পা গলালেই যেমন তাকে আত্মীয় ব'লে মনে হয়, তেম্‌নিই এ জীবন। কোথাও একটুকু ব্যতিক্রম নেই—নিটোল, নিভাঁজ। ছিঁড়ে গেলে ফের তালি লাগিয়ে নিতে হয়।

যেমন, প্রথম পক্ষটি মুক্তপক্ষ হ'য়ে পলাতক হ'তেই বিনয়ভূষণ ফের তালি লাগিয়ে জীবনের ফাঁকাটা ভরাট্ ক'রে তুলেছে। রাণীহীন কেরাণী লক্ষ্মীহীন প্যাঁচারই সামিল।

এক খুনে ডাকাত নাকি একবার সন্ন্যাসীর গেরুয়া প'রে ফেরার্ হয়েছিল। মজা এই, সংসারে আর নাকি ফেরবার নামও করেনি,—ঝুলি নিয়েই ঝুলে পড়েছে। তেম্‌নি ধারা বিনয়ভূষণও কেরাণীর মুখোস প'রে ঠিক তারই মধ্যে মুখের ডৌলটি মানানসই ক'রে নিয়েছে—মুখের মধ্যে এম্‌নি একটা হতাশা, এম্‌নি একটা মালিন্য।—এপারে ওর এই পুরোনো বালি-খসা নড়্‌বড়ে ঘরের মধ্যে নড়্‌বড়ে তক্তপোষটি; ওপারে ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে প্রায়ান্ধকার ঘরে একখানা ছারপোকাসঙ্কুল চেয়ার—জীবনের ওর সদর রাস্তার টার্মিনাস্ ঐ পর্য্যন্ত। এর বাইরে কোথায় এরোপ্লেনে ঠোকাঠুকি লাগ্‌ল, কোথায় কোন্ দেশ যুদ্ধের সাঁজোয়া প'রে সঙিন্ উঁচিয়ে ব্যাপার সঙীন্ ক'রে তুলেছে, মড়ক লেগে কোথায় সমস্ত সহর শূন্য সড়কে রূপান্তরিত হ'ল—এ সব বাজে খবরে ওর প্রয়োজন নেই। আজকাল বাঙ্‌লা দেশে নিবারণ চক্রবর্ত্তী নামে যে একজন অমিতশক্তিশালী কবি উঠেছেন, ও তার খবরই রাখে না। রাখ্‌লেও, ওকে আস্‌তে দেখে বারণ কর্‌তে বা বরণ কর্‌তে কোনটাতেই ওর স্পৃহা নেই।

অথচ তর্কের মুখে মুখ বুজে' থাকা ওর ধাতেই নেই,—সব বিষয়ে মত জাহির করা চাইই। সে মত যেম্‌নি পুরোনো তেমনি পচা,—তার মধ্যে একটা উৎকট উগ্রতা আছে। মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে ও খড়্গহস্ত, স্ত্রী-স্বাধীনতা ওর দু' চোখের বিষ, তপোবল যতটা না হোক্ তপোবনই ও বেশি পছন্দ করে। বিধাতা ওকে যেন ফর্‌মায়েস দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা। ড্যালহৌসি স্কোয়ারের চার পাশের রাস্তাগুলো'তে লোক কিল্‌বিল্ কর্‌ছে। আপিস্ ভেঙে গেছে; বউবাজারের সরু ফুট্‌পাথ্ ধ'রে কেরাণীরা সার বেঁধে মার্চ্চ ক'রে চলেছে,—কাঁধে ছাতি। যেন যুদ্ধ জয় ক'রে ফির্‌ছে।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় ওর ঘরের কি অবস্থা ও বেশ ভেবে নিতে পারে। বড় ছেলেটা আজ ন' দিন ধ'রে জ্বরে পুড়্‌ছে,—এক ফোঁটা ওষুধ পড়ে নি। ছোট মেয়েটা ট্যাঁ ট্যাঁ কর্‌ছে নোংরা মেঝের ওপর প'ড়ে,—অবাঙ্মুখী চারু নিঃশব্দে ঘরের কাজ ক'রে যাচ্ছে ক্ষিপ্রপদে,—পরনের কাপড়টা সেলাই-করা, দু'টি হাতে খালি দু'টি শাঁখা, নাকের উপর একটা নাকছাবি আছে ব'লেই মুখখানিকে বেশি করুণ মনে হয়!—নিশ্চয়ই এখন উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে, সমস্ত পাড়াটাই যেন দম বন্ধ ক'রে আছে, কাঁচা ড্রেনের ওপর মশাগুলি গুঞ্জন ক'রে ফির্‌ছে।

চিরাভ্যস্ত পদক্ষেপে বিনয় এগুতে থাকে।

মাসের পনেরোই,—মেল্‌ডে। কাগজের তাড়া থেকে মুখ তুলে শিববাবু বল্লেন—যাই বলুন, আপনাদের পরম ধার্ম্মিক ভগবানবাবুটি আর যাই হোক্ ভারি বেরসিক।

কথাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে ঠাওরাতে না পেরে বিনয় কলম থামিয়ে চুপ ক'রে রইল।

শিববাবু ঘৃণার হাসি হেসে বল্লেন—দরকার হয়নি ব'লেই আপনাদের ভগবানবাবুটিকে খোসামোদ করি নি, তার জন্যেই বোধ হয় এমন একটা খেলো রসিকতা কর্‌লেন। আমার মত্ন গরীব গোবেচারার ওপর হাত না তুল্‌লে বুঝি তাঁর ভদ্রতার লাঘব হ'ত। বলিহারি!

বিনয় বল্লে—ব্যাপার কি?

—ব্যাপারটা জলের মতোই তরল ও সোজা। বড় বাবু বল্লেন—এই দিন পনেরো ফুরুলেই আমাকে তল্‌পি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গুটোতে হ'বে। বল্লেন—বুড়ো নিয়ে আর কাজ চল্‌বে না, এম্‌ এস সি আস্‌ছেন। মনে মনে বল্লাম—তোমাদের ভগবানবাবুটির ত' বয়সের গাছ পাথর নেই, তাঁকে খারিজ করবার কারু মুরোদ নেই ব'লেই বুঝি আমার ওপর তম্বি! বড়বাবু বল্লেন—ডিস্‌মিস্‌। বল্লাম—সেলাম, গুড্‌মর্ণিং। এমন ভাবে ডিস্‌মিস্‌ কথাটি বল্লেন যেন আমাকে মোলায়েম কিস্‌মিস্‌ খেতে দিলেন।

বিনয় ব্যথা পেয়ে ব'লে উঠ্‌ল—চাকরি গেল, শিববাবু?

টেব্‌লের ওপর কলমটা ছুঁড়ে ফেলে শিববাবু বল্লেন—শুধু কি চাক্‌রি? সকালে-বিকালে দু' পেয়ালা চা পর্য্যন্ত। বেতো স্ত্রী, বিকল শিশু। সংসারে আর রইল কি?

বিনয় কঠিন ক'রে বল্লে—সংসারে যা ছিল তা নিয়ে কোনো দিনই ত' আপনাকে গর্ব্ব করতে দেখি নি। স্ত্রী পিট্‌টান দিলে আপনিও যে বুক টান্‌ ক'রে আপনার নামের মর্য্যাদা রাখ্‌বার জন্য কিছু ব্যস্ত হবেন তেমন দুর্ব্বলতা ত' আপনার চরিত্রে নেই। আপনার ভাবনা কি?

শিববাবু বল্লেন—স্ত্রী পিট্‌টান দিলে শ্মশান থেকে তাঁর শ্রাদ্ধবাসরের পথটুকু হাঁট্‌তে গিয়েই আমাকে সটান্‌ শ্রীঘরে গিয়ে ঘরজামাই হ'তে হবে,—ভাবনাটা তারি জন্যে। বিয়োগান্ত নাটিকায় আমি পেছ্‌পা নই বিনয়বাবু, খরচান্ত নাটিকাতেই আমার ভয়।

হঠাৎ কণ্ঠস্বরটা কোমল ক'রে বল্লেন—কিন্তু মুঠির মধ্যে থেকে একজন এম্‌নি ফস্‌কে যাবে এও যে সয় না, বিনয়বাবু। বহু বছর আগে এম্‌নি এক দিন এক জন ভোজবাজির মত উবে গিয়েছিল! মানুষের নাগালটা এত ছোট, মুঠি দুটো এত দুর্ব্বল কেন? বারে বারে ভাগ্যের কাছ থেকে এ হার আর হাত পেতে নিতে পারি না।

বিনয় ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বল্লে—নিতে পার্‌বেন না জেনেও ত' অনেক জিনিস নিয়েছিলেন, শিববাবু। এ হারও তাই নিতে হবে।

—নিতে হবে। সেইটেই কথা, তিরস্কারের নয় বিনয়বাবু, বেদনার। শত চেষ্টা ক'রেও রাখা যায় না।

—রেখে লাভ?

—এম্‌নি রাখার জন্যে রাখা,—রাখ্‌তে পারার মধ্যে ভারি একটা গৌরব আছে। যেতে দিতে তবু যে মন চায় না। কিন্তু আমি রেখে দিতে চাই,—আমার বেতো স্ত্রীকে, কাঙাল শিশুটিকে, যেমন আজো এই বুড়ো বয়সেও সেই বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবনের প্রথম দুঃখটিকে রেখে দিয়েছি।

শিববাবুর চোখে জল ভ'রে আসে বুঝি, বিনয় হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে থাকে।

শিববাবু চোখের জলটা রুখে রেখে বল্লেন—আজ আমার গতযৌবনা কাহিল কঙ্কালসার স্ত্রীর শুক্‌নো কুৎসিত মুখের পানে চেয়ে যেন নিজের জীবনের শূন্যতাটাকে মুখোমুখি ক'রে দেখ্‌লাম। তার সীমা কে নির্দ্দেশ কর্‌বে?

আপিস্‌ ছুটি হ'তেই শিববাবু কুঁজো হ'য়ে ছাতি বগলে ক'রে আস্তে আস্তে পথ চল্‌তে সুরু কর্‌লেন। কোন্‌ পথে বাড়ী যেতে হবে তারো যেন হদিস্‌ নেই,—কোথায় এর শেষ, তারো ঠিকানা নেই কোনো। গিয়ে আবার উনুন ধরাতে হবে, সকালে আপিসের তাড়াতাড়িতে এঁটো বাসন ক'টা মাজা হয় নি, তাই মাজ্‌তে হবে গিয়ে,—মেয়েটা হয় ত' কাঁদ্‌ছে আর বুকে হেঁটে হেঁটে বাপকে হয় ত' এ-ঘরে ও-ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে! তাকেও একটি বার কোলে নেওয়া চাই।

সেদিন বিনয়কে শিববাবু বলেছিলেন—আপনার কি, জোয়ান বয়েস, এক দিন সংসারে বীতস্পৃহ হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌বেন। গৌতম যদি পৃথিবীর কাছে ক্ষমাভাজন হ'য়ে থাকে, আপনিও হবেন।

বিনয় বলেছিল—আপনার ত' মহাপ্রস্থানের সময় এগিয়ে এসেছে শিববাবু, বাণপ্রস্থ নিয়ে ভেসে পড়ুন না।

কি জানে বিনয়? বিকলাঙ্গ অবোলা শিশুর কী কাকুতি,—রোগা পঙ্গু মুমূর্ষু স্ত্রীর কাতর দৃষ্টির কী গভীরতা!

শিববাবু চোখ ছাড়িয়ে যেতেই বিনয়ের মনে হ'ল—লালদীঘি কথাটার মধ্যে একটা রূপক প্রচ্ছন্ন আছে। দীঘির জল কেরাণীরই রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছে! উত্তর-পশ্চিম কোণে অন্ধকূপ,—ওদেরই কিংস্‌টন্‌ কোম্পানির

আজকের ঘটনা সুদূর ভবিষ্যতে যখন পুরাতত্ত্ব হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন এই হবে তার ব্যাখ্যা।

মাস ফুরোয়,—কুণ্ঠিত স্মিত মুখে নূতন মাসের প্রথম তারিখটি যেন বহু যুগ পরে হেসে এসে দেখা দেয়।

শিববাবু বল্লেন—আজই শেষ, বিনয়বাবু।

বিনয় যেন চম্‌কে ওঠে—কিসের?

—আমার চাক্‌রির, আমার স্ত্রীর।

—আপনার স্ত্রীর মানে? কেমন আছেন তিনি?

—সকাল থেকেই শ্বাস উঠেছে। টেঁসে যাবে এবারে।

—বলেন কি? তবে এসেছেন কেন?

একটু হেসে শিববাবু বল্লেন—এসেছি কেন? চল্লিশটা টাকার জন্যই ত' সব,—মরন্ত স্ত্রী, বিকলাঙ্গ শিশু। তাকে আর অর্জ্জন করতে না পার্‌লেও বর্জ্জন করতে ত' পারিনে।

বিনয় বল্লে—আচ্ছা, এখন চলুন বাড়ী, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

হাত জোড় ক'রে শিববাবু বল্লেন—মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমার জন্য কষ্ট সইতে হবে না আপনার। ব'লেই চোখের নিমেষে শিববাবু খ'সে পড়্‌লেন। বিনয় থ হ'য়ে রইল।—ভাব্‌লে, বুড়োর বড়াই এবার ঘুচেছে।

যেমন-কে-তেমন,—আস্তে আস্তেই পা চালিয়ে চল্‌ছিল—অন্যমনস্ক, উদাসীন। হঠাৎ একটা মোটর গায়ের ওপর হুড়্‌মুড়িয়ে পড়ছিল আর কি! আচম্‌কা মোটর থেকে কে ডেকে উঠ্‌ল—আরে, বিনয় যে!

কলেজের বন্ধু,—সৌরীন। হাওয়া খেতে চলেছে, পাশে নবপরিণীতা স্ত্রী। সপ্রতিভ সুন্দর মেয়েটি!

বিনয় বল্লে—বহুদিন পরে খুব জাঁকালো রকমই সম্ভাষণ করছিলে, ভাই! কেমন আছ?

স্ত্রীর সুন্দর মুখখানির পানে চেয়ে সৌরীন বল্লে—চমৎকার। আর তুমি?

—ছ্যাকড়া গাড়ি। তোমাকে দেখে ভারি খুসি হলাম। মোটর কবে কিন্‌লে?

—মেয়েকে মোটরে চড়িয়ে বেড়াবার জন্য শ্বশুর যৌতুক দিয়েছেন। আচ্ছা, যাই।

ততক্ষণে সোফার্‌ ষ্টার্ট দিয়েছে। মোটর বেরিয়ে গেল।

সেই দিকেই খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিনয় আপন বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটি বাক্যহীন অস্পষ্ট বেদনা অনুভব করলে। হাওয়ায় মেয়েটির চুল ও ঘোম্‌টার ওড়া থেকে পশ্চিম আকাশে প্রথম অস্ফুট তারাটির ফোটার মধ্যে যেন একটি সুমধুর সুখাবেশ আছে। এই স্তিমিত সন্ধ্যালোকে আকাশের নীচে ওদের জীবনের এই নিভৃত মুহূর্ত্তগুলি খালি একলা ওদেরই! কোথাও এতটুকু বাধা নেই, না বা এতটুকু আড়াল! মেয়েটির মুখে কি অপরিসীম তৃপ্তি, সৌরীনের চাপা ঠোঁটের কোণে কি উজ্জ্বল অহঙ্কার! সব, সব মিছে,—সমাজ, সংসার, শ্মশান,— সমস্ত। আজ্‌কের সন্ধ্যায় এই সুনিবিড় অন্তরঙ্গতার তুলনা কোথায়?

পকেটে তিনখানি দশটাকার নোট, আর তিনটি খুচ্‌রো টাকা। এই টাকা তিনটি ও অপব্যয় কর্‌বে। ও ট্যাক্সি ক'রে চারুকে হাওয়া খাইয়ে আন্‌বে। হিসাবের খাতায় খরচের ঘরে এত বড় রাহাজানি জীবনে কোনোদিন হয় নি, না হোক্‌; এই ডাকাতির বিরুদ্ধে ও বিবেকের কোনো ডাকেই কান দেবে না। শুধু চারুকেই চৌরঙ্গী আর গড়ের মাঠ দেখিয়ে আন্‌বার জন্য নয়, নিজেকেও ও ভালো ক'রে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশ দেখিয়ে আন্‌তে চায়,— প্রিয়া নারীর অন্তর্লীন রহস্যটি উদ্ধার ক'রে নিতে চায়, ও চায় ক'টি মুহূর্ত্তের জন্য ওর কেরাণী-জীবনের গ্লানি ভুলে যেতে, চারুর ম্লান দু'টি চোখের মণি কৌতুকে কলহাস্যে সান্নিধ্যে চুম্বনে চঞ্চল ক'রে তুল্‌তে।

মনে অফুরন্ত খুসি নিয়েই ও চলেছে,—হঠাৎ পাশে থেকে কে ডাক্‌লে—বিনয়বাবু!

চেয়ে দেখ্‌লে—শুঁড়ির দোকান। বেজায় ভিড় লেগেছে। কে ডাকে ওখান থেকে?

মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখ্‌লে,—শিববাবু! মদ খেয়ে চুচ্চুরে মাতাল হ'য়ে ব'সে আছেন,— হতশ্রী চেহারাটায়

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এমন একটা দুর্ব্বিবহ কদর্য্যতা আছে যে গা রি রি ক'রে ওঠে।

বিনয় একটু এগিয়ে এসে বল্লে—এ কি হচ্ছে, শিববাবু? আপনার স্ত্রী মর-মর, আর আপনি—

শিববাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—আরে ভাই, এম্‌নিই যাবে, এতক্ষণে কাবার হ'য়েও গেছে হয় ত'। মিছিমিছি ডাক্তার ডেকে কতগুলি গর্‌চা দিই কেন? কতদিন ধ'রে গলাটা কাঠ হ'য়ে ছিল, খবর ত' রাখ না? নিজের প্রাণ উৎসর্গ করাটা যত বড়ই মহৎ কাজ হোক্ না কেন দাদা, আত্মরক্ষা করাটা তারো চেয়ে মহৎ।

বিনয় বল্লে—আপনি যে এত বড় পাষণ্ড জান্‌তাম না।

শিববাবু না চ'টেই বল্লেন—কোনোদিন ত' খাওনি, তাই ওর যাদুও জান না। পাষণ্ডই বটে। আরে ভাই, মদ না খেয়ে যে শ্মশানে মড়া পুড়্‌তে পারি না আমি। খালি মদই ত' দেখ্‌বে, মন ত' দেখ্‌বে না ছাই।

বিনয় বল্লে—সব টাকাটাই গেছে?

—এই শেষ পাত্তর্। একটা ফুটো পয়সাও নেই। খাবে ভাই একটু?—মিষ্টি!

বিনয় গর গর করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তা'রি জন্যেই আজ্‌কের দিনে চারুর মুখে গালে ঠোঁটের কোণে ও হাসির হাস্‌নুহানা ফোটাবে এই ওর পণ। শিববাবুর স্ত্রীর মতো যদি অভিমান ক'রে ও-ও মৃত্যুর অভিসারিণী হয়! নারীজাতির ওপর শিববাবুর এই মর্ম্মান্তিক অপমানের ও প্রতিশোধ নেবে। যে চারুকে অবহেলায় দূরে ঠেলে রেখেছিল তাকে আজ ও আদরে, স্নেহের ঐকান্তিকতায় ডুবিয়ে দেবে। চারু তা'র অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুক ওর হাত ধ'রে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও চায় না বটে,—কিন্তু খালি আজ্‌কের সন্ধ্যাটুকুর জন্য যদি একটু ব্যতিক্রম হয় তাতে গোটা মোটা মহাভারতটাই অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না।

সেই উনুনের ধোঁয়া, সেই ছোট মেয়েটার প্রাণান্তকর চেঁচানি, সেই ড্রেনের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ,—কিন্তু বিনয়ের মুখে বিরক্তির চিহ্নটি পর্য্যন্ত নেই। প্রশান্ত লাবণ্যে মুখ ছেয়ে গেছে। বল্লে—চারু, মাইনে পেলাম, নাও, রাখ।

চারু তার পেলব করতলে টাকা কয়টি গ্রহণ কর্‌লে। চাবি দিয়ে টিনের বাক্সটি খুলে কাপড়-চোপড়গুলির তলায় যত্ন ক'রে টাকা কয়টি রেখে দিলে।

হঠাৎ বিনয় বল্লে—ট্যাক্সি ক'রে বেড়াতে যাবে, চারু?

ওর চোখে ভাস্‌ছিল সৌরীনের গর্ব্বোজ্জ্বল প্রদীপ্ত মুখ ও তার পাশে তার অকুণ্ঠিতা স্বল্পাবগুণ্ঠিতা নববধূটির কথাভরা দু'টি চোখের স্বচ্ছ আভা! পৃথিবীতে উনুনের ধোঁয়া আর ড্রেনের গন্ধই ত' সব নয়!

বিনয় বল্লে—চল, বেরিয়ে পড়ি, একখানা ফর্সা দেখে শাড়ি প'রে নাও। আছে ত'?

চারুর চোখে মুখে খুসি উপ্‌চে পড়্‌তে লাগ্‌ল, বল্লে—হঠাৎ এই সখ্?

—সখ্‌টা হঠাৎই হয় চারু,—কতদিন যে ফাঁকা আকাশ দেখিনি, তুমি গুণে বল্‌তে পার্‌বে না। চল, দেরি করো না।

মেয়েটা তখনো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। মেয়েটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে তাকে একটু আদর কর্‌লে, বাপের হাতের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আদর লাভ ক'রেও মেয়েটা কণ্ঠ থামিয়ে নীরবে বাপকে ধন্যবাদ জানালে না। বিনয় বল্লে—নন্দার কাছে রেখে এস।

নন্দা বিনয়ের ছোট বোন। শ্বশুরবাড়ী থেকে দাদার বাড়ী বেড়াতে এসেছে।

চারু বল্লে—ঠাকুর-ঝিকে নিয়ে গেলে হয় না?

বিনয় হেসে বল্লে—তোমার যেমন বুদ্ধি! আজ্‌কের দিনে পৃথিবীতে খালি আমি আর তুমি, সেখানে আর কেউ নেই।

চারু অবাক হ'য়ে বল্লে—সে কি! খুকীকেও নিয়ে যাব না?

—না। ওকে তক্তপোষের নীচে না হয় ফেলে রেখে চল, শিগ্‌গির! ভাব্‌বে, আমাদের সংসার নেই, সমাজ নেই, শাসন নেই,—খালি আমরা, আমি আর তুমি! ওপরে চলেছে তারার সারি, নীচে শুধু আমরা দু'জনে।

বিনয়ের যেন কি হয়েছে। চারু কিছু ঠাহর করতে না পেরে পাশের ঘরে চ'লে গেল।

নন্দা ব'সে ব'সে বিনয়ের আগের পক্ষের বড় ছেলেটার মাথায় পাখা করছে। চারু ঘরে ঢুকে ক্রন্দনরত মেয়েটাকে নন্দার পাশে বসিয়ে দিয়ে বল্লে—রাখ্‌তে বল্লেন উনি।

নন্দা পাখা থামিয়ে বল্লে—মহারাণী প্রজাপালনে ইস্তফা দিলেন নাকি?

—আমাকে উনি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন ট্যাক্সি ক'রে—

—বল কি? হাওয়া-গাড়িতে? কত খরচ পড়্‌বে, জান?

—সে হিসেব উনি কর্‌বেন।

—জান, যেই টাকাটা অমনি হাওয়ায় উড়োবে তা' দিয়ে এই রোগা ছেলেটার মুখে দু'চামচে ওষুধ পড়্‌ত। বেচারার মুখপানে চেয়ে দেখেছ একটিবার? পেটে ধর নি ব'লে কি একটু মমতাও হ'তে নেই?

চারু বল্লে—মোকদ্দমা করতে হয় ওঁর সঙ্গে কর গে।

ব'লে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে পিঠে দুম্ দুম্ ক'রে কিল্ বসিয়ে ওর কান্না আরো চড়িয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—তুই মরিস্ না কেন হতভাগি? তুই মর্‌লেই ত' আমার হাড় জুড়োয়! তোর কেন জ্বর হয় না, তুই কেন চোখ বুজিস্ না?

মেয়েটাকে যত মারে, যতই কোল থেকে নাবিয়ে দিতে চায়, ততই ও কাঁদে আর মায়ের আঁচল আঁকড়ে ধরে। তার পর মেয়েটাকে জোর ক'রেই ঠেলে দিয়ে চারু কাপড় বদ্‌লাতে গেল।

বিনয় মোড় থেকে ট্যাক্সি ধ'রে আন্‌তে গেছে।

যখন ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল, মেয়েটা তখন চেঁচিয়ে সমস্ত বাড়ী মাথায় করেছে। বিনয় বল্লে—মেয়েটাকে নিয়েই চল সঙ্গে ক'রে। সব মাটি।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। মেয়েটার কান্না তবু থামে না। চারু মেয়েটার কান্না থামাবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

বড় রাস্তায় পড়েছে। চারু বল্লে—ঠাকুরঝি খুব টাস্ টাস্ কথা শুনিয়ে দিল। সোয়ামি বড় চাকুরি করে ব'লে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।

বিনয় প্রশ্ন করলে—কি বল্‌ছিল?

—বল্‌ছিল, ছেলেটা মর্‌ছে, আর ওঁরা দেবা-দেবী হাওয়া খেতে যাচ্ছেন। কী ফুটুনি ক'রে ফোঁড়ন দিয়ে কথা বলা!

বিনয় হেসে বল্লে—ও সব কথা আজ্‌কের জন্য ভুলে যাও, শিকেয় তুলে রাখ;—ছেলের অসুখ, বাড়ীভাড়া বাকি, মুদি কাল শাসিয়ে গেছে;—সে সব আর কারুর, আমাদের নয়। আমাদের দেহে প্রচুর স্বাস্থ্য, সিন্দুকে মেলাই টাকা—আমরা ট্যাক্সি চড়ছি। বেশ পা ছড়িয়ে গা মেলে বোস। জবুথবু কেন?

চারু বল্লে—আপিসের বাবুকে ব'লে তোমার মাইনে বাড়িয়ে নাও না। আমায় অন্তত একজোড়া দুল্‌ও কিনে দাও না। দেখেছ, শাড়িটা ফর্সা হ'লে কি হ'বে, আঁচলের দিকটা কি রকম ছেঁড়া। একটা নিকার্ ছাড়া মেয়েটার একটাও জামা নেই।

বিনয় বল্লে—ও সব কথা ছেড়ে দাও এখন। বাড়ীতে ব'লো যত খুসি।

চারু ফের ঘটা ক'রে বল্‌ছিল—রায়দের বাড়ীর কাণ্ডখানা শুনেছ ত'?—

বিনয় বাধা দিয়ে বল্লে—ও সব কথায় এখন কি দরকার?

রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। বিনয় ভাব্‌ছিল,—এ নয়, এ ও চায়নি। হঠাৎ বল্লে—আচ্ছা, এ কি হ'তে পারে না যে তুমি চারু নও, আর কেউ—আমিও বিনয় নই, আর কেউ। হতে পারে না, না?

খালি মনে পড়্‌ছিল,—শিববাবুর সেই লোলুপ বিকৃত মুখচ্ছবি নয়, সৌরীনের দাম্ভিক অথচ সুন্দর মুখকান্তি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি ও উড়্‌নি, কেমন পরিপাটি ক'রে চুল আঁচড়ানো, হাতে সোনার ঘড়ি। পাশে যেন একটি ফুলের গেলাস!

নয়, নয়। এ ও চায়নি। যাকে ও চায় তাকে ও চেনে না, নাম জানে না,—যে আজ এত কাছে ব'সে থেকেও দূর থাক্‌বে,—যার সমস্ত নিঃশব্দতাই বাঙ্ময়, যার দূরত্বের মধ্যেও সুনিবিড় সান্নিধ্য আছে। কে সে? বিনয়ের ছোট পৃথিবীটিতে কোনোদিন তার পদচিহ্ন পড়েনি।

বিনয় মুখ বাড়িয়ে সুমুখে কি দেখ্‌ছিল।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চারু ততক্ষণ অনর্গল কণ্ঠে তার সাংসারিক অভিযোগ বিবৃত করছিল। মাসে ধ'নে-সর্ষের খরচ থেকে সুরু ক'রে রায়েদের মেয়ের হাতের পনেরো ভরি সোনার ডায়মনকাটা বালা পর্য্যন্ত! বুলি পাড়া থামিয়ে বল্লে—কি দেখ্‌ছ?

বিনয় বল্লে—দেখ্‌ছি, মিটারে কত উঠ্‌ছে। দেড় টাকা হ'লেই ফির্‌তে হবে। তিন টাকার বেশি হ'লেই গেছি আর কি!

এর খানিক বাদেই ড্রাইভারকে ও বল্লে—ফের'!

চারু বল্লে—এরি মধ্যে?

বিনয় বল্লে—আজ্ঞে হাঁ।

চারু বল্লে—টাকা ত' সঙ্গে আনো নি।

—বাড়ী ফিরে গেলেই দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা ভাব্‌ছি, অমনি পায়ে হেঁটে যখন বেড়াই তখন কত চেনা লোকের সঙ্গেই যে অকারণে দেখা হ'য়ে যায়। আজ্‌কে আমার এই সৌভাগ্যের দিনে রাস্তায় কি কেউ নেই যে এই পরম আশ্চর্য্যকর ব্যাপারটি তাদের খাতায় নোট্‌ ক'রে রাখে? তুমি আমার স্ত্রী নও, এমনি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রিয়া,—এ কথাও ত' কেউ কেউ ভুল ক'রে ভেবে নিতে পারে! সেদিক দিয়ে আজ আমার পরম দুর্দ্দিন, চারু। স্ত্রী ছাড়া তুমি আর আমার কেউ নও,—আর কারু চোখেও আর কিছু নও। এই আমার ভয়ানক দুঃখ!

মিটারে যখন দু' টাকা উঠেছে, হঠাৎ একটা চাকা দারুণ আর্ত্তনাদ ক'রে ফেটে ফেঁসে গেল।

বিনয় ব'লে উঠ্‌ল—এই যা! উপায়?

ড্রাইভার বল্লে—অন্য গাড়ীতে যান্‌। ব'লে প্রাপ্য টাকার জন্যে হাত পাত্‌লে।

বিনয় বল্লে—টাকা সঙ্গে নেই, আমার বাড়ী যেতে হ'বে।

ড্রাইভার কিছুতেই রাজী হয় না। এই নিয়ে একটা তুমুল কোলাহল বেঁধে গেল,—ভিড়ের মধ্যে চারু আকণ্ঠ ঘোম্‌টা টেনে ক্রন্দনরত মেয়েটার মুখ চেপে ধ'রে নিঃশব্দে ঘাম্‌তে লাগ্‌ল।

অবশেষে পাঁচ জনের মধ্যস্থতায় ঠিক হ'ল ড্রাইভারকে বিনয়ের সঙ্গেই আল্‌বৎ বাড়ী গিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌তে হবে।

বিনয়ের পিছু পিছু চারু গুটি গুটি এগুতে লাগ্‌ল। বিনয় খুব বড় বড় পা চালিয়ে এগিয়ে গেল, যেন পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নারীটির সঙ্গে ওর কোনই সংস্রব নেই, তাকে ও চেনেই না। চারুর প্রতি বিনয়ের মন একেবারে তিক্ত হ'য়ে উঠেছে। চারু যে প্রকাণ্ড ঘোম্‌টা ঝুলিয়ে রোরুদ্যমান মেয়েটাকে শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে পথ ভাঙ্‌ছে তার জন্যে ওর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। পথের লোক যে এই অভিভাবকহীনা মেয়েটির প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তাতে ওর কুণ্ঠাও নেই কিছু।—একবার ইচ্ছে হচ্ছিল পাশের গলি দিয়ে স'রে পড়্‌লে কেমন হয়!

মোড়ে এসে একটু দাঁড়াল। পেছন থেকে প্রায় মিনিট দশেক বাদে চারু এসে ওকে ধর্‌ল। ঘোম্‌টা না খুলেই ধমক দিয়ে উঠ্‌ল—ভিড়ের মাঝে তোমার ঐ জুতো-জোড়া চিনে চিনে আর কতদূর চল্‌ব আমি?

বিনয় বল্লে—বেশ ত, ব্যায়াম হচ্ছে।

ব'লেই আবার এগিয়ে চল্‌ল। ট্যাক্সি-ড্রাইভারটাও সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে।

হঠাৎ আকাশে কখন্‌ যে মেঘ ক'রে এসেছে বিনয়ের খেয়াল নেই। পেছন তাকিয়ে দেখ্‌লে চারু তার ঘোম্‌টা খুলে চোখ ওপরে তুলে আকাশে মেঘের সমারোহ দেখ্‌ছে! মেঘেরই মত ওর বুক ভয়ে দুরু দুরু ক'রে উঠেছে বুঝি। চারু যে তার কালো দু'টি চোখ তুলে মেঘ দেখ্‌বে এ বিনয় কোনোদিন ভাবেনি। ঐ অবগুণ্ঠনটি আছে ব'লেই ওর মুখখানি যেন সুমধুর একটি অপরিচয়ের রহস্যে ঢাকা আছে; কিন্তু বাড়ী গিয়ে ঐ ঘোম্‌টাটি যখন কমিয়ে আন্‌বে, তখন ওকে আর এমন সুন্দর লাগ্‌বে না।

বৃষ্টি পড়্‌তে সুরু করল, সবাই গাড়ী কিম্বা গাড়ী-বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলে। খালি বিনয়ই থাম্‌ল না, পেছনে ওর পুরাতন স্ত্রী আর মেয়ে! বড় ছেলেটা বিছানা নিয়েছে, ছোটটাও নেবে,—না ভিজ্‌লেও নিত। শিখ্‌ ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা কিছুতেই দাঁড়াতে দিচ্ছে না—নিজে একটা ওয়াটার-প্রুফ্‌ গায়ে চাপিয়েছে কি না।

ললাটে এত বিড়ম্বনাও লেখা ছিল !

কোনো রকমে বাড়ী এসে পৌঁছুনো গেল। যে-কে-সে-ই। নন্দা বেরিয়ে এসে বল্লে—একি কাণ্ড !

বিনয় চেঁচিয়ে বল্লে—টাকা বার ক'রে দাও দু'টো।

ভিজে কাপড় নিয়েই চারু চাবি খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল চাবি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডানা গজাল নাকি ওর? কাপড় চোপড় বালিশ তোষক ছরকোট্ ক'রেও কোথাও মিল্‌ছে না।

নন্দাকে বল্লে—আমার চাবির রিংটা তাড়াতাড়ি ফেলে গেছ্‌লাম, দেখেছ কোথাও?

নন্দা মুখ বেঁকিয়ে বল্লে—তোমাদের ট্রাঙ্কের চাবিও জানি না, মনের চাবিও জানি না।

বিনয় একেবারে রুখে এল,—কোথায় টাকা? ব্যাটা সেই কখন থেকে জোঁকের মতো লেগে আছে। ঝক্‌মারি! এত দেরি হচ্ছে কেন?

চারু মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বল্লে—চাবি পাচ্ছি না।

বিনয় মুখ ভেঙ্‌চে উঠ্‌ল—চাবি পাচ্ছি না! টাকাগুলি গেল বুঝি লোপাট্ হ'য়ে? হতচ্ছাড়ি!

আনাচ কানাচ আস্তাকুঁড় পর্য্যন্ত চাবি খোঁজা হ'ল। উনি নিরাকার অদৃশ্যই থেকে গেলেন।

অগত্যা বিনয় রাগ ক'রে কাঠের বাক্সটা দু' হাতে মেঝের ওপরে সজোরে আছ্‌ড়ে ফেল্‌লে। বাক্সটা চৌচির হ'য়ে ফেটে গেল। তখন দেখা গেল ছোট্ট চাবিটি বাক্সটির মুখে আট্‌কে আছে। দু'টো টাকা বার ক'রে নিয়ে যেতে যেতে বিনয় বল্লে—তোমার জন্য শুধু শুধু দুটো টাকা উড়ে' গেল আজ—একেবারে খামোখা। তা' দিয়ে দশ বারো দিন বাজার খরচ হ'ত,—ছেলেটার ওষুধ হ'ত, হয় ত' মর্‌ত না। সাধে কি বলেছে—স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ? সাধে কি শিববাবু এত বিগ্‌ড়েছেন? কেলেঙ্কারি না কেলেঙ্কারি! কেরাণীর স্ত্রী, তার আবার কেরামতি দেখ—যাবেন গাড়ী চ'ড়ে! খেঁক্‌শিয়ালি রাজা হ'লেও জুতো খায়। ছোঃ!

টাকা পেয়ে ড্রাইভারটা গালি পাড়্‌তে পাড়্‌তে চ'লে গেল।

বৃষ্টি থেমে গেছে,—কাপড় ছেড়ে চারু গিয়ে নোংরা সেই রান্নাঘরে ঢুকেছে, মেঝেতে চিৎ হ'য়ে মেয়েটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, ড্রেন থেকে ফের গন্ধ উঠ্‌ছে,—জীবনে এই সত্যি।

সব চেয়ে বড় সত্যি,—কাল্‌কে আবার ভোর হবে। কাল্‌কে থেকে আবার আপিস্ সুরু।

আলো আর কালো

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রথম দৃশ্য

[শিকার করতে এসে বনের ভিতর রাজা পথ হারিয়ে ফেলেচেন। তাঁর কটিতে তলোয়ার আর হাতে ঢাল আর বল্লম। সময় সন্ধ্যা।]

রাজা

(স্বগত) তাই ত! বুনোবরার পিছনে তাড়া করতে গিয়ে এ কোথায় এসে পড়লুম? শিকারও পালাল আর পথও হারালুম। চন্নক রথ নিয়ে যে কোথায় প'ড়ে রইল তার আর সন্ধান করতে পারচি না। যতই এগাচ্চি ততই অরণ্য গভীর হ'চ্চে! পায়ে পায়ে লতাপাতা জড়িয়ে পড়চে,... হিংস্রজন্তুর ভীষণ কলরব চারদিক থেকে শুনতে পাচ্চি। এখন এই অরণ্যে পথ হারিয়ে যাই কোথা? (খানিক নীরব থেকে) নাঃ, আর এগোনো হবেনা, রাত হ'য়ে এল; এই গাছের উপর চ'ড়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরের বেলা আবার পথের খোঁজ করতে হবে।

[রাজা গাছের উপর ঢাল তরোয়াল নিয়ে চ'ড়ে বসলেন আর ঠিক তার পরেই একদল দস্যু লুটের বোঝা কাধে ক'রে সেখানে এসে পড়ল]

১ম দস্যু

(২য় দস্যুকে ঠেলতে ঠেলতে প্রবেশ ক'রে) আরে এই জালাপেটের জ্বালায় যে গেলুম, আরে চ না? এদিকে যে মাছি লেগেচে!

২য় দস্যু

(ব'সে প'ড়ে) আরে ভাই চলতে পারচিনে,সেই কেঁদুলের হাট থেকে গোয়ালপাড়ার মাঠ পর্য্যন্ত প্রাণ হাতে ক'রে বোঁচকা নিয়ে চোঁচা দৌড়েছি, চলতে চলতে পায়ের তলাটা যেন ক্ষ'য়ে গেল!

৩য় দস্যু

আরে এখন হয়েচে কি? মাছির সঙ্গে যদি কেউ লাগে ত সুদে আসলে আদায় ক'রে নেবে!

৪র্থ দস্যু

তাইতো রে চ'না, এমন কুড়ে মনিষ্যি দেখিনি তোর মতন। (ব'লেই সজোরে ২য় দস্যুকে ধাক্কা)

২য় দস্যু

আরে ভাই আর ঠেলিসনে আমায়, এতদূরে তো তোরা আমায় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এনেচিস, আর কেন? বলি ভাই হলধর...

১ম দস্যু

(২য়ের পৃষ্ঠে পদাঘাত ক'রে) ফের 'হলধর' বলচিস? বল্ আমায় গোঁসাই বল্!

২য় দস্যু

হ্যাঁ, হ্যাঁ, থুড়ি থুড়ি, হলধরটা মুখ দিয়ে ফস্‌কে বেরিয়ে গেছল!

৩য় দস্যু

দেখ জগা, তোকে গোঁসাই না বল্‌লে ত কি হ'ল? তাতে ত আর ভাগ-বখ্‌রার সুবিধে কিছু নেই?

১ম দস্যু

তা হ'ক্‌গে, আমার ঐ 'হলধর' নামটা মোটেই পছন্দ নয়। বাপ যদি ধর্ হলধর নাম না দিয়ে অন্য যে কোনো "অধর" "শ্রীধর" এম্‌নি একটা গুণধর ক'রে দিত তাতে আমার আপত্তি ছিল না।

৪র্থ দস্যু

ভাই জগা, তোরা এখন নামকরণের পালা সাঙ্গ ক'রে ভাগকরণের উপকরণের তল্পীগুলো যদি লণ্ঠনের আলোতে খুলে দেখিস ত অনেকটা কাজ এগোয়।

৫ম দস্যু

হাঁ ভাই, গোঁসাই আর জগার বক্‌বকম্ শুন্‌তে শুন্‌তে সারা পথটায় আমার মাথা ধ'রে উঠেচে।

৪র্থ দস্যু

মিথ্যে বলিসনি, একে লুটের ভার দশকোশ বওয়া, তায় এদের কথাকাটাকাটির তুবড়ি বাজী!

৫ম দস্যু

(চারিদিক ভাল ক'রে দেখে) এ যায়গাটা বেশ নিরি-বিলি রে, আয় ভাই তাহ'লে এই গাছতলায় ব'সে আমাদের ভাগ-বখরার কাজ শেষ করি।

১ম দস্যু

(লুটের সামগ্রী তল্পীমুক্ত ক'রে) এ্যাঁ! এ যে হীরের সাতনহর রে!

২য় দস্যু

হ্যাঁরে, বাঃ বাঃ, এ যে সোনার বাজুবন্ধ!

৩য় দস্যু

তাইত রে এ যে আবার জরির শল্‌মাচুম্‌কি কাজের জামার উপর পান্নার জড়োয়া!

৪র্থ দস্যু

আরে থাম্ থাম্, এখন কে কোন্‌টা নিবি বল্ ত?

ভাগকরণ

৩য় দস্যু

না ভাই, তুই জগাকে বেশী দিলি।

২য় দস্যু

না ভাই, তুই সর্দ্দারি করার বেলায় আছিস, আর সিঁধ কাটবার বেলায় আমরা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, আর বখরার বেলা দেড়েমুশে নিবি তুই—তা' হবে না।

৩য় দস্যু

তা' পথ ঘাটের সন্ধান তোদের কে দেয় রে শুনি? কে তোদের তালিম দিয়ে মানুষ করেচে রে নিমখারাম।

১ম দস্যু

(ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে) না, তা' তুই যথার্থ আমাদের গুরু।

২য় দস্যু

সঞ্জীব বেনের বাড়ীতে সিঁধ দিয়ে যা পাওয়া গেছে তা' কোনো রাজবাড়ীতেও মিলতনা রে!

৫ম দস্যু

তা' ভাই কে জান্‌তো বল্ যে সঞ্জীবের ঘরে এত ধন দৌলৎ আছে।

৪র্থ দস্যু

হাঁ ভাই, সত্যি পেটে খায় না যে গায়ে পরে না যে তার ঘরে মাটির মালসাতে পোঁতা এত ঐশ্বর্য্যি যে আছে তা' কে জান্‌তো বল্? তা' তার সন্ধান তুই দিয়েছিস, তা' যথার্থই তুই গুরু হবার যুগ্যি বটে।

[ভাগ করা শেষ ক'রে পুঁটুলি আপন আপন কাঁধে ফেলে]

জগার তুড়ি দিয়ে গান

চাঁড়ালে চিঁড়ে কোটে
ধপ্‌ধপাধপ্ শব্দ ওঠে।
ভিজিয়ে খেতে মজা
গাব্ গুবাগুব্-গুব্ রে।
নাপিতে দাড়ি চাঁচে
জল দিয়ে দল্‌না-মারে
খুর দিয়ে টান্‌লে পরে
ক্যাঁৎ ফুতা ফুৎ কুৎরে।

৩য় দস্যু

থামা, তোর গান থামা। রাত বেজায় হয়েচে, এদিকে আমাদের ত সেই কসাই পাড়ায় রাত থাকতে থাকতে ফিরতে হবে, নইলে মাছি লাগবে।

২য় দস্যু

হাঁ ভাই, মাছির সঙ্গে আবার কেউ আছে।

[ঠিক সেই সময় গাছের উপর থেকে রাজার হাতের ঢালটা ধুপ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। আর যেই শব্দ হওয়া, আর ডাকাতের দল 'বাপ্ রে' 'ভূত রে' ব'লে যে যেদিকে পারলে স'রে পড়ল।]

(ডাকাতদের পালাতে দেখে গাছ থেকে নেবে এসে) বাঃ, এ যে লণ্ঠন আর চকমকিটা এরা ফেলে গেছে? বেশ হ'ল, এইবার এই আলো নিয়ে একবার পথের সন্ধানটা ক'রে দেখি না? চন্দ্রককে যদি খুঁজে পাই; সে যে রকম বিশ্বাসী সারথি, তা'তে আমার মনে হয় যে সে অরণ্যের প্রান্তে রথ নিয়ে নিশ্চয় আমার জন্যে অপেক্ষা করচে!

আলো-আর কালো

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

[এমন সময় একটি কুব্জা বুড়ির ঘাড় নাড়তে নাড়তে গুঁড়ি গুঁড়ি লাঠি ধ'রে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ]

বুড়ির নেপথ্যে গান আরম্ভ

য়্যাকটা কাল বাড়াল
য়্যাকটা কাল বাড়াল
কা৷ পুসেছে পাড়াতে,
পাড়াতে, পাড়াতে।
বাড়াল এ্যাল গুঁড়ি গুঁড়ি,
খাইয়া গেল ভাতের হাঁড়ি,
যার বাড়াল সে বাঁইধ্যা রাখুক
পাড়াতে, পাড়াতে, পাড়াতে ॥

রাজা

(বুড়িকে অন্ধকার বনের ভিতর থেকে আসতে দেখে)

ও বাবা রে এ যে একটা ডাইনি বুড়ি রে! এখন যাই কোথা!

বুড়ি

(নাকি সুরে) আঁলো নেঁভা, আঁলো নেঁভা, ভাল চাঁস ত আঁলো নেঁভা !

রাজা

কেন ? আলো কি তোমার দু চক্ষের বিষ নাকি ?

বুড়ি

আঁলো বিঁষ নয়, আঁলোর আমি বিঁষ। ভাল চাঁস্ ত আঁলো নেঁভা।

রাজা

আগে বল তুমি কে ? কেন এখানে এসেচ, তবে আলো নেভাব।

বুড়ি

আমি যেই হইনা, ভাল চাস্ ত আলো নেভা। আমি তোকে তা' হ'লে পথ ব'লে দেব!

রাজা

পথ ব'লে দেবে নিশ্চয়?

বুড়ি

হাঁ, নিশ্চয় ব'লে দেব।

বুড়ি

[রাজা আলো নিবিয়ে দিলেন। তখন বুড়ি রাজাকে তার হাতের লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে বল্লে] ধর্, এই লড়িটা ধর্, আর আমার পিছু পিছু আয়।

রাজা

বেশ, আমি লাঠি ধরলুম, এখন আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল!

বুড়ি

দেখ্, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চি, কিন্তু তুই আলোও জ্বালতে পাবিনে আর চোখও খুলতে পাবিনে!

রাজা

আচ্ছা বেশ, আমি চোখ বুজেই তোমার সঙ্গে লাঠি ধ'রে চলব।

(উভয়ে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজা

(চারিদিকে অন্ধকার। রাজা চোখ খুলে) তাই ত! বুড়িটা ফস্ ক'রে লাঠিটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারে কোথায় যে স'রে পড়ল তার ঠাওর করতে পারচিনে, এদিকে চক্‌মকি দিয়ে আলোটা জ্বালাতেও সাহস হচ্চে না, কি জানি যদি তাতে কোনো কুফল হয়!

[এমন সময় অন্ধকারের বুকের ভিতর একটা চক্‌চকে চোখ এসে তার সাম্‌নে ভেসে বেড়াতে লাগল।]

চোখ

আলো-পিদুম জ্বালাসনে—জ্বালাসনে, সাবধান!

রাজা

(ভয় পেয়ে) কে ? কে তুই বল্ শিগ্‌গির ?

চোখ

আমি এখানকার এই আঁধার পুরীর রাজা, যে আলো জ্বালায় তার আমি ঘাড় মট্‌কাই।

[এমন সময় আরো একটা চোখ আগেকার চোখের পাশে এসে ঠোকাঠুকি করতে লাগল]

রাজা

(কোমর থেকে তলোয়ার বার ক'রে) আগে বল্ তুই কে, নইলে এই খাঁড়ার এক কোপে তোকে শেষ করব।

[তখন আবার সেই চোখ দুটির পাশে একটা নাক আর এক পাটি দাঁত এসে জুটল, আর পরস্পর ঠোকাঠুকি করতে লাগল। তখন রাজা সাহসে ভর ক'রে যেই খাঁড়ার কোপ দিতে যাবেন আর অমনি চোখ নাক দাঁত অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তখন বুড়ি লাঠি হাতে গুঁড়ি গুঁড়ি সেখানে এসে হাজির হ'ল।]

রাজা

আলো ত জ্বালাব না, কিন্তু এই চোখ নাকগুলো যদি ফের উপদ্রব করতে আসে ত তলোয়ার দিয়ে কেটে দু আধখানা ক'রে দেব।
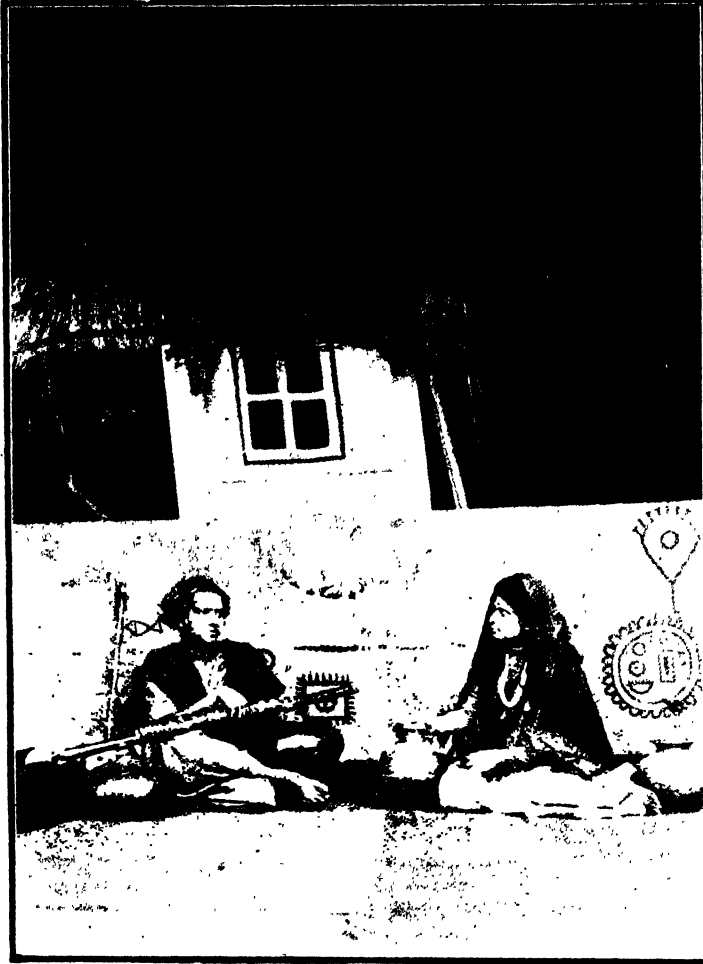
অভিনয়ের একটি দৃশ্য

বুড়ি

(হাতে খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে) এই নে খা, ঝগড়া করিসনে, আর আলো জ্বালাসনে, বুঝলি?

বুড়ি

না, তুই ভাল হ'য়ে থাক্, তোকে পথ ব'লে দেব।

রাজা

আচ্ছা বেশ।

(বুড়ির প্রস্থান)

আলো আর কালো

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

দূরে নেপথ্যে গান

তুমি এত আলো জ্বালিয়েচ
এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন ক'রে
ফেল আমার মুখের 'পরে
আপনি থাক আলোর
পিছনে।
প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-
গগনে
কি উৎসবের লগনে
সব আলো তার কেমন ক'রে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে
আপনি পড়ি আলোর
পিছনে।

রাজা

এ গানের সুর কোথা থেকে আসচে? কি সুন্দর গান! গানের শব্দ ধ'রে এগিয়ে চ'লে দেখি, পথ মিলে কিনা! (কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে) এঁ্যা! এ যে উঁচু নিচু ঢেউ-খেলানো পথের আর শেষ নেই! এ কি! এ যে গুহার পথের রাস্তা, দুদিকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাথরের দেয়াল ঠেক্‌চে, আর কি মিশমিশে অন্ধকার! (সহসা এক কোণে আলো দেখতে পেয়ে) আলো-- আলো-- আলো! ঐ যে দূরে অন্ধকারের বুক চিরে আলোর প্লাবন ব'য়ে যাচ্চে। দেখি একবার এই আলোর ফাঁকে সেই গাইয়েদের সন্ধান পাই কিনা! (অন্ধকারের মধ্যে যে ছিদ্রপথ দিয়ে আলো প্রবেশ করচে, তার ভিতর চোখ দিয়ে দেখে) কে তোমরা ছোট ছোট শিশুর দল এই গুহার বাইরে আলোর মধ্যে ব'সে গান গাইচ? আমায় তোমাদের কাছে যাবার পথ ব'লে দিতে পার কি?

১ম বালক

(নেপথ্যে) না আমরা পথ ব'লে দিতে পারি না।

রাজা

কেন?

২য় বালক

(নেপথ্যে) আমাদের মানা আছে।

রাজা

কে মানা করচে তোমাদের?

৩য় বালক

(নেপথ্যে) এখানকার রাজা।

রাজা

তোমাদের কে রাজা?

৩য় বালক

(নেপথ্যে) তাঁর আমরা নাম জানিনা, তিনি আলোর মধ্যে বাস করেন।

রাজা

তিনি কি আমায় এই অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচাবেন না?

২য় বালক

(নেপথ্যে) হাঁ, বাঁচাতে পারেন যদি পথের খোঁজ ক'রে তাঁর কাছে তুমি আসতে পার।

রাজা

সে কি? পথের খোঁজ যদি নিজে ক'রে নিতে হবে তা' হ'লে তাঁর কাছে যাবারই প্রয়োজন কি?

২য় বালক

(নেপথ্যে) আমাদের রাজা রাতদিন আলোর ভিতর ডুবে থাকেন তাই তাঁর কাছে সব পথই সোজা; অন্ধকারের গলিঘুঁজির সন্ধান তিনি দিতে পারেন না।

৩য় বালক

(নেপথ্যে) তাই তোমায় নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিতে হবে।

হায়! তা' হ'লে আমায় এই অন্ধকারে বন্দী হ'য়ে প'চে মরতে হবে দেখচি।

১ম বালক

(নেপথ্যে) হাঁ, যদি না পথের খোঁজ করতে পার।

রাজা

তবে আমায় তোমরা মাঝে মাঝে এমনি গান শুনিও?

৩য় বালক

(নেপথ্যে) তা' শোনাব, কিন্তু তুমি এখানে লুকিয়ে এস!

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজা হতাশভাবে অন্ধকারের মধ্যে ব'সে আছেন, আর বুড়ি এমন সময় রাগে গর গর করতে করতে ঘাড় কাঁপাতে কাঁপাতে সেখানে উপস্থিত হ'ল]

বুড়ি

এঁ্যা, কোথায় গিয়েছিলি তুই ? খাবারের দোনা নিয়ে ফিরচি তখন থেকে, আর তুই স'রে পড়েচিস্ !

রাজা

কোথায় আবার যাব, পালাবার কি পথ রেখেচ ? গুহার সুড়ঙ্গ পথে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

রাজা

তা' আসব।

নেপথ্যে একটি ছেলের গান

আলো যে যায়রে দেখা
হৃদয়ের পুব-গগনে
সোনার রেখা।

এবারে ঘুচল কি ভয়,
এবারে হবে কি জয়,
আকাশে হ'ল কি ক্ষয়
কালির লেখা ?

অভিনয়ের আর একটি দৃশ্য

কারে ঐ যায়গো দেখা
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায়ে একা।

ওরে তুই সকল ভুলে
চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে,
নীরবে চরণমূলে
মাথা ঠেকা।

বুড়ি

তা' বেশ, তুই নিজেই তা'হ'লে পথ খুঁজে বের কর্, আমি চল্লুম। বিপদে পড়লে আমি জানি না, তোকে কে বাঁচায় তা' দেখব।

রাজা

(রাজা চকমকিটা তুলে নিয়ে ঘসতে ঘসতে বল্লেন)

আচ্ছা আমি আমার পথ এবার নিজেই দেখে নিচ্চি—

আলো আর কালো

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আলো জ্বেলে।

বুড়ি

ওরে পোড়ামুখো, হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, জ্বালাসনে, পিদুম জ্বালাসনে (ব'লতে ব'লতে দুচোখে হাত দিয়ে ঢেকে পালাল, আর রাজাও চকমকি দিয়ে লণ্ঠনটা জ্বেলে নিলেন। আলো জ্বালবা-মাত্র এক দল ছেলে অন্ধকারের ভিতর থেকে নাচতে নাচতে গান গাইতে গাইতে এসে হাজির হ'ল)

ছেলেদের নাচ আর গান

আলো আমার আলো ওগো,
আলো ভুবন-ভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়-হরা!
নাচে আলো নাচে ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে—
বাজে আলো বাজে ও ভাই—
হৃদয়-বীণার মাঝে।
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা,
আলো আমার, আলো ওগো,
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেচে
হাজার প্রজাপতি,
আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই,
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই,
পুলক রাশি রাশি।
সুদূর নদীর কূল ডুবেচে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো আমার আলো ওগো
আলো ভুবনভরা।

রাজা

কে তোমরা ?

১ম বালক

আমরা সেই আলোর দেশের চর!

রাজা

আলোর দেশে কি কেবল শিশুদেরই রাজত্ব নাকি ?

২য় বালক

হাঁ, আমরা আলো নইলে থাকতে পারি না যে!

তোমরা যে পথ দিয়ে এখানে এসেচ আমায় ব'লে দেবে?

৪র্থ বালক

আমরা তা' ঠিক্ বলতে পারব না। তবে আলো নিয়ে চল, আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

রাজা

তা' বেশ!

[রাজা লণ্ঠন নিয়ে চল্লেন, আর ছেলের দল তাঁর ঘাড়ে পিঠে চ'ড়ে চল্ল।]

১ম বালক

আমায় তুমি কাঁধে কর!

২য় বালক

আমায় তুমি কোলে ক'রে নাও, চলতে পারচিনে!

৫ম বালক

আমি আর চলতে পারচিনে, আমায় তুমি নেবে ?

৪র্থ বালক

আমায় নাও তুমি!

[আমায় কোলে নাও, আমায় তুমি নাও ব'লে সব ছেলেরা মিলে রাজাকে বিরক্ত করতে লাগল]

রাজা

অমন অবাধ্যিপনা যদি কর ত আলো নিবিয়ে দেব বলচি।

৫ম বালক

না, তুমি আলোটা আমাদের দাও, আমরা খেলব।

১ম বালক

না, আমায় দাও আমি খেলব।

[সবাই মিলে তাঁকে এই ভাবে বিরক্ত করায় রাজা রেগে আলোটা একটা গাছে টাঙিয়ে রেখে নিজে স'রে পড়লেন, আর ছেলেরা সেই আলোর নীচে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে নাচতে লাগল।

ছেলেদের নৃত্যগীত

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে,
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হ'তে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো,
ব্যথা মোর উঠ্‌বে জ্ব'লে ঊর্দ্ধপানে।
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

রাজা

(রাজা অন্ধকারে পথ না পেয়ে ফিরে এসে) না; পথ পাচ্চিনা, আলো নইলে কাঁটা ঝোপে এই অরণ্যে এগোনো যাবে না!

১ম বালক

ঐ রে আবার আলো নিতে এসেচে রে!

৩য় বালক

এবার আর আলো ওকে দেওয়া হবে না।

৪র্থ বালক

না ভাই, আমরা কিছুতেই ওকে আলোটা নিতে দেব না।

রাজা

তবে রে দাঁড়া, কেমন ক'রে তোরা আলো নিস তাই দেখচি। (ব'লেই রাজা গাছ থেকে লণ্ঠনটা পেড়ে নিয়ে নিভিয়ে দিলেন। আলো নিভাবামাত্র ছেলের দল অন্ধকারে কে কোথায় স'রে পড়ল)

রাজা

তাই ত, ছেলেগুলো যে ছিল ভাল! এই থম্‌থমে অন্ধকারে পথ হারিয়ে আবার কোন্ জটেবুড়ির পাল্লায় না গিয়ে পড়ি। নাঃ, আলোটা আবার জ্বালি, যদি ছেলেগুলো ফিরে আসে। (আলো জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা) কৈ? কারুর ত সাড়া শব্দ নেই? ছেলেগুলো ত এল না দেখচি। ঐ বনের পুব কোণে মনে হচ্চে কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েচে! এত রঙও কখন ত দেখিনি। পাখীরা ঐ যে গান গেয়ে উঠ্‌ল! বাঃ, এ কি? এ যে আমি বনের এক প্রান্তে এসে পড়েচি, আর দূরে ঐ যে চন্নক রথ নিয়ে ব'সে ব'সে ঝিমচ্চে!

শেষ

ভালবাসা নহে অপরাধ

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

নহে মরতের শুধু ভালবাসা, নহে অপরাধ !
কবির স্বপনে দেখা সুগোপন মরমের সাধ ;
সে যে দেবতার পুণ্য স্নেহভরা শুভ আশীর্ব্বাদ,
অমরার অমৃত প্রসাদ !
অমূর্ত্তের মূর্ত্তি সে যে বিশ্ব-বিমোহন,
ধেয়ানের ধন !

সিন্ধুর মন্থনোদ্ভূতা মদালসা বিহ্বলা সুরারে
অসুরে লইল বরি' সাদরে সে ভ্রান্তি-বিধুরারে ;
তারপরে উঠিলেন লক্ষ্মীরূপে প্রেম শরীরিনী
পদক্ষেপে বাজায়ে কিঙ্কিণী।
কা'রে দিল বরমালা সে বরাঙ্গী ? কে পুরুষোত্তম !
প্রেমিক প্রথম !
ভালবাসা সেই দিন সে আঁখি-ভঙ্গীতে
জনমিল সৃজন-ইঙ্গিতে !

রতন-পর্য্যঙ্কে পাতা মণিময় স্বপ্নশয্যা ছাড়ি'
ক্ষীরাব্ধির অঙ্ক হ'তে প্রেম ল'য়ে এল সুকুমারী ;
নলিননয়নকোণে ভালবাসা পড়িল ঝরিয়া,
মুকুতার মূরতি ধরিয়া,
সেই. অশ্রুবিন্দু স্নেহে সিন্ধু করিয়া চুম্বন,
অতুল্য সৃজন—
অমরাবতীর তরে দিল উপহার
সঞ্জীবনী সুধার ভাণ্ডার !

অমৃত লুকায়ে ছিল চঞ্চলার কনক-অঞ্চলে,
অনন্ত অতল গর্ভে দেবেন্দ্রের ঋষিশাপ ছলে;
প্রেমসুধা-হারা স্বর্গ হয়েছিল ধূসর ঊষর
অহরহ কাঁদিত অন্তর,
নন্দন সে হ'য়েছিল বিজন কান্তার
বিহনে মন্দার ;
শুচি শান্ত স্মিত হাস্যে আবার নবীন
পারিজাত জাগিল সেদিন !

ইন্দিরার ইন্দুকান্তি নিরখিয়া ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীর,
পুলকরোমাঞ্চছলে রাঙ্গা পদতলে জননীর—
উত্তপ্ত বালুকা ছেয়ে ফুটাইল কত না কমল,
কমলার প্রেমে নিরমল !
সহসা সৈকতভূমে হ'ল স্বয়ম্বরা,
কুমারী বাঞ্ছিতে দিতে ধরা !
কৌতুকে হাসিয়া শশী সে ভালে নির্ম্মল
শোভিল উজ্জ্বল !

আদিম প্রভাত হ'তে অনাদি অনন্ত কাল ধ'রে
"ভালবাসি নাই আমি" কহিতে কে পারে দৃঢ়স্বরে ?
বৈরাগী সে মহাযোগী ডুবি' কা'র প্রেমের সায়রে
নীলকণ্ঠ বিষ পান ক'রে !
হিম-প্রিয়া-তনুখানি কণ্ঠলগ্ন তাঁরি
পরম ভিখারী ;
প্রেমের চরম সেই অর্দ্ধ-নারীশ্বর
মৃত্যুঞ্জয়ী দেবদেব হর !

ভালবাস, ভালবাস, ভালবাসা নহে অপরাধ,
প্রেম-নন্দনের স্বপ্ন, ইন্দ্রাণীর মনোমদ সাধ।
মেঘমুক্ত নীলাম্বরে সে যে পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ,
ভালবাসা দেবের প্রসাদ !
পোড়ায়ে পাবার সাধ প্রেমানল জ্বালি'
দাও শুধু ঢালি
অন্তর-সর্ব্বস্ব তব বাঞ্ছিতের পায়
পূর্ণ হও প্রেম-মহিমায় !

রুদ্ধ নিঃশ্বাস

—গল্প—

—শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

বিপিন লাহিড়ী এবং রমেশ কাঞ্জিলাল অনেক দিনের বন্ধু। এমনি গভীর বন্ধুত্ব যে তাহারা শুধু একসঙ্গে আহার বিহার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, একসঙ্গে ফেল করিয়াছে, আবার একসঙ্গেই পাশ করিয়াছে। আই, এস্, সি শেষ করিয়া রমেশ গেল ডাক্তারিতে, কিন্তু বিপিন তাহার পুরাতন বঙ্গবাসী কলেজ ছাড়িল না। সেই থেকেই ছাড়াছাড়ি। রমেশ বিপিনকে টানিবার চেষ্টা কম করে নাই। বলিয়াছিল, এতদিন তো কেবল পুঁথিপত্তরই ঘাঁটা গেল, এবার একটু হাড়গোড় ঘাঁটতে দোষ কি?—একটু থামিয়া কাছে আসিয়া বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রাখিয়া বলিয়াছিল, জানিস, মড়াগুলো যা' দাঁত খিঁচিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকায় একা একা ভয়ই লাগে। চল্ না! উত্তরে চিরগম্ভীর বিপিন কেবল মাথা নাড়িয়াছিল। রমেশ রাগিয়া কহিল, এখানে কোন ছাই পড়বে শুনি?

জবাব আসিল, ছাই নয় দর্শনে অনার্স্। বক্তার গাম্ভীর্য্যের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইল না।

তারপর অনেক দিন গিয়াছে। বিপিন এম্ এ পাশ করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমেশও ডাক্তার হইয়া প্রাকটিসের আয়োজন করিতেছে। কলিকাতার কাছেই একটা ছোট সহর। চারিদিকে পাঁচ সাতটা পাটের কল এবং তাহার পাঁচ সাত হাজার কুলী। ইহাদের না আছে এমন রোগ নাই। কিন্তু রোগটা যে পরিমাণে বেশী, পয়সাটা আবার তেমনি কম। তবু মদের হাত হইতে কাড়িয়া ছিনিয়া যাহা কিছু রাখা যায়, এই আশায় মদের দোকানের কাছেই একটা জীর্ণ বাড়ীতে রমেশ বাসা লইয়াছিল। বাড়ীটা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি পরানো। একটা অংশ একেবারে ধসিয়া গিয়াছে, অন্যটারও হাড় মাংস খসিয়া গিয়া পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারি হাজার রকমের ভগ্নস্মৃতি আগলাইয়া হাজার বছরের নিশ্চল ইতিহাস বিশাল কালো ডানা মেলিয়া মুখ বুজিয়া ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সারি সারি অসংখ্য পাষাণস্তম্ভ এক একটি দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া; আর তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা যেন কিছু একটা ধরিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে। ঘরগুলি খাঁ খাঁ করে। আলো বাতাস ঢুকিতে সাহস করে না। যুগান্তের গাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া বসিয়া আছে। মানুষের কণ্ঠে গমগম করিয়া ওঠে। যেন কত শত অলক্ষ্য অশরীরী প্রাণী শান্তিভঙ্গের আক্রোশে একযোগে রুখিয়া গর্জ্জিয়া মারিতে চায়।

'ভূতের বাড়ী' বলিয়া উহার খ্যাতির অন্ত ছিল না, এবং সে কথা রমেশের কানেও যথাসময়ে পৌছিয়াছিল। উত্তরে, সে তাহার রিভলবার কেস্‌টার দিকে চাহিয়া একটু গর্ব্বিত হাসির সঙ্গে জানাইয়াছিল, তা হ'লে তো ভালই হ'ল। একেবারে একা পড়তাম, তবু মাঝে মাঝে দু'চারজন স্বজাতির দেখা মিলবে। মুখে যাহাই বলুক বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে চাহিয়া তাহার মনটা যেন ক্রমাগত সিঁড়ির পথ খুঁজিতে লাগিল। জিনিষপত্র সব অগোছালো অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহারই দুই চারিটা নাড়াচাড়া করিয়া কাজে লাগিবার চেষ্টায় ছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ ব্যাগহস্তে ক্ষীণকায় চশমাধারী বিপিনচন্দ্রের প্রবেশ। রমেশ লাফাইয়া উঠিয়া চেঁচামিচি করিয়া কহিল, একি হেরি অকস্মাৎ বিনা মেঘে—বলিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখিল চারিদিকে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াঢাকা এই ভয়গম্ভীর বাড়ীটাকে বিপিন যেন কী একরকম চোখ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে; অজ্ঞাতসারে তাহার মনটা নড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহ কোন কথা কহিল না।

অনেক রাত্রে গুরুভোজন শেষ করিয়া সেই প্রশস্ত বারান্দার একধারে দুইজনে দুইখানি চেয়ার লইয়া পাশাপাশি বসিয়াছিল। কথা বলিবার মত মনের বা উদরের অবস্থা

রুদ্ধ নিঃশ্বাস

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কাহারও নয়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। একে অতি বিশ্রী অন্ধকার, তাহার উপরে আবার সমস্ত আকাশ জোড়া গাঢ় মেঘ। একটি তারাও কোথাও জাগিয়া নাই। বাতাস বন্ধ। অদূরে কয়েকটা প্রাচীন বট অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। একটি পাতাও নড়ে না। সুমুখেই খানিকটা জলা। এককালে হয়তো দীর্ঘই ছিল। সংস্কার অভাবে বুজিয়া আসিয়াছে। আবর্জ্জনার বোঝা চারিদিকে স্তূপ বাঁধিয়া গিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল ঐ জীর্ণ পুকুরটার গাঢ় কালো জল যেন এক ভীষণ ভূমিকম্পের তাড়নায় বিপুল-বেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক শত ভয়ার্ত্ত নারীকণ্ঠের বিকট তীক্ষ্ণধার গুমট রাত্রির বুক চিরিয়া তীরের ফলার মত গায়ে আসিয়া লাগিল। পরক্ষণেই মনে হইল, অনেকগুলি লোকের মাথা কে যেন একসঙ্গে জলে চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহাদের নিঃশ্বাস লইবার প্রাণপণ ব্যর্থ প্রয়াসে সমস্ত পুকুর জুড়িয়া একটা ভয়ঙ্কর বুঁ বুঁ বুঁ শব্দ উঠিতেছে। রমেশ ও বিপিন এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। দেখিল, কোথাও কিছু নাই। সেই গুমট রাত্রি, নিশ্চল জল, নিঃশব্দ গাছের সারি।

বিপিন আড়ষ্টের মত চাহিয়া ছিল। তাহার হাত ধরিয়া এক টান মারিয়া রমেশ গর্জ্জিয়া উঠিল, কি দেখছিস? চল্। দুই জনেই বাহির হইয়া পড়িল।

কাছেই বস্তি। নারীকণ্ঠের আর্ত্তস্বর সেখানে প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার। তাহার করুণ এবং কদর্য্য কারণটাও রমেশের অজানা ছিলনা। আজিকার এই চীৎকারে তাহারি একটা ভয়ঙ্কররূপ ধারণা করিয়া সে উত্তেজিত হইয়াছিল। দুইজনে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। সমস্ত বস্তিটা নিঝুম। কোথাও কোন সাড়া নাই। হঠাৎ কোথা হইতে তুমুল ঝড় জল ছুটিয়া আসিতেই, তাহারাও ছুটিয়া বাড়ী ফিরিল। বৃষ্টি আসিতে দেরি হইল না। কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়া একটা ক্ষুব্ধ, হিংস্র, ক্রুদ্ধ বাতাস নিষ্ফল আক্রোশের শন্ শন্ শব্দে সেই প্রকাণ্ড নির্জ্জন বাড়ীটার অন্ধকারের মধ্যে কাহাকে যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শাসাইয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রকাণ্ড জীর্ণ কপাটগুলি থাকিয়া থাকিয়া বুকফাটা আর্ত্তনাদে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া আছড়াইয়া মরিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে একটি ঘরে দুইজন লোক পাশাপাশি খাটে গুটিগুটি হইয়া শুইয়া রহিল। নড়িল না, একটি কথাও কহিল না। দুইটি ভয়-বিনিদ্র প্রাণীর অর্দ্ধজাগ্রত তন্দ্রা ভেদ করিয়া বাজিতে লাগিল সেই প্রমত্ত বাতাসের রুদ্ধ গর্জ্জন, আর তাহার মধ্যে সেই করুণ কণ্ঠ—উঃ মাগো! মাগো! মাগো! বিপন্না নারীর ব্যাকুল কান্নায় তাহাদের পুরুষবক্ষ নিরুপায় অক্ষমতার ক্ষুব্ধ বেদনায় কাঁপিয়া, ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু তবু তাহারা নড়িতে পারিল না। মনে হইল তাহাদের একটা অঙ্গও আর তাহাদের নাই।

ভোরের দিকে বিপিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উঠিতেই দেখে রমেশ ঘরে নাই। অদূরে পাটকলের চোঙাটা অনর্গল ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। দিনের আলোয় চারিদিক চাহিয়া গত রাত্রির সমস্ত ব্যাপার যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়াই মনে হইল। চোখে পড়িল বিছানার উপরে রমেশ লিখিয়া রাখিয়াছে, ফিরিতে রাত্রি হইবে। অন্যদিন এই নিঃসঙ্গতা ভালো লাগিত না। কিন্তু আজ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। মনটা কেমন ভারী হইয়া পড়িয়াছিল; সঙ্গের বোঝা এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। বিপিন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সেই জলাটার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা বই টানিয়া নিয়া বসিল। পরলোকতত্ত্বের আলো-চনা। সেই সব পুরাতন কথা—সেই আত্মা, ভগবান, মৃত্যু, আর তাহার চারিদিকে ঘনায়মান অজ্ঞানের অন্ধকার। লেখক বলিতেছেন জীবনের যে অংশটা দৃশ্যমান সেইটাই কি সব? তাহার চেয়ে অনেক বড় যাহাকে দেখা যায় না। তাই মৃত্যু উত্তর নয়, একটা বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। কিন্তু ওপারে কি নিষ্ঠুর অন্ধকার। কত মানুষ কত যুগ ধরিয়া তাহারি প্রান্তে মাথা খুঁড়িয়া প্রাণপণ করিয়া মরিল। কিন্তু সে চিররহস্য অবগুণ্ঠন এক চুল নড়িল না। তবু সে থামিল না। কেহ বা দম্ভভরে প্রচার করিল, আত্মা অবিনশ্বর, তাহার ধ্বংস নাই, মৃত্যু নাই; সে নব নব রূপে প্রতিদিন এই ধরিত্রীর জন্মমৃত্যুস্রোতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ বা বিদ্রূপ হাস্যে সমস্ত তথ্য উড়াইয়া দিয়া কহিল, মানুষ মরিলে আর বাঁচেনা। আত্মা টাত্মা সব গঞ্জিকা। কিন্তু মন মানে কৈ? সে বলে পৃথিবীময় এই যে সাধ, আকাঙ্ক্ষা, আশা, নৈরাশ্যের তুমুল

আবর্ত্তন ইহার কখনো মৃত্যু নাই। জন্ম জন্ম ধরিয়া তাহার উগ্রতা মানুষকে এই পৃথিবীর মাটিতে টানিয়া টানিয়া আনে। যেখানে তাহার একান্ত প্রিয়জন তাহার বিরহে নিঃশ্বাস ফেলে, যেখানে তাহার অসমাপ্ত সাধনা ব্যর্থতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেইখানে সে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। এ মায়ার খোলস তাহাকে ছাড়ে না। জগৎ ভরিয়া সেই অতৃপ্ত ক্রন্দন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে যখন সে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সম্ভব, অসম্ভবের মাপকাঠি ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। বিপিন নেশার ঘোরে পড়িয়া চলিল। সমস্ত দিন বাহির হইল না। সেদিন তাহার সকল কাজে সেই কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য-লোকবাসী লক্ষ লক্ষ জন্মপ্রার্থী মানবাত্মার ব্যাকুল ক্রন্দন মূঢ় চেতনার নানা ছিদ্রপথে রণিয়া রণিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন পাটকলের মাইনে দেবার দিন। সন্ধ্যা না হইতেই দলে দলে স্ত্রী পুরুষ চোখে মুখে হিংস্র পিপাসা লইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে করিয়া খানিকটা তরল পদার্থ পেটে পড়িতেই নাচগানের আসর সরগরম হইয়া উঠিল। একজন বুড়ার মাত্রাটা বোধহয় একটু বেশি চড়িয়াছিল। ভাঙা হাড় ক'খানি কোন রকমে নাড়াচাড়া করিয়া উহারই মধ্যে একটু নৃত্যলীলা দেখাইবার চেষ্টায় ছিল। সহসা পাশের একটি রক্তচক্ষু যুবক মত্ততার আবেগে একটি যুবতীর হাত ধরিয়া টান মারিতেই সে একেবারে বুড়ার মাথা ছাপিয়া পড়িল। মেয়েটি প্রথমটা রাগিয়া পরক্ষণেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিপিন ছুটিয়া গিয়া বুড়াকে ধরিয়া তুলিল, এবং নিজের ঘরে নিয়া আসিল। এই সমস্ত সময়টা সে অতি অশ্লীল ভাষায় অজস্র গালিগালাজ করিয়া চলিয়াছিল। খানিকটা সুস্থ হইলে বিপিনের দিকে চাহিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। বিপিন প্রশ্ন করিল, মদ খাও কেন? উত্তরে সে প্রথমটা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর অত্যন্ত ভাঙা মোটা গলায় আস্ফালন করিয়া কহিল, শালা, শালাকে মদ ঠেসেই দেবো সাবাড় ক'রে। বলিয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইখানি উপরে তুলিয়া দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল। বিপিন ভয় পাইল। বৃদ্ধ লোকটা তাহা লক্ষ্য করিয়া সস্নেহে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া ভাঙা গলাটাকে যতদূর সম্ভব নরম করিয়া অনর্গল বকিয়া চলিল। তাহার কথা কতক কানে গেলনা, কিন্তু বিপিন নিঃশব্দে শুনিয়া যাইতে লাগিল। লোকটা বড় দুঃখী। একে একে সবাই গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে ছিল একটি মেয়ে সেও এই পুকুরটায় ডুবিয়া মরিয়াছে। এইখানে আসিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ থামিয়া চোখ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, বাবুজি, তোমার মা আছে?

বিপিন কহিল, আছেন। কেন বল দিকিন?

তবে আর দেরি করোনা, আজই এ বাড়ী থেকে চ'লে যাও।

বিপিনের সমস্ত শরীরটা অজ্ঞাতসারে কাঁপিয়া উঠিল। যথাসাধ্য আত্মদমন করিয়া কহিল, কেন?

বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া বলিল, কেন নয়? তুমি পালাও। এখানে থেকো না। বড় খারাপ জায়গা বাবুজি। এখানে কেউ টি'কতে পারে না।

বিপিন জবাব দিল না। তাহার মাথার মধ্যে গত রাত্রির সেই অশ্রান্ত ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আবার কথা কহিল। তাহার সেই অতি বিশ্রী মোটা ভাঙ্গা গলায় যেন কোন্ প্রেতলোকের শুষ্ক গাম্ভীর্য্য নিবিড় হইয়া উঠিল, এই ভাঙ্গা বাড়ীটাই নাকি একদিন ধনে জনে, আমোদে উৎসবে গম্‌গম্ করিত। এই পুকুরটাও ছিল একটা প্রকাণ্ড দীঘি। পরিষ্কার কালো জল, শ্বেত পাথরের বাঁধানো ঘাট। মেয়েরা দল বাঁধিয়া স্নান করিতে আসিত; হাসিয়া, খেলিয়া, জল ছিটাইয়া দীঘিটাকে মাতাইয়া তুলিত। তার পর একদিন ঐ বাড়ীতে বিবাহ-উৎসব। বৈশাখের সন্ধ্যায় এই ঘাটে ভিড় আর ধরে না। আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া উৎসববেশিনী তরুণীর দল জলক্রীড়ায় মত্ত। সহসা একটা তীব্র চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর পুরুষেরা যখন ছুটিয়া আসিল, নির্জ্জন ঘাট খাঁ খাঁ করিতেছে। দীঘির শেষ জল-রেখা মিলাইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে প্রচণ্ড তুমুল ঝড় ছুটিয়া আসিল। বড় বড় বট গাছগুলি উপড়াইয়া পড়িল। দীঘির জল পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া তটভূমি ভাসাইয়া লইয়া গেল। সেই শেষ। সেই দিন

থেকে এই পুকুরের জল পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া গেছে। এই এত বড় বাড়ীটা সেই দিন থেকে শূন্য হইয়া গেছে। লোকে বলে যে রাত্রে ডুবুরি ডাকাতের দল দীঘির ওপার থেকে ডুবিয়া আসিয়া রূপ এবং অলঙ্কারের লোভে ইহার অপূর্ব্ব নারীরত্ন লুটিয়া লইয়া গেল, সেদিন থেকে একটি পুরুষও আর এই লক্ষ্মীহীন গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে নাই।

বৃদ্ধের প্রত্যেকটি কথা বিপিন যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছিল। সহসা তাহার স্পর্শে চমক ভাঙিল। বৃদ্ধ কাছে আসিয়া হাত ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, তারা সব আছে বাবুজি, সব আছে। বৈশাখ মাসে যেদিন ঝড় ওঠে, দীঘির জলে কান্নার ধুম প'ড়ে যায়। সেই সব মরা মেয়ের কান্না। বিপিনের সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল।

২

রমেশ তাহার কাজ সারিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মনটাকে যথাসম্ভব হালকা করিয়া, একটা সহজ ভাব নিয়াই সে আসিয়াছিল। কিন্তু বাড়ীতে পা দিতেই চোখে পড়িল চারিদিকের সঞ্চিত এলোমেলো ধ্বংস স্তূপের উপরে একটি স্তব্ধ গম্ভীর কালরাত্রির করাল ছায়া। তাহার বুকটা দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অন্ধকারে শূন্য-নিবদ্ধ চক্ষু দুটি যতদূর সম্ভব বড় করিয়া বিপিন একান্ত চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছে; রমেশের আগমন টের পাইল না। রমেশের মনে হইল, তাহাদের এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথাবার্ত্তা, মেলামেশার মাঝখানে কোথা হইতে কোন অজ্ঞাতলোকের একটা কালো পর্দ্দা নামিয়া আসিয়াছে। তাহারা যেন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে। কোন কথাই আর বলিবার উপায় নাই।

শুইতে যাইবার সময় রমেশ দেখিল, বিপিন একটা খোলা বই এর একখানা পাতাই প্রায় ঘণ্টা খানেক যাবৎ পড়িতেছে। কাছে গিয়া কহিল, আর পড়তে হবে না। এবার শুয়ে পড়। বিপিন প্রখর শূন্যদৃষ্টিতে একবার শুধু মুখ তুলিয়া চাহিল, কথা কহিল না। রমেশও ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া নিজের খাটে আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। এমন দৃষ্টি সে জীবনে দেখে নাই। তাহার কলেজের মড়াগুলাও এমন করিয়া কোনদিন চাহে নাই।

তখন রাত্রি দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। মাথার উপর একটা দুম্ দুম্ শব্দ শুনিয়া রমেশের নিদ্রা সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। কী তীব্র অন্ধকার! কিছুই চোখে পড়িল না।

মনে হইল শব্দটা এবার তাহার ঘরের মধ্যেই। নিজেকে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই অনেকগুলি পায়ের শব্দ দুর্‌দুর্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। রমেশও বাহির হইয়া পড়িল। আবার সেই শব্দ! ঠিক তাহার পাশের ঘরেই। ঢুকিতেই তেমনি করিয়া ছুটিয়া গেল। রমেশ থামিল না, অদৃশ্য শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এমনি ভাবে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, প্রকাণ্ড প্রশস্ত বারান্দার অন্ধকার কোণে, জীর্ণ ইষ্টকস্তূপের মধ্য দিয়া উন্মাদের মত প্রচণ্ড বেগে রমেশ সেই অভ্যগ্র পদধ্বনির অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কত শত বৎসরের নিদ্রিত ধূলি তাহার পদাঘাতে চমকিয়া উঠিল। কত সরীসৃপ অস্ফুট চীৎকার করিয়া প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল। রমেশ কি করিতেছে, কিছুই বুঝিল না। অবশেষে মনে হইল, শব্দ নীচে নামিতেছে। অন্ধ আবেগে রমেশ সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিল, এবং তাহারই একটা খসিয়া যাওয়া ইঁটের ঘায়ে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। বহুক্ষণের মধ্যে উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

আর বিপিন? তাহার সেই একটিমাত্র পাতা আর শেষ হইল না। কিন্তু আলোটি ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে নিবিয়া গেল। অগত্যা সে শুইয়া পড়িল। ঘুম আসিয়াছিল কিনা বুঝিতে পারে নাই। এক সময়ে মনে হইল, যেখানে সে শুইয়া আছে, সে যেন রূপকথার রাজপুরী। শোভায় সঙ্গীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অচ্ছোদ দীঘির চঞ্চল জল সর্পিল ফণা মেলিয়া ছুটিয়াছে। শ্বেত পাথরের সোপানের পরে আরক্ত কোমল চরণ রাখিয়া দলে দলে তরুণীর দল স্নানে চলিয়াছে। অনাবৃত বাহুবল্লরীর কোমল আঘাতে স্বচ্ছ জলরাশি বিহ্বল হাস্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সহসা কি তীব্র আর্ত্তস্বর—উঃ মাগো মাগো মাগো! আকাশ বাতাস যেন বুকফাটা কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। বিপিন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, খবরদার! দেখিল

কোথাও কিছু নাই। সেই অন্ধকার ঘর। আলোটা হইতে তখনো দুর্গন্ধ ধোঁয়া উঠিতেছে। চারিদিকে মৃত্যুশীতল নিস্তব্ধতা!

বিপিন বিছানার উপর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মনে হইল, একটা কিসের চাপ যেন ক্রমেই ভারী হইয়া উঠিতেছে। দুই হাত দিয়া ঠেলিতে গেল। কিন্তু সব শূন্য। কান পাতিয়া শুনিল, যেন বহুদূর থেকে একটা শোঁ শোঁ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। যেন কত হাজার বৎসরের দীর্ঘনিঃশ্বাস মহা-কালের সমাধির আবরণ ঠেলিয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃ কাছে, আরো কাছে, তাহারি ঘরের মধ্যে। তাহারি সজাগ চেতনার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই পুঞ্জীভূত নিঃশ্বাসের তুষার-শীতল ব্যাকুলতা! বিপিন দুই হাত মেলিয়া সর্ব্বাঙ্গে ইহার কোমল স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। এ যেন কোন জলমগ্ন সুন্দরীর কণ্ঠের অসমাপ্ত নিঃশ্বাস। কণ্ঠে আসিয়াছিল বাহির হইতে পারে নাই; এই রহস্য-প্রাচীরের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। ইহার প্রতি ইষ্টকখণ্ডে সেই শব্দ। ইহার প্রতি রুদ্ধ জানালার ছিদ্রপথে, প্রতি মুক্ত দরজার বায়ুকম্পনে সেই শব্দ রী রী করিয়া চলিয়াছে। ইহার শেষ নাই, ক্লান্তি নাই। বিপিন দেখিতে পাইল, নিঃশ্বাসের তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাতাস, সমস্ত ধূলি, সমস্ত অনুপরমাণু যেন নিঃশ্বাস হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার চোখের সুমুখে সমস্ত বাড়ীটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এক সময়ে মনে হইল সেও যেন একটা প্রকাণ্ড নিঃশ্বাসের পিণ্ড হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

রমেশ যখন ঘরে ফিরিল, চারিদিকে ভোরের আলো অস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিল, বিপিন উন্মত্ত ভঙ্গীতে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। কাপড় খুলিয়া পড়িতেছে। ভ্রূক্ষেপও নাই। দুই হাত শূন্যে ছুঁড়িয়া রক্ত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি দিয়া কাহাকে যেন ধরিবার ব্যর্থ প্রয়াসে উদ্দাম উত্তে-জনায় ছুটিতেছে। রমেশ ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিতেই সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুনতে পাচ্ছ? রমেশ কহিল, কী?

বিপিন ভয়শুষ্ক চাপাগলায় কহিল, নিঃশ্বাস।

রমেশ উত্তর না দিয়া তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল, এবং মাথায় একটা ওষুধ দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

৩

তখন বেলা হইয়াছে। দুইজনে আবার তেমনি পাশা-পাশি চেয়ারে আসিয়া বসিল। কেহই কোনো কথা তুলিতে পারিল না। শুধু থাকিয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ চোখে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। কাল মনে হইয়াছিল তাহারা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। আজ মনে হইল শুধু তাই নয়, তাহারা যে তাহারাই, একথা আর জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই যে আজ রমেশ কাঞ্জিলাল আর বিপিন লাহিড়ী বলিয়া দুইটা লোক রিষড়ার মদের দোকানের সুমুখে একটা ভাঙা বাড়ীতে পাশাপাশি বসিয়া আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? এ পৃথিবীর কাছে তাহাদের পরিচয় মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। চিঠি বিপিনের। রমেশ পড়িয়া দেখিল, বিপিনের মা অসুস্থ, তাহাকে যাইতে লিখিয়া-ছেন। দুর্গম বনের মধ্যে তিন দিন ঘুরিয়া সহসা একটা পথের রেখা চোখে পড়িলে মানুষ যেমন করিয়া চেঁচাইয়া উঠে, রমেশ তেমনি ভাবে কহিল, গুছিয়ে নে, গুছিয়ে নে। আমি কয়েকটা ওষুধ নিয়ে আসছি। আমিও যাবো। বলিয়া বাহির হইয়া গেল। এ বাড়ীতে আর নয়। দুইজনের মনই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, পালাও, পালাও। বিকালের দিকে ট্রেন। আগ্রহের আতিশয্যে তাহার অনেক আগেই দুইজনে বাহির হইয়া পড়িল।

ষ্টেশনের একটা বেঞ্চি দখল করিয়া দুইজনে বসিয়াছিল। বিপিনের সমস্ত মুখ যেন কোন দুশ্চিন্তার ভারে ভারী হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ কহিল, অতো ভাবছিস কেন? তেমন কিছু তো নয়, সামান্য জ্বর আর—

বিপিন সহসা উত্তেজিত গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মিথ্যা কথা। মানুষ মরে এইখানেই যারা দাঁড়ি টানতে চায়, তারা হয় ভণ্ড নয় মিথ্যাবাদী। গাম্ভীর্য্যের কারণ বুঝিতে পারিয়া রমেশ ভয় পাইল। কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন রাখিয়া কহিল, আপাততঃ সে প্রশ্নের মীমাংসা না

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হ'লেও চলবে। কেন না, গাড়ী আসতে আর দেরি নেই। বিপিন খানিকটা বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুই অবাক হ'য়ে যাবি রমেশ, অজ্ঞতার কী দম্ভ! যেন চোখের দৃষ্টিটাই শেষ প্রমাণ। দেখ্‌বি মজা? মস্ত বড় দার্শনিক, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান যদি একটুও থাকে। এই ছ্যাথ, বলিয়া সেই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটা একেবারে সদ্য সদ্য দেখাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যাগ্‌ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। রমেশ ব্যাগটা টানিয়া নিয়া কহিল, ক্ষেপলি নাকি?

বিপিন কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইয়া কহিল, না রমেশ, আমার যাওয়া অসম্ভব। তারা আজও আসবে। বলিয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া যেন ব্যাপারটার দৃঢ়নিশ্চয়তা জানাইয়া দিল। রমেশ তাহার হাত ধরিয়া একটান মারিয়া কহিল, একেবারে উন্মাদ! নে, চল ওদিকে।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই একটি ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, শীগ্‌গির চলুন ডাক্তার বাবু।

রমেশ একটু মৃদু আপত্তি তুলিতেই লোকটি একেবারে তাহার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, একমাত্র ছেলে ডাক্তার বাবু, যা চান তাই দেবো।

রমেশ দুই একটা প্রশ্ন করিয়া বুঝিল, যাওয়া দরকার। এ অঞ্চলে সেই একমাত্র বড় ডাক্তার। আর রোগটাও যে-সে নয় একেবারে কলেরা। এদিকে বিপিন এক মস্ত সমস্যা। তাহার কাছে গিয়া কহিল, বুঝলি তো সব? তুই যা এই ট্রেনেই, আমি পরের গাড়ীতেই আসছি। বিপিন কি বলিল বোঝা গেল না। রমেশ আর একবার কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই ভদ্রলোক তাহাকে এক রকম টানিয়া লইয়া গেল। রমেশ দূর থেকে বলিল, যাস্‌ কিন্তু।

ছেলেটি বাঁচিল না। এমন অনেক রোগীই তো বাঁচে না। ডাক্তারের তাহাতে কি আসিয়া যায়? কিন্তু আজিকার এই মৃত্যুটা তাহাকে যেন কেমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া গেল। গত রাত্রির সমস্ত কাণ্ডের সঙ্গে বিপিনের বক্তৃতা মিশিয়া, তাহার মনের মধ্যে যেন কোন অদৃশ্য-লোকের অচিন্তনীয় দৃশ্য আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। সেই বাড়ীটায় ফিরিবার কথা মনে হইতেই তাহার সমস্ত শরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কোন্নগরে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ী। সেই দিকেই ক্লান্ত চরণ চালাইয়া দিল।

রমেশ অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিয়াছিল। সহসা এক সময়ে খেয়াল হইল, পা যেন আর চলিতে চায় না। ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! রাত্রি প্রায় বারোটা। এতক্ষণ যে কোথা দিয়া কি করিয়া গেল, তাহার বুদ্ধির অতীত। এইবার চোখে পড়িল, কী দুর্ভেদ্য জমাট অন্ধকার! তাহার সঙ্গে কলের ধোঁয়া রাস্তার পাশে পচা ড্রেনের দুর্গন্ধ এবং ঝিঁঝিঁপোকার ডাক মিশিয়া চারিদিকটা যেন থম্‌ থম্‌ করিতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া পথ চলিতে হয়। রমেশ চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। এ যে কোথায়, উত্তর না পশ্চিম, কিছুই বোঝা গেল না। অগত্যা আবার চলিতে লাগিল। কয়েক পা চলিতেই সুমুখে যাহা দেখিল, এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জল হইয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। ঠিক সুমুখেই সেই বাড়ীটা প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। রমেশ ক্ষণেকের জন্য কি ভাবিল। ছেলেবেলায় শুনিয়াছিল ইহাদের হাতে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। যেমন করিয়া হোক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ফাঁদেই পা দিতে হইবে। সেই কথা মনে করিয়া তাহার আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। রাস্তার ধারেই বসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল রিভলবার। রমেশ যেন সমস্ত চেতনাকে ঠেলিয়া তুলিয়া, এক নিঃশ্বাসের উপরে গিয়া, বাক্স খুলিয়া রিভলবার হাতে নিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত বাড়ীটায় এতটুকু শব্দ নাই। রক্তহীন স্তব্ধতা পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়া আছে। রমেশ প্রাণপণ বলে পিস্তলটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিল। কিন্তু সমস্ত শরীর এমন কাঁপিতেছিল, মনে হইল যে কোনও মুহূর্ত্তে সেটা ছিটকাইয়া পড়িতে পারে। কোন রকমে উঠিয়া গিয়া জানালা বন্ধ করিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু কম্পন থামিল না। হাড় মাংসের ভিতর হইতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে পাইল রুদ্ধ ঘরের স্তব্ধ অন্ধকার তাহাকে হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে। মাথা নাই, চক্ষু নাই, শুধু একটা দেহহীন হাঁ। অজ্ঞাতসারে চক্ষু

য়া আসিল। সমস্ত দেহটাকে পিণ্ডের মত জড়ো করিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া সে পড়িয়া রহিল। বুকের ভিতরে যন্ত্রটা এমন ভীষণ বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল, মনে হইল কোনও মুহূর্ত্তে সে বেচারী একেবারে থামিয়া যাইবে।

এই ভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছিল, রমেশ জানিতে পারে ই। সে যেন এক যুগ। হঠাৎ কানে গেল কতকগুলি াক চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতেছে। ক্রমে দ স্পষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আরো স্পষ্ট। অকস্মাৎ াঁহার পরদা চড়িয়া গেল। তিনশ পাঁচশ, হাজার গুণ। কী দ গর্জ্জন! যেন এক সহস্র লোক এক সঙ্গে আকাশ াটাইয়া হা হা হা হা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই প্রচণ্ড দ-সঙ্ঘাতে দরজাটা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গেল, এবং াহিরের সমস্ত স্তূপীকৃত ভয় হুড় হুড় শব্দে ঘরে ঢুকিয়া ল। রমেশ অনুভব করিল তাহার সমস্ত শরীরে জলের াত বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু হাত নাড়িয়া মুছিয়া ফেলিবে মন সাহস হইল না। নিজেকে স্পর্শ করিতেও তাহার ভয় হইতে লাগিল। হু হু শব্দে বাতাসের ক্রোধান্ধ গর্জ্জন থাকিয়া থাকিয়া বহিতে লাগিল, এবং তাহারি তালে তালে রমেশের রক্তস্রোত উদ্দাম বেগে ছুটিল। মনে হইল, কখন স মাংস এবং চামড়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া ফাটিয়া বাহির হইয়া ড়িবে।

রমেশের জ্ঞান তখনো স্পষ্টই ছিল, এবং প্রাণপণে তাহারি জন্য সমগ্র চেতনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু আর বোধ হয় পারিল না। কখন এক সময়ে তাহার ধারণা হইল, সে যেন নাই; মরিয়া শব হইয়া গিয়াছে; এবং দুইটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল সাত হাত লম্বা রক্তমাংসহীন হাত বাহির করিয়া তাহাকে টানিতেছে। এ-দুইটা যেন তাহার চেনা, কলেজে অনেক দিন ইহাদের লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছে। হাড়ের স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুহ্যমান অবস্থাটাও কাটিয়া যাইতেই, রমেশ চক্ষু মেলিয়া দেখিল অস্ফুট, ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় সমস্ত ঘরময় কে যেন চলিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাণ্ড শীর্ণ দেহ। যেন ছায়াশরীর রক্তহীন হাড়। রমেশ আর একবার ভালো করিয়া দেখিল, ভুল নয়, সত্য। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার গায়ে অসীম বল ফিরিয়া আসিল। এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গুলিভরা রিভলবার উঁচু করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, সাবধান! স্বর ফুটিলনা, কিন্তু গুলি ছুটিয়া গেল। ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল। কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, বেদনা-বিকৃত, তবু পরিচিত কণ্ঠের বুকফাটা আর্ত্তনাদ! রমেশের হাত হইতে পিস্তলটা খসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা বিকট চীৎকার করিয়া সেই জরাজীর্ণ বাড়ীটার বুকের ভিতর হইতে যেন কত যুগ-সঞ্চিত অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস বিপুল বেগে বাহির হইয়া গেল। রমেশ চমকিয়া দেখিল, সম্মুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে প্রতি সূক্ষ্ম আলোক-রাশির অস্ফুট কণায় লক্ষ লক্ষ বন্ধন-মুক্ত আকাঙ্ক্ষা প্রচণ্ড উল্লাসের খল খল হাস্যে করতালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সহসা মনে হইল তাহারা যেন এক একটি দেহহীন বিপিন; যেন বলিতেছে পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি। রমেশ দুই হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল; পারিল না। সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

ভাষা-সংস্কার

৺মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা Young Bengal সমিতির তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের proceedings এর minutes।

"বর্ত্তমান century-তে বঙ্গ ভাষার improvement।"

স্থান—হেদুয়া ; কাল—সন্ধ্যা ; উপস্থিত—চারু, হেম, নলিনী, গোপাল, শ্যামচাঁদ প্রভৃতি দশ বারো জন সভ্য।

চা। আজ আমাদের subject কি ?

হে। "বর্ত্তমান century-তে বঙ্গ ভাষার improvement।"

গো। বেশ উপযুক্ত বিষয়টি; বাদানুবাদ খুলবেন কে ?

হে। নলিনী—একবারে right man in the right place।

চা। Oh, yes! বেচারা আমাদের languageএর improvement যথেষ্ট study করেছে।

হে। তা হ'লে আর দেরী কি? Proceedings commence করা যাক্। (উঠিয়া)—আমি propose করছি যে আমাদের worthy and esteemed friend গোপাল বাবু আমাদের আজকার meetingএ chairman হোন।

চা। আমি হেমবাবুর proposal pleasureএর সহিত second করছি।

গো (উঠিয়া) ভদ্র মহাশয়গণ! আমি বিবেচনা করি যে আমার কদাচ আবশ্যক যে আপনারা আমার উপর যে মস্ত মান্য অর্পণ করিলেন তাহা দ্বারা আমি নিজেকে খুব বেশী রকম খোসামোদিত বোধ করছি। এই বোঝা ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যটি কোন যোগ্যতর স্কন্ধে ন্যস্ত হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক আমি চেষ্টা করিব ক্ষমতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে। এই কয়েকটি কথার সহিত ভদ্র মহাশয়গণ আমি আহ্বান করিতেছি আমাদের অদ্য সন্ধ্যাকালের বক্তা নলিনী বাবুকে দান করিতে তাঁহার বক্তৃতাটি যাহা আমাদের সন্দেহ নাই যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।

(উপবেশন ও সকলের করতালি)

নলিনী বাবুর উত্থান ও পুনরপি করতালি

ন। সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহোদয়গণ, আমি যে subjectটি অদ্যকার বক্তৃতার জন্য select করেছি সেটি অত্যন্ত vast ও complicated এটা বোধ হয় আপনারা কেউ deny করবেন না। আজকাল এই দেশের জাগরণের দিনে আমাদের মাতৃভাষার কথাটি কেহই ভাল করিয়া reflect করেন না, subjectটির importance কিন্তু কোন মতেই over-estimated হ'তে পারে না। স্বদেশের regenerationএর আবশ্যকতা কি কি উপায়ের দ্বারা ventilated হয়? হয় meetingএ speech দিয়ে, না হয় newspaper বা journalএ article লিখে, না হয় Government বা Parliamentকে memorial ক'রে। এই সবেতেই ভাষা বা language বিশেষ আবশ্যক। এহেন subject যে আমি take up করেছি সেটা আমার পক্ষে presumptuous বলতে হবে, আর আমার poor talentsএর সাধ্য নাই যে এরূপ subjectএর প্রতি adequate justice করি। তবে কিনা এটা আমার বেশ ভরসা আছে যে আমার defect and shortcomings গুলি আপনারা kindly and indulgently overlook ক'রে যাবেন, ও যা কিছু gaps আমার lectureএ থাকবে সেগুলি আপনাদের learned discussions দ্বারা fill up করবেন। প্রথমতঃ, এই বর্ত্তমান 20th centuryতে যা কিছু আশ্চর্য্যজনক revolution হয়েছে, আমাদের বঙ্গভাষার improvement হ'ল তার মধ্যে grandest! দেখুন সেকেলে বাংলা ভাষাটাকে সংস্কৃতের একটা ভেংচান বললেও বড় exaggeration হবে না। বিদ্যাসাগর

মহাশয় প্রভৃতির productionsও আমার remarksএর মধ্যে আসে। আর বিশেষতঃ আমাদের grandfatherদের আমলে pure Bengali জিনিসটাই rare ছিল। তার ভেতরে at least অর্দ্ধেক সেকেলে মুসলমানী dialect—সেকেলে জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্র বা দলিল দস্তাবেজ দেখলেই আপনারা আমার কথাটার force বেশ realise করতে পারবেন। Languageএর যত রকম defect থাকতে পারে, impurity হচ্চে তার মধ্যে most intolerable। একটা আরবি, পারসি, সংস্কৃতের hodge-podgeকে আপনারা যদি কেহ ভাষা বল্‌তে চান ত বলুন, আমি কিন্তু ওরূপ languageকে bastard language ও civilized nationএর অযোগ্য language ব'লে characterise করতে কিছু মাত্র hesitate করব না। বরং চিরকালের মত dumb speechless হ'য়ে থাকা desirable, তবু যেন ওরূপ base admixtureকে ওরূপ barbarous gibberishকে নিজের mother-language ব'লে acknowledge করতে না হয়! (Hear, hear! ও ঘন করতালি) এখন দেখুন, the other side of the picture! আজকালকার languageএ আর সেকেলে সেই barbarous gibberishএ Heaven and Hell প্রভেদ! কোথায় সে পরের ভাষা থেকে borrow করা উড়ে গেছে, আর তার জায়গায় কেমন chaste and pure এবং কতটা progressive language এসেছে! আমরা যে thoroughly unalloyed and unadulterated ভাষা ব্যবহার করছি ও আমাদের grateful posterityকে যে enriched, and pure language রূপ rich legacy bequeath ক'রে যাব, তা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের wildest dreamsএরও beyond ছিল। এ subject সম্বন্ধে আর আমার কিছু remark করবার নেই।

ঘন করতালির মধ্যে উপবেশন

গো। এক্ষণে আমি বিদ্বান বক্তা মহাশয়ের এই সুন্দর বক্তৃতার উপরে বাদানুবাদ আমন্ত্রণ করিতেছি। ভরসা করি সভ্য মহাশয়েরা উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আলোকিত করিবেন।

হে। (উঠিয়া) সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহাশয়গণ! অদ্যকার subjectটি যেরূপ গুরুতর ও time যেরূপ short তাতে আপনারা আমার কাছে থেকে একটা lengthy discussion expect করবেন না বলা বাহুল্য। আর আমাদের learned lecturer মহাশয় বর্ত্তমান subjectটাকে এরূপ সুন্দরভাবে handle করেছেন যে আমাদের আর additional light throw করবার বড় কিছু রাখেন নাই। তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বেচারাদের justificationএ একটি কথা suggest করতে ইচ্ছা করি। তাঁরা যে মুসলমানী dialect অত freely use করতেন তার কারণ এই যে মুসলমানেরা তাঁদের রাজা ছিলেন, সেজন্য তাঁদের language জানাটা absolutely necessary ছিল এবং রাজভাষা ব'লে তাঁদের ভাষাটা একরকম Lingua Franca গোছ হ'য়ে পড়েছিল। এই কয়টি remark ছাড়া আর আমার present subject সম্বন্ধে কিছু occur করছে না।

করতালি ও উপবেশন

চা। (সবেগে উঠিয়া) Mr. President and gentlemen! আজকার subjectএর উপর directly আমার comment করবার কিছু নাই, কিন্তু হেমবাবু যে abruptly একটা observation ক'রে ফেল্লেন, যে মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিলেন ব'লেই মুসলমানী languageটা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের languageএর compositionএ অতটা largely enter করেছিল, ও positionটা একবারেই tenable নয়। ওঁর argumentএর fallacyটা আমি এক কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে English languageটা আমাদের এখনকার রাজভাষা, তা ব'লে কি আমাদের বর্ত্তমান ভাষাটা তা থেকে এক syllable borrow করেছে, না English language দিয়ে আমাদের speechই বলুন আর writingsই বলুন আমরা intersperse ক'রে থাকি? এই যে আমরা এই সব deliberations conduct করছি, এর ভিতরে কি আপনারা English languageএর slightest traceও পাচ্ছেন? আসল কথাটা হচ্ছে এই, তখন Bengali languageটা ছিল in its infancy, সুতরাং infantদের মত mimic করতো, আর এখন সেটা হ'য়ে

৺মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়েছে adult ও matured, এখন আর অন্য কোন language থেকে borrow করবার কোনই earthly necessity নাই। মশায়, language যখন আমাদের language-এর মত improved ও well-formed হয়, তখন কি আর তার অন্য languageএর ওপর depend করতে হয়? বরং সে তখন ওরূপ helpকে disdain করে, তার very ideaকে spurn করে, just as in our case।

ঘন ঘন hear! hear! ও করতালির মধ্যে উপবেশন

শ্যা। মহাশয়গণ! সময়টা অনেকদূর অগ্রসর অর্থাৎ advance হয়েছে। আমি দু এক কথা নিবেদন অর্থাৎ submit ক'রেই ব'সে পড়ব্বো। আমার পূর্ব্ব বক্তা মহাশয় বলেছেন যে আমরা আর বিদেশী ভাষা থেকে ধার করি না অর্থাৎ borrow করি না, সেটা অনেকটা ঠিক কথা বটে, তবে কিনা অনেকের এমন কু অভ্যাস অর্থাৎ bad habit আছে যে সামান্য একটা কথা বোঝাতে অর্থাৎ explain করতে গিয়ে দুই একটা ইংরাজি বুক্‌নি অর্থাৎ English expressions ব্যবহার না ক'রে থাক্‌তে পারেন না। বলা বাহুল্য যে আমাদের বঙ্গ ভাষায় এরূপ উন্নত অবস্থা বা improved stageএ এরূপ অভ্যাস বড়ই দুঃখজনক অর্থাৎ regrettable। অতএব আমি আগ্রহের সহিত প্রস্তাব করছি, অর্থাৎ earnestly propose করছি যে আজ হইতে সকলে যেন এই খুব সাবধানতার সহিত বর্জ্জন করেন অর্থাৎ very carefully shun করেন।

করতালি ও উপবেশন

ন। এইবারে আমরা learned President মহাশয়ের valuable remarks শোনবার জন্যে eager হয়েছি।

গো। (ঘন ঘন করতালির মধ্যে উঠিয়া ও সশব্দে গলা পরিষ্কার করিয়া) সময় সম্মানিত প্রথা ও আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে আমি এক্ষণে অদ্যকার আলোচনাগুলি গুটাইয়া কয়েকটি কথা বলি। প্রথমতঃ আমি •বলিতে ইচ্ছা করি যে আমরা অত্যন্ত আমোদ ও লাভের সহিত বিদ্বান বক্তা মহাশয়ের বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়াছি, ও সেজন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্টভাবে ধন্যবাদ দিতে পারি না। এটি বোধহয় নিরাপদে বলা যাইতে পারে যে ইনি এই বিদ্বান বিষয়টির প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করেছেন, ও সে চেষ্টাও সফলতা-মুকুটিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমি আপনাদের বাদানুবাদগুলি তেরিজ করিয়া লই। সেকালের ও একালের বাংলা ভাষার ক্ষতস্থানগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যথাক্রমে বক্তা মহাশয় ও শ্যাম-চাঁদ বাবু ভালই করিয়াছেন, আর চারুবাবুও ঠিক বলিয়াছেন যে রাজভাষা বলিয়াই যে আমাদের ভাষার ভিতরে তাহাকে চালাইয়া দিতে হইবে ইহা আবশ্যকভাবে অনুসরণ করে না। তবে একটি বিপদ আছে যাহার বিরুদ্ধে আমি আপনাদিগকে যথেষ্ট সাবধান করিয়া দিতে পারি না। অর্থাৎ ইংরাজি ভাষা এড়াইবার চেষ্টাতে আপনারা যেন অপর প্রান্তে না দৌড়িয়া যান। আমি এরূপ অনেককে দেখিয়াছি যাহাদের ব্যবহৃত তথাকথিত বঙ্গভাষা ইংরাজি ভাষার আক্ষরিক তর্জ্জমা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমি আশা ও বিশ্বাস করি যে আপনারা সকলেই আমার স্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন ও পূর্ব্বকথিত বিপদগুলি হইতে পরিষ্কার ভাবে বাহিয়া যাইবেন। তাহা হইলেই আমাদের ভাষা ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রাখিবে না। পরিশেষে ভদ্র মহাশয়গণ, আসুন, আমরা বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমাদের, খাঁটি, সতী ও উন্নতা মাতৃভাষার নিমিত্ত তিন উল্লাস প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করি।

ঘন ঘন করতালি ও সকলের hip hip hurrah করিতে করিতে প্রস্থান

তীর্থযাত্রী

—গল্প—

—শ্রীঅনিলবরণ রায়

১

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় আর যাহার যত ক্ষতিই হউক, আমার কোনও ক্ষতি হয় নাই, বরং বিশেষ লাভই হইয়াছে। আমি ছিলাম বীরভূম-বারের একজন জুনিয়র উকিল। ওকালতিতে নাম লিখাইবার পর চার পাঁচ বৎসর নিছক বসিয়া কাটাইয়াছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিরূপ কষ্টে সৃষ্টে যে বাসাখরচটুকু চালাইতে হইত তাহা ভগবানই জানেন। বারলাইব্রেরীতে বসিয়া গল্পগুজব করা আর ব্রীজ্‌খেলা এবং বাসায় আসিয়া মক্কেলের আশায় তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া থাকা একজন পূর্ণবয়স্ক কর্ম্মক্ষম যুবকের পক্ষে বৎসরের পর বৎসর এই ভাবে কাটান যে কি ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই বুঝিবে না। যাহারা কখনও অর্ডিন্যান্স আইনে বন্দী হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত জেলে কাটাইয়াছেন, তাহারা জুনিয়র উকীলের ব্যথা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। আর চলে না, এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী উকিলগণকে অসহযোগ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ওকালতি ছাড়িলে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ মিলিবে। এমন অমূল্য জিনিষটি ছাড়িয়া দিলে বছরের মধ্যেই যদি দেশের স্বাধীনতা পাওয়া যায় তাহাতে কার আপত্তি থাকিতে পারে? আমার গৃহিণী কিন্তু বড়ই বুদ্ধিশালিনী, তাঁহার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি প্রথম হইতেই বলিয়াছিলেন, "তাও কি হয়? এক বছরে স্বরাজ! ওসব ছেলে ভোলানো কথা।" আজ আমার গুণবতী গৃহিণীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির তারিফ্ করিতেছি।—কিন্তু যাহাই হউক, তখন আমার পক্ষে একটা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহিণীকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া, হাত পা ছাড়িয়া ঝুলিয়া পড়ার ন্যায় আমি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

একেবারে দেশপূজ্য নেতা। হাতে এত কাজ আসিয়া পড়িল যে আহার নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত পাইতাম না। আজ এখানে বক্তৃতা দিতে হইবে, কাল ওখানে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে হইবে, চরকা, জাতীয় শিক্ষা, সালিশ, পিকেটিং, অস্পৃশ্যতানিবারণ, মাদকতানিবারণ, আরও কত কি, সে সব কাহিনী লিখিবার জন্য আজ আমি লেখনী ধারণ করি নাই। দুই তিন বৎসর দেশের কাজে বাস্তবিকই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু, কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে! দেশ স্বরাজের দিকে যদি এক পা আগাইয়াছিল ত আবার যেন সাত পা পিছাইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। ক্রমে কাজও কমিয়া আসিল, জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র নাই, কংগ্রেসে সভ্য নাই, সভায় বক্তৃতা দিতে গেলে শুনিবার লোক মেলে না—এ যেন জুনিয়র উকিলেরও বেহদ্দ। যাক্, আর ভণিতা করিব না, সুড়্ সুড়্ করিয়া পুনরায় মূষিক হইলাম। বারলাইব্রেরীর পুরাতন বন্ধুরা অনেকেই বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া আমাকে শুনাইতে লাগিলেন, "আমরা তখনই বলেছিলাম, ও-সবে কিছু হবে না।"

কিন্তু, স্বরাজ না হোক্, স্বরাজের জন্য ঘোরাঘুরি করিয়া দেশের মধ্যে যে একটা নাম করিতে পারিয়াছিলাম তাহাতে আমার ওকালতির পসার আশাতীত ভাবে খুলিয়া গেল। এখন আর আমার সে-দিন নাই, ভাল রকমের একটা বাসা লইয়াছি, গুণবতী গৃহিণীকে দুই চারখানা গহনাও কিনিয়া দিয়াছি। দেশ-উদ্ধারের কাজ সংবাদপত্র পাঠ করিয়াই শেষ করি, মাঝে মাঝে বন্ধুমহলে বর্ত্তমান স্বরাজ্য দলের কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করি। বাস্তবিক, দেশের কাজে নামিয়া খাঁটি কর্ম্মী বড় একটা দেখিতে পাই নাই, বেশীর ভাগ আমারই ন্যায় হুজুক-প্রার্থী, নাম, যশ, পদপ্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যস্ত। নিজের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের নীচে স্থান দিতে, নিজের "অহং"কে ভুলিয়া কাজ করিতে আমাদের

তীর্থযাত্রী

শ্রীঅনিলবরণ রায়

দেশের লোক এখনও বেশ শিখে নাই। আবার যাহাদের মধ্যে সত্যিকার ত্যাগের প্রেরণা আছে তাহাদের ধৈর্য্য নাই, কার্য্যকুশলতা নাই। আমাদের নেতা বা কর্ম্মীদের মধ্যে practical কাজের লোক নাই বলিলেই হয়, সবাই ভাবের আবেশে মত্ত, কোন জিনিষটা তলাইয়া দেখে না, একটা sensational বা চমকপ্রদ কিছু করিতে পারিলে আর তাহারা কিছুই চায় না। কিন্তু, কয়েকজন খাঁটি নীরব কর্ম্মীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের একজনার কথাই আজ বলিব।

তাঁহার নাম হরিদাস দত্ত। তিনি ছিলেন একটি স্কুলের শিক্ষক, বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়া আর পড়েন নাই। ছাত্রাবস্থাতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কে আসেন, তাহাতেই তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি কোথাও দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তবে সেবাধর্ম্মকেই তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন এবং এই জন্য আজীবন অবিবাহিত থাকিবার সঙ্কল্প করেন। যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন তাহার বয়স উনত্রিশ কি ত্রিশ। তিনি যে স্কুলে কাজ করিতেন সেইটিকেই জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় নিজে গিয়া একটা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার সহিত অনেক ছাত্রও যোগ দেয়। কিন্তু, ক্রমে অন্যান্য জাতীয় বিদ্যালয়ের ন্যায় সে বিদ্যালয় উঠিয়া যায়, কিন্তু তিনি আর তাহার পূর্ব্বপদে ফিরিয়া যান নাই। একখানি গ্রামকে সংগঠন করিবার ভার লইয়া তিনি সেই গ্রামে একটি পাঠশালা খুলিয়া বসেন। ক্রমে ক্রমে সেই গ্রামের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গ্রামখানির সর্ব্বতোমুখী উন্নতির এমন ব্যবস্থা তিনি করিতেছিলেন, যে তাহা আদর্শস্বরূপ হইয়া উঠে।

হরিদাস বাবু ছিলেন অন্য জেলার কর্ম্মী। কংগ্রেসে কার্য্যোপলক্ষে মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত কলিকাতায় আমার সাক্ষাৎ হইত। সকলেই তাঁহাকে একজন খাঁটি কর্ম্মী বলিয়া জানিত এবং সকলেই তাঁহার সংযম ও চরিত্রের, তাঁহার দেশপ্রেম, সাহস ও কর্ম্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিত। একটা মোটা ময়লা খদ্দরের ছোট কাপড় পরিধান করিয়া এবং সেই রকম একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া উস্কখুস্ক একমাথা চুল এবং খালি পা লইয়া তিনি যেখানেই উপস্থিত হইতেন, সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিত। অমন আপনভোলা, সেবাপরায়ণ, দেশগতপ্রাণ একনিষ্ঠ কর্ম্মী আমি আর কোথাও দেখি নাই।

২

কংগ্রেসের সম্পর্ক ছাড়িয়া আসিবার পর বহুদিন হরিদাসকে দেখি নাই, তাহার সংবাদ লইবার কোন প্রয়োজনও বোধ করি নাই। চার পাঁচ বৎসর পরে সহসা একদিন হরিদাস আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত, সেইরূপ উস্কখুস্ক চেহারা, পরণে মোটা ময়লা ধুতি, খালি পা, বগলে একটা কম্বল এবং ময়লা কাপড় বাঁধা একটা বোঁচ্‌কা। কিন্তু তিনি একা নহেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল একটি রমণী, তাহারও চেহারা হরিদাসের ন্যায়ই উস্কখুস্ক, তাঁহারও বগলে ছোটখাটো একটা মোট্—দুই জনার পায়ে ধূলা হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, দেখিলেই বুঝা যায় যে তাঁহারা অনেকখানা পথ পায়ে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন। হরিদাসকে দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিলাম, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিদাসবাবু যে! কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

"আস্‌ছি, ভাই, বক্কেশ্বর থেকে।"

"পায়ে হেঁটেই?"

"হাঁ—তা বৈকি।"

বলিতে বলিতে বোঝাটা নামাইয়া পায়ের ধূলা ঝাড়িতে লাগিলেন। সঙ্গিনীটিও তাহার বোঝা নামাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সঙ্গে এটি কে?"

দুই জনে একবার দুই জনার মুখের দিকে চাহিলেন, চকিতে দুই জনার মধ্যে কি যেন একটা নীরব আলাপন হইয়া গেল, হরিদাসবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওটি আমার বিধবা বোন্, আমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছে।"

আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, কিন্তু তখনই নিজেকে বুঝাইলাম, আদর্শ ব্রহ্মচারী হরিদাস, তাহার সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ উঠিতে দেওয়া ঠিক নহে, আমারই মনের ভ্রম। তখনই দুই জনাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম, স্ত্রীর নিকট সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া তাহাদের

আহারাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। হরিদাস মুখ হাত পা ধুইয়া বাহিরের ঘরে আমার নিকট আসিয়া বসিল। আমি বলিলাম "এখন আর কোন কথাবার্ত্তা নয়। বক্রেশ্বর হ'তে হেঁটে এসেছেন, সে অনেকখানি পথ—জলযোগ ক'রে একটু বিশ্রাম করুন।"

হরিদাস বলিল, "এরূপ হাঁটা আমাদের নিত্য ব্যাপার, এতে আমার কোন কষ্ট নেই।"

"বলেন কি? এই রকম পায়ে হেঁটেই তীর্থ ক'রে বেড়াচ্চেন?"

"তীর্থভ্রমণ পায়ে হেঁটেই হয় ভাল,—তা' ছাড়া অর্থাভাবও বটে।"

"আপনি না হয় চিরকাল কঠোরতা অভ্যাস করেছেন, বিশেষত অসহযোগ আন্দোলন ক'রে এ সব আপনার স'য়ে গেছে, কিন্তু আপনার বোন্‌টি, ও এ সব কঠোরতা সহ্য করতে পারে?"

হরিদাস হাসিয়া বলিল, "মেয়েদের সহিষ্ণুতা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সুরেশবাবু,—ওরা যত কষ্ট সহ্য করতে পারে পুরুষে তা' কল্পনাও কর্‌তে পারে না।"

"আপনারা কত দিন এরকম ঘুর্‌ছেন?"

"প্রায় দু' বৎসর।"

"এর মধ্যে বাড়ী ফেরেন নি?"

"না।"

আমার বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,"পথে স্ত্রীলোক নিয়ে এমন ভাবে ঘুর্‌ছেন, এতে বিপদ আছে।"

"বিপদ কোথায় নেই ভাই? পদে পদে বিপদকে ভয় করতে হ'লে সংসারের পথে আর চলা যায় না। বিপদ যখন এসে পড়বে তখন যা হয় করা যাবে, আগে থেকে তার জন্য ভয় ক'রে লাভ কি?"

"তা' ব'লে বিপদকে কি টেনে আন্‌তে হবে?"

"না, সাধ ক'রে বিপদকে টেনে আমরা আনি না। যথাসম্ভব সাবধানেই আমরা চলি।"

দেখিলাম ইহার সহিত তর্ক করিয়া কোনও লাভ নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের সঙ্গে টাকা কড়ি কিছু নেই?"

হরিদাস হাসিয়া বলিল, "ঐটিই বিপদের মূল; টাকা কড়ি আমাদের কাছে নেই ব'লেই আমরা অনেকটা নিরাপদ।"

"তবে আপনাদের চলে কিসে?"

"চলা? সে ত পায়েই চলি, টিকিট কিন্‌তে হয় না। আর খাওয়া থাকা? ভারতবর্ষের যতই দুর্দ্দশা হোক্, তীর্থযাত্রীরা যেখানেই যাক্ এখনও দুটি খেতে পায়। বিশ্রামের জন্য যদি ঘর-বাড়ি পাওয়া না যায়, গাছতলার অভাব কোথাও হয় না।"

"এই ভাবে ভিক্ষে ক'রে খেয়ে আর গাছতলায় বাস ক'রে দু'বছর ঘুর্‌ছেন?"

"এক রকম তাই বৈকি?"

আমি হরিদাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কেমন একটা শান্ত পবিত্রতার ভাব, কোন চিন্তা বা উদ্বেগের রেখা সে মুখে নাই। এ যেন একটা মহাপুরুষের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছি। আমার ভিতরে আপনা হইতেই শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সেই রমণীটি বাড়ির ভিতর হইতে আসিল। ইতিমধ্যে সে স্নান সারিয়া ফেলিয়াছে, এক রাশি চুল পৃষ্ঠের উপর ফেলিয়া দিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় বহুদিন চুলের সহিত তেলের কোন সম্পর্ক নাই তবু তাহারা কেমন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, অনেকটা হরিদাসেরই ন্যায়। মুখখানির গড়ন সুন্দর, তাহাতে বড় বড় ভাসা ভাসা দুটি চোখ। বয়স সাতাস আটাশের বেশী হইবে না। দেখিলাম সুন্দরী বটে, ধূলায় ঢাকা ক্লান্ত শরীর লইয়া যখন সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে আমি চিনিতে পারি নাই।

অতি সহজ স্বচ্ছন্দভাবে রমণী বলিল "সুরেশবাবু, এইবার ওকে একবার ছেড়ে দিন। সকাল থেকে কিছু খায়নি, একটু জলযোগ করুক, তার পর ওর সঙ্গে ব'সে যতক্ষণ ইচ্ছে গল্প কর্‌বেন।"

কি পবিত্র চাহনি! কি সুন্দর হাসি ও মিষ্ট কথা! আমার সমস্ত শরীরের উপর দিয়া একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। হরিদাসের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদয় হইতেছিল,

শ্রীঅনিলবরণ রায়

এই যৌবনে যোগিনীটিকে দেখিয়া তাহারও প্রতি ঠিক সেইরূপ শ্রদ্ধায় আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

৩

একটু ফাঁক পাইয়া আমার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়েটিকে কেমন দেখ্‌লে?" আমার স্ত্রী আগ্রহের সহিত বলিল, "আহা, লক্ষ্মীপ্রতিমা, কথা কয় যেন বুক জুড়িয়ে যায়। কিন্তু, তুমি ভুল বলেছ, ওরা ভাই বোন নয়, ওরা স্বামী স্ত্রী।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সে কি?"

"হঁা, মেয়েটি নিজেই বলেছে, হরিদাস ওর স্বামী।"

"তবে বিধবার মত বেশ কেন?"

"ওরা কি সংসারী? ওরা যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী,—সংসারীর মত ওদের চালচলন কেন হবে?"

আমার বিস্ময় আরও বাড়িতে লাগিল। হরিদাসের মধ্যে সন্ন্যাসীর চিহ্ন আমি কিছুই দেখি নাই। তাহা ছাড়া আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি, হরিদাস বলিয়াছিল, ওটি তাহার বিধবা ভগ্নী।

স্ত্রী বলিল,"সেটা তোমাকে হয়ত রহস্য ক'রেই বলেছে।"

কিন্তু, এ কি রকম্ রহস্য!

স্ত্রীর সহিত আর বেশী কথাবার্ত্তার সুবিধা হইল না। হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া আবার বাহিরের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। হরিদাস তখনই শয্যাগ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। আমিও রহস্যভেদ করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত। বলিলাম, "আপনার বোন্‌টির মুখে হাসি লেগেই আছে।"

"হাঁ, ও ঐ রকমই বটে, কোন বিপদ আপদে আমি দেখিনি যে ওর মনে বিষাদ বা ভয় এসেছে।"

"আপনারা তা' হ'লে বিপদ আপদে পড়েছেন?"

"তা' দুই একটা অমন আসে বৈকি? একবার একটা বনের ধার দিয়ে যেতে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। সেখান থেকে লোকালয় অনেক দূরে। নিকটেই একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়ের তলায় এসে আমার মনে কি ভাবের উদয় হ'ল, আমি প্রাণ খুলে গান আরম্ভ করলাম, বোনটিও আমার সঙ্গে যোগ দিল, কিছুক্ষণ দু'জনেই গানে তন্ময় হ'য়ে ছিলাম—এমন সময় একটা বিকট গর্জ্জন শুনে আমাদের চৈতন্য হ'ল। নিকটেই কোন একটা গুহায় একটা বাঘ ঘুমোচ্ছিল, আমাদের গানের শব্দ শুনে উঠে গর্জ্জন আরম্ভ করেছে। সে কি ভীষণ শব্দ, সমস্ত বন ও পাহাড় যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। আমার বোন্‌টি বলল, "এবারে হয়েছে, ও বাঘ আমাদের দেখ্‌তে পেয়েছে, এসে ধরলে ব'লে।"

কিন্তু, তখনও সে হাস্‌ছে, গলা ছেড়ে গান ধরল—

ফুরাল মা ভবের খেলা
এসগো মা এই বেলা।

আমি তাকে ধমক্ দিয়ে বললাম—"চুপ কর। বাঘ যদি দেখ্‌তে পেয়ে না থাকে, তোমার ঐ চীৎকার শুনেই দেখ্‌তে পাবে।" সে হাসতে হাসতে বল্লে—"আমি ত তাই চাই। বাঘটা এসে আমাকে নিয়ে যাবে, সেই ফাঁকে তুমি পালিয়ে যাবে।"

"তারপর কি হ'ল?

"হবে আর কি? ভগবান রক্ষা করলেন। ঠিক সেই সময়ে এক দল সাঁওতাল সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিল, তারা সকলে মিলে এমন বিকট চীৎকার আরম্ভ করলে যে বাঘটা বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। তারা আমাদের কত তিরস্কার করলে, "সন্ধ্যের পর এসব পথে চলিস্ না তোরা, ম'রে যাবি।"

* * * *

কৌতূহল চাপিয়া রাখা আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি বলিলাম, "হরিদাসবাবু! যদি কিছু না মনে করেন ত আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

হরিদাস হাসিয়া বলিল, "কি কথা? ঐ মেয়েটি আমার সত্যকারের বোন্ কিনা?"

আমি একটু অপ্রতিভই হইলাম। হরিদাস বলিতে লাগিল, "আপনার কাছে বলতে আমার কোন আপত্তি নেই সুরেশবাবু, কিন্তু সে একটা কাহিনী, দুই এক কথায় বলা যায় না, একটু অবসর প্রয়োজন, তাই প্রথমে একটা

কাজচলা জবাব দিয়াছিলাম যে ও আমার বোন্। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওর সঙ্গে আমার সামাজিক কোন সম্বন্ধই নেই, ও ব্রাহ্মণের মেয়ে আর আমি কায়স্থ।"

আমার মুখের উপর একটা ছায়া আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে আমার প্রথমকার সন্দেহ সত্য! এ সংসারে দেখিতেছি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। হরিদাসের ন্যায় আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী সেবাপরায়ণ পুরুষ একটা যুবতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শাস্ত্রে যে বলিয়াছে, নারী নরকের দ্বার, ইহা অপেক্ষা বড় সত্য আর কিছুই নাই।

"কি ভাই? অম্নি যে মুখ চূণ হ'য়ে গেল! এই জন্যই আমি সমাজে থাক্‌তে পারি না, পথে পথে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। পথই আমার ঘর।"

"কিন্তু—"

"আচ্ছা, আমার কাহিনীটাই আগে শুনুন, তারপর বিচার করবেন।"

৪

সেবার রথ উপলক্ষ্যে জগন্নাথে অসাধারণ ভিড় হয়। আমি একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া জগন্নাথে উপস্থিত হইয়াছিলাম, উদ্দেশ্য, রথ দেখা এবং কলা বেচা, সেবাকার্য্য, সেই সঙ্গেই জগন্নাথদর্শন এবং সমুদ্রের বিশুদ্ধ বায়ুসেবন। সে কি ভয়ানক জনতা! দেখিতে দেখিতে নীল সমুদ্রের তীরে আর একটা যেন নূতন সমুদ্রের আবির্ভাব হইল, সমুদ্রের ন্যায় কলরব, সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গ, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। একটা কাঠের ঠুঁটো মূর্ত্তি—হাসে না, কথা কয় না, নিজের দেবত্বের প্রমাণ দিবার তার কোনই ক্ষমতা নাই, তবু সহস্র সহস্র লোক কত কষ্ট ও নির্যাতন স্বীকার করিয়া, প্রাণের মায়া, সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একবার ঐ ঠুঁটোর মুখ দেখিতে আসিয়াছে। রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে! জন্ম কি, পুনর্জন্ম না হইলে লাভটা কি, রথে জগন্নাথকে দেখিলে কেন পুনর্জন্ম হয় না, এ সব কথা তাহাদের মধ্যে কেহই বুঝে না, বুঝিতে চায়ও না, লোকে বলে পুণ্য, এই পার্থিব জীবনের উপর একটা মহাসুখের পরলোক আছে, সেখানে যাইবার পথ পরিষ্কার হয়, তাই সব আসিয়াছে। বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক, অজ্ঞান, মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু, ইহাদের এই ভক্তি, এই অন্ধ বিশ্বাস এ সবই কি মিথ্যা, নিরর্থক! যুগ-যুগান্তর ধরিয়া দেশে দেশে মানুষ যে ভগবানকে পাইবার জন্য এই রূপ পাণ্ডা, পুরোহিত, ধর্ম্মযাজকেরা যাহা বলিতেছে নির্ব্বিবাদে তাহাই করিতেছে, এইরূপ অন্ধভাবে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে ভগবানকে পাইবার জন্য খুঁজিতেছে, এ সকলের কি কোনই সার্থকতা নাই? সেই পথ কি? কেমন করিয়া সেই পথের ঠিক সন্ধান পাওয়া যায়? কে আমাকে সেই পথের সন্ধান দিবে? মনের মধ্যে এই সকল প্রশ্ন উঠিত, আকাঙ্ক্ষা জাগিত, আর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাত্রীদের সেবা করিতাম।

কিন্তু সেখানে সেবার ক্ষেত্র এত বিরাট যে আমার সেই ক্ষুদ্র দল সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর ন্যায় কোথায় যেন মিশাইয়া গেল। বুঝিলাম লোকের দুঃখ দূর করিবার আমাদের কোন ক্ষমতাই নাই, আমরা কয়জনকে সাহায্য করিতে পারি? কেবল নিজেদের একটু অহঙ্কারের তৃপ্তি! আপন আপন ভাগ্য অনুসারেই কম বেশী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যাত্রিগণ ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া গেল, কাহাকেও বা ফিরিতে হইল না।

উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে জগন্নাথক্ষেত্র এক রকম খালি হইয়া গেল, পড়িয়া রহিল কেবল স্তূপাকার আবর্জ্জনা, দুর্গন্ধ এবং রোগ। আমার সেবকদল কয়েক দিনের পরিশ্রমে খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রসদও প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল, আমরা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় এক পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিল, একজন যাত্রীর কলেরায় মরণাপন্ন অবস্থা, তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সেবকগণের মধ্যে কাহারও মুখে বিশেষ উৎসাহের চিহ্ন দেখিলাম না, সকলেই তখন ঘরমুখো বাঙ্গালী। আমি বলিলাম, "তোমরা সব গুছাইয়া ঠিকঠাক করিয়া লও আমিই দেখিয়া আসি ব্যাপারটা কি?"

ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত কিছুই নয়। একটা জঘন্য পল্লীতে সারি সারি খোলার ঘর, এই কয়দিনের উপদ্রবে সে প্রায় নরকতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতক্ষণ সেখানে মানুষ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

ছিল, ততক্ষণ তবু এক রকম ঢাকাঢাকি ছিল, এখন একেবারে নগ্নমূর্ত্তি! তারই একটা ঘর আমাকে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া পাণ্ডামহাশয় সরিয়া পড়িলেন, তবে যাইবার সময় বলিতে ভুলিলেন না—"ও ঘরটা আমারই, আমার নাম সীতারাম পাণ্ডা, যদি কিছু পয়সাকড়ি ওর কাছে পাওয়া যায়, সেটা আমারই পাওনা, বুঝ্‌লেন বাবু? এই ক'রেই আমাদের জীবিকা চলে।"

ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই দুর্গন্ধে আমার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মেঝের উপর এক জন পড়িয়া রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আমার শব্দ পাইয়াই বলিয়া উঠিল—"পিসি, একটু জল দে পিসি—তোর পায়ে পড়ি।"

কোথায় তার পিসি, আর কোথায় বা কে? দেশে গিয়া নিশ্চয়ই সংবাদ দিবে যে ভাইঝি জগন্নাথ ক্ষেত্রে কলেরায় মরিয়াছে, বাবা জগন্নাথ তাহাকে লইয়াছেন, স্বর্গ হইতে রথ নামিয়া আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে!

সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া মনে একটা অহঙ্কার ছিল, এইবার তাহার পরীক্ষা। নিজের হাতে সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিলাম, রোগীকে একটা ফর্সা কাপড় পরাইলাম, ভাল বিছানা আনিয়া তাহার উপর শোয়াইলাম, কেমন একটা জিদ্‌ হইল, তাহাকে বাঁচাইব। আমার সঙ্গিগণকে দেশে পাঠাইয়া দিলাম, বলিলাম, আমি দুই চারিদিন পরেই যাইব।

যমে মানুষে টানাটানি, এ ক্ষেত্রে যমকেই হার মানিতে হইল। কিন্তু আমাকে সেখানে প্রায় মাসাবধি অপেক্ষা করিতে হইল।

তাহার নাম মনোরমা। সে ছিল ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা, সংসারের অন্যান্য সকলের চক্ষুশূল। দিবারাত্রি গাধার ন্যায় পরিশ্রম করিয়া এক বেলা দুইটি খাইতে পাইত, তাহার জ্ঞান হওয়া অবধি এই ভাবেই সে কাটাইয়াছে। অনেক দিন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া অনেকের হাতে পায়ে ধরিয়া একবার জগন্নাথে আসিবার ছুটি পায়। কিন্তু, এখানে কলেরা হইতেই তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া পালাইয়া গিয়াছে।

সে এখন অনেকটা বল পাইয়াছে। তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মন্তুদ কাহিনীটি আমাকে বলে, আর আমার কাছে দেশ বিদেশের কত কথা বিস্ময়ের সহিত শোনে। আমি যদি বলি, "এইবারে চল তোমাকে দেশে রেখে আসি।" তখনই তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। তাহার উপর কেমন একটা মায়া জন্মিয়াছিল, আমিও ভাবিতাম, আহা আরও দুই চারি দিন থাকুক, সমুদ্রের হাওয়ায় বেশ সারিয়া উঠুক। তাহারই পাশের একটা ঘরে আমি বাসা লইয়াছিলাম। তাহাকে লইয়া সমুদ্রের তীরে বেড়াইতাম, জগন্নাথের আরতি দর্শন করিতাম। প্রথম প্রথম আমি রাঁধিতাম, সে খাইত, এ জগন্নাথক্ষেত্র, এখানে জাতির বিচার নাই। ক্রমে সে কাছে বসিয়া আমাকে রান্না দেখাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, এখন সেই রাঁধে, দুই জনায় খাই। জীবনের যেন একটা নূতন আস্বাদ পাইতেছিলাম। অন্ধকার উপত্যকার উপর জ্যোৎস্না উঠিলে যেমন সমস্ত দৃশ্যটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এই মেয়েটির হৃদয়ের আলোয় আমার ভিতরেও যেন তেম্‌নি একটা পরিবর্ত্তন হইতেছিল। কিন্তু, আমি আজন্ম ব্রহ্মচারী, কামিনীকাঞ্চনবর্জ্জন আমার জীবনের দৃঢ় ব্রত, ভিতরের এই দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিবার কোন দিনই ইচ্ছা ছিল না। এখন বুঝিতেছি আমার অন্তরতম সত্তা এই দুর্ব্বলতাতেই সায় দিত, কিন্তু আমি নিজের কাছে তখন সেটা স্বীকার করিতাম না, ভাবিতাম, ইহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছি, যাহাতে এ সম্পূর্ণভাবে সারিয়া উঠে তাহাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাকে আরও কিছুদিন সমুদ্রের ধারে রাখিলে, তাহার সঙ্গে একটু মিষ্ট ব্যবহার করিলে সে শীঘ্র সারিয়া উঠিবে, ইত্যাদি।

কিন্তু, এমন করিয়া আর বেশী দিন চলে না। বলিলাম, "মনো, এবার তোমায় যেতেই হবে।" তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল, সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "দেশে আর আমি কিছুতেই যাব না, তার চেয়ে বরং আমাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যান্‌।"

"তবে কোথায় যেতে চাও?"

"আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।"

"তা' যে হয় না, মনো।'

কিন্তু, কিছুতেই তাহাকে দেশে ফিরিবার মত করাইতে পারিলাম না। শেষকালে অনেক বুঝাইবার পর সে মত করিল; কলিকাতায় কোন বিধবা-আশ্রমে থাকিবে, আমি মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া যাইব।

মাসখানেক একটি বিধবা-আশ্রমে সে রহিল। তাহার পর আশ্রমের সম্পাদিকার নিকট হইতে জরুরী পত্র পাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তিনি বলিলেন, "ও দিন রাত কাঁদে, এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না, আপনি নিয়ে যান্।" আমি আসিতেই মনোরমা আমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল—"আমি এখানে থাক্‌লে বাঁচ্‌ব না, তুমি এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল।"

"কোথায় যাবে?"

এমন ভাবে সে আমার দিকে চাহিল যে তাহার উত্তর বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। আমি বলিলাম, "মনো, তুমি ছেলেমানুষটি নও, সব বুঝ্‌ছ—আমি দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছি, আমার কাছে তোমার স্থান কিছুতেই হ'তে পারে না। তুমি আর যেখানে বল সেই খানেই তোমার থাক্‌বার সুব্যবস্থা ক'রে দোব।" মনোরমা বলিল, "তবে আমাকে কোন তীর্থস্থানে রেখে আসুন।"

সে ভাল যুক্তি। মনোরমাকে লইয়া তীর্থের সন্ধানে বাহির হইলাম। কত দেশে গিয়াছি, কত তীর্থ ঘুরিয়াছি, মনোরমার পছন্দমত স্থান আর কোথাও পাই নাই। ক্রমে ক্রমে নিজের অন্তরের কথাও বুঝিয়াছি, জগন্নাথ হাতে তুলিয়া যে রত্ন আমাকে দিয়াছেন তাহার মর্যাদা ও মূল্য বুঝিয়াছি। জীবনে যা' চিরদিন আমার কাছে কুহেলিকাচ্ছন্ন ছিল, মনোরমার সংস্পর্শে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে সে সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। উপলব্ধি করিয়াছি এ সংসার আনন্দের লীলা, ভগবান আনন্দময়, আনন্দের ভিতর দিয়াই সহজে তাঁহাকে লাভ করা যায়। ভগবানকে জানিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে দিব্যজীবনের বিকাশ করিতে হইবে ইহাই লক্ষ্য; ত্যাগ, সেবা, সংযম এ সব কেবল উপায় মাত্র। পথের সন্ধান ঠিক পাইয়াছি, পথের সাথীও আমার জুটিয়াছে, অন্তর হইতে ভগবান আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, আমাদের যাত্রা সুরু হইয়াছে।"

৫

পরদিন সকালে নিদ্রা হইতে উঠিতেই আমার স্ত্রী শশব্যস্তে আসিয়া বলিল—"ওগো! ওঁদের কিছুতেই ছেড়ে দিও না, ওঁরা মানুষ নন, হর-পার্ব্বতী, আমাদিগকে ছলতে এসেছেন।"

আমার ঘুমের ঘোর তখনও বেশ ছাড়ে নাই। বলিলাম, "এতদিন তোমার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল, এখন দেখ্‌ছি তুমি রামী শ্যামীর মতই পাড়াগেঁয়ে। ও আমাদের হরিদাস, ওকে আমি কতদিন থেকে জানি।"

"তুমি ছাই জান, তোমাদের কি চোখ্ আছে? চোখ্ থাক্‌লেও কানা তোমরা!"

"ব্যাপারটা কি? তোমার ত আছে বড় বড় দুটো চোখ কপালের মাঝখানে, কি দেখেছ খুলেই বল না।"

আমার স্ত্রী বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল, "কাল রাত্রে ওদের এক ঘরেই বিছানা ক'রে দিয়েছিলুম, কিন্তু দুটো আলাদা বিছানা। রাত্রি তখন দুটো, বাইরে এসেছি, মনে হ'ল একবার দেখিই না ওরা ঘরের মধ্যে কি কর্‌ছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি—ওমা! এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে, কোন অপরাধ নিও না, ঠাকুর! দেখি দুটো বিছানাই খালি, মেঝের ওপর একটা কম্বল পেতে দু'জনে পাশাপাশি বসেছে, এক জনের হাতের উপর আর এক জনের হাত, গভীর ধ্যানে মগ্ন, দু জনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সোনালী রংয়ের এক অপূর্ব্ব আলো বেরিয়ে সমস্ত ঘরটার মধ্যে যেন ঢেউ খেলাচ্চে। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌লাম না, সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছিল, এসে শুয়ে পড়্‌লুম। যতবার সেই কথা মনে হচ্চে, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে, ওরা মানুষ নয়, দেবতা, ওদের কিছুতেই ছেড় না।"

জেম্‌স্ সাহেবের Varieties of Religious Experience আমার পড়া ছিল, বুঝিলাম আমার স্ত্রীর সেইরূপ কোন একটা মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে। কোন তর্ক না করিয়া তাহার কথাতেই সায় দিলাম। দেবতা হউক আর না হউক, তাহারা আমার বাড়ীতে আসিবার পর হইতে কেমন যে একটা বিমল আনন্দ, পবিত্র শান্তি পাইয়াছিলাম,

সেটা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। আমাদের আগ্রহাতিশয্যে সে দিন তাহারা যাওয়া বন্ধ করিল।

আমার স্ত্রীর কি উৎসাহ! কোথা হইতে রাশি রাশি ফুল যোগাড় করিল, চারিদিকে ধুপধুনার গন্ধে বাড়ীটাকে যেন একেবারে পূজাবাড়ী করিয়া তুলিল। দেখি, তাহার সব চেয়ে ভাল গোলাপী রংয়ের রেশমী সাড়ীখানি মনোরমাকে পরাইয়াছে, গলায় মুক্তার মালা, কপালে সিঁদুরের টিপ্, আল্‌তা দিয়া তাহার পা দুখানি নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে; সত্য সত্যই যেন দুর্গা প্রতিমা!

কিন্তু, কোন ক্রমেই তাহারা তিন দিনের বেশী রহিল না। আমার স্ত্রীর দেওয়া গহনা, কাপড়, ওড়্না, সব ছাড়িয়া দিয়া মনোরমা তাহার সাবান দিয়া কাচা মোটা কাপড়খানি পরিধান করিল, দুই জনের বগলে সেই কম্বল ও বোঁচ্‌কা। আবার তাহাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। যেন বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আমার স্ত্রী অশ্রুবর্ষণ করিতে বসিল।

"সনেট"-পাঠান্তে

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

অন্তরের অন্তঃস্থলে যে শোভা-সম্ভার
বিচিত্র অপূর্ব্ব রূপে উঠে বিকশিয়া
তাই হ'তে গুটিকত পুষ্প আহরিয়া
হে কবি, সাজালে কার পূজা-উপচার ?
এ নয়কো মরমের পূর্ণ ইতিহাস,—
বিন্দুমাত্র—নয় সিন্ধু উদ্বেল উচ্ছল,
শুধু কয় ফোঁটা অশ্রু করে টলমল
আধ আলো ছায়া-ঘেরা একটু আভাস।
লুকানো যা র'য়ে গেল গোপন আড়ালে
না জানি সে কি অপূর্ব্ব কত সুমধুর ;
যে টুকু অঞ্জলি ভরি' সমুখে বাড়ালে
সে টুকুরি সুবাসেতে চিত্ত ভরপুর !
মৌন মুগ্ধ মন মোর ভাবে ব'সে তাই—
এ দানের প্রতিদান বুঝি কিছু নাই।

১৭ই আষাঢ়
১৩৩৫

আলো

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

কলেজেতে পূজোর ছুটি হ'লে
হঠাৎ কি যে খেয়াল হ'ল, আমি এলেম চ'লে
শহর ছেড়ে ছুটে তাড়াতাড়ি
পাড়াগাঁয়ে, ছোট মাসির বাড়ি।
মনে আছে আমার সে-বার
কথা ছিল বি-এ দেবার
বয়স হবে আঠারো কি উনিশ।

বাড়ি থেকে বেরুই যখন, মা বল্‌লেন, "মাসির কথা শুনিস্।
সুহাসিনী আছে একা,
সাতটি বছর পরে হবে দেখা,
এই দুটি মাস থাকিস্ তারি কোলেই,
ছুটোছুটি করিস্ নে কো ছুটি আছে বোলেই।
অমন আদর কোথাও পাবিনে রে,—
মাসির বুকের সোহাগ পেলে ভুলেও মনে পড়্‌বে না মায়েরে।"
শুনে আমি রেগে বল্‌লেম, "যাঃও,
মায়ের চেয়ে মাসির দরদ, শুনিনি কোথাও!"
মা বল্‌লেন, "ওরে অরি, দস্যি ছেলে, তুই
বুকভরা তা'র ব্যাকুল ব্যথা বুঝবিনে কিচ্ছুই।
মায়ের ক্ষুধা মেটেনি তা'র মোটে;
দলে দলে ছেলেমেয়ে তাইত এসে ওর আঙিনায় জোটে
নিত্য সকাল হ'লে
কেউ 'জেঠিমা', কেউ 'কাকিমা', কেউ বা 'মাসি', কেউ শুধু 'মা' ব'লে
একে একে নিয়ে তাদের বুকে কোলে
অভাগিনী
মনের ফাঁকা ভরাতে চায়। অন্তর্যামী যিনি
অন্তরালে থেকে তিনি দেখেন নারীর ব্যর্থ এ কৌতুক!
গভীর ব্যথায় ভুল ভেঙে যায়, ভরে না রে ভরে না ঐ বুক।

আলো

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

বিনিসুতোর হারখানি ও ভাগ্যদোষে
দিনের শেষে ধুলোর পরে আপনি পড়ে খ'সে।
নিশীথ রাতে হয়ত হঠাৎ ভাব্‌তে গিয়ে গুমরে ওঠে বুক—
হৃদয়-সুধার সমুদ্রে তা'র দেয় নি ধরা একখানি চাঁদমুখ।
তরঙ্গিত হিয়ায় যাদের খেলার ছলে আনাগোনা,
ওরা ত সব টুক্‌রো চাঁদের কোণা।
বুকের রক্তসাগর-মথন একটি সে-কোন্ শিশু-রতন বিনে
জমাট্ ব্যথা নারীর বুকে, ওরে অবোধ, বুঝ্‌বিনে বুঝ্‌বিনে!"
বল্‌তে মায়ের দুটি আঁখি ছল্‌ছলিয়ে এল আঁখির জলে।

দুটি হাতে জড়িয়ে ধ'রে গলে
আমি বল্‌লেম, "মাসির কাছে তুমিও চল-না মা,
ঘরে থাকুন মামা।
গাঁয়ের মত হেথায় ত আর ঘরে ঘরে মায়ের পূজো নেই,—
দুমাস পরে ফির্‌ব দুজনেই।
আর তা ছাড়া, জান ত মা, শাস্ত্রে বলে—
মায়ের একা ছেলে হ'লে
তাঁকে ফেলে কোথাও যেতে নেই।"
মা বল্‌লেন হেসে, "অর্থাৎ আসল কথা এই,—
আমায় ছেড়ে যেতে
সরে না তোর মন।"—আমাকে হ'ল লজ্জা পেতে।
তবু বল্‌লেম, "ঈস্!
তুমি ভাব্‌চ তোমার কাছেই থাক্‌ব অহর্নিশ ?
কথ্‌খনো না, এই চল্‌লেম,—কিন্তু—তবে কিনা—
একলা সেথা যেতে আমি আর কিছু ভাব্‌চি না—
ভাব্‌চি শুধু হাসি-মাসি জাম্‌বে কেমন ক'রে
আজো তারি তরে
তোমার মনে এমন ব্যথা, এই যা।" "ওরে ওরে,
কেমন ক'রে বুঝাই আমি তোরে,
তুই যদি যাস্, দেখ্‌বে হাসি, দরদী তা'র দিদি
ভালোবাসে বোলেই তা'রে পাঠিয়ে দেছে আপন বুকের নিধি,
গোপন সুখের একটি মাত্র আলো,
আপন হ'তে আপন সে যে ;—নারী-হৃদয় নারীই জানে ভালো।

ওরে অরুণ, আলোই যদি পাই,
প্রদীপে কাজ নাই।"
আমি বল্‌লেম, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্চ আসল কথাটাই।—
যে-দীপখানির বুকে কোলে আলো নাচে
তারে ছেড়ে তিলেক সে কি বাঁচে?"
এম্‌নি ক'রে তর্ক তুলে হারিয়ে দিয়ে হেসে
মায়ের কাছে বিদায় নিলেম অবশেষে;
পথের পরে ছুটি আঁখি রইল জাগি নীরব নির্নিমেষে।

এসে মাসির ঘরে
মায়ের কথা মিলেছিল অক্ষরে অক্ষরে।
বলচি ক্রমে পরে।
বাইরে থেকে যেই ডাক্‌লেম, "হাসি-মাসি!"
অম্‌নি হঠাৎ একটি মেয়ে আসি
—জানিনে কে—
সাম্‌নে আমায় দেখে'
চম্‌কে চেয়ে, যেন চিনেই, লাজে সুখে রাঙিয়ে উঠে
পালিয়ে গেল ছুটে।
তারপরেতে বেরিয়ে এলেন মাসি.—
মুখে হাসি, চোখে অশ্রুরাশি।
"এতদিনে মনে পড়্‌ল অরুণ?"
কণ্ঠ তাঁহার কোমল করুণ।
--ব্যথায় লাজে আঁখির বারি রাখিতে আর পারিনে আঁখিতে।
বিকেলবেলা জলখাবারের ফল ছাড়িয়ে দিতে দিতে
মাসি বল্‌লেন, "ছুটির ছুটি মাস,
দুষ্টু ছেলে, শাস্তি তোমার কঠিন কারাবাস
হাসি-মাসির ঘরে;
কোনো ওজর মানব না এর পরে।
ক্ষুদ-কুঁড়ো যা জোটে, আমি রেঁধে আপন হাতে
দেব রে তোর পাতে।"
আমি বল্‌লেম, "বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তাতে।"
গভীর স্নেহে মাসি তখন তৃপ্তিভরা সুপ্রসন্ন সুখে
চেয়ে রইলেন মুখে।

আলো

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু.

মাসির আশেপাশে
একটি মেয়ে,—সেই মেয়েটি,—কে যে জানি না সে,—
সমস্ত খন করছিল ঘুরঘুর ;—
দূরে থেকেও যেন কাছে, কাছে থেকেও যেন অনেক দূর !
মাসির সকল কাজের মাঝে একটি মিঠে সুর
সরল ছন্দে সাধা
মধুর করুণ ভৈরবীতে বাঁধা।
ঐ মেয়েটির ওঠা বসা চলা বলায়
মনের গভীর তলায়
কিসের কাঁপন লাগে ?
নাম-না- জানা আনন্দ কোন্, কোন্ সে বেদন জাগে
চেয়ে চেয়ে ওরি মুখের পানে ?
স্বপন-পারের কোন্ কামনা মনের কানে কানে
গুণ্‌গুণিয়ে বাজে,—
আধেক বুঝি, আধেক বুঝি না যে !
চাউনিটি ওর ক্ষণে ক্ষণে চরণ ছুঁয়ে যায়,
চোখে-মুখে-চল্‌কে'-যাওয়া চাপা-হাসির চমক লাগে গায়।
রঙটি ঈষৎ কালো,
তবু কেমন মনে হ'ল, না না, আহা এই ভালো এই ভালো !
কালো আঁখির কোমল মায়া মন ভুলালো,—
মনে মনে নাম রাখ্‌লেম, 'আমার আঁখির আলো' !
তৃপ্তিবিহীন সেই আলোকে
আমি যখন পলকহারা, দেখ্‌চি চেয়ে ওকে
চোখে ভরি অচিন্ সুখের আকুল পুলক অনন্ত বিস্ময়,
—হেসে মাসি দিলেন পরিচয়।

পাশেই ওদের বাড়ি,
বাপের মায়ের স্নেহের লাগি ক'ভাইবোনের বিষম কাড়াকাড়ি ;
কেবল শুধু ওঁর সঙ্গে আর-সকলের আড়ি।
কালো ব'লে
অবহেলার ব্যথার জ্বালা অন্তরে ওর নিত্য আছে জ্ব'লে।
বড় ছোট সুন্দরী পাঁচ বোন্
ওকে যেন মুছে ফেল্‌তেই করেচে প্রাণপণ।

চাঁদের গায়ে কলঙ্ক একটুক,—
তাই নিয়ে হায় কত হাসি কত ঠাট্টা কতই-না কৌতুক
পলে পলে উঠ্‌চে জ'মে নিত্য ওদের ঘরে
অষ্টপ্রহর ধ'রে।
বাপের আদর মায়ের স্নেহ—ছি ছি একি নিষ্ঠুর অন্যায়—
কালো বোলেই বঞ্চিল এই পঞ্চমী কন্যায়!
আপন ঘরে যত্ন আদর পেলে নাকো,—
ভাব্‌লে মাসি, 'আহা, তবে আমার কাছেই থাক্ ও।'

আস্‌ত যেত রোজ,—
কোথায় থাকে, খায় কি না খায়, ঘরের লোকে কেউ নিত না খোঁজ
মাসির সনেই যা-কিছু ভাব তা'র,
তাঁরি কাছে ন্যায়-অন্যায় যা-কিছু আব্‌দার;
আপন ঘরে দাব্‌-রাব্‌ তা'র নেই কোনো কিছুতে,—
দুটি বেলা ফির্‌ত ঘরে কেবলমাত্র খেতে এবং শুতে।
কোনদিন বা বায়না ধরে, মাসির কাছেই শোবে,—
সন্ধ্যা বেলা জুট্‌ত এসে হয়ত-বা সেই লোভে।
মাসির হাতে খেয়ে মাসির পাতে
মাসির মেয়ে মাসির সাথে ঘুমোত সেই রাতে।

পাষাণ-কারা এড়িয়ে চলে নির্ঝরিণী।
মাসি বলেন,—'ঐ মেয়েরে কেউ চেনে না আমি যেমন চিনি।
মূল-ছেঁড়া ফুল, দিশেহারা স্রোতের টানে ভেসে
ঠেকল আমার হিয়ায় ঘাটে এসে;
আমি ওরে আদর ক'রে তুলে
মিশিয়ে রেখে দিলেম আমার নিত্যপূজার নৈবেদ্যের ফুলে।
কালো মেয়ে, ও যে আমার অপ্‌রাজিতার কুঁড়ি;
আছে আমার শূন্য হৃদয় পূরি'।
—অনাদরের ঘরে কেবল ভাগ্যদোষেই জন্মেচে মাধুরী।'

আমি শুনে আপন মনে হাসি,—
তা নয়, তা নয় মাসি!
তোমার এ বালিকা
আঁধার রাতের ছায়ায় ঘেরা শেফালিকা।

আলো

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

বাথায় রাঙা বৃন্ত পরে
থরে থরে
মেলে দিয়ে শুভ্র প্রাণের দল
শিশির-ছলছল্
অরুণ-আলোর পথে চেয়ে রয়েচে তন্ময়,—
সময় হ'ল, এখন শুধু ঝ'রে পড়্লেই হয়!

আমার চির-শহরে-বাস ;
গাঁয়ের বাতাস
লাগল্ প্রথম গায়ে ;—
সেই আমাদের সরু গলির ধোঁয়ায়-ধূলোয়-ধূসর বাতাস না এ।
হেথায় নিত্য গন্ধবিধুর স্নিগ্ধ-মধুর মন্দ সমীরণ
বনান্তরের বার্ত্তা নিয়ে দিগন্তরে যায় বয়ে উন্মন।
জ্যোৎস্না-রাতে দিগবালাদের হাতে
আলোয় বীণায় কী সুর জাগে শুনি নীরব রাতে ;—
আকাশে ঐ অসীম নীলের কূলে কূলে
চেয়ে দেখি সহসা কোন্ অরূপ-রূপের উৎস গেছে খুলে!
দোলন-লাগা নাচন-জাগা নতুন পাতায় পাতায়
বনকে মাতায়, মনকে মাতায়।
পথের পাশে পাশে
শিহর জাগে শ্যামল ঘাসে ঘাসে।
কাঁচা ধানের কোমল কচি শীষে
মাঠের পরে মাঠ ছেয়ে যায় লক্ষ্মীমায়ের সবুজ শুভাশীষে।
গাছে গাছে পাখীর গানে, দোয়েল শামার শিসে
মরি মরি কোন্ অমরীর কণ্ঠ আছে মিশে'।
মধুমতী, একটি ছোট নদী,
আপন মনে বইচে নিরবধি।
ও-পারে তা'র ঘন কাশের বন
খুসির তুফান তুলে দিয়ে অকারণেই হাস্‌চে অনুক্ষণ।
ঐ যে দূরে প্রকাণ্ড মাঠ, ঘন সবুজ বাঁশের বনে ঘেরা,
ঐখানেতে রাখাল-বালকেরা
নিত্য প্রাতে আসি
গোরু চরায় বাজিয়ে বাঁশের বাঁশি।

কখনো বা নদীর কূলে ব'সে বটের তলায়
মেঠো সুরে মিঠে গলায়
জলের কুলুকুলুর সনে মিলিয়ে কণ্ঠতান
গাহে তা'রা সরল আশার সরল ভাষার গান।
আমার বক্ষে জাগিয়ে দিল দোল
ঊর্দ্ধে অমল সুনীল সুদূর, নিম্নে শ্যামলসমুদ্রহিল্লোল।
চন্দ্র সূর্য্য তারা,
রহস্যময় জ্যোতির্লোকের বার্ত্তাখানি মর্ত্ত্যে আনে তা'রা
এই তৃষার্ত্ত পথিকেরে রূপের সুধায় করলে আত্মহারা ,
ক্ষুদ্র হ'য়ে, তুচ্ছ হ'য়ে, আজন্মকাল অন্ধ গৃহের কোণে
বন্ধ হ'য়ে ছিলেম অন্যমনে,—
আজকে হঠাৎ দাঁড়িয়েছি এই অনন্তদীপদীপ্তদিগঙ্গনে!
মুক্ত আমার মুগ্ধ হৃদয় মাঝে
শুনি আমি বিশ্বজনের মিলন-মেলার বাঁশি বাজে
এক তানে এক সুরে।
প্রাণ ভ'রে পান করিনু রে
সঞ্জীবনী সুধারসের ধারা ;—
আমার ছুটির দু'মাস হ'ল ক্ষীর-ঝরা দুই পয়োধরের পারা
পল্লীমায়ের বুকে,—
শ্যামল আঁচল ছায়ে বসি' স্তন্যসুধা পান করি কৌতুকে!
উপরে ঐ নীল চাঁদোয়া,
পূর্ণ চাঁদের অমল আলোয় ধোয়া,
মনে লাগে, আমার মায়ের জেগে-থাকা আঁখির নীরব চাওয়া!-
দূরের থেকে তারি পরশ পাওয়া।
কাটাই সুখে বেলা ;—
ভাসাই আমার আপন-মনের খেয়াল-খেলার ভেলা
আপন-ভোলা খুসির লহর বেয়ে,
নাই ভাষা যার নাই আশা যার এম্নি ভরা-সুখেরি গান গেয়ে

অনেকদূরে ফেলে এলেম মাকে,—
হাসি-মাসির দুই আঁখি তাই আমার পরে নিত্য সজাগ থাকে
যত্ন-সেবার কোনোদিকেই কোনোমতে হয় না কোনো ত্রুটি
দু'হাত ভ'রে আদর সোহাগ লুটি মুঠি মুঠি।

আলো

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

রাত্রি যেমন ক'রে
দেবের পূজার ফুল ফুটিয়ে, গোপন সুধায় ভ'রে,
বনে বনে সাজিয়ে ডালা, পূজার বেলায় আপনি সে যায় স'রে,—
তেম্‌নি ক'রে মাধুরী তা'র নিপুণ হাতের পরশ দিয়ে
নিবিড় প্রাণের হরষ দিয়ে
আমার পূজার সব উপচার সাজিয়ে ভারে ভারে,
সেবার সকল উপকরণ গুছিয়ে চারিধারে,
আপনি কোথায় লুকায় সে আঁধারে ;—
পূজা ত পাই, সেবা ত পাই,—পাইনে সেবিকারে।
আকুল আঁখি কাঙাল হ'য়ে খুঁজে বেড়ায় এ-দিকে ঐ-দিকে ;
কত ছলে কত ছুতোয় হয় প্রয়োজন মাধুরীকে।
বল্‌তে মরি লাজে,
এই আমাদের এম্‌নিতর লুকোচুরির মাঝে
সঙ্গোপনে বাঁধলে আপন বাসা
মাসির মনের একটি সে-কোন্ গভীর গোপন আশা।
—আমি কি আর দেখিনি তাঁর মুখ-ফিরিয়ে চাপা-হাসি হাসা ?
হঠাৎ কখন ক্ষ্যাপা পবন আমার মনের জান্‌লা পেয়ে খোলা
বুকের মাঝে দিলে বিষম দোলা।
কূলের বাঁধন টুট্‌লো আমার, দিলেম তরী খুলে
ঐ মাধুরীর প্রেমেরি পাল তুলে
কোন্ অজানার টানে
উচ্ছ্বসিত স্রোতের ধারায় কে জানিত কোন্ অসীমের পানে।
মাসির স্নেহ, মায়ের স্নেহ,—দুই পারে দুই তীর
শ্যামল ছায়ায় স্নিগ্ধ সুনিবিড়
ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসে আমার আঁখির আগে।—
মুগ্ধ চোখে কোন্ স্বপনের নেশার আবেশ লাগে ;—
অন্তরে তাই জাগে
কেবল-শুধু একখানি মুখ ব্যথায় ভরা, ভরা অনুরাগে।
স্নেহময়ী মাগো আমার, ওগো আমার মাসি,—
জানো না ত, এম্‌নি অবিশ্বাসী
কিশোর-হিয়ায় প্রথম-জাগা অশান্ত এই উদ্বেল যৌবন !
কৃতঘ্ন সে,—তাইত অনুক্ষণ
দূরের-পথে-চলার-নেশা-লেগে
আপন প্রাণের বিপুল বেগে

অবহেলে

অকাতরে যায় সে ঠেলে ফেলে—

হাতের কাছে অযাচিত চিরদিনের দান যা-কিছু মেলে।

চাও না কিছু, পাও না কিছু—দানের সুখেই আপনি রহ ভোর,-

স্নেহে পাগল মাসি আমার, হায় জননী মোর!

দিন চ'লে যায়। উচ্ছ্বসিত আনন্দ-কল্লোলে

পুজো এল, পুজো গেল চলে।'

বিসর্জ্জনের রাতে

আগমনীর বাঁশি যেন বাজল আবার মধুর সাহানাতে

যখন আমায় একলা পেয়ে ঘরে

মধুর কুণ্ঠাভরে

মাধুরী তা'র প্রথম প্রণাম রাখলে এসে আমার পায়ের পরে।

লুটিয়ে পড়ে' রইল মাথা গুঁজে,—

বিভল চোখে রইনু চেয়ে, কী যে বলি পাইনে ভাষা খুঁজে।

একটু কেমন দ্বিধা হ'ল,—ক্ষণেক পরেই আদর ক'রে

দুটি হাতে ধ'রে তুললেম ওরে,—

এল সে মোর বুকের কাছে স'রে।

আশিস রাখি' মাথে,

কাঁপতে-থাকা হাতখানি তা'র নিয়ে আপন হাতে

আমি বললেম, "মাধুরী, আজ চল মোরা দুজনে একসাথে

প্রণাম ক'রে আসি মাসিমাকে।"

আমার ঘরের বাতায়নের ফাঁকে

আকাশ ভরা চাঁদের আলোর একটি লহর এসে

এই মিলনের সাক্ষী হ'ল, যখন মৃদু হেসে

মাধুরী মোর বুকের পরে পড়ল ঢ'লে

সোহাগ-সুখে গ'লে।

পেলেম মাসির প্রাণের আশীর্ব্বাদ,

নত হ'য়ে পায়ের কাছে যেই জানালেম মোদের মনের সাধ

একটিমাত্র নীরব নিবেদনে,

মোর জীবনের একটি পরম ক্ষণে।

ঘরে ফিরে ঠিক দুটি মাস পরে,

খবর শুনি, বাগবাজারের মুখুজ্জেদের ঘরে

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

আমার বিয়ের সকলি ঠিকঠাক ;
বিয়ে হবে বাইশে বৈশাখ,
পরীক্ষাটার গোল গেলে সব চুকে ।
হঠাৎ আমার বুকে
নিষ্ঠুর শেল হান্‌লে যেন ; অভিমানে রইল হৃদয় রুখে ।
সকল কথা জানিয়ে মাকে যেই দাঁড়ালেম বেঁকে
মা ত আমার রকম দেখে'
ভয়েই ভেবে হ'লেন সারা । মামা আমায় ডেকে
রেগে বলেন, "এ কি কথা অরুণ ?
একটা তোমার খামখেয়ালির দরুণ
আমায় তুমি এমন সুযোগ ছাড়তে বল কোন্ হিসেবে ?
এরা নগদ পাঁচটি হাজার দেবে—"
বিনয় ক'রে বল্‌তে গেলেম, "কিন্তু আমি—"
বাধা দিয়ে বলেন তিনি, "জানি, জানি, নিছক্ এ পাগলামি ।
একে গরীব, তা'তে কালো মেয়ে ;—
মুখুজ্জেদের মণিমালা হাজারগুণে সুন্দরী তা'র চেয়ে ।
একেবারে হাল ফ্যাশানের, রূপের ডালি, ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে ;—
অমনটি না হ'লে কি আর মানাবে এই ঘরে ?
আর তাছাড়া, দান-সামগ্রী—"ইত্যাদি ইত্যাদি ।
মোটের উপর,—ভাগ্য আমায় বাদী ।
তাই নিদারুণ বিধি
আমার তরে পাঠিয়ে দিলেন মামা হেন প্রতিনিধি ।
তখনি সেইদিনই
মাসির কাছে চিঠি দিলেন তিনি ।
—আমার বুকের বোবা কাঁদন জান্‌ল কি আর সেই দুটি দুঃখিনী ?

ঘনিয়ে এল জীবনে মোর গভীর কালো নিশা,
পাইনে খুঁজে পথের দিশা,
যখন এরি এগারো দিন পরে
কেবলমাত্র দুটি দিনের জ্বরে
মাকে আমার বিদায় দিলেম চিরতরে ।
মনে হ'ল, এ সংসারের প্রদীপটি আজ নেই,
আলোটি তা'র জ্বল্‌বে কি শূন্যেই ?

অসীম উর্দ্ধে আকৃতি মোর কা'র কাছে হায় জানাই থাকি থাকি,
মায়ের-কোলের-কুলায়-হারা পাখী!
হঠাৎ-হাওয়ার-ঝাপ্‌টা-লাগা নোঙর-ছেঁড়া নৌকা যেন শেষে
ঠেক্‌ল এসে
দিক্‌ হারা এক শুক্‌নো বালুর চড়ায়—
সবার কথা মেনে যখন লাগ্‌তে হ'ল আবার লেখাপড়ায়।
বি-এ ক্লাসে আমিই নাকি ছিলেম সবার সেরা,
আমারি মুখ-চেয়ে আছেন বন্ধুরা আর সকল শিক্ষকেরা।
অবাঞ্ছিত সান্ত্বনা আর উপদেশের চাপে অহরহ
এই জীবনের বোঝা ক্রমেই হচ্ছিল দুর্ব্বহ।

হেন কালে, ভোগের উপর ভোগ,—
পরীক্ষাটার কিছু আগে হ'ল আমার কঠিন চক্ষুরোগ।
ডাক্তারেরা ঘন ঘন করলে কত আনাগোনা,—
একটি-মাসে দারুণ ব্যাধি একটুও কম্‌ল না।
হতাশ হ'য়ে, অনেক রকম বচন ছেঁদে,
শেষটা চোখে চালিয়ে ছুরি, রাখ্‌লে ওরা আমার দু'চোখ বেঁধে।
দিন-পনেরো চোখের বাঁধন খুল্‌তে হ'ল মানা,
রবির কিরণ লাগ্‌লে নাকি বিঘ্ন আছে নানা।
দুপুরবেলা মামার আপিস্‌—এক্‌লা থাকি ঘরে,
ঝর্‌ঝরিয়ে অশ্রুধারা ঝরে।
ক্ষণে ক্ষণে
কেবল পড়ে মনে
একটি কথা স্মৃতির-আগুন-জ্বালা,—
মা নেই কাছে, নেইকো মাসি,—নেই মাধুরী, নেইকো মণিমালা!
স্নেহভরে নিপুণ-করে সকল রোগের শুশ্রূষা ও সেবা
এ সংসারে নারীর মত করতে জানে কে বা?
আপনাকে তাই লাগ্‌ত যেন নিতান্ত নিঃসঙ্গ,
অদৃষ্টদেব অলক্ষ্যে হায় দেখ্‌ছিল এই রঙ্গ।

ব্যস্ত হ'য়ে মামা শেষে খবর দিলেন মাসির কাছে,—
লিখে দিলেন 'চোখের ব্যামো;—অরুণ এবার বাঁচে কিনা বাঁচে।
এই নিদারুণ খবর পেয়ে
হাসি-মাসি পাগল হ'য়ে ছুটে এলেন ধেয়ে।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

সব অভিমান ঘুচিয়ে দিয়ে, সব অপমান এক নিমেষে ভুলে'
কেঁদে এসে অম্‌নি আমায় নিলেন কোলে তুলে;
অভিমানে হৃদয় আমার উঠ্‌ল ফুলে' ফুলে'।
"এতদিনে মনে পড়ল মাসি ?"
বল্‌তে গিয়ে দু'চোখ গেল ভাসি।
ন'দিন পরে ডাক্তারেরা এসে,
দেখে-শুনে, মাসির পানে চেয়ে বল্‌লে হেসে,
"আর ভয় নেই,—এবার আসল ওষুধ পেয়েচে সে।
চোখের বাঁধন খুলে দেব কালই,—
দিন-দুত্তিন একটুখানি সাবধানেতে থাক্‌তে হবে খালি।"

সেদিন গভীর রাতে,
তন্দ্রাঘোরে, একলা শুয়ে বিছানাতে,
হঠাৎ আমার মনে হ'ল কেন,—
পায়ের কাছে একটা চাপা-কান্না শুনি যেন!
অন্ধ আঁখি,—কেমন ক'রে দেখি ?
স্বপ্ন এ কি ? মায়া এ কি ?
আধো-ঘুমের আবেশটুকু হঠাৎ গেল টুটে,—
যখন আমার পায়ের পরে লুটে,
প্রণাম ছলে, তারি পরে শিশির ভেজা পদ্মটি রাখ্‌ল সে,—
অশ্রু-সজল মুখখানি তা'র। চম্‌কে উঠে ব'সে
আকুল হ'য়ে হাত বাড়ালেম যেই,
—কেউ কোথাও নেই!
এক নিমেষে চোখের বাঁধন টেনে ছিঁড়ে
আব্‌ছা আলোয় চেয়ে দেখি, কে তরুণী নতশিরে
চোখে আঁচল দিয়ে
ধীরে ধীরে ঢুক্‌ল আমার পাশের ঘরে গিয়ে।
—বিস্ময়ে মোর রইল না আর সীমা।

"মাসি, মাসি, ও মাসিমা!"
—ডাক শুনে মোর চম্‌কে জেগে উঠি'
মাসি এলেন ছুটি'।
ভয়ে কেঁদে শুধান্ তিনি, "কী হয়েচে?—ছি ছি, ওকি, ওকি!"
"বল মাসি, বল বল,—হেথায় তুমি একলা এসেচ কি?"

ব্যাপার শুনে কেঁদে
আবার আমার চোখের বাঁধন বেঁধে
ধীরে ধীরে
ধরা গলায় বলেন মাসি, "একলা আসিনি রে,
সঙ্গে ক'রে এনেচি সেই অভাগিনী মাধুরীরে।
তোর অসুখের খবর শুনে, আমার পায়ে প'ড়ে
অধীর হ'য়ে কেঁদে অঝোর-ঝোরে,
আসার বেলায় রইল আঁচল ধ'রে,
তাই এনেচি সঙ্গে ক'রে।
এই ক'টা দিন আমার পাশে পাশেই থেকে মাধুরী যে
ওষুধ পথ্যি যা-কিছু সব আপন হাতে নিজে
জুগিয়ে দিলে তোরে!—
দু'চোখ ঢাকা,—দেখ্‌বি কা তুই? কয়নি কথা,—জান্‌বি কেমন ক'রে?"
সন্দেহ লেশ রইল না আর মনে কোনো।
"ওগো মাসি, তবে কি এখনো—?"
বল্‌তে গিয়ে কিসের ভারে কণ্ঠ আমার হঠাৎ গেল থামি'।
—তার পরে কী ঘটেছিল আর জানিনে আমি।

সকাল বেলা মনে হ'ল, ঘরেতে কেউ নেই;
অবশেষে দাসীর মুখে খবর পেলেম এই—
ভোর না হ'তেই মাসি
মামার কাছে বিদায় নিয়ে মায়ে-ঝিয়ে চ'লে গেচেন কাশী।
বেলা হ'লে ডাক্তারেরা আসি
চোখের ঢাকা খুলে দিলে;—
নতুন আলোয় নতুন ক'রে জন্ম নিলেম যেন এ নিখিলে।
অসাড় মনে ভাব্‌চি ব'সে আকাশ পানে মেলে' আতুর দিঠি,—
হঠাৎ পাশেই ঠেক্‌ল হাতে, এ কি, এ যে হাসি-মাসির চিঠি!
রহস্য এর কেউ না জানে,—
পড়তে গিয়ে চোখের জলে পাইনে খুঁজে মানে;—
তারি গোটা-কতক লাইন ছন্দে গেঁথে রাখিনু এইখানে:—

"…দাদার চিঠি পেয়ে, অরুণ, আমার অকস্মাৎ
মাথায় যেন হ'ল বজ্রপাত।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

দিদির পরে, দাদার পরে, তোমার পরে দারুণ অভিমানে
মায়ের আমার বিয়ে দিলেম এই গেল-অঘ্রাণে
জমিদারের ঘরে
চরিত্রবান্ সুশ্রী এবং সুশিক্ষিত বরে।
কিন্তু হঠাৎ সবেমাত্র পনেরো দিন পরে
—কোথাও কিছু নেই—
অভাগিনী হাসিমুখেই
অকাতরে
মায়ের ঘরে মায়ের বুকে ফিরে এল চিরদিনের তরে।
যেই শুধালেম, 'বল্ মা আমায়, হ'ল কী এ ?'
করুণ হেসে বল্লে, 'মাগো, মেয়েছেলের হয় কি দু'বার বিয়ে ?
এ বিয়ে যে একটা বিষম ফাঁকি—
আপ্নি তুমি জেনেও জানো না কি ?
সকল কথা খুলে' বল্তেই,—বাইরে ঘরে আর কেউ জান্ল না,—
আমায় তিনি মুক্তি দিলেন, সহজ মনেই কর্লেন মার্জ্জনা।'…"
মাসির চিঠির এ কাহিনীর এইখানেতেই শেষ ;—
নেই হা-হুতাশ, নেই উচ্ছ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজলের লেশ।
নেইকো ভাষ্য, নেইকো টীকা ;—
বহ্নি আছে,—নেই যেন তার শিখা।
সেই আলোতে দেখ্তে পেলেম, কোন্ মৃগতৃষ্ণিকা
ঐ তরুণীর জীবন-মরুর সাম্নে জাগে !
তপ্ত-রক্তরাগে
ছবিটি তার পড়ল আঁকা বক্ষে আমার চিরকালের তরে,
রইল লিখা চোখের জলের অক্ষরে অক্ষরে।
নতুন-ক'রে খুলে' গেল আবার আমার চোখের ঢাকাখানি,—
দেখ্তে পেলেম, আলোর নীরব বাণী
মণির মত ঝলে
খনির ঘন তিমির মাঝে, অতল কালো গহন সাগরতলে !
সেই আলোটি মোর জীবনের সকল দুঃখে সুখে
সঙ্গোপনে লুকিয়ে নিয়ে বুকে
সে দিন হ'তে
একলা পথের পথিক আমি, আপন মনে ফিরি আপন পথে।
কেউ দেখেনি কোথায় ক্ষত, কেউ জানে না কত যে তার জ্বালা ;—
মা নেই আমার, নেইকো মাসি,—মাধুরী নেই, নেই সে মণিমালা ॥

নারী

শ্রীমতী আশালতা দেবী

আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় নারী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা লেখা গেছিল। বোধ হচ্ছে তাতে প্রবলতার পরিমাণ কিছু বেশি হয়েছিল। রচনারীতিতে স্নিগ্ধচ্ছায়া চিরদিনই আমাকে আকর্ষণ করেচে, কিন্তু স্নিগ্ধতা এবং সত্য যে এক বস্তু নয় এইটে মাঝে মাঝে উপলব্ধি না ক'রেও উপায় নেই। যদি কোন স্থানে তার আতিশয্য অথবা বিনম্রতার অভাব ঘ'টে থাকে, তার জন্য দোষ আমার নিশ্চয়ই হয়েছে, অথচ সত্য কথা সহজ ক'রে বলতে বসলে সেটা কিছু পরিমাণে দুঃসাহসিক হ'য়ে দাঁড়ায় এ কথাটার মাঝেও বোধ করি কেবলই অত্যুক্তি নেই। নারী সম্বন্ধে আমি যা কিছু বলতে চেয়েছি তাতে এইটেই পরিস্ফুট করবার ইচ্ছে ছিল—ভাবলোকের এবং জ্ঞানলোকের সৃষ্টিতে স্ত্রীলোক যে কেন অক্ষম এ অবধি তার অনেক রকম কারণ নির্ণীত হয়েছে, কিন্তু সে কারণ যুগান্তের সঞ্চিত বাধা, সংস্কার এবং প্রতিকূলতা, অথবা তার কারণ বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই রয়েচে; এবং যদিবা প্রকৃতির মধ্যেই থাকে তাকে সর্ব্বতোভাবে মেনে নিয়ে চলা ছাড়াও এই দিকে চেষ্টার তার প্রয়োজন রয়েচে কিনা সেইটে ভাল ক'রে ভেবে দেখা দরকার। স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা সব চেয়ে বেশি শোনা যায় তার একটা হচ্ছে পুরুষপ্রকৃতি নারী-লাবণ্যের অপেক্ষা করে। এই কথাটির মাঝে মাধুর্য্যের অন্ত নেই এবং সংযমে, সৌন্দর্য্যে, গভীরতায়, পুরুষকে তার মানসিক রাজ্যে সহায়তার এই কাজ স্ত্রীলোকে যে কত ললিত এবং রমণীয় ভাবে সম্পন্ন করতে পারে, সে সম্বন্ধেও আমার সংশয়ের আভাস মাত্র নেই। কিন্তু চিত্তশক্তি এবং কর্ম্ম-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করবার যে দুরূহ দায়িত্ব তার proportion এবং harmonyর জ্ঞান সকল সময় অব্যাহত রাখা কঠিন। স্ত্রীলোকের মনে এই ধারণাই যদি হয়, পুরুষপ্রকৃতিকে জ্ঞানে কর্ম্মে প্রেরণা দেওয়া ছাড়া তার আর কোন স্বতন্ত্র শক্তি নেই, এবং এই শক্তির আকাঙ্ক্ষা পুরুষে বিশেষ ক'রে করেচে; তা'তে ক'রে এই ফল হবে মনোলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করবার অনির্ব্বচনীয়তা ক্রমশঃ বাস্তব জগতে স্থূল এবং উদ্ধত আকারে প্রকাশ পাবে। স্ত্রীলোকের অন্যের প্রতি অতি পরিমাণ সংসক্তিতে এই যে এত আনন্দ এবং প্রয়োজন তার কারণ নিজের প্রতি তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নেই।

যেখানে প্রতিষ্ঠা নেই সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে বাঁধতে চেয়েছে কিন্তু পরস্পরের সাহচর্য্যের মাঝে যদি কোন সত্য এবং কোন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়, তবে সেটা সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজনের তাগিদকেই অতিক্রম ক'রে সৃজন করতে হবে। স্ত্রীলোকের সর্ব্ব প্রকার স্বাভাবিক উপাদানকে বিলোপ ক'রে এতকাল ধ'রে কোমলতার চর্চ্চা ক'রে আসার দরুণ ব্যক্তিত্ব তাঁদের মাঝে গঠিত হ'য়ে ওঠেনি। আজ মোহিনী তার অপরিদৃশ্য শতকোটি সৌন্দর্য্যসূত্রে পুরুষকে আবিষ্ট করতে চেয়েছে, এবং মনে করেচে এতেই তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সব চেয়ে অতিস্ফুট আকারে প্রকাশ পাবে। নারীলাবণ্যকে গভীর ভাবে গ্রহণ করতে না পারলে এই ভ্রান্তির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েচে। এই আমি বলতে চেয়েছিলেম পুরুষের চেতনায় এবং হৃদয়-বৃত্তিতে এই মনঃশক্তি-সঞ্চারের কাজ তাঁদের অত্যন্ত অবছিন্ন (abstract) ভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং এই প্রবৃত্তিটাকেই যেন তাঁরা অতিশয় একান্ত ক'রে তাঁদেরই বিশেষ ক্ষমতার সীমানাভুক্ত ক'রে না দেখেন। কলাসৃষ্টিতে, জ্ঞানলোকের সৃজনে পুরুষে যা করেচে সে কোন দিনও কেবলমাত্র নারী-কিরণপাতে সম্ভব হয়নি। তবে স্ত্রীলোক তার স্বাভাবিক স্নিগ্ধ হৃদয়-সৌন্দর্য্যে এই সৃষ্টিব্যাকুলতাকে আশ্রয় দিতে পারে, সহায়তা করতে পারে, এইটুকু মাত্র। এ সম্বন্ধে H. G. Wellsএর গুটি-কতক কথা আমার অতিশয় সত্য ব'লে মনে হয়েছিল।

"The fatal delusion that a woman can be the crown of a man's life, his incentive to action,

শ্রীমতী আশালতা দেবী

his inspiration, has to be cleaned out of her mind altogether.

—But no man has ever done any great creative thing primarily for the sake of a woman. These things can only be done well and fully for their own sake, because of a distinctive drive from within; they arise from that sublimated egotism we call self-realisation."

পুরুষের এই আত্মোপলব্ধিতে কোন নারী তাকে বাধা দিয়েচে এবং কেউবা তার বিশেষ নারীশক্তি দিয়ে তাকে সহায়তা করেচে—'but from first to last they have been accessory' "World of William Clissold."

বিচিত্রার নারী প্রবন্ধে আরও বলতে চেয়েছিলেম নারী-লাবণ্য জিনিষটা যে কোন অহৈতুকী ভাবলোক থেকে আবির্ভাব হয়েচে তা নয়। এবং স্ত্রীলোকের শক্তিসীমানার মাঝেই যে তাকে বিশেষ ক'রে বিক্ষিপ্ত করা হয়েচে তারও কোন কারণ নেই। পুরুষ এবং পুরুষের বন্ধুত্বের মাঝে সৌন্দর্য্যের অভাব নেই, অথচ নারীর সহিত সখ্যতায় বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির অনেক সুকুমার দাবী চরিতার্থ হওয়া ছাড়াও আরও অনির্ব্বাচনীয়তার সৃষ্টি হয়। এর কারণ বিশ্বপ্রকৃতির মাঝেই রয়েচে নিশ্চয়, এবং এই মোটা কথাটা বুঝতেও বোধ করি বা বিলম্ব হয় না, কিন্তু পুরুষের সহিত নারীর সখ্যতায় জ্ঞানলোকের এবং ভাবলোকের সম্পদ-বৃদ্ধির সহিত অতিচৈতন্য লোকের এই সৌন্দর্য্যস্পন্দন এমনই ক'রেই স্ত্রীলোকেও পুরুষের নিকট প্রত্যাশা করতে পারে। স্ত্রী এবং পুরুষের মাঝে বন্ধুত্বের ভিতর sex-attractionএর একটা স্থান রয়েচে নিশ্চয় এবং রয়েচে ব'লেই নারীপ্রকৃতিকে তার বিশেষ স্নিগ্ধতার মাঝে অক্ষুণ্ণ রেখেও চিন্তাজগতে, ললিতসৃষ্টিতে আইডিয়ার আদানপ্রদানে এই যে পরিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের অপেক্ষা সমাজ করেচে তাকে গভীর এবং মধুর সত্য ও সুকুমার সংযত অথচ কম্র ক'রে তুলবার যে দায়িত্ব তাকেও নিষ্ঠার সহিত অর্জ্জন ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের মাঝে যে নারীবিশেষত্ব রয়েচে সেইটুকুর জন্যেই তাঁদের সহায়তা এবং বন্ধুত্বের ভিতর বন্ধুত্বের অতীত একটা জিনিষ পাওয়া যায়, এইটে পেতে হ'লে তাঁরা যদি Sex-attraction প্রভৃতি কথা শোনাও বিপজ্জনক মনে করেন এবং সর্ব্বভাবে স্ত্রী-স্বভাবকে পরিহার করবার চেষ্টা করেন তাতে ক'রে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। নারীলাবণ্য বস্তুটি সত্যই ভালো, এবং এইটেকে ইনষ্টিংক্‌ট্‌এর কোঠা থেকে, সংযমে, নিষ্ঠায়, সৌন্দর্য্যে তার চেয়ে উচ্চস্তরে বিকাশ করতে পারলে অনেক অনির্ব্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়। সেদিন গলসওয়ার্দ্দির লেখায় আর্ট সম্বন্ধে ভারি চমৎকার গুটিকতক কথা চোখে পড়েছিল, নারীলাবণ্যকে ঠিক এমনি সূক্ষ্ম, অপরিদৃশ্য, অথচ অপরিহার্য্য ভাবে নেওয়া যেতে পারে, "Flavour! an impalpable quality, less easily captured than the scent of a flower, the peculiar and most essential attribute of any work of art! Flavour, in fine, is the spirit of the dramatist projected into his work in a state of volatility, so that no one can exactly lay hands on it, here, there, or anywhere." স্ত্রীলোক যদি তাঁদের সংস্পর্শের সহিত সৌন্দর্য্যসৃজনের কাজটা আর্টের মত ক'রে গ্রহণ করেন, অনুভব, আন্তরিকতা, সংবরণ এবং সর্ব্বোপরি সংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাকে সিক্ত ক'রে তোলেন সেইটেই সব চেয়ে ভালো হয়।

কিন্তু বোধ করি বন্ধুত্ব জিনিষটাই স্ত্রীলোকের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। স্ত্রীলোকের স্নেহ প্রেম সমস্ত প্রকার মনোবৃত্তির মাঝেই ইনষ্টিংক্‌ট্‌-এর প্রবলতা রয়েচে। একজন পুরুষের সহিত তার পুরুষবন্ধুর অনেক স্থানে গভীর অনুরাগবন্ধন যেমন ক'রে দৃঢ়তম হ'য়ে ওঠে, জীবনসম্বন্ধে out-lookএ আইডিয়াতে, সৌন্দর্য্যোন্মুখ চিত্তের রসপিপাসু শত সহস্র স্রোতঃপথে ঐক্যসূত্র খুঁজে পেয়ে, জ্ঞানে, সৌন্দর্য্যে, বৈচিত্র্যে যেমন ক'রে তারা বন্ধুত্বের সৃষ্টি করতে পারে সে ইনষ্টিংক্‌ট্‌-এর তাগিদকে স্পর্শও করেনি। অথচ স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের বন্ধুত্ব তাদেরই জীবনে তাদের জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ এবং গভীরতম অংশ অধিকার ক'রে রয়েচে, এ সম্ভব হ'য়ে উঠল না। যেটুকু বন্ধুত্বের আভাস তারা সৃষ্টি করতে পারে তার বেশির ভাগ, সামাজিক ও কৃত্রিম এবং লৌকিকতার

বাঁধা চাপে বরাদ্দমত সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে। নারীলাবণ্যে অতিচৈতন্যলোকে যে বিশেষ তৃপ্তির অপেক্ষা রয়েচে সে বোধ করি নারীর সাহচর্য্যে তার বিভিন্ন Sexএর দরুণ যে আকর্ষণী শক্তি এবং ছুটো বিপরীত, অসাম্য উপাদানের সংযোগে যে আবেগ এবং উত্তেজনার সঞ্চার, তাকেই মধুরতর এবং গভীরতর ক'রে সৃষ্টি করা। অথচ এই সৃষ্টি করাটা সত্য ও সুন্দর ক'রে তোলা যে কত কঠিন সে য়ুরোপের অনেক চিন্তাশীল, যাঁরা এই সমস্যার কথা নিয়ে ভেবেচেন, তাঁদের সেই সব চিন্তার কথা নিয়ে একটুখানি ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। যদিচ আমাদের দেশে নিঃসম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষের জ্ঞানলোকে ভাবলোকে কোন লোকেই কোন-প্রকার বন্ধুত্বের অবকাশক্ষেত্র নেই, কিন্তু আইডিয়া ও থিওরি নিয়ে ভেবে দেখতে দোষ নেই। বিশেষ ক'রে ভারতের সর্ব্বপ্রকার সনাতন বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ভবিষ্যতে এই জিনিষই যে আমাদের দেশে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে না সে সম্বন্ধে আজও কেহ নিরতিশয় নিঃসংশয় ন'ন। সমাজে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের এই বন্ধুত্বসূত্র যাতে সর্ব্বদিক থেকে আবেশ এবং উত্তেজনাবর্জ্জিত হ'য়ে নির্ম্মুক্ত, অবচ্ছিন্ন, সত্য হ'য়ে ওঠে সে নিয়ে H. G. Wells. অনেক চিন্তা করেচেন। তাঁর এক উপন্যাসের পাত্রী তার আশৈশবের সখা, স্নেহাস্পদকে বহুদূর থেকে চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েচে স্ত্রীলোকের কথা নিয়ে তুমি ভাব না কেন? এবং তার এইদিকের আশঙ্কা-টাকেও ব্যক্ত করেচে। "My dear, wasn't all that time, all that heat and hunger of desire, all that secret futility of passion, the very essence of the situation between men and women—but that humans are creative and unselfish and so forth, and that it is their sexual, egotistical, passionate side, (which is so much bigger relatively in a woman than in a man) which is going to upset your noble and beautiful apple-cart. Stephen, there are moments when it seems to me that this futility of women, this futility of men's effort through women is a fated futility in the very nature of things." H. G. Wells: The Passionate Friends। স্ত্রী এবং পুরুষের এই যোগবন্ধন সর্ব্বপ্রকারে হওয়া প্রয়োজন। এইটে কৃত্রিম হ'লে এই ফল দাঁড়াবে যে একজন পুরুষ, একজন স্ত্রী-লোকের মনোজগত এবং অন্তঃপ্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে, জানবার এবং গ্রহণ করবার সুযোগ হয়ত পেতে পারে কিন্তু এইটুকু নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এবং অন্য স্ত্রী-লোকের প্রতি একটু আনম্র উদাসীনতা, একটু সুমার্জ্জিত অমনোযোগ দেখাতে হবে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও তাই সহজ বন্ধু হিসেবে এক জন পুরুষ ছাড়া, অপর সকলের প্রতি তার সম্বন্ধটা দাঁড়াবে, ঈষৎ সুমিষ্ট কৃত্রিমতা, এবং বিনম্র গোপনতা। বাইরের দিক থেকে মেলা মেশার লৌকিক বাধা উঠে গেলেও, অন্তরের ক্ষেত্রে, স্ত্রী এবং পুরুষের, মনো-জগতের বন্ধুত্ব, সত্যই গভীর ও সৌন্দর্য্যশীল ক'রে তুলতে হ'লে আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন।

আধুনিক কালের অনেকে বলচেন, নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বে সব চেয়ে যেটা আকর্ষণের বস্তু, সেটা তার ইম্পার্সোনাল সমস্যা নির্ণয়ের ক্ষমতাও নয়, চিন্তাশক্তির প্রখরতা নয়, সে হচ্ছে তার নারীত্বের মাধুর্য্য।

স্ত্রীলোকের erotic personalityর একটা প্রভাব নিঃসন্দেহই রয়েচে, এমন কি ব্যক্তিত্বের অন্যান্য অংশের চেয়ে এই দিকের প্রভাবটাই তার সবচেয়ে বেশি, অথচ একে উত্তেজনা এবং ইন্‌স্পিরেসন (inspiration)এর পথে ক্রমাগত চালনা ক'রে লঙ্কা মরীচের তীব্রতায় উত্তপ্ত না ক'রে তুলে, স্নিগ্ধতা সংবরণ, ও প্রকাশ এবং অপ্রকাশের ইঙ্গিতে মধুর ক'রে সৃষ্টি ক'রে তোলা যায়। স্ত্রীলোক মোহিনী নয়, মায়াবিনী নয়, এবং পুরুষপ্রকৃতিকে ইন্‌স্পিরেসন এর বড়ি জোগান দেওয়া তার কাজ নয়। বিশ্বের কবিরা নিখিল প্রণয়ীর মত, প্রকৃতির এবং স্ত্রীলোকের স্তব গান করেচে, কিন্তু সে স্তব গানে স্ত্রীলোকের বিচলিত হবার কিছুই নেই। কবিপ্রকৃতির কাছে গন্ধ, গান, দৃশ্যের যে মূল্য, তাদের স্পর্শে কবিচিত্তের বিশেষ বিশেষ ভাবান্দোলনকে আরও উত্তেজিত ক'রে তোলে, নারীর সেই হিসেবেই স্থান, তার বাস্তব সত্তাকে তার সমস্ত ভাল ও মন্দ, দুর্ব্বলতা এবং

শ্রীমতী আশালতা দেবী

অসুন্দরতার সহিত গ্রহণ ক'রে তার সত্যকার ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় সে নয়, সে হচ্ছে, কবিপ্রকৃতির মোহাঞ্জন, যেমন ক'রে তাকে দেখেচে এবং মানবজগতের তিলোত্তমার সঙ্গে মিলিয়ে গুটিকতক দুর্লভ আইডিয়াল দিয়ে যেমন ক'রে তাকে মণ্ডিত করেচে, সেই অবাস্তব মানসীর কাছে সৌন্দর্য্যোচ্ছাস নিবেদন। নারীকে আশ্রয় ক'রে কবির অন্তর্লোকে যে সব সুকুমার অনুভব উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেচে, সেই অনুভবেরই বিশেষ ক'রে আদর রয়েচে, নারীর সত্যরূপ এবং সত্য সাহচর্য্যের নয়।

স্ত্রীলোকের জ্ঞানরাজ্যের, ভাবরাজ্যের, সৃষ্টিকার্য্যে যে অক্ষমতা রয়েচে, বাইরের দিক থেকে তার অনেক রকম কারণ দেখান হয়েচে, কিন্তু এমনও হ'তে পারে এর কারণ বাইরের মধ্যে নেই, এর কারণ বিশ্ব-প্রকৃতিতেই রয়েচে। এ সমস্ত কথার নিঃসংশয় ক'রে মীমাংসা করা কঠিন। জৈবতাত্ত্বিক বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে স্ত্রীলোকদের যেমন ক'রে একই একাগ্র প্রণালীতে চালনা করেচেন, পুরুষদের বেলায় সে আবশ্যকের জের তাঁকে তেমন ক'রে টানতে হয়নি, অতএব পুরুষে সৃষ্টিকার্য্যে অনেকটা ছুটি পেয়েচে।

এই কথাটায় স্ত্রী পুরুষের মাঝে বিশ্ব-প্রকৃতিতে যে বৈষম্য রয়েচে সে বাদ দিয়েও বাহিরের হিসাবে একটা অতিশয় বাস্তব দিক রয়েচে। মানবসন্তানের দায়িত্ব দীর্ঘকাল ধ'রে নারীকে বহন করতে হয়, এ দীর্ঘ কালের কোন সঠিক হিসেব নেই তবে এই কথা বলা যেতে পারে Sexual life পুরুষের জীবনে যতটা সময় অধিকার ক'রে রয়েচে, স্ত্রীলোকের তার চেয়ে কিছু বেশী সময় অধিকার ক'রে আছে। প্রকৃতির এই একাগ্র প্রবর্ত্তনা স্ত্রীলোকের সৃষ্টি-অক্ষমতার একটা কারণ ব'লে নির্দ্দেশ হয়েচে। কিন্তু মানুষের সমস্ত শক্তিকে স্পর্শলেশহীন ক'রে সৃষ্টি-কাজে নিয়োজিত করা যায় না, ইনষ্টিংক্‌ট্‌এর দাবী মেটাতে খানিকটা তাকে খরচ করতে হবেই, এবং আমার মনে হয় এই দাবী মেটাবার প্রয়োজনের স্থানে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন যে বেশী এবং পুরুষের কম তা নয়। অন্ততঃ এখানে কোন মোটা রকম generalisation করা চলেনা। H. G. Wells লিখেচেন "I do not believe that a normal man can go on living a full mental life in a state of sexual isolation. I refuse to entertain the idea that I should have accepted celibacy and devoted myself entirely to scientific work. Such a release with unimpaired energy is against all biological presumption. This is I am convinced as true for an ordinary woman as for an ordinary man." আজকাল সমস্ত ক্ষেত্রেই জীবনকে একটা সুসামঞ্জস স্থিতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখবার প্রবলতা উপস্থিত হয়েচে। কোথায় যেন পড়া গেছিল, যে সমস্ত সমস্যাই হচ্ছে a question of harmony। ঠিক এই প্রবৃত্তিটাই আধুনিক কালে সমস্ত প্রকার সমস্যানির্ণয়ে এসে পড়েচে। এতকাল ইনষ্টিংক্‌ট্‌ জিনিষটা অনেকে অনেক পরিমাণে অবহেলা ক'রে এসেচে, কিন্তু আজ যখন সমস্ত জিনিষকেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তার শেষ তল অবধি বুঝবার সময় উপস্থিত হোল, তখন সহজেই প্রমাণ হয়েচে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক আর্টিষ্ট, তাঁদের জীবনেও ইনষ্টিংক্‌ট্‌এর তাগিদকে পূর্ণ করবার প্রয়োজন কিছু কম নয়, এমন কি একে অস্বীকার করতে বসলে বহিঃপ্রকৃতি এবং মানসপ্রকৃতির সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতির পথে বাধা পড়ায় অশ্রান্ত দ্বন্দ্বে, প্রতিঘাতে সৃষ্টি করবার শক্তিকেও সে খর্ব্ব ক'রে ফেলে। বাস্তব দিক বাদ দিয়ে অন্তঃপ্রকৃতিতে স্ত্রীলোকের সৃষ্টিঅক্ষমতার কারণ কোথায় রয়েচে, এবং তার কতটা অসংশয়ে সত্য বলা যায় সেইটে নিয়েও ভেবে দেখা দরকার।

এর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে, আইডিয়ার প্রতি স্ত্রীলোকের ঔৎসুক্য নেই, সে এমন কিছু চায়, যাকে ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়, যাকে জীবনের উত্তাপে প্রবল ক'রে অনুভব করা যায়। জীবনের একান্ত অব্যবহিত সংস্পর্শ ছাড়া, আইডিয়ার মণ্ডল, অথবা কোন সুদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে ধ্যানবদ্ধ গভীরতায় নিজেকে মগ্ন করবার ক্ষমতা তার নেই। H. G. Wells লিখেচেন—"A woman must see and touch, women are more immediate, what they want is a tangible

reality. For them images are a necessity." পুরুষে জীবন থেকে অনেক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কেমন ক'রে কাজ করতে পারে, ব্যক্তিগত আশা, কামনা, বিক্ষোভ কেমন ক'রে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কোন আইডিয়া অথবা আদর্শের মাঝে বিলীন ক'রে দিতে পারে, এবং স্ত্রীলোকে পারে না, নারীর কাছে জীবনের বাস্তবের জালটাই নিরতিশয় সত্য ; সে এতে ক'রে আপনাকে গভীর ভাবে, প্রবল ভাবে জড়িয়েচে, তাই বাস্তবকে অবচ্ছিন্ন (abstract) ভাবে গ্রহণ করবার শক্তি তার কত কম। এই দিককার বৈষম্যটা Wells তাঁর উপন্যাসে স্ত্রী এবং পুরুষের মনস্তত্ব পাশাপাশি ফুটিয়ে তুলতে ব'সে দেখিয়েচেন—

"Clementina is in life inextricably in life—But fundamentally I am outside life, receiving experiences. I like and want to do things with life, but I am not of the substance of lifeany more than I am of the substance of matter."
—World of William Clissold.

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাতে একান্ত ক'রে আবিষ্ট হ'য়ে থাকা, এবং শত সহস্র সূত্রে তারই সহিত অব্যবহিত হ'য়ে নিজের যোগ রাখা এই জন্যে মেয়েদের সৃষ্টির পথে বাধা হয়েচে যে জীবনকে সমগ্রভাবে অনাবিষ্ট ভাবে দেখতে সে বাধা দিয়েচে। এইদিকের কথাটা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নারী' সম্বন্ধে লেখায় ভারি সুন্দর ক'রে লিখেচেন, "বস্তুত পরিচ্ছিন্ন ভাবের সৃষ্টিতে অব্যবহারিক সত্যের সন্ধানে মেয়েদের যে বাধা, সেটা বাহিরের নয় অন্তরের, ভাবলোকের জ্ঞানলোকের সৃষ্টিতে অনেকটা পরিমাণে বুদ্ধির বৈরাগ্য থাকা দরকার। ব্যক্তিগত, বস্তুগত, ব্যবহারগত সংসক্তি বেশি থাকলে সেই বৈরাগ্যের অভাব ঘটে।" অথচ স্ত্রীলোকের সমস্ত প্রকার সংসক্তি অত্যন্ত পরিমাণে বৈাক্তিক। এবং এর কারণ দেখান হয়েচে, যে এই রকম না হ'লে চলে না। জীবন-স্রোত এবং জীবস্রোত চিরপ্রবাহমান রাখতে হ'লে এক পক্ষকে জীবলোকে ঔৎসুক্য বিশেষ ক'রে রাখতেই হবে, এবং সৃষ্টির মূলে যে বৈরাগ্যের ছায়া সঞ্চারিত হবার কথা রয়েচে, সেই বৈরাগ্যের প্রাবল্যে জীবলোকে আমাদের ঔৎসুক্যের ক্ষীণতা ঘটে। জীবসৃষ্টির ভূমিকায় স্ত্রীলোকের দায়িত্ব এবং সময়ের কাল যে কিছু বেশি সেই কথাটার বাস্তব দিক থেকে এই রকম ক'রে মীমাংসা হ'তে পারে, পৃথিবীতে সভ্যতার যা কিছু নিদর্শন গ'ড়ে উঠেচে সে মানুষের প্রয়োজনবিভাগের দাবী মিটিয়ে তার উদ্বৃত্ত অংশ এবং অবকাশ চর্চ্চার ফলেই সৃষ্টি হয়েচে। বাস্তব জগতে কাজের জন্য পুরুষের উপর অত্যন্ত তাগিদ রয়েচে কিন্তু যার মধ্যে সৃষ্টিব্যাকুলতা রয়েচে সে এই অবসরকামনার জন্যই বাস্তব সংসারের কাজ থেকে কিছু পরিমাণে ছুটি চায় এবং নির্লজ্জের মত কাজ ফেলে নিভৃত বাতায়নকোণ খোঁজে। যে সব স্ত্রীলোক গৃহসীমা অতিক্রম ক'রেও পৃথিবীর অনেক বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, তাঁরা অবকাশ খোঁজেন, অথচ এটা অস্বাভাবিক নয় জীবসৃষ্টির ভূমিকায় স্ত্রীলোকের ঔৎসুক্য এবং প্রয়োজন কিছু অধিক থাকা আবশ্যক ব'লে যে পৃথিবীকে তার বিস্তৃতি এবং চিন্তা ও সৌন্দর্য্যের দিক থেকে গ্রহণ করবার পক্ষে তার বাধা উপস্থিত হবে, এটা সত্য নয়। এইজন্য স্ত্রীলোক যদি তাঁর সন্তানসংখ্যা তাঁর সুবিধামত এবং অবসর-আকাঙ্ক্ষামত নিয়মিত করবার উপায় করেন সেইটেই হবে সব চেয়ে বাস্তব পথ। কিন্তু একটা কথায় আধুনিক কালে অতিশয় জোর পড়চে, সেটা হচ্ছে যে বহিঃ-সংসারের অনুকূলতা, অবকাশ, সুযোগ সমস্ত পেলেও মেয়েদের যেটা বাধা সেটা ভিতরকার বাধা এবং কারণ রয়েচে তার বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই ; অথচ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে চেষ্টা করলে করা যায় না এবং ফল যে তার সব সময়েই খারাপ হয় তাও ত নয়। একটুখানি ভেবে দেখলেই বোঝা যায় নারী এবং পুরুষকে আশ্রয় ক'রে পরস্পরের মাঝে পার্থক্যের যে সব দৃঢ় বিভক্ত সীমাটানা হয়েচে তার বেশির ভাগ কৃত্রিম। এমন কি প্রাকৃতিক দিক থেকেও উভয়ের মাঝে বড় বড় generalisation করতে বসা চলে না। আজকাল বিজ্ঞানের ব্যাপকতার দিনে এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি গ'ড়ে উঠচে, তারা বলে সমাজের ভালো মন্দ সুবিধা অসুবিধা হিসেব ক'রে যে সব সত্য এতকাল ধ'রে মুখে মুখে প্রচার হ'য়ে এসেচে তার ভিতরও বিস্তর সংশয় করবার কারণ রয়েচে, অতএব generalisationএর কাজটা

শ্রীমতী আশালতা দেবী

পূর্ব্বে যত সোজা ছিল এখন ঠিক তেমনই সহজ নেই। স্ত্রীলোকের প্রেম নিরতিশয় বৈয়ক্তিক, ব্যক্তিকে তার সমস্ত বিশেষত্ব নিয়ে রক্ষা করায় তার আনন্দ, কোন অ্যাবষ্ট্রাক্ট অরগ্যানিজেশন্ (organisation) এর কাছে ব্যক্তির বলি সে সহ্য করতে পারে না, এই সমস্ত আবৃত্তি ক'রে এতকাল স্ত্রীলোককে সভ্যতার একান্ত নিভৃত, সুকুমার মর্ম্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত স্ত্রীজাতির মনোবৃত্তি যদি এতই সুকোমল হোত তবে সেটা তাদের পক্ষে এবং মানবসভ্যতার পক্ষে ভালই হোত। অথচ তা নয়, এর কারণ স্ত্রী এবং পুরুষের ঔৎসুক্যভেদের উপর তত প্রতিষ্ঠিত নয়। এতদিন অবধি স্ত্রীলোক তার ইনষ্টিংক্টএর অংশটাকে একঝোঁকা ভাবে কেবলই বাড়িয়েচে, গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পর স্ত্রীলোকের দিক থেকে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সমিতি প্রভৃতি প্রবর্ত্তন হয়েচে বটে। কিন্তু যুদ্ধের হৃদয়হীনতা নিয়ে পুরুষ যখন ক্ষোভ করেচে তখন অনেক স্ত্রীলোকেরই তার বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের অন্যায় আশ্রয় ক'রে ঘৃণার দ্বারা তাকে আতপ্ত ক'রে তুলে যুদ্ধকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করতে বসতে বাধেনি। স্বজাতিপ্রীতি যেখানে বিচ্ছিন্ন বিচারবুদ্ধিকে আবিল ক'রে তোলে সেখানে ইনষ্টিংক্টএর প্রাবল্য ছাড়া কিছুই নেই। স্ত্রীলোক তার আপনার সন্তানের শুভকামনায় যেখানে অপর শিশুকে বঞ্চিত করতেও লেশমাত্র দ্বিধা বোধ করেনি, সেখানেও তার সন্তানস্নেহ কেবলই ইনষ্টিংক্টিভ্। স্ত্রীলোক ভালবাসে এবং ঘৃণা করে কিন্তু ভালবাসা এবং ঘৃণা করার যে মধ্যবর্ত্তী অবস্থা স্বাভাবিক সস্নেহ বিস্মরণ, সে তার রয়েচে কোথায়? আবেগ, আকর্ষণ, অধিকার বাদ দিয়ে অনাবিষ্টভাবে কোন বস্তুকে গ্রহণ করবার ক্ষমতার তার অভাব রয়েচে। স্ত্রীলোকের সন্তান-স্নেহকে, প্রেমকে possessive এবং ইনষ্টিংক্টিভ্ না ক'রে তাকে creative ক'রে তুলতে হলে যে চেষ্টার প্রয়োজন সে ভার তাকেই নিতে হবে, এ জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে দায়ী ক'রে লাভ নেই এবং পুরুষও স্ত্রীলোকের ঔৎসুক্যভেদের কথাটা মোটা ক'রে মনে রাখলেও লাভের সম্ভাবনা নেই।

পুরুষের সন্তানস্নেহ অনেক পরিমাণে সৃষ্টিশীল, সে তার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, এবং আইডিয়া, প্রাণস্পন্দনের ভিতর দিয়ে তারই রচিত মানব চরিত্রের মাঝে প্রকাশিত দেখতে চায়। ইংরাজীতে যাকে 'ego' বলা হয় সে জিনিষটা শুনতে খারাপ হ'লেও, সৃষ্টিশীল মনোবৃত্তির মাঝে এই জিনিষই যদি না থাকে, তবে সৃষ্টি কোন দিনও সম্ভবপর হোত না। পুরুষে যখন জীবসৃষ্টির প্রবর্ত্তনায় ধাবিত হয়েচে তখন তাদের মনোবৃত্তির মূলে এই ভাবেরই প্রাধান্য রয়েচে। "Man is and will remain incurably egotist. To cease to be an egotist is to cease in that measure to be an individual. Even when he devotes himself wholly to the service of the species, it is that he seeks to realise his individual difference to the full in order to add it to the undying experience of his kind." H. G. Wells. স্ত্রীলোকের সন্তানস্নেহ ইনষ্টিংক্টিভ্ কিন্তু এই ইনষ্টিংক্টএর কোঠাকে এখন যদি না সে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, তাতে সেটা উভয় পক্ষেরই ক্ষতির কারণ হবে। জীবলোকের প্রতি অতিমাত্রায় সংসক্তি না থাকলেই যে সেটা জীবলোকের কল্যাণের অন্তরায় হয় তা ত নয়। বস্তুত সংসক্তি এবং কল্যাণ এ দুটো এক বস্তু নয়। স্ত্রীলোকের ভালবাসার চারিদিকে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে জড়িত করবার এবং অপরকে ক'রে তুলবার এই যে একটা অত্যন্ত উগ্রতা রয়েচে, সেইটের দ্বারা জীবলোকের প্রতি অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করবার লক্ষণ দেখা গেলেও সেটা পরস্পরের পক্ষে শুভ নয়। ভালবেসেও নিজেকে উদার, নির্ম্মুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন রাখা যায়। যেখানে যায় না সেখানে যে ভালবাসচে এবং যে ভালবাসা পাচ্ছে উভয়ের পক্ষেই সেটা অকল্যাণ হ'য়ে ওঠে। জীবলোকের কল্যাণের পক্ষে এই একান্ত তীব্র সংসক্তি প্রাথমিক দিনে যত প্রয়োজন থাক, সভ্যতার বিস্তার এবং জটিলতা বাড়ার পরও যে তার সেই একই প্রয়োজন রয়েচে, তা ত নয়। মানুষের প্রাথমিক জীবনের অনেক ছোট বড় ইনষ্টিংক্ট, যেগুলো তাদের প্রয়োজন শেষ হ'য়ে যাবার পর এতদিনে বিলীন হ'য়ে যাবার কথা ছিল অথচ যায়নি এবং সভ্যতার উচ্চ স্তরের সঙ্গে নিজেকে না মেলাতে পেরে বহুবিধ আকস্মিক উৎপাতের সৃষ্টি করচে, এ ঠিক সেই ধরণেরই। ইনষ্টিংক্টের যথার্থ

স্থানকে অস্বীকার করা চলে না। আমিও বলতে চেয়েছিলেম জীবনব্যাপারে ইনষ্টিংক্‌টএর দাবীকে সুসমঞ্জস ভাবে মেলাতে চেষ্টা না করলেও আবার পূর্ণতা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জন্যে স্ত্রীলোকদের, সঙ্গতিজ্ঞান এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি অর্জ্জন করা আবশ্যক। সন্তানস্নেহের মাঝে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েরই, সামাজিক কর্ত্তব্য, নৈর্ব্যক্তিক ভাবে নিজের আইডিয়া অথবা ব্যক্তিত্বের অনেক অপরিদৃশ্য বিশেষত্ব এক জনের মাঝে বিকশিত হ'তে দেখবার আকাঙ্ক্ষা এ সব ছাড়াও একটা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা এবং ইনষ্টিংকৃটিভ্‌ অংশ রয়েচে। প্রিয়তম এবং প্রিয়তমার শরীর ও মনের নিগূঢ় বিশেষত্বের একটু ছায়াপাতে, কেশে অথবা ঘনপক্ষ্মে সেই পরিচিত সৌন্দর্য্যের নূতন প্রকাশে, এই সব দিক থেকে সন্তানের মাঝে মানুষ ব্যক্তিগত আনন্দ এবং রহস্যচ্ছায়াময় মাধুর্য্য অনুভব করে, যার কারণ, সমাজের প্রতি ইম্পার্সোনাল কর্ত্তব্য, জীবনশীল মানবপ্রকৃতির মাঝে আপনার আইডিয়ার বিকাশ, অথবা ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতাকে সুস্পষ্ট ক'রে বংশানুক্রমে চিরপ্রকাশমান ক'রে রাখবার ইচ্ছা, এ সমস্ত একটাও বড় বড় কথার ভিতর নেই, যেখানে রয়েচে, সেখানে বড় আইডিয়ার চেয়ে একটুখানি চিহ্ন, একটুখানি স্মৃতি এবং ইঙ্গিতের সমাবেশই বেশি। অথচ কবির কাব্যের মত তাদের এই সৃষ্টিতে পরস্পরের নিভৃত মর্ম্মস্থানের অনেক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকলেও, তার আনন্দবেদনার মাঝে নিজেকে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ না রেখেও পৃথিবীর মুক্তপ্রাঙ্গণে তার উপর অধিকারের সব সূত্র বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে মুক্তি দেওয়া যায় এবং আপনাদেরও ভিতরে এবং বাহিরে মুক্তি পাওয়া যায়। আজকাল যাঁরা মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা বলেন যে মানুষের possessive instinct এবং creative instinct এই দুই ধরণের প্রবৃত্তি থেকে আনন্দ পাবার উপায় রয়েচে। সে আনন্দের ভিতর শ্রেণী-বিভেদের পার্থক্যটাও অবশ্য খুব বড় ক'রে রয়েচে। সন্তানের স্নেহের উপর অধিকারের দাবী সাব্যস্ত ক'রে সুচিরকাল তাকে নানা প্রকারে কেবলই ইনষ্টিংকৃটিভ্‌ ক'রে তুলে স্ত্রীলোক যদি নিজেকে জড়াতে বসে, তবে তার দ্বারা তার চিত্তাকাশে বিচ্ছিন্নতার আভাস যে থাকবে না সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। শিল্পী যখন তাঁর পূর্ণতা দ্বারা সৌন্দর্য্যসৃজন করেন, তখন তাঁরই সৃষ্টি কি তাঁকে আবদ্ধ ক'রে রাখে? রাখে না ত। এমন কি তাঁর ভিতরকার ভাবাবেগ আন্দোলন এক একটি বিশেষ সংহত রচনার মাঝে স্পষ্ট আকার পেয়ে তাঁর চিত্তাকাশকে নূতন সৃষ্টির ছায়াপাতের জন্য আরও নির্ম্মুক্ত ক'রে তোলে। নারী যদি তার প্রেমের পূর্ণতার ভিতর দিয়ে তার মধ্যকার শ্রেষ্ঠতা এবং সৌন্দর্য্য, সন্তানসৃষ্টির দ্বারা দিতে চায় সে ত তার প্রাচুর্য্যের একটি বিশেষ আকার নিয়ে ব্যক্ত হয়েচে। এবং কবির কাব্যের মত সে তাকে বদ্ধ করে না কিন্তু সৃজনের আনন্দের মাঝে মুক্তির আভাস দেয়।

এখানে আমি এই কথা বলতে চাইছি মানবসন্তানের দায়িত্ব স্ত্রীলোককে পুরুষের চেয়ে বেশী দীর্ঘকাল ধ'রে বহন করতে হয় এ সমস্ত স্বীকার ক'রে নিয়েও নারীর মনোভাবের মূলে যে তীব্র সংসক্তি এবং ইনষ্টিংকৃটএর প্রাবল্য রয়েচে তাকে সে পরিবর্ত্তন করতে পারে কি না? সন্তানস্নেহকে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পক্ষ থেকেই instinctive না ক'রে creative করা যায়। এবং সৃষ্টির মাঝে যে একটা বৃহৎ মুক্তির বিস্তার রয়েচে সেখানেও ত সংশয়ের লেশ নেই। এবং এই জিনিষই স্ত্রীলোক তাঁদের স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা এবং মাধুর্য্যকে লেশমাত্র ব্যত্যয় না ক'রেও এবং ইনষ্টিংকৃটএর সহজ সুসমঞ্জসতাকে খর্ব্ব না ক'রেও চেষ্টা ক'রে লাভ করতে পারেন।

বাইরের প্রভাব যে সর্ব্বব্যাপী সে সত্য নয়, কিন্তু বাহিরের অধিকারক্ষেত্রে অনুকূলতা পাবার জন্যে স্ত্রীলোকের চেষ্টা এবং দুঃখ সহ্য করার যেমন প্রয়োজন রয়েচে, তেমনি অন্তঃপ্রকৃতির ভারটা একেবারে generalisationএর হাতে নির্ব্বিবাদে সমর্পণ না ক'রে, একেও নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার ভার নেওয়া যেতে পারে।

'নিট্‌শের' (Neitzsche) একটি ছোট্ট কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল—'transvaluation of all values'। পৃথিবীতে সব চেয়ে সংশোধনের পথ এই দিকেই খোলা রয়েচে, নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া এবং নূতন মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে চাওয়া। স্ত্রীলোক এত দিন যে দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে এসেচে সেইটে বাইরের প্রভাবের দ্বারা প্রকৃতির

প্রতিকূলতার দ্বারা এমনি নিরেট হয়েছিল যে তার পরিবর্ত্তন সম্ভব হ'তে দেরি হয়েচে। মানুষে তার অর্দ্ধছায়াময় মানব-সত্তাকে যতক্ষণ অনুভব না করতে পারে, দিন তার জড়ের মত কাটে, কিন্তু যখন সে আত্মোপলব্ধি করতে পেরেচে, তখন বহিঃসংসারের চাপে তাকে কেবলই চাপসহ ক'রে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। সে করতে গেলেই সংঘর্ষ বাধে, এবং যে কাজটা সোজা ছিল, সেইটে কঠিন হ'য়ে ওঠে। স্ত্রীলোকেরা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে যখন সত্যই সৃষ্টি ক'রে নেবেন, তখন বহিঃসংসারের অনেক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারবেন। নারী এবং পুরুষের পরস্পরকে দেখবার, চাইবার এবং গ্রহণ করবার দিকটা যদি সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিমতা এবং সুবিধা অসুবিধা বিচার করবার প্রবৃত্তিকে অতিক্রম ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, তবেই সত্যের আবির্ভাব সম্ভব হবে। স্ত্রী-লোকের মাঝে যে বুদ্ধির বৈরাগ্য নেই, প্রতিদিনের সংসার থেকে সে বিচ্ছিন্ন এবং নির্লিপ্ত হ'তে পারে না, এ সমস্ত বলা হ'লেও, চেষ্টা করলেই এই দিকেও সে আপনাকে সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে। স্ত্রী এবং পুরুষের সমস্ত বিশেষত্ব এবং বৈষম্য অতিক্রম ক'রেও তাদের জীবনপথের একটা অংশে তারা মানুষ। রাত্রির অন্ধকারে, তারার প্রশান্ত অথচ স্পন্দিত আলোর দিকে চেয়ে মানুষের মনে যে সহজ বৈরাগ্যের সুরটি জেগে ওঠে, গৃহ নয়, আশ্রয় নয়, স্নেহ নয়, জীবনরহস্যের সন্ধানে সে একাকী পথিক মাত্র। জীবনের সৌন্দর্য্যচ্ছায়ার প্রান্তে সে সঙ্গীহীন, বিস্মিত দর্শক, নারীর ভিতর এই সুদূরতার আভাস যে স্থান পায়নি, এই পরিচ্ছিন্নতার ভাব যে তাকে আক্রান্ত করেনি তা সম্পূর্ণ সত্য নয়; এবং সে ত আজও কেউ প্রকাশ ক'রে বলেনি। স্ত্রীলোকের সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষমতা রয়েচে কিনা জানতে হ'লে তার একমাত্র উপায় স্ত্রীলোকের সৃষ্টির একটা নির্দ্দিষ্ট 'ডেটা' পাওয়া। অথচ পঁচিশ বছর পূর্ব্বেও য়ুরোপের সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার সর্ব্বদিক থেকে স্বাভাবিক ব্যাপক এবং উন্মুক্ত ছিল না, এবং এই অল্পকালের মধ্যে সৃজনচেষ্টায় তাঁরা কোন আভাস দেখিয়েচেন কিনা সে নিয়ে বিচার করবার সময় বোধ করি আজও উপস্থিত হয় নি। আমাদের দেশের কথা না হয় এখন থাক্।

শৈশব সাথী

শ্রীনবেন্দু বসু

হে মোর শৈশব সাথী সুন্দর বনানী!
কোথা তব ছায়াতল—মনে পড়ে আজ
স্বপ্নসম সেই দিন অতীতের মাঝ—
স'রে গেছ বহুদূরে এই শুধু জানি।
কূজনমুখর সেই শ্যামশোভাখানি
যদি বা আজিও থাকে পরি সেই সাজ,
আর কি চিনিব তবু? সর্ব্বগ্রাসী কাজ
নয়নে দিয়েছে ক্রূর আবরণ টানি।
অতীতের ধারে আছে সেই ছায়া-তরু,
বর্ত্তমানে স্মৃতি তার, মাঝে শুষ্ক মরু।
তবু যেন মনে হয় আবার বা কবে
বুঝি কোন চন্দ্রালোকে উঠিবে উছসি'
সে লুপ্ত সুষমা পুন---যেন চেয়ে রবে
সজলনয়না মম জনম-প্রেয়সী।

আসামের বাঘ

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

১

আজ বহুদিনের কথা—জানিতাম না যে জীবনের এই সায়াহ্নে—সুদূর প্রবাসের নির্জ্জনবাসে, অতীত জীবনের ঘটনাবলীর স্মৃতিগুলি ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য দেবী বীণাপাণিকে আবার আরাধনা করিতে হইবে।

দিব্যচক্ষে দেখিতেছি সেই জার্ম্মাণ সিংহ-চিত্রকরের অবস্থা আমার অবশ্যম্ভাবী! হতভাগ্য চিত্রকর জীবনে সিংহের আকৃতি কখনও দেখে নাই, এদিকে সিংহ প্রতিকৃতির সনির্ব্বন্ধ প্রয়োজন। কি করে ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় না পাইয়া শেষে না বিড়াল, না কুকুর, না খেঁকশিয়াল, না ভল্লুক, এক অপূর্ব্ব সিংহই আঁকিয়াছিল। তাই ভয় হয় এই বিস্মৃতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত অসংলগ্ন চিন্তারাশির সংমিশ্রণে না জানি কি এক উপাদেয় পদার্থই প্রস্তুত হইবে। সহৃদয় পাঠকের নিকট পূর্ব্বেই ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া রাখিতেছি।

'হুজুর খপড়িয়া এয়েছে, কর্ত্তা মউর করেছে।'

হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে কোথায়?'

'এজ্ঞে চলাকুড়ার চরে, বাথানে।'

আমি ত অবাক! বিশেষ স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সে সময় আমরা কার্য্যে এতই নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম যে হঠাৎ এই খবর শুনিয়া আমি সংবাদ-দাতার দিকে চাহিয়া রহিলাম, মোটামুটি এইমাত্র বুঝিলাম কোন শিকারের খবর আসিয়াছে। আমাকে বিস্ময়ান্বিত দেখিয়া হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কিছু বুঝিতে পারিলেন কি?'

'কর্ত্তা মউর করেছে' এটুকু বুঝিতে আমার বিলম্ব হইতেছিল, তাই তিনি বলিলেন 'আজ খুব সুসংবাদ, চলাকুড়ার চরে মহিষের বাথানের একটা মহিষকে বাঘে মারিয়াছে। আমরা আজ শীঘ্র সেখানে যাইতে পারিলে নিশ্চয়ই এই বাঘ মারিতে পারিব। আপনিও প্রস্তুত হউন, শীঘ্র করিয়া আমাদের আহারাদির ব্যাপার শেষ করা যাক।'

এই বলিয়া তিনি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাঘ শীকারে যাওয়ার বন্দোবস্ত হয় তাহার আদেশ দিলেন। যাঁহারা শিকারে যাইবেন তাঁহাদেরও সংবাদ পাঠান হইল। শিকারের সাজ সরঞ্জাম ক্ষিপ্রগতিতে চলিতে লাগিল। কয়েকটা হস্তী আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সত্বর সজ্জিত হইতে আদিষ্ট হইল। বাকীগুলিকে শীকার-ভূমিতে কয়েকটা হাওদাসহ শীঘ্র রওনা করিবার জন্য 'ধুরায়' * বরকন্দাজ প্রেরিত হইল। আমরাও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া শিকারী বেশে সজ্জিত হইলাম।

বহুদিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল আজ মিটিবে, আজ নিশ্চয়ই বাঘ পাওয়া যাইবে শুনিয়া আমার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। বিশেষতঃ যাঁহাদের সঙ্গে শিকারে যাইতেছি তাঁহারা ব্যাঘ্র-শিকারে বাল্যবয়স হইতেই দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তাঁহারা বাঘের সঙ্গে একপ্রকার বাস করেন বলা যাইতে পারে। সুতরাং আজিকার সফলতার আশায় নিঃসন্দেহ হইয়া চিত্ত একান্ত উদ্বেলিত হইতেছিল। পূর্ব্বে বহুবার বরেন্দ্রভূমে শার্দ্দূল শ্রেষ্ঠের সন্ধানে যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য এমনি সুপ্রসন্ন ছিল যে, 'ঐ গেল', 'ঐ গেল,'—এই কথা শুনা ছাড়া কখনও master-stripesএর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটেনি। তবে দু'টা একটা Tiger-Cat, কি নকড়া (নেকড়ে) ও দু'টা চারিটা ক্ষুদ্র চিতা বাঘ সময়ে সময়ে মিলিত। তা ছাড়া, রাজসাহীর সেই প্রায় তিন শতাধিক মনুষ্যহন্তা

* (ধুরা—যেখানে হস্তীরা সর্ব্বদা থাকে, বিশ্রাম করে, 'চারা' আনিয়া আহারাদি করে ও নিশা যাপন করিয়া থাকে।)

আক্রমণ

শিল্পী—ডি, দত্ত

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের সৌজন্যে

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী.

ক্রূর বাঘিনীর হৃৎকম্পকারী কাহিনীগুলি আজিও বেশ মনে আছে। তাহার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ-প্রবেশ, সুপ্তা জননীর কোল হইতে শিশুপুত্র উত্তোলন—ক্ষিপ্রগতি পলায়ন, গৃহাভিমুখী কুম্ভকক্ষা কামিনীকে লইয়া নিরুদ্দেশ, অসতর্ক পথিককে বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ ও নিহনন প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ভীষণ অত্যাচার সমূহ বরেন্দ্রভূম বিত্রস্ত ও বিকম্পিত করিয়াছিল। সেই সাক্ষাৎ যমভগিনীর পশ্চাৎ আমাদের নিষ্ফল অনুসরণ ও দারুণ মনঃক্ষোভ আজিও বেশ মনে খেদান হইয়াছিল। যে সব জঙ্গলে নিশ্চিতই বাঘ পাওয়া যাইত, আমার শুভাদৃষ্টগুণে তাহারা সে সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল।

যাহা হউক এবার মনে ভারি স্ফূর্ত্তি, এবার বোধ করি বাড়ী হইতে মাহেন্দ্রযোগে পা বাড়াইয়াছিলাম। যে প্রকার শিকারের হৈ রৈ পড়িয়া গিয়াছে, শিকারীদের সাজ সরঞ্জাম, উৎসাহ-উদ্যম ও শিকার-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে

নদী উত্তরণ

আছে। অধিকন্তু যে দিনের কথা লিখিতেছি, ইহার ঠিক পূর্ব্ব বৎসর এই সময়ে ঘটনাক্রমে দার্জ্জিলিং হইতে আমাকে এখানে আসিতে হয়। যাঁহার সহিত আসিয়াছিলাম তিনি, এত ক্ষুদ্র নগণ্য যে আমি, আমার প্রতি যে প্রকার অতিথি সৎকারের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। আমাকে ব্যাঘ্র-শিকার দেখাইবার জন্য বহু হস্তী লইয়া প্রায় ৮।১০ ক্রোশ] পরিমিত জঙ্গল কতক্ষণে শিকারে রওনা হওয়া যাইবে, কতক্ষণে ব্যাঘ্র-শ্রেষ্ঠের সেই ভীষণ গর্জ্জন বনভূমি কম্পিত ও আমার অধীর-উন্মুখ চেতনায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করিবে, এই চিন্তায় মুহূর্ত্তগুলি যেন এক একটি যুগ বলিয়া বোধ হইতেছিল। আহত ব্যাঘ্রের ভীষণ আস্ফালন ও সবেগ আক্রমণ আজ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারিব, যাহা পূর্ব্বে মাত্র কল্পনা-চক্ষে দেখিয়া চিত্রে প্রতিফলিত করিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে কাহারও বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ, কাহারও

বা সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলাম; অভিজ্ঞবর্গের (connoisseurs) অনুকূল-প্রতিকূল সমালোচনা অর্জ্জন করিয়া অবশেষে যাহা তদানীন্তনজীবিত নবাব আমাগুল্লার প্রদত্ত দুই শত মুদ্রা পুরস্কার-জয়মাল্যে ভূষিত হইয়াছিল, সেই ছায়াময়ী কল্পনা আজ এতদিনের পর বাস্তবে পরিণত হইবে ভাবিয়া হৃদয় একান্তই উদ্বেলিত হইতেছিল।

২

খর বৈশাখের বেলা ১০টার পর হস্তীতে রওনা হইয়া প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে ব্রহ্মপুত্রের এক সোঁতার (শাখা-স্রোত) ধারে উপনীত হওয়া গেল। সেই দারুণ গ্রীষ্মেও সোঁতার ক্ষীণ শরীর নিতান্ত ক্ষীণ ছিল না। অপর পারে বিস্তীর্ণ বালু-চর ধূধূ করিতেছে। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে বালু-বক্ষ ঈষৎ বিকম্পিত, আরও দূরে চরের উপর শ্যামল জঙ্গল-শ্রেণী। চরের সম্মুখ ভাগে নদীর তীরদেশে একখানা পর্ণ-কুটীর দেখা যাইতেছে; শুনিলাম উহাই মহিষের বাথান। এই বাথানে প্রায় ৭০০ মহিষ আছে। উহারা ঐ চরের জঙ্গলে চরে, রাত্রে চরেই কুটীরের পার্শ্বে এখানে সেখানে দলবদ্ধ হইয়া শয়ন করে। কুটীরে 'মৈষেল' সর্দ্দার ও রাখালেরা থাকে, মহিষদলের পাহারা দেয়, জঙ্গল হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডঙ্কা বাজাইয়া বাথানে ফিরাইয়া আনে। দুগ্ধ-দোহন, মাখন ঘৃত ও দধি প্রস্তুত করণ, বংশখণ্ডে দুগ্ধভাণ্ড নির্ম্মাণ প্রভৃতি বাথান সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের ভার উহাদের উপর সমর্পিত। উহারা বাথানজাত দ্রব্যের ব্যবসায় চালায়, ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখে ও উহার লাভ হইতেই নিজেদের বেতনাদি গ্রহণ করে। কেবল সময়ে সময়ে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে 'ধনীকে' দুগ্ধ দধি প্রভৃতি যোগাইতে হয়। কিংবা কোথাও বা নিত্যই কিছু পরিমাণ 'খাউদা' বা 'মাথুর' (দধির সারভাগ) মহাজনের বাটী পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

যে নদীর তীরে বাথান ছিল তাহার নাম 'ছাতাগুড়ি'। প্রায় সমস্ত হস্তীই নদী পার হইয়া ওপারে উঠিয়াছে। আমরা 'ছাতাগুড়ি' পার হইবার জন্য ক্রমশঃ উচ্চ তট হইতে নীচে নদীর জলে নামিতে লাগিলাম, হস্তীতেই নদী পার হওয়া চলিবে। জল বিশেষ গভীর ছিল না। কূলে 'বারমেসে'দের কয়েকখানা নৌকা ভাসিয়া ছিল। উহারা চিরদিন স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া নৌকায় জীবনযাপন করে। উহারা নানা প্রকার মণিহারী দ্রব্যাদি রাখে ও ঔষধার্থে নানা আরণ্য গাছ গাছড়া মূল, এবং নানা প্রকার পক্ষীর পালক; আরণ্য জন্তুর অস্থি চর্ম্ম প্রভৃতি নিকটস্থ হাটে, বাজারে বা গঞ্জে 'ফিরি' করিয়া বেড়ায়। ইহাই উহাদের ব্যবসায়। উহাদের নৌকায় জন্ম, নৌকায় বাস ও নৌকায় মৃত্যু। উহাদের কথা শুনিয়া আমার ক্যাণ্টনের নৌকাবাসী চীনদের কথা মনে পড়িল।

বারমেসেদের নিকট শোনা গেল যে গত রাত্রে ওপারের জঙ্গলে বাঘ অনেকবার গর্জ্জন করিয়াছে। আজ আমরা নিশ্চয়ই বাঘ পাইব। শিকার ছাড়িয়া নিশ্চিতই বাঘ পলায় নাই। মধ্যে এই নদীটুকু ব্যবধান। আমাদের ধৈর্য্য আর সীমার গণ্ডীর ভিতর থাকিতে চাহে না। এদিকে হস্তী নদীজলে সমস্ত শরীর ডুবাইয়া পৃষ্ঠদেশ ও মাথা মাত্র জাগাইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। সিন্ধুজলে বটপত্রশায়ী ভগবানের মত আমরাও স্পন্দহীন, আপনাকে আপনি স্থির রাখিয়া চলিয়াছি। হস্তী কখন কখন সম্পূর্ণ অবগাহনের চেষ্টা করিতে থাকে, মাহুত অমনি লৌহ-অঙ্কুশ তাহার মাথায় বসাইয়া দেয়। কাজেই সে আমাদের বসিবার সম্বল গদিখানা সম্পূর্ণ ভিজাইতে পারে না। এই বুঝি জলে ভিজিয়া যাই, এই বুঝি হস্তী জলে ডুব দেয়, এইরূপ ভয়ে ভয়ে আমরা কোন ক্রমে নদীর পরপারে উপনীত হইলাম।

কয়েকটা হস্তী শিকারে যাইবার জন্য বাথানের কুটীর পার্শ্বে প্রস্তুত হইয়াছে। দুই চারিটা বা হাঁটু গাড়িয়া রহিয়াছে; মাহুত ও কামলা (মাহুতের অনুচর, হস্তীপালন সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকে) পৃষ্ঠে 'গাদালা' (গদি, Pad) করিতেছে। একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল হস্তীর পৃষ্ঠে হাওদা কষা হইয়াছে। হাওদার ভিতর বন্দুক তোষদান কার্ত্তুস (cartridge case) ও অন্য অন্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি তুলিয়া

† (মহিষদলের ও বাথানের অধিকারী)

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

শ্রেণীবদ্ধভাবে যথাস্থানে সাজান হইতেছে। বাথানের নিকট পৌছিলে হস্তীকে 'তেরে বৈঠ,' 'তেরে বৈঠ,' (সহজে নামিবার জন্য হস্তীর ঝুঁকিয়া বসা) করিয়া বসান হইলে আমরা হস্তী হইতে অবতরণ করিলাম। মষেল সর্দ্দারের নিকট শুনিলাম পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন মহিষের দল জঙ্গল হইতে ফিরিতেছিল, সেই সময় দলের একটা মহিষকে বাঘে মারিয়া ঘন জঙ্গলের ভিতর লইয়া যায়। যখন বাথানে সমস্ত দলের মধ্যে গণনায় একটা মহিষ কম প্রকাশ পায়, তখন এক জন 'মষেল' একটা মহিষে চড়িয়া জঙ্গলের ভিতর তাহাকে অনুসন্ধান করিতে যায় ও সেই ব্যাঘ্র-নিহত রক্তাক্ত ও কিয়ৎ-ভক্ষিত 'মউর'

মানসতীরে শিবিরশ্রেণী

(kill) দেখিতে পায়। পরক্ষণেই জঙ্গলের অন্তরাল হইতে ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। কাজেই ভয়ে সে মহিষ ছুটাইয়া বাথানে ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দেয়। এই 'মষেল'কে 'মউর' স্থান দেখাইবার জন্য একটা হস্তীতে চড়িয়া সঙ্গে আসিতে বলা হইল। কিছু বিশ্রামের পর সমগ্র হস্তী সজ্জিত হইলে শিকারীরা স্ব স্ব তোষদান বন্দুক সহ যথা নির্দ্দিষ্ট হস্তীতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কুমার আমাকে তাঁহার হাওদায় উঠিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন বিশেষ কারণে আমি অন্য হস্তীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি 'মোহন মালা' নাম্নী দ্রুতগামিনী হস্তিনীতে উঠিতে বলিলেন, ও টুনি নামক old veteran শিকারীকে সঙ্গে দিলেন। বলিয়া দিলেন—এই হাতী খুব চলিতে পারে, যদি বাঘ আক্রমণ (charge) করে তখন যেন আমি হাতীর পৃষ্ঠস্থিত রশী খুব সবলে ধরিয়া থাকি, হাতী ভয়ে ছুটিলেও কোন মতে নীচে পড়িয়া না যাই। এই অযাচিত উপদেশগুলি যে কিছু পরেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার প্রয়োজন হইবে তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। তখন শিকার প্রাপ্তির সফলতা বিষয়ে মন এতই নিবিষ্ট ও ব্যগ্র ছিল যে অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করার অবসর বা সম্ভাবনা ছিল না।

সিপাহীরা 'কুচ' করিবার পূর্ব্বে যেরূপ 'চলতি হো' শব্দ স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক সমস্বরে চীৎকার করিয়া যাত্রা আরম্ভ করে, মাহুতদিগের 'মাইল' 'মাইল' (হাতী চালানর শব্দ) শব্দও সেরূপ হস্তীবৃন্দকে শিকার যাত্রায় প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। তাহাদের সগর্ব্ব-পদ-বিক্ষেপণ, দোদুল্যমান শুণ্ড আস্ফালন, প্রকাণ্ড সূর্পের মত কর্ণ সঞ্চালন ও গুরু গম্ভীর বৃংহিত নিনাদ শিকারীদের প্রাণ কি এক অননুভূত ভাবে কি এক অদম্য বিপুল উৎসাহে মুহুর্মুহুঃ অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা বালু চরের উপর দিয়া জঙ্গলের নিকট পৌছিলাম। এখানে সোঁতার এক দিক ধরিয়া সতেরটা হস্তী ৩০।৪০ হাত অন্তর শ্রেণীবদ্ধভাবে লাইনবন্দি হইয়া দাঁড়াইল, এবং অর্দ্ধ-

বৃত্তাকারে ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভিতর নিঃশব্দে প্রবেশ করিবার জন্য ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইল। জঙ্গলের সম্মুখভাগ অনুচ্চ বনঝাউ পূর্ণ ছিল। অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশ ১২।১৪ ফুট উচ্চ গভীর বনঝাউ জঙ্গলে আমরা ডুবিয়া গেলাম। কখন বনঝাউ শেষ হইয়া ঘনসন্নিবিষ্ট 'বাতা' বনে, কখনও অসিপত্রসমন্বিত সমুচ্চ 'নল খাগড়া' স্তূপে, কখনও বা বন্য লতা সমাকীর্ণ ঘনবিন্যস্ত কণ্টকীবনে শুণ্ড আগাইয়া হস্তী অগ্রসর হইতে লাগিল। গজস্কন্ধে অঙ্কুশ হস্তে মাহুত, তাহার পশ্চাতে হস্তী পৃষ্ঠে গদির উপর বন্দুক হস্তে শিকারী টুনি, তাহার পশ্চাতে ঝাড়া চৌদ্দ ইঞ্চি দীর্ঘ কৃষ্ণশ্মশ্রুসমন্বিত স্বয়ং আমি। হস্তীপুচ্ছমূলে সবুট শ্রীপদদ্বয় ঝুলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছি, কি জানি যদি বাঘ নিঃসাড়ে হস্তী পশ্চাতে উঠে তবে ত সমূহ বিপদ। রাশি রাশি জঙ্গলে, মুহুর্মুহু ডুবিয়া যাইতেছি। কচিৎ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দূরে কোন মাহুতের সপাগড়ী শীর্ষদেশ, কোনো কোনো হস্তীর শ্বেত দন্ত, কোনও শিকারীর বন্দুকের নলী (চোঙ্) দেখা যাইতেছে। চারিদিক নিথর নিস্তব্ধ—মাথার উপর বৈশাখী মধ্যাহ্নের খররৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। মাঝে মাঝে হস্তীর জঙ্গল-বিমর্দ্দনের শব্দ, কচিত বৃংহিত নাদ, কচিৎ বা দূরাগত টিট্টিভের মৃদু মৃদু 'টি টি' ধ্বনি কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছে। এই বুঝি বাঘ বাহির হয়, এই বুঝি অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে—এই চিন্তাই মনোমধ্যে ক্রমাগত আনাগোনা করিতেছিল। কিন্তু কৈ, বাঘের ত কোন চিহ্নই পাওয়া যাইতেছে না। বাঘ কি হস্তীগন্ধ ভয়ে পলাইয়া গেল?

প্রায় ক্রোশ খানেক জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আমরা আর একটা সোঁতার পার্শ্বে উপনীত হইলাম। এই সোঁতার পরপারে আবার জঙ্গলের সারি। নিকটস্থ সিক্ত বালুতটে ব্যাঘ্রের কোন নূতন 'ভাঙ্গা' (ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন, থাবার দাগ, Trail) পাইবার আশায় কিছুক্ষণ বৃথা অনুসন্ধান করা হইল। যে জঙ্গল ভূমি খেদান হইয়াছিল তাহা বাদ দিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ আমরা জঙ্গলের মধ্যভাগে প্রবেশ করিলাম। এখানে বেশীর ভাগ লম্বা লম্বা ঘাসের দল। মাঝে মাঝে বাতাবন—বনমধ্যে 'মটমটে' বনতুলসীর গন্ধে বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। দল দল সূচ্যগ্র তৃণগুচ্ছ মাথার উপর গা ছুঁইয়া সর্ সর্ সরিয়া যাইতেছে। বায়ু স্থির নীরব।

শিকার পার্টি

আসামের বাঘ

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

কি সুন্দর নেত্র-অভিরাম হরিদ্বর্ণ! সুদীর্ঘ তৃণদলের কি তরল শোভা! উপরে জ্বালাময় তপ্ত রৌদ্র—নীচে বনতলে শ্যামময়ী সুস্নিগ্ধ ছায়া! এমন কোমল দৃশ্য কঠোর ব্যাঘ্রের বিচরণভূমি। কোমলে কঠোরে মিলনই কি কুহকিনী প্রকৃতির খেয়াল!

হঠাৎ একটি 'গারো' মাহুত আমাদের 'মেচ' মাহুতকে কি ইঙ্গিত করিল—ভাষা আমার অবোধ্য—মাহুত তাড়াতাড়ি হস্তীকে সেইদিকে চালাইল। আমি সোৎসুকে টুনিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ব্যাপার কি?' টুনি বলিল, 'কর্ত্তা।' (আসামে অনেকেই বাঘকে কর্ত্তা কিংবা বুড়োর বেটা বলিয়া থাকে) কিছু পরে সেইস্থানে পৌছিলে দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে কতকটা স্থল বেশ 'ফট্‌ফটা' (পরিষ্কার) মধ্যভাগে খানিকটা ঘোলাটে জল। জলের ধারে ভিজামাটিতে তুই তিনটা বেশ বড় বড় 'ভাজা' (বাঘের পায়ের দাগ)।

খুব টাটকা সদ্য ও সুস্পষ্ট 'ভাজা' দেখিয়া টুনি চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাপ, বড় বাঘ!' অমনি বাঁশীতে শীশ দিল। ইসারায় অন্যান্য দূরের মাহুতদের যে দিকে বাঘ সম্ভবতঃ গিয়াছে সেই দিক নির্দ্দেশ করিয়া দিল। এইবার 'ভাজা' দেখিয়া টুনি বাঘের গতির দিক নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। এখন হইতে মাহুত আরও সতর্কভাবে সেইদিকে জঙ্গল খেদাইতে খেদাইতে হস্তী চালাইতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যভাগে ব্যাঘ্রের সন্ধান করা হইল। হঠাৎ শুনিলাম—'বাঘ পলাইয়াছে।' কখন বাহির হইল আর কখনই বা পলাইল বুঝিতে পারিলাম না। টুনি হস্তনির্দ্দেশে জঙ্গলের মধ্যভাগে দূর আকাশে চক্ষুর ইঙ্গিত করিল। দেখিলাম জঙ্গল হইতে কিছু ঊর্দ্ধে শূন্যে তুই তিনটা শকুনি উড়িয়া নীচে জঙ্গলের ভিতর নামিতে যাইতেছে, অমনিই পক্ষ সাপটিয়া বেগে শূন্যে উড়িয়া পড়িতেছে। তখন বুঝিতে পারি নাই যে সেখানে 'মউর' (Kill) আগলাইয়া ব্যাঘ্র আছে ও মুখের গ্রাস নষ্ট হইবার ভয়ে শকুনিকে তাড়া করিতেছে।

আদেশ আসিল, আবার ঘুরিয়া 'বিট' (beat) করিতে, আমাদের হস্তীকে জঙ্গলের পূর্ব্বদিকে অন্য একটা সোঁতার ধারে ধারে পাহারা দিয়া চলিতে,—যেন এই সোঁতা দিয়া বাঘ পলাইয়া না যায় এ বিষয় লক্ষ্য রাখিতে। টুনি এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ—সে নিজেই হস্তীর পার্শ্বদেশে পদাঘাত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র চালাইতে লাগিল। আমরা সেই ক্রমনিম্ন জঙ্গলের শেষ প্রান্তে ঢালু বালুচরে উপনীত হইলাম। খুব জঙ্গল ঘেঁসিয়া অথচ আমরা যাহাতে সোঁতার সমগ্র সম্মুখভাগ দেখিতে পাই এরূপভাবে হাতীকে চালানো হইতে লাগিল।

মানসতীরে শিকার ক্যাম্প

অকস্মাৎ কিছু দূরে বামভাগে জঙ্গলের ভিতর বন্দুকের আওয়াজ হইল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক ব্যাঘ্রগর্জ্জন ও জঙ্গল ভাঙিয়া আমাদের দিকে ঝড়ের মত আসিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। টুনিও তৎক্ষণাৎ মাহুতকে ক্ষিপ্র-গতিতে হাতী চালাইয়া বাঘের দিকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। এবার নিশ্চয়ই আমরা সম্মুখে বাঘ দেখিতে পাইব, কারণ এখানে জঙ্গলের প্রান্তভাগে যদি সোঁতার দিকে বাঘ

পলায়নের চেষ্টা করে তবে ত অব্যর্থ সন্ধানে তাহাকে গুলি করা যাইবে। এই বুঝি বাঘ নিকটে আসিল—আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া জঙ্গল লক্ষ্য করিয়া প্রায় নিশ্বাস রোধ করিয়া নিঃশব্দে আছি। কিন্তু কৈ, আর ত বাঘের শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। এই দুর্দ্দমনীয় স্রোতবেগের ন্যায় জঙ্গল ভাঙার শব্দ একবারে কোথায় মিলাইয়া গেল? এদিকে সোঁতার ধারেও ত বাঘ আসিল না। আসিতে আসিতে তবে কি আমাদের হস্তীব্যূহের ভিতর দিয়া পলাইল? আমরা বরাবর সম্মুখভাগের জঙ্গল খেদাইয়া ত উৎকর্ণ হইয়াই আছি। হঠাৎ 'টিউক টিউক' শব্দ আমার কানে আসিল। কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে স্থির করিতে না পারিয়া আমি বিস্ময়ে এধার ওধার চাহিতেছি। অকস্মাৎ 'চটাশ চটাশ' শব্দ—মোহনমালা জঙ্গলের গায়ে সজোরে শুণ্ডের আঘাত দিল। ব্যাঘ্র কি বন্য বরাহ বা অন্য শ্বাপদের ঘ্রাণ পাইবামাত্র হস্তীরা প্রায়ই এইরূপ শুণ্ডের বাড়ি দিয়া শব্দ করিয়া থাকে, তাহাতে শিকারীরা অগ্রেই সাবধান হইয়া যায়, ও শিকার যে সেখানে আছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়।

মৃত ব্যাঘ্র পরিদর্শন

উত্তরবর্ত্তী সোঁতার ধার পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু বাঘের কোন চিহ্নই পাইলাম না। উত্তরবর্ত্তী সোঁতা ত বাঘ পার হইয়া যায় নাই। তবে এই জঙ্গলেই নিশ্চয় কোথাও লুকাইয়া আছে। তখন চতুর্থবার আমরা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

৪

এবার যে তৃণজঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম তাহা উচ্চে ১০।১২ ফুট হইবে। চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে বিন্দুমাত্র শব্দ হইলেও তাহা শোনা যায়। আর আমরা

মোহনমালা আর আগাইতে চাহে না। যতই তাহার মাথায় ডাঙ্গশ পড়ে, সে মাথা নোয়াইয়া পেট ফুলাইয়া পিছু হাঁটিতে থাকে। টুনি মৃদু স্বরে বাঘ বাঘ বলিয়া ব্যস্ত ভাবে "ধ্বাৎ ধ্বাৎ" (হস্তীকে থামান বা স্থির রাখিবার সাঙ্কেতিক শব্দ) করিয়া হস্তীকে স্থির রাখিতে বলিল ও ক্ষিপ্রগতিভরে দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক ধরিয়া সম্মুখভাগের জঙ্গলের তৃণের আগা গুলি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। জঙ্গল উচ্চে ১০।১২ হাত হইবে। আগার স্পন্দন দেখিয়া তলার বাঘ সন্ধান করিতে হয়।

বাহাদুরি বটে! কিন্তু যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় তবে ত সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আমি চুপি চুপি টুনিকে বলিলাম, 'বাঘ না দেখিয়া মারিও না।' জানিতাম বাঘকে সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করিতে না পারিলে বরং ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। নতুবা ব্যাঘ্রের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। টুনি কিন্তু নীরব নিশ্চল। মোহনমালাও স্থির ও গম্ভীর, কেবল রহিয়া রহিয়া দূরাগত মেঘমন্দ্রের ন্যায় গর্জ্জন তুলিতেছে। হস্তীপৃষ্ঠে শিকারীর পশ্চাদ্ভাগে বেশ নিরাপদ আছি—ভয়ের ও বিপদের লেশমাত্রও মনে উঠিতেছিল না। যদি বাঘ আক্রমণ করে, হস্তীর পৃষ্ঠে উঠে—তবে অগ্রে ত মাহুত, পরে শিকারী, তার পর আমি। প্রতি মুহূর্ত্তেই বিদ্যুৎবজ্র-ঘোষণার প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ আছি।

৫

ইতিপূর্ব্বেই হস্তীর লক্ষণে ব্যাঘ্র সম্ভাবনা বুঝিয়াই টুনি

মৃত ভল্লুকের ছাল-ছাড়ানো

ওদিকে জঙ্গলের নিবিড়তা হইতে 'টিউক টিউক' ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

শুনিয়াছি যেখানে বাঘ কি বন্যবরাহ থাকে সেখানে প্রায়ই থাকিয়া থাকিয়া এই 'টিউক টিউক' ধ্বনি হয়। শুনিয়াছি টুনটুনি পক্ষীর ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী এই প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য থাকিয়া ইহারা ডাকে, ইহাতে শিকারীরা শিকারের নিশ্চিত অবস্থিতি বুঝিতে পারে। আমি ত ভাবিতেছিলাম দূরস্থিত শিকারীবৃন্দকে বাঁশীদ্বারা সঙ্কেত করিয়াছিল। উহারা অবিলম্বে আমাদিগের হস্তীর পিছনে ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া পড়িল। আমাদের বামে প্রায় [illegible] দূরে শিকারী চন্দ্রদাস নিজেই মাহুতরূপে হাতী চালাইয়া আনিয়া একটু স্থির হইতে না হইতে টুনি পুরবর্ত্তী তৃণাগ্রে বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে, আমাদের ডানদিকে কিছু পশ্চাতে শ—বাবুরা বেগে হস্তী চালাইয়া বাঘকে ঘেরিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ টুনির বন্দুকের আওয়াজ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোর গভীর গর্জ্জন! বজ্র-বেগে ব্যাঘ্র মোহনমালাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সেই অতর্কিত সবেগ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হস্তী বিদ্যুৎগতিতে চক্রবৎ ঘুরিয়া পড়িল। চক্ষুর নিমেষে দেখি জঙ্গল বন হস্তী শিকারী ঘুরিয়া যাইতেছে। দেখি পার্শ্বের হস্তীগুলা পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া বন জঙ্গল ভাঙিয়া পলায়ন করিতেছে। চক্ষুর নিমেষে মোহনমালা পিছন ফিরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; তীব্র অঙ্কুশতাড়নায়ও পলাইতে পারিল না। চক্ষুর নিমেষে আমি ব্যাঘ্রের সম্মুখে, পাঁচ ছয় হাত মাত্র ব্যবধান।

উঃ! কি ভয়ানক ভীষণ মূর্ত্তি! কি বিপুল মুখব্যাদান! কি করাল দংষ্ট্র! কি অগ্নিময় নির্নিমেষ চক্ষু! চক্ষে কি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ নির্গম! কি শোণিতাক্ত সৃক্কনী!! কি বিপুল তেজোব্যঞ্জক সমগ্র অবয়ব। উঃ! কি কর্ণবধিরকারী হৃদয়দ্রবকর বজ্রগর্জ্জন! সাক্ষাৎ কৃতান্তের করাল ছায়ার ন্যায়, পৃথিবীগর্ভনিহিত বহুকালরুদ্ধ জ্বালাময় অগ্নিস্রাবের ন্যায় উল্লম্ফনোন্মুখী কি বিকট দানব মূর্ত্তিই দেখিলাম! সম্মুখভাগের জঙ্গলরাশি বিত্রস্ত বিদলিত। সম্মুখপদ তির্য্যগভাবে তীব্র তেজে উৎক্ষিপ্ত; পশ্চাদ্ পদ উল্লম্ফনোন্মুখ আকুঞ্চিত—খর নখর বিদ্যুৎ-কণ্টকিত; পশ্চাদ্ভাগ সঙ্কুচিত ও ইতস্ততঃ অনৃজুবিদীর্ণ তৃণ গুচ্ছে আবৃত; তৃণদামের মধ্য দিয়া ফাঁকে ফাঁকে পাটলাভ পীতে বিচিত্র দীর্ঘ দীর্ঘ কৃষ্ণ ডোরাগুলা আরও ভয়ানক দেখাইতেছে। অথচ এই কুটিল চক্ষুর বিদ্যুদ্দীপ্তি, এই ক্রোধ-বিস্ফারিত নাসা, এই রোষ-কষায়িত রক্তদন্ত ও রক্তজিহ্বা, এই হুঙ্কারে হুঙ্কারে অনলশ্বাস, এই বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট প্রচণ্ড বলশালী বিপুলদেহ, সর্ব্বোপরি এই বীর্য্য-বিকম্পিত উল্লম্ফনশীল ভঙ্গিমা কি সুন্দর! ভীষণ অথচ সুন্দর! আমি
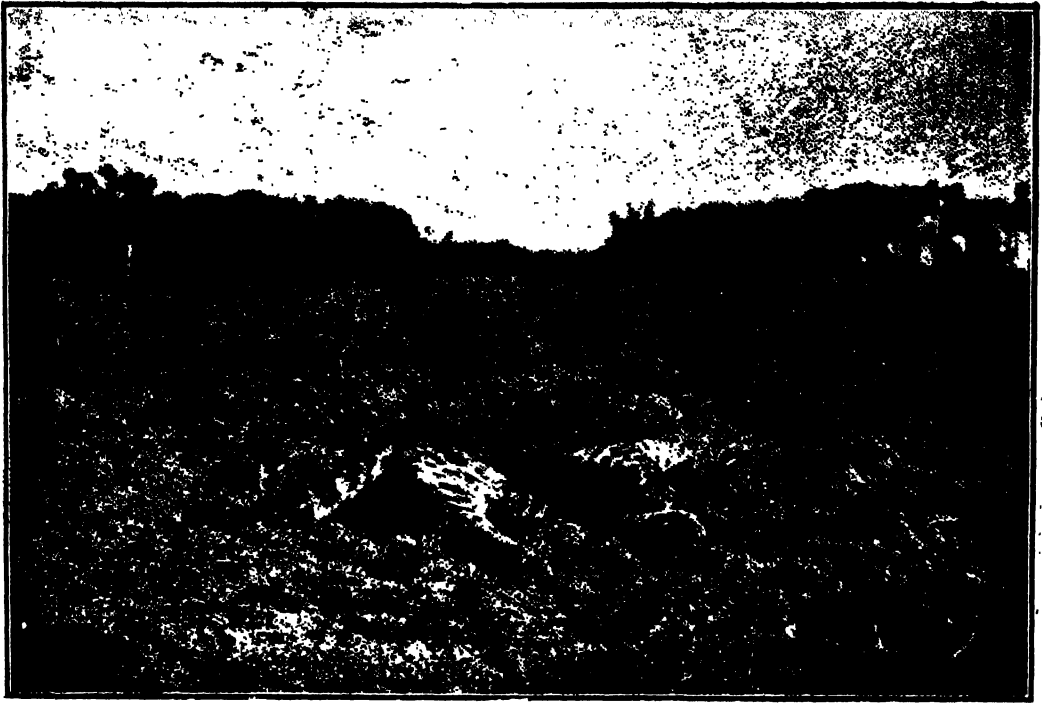
গুলিখেকো বাঘ রাগে নিজের পা কামড়াইতেছে

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

মন্ত্রমুগ্ধ, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক, নির্নিমেষচক্ষু! কি সুন্দর ভীষণ জীবন্ত চিত্রই দেখিলাম। চক্ষু শত চক্ষু হইয়া এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিল।

সেই শান্ত শ্যামল স্থির ঘুমন্ত জঙ্গলে তড়িৎগতিবিক্রান্ত ব্যাঘ্রের সলম্ফ আক্রমণ, সেই অসাধারণ শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন, বড়ই প্রাণস্পর্শী চিত্র। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে মোহ ঘুচিয়া গেল। পৃষ্ঠস্থিত টুনি ও মাহুতের—'খেলে' 'খেলে' চীৎকারে আমার সৌন্দর্য্যস্পৃহা নিমেষের মধ্যে উড়িয়া গেল। বুঝিলাম—বিষম বিপদ উপস্থিত, বিলম্ব হইতেছে। পার্শ্ব ও দূরবর্ত্তী শিকারীবৃন্দের ব্যাকুল কোলাহলে প্রাণের সাহসটুকু ক্রমশঃ বিলীন হইতে লাগিল। মৃত্যুকে সাক্ষাৎ সম্মুখে বিরাজমান দেখিলাম। অতীত জীবনের রিষ্টিগুলি বিদ্যুৎগতিতে চিত্তে চক্রবৎ চমকিত হইতে লাগিল। সেই অতি শৈশবে ছাদ হইতে পতন ও আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা, যৌবনে জাহাজ ও নৌকা ডুবিতে উদ্ধার, রেলসংঘর্ষণে অব্যাহতি, ভূমিকম্পে দুইবার মুক্তি, দুর্দ্দান্ত মদোন্মত্ত মত্ত হস্তীর আক্রমণে রক্ষা, এই বৈশাখী মধ্যাহ্নে সুদূর ব্রহ্মপুত্রচরে ব্যাঘ্রমুখে প্রাণবিসর্জ্জনের জন্যই

মৃত ব্যাঘ্রের মাপ নেওয়া হইতেছে

মৃত্যু করাল হস্ত প্রসারণ করিতেছে। এতক্ষণে নিঃশঙ্ক হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল। যতই সাহস রাখিতে চেষ্টা করি, ততই কালগর্জ্জনে শোণিত জল হইতে থাকে। দূরস্থ হাওদা হইতে চীৎকার আসিল, 'দড়ি ছাড়িবেন না, দড়ি ছাড়িবেন না।' হায়, বৃথা ব্যঞ্জনা; যদি আমি দারুণ ভয়ে ব্যাঘ্রমুখে পড়িয়া যাই—তাই এই ক্ষীণ উৎসাহ প্রেরণা। যাঁহার সাহসে নির্ভর করিয়া এই শিকারে আসা, তিনি এখন বহুদূরে, হাওদার হস্তী আসিতে কি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল? আমি নিরস্ত্র, হস্তে বন্দুক থাকিলে ঐ বিকট মুখব্যাদানের ভিতর গুলি চালাইতে পারিতাম; দুর্দ্দান্ত শত্রুকে মারিয়া সুখে মরিতাম। শত্রুকে একটি আঘাত না করিয়াই মরিব—বড়ই মর্ম্মযন্ত্রণা হইতে লাগিল। এইবার বুঝি লাফাইয়া পড়ে, একখানা ছোরাও হাতে নাই যে ঐ বিকট গ্রাসের ভিতর বিঁধিয়া দি। হস্তী কম্পিতকলেবর। বুঝি হস্তী এই বসিয়া পড়ে! মাহুত হাতীকে ফিরাইবার জন্য যতই অঙ্কুশ তাড়না

করে, হস্তী ব্যাঘ্রগর্জ্জনের সহিত নিজের ভীতিগর্জ্জন মিলাইয়া ভয়বিকম্পিত পদে বসিয়া পড়িতে চাহে। আর রক্ষা নাই! করাল মৃত্যু তিন চারি হাত দূরে। ঐ মৃত্যুমাখা ভয়ানক মূর্ত্তি ও গর্জ্জন আর সহ্য করিতে পারা যায় না। যতই দেখিতেছি, যতই শুনিতেছি, ততই হৃদয় বসিয়া যাইতেছে। এবার ব্যাঘ্র হাত বাড়াইলেই হইল! আর লম্ফের প্রয়োজন নাই; ঐ থাবা তুলিতেছে; পরিপূর্ণ নিরাশায় ভয়ের অতীত হইয়া গেলাম। নিরুপায় অদৃষ্টে পূর্ণ নির্ভর করিলাম, দিব্য চক্ষু ফুটিল, সহসা বুদ্ধি খুলিয়া গেল। চকিতে বদ্ধ ছত্র খুলিয়া ব্যাঘ্রের

মৃত ব্যাঘ্রকে হাতীর পিঠে উত্তোলন

সম্মুখে হস্তীর পুচ্ছমূলে সজোরে ধরিলাম। সাঁ করিয়া মোহনলাল ঘুরিয়া গেল—সাঁ করিয়া লেজ গুটাইয়া বাঘ নিবিড় জঙ্গলে অদৃশ্য হইল। ওঃ! কি ফাঁড়াটাই কাটিয়া গেল। উৎফুল্ল কৃতজ্ঞ প্রাণ শত উচ্ছ্বাসে স্বর্গের দ্বারে ধাবিত হইল।

এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে কতক্ষণ লাগিল; কিন্তু কার্য্যকালে উহা তিন চারি মিনিটে নিঃশেষ হইয়াছিল। সে সময়ের সেই মুহূর্ত্তগুলা কি মন্থর গতিতেই চলিয়াছিল। জীবন মৃত্যুর সেই সন্ধিস্থলে চিত্তের ও প্রাণের ভাব কি মহান স্থির, বাক্যাতীত, আশা নিরাশাপূর্ণ, নিরালম্ব, আপনাতে আপনি অনুপ্রবিষ্ট। অসংখ্য-শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট বিশাল বটের ন্যায় অনন্ত-কর্ম্ম-ঘটনা-পূর্ণ এই জীবন সঙ্কুচিত হইয়া এক নিমেষে ক্ষুদ্র বট-বীজের মত একটি কণিকায় পরিণত হয়। দুইটি গ্রহের প্রচণ্ড আকর্ষণের মধ্যস্থিত উল্কাবিন্দুর মত কি "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা! আসন্ন মৃত্যু হইতে মুক্তি কি মনোরম! বিপদের গুরুত্বেই আনন্দের গুরুত্ব। অমাবস্থার ঘোর তামসী নিশীথে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় মেঘপার্শ্বে চিকুর-চমক তুলনায় অধিকতর মনোহারী।

৬

সাহসী শিকারীবৃন্দ স্ব স্ব হস্তী ফিরাইয়া আমাদের হস্তীপার্শ্বে পুনরায় সমবেত হইলেন। আমি যে ব্যাঘ্রের ভীষণ কবল হইতে বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছি ও আক্রমণের সময় রশি ছাড়িয়া ভয়ে তাহার সম্মুখে পড়িয়া যাই নাই এবং নিরস্ত্র তাহার সম্মুখে স্থির ছিলাম, সেজন্য তাঁহারা আমাকে বিশেষ সাহসী বলিয়া আপ্যায়িত করিতে ক্রটি করিলেন না। কলিকাতা অঞ্চলের লোকের এরূপ সাহস দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন তাহা অকপটে স্বীকার করিলেন

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

শ্রীযুক্ত কুমারমোহনমালার মাহুতকে বিশেষভাবে তিরস্কার করিলেন। তাহার হস্তী চালনার দোষেই যে আমি আজ মৃত্যু-মুখে পড়িয়াছিলাম সে জন্য তাহাকে যথেষ্ট ভৎসনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল। কিন্তু বেচারী কি করিবে। সাক্ষাৎ যমের সম্মুখে প্রাণের ভদ্রাভদ্রতা নাই। সে ত স্পষ্টই বলিয়াছিল যেপ্রকার প্রকাণ্ড বাঘ ও যে প্রকাণ্ড হাঁ, তাতে সে হাতী না ফিরাইলে তার মাথাটাই গ্রাস করিয়া ফেলিত। কেহই যে সাহসে হীন নহেন, হস্তীর ও মাহুতের ভিতর বাঘের পলায়নের দিক ধরিয়া চলিলাম। জঙ্গলের মধ্যে এখন ঘন বনঝাউপূর্ণ উচ্চভূমিতে আসিলাম। এখানে বনঝাউ উচ্চে দশ ফুট হইতে পনেরো ফুট হইবে। বস্তুতঃ চরভূমিতে ঝাউতৃণাদি এত অধিক বাড়িয়া উঠে যে অন্যত্র তাহা অসম্ভব। বর্ষায় যখন সমস্ত চর ব্রহ্মপুত্রস্রোতে ভাসিয়া যায়, তখন অনেক চরেই এইরূপ বনঝাউ ও অন্যান্য চরজাত তৃণশ্রেণী মাথা জাগাইয়া থাকে। বন্যার জন্য চরগুলি প্রায়ই উর্ব্বর। যে গুলি ভাঙিয়া না যায় তদুপরিজাত বনঝাউ ও
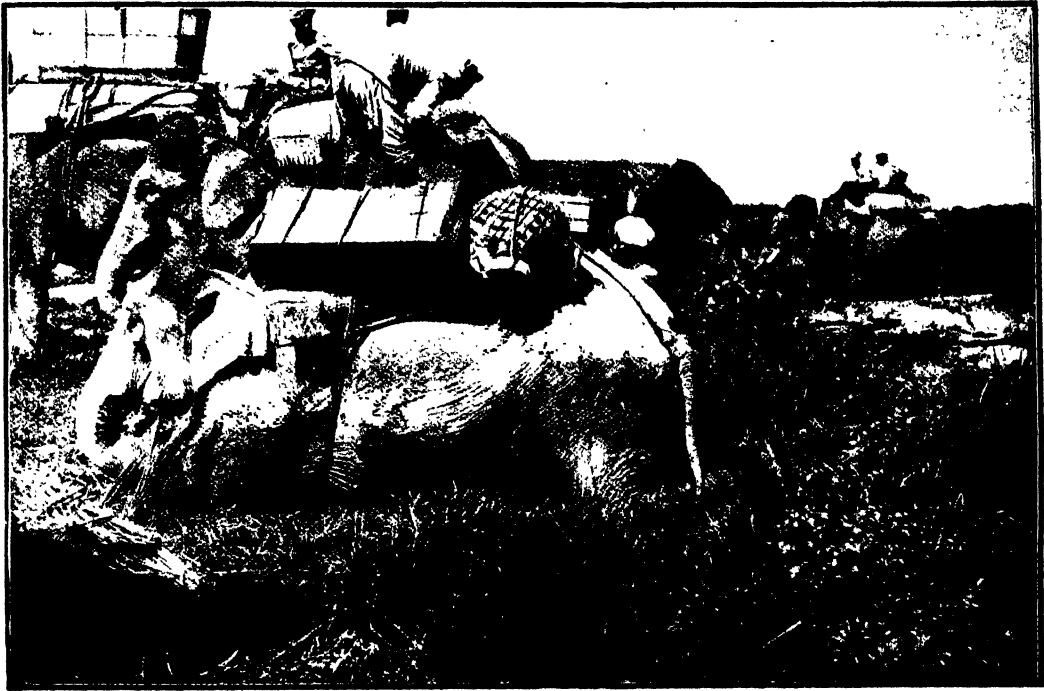
জলযোগের উদ্যোগ

দোষেই যে তাঁহারা বন্দুক লক্ষ্য করিতে ও বাঘকে বিদ্ধ করিতে পারেন নাই এ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ চলিল। বাঘের আক্রমণের সময় যে হস্তী আমাদের ডানদিকে ছিল, শুনিলাম বাঘের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেই ও গর্জ্জন শুনিতেই তাহার শিকারীর হস্ত বন্দুকভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

এবার যাহাতে হস্তী আর না পলায়, মাহুতদের এরূপ কড়া আদেশ দেওয়া হইল। আমরা পুনরায় জঙ্গলের বন্যতৃণগুল্মসমূহ অসাধারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বনঝাউগুলা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের গা-হাত-পা-মস্তক স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে দৃষ্টিরোধ করিতেছে। বনের তলভাগ বেশ ফাঁকা। মধ্যে মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোক পড়িয়া বিচিত্র ছায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে বাঘ থাকিলে সহজেই দূর হইতে তাহাকে দেখা যাইতে পারে ভাবিয়া আমরা বনের বিরলভাগে

বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছি। ক্রমশ বন উপর হইতে নীচে ঢালুভাবে সোঁতার ধার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আমাদের মোহনমালা যখন উচ্চ হইতে নীচে ক্রমে ক্রমে নামিতে ছিল তখন মনে হইতেছিল যদি এ সময় বাঘ উচ্চভূমি হইতে আমাদের উপর লাফাইয়া পড়ে তাহা হইলে বিপদের আর শেষ থাকিবে না। এমন সময়ে সহসা ঠিক সেই ঘটনাই ঘটিল। আমার ডান দিকে ২০।২৫ হাত দূরে কিছু পিছনে একটা Tracker হস্তী আসিতেছিল, তাহার সমুখে বাঘ দেখিতে পাইয়াই মাহুত বন্দুক ছোঁড়ে। বাঘ ভীমগর্জ্জনে শূন্যে লাফ দিয়া বেগে আমাদের বামপার্শ্বস্থিত 'বারিণী' হস্তীর সম্মুখে পতিত হইল ও সেই হস্তীকে আক্রমণ করিল। আকস্মিক আক্রমণে হস্তী বসিয়া পড়ায় বাঘ তাহার গণ্ডদেশে বিষম থাবা মারিল। বাঘ শূন্যে লম্ফ দিবার সময় আমাদের মাহুতের সম্মুখে কিছু উচ্চে বনঝাউএর শীর্ষদেশে তাহার বিচিত্র পীতবর্ণ দেহ মাত্র দেখিয়াছিলাম। নিমেষে টুনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইল। আহত হইবামাত্র বাঘ 'বেড়েনীকে' ছাড়িয়া সহুঙ্কারে পুনর্ব্বার আমাদের হস্তীকে আক্রমণ করিল। মোহনমালাও পূর্ব্ববৎ সেই ভীষণ আক্রমণে ভয় পাইয়া চকিতে ঘুরিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক ঝড়বেগে বনঝাউ ভাঙ্গিয়া দলিয়া ছুটিতে লাগিল। বনঝাউ-এর ডালপালাগুলা ধাবমান ট্রেণের পার্শ্বস্থিত বেড়ার ন্যায় আমাদের গা-মাথা ঘর্ষিয়া বেগে সরিয়া যাইতে লাগিল; অতিকষ্টে দুই হাতে রজ্জু ধরিয়া কোনমতে বসিয়া রহিলাম। হস্তী যে এত বেগে দৌড়িতে পারে তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। রজ্জু জোরে ধরিয়া থাকায় হাতের খোলা ছাতা শিথিল ভাবে বুটের উপর পড়িয়াছিল। বনঝাউএর ক্রমাগত ঘর্ষণে তাহার ২।১টা শিক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

এময় সময় দূর হইতে গ-বাবুর চীৎকার কর্ণে আসিল,'—বাবুকে বাঘে লইয়া গেল।' বাঃ! এই ত আমি সশরীরে। বিন্দু মাত্র রক্ত ত কোথাও পড়ে নাই, তবে কি গ-বাবুর ভুল? তবে কি আর কাহাকেও বাঘে লইয়া গিয়াছে? জঙ্গলের মধ্যে তিনি হয়ত স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। কি সর্ব্বনাশ! কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না। সম্মুখে ছাতা পড়িয়া আছে। হাতীর ভয়ানক দৌড়ের ঝাঁকানিতে, মুহুর্মুহু হেলন দোলনে কখন পড়িয়া যাই, প্রাণ ত একান্তই অস্থির হইয়াছে। দড়ি ছাড়িয়া যে ছাতা তুলিয়া দেখিব. তাহা কল্পনার বাহিরে; মুষ্টি শিথিল করিবামাত্রই নীচে পড়িয়া যাইব। কি করি, কাহাকে লইয়া গেল জানিতে না পারিয়া মন বড়ই উতলা হইল, প্রাণ ছটফট্ করিতে লাগিল। অবশেষে একান্ত অধৈর্য্য হইয়া ঐ ছুটন্ত অবস্থাতেই দড়িশুদ্ধ ছাতার বাঁটে জোর দিলাম, একটুখানি ছাতা তুলিয়া দেখির কি হইয়াছে। যেমনি একটু উচ্চে ছাতা তোলা, "ও বাবা! বাঘের থাবা!" অমনি ছাতা দ্বিগুণ জোরে, ফেলিয়া ঠেলিয়া ধরিলাম! বুটশুদ্ধ পা যতদূর সম্ভব গুটাইয়া লইলাম। বুটের পাশেই বাঘের থাবা আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। দেখিয়া আত্মা চমকিয়া উঠিল! বারবারই কি ফাঁড়া কাটিবে এবার হাতীর উপর যখন উঠিয়াছে, তখন ত আমাকে লইয়াই গিয়াছে। পশ্চাতে সরিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কোথায় যাইব—পশ্চাতেই টুনি। টুনি ঘাড় বাঁকাইয়াই চেঁচাইয়া উঠিল, 'ও বাবা, বড় বাঘ রে।' বাঘ হাতীর পশ্চাতে উঠিয়াছে দেখিয়া বলিল —এবার আর রক্ষা নাই। পৃষ্ঠদেশে বাঘকে লক্ষ্যই বা কি করিয়া করিবে, পিছুতে গুলিই বা কি করিয়া ছুঁড়িবে। সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি ত স্তম্ভিত। ছাতা খুব জোরে বাঘের থাবা ও মুখের দিকে ঠাসিয়াই ধরিয়া আছি—কি ক্ষীণ ব্যবস্থা—হস্তী সমভাবেই ছুটিতেছে। এ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম ঠিক মনে নাই, হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমাদের হাতীও থামিয়া পড়িল। ভয়ে ভয়ে ছাতা তুলিয়া দেখি বাঘ নাই—ধড়ে প্রাণ আবার ফিরিয়া আসিল। আবার টুনি মাহুতকে হাতী ফিরাইয়া যে দিকে বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছে সেই দিকে চালাইতে বলিল। টুনি বলিল, 'বাবু বাঘের আজ আপনার উপরই রোক বেশী। দুইবার বাঁচিয়া গেলেন!'

বহুদিনের বাঞ্ছিত বাঘের আক্রমণ (charge) দেখার আনন্দ আজ আমার বেশ মিটিয়াছে। এখন বাড়ী ফিরিতে পারিলে বাঁচি! উপায় নাই, এ রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন চলিবে না। আহত বাঘ রাখিয়া বাড়ী ফিরিবার নিয়ম

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

নাই। সভয়ে চলিলাম। কিছু দূরে যাইতে না যাইতে আবার এক আওয়াজ, কিছু পরেই Hurrah Hurrah ধ্বনিতে বন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম লড়াই ফতে হইয়াছে। ব্যাঘ্রের ইহলোকের লীলা শেষ হইয়াছে। সাহস বাড়িল; হস্তীকে সজোরে চালাইয়া হাওদা-হস্তীর নিকট পৌঁছিলাম। দেখি শ্রীমান—কুমার ও গ-বাবু আমাদের দিকে একদৃষ্টে বিষণ্ণ মুখে চাহিয়া আছেন। আমরা আরও নিকটে অগ্রসর হইলে গ—বাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আপনি বাঁচিয়া আছেন?"

গেলেন। আপনার ভাগ্যবলেই আজ আমরা এত বড় প্রকাণ্ড বাঘ মারিতে সক্ষম হইয়াছি। এতদিন শিকারে আসিতেছি, এত বড় বাঘ কখনও চক্ষে পড়ে নাই।"

সমস্ত শিকারিবৃন্দ একত্র হইলেন। কিছু দূরেই জঙ্গলে মৃত ব্যাঘ্র পড়িয়া আছে। বনঝাউদলের অন্তরালে তাহার পীতকৃষ্ণ রেখা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সকলেরই হৃদয় আজ সফলতায় উৎফুল্ল। ব্যাঘ্রের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য আমরা মণ্ডলাকারে হস্তী চালাইতে লাগিলাম, কিন্তু হস্তীযূথ কিছুতেই অগ্রসর হইতে

শিকারের পর জলযোগ

আমি বলিলাম, "কি হইয়াছে?"

"কি হইয়াছে? আমরা ভাবিতেছিলাম কি বলিয়া আপনার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইব। স্বচক্ষে দেখিয়াছি বাঘ আপনার হস্তীর পশ্চাতে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছে। তখনই বুঝিয়াছি আপনি মোহনমালার পশ্চাৎ দিকে আছেন; ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র আপনাকে না লইয়া ছাড়িবে না। যাহা হউক, আপনার কপালজোর খুব। দুই দুইবার আজ বাঁচিয়া

চাহে না। মাহুতেরা এত অঙ্কুশাঘাত করিতেছে তত্রাচ কিছুতেই এক পদ অগ্রসর হইতেছে না। এতই ভয় পাইয়াছে। কোন কোন শিকারী পরামর্শ দিলেন যে, বাঘ এখনও বাঁচিয়া আছে, আরও দু একটা গুলি করা যাক। কিন্তু যদি মরিয়া গিয়া থাকে, আর অনর্থক গুলি করিয়া অমন সুন্দর চর্ম্মখানা নষ্ট করা অন্যায় ভাবিয়া অনেকেই ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ব্যাঘ্রের

আর শ্বাসস্পন্দন দেখা যাইতেছে না। প্রত্যেক সাহসী হস্তীকে আগাইবার জন্য যথেষ্ট তাড়না করা হইল, কিন্তু বৃথা। শেষে একটি বাচ্ছা হস্তীকে আগাইয়া বাঘ বাঁচিয়া আছে কিনা পরীক্ষার জন্য পাঠান হইল। সে প্রথমে বাঘের নিকটবর্ত্তী হইয়া পশ্চাতে দৌড় দিল। কিন্তু কৈ, বাঘ ত নড়িল না, চীৎকারও করিল না। এবার হস্তিবৎস বড়ই বাহাদুরী দেখাইল। সে বাঘের নিকট গিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া তড়িৎ গতিতে পশ্চাৎপদ দ্বারা সজোরে বাঘকে এক লাথি মারিয়াই সম্মুখ ভাগে প্রায় ৩০।৪০ হাত ছুট দিল। এই আঘাতেও বাঘকে স্পন্দনরহিত দেখিয়া সমগ্র সুচতুর হস্তিবৃন্দ আপনাআপনি বাঘের খুব নিকটে অগ্রসর হইল। বুঝিলাম হস্তিবৃন্দ অপেক্ষা হস্তিবৎস বিশেষ সাহসী ও সুচতুর।

বৎসের সাহসে বৃদ্ধের সাহস বাড়িল। নিকটে গিয়া হস্তী হইতে সকলেই জঙ্গলে অবতীর্ণ হইয়া বাঘের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তখনও তাহার দেহ খুব উষ্ণ আছে। নাসাগ্র হইতে পৃষ্ঠদেশ দিয়া বরাবর পুচ্ছাগ্র পর্য্যন্ত মাপ করা হইল দেখা গেল ১০ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা। এ প্রকার বড় বাঘ ক্বচিৎ মিলে। আমরা সানন্দে সকলেই এক একবার বাঘের উপর দণ্ডায়মান হইলাম। কিছু পূর্ব্বে উহার হস্তে প্রাণ ত গিয়াছিল। এক্ষণে উহার পৃষ্ঠে চড়িয়া কি অতুল আনন্দ উপভোগ করা গেল। আমি যে বিশেষ সাহসী ও সৌভাগ্যশালী বীর তাহা শিকারিবৃন্দ অবিসংবাদিতরূপে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিলেন। আমি ত অবাক! বন্দুক না ধরিয়াই বীর হইয়া গেলাম, ইহা অপেক্ষা ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ লাভ আর কি হইতে পারে?

ব্যাঘ্রের বাহুমূলের নিকট বক্ষস্থলে একটি মাত্র সুরঙ্গ ছিদ্র দেখা গেল। একটি মাত্র সাংঘাতিক গুলি বিষম বেগে ব্যাঘ্রের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহার ইহলোকের লীলা শেষ করিয়াছে। শোনা গেল ছুটন্ত মোহনমালার পশ্চাদ্দেশে বাঘ কিছুক্ষণ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু হস্তীর দৌড়ের বেগে পৃষ্ঠের উপর সম্পূর্ণভাবে উঠিতে না পারিয়া কিছু পরে তাহাকে ছাড়িয়া লাফাইয়া পড়ে। আহত ও ক্লান্ত হওয়ায় ভূমিতলে জানুর উপর ভর দিয়া সম্মুখ পদদ্বয় স্থির সমান রাখিয়া আহত স্থানগুলি জিহ্বা দ্বারা চাটিতেছিল। ইত্যবসরে মোহনমালার পশ্চাদ্ধাবিত হাওদার হস্তী সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র গ—বাবু দেখিতে পাইয়াই শ্রীমান—কুমারকে ইশারায় বাঘকে দেখাইয়া দেন। বাঘ হস্তী ও শিকারীদের দেখিবামাত্র হাওদার উপর লম্ফ দিবার উপক্রম করে। মস্তক উন্নত করায় তাহার উন্মুক্ত বক্ষস্থলে শ্রীমান—কুমার বিষম গুলি সন্ধান করেন। গুলি লাগিবামাত্রই মাথা নীচু করিয়া যেমন বাঘ আহত স্থল চাটিতে যাইবে অমনি নিঃশব্দে জঙ্গলে লুটাইয়া পড়িল। বস্‌। এক গুলিতেই অনন্ত শয়ন। বিপুল শক্তি ও সৌন্দর্য্যের একীভূত আধার একটি ক্ষুদ্র গুলির তেজে পরাহত। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! একটি অদৃশ্য অনুতে সমগ্র বিশ্ব কেন্দ্রীভূত। যদি আমরা চক্ষু খুলিয়া জীবনের চারিধার নিরীক্ষণ করি, তবে দেখিতে পাই যে অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা কি অনন্ত মহান কার্য্যই না সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সাধিত হইতেছে।

৯

কি বলিতে কোথায় আসিলাম। কোথায় ব্যাঘ্র বিনাশের কথা, না গূঢ় দার্শনিক চিন্তায় ভাসমান। বনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কিছু জলযোগ করিয়া সানন্দে আমরা স্ব স্ব হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। নিহত ব্যাঘ্রকে ইতিমধ্যেই "কানভাঙি" হস্তিনীর পৃষ্ঠে উত্তোলিত ও রজ্জু-নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রমশঃ আমরা জঙ্গল ছাড়িয়া বাথানের নিকট পৌঁছিলাম। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। চরে মাষেল রাখালরা উদগ্রীব হইয়া ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিতেছে ও মাহুতদের মুখে শিকার-কাহিনী শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতেছে। যে মষেল রাখাল ব্যাঘ্রের সন্ধান ও সংবাদ দিয়াছিল, বলা বাহুল্য সে যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত হইল।

আসামের বাঘ

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

আমরা আবার সেই 'ছাতাগুড়ি' পূর্ব্ববৎ পার হইয়া এ পারে উঠিলাম। সম্মুখে বারমেসেরা শিকার-কাহিনী শুনিয়া বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। অন্যান্য হস্তী ও শিকারীরা ক্রমশঃ নদী পার হইতেছে; এ জন্য আমরা এ পারে কিছুক্ষণ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া হস্তীপৃষ্ঠেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সেই নিদারুণ গ্রীষ্মের মাধ্যন্দিন শিকার-সংগ্রামের দারুণ উৎকণ্ঠা কোলাহলের পর এই সফলকাম সায়াহ্নের বিশ্রাম বড়ই আরামপ্রদ হইয়াছিল। বহুক্ষণ উত্তেজনার পর শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহ মন আবার আত্মপ্রসাদে ও শান্তিরসে আপ্লুত হইতেছিল। আমি ত বিমুগ্ধ নেত্রে হস্তিবৃন্দের নদীপার হওয়া দেখিতে লাগিলাম। বাথানের নিকট দুই একটা হস্তী 'গাদলা' নামাইয়া রাখিতেছে; কেহবা উচ্চ বালুতট হইতে পশ্চাৎ হাঁটু গাড়িয়া ও সম্মুখ পদদ্বয় ঋজু রাখিয়া ঢালুভাবে নদীজলে নামিয়া পড়িতেছে; কয়েকটা নদীজলে গা ভাসাইয়া এ পারে আসিতেছে; কেহবা সমস্ত দেহ জলে ডুবাইয়া কেবল শুণ্ডের অগ্রভাগটি উচ্চ করিয়া জল নিক্ষেপ করিতেছে, পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া মাহুত হেলিয়া দুলিয়া পদটিপ্ দিয়া তাহাকে চালাইতেছে; কেহ বা শুণ্ড বাঁকাইয়া নিজ গাত্রে পিচকারির মত জল ছিটাইতেছে ও তাহার মাহুত "বিরি বিরি" (নিষেধ সূচক শব্দ) চীৎকার ছাড়িতেছে; কোনটা বা এ পারে উচ্চ তটে উঠিবার জন্য শুণ্ড কুণ্ডলিত করিয়া সম্মুখ পদদ্বয় ক্রমান্বয়ে গুটাইয়া ও পূর্ণভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, পৃষ্ঠস্থ শিকারী হেলিয়া পড়িতেছে। বাস্তবিক হস্তিদলের নদী উত্তরণ একটি অপরূপ দৃশ্য, এরূপ চিত্র খুব অল্পই আছে।

শিকারের পর মানসতীরে বিশ্রাম

নিদাঘের সায়ংকাল। মাথার উপর মেঘশূন্য বৈশাখী আকাশ মথিত কজ্জল-প্রায় কোমল। নীচে স্রোতজল মুক্তাধূসর। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে সন্তরণশীল হস্তিগাত্রে, কর্ণে, শুণ্ডে শত শত স্ফটিকচূর্ণ হইতেছে। সম্মুখ ভাগে তটদেশে কয়েকখানা বারমেসের নৌকা, গৃহসজ্জা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ। তদুপরি লাল কাপড় পরিহিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির কৌতূহলপূর্ণ সোৎসুক দৃষ্টি হস্তী-শুণ্ডোত্থিত জল-ফুৎকারে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, যেন হস্তিদলের বৈশাখী দোললীলা দেখিতেছে। কাহারও বা দৃষ্টি উত্তরণশীল হস্তিপৃষ্ঠস্থিত

নিহত ব্যাঘ্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যাঘ্রের বিপুল দেহ হস্তিপৃষ্ঠে একদিকে মস্তক ও সম্মুখ পদদ্বয়—অন্যদিকে পশ্চাৎ পদদ্বয় সহ পুচ্ছ, স্রোতজলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। নিমজ্জমান হস্তীর বেগে জল চক্রে চক্রে উচ্ছলিত, ফেনপুঞ্জ-স্ফুটিত, ও কল্লোলিত হইতেছে। সদ্যস্নাত কৃষ্ণ হস্তীর কৃষ্ণধূসর ছায়া বীচিমালাময় নদীবক্ষে শত শত খণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। দূর চর বিস্তীর্ণ, পাণ্ডুর বর্ণ। আরও দূরে বনভূমির শ্যামশোভা দিগন্তপ্রসারী ব্রহ্মপুত্র নদে মিশাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রপারে দিগন্তের কোলে ঈষৎ কুহেলিকাময় গারো শৈলশ্রেণী কোমল Ultramarine নীলে রেখায় রেখায় আকাশপটে সায়াহ্নস্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বহুদিনবিস্মৃত দুরস্বপ্নের মত একখণ্ড শুভ্র মেঘ দিগ্‌বধূর উৎসঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কি সুন্দর রমনীয় নিসর্গ চিত্র! আত্ম-বিস্মৃতির কি পূর্ণ মানস-প্রতিমা! মুগ্ধ মস্তিষ্কে মোহময়ী কল্পনার কোমল করস্পর্শে কি অমিয়-স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে!

আমাদের জীবনদৃশ্যও কি ঠিক ইহারই মত নহে? এই ঐরাবৎ তুল্য বৃহৎ বপুবিশিষ্ট বারণবৃন্দ, প্রকাণ্ড শৃঙ্গযুক্ত প্রায়-বন্য রক্তচক্ষু মহিষের দল, চরস্থিত কণ্টকাকীর্ণ ঝোপ জঙ্গল, বারমাসের আশাস্বরূপ বারমেসের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাশ্রেণী, ঐ অনন্তযুগ প্রবাহিত করুণাপ্লাবিত ধূ—ধূ প্রসারিত লৌহিত্য নদ, বহুদূরে তপোমগ্ন শান্ত শৈলশ্রেণী প্রাণে কি-এক অতৃপ্ত বাসনা জাগাইয়া দেয়! কি-এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবে চিত্ত পরিপ্লাবিত করে! মন কি-এক অব্যক্ত বেদনায় দুলিতে থাকে। হায়, মোহ-মরীচিকাময় মর্ত্ত্যজীবন দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়তাণ্ডবে, দ্বেষ হিংসার উৎকট জ্বালায়, আশা আকাঙ্ক্ষার শত ঝঞ্ঝায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর তাড়নায় অস্থির হইয়া যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে চাহে—জীবনের পরপারে অনন্ত শান্তির জন্য আকুলি ব্যাকুলি প্রকাশ করিতে থাকে, তখনকার সেই অবস্থা বুঝি এই সম্মুখস্থ বর্ত্তমান দৃশ্যের তুল্য।

আচম্বিতে হস্তীর বৃংহিতধ্বনিতে আমার চিন্তাস্রোত অন্যপথে ধাবিত হইল। শান্তির স্বর্গচ্যুত হইয়া কর্কশ মর্ত্ত্যভূমিতে আবার নামিয়া পড়িলাম।

ধুব্‌ড়ির নিকট চলাকুড়া চরে গৌরীপুরের রাজা-বাহাদুরের (তখন শ্রীযুত কুমার বাহাদুরের) বাঘ-শিকার।

শিকার সম্বন্ধীয় ফটোগ্রাফগুলি রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত। বিঃ সঃ।

বৈরাগীর গান

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

চরিত্র পরিচয়

গণপতি }
বিপিন } বন্ধু

খোকা—বিপিনের ছেলে

বৈরাগী

প্রকৃতি পরিচয়—শরৎকালের সকালবেলা।

দৃশ্য পরিচয়—বাড়ীর বারান্দা। সম্মুখে রাস্তা।

গণপতি

এই ত, চল না—এখুনিই ফিরে আস্‌বে।

বিপিন

না আর ত কিছু নয়। খোকাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডের তরেও বাইরে যেতে পারি না। তাই ত ভাব্‌ছি।

গণপতি

তা চাকরদের ব'লে যাও—ততক্ষণ ওকে একটু দেখ্‌বে। তুমি ত এখুনই ফিরে আস্‌বে।

বিপিন

চাকররা ত অবশ্য দেখবে। কিন্তু—খোকাও ওকে ফেলে আমি বাইরে যাচ্ছি শুনলেই কি রকম অস্থির হ'য়ে ওঠে।

গণপতি

কিন্তু ভাই তোমার একবার না গেলেই যে নয়। আর সেখানে খোকাকে নিয়ে যাওয়াটাও বোধ হয় সুবিধে হবে না।

বিপিন

না, খোকাকে নিয়ে যাওয়া ত চলেই না।

গণপতি

তবে ভাই যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রে একবারটি চল।

বিপিন

চল যাচ্ছি।—কিন্তু গণপতি! খোকার কথা যদি তুমি সব শোন, অবাক হবে। এই প্রায় দুই মাস হ'ল ওর মা মারা গেছেন। প্রথম প্রথম কতই না মার কথা আমাকে বল্‌ত। কত কথাই না আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারলে তাতে আমার কষ্ট হয়।—তাই আমার কাছে আর একটিবারও মার কথা মুখে আনে না। আমি কথা তুলতে গেলে কি রকম সুন্দর ছেলেমানুষি ভাবে কথা চাপা দেয়—হাসিও পায়, কষ্টও হয়। তাই ত কোনও দিক দিয়ে ওর মনে যদি কোনও কষ্ট হয় আমি সে কাজ কোনও মতেই করতে পারি না। দাঁড়াও; খোকাকে একবার ডাকি। খোকা, ও খোকা!

(খোকা ছুটিয়া বাহিরে আসিল)

বিপিন

খোকা! তুমি একটু বাড়ীতে থাক—চাকরদের সঙ্গে খেলা করো। আমি একবার বাইরে থেকে ঘুরে আস্‌ছি।

খোকা

তুমি অনেকক্ষণ পরে আস্‌বে?

বিপিন

আমি এখুনই ঘুরে আস্‌ব। খুব শীগ্‌গীর আস্‌ব।

খোকা

আচ্ছা, আমি এইখানে ব'সে থাকি। যতক্ষণ না তুমি ফিরে এসো। রাস্তায় লোকজন যাবে দেখ্‌বো।

বিপিন

রাস্তায় যেও না যেন।

খোকা

না।

বিপিন

চল—গণপতি।

(উভয়ে রাস্তায় বাহির হইলেন)

খোকা

দেরি করো না।

বিপিন্

না বাবা! এখুনই ফিরে আস্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

খোকা

(সম্মুখের বাড়ীতে বৈরাগীকে দেখিয়া)

বৈরাগী! ও বৈরাগী! আমাদের বাড়ীতে এস না।

বৈরাগী

যাচ্ছি বাবা! যাচ্ছি। এ বাড়ীতে দুটো ভিক্ষের চাল নিয়ে তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি।

খোকা

শীগ্‌গীর এসো। আমাদের বাড়ীতে ভিক্ষে নেবে না?

বৈরাগী

হাঁা, নিশ্চয়ই নেবো।

(বৈরাগীর আগমন)

খোকা

তুমি এত দিন আসনি কেন বৈরাগী?

বৈরাগী

এইত বাবা! সেদিন তোমাদের বাড়ী ভিক্ষে নিয়ে গেলাম।

খোকা

সে ত অনেক দিন হ'য়ে গেল।

বৈরাগী

এই ত আজ চার দিন আগে।

খোকা

তা এত দিন আসনি কেন?

বৈরাগী

ভিক্ষে ক'রে খাই। রোজ ত আর এক পাড়ায় আসি না বাবা। সব পাড়ায় ঘুরতে হয়।

খোকা

আমি রোজ সকাল বেলা ভাবি—তুমি আস্‌বে।

বৈরাগী

তুমি আমার কথা ভাব?

খোকা

হ্যাঁ—রোজ সকাল বেলা ভাবি।

বৈরাগী

তুমি বড় ভাল ছেলে বাবা—ভগবান তোমায় রাজা করুন।

খোকা

গান গাইবে না?

বৈরাগী

হাঁা, গাইব বৈকি বাবা। তোমার আমার গান শুন্‌তে ভাল লাগে?

খোকা

খুব ভাল লাগে।

বৈরাগী

আচ্ছা! আজ তোমায় একটি নতুন গান শোনাই।

গান

আস্‌বে বুঝি তুমি আমার ঘরে
(আজ) সকাল বেলা মন যে কেমন করে।
তাই বুঝি আজ আলোর পরশ লাগল আমার মনে
ভোরের হাওয়া লুটিয়ে গেল ঘরের কোণে কোণে
গভীর আবেগ ভরে।
(তোমার) চরণ ধ্বনির পুলক বাজে
আজকে আমার প্রাণে,
(তোমার) তোমার আগমনীর সুর লেগেছে
আজকে আমার গানে।
নয়নে মোর রূপ লেগেছে তোমার আসার পথে,
তোমার মাথার মুকুটচূড়া দেখি যেন রথে—
(ঐ) নীলাকাশের পরে।
আস্‌বে বুঝি তুমি আমার ঘরে॥

খোকা

তুমি বড় ভাল গান গাও বৈরাগী। কোথায় শিখেছ?

বৈরাগী

সে এক বাউল আছে আমাদের দেশে। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। অনেক নতুন নতুন গান সব শিখে আসে। তার কাছ থেকে শিখি।

খোকা

আমায় শিখিয়ে দাও না।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বৈরাগী

তুমি শিখ্‌বে?

খোকা

হাঁ শিখ্‌ব।

বৈরাগী

আর একটু বড় হও—তারপর শিখিয়ে দেবো।

খোকা

তোমার সেই গানটা আমায় শিখিয়ে দিও।

বৈরাগী

কোনটা?

খোকা

ঐ যে সেদিন গেয়েছিলে।

বৈরাগী

কোনটা?

খোকা

সেই যে—"মায়ের কোলের" গান।

বৈরাগী

ও—হো। মনে পড়েছে বটে। তোমার সেদিন ও গানটা বড় ভাল লেগেছিল, না?

খোকা

ও গানটা আর একবার গাইবে?

বৈরাগী

গাইব বৈকি। তুমি যদি বল নিশ্চয়ই গাইব।

খোকা

গাও না—তোমায় খুব বেশী ক'রে ভিক্ষে দেবো।

বৈরাগী

হাঃ হাঃ হাঃ! তা বাবা! তুমি যত গান আমায় গাইতে বলবে—গাইব। তা তুমি আমায় ভিক্ষে দেও আর নাই দেও।

খোকা

গাও না—সেই গান খানা।

বৈরাগী

গান

তুলে নে মা কোলের পরে,
(আমি) কেঁদে মরি তোমার তরে।
এই যে আমার ধূলায় আসন, এই যে আমার মলিন বসন,
এই যে আমার কাতর হিয়া সইচ তুমি কেমন ক'রে।
ধূলা ঝেড়ে তুলে নে মা,
মনের মতন সাজিয়ে দে মা,
প্রাণের পরে দাও বুলিয়ে, স্নেহের হাসি সোহাগভরে।
দিনের শেষে দিন ফুরালো,
নিভে গেল চোখের আলো,
তোমার আঁখির আলোর শিখা, দাও জ্বালিয়ে আঁধার ঘরে॥

(খোকার শুনিতে শুনিতে চোখ্‌ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল।)

খোকা

বৈরাগী! একটু বোস। আমি তোমার জন্য ভিক্ষে নিয়ে আসি।

(খোকা ভিতরে চলিয়া গেল)

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন

বৈরাগী! খোকা তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিল বুঝি?

বৈরাগী

বাবু! ও ছেলেমানুষ নয়। মায়ের নামের গান শুনে ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে। নিশ্চয়ই ও কোনও শাপভ্রষ্ট দেবতা।

বিপিন

ও বুঝি খালি তোমাকে মায়ের নামের গান গাইতে বলে?

বৈরাগী

বাবু! ও কি আপনার ছেলে?

বিপিন

হাঁ।

বৈরাগী

বড় অদ্ভুত ছেলে। মায়ের নাম ক'রে আমার একখানা গান সেদিন শুনেছিল। সেদিনও চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

আজও সেখানাই গাইতে বল্লে। আজও গান শুনে চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠল।

বিপিন

ওর মা আর নাই কিনা বৈরাগী।

বৈরাগী

মা নাই। আহা-হা।

বিপিন

এই দু' মাস হ'ল ওর মা মারা গিয়েছেন।

বৈরাগী

আ-হা! তাই বুঝতে পার্‌ছি।

বিপিন

গান শুনে কেঁদেছিল?

বৈরাগী

আহা! আপনি যান্ ভিতরে যান। ওকে দেখুন। সেদিনও এমনি ধারা হয়েছিল। মায়ের নামের গানখানা শুনেই ভিতরে চলে গেলো। অনেকক্ষণ পরে ভিক্ষে নিয়ে এলো। যান বাবু! খোকাকে দেখুন; আমি ভিক্ষে চাইনা —চাইনা।

(বিপিন সত্বর পদে ভিতরে চলিয়া গেলেন)

খোকার প্রবেশ

খোকা

বৈরাগী! এই নেও ভিক্ষে। আবার কাল্‌কে এসো।

বৈরাগী

দাও! দাও! বাবা! আমি বৃদ্ধ বৈরাগী। তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি—মায়ের কোল তুমি এক দিন পাবে।

খোকা

বৈরাগী! বৈরাগী! তুমি ত জান না, আমার মা আর নেই। কেমন ক'রে আর পাব?

(বৈরাগী কোনও কথা কহিতে পারিল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। খোকাও নীরব। খোকার বাবা পশ্চাৎ হইতে আসিলেন)

বিপিন

খোকা!

খোকা

(তাড়াতাড়ি ফিরিয়া) বাবা।

(খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন)

বৈরাগী

আমি যাই বাবা। তোমার জয় হোক্‌। আমি আবার আস্‌ব বাবা।

খোকা

হ্যাঁ, কালকে এসো।

বৈরাগী

আমি রোজ সকালে আস্‌বো বাবা,—রোজ এসে তোমায় গান শুনিয়ে যাবো। তোমার মত এমন ক'রে আর ত কেউ আমার গান শুন্‌বে না বাবা।

(প্রস্থান)

বিপিন

খোকা! বৈরাগীর গান তোমার বড় ভাল লাগে, না?

খোকা

হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল লাগে। (সহসা) তবে বাবা! এমন কিছু ভাল নয়। তোমার ভাল লাগবে না। ও ছোট ছেলেদের গান।

শেষের রেশ

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

কোনখানেতে শেষ আমার, কোনখানেতে শেষ !
কোন খানেতে থামে আমার দুঃখ সুখের লেশ।
ভরা স্রোতের মাঝখানেতে কোথায় পাব পার ;
অসীম মাঝে সীমা কোথায় অচিন পারাবার।
কালের যবে হারিয়ে যাবে মুহূর্ত্ত নিমেষ ;
কোন খানেতে শেষ আমার, কোন খানেতে শেষ।

পরাজয়ের ধূলায় মাথা দুখের বোঝা ব'য়ে
তাকিয়ে রব হতাশমনে নিমেষহারা হ'য়ে ;
কবে আমার ঘরের মাঝে জ্বলবে নাগো আলো,
আঁধার এসে নাম্‌বে চোখে সেই হবেগো ভালো।
যাইগো ছুটে অনেক দূরে খুঁজি শেষের দেশ,
কোন খানেতে শেষ আমার, কোন্ খানেতে শেষ।

লুটিয়ে আমি শেষের পথে ধূলায় রব প'ড়ে,
হৃদয় খানি উঠ্‌বে তবু শেষ গানেতে ভ'রে।
রবি তখন তলিয়ে যাবে, তলিয়ে যাবে চাঁদ,
আলো তখন পেরিয়ে যাবে তম-পুরীর ফাঁদ,
রইবে নাগো কোথাও মোর কিছুই অবশেষ ;
কোন খানেতে শেষ আমার, কোন খানেতে শেষ।
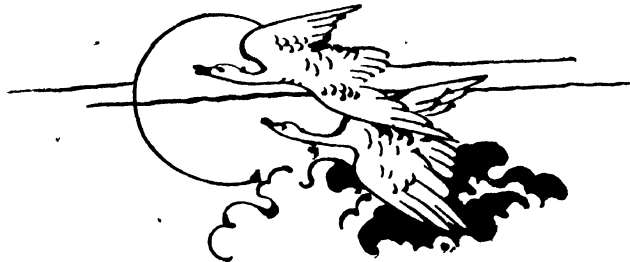
শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর ও উচ্চ সঙ্গীত

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়

অনাগত যখন অপরিচিতের বেশে দ্বারে উপস্থিত হয়, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকে আহ্বান ক'রে নিতে বাধে। অভ্যর্থনার হয়ত ত্রুটি হয় না, কিন্তু সর্ব্ববিধ আদর আপ্যায়নের মাঝেও আসল মানুষটি হয়ত তেমনি অনাবিষ্কৃত র'য়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর

শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরকে যখন প্রথম দেখি, এমনিই একটা মনোভাবের উদয় হয়েছিল। বিদেশী এবং তরুণ, বয়সের দাবীর কোন স্বাক্ষর তার অঙ্গে নেই, মন সহজেই সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তারপর তাঁর সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি, বিশেষতঃ সঙ্গীতশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান, সব অতিক্রম ক'রেও আকৃষ্ট করেছিল। তবে সব চেয়ে আকর্ষণ ছিল তাঁর অমায়িক স্নিগ্ধ ব্যবহার, কথায় কথায় স্মিত হাসি আর বাঙালিসুলভ কৌতুকপ্রিয়তা ও স্নেহপ্রবণতা।

সে দিন সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টা সঙ্গীতের পর শ্রীকৃষ্ণের কাছে বসেছিলাম। বাইরে নারিকেল পাতায় দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোক প্রতিহত হ'য়ে কম্পিত হ'য়ে উঠছিল, শরতের শাদা মেঘগুলি ইতস্ততঃ লঘুভাবে ভেসে যাচ্ছিল, আমি শ্রীকৃষ্ণের কাছে গল্পস্থলে তাঁর বাল্যজীবনী শুনছিলাম। এই অল্পভাষী মহারাষ্ট্রীয় যুবক তাঁর কথা বড় বল্‌তে চান না, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত বিরোধ, বেদনার দিকটা তিনি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছিলেন, তবুও মাঝে মাঝে চক্ষের ম্লান দৃষ্টিতে, অধরের কমনীয় কম্পনে, অনেক কথাই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর জন্ম হয় ১৯০২ সালে। বম্বেতে তাঁর পিতা গবর্ণমেণ্টের হিসাববিভাগে কাজ করতেন। তাঁর পিতার সেতারে কিছু ক্ষমতা ছিল, এবং ঘটনাক্রমে তিনি এক দিন আবিষ্কার করেন যে তাঁর সাত বছরের ছেলে শ্রীকৃষ্ণ কয়েকটি গৎ গাইতে পারে। ইতিমধ্যে তিনি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পুস্তকগুলি পড়েন ও এক দিন সুযোগক্রমে পণ্ডিতজীর সঙ্গে পুত্রের পরিচয় করিয়ে দেন। বালক শ্রীকৃষ্ণ যখন পর পর তীব্র ও কোমল ১২টি স্বর গেয়ে তাঁর স্বরজ্ঞানের পরিচয় দেন, পণ্ডিতজী তাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ১৯১২-১৯১৭ তিনি পাঁচ বৎসরে ভাতখণ্ডের কাছে ৫০০ খেয়াল শিক্ষা করার পর ষ্টেট স্কলারশিপ পান ও বরোদার ফৈয়াস খাঁর কাছে ১৯১৭-২২ শিক্ষা করেন। এই সঙ্গে বলা ভাল যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্কুল কলেজের পরীক্ষায় অন্যান্য বালকের মতই উত্তীর্ণ হ'তে হয়। ১৯২৬ সালে তিনি বি, এ পাশ ক'রে লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজের শিক্ষক হ'য়ে আসেন এবং ১৯২৮ সালে এই কলেজের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। এই সব ঘটনার অন্তরালে অসচ্ছলতার, নৈরাশ্যের এবং সঙ্গীতচর্চ্চার অসাধারণ পরিশ্রমের আর একটা অংশ অদৃশ্যে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু দু'একটি উদাসীন ইঙ্গিত ছাড়া কথা বার্ত্তায় সে সব সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠবার অবকাশ পায়নি। তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, বাল্যে মাতৃহারা সন্তানটির প্রতি তাঁর স্নেহের সীমা নেই। শ্রীকৃষ্ণ গাইতে গাইতে প্রায়ই পিতার দিকে এমন সস্মিত ও স্নেহপূর্ণ ভাবে তাকাতেন,

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়

সকলেরই সেটা ভারি মিষ্টি লাগত। শ্রীকৃষ্ণ একবার দুঃখ ক'রে বললেন, "আমার পড়াশুনো আরো করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই কলেজটিকে গ'ড়ে তুলতে এত পরিশ্রম করতে হয়, কোন কিছু করবার আর অবসর পাই না।" আমার তখন মনে হ'ল লেখা পড়া ক'রেও এত অল্প বয়সে সঙ্গীতে যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেচেন, শুধু তাই যে কোন অশিক্ষিত গায়কের পক্ষে গৌরবের বস্তু হ'তে পারত। শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক শরৎ বাবুর মুখেও ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে এই রকম একটা আক্ষেপোক্তি শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের দিকে আমার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, নানা অভাবে সেটা অকালেই নাশ পায়। এত দুঃখ হয়।" ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে, সেটা অবশ্য সুধী সমাজের বিচার্য্য।

তিনি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক বাঙ্‌লা দেশে সঙ্গীত প্রচারে পরামর্শ দিতে আমন্ত্রিত হ'য়ে কলিকাতায় চার দিন ছিলেন। তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে বাঙ্গালা দেশের কীর্ত্তন, বাউল, রামপ্রসাদী বা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুল সেনের গানের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ নেই, বাঙালী হৃদয়ে তাদের প্রভাব অচল ও অক্ষয়। তাঁরা কেবল এইটুকু বলতে চান যে বাঙলা ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরীতে হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীত এতদিন মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের নিকট শিক্ষা করেচে, সেইটেই পশ্চিম-ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রণালী দ্বারা বিধিবদ্ধ হোক। বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষিত যুবকেরা এই প্রণালী আয়ত্ত ক'রে বাঙ্‌লায় তা প্রচার করলে এদেশে ভাল 'চালের' গান আরও সুলভ হবে, এবং উচ্চ সঙ্গীতের বিস্তার সব দিক থেকেই সহজ হ'য়ে উঠ্‌বে। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আপনাদের দেশে উপাদানের অভাব নেই, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ভাল চালের গান এবং সঙ্গীত শিক্ষার কোন ভাল প্রণালীর অভাবে তা বিকশিত হ'তে পায় না। আমার লক্ষ্ণৌ কলেজে ছাত্রীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী, তাদের মাঝ থেকে আশা করি উচ্চ সঙ্গীতের বিকাশ হয়ত কিছু দিনের মধ্যে দেখাতে পারব।"

খেয়ালের মধ্যে তাঁর জৌনপুরী, ভীমপলশ্রী যোগিয়া, গৌড় সারঙ্গ, আড়ানা ও কানাড়া আমার ভাল লেগেছিল। এমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক বিস্তারের পদ্ধতি বড় একটা শোনা যায় না। তার সঙ্গে তাঁর গমকতান, হলকতান, মিড়, অসাধারণ সা র গ ম ইত্যাদি আরও অপূর্ব্ব ক'রে তুলেছিল। তাঁর সঙ্গতিজ্ঞান এত সূক্ষ্ম ছিল যে তিন ঘণ্টা একাদিক্রমে গান শুনেও শ্রান্তি বোধ হ'ত না। বিলম্বিত লয়ে কোন রাগ গাইবার পরই তার একটা জলদ সংস্করণ আরম্ভ হোত। মাঝে মাঝে ঠুংরী চালের দু'একটা গান বৈচিত্র্যের আমেজ নিয়ে আসত। লয়ের মাধুর্য্যের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। প্রখ্যাত বাদক শ্রীযুক্ত রাইচরণ বড়ালের সহযোগিতায় ছন্দ-বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। পটবিহার, মেঘরঞ্জিনী, খাম্বাবতী প্রভৃতি কয়েকটি নূতন এবং অপরিচিত রাগ শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সঙ্গীতে এতগুলি গুণের সামঞ্জস্য এত অল্প বয়সে সম্ভব হওয়ার কারণ মনে হয় তাঁর শিক্ষিত বিশ্লেষণশীল মন ও মাজ্জিত রুচি। বিখ্যাত আমেরিকান টেনিস প্লেয়ার Tilden এবং ক্রীড়ায় তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কথা আমার প্রায় মনে আসত।

এই চার দিন সকাল সন্ধ্যায় গানের অনুরোধ এবং নানাবিধ কূট প্রশ্নের সমাধানে তাঁকে কখনো অধৈর্য্য হ'তে দেখিনি। ভাতখণ্ডের অনুসরণে রাগাদির স্বরূপবর্ণনায় তিনি খুসীই হ'য়ে উঠতেন। অন্যান্য গায়কের সমালোচনায় বিদ্বেষ কখনো প্রকাশ করেননি, প্রশংসাই করতে চাইতেন, এবং তা না করতে পারলে নিস্তব্ধ থাকতেন। এক দিন কথায় কথায় ব'লে ফেলেছিলেন "To offend anyone is very painful to me"। পরিণত বুদ্ধি ও বয়সের স্নিগ্ধতা ও গাম্ভীর্য্যে এই তরুণ প্রতিভা কিরূপ বিকাশ লাভ করবে তা অনুমান করতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।
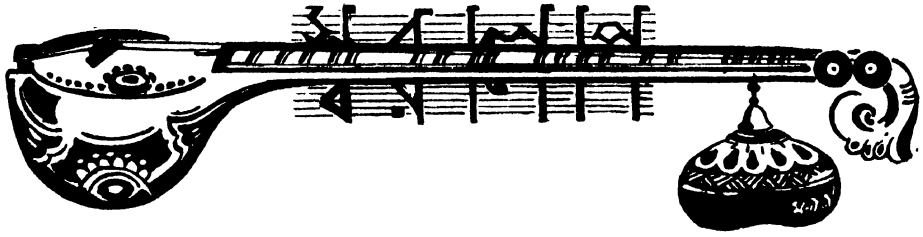
গান

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

ভবানী দয়ানী মহাবাকবাণী
সুর নর মুনিজন মানি সকল বুধ জ্ঞানী
জগজননী জগজানী মহিষাসুর মরদনি
জ্বালামুখী চৌণ্ডী অমরপদদানী।

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে — নবাব আলি চৌধুরী

গান ও সুর রচয়িতা—পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে
গানের ঢঙ—তৎশিষ্য লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর
স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

সা I র্সা -া র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞা র্সা I ণা র্সা ণদা পা পদা
ভ বা ০ নী ০ দ য়া ০ নী ০ ভ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

I র্সা -া ণর্সা জ্ঞ´ঋ´া র্সা I ণা র্সা ণদা পা পা I
বা ০ নী ০ দ য়া ০ নী ০ ম

I পা -া পা দা ণা I দণদা পা মা -া জ্ঞা I
হা ০ বা ০ ক বা ০ ণী ০ স্থ

I সা জ্ঞা মা জ্ঞমপা মা I জ্ঞা মা জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা I
র ন র মু নি জ ন মা ০ নি

I সা সর্জ্ঞা সর্জ্ঞা ঋ´া র্সা I ণা র্সা ণদা পা দা I
স ক ল বু ধ জ্ঞা ০ নী ০ ভ

I পদণা র্সঋ´র্জ্ঞা ঋ´র্সা ণদা ণা I র্সা জ্ঞঋ´া র্সা ণদা ণা I
বা ০ নী ০ দ য়া ০ না ০ ভ

I র্সঋ´া জ্ঞর্মা র্মা -া জ্ঞর্মা I জ্ঞ´ঋ´া জ্ঞঋ´া র্সণদা পা দা I
বা ০ নী ০ দ য়া ০ না ০ ভ

I র্সা -া র্সা -া র্জ্ঞা I র্সা -া ণদা পা পা I
বা ০ নী ০ দ য়া ০ না ০ ম

I পদা ণর্সা ণপা ণা দা I দপা দমা মা -া মা I
হা ০ বা ০ ক বা ০ ণী ০ স্থ

I সা জ্ঞা মা সঋজ্ঞা মপদা I জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া সা I
র ন র মু নি জ ন মা ০ নি

I দা মা দা দা ণা I পর্সা র্সা র্সা -া র্সা I
জ গ জ ন নী জ গ জা ০ না

I ঋর্া ঋর্া ঋা -া ঋর্া I জ্ঞর্া ঋজ্ঞর্া ঋর্া র্সা র্সা I
ম হি ষা ০ সু র ম র দ নী

I ণদা দপা পা দা র্সা I ণপা ণা দা পা পা I
জ্বা ০ লা ০ মু খী ০ চো ০ ণ্ডি

I পা দা ণা র্সা জ্ঞঋর্া I র্সণা র্সা ণদা পা দা I
অ ম র প দ দা ০ নী ০ ভ

I পদণা র্সঋর্জ্ঞর্া জ্ঞর্া ণা র্সা I জ্ঞর্ঋর্া ঋর্সা ণদা পা দা I
বা ০ নী ০ দ য়া ০ নী ০ ভ

I মা দা ণা র্সা জ্ঞর্ঋর্া I র্সা -া -া -া র্সা I
বা ০ ০ ০ ০ নী ০ ০ ০ ভ

I ঋর্া র্সা র্সণা ণদা ণা I র্সা -া -া -া র্সা I
বা ০ ০ ০ ০ নী ০ ০ ০ ভ

I র্সঋর্া জ্ঞর্া ঋর্জ্ঞর্া ঋর্সা ণা I ণর্সা ঋর্া র্সঋর্া র্সণা দা I
বা ০ ০ ০ নী দ ০ য়া ০ ০

I মদা ণর্সা পণদা পমা জ্ঞঋা I সা -া -া -া -া I
নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

হিন্দুস্থানী গানের সুরের সাবলীলতা ও পরিবর্ত্তনশীলতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। আমার স্বরলিপি পুস্তক "গীতি মঞ্জরীতে" গানটি যেভাবে স্বরলিপি করা হ'য়েছে সেইভাবে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নিজে গানটি গান। কিন্তু তৎশিষ্য রতনজনকর গানটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার প্রেরণায় এবার কলিকাতায় অনেকটা অন্য ঢঙে গেয়েছিলেন—শুধু তানালাপের বেলায় নয়, গানটার ঢঙটিকে নিজ প্রতিভার রসায়নে আত্মসাৎ করার বেলায়ও বটে। হিন্দুস্থানী গানের এই সাবলীলতার অবসর বাঙ্গলা গানে আনা চলে—অনেকাংশে, যেমন অতুলপ্রসাদের "সে ডাকে আমারে" গানটিতে। এ গানটি তিনি এই ছন্দে ও ঢঙেই রচনা করেছেন। পরে স্বরলিপি দেবার ইচ্ছে রইল।

মণিলাল

—গল্প—

—শ্রীনীলমণি দাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাশুড়ী-জামাতা

"পাঠাবেন না ?"

"না।"

"বিয়ে করেচি কিসের জন্যে যদি চিরটা কাল বাপের বাড়ীতেই থাকবে ?"

"তোমাকে মেয়ে দিয়েছি সেই ভাগ্যি! অতবড় বংশের মেয়ে কোথায় এক পাড়াগেঁয়ে নীচ ঘরে দিলাম। আমি তখনই কত্তাকে বলেছিলাম, মেয়েটাকে বনে জঙ্গলে যার তার হাতে দিওনা, কিন্তু তাঁর সে কি ঝোঁক! বিদ্বান, সচ্চরিত্র পাত্র! ওঃ! বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা কয়েক স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ন্যাজে থাকলেই যেন সব হ'ল।"

"যখন দিয়েছেন তখন ত আর চারা নেই, আমার স্ত্রী আমার কাছে না থেকে আপনাদের বাড়ীতে থাকলে আপনাদেরও লজ্জার কথা। আমার দিকটা নাই ধরলেন।"

"বলি, মেয়েটাকে হাঁপিয়ে মরতে পাঠাব? বিজলীর বাতি, ফ্যানের হাওয়া না হ'লে সে এক দণ্ড থাকতে পারে না। মহিলা-সমিতিতে সে সব চেয়ে সেরা প্রবন্ধ লেখে, সেদিন শেলি বোসের বাড়ীতে এমন গান গাইলে যে শেলি বল্লে, 'মাসিমা! শ্যামাদিদির গান আমাদের 'বান্ধব সম্মেলনে' একবার শোনাতে ইচ্ছা হয়!' সে মেয়ে কিনা পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে থাকবে তোমার ভাত রাঁধবার জন্যে!"

একটি পাঁচ বৎসরের বালক আসিয়া থমকিয়া বলিল, "কর্ত্তামা! তুমি পিসেমশায়ের সঙ্গে বকাবকি করতে লাগলে? বায়স্কোপ দেখতে যাবার সময় হ'য়ে এল। সাড়ে ছয়টা বাজে জান ত। মা পিসিমা এরা সব চান ঘরে সাবান মাখছে। তুমি শিগ্‌গির সেরে নাও।"

"তবে আমি চল্লাম। আর এবাড়ী আসছিনা। মেয়েকে পৌছে দিতে হয় দেবেন, নইলে এখানেই সে থাকবে।" বলিয়া মণিলাল বাহির হইয়া গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন সে এক খানা ঠিকাগাড়ী লইয়া আসিল তখন বাড়ীর মেয়েরা বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। সে যে রাগ করিয়াছে গিন্নি সেকথা কন্যাকে বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন মাথা পাগ্‌লা মণিলাল নিকটের স্কোয়ারে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ফের ফিরিয়া আসিবে, এমন ত আগে অনেকবার সে আসিয়াছে। মণিলাল তাহার ব্যাগ ও বিছানা লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে চলিল। তাহার বাড়ী পূর্ব্ব বঙ্গে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেল কক্ষ

মণিলাল পূজার ছুটিতে কনসেশন টিকিট লইয়া শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিল। সুতরাং টিকিট কেনার বিড়ম্বনা আর ভোগ করিতে হয় নাই; সে বিমনস্কচিত্তে গাড়ীতে যাইয়া বসিল। ছুটির তখনও বিলম্ব ছিল; গাড়ীতে সেকেণ্ড ক্লাসে ভিড় ছিল'না। সে একটা খালি কামরায় আরোহণ করিল। যাত্রীর দৌড়াদৌড়ি, কোলাহল, গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা, সব কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু মস্মে প্রবেশ করিল না। গাড়ী ছাড়িতে শরতের স্নিগ্ধ বাতাসে তাহার তপ্তদেহ জুড়াইয়া গেল—মনে হইল সে যেন তাহার দুঃখে করুণাময়ী প্রকৃতির সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়াছে।

মণিলাল জানলা দিয়া দেখিল শ্যামল শস্যক্ষেত্র, শিশির-সিক্ত বৃক্ষরাজি,স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনী সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া শরতের জ্যোৎস্না হাসিতেছে। রূপের লীলা-হিল্লোলে তার হৃদয়ের রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া গেল। প্রাণের আবেগে সে গাহিল,—

ছি ! ছি ! কি ছার দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারায়েছিলেম
আমার বঁধুর মতন মধুর
এমন বঁধু কার বা আছে।

মনে পড়িল তার প্রথম যৌবনের কথা, যখন মণিলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া প্রখরা প্রতিভাময়ী কলিকাতার বিদুষী শ্যামাঙ্গিনীকে বিবাহ করিল, তার বিধবা পিসিমাতার একান্ত অনুরোধে। সাহেবদের সদাগরী আফিসে বাবুগিরি করিয়া শ্বশুর বিস্তর অর্থ জমাইয়াছিলেন, বড় শ্যালক ঘোড়-দৌড়ের দালালীতে বেশ রোজগার করে। ছোট শ্যালকটি তখন দ্বাদশ বৎসরের, নাম মলয়।

তার "কিশোর বয়স বেশ,
মাথায় চাঁচর কেশ,
মুখে হাসি আছে মিশাইয়া।"

শ্বশুর বাড়ীতে এই শ্যালকটিকে সে বড় বেশী ভাল বাসিয়াছিল। আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মণিলালের পুত্রটি এখন পাঁচ বৎসরের কন্যাটি তার চেয়ে তিন বৎসরের ছোট। বিবাহের পূর্ব্বেই তার সরকারি চাকরি জুটে, সে জন্য তাহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রায় যাইতে হইত। কোথাও বেশী দিনের জন্যে থাকিতে পাইত না। দেশে উপরোক্ত বিধবা পিসিমা ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না। তিনিও মণির চাকরি হইবার পর নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। নানা কারণে মণিলালের স্ত্রীর সহিত স্বগৃহে বেশীদিন বাস করার সুযোগ হয় নাই। স্ত্রী কলিকাতায় থাকিতে চায়।

অল্পদিন হইল মণিলালের অন্তরঙ্গ অকৃত্রিম বন্ধু অপূর্ব্ব কুমার হাকিম হইয়া আসিয়াছে। মণিলাল পূজার ছুটির সঙ্গে ছয় মাসের "ওয়ারলিভ্" অবকাশ লইয়াছিল, এই আশায় যে স্ত্রীকে আনিয়া বন্ধু পরিবারের প্রতিবেশী হইয়া সুখে সময়টা কাটাইবে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে এই সাধে বঞ্চিত করিলেন। শুধু তাই নয়। তাহার শ্যালক সখাটি এবার নভেম্বর মাসে এম এ পরীক্ষা দিয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া পল্লিজীবন উপভোগ করিবে সে ভরসা সে পূর্ণমাত্রায় রাখিত তাহাও হইল না।

নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় এক মতলব খেলিল। সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রেলগাড়ী যখন তাহার গ্রামের ষ্টেশনে পঁহুছিল তখনো তাহার উৎসুক-চিত্ত সেই খেয়াল লইয়াই ব্যাপৃত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বগ্রামে

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। বাড়ী ষ্টেশন হইতে অধিক দূর নয়। কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া সে গৃহে উপস্থিত হইল। কুলিকে বিদায় করিয়া কপাটে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকিল "রহিম চাচা ! রহিম চাচা ! কপাট খোল। বেশ ঘুমচ্ছো দেখছি ! চোর এসে লোহার সিন্দুক ভাঙ্‌লেও তোমার ঘুম ভাঙ্‌তো না।"

দীর্ঘ ঋজু-দেহ রহিম দ্বার খুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। "বৌমাকে আন্‌লে না ? এত রাত্রিতে একা এসে হাজির যে ? কি হলো বল ত ?"

"শাশুড়ী পাঠালেন না চাচা। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কি কলকেতার লোক বাঁচে ? আমি রাগ ক'রে চ'লে এসেছি। এই অঘ্রাণে আবার বিয়ে করব ঠিক করেছি।"

"বলো কি মণিলাল ! তোমার দুটা ছাওয়াল রয়েছে, শাশুড়ী না পাঠায়, বৌয়ের কি কসুর বলত ? হিঁদুর মেয়ে তাল্লাক ত চলেনা যে, সে একটা নিকে ক'রে নেবে তুমি তাকে ছাড়লে।"

"তোমাদের ব্যবস্থা বেশ রহিম চাচা। গরমিল হ'লেই তালাক দিয়ে দুজনেই খালাস। আবার পছন্দ মত আপনার আপনার যুড়ি খুঁজে নিতে পার।"

"তুমি ছোকরা হচ্ছ ভাতিজা। বোঝ না। তেমনটি আর হয় না। আমি ত আলির মাকে তালাক দিইনি। সে দেখতে খপসুরত ছিল না—আর সাহিদের বেওয়া ছিল যেমন বেহেস্তের পরী একটি। আমাকে দেখে মেয়েলোক-গুলো কেমন যে ভুলে যেত আমার এখন মনে কর্‌লে হাসি পায়। তার নাম ছিল সাকিরুন্নিসা। সাহিদ আদর ক'রে ডাকত সাকী। সাহিদের মেজাজ মদের মৌতাতে খুব খুশ্ থাকত কিনা। আহা ! বেচারা সাকীকে সে বড় মার-

শ্রীনীলমণি দাস

খোর করত। সে কেঁদে কেঁদে হাড়সার হতে লাগ্‌ল। শেষে একদিন আর থাক্‌তে না পেরে সে আলির মাকে বললে দিদিজান! আলির বাবার সঙ্গে আমার নিকে করিয়ে দাও। কি বলব মণিলাল! সে সব কথা মনে হ'লে আমার কলিজাটা এখনও কেমন ক'রে ওঠে। আয়েষা আমাকে ধ'রে বসল নিকে কর্ত্তেই হবে। কত সমঝালাম কিছুতেই মান্‌লে না। খোদার কি মর্জ্জি! নিকা করবার পর এক চাঁদ যেতেই সে বেহেস্তে চ'লে গেল। মাকী আলিকে নিজের পেটের দাউদের চেয়েও স্নেহ দিয়ে মানুষ করলে, কিন্তু আমার কলিজাটা আর ঠাণ্ডা হল না। বুড়া চাচার বাত শুন মণিলাল, দোসরা বিবি কোর না।"

"আচ্ছা সে কথা পরে ভেবে দেখব। এখন বড় ক্ষিদে লেগেছে, কিছু দাও খেতে।"

"এত রাত্রে কি পাব! ময়রা মুদি সব দোকান বন্ধ ক'রে ঘুমুচ্ছে।"

"তোমার কিছু রুটি বিস্কুট নেই চাচা।"

"জাত যাবে যে। তুমি হিন্দু; আচার ছাড়লে কবে থেকে। একটা পাউরুটি আছে। ফজিরে ইন্দারার জল কলসীতে এনে রেখেছি গেলাসটা ধোয়া আছে।"

"আমাকে তাই দাও চাচা। তোমার হাতের রুটি জলে খাব। তুমি যে আমার চিরদিনের চাচা সেকথা ভুলচ কেন? বাবা মরবার সময় তোমার হাতে আমাকে সঁপে ছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, সেদিন যখন তোমাকে দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাকলেন "রো—হি—ই—ই" তুমি ইতস্ততঃ করছ দেখে হাত নেড়ে বিছানার কাছে আসতে ইসারা করলেন। তুমি আসতে, তোমার হাত ধ'রে আমার মাথায় দিলেন। তারপর তিনি আর কথা বলেননি।"

বৃদ্ধ রহিম গলদশ্রু হইয়া মণিলালের মাথায় হাত দিল। মণিলাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। রহিম তাহাদের পুরাতন প্রজা প্রতিবাসী ও রক্ষক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভোজন শালা

ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ করিয়া নিকটের গির্জ্জার বড় ঘড়িতে দশটা বাজিল। বিজলী—আলোকিত খাবার ঘরে চারখানি গালিচার আসন পাতা, চারটা গ্লাসে জল রাখা হইয়াছে। একদিকে আর একটি আসন, তাহার পাশে গ্লাস নাই। এইটিতে মণিলালের শাশুড়ি বসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে সে দিনের বালিগঞ্জের টার্ফ ক্লাবের ঘোড় দৌড়ের গল্প কর্‌ছিলেন। ঘণ্টা বাজিতে মলয় আসিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিল। তখন গিন্নি বাঞ্ছানিধি ওরফে নিধি চাকরকে সদর হইতে কর্ত্তাকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

কর্ত্তা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "মণিলালের জন্য বসেছিলাম; সেত এখনও এল না। কোথাও নিমন্ত্রণ আছে নাকি তার?"

"না গো না। তোমার গুণের জামাই রাগ ক'রে চ'লে গেছেন। আমাকে শাসিয়ে গেছেন যে মেয়ে পৌঁছে না দিলে মেয়ে এখানেই থাকবে।"

"তুমি বুঝি শ্যামাকে পাঠাতে মত কর নি, সে অভিমানে তাই চ'লে গেছে।"

"তোমার ত আর মেয়ের উপর একটুও মমতা নেই তা না হ'লে কলকাতা সহরে কত ভাল ভাল ছেলে থাকতে কোথাকার এক পাড়াগেঁয়ে ভূতের হাতে মেয়েটাকে সঁপে দিলে। পাঁচটা নয় সাতটা নয়, আমার অই একটি। তাকে কত যত্নে মিশনরি স্কুলে পড়ালাম। সে কিনা খোড়ো রান্নাঘরে ভাত রাঁধবে। সেখানে গেলেই সে ম'রে যাবে।"

"একবার পাঠিয়েই দেখলে না কেন? শ্মশান-বাসী ভিখারী শিবের কাছে সতী কি থাকতেন না?"

"তোমার ঐসব কথা! সে দেশে রসুয়ে বামুন পাওয়া যায় না শুনি। চাকরও মেলা কঠিন। আমি সেখানে কিছুতেই মেয়ে পাঠাব না। মণিলাল কতই রোজগার করে যে আমার মেয়েকে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবে।"

"দেখ তুমি সব তাতেই টাকা টাকা কর। টাকাই কি সব? এই সেদিন ডেপুটি বাবুর বোনের সঙ্গে মলয়ের

অমন সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিলে কেবল টাকার জন্যে। আবার জামাইটিকেও তাড়ালে।"

গৃহিনী দমিবার পাত্রী নহেন; বলিলেন, "যার বাপ লাখ টাকা রেখে গেছে, যে নিজে হাকিম, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, সে একমাত্র ছোট বোনটির বিয়েতে দশ হাজার টাকা দেবে না কেন? এই সেদিন শেলির বিয়েতে নিমাই মিত্র বিশ হাজার টাকা দিলে। আমার অমন ছেলে আমি দশ হাজার টাকা গুণে নিয়ে তবে বৌ বরণ করব।"

ছুটি আয়ত ভাবাবিষ্ট চোখের ঘন নীল তারা ক্ষণেকের জন্য মাতৃমুখের উপর স্থাপিত হইয়া পিতার দৃষ্টি খুঁজিয়া নিবৃত্ত হইল।

"মলু! তুই কিছু খাচ্চিস না যে আজ—কি হয়েছে বল্ ত?"

"ক্ষিদে নেই মা।"

স্বল্পভুক্ত আহার ছাড়িয়া মলয় সকলের সঙ্গে উঠিল। তার মণিদা তাহাকে না বলিয়া বিদায় হইয়াছে। সে দুঃখ তার কার কাছে বলিবে। বয়সের পার্থক্য থাকিলেও দুজনের মধ্যে আত্মার একটা অভেদ্য মিল ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শয়নকক্ষ—জ্যোৎস্নারাত্র

পুত্রকন্যা ছুইটি পালঙ্কে ঘুমাইতেছে। বুড়ী ঝী কানা-কড়ির মা দূরে ঝিমাইতেছে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিজলীর পাখা বন্ধ করিয়া দিয়া মুক্ত বাতায়ন-পাশে দাঁড়াইয়া শ্যামাঙ্গিনী। রাত্রি বারোটা। বায়স্কোপের মনোরম অভিনয় দুইঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার কত ভাল লাগিয়াছিল। এখন একটি দৃশ্যের একটু খণ্ডও মনে আসিতেছে না। মণিলালের এতটা অভিমান করা কি উচিত হইয়াছে? কলিকাতা ছাড়িয়া শ্যামাঙ্গিনী থাকিবে কি করিয়া? তাহার শিক্ষিত সখাসখীদের সঙ্গ না পাইলে সে বাঁচিবে কি? কিন্তু তার নিঃসঙ্গ স্বামী চাকরীর জন্য একা একা দূরে দূরে কলম পিষিতেছে। তার সুখ তার স্বাচ্ছন্দ্য—সেটাও কি তার ভাবিবার দেখিবার নহে? সে কথা সে এতদিন ধারণায় আনে নাই। মনটা কেমন করিতে লাগিল। গভীর অবসাদে সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে একা—পাশের অন্য বালিশটি খালি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোজগরী পূর্ণিমা

মহকুমার হাকিমের সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে আরাম কেদারায় অপূর্ব্বকুমার ও তাহার বিংশবর্ষীয়া স্ত্রী বীণা বসিয়াছিল। নিকটে একটি সুন্দর অর্গান বাজাইয়া অপূর্ব্ব কুমারের সুন্দরী পঞ্চদশ বর্ষীয়া সহোদরা গাহিতেছিল,

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে
ও চাঁপা ও করবী!

মণিলাল ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দম্পতিকে নিঃশব্দে নমস্কার করিল ও অপূর্ব্বর পাশে শোফায় বসিল। বাসন্তী পিছন ফিরিয়া গান গাহিতেছিল, মণিলালকে দেখিতে পায় নাই। গান থামিলে মণিলাল বলিল, "কি চমৎকার গান গাইলে বাসি। কলকাতার অনেকের দর্প তোমার কাছে চূর্ণ হয়।"

বাসন্তী ফিরিয়া করযোড়ে তাহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

অপূর্ব্ব বলিল, "বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছিস বুঝি?"

"না রে না! শাশুড়ীর সঙ্গে। তিনি মেয়েকে পাঠাবেন না, কাজেই আমি আবার বিয়ে করব ঠিক করেছি। তাই তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। এই অগ্রাণ মাসের প্রথমেই একটা দিন আছে। দুজনের রাশি নক্ষত্র মিলিয়ে দেখেছি, বেশ প্রশস্ত দিন।" বলিয়া তাহার খোলা প্রাণের হাসি হাসিতে লাগিল। অপর তিনজন একেবারে অবাক! মণিলালের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হইয়াছে! অপূর্ব্বর নিভৃত অন্তরে সখ্যের অভিমানে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল যে, মণিলাল তাহাকে কোন কথা না বলিয়া একেবারে পাত্রী মনোনীত পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছে। সে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "পাত্রী পর্য্যন্ত পছন্দ হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি। এখন মিষ্টান্নমিতরেজনার ব্যবস্থা কর আর কি।"

শ্রীনীলমণি দাস

"অভিমান আর কর্ত্তে হবে না অপূর্ব্ব! তুই বল্লেই বুঝবি যে তোকে আগে এ বিষয় জিজ্ঞাসা কেন করিনি।" বলিয়া অপূর্ব্বর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি যাহা বলিল তাহাতে অপূর্ব্ব লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সাবাস! সাবাস!" তাহার পর বীণার দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "শুনছ? পাঁচুই অঘ্রাণ বাসির সঙ্গে মণিলালের বিয়ে।"

স্তম্ভিত বাসন্তী লজ্জায় লাল হইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। বীণাপাণি বলিল, "তোমরা দুই বন্ধু পাগল হ'লে নাকি?"

দুই বন্ধুতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া বিবাহের সব স্থির করিয়া খাইতে উঠিল। শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতই তাহাদের হৃদয় তখন আনন্দে উজ্জ্বল।

পরদিন প্রাতঃকালে মণিলাল তার পিসিমাতার কাছে চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব বিবাহের সব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার ভার লইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রণপত্র ও উড়োচিঠি

মণিলালের শ্বশুর চারুবাবু একদিনেই ডাকে দুইখানি পত্র পাইলেন। একটির মর্ম্ম, "আপনার জামাতা শ্রীযুক্ত মণিলাল তাহার বন্ধু অপূর্ব্ব বাবুর ভগ্নী বাসন্তীকে বিবাহ করিতেছেন। আগামী পরশ্ব পাত্র-আশীর্ব্বাদ ও গাত্র-হরিদ্রা। সত্বর প্রতিবিধান আবশ্যক।" উহা বেনামী জনৈক হিতৈষী লিখিয়াছেন। অপরটি অপূর্ব্ব তাহার ভগিনীর শুভ বিবাহে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া ত্রুটি-মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছে। পাত্রের নাম ধাম লিখা নাই। কর্ত্তা বুঝিলেন ইচ্ছাপূর্ব্বক পত্রে উহা প্রকাশ করা হয় নাই। চিঠিদুইখানা তিনি গৃহিনীকে দেখাইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘোড়দৌড়ে টালিগঞ্জে গিয়াছিল। মলয়ের সেদিন পরীক্ষার শেষ দিন। সে পূর্ব্বেই সেনেট হলে গিয়াছিল।

গিন্নি বলিলেন, "তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে তোমাদের বড় সাহেবের চিঠি নিয়ে যাও। বিয়ে করুক না, আমার মেয়ে ত ভেসে যাবে না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "না গো না! সে হবে না। মেয়েটা কি বলে? তাকে পত্র দুখানি দেখিও; আমি তাকে, তার ছেলে মেয়েদের আর মলয়কে নিয়ে ভোরের ট্রেণে গিয়ে পৌছোব। সে ট্রেণ পৌছবার প্রায় দু ঘণ্টা পরে ভাল সময়। মলয়ের পরীক্ষা আজ শেষ হবে। তোমার গিয়ে কাজ নেই। বড় সাহেবকে ব'লে এক সপ্তাহের ছুটি নোবো। বিবাহের দিনটা কেটে গেলে সেখান থেকে ফিরব। আমার বিশ্বাস, আমরা গিয়ে পড়লে আর কোনো গোল হবে না।"

গিন্নি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "যেমন তোমার ইচ্ছা! মেয়েটাকে দেখেওছিলে বিশ্বাসেরই উপর নির্ভর ক'রে। তোমার যে অমন অফুরন্ত বিশ্বাস কি ক'রে যোগায় তা জানি না।

কর্ত্তা শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। গিন্নির কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা ভগিনী

পরীক্ষার পর মলয় বাড়ী ফিরিলে মাতা বলিলেন, "মণিলালের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। শ্যামা তার ঘরে আছে। তার কাছে যাও একবার।"

"দিদি।" বলিয়া মলয় ঘরে ঢুকিতেই শ্যামাঙ্গিনী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মলয় হাসিয়া বলিল, "তুমিও তাহ'লে বিশ্বাস করেছ দেখছি। আমি কিন্তু একটুও করিনি।"

"তোমার চেয়ে আমি বোধ হয় মণিদাকে বেশী বুঝতে পারি, দেখি চিঠি।"

পত্র পড়িয়া মলয় বলিল, "কই অপূর্ব্ব বাবুর পত্রে তো পাত্রের নাম ধাম কিছু নেই। অন্য চিঠিখানা কোনো দুষ্টু লোকের। যাহোক আজ ভোরের ট্রেণে চল আমরা ভাই বোনে যাই; বিয়ের ভোজ খেয়ে আসব। নিশ্চয় অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে। বাবাও আমাদের নিয়ে যাবেন বলেছেন।

শ্যামা স্নেহভরে কনিষ্ঠের মুখ-চুম্বন করিল। তার এই ভাইটি যে মূর্ত্তিমন্ত ভালবাসা!

"দিদি ভাই! মণিদাকে তুমি ফস ক'রে কিছু ব'লে ফেলো না। আমার উপর ছেড়ে দিও। মা যাচ্ছেন না সে এক রকম ভালো। রবি ও ছবি সঙ্গে থাকবে।"

রবি শ্যামার পুত্র। ছবি তার কন্যা।

দশম পরিচ্ছেদ

পিসীমা

নবদ্বীপে প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানান্তে সোনার গৌর দর্শন করিয়া পিসীমা যখন বাড়ী ফিরিলেন মণিলাল তখন প্রাতরাশ করিয়া বাহিরের দাওয়ায় সুখাসীন। সে তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল।

"মণি তুই এখানে এলি যে!"

"তোমাকে দেখতে।"

"বৌমাকে আনবার কথা ছিল না?"

"শাশুড়ী পাঠাননি। বল্লেন পাড়াগেঁয়ে নীচ ঘরে মেয়ে দিয়েছেন সেই আমাদের ভাগ্যি, তিনি আমার বাড়ীতে ভাত রাঁধতে তাঁর মেয়েকে পাঠাবেন না।"

"বটে! আমি তার বাপের কুলের কথা জানি না বুঝি! নীচ বংশ, কিন্তু দেমাক কত! সেই যে বৌমার সঙ্গে ঝি মাগিটা এসেছিল সেটাও কম ছিল না। সেই যেন বাড়ীর কর্ত্রী, আর আমি বাঁদী!"

মণিলালদের অঞ্চলে পিসীমার রসনা চালনার বেশ খ্যাতি ছিল। কেহ কেহ বলিত উক্ত ঝির নিকট স্বক্ষেত্রে পরাভব তাঁহার নদীয়া বাসের অন্যতম কারণ। এতদিন পরে তাহার জ্বালা মনে জাগিয়া উঠাতে বলিলেন "তুই আবার সংসার কর মণি! আমি তোকে সংসারী দেখে সুখী হই! আজীবনটা কি বৈরাগী থাকবি?"

"তাই করব। অপূর্ব্বর বোন বাসন্তীকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়। তার সঙ্গে এই অগ্রাণের প্রথমে আমার বিয়ের সব ঠিক করেছি।"

"বেশ করেছিস! আহা মেয়েত নয়, যেন প্রতিমা খানি। কত নাকি পড়েছে, আমি তা কি ছাই বুঝি। কিন্তু মান মর্য্যাদা করতে জানে। আমাকে দেখে ভূমিষ্ট হ'য়ে পায়ের ধূলা নিয়ে যেন কৃতার্থ হ'ল। বেশ, বাবা, বেশ। আমি যাব; নিয়ে যাস্।"

দশম পরিচ্ছেদ

সুপ্রভাত

পূর্ব্বদিক ঈষৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। পাখীর কাকলি উষার আগমনী ঘোষণা করিতেছিল। কলিকাতার ট্রেণ মণিলালদের গ্রামের ষ্টেশনে পৌঁছিল। মণিলালের শ্বশুর ও মলয় নামিতেই একজন চাপরাশি চারুবাবুকে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "হুজুর এসেছেন! মণিলাল বাবুর বাড়ী যাবেন বুঝি? আমি গাড়ি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

"তুমি ষ্টেশনে কেন পাঁচু?"

মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া পাঁচু, অর্থাৎ পঞ্চানন্ বলিল, "আজ্ঞে হুজুর! এই কি না হাকিমবাবুর বোনের বিয়ে; সেই যেনারে দেখতে হুজুর মাঠাকরুণকে নিয়ে বর্দ্ধমান গিছ্‌লেন। বাবু বর্দ্ধমান হ'তে বদলি হ'য়ে এই মহকুমার হাকিম হয়েছেন। আমিও অনেক দরখাস্ত ক'রে সঙ্গে এসেছি। এই বলছিলাম কি ভাল রোশন চৌকী ঢ় দল এই গাড়ীতে আসবে তাই দেখতে এলাম। ঐ যে তারা!" প্লাটফরমের অপর দিকে চাহিয়া গলা হাঁকিয়া বলিল, "তোমরা দাঁড়াও একটু হে! ও রাম সিঙ! দেখছেন হুজুর, সিপাহীটা কেমন ঘুমুচ্ছে ষ্টেশনের বারান্দায়। এই আমি এনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে তোমাদের ব্যবস্থা করছি।"

পঞ্চানন মণিলালের শ্বশুর প্রভৃতিকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ি চলিয়া গেলে বাজনদারদিগকে প্রভুর কুঠিতে লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "বিয়ে বুঝি ফেঁসে যায়। প্রথম পক্ষকে নিয়ে শ্বশুর পৌঁছেচেন, এখন কি দাঁড়ায় বলা যায় না। তোরা পৌঁছেই সানাইটাতে বেস ভাল ক'রে সুর ধরিস, জানলি?" তাহারা কুঠির নিকটে হরিসভা মন্দিরের বারান্দায় আস্তানা করিয়া মিষ্ট সুরে ভৈরবীর আলাপ ধরিল। অপূর্ব্ব বাহিরে আসিলে পাঁচু নমস্কার করিয়া বলিল, "হুজুর ষ্টেশনে গিছলাম কিনা, বাজনদারদের

শ্রীনীলমণি দাস

দেখতে। মণিবাবুর শ্বশুর সেই যেনা দিদিমণিকে দেখতে গেছলেন বর্দ্ধমানে, মণিবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও ছেলেদিগে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে এক জন রাজপুত্রের মতন ২০।২১ বছরের ছেলে। বোধ করি মণিবাবুর ছোট শালা।”

“তাই নাকি! তা'হলে বিলম্ব করলে চলবে না। আশীর্ব্বাদের জিনিস সব ঠিক ক'রে ৺হরিসভার শিরোমণি মহাশয়কে ডেকে নিয়ে এস।”

ভিতরে যাইয়া বলিল, “ওগো! শুনছ! মণিলালের স্ত্রীকে নিয়ে মণির শ্বশুর আর ছোট শালা এসেছে। সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল। বিলম্ব না হয়। বাসন্তী কোথায়? তাকে একখানি ধোয়া কাপড় ও সেমিজ পরিয়ে রেখ। হাতে খালি দুগাছি রুলী, কানে দুটি ইয়ারিং; আর কিছু নয়।”

“হ্যাঁ গো হ্যাঁ! সে মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়তে গিয়েছে। মুন্সেফ গিন্নিকে ডাকতে ঝি পাঠাচ্ছি। তাঁরা এসে পড়বেন। চা জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রে রাখছি। শাঁখটী আমার হাতেই থাকবে।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

মণিলালের বাটী

শানাইয়ের শব্দে ত্রস্ত হৃদয়ে মণিলাল বাহিরে আসিয়া ষ্টেশনের রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল একখানা গাড়ি তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ির জানালা হইতে মলয়ের মুখ বাহিরে দেখিয়া সে তার উচ্ছ্বসিত হৃদয় বহু চেষ্টায় বশে আনিল। গাড়ি আসিয়া থামিলে মলয় প্রথমে নামিল। তাহার সেই মর্ম্মতল-স্পর্শী ভাসা-চোখের নীল তারা দুটী মণিলালের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, “মণিদা! বাবা আর দিদি এসেছেন।”

মণিলাল তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে গিয়া শ্বশুরকে বলিল “আসুন।”

রবি ও ছবি দুইজনে গাড়ি হইতে নামিয়া মণিলালের দুই হাত ধরিল। শ্যামাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

পিসীমাকে দেখিয়া শ্যামাঙ্গিনী প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। পিসিমা মনে প্রমাদ গণিলেন। শ্যামাঙ্গিনীকে বৈঠকখানার পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন; তারপর গলা চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, “এসেছ মা, বেশ করেছ। ঘরের লক্ষ্মী তুমি। আমি মণিলালকে কত বুঝালাম, অমন কথা মনেও আনতে নাই। তা আজ কালের ছেলেরা বাছা, কথা মোটেই শোনে না। বলি তোর অমন সুন্দর বউ। ফুটফুটে চাঁদপানা ছেলে মেয়ে! আর কি চাস্? হোলেই বা রঙ শ্যামবর্ণ। গৃহস্থ ঘরের বউ ত আর রূপ দেখিয়ে বিকোবে না। কি জানি মা! বাঁচলে আরো কত দেখব। গৌর হে! তোমারই কৃপায় গঙ্গায় হাড় কখানা পড়লে নিশ্চিন্তি হই।”

গাড়ি বিদায় করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখাইয়া তিনজনে পাশের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। চারুবাবু প্রথমে কথা কহিলেন; বলিলেন, “মণিলাল কি করছো তা একটু ভেবে দেখেছ কি? এ কাজ করা কি তোমার উচিত হচ্চে?”

“আজ্ঞে মাথার খেয়ালে এ কাজে নেমেছি। এখন এতদূর এগিয়েছে যে বিবাহ বন্ধ হ'তে পারে না।”

“বল কি তুমি! তুমি আবার বিয়ে করবে? আমার কন্যার কি দোষে তাকে ত্যাগ করবে?”

“আমি তাকে ছাড়বো কেন? এ শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হ'লে তাকে ত্যাগ করবার কোনও কারণই দেখিনা!”

“কি বলছ তুমি বুঝতে পারছি না! তুমি অপূর্ব্বর ভগ্নীকে বিবাহ কর্ত্তে পাবে না।”

“তার বিবাহের সব স্থির। নিমন্ত্রণ-পত্র পর্য্যন্ত ডাকে গিয়েছে। আপনিও তাই পেয়ে এসেছেন। এখন বিবাহ না হ'লে কতদূর লজ্জা ও অপমানের কথা তা আপনি ভেবে দেখুন। অপূর্ব্ব আমার ভাইয়ের অধিক বন্ধু। আপনি যদি তাকে রাজি করতে পারেন ত আমার কোনো আপত্তি হবে না।”

“আমি এখনি গিয়ে তাঁর হাতে পায়ে ধরি। চল্ মলয়! তুইও চল্। মণিলাল তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।”

"অত তাড়াতাড়ি কেন? অপূর্ব্বকে সংবাদ দিচ্ছি, আমরা সকলে এক ঘণ্টা পরে যাব।"

"আচ্ছা বাবা! তাই কর। আমার বুদ্ধিতে কিছু কুলিয়ে উঠ্ছে না।"

শ্যামাঙ্গিনী প্রথমে যাইতে রাজি হয় নাই। সে যাইলে অপর পক্ষের মন গলিতে পারে এই বুঝাইয়া মণিলাল তাহাকে মলয়ের দ্বারা সম্মত করাইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্বর বৈঠকখানা

একঘণ্টা পরে মণিলাল সপরিবারে বন্ধুর বাসা-বাটীর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পঁহুছিল। কক্ষের একাংশে আশীর্ব্বাদের তত্ত্ব সাজান ছিল। অপূর্ব্ব চারুবাবু প্রভৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, বাহিরের কোন ভদ্র-লোক এখনও আসেন নাই। প্রাতঃকালেই প্রথমা স্ত্রীর আবির্ভাবের কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল। সকলেই একটা গোল-যোগের আশঙ্কায় উৎকর্ণ হইয়া নিজ নিজ গৃহে বসিয়া ছিল। কেহ সাহস করিয়া হাকিমের বাসায় যায় নাই।

রোশনচৌকীর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। অন্দরে বীণাপাণি জোরে শাঁখ বাজাইয়া শ্যামাকে লইতে বাহিরে আসিল। গাড়ী হইতে হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইতে যাইতে বলিল, "মনে কিছু কোর না ভাই। তোমরা যখন সকলে এসেছ সব ভালই হবে। মণিবাবুর বিয়ের মতলব শেষে যা দাঁড়ায় দেখে দুজনে আমরা হেসে বাঁচব না, এ তুমি দেখে নিও।"

বাসন্তী লজ্জায় নিকটে আসিল না। শ্যামা তাহাকে বর্দ্ধমানে দেখিয়াছিল। সেও তাহাকে দেখিতে চাহিল না।

অপূর্ব্ব সকলকে সমুচিত আদর করিয়া বসাইল। চারু-বাবু বলিলেন, "বাবা, তুমি আমার পুত্রস্থানীয়! তুমি মণিলালের কথায় কেমন ক'রে এ বিবাহের ব্যবস্থা করলে?"

"কি করি বলুন? তার এ অনুরোধ উপেক্ষা করবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনাদিগকে পূর্ব্বে জানালে মত পেতেম না। এখন যেমন এগিয়েছে নির্দ্ধারিত দিনে বাসির বিয়ে দিতেই হবে।" বলিয়া সে একবার সকলের মুখ দেখিয়া লইল। মলয়ের মুখ লাল। মণিলালের মুখ পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল। চারুবাবুর মুখ হতাশার ছায়ায় বিবর্ণ!

অতিকষ্টে চারুবাবু বলিলেন, "তোমার অবস্থা বেশ বুঝি, কিন্তু মণিলালের দ্বিতীয় বিবাহ হ'লে কেউ কি বাস্তবিক সুখী হবে? মণিলাল খেয়ালের বসে কি ক'রে বসেছে। এখনও পথ বন্ধ হয় নি। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার ভগ্নীর উৎকৃষ্ট পাত্র পাবে, তুমি আমাকে অভয় দাও।"

"আপনি আশীর্ব্বাদ করলে তার ঐ দিনই বিয়ে হবে। আমি আপনার শরণ নিচ্ছি। আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা করুন, বাসন্তীকে মলয়ের হাতে দিতে অনুমতি দিন।"

"বাবা! সে সৌভাগ্য কি আমার হবে!"

"আপনি ইচ্ছা করলেই—"

টং টং করিয়া সাতটা বাজিল। শুভ সময় উপস্থিত।

"অনুমতি করুন তাহলে শিরোমণি মহাশয়কে ডেকে পাঠাই?"

"ভগবান সাক্ষী আমি মত দিলাম।"

পাশের ঘরে বীণাপাণি নিকটস্থ শাঁখ তুলিয়া জোরে তিনবার বাজাইল। অপূর্ব্ব ডাকিল "পাঁচু! পাঁচু!"

"হুজুর।" একমুখ হাসি লইয়া পঞ্চানন হাজির।

"যা! শিরোমণি মশায় ও আর আর ভদ্রলোকদের শিগ্‌গির ডেকে আন। আশীর্ব্বাদের সব ঠিক; সময় হয়েছে।"

"যে আজ্ঞা!"

মণিলাল তাহার বাটী হইতে কন্যার আশীর্ব্বাদী তত্ত্ব আনিতে গেল। সেখানে সব প্রস্তুত ছিল। শুভক্ষণে শিরোমণি মহাশয় পাত্র কন্যা উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে উভয়ের গাত্রহরিদ্রা হইল।

চারুবাবু জ্যেষ্ঠপুত্রকে সবিস্তারে এক তার দিলেন। বিবাহের পর দিন তাঁহারা সকলে বরকন্যা লইয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। 'তোমার মাতাকে জানাইও পিতার লাখটাকার অর্দ্ধেক কন্যা পাইয়াছে।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ফুলশয্যা

ফুলশয্যার রাত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ফুলের রাশির মধ্যে শায়িত মলয় বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা, করিল, "বাসন্তী! তোমারসঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?"

"মণিদা আপনার কে?"

"সে-কথা কেন? ভগ্নীপতি জান ত।"

"আমি তাঁর বাগদত্তা জানেন ত।"

মলয় তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। বাহিরে বীণাপাণি ও শ্যামার চাপা হাসি শুনা গেল।

আকাশ আজি চাইছে

শ্রীউমা দেবী

আকাশ আজি চাইছে মুখে মুক্ত মেঘহীন,
তপ্ত হাওয়া মাঠের বুকে বইছে সারাদিন।
আমার ঘরের আঙিনাতে
রোদ এসেছে নেমে,
ক্লান্ত ঘুঘু গাইতে গান
হঠাৎ গেছে থেমে।
বাবলা শাখে ফুল ধরেছে একটি দুটি ক'রে,
শান্ত দুপুর; স্তব্ধ আকাশ গন্ধে আছে ভ'রে।
কোন্ সে বাণী বলব ব'লে
আকুল হোল মন,
ব্যাকুল আঁখি কাহারে আজ
খোঁজে সারাক্ষণ।
মাঠের বুকে গরু চরে, রাখাল ছেলের বাঁশি
কোন্ সুরেতে গান ধরেছে করুণ উদাসী।
শ্রান্ত মাথা পড়ছে ঢ'লে
কাহার বাহু-আশে,
স্বপ্নসম চোখের কোলে
দু'টি নয়ন ভাসে।

সিংহের মুখোমুখি

সাহসিকার বর্ণনা

মিঃ একিলি একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্। তিনি আফ্রিকায় থেকে জীবজন্তু সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ পর্যালোচনা করেছেন এবং একটি যাদুকরে তাঁর নিজ হাতের জীবজন্তুদের নানাপ্রকার উৎকীর্ণ মূর্ত্তি সংগৃহীত আছে। তাঁর স্ত্রীই তাঁর অনুচারিণী ও সহকর্ম্মিণী। স্বামীর সঙ্গে আফ্রিকায় থাকবার কালে তিনি তাঁদের বিপজ্জনক দুঃসাহসিক কার্য্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিচ্ছেন

"যে-চাকরটা আমার স্বামীর বন্দুক আগ্‌লাত, সে একদিন উঠে' প'ড়ে লেগে গেল যে তাদের দেশে—টান্‌গানিকা-য় যেতে হবে সিংহশিকারে। আফ্রিকার কালো বন, সিংহের গর্জ্জন,—যেন আমার মুখোমুখি ব'সে বিশ্রাম্ভালাপ কর্‌ছে—ভাবতে গা শিউরে উঠল। তবু বেরিয়ে পড়্‌লাম।

ভোর বেলা। আকাশ একেবারে গাঢ় নীল।—গায়ে মোটা সোয়েটার ও তার ওপর টপকোট্ এঁটে মোটর হাঁকিয়ে চলেছি। তাঁবু থেকে তিন চার মাইল এগিয়ে এসেই দেখলাম অনেক-গুলি হায়েনা—গুণে' দেখলাম আটত্রিশটা—একটা সদ্যমৃত বন্য জন্তুকে নিয়ে কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি লাগিয়েছে। যেন মহোৎসব! কিন্তু আমাদের চক্ষু স্থির!

পথহীন বিজন বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি,—খাল পেরিয়ে যেতে হচ্ছে;—কাঁটা আর আগাছায় ভরা আমাদের পথ। এই খালের পারে আগাছার আড়ালেই সিংহেরা বাসা বেঁধেছে।

উদাসীন নির্ব্বিকার সিংহ! একবার তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করে না, দু পা হেঁটে একটু বেড়িয়ে নেয়

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শুধু, তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে জিরোয়। সংসারে ওর ভয় করবার কিছুই নেই। মৃত্যুকেও ও অবহেলা করে।

সিংহ যেন ঘাসের ওপর গা বিছিয়ে আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিল। আমরা যেন ওর নিমন্ত্রিত অতিথি। কিন্তু আমাদের ওর পছন্দ হ'ল না বুঝি। ঘাড় ফিরিয়ে চ'লে গেল। আমি ওর গর্ব্বিত পদপাতের দিকে চেয়ে রইলাম,—ওর প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বুকে যেন প্রতিধ্বনি জাগে।

চাকর বাঁল্ কিন্তু খুসি হয় নি। বল্লে,—ওটা ছাই, কেশর নেই! ওকে মারা যা, ছুঁচো মারাও তাই।

হঠাৎ জিরাফের ভিড়ের মধ্যে এসে পড়লাম। যৌবন-দৃপ্ত দীর্ঘগ্রীব জিরাফ,—সঙ্গে কয়েকটি নাবালকও আছে। রৌদ্র গায়ে এসে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। ছোট শিশু কয়টি চোখ বুজে' ঝিমুচ্ছে। ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল।

তিনটা সিংহ আমাদের জন্য ওৎ পেতে ব'সে আছে। চোখে মুখে বেশ একটা প্রতিজ্ঞার ভাব,—ওরা এতক্ষণ আমাদের সম্বন্ধেই পরামর্শ করছিল বোধ হয়। আমরা এগোলাম। রোমাঞ্চকর শুভদৃষ্টি!

হঠাৎ ওদের মধ্যে এক সিংহী এসে আবির্ভূত হ'ল। দেখ্‌লাম ওরই রাগ বেশি। সব চেয়ে ওই বোধ করি বেশি পতিব্রতা। তাই হঠাৎ থাবা তুলে ছ'পায়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সাবধান ক'রে দিল। চমৎকার! রাণীর মতই লাবণ্য, রাণীর মতই মহিমা। ক্যামেরাটা টিপে দিলাম।

এমন দৃশ্য বোধ করি জীবনে আর দেখিনি। আমরা আক্রমণের অযোগ্য ভেবেই হয় ত' অভিমানিনী সিংহী ব'সে পড়্‌ল। কিন্তু কি ভেবে ফের উঠে প'ড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগল,—দুই চোখ জ্বেলে যেন আমাদের গিলে ফেল্‌ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌তে লাগল,—অতি ধীরে ধীরে। মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। সুনিশ্চিত মৃত্যুর মত নিঃশব্দপদচারে কাছে আস্‌ছে। রাণীর মত মহীয়সী!

কার্ল্‌ য়্যাকিলি কৃত সিংহের ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি

স্বামী বল্লেন,—আর যদি এক পা এগিয়ে আসে, ছুঁড়ব গুলি—

মোটরের হর্ণে, এঞ্জিনে আওয়াজ ক'রেও সিংহীকে বোঝানো গেল না,—নিজে নিজেই ফিরে গেল।

স্বামী বল্লেন—ওকে মারতে হাত উঠ্‌ছিল না।

তার জন্যই হয় ত'। কিন্তু কি দুর্দ্দান্ত ওর সাহস,—সত্যিই কত সুন্দর ভয়ঙ্করতা! মনে ছাপ রেখে যায়।
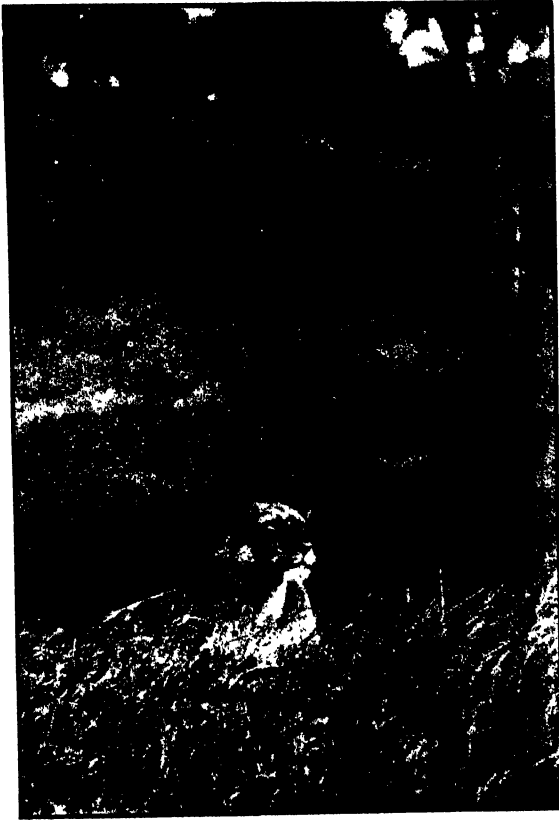
পশুরাজ

ওকে গুলি মারা হয়নি, বিশেষ ক'রে ওকে,—যেন একটা মহৎ কাজ করা হয়েছে।

শ'য়ে শ'য়ে জেব্রা—ওদের মধ্যে পথ হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। আসন্ন মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে ওদের গায়ে নানা রঙের খেলা চলেছে—চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

হঠাৎ স্বামী শুধোলেন—গাছের নীচে কী ওটা? গাছের গুঁড়ি হয় ত। চল, ওখানে ব'সে কিছু জলযোগ করা যাক্।

গুঁড়িই বটে!—একটা সিংহ লোলুপ চক্ষু প্রসারিত ক'রে চেয়ে আছে,—কিন্তু কি মহিমাব্যঞ্জক!

জীবনে সিংহশিকার করাই আমার একমাত্র কাম্য ছিল,—এখন মনে হচ্ছে, কাজ নেই। সিংহ বোধ হয় মৃত্যুর চেয়েও বড়ো,—শুধু বিভীষিকায় নয়, মহিমায়।

ভয় হচ্ছিল ব'লেই কি হাত গুটিয়ে নিচ্ছিলাম? না, খুব বেশি ভালো লাগছিল ব'লে। সিংহ যেন আমারই হাতে ধরা পড়তে চায়,—মাথা নীচু ক'রে কাঁটা-ঝোপের মধ্যে চুপ ক'রে দাঁড়াল।—চমৎকার ওর কেশর!

স্বামী কানে কানে বল্লেন—ছোঁড় গুলি—

আঙুলগুলিতে যেন সুমধুর একটা উত্তেজনা বোধ করলাম,—দিলাম ঘোড়া টিপে। সিংহ কয়েক হাত দূরে লাফিয়ে উঠে একেবারে আমাদের দিকে তেড়ে এল। আবার ছুঁড়লাম। শূন্যে একবার ছট্‌ফট্ ক'রে নিঝুম হ'য়ে গেল।

ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে ওকে আরো কাছে থেকে দেখি। স্বামী বল্লেন—মরা সিংহ বেঁচে উঠতে কতক্ষণ?

আমিও তাই ভাবছিলাম। দুই গুলিতে কখনো সিংহ মরে?

কিন্তু আমার কপালজোর আছে! দুই গুলিতেই ও সাবাড়। ওর আর কিছু নেই।

লম্বায় ন' ফিট্ ছ' ইঞ্চি,—ওজন চারশো পঁচাত্তর পাউণ্ড। পাঁশুটে চামড়া,—সমস্ত গায়ে ক্ষতের চিহ্ন। পুরাকালের যোদ্ধা!—অনেক ঝড় জল সয়েছে। আজ সকালেই বোধ হয় কোথাও যুদ্ধ ক'রে এসেছে,—পেছনের একটা পা খানিকটা কাটা, ঘা-টা টাট্‌কা,—ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এ সব আমার গুলিতে নয়—আমার গুলি ওর বুকের মধ্যে!

দশ কি বারো বছর বয়স। আধখানা জেব্রা ধরতে পারে এত বড় পাকস্থলী,—এখন যেন শুকিয়ে চিম্‌টে হ'য়ে এসেছে! হয় ত' খাবার সংস্থান করবার জন্যই সকালবেলা কার সঙ্গে মারামারি করেছে। কে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিংহের বাসা

মৃত সিংহের উদ্দেশ্যে শান্তি-স্তব
কার্ল য়্যাকিলি কৃত ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি

জানে,—হয় ত' বা কোন্ সিংহীর হৃদয় হরণ করবার জন্য, তার প্রেমলাভের আশায়। কেন না যে সিংহীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হ'ল তার সেই বলিষ্ঠ সুন্দর আকৃতি কোন্ সিংহবরকে প্ররোচিত বা প্রবুদ্ধ কর্‌বে না?

ওর চাম্‌ড়ার দিকে চেয়েই কিন্তু ওর শক্তির অনুমান চলে। তাই জীবজন্তুর চাম্‌ড়া সংগ্রহ করতে স্বামীর কেন এত আনন্দ, এত দিনে বোঝা গেল! তাঁর যাদুঘরেরই বা কী সার্থকতা!

স্বামী বল্লেন—ওকে আমি জীবন্ত ক'রে প্রতিমূর্ত্ত করব।

আরো বল্‌ছিলেন—সিংহ সব চেয়ে ভদ্রলোক, শিষ্টাচারী।

সিংহ সম্বন্ধে এই তাঁর শেষ কথা।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মন্দিরের দেশ

বলি

বলি প্রাচ্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত যাভার পূর্ব্ব-প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র রমণীয় দ্বীপ। পাশ্চাত্য ভৌগলিকগণ কর্তৃক Little Java বলিয়া কথিত। এই দ্বীপ বৃহত্তর ভারতের অংশ। ভারতীয় আর্য্যেরা আসিয়া এই স্থানকে সভ্যতালোকমণ্ডিত করেন। আর্য্য-সভ্যতার অনেক নিদর্শন ইহাদের নামে ও কার্য্যে, আচার-ব্যবহারে, ভাষা-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহারা প্রাচীন

পূর্ব্বে এই দ্বীপ রাক্ষস-অধ্যুষিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু প্রায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মজপহিত হইতে কতকগুলি হিন্দু আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদের বংশ উচ্চ জাতি বলিয়া গণ্য ও ও তাহারা wong Majapahit বলিয়া অভিহিত। আদিম অধিবাসীরা বলি-অগ (Bali-Aga) নামে অভিহিত। তাহারা গ্রামে বাস করে। অধিবাসীদিগের শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি যাভা ও মলয়বাসীদিগের অনুরূপ। কিন্তু বেশভূষায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহারা আধুনিক জীবনযাত্রাপ্রণালী ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত

'সারং' পরিহিতা বলিদেশীয় বালিকা

ভাবের এত ভক্ত যে ইহাকে প্রাচীনকালের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দ্বীপে আসিলে মনে হয় যে অকস্মাৎ কোন এক যাদুমন্ত্রবলে রহস্যময় অতীত যুগে পৌছান গিয়াছে।

এই দ্বীপের অধিকাংশ স্থান গিরিমালা-বিভূষিত। স্থান বিশেষে ৪ হাজার হইতে ১০ হাজার ফীট উচ্চ। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। ইহা এখন ওলন্দাজদিগের অধীনে। পরিসর দৈর্ঘ্যে ৯০ মাইল, প্রস্থে ৫০ মাইল। ধান্য, কলাই, ভুট্টা, তুলা, কমলালেবু, কফি ও চাউল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

হয় নাই! তাহাদের রীতি-নীতি ও পোষাক অদ্ভুত। বলিবাসীরা দেশরীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করে ও প্রাচীন রীতি-নীতি ও প্রথা মানিয়া থাকে। Singaradjah ও অন্যান্য নগরে পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসায় তথায় রমণীরা কতক পরিমাণে আধুনিক 'ফ্যাসানে' বস্ত্রাদি পরিধান করে। কিন্তু গ্রামে শুধু 'বেটিক' নির্ম্মিত 'সারং' ব্যবহৃত হয়।

এই দ্বীপ-সাম্রাজ্য আটটি সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত। এক এক ভাগে এক এক জন লোক শাসনকর্তৃরূপে নিযুক্ত আছে। উহারা ৮ লক্ষ লোকের উপর শাসন করে। অধিবাসিগণ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

যাভাবাসী অপেক্ষা উন্নত, সভ্যতা ও শাস্ত্রজ্ঞানে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এক সময়ে তাহারা যাভার ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কাতর হয় নাই। এই দ্বীপের সংস্পর্শে ওলন্দাজরা প্রায় ১৫৯৭ খ্রীঃঅঃ আসে। তৎসময়ে স্থানীয় রাজাদিগের সহিত দাস সংগ্রহ করিয়া দিবে বলিয়া ওলন্দাজরা এক রফা করে। দাস প্রথা তখন সুপ্রচলিত ছিল। বন্দী, শত্রু, চোর ও যোগীদিগকে দাসরূপে বিক্রীত করা হইত। ১৭৭৪ খ্রীঃঅঃ বাতাবিয়ায় সংকলিত সরকারী হিসাবনিকাশে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই সময়ে বাতাবিয়া নগরে ও তাহার চারি পার্শ্বে বলিবাসী দাসের সংখ্যা ১৩,০০০ এর কম হইবে না। যাভায় ব্রিটিশ-অধিকারের সময় (১৮১১-১৬খ্রীঃঅঃ) এই দাস প্রথা রদ হয়। এই দাস প্রথার জন্য ওলন্দাজেরা এই উপনিবেশ সমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইলে অধিবাসীরা তাহাদিগকে অবিশ্বাসের চোখে দেখিত। পরে ১৮৩৯ খ্রীঃঅঃ দেশীয় রাজগণ ওলন্দাজদিগের সহিত এক চুক্তি-পত্রে (agreement) তাহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে এই চুক্তি-পত্র লঙ্ঘন করায় তাহাদের বিরুদ্ধে তিন বার অভিযান প্রেরিত হয়। ইহার ফলে ১৮৪৯ খ্রীঃঅঃ ওলন্দাজদিগের প্রভুত্ব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ বলি ও লম্বক দ্বীপকে এক বিভিন্ন রেসিডেন্সিতে পরিণত করা হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ অঃ চীনেদের এক দ্বি-মাস্তুলের জাহাজ ইহার উপকূলে আটক পড়ায় লুণ্ঠিত হয়। তজ্জন্য ওলন্দাজরা ক্ষতিপূরণ চাওয়ায় পর পর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহা দমন করিবার জন্য অভিযান পাঠানর ফলে এই দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হয়।

বলিবাসীদিগের অধিকাংশ হিন্দু ও অল্প বৌদ্ধ। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে নতুন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহারা শিব-উপাসক। কিন্তু কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও অন্যান্য অসংখ্য দেবতা তাহারা মানিয়া থাকে। এই স্থানে মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বলিয়া 'মন্দিরের দেশ' (The Land of Shrines) বলিয়া কথিত হয়। 'গুনুঙ্গ, অগুঙ্গ' পর্ব্বতপাদমূলে বাসুকির মন্দির সর্ব্বপ্রধান। প্রধান মন্দির সমূহে রাজাগণ প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনায় পূজা দিয়া থাকেন। এখানে মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে পুরুষেরা নির্লিপ্ত। তাঁহাদের ধারণা, ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের কার্য্যের অঙ্গ; তাহারা ইহার সমুদয় অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে। পূজাকালে রমণীরা জরীর সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়া, পূজোপহারের নিমিত্ত মিষ্টান্ন ও ফলসম্ভারে পূর্ণ ডালা মাথায় করিয়া, ফুলে কেশপাশ ঢাকিয়া বেদীর সোপান-শ্রেণী বাহিয়া উঠে ও অবনত হইয়া প্রণাম করে, পুরোহিত তাহাদের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করে, কখন বা গান গায় ও উপহার-সামগ্রীর উপর শান্তি-বারি সিঞ্চন করে। অদ্ভুত মূর্ত্তি-খোদিত বেদী, দেবতার পাদমূলে নিবেদিত পূজার উপহারস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্যপূর্ণ ডালা সমূহ পূজার ফুলের কি এক মধুর অননুভূত সৌরভ—আর মাথার উপর নির্ম্মল মেঘশূন্য আকাশ। দূরে চারিপার্শ্ব নিবিড় অরণ্যানী পরিবেষ্টিত—মন্দির প্রাঙ্গণে রমণীরা অদৃশ্য দেবতার বন্দনায় রত।

দেশের পুরুষদের জাতীয় দেবতা—মোরগ। তাহারা অবসর বিনোদনের জন্য সর্ব্বদা মোরগের লড়াই দিতে নিযুক্ত থাকে। তাহারা বিড়াল ছানার মত ইহাদিগকে আদর যত্ন করে।

দেশের পুরুষদেয় জাতীয় দেবতা মোরগ। তাহারা অবসরবিনোদানর জন্য সর্ব্বদা মোরগের লড়াই দিতে নিযুক্ত থাকে। তাহারা বিড়ালছানার মত ইহাদিগকে আদর যত্ন করে। এই মোরগের লড়াই আইনের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু চারি ধারে এত মোরগ দেখা যায় ও ছায়া-শীতল রাস্তায় লোকে এত মোরগ বগলে নিয়া যাতায়াত করে, তাহাতে মনে হয় যে এই আইন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় না। 'লাইসেন্স' না লইয়া অনেক মোরগের লড়াই হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক টাকা ও 'সারং' বাজি রাখা হয়। এই মোরগের লড়াই ছাড়া পুরুষদের বিশেষ আর কোন কাজ নাই। তবে স্ত্রীলোকেরা চাষ করিবে বলিয়া কখন জমি তৈরী করে বা কখন কখন মাছ ধরে। স্ত্রীজাতি বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী।

সামাজিক প্রথার বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নাই। নারী শুধু সম্পত্তি মধ্যে গণ্য, এর অতিরিক্ত তাদের কোন সত্তা নাই। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যসম্পাদনে ও আত্মত্যাগে তাদের আগ্রহ ও ভক্তি অপরিসীম।

হিন্দুদিগের জাতি বিভাগ এখানে প্রচলিত। কিন্তু কোন সময়ে বেশী বাঁধাবাঁধি ছিল না। ইহারা চারি বর্ণে বিভক্ত,—ব্রাহ্মণ, সত্রিয় (ক্ষত্রিয়), বেশু (বৈশ্য) ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের উপাধি 'ইদা', সত্রিয়ের 'দেব' ও বেশুের গুষ্টি (গোষ্ঠী)। শূদ্রের সম্মানসূচক কোন উপাধি নাই। পূর্ব্বে কোন স্ত্রী বা পুরুষ অন্য কোন বর্ণে বিবাহ করিলে তাহাকে নিহত করা হইত। কিন্তু এখন উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ নিম্ন-শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে ও তাহাকে স্ব শ্রেণীতে উন্নীত করিতে পারে এবং সন্তানেরা পিতৃপদবী পাইয়া থাকে। তাহারা নিম্ন শ্রেণীর সমস্ত বস্তুই পরিহার করিয়া চলে। নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর ছেলেদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। শুধু উচ্চ বংশীয় ছেলেদের মাথা 'নেড়া' ও এক গোছা চুল তাহাদের চোখের উপর ঝুলিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে পোষাকের বালাই বড় বেশী নাই। উভয় শ্রেণীর মধ্যে অর্থের খুব কম পার্থক্য আছে।

ইহাদের ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দুত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। অক্ষর সংস্কৃত ছাঁদের পূর্ণ চিত্র—পলিনেশিয় ভাষার সংশ্রবে আসায় অনেকটা উচ্চারণদুষ্ট। 'রেগ', 'যজুর', 'সাম'

শব-যাত্রায় অর্থ ও জাতি পরিচয় সূচক অদ্ভুত মূর্ত্তি

কিন্তু নিম্নশ্রেণীর পুরুষ উচ্চ শ্রেণীতে বিবাহ করিতে সমর্থ হয় না।

বলি দ্বীপের ব্যবসার ভাষা অতি সহজ। উচ্চ শ্রেণীর সাধুভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এই ভাষা অতিশয় শক্ত কিন্তু মার্জ্জিত। ইতর সাধারণে যে ভাষা কহিয়া থাকে তাহা নিম্নশ্রেণীর ভাষা বলিয়া পরিচিত। Wong Madjapahit নামক উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের পুরাতন ভাষা ও জাতীয় আচার-ব্যবহারে বেশী আসক্ত— ও 'অর্ত্তব' নামে চারিখানি বেদ প্রচলিত। ব্যাস সংগ্রহ-কর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও বেদে অধিকার নাই। ভারতীয় অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নামে একখানি গ্রন্থ দেখা যায়। ইহারা শৈব বলিয়া ইহার এত আদর। এই পুস্তকের ভাষা সংস্কৃত শ্লোকাকারে লিখিত।

হিন্দুদিগের সতী প্রথা এখানে প্রচলিত ছিল। ওলন্দাজ-দিগের আবির্ভাবের রদ থেকে এই সহমরণ প্রথা রদ হইয়া

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

গিয়াছে। এই সম্পর্কে 'পতিমা'-র কথা কৌতূহলোদ্দীপক। 'পতিমা' বলি দ্বীপের এক রাজকুমারের পত্নীদিগের মধ্যে অন্যতম। রাজকুমারের মৃত্যুতে তিনি আরও ষোল জন সপত্নীসহ রাজকুমারের চিতায় সহমরণে যাইতে আদিষ্ট হন। কিন্তু পতিমার মরিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তখন তিনি নবযুবতী—জীবন তাঁহার কাছে তখনই অর্থহীন হইয়া যায় নাই। দড়িতে হাত পা বাঁধিয়া ফুলের মালায় সাজিয়া

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য নির্ম্মিত মঞ্চোপরি মৃতদেহ উত্তোলন

তাঁহাকে 'যাই আমি, যাই আমি হে স্বামী আমার', এই গান গাহিতে গাহিতে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে হইবে—তাহা তিনি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। পতিমা অন্যান্য সপত্নীদিগের সহযোগে দুর্গের প্রহরীদের 'বোকা' বানাইয়া রাত্রিকালে পলাইয়া গিয়া Singaradjahএ ওলন্দাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখন তাঁহার দোকান নগরীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ভ্রমণকারীরা বলির প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—রৌপ্যের ও কাঠের খোদাই ও জরীর কার্য্যবিশিষ্ট দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য পতিমার প্রসিদ্ধ দোকানে যাইয়া থাকে।

বলি দ্বীপের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ভারী অদ্ভুত। ইহাতে ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য দেখা যায়। এই ক্রিয়া অনুষ্ঠান ব্যয়বহুল ও কষ্ট সাপেক্ষ। সাধারণ লোকের দেহ মৃত্যুর পর সমাহিত হয়। কিন্তু ধনীদিগের বেলা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আত্মীয়স্বজনগণ মৃত দেহকে স্নান করাইয়া, চন্দন, কস্তুরী, দারুচিনি, এলাচ ও সুগন্ধি অনুলেপনাদির দ্বারা রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্যে এক উচ্চ মঞ্চ তৈরী হয় ও সেই মঞ্চোপরি মৃতদেহ রাখিতে হয়। এই উপলক্ষে জানোয়ারের কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি কাঠ ও কাগজে তৈরী করা হয় ও নানাবিধ ভীষণ ছবি আঁকা হয়। জানোয়ারের ছবি ও মূর্ত্তির আকার মৃত ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য ও উচ্চশ্রেণীর পরিচয়সূচক। পরে সমুদয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে সেই মঞ্চে আগুন দিয়া মৃত দেহ দাহ করা হয়। সাধারণতঃ এই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত শরৎকালে হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাব ইহাদের উপর বেশী পড়ে নাই। সিংগারদ্জ-এ চলচ্চিত্রের একটি থিয়েটার আছে, তবে দেশী লোকে ইহা দেখে না। তাহারা হাস্যরসপূর্ণ ছবির চেয়ে ত্রিশীর্ষ-মুকুট-শোভিত রাজকুমারীর মত দোদুল্যমান বস্ত্র পরিহিতা অল্পবয়স্কা নর্ত্তকীর সুন্দর আবর্ত্তিত দেহে বেশী সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।

যদি কোন পরিব্রাজক সুমাত্রা ও যাভা পরিদর্শন করিয়া এই নীলাম্বুবেষ্টিত হরিৎ দ্বীপ দেখিয়া চক্ষু সার্থক না করেন তবে তাহার ভ্রমণ অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। বলি দ্বীপকে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমুদ্র বক্ষ হইতে সূর্য্যোদয়কালীন বলির দৃশ্য ভারী চমৎকার। তীরে রক্তবর্ণ টালি নির্ম্মিত ওলন্দাজের গৃহ, দূরে হেলান তাল বৃক্ষের নীচে দেশীয়গণের পর্ণ কুটীর—আর পিছনে, দূরে পৃষ্ঠপটের মত গাঢ় নীল ও ধূমল বর্ণের গিরিশ্রেণী। এই দৃশ্যে নানাবিধ রঙের সমাবেশ দেখিয়া এক জন পাশ্চাত্য পরিব্রাজক বলিয়াছেন, "Bali is an Oriental

idyl in deep blue and purple, vivid green and soft manve."

হরিদ্বর্ণের নয়নস্নিগ্ধকর: ঢেউখেলানা ধানের ক্ষেত, পশ্চাতে ধূমলবর্ণের গিরিশ্রেণী ও তীরে শুভ্রফেনপুঞ্জময় নীল সাগর। সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান ধানের ক্ষেত শ্রেণীর পর শ্রেণী গিরিপার্শ্ব দিয়া চলিয়াছে। আর মাঝে মাঝে তালীবনকুঞ্জ ; ছোট নদীর নিকটে ছোট ছোট গ্রাম। স্থান নির্জ্জন ও শান্তিময়—ঢালু জায়গা হইতে সমুদ্র ও অনন্ত-বিস্তারিত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন এক বিস্তৃত চিত্রপটবিশেষ—তেলের রঙের আঁকা গ্রাম্য দৃশ্যের উপর যেন কোন রূপদক্ষ রঙ দিয়া ইহা তুলিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন মিতব্যয়ী ওলন্দাজের পরিশ্রমশীলতা ও স্বভাবের প্রাচুর্য্য এই স্থানের অধিবাসীদিগকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিয়াছে। জীবনযাত্রাপ্রণালী অত্যন্ত সাদাসিদে। ভিক্ষুকের সমাবেশ নাই। সকলের অভাবমোচনের জন্য প্রচুর চাউল, নারিকেল, মাছ ও গরু আছে—স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কাহারও জীবনযাত্রা কঠোর নহে—কিন্তু তাহারা ইহাতে অসন্তুষ্ট নহে।

এই হরিৎ দ্বীপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-কারী বলিয়াছেন—

"Here in Bali, almost intact, is a bit of antiquity, a life that has all but passed away from this money-mad world of ours. Here is a little Oriental, old-world paradise. Bali is Bali and nothing else."

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
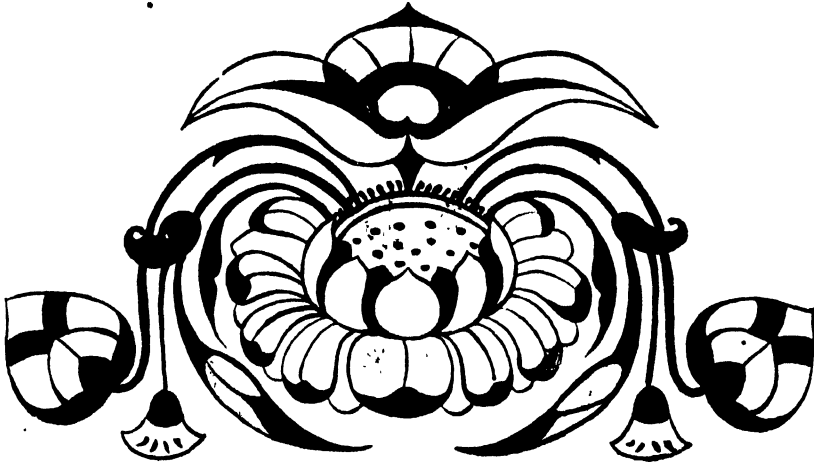
শরৎ-প্রশস্তি

গত ৩১ ভাদ্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ গৃহে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্ম-তিথি উপলক্ষে তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি বিরাট সভা হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের প্রতি হৃদয়ের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করবার জন্যে সভাস্থলে বহু সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যরসিক উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রশস্ত সভাগৃহ পুষ্প-মাল্য-পতাকায় ভূষিত এবং বিপুল জনসঙ্ঘে পূর্ণ হ'য়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করেছিল। মহনীয়র প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনও মহত্ত্বের একটা পরিচয়; নিজে বড় না হ'লে বড়কে বড় ব'লে বোঝা যায় না। সে দিনের শরৎ-প্রশস্তি সকলেরই মনে একটি সুমিষ্ট পরিতৃপ্তির রস সঞ্চারিত করেছিল।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী কর্ত্তৃক এই উপলক্ষে রচিত একটি সঙ্গীত শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, শ্রীমতী সাহানা দেবী প্রভৃতি দ্বারা গীত হইলে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রেরিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করা হয়।

"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা সভায় বাঙলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন-বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে, সে কথা স্মরণ করবার নানা উপলক্ষ সর্ব্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না, এও তারি মধ্যে একটা। বস্তুত আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ—এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত ক'রে তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয়-শিখরে আপন প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করছেন।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় শরৎচন্দ্রকে চন্দন-চর্চ্চিত ও মাল্য-ভূষিত করেন ও ধান্য-দূর্ব্বা সহকারে আশীর্ব্বাদ ক'রে উপঢৌকন সামগ্রীগুলি তাঁহাকে অর্পণ করেন। বিবিধ মান-পত্র এবং সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের উত্তরে শরৎচন্দ্র যাহা বলেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।—

"বন্ধুজনের সমাদর, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের প্রীতি এবং পূজনীয়গণের আশীর্ব্বাদ আমি সবিনয় গ্রহণ করলাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাওয়া কঠিন। নিজের জন্য শুধু এই প্রার্থনা করি, আপনাদের হাত থেকে যে মর্য্যাদা আজ পেলাম, এর চেয়েও এ জীবনে বড় কিছু আর যেন কামনা না করি। যে মানপত্র এই মাত্র পড়া হোল, তা আকারে যেন ছোট, আন্তরিক সহৃদয়তায় তেমনি বড়। এ তার প্রত্যুত্তর নয়; এ শুধু আমার মনের কথা। তাই আমারও বক্তব্যটুকু আমি ক্ষুদ্র ক'রেই লিখে এনেচি।

এই যে অনুরাগ, এই যে আমার জন্মতিথিকে উপলক্ষ ক'রে আনন্দ প্রকাশের আয়োজন—আমি জানি, এ আমার ব্যক্তিকে নয়। দরিদ্র-গৃহে আমার জন্ম, এই তো সে দিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জ্জনেই ব্যাপৃত ছিলাম; সে দিন পরিচয় দিবার আমার কোন সঞ্চয়ই ছিল না, তাই তো বুঝতে আজ বাকি নেই—এ শ্রদ্ধা-নিবেদন কোন বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়, উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া কোন অতীত দিনের গৌরবকে নয়, এ শুধু আমাকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষদের শ্রদ্ধা-নিবেদন।

জানি এ সবই। তবুও যে সংশয় মনকে আজ আমার বারম্বার নাড়া দিয়ে গেছে সে এই যে, সাহিত্যের দিক দিয়েই এ মর্য্যাদার যোগ্যতা কি আমি সত্যই অর্জ্জন করেছি? কিছুই করিনি, এ কথা আমি বলব না। এত বড় অতি-বিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস করতে আমি নিজেকেও

চাইনে, আপনাদেরও না। কিছু আমি করেছি। বন্ধুরা বলবেন, শুধু কিছু নয়, অনেক কিছু। তুমি অনেক করেছ। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যারা নন, তাঁরা হয় ত একটু হেসে বলবেন, অনেক নয়, তবে সামান্য কিছু করেছেন। এইটি সত্য এবং আমিও তাই মানি। কিন্তু তাও বলি যে, সে সামান্যের ঊর্দ্ধস্থ বুদ্বুদ আর অধঃস্থ আবর্জ্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট যা থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়।

এ যাঁরা বলেন, আমি তাঁদের প্রতিবাদ করিনা। কারণ, তাঁদের কথা যে সত্য নয়, তা কোন মতেই জোর ক'রে বলা চলে না। কিন্তু এর জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসে নি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্ত্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হ'য়ে মিল্‌তে না পারে, পথ তাকে তো ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হ'য়েই যায়, সে শুধু এই জন্যেই যাবে যে আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্য্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হ'য়েছে। ক্ষোভ না ক'রে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো, আমার দেশে আমার ভাষার এত বড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক, যার তুলনায় আমার লেখা যেন এক দিন অকিঞ্চিৎকর হ'য়েই যেতে পারে।

নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে এক দিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আস্‌তে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষে ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখায় কোন দিন যেন না এত বড় অন্যায় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকে তা আমার অপরাধ ব'লেই গণ্য করেছে এবং যে অপরাধে আমি সব চেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভালো কি মন্দ, আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অধিক হয় কি না, এ বিচার ক'রেও দেখিনি—শুধু সে দিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না, এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হ'য়েও যায়—তা নিয়েও কারও সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাবো না। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হয়। হঠাৎ শুনলে মনে ঘা লাগে, তথাপি এ কথা সত্য ব'লেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনও নিত্যকালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত এরও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব চিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে। সেই মানবচিত্তই যে এক স্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকৃতে পায় না, তার পরিবর্ত্তন আছে, বিবর্ত্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্যবিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষ খুসি হ'য়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

মনে আছে দাশুরায়ের অনুপ্রাসের ছন্দে গাঁথা দুর্গার স্তব পিতামহের কণ্ঠহারে সে কালে কত বড় রত্নই না ছিল। আজ পৌত্রের হাতে বাসি মালার মত তারা অবজ্ঞাত। অথচ এতখানি অনাদরের কথা সে দিন কে ভেবেছিল?

কিন্তু কেন এমন হ'ল? কার দোষে এমন ঘটলো? সেই অনুপ্রাসের অলঙ্কার তো আজও তেম্‌নি গাঁথা আছে। আছে সবই, নেই শুধু তাকে গ্রহণ কর্‌বার মানুষের মন। তার আনন্দবোধের চিত্ত আজ দূরে স'রে গেছে, দোষ দাশু রায়ের নয়, তাঁর কাব্যেরও নয়, দোষ যদি থাকে কোথাও, সে যুগধর্ম্মের।

তর্ক উঠতে পারে, শুধু দাশু রায়ের দৃষ্টান্ত দিলেও ত চলে না, চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী তো আজও আছে;

কালিদাসের শকুন্তলা তো আজও তেম্নি জীবন্ত। জীবন্ত মানি। তাতে শুধু এই টুকুই প্রমাণিত হয় যে তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না, তার দোষ গুণেরও শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।

সমগ্র মানব জীবনের কেন, ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়মই বিদ্যমান। ছেলে বেলায় আমার ভবানী পাঠক ও হরিদাসের গুপ্ত কথাই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন কত রস, কত আনন্দই যে এই দুখানি বই থেকে উপভোগ করেচি, তার সীমা নেই। অথচ আজও সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ, বলা কঠিন। অথচ এমনিই পরিহাস, এমনি জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য উপন্যাসের ভাল মন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের পরেই। কিন্তু এ কি বিজ্ঞান ইতিহাস? এ কি শুধু কর্ত্তব্যকার্য্য, শুধুই শিল্প—যে বয়সের দীর্ঘতাই হবে বিচার করবার সব চেয়ে বড় দাবী?

বার্দ্ধক্যে নিজের জীবন যখন বিস্বাদ, কামনা যখন শুষ্কপ্রায়, ক্লান্তি অবসাদে জীর্ণ দেহ যখন ভারাক্রান্ত, নিজের জীবন যখন রসহীন, রসের বিচারে যৌবন কি বারবার দ্বারস্থ হবে গিয়ে তারই?

ছেলেরা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে যখন আমার কাছে উপস্থিত হয়—তারা ভাবে, এই বুড়ো লোকটার রায় দেবার অধিকারই বুঝি সব চেয়ে বেশী। তারা জানে না যে, আমার নিজের যৌবনকালের রচনারও আজ আমি আর বড় বিচারক নই।

তাদের বলি, তোমাদের সমবয়সের ছেলেদের গিয়ে দেখাও। তারা যদি আনন্দ পায়, তাদের যদি ভালো লাগে, সেইটেই জেনো সত্য বিচার।

তারা বিশ্বাস করে না, ভাবে দায় এড়াবার জন্যেই বুঝি এ কথা বলচি। তখন নিশ্বাস ফেলে ভাবি, বহু যুগের সংস্কার কাটিয়ে ওঠাই কি সোজা? সোজা নয় জানি, তবুও বোলব, রসের বিচারে এইটিই সত্য বিচার।

বিচারের দিক থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক থেকেও ঠিক এই এক বিধান। সৃষ্টির কালটাই হ'ল যৌবন কাল—কি প্রজা-সৃষ্টির দিক দিয়ে, কি সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম ক'রে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয় ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝ'রে পড়ে, তার উৎসমুখ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। অতঃপর রসের পরিবেশনে ক্রটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জান্‌বেন, তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।

আজ আমি বৃদ্ধ। কিন্তু বুড়ো যখন হইনি, তখন পূজনীয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, অনেকের সাথে ভাষা-জননার পদতলে যেটুকু অর্ঘ্যের যোগান দিয়েছি, তার বহুগুণ মূল্য আজ দুই হাত পূর্ণ ক'রে আপনারা ঢেলে দিয়েছেন। সকৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদের নমস্কার করি।"

পরিশেষে কাজি নজরুল ইসলাম রচিত একটি গান শ্রীমতী সাহানা দেবী কর্ত্তৃক গীত হওয়ার পর সভা সঙ্গ হয়।

পুস্তক-সমালোচনা

চিত্রবহা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বরদা এজেন্সি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৸৹।

সুবৃহৎ উপন্যাস। সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লেখা। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী যে সত্যের আঘাতে জাগিয়াছিল তাহারই একটা দিক কাহিনীর ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই উদ্দীপনার প্রথম উন্মেষ হইতে আজিকার দাহ-শেষ অঙ্গারদীপ্তি পর্য্যন্ত একটি প্রাণ-শিখার সমগ্র ইতিহাস এই উপন্যাসখানির নানা ঘটনা চরিত্র ও চিত্রের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নায়ক অমর সেই যুগের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত একটি স্বপ্নাতুর অথচ দৃঢ়চেতা একনিষ্ঠ যুবক। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যত কিছু মিথ্যাচার ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তার সারা প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন জাগিয়াছে, তেমনি সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা তার চেতনায় অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সহজ সরল জীবনযাত্রার আদর্শে উৎসাহিত একটি তরুণ হৃদয়ের স্বাধিকার লাভের আগ্রহ, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম, এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও পরিশেষে পরাজয়ের মধ্যেও একটি মহিমার আভাস—ইহাই এই উপন্যাসের ভাব-বস্তু। ভাষা স্বচ্ছ মার্জ্জিত ও অর্থপূর্ণ—কোনোখানে বাগ্‌বাহুল্য নাই। সংযত ও পরিমিত শব্দবিন্যাসে লেখকের লিখনভঙ্গি একটি অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছে। এই ভাষার দ্বারা রচনার গাঢ়তা উপলব্ধি হয়, এবং তাহা হইতেই লেখকের seriousness ও sincerity পাঠকের মনকে অধিকার করে। উপন্যাসখানি পড়িবার সময় মনে হয়, বাস্তবে ও কল্পনায়, সত্যে ও স্বপ্নে মিশাইয়া লেখক যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি সত্যকার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে।

কিন্তু উপন্যাসখানির শক্তি যেখানে ঠিক সেইখানে সেই কারণেই রসসৃষ্টির কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। যে নায়কটিকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসগত বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনা অর্থযুক্ত হইয়াছে, তাহার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাস্পৃহার মধ্যে একটি কঠিন moral প্রয়োচনা আছে। যে জগতে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার সকল চিত্র তাহারই মনের রঙে রঞ্জিত হওয়ায় সর্ব্বত্র একটা ব্যক্তিগত আদর্শের চাপে রসস্ফূর্ত্তির অন্তরায় হইয়াছে। এই Idealismএর প্রভাবে লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে দুইটি বিশেষ লক্ষণ প্রবল হইয়াছে, যাহা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ তাহার প্রসঙ্গে তীব্র ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এবং যাহা শ্রেয় ও প্রেয় তাহার প্রসঙ্গে একটি স্বপ্নময় ভাববিহ্বলতা। এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটিতেই লেখকের শক্তির পরিচয় পাই। প্রবল আদর্শনিষ্ঠা ও বাস্তবের তীব্র অনুভূতি এই দুয়ের মিশ্রণে, রচনায় এই শক্তি জন্মে। লেখকের সে শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। এই বস্তুতন্ত্রতার জন্যই তাঁহার উপন্যাস-রচনা সফল হইয়াছে। কিন্তু নিছক ভাব-কল্পনা ও আদর্শবাদে লেখক তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই—সমবেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক আছে বটে, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে যে detachment থাকা প্রয়োজন, তাহা না থাকায় রস তেমন গাঢ় হইয়া উঠে নাই।

তথাপি এই উপন্যাসখানি পাঠকসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এমন একখানি সত্যকার আবেগ, গভীর ভাবনা ও অনুভূতি পূর্ণ উপন্যাস আমরা পাঠ করি নাই। নির্ভীক সত্যবাদ, সর্ব্ব সংস্কার ভেদ করিবার সৎসাহস এবং সর্ব্বোপরি গভীর সহৃদয়তা ও উদার মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা এই উপন্যাসখানির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে।

বহিখানির ছাপা ও বাঁধাই যেমন পরিপাটি তেমনি সুন্দর হইয়াছে। প্রচ্ছদপটের উপর স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী যতীন্দ্র-কুমারের পরিকল্পনাটি গ্রন্থের মূলভাব ও তাহার নামটিকে

(চিত্রবহা অর্থে নদীবিশেষ) রেখায় ও বর্ণে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বেদে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ৯০।২ এ হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছ'টি বিভিন্ন নারী-সংস্পর্শঘটিত ঘটনা-স্রোত অবলম্বন ক'রে একটি অশান্ত অ-বশ্য পুরুষ-চিত্তের বৈচিত্র্যময় কাহিনী। সাধারণ উপন্যাসের আদি-অন্ত বাঁধা প্লটের মত এ উপন্যাসে তেমন কোনো বস্তু নেই, কিন্তু নিপুণ রচনা-ভঙ্গির আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে পাঠক-চিত্ত উপন্যাসের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত আগ্রহের একটানা স্রোতে ভেসে যায়। এই উৎকৃষ্ট উপন্যাসখানি লাভ ক'রে বাঙলা কথা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েচে তা'তে সন্দেহ নেই।

রাগ-রেখা

শ্রীতারানাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাব্লিশার্স, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এ বইখানি তুর্গেনিভের Virgin Soil উপন্যাসের বাঙলা অনুকার (adaptation)। পুরোদস্তুর অনুবাদ না হ'লেও বইখানি অনুবাদের নির্জ্জীবতা থেকে সব সময়ে মুক্ত হ'তে পারেনি; তা ছাড়া বইখানির মধ্যে এমন কয়েকটি বানান ভুল আছে যা ছাপার ভুল ব'লে মনে করা কঠিন; যেমন 'দুঃখিত' কথাটি যতবার চোখে পড়ল "দুঃখীত" রূপে ছাপা হয়েচে। এ নিশ্চয়ই অনবধানতাবশত হয়েচে—কিন্তু এরূপ ত্রুটি শিক্ষিত লেখকের পুস্তকে উপেক্ষণীয় নয়; প্রুফ সংশোধনের ভার যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে দেওয়া উচিত ছিল। সে যাই হোক, বিদেশের সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে সদ্‌বস্তু আহরণের দ্বারা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যে লেখক সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ।

স্বরলিপি দৃষ্টে হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ প্রণীত। প্রকাশক—ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স্, ৮নং ডালহাউসি স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য চার আনা মাত্র।

স্বরলিপি দেখে গান অথবা গৎ শেখবার প্রধান অন্তরায় মাত্রাবোধের অভাব। প্রথম শিক্ষার্থীরা মাত্রার দিকটা ঠিক রাখ্‌তে না পেরে স্বরলিপি-প্রদত্ত সঙ্গীতের মাধুর্য্য লাভ করতে পারেন না, অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে স্বরলিপি পরিত্যাগ করেন। এ বইখানি প্রথম শিক্ষার্থীর সেই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর করতে পারবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। সাধন-প্রণালীর উদাহরণ স্বরূপ বইখানির শেষে কয়েকটি গতের স্বরলিপি দেওয়া হয়েচে।

দাদার কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই বইখানি স্যার রাসবিহারী ঘোষের জীবন-কথা, তাঁর অনুজ কর্ত্তৃক লিখিত। স্যার রাসবিহারীর প্রতিভান্বিত জীবনের কাহিনীর চেয়ে তাঁর সাধারণ জীবনের কাহিনীই এ পুস্তকখানিতে অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়েচে। আমরা আশা করেছিলাম পুস্তকখানি আরো মূল্যবান তথ্যে সম্পন্ন হইবে। তবু বইখানি সুপাঠ্য—বড় জিনিসের ছোটও ভাল।

বইখানিতে চোদ্দ-পনেরোখানা ছবি দেওয়া হয়েচে।

নানা কথা

সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিক বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বহু বাঙ্লা সাময়িক পত্র ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'স্বারস্বত লাইব্রেরী' 'বান্ধব-সম্মীলনী' ও 'বান্ধব সমিতি'র তিনিই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মহাকালী পাঠশালা স্থাপনায় বাণীনাথের উদ্যোগ ছিল অনন্যসাধারণ,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার নিবিড় সংস্রব ছিল। তিনি বহুরূপে ঐ প্রতিষ্ঠানটির সেবা ও সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতি, অভিমানশূন্য অনাড়ম্বর জীবন, অবিচল কর্ম্মনিষ্ঠা ও অসাধারণ স্বদেশানুরাগ দেশবাসীর অন্তরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরকাল মহিমোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

এবার শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের নাটিকায় যে দুইখানি ছবি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা হরিমতি বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে অভিনীত 'আপদবিদায়' ও 'বাঁশির ডাক' ভূমিকায় লক্ষৌয়ের ছাত্র-বৃন্দের ছবি। অসিত বাবুর 'আপদ-বিদায়' 'বাঁশির ডাক' ও 'ফললাভ' এই তিনখানি নাটিকা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে

আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের একটি হাস্যরসাত্মক সচিত্র গল্প প্রকাশিত হইবে।

আগামী ছাব্বিশে কার্ত্তিক সূর্য্যগ্রহণ হইবে। লোকে নানা উপায়ে এই গ্রহণ দেখিয়া থাকে,—কেহ হাত মুঠো করিয়া আঙুলের ফাঁক দিয়া দেখে, কেহ বা হলুদ-গোলা জলে সূর্য্যের প্রতিফলিত ছায়া দেখে, কেহ বা সোজাসুজিই সূর্য্যের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করিয়া থাকে। এই সব উপায়ে সূর্য্যগ্রহণ দেখিতে গেলে চক্ষুর অনিষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়া সাধারণ সার্শির কাচে খুব পুরু করিয়া ভুষো মাখাইয়া তাহার ভিতর দিয়া চক্ষু সহজেই সূর্য্যের মুখোমুখি হইতে পারে। সূর্য্যকে তখন নয়নপ্রীতিকর কমলালেবুর রংয়ের একটি গোলার মতন দেখাইবে।

এই সংখ্যার 'রাজপুত-পাহাড়ী চিত্র-শিল্প' প্রবন্ধের চারখানা ছবি শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহ হইতে তাঁহার সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে বিচিত্রা প্রতি মাসের মধ্যভাগে বাহির হইবে।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta.
by Srijut Probodh Lal Mukherjee and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

তাহারে নাচাত প্রিয়া
করতালি দিয়া দিয়া।

শিল্পী—শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ | ষষ্ঠ সংখ্যা

মোহানা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইরাবতীর মোহানা-মুখে কেন আপন-ভোলা
সাগর তব বরণ কেন ঘোলা ?
কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া,
রবির পানে গভীর গান গাওয়া ?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠালে এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হোলো দিঠি ?
আকাশ সাথে মিলায়ে রঙ আছিলে তুমি সাজি,
ধরার রঙে বিলাস কেন আজি ?
রাতের তারা আলোক দিয়ে পরশ করে যবে
পায় না সাড়া তোমার অনুভবে ;
প্রভাত চাহে তোমার মাঝে নিজেরে দেখিবারে,
বিফল করি' ফিরায়ে দাও তা'রে ॥

নিয়েছ তুমি ইচ্ছা করি' আপন পরাজয়,

মানিতে হার নাহি তোমার ভয়।

বরণ তব ধূসর করো, বাঁধন নিয়ে খেলো,

হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেলো।

এ লীলা তব প্রান্তে শুধু তটের সাথে মেশা,

একটুখানি মাটির লাগে নেশা।

বিপুল তব বক্ষপরে অসীম নীলাকাশ,

কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ?

ধূলারে তুমি নিয়েছ মানি', তবুও অমলিন,

বাঁধন পরি' স্বাধীন চিরদিন।

কালীরে রহে বক্ষে ধরি' শুভ্র মহাকাল,

বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষ জাল॥

ইরাবতী সঙ্গম

বঙ্গসাগর

৭ কার্ত্তিক, ১৩৩৪
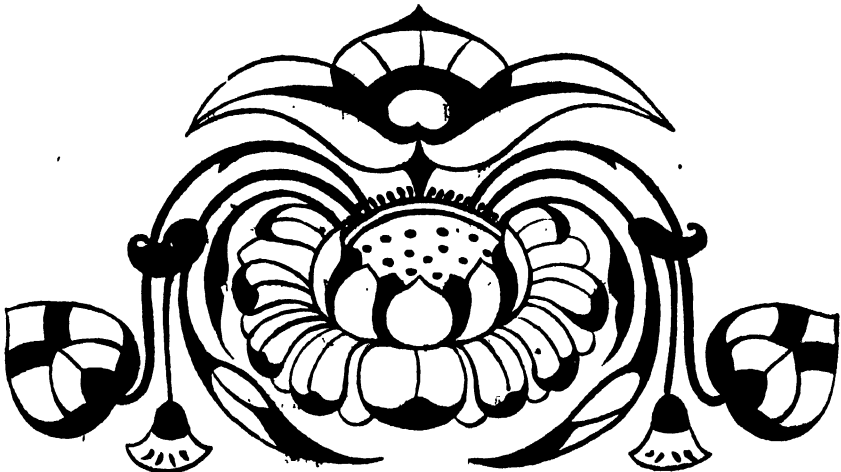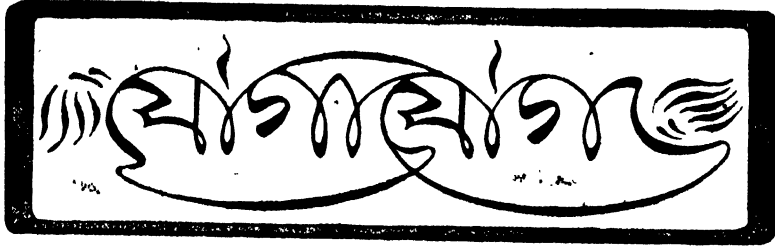
—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে একটা কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস বল্‌লে, "আসুন নবীন বাবু, এইখানে বসুন।"

নবীন বল্‌লে, "আমার পরিচয়টা পাননি বোধ হচ্ছে। মনে করেচেন আমি রাজবাড়ির কোন্ আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোট বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান ক'রে আমার আশীর্ব্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু করেচেন কি? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেচেন!"

"শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।"

কুমু ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "ঠাকুরপো চলো কিছু খাবে।"

"খাবো, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে। যতক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে প'ড়ে থাকবে।"

"সর্ত্তটা কি শুনি?"

"আমাদের বাড়িতে থাক্‌তেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাইনি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা' বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ঐতো সামনেই ঝুলচে।"

ভালো ছবি দৈবাৎ হ'য়ে থাকে, কুমুর ঐ ছবিটি তেমনি একটি দৈবের রচনা। কপালে যে আলোটি পড়লে কুমুর মনের চেহারাটি মুখে প্রকাশ পায়, সেই আলোটিই পড়েছিল। ললাটে নির্ম্মল বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে গভীর সারল্যের সকরুণতা। দাঁড়ানো ছবি। কুমুর সুন্দর ডান হাতটি একটা শূন্য চৌকির হাতার উপরে। মনে হয় যেন সামনে ও আপনারই একটা দূরকালের ছায়া দেখ্‌তে পেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েচে।

নিজের এই ছবিটি কুমুর চোখে পড়েনি। কলকাতা থেকে ছবিওয়ালা আনিয়ে বিবাহের কয়দিন আগে ওর দাদা এটি তুলিয়েছিল। তার পরে নিজের ঘরে ছবিটি টাঙিয়েচে, এইটেতে কুমুর হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে গেল। ফটোগ্রাফের কপি আরো নিশ্চয় আছে, তাই দাদার মুখের দিকে চাইলে। নবীন বল্‌লে, "বুঝতে পারচেন, বিপ্রদাস বাবু, বৌরাণীর দয়া হ'য়েচে। দেখুন না ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য ব'লেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।"

বিপ্রদাস হেসে বল্‌লে, "কুমু, আমার ঐ চামড়ার বাক্সয় আরো খানকয়েক ছবি আছে, তোর ভক্তকে বরদান করতে চাস যদি তো অভাব হবে না।"

কুমু নবীনকে খাওয়াতে নিয়ে গেলে পর কালু এল ঘরে। বল্‌লে, "আমি মেজবাবুকে তার করেছি, শীঘ্র চ'লে আসবার জন্যে।"

"আমার নামে?"

"হাঁ, তোমারি নামে, দাদা। আমি জানি, তুমি শেষ পর্য্যন্ত হাঁ-না করবে, এদিকে সময় বড়ো কঠিন হ'য়ে আসচে। ডাক্তারের কাছে যা' শোনা গেল, তোমার উপর এত চাপ সইবে না।"

ডাক্তার বলেচে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েচে, শরীর মন শান্ত রাখা চাই। এক সময়ে বিপ্রদাসের যে অতিরিক্ত কুস্তির নেশা ছিল এটা তারি ফল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েচে মনের উদ্বেগ।"

সুবোধকে এ রকম জোর তলব ক'রে ধ'রে আনা ভালো হবে কিনা বিপ্রদাস বুঝতে পারলে না। চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। কালু বল্‌লে, "বড়ো বাবু, মিথ্যে ভাবচ, বিষয় কর্ম্মের একটা শেষ ব্যবস্থা এখনি করা চাই, আর এতে তাঁকে না হ'লে চল্‌বে না। বারো পার্সেণ্ট সুদে মাড়োয়ারির হাতে মাথা বিকিয়ে দিতে পারবো না। তা'রা আবার দু'লাখ টাকা আগাম সুদ হিসেবে কেটে নেবে। তার উপরে দালালি আছে।"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "আচ্ছা আসুক সুবোধ। কিন্তু আসবে তো?"

"যত বড়ো সাহেব হোক্ না, তোমার তার পেলে সে না এসে থাক্‌তে পার্‌বে না। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু দাদা, আর দেরি করা নয়, খুকীকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, বল্‌লে, "মধুসূদন না ডেকে পাঠালে যাবার বাধা আছে।"

"কেন, খুকী কি মধুসূদনের পাটখাটা মজুর? নিজের ঘরে যাবে তার আবার হুকুম কিসের?"

আহার সেরে নবীন একলা এলো বিপ্রদাসের ঘরে। বিপ্রদাস বল্‌লে, "কুমু তোমাকে স্নেহ করে।"

নবীন বল্‌লে, "তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য ব'লেই ওঁর স্নেহ এত বেশি।"

"তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বল্‌তে চাই, তুমি আমাকে কোন কথা লুকিয়ো না।"

"কোন কথা আমার নেই যা আপনাকে বল্‌তে আমার বাধবে।"

"কুমু যে এখানে এসেচে আমার মনে হচ্চে তার মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।"

"আপনি ঠিকই বুঝেচেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।"

"অনাদর ঘটেচে তবে?"

"সেই লজ্জায় এসেচি। আর তো কিছুই পারিনে, পায়ের ধুলো নিয়ে মনে মনে মাপ চাই।"

"কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি?"

"সত্যি কথা বলি, যেতে বলতে সাহস করিনে।"

ঠিক যে কি হ'য়েচে বিপ্রদাস সে কথা নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে না। মনে করলে জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হবে। কুমুকেও প্রশ্ন ক'রে কোনো কথা বের করতে বিপ্রদাসের অভিরুচি নেই। মনের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কালুকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি তো ওদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করো, মধুসূদনের ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় কিছু জানো।"

"কিছু আভাস পেয়েচি, কিন্তু সম্পূর্ণ না জেনে তোমার কাছে কিছু বল্‌তে চাইনে। আর দুটো দিন সবুর করো, খবর তোমাকে দিতে পারব।"

আশঙ্কায় বিপ্রদাসের মন ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রতিকার করবার কোনো রাস্তা তার হাতে নেই ব'লে দুশ্চিন্তাটা ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিতে লাগল।

৫০

কুমু অনেকদিন যেটা একান্ত ইচ্ছা করেছিল সে ওর পূর্ণ হ'ল; সেই ওর পরিচিত ঘরে, সেই ওর দাদার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যে এলো ফিরে, কিন্তু দেখ্‌তে পেলে ওর সেই সহজ জায়গাটি নেই। এক-একবার অভিমানে ওর মনে হচ্চে যাই ফিরে, কেননা ও স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চে সবারই মনে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি রয়েচে, "ও ফিরে যাচ্চেনা কেন, কি হয়েচে ওর?" দাদার গভীর স্নেহের মধ্যে ঐ একটা উৎকণ্ঠা, সেটা নিয়ে ওদের মধ্যে স্পষ্ট আলোচনা চলেনা, তা'র বিষয় ও নিজে, অথচ ওর কাছে সেটা চাপা রইল।

বিকেল হ'য়ে আস্‌চে, রোদ্দুর প'ড়ে এল। শোবার ঘরের জানালার কাছে কুমু ব'সে। কাকগুলো ডাকাডাকি করচে, বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ আর লোকালয়ের নানা কলরব। নতুন বসন্তের হাওয়া সহরের ইঁটকাঠের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপর রঙ ধরাতে পারলে না। সামনের বাড়িটাকে অনেকখানি আড়াল ক'রে একটা পাত-বাদামের গাছ, অস্থির হাওয়া তারি ঘন সবুজ পাতায় দোল লাগিয়ে অপরাহ্ণের আলোটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছড়িয়ে দিতে লাগলো। এই রকম সময়েই পোষা হরিণী তার অজানা বনের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁওয়া লাগে, মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হ'য়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের দিকে। যা-কিছু চারিদিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে, আর যার ঠিকানা পাওয়া যায় নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রঙ যায় আকাশে ছড়িয়ে, মূর্ত্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জলস্থলের নানা ইসারার মধ্যে, মন তাকেই বলে সব চেয়ে সত্য। কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই করচে সব কিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে। কিন্তু এ কী বেড়া! আজ এ বাড়িতেও মুক্তি নেই। কল্পনায় মৃত্যুকেও মধুর ক'রে তুল্‌লে। মনে মনে বল্‌লে, কালো যমুনার পারে, সেই কালোবরণ, চলেচি তারি অভিসারে, দিনের পর দিনে—কত দীর্ঘ পথ কত দুঃখের পথ। মনে প'ড়ে গেল, দাদার অসুখ বেড়েচে—সেবা করতে এসে আমিই অসুখ বাড়িয়েচি, এখন আমি যা করতে যাব তাতেই উল্টো হবে। দুই হাতে মুখ চেপে ধ'রে কুমু খুব খানিকটা কেঁদে নিলে। কান্নার বেগ থাম্‌লে স্থির করলে বাড়ি ফিরে যাবে, তা যা হয় তাই হবে—সব সহ্য করবে—শেষকালে তো আছে মুক্তি, শীতল গভীর মধুর। সেই মৃত্যুর কল্পনা মনের মধ্যে যতই স্পষ্ট ক'রে আঁক্‌ড়ে ধরল ততই ওর বোধ হোলো জীবনের ভার একেবারে দুর্ব্বহ হবেনা, গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে লাগ্‌ল—

পথপর রয়নী আঁধেরী,
কুঞ্জপর দীপ উজিয়ারা।

দুপুর বেলা কুমু দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চ'লে এসেছিল, এতক্ষণে ওষুধ আর পথ্য খাওয়াবার সময় হয়েচে। ঘরে এসে দেখ্‌লে বিপ্রদাস উঠে ব'সে পোর্টফোলিয়ো কোলে নিয়ে সুবোধকে ইংরেজিতে এক লম্বা চিঠি লিখ্‌চে। ভর্ৎসনার সুরে কুমু তাকে বল্‌লে, "দাদা, আজ তুমি ভালো ক'রে ঘুমোওনি।"

বিপ্রদাস বললে, "তুই ঠিক ক'রে রেখেছিস্ ঘুমোলেই বিশ্রাম হয়! মন যখন চিঠি লেখার দরকার বোধ করে তখন চিঠি লিখ্‌লেই বিশ্রাম।"

কুমু বুঝলে, দরকারটা ওকে নিয়েই। সমুদ্রের এপারে এক ভাইকে ব্যাকুল করেচে, সমুদ্রের ওপারে আর এক ভাইকে ছট্‌ফটিয়ে দেবে, কি ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল তাদের এই বোন। দাদাকে চা খাওয়ানো হ'লে পর আস্তে আস্তে বললে, "অনেক দিন তো হ'য়ে গেল, এবার বাড়ি যাওয়া ঠিক করেচি।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে কথাটা কি ভাবের। এতদিন দুই ভাই বোনের মধ্যে যে স্পষ্ট বোঝাপড়া ছিল আজ আর তা' নেই, এখন মনের কথার জন্যে হাৎড়ে বেড়াতে হয়। বিপ্রদাস লেখা বন্ধ করলে। কুমুকে পাশে বসিয়ে কিছু না ব'লে তার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। কুমু তার ভাষা বুঝল। সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসার একটুও অভাব হয়নি। চোখ দিয়ে জল পড়তে চাইল, জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে। কুমু মনে মনে বল্‌লে, এই ভালোবাসার উপর সে ভার চাপাবে না। তাই আবার বললে, "দাদা, আমি যাওয়া ঠিক করেচি।"

বিপ্রদাস কী জবাব দেবে ভেবে পেলে না, কেননা, কুমুর যাওয়াটাই হয়তো ভালো, অন্তত সেটাই তো কর্ত্তব্য। চুপ ক'রে রইল। এমন সময় কুকুরটা ঘুম থেকে জেগে কুমুর কোলের উপর দুই পা তুলে বিপ্রদাসের প্রসাদ রুটির টুক্‌রোর জন্যে কাকুতি জানালে।

রামস্বরূপ বেহারা এসে খবর দিলে চাটুজ্জে মশায় এসেচেন। কুমু উদ্বিগ্ন হ'য়ে বল্‌লে, "আজ দিনে তোমার ঘুম হয়নি, তার উপরে কালুদার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে। আমি বরঞ্চ যাই, কিছু যদি কথা থাকে শুনে নিইগে, তারপরে তোমাকে সময় মতো এসে জানাবো।"

"ভারি ডাক্তার হয়েচিস তুই! একজনের কথা যদি আর একজন শুনে নেয় তাতে রোগীর মন খুব সুস্থির হয় ভেবেচিস!"

"আচ্ছা আমি শুনব না, কিন্তু আজ থাক্।"

"কুমু, ইংরেজ কবি বলেচে, শ্রুত সঙ্গীত মধুর, অশ্রুত সঙ্গীত মধুরতর। তেমনি শ্রুত সংবাদ ক্লান্তিকর হ'তে পারে, কিন্তু অশ্রুত সংবাদ আরো অনেক ক্লান্তিকর, অতএব অবিলম্বে শুনে নেওয়াই ভালো।"

"আমি কিন্তু পনেরো মিনিট পরেই আসব, আর তখনো যদি তোমাদের কথাবার্ত্তা না থামে তবে আমি তার মধ্যেই এস্‌রাজ বাজাবো—ভীমপলশ্রী।"

"আচ্ছা তাতেই রাজি।"

আধঘণ্টা পরে এস্‌রাজ হাতে ক'রেই কুমু ঘরে ঢুকল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের ভাব দেখে তখনি এস্‌রাজটা দেয়ালের কোণে ঠেকিয়ে রেখে দাদার পাশে ব'সে তার হাত চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েচে, দাদা?"

কুমু এতদিন বিপ্রদাসের মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল তার মধ্যে একটা গভীর বিষাদ ছিল। বিপ্রদাসের জীবনে দুঃখ তাপ অনেক গেছে, কেউ তাকে সহজে বিচলিত হ'তে দেখেনি। বই পড়া, গান বাজনা করা, দূরবীন নিয়ে তারা দেখা, ঘোড়ায় চড়া, নানা জায়গা থেকে অজানা গাছপালা নিয়ে বাগান করা প্রভৃতি নানা বিষয়েই তার ঔৎসুক্য থাকাতে সে নিজের সম্বন্ধীয় দুঃখ কষ্টকে নিজের মধ্যে কখনো জমতে দেয়নি। এবার রোগের দুর্ব্বলতায় তাকে নিজের ছোট গণ্ডীর মধ্যে বড়ো বেশি ক'রে বদ্ধ করেচে। এখন সে বাইরে থেকে সেবা ও সঙ্গ পাবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে, চিঠিপত্র ঠিকমতো না পেলে উদ্বিগ্ন হয়, ভাবনাগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে কালো হ'য়ে ওঠে। তাই দাদার পরে কুমুর স্নেহ আজ যেন মাতৃ-স্নেহের মতো রূপ ধরেছে—তার অমন ধৈর্য্য-গম্ভীর আত্মসমাহিত দাদার মধ্যে কোথা থেকে যেন বালকের ভাব এল, এত আবদার, এত চাঞ্চল্য, এত জেদ। আর সেই সঙ্গে এমন গভীর বিষাদ আর উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কুমু এসে দেখ্‌লে তার দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েচে। তার চোখে যে আগুন জলেচে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো, নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়—সে তার দৃষ্টির সামনে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখতে পাচ্চে, তাকে দগ্ধ করা চাই। কুমুর কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সামনের দেয়ালে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বিপ্রদাস চুপ ক'রে ব'সে রইল।

কুমু আর খানিক বাদে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, কি হয়েচে বল।"

বিপ্রদাস যেন এক দূর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বল্‌লে, "দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মানতে হবে।"

"তুমি উপদেশ দাও, আমি মানতে পারব দাদা।"

"আমি দেখতে পাচ্চি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।"

কুমু ভালো ক'রে তার দাদার কথার মানে বুঝতে পারলে না।

বিপ্রদাস বললে, "ব্যথাটাকে আমারি আপনার মনে ক'রে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝতে পারচি এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সকলের হ'য়ে।"

বিপ্রদাসের ফ্যাকাসে গৌরবর্ণ মুখের উপর লাল আভা এল। ওর কোলের উপর রেশমের কাজ করা একটা চৌকা বালিশ ছিল সেটাকে ঠেলে হঠাৎ সরিয়ে ফেলে দিলে। বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওয়ালা চৌকির উপর বস্‌তে যাচ্ছিল, কুমু ওর হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে. "শান্ত হও দাদা, উঠোনা, তোমার অসুখ বাড়বে।" ব'লে একটু জোর ক'রেই পিঠের দিকের উঁচু-করা বালিসের উপর বিপ্রদাসকে হেলিয়ে শুইয়ে দিলে।

বিপ্রদাস গায়ের কাপড়টাকে মুঠো দিয়ে চেপে ধ'রে বল্‌লে, "সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারে নেই ব'লেই তাদের উপর কেবলি মার এসে পড়চে। বলবার দিন এসেচে যে সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে ক'রে থাকতে পারবি? ওবাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।"

কালুর কাছ থেকে বিপ্রদাস আজ অনেক কথা শুনেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের যে সম্বন্ধ ঘটেচে তার মধ্যে অপ্রকাশ্যতা আর ছিল না। ওরা দুই পক্ষই অকুণ্ঠিত। লোকে ওদেরকে অপরাধী মনে করচে মনে ক'রেই ওরা স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেচে। এই সম্বন্ধটার মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ কিছু ছিল না ব'লেই পরস্পরকে এবং লোকমতকে বাঁচিয়ে চলা ওদের পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। শোনা গেছে শ্যামাসুন্দরীকে মধুসূদন কখনো কখনো মেরেওচে, শ্যামা যখন তারস্বরে কলহ করেচে, তখন মধুসূদন তাকে সকলের সামনেই বলেচে, "দূর হ'য়ে যা, বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।" কিন্তু এতেও কিছু আসে যায় নি। শ্যামার সম্বন্ধে মধুসূদন আপন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেচে, ইচ্ছে ক'রে মধুসূদন নিজে তাকে যা দিয়েচে শ্যামা যখনি তার বেশি কিছুতে হাত দিতে গেছে অমনি খেয়েচে ধমক। শ্যামার ইচ্ছে ছিল সংসারের কাজে মোতির মার জায়গাটা সেই দখল করে, কিন্তু তাতেও বাধা পেলে; মধুসূদন মোতির মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, শ্যামাসুন্দরীকে বিশ্বাস করে না। শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগে নি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেচে। যেন শীতকালের বহু-ব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব. বিশেষ যত্ন করবার জিনিষ নয়, খাট থেকে ধূলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না। কিন্তু ওতে আরাম আছে। শ্যামাকে সামলিয়ে বলবার একটুও দরকার নেই, তা ছাড়া শ্যামা সমস্ত মন প্রাণের সঙ্গে ওকে যে বড়ো ব'লে মানে, ওর জন্যে সব সইতে, সব করতে সে রাজি এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুণ মধুসূদনের আত্মমর্য্যাদা সুস্থ আছে। কুমু থাক্‌তে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্য্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।

মধুসূদনের এই আধুনিক ইতিহাসটা জানবার জন্যে কালুকে খুব বেশি সন্ধান করতে হয়নি। ওদের বাড়িতে লোকজনের মধ্যে এই নিয়ে যথেষ্ট বলাবলি চলেছিল, অবশেষে নিতান্ত অভ্যস্ত হওয়াতে বলাবলির পালাও এক রকম শেষ হ'য়ে এসেচে।

খবরটা শোনবামাত্র বিপ্রদাসকে যেন আগুনের তীর মারলে। মধুসূদন কিছু ঢাকবার চেষ্টামাত্রও করেনি, নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতই সহজ—স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাহিরের বাধা এতই কম! স্ত্রীকে নিরুপায় ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয়নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে ও যুগে যুগে কি রকম ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে এক মুহূর্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখতে পেলে। সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত শস্তা. এত অকিঞ্চিৎকর।

বিপ্রদাস বল্‌লে, "কুমু, অপমান সহ্য ক'রে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হ'য়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবী করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক্।"

কুমু বল্‌লে, "দাদা, তুমি কোন্ অপমানের কথা বল্‌চ ঠিক বুঝতে পারচিনে।"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "তুই কি তবে সব কথা জানিসনে?"

কুমু বল্‌লে, "না।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বল্‌লে, "মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হ'য়ে রয়েচে। কেন তা জানিস?"

কুমু কিছু না ব'লে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে বল্‌লে, "চিরজীবন মা যা দুঃখ পেয়েছিলেন আমি তা কোনো মতে ভুলতে পারিনে, আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিহীন সমাজ সে জন্যে দায়ী।"

এইখানে ভাই বোনের মধ্যে প্রভেদ আছে। কুমু তার বাবাকে খুব বেশি ভালো বাসতো, জান্‌ত তাঁর হৃদয় কত কোমল। সমস্ত অপরাধ কাটিয়েও তার বাবা ছিলেন খুব বড়ো এ কথা না মনে ক'রে সে থাকতে পারত না, এমন কি তার বাবার জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল সে জন্যে সে তার মাকেই মনে মনে দোষ দিয়েচে।

বিপ্রদাসও তার বাবাকে বড়ো ব'লেই ভক্তি করেচে। কিন্তু বারে বারে স্খলনের দ্বারা তার মাকে তিনি সকলের

কাছে অসম্মানিত করতে বাধা পান নি এটা সে কোনো মতে ক্ষমা করতে পারলে না। তার মাও ক্ষমা করেন নি ব'লে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ করত।

বিপ্রদাস বল্‌লে, "আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগত ভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবিনে।"

কুমু মুখ নীচু ক'রে আস্তে আস্তে বল্‌লে, "বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন সে কথা ভুলো না, দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জ্জনা হয়।"

বিপ্রদাস বললে, "তা মানি, কিন্তু এত ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি এত সহজে মায়ের সম্মান হানি করতে পারতেন, সে পাপ সমাজের। সমাজকে সে জন্য ক্ষমা করতে পারব না, সমাজের ভালোবাসা নেই, আছে কেবল বিধান।"

"দাদা, তুমি কি কিছু শুনেচ?"

"হাঁ শুনেচি, সে সব কথা তোকে আস্তে আস্তে পরে বলব।"

"সেই ভালো। আমার ভয় হচ্চে আজকেকার এই সব কথাবার্ত্তায় তোমার শরীর আরো দুর্ব্বল হ'য়ে যাবে।"

"না কুমু, ঠিক তার উল্টো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলচে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসচে।"

"কিসের লড়াই দাদা!"

"যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।"

"তুমি তা'র কী করতে পারো, দাদা?"

"আমি তাকে না মানতে পারি। তা ছাড়া আরো আরো কী করতে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে, আজ থেকেই সুরু হোলো, কুমু। এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর কারো সঙ্গে আপোষ ক'রে নয়। এই খানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।"

"আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা কোয়ো না।"

এমন সময় খবর এলো, মোতির মা এসেচে।

(ক্রমশঃ)

রামমোহন

শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী

অগ্নি ও জলের অপূর্ব্ব সমাবেশ যেমন বজ্রগর্ভ মেঘেই দেখা যায়, তেমনি দেশাচারের প্রতি বিদ্রোহ ও অনুরাগের একটা সমঞ্জস ঐক্যতান, আজ আমরা যে বজ্রগর্ভ মানুষটির স্মৃতিরক্ষার্থে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রতি অনুপ্রাণনায় অভাবিত মন্দ্রে ধ্বনিত হইয়াছিল। এ যেন সমাজ-প্রাঙ্গণের আগাছাগুলিকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অমৃত ফল রসাল বৃক্ষগুলিকে বর্ষণের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিল। বিপরীতের এমনই সমন্বয় লোকোত্তর পুরুষদিগের চরিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি একেশ্বরবাদই প্রকৃত তত্ত্ব ইহা প্রচারিত করিতে মূর্ত্তি-পূজা নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার জগতে যাহা কিছুকে যে কোনও মনুষ্য ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে তাহার নিন্দা সহ্য করেন নাই। এমনটি কি করিয়া ঘটিল? এ বিষয়ে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে যিনি সত্যের প্রকৃত রূপ দেখিতে পান তাঁহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কারণ যিনি অবাঙ্‌মনস-গোচর, দেশ কাল ও সঙ্খ্যার অতীত—তাঁহাকে এক বলা বা বহু বলা দুই সমান ভ্রমাত্মক। তাঁহাকে এক হিসাবে এক বলা হইয়া থাকে—অন্য হিসাবে বহুও বলা যায়। কিন্তু এ দুইএর কোনোটিই যে তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহাকে সত্যও বলা যায় না কারণ তাহা হইলে মিথ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ও তাহাতে অদ্বৈত হানি হয়। এই সকল কারণে উপনিষদে তাঁহাকে "নেতি নেতি" করিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল "নেতি" করিয়া বুঝিয়া মানুষের মন সেই রসঘনর আস্বাদ পায় না। "নেতি নেতি" আমাদের ক্ষুদ্র সসীম মনটিকে শূন্যে লইয়া পৌছাইয়া দেয়। তাই আমরা আমাদের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে এই বিরাট্ পুরুষের একটা দিকমাত্র—ইংরাজীতে যাহাকে বলে aspect—লইয়া সন্তুষ্ট থাকি। আমাদের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে এই ধারণা কাহারও কিছু সূক্ষ্ম কাহারও কিছু স্থূল হইয়া থাকে। আমরা ক্ষুদ্রমতি—আমরা এই পার্থক্যটুকুকে বড় করিয়া দেখি ও আমাদিগের সঙ্কীর্ণ মন দিয়া ইহাদিগকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা আমাদের চেয়ে অনেক বড় তাঁহারা দেখেন এই স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণার মধ্যে পার্থক্য বেশী নহে—উনিশ বিশ মাত্র। যে ভক্তি করিয়া পূজা করে—ভাবগ্রাহী নারায়ণ সে পূজা গ্রহণ করেন। কারণ মানুষের ভুল হইতে পারে—কিন্তু মানুষের উদ্দেশ্যকে তিনি ত কখনই ভুল করিবেন না। সকলেরই আন্তরিক ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতি এই জন্য রাজা রামমোহন রায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

আরও একটা বড় কথা এই যে রামমোহন তাঁহার নিজের দেশকে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন দেশাত্মবোধ কাহারও চিত্তে প্রবুদ্ধ হয় নাই বলিলেও চলে, তখন বাংলার একটি সুবর্ণ প্রদীপের মত বাংলার সেই ঘোর অমানিশায় এই অমর আত্মা দেশ-লক্ষ্মীর আরতি করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর দিনের পর দিন কত সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়াছে—কত নিশীথ দীপ জ্বলিয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—কত শুক-তারা উঠিয়াছে ডুবিয়াছে—কিন্তু এই এক শতাব্দী পরেও সে আলোকের রশ্মি ক্ষীণ নিষ্প্রভ হয় নাই—উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

যখন বিজাতীয় ধর্ম্ম ও বিদেশীয় ভাবের প্রবল বন্যা আসিয়া এদেশের পঙ্ক-কর্দ্দমের সঙ্গে সঙ্গে তৃষার পানীয়টুকুকে পর্য্যন্ত নিষ্কাশিত করিবার উপক্রম করিতেছিল তখন অটল পর্ব্বতের মত সেই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান এই মহাপুরুষ দেশীয় ধর্ম্ম ও ভাবকে রক্ষা করিয়া দেশের ধর্ম্মপিপাসুগণকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

---

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মমন্দিরে রামমোহন স্মৃতিসভায় পঠিত।

অথচ ধর্ম্মের এত বড় সংস্কারকও অল্পদিনের মধ্যে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমাদের আচার-মুখী ধর্ম্মের যে স্থানে কদর্য্যতা লক্ষ্য করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি সবলে আঘাত করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের বিরাট্ সমাজ-সৌধের যাহা জীর্ণ লোণা-ধরা অংশ তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। এমনি রক্ষক ও সংহারক মূর্ত্তিতে এক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন! কিন্তু রামমোহনের আঘাত ছিল মায়ের আঘাতের মত "বুকে বেঁধে মারা"—তাহা বিজাতীয় হীন ঈর্ষ্যাপ্রসূত নহে। তাই তাহা কোনো দিন অপমানের বেদনা বা লাঞ্ছনা বহন করে নাই।

তাঁর ভাঙন ছিল গড়ার প্ররোচনা—
আঘাত ছিল বাঁধন বেদনা—
খুঁচিয়ে শুধু জাগানো চেতনা
আধমরা এ জাতে!

সে চেতনা জাগিয়াছে কিনা ও জাগিলেও কতটুকু জাগিয়াছে এক শতাব্দী পরে তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা কত হীন ছিল তা সে কালের কৌলীন্য ও সতীর ইতিহাস হইতে আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি। নারীকে কল্যাণী ও দেবী করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহার মনুষ্যত্বের গৌরবময় দাবী এই হতভাগ্য দেশ বিস্মৃত হইয়াছিল। আজও তাহার সে মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে যে আমরা ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছি তাহা আমার মনে হয় না। তথাপি সামান্য যাহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা রামমোহনের আন্দোলন প্রসাদাৎ। আমাদের নাটকে, উপন্যাসে অন্ততঃ নারীকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতেছি। ইহাতে আমাদের দৃষ্টিভূমির পরিবর্ত্তন হইয়াছে বুঝা যায়। বাস্তব জগতে নারীর ন্যায্য দাবী তাহাকে দান করা তাহাতে সহজ হইয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে সম্যক্ পরিবর্ত্তন এখনো সময়-সাপেক্ষ। পুরুষ এতকাল ধরিয়া কেবলই মনে করিয়া আসিয়াছে যে তাহার গৃহরক্ষার নিমিত্তই শুধু নারীর সৃষ্টি, আজ তাহা ভোলা সহজ নহে। নারীর নিজেরই যে একটা নিরপেক্ষ সার্থকতা থাকিতে পারে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রভুত্বের ধর্ম্মই এই—ইহা দাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুরও নৈতিক হীনতা আনয়ন করে। তবু এই দেশের নরনারীগণের প্রতি কোনও অসম্মানকর ইঙ্গিত রামমোহন কদাচ সহ্য করিতেন না।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে যাহাতে বিরোধ না বাধে—তাহাদের ভেদের দিকটাকে এমনি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের সাম্যের দিক মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও রামমোহন রায়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এখানে তাঁহার বিদ্রোহী মূর্ত্তি যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তাঁহার বীণার রুদ্রতা সামগানে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেশসেবার কোনও দিকেই ত্রুটি রাখে নাই। তাঁহার প্রবন্ধাবলীর দ্বারা তদানীন্তন বাংলা গদ্য-সাহিত্য অলঙ্কৃত হইয়াছিলই; তাহা ছাড়া তিনি গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়া তখনকার দিনে বাংলা ভাষাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই ব্যাকরণের চারিটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বহু সুচিন্তিত কথা ইহাতে নিবদ্ধ ছিল। এখানেও বহু অন্ধ-সংস্কার ধ্বংস করিয়া তিনি ব্যাকরণকে "ঢেলে সাজিয়াছিলেন।" পরবর্ত্তী বাংলা ব্যাকরণগুলি যদি এই আদর্শে রচিত হইত তাহা হইলে এতদিনে বাংলা ভাষার উন্নতির পথ খুবই সুগম হইয়া থাকিত সন্দেহ নাই। "লোহারামে"র ছাঁচে পড়িয়া সে পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। এখন আবার এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু "ঢেলে সাজিতে" পারে এমন প্রতিভার অভাবে বা অবজ্ঞায় ভাল বাংলা ব্যাকরণ এখনো একখানিও লিখিত হয় নাই। বাংলা বাণী মন্দিরে কারুকার্য্য করিবার শিল্পী অনেক আছেন—কিন্তু তাহার দিন দিন বর্দ্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে কোদাল পাড়িবার লোক নাই। রামমোহনের স্মৃতি যদি আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে তাহা হইলে এই কোদাল পাড়ার কাজেই আমাদের সাহিত্যসেবিগণকে লাগিতে হইবে। ডাক্তার সুনীতি চাটার্জ্জি তাঁহার বাংলা-ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থে পথ দেখাইয়াছেন। এখনো অনেক বাকি—এই পথে নবীন সাহিত্যিকগণকে চলিতে হইবে।

এমনি এক শতাব্দী পূর্ব্বে এক হস্তে বিদ্রোহ ও অপর হস্তে শান্তি লইয়া যুগপৎ বিষাণ ও বাঁশরী বাজাইতে

হুমায়ুন কবির

বাজাইতে বাংলার এই নবকিশোর রামমোহন বাংলার পল্লীপথ সচকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঝটিকা বা ধূমকেতুর অবাধ গতির সঙ্গে সাগরদোলা বা গ্রহ-পরিভ্রমণের নিয়ন্ত্রিত ছন্দ যদি একত্র কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে এই মহাপুরুষের প্রাণের আবেগ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উৎপীড়ন ও অত্যাচার দর্শনে উহা যেমন বিক্ষুব্ধ ও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অগাধ দেশভক্তির দ্বারা উহা তেমনি প্রশান্ত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সকল প্রচেষ্টায় সুশৃঙ্খলা ও মনোরম অনুপ্রাণনা আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশকে সমাজকে ভাষাকে ধন্য করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হউক।

অভিসারিকা

হুমায়ুন কবির

বেদনায় তুমি বারে বারে সখি আসিয়াছ কাছে মোর,
অশ্রু-সজল দীপ্ত আনন ভুলাল এ অন্তর।
তোমার পরাণে দিবস রজনী জ্বলে অগ্নির শিখা
তাইতো ঝলিল ললাটে তোমার দুঃখের রাজটীকা,
তাই তো বহিল নয়নে তোমার অশ্রুর নির্ঝর।

তোমারে যখনি দেখেছি বন্ধু তখনি জেনেছি মনে
নহ ঝরাপাতা, কোনদিন ভেসে চলনি স্রোতের সনে।
ঝঞ্ঝার মুখে যে জন দাঁড়ায় ঝটিকা তাহারে হানে
অগ্নি উল্কা বৃষ্টিধারায় তীক্ষ্ণ মৃত্যুবাণে,
সে কথা জানিয়া লয়েছ বরিয়া সংগ্রাম আবাহনে।

আঘাতে যখন হৃদয় বিদারি' অবাধ্য আঁখি ঝরে
উন্নতশিরে তখনো চলেছ একেলা পথের পরে।
সঙ্গীরা সবে থাকে পিছে পড়ি', গায়ে দেয় ধূলি কেহ,
জাগায় নিন্দা, বিদ্রূপ, রোষ, সংশয়, সন্দেহ,
প্রাণের প্রদীপ জ্বালি' চল তুমি নির্ভীক অন্তরে।

জানিনা কি আলো লক্ষ্য করিয়া চলেছ তিমির রাতে,
বেদনাসাগর লঙ্ঘন করি' কি চাও নূতন প্রাতে?
মনের গোপন স্বপন কি সেথা কুসুমে রয়েছে ফুটি'?
জীবনেরে বাঁধে বন্ধন যত সেথা কি গিয়াছে টুটি'?
কিছু না জানিয়া চাহে মম হিয়া চলিতে তোমার সাথে
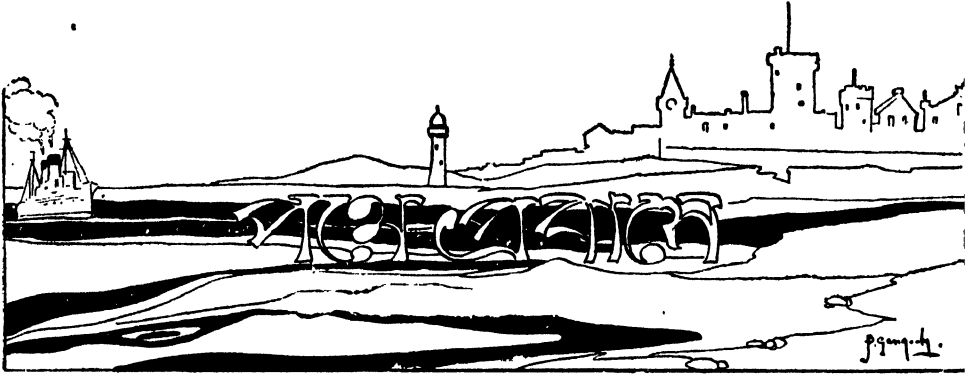
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৪

অষ্ট্রিয়ায় যাবার আগে বড় ভাবনা ছিল, কী আর দেখ্‌বো! গত মহাযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার যে সর্ব্বনাশ ঘ'টে গেল কোন দেশের তেমন ঘটেছে! কত শতাব্দীর কত বড় একটা সাম্রাজ্য, চারটি বছরের যুদ্ধে তার চৌচির অবস্থা! কোথায় গেল হাঙ্গেরী, কোথায় ট্রানসিলভেনিয়া, কোথায় গেল ক্রাকাউ, কোথায় বোহিমিয়া, কোথায় গেল ক্রোয়েশিয়া ড্যাল্‌মেশিয়া বস্‌নিয়া। চারটি বছরে চার বছরের কীর্ত্তি নিঃশব্দে ভেঙে পড়্‌লো; যেন একটা তাসের কেল্লা একটি আঙুলের একটু ছোঁয়া সইতে পার্‌লে না। সাম্রাজ্য যদিও চার শতাব্দীর রাজবংশ প্রায় আট শতাব্দীর। যেন আলাউদ্দিন খিলজী থেকে পঞ্চম জর্জ্জ পর্য্যন্ত একটি রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসনে ব'সে রাজ্যবিস্তার ক'রে আস্‌ছিলেন, ভেবেছিলেন সূর্য্যচন্দ্র যতদিনের তাঁরাও ততদিনের। ভালোই হ'লো যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটও গেলেন, নইলে এখনকার ঐটুকু অষ্ট্রিয়ায় অত বড় বনেদী রাজবংশকে মানাতো না।

বড় ভাবনা ছিল, ভিয়েনায় গিয়ে কী আর দেখ্‌বো, সুন্দরী ভিয়েনার বিধবার সাজ কি আমার ভালো লাগ্‌বে! ভিয়েনাকে রাণীর বেশে সাজাবার সামর্থ্য অষ্ট্রিয়ার নেই, অষ্ট্রিয়ার না আছে বন্দর না আছে খনি, অষ্ট্রিয়ার লোকসংখ্যা এখন এত অল্প যে ভিয়েনার মতো বৃহৎ নগরীর নাগরিক হবার জন্যে আমেরিকানদের সাধাসাধি কর্‌তে হয়। এ্যাট্‌লান্টিকের ওপার থেকে পঙ্গপাল এসে ভিয়েনা দখল কর্‌ছেও। সঙ্গে আন্‌ছে তাদের Jazz Band, তাদের সিনেমা, তাদের Charabanc, তাদের American Bar— তাদের ভুঁইফোড় সভ্যতার সমস্ত ইতরতা। আর কিছুদিন পরে ভিয়েনাটাকেও তারা প্যারিস্ ক'রে ছাড়্‌বে— প্যারিসেরই মতো আমেরিকার উপনিবেশ।

পা দিলুম অষ্ট্রিয়ায়। সুন্দর দেশ, পর্ব্বত-পরিপূর। আমাদেরি দেশের মতো কৃষিপ্রধান, তফাতের মধ্যে বিরল-বসতি। ইংলণ্ডের তুলনায় স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ নিম্নতর, কিন্তু আমাদের মতো এত নিম্ন নয়। ইউরোপের যতই পূর্ব্বদিকে যাই ততই ভারতবর্ষের দিকে যাই, ভিয়েনার পূর্ব্বদ্বার একেবারে ভারতবর্ষের লাগাও। হাঙ্গেরীকে তো ভারতবর্ষ ব'লে মনেই হয় না। হাঙ্গেরী যদি ইউরোপ হয় তবে পাঞ্জাবও ইউরোপ। জিওগ্রাফীর জুলুম অনুসারে কিন্তু পাঞ্জাব ও জাপান হ'লো এশিয়া আর ইংলণ্ড ও হাঙ্গেরী হ'লো ইউরোপ। যাঁরা Pan-Asia or Pan-Europeএর ধ্যান দেখেন তাঁদের বেদ হলো ঐ জিওগ্রাফী, তাঁরা কল্‌কাতার সঙ্গে লণ্ডনের মিল খুঁজে পান না, মিল খোঁজেন কল্‌কাতার সঙ্গে লাসার, লণ্ডনের সঙ্গে বুডাপেষ্টের। এক হিসাবে লণ্ডন থেকে কল্‌কাতা ততদূর নয় লণ্ডন থেকে বুডাপেষ্ট যতদূর। প্রথম দুটোর মাঝখানে কেবল সমুদ্র,

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

দ্বিতীয় ছুটোর মাঝখানে কত দেশ। আজকালকার দিনে সমুদ্র তো একটা চ্যানেলের মতো, ফরাসী যদি ইংরেজের প্রতিবেশী হয় তবে বাঙালীও ইংরেজের প্রতিবেশী। ইংরেজী সভ্যতা যত সহজে কল্‌কাতায় পৌঁছায় তত সহজে বুডাপেষ্টে পৌঁছাতে পারে না, তাই বম্বে বা দক্ষিণ কল্‌কাতার তুলনায় বুডাপেষ্টকে বেশ ওরিয়েণ্টাল্ মনে হয়।

তবে এও সত্য যে বুডাপেষ্টের সঙ্গে তার আশপাশের যে সঙ্গতি আছে বম্বে বা কল্‌কাতার তা নেই। ভিয়েনা সম্বন্ধেও এই কথা। ভিয়েনার সঙ্গেও তার আশপাশের সঙ্গতি নেই। একটা কৃষি-প্রধান দেশের এক প্রান্তে এত বড় একটা শিল্প-প্রধান শহর, যার ত্রিসীমানায় বন্দর বা খনি নেই। বন্দর যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও কেড়ে নিয়েছে ইটালী। আর খনি যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও পড়্‌লো চেকোস্লোভেকিয়ার ভাগে, কেবল টুরিষ্ট্ নিয়ে তো একটা বড় শহর বাঁচ্‌তে পারে না। ভিয়েনার লোকসংখ্যা কমেছে। বাদ্‌শাহী জাকজমক আর নেই। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও ভিয়েনা অতুলনীয়া সুন্দরী। তার প্রায় চারদিকে পাহাড়, কাছেই ড্যানিউব্ নদী, ভিতরে নদীর খাল। "Ring" নামক রাজপথটি ভিয়েনারই বিশেষত্ব। বার্লিন দেখিনি, কিন্তু লণ্ডন প্যারিসের চেয়েও ভিয়েনা ছুটি কারণে সুন্দর। প্রথমত ভিয়েনার পথঘাট প্যারিসের চেয়ে তো নিশ্চয়ই লণ্ডনের চেয়েও পরিষ্কার। দ্বিতীয়ত ভিয়েনার সৌধগুলি লণ্ডনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই প্যারিসের চেয়েও সুধা-ধবল। লণ্ডনের এক রিজেণ্ট্ ষ্ট্রীটের সঙ্গেই ভিয়েনার অধিকাংশের তুলনা। ধোঁয়া আর ফগের ভয়েই বোধ হয় লণ্ডনের বাড়ীগুলো চুণ মাখ্‌তে চায় না। কিন্তু আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটীও যদি অন্ধকার হয় তো মনের উপরে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। ভিয়েনায় এ আপদ্ নেই তাই সেখানে নয়ন ছুটি মেলিলে পরে পরাণ হয় খুসী।

কিন্তু ভিয়েনার নির্জ্জনতা লণ্ডন প্যারিসের মনকে ঘুম পাড়াতে চায়। মধ্যাহ্নকে মনে হয় মাঝ রাত। কত বড় বড় বাড়ী, কত বড় বড় রাস্তা—কিন্তু এত জনবিরল যে ঘুমন্তপুরীর মতো লাগে। বৃহৎ রেস্তর্‌াঁ, ঢুকে দেখা গেল লোক নেই, অথচ অমন রান্না সারা ইউরোপ ঢুঁড়্‌লেও পাওয়া যায় না, অথচ অত সস্তায়। প্যারিসে লোক কিলবিল করছে, আর মানুষ যত নেই মোটর আছে তত; আর সে-সব মোটর যারা হাঁকায় তারা বিদ্যুতের সঙ্গে টক্কর দেবার স্পর্দ্ধা রাখে। প্যারিস্ থেকে ভিয়েনায় গেলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। অথচ ভিয়েনা চিরদিন এমন ছিল না। এই বিগত-যৌবনা রূপসী একদিন ইউরোপের রাণী ছিল। তখন কত ডিপ্লোম্যাট্ কত বণিক কত গুণী ও কত পর্য্যটক সোনা নিয়ে তার মুখ দেখ্‌তে আস্‌তো। সঙ্গীতে ভিয়েনার সমান ছিল না। ভিয়েনার অপেরা এখনো তার পূর্ব্ব-গৌরব হারায়নি। কিন্তু মহাকাব্যের মতো অপেরারও দিন যায়—যায়। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে চিকাগোর অপেরা লণ্ডনে ব'সে দেখ্‌বার ও শোন্‌বার উপায় হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু নতুন একখানা অপেরা লেখ্‌বার মতো প্রতিভা একমাত্র Straussএর আছে এবং সম্ভবত তাঁর সঙ্গেই লোপ পাবে। থিয়েটারের সাজসজ্জার যে উন্নতি হয়েছে তা শেক্‌স্‌পিয়ারের পক্ষে কল্পনাতীত, কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ারের পায়ের ধূলো নেবার উপযুক্ত নাট্যকার একটিও জন্মাচ্ছে না। এবং রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় জগতের শেষ মহাকবি।

ঠাট বজায় রাখ্‌তে ভিয়েনার লোক অদ্বিতীয়। অত বড় সাম্রাজ্য হারাবার পরে সোশ্যালিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা আগের মতোই কায়দা-দুরস্ত আছে। রেস্তর্‌াঁয় লোকই আসে না, তবু ওয়েটার বাবাজীদের দরকারী পোষাকটি অপরিহার্য্য। পাহারাওয়ালা অন্য সব দেশে কেবল পাহারাই দেয়, তার হাতে একটা বেটন থাক্‌লেই যথেষ্ট, কিন্তু ভিয়েনার পাহারাওয়ালার গায় সৈনিকের সাজ ও কোমরে সুখচিত তরবারি। ভিয়েনার লোক কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছে না যে তাদের সম্রাট ও তাঁর সভাসদেরা ছিলেন ইউরোপের মধ্যে অভিজাততম, যদিও এখন তারা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বল্লে হয় এবং খেতে পায় না ব'লে লীগ্ অব্ নেশন্‌সের মধ্যস্থতায় টাকা ধার নিয়েছে। অষ্ট্রিয়াকে সম্ভবত একদিন বাধ্য হ'য়ে জার্ম্মেনীর অন্তর্গত হ'তেই হবে, কিন্তু ভিয়েনা কেমন ক'রে ভুলবে যে সেই ছিল

জার্ম্মেনীর তথা ইউরোপের দীর্ঘকালের রাজধানী! সেদিনকার বার্লিনের কাছে ভিয়েনা কেমন ক'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াবে! যে-প্রাসিয়া একদিন তার ভৃত্যের মতো ছিল তার কাছে অষ্ট্রিয়া হবে ছোট! কিন্তু গরজ বড় বালাই। কত বড় বড় উঁচু মাথাকে সে ধূলায় মিশিয়েছে। যে কারণে এখন ছোট ছোট কারবার টিঁকৃতে পারছে না, পৃথিবীব্যাপী combine গ'ড়ে উঠছে ঠিক সেই কারণে এখন ছোট ছোট রাষ্ট্র টিঁকৃতে পারবে না, মহাদেশব্যাপী মহারাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতেই হবে। কে বল্লে Imperialismএর দিন গেছে? বরং Imperialismএরই দিন আসছে। ন্যাশনালিজমের দিন গেছে। রাশিয়া কি একটা নেশন? চীন দেশ কি একটা নেশন? ভারতবর্ষ কি একটা নেশন? এরা যদি এক একটা রাষ্ট্র হয় তো এদের চাপে অর্দ্ধেক ইউরোপ একদিন একরাষ্ট্র হ'য়ে উঠবে। এখনি তো আমেরিকার উৎপাতে ইউরোপের দোকান বাজার টলমল।

অষ্ট্রিয়ানদের দরিদ্র বল্লুম ব'লে যেন না মনে করেন ওরা আমাদের মতো দরিদ্র। ভিয়েনার পশ্চিম দিকে যাকে দারিদ্র্য বলা হয় ভিয়েনার পূর্ব্বদিকে তার নাম স্বচ্ছলতা। অর্থাৎ ইউরোপের দরিদ্ররা এশিয়ার মধ্যবিত্ত। ইংলণ্ডে যাকে slum বলে সেটা আমাদের উত্তর কল্‌কাতার চেয়ে কুৎসিত নয়। ইউরোপের পারিয়াদের দাবীর ফিরিস্তি আমাদের মধ্যবিত্তদের তাক লাগিয়ে দেয়—চড়া হারের মজুরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, সস্তায় আমোদ প্রমোদের টিকিট্, ঘন ঘন ছুটী, প্রচুর পেন্সন, আপদে বিপদে জীবন-বীমা। আরো কত কী! জীবনের কাছে আমাদের দাবী কোনোমতে বংশ-রক্ষা করা ও ম'রে গেলে পিণ্ডটুকু পাওয়া। এদের দাবী হয় রাজসিক জীবন নয় রাজসিক মৃত্যু। সামান্য কারণে এরা বিদ্রোহ ক'রে বসে, যত সহজে মরে তত সহজে মারে। জীবনের মূল্য যত প্রাণের মূল্য তত নয়। স্বল্পতম ভার সইতে পারে না ব'লে এদের সমাজ লোক সংখ্যা বাড়লেই যুদ্ধের অছিলা খোঁজে। এদের সমাজকে পাতাবাহারের গাছের মতো মাঝে মাঝে ছাঁটলে তবে তার স্বাস্থ্য থাকে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শটি এদের কাছে এত মূল্যবান যে এই জন্যে যুদ্ধের আর বিরাম নেই, এই জন্যে এরা পিণ্ডাধিকারী না রেখে চিরকুমার অবস্থায় মরাটাকে অধর্ম্ম জ্ঞান করে না, বেশী বয়সে বিয়ে করার আনুসঙ্গিক অন্যায়—হয় আত্মনিগ্রহ নয় অপকীর্ত্তি—তো করেই, বিয়ের পরেও যে কোনো মতে জন্ম-শাসন করে। এত বড় ইউরোপে কোথাও একটি পশু-পাখী-সাপ-ব্যাঙ্-মশা-মাছি দেখতে পাওয়া শক্ত, অন্নের ভাগ দিতে পারবে না ব'লে অভক্ষ্য প্রাণীকে এরা মেরে সাবাড় করেছে ও ভক্ষ্য প্রাণীকে এরা অন্নে পরিণত করেছে। একটা পোষা প্রাণীর যদি স্বাস্থ্য গেল তো তাকে এরা তখুনি গুলি ক'রে ভাবলে দু'পক্ষের আপদ চুকল। অপর পক্ষে কিন্তু পোষা প্রাণীকে এরা রুগ্ন হ'তেই দেয় না, এত যত্নে রাখে। পীড়িত পশুকে দিয়ে গাড়ী টানালে কঠিন সাজা। হত্যা ব্যাপারটা যাতে এক মুহূর্ত্তে সমাপ্ত হয়, পশুর পক্ষে যন্ত্রণাকর না হয়, সেজন্যে কসাইদেরকে pistol ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একটা মুমূর্ষু প্রাণী দশদিন ধ'রে—না, দশ ঘণ্টা ধ'রে—একটু একটু ক'রে মরছে ও অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছে এ দৃশ্য ইউরোপে দেখবার জো নেই। নিজে যন্ত্রণা ভালোবাসে না ব'লে এরা যন্ত্রণা দিতে ভালো বাসে না। Vivisectionএর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলেছে। ইউরোপের সব দেশেই এখন নিরামিষাশী-সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হয়েছে অনেকেই।

ইউরোপের ইতিহাস এই প্রমাণ করছে যে ইউরোপ যাকে নিজের খড়্গের যোগ্য শত্রু মনে ক'রে সম্মানের সঙ্গে দলে টানতে পারেনি তাকে নির্ম্মম ভাবে নিঃশেষ করেছে। সেই জন্যে ইউরোপে অস্পৃশ্য নেই, একঘরে নেই, ম্লেচ্ছ নেই। হয় একাকার হও নয় মরো। একমাত্র ইহুদীরাই এই অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে, আর কোনো জাতি পারে নি। তারা হয় ধ্বংস হ'য়ে গেছে, নয় মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে, নয় এখনো মারামারি করছে (যেমন বলকানে)। কিন্তু ভারতবর্ষে একবার যে ঢুকলো সে আর নড়বার নাম করলে না, এক কোণে একটুখানি জায়গা ক'রে নিয়ে থার্ড্ ক্লাস্ রেল গাড়ীর মেজেতে কাপড় পেতে বা বাঙ্কের উপরে হাত পা গুটিয়ে নাক ডাকাতে সুরু ক'রে দিলে।

পথে প্রবাসে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ভারতবর্ষের যে কোনো একটা জেলাতে যত genusএর উদ্ভিদ্ ও প্রাণী, যত speciesএর পশু ও পাখী, যত raceএর মানুষ, যত tribeএর কোল ভীল সাঁওতাল, যত জাতের হিন্দু, ও যত সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান মুসলমান দেখা যায় ইউরোপের কোনো একটা দেশে তত দেখ্‌তে পাওয়া উনবিংশ শতাব্দীর আগে তো অসম্ভব ছিলই, এখনো দুর্ঘট। এক বলকান্ ছাড়া ভারতবর্ষের তুলনা নেই, তবে বলকানের সবাই খুনোখুনি ক'রে মর্‌ছে, ভারতবর্ষের সবাই ধুনি জ্বালিয়ে কটিবস্ত্র প'রে নিদ্রা দিচ্ছে। তাদের কেউ বা এখনো stone ageএ আছে, কেউ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, কেউ খ্রীষ্টোত্তর দ্বাদশ শতাব্দীতে। ত্রিশ কোটি মানুষ ও অসংখ্য কোটি জীব-জন্তুর পরস্পরের সঙ্গে ভাগ ক'রে খাবার মতো অন্ন ভারতবর্ষে তো নেইই সৌরজগতেও নেই। এর ফলে যদি দেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী হয় তবে কার দোষ? এখন তবু বিদেশীকে দায়ী ক'রে কড়া কড়া রেজলুশন পাশ্ ক'রে নিশ্চিন্ত হচ্ছি, স্বরাজ হ'লে মুস্কিল বাধ্‌বে হিন্দুর গোমাতা মুসলমানের শূয়োর ও জৈনের কীটপতঙ্গগুলিকে নিয়ে। কাউকেই মার্‌বো না—এ নীতির লজিক্যাল্ পরিণাম কেউ বাঁচবো না, সবাই নির্ব্বাণ পাবো।

অনাবশ্যককে ইউরোপ নির্ম্মমভাবে ছেঁটেছে। বুড়ো বুড়ীকেও না খাটিয়ে খেতে দেয় না। "Dying in harness" তার জীবনের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকের বহরকেও সে বাড়াতে লেগেছে। যৌবন আগে ছিল গোটাকয়েক বছরের। এখন চাই শতবর্ষের যৌবন। এর জন্যে কত প্রাণী হত্যা কর্‌তে হবে, কত মানুষকে যুদ্ধে মার্‌তে হবে, কত লোককে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে হবে, কত অজাত শিশুকে জন্মাতে দেওয়া যাবে না, কত শিশুকে প্রকারান্তরে হত্যা কর্‌তে হবে। এত কাণ্ড করলে তবে হবে জন কয়েকের দীর্ঘ যৌবন, নিখুঁৎ স্বাচ্ছন্দ্য। দুর্ভিক্ষের চেয়ে আত্মনিগ্রহের চেয়ে শিশুমৃত্যুর চেয়ে চির রুগ্নতার চেয়ে এ ভালো, না, মন্দ?

দূর থেকে শুন্‌তুম অষ্ট্রিয়ানদের মরো মরো অবস্থা, তারা বুঝি আর বাঁচে না। দেখ্‌লুম তারা দিব্য আছে, আমাদের চেয়ে স্বচ্ছল ভাবে। বুঝ্‌লুম ইউরোপের লোক সামান্য অসুবিধাকেও বাড়িয়ে দেখে, চার বেলার এক বেলা না খেতে পেলে বলে দুর্ভিক্ষে মারা গেলুম! লণ্ডনে সেদিন দশ বারোটা লোক নাকি অনশনে মরেছিল, তাই নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর আসন ট'লে উঠ্‌ল। অথচ ওরা যদি যুদ্ধে মর্‌তো তবে কেউ ওদের কথা ভুলেও ভাব্‌তো না। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের দুর্ভাবনা এই যে তাদের স্ত্রীরা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পঁচিশ বছর বয়সের অনবদ্য স্বাস্থ্য অটুট রাখ্‌তে পারে না, তাদের স্বামীদের মজুরি এত কম! আর আমাদের বড় লোকের মেয়েরাও কুড়িতে বুড়ী হন। দূর থেকে আমাদের দেশটাকে মাঝে মাঝে মনে হয় একটা বিরাট Slow suicide club—এত আমাদের সহিষ্ণুতা, অল্পে সন্তোষ, আত্মনিগ্রহ, চক্ষুলজ্জা। আমরা বলি, নিজের ছাড়া বাকী সকলের উপকার করো। এরা বলে, "Help yourself", কেন না "God helps those who help themselves", অর্থাৎ নিজের মাথায় যদি তেল ঢালো তো ভগবান তোমার তেলা মাথায় তেল ঢাল্‌বেন। বেকার সমস্যা নিয়ে ইংলণ্ড বড় বিব্রত। অথচ ইংলণ্ডের ধনীরা যদি একখানা ক'রে রুটী দেয় তবে ইংলণ্ডে যত বেকার আছে প্রত্যেকেই এক একজন মোহান্ত মহারাজের মতো বৈষ্ণবী নিয়ে পরম আহ্লাদে মালা জপ্‌তে পারে। শুধু তাই নয় ইংলণ্ডের ধনীরা ইচ্ছা করলেই বিশ ত্রিশ কোটি ইঁদুর বাঁদর প্রভৃতি কেষ্টর জীবের জন্যে একটা দেশব্যাপী চিড়িয়াখানাও স্থাপন কর্‌তে পারে। কিন্তু ভিক্ষা দিয়ে অপরের উপকার করা এদেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—যোগ্যতা না দেখ্‌লে, বাধ্য না হ'লে কেউ দেয় না। ধনী দরিদ্রের মধ্যে এমন মন কষা-কষি আমাদের দেশে নেই, এত দলাদলিও আমাদের দেশে নেই। তবে সন্ধি করবার কায়দাও এরা জানে। সময় বুঝে সন্ধি না করলে দু'পক্ষের একপক্ষ অবশিষ্ট থাক্‌বে না, এক হাতে তালি বাজ্‌বে না। যুদ্ধটা হচ্ছে সহিংস সহযোগ, ও ব্যাপার একা একা হয় না। ভবিষ্যতে আবার লড়্‌বে ব'লে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কেননা শত্রুই হচ্ছে যুদ্ধের সহযোগী। যে জন্তুকে এরা শীকার কর্‌বে সে জন্তুকেও এরা বন জঙ্গলে পালন করে। খাবার জন্যই এরা

গোরু শূয়োরকে খাইয়ে মোটা করে।*

ইউরোপের বহিঃপ্রকৃতি তার অন্তঃপ্রকৃতিকে কি পরিমাণ নিষ্করুণ করেছে তার একটা নিদর্শন ইউরোপের যে দেশে যাই সে দেশে দেখি। আমাদের যেমন ভাল চালের দোকান এদের তেমনি মাংসের দোকান; প্রায় প্রত্যেক অলিতে গলিতে আছেই, কষ্ট ক'রে খুঁজ্‌তে হয় না, আপনি চোখে খোঁচা দেয়। বেচারা মুসলমানেরা ক'টাই বা গোরু খায়, যদি বা খায় তবে ক'টা গোরুর ছাল-ছাড়া ধড় রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে, খ'দ্দের এলে করাৎ দিয়ে নির্দ্দিষ্টস্থানের মাংস কেটে ওজন ক'রে প্যাক্ ক'রে বিক্রী করে? একসঙ্গে একশোটা মরা পাখী পাকা কলার মতো ঝুলছে কিম্বা একশোটা মরা খরগোস! সাজিয়ে রাখাটাকে এরা একটা আর্ট ক'রে তুলেছে ব'লে বীভৎস ঠেকে না ক্রমে ক্রমে কলা-মূলো-কপি-কুমড়ার মতো লাগে, আমিষ নিরামিষের পার্থক্যবোধ লোপ পায়। রাগ কর্‌বার উপায়ও নেই, কেননা মাছকেও তো আমরা কলা-মূলোর সামিল মনে ক'রে থাকি, বিশেষ ক'রে বাঙালীর চোখে মাছ একটা প্রাণীই নয়। প্রাণ সম্বন্ধে ঐ অসাড়তাটাকে আরেকটু প্রশ্রয় দি'লে আমরাও ইউরোপীয় হ'য়ে পড়্‌তুম, ঝুলন্ত হ্যাম্ দেখে—চোখে নয়—জিভে জল এসে পড়্‌তো।

দোকান সাজানোতে ইংরেজ—জার্ম্মান—অষ্ট্রিয়ান—সুইস্‌রা ওস্তাদ্। ফরাসীরা আমাদেরি মতো এলোমেলো শুধু দোকান নয়, রেল ষ্টীমার হোটেল রেস্তরাঁ পথঘাট প্রদর্শনী—সর্ব্বত্র একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য উত্তর ইউরোপের বিশেষত্ব ব'লেই মনে হয়। ভিয়েনা ও প্যারিস্ এই দুটি শহরের মধ্যে ভিয়েনা অনেক বেশী সৌষ্ঠবসম্পন্ন, যদিও এলোথেলো সৌন্দর্য্য প্যারিসেরই বেশী। ভিয়েনায় তো সেন্ নদীর মতো আঁকা বাঁকা নদী নেই, তার কূলে ব'সে মাছধরা নেই, তার কূলে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা নেই, তার বাঁধে পুরোনো বইয়ের দোকানে ঝুঁকে পড়া বই-পাগ্‌লা বুড়ো নেই, তার আশপাশের রাস্তায় রঙীন কার্পেট্ কাঁধে নিয়ে পায়চারি-কর্‌তে-থাকা ঈজিপ্‌শিয়ান ফেরিওয়ালা নেই। এত রকম রাস্তার দৃশ্য (street sights) প্যারিসের মতো কোথায় আছে?—সারাক্ষণ যেন অভিনয় চলেছে প্রতি রাস্তায়। অথচ নোংরা রাস্তা, মোড়ে জল জমেছে, ফুটপাথে দোকানের নীচে দোকান, তাতে একসঙ্গে একশো রকম জিনিষ জট পাকিয়েছে, তরমুজ আর বাঁধা-কপির সঙ্গে খরগোস আর মাছ এবং গেঞ্জি আর পুলোভার। দোকানের গায়-গায় একটা কাফে কিম্বা মদের দোকান—সেও অকথ্য নোংরা এবং অগোছালো। এ-সব অনাচার ভিয়েনায় কিম্বা লণ্ডনে নেই, কোলোনে কিম্বা মিউনিকে নেই, বার্ণে কিম্বা লুসার্ণে নেই। মার্সে্‌ল্‌সে আছে, ভার্সে্‌ল্‌সে আছে এবং সম্ভবত সমস্ত ফ্রান্সে আছে। এবং সম্ভবত সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো ফরাসীদের নিখুঁৎ বাস্তুকলার সঙ্গে প্রচুর ধুলা কাদা যোগ দিয়েছে। ভিয়েনা চিত্রে ভাস্কর্য্যে বাস্তুকলায় প্যারিসের নকল, কিন্তু শৃঙ্খলায় ও পারিপাট্যে প্যারিসের বাড়া। অবস্থা-বিপর্য্যয়সত্ত্বে তার এই গুণগুলি যায়নি, তার সোশ্যালিষ্ট্ মিউনিসিপালিটির মেজাজটা বোধ হয় বাদশাহী।

বাদশাহের প্রাসাদগুলি অবশ্য এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। দশ বছর আগে যে-বাগানে বাদশাজাদীরা হাওয়া খেতেন এখন সেখানে গরীবের মেয়েরা খেলা কর্‌তে যায়। দশ বছর আগে যে-সব ঘরে বাদশাহ শয়ন বিশ্রাম

* যুদ্ধ বা সন্ধি, দু'টোর কোনোটাই আমরা ভালোবাসিনে, আমরা ভালোবাসি একলা থাক্‌তে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হ'তে, আমরা মনে-প্রাণে অহিংস অসহযোগী। নিজের হাতে না রেঁধে খেলে আমাদের গ্লানি বোধ হয়, পাল্টাঘরে বিয়ে না করলে আমাদের কেমন-কেমন লাগে, আমাদের এক বাড়ীতে ভাশুরের সঙ্গে ভাইবৌ দেখা করে না, সধবার হাঁড়িতে বিধবা খায় না, আমাদের এক পাড়াতে কে জলাচরণীয় কে অনাচরণীয় তাই বিচার করতে আমাদের সময় যায়। এবার আরেকটু একলা হ'তে হবে—নিজের কাপড়খানা নিজের হাতে বুনতে হবে। ত্রিশ কোটি মানুষকে ত্রিশ কোটি স্বতন্ত্র গণ্ডীতে না রেখে আমাদের স্বস্তি নেই। হিন্দুর গ্রাম থেকে হিন্দু মুসলমানদের গ্রাম থেকে মুসলমান বেরিয়েছে ব'লেই না দাঙ্গা! ব্রাহ্মণের গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের গ্রাম থেকে চণ্ডাল বেরিয়েছে বলেই না দ্বন্দ্ব! অতএব "Back to Villages"।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ভোজন করতেন, যে-সব ঘরে বেগম সখীদের সঙ্গে গল্প করতেন বা অতিথিচর্য্যা করতেন বা নাচের মজলিস্ ডাকতেন, সে-সব ঘর এখন সামান্য কিছু দর্শনী দিলে কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তার লোকের সম্পত্তি। দশ বছর আগে সাধারণের চোখে যা আলাদীনের প্রদীপের মতো ছিল তাই এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তারই মতো সাধারণ মানুষকে বাদশাহ পদবী দিয়ে তারই গৃহের মতো সাধারণ গৃহকে অমরাবতী কল্পনা করেছিল এবং সমস্ত ব্যাপারটির গায় পুরাণ ইতিহাস রূপকথার সোনার কাটি ছুঁইয়ে সেটিকে নিজের প্রতিদিনের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে রেখেছিল। ঈশ্বর-ভক্তির মতো রাজভক্তিও মানুষের নিজের তৃপ্তির জন্যে; এবং একটা কাল্পনিক দূরত্বই তার প্রাণ। আজ সে-দূরত্ব ঘুচে গেছে; প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে যে রাজপ্রাসাদটা বাহির থেকে হাঁ ক'রে দেখ্‌বার মতো এমন কিছু মায়াপুরী নয়, বারো আনা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ কর্‌লে নিতান্তই রক্ত মাংসের মানুষের আহার-নিদ্রার স্থান, এবং ছোট ছোট মান অভিমান পরশ্রীকাতরতার দাগে দাগী। মানুষে মানুষে যে কাল্পনিক ব্যবধান এত কাল এত কাব্য ও এত কলহ উদ্রেক করেছিল আজ মনে হচ্ছে—সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। এবার মানুষ যে নতুন জগতের দ্বারে দাঁড়িয়েছে সে-জগৎ দিনের আলোর জগৎ, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা তার নাড়ীনক্ষত্র জানা, কোথাও একটু কল্পনার অবকাশ নেই, নিদারুণ মোহভঙ্গের মধ্যে তার পথ। কোন্ রাজপ্রাসাদকে দেখে স্বর্গ কল্পনা করবে? কোন্ রাজাকে দেখে দেবতা? কোন্ রাজপুত্রকে নিয়ে উপকথা রচনা কর্‌বে? কোন্ রাজবংশকে নিয়ে কাব্য? তাই শেক্‌সপিয়ারও আর হয় না, রবীন্দ্রনাথও আর হবে না।

রসেটি — দেবদূত ও কুমারী মেরী

গী দো রেণি যীশু

ভেলাস্‌কেস্ মার্থার গৃহ
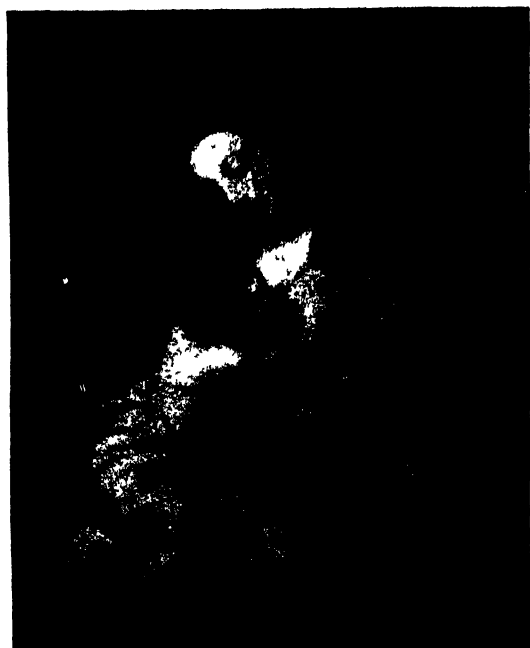
টিশিয়ান্ মাতা ও শিশু

র‍্যাফেল্ জননী, শিশু ও সেণ্ট্ জন্

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

বনলতুস　　সবলতা

মুবিলো　　জলপান

টার্ণার　　কুহেলিকার অন্তরালে সূর্য্যোদয়

সমাধি

মিকালেঞ্জেলো

অশ্বপৃষ্ঠে প্রথম চার্লস্

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক
নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত।
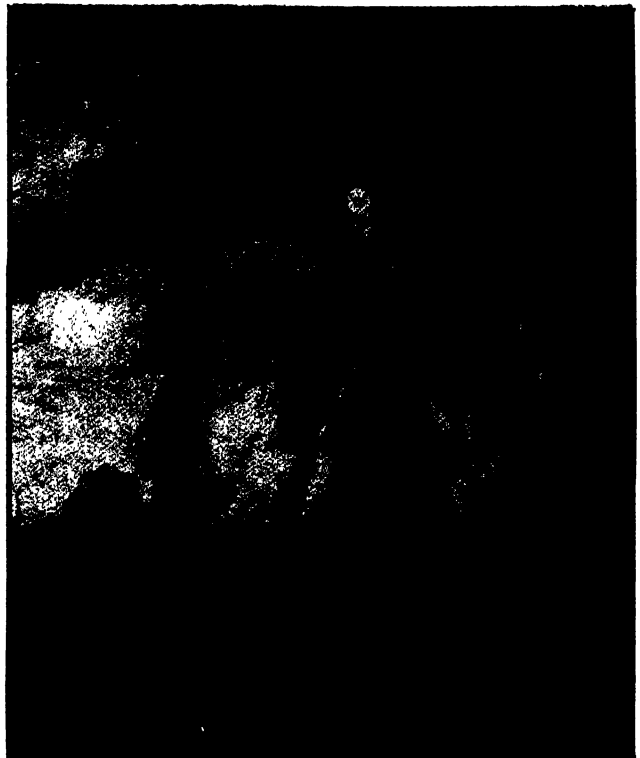
ভ্যান্ডাইক্

মনের চালনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে যে জীব আছে সেই জীবাণু কেবল একই জায়গায় থেকে ঘুরতে থাকে। তাদের খাদ্য তাদের কাছে এসে পৌঁছলে তবে তারা খায়। গাছপালা খাদ্যের সন্ধানে মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে দেয় এবং আলোর খোঁজে তাদের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। কিন্তু তবু তাদেরও এই সন্ধান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

যারা এদের চেয়ে উচ্চ পর্য্যায়ের জীব খাদ্যের সন্ধানে তাদের প্রয়াস আরো বেশি বিস্তীর্ণ। এই প্রয়াস তাদের বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে দেহকে নানা প্রকার গতি দান করতে থাকে। এই গতির বৈচিত্র্যে এবং উৎকর্ষেই জীবনের পূর্ণতা। প্রাণ শব্দের অর্থই হচ্চে চলা।

গতি যতই বৃহৎ ও বিচিত্র হয় জীব ততই তার জীবনযাত্রায় নানা বাধায় এসে ঠেকতে থাকে। কেবলি এই বাধার প্রতিঘাতে সে বিশ্বের এবং নিজের পরিচয় পায়। গতি যতই সঙ্কীর্ণ, বাধা ততই অল্প, চেতনা ততই ক্ষীণ, জ্ঞান ততই ক্ষুদ্র।

জীবন যখন অভ্যস্ত পথে বাঁধা নিয়মেই চলে তখন তার মন জাগ্‌তে চায় না। সুতরাং তখন মানুষ যেটাকে দেখে সেইটেকেই একান্ত ক'রে জানে। তার অন্তরে কিম্বা বাইরে আর কিছু আছে কি না এ প্রশ্নমাত্রও তার বুদ্ধিতে জোগায় না।

কিন্তু মন নাকি কেবল মাত্র বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়েই জানে না, তার অন্তরের ইন্দ্রিয় না কি দেহের ইন্দ্রিয়কেও বহু দূরে ছাড়িয়ে যায় এই জন্যে জাগ্রত মনের প্রশ্ন থামতে চায় না। এই জন্যে বহিরিন্দ্রিয় তার সাম্‌নে যা কিছু এনে উপস্থিত করচে সত্য সম্বন্ধে সেই গুলোকেই সে চরম সাক্ষী ব'লে গণ্য করে না। সে বল্‌চে, আমি সত্যকে চাই; যা আমার কাছে যেরূপেই আস্‌চে তাকেই যে আমি সেইরূপেই সত্য ব'লে জান্‌ব তা হবে না। আমি নিজে এগিয়ে সন্ধান ক'রে সত্যকে বের করব।

তাহলেই দেখা যাচ্চে প্রাণ তখনি উৎকর্ষ লাভ করে যখনি বাধা ভেদ ক'রে প্রাণযাত্রার সমস্ত উপকরণকে সে সন্ধান করতে থাকে; মনও তেমনি আপন শক্তির উৎকর্ষ তখনি প্রাপ্ত হয় যখন সে, যা-কিছু তার সাম্‌নে আস্‌চে, তাকেই অলসভাবে মেনে না নেয়। সত্যকে সে সন্ধান করবে প্রশ্ন করবে আমাদের মনের পক্ষে এইটেই হচ্চে যথার্থ প্রাণক্রিয়া।

পৃথিবীতে একদল মানুষ আছে তারা, যা কিছু উপস্থিত, তাতেই লগ্ন হ'য়ে আছে। এরাই পৃথিবীর দুর্গতিগ্রস্ত মানুষ। এদের রোগ দৈন্য অজ্ঞান অপমান কিছুতেই ঘোচেনা। আর একদল তারা তাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপরে পরাশ্রিত জীবের (Parasites) মত লগ্ন হ'য়ে নেই, সমস্ত দেহ মন দিয়ে তারা জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আবিষ্কার করচে এবং উদ্ভাবন করচে। এরাই জগতে অগ্রসর হচ্চে, কেননা এদের প্রাণ ও মন বিচিত্র গতির দ্বারা সচল হ'য়ে উঠেচে। এই সচলতার দ্বারাই শক্তি মুক্ত হ'তে থাকে, শক্তির আবরণ ক্ষয় হয়, তার বাধা জীর্ণ হ'য়ে দূর হ'য়ে যায়।

কি জ্ঞানে কি কর্ম্মে আজ য়ুরোপের যে উন্নতি সে স্পষ্টই দেখা যাচ্চে। আজ পৃথিবী জুড়ে তাদের আধিপত্য। কোথা থেকে এই আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি তারা পেলে? এই সমৃদ্ধি তার মনের সমৃদ্ধি; তার মন সম্পূর্ণ সজীব। এই মন কোথাও এসে ঠেকে যায় নি, থেমে যায় নি। এই জন্যে বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বের শক্তির সঙ্গে তার নিরন্তর জীবনের যোগ ঘট্‌চে—তাই অন্তরে বাইরে সে কেবলি বেড়ে উঠ্‌চে।

মানুষ মনোবান জীব। এই জন্য তার জগতের বা জীবনযাত্রার যে-কোনো অংশের সঙ্গে তার মননশীল মনের যোগ না ঘটে সেই অংশটাই এই চিৎপ্রধান জীবের বিরুদ্ধ, সেটার সঙ্গে এর গভীর অসামঞ্জস্য, সেইখানে এর পরাভব,

সুতরাং সেইখানেই এর দারিদ্র্য, সেইখানেই এর সকল প্রকার দুঃখের কারণ বর্ত্তমান। মনন-যোগের বাধা দূর ক'রে যারা আপনার মনকে যে পরিমাণে নিকটে ও দূরে বিস্তীর্ণ করেচে তারা সেই পরিমাণে আপনার শক্তির ক্ষেত্রকে মুক্ত করেচে এবং সম্পদের অধিকারী হয়েচে।

এমনতর বুদ্ধি আছে যা এমন কথা বল্‌তে চায় যে, সত্যের আবিষ্কার শেষ হ'য়ে গেছে, অনেক হাজার বছর পূর্ব্বেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে যা-কিছু জানবার তা জানা এবং যা-কিছু করবার তা করা হ'য়ে গেছে, এখন সেই অতীত কালের উপর স্তব্ধ হ'য়ে লগ্ন হ'য়ে থাকা ছাড়া আর যা-কিছু করব তাতেই আমাদের ভুল হবে, অপরাধ হবে; অতএব অন্যে যা ব'লে গেছে তাকেই মেনে যাওয়া অন্যে যা ক'রে গেছে তারই অনুসরণ করা আমাদের এখন একমাত্র কাজ; সুতরাং জীবনের খুব একটা বড় ক্ষেত্রে মনের কোনো দরকার নেই তা নয়, সেখানে মনই শত্রু; সুতরাং সে সব ক্ষেত্রে জড়ত্বেই মানুষের সার্থকতা, তার পুণ্য।

তাই যদি হয় তাহলে সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সুরের মিল হবে কেমন ক'রে? এ কথা যদি সত্য হ'ত যে এই বিশ্বে কোনো একটা জায়গায় যা কিছু হবার তা হ'য়ে গেছে, সেখানে সংসারে সত্যের প্রকাশ নিস্তব্ধ, তা হ'লে যে-মানুষ থেমে থাকত পৃথিবীতে তারই হ'ত জিত, কেননা তারই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের মিল হ'ত, যে কেউ চল্‌তে যেত সেই চূরমার হ'য়ে মারা যেত। কিন্তু সৃষ্টির ক্রিয়া চলেইচে, কোনোখানেই থেমে যায় নি; বিশ্বকর্ম্মা জড় পদার্থ নন এইজন্য সত্যের প্রকাশ নিত্যই চলমান; নবনবরূপে সে আপনাকে উদ্ঘাটিত করচে। এমন অবস্থায় যদি দেখি এই বিশ্বসত্যের সচলতার উজান দিকে মানুষের মন তার ধর্ম্মে তার সমাজে একটা জায়গায় এসে চিরকালের মত ঠেকে গেল তা হ'লে জান্‌তে হবে তার এই থামাটা হচ্চে নিখিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অতএব তাকে মার খেতেই হবে, তাতেও যদি বিচলিত না হয় তা হ'লে মরতে হবে।

সত্যকে যারা তর্কশাস্ত্রের কোঠার মধ্যে বেঁধে দেখ্‌তে চায় তারা বলে, যা চল্‌চে তাকে ত পাওয়া যায় না; এবং কিছুই যদি নাই পাই তা হ'লে ত সত্যের কোনো অর্থ থাকে না। সুতরাং যা কিছু চঞ্চল তাই মায়ামৃগের মত অসত্য, তা আমাদের দৌড় করায় কিন্তু কিছুই দেয় না। কিন্তু এ রকম তর্ক কেবল কথার ফাঁকি। যা চলে তাকেও আমরা পাই। কেননা একদিকে তা যেমন অসমাপ্তির দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট, আরেকদিকে তা তেমনি ঐক্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। আমরা নিজেকে জানিনে এ কথা বলা চলেই না, অথচ আমরা ত শিশুকাল থেকে কেবলি পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে চলেচি। তবু সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঐক্য আছে—এই ঐক্যকে নিয়তবিকাশমান রূপে জানা নিজেকে সত্য-রূপে জানা; নিজের সেই ঐক্যকে কালের কোনো একটা অংশে একান্ত আবদ্ধ ক'রে জানাই মিথ্যা।

যে সত্যের প্রকাশ সমাপ্ত নয় তাকে যারা সচলভাবে অনুসরণ করচে তারা উন্নতির দ্বারা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রমাণ করচে যে তারা সত্যকে পাচ্চে। আমাদের দেশে সাহসপূর্ব্বক মনকে সেই নিত্য-সচেষ্টতার পথে প্রবর্ত্তন করার বাধা আমরা শিশুকাল থেকেই পাচ্চি। প্রশ্ন করবে না, সন্ধান করবে না, অগ্রসর হবে না, এই নিষেধ নানা আকারে পদে পদে মান্‌তে মান্‌তে নিয়ত অভ্যাসে আমাদের মন আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্চে। আমাদের সমাজধাত্রী সকল বিষয়েই আমাদের মনকে আফিম খাইয়ে শান্ত ক'রে রাখ্‌চে। এমনতর আফিমখোর মন কেবলি ঝিমোয় এবং স্বপ্ন দেখে, নিজেকে রাজা বাদশা ব'লে কল্পনা ক'রে মিথ্যা অভিমানে অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে থাকে। এমনতর মনের বাঁচায় মরায় প্রভেদ প্রায় থাকে না। আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব নিয়ে তারস্বরে বিলাপ ক'রে থাকি, কিন্তু আমাদের দেশের সব চেয়ে বিপদের কথা এই যে, আমাদের সমস্ত সমাজের প্রধান লক্ষ্য আমাদের মনের পায়ে শক্ত ক'রে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া। তাকেই আমরা ধর্ম্ম বলি, শ্রেয় বলি, সুতরাং তাকে নিয়ে আমরা অহঙ্কার করি। একথা আমরা কোনমতেই চিন্তা করতে চাইনে যে, যে-জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় উৎকর্ষ লাভ করেচে, তারা জ্ঞানের পথে কর্ম্মের পথে নিজের মনকে বন্ধনমুক্ত করেচে, মনকে তারা যতই চল্‌তে দিচ্চে ততই তারা জড়ের শাসনকে লঙ্ঘন করচে, ততই তারা সকল

মনের চালনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিকে সহজেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করচে। আমরা মনকে শাস্ত্রের গারদের মধ্যে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, খাওয়া ছোঁওয়া ওঠাবসা প্রভৃতি জীবনের সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার সম্বন্ধেও নিরর্থকতার বেড়াজালে নিজেদের আটক ক'রে কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য পরের হাত থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে মুক্তি লাভ করব এই স্থির ক'রে নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনই ঘটেনি। কোন গাছ যদি নিজের শিকড়কে ধ্বংস ক'রে ফেলে নির্জ্জীবভাবে অন্য গাছের শাখা থেকে বিচ্যুত ফলকে কামনা করে সে তার পক্ষে যেমন সফলতা, আমাদেরও কি তেমনি ঘটচে না? আগাগোড়া আমাদের সমস্ত জীবনের সঙ্গেই যদি উন্নতিশীল সত্যের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসি তা হলে কি একমাত্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই আমরা মুক্তির পথে চলতে পারব? আগেপিছে আমাদের নৌকো থাকবে ছোট বড় নোঙরে বাঁধা, কেবল একটিমাত্র মাস্তলে গুণ বেঁধে তাকে প্রবল স্রোত পার ক'রে নিয়ে চলব? যখনই সে কাজ করতে যাব তখনই আমাদের সনাতন বেড়িগুলো নিয়ে সত্যের সঙ্গে কি বোঝাপড়া করতে হবে না? অপরের বদান্যতার একটা কোনো মন্ত্র ব'লেই কি অতি সহজে আমরা নিষ্কৃতি পাব?

পৃথিবীতে যারা বিজয়ী জাতি তারা শুভক্ষণে চলার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচে। আমাদের দেশে আমরা ধর্ম্মের নাম ক'রে জড়তার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচি। নূতনের আহ্বান বারে বারে আসচে, কখনো বজ্রস্বরে কখনো বেদনার রবে বলচে, বেরিয়ে এস, বলচে বাঁধন কাট, চলবার পথে সকল যাত্রীর সঙ্গে যোগ দাও! আর বারে বারে আমাদের দেশে এক একজন অচলপন্থী উঠে বলচেন, চলবার দরকার নেই। আর তাঁদের প্রদক্ষিণ ক'রে আমরা নৃত্য করচি। তাঁদের কথাকেই আমরা ধ্রুব সত্য ব'লে মানচি, এইজন্যে যে, তাঁদের কথার সঙ্গে আমাদের চির জীবনের অভ্যাসের সঙ্গে মিল হচ্চে; এইজন্যে সমস্ত বিশ্বের সত্যের সঙ্গে আমাদের আচরণের অনৈক্য নিয়েই আমরা বেশি ক'রে গৌরব করি, মনে করি এই অনৈক্যেই আমাদের আভিজাত্য।

এইজন্যে দেখতে পাই অভ্যাসদোষে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়েচে; অথচ কোনো একটা জড়বুদ্ধির কথা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজে গ্রাহ্য হয়। আমাদের আশ্রমে অনেকবার তার প্রমাণ পেয়েচি। কোনো একটা অদ্ভুত কথা, যা অন্য দেশের ছেলেরা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কখনই গ্রহণ করত না, আমাদের ছেলেরা সেইটেকেই আরো আগ্রহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। কিছুদিন পূর্ব্বে দেখেছিলুম আশ্রমের বালকদের অনেকের কপালে ক্ষত চিহ্ন। একসঙ্গে এতগুলি বালকের একই জায়গায় এই রক্তপাতের চিহ্ন দেখে আমি তার কারণ সন্ধান ক'রে জানলুম যে ছেলেদের মধ্যে কে এদের বলেচে যে কপালে ক্ষত করলে সেই ক্ষতস্থান থেকে পাপ বেরিয়ে যায়। যেমনি বলা অম্‌নি এই কথাটাকে বিশ্বাস করতে এবং এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করতে এদের কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। অথচ স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের কাছে যদি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দোহাই পাড়া যায়, কল্যাণসাধন সম্বন্ধে এদের উদ্যোগী বুদ্ধিকে যদি আহ্বান করা যায়, তা হ'লে এদের কাছ থেকে তার সাড়া পাওয়া কতই কঠিন। এ'তে এদের দোষ দেওয়া যায় না, কেন না প্রবল সমাজ আমাদিগকে প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কেবলি ব'লে এসেচে, "সত্যের সন্ধান কোরো না।" তাই যে-সত্যকে সন্ধান ক'রে প্রমাণ ক'রে চিন্‌তে হয় আমাদের মন সেই সত্যকে গ্রহণ করবার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ প্রাণবান মন যে-রকম ক'রে আপন খাদ্যকে নিজের রসে জীর্ণ ক'রে তাকে আপন ক'রে তোলে, আমাদের মন সে রকম ভাবে সত্যগ্রহণ করতে বিমুখ, কিন্তু জড় পদার্থ যেমন ক'রে বিনা চেষ্টায় বিনা নির্ব্বাচনে বাইরের জিনিষের সঙ্গে আসক্ত হয়, আমাদের মন তেমনি জড়ভাবে অতি সহজেই সমস্ত সংস্কারকে নির্ব্বিচারে বহন করে, তাতে লজ্জা নেই—দ্বিধা নেই। এই জড়তাই হচ্ছে ভয়ানক বন্ধন এবং মানুষের সকল বন্ধনেরই মূল। কেন না সত্যের প্রকাশ চলমান ব'লেই সত্য মানুষের মনকে মুক্তি দিতে থাকে। মানুষ যখনি তাকে বাঁধা কথায় ও নিয়মের অভ্যাসে পাকা করতে থাকে তখনি সত্য অন্তর্দ্ধান করে, আর তার জায়গায়

কেবল মত ও সংস্কার প'ড়ে থাকে। অন্য দেশেও এরকম দুর্বিপাক মাঝে মাঝে ঘটে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না; সেখানে প্রশ্নজিজ্ঞাসু মনের প্রবাহ আপনি আপনার বন্ধনকে আঘাত করতে থাকে, তাতেও যখন বাধা দূর হ'তে চায় না তখন বিপ্লব বাধিয়ে দেয়।

কেবলি মেনে যাবার অভ্যাসের মস্ত এই দোষ যে, তাতে ক'রে অমঙ্গলকে স্থায়ী ব'লে ভ্রম আমাদের মনে পাকা হ'য়ে যায়। আমাদের নিজের মন স্থাণু হ'য়ে বসেচে ব'লেই জীবনের সমস্ত বাধাকে সমস্ত দুঃখকে সে ধ্রুব ব'লে কল্পনা করে। এই জন্যে অকল্যাণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ভরসা পর্য্যন্ত তার থাকে না। যা আপনিই হয় তাকেই সে মেনে নিয়ে ব'সে থাকে। পাশ্চাত্য দেশে যেখানেই ম্যালেরিয়া এসেচে, মরক এসেচে, অন্নকষ্ট এসেচে, অত্যাচার দেখা দিয়েচে, কোনোটাকেই সেখানকার লোকে অনিবার্য্য ব'লে চুপ ক'রে ব'সে থাকেনি। তাদের চল্‌তি মন সকল বাধাকেই ঠেলে চালিয়ে দিচ্চে সরিয়ে দিচ্চে। কিন্তু যারা মনের পায়ে বেড়ি পরানোকেই কৌলীন্য ব'লে ঠিক ক'রে ব'সে আছে, তারা, শুধু নিজেদের নয়, সমস্ত মানুষের শত্রু হ'য়ে বসেচে। কেননা পৃথিবীর যে-অংশেই মানুষের জীবন-যাত্রার পথে বাধা জম্‌চে সেইখানেই সমস্ত মানুষের বিপদ এবং ক্ষতি সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌চে। মানুষের পক্ষে যা কিছু দুঃখ তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে পৃথিবীর সকল মানুষকেই পূর্ণ শক্তিতে প্রস্তুত হ'তে হবে। আমাদের দেশে শিশুকাল থেকে আমরা সেই শক্তিকে সকল দিকেই দুর্ব্বল করবার জন্যেই বহু যুগ থেকে সামাজিক সাধনা ক'রে আসচি; সেই সাধনাকে আজ আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও নানা তর্কের দ্বারা নূতন উৎসাহে সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়েচেন। মনের এই জড়তাকে আমরা যত দিন রক্ষা করব ও পূজা করব ততদিন আমাদের দেশে রোগ দৈন্য অত্যাচার প্রভৃতি সকল দুঃখই স্থায়ী হ'য়ে থাকবে। কেননা সত্যকে পাওয়াই হচ্চে সকল কল্যাণের আকর; কিন্তু মন যেখানে চলে না সেখানে সে সত্যের চিরপ্রবাহমান প্রকাশ-স্রোতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী; স্রোতের মাঝখানে সে খোঁটার মত দাঁড়িয়ে থেকে নিজের চারিদিকে কেবলি আবর্জ্জনা বিস্তার করতে থাকে।

সত্যমহারাজ বিশ্বের পথে জয়যাত্রায় বেরিয়েচেন—তাঁর আহ্বানের শঙ্খ দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্চে। যে সব ভীরু, যে সব অলস, যে সব আত্মবঞ্চনাকারী তার্কিক তাঁর পথের মাঝখানে শাস্ত্রের বচন জড় ক'রে তুলে তাঁর রথকে ঠেকাবার জন্যে পণ করেচে তারা কি কোনোমতেই বাঁচতে পারে? যে সমাজ চলবার লোকের সমাজ নয়, যে সমাজ পঙ্গুদের সমাজ, সে সমাজ কি সত্যের বিরুদ্ধে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে? আর শুধু কেবল প্রাণধারণ করাই কি মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা? মানুষের মনের জীবন কি মানুষের দেহের জীবনের চেয়ে বড় নয়? বাধা ভেঙে ফেলে সত্যের দীক্ষা নিতে হবে। পথিকদের রাজা স্বয়ং বেরিয়েচেন। প্রতিদিন তাঁর কাছ থেকে প্রশ্ন আস্‌চে, "কতদূর তোমরা এগলে?" আমরা কি গর্ব্ব ক'রে প্রতিদিন সেই প্রশ্নের একই উত্তর দেব, "এক পা-ও না?" বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ সেই একই উত্তর? তারপরে আমরা বিশ্বের যাত্রাপথের চৌমাথায় একই জায়গায় সনাতন কৌপীন প'রে ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর যে যাত্রীরা পথিক-রাজের রথে চ'ড়ে চলেচে তাদের কাছে কখনো স্পর্দ্ধার ভাণ ক'রে কখনো বা কান্নার সুরে দুই শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা করতে থাকব, "আমাদের অন্ন দাও, আরোগ্য দাও, জ্ঞান দাও, পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্য দাও?" তারপর তারা যদি জিজ্ঞাসা করে, অন্নের, আরোগ্যের, সত্যের, স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল না কেন? তার উত্তরে কি বারে বারে সেই এক কথাই বল্‌ব যে, চলা আমাদের নিষেধ, কেন না জগতের মধ্যে আমরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; সেই জন্যে যারা যাত্রী, যাদের কোথাও চলার কোনো নিষেধ নেই, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া আমাদের পক্ষে আর সকল রকম পথ অবরুদ্ধ? তাই যদি হয়, তা হ'লে এত বড় নিশ্চল কৌলীন্যের জগদ্দল পাথর গলায় বেঁধে বিনাশের রসাতলে আমরা তলিয়ে গেলেই বা জগতে তাতে কার কি ক্ষতি?

একলা পথিক

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

১

বউ আর শ্বাশুড়ীর মন পায় না।

গোটা সংসারের কাজ এক হাতেই করে—সকালের ঘর ঝাঁট থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্রে হেঁসেলে কুলুপ দেওয়া পর্য্যন্ত শ্বাশুড়ীকে উপর থেকে নামতে দেয় না। ঠাকুরঝিকে একঠাঁয় বসিয়ে রাখে। সাহচর্য্য থেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করে। সে যে কত বড় দুঃখ, যে জানে সেই জানে। তবু শ্বাশুড়ীর মন ওঠে না। মুখ ভার ক'রে থাকেন।

বউ ভাবে কেন এমন হয়? ওঁকে তো মায়ের মতই মানি। নিজে মা হ'য়েও মা হ'তে পারলুম না, তাই কি? পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি সলতেই যে একটি একটি ক'রে নিভেছে! কিন্তু যার জন্যে স্বামীর ভালবাসা হারাই নি, তার জন্যে শ্বাশুড়ী রাগ করেন কেন? বড় লোকের মেয়ে হ'লেও ছোট ঘরের মেয়ে বলে কি? কিন্তু আমার মন কি সত্যি ছোট?

বউ ভাবনার কূল কিনারা পায় না। প্রবাসী স্বামীর পত্রের আশায় ডাকপিয়নের পথ চেয়ে জানলার ধারে ব'সে বউ এম্‌নি এক একদিন তার ভাবনা-রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মনটাকে ছুটিয়ে নেয়।

বাংলা দেশের মেয়ে তত বয়েস না হ'লেও বয়েস হয়েছে বই কি! তবু সপ্তাহে সপ্তাহে পত্র যায়। সপ্তাহে সপ্তাহে পত্র আসে। শীতের শেষে আমবনে বসন্তের নিশ্বাসের মত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আনাগোনা করে পত্রের এই যাদু। শুক্‌নো ডালে কচি পাতা বেরোয়।

কিন্তু এত কি কথা লেখার থাকে এই বুড়ো বয়েসে?

ঠাকুরঝি হেসেই আকুল! বলে—যাই বল বাপু, এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি, বউদি! আমাদের হাতেও তো নোয়া রয়েছে। না, নাই? তোমার হাতের নোয়া যে দাদার গলায় বক্‌লস্ হয়ে উঠ্‌লো! ছিঃ!

তার বিশ্বাস বেচারা দাদা বউয়ের তাড়া খেয়েই সপ্তাহে সপ্তাহে এই পত্র লেখার হুকুম তামিল করে।

বউ বলে—তবু ভাল, তোমার দাদাকে বক্‌লস্-ওয়ালা কুকুর ব'লেই রেহাই দিলে; গাধা কি ভেড়া বানাও নি, ঠাকুর ঝি!

ঠাকুর ঝি বলে—সত্যি তো! প্রভুভক্ত কুকুর, লেজ নাড়ে, পা চাটে! না হয় শিক্‌লিতে টান্ খেয়ে মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। শিক্‌লিটে অত যখন-তখন টেনো না বউ! মানায় না আর।

বউ ঠাকুরঝির কথা শুনে মলিন ক'রে হাসে। মনে কষ্ট তো পায়ই। তা' ব'লে রাগ করে না। জানে এ-সব কথা নিয়ে রাগারাগি করা চলে না। তর্ক করাও চলে না। মিষ্টি কথা বিষ হ'য়ে ওঠে। স্বামী যে লেজ নেড়ে তার পা চাটেনা বউ ভাল মতই জানে। তা ব'লে কোমরে আঁচল বেঁধে সাফাই গাইতে পারবো না তো।

হাল্কা-সুরে বলে—না ভাই, আল্‌গা দিতে সাহস পাইনে। কি জানি যদি লুফেই নাও!

এমন কি স্বামীর দুই জোড়া ঠ্যাং আর একটি লাঙ্গুলের কল্পনা ক'রে মনে মনে হাস্‌তেও চেষ্টা পায়।

ঠাকুরঝি চোখ ঘুরিয়ে বলে—নাও, থামো! বাজে ব'কো না আর।

বউ বলে—আচ্ছা কাজের কথাটাই বা কি শুনি না?

ঠাকুরঝি বলে—দুধের সাধ ঘোলে মেটে না। আঁচলের ধন আঁচলেই বাঁধ না? চাবির রিংয়ের সাথে পিঠের উপর দিনরাত টুং টাং করবে।

বউয়ের হাসিটি দেখতে দেখতে নিভে যায়—ছিট্‌কে-পড়া তারার ক্ষীণ আলোর রেখাটির মত।

তার স্বামীগর্ব্ব অপরিসীম। তাই একটু আঘাতেই মন ব্যথিয়ে ওঠে। কেন যে ওরা তার স্বামীকে বউয়ের

আঁচল-ধরা বলে তা জানেনা। নিজের স্বার্থের জন্যে স্বামীকে দিয়ে কোনো অন্যায় কাজ করতেই পারেনা, স্ত্রীর কথায়ই হোক আর তার মা-বোনের কথায়ই হোক, এই বিশ্বাস বউয়ের খুবই আছে।

বউ দুই ভুরু এক ক'রে বলে—টুং টাং?

তারপর হেসে বলে—তা বল্‌বেই তো, ভাই। তোমরা তো কেউ জানো না তোমার দাদা যে কী আশ্চর্য্য মানুষ।

মাথা নেড়ে বলে—নাঃ, কেউ জানো না তোমরা। কেউ নাঃ!

আবার হেসে বলে—আমিই কি ছাই জানি; না, তাকে সবটা বুঝি!

বউয়ের চোখ সজল হয়। প্রবাসে কি কষ্টে স্বামীর দিন কাটে এঁরা তো কিছুই জানে না। সে-ই এই পত্রের ভিতর দিয়েই এক আধটুকু আঁচ পায়, আর অনুক্ষণ তার বুকের নাড়ীগুলো টন্‌টন্ করতে থাকে। তার উপর ঠাকুরঝির এই শ্লেষ-ভরা ইঙ্গিত। বড় কঠিন হ'য়ে বাজে!

দু এক ফোঁটা চোখের জল বউয়ের হাতের নোয়ার উপর পড়ে।

ঠাকুরঝি আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে—ও কি, ভাই! কী হাপুস-নয়নে তুমি!

বউ এক ঝাপটায় হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বলে—তোমরা বোঝ না, তাই অমন ক'রে বল। কিন্তু আমাকে যা খুসি তোমরা ব'লো, টু শব্দটি করবো না। করিও না তো! তোমার দাদাকে নিয়ে কিন্তু টানাটানি করো না, ভাই।

গলা কোমল ক'রে বলে—মনে বড় লাগে। ওঁকে নিজের হাতের সেবা যত্ন দিয়ে সুখে রাখ্‌তে পারি নি। তার উপর তোমরা যদি ওঁকে অন্যায় ক'রে কিছু বল, আমার দুঃখের বোঝা অসহ্য হ'য়ে ওঠে!

ঠাকুরঝির গালে টোকা মেরে বলে—তোমার দাদার মত আমার মন তো বড় নয়। কত তুচ্ছ কথা নিয়ে কত অনাছিষ্টি করি। আর তিনি হ'লে কি করতেন জানো? বলতেন, নীহারের বুদ্ধি সুদ্ধি আর হ'লো না, তরু! সেই কচি খুকিটিই র'য়ে গেল! আর একটু একটু ক'রে হাসতেন শুধু!

ওর মানস-নয়নে ধরা পড়ে স্বামীর মুখের সস্নেহ হাসির সকৌতুক রেখাটি। ওর কানে গুঞ্জরণ তোলে স্বামীর তরু বলার বিশেষ ভঙ্গিমাটি!

নিজের মুখে নিজের স্বামীর প্রশংসা শুনে নিজেই তন্ময় হয়। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে বাজ্‌তে থাকে গানের মত—কী আশ্চর্য্য মানুষ তিনি!

২

কিন্তু মানুষটি যে খুবই আশ্চর্য্য হলপ্ ক'রে বলা চলে না।

সত্যেন বি,এ পাশ ক'রে পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাষ্টারি করে কলকাতার কোনো একটা ইস্কুলে। দশ জনের মত-ই সে তার মাকে ভালবাসে, বোনকে ভালবাসে, স্ত্রীকেও ভালবাসে। একটু ইতর-বিশেষ এই যে তার স্ত্রী তরু ধনী শ্বশুরের কন্যা হ'য়েও তার মত গরিবের ঘরে এসেছে ধনের দেমাক বাপের বাড়ি রেখেই। বউয়ের এই স্ব-ইচ্ছায় ধন-মর্য্যাদা বিস্মৃতিই তাকে সব চেয়ে বেশি টানে। তারপর টানে তার আরো অনেক কিছু যার আস্বাদ শুধু সেই তার রসপিপাসু হৃদয় দিয়ে হাজারো রকমে অনুভব করে—মুখে প্রকাশ করে না, বা করতে পারে না।

দেখা না গেলেও বোঝা যায় স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমনি আশ্চর্য্য, স্বামীর কাছেও স্ত্রী তেমনি আশ্চর্য্য!

তাদের সংসার বড় নয়; ছোট-ই। স্বামী, স্ত্রী, বিধবা মা নয়নতারা, ছোট বোন নীহার, বোনাই অতুল আর তাদের ছোট দুই মেয়ে; কিন্তু সংসারটি নির্ভর ক'রে আছে একা তারই উপর। ইস্কুলের পঞ্চাশ টাকা ছাড়া আরো গোটা কুড়ি টাকা সত্যেন পায় টিউশানি ক'রে। তাই দিয়েই নিজের খরচ আর বাড়ির খরচ চালায়। অতিরিক্ত কিছু সে চালাতে পারে না।

এইখানেই সত্যেনের মুস্কিল।

সত্যেনের বাবা বিনয় মিত্তির আদালতের পেস্‌কার ছিলেন। হিসাবী ছিলেন না। বাঁ হাতে যা এনেছেন, ডান হাতে খরচ করেছেন। "বিনয় কুটীর" খাড়া ক'রে গৃহপ্রবেশের সময় সহরের ছোট বড় সব্বাইকে নেমন্তন্ন না করলেও চল্‌তো। মেয়ে নীহারের বিয়ে তত ঘটা ক'রে না দিলেও

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

হতো। ফল দাঁড়ালো এই যে, তিন দিনের ব্ল্যাক ওয়াটার ফিবারে মারা গিয়ে হাজার তিনেক টাকার কর্জ্জ শোধের ভারটা রেখে গেলেন সত্যেনের উপর। সত্যেনকে এম, এ পড়া ছেড়ে দিয়ে মাষ্টারি নিতে হ'লো। তখন সে দেখ্‌লে মাসে সত্তর টাকা আয়ের উপর নির্ভর ক'রে পেট্ চালাতে গেলে কর্জ্জ শোধ হয় না। কর্জ্জ শোধ করতে গেলে পেট চলে না।

সত্যেন ভাবে—কী বিপদ! একেই বুঝি বলে between the devil and the deep sea।

সহরের বাড়িটা বিক্রি ক'রে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাক্‌লে সহজেই কর্জ্জটা শোধ হয়। কিন্তু তার বিধবা মাকে সে একথা কোন্ প্রাণে বলে! নয়নতারার মন যে এই "বিনয় কুটীরের" ভিতের অনেক নীচু পর্য্যন্ত শিকড় মেলে আছে। কর্ত্তার বড় সখের বাড়ি এই। তাঁর বসবার ঘর। তাঁর পূজার ঘর, মার্ব্বেল পাথরের প্লীন্থ্। চিনা টাইলে মোড়া বাথরুম। ঝাঁঝ্‌রা আঁটা জলের কল। শান বাঁধানো চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার পাশে কর্ত্তার নিজের হাতে লাগানো পেয়ারা আর নেবুর গাছ দুটি। বাইরে ছোট ফুল বাগানটি। নয়নতারা এখনো নিজের হাতে ফুলের চারাগুলোর তদারক করেন। না, বিধবা মাকে "বিনয় কুটীর" হাত ছাড়া করতে সত্যেন কোনো রকমেই বলতে পারে না।

নীহারের স্বামী অতুল যদি মানুষের মত হ'তো সত্যেনের ভাব্‌না ঘুচ্‌তো।

কিন্তু সত্যেন ভাবে, লক্ষ্মী যাদের ঘরের সহস্রদল স্বর্ণ-পদ্মটিকে পায়ে দ'লে কুমোরের হাতে-গড়া মাটির ডেলায় পরিণত ক'রে গেছেন, তাদের মত অলক্ষ্মী দুনিয়ায় আর কেউ নেই বুঝি! অতুলচন্দ্র তাদেরই একজন তো! এক কালে তাদের অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। এখন আর কোনো ছলেই তাকে সচ্ছল বলা চলে না। অতুলের বাবা পাটের কারবারে ফেল মেরে সুধু কয়েক বিঘা লাখরাজ জমি অতুলের জন্যে রেখে যান। তাও মহাজনের কাছে রেহানে আবদ্ধ। অতুল ঋণ ক'রে ঋণ শোধ করাবার মত ঝক্‌মারিতে যায় না। জমি বিক্রি ক'রেই দেনা শোধ করে। এখন সুধু বাড়িখানাই সচল শ্রীর অচল স্মৃতিভারে হতশ্রী হ'য়ে প'ড়ে আছে। সব দেখে শুনে নয়নতারা নীহারকে নিজের কাছেই এনে রাখেন। কান টান্‌তে মাথাও আসে। থেকেও গেল। চাক্‌রি বাক্‌রির চেষ্টা করা মাথায় থাকুক্, অতুল বাড়ি ছেড়ে নড়বার নামটিও করে না!

নীহার বলে—জানো বউদি, পঁচিশ তিরিশ টাকার গোলামির জন্যে একে ধরা তাকে ধরা এখানে সেখানে টো-টো করা ওঁর পোষায় না। ওদের খুব নাম ডাক ছিল কিনা? মান সম্ভ্রমও ছিল।

তরু বলে—তোমার ভাই স্বামীভাগ্য ভাল। ঠাকুর জামাই চোখের আড়াল করেন না।

নীহার বলে—ঈস্! দাদাই বা কোন্ কর্ম্ম যান! হপ্তায় হপ্তায় তো আট পৃষ্ঠার চিঠি আসতে কিছু কসুর হয় না।

তরু কপট গাম্ভীর্য্যের সাথে বলে—তা ভাই দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে!

নীহার বলে—আর আমিই বুঝি ক্ষীরসাগরে হাবুডুবু খাই, না? কিন্তু যাই বল বাপু, দাদা তোমায় এক একখানা যা চিঠি লিখেন মনে হয় অই দুধের চেয়ে ঘোলই বুঝি ভাল।

তরু আঁৎকে ওঠে, তার হাত চেপে ধ'রে বলে—সর্ব্বনাশ! অমন কাজটি আর করো না, ভাই। চুরি ক'রে পত্র পড় জান্‌তে পারলে আর আমাকে আস্ত রাখ্‌বেন না।

এ তার গোপন ঐশ্বর্য্য, একান্তই তার—কৃপণের ধনের মত লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখ্‌তে চায়।

নীহার বলে—বাব্—বাঃ! দুধও নয় ঘোলও নয়। অবাক্ সন্দেশ! সত্যি ভাই, অবাক্ করলে তুমি!

তরু হেসে বলে—উপোষ দিয়ে দিয়ে শুক্‌নো আর-পোকার মত পেটে পিঠে এক হ'য়ে গেছি যে! ঠাকুর জামাই জানেন তো এরকম উপোষ করা সবার ধাতে সয় না।

নীহার বলে—ওগো, তা নয়। বলেন কি, এই মেয়ে দুটোকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করে।

বউ ঠাকুর-ঝির গাল টিপে বলে—ওগো, তার মানেই তাই!

সদ্যঃস্নাত কেশপ্রসাধন-রত, অতুলচন্দ্র বলে—তুমি বেশ মানুষ যা হোক বউদি। বলি, ভাত-টাত দেবে টেবে, না অভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ ব্যবস্থাই করেছ?

তরু বলে—তার চেয়ে ঢের ভাল ব্যবস্থাই করি না! পেটও ভরবে মনও ভরবে!

অতুল বলে—থাক্, কাজ নেই তোমার। তুমি এসো তো এস। একজনের রান্না আর একজনের পরিবেশন আমারও সইবে না, তোমারও সইবে না। তা ছাড়া মাথায় এত চুল আমার নেই যে গঙ্গা যমুনা দুই-ই লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি।

স্বামীর পাশে ঠাকুর-জামাইকে চোখেই পড়ে না। সত্যোনের মধ্যে একটি একান্ত আত্মনির্ভরতার দুর্জ্জয় সাহসিকতা আছে। সে দুর্ব্বল ব'লেই তার এই সাহসিকতা তরুর মনকে বেশি ক'রে মুগ্ধ করে। তরুর কাছে অতুল সত্যোনের ঠিক বিপরীত। তাকে সে ছেলেমানুষ ব'লেই মনে করে—সত্যোনের কাছে নীহারও যেমন ছেলেমানুষ।

অতুলের সাথে তরুর একটি সকৌতুক লঘু-হাস্যলীলা চলে।

অতুল তার থালার শেষ অন্নকণাটির সদ্গতি ক'রে কানের পাশ থেকে একটা খড়কে বের ক'রে মুখের দুরধিগম্য প্রদেশে চালনা করতে থাকে।

তরু বলে—উঠ্‌ছো না যে?

অতুল বলে—ঘাড় ধ'রেই তাড়াবে না কি? দেখ, কলিযুগের সতী সাবিত্রীরা যদি সত্যযুগের অন্নপূর্ণা হ'তে চান তা হ'লে আমাদের মত পেটুকদের পেটের নাড়ীভুড়ি-গুলোকেই হাতের পাঁচ ক'রে রাখ্‌তে হয়।

তরু বলে—তোমাদেরই দোষ। একমুঠো ক্ষুদ্ নিয়ে যে মহেশ্বর তুষ্ট হ'তেন, তাতে তাঁরই গুণপনা বেশি। তাঁর কপালের আগুন তো তোমাদের নেই। আছে শুধু পেটের আগুন, যে আগুন অন্নপূর্ণাও নিভাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এখন কি চাই তাই বল। জল খাও নি। কিছু আদায় না ক'রে যে উঠ্‌বে না তা জানি।

তার খালি থালায় আরো ভাত দেয়।

অতুল বলে—ঐ চচ্চড়িটে বউদি। পোলাও কোর্ম্মার কথা তো সত্যযুগের কাহিনী। দুঃখু নেই। কিন্তু তোমার এই চচ্চড়িটে—

তরু তার কুমড়ো ডাঁটা আর কাঁঠালের বিচির চচ্চড়ি সবটুকু অতুলের পাতে ঢেলে দেয়।

অতুল বলে—ওকি! তোমাদের জন্যে রাখ্‌লে না? বেশ, আমার ভাগে কারো ভাগ না পড়লেই হয়। এই দেখ! যা চাইলুম তাই। আঙুলের ফাঁকে আর কিছু গলে না। ছি বউদি! তোমার বাবা না জমিদার!

তরু হেসে বলে—আজ দেখি হনুমান হ'য়ে বসেছো! আবার আড়চোখে তাকায়!

দু' তিন হাতা আম্‌সির ডাল পাথরের বাটি থেকে অতুলকে দেয়।

অতুল বলে—তুমি অন্তর্যামী, বউদি। ঢালো খানিক্‌টা আরো! ব্য-অস্! এই মনে মনে তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, এইবার ঠিক উঠবো! আর জ্বালাবো না।

অতুল জানে তার এই উৎপাত তরু খুসিমনেই গ্রহণ করে। তাই চেয়ে-চিন্তেই সে খায়। নইলে কেড়ে খেতো। জামাতাবাবাজীবনদের আদবকায়দার বাহ্য বেশভূষা কোনদিন যে কোনখানে সে হারিয়ে বসেছে অতুল জানে না।

সে এম্‌নি পেটুক পাষণ্ড যে নীহারের জন্যেও এতটুকুন রাবড়ি পাতে অবশিষ্ট রাখ্‌লে না।

কিন্তু সংসারের কোনো কাজে সে লাগেনা। খায় দায় ঘুমায়, আর তার পৈত্রিক বাড়িটার সুবিধামত একজন খদ্দের খুজে বেড়ায়। তার চেয়ে দুই মেয়ের দুধের বাবদ যে দশবারোটা টাকা সত্যোনের মাসে মাসে লাগে তরু ভাবে সেই টাকা কয়টাও যদি অতুল জোটাতে পারতো!

সত্যোন মাকে লিখ্‌তে পারে না, অতুল একটা কাজটাজ জুটিয়ে নিলেও তো পারে। কি জানি মা হয়ত ভাব্‌বেন নীহারকে ও গলগ্রহ মনে করে। নীহার হয়ত ভাব্‌বে আজ বাবা বেঁচে থাক্‌লে দাদা কি আর এ রকম ক'রে বল্‌তে পারে।

তরুও একথাটা ভেবেছে। কিন্তু সত্যোনকে কিছু বল্‌তে পারেনি। তা ছাড়া, অতুলকে সে একটু কৃপা-মিশ্রিত স্নেহের চোখেই দেখে। তার সাথে হাস্যপরিহাস করে। কিন্তু সর্ব্বদা সজাগ থাকে, এই হৃত-গৌরব তরল-মতি যুবকটির মনে যেন সে কথায় এবং কাজে এতটুকু আঘাতও না করে!

একলা পথিক

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

৩

দোষ ধরার ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছুতেই খুঁৎ ধরা যায়। নয়নতারা পছন্দ করেন না যে তরু অতুলের সঙ্গে অতটা মেলামেশা করে। কি জানি, পুরুষের মন কখন কোন দিকে ঝোঁকে!

নয়নতারা তরুকে নিভৃতে ডেকে বলেন—দেখ বাছা অতুল আর ছোট্টটি নয়। ওকে অত নাচিয়ো না!

শ্বাশুড়ীর কথা শুনে বৌয়ের মুখে কথা জোগায় না।

চোখ্‌ মুখ লাল ক'রে বলে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!

শ্বাশুড়ীর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করে না। ঘরের কাজে মন দেয়।

নয়নতারা ফের বলেন—নিশ্চিন্ত হ'তে পারি কই! যা ঢলাঢলি হচ্ছে—

তরু হাতের কাজ ফেলে নয়নতারার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। মুখের ভাব শক্ত ক'রে কিছু একটা বল্‌তে ইতস্তত করে। শেষে কিছু বলে না। ফের হাতের কাজ ধরে।

মনে মনে হেসে বলে—অতুলের মত যারা না বুজেসুজে অন্যায় করে তাদের ক্ষমা করবার মত সাহস আমার আছে!

কিন্তু তার অকৃত অপরাধের অপ্রাপ্য শাস্তির নানা প্রকার আকৃতি দেখা যায়। তার হাতের মাজা পুজার বাসনকোসন তত নির্ম্মল হয় না। ঘরদোরের ধুলোবালি মরে না। উঠোনের জঞ্জাল সরেনা। তার হাতের রান্না মুখে রোচেনা।

তরু আবার ভাব্‌তে বসে। এতো না জেনে অন্যায় করা নয়। এ যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে চিন্তে তিল তিল ক'রে দ'গ্ধে মারা।

মায়ের নামে ছেলের কাছে সে লাগাতে পারে না। তত হীন প্রকৃতি তার নয়। নিজেই সব মুখ বুজে' সহ্য করে।

সত্যেন ভাবে-ইঙ্গিতে কিছু কিছু যে না বোঝে তা নয়। কিন্তু সংসারের এই সব খুঁটিনাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার মত অবসর অথবা ইচ্ছা তার ছিল না। তার তখন অন্ন-চিন্তা চমৎকারা! কি রকমে সে পিতৃঋণ শোধ করবে সেই তার জীবনের প্রধান সমস্যা। এই পর্য্যন্ত সে জানে যে, কারো প্রত্যাশা সে করে না। জমিদার শ্বশুরেরও না; দরিদ্র ভগ্নিপতিরও না। সংসারের ভার যত গুরুভারই হোক্‌, তাকেই তো বইতে হবে। সে তাই বয়। পণ ক'রে বসেছে কারো কাছে হাত পাতবে না, মরে আর বাঁচে! আরো একটা টিউশনি সে যোগাড় ক'রে নেয়। সম্প্রতি তার মাসিক আয় আশী টাকা। ত্রিশ টাকা মাকে পাঠায়। ত্রিশ টাকা মহাজনের কাছে পাঠায়। বাকি কুড়ি টাকায় নিজের খরচ চালায়।

কিন্তু এমন ক'রে কতদিনে কর্জ্জশোধ হবে! এই ঝিনুক দিয়ে সাগর সেঁচা?

এদিকে মা ছেলেকে লেখেন— আমাদের কারো কাপড় নেই। মশারি দুটোই গেছে। নীহারের দেওর শীগ্‌গির আস্‌ছে। ওর কোলের মেয়েটাকে একখানা গয়নাও আজ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি। ভরি দুয়েকের এক ছড়া ঘসা হার হ'লে যেমন-তেমন এক রকম হয়। মিউনিসিপালিটির দুই কিস্তির ট্যাক্‌স্‌ বাকি। গয়লাও তাগাদা দিচ্ছে। তারও চৌদ্দ পনেরো টাকা পাওনা।

একবার হাত বড় হ'য়ে গেলে হাত আর ছোট করা যায় না। স্বামী বর্ত্তমান থাকতে সম্ভব-অসম্ভব নানা উপায়ে পয়সা খরচ ক'রে ক'রে নয়নতারা এম্‌নি হ'য়ে গেছেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাতের শেষ পয়সাটি বিদায় না কর্‌তে পেরেছেন—ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনে সোয়াস্তি পান না। হাত নিস্‌পিস্‌ করে।

নয়নতারা বেশ জানেন তিন হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ করা সত্যেনের পক্ষে অসাধ্য না হ'লেও দুঃসাধ্য। যে পারে সে হচ্ছে ঐ বড় মানুষের ঝি তরু। মুখ ফুটে' একবার তার জমিদার বাবাকে বললেই হয়। টাকাটা তখনি ফেলে দেয়।

ছেলের কাছে কথাটা একবার তুলেছিলেনও। সত্যেন হেসে উত্তর করেছিল—কি যে বল তুমি মা!

এই পর্য্যন্ত। আর কিছু না। কথাটা সে তরুকে বলেনি। বৌয়ের কাছে মাকে খাটো করতে পারে না।

নয়নতারা সে কথা ভাবেন নি। ছেলের বিষয়-বুদ্ধির উপর তাঁর কোনো দিনই আস্থা নেই। বিয়ের পরও

ওদিকে সত্যোনের কোনো উন্নতি দেখেন না। সে জন্যে বউকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। হাল ঠিক থাকলে কি আর নৌকো কাৎ হয়?

নয়নতারা তরুর উপর বিরক্ত হন, ছেলের উপর রাগ করেন। বলেন—ম'রে যাই! মণি-কাঞ্চনের যোগ আর কি!

নয়নতারা কঠিন হেসে বলেন—তোমাকেই এই কর্জ্জ শোধ করতে হবে, বাছা! দেখি কর কি না।

তরু কর্জ্জের কথা কিছুই জানে না। সত্যোনও কিছু বলে নি, নয়নতারাও না। তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন আজ হোক কাল হোক সত্যোনকেই একদিন তরুকে বলতে হবে কর্জ্জটা শোধ ক'রে দিতে—তাদের অচল নৌকোটাকে সচল করতে।

মানুষ মানুষকে কত কম চেনে. মা তাঁর পেটের ছেলেকে চেনেন না!

নয়নতারা নীহারকে বলেন—ওর গরিমাটাই বেশি হ'লো। এদিকে ছেলেটা ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেল। কেন, সতুর কলকাতা প'ড়ে থাকার কি দরকার। ওর বাবা কি তাকে তার ষ্টেটের ম্যানেজার ক'রে রাখতে পারে না। ওর কি ক অক্ষর গোমাংস? না হয়, হাজার কয়েক টাকা দিয়ে ব্যবসা ট্যবসা একটা ফেঁদে দিতে পারে তো? কর্জ্জটাও শোধ হ'তো। ছেলেটাও বাঁচতো।

নীহার বলে—বউকে একবার পাকে প্রকারে ব'লে দেখবো, মা?

নয়নতারা বলেন—না, কি দরকার আমার! মরুক্ গে।

ছেলেকে ফের পত্র দেন—তোমাকে গত পত্রে যা লিখেছিলুম তার কি করলে না করলে বুঝতে পাচ্ছিনে। আর তো দেরি করা যায় না। নীহারের দেওর কোন্‌দিন এসে উপস্থিত হবে স্থির নেই। মেয়ের গলা খালি দেখলে আমি মুখ দেখাতে পারবো না।

বাঁকা লোহা চাপ দিয়েই সোজা করতে হয় কি না!

সত্যোন মাকে লেখে—সেই কর্জ্জটা শোধ করবো ব'লে মাসে মাসে যে ত্রিশটা টাকা মহাজনের কাছে পাঠাচ্ছি, এ মাসে আর তা হ'লো না। তোমাকেই পাঠাচ্ছি। যা করতে হয় ক'রো। নীহারের মেয়েকে এখন না হয় কিছু নাই দিলে। সময়মত একটা কিছু দিও। ওকে আমি যে বড় একটা কিছু দিতে পারিনি, সে দুঃখ ভোলবার নয়। তবে দুঃসময় চিরকাল কারো থাকে না। সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছি।

নয়নতারা জবাব দেন—মেয়েটাকে একখানা গয়না না দিলেই যে নয়, বাবা! আমার হাতে তো একটি কানাকড়িও রেখে যান নি। উনি আজ বেঁচে থাকলে কি আর কোনো কথা হতো? নাতনীকে নিজেই একটা কিছু দিতেন। তোমাকে কিছুই করতে হ'তো না।

এই কথাটিই সত্যোনকে বেশি ক'রে বিঁধে। পিতৃঋণ শোধ করাটাকে সত্যোন যতটা গুরুগম্ভীর ক'রে দেখে নয়নতারা ততটা দেখেন না। তিনি যেন ধ'রে নিয়েছেন কর্জ্জটা যে প্রকারেই হোক এক রকমে শোধ হ'য়ে যাবেই। নয়নতারার আন্তরিক ইচ্ছা যে অনুরূপ, বড় মানুষের ঝিকে দিয়েই যে তিনি মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান, এবং সেই জন্যেই যে তার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে সত্যোন ততটা তলিয়ে দেখেনি। চকিতে এই কথাটাও তার একবার মনে হয়েছিল, মা যদি মনে ক'রে থাকেন আমার হাতে টাকা আছে। তরুর গয়না কাপড়ের জন্যে আমি টাকা জমাচ্ছি!

মা তার কথায় বিশ্বাস করেন না হয়ত এই ভেবে সত্যোনের মনটা মাঝে মাঝে ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে।

একটু অভিমান ক'রেই মাকে লেখে—আমার হাতে যা ছিল সবই তোমাকে পাঠিয়েছি, মা। আর একটি পয়সাও নেই। যদি ধার ক'রে দিতে বল, লিখো। দেখি কোথাও পাই কি না।

নয়নতারা লেখেন—আবার ধার কর্জ্জ কেন? কিন্তু তুমি তো বাবা বুড়ো মার কথা কানে তোলো না! বালিতে আর জল ঢালা কেন? তোমাদের সংসার তোমরা এসে বুঝে নাও। আমায় বিদায় দাও। যেখানে আমার কথা থাকে না, সেখানে আমি থাকি কি ক'রে। আমি কাশী যাই।

সত্যোন মনে মনে হেসে বলে—বুড়ো মার কোল ছাড়া হ'লেই ছেলে যুবতী স্ত্রীর আঁচল-ধরা হয় নাকি! অথচ

মা-ই উদ্যোগী হ'য়ে ছেলের বিয়ে দেন। হায়, তখন কি আর তিনি জান্‌তেন যে ঘরের লক্ষ্মী ব'লে একদিন যে নতুন মানুষটিকে বরণ ক'রে নিলেন দু'দিন বাদে সেই মায়ের ভাগে ভাগ বসিয়ে নিজের ভাগটি কড়ায় গণ্ডায় উসুল ক'রে নিতে একটুকুও ইতস্তত করবে না!

৪

মরা নদীতে বান-ডাকার মত হঠাৎ একটা প্ল্যান্ সত্যেনের মাথায় ঢোকে। সেটাকে নিয়ে যতই সে নাড়াচাড়া করে তার মুখে ততই হাসি ফোটে। বলে—মন্দ কি! এক ঢিলে দুই পাখী। দেখাই যাক না মা কি বলে!

মাকে লেখে—বিদায় চাইলেই কি সব সময় বিদায় মেলে, মা? আর তোমার আবার ভিন্ন কাশী কোথায়? আমরা যেখানে আছি সেখানেই তো তোমার গয়া-কাশী মথুরা-বৃন্দাবন! এক কাজ কর। তুমি আমার কাছে এসো। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দাও। মহাজন মাসে এক শ' টাকা ভাড়া দিতে এখনো রাজি আছে। তিন বছরে-ই কর্জ্জটা শোধ হ'য়ে যাবে। তারপর তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যেও। আমি এখানে যা পাচ্ছি তাতে রাজার হালে থাকতে পারবো। মাসে মাসে কিছু উদ্বৃত্তও থাকবে। দেখ তো কী চমৎকার প্ল্যানটা ঠাওরেছি! আর এদ্দিন কিনা আমি অন্ধকারে হাতড়ে মরেছি! দেয়ালে চৌকাঠে মাথা ঠুকেছি। এবার আমার বুদ্ধি খুলে গেছে মা! আর তুমি বল্‌তে পাবে না সতুর বুদ্ধি-সুদ্ধি মোটেই নেই—বিশ্রী রকম মোটা!

সত্যেন তরু নদীর দুই তটের মত—তাদের পরস্পর মিলনের পথে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তার বুঝি আর বিনাশ নেই। মাকে প্রকারান্তরে এই কথাটাই সত্যেন বল্‌তে চায়। এইবার নদীর দুই তটের উপর মিলন-সেতুর ভিত্তি গ'ড়ে উঠ্‌বে মনে ক'রে নানা রঙের কল্পনার জাল বুন্‌তে বুন্‌তে সত্যেন পত্র ডাকে দিলে। মাথার উপর থেকে এক রাজ্যের ভাবনার বোঝাটা হাল্কা হ'য়ে এলো, আনন্দের আতিশয্যে সে তার পক্ষে এক অভাবনীয় কাজ ক'রে বস্‌লে। কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে চার পয়সার এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ খেয়ে আট আনার টিকিট কিনে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে সিনেমা দেখতে গেল। এত বড় অপব্যয় তার বাবার মৃত্যুর পর সে কোনো দিন করেছে কিনা সন্দেহ।

পত্র প'ড়ে নয়নতারা গুম হ'য়ে থাকেন। মনে করেন বউ-ই ছেলেকে উস্‌কাচ্ছে!

তরুকে বলেন—তোমার মন যদি এখানে না-ই টেঁকে আমাকে বল্‌লেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। অত পেটে-এক মুখে-আর করা কেন?

তরু ব্যাপার কি বুঝ্‌তে না পেরে বলে—সে কি মা! এখানে মন টেঁকে না কাউকে কোনদিন তো বলিনি?

নয়নতারা বলেন—সব কথা মুখে না বললেও বলা চলে বাছা!

অতুলকে ডেকে বলেন—পণ্ডিত মশাইকে দিয়ে একটা ভালো দিন করিয়ে নিয়ে এসো তো। বউকে কলকাতায় রেখে আস্‌বে।

অতুল বল্‌লে—সে তো ভালো কথা। আপনার উচিত ছিল...। যাক্‌গে। কিন্তু এই ভরা চৈত্রে!

তরুকে বলে—তুমি আমাকে শেষে নির্ব্বাসনেই দিয়ে গেলে, বউদি? একটা লোক যে না খেয়ে খেয়ে চিঁ চিঁ ক'রে শুকিয়ে মরবে সে কথাটাও তো ভাব্‌তে হ'তো!

তরু বলে—নির্ব্বাসন তো তোমরা আমাকেই দিচ্ছ। কিন্তু কি অপরাধে যে এই শাস্তি জানিনে।

অতুল বলে—বউদি, এই শাস্তিই তোমার পুরস্কার! অধমের একটা কথা শোন। রাগই লক্ষ্মী। রাগকে রাগ দিয়ে ঠেকাতে পারলেই লক্ষ্মীর পায়ের তলার পদ্মে অরুণরাগের আভা ফোটে বেশী। মা তোমাকে কলকাতা পাঠাচ্ছেন। তুমিও "আচ্ছা, আসি, তবে", ব'লে মার খুরে দণ্ডবৎ হ'য়ে গাড়ীতে চেপে বস। দেরি করো না। মা আবার মত বদ্‌লাতেও পারেন। এ সব কাজ ঝোঁকের মাথায় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বুকের পরে নিঃশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
ক্ষোভে কম্পমান।

তবু তরু বলে—নাঃ! হাসি মুখে ছেড়ে না দিলে যাবো না তো!

অতুল উবু হ'য়ে মাটিতে মাথা ঠুকে বলে—গড় করি গো মা-ঠাকরুণ! পেটে এতো বিদ্যে না থাকলে কি আর পিঠে এতো সয়!

নীহার এসে বলে—তুমি গেলে বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে ভাই! এই মেয়ে দুটো। তারপর দু'ঘরের রান্না। কি ক'রে যে কি হবে আমি তাই ভাবছি!

অতুল বলে—আর কিছু না? বলিহারি ঠাকুরঝি! যাও যাও মাকে বোঝাওগে। বলগে, চল সব্বাই আমরা যাই। মেয়েও সাম্‌লাতে হবে না; দুই ঘরের রান্নাও করতে হবে না। আর দুই চক্ষের জলও ফেলতে হবে না!

নয়নতারা সত্যেনকে লিখে পাঠান—চোত্ মাসে তো আর পা বাড়ায় না। বোশেখের প্রথমেই বউ কলকাতা যাবে। আমার যাবার কোনো উপায় নেই। রাধামাধবজী রয়েছেন। তা ছাড়া ভাড়াটের কাছে বাড়ি রাখলে বাড়ির কিছুতো থাকে না বাবা! দু'বছর পরে এর একখানা ইটও আস্ত থাকবেনা। কর্জ্জের জন্যে তোমার অত ভাবতে হবে না। এক রকম ক'রে শোধ হবেই!

কিন্তু কি রকম ক'রে?

পত্র প'ড়ে মার উপর ছেলে খুসী হ'তে পারে না। কর্জ্জ শোধের এমন একটা সহজ সুসাধ্য উপায় নয়নতারা যে হেলায় ছেড়ে দেবেন সত্যেনের ধারণার অতীত। এ কয়দিন সে যে নিজকে কল্পনার রঙিন মোহে আচ্ছন্ন ক'রে শরতের শুভ্র মেঘের মত সুনীল আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত বিকলতা একযোগে সত্যেনের কানে বলতে লাগলো—বোকা, বোকা, বোকা!

তরুকে লেখে—দেখ, মা যে তোমার উপর বিরূপ তোমারও দোষ নয়, মার ও দোষ নয়। দোষ আমার! যে পণ্ডিত বলেছিলো "অর্থমনর্থম্" তার পাণ্ডিত্য আগাগোড়াই অনর্থক!

তরু জবাব দেয়—আর জন্মে তুমি রাজপুত্তুর হ'য়ে জন্ম নিও। হা অর্থ, হা অর্থ ক'রে আর ব্যর্থ কান্না কাঁদতে হবে না। তা ব'লে সিদ্ধার্থের মত তোমার গোপাকে অকূলে ভাসিও না যেন। এ জন্মে যা নমুনা দেখাচ্ছ তাতে কিন্তু বিশেষ ভরসাও হচ্ছে না। কর্জ্জশোধের কথাটা আমার কাছে গোপন না রাখলেও পারতে—তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো না। তুমি কি মনে কর তোমার মার কাছে যা বলতে পার আমার কাছে তা না ব'লে আমাকে আকাশে তুলে দিচ্ছ? বলবে, তোমাকে ভালবাসি ব'লেই এই আঘাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে চাই। এই তো! তা হ'লে বলি, অমন ঠুনকো ভালবাসার 'পর আমার দরদ নেই। ভালবাসা শুধু মায়া মমতা স্নেহ করুণা নয়, এই আমি বুঝি!

মাকে বলেছিলুম—আমার ছেলে নেই পুলে নেই, কি হবে আমার অই অলঙ্কার গুলো দিয়ে। ওগুলো তো সিন্দুকেই তোলা থাকে। তার থেকে কয়েক খানা গয়না বিক্রি করলেই কর্জ্জটা শোধ হ'য়ে যায়। না হয়, বিয়ের সময়—বাবা আমাকে যে কয়খানা কাগজ দিয়েছিলেন তাই দিয়ে—

কথাটা শেষই করতে দিলেন না। বললেন, সতু তোমাকে লিখেছে বুঝি! তোমরা দু'জনেই যদি ছেলেমানুষি সুরু কর, আমি আর কি করি! আর তোমার রকমখানাই বা কি রকম! গয়না আর কাগজগুলো ছাড়া আর কিছু তোমার চোখে পড়লো না!

আমি বললুম—আমি তো বউ মানুষ। রোজগার তো করতে পারিনে মা!

তোমার মা বললেন—না, রোজগার করবার মত বয়েস তোমার আর নেই বাছা!

কিন্তু তোমার মার মুখে এ রকম কথা, এই বাউড়ী বাগদীর কথা! জান, তোমাদের ঘরে এসে এমন কোনো অপরাধ আমি কারো কাছে করিনি যার জন্যে এই সব—। থাক, মনে করোনা তোমার মার নামে তোমার কাছে আমি নালিশ করছি। তুমি আমাকে দূরে ঠেলে রেখে যে অপমান করেছো তার কাছে তোমার মার এই অপমান খুব বেশি নয়। তবু ভুলতে পারিনে অপমানের পসরা আজ আমার পূর্ণ হ'লো!

তা হোক্। মেয়ে মানুষ, তার আবার মান অপমান কি!—তাই যখন আবার বললেন—তোমার বাবা না মস্ত জমিদার! রোজগারের জন্যে তোমাকে আবার সাজতে

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

গুজ্‌তে হবে নাকি! তখন সে কথাও গায়ে মাখ্‌লুম না। চুপটি ক'রে চ'লে এলুম।

তাই বল! শ্বাশুড়ী যে আমার উপর বিরূপ তা আমার দোষে কি তোমার মার দোষে নয়, আমার বাবার দোষে। তা বেশ তো! কথাটা আগে বল্‌তে হ'তো। আমি তো আর গণক ঠাকুর নই যে কারো পেটের কথা টেনে আন্‌তে পারি! টাকাটা শোধ করবার জন্যে বাবাকে লিখ্‌বো কিনা পত্রপাঠ লিখো। আমার গুরুজন তুমি। তোমার গুরুজন তোমার মা। তোমার মার কথা তো আমি ঠেল্‌তে পারিনে! মনে করেছিলুম যে বাবাকে আজ্‌কেই লিখে দিই। কিন্তু তোমাকে তো একটু আধ্‌টু চিনি! তাই তোমার কাছে না লিখে বাবার কাছে লিখ্‌তে পারিনি। এতেও যদি কিছু অপরাধ হ'য়ে থাকে তোমার মা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

সহ্যেরও যে একটা সীমা আছে তিনি না জান্‌লেও তুমি জান আশা করি!

৫

মনের অন্তরতম প্রদেশে কল্পনার আলোকে বিচিত্র রংএর তুলি দিয়ে যে দুটি আলেখ্য সত্যেন পাশাপাশি এঁকেছিল, তাদের সাথে বাস্তব রাজ্যের এই তরু আর এই নয়নতারার বৈসাদৃশ্যটিই আজ তাকে অত্যন্ত বেশি ক'রে আঘাত দেয়। সেই প্রচণ্ড আঘাতের সাম্‌নে তরু অথবা নয়নতারার ব্যক্তিগত অপরাধের বিচার করতে তার আর প্রবৃত্তি রইলো না। নিজের হাতে সযত্নে আঁকা ছবি দুটির মস্ত বড় ত্রুটিলক্ষ্য ক'রে তার চোখে জল এলো—সে যেন শোকে মুহ্যমান হ'য়ে নিজের মৃতদেহ কোলে নিয়ে ব'সে রইল!

দিন দুই বাদে সত্যেন তরুকে লেখে—'তোমার মা?' এটা কিন্তু তোমার কাছে আশা করিনি, তরু! আজ মনে না ক'রে পারছিনে আমাদের হৃদয় মনের যোগাযোগটি সত্য হ'য়ে ওঠেনি, কোথায় যেন একটু আল্‌গা হ'য়ে আছে।

তোমার বাবাকে তোমার কিছু লিখ্‌তে হবে না। আমিই মাকে বুঝিয়ে বল্‌বো যে কর্জ্জ শোধটা আমাকেই করতে হবে, অন্য কাউকে নয়। কারণ টাকাটা আমার বাবাই কর্জ্জ করেছিলেন, তোমার বাবা নয়।

তরু লেখে—আমার স্বামী-ভক্তি যত বড়ই হোক তোমার মাতৃভক্তির সাথে তো পাল্লা দিতে পারে না! সে জন্যে আমার দুঃখু নেই। মা-রা তো আগাগোড়াই আগে। কিন্তু মা যদি মায়ের মতন না হন? আচ্ছা, এই যে তিনি আমাকে যা তা ব'লে বাবার কাছে থেকে টাকা এনে কর্জ্জ শোধ করতে বল্‌লেন, এটা কি খুব ভালো কথা হ'লো? না, এর অপমান তোমাকে মোটেই লাগেনি!

লাগে বই কি!

কিন্তু সত্যেন লেখে—না, মোটেই লাগেনি! বাবা যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন তা হ'লো হয়তো লাগ্‌তো। জানোনা, বিধবা মা তাঁর ছেলের কাছে এমন কোনো কাজই করতে পারেন না যার জন্যে ছেলে মাকে অপরাধী করতে পারে? এই সোজা কথাটাও কি তোমাকে নতুন ক'রে বল্‌তে হবে!

আমি চম্‌কে গেছি আজকের তোমার এই ছিন্নমস্তার প দেখে। আর কেউ না জান্‌তে পারে আমি তো জানি' এ তোমার সত্যরূপ নয়। যে রূপ তোমার মধ্যে এপর্য্যন্ত দেখে এসেছি, যা দিয়ে তোমাকে চিনেছি, তোমাকে ভালবেসেছি, যা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সেই রূপই তোমার মধ্যে বরাবর অক্ষুন্ন থাকুক। তার যেন কোনো বিকৃতি না হয়।

দেখ, তপস্যারতা পার্ব্বতীর মত হ'য়ো, দক্ষযজ্ঞের সতী হ'য়ো না, এই আশীর্ব্বাদ আমার রইল।

পত্র প'ড়ে তরুর কান্না পায় এই ভেবে যে, স্বামী তাকে যতটা বড় ব'লে জানে সে তত বড় নয়। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে থাকে—ওগো, কী দেখেছো তুমি আমার মধ্যে! এ তো আমি সইতে পারিনে! এত বড় আশা তুমি কর, কিন্তু আমি যে নিঃসম্বল পথের ভিখিরী!

গ্রীষ্মের বন্ধে সত্যেন বাড়ি এল্‌লা। তার চেহারা দেখে তরুর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। অর্থম্ অনর্থম-ই তো! তার চিন্তা যে মানুষকে এমন ক'রে শুষে নিতে পারে তরু ভাব্‌তে পারেনি!

তরু বলে—তুমি কি আমাকে না মেরে ছাড়বে না! এ কী হ'য়ে গেছ, দেখ্‌তেও পাও না?

সত্যেন বলে—তোমাকে দেখ্‌বো না আমাকে দেখ্‌বো? সারা বছর তো নিজ্‌কেই দেখ্‌ছি। এ ক'টা দিন না হয় নিজ্‌কে একটু তোমার পেছনে আড়াল ক'রেই র'খি!

তরু বলে—নাও, এই বুড়ো বয়সে আর কাব্যিক হ'য়ে কাজ নেই। রাত্রে কি খাবে তাই বল।

সত্যেন বলে—বুড়ো? ওঃ! এই ক-গাছা সাদা চুল তোমার দৃষ্টি এড়ায়নি তা হ'লে! দাও না, এগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে লক্ষ্মী মেয়েটির মত—আবার সেই বিয়ের রাতে ফিরে যাই!

তরু নিঃশব্দে সত্যেনের মাথাটা কোলের উপর টেনে নেয় আর এক একটি ক'রে সাদা চুল ওপ্‌ড়ায়। সত্যেন অতি বাধ্য ছোট ছেলেটির মত চোখ্‌ বুজে' চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে।

তরু বলে—দেখ, এই গুটিকয়েক টাকার জন্যে যে তুমি আত্মঘাতী হ'বে, সেটি হচ্ছে না। আমাকে আগে বল্‌লে না কেন? যদি দূরে দূরেই রাখ্‌বে, ঘরে না-ই আন্‌তে! খুব অর্দ্ধাঙ্গিনী!

সত্যেন বলে—তা তো বটেই! সুখের ভাগ দিতে পারি আর না পারি, দুঃখের ভাগ দেবো কেন? সাধ ক'রে কে আর নিজেদের হাত নিজে কাটে বল?

তরু হেসে বলে—তুমি কাকে বল সুখ আর কাকেই বা বল দুঃখ? ও দুটো কথার মানে জানো?

সত্যেন দুই হাতে তরুর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে—না! কই আর জানি! হ্যাঁ! শুনেছো একটা কথা। অতুল নাকি তার বাড়ির খুব ভাল একটা খদ্দের পেয়েছে!

সত্যেন আসল কথাটা চাপা দিতে চায়। তাকে তরু চেনে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তার বাবা তাকে হাত খরচের অছিলায় একবার পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন এবং মাসে মাসে এই টাকাটা তরুর কাছে আস্‌বে এরূপ ইঙ্গিত করেছিলেন। তাতে সত্যেন বলেছিলো—একে এই জমিদার মেয়ের গুরুভার, তারপর এই মাসিক বরাদ্দের বোঝা। অত কে সইবে বাপু।

টাকা কয়টা ফেরত গেল। স্বামীর দৃঢ়তায় তরু খুসিই হয়েছিল। সে তার বাবাকে লিখেছিল—ব'বা, যাকে দান কর, তার উপর কোনো দাবি দাওয়া না রেখেই দান করতে হয়। তুমি আমাকে বিয়ের সময় যে কাগজ ক'খানা দিয়েছ তাই নিয়েই খিটিমিটির অন্ত থাকে না। সেগুলোর উপর ফের এই হাত খরচের টাকা! না বাবা।

তরু সত্যেনের হাত থেকে নিজ্‌কে মুক্ত ক'রে বলে—আমাকে কচি খুকিটি পাওনি। যা বলি দয়া ক'রে শোন। সেই কাগজগুলো, না হয় গয়নাগুলো দিয়ে—

সত্যেন বিছানা ছেড়ে উঠে বলে—নাঃ! দিনটাই আজ মাটি করবে দেখ্‌ছি! দিব্যি আরামে ছিলুম, ঢেঁকীর স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই।

তরু তবু বলে—ও গুলো রেখে কি আমি ধুয়ে জল খাবো!

সত্যেন বলে—ওগো, এ হচ্ছে কলিকাল! একটু ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। অত ঔদার্য্য দেখানো কিছু নয়। তোমার বাবা বুদ্ধিমান লোক। তাই তিনি এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে আমার অভাবে তোমার অন্ততঃ কাপড়ের অভাব হবে না। আমি অত বোকা নই যে—

তরু একটানে মাথার কাপড়টা ঠিক ক'রে নিয়ে বলে—আর কোনোদিন যদি তোমাদের কোনো কথায় থাকি তখন ব'লো!

সত্যেন বলে, "তোমাদের!" কী মুস্কিলেই পড়া গেছে বাবা!

সত্যেনের কলকাতা ফেরবার সময় হ'লো।

মা বলেন—বউকে সাথে ক'রে নে!

ছেলে বলে—এখনো তোমার রাগ পড়েনি বুঝি!

তরুকে বলে—যাবে আমার সাথে?

তরু শুধু বলে—না, থাক্‌।

সত্যেন বলে—কার উপর এই রাগ?

তরু বলে—তোমার উপর। শুধু রাগ নয়, ঘেন্নাও!

সত্যেন হাসিমুখেই চলে যায়। যাবার আগে রেখে যায় বিদায়ের একটি অদৃশ্য ঈষৎ-উষ্ণ চিহ্ন তরুর সুকুমার ললাটের উপর।

তরু হাতদুটি তার চিবুকের নীচে রেখে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে। দৃষ্টিহীন চোখে পলক পড়ে না। ক্রমে

একলা পথিক

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

দু' একবার চোখের পাতাদুটো পড়ে ওঠে। বড় বড় কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে।

মনে মনে বলে—এই পাগলকে নিয়ে আমি কী করি!

ঠোঁটের কোণে একটি ক্ষীণ হাসির আভা চোখের পলকে লুকোয়!

কলকাতা যেতে না যেতেই সত্যেন নয়নতারার পত্র পায়—

আমি থাকৃতে থাকৃতে নীহারের একটা উপায় তো আমাকেই ক'রে যেতে হবে। তাই বউয়ের কাগজ ক'খানা অতুলকেই দিলুম বন্ধক রেখে কিছু টাকা জোগাড় করতে। একটা কারবার-টারবার করুক। তারপর কিছু কিছু ক'রে কাগজগুলো উদ্ধার করবে। দেখি হতভাগীর যদি একটা কিছু হিল্লে হয়।

পত্র প'ড়ে সত্যেন ভাবে—তরুর টাকা তরুর থাকাই তো উচিত! ওকে ওরা এ যাবৎ কিছু দেয়নি। দেবার বেলা নেই, অথচ নেবার বেলা আছে, এ যে বড় লজ্জার কথা। হোক্ না নিজের স্ত্রী! এমন সময় তো ঢের আসে যখন নিজের স্ত্রীকেও দশজনের সামিল ক'রে দেখ্তে হয়। এই সামান্য কথাটাও কি মা জানেন না। অতুলটাও কি একটা অকাট মূর্খ?

তবু মনে মনে বলে—এতে যদি তুমি সুখী হও মা, তাই হ'ক! আর নীহার অতুলও যদি সুখের মুখ দেখ্তে পায়, বেশ তো, ভালই তো! আহা, ভাইয়ের কাছে প'ড়ে থাকা যে নরক যন্ত্রণা! তাতে আমিও কি মনে সুখ পাই? তরুও পায় না!

মনে মনে যথেষ্ট আরাম পায়!

তরুকে লেখে—তোমার এক দফা সম্পত্তির এতদিনে একটা সুরাহা হ'ল। আমি জানি তুমি একথা জানতে পেরে নিশ্চয়ই খুসি হয়েছ যে তোমার সাহায্য পেয়ে অতুল নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। এদ্দিনে হয়ত নীহারের দুঃখ ঘুচ্লো। কি বল?

তরু—হাঁ-না কিছুই বলে না। এতকাল পরে আজ কেন যে নয়নতারার মন নীহারের দুঃখে কেঁদে উঠ্লো, তার অর্থ ধরা তরুর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সে বুঝ্তে পারে তার বাবাকে দিয়ে কর্জ্জশোধ করবার এই আর এক ফিকির তার শাশুড়ী উদ্ভাবন করেছেন। বউকে রিক্ত ক'রে ছেলেকে চাপ দিয়ে বেয়াইয়ের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা!

সে মুখ কালি ক'রে নিজের মনে বলে—আমি আর তোমাদের কোনো-কিছুতে নেই। যা খুসি কর। বিধির লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে? নইলে এমন হয় কেন? সহজে যে কাজ আদায় হয় তার জন্যে জীবন পণ ক'রে বসে কে! হয়ত স্বামীর এই কথাই ঠিক, আমাদের হৃদয় মনের যোগাযোগ সত্য হ'য়ে ওঠে নি! এই ফস্কা গেরর যোগাযোগ যত শিগ্‌গির ছিন্ন হয়, ততই মঙ্গল। আবার নতুন ক'রে জীবনের পালা সুরু করা যায়।

৬

দিন কয়েক যায়। সত্যেন তরুর কাছ থেকে পত্রের উত্তর পায় না। ভাবে, তরু হয়ত এই মনে ক'রে রাগ করেছে যে, যে-পূজার নৈবেদ্য তার দেবতার সাম্‌নে সে ধরলে তার দিকে তিনি ফিরেও তাকালেন না। ভোগে আসলো অই নীহার আর অতুলের। হায়, অভিমানিনী নারী! আমি না চেয়ে যা পেয়েছি, কানায় কানায়ই পেয়েছি! তার কাছে এই কোম্পানীর কাগজ আর অই জড়োয়া গয়না! তুচ্ছ, তুচ্ছ, তুচ্ছ! এসব কথাও আবার লিখ্তে হয় নাকি!

তরুকে এই সব কথা লিখবে কিনা ভাবছে এমন সময় অতুলের পত্র পেয়ে সত্যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল! অতুলকে সে বরাবরই একটু কৃপা-দৃষ্টি দিয়েই দেখে এসেছে। নিজকে আর তাকে একই দাঁড়ি-পাল্লায় চাপিয়ে নিজের দিকটাই বেশি ঝুঁকেছে ব'লে তার মনে হয়েছে। আজ দেখ্‌লে মানুষকে ধান চাল কাঠ-কয়লার মত কোনো মানদণ্ডে মাপা যায় না। তার মধ্যে ভাল মন্দ এলোমেলো সুতোর মত এম্‌নি পাক খেয়ে আছে যে তার কোনটা আগা আর কোনটা গোড়া বোঝা ভার!

অতুল লিখেছে—তোমার বোনটির ভাই, পেটে যত মেয়ে জন্মায় মাথায় তত বুদ্ধি গজায় না। এই মোটা কথাটা ওর মাথায় মোটেই ঢোকে না যে, তার দাদা আর বউদি হরপার্ব্বতী নয় যে, এ যুগে যজ্ঞের ফুল বেলপাতা, না হয় বড় জোর এক আধটা কলা খেয়ে কৈলাস শিখরে সুখে ঘরকন্না ক'রে যাবেন। তার চাইতে অনেক বেশি কিছু সারপদার্থ চাই। এই কাগজ ক'খানা কাগজ হ'লেও, বাজে কাগজ নয়।

সে উত্তর করে—তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি কি মনে কর মার চেয়ে তুমি বেশি বোঝ?

আমি বললুম—কি বুদ্ধি তোমার! আমি তোমার মার চেয়ে বেশি বুঝি আর না বুঝি, তোমার মা যে রাণীভবানী নন্ ভাল মতই জানি।

কাগজ তিনখানা তোমার কাছেই পাঠাতে হ'লো ভাই। বউদিকে ফেরত দিতে চাইলুম; নিলেন না। বললেন, ওর উপর আমার কোনো মায়া নেই, ঠাকুর জামাই! হয়ত অভিমান ক'রেই ও রকম ক'রে ব'লে থাক্‌বেন। আশ্চর্য্য কি! তোমার কাজে ওঁর এই টাকাটা যদি না লাগে, কেন উনি খামকা ভূতের বোঝা বইবেন বল!

তোমার বোন্‌কেও বলেছি, তোমাকেও বলি। তোমার মাথায় শুধু কয়েকটি পাকা চুলে হানা দিয়েছে। মনে করেছো চুলে যখন পাক ধরেছে, বুদ্ধির গোড়াতেও শিকড় গজিয়েছে। ভুল করেছো ভাই। তোমার বুদ্ধির গোড়ায় ঘুণ ধরেছে!

আমি জড়পিণ্ড মাত্র! তবু একটা সার কথা তোমায় বলি শোন। এই কাগজগুলো দিয়ে কর্জ্জের টাকাটা শোধ কর। তাতে ক'রে বউয়ের মুখে যে হাসি ফুটবে, তার আলোয় তোমার আত্মসম্মানের প্রদীপের কালির শীষ কোথায় মিশিয়ে যাবে জান্‌তেও পারবে না!

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো দাদা। বউটা একটু জুড়োক। এসো আমরা দু'জনায় একটা ব্যবসা ফাঁদি। কি ক'রে রাতারাতি কুবেরের ভাণ্ডার লুটে নিতে হয়, তার অনেক প্ল্যান আমার মাথায় এসে জুটেছে। ক্যাপিটেল? কোনো ভাবনা নেই, দাদা! এতকাল পরে অনেক চেষ্টায় পৈত্রিক ভিটেটার একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে হাজার সাতেক টাকা জুটিয়েছি। তোমার অর্দ্ধেক আমার অর্দ্ধেক—We go fifty-fifty! কোম্পানিরও একটা নাম ঠিক করেছি—The Twin Bros Ltd. তার বাংলা করেছি—ভাই-ভাই-একঠাঁই লিমিটেড্!

চিঠি প'ড়ে সত্যেন ভাবে—কাছে থাকে যারা, সবার চেয়ে বুঝি কম চিনি তাদের। মা ছেলেকে চেনে না। স্বামী স্ত্রী কেউ কাকে বোঝে না! অতুলের মধ্যেও যে এতো ছিল কে জান্‌তো! আচ্ছা, এ তো মন্দ নয়! অই Twin Bros এর অতুল, বিনয়কুটীরের মা, নীহারের দুটি ছোট মেয়ে, তাদের চেয়েও ছোট তাদের মা, আর তার ক্লাসের সব চেয়ে ভাল ছাত্রীটি অই অভিমানিনী তরু, এরা যদি তাকে কাছে পেয়ে খুসি হয়, সে-ই কি হয় না? এতগুলো মুখে যদি হাসি ফোটে, তার আলোয় "ভাই-ভাই-এক-ঠাঁই লিমিটেড"—এবং মুনাফা হীরার মতই চিক্‌চিকিয়ে উঠ্‌বে যে!

অতুলকে লিখ্‌তে বসে—আচ্ছা, তোমার Get-me-rich-quick-এর প্ল্যানগুলো আগে জানাও তো, তারপর দেখি কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম্ আর প্রস্‌পেক্‌টাসের খসড়া করতে হবে কি না!

এক লাইন লিখেই সত্যেন কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে। বলে—পাগল হলুম না কি! অতুলের বাড়ি বেচা টাকা, নীহারেরই টাকা! নিতে পারিনে। বাবা শান্তি পাবেন না! আমাকে শক্ত হতে হবে। যে পথ ধরেছি, সেই আমার একমাত্র পথ। একলার পথ। নাস্তি গতিরন্যথা, মরি আর বাঁচি! উঃ! অতুলটা কি ভয়ঙ্কর লোক!

মরি আর বাঁচি বটে, কিন্তু বাঁচার লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না। এ যেন পথের পাশে মুখ-থুব্‌ড়ে-পড়া স্বেদাক্ত ক্লান্ত ঘোড়াকে চাব্‌কে চাব্‌কে সচেতন ক'রে তোলার অসাধ্য সাধনের চেষ্টা! সত্যেন আর পারে না।

মাস দেড়েক বাড়ি থেকে শরীরটা একটু সেরেছিল। বাড়ি থেকে ফেরবার পথে রাত্রে ট্রেণে ঠাণ্ডা লেগেই হোক্ আর যে কারণেই হোক্ কলকাতায় এসেই সত্যেন নিউমোনিয়ায় পড়ে। সে-ধাক্কা সাম্‌লে সে উঠলো না-ওঠার

একলা পথিক

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

মতন, তারপক্ষে হাঁটাহাঁটি আর সহজ সাধ্য নয়। হাঁটু যেন এলিয়ে পড়ে। ক্ষীণ দেহের ভার আর বইতে পারে না। একটু যা নড়ে চড়ে দেহের জোরে নয়, মনের জোরে।

এক একবার তার এই আনন্দহীন নিঃসঙ্গ জীবনের বিপুল বোঝা দুর্ব্বিষহ মনে করে। রাত্রে যখন জ্বরটা চেপে আসে, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে, বুকে গলায় কাঁধে ব্যথা, ঘুমোতে পারে না, ছটফট্ করে, ঘড়ির পর ঘড়ি শোনে, চোখের জল রাখতে পারে না। গলা ছেড়ে কেঁদে মনটাকে হাল্কা করতে চায়। মা বোন স্ত্রীর এতটুকু সেবার প্রত্যাশায় তার সারা দেহ-মন দুলে ওঠে। মনে পড়ে এই তো সে দিনের কথা চুল তোলার ছল ক'রে তরুর কোলে মাথা রেখে চুপ ক'রে পড়ে থাকার নিবিড় আনন্দ। সে ছলটুকু ধরতে পেরে তরুও কি কম খুসি হয়েছিল! তার রেশ এখনো তার মনে বাজে। মনে পড়ে আরো কত কি, কতদিন-কার কত তুচ্ছ কথা, খুটি নাটি! আর দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে, ওঠে—আর তো আমি পারিনে মা! কি করে যে আমার দিন কাটে তোমরা তো কেউ—জানোনা। যদি জান্‌তে পার্‌তে, তখনি ছুটে আস্‌তে।

পূর্ব্বাকাশ গোলাপী হ'য়ে এলো পাখীর কলরবের সাথে সাথে তার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়। মনের আঁধার কাটে। বুকে বল পায়। রাত্রের অসহ্য যন্ত্রণাকে দুঃস্বপ্ন ব'লে ওড়াতে চায়। আবার আশায় বুক বাঁধে। নিত্যনৈমিত্তিক কাজে জোর ক'রে নিজেকে নিয়োগ করে। এই সকালবেলাটাই সে একটু ভাল থাকে।

বলে—একলা পথিক আমি। মাঝ রাস্তায় এসে ভড়কালে কি চলে। এগোতেই হবে—মরি আর বাঁচি!

নিজের অসুখের কথা কাউকে লেখেনা। সেটাকে অসুখ ব'লেই মান্‌তে চায় না। বলে—সবতাতে অত পুতুপুতু কর্‌লে কি ব্যাটাছেলে পারে! রোগ আর ভূত দুই-ই এক। বিশ্বাস করেছো কি মরেছো—টুঁটি চেপে ধরবে! কি একটা কাগজে আত্ম-অনুপ্রেরণার কথা (auto suggestion) পড়েছিলো। রাত্রে ঘুমোবার আগে বার কুড়ি মনে মনে আওড়ায়—আমার কোনো রোগ নেই, কোনো রোগ নেই। দিন তিনেক পরে মন্ত্রটা পালটায়—আমি বেশ ভাল আছি, বেশ ভাল আছি। তারপর ঘুমোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আর আসে না, ঘড়ির পর ঘড়ি শোনে।

অতুলকে লেখে—তোমার প্রস্তাবটা ভাই লোভনীয়। কিন্তু লোভ জিনিসটা ছয় রিপুর এক রিপু। ওটাকে যতটা দাবিয়ে রাখা যায় ততই মঙ্গল। তা ব'লে ওটাকে ঠেকিয়ে রেখে তোমার স্নেহ থেকে নিজেকে ঠকালুম এ যেন আমাকে কোনোদিন বল্‌তে না হয়। এবারের বড়দিনের ছুটিতে হয়ত বাড়ি যাবো। যদি যাই তোমার Twin Bros Ltd সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করা যাবে।

পত্র প'ড়ে অতুল নীহারকে বলে—এক বোঁটায় দুটি ফুল! তোমার দাদা যে অত বড় গাধা আগে জান্‌তুম না!

নীহার বলে—মুখ খারাপ ক'রো না বল্‌ছি। গাধা গাধার মত চেঁচায়।

অতুল বলে—ঠিক, ঠিক! গাধার ভাষা গাধাই বোঝে!

তরুকে বলে—তোমার উচিত ছিল আমাকে বিয়ে করা বউদি! সত্যেন ত্রে মানুষ নয়, ও হচ্ছে অমানুষ। বরাবর তোমার হাতের বাইরেই র'য়ে গেল। আমাকে যদি হাতের কাছে পেতে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া কর্‌তে পার্‌তে!

তরু হেসে বলে—কেন, ঠাকুর-ঝির হাতে কি চাবুক নেই নাকি!

অতুল বলে—নেই আবার! কিন্তু ও চাবুক ধর্‌তে জানেনা। আস্ত গণ্ডমূর্খ কি না! ওকে চাবকাতে হয় আমাকেই! যাক্ সে কথা। আসল কথাটা হচ্ছে এই। আমি আজ কলকাতায় যাচ্ছি। বাঁকা কথায় অতুলচন্দ্র ভোলেন না। পত্রটত্র যদি দিতে হয়, দাও। কলকাতার ডাক্ বিলির ঝাড়া দু'ঘণ্টা আগে পাবেই পাবে। তোমার পত্রটা কাছে থাক্‌লে দূত যে অবধ্য একথাটাও তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবো!

তরু বলে—না, তোমাকে আমি দূত ক'রে পাঠাতে পারিনে। যদি আসেন নিজেই আস্‌বেন। মুখে ব'লে ক'য়ে কিছু হয়নি, পত্র দিয়ে আর কি হবে। সে সব খেয়াল আর নেই।

তরু সত্যেনকে পত্র লেখা বন্ধ করেছে।

অতুল বলে—আচ্ছা দেখি, ওটাকে তোমার পায়ের কাছে টেনে আন্‌তে পারি কি না!

স্বইচ্ছাতেই সত্যেন এলো—নাম-সর্ব্বস্ব সত্যেন!

৭

অতুল সত্যেনের খোলার ঘরে ঢুকে দেখে সে তার মলিন শয্যার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে খুব মন দিয়ে কি একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। বালিশের পাশে গোটা দুই তিন হোমিওপ্যাথিকের শিশি।

দুই তিনবার মন্ত্রের বোল্‌ বদল ক'রেও Auto-suggestion এ ফল পায়নি; হোমিওপ্যাথি ধরেছে!

অতুলকে দেখে সত্যেনের মুখে আর হাসি ধরেনা! দুর্গম রাস্তার একলা পথিকের মনের বল আর তার পূর্ব্বের মত নেই। রোগে ভুগে ভুগে অনেকখানি দুর্ব্বলতা অজানিতে তার মনের মধ্যে ঢুকেচে। আজ অতুলের আকস্মিক আগমন তার কাছে দেবতার দানের মত মনে হ'লো!

কনুইয়ের উপর ভর রেখে বালিশ থেকে মাথা তুলে বল্লে—আরে তুমি! টুইন্‌ ব্রস লিমিটেডের গোড়া পত্তন না ক'রে ছাড়বে না দেখছি!

গলার স্বর ভাঙ্গা, মাথার ভার ঘাড় সয় না, বালিশের উপর ধুপ ক'রে পড়ে।

অতুল খানিকক্ষণ সত্যেনের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তারপর তার গায়ের টুইলের কামিজটা খুলে নেয়।

সত্যেন বলে—কি ব্যাপার?

অতুল কিছু বলেন না। আস্তে আস্তে তার চোখ দুটি জলে ভ'রে আসে।

তার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সত্যেনের মুখ শুকিয়ে যায়। যে কথাটা এতদিন তার মনের দোরে আঘাত ক'রে মধ্যে ঢুকতে চেয়েছে, সেই কথাই যেন চোখের জলে রূপান্তরিত হ'য়ে আজ সত্যেনের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

কথাটা সে বলি বলি ক'রেও বল্‌তে পারে না।

হাতের বইটে খুলে অতুলের দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর থাইসীস্‌ শীর্ষক পাতাটার উপর আঙুলের টোকা দিয়ে বলে—তোমারও কি এই মনে হয়?

অতুল সে কথারও কোনো জবাব না দিয়ে বলে—চল, সিম্‌লা, শিলিং, পুরী, যেখানে খুসি!

সত্যেনের গালের উপর যেটুকু রক্তের ছোপ ছিল তাও যেন মিলিয়ে গেল!

তারপর জোর ক'রেই হেসে বলে—বাঃ! তুমি ভয় পেয়ে গেলে যে হে! যদি থাইসীস্‌-ই হ'য়ে থাকে অত ভয় কিসের! Phosphorus হচ্ছে King of Remedies for Phthisis! আর এই দেখ ওর প্রায় সব কটি symptoms আমার সাথে আশ্চর্য্য রকম মিলে গেছে। শুনবে?

অতুলকে রোগলক্ষণ প'ড়ে শোনায়।

একটা দমকা কাশির ধমকে তার হাঁটু বুকের উপর উঠে আসে। বুকে হাত চেপে "মা" ব'লে চোখের কোলের জল মুছে চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে।

অতুল ডাক্তার রায়কে নিয়ে আসে। রোগী পরীক্ষা ক'রে প্রেস্‌ক্রপশান লিখে ডাক্তার রায় বিধান দেন বাড়ি না যাওয়াই ভালো। এই সময়টা ওয়াল্‌টেয়ার চমৎকার।

সত্যেন বলে—না, আগে বাড়ি। মরিই যদি। তবু সবাইকে একবার দেখে যাই!

ডাক্তার রায় আর আপত্তি করলেন না।

সত্যেন অতুল বাড়ি ফেরে।

ছেলেকে দেখে মা কেঁদে ওঠেন—এ কী সর্ব্বনাশ করলি বাবা!

ছেলে বলে—ভয় কি মা? এই বুকের ব্যথাটা যা একটু জব্দ করেছে। আর এই—। থাকগে। তোমার পায়ের ধুলোয় সব সারবে, মা!

বোন বলে—ওমা! তোমায় যে আর চেনাই যায় না, দাদা!

দাদা হেসে বলে—যা-যা! তোর আর জ্যোঠামো করতে হবে না।

একলা পথিক

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

বউ বারান্দায় ব'সে শান-বাঁধানো জলের চৌবাচ্চার ধারের পেয়ারা গাছটার কচি পাতাগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। পাতাগুলো বাতাসে কাঁপে। গাছের তলায় দুএকটা শুক্‌নো পাতা খস্ খস্ ক'রে ওঠে।

অতুল তরুর পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বলে—বউদি, কেন আমি ওকে আন্‌তে গেলুম। দূরে থাকাই যে ছিল ভাল!

তরু কোনো কথা না ব'লে সত্যেনের ডান হাতটা শুধু একটু টিপে দিয়ে নিজের ঘরে চ'লে যায়।

নিরালায় পেয়ে তরুকে সত্যেন বলে—তুমি ভেবোনা, তরু। মরবো না আমি। সে দুঃখের হাত থেকে তোমাকে যে বাঁচাতেই হবে।

তরুর বুকের মধ্যে তার এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা মুখর হ'য়ে ওঠে। প্রাণপণে চোখের জল রোধ ক'রে মনে মনে বলে— এই দশ বছর তো দূরে দূরেই কাট্‌লো। আজ সব ছেড়েছুড়ে সুদূরে যাবার বেলায় তোমাকে যে কাছে পেলুম এই আমার যথেষ্ট।

নীহার নয়নতারার কথামত এক বাটি গরম দুধ আর খানিকটা মিছরির গুঁড়ো নিয়ে আসে।

তরু হাত বাড়িয়ে মলিন হেসে বলে—দাও ওটা আমার কাছে। দেখ, আজ যদি সত্যি তোমার দাদা আমার চাবির রিংয়ের সাথে আঁচলের কোণে বাঁধা থাকে আর দিন রাত টুং টাং করে, তুমি ভাই, রাগ করোনা কিন্তু!

নীহার কি বল্‌বে খুঁজে পায় না।

তরু তাকে বারান্দায় ধ'রে নিয়ে নিয়ে বলে—যখন তখন এ ঘরে তুমি এসো না; বুঝলে? বড় খারাপ রোগ কি না!

নীহার কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বলে—তুমি একা পারবে কেন বউদি! আমাকেও থাকৃতে দাও।

তরু একরকম ক'রে হেসে বলে—আর বেশি দিন পারতে হবে না বলেই মনে করি। দেখলি সে দিন একটা কাক কি রকম আমার পেছনে লেগেছিলো? সিঁথের উপর কি ঠোকরটাই না মেরে গেল। আর কী তার ভয়ানক কা-কা রব। ক্রমে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল!

নীহার বলে—তুমি ভয় পেয়েছ, বউদি! তোমার সাথে আমি থাক্‌বই!

হঠাৎ তরু জ্ব'লে ওঠে। কঠিন স্বরে বলে—যাও, যাও! আমার জন্যে ভাবতে হ'বে না কারো। যার জন্যে তোমাদের ভাবতে হতো সে এই আজ মরতে বসেছে। এখন এ সব কথা নাকি কান্নার মত শোনায়—

নীহার আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ফোঁপাতে থাকে; বলে—বউদি, কি দোষে দোষী আমি তোমার কাছে যে এমন ক'রে বল্‌লে!

তরু তাকে তার বুকের কাছে টেনে আনে। নরম সুরে কয়—লক্ষ্মীটি রাগ করো না। সত্যি আর তোমার কিছু দোষ নয়। দোষ আমার পোড়াকপালের! বল, রাগ করলে না তুমি!

নীহার বলে—না বউদি। কিন্তু দাদার কাছে আমি থাক্‌বোই থাক্‌বো! দেখি কি ক'রে ঠেকাও তুমি!

এক রকম ঝাপসা ঝাপসা ক'রে সে বুঝতে পারে দাদার এই বর্ত্তমান অবস্থার সাথে তারও একটু যোগ আছে। আজ শেষ সময়ে দাদার পাশে থেকে তার সেবা যত্ন দিয়ে তার বিয়ের সময়কার পিতৃঋণটা কতকটা সে শোধ করতে চায়।

মৃত্যুর সাথে তরুর এই প্রথম মুখোমুখি পরিচয়। মৃত্যু যন্ত্রাণায় যে ছট্‌ফট্ করে তার চেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা যে দেখে তার যন্ত্রণাও কম নয়। একটু বাতাসের জন্যে কী মর্ম্মান্তিক হাঁস্‌ফাঁস্!...

সত্যেনের রুক্ষ-কেশ ঘর্ম্মাক্ত মাথাটা তার কাঁধের উপর রেখে হাতপাখাটা নিয়ে তরু জপতে থাকে—ঠাকুর, দয়া কর, দয়া কর। আর তো সইতে পরিনে! নেও যত শীগগির পার একে নেও ঠাকুর। জন্মে জন্মে যেন বিধবা হই। তবু দয়া কর, ঠাকুর, দয়া কর। না হয় আমাকে মেরে ফেল!...

ভালমন্দে এক একটা রাত এক একটা যুগের মত কাটে। ক্রমে শেষের রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

মাকে ছেলে বলে—মা, এই তোমার নীহার রইল। আর এই রইল তরু। দুই-ই তোমার মেয়ে মা! অনেক

কিছুও সহ্য করেছে। আমিও করেছি! তোমরা সে সব কিছু জানো না। জান্তেও দিই নি। যদি কোনো দিন কোনো অন্যায় কিছু ক'রে থাকে ও তোমার কাছে মা, মনে রেখোনা কিছু। ওকে মাপ করো। আমাকেও ক'রো!

মা ছেলেকে বলেন—ওরে, তুই তোর মার উপর অভিমান ক'রে চ'লে যাচ্ছিস্ বাবা! এত বড় দাগা আমি কি ক'রে সইব রে!

অভিমান? নয়নতারার এই একটিমাত্র কথা শুনে সত্যেনের মুখে কে যেন কালি লেপে দিল। তার চোখে মৃত্যুর ছায়া গভীরতর হয়ে এলো···অভিমান? সত্যি তো! সে তো নিজকেও জান্তে দেয়নি মায়ের উপর কত বড় অভিমান ক'রেই এই গুটিকয়েক টাকার জন্যে নিজের জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে!

দুইহাতে নয়নতারার পা জড়িয়ে ধ'রে সত্যেন বলে, মাপ কর মা, মাপ কর! কিন্তু আর তো ফেরবার উপায় নেই। বড় দুঃখ রইল মা যাবার সময়ও তোমাকে কষ্ট দিয়ে গেলুম। তার চোখের জলে মায়ের পা ভিজে যায়।

অতুলকে কাছে ডেকে বলে—আর এক জন্মে টুইন্ ব্রস্ লিমিটেড ফাঁদবো ভাই, এ্যাঃ? না, আর ওষুধ নয়, দাদা। মেয়াদ তো ফুরিয়ে এলো ব লে! এইবার গুড্ বাইয়ের পালা।

নীহারকে বলে—দাদাকে ভুলিস্‌সি যেন বোন্।

নীহার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে! বলে—ওমা, আমাকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারনি কেন!

এক তরুকে সত্যেন কিছু বলে না। সুধু তার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দুটির সকাতর দৃষ্টি দিয়ে যেন নীরবে জানাতে চায়—এবারের মত এই খানেই শেষ! তোমাকে যে দুঃখ দিয়ে গেলুম, তার চেয়ে আমার দুঃখ কম নয়!

* * * *

এক মাস পরে তরুর সেই কাগজকখানা দিয়েই শ্রাদ্ধও শেষ হয়, কর্জ্জও শোধ হয়।

ভগবানের মার দুনিয়ার বার! কিন্তু বউও বোঝে না, শাশুড়ীও বোঝে না।

যে চিতার আগুন এখনো নিভেনি তারি আগুনে একজন আর একজনকে জীয়ন্তে পোড়াতে চায়।

শাশুড়ী দাঁতে দাঁত চেপে বলে—রাক্ষুসী!

বউ শাশুড়ীর দিকে কটমটিয়ে তাকায়। বল্‌তে চায় ডাইনী!

বলে না! ঝঞ্ঝার মত অট্টহেসে এই বিনয়কুটীরের দোর জানলা ঝন্ ঝন্ ক'রে কাঁপিয়ে বলতে পারলে বাঁচতো বুঝি।

চুম্‌কি

শ্রীউমা দেবী

চুম্‌কি যখন চার পুরিয়ে পাঁচে
পা দিয়েছে—এল আমার কাছে
আমাদের ওই লছ্‌মা দাসীর সাথে
একদা এক প্রাতে।
দাসী বল্‌লে, "আমার যে ভাই তুখি,
এইটি তারি খুকি।
গেল বছর মা গেছে এর মারা,
তাইত ভেবে সারা
রাখ্‌বে কোথায়? কাহার কাছে?
আপন জন কেইবা আছে
আমি ছাড়া এ সংসারে তার?
তাইতে মেয়ের ভার—
আমার হাতে দিল তুলে এবার যেতে দেশে
চোখের জলে ভেসে—"
আমি একটু রুষ্ট হোয়ে ব'লে উঠ্‌লুম, "তোর
কাণ্ড দেখে কান্না আসে মোর!
এদিকে তো কাজের কমতি নাই,
তার ওপরে বিষম বালাই
মা-হারা এই কচি বাচ্চাটায়
কোন্‌ সাহসে আন্‌লি ঘাড়ে এমনতর দায়?"—
লছমী আমার অনেকদিনের দাসী।
স্বামীর ঘরে আসি
প্রথম যখন একা একা কাট্‌তো না আর দিন
কাজকর্ম্মহীন—
লছমী তখন আপন হোতে এল আমার ঘরে
কাজের আশা ক'রে।
সেই থেকে ও আছে
আমার কাছে কাছে,

ছায়ার মত, সখীর মত ; দাসীর মত নয়,
একান্ত নির্ভয়।
আমার কথায় লছ্‌মী যেন একটু ব্যথা পেয়ে
মুখের পানে চেয়ে
বল্‌লে ধীরে শান্ত সুরে তার—
"তোমার কাজে ঘটায় ব্যাঘাত এই মেয়েটার
সাধ্য কভু আছে?
এতটা দিন নিমক আমি খাইনি তোমার কাছে?
নিতান্ত ও দুঃখিনী যে জন্ম থেকে মায়ের স্নেহ ছাড়া
বাপের কাছে মার খেয়েছে, আর পেয়েছে তাড়া ;
আপন মনে থাকে ও যে—নেইক মুখে বুলি—
অবাক কাণ্ড! যদি ওকে খাবার দিতে ভুলি
ভয়ে ভয়ে চায়না ওযে থাকে উপোস ক'রে
সঙ্কোচেতে ভ'রে।"
এতক্ষণে—দাসীর পেছন ঘেঁসে
দাঁড়িয়ে ছিল যে মেয়েটা রুক্ষ কেশে
ময়লা কাপড় পরে',
নজর আমার পড়ল যেমন--স্নেহে ভ'রে
উঠ্‌ল আমার বুক!
ছোট্ট এতটুক্
মা-হারা এই কচি মেয়ে
আমার চুনির চেয়ে—
ছোটই হবে—ওরে কেমন ক'রে
পিসির আদর হোতে কেড়ে রাখি দূরান্তরে?
এমন সময় দাসীর গলা শুনি
দৌড়ে এল চুনি—
দুটি হাতে জড়িয়ে গলা
যত কথা এতটা দিন হয়নিক তার বলা—
অবিলম্বে করল সবি সুরু
ঘুরিয়ে চোখ, ফুলিয়ে নাক বাঁকিয়ে দুটো ভুরু—।
কথার স্রোতে তার—
অন্ত যেন পেলুম আমি আমার ভাবনার।
হঠাৎ যেমন পড়ল নজর পেছন-ঘেঁসা সেই মেয়েটার পানে ;
অম্‌নি বাক্যবাণে

চুম্‌কি

শ্রীউমা দেবী

নতুন ক'রে ভরল চারিধার
এলো মেলো ছাড়া ছাড়া মানে বোঝাই ভার!
"লছি, লছি, এই মেয়েটা কোথা থেকে পেলি?
দেশ থেকে যে এলি—
আমার তরে আন্‌লি কি তুই খেলার পুতুল ভুলে?"
তারপরে ওর মুখ খানাকে তুলে
শুধায় ওরে—
"কি নাম ধ'রে
তোকে সবাই ডাকে?
এটা আবার ঝুলচে কি তোর নাকে?
নোলক বুঝি? অবাক হ'য়ে আছিস্‌ কেন চেয়ে?
কোথা থেকে আন্‌লি লছি, এমন ধারা মেয়ে?"
এই ব'লে সেই হরিণ শিশুর মত
লজ্জা ভয়ে নত
সেই মেয়েটার হাত দুখানা ধ'রে
পাশের ঘরে নিয়ে গেল ভাব জমাবার তরে।
চেয়ে চেয়ে আমার হোল মনে
আমরা মাথা ঘামাই অকারণে!
সৃষ্টি করি মিছেই কথার জাল
তবু যেন পাইনে কোথাও তাল—
মত্ত থাকি আপন অহঙ্কারে!
শিশুর মত কবে মোরা দেখ্‌ব এ সংসারে!
সেই থেকে ও রয়ে গেল আমাদের এই ঘরে
এত বছর ধ'রে।
আমিই ওকে দিলুম চুম্‌কি নাম
খবর পেল দেশে দুঃখী রাম।
চুনী এখন ইস্কুলেতে যায়,
মাথায় অনেক বেড়েছে লম্বায়,
বয়েস সবে হোল এবার বারো,
দেখায় বড় আরো।
চুম্‌কি আজো তেম্‌নি আছে ক্ষীণ;
যেন দিনের দিন
ছোট থেকে ছোট্ট আরো হয়;
বড় বড় চোখ দুটোতে ভয়

সদাই যেন উঠ্‌ছে ফুটে তার ;
মধুর স্বভাব কোমল ব্যবহার।
ইস্কুলেতে দিইনি আমি ওকে
জানি আমি বল্‌বে আমায় লোকে—
এখানে মোর স্বার্থ কিছু আছে,
ইস্কুলেতে ওকে দিলে পাছে
আমার মেয়ের মান হানি বা হয়,
সেইটে জাগে ভয় ;
তোমরা জেন নয়ক সত্যি তাই।
আমি যে ভয় পাই
ওর শরীরের তরে,
একটু তাতেই ওকে ক্লান্ত করে।
আস্তে চলে, আস্তে বলে, আহার তাও কম,
এর উপরে স্কুলের পরিশ্রম—
সইতে যদি না পারে ও পড়বে ব্যারামে।
তার চেয়ে ও থাক্ না আরামে।
আমার কাছে পড়ে লেখে, পিসির সাথে ঘরের কাজে লাগে
সবার আগে আগে।
লছমি এখন পাকিয়েছে তার চুল ;
ভিমরতি আর ভুল
এখন যেন ঘট্‌ছে মাঝে মাঝে
অবিশ্রান্ত কাজে।
চুমি বলে, "পিসি. তোমার সকল কাজের ভার
দাও মোরে এবার—"
লছমী হাসে, বলে, "ওরে বেটি,
মরা হাতী লাখ টাকা যে জানিস্‌নেকি সেটি ?"
চুম্‌কি সেটা মানে—
পিসির কাজের শক্তি কত ভাল ক'রেই জানে।
চুনীকে ও তেম্‌নি ভালবাসে ;
ছায়ার মত ঘোরে সদাই পাশে।
চুনী যদি কিছু হুকুম করে—
করবে কি যে—খুসীর ভরে
পায়না যেন ঠিক,
হারায় দিক্ বিদিক্।

চুম্‌কি

শ্রীউমা দেবী

চুম্‌কি চুনী ছোট্ট দুটি ফুল
আমার ঘরে উঠ্‌ল ফুটে নাই যেন রে তুল্‌!
চুনী যেন অস্ফুট মোর গোলাপ ফুলের কলি,
কবে সে যে উঠবে ফুটে—ভাবছি কুতুহলি'
রূপে গন্ধে ভরিয়ে দেবে আমাদের এই বুক!
সেদিন কি আর থাক্‌ব বেঁচে? তাই তো জাগে দুখ।
চুম্‌কি যেন শিউলি ফুলের মত,
একটি নিশির খেলায় আছে রত;
রাতের বেলা কখন ফুটে উঠে
ভূঁয়ের পরে পড়বে ঝ'রে লুটে
কেউ জানেনা। তাইত জাগে ভয়;
ও যে আমার সবার মত অমন ধারা নয়।
সেদিন সকাল থেকে
ঘন মেঘে আকাশ আছে ঢেকে,
চুনী গেছে ইস্কুলেতে।
ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে
শুয়ে আছি—চুম্‌কি মাথার কাছে
এক মনেতে পাকা চুল মোর বাছে।
এমন সময় যেন ঝড়ের বেগে,
লছমী সেথা দৌড়ে এল ভীষণ চ'টে রেগে—
বল্‌লে, "দিদি, এতদিনের পরে
দুঃখারাম এসেছে তার মেয়ের খোঁজের তরে"—
সাত বৎসর হোয়ে গেল পার—
যেদিন দুখি লছির হাতে দিল মেয়ের ভার;
তার পরেতে আর—
খবর কভু নিতে কিন্তু হয়নিক দরকার।
আমি বল্‌লুম, "বুড়ী হোয়ে একটু তাতে যাস্‌ যে হেদিয়ে!
বাপ এসেছে মেয়ের খোঁজে রাগের কথা কি এ?"
লছি বল্‌লে, "কপাল আমার! এই কি হোল খবর নিতে আসা
জাননা তো মগজে ওর দুষ্টু বুদ্ধি ঠাসা—
চুম্‌কিকেও নিয়ে যাবে তাই এসেছে আজ"—
আমার যেন মাথায় পড়ল বাজ!
এতটা দিন ধ'রে
রেখেছি যে আড়াল ক'রে

ওরে বুকের তলে—
আজকে ওকে নিয়ে এই কথা সে বলে ?
আমি বল্লুম, "হঠাৎ কেন এমন মতি তার ?"—
লছি বল্লে, "বাপের অধিকার।
দেশে নাকি ঠিক করেছে বর—
বড় মানুষ ঘর ;
মেয়ের বিয়ে দিলে মোদের জাতে
টাকার থলি আসে যে তার সাথে,
টাকা নিয়ে বেচি ঘরের মেয়ে।
মোদের ঘরে মেয়ের মূল্য অনেক বেশী বেটাছেলের চেয়ে"—
কইনু আমি, "কেমন ছেলে ? ভালই যদি হয় ?
প্রস্তাবটা মন্দ তেমন নয়—"
লছি বল্লে, "ভাল ছেলে ? এমন শুভ মতি
হবে দুখির ? খারাপ ছেলে অতি !
আমি তারে ভাল ক'রেই জানি,
দুখির সমান হবে বয়েস খানি,
তার উপরে তিনটে বিয়ে আগেই আছে করা,
চারের সংখ্যা পুরবে এবার দুখির কাছে তাই দিয়েছে ধরা"—
আমি বল্লুম, "বাবু আসুন তার পরেতে ওরে
দেব বিদায় ক'রে"—
লছি বল্লে, "সাধ্য কি যে ঠেলবে ওকে।
বশ করেছে দেশের লোকে ;
তার উপরে পুলিশ আছে ঠিক।
এমন ভায়ের বোন হোয়েছি তাইত জাগে ধিক্।"
এমন সময় দুষমনেরি মত
বেঁটে মোটা পিঠটা কুঁজে নত
এল সেথা চুমির বাবা মস্ত সেলাম ক'রে
হিন্দিতে সে ভাঙা গলায় বল্লে আমায় জোরে,
"বেটি কোথায় ? এক্ষুণি সে আসুক আমার সাথে
যেতে হবে মুল্লুকেতে ছুটোর গাড়ীটাতে।"
তার পরেতে লজ্জা ভয়ে ত্রাসে
চুমি যেথা দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়াল তার পাশে ;
কটমটিয়ে দেখল ওরে ;
তার পরেতে আরো বিষম জোরে

চুম্‌কি

শ্রীউমা দেবী

ব'লে উঠল, "চল্ হাম্‌রা সাথ"—
হ্যাঁচকা মেরে টান্‌লো চুমির হাত।
আমি বললুম, "আমার হুকুম শোন—
যেতে আমি দেবনা কক্‌খনো"—
দুখি বল্‌লে, "এম্‌নি যদি না পাই ওরে শেষে
শেকল বেঁধে নিয়ে যাব—পুলিশ নিয়ে এসে— "
একটি কথা এলনা আর মুখে।
চুম্‌কি গভীর দুখে
চাইল বারেক আমার মুখ' পানে ;
সেই চাহনি বাজ্‌ল গিয়ে আমার মায়ের প্রাণে।
দৌড়ে আমি গেলাম সেখান থেকে,
শুন্‌ছি লছি বল্‌ছে ওরে ডেকে—
"যাস্‌নে চুমি, যাস্‌নে চুমি ওরে—"
বাপ বেটিতে চ'লে গেল—নাম্‌ল বৃষ্টি জোরে।
চুমকি যাবার এগারো মাস পরে
দিন দুএকের জ্বরে
লছমী গেল মারা।
চুনী যেন হোল মাতৃহারা ;
একেই তো সে চুম্‌কি যাবার পরে—
গুম্‌রে আছে মরে,
তার উপরে লছমী দাসীর এ চির বিচ্ছেদ
নতুন ক'রে লাগল তারে খেদ।
দেশে আমি খবর দিলুম দুখীরামের কাছে
চুম্‌কি কোথা আছে ;
জবাব তাহার এল নাক' ভাবছি ব'সে তাই
কেমন করে জানাই তারে আজ যে লছি নাই।
মা হারা সেই কচি মেয়ের তরে
পিসির যত ভাবনা ছিল, আজ মরণের পরে
মুক্তি পেল সেকি ? হয় তো বা তা' নয় ;
শান্তি তাকে দিলনাক স্বরগ আশ্রয় ;
দিবানিশি রইল ঘিরে তারে
নতুন বাঁধন হোল এবার এ পারে ঐ পারে।
আরো কত বছর গত হোল—
চুনীর সেবার পুরলো বুঝি ষোল ;

ফুলে ফুলে ভরল দেহ তার,
চেয়ে চেয়ে তার পানেতে আশ মেটেনা আর।
প্রবেশিকা পাশ ক'রে সে বিশ টাকা জলপানী
দিল আমায় আনি।
বল্লে ধীরে, "চুমির নামে কোথাও কোর দান।"
কোথায় সে যে কেমন আছে জানেন ভগবান।
অনেক খুঁজে পাওয়া গেল মনের মত বর—
যেমন ছেলে—তেম্নি বড় ঘর।
স্বামী যেদিন এই সুখবর এনে দিলেন মোরে
খুসীর সাথে মনে হলো, ওরে
ছাড়ব কেমন করে ?—
একলা এক মাসের শেষে
আলতা রংএর শাড়ী পরে নববধূর বেশে
চুনী আমার গেল পরের ঘরে
চির দিনের তরে !
বিয়ের আগে লিখেছিলুম দুঃখিরামের কাছে
চুম্‌কি কোথা আছে—
খবর মোরে দিতে একটিবার—
চুনীর বিয়ে আস্‌বে না সে—কেমন অবিচার !
দুখীর চিঠি ঘুরে এল "মালিক সেথা নাই"—
কে জানে হায় কেমন ক'রে কোথায় তারে পাই !
চির জীবন ধ'রে
এই বেদনা কাঁটার মত রইল বুকে ভ'রে !
এল পূজার দিন
গৃহ আমার শূন্য সুখহীন।
চুনী গেছে দারজীলিং এ বরের সাথে তার,
এবার পূজোয় আস্‌বে না সে আর।
আমি কেবল একলা আছি ঘরে
কর্ত্তা গেছেন নৈনিতালে মাস দুএকের তরে।
—সেদিন ষষ্ঠী তিথি,
কোথায় যেন বাজে বোধন গীতি ;
উমা আস্‌বে সারা বছর পরে
ধানের আকাশ উঠ্‌ল যে তাই চঞ্চলতায় ভ'রে
আগমনীর গানে—

চুম্‌কি

শ্রীউমা দেবী

কতদিনের কত কথা ভাস্‌ল যেন প্রাণে।
কেউ ছিল না কাছে,
তবু যেন সবারে আজ পেলাম আঁখি মাঝে।
অন্যমনে ব'সে আছি—হঠাৎ দূরে যেন
মলিন ছায়ার হেন
বারান্দাটার কোণের দেয়াল ঘেঁসে
মনে হোল কে যেন এক দাঁড়িয়ে আছে এসে।
চাঁদের 'পরে পড়েছিল মেঘের আবরণ
আলোয় ছায়ায় মেশামিশি বারাণ্ডাটার কোণ,
মনে হোল সে এসেচে—হয় তো বা সে নয়—
স্বপন যদি হয়
সেই ভয়েতে চোখটা বুজে রইনু খানিক্ষণ ;
উঠ্‌ল কেঁপে মন।
এমন সময় অভাগী সেই মেয়ে
দৌড়ে এল ধেয়ে,
'মা' ব'লে সে উঠ্‌ল আমায় ডেকে
মেজের পরে লুটিয়ে প'ল পায়ের তলে ঠেকে।
হায়রে কপাল! চুম্‌কি এ যে মোর!
এত দিনের পরে কিরে পড়ল মনে তোর?
আলো জেলে, দুহাত দিয়ে টেনে নিলুম বুকে ;
গভীর স্নেহে সুখে—
অবাক হোয়ে দেখ্‌নু তারে চেয়ে—
এই কি আমার অনেক দিনের সেই হারানো মেয়ে?
শীর্ণ যেন রুক্ষ, মলিন, কালো
বিশাল দুটি আঁখির উজ্জল্ আলো
অন্ধকারে ঢাকা,
গভীর বিষাদ মাখা।
এক নিশাসে শুধাই তারে এলি কাহার সাথে?
এমন দুপুর রাতে?
জামাই কোথায়? বাবা কোথায়? আছে সবাই ভাল?
কেমন ক'রে হলিরে তুই এমন রোগা কালো?
কোনো কথা কইল না উত্তরে—
পা দুটো মোর ধ'রে—
রইল প'ড়ে ছিন্নলতার মত

বেদন-ভারে নত।
আমি ধীরে রুক্ষ কেশে তার
হাত বুলিয়ে দিলাম বারে বার;
আঁখির ধারে ভাস্‌ল আমার বুক—
কিসের অশ্রু? দুঃখ সেকি? নয়ক' এ যে সুখ।
যেমন করেই আসুক তবু এসেছে মোর পাশে
উমা যেমন বছর শেষে মায়ের ঘরে আসে।
খানিক কেঁদে মনের ব্যথা ভার
একটু বুঝি লাঘব হোল তার—
হঠাৎ শুধায়—"পিসি কোথায় মোর?—
এমন কেন লাগছে চোখে ঘোর?
পিসি তো বেশ আছে ভাল? কোথায় চুনী বোন?
এমন কেন কাঁপ্‌ছে আমার মন?"
একে একে কইনু সবি তারে—
এতদিনের এত কথা—ভাস্‌ল আঁখি ধারে;
জমাট বাঁধা অশ্রু যেন হোল বাঁধন হারা।
ঝরল অঝর ধারা।
তারপরেতে মাটির পানে চেয়ে—
যে কথা সে কইল আমার ভাগ্যহতা মেয়ে—
ভাব্‌তে আজো কাঁপে আমার বুক
নিঠুর বিধি, কঠিন বিচার, নেই দয়া একটুক।
স্বামীর ঘরের অশেষ অত্যাচারে
জর্জ্জরিত হোয়ে এবার এসেছে মোর দ্বারে;
মরণ হোতে নেইক' বাকি আর,
শেষ শ্বাসটা আমার কাছে ফেল্‌বে এ সাধ তার
জেগেচে ওই দুঃখে ভরা প্রাণে;
কোন মতে পালিয়ে সে তাই এসেচে এই খানে।
"লুকিয়ে রাখ, মাগো, আমায় লুকিয়ে হেথা রাখ
বিশ্বনাথে ডাক—
বল তাঁরে তোমার কাছে শেষ যেন হয় আর
এ জনমের তরে আমার নাই কিছু চাইবার!"
ব্যাধি কাতর দেহে তাহার নানা রকম রোগ
তার উপরে পিসির মৃত্যু শোক
পথের কষ্ট—উত্তেজনা বশে—

চুম্‌কি

শ্রীউমা দেবী

মনে হোল বৃন্ত শুধু, ফুলগুলি তার আগেই গেছে খ'সে।
চিকিৎসকে হাসল ক্ষীণ হাসি—
তার পরেতে নীচু গলায় বল্‌লে আমায় আসি,
"আজ রাতটা হয় তো বা শেষ রাত ;
মনের জোরে কেবল আছে, এড়িয়ে গেছে চিকিৎসকের হাত।"
উৎসব শেষ—যাচ্ছে সবে ঠাকুর ভাসানে,
বিদায় বাঁশির সুরে যেন চমক্ লাগে প্রাণে!
ব'সে আছি চুনির মাথার পাশে—
হটাৎ দুঠোঁট নড়ল যেন কথা বলার আশে।
গেলাম কাছে বল্‌লে, "মাগো, নাই কিছু আর সাধ,
এত দুখের মাঝে ছিল পিসির আশীর্ব্বাদ,
তোমার ঘরে, তোমার পাশে, তোমার বুকে থেকে
মরণ যদি চায় তো এবার নিক্‌না আমায় ডেকে"—
—বড় বড় মস্ত দুটি চোখে
ও যেন রে দেখ্‌তে পেল সুদূর স্বর্গলোকে—
হঠাৎ কি তাই উঠ্‌ল অমন হেসে?
মরণ তারে মুক্তি দিল—অনেক দুখের শেষে।
বিসর্জ্জনের ঢাক
কোথায় দূরে বাজ্‌তে ছিল—যেন শেষের ডাক
ডাক্‌তে ছিল সারা আকাশ ব্যেপে
মরা মেয়ের বুক খানাকে চেপে।
ধ'রে তাহার শীতল দুটি হাত
একা ব'সে রইনু সারা রাত।
মনে হোল আমার চুমির বিদায় বেলার হাসি
তারায় ভরা আকাশ মাঝে উঠ্‌ছে যেন ভাসি।

২২

এ পর্য্যন্ত পুরুষদের আলোচনার মধ্যে মতান্তরের উত্তেজনা থাক্‌লেও মনান্তরের কোনো আশঙ্কা ছিল না—কিন্তু অকস্মাৎ তার মধ্যে তপ্ত মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কমলা আবির্ভূত হওয়ায় ব্যাপারটা সহসা এমন গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াল যে, একটা অপ্রীতিকর ঘটনার দুশ্চিন্তায় সকলের মন উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। চেয়ার নিয়ে বিনয়ের আচরণ যে তারই পূর্ব্বরঙ্গ, এবং আসল অভিনয়টা যে সেই অনুপাতেই গুরুত্ব লাভ করবে—এ সকলেই মনে করলে।

কমলার মুখ দিয়ে কিন্তু প্রতিবাদের একটি বাক্যও বার হ'ল না—সন্তোষের দেওয়া চেয়ারে আশ্রয় নিয়ে সে নতনেত্রে নির্ব্বাক হয়ে ব'সে রইল। বিনয়ের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যে-সব তীক্ষ্ণ শাণিত উত্তর উপযুক্ত ভাষায় সজ্জিত হ'য়ে তার মাথার মধ্যে আপনা-আপনি উপস্থিত হয়েছিল, হাল্কা শাদা টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের মত কখন্ তারা কোথায় মিলিয়ে গেছে! যা দু'একটা কথা মনে এল তা মনে হ'ল এতই দুর্ব্বল যে, বিনয়ের বিদ্রূপ-বিতর্কের আঘাত একমুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারবে না। বারান্দা থেকে চেয়ার নিয়ে এসে সন্তোষ বসেছে; বিনয়ের কথার উত্তরে কমলা যা বল্‌বে তা শোনবার অপেক্ষায় সকলে নীরবে অবস্থান করছে; অথচ কোন্ কথা দিয়ে সে কথা আরম্ভ করবে, বিনয়ের কোন্ কথার প্রতিবাদ সে প্রথমে করবে তা স্থির করতে না পেরে সে কথা বলতে পারছে না, এই শোচনীয় অবস্থার উপলব্ধি কমলার বিহ্বলতাকে আরও বাড়িয়ে তুললে।

কোনো তীক্ষ্ণ আঘাতের প্ররোচনায় একটা অবান্তর ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হ'লে মানুষের এম্‌নি দুরবস্থাই হয়। কোথায় কখন্ কি ভাবে আহত হ'য়ে মনের মধ্যে যে বৈরূপ্য উৎপন্ন হয়েছিল তা উদ্যত হ'য়ে উঠ্‌ল প্রথম সুযোগেই এই নারী জাতির অধিকার বিষয়ে আলোচনা অবলম্বন ক'রে; সেই বৈরূপ্যের প্রভাবেই সমস্ত সঙ্কোচ এবং প্রতিবন্ধ কাটিয়ে কমলা বিরোধের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কিন্তু অবিলম্বেই সে বুঝ্‌তে পারলে যে ক্রোধ শুধু প্রবর্ত্তিতই করতে পারে, কিন্তু তার পরেই যে জিনিসের একান্ত প্রয়োজন তা অস্ত্র—ক্রোধ নয়। রাগ ক'রে সবই প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু প্রতিপন্ন করা যায় না কিছুই;—তার জন্যে চাই যুক্তি, বিচার, স্থৈর্য্য।

কমলার বিপন্ন অবস্থা উপলব্ধি ক'রে বিনয়ের মনে করুণা হ'ল। সে বুঝ্‌লে কথাটা আবার নূতন ক'রে না উঠ্‌লে কমলার পক্ষ থেকে আরম্ভ হওয়া কঠিন; বল্‌লে, "মিস্ মিত্র, আপনি কি সন্তোষ বাবুরই মতো বলতে চান যে, পুরুষরাই মেয়েদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেচে?"

প্রসঙ্গের পুনরবতারণে কমলা ঈষৎ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌ল; মনের নিভৃত প্রদেশে হয়ত একটু কৃতজ্ঞতাও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেখা দিলে; বল্‌লে "হাঁ, নিশ্চয়ই বল্‌তে চাই।"

"আচ্ছা, এ ভাবে কতদিন পুরুষরা মেয়েদের বঞ্চিত ক'রে রেখেচে—তা আপনার মনে পড়ে কি? এমন কোনো যুগের কথা কি মনে পড়ে, যে সময়ে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়ে সমকক্ষতা করেছে?"

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কমলা বল্‌লে, "বোধ হয় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই পুরুষরা মেয়েদের বঞ্চিত ক'রে এসেছে।"

বিনয়ের মুখে একটা নীরব মৃদুহাস্য খেলে গেল, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে কেউ তা লক্ষ্য করলে না। সে বল্‌লে, "আপনার এ উক্তি পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত জাতের সম্বন্ধে খাটে?—না, কোনো কোনো জাত এ উক্তি থেকে বাদ পড়ে? চীন জাপান থেকে আরম্ভ ক'রে উত্তর আমেরিকায় দক্ষিণ আমেরিকায় পর্য্যন্ত কত হাজার হাজার জাত আছে মনে ক'রে দেখুন।"

কমলাকে দিয়ে যে-স্বীকারোক্তি করিয়ে নেবার জন্যে বিনয় অগ্রসর হচ্চে তা বুঝ্‌তে পেরে সন্তোষ তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "আছে। এমন অনেক অসভ্য জাত আছে যাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে কোনো অধিকার-ভেদ নেই।"

এবার বিনয়ের হাসির মৃদু ধ্বনি শোনা গেল; সে কমলাকে সম্বোধন ক'রেই বল্‌লে, "মিস মিত্র, আপনি এমন একটাও অসভ্য জাতের নাম করতে পারেন কি যাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে কোনো অধিকার ভেদ নেই?"

এ প্রশ্নে কমলা প্রথমে একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেল—তারপর আরক্তমুখে স্খলিতকণ্ঠে বল্‌লে, "আমি না পার্‌লেও, সন্তোষ বাবু হয়ত' পারেন।"

বিনয় বল্‌লে, "আচ্ছা, সন্তোষ বাবুর সাহায্য নেওয়া যদি একান্তই আপনার দরকার হয়, তা হ'লে তাঁর কাছ থেকে এমন একটা অসভ্য জাতের নাম জেনে নিন্ যাদের সর্দ্দার একজন পুরুষ নয়।"

এই প্রশ্নের ভঙ্গীতে কমলার অজ্ঞতার বিষয়ে যে ইঙ্গিত ছিল তার অপমানে কমলার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু উত্তরে সে কি বল্‌বে তা ভেবে স্থির করবার পূর্ব্বেই সন্তোষ উত্তর দিলে; বল্‌লে, "হঠাৎ বলা শক্ত; তবে Peoples of All Nations হাতের কাছে থাক্‌লে হয়ত বল্‌তে পারতাম।"

বিনয় তেমনি শান্তভাবে বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে না-হয় Peoples of All Nations হাতের কাছে না পাওয়া পর্য্যন্ত এ আলোচনা বন্ধ থাক্?"

বিনয়ের সংযমের ভঙ্গিমায় এবং বাক্যের বাঁধুনিতে কমলা মনে মনে অতিশয় উত্যক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লে, "তার দরকার কি? স্বীকার করলাম তেমন কোনো জাতের নাম জানিনে—আপনি তা'তে কি বল্‌তে চান?"

বিনয় বল্‌লে, "আমি তা'তে বলতে চাই যে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সব দেশে সব জাতে পুরুষরা যদি স্ত্রীলোকদের দাবিয়ে রেখে থাকে তাতে পুরুষদের প্রতি আপনাদের যতই রাগ হ'ক না কেন, একবারও মনে মনে এ সংশয় হওয়া উচিৎ নয় কি যে, তা হয়ত' আপনাদেরই দুর্ব্বলতা অথবা অক্ষমতার জন্যে? প্রথমে আপনারা স্বেচ্ছায় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং তারই সুবিধা নিয়ে পরে পুরুষরা বরাবর আপনাদের ওপর প্রভুত্ব খাটিয়ে আস্‌ছে, এ কথা বোধ হয় আপনারা বল্‌তে চান্ না?"

অবহেলার স্বরে কমলা বল্‌লে, "এ আপনাদের সেই পুরোনো যুক্তি, পুরোনো তর্ক! এ আর আপনারা কতবার বল্‌বেন?"

মৃদু হেসে বিনয় বল্‌লে, "যতবার আপনারা বলাবেন। তর্ক পুরোনো হ'লে ত কোনো দোষ নেই মিস্ মিত্র, ভুল হ'লেই দোষ। এক লক্ষবার তিন দুগুণে ছয় হয় বলবার পরও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তিন দুগুণে কত হয়, তা হলে বল্‌তেই হবে তিন দুগুণে ছয় হয়; নূতনত্বের খাতিরে তিন দুগুণে সাত হয় বল্‌লে বোকামি হবে।"

উত্তেজিত হ'য়ে সন্তোষ বল্‌লে, "কিন্তু আপনি যে তিন দুগুণে ছয় হয় বলছেন তার প্রমাণ কোথায়? আপনি হয়ত' তিন দুগুণে সাত হয়-ই বল্‌ছেন!"

মাথা নেড়ে বিনয় বল্‌লে, "মিস মিত্রের কিন্তু আপত্তি এ নয় যে, আমি ভুল কথা বল্‌ছি—তাঁর আপত্তি আমি অনেকবার-বলা পুরোনো কথা বল্‌ছি।"

কোনো পক্ষ থেকে কোনো প্রকার অবাঞ্ছনীয় আচরণ না ঘটে সে জন্য মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ থাক্‌লেও দ্বিজনাথ সকৌতুকে এই তর্ক-বিতর্কের সংগ্রাম উপভোগ করছিলেন; চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে উঠে ব'সে বল্‌লেন, "ওহে বিনয়, তুমি যদি পেণ্টার না হ'য়ে ব্যারিষ্টার হ'তে তা হ'লে আমার মনে হয় ঢের বেশি টাকা কামাতে পারতে। শুধু জেরা আর তর্ক করবার শক্তিই নয়, নিজে ঠাণ্ডা থেকে প্রতিপক্ষকে উত্তপ্ত করবার তোমার অসাধারণ ক্ষমতা আছে তা'তে সন্দেহ নেই!"

কলহ-বাক্যের পীড়নে বায়ু জমাট বেঁধে উঠেছিল, দ্বিজনাথের পরিহাস-বাণীর প্রভাবে অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। উৎফুল্ল মুখে সুকুমার বল্‌লে, "শুধু প্রতিপক্ষকেই নয়, মিত্র মশায়, প্রতি ব্যক্তিকেও! আমিও মনে মনে অতিশয় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিলাম; কিন্তু পাছে কোনো কথা বল্‌লে সেই কথা নিয়ে ও আরো তর্ক করবার সুবিধে পায় সেই জন্যে চুপ ক'রে ছিলাম।"

সুকুমারের কথা শুনে দ্বিজনাথ হেসে উঠ্‌লেন; বল্‌লেন, "বেশ করেছিলে সুকুমার!—বোবার শত্রু নেই।"

মৃদু হেসে বিনয় বল্‌লে, "যারা বোবা নয় তাদেরো কিন্তু আমি শত্রু নই মিষ্টার মিত্র,—তাদেরো আমি মিত্রই।" তারপর কমলার দিকে চেয়ে নম্র-বিনীত স্বরে বল্‌লে, "আমার কোনো কথায় অথবা আচরণে আপনার প্রতি যদি সামান্য মাত্রও অশিষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তা হ'লে আমাকে ক্ষমা করবেন মিস মিত্র,—আপনার প্রতি অশিষ্টতা প্রকাশ করবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার ছিল না। যখন বুঝ্‌লাম যে আপনি পুরুষের সমকক্ষতা দাবী ক'রে পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তর্ক করতে এসেছেন তখন, অন্ততঃ সে সময়ের জন্যে, আপনার সঙ্গে স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার করা শুধু নিরর্থকই নয়—অসঙ্গত হবে ব'লে মনে হয়েছিল। ধরুন, সীতাহরণ অভিনয়ে আমাকে যদি রামের চরিত্র অভিনয় করতে হয়, আর আমার বন্ধু সুকুমারকে যদি রাবণের চরিত্র অভিনয় করতে হয়, তা হ'লে সুকুমার আমার সমুখে এলে আমি যদি তাকে তীর না মেরে বন্ধু বিবেচনায় শেক্‌ হ্যাণ্ড্‌ করি তা' হ'লে অবিবেচনার কাজ হয় না কি?"

হাসির একটা উচ্চ রোল উঠ্‌ল। সুকুমার বল্‌লে, "দেখুন মিত্র মশায়, কি রকম আমার বন্ধু দেখুন! উনি রাম হ'য়ে তীর মারবেন, আর আমি হব রাবণ!"

সহাস্য মুখে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তা বাপু, বিশ হাতে তুমিও ত' নেহাৎ কম মারবে না।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ হাতে ত' আমি সুবিধে করতে পারব না মিত্র মশায়,—দু' হাতে ও-ই আমাকে শেষ করবে!"

বিনয় বল্‌লে, "তোমার ভয় নেই সুকুমার, তার আগেই আমাদের অভিনয় শেষ ক'রে দোবো।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সুকুমার বল্‌লে, "আর সীতা অশোকবনে প'ড়ে চিরকাল দুঃখ পাবে?"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠ্‌ল।

মনে হচ্ছিল হাস্য-পরিহাসের বারি-বর্ষণে বিরোধের আগুন একেবারে নিভে গিয়েছে—কিন্তু এক দিকে ভস্মের ভিতর থেকে আবার নূতন ক'রে একটু ধোঁয়া দেখা দিলে। বিনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কমলা বল্‌লে, "আপনার কোনো আচরণের জন্যে আমি একটুও অনুযোগ করছিনে বিনয়বাবু, কিন্তু আপনি কি মনে করেন আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসে আমি অভিনয় করতে এসেছিলাম?"

উদ্বিগ্ন-অপ্রসন্ন কণ্ঠে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "না, না, কমল, সে রকম কোনো অর্থে বিনয় অভিনয়ের কথা বলেননি। আর যেতে দাও ওসব কথা—তার চেয়ে বরং একটু তোমার গান টান হ'ক—অতিথি-সৎকারের দিকে একটু মন দাও।"

দ্বিজনাথের প্রচ্ছন্ন ভৎর্সনায় নিজ আচরণের অসমীচীনতা বুঝ্‌তে পেরে লজ্জিত হ'য়ে কমলা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "গান যদি সুবিধে হয় ত' পরে হবে বাবা, খাবারের দিকটা কতদূর এগুলো একটু দেখে আসি।"

বিনয় বল্‌লে, "মিস্‌ মিত্র, দয়া ক'রে একটুখানি অপেক্ষা ক'রে যান। চপ্‌ কাট্‌লেটের ব্যবস্থা যতই করুন না কেন,

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অতিথিকে প্রশ্ন ক'রে তার উত্তর না নিলে অতিথি-সৎকার কিছুতেই হবে না।"

বিনয়ের ভঙ্গী দেখে সকলের ভয় হ'ল আগুনটা দ্বিতীয়বার ভাল ক'রেই বুঝি জ্ব'লে উঠ্‌ল! সন্তোষ বল্‌লে, "প্রশ্ন ক'রে উত্তর না নিলে বুঝ্‌তে হবে প্রশ্ন তুলে নেওয়া হয়েচে; সে হিসেবে বিনয় বাবু, আপান চপ্‌ কট্‌লেটের ব্যবস্থায় বাধা না দিতে পারেন।"

কমলা কিন্তু সে মীমাংসার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে চিন্তিত অপ্রসন্ন মুখে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে বলুন কি বলবেন।"

একমুহূর্ত্ত স্থিরনেত্রে কমলার দিকে চেয়ে বিনয় বল্‌লে, "আমার ত' নিশ্চয়ই মনে হয় মিস্ মিত্র, আপনি তখন আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসে অভিনয় করতেই এসেছিলেন।"

কমলার দুই চক্ষের মধ্যে অগ্নি-কণা জ্ব'লে উঠ্‌ল; তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে, "অভিনয় করতে এসেছিলাম?"

বিনয় বল্‌লে, "এসেছিলেন। আপনার শিক্ষা, রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তির যে-টুকু পরিচয় এ কয়েক দিনে আমি পেয়েছি তাতে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, যে-মূর্ত্তি নিয়ে আপনি আমাদের মধ্যে তখন উপস্থিত হয়েছিলেন তা আপনার নিজের মূর্ত্তি। ওটা আপনার নিতান্তই ধার-করা মূর্ত্তি ব'লে আমার মনে হয়েছিল। কিছু মনে করবেন না মিস মিত্র, আপনার কল্যাণী লক্ষ্মীমূর্ত্তি ত্যাগ ক'রে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করবেন কিসের লোভে? নিজের পদ্মাসন ছেড়ে পুরুষের কাঁটাবনে ছুটোছুটি ক'রে কি পরমার্থ লাভ করবেন? দেখুন, ইচ্ছে ক'রে নিজের মহিমা থেকে, শ্রী থেকে, নিগূঢ়ত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন না; পুরুষের মোহ, স্বপ্ন, রহস্য নিজের হাতে ভেঙ্গে দেবেন না। কেশ যতই ছোটো ক'রে ছাঁটুন, আর বেশ যতই খাটো ক'রে কাটুন, তাতে পরুষ হবেন, কিন্তু পুরুষ হবেন না। প্রকৃতির হাত থেকে যে বৈষম্য লাভ করতে হয়েচে, তার ফল ভোগ করতেই হবে, তা ভোট দিন আর না-ই দিন। পুরুষের চেয়ে আপনারা বড় হোন, কিন্তু পুরুষের সমান হ'য়ে কাজ নেই। বিলিতি সাফ্রেজিষ্ট্‌দের পথে না চ'লে নিজেদের যোগ্যতার অনুশীলন করুন, দেখবেন তা হ'লেই সত্যি-সত্যি সার্থকতা লাভ করবেন। মনে করবেন না এ আমি আপনাদের ঘুম পাড়াবার জন্যে, ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে ছড়া কাটছি,—এ আমার কঠিন বিশ্বাসের কথা। অপরকে দাবিয়ে রেখে নিজে বড় হ'য়ে থাকা মনুষ্যত্বের প্রতি সব চেয়ে বড় অপমান ব'লে আমি মনে করি।"

বিনয়ের সুদীর্ঘ অভিভাষণ শেষ হ'লে অপ্রিয়তার দুশ্চিন্তা থেকে বিমুক্ত হ'য়ে দ্বিজনাথ প্রফুল্লমুখে চেয়ারে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বল্‌লেন, "এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একেবারে একমত বিনয়! আশা করি কমল, তোমারো এখন আর বিনয়ের সঙ্গে মতান্তর নেই। এবার তুমি যে কাজে যাচ্ছিলে যেতে পার।" তারপর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "বিনয়, বোধহয় কমলকে তোমার আর কিছু বল্‌বার নেই?"

ব্যস্ত হ'য়ে বিনয় বল্‌লে, "আজ্ঞে না, আর আমার ওঁকে কিছুই বলবার নেই, শুধু—উনি যেন আমার অবিনয় ক্ষমা করেন।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তুমি যে-অপরাধ করনি, সে অপরাধ ক্ষমা করা কমলার পক্ষে শক্ত কথা।"

সন্তোষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "এখন তা হ'লে আপনি কমলাকে নারীদের মহিমায় স্বীকার করছেন বিনয়বাবু?"

বিনয় বল্‌লে, "মুখে এখন করছি;—মনে বরাবরই করেছি।"

সুকুমার বল্‌লে, "তোমার আর একটা গুণ জানা গেল বিনয়! মুখে আর মনে তুমি দু রকম ভাব করতে পার।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠ্‌ল।

২৩

চামেলি ঝাড়ের পাশ দিয়ে কমলা যাচ্ছিল অন্তঃপুরের দিকে; দ্রুতপদে শোভা পিছন থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, "বা রে, বেশ ত! আমাকে একা ফেলে চ'লে যাচ্চ?"

কমলা তাড়াতাড়ি শোভার অলক্ষ্যে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে শোভার দিকে তাকিয়ে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে,

"আমি ভাই, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি এখানে ব'সে আছ!"

শোভা মৃদু হেসে বল্‌লে, "তা'ত ভুলে যাবেই ;—যে বকুনিটা বিনুদার কাছে খেয়েচ, তা'তে কি আর অন্য কোনো কথা মনে থাকে! এখন বিশ্বাস হ'ল ত সেদিন যে কথা বলেছিলাম?"

অন্যমনস্কভাবে কমলা বল্‌লে, "কি কথা?"

"বলছিলুম না, কথা বলবার অদ্ভুত ক্ষমতা বিনুদার আছে? আজ ত তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌লে।"

কমলা বল্‌লে, "স্বকর্ণে শুন্‌লাম।"

অপ্রতিভ হয়ে শোভা বল্‌লে, "এত ভুলও হয় আমার কথা বল্‌তে গেলে!" তারপর কমলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একটু চাপা গলায় বল্‌লে, "এখন বিনুদাদার উপর রাগ গিয়েছে ত কমলা?"

শোভার মুখের দিকে তাকিয়ে কমলা বল্‌লে, "কিসের রাগ?"

সবিস্ময়ে শোভা বল্‌লে, "অত রাগ ক'রে বিনুদার কথার জবাব দিতে গেলে, আবার বলছ কিসের রাগ?—গিয়েছে?"

"কি জানি?"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে শোভা বল্‌লে, "কি জানি? শেষে তোমাকে কত ভাল কথা বল্‌লেন, 'লক্ষ্মী' বল্‌লেন, 'পদ্মাসন' বল্‌লেন, আরো কত কি সব বল্‌লেন, তবু বল্‌চ 'কি জানি'?"

শোভার কথায় কমলা হেসে ফেল্‌লে; ডান হাত দিয়ে শোভাকে একটু চেপে ধ'রে বল্‌লে, "তোমাকে ও-সব কথা বল্‌লে তোমার রাগ যেত শোভা?"

"যেত না? নিশ্চয় যেত!"

"তবে আমার গিয়েচে কি না জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

অপ্রতিভ স্বরে শোভা বল্‌লে, "তা বটে।"

"আচ্ছা কমলা, বিনু দাদা তোমাকে যখন—

কমলা শোভার হাতে একটু চাপ দিয়ে বল্‌লে, "চুপ!"

শোভা অবাক হয়ে তার অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে থেমে গেল। পর মুহূর্ত্তেই উভয়ে রান্নাঘরের দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হ'ল। তখন শোভা কমলার নিষেধের অর্থ বুঝতে পারলে।

কমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কত দূর—পদ্ম ঠাকুমা?"

পদ্মমুখী বল্‌লেন, "এখনো ভাই এক ক্রোশ।"

শৈলজা আর শোভা হেসে উঠ্‌ল।

কমলা বল্‌লে, "এখনো এক ক্রোশ? আধ ক্রোশে হয় না?"

"কেন, সন্তোষের ঘুম পাচ্ছে নাকি?" ব'লে শৈলজার দিকে তাকিয়ে পদ্মমুখী একটু চাপা হাসি হাস্‌লেন। কমলা ও শোভার অনুপস্থিতিতে পদ্মমুখী এবং শৈলজার মধ্যে উভয়ের সঙ্কল্প সাধনার্থে যে কার্য্য-বিধি নিরূপিত হয়েছিল এ ব্যাপারটা তারই অন্তর্গত।

পদ্মমুখীর পরিহাসে কমলার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে সে বল্‌লে, "তা নয় পদ্মঠাকুমা, বিনয় বাবু একটু ব্যস্ত হচ্চেন।" ব'লে পার্শ্ববর্ত্তিনী শোভাকে নীরব থাক্‌তে ইঙ্গিত করলে।

নিক্ষিপ্ত শর তীক্ষ্ণতর হয়ে ফিরে এল বুঝতে পেরে পদ্মমুখী জ্বলে উঠ্‌লেন; বল্‌লেন, "এ ত আর ছবি আঁকা নয় যে, যখন ইচ্ছে তুলি তুলে রাখ্‌লেই হ'ল; এ খুন্তি-হাতার কাজ, একবার আরম্ভ হ'লে শেষ না ক'রে উপায় নেই।"

পরামর্শকালে স্থির হয়েছিল যে, বিনয় শোভাকে ভালবাসে সে বিশ্বাস কমলার মনে, এবং কমলা সন্তোষকে ভালবাসে সে বিশ্বাস বিনয়ের মনে, কৌশলে উৎপাদন করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে শৈলজা বল্‌লে, "বলবেন না ঠাকুমা, বিনয় ঠাকুরপোর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবেন না। একজনের গায়ে ফোস্কা পড়বে!"

সহাস্যমুখে পদ্মমুখী জিজ্ঞাসা করলেন, "কার গায়ে বউদিদি?"

শৈলজা কার নাম করে শুনবার ঔৎসুক্যে কমলা আর শোভা সাগ্রহে শৈলজার দিকে তাকিয়ে রইল।

শৈলজা মুচকি হেসে বললে, "আমার ওই ননদটির। একটি কথা যদি বিনয় ঠাকুরপোর বিরুদ্ধে বলবার যো আছে! ওদিকটিও আবার ঠিক তেম্‌নি। একদিন বিনয় ঠাকুরপোর

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কাছে বলেছিলাম শোভার রঙ কালো সে কি ভীষণ আপত্তি! বল্লেন, ও রঙ একটুও কালো নয়,—অনেক ফর্সা রঙ ওর কাছে হার মানে।"

পদ্মমুখী বললেন, "আহা! দুটিতে বিয়ে হ'লে বেশ ভাল হয়। তাই দাও না কেন বউদিদি?"

শৈলজা বল্লে, "হবে বোধ হয় তাই। কোনো পক্ষ থেকে তা'তে ত কোনো বাধা দেখচি নে।"

নিজের কথা আরম্ভ হয়ে পর্য্যন্ত শোভা পালাবার জন্যে ক্রমাগত কমলাকে ঠেল্‌ছিল, কমলা শোভাকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে রেখে শৈলজার কথা শুন্‌ছিল; কিন্তু শোভার কথা পরিত্যাগ ক'রে শৈলজা যখন সন্তোষ এবং কমলার কথা আরম্ভ করলে, পাত্র হিসাবে সন্তোষের মূল্য নির্ণয়ের জন্য কষ্টি পাথরে তাকে ঘষ্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল, তখন কমলা বাবুর্চির রান্না কত দূর অগ্রসর হ'ল দেখবার ছল ক'রে শোভাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়ে প'ড়ে কিন্তু বাবুর্চিখানায় না গিয়ে সে বল্লে, "চল শোভা, একটু ফাঁকায় গিয়ে বসি।"

শোভা বল্লে, "রান্নার খবর নেবে না?"

"সে নেবার এমন কিছু দরকার নেই।"

চামেলি ঝাড়ের অনতিদূরে একটা সান-বাঁধানো বেদি ছিল, উভয়ে গিয়ে তার উপর বস্‌ল। দূরে পুরুষদের মধ্যে কথোপকথন চল্‌ছিল; শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। কমলা অথবা শোভা কারো মুখে কোনো কথা ছিল না—কিন্তু উভয়ের চিত্ত পূর্ণ হ'য়ে ছিল গভীর চিন্তাজালে। দুজনের চিন্তার প্রকৃতি এক নয়, কিন্তু পরিমাণ বোধ হয় একই রকম।

বহুক্ষণের নীরবতার পর মৌন ভঙ্গ করলে শোভা; মৃদুস্বরে ডাক্‌লে, "কমলা?"

কমলা শোভার দিকে তাকিয়ে বল্লে, "কি?"

"একটা কথা তোমাকে বলি— তুমি যদি কাউকে না বল।"

"কি কথা?"

"আগে বল, কাউকে বল্‌বে না।"

"তুমি যখন মানা করছ তখন না-হয় বল্‌ব না।"

"বউদিদিকেও নয়?"

"কাউকে যখন বল্‌ব না, তখন বউদিদিকেও বলব না।"

একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা ক'রে শোভা বল্‌লে, "বউদিদি যে-কথা বল্লেন বিশ্বাস কোরো না—আমি জানি বিনুদা তোমাকেই ভালবাসেন।"

চকিত হ'য়ে কমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কি ক'রে জান্‌লে?"

কমলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে শোভা বল্‌লে, "বোলো না যেন কাউকে,—বউদিদি নিজেই আমাকে বলেচে।"

মাথার উপর আকাশ-ভরা এক রাশ তারা ঝিক্ ঝিক্ ক'রে হাস্‌ছিল, আর বোধহয় বলছিল, "ওরে বোকা মেয়ে! নিজের দিকটা ভুল্‌লি ত কি এম্‌নি ক'রেই ভুল্‌লি!"

* * * *

কথাবার্ত্তা হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে আহার যখন সমাপ্ত হ'ল তখন রাত অনেক হয়েছে।

যাবার আগে কমলাকে একটু একান্তে পেয়ে বিনয় বল্‌লে, "দেখুন, আজ বিকেলে মিষ্টার মিত্রের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে, উপস্থিত আপনার ছবি আঁকা বন্ধ থাক্‌বে, কিন্তু কাল থেকে আমি নিয়মিত সকালে আস্‌ব আপনার ছবি আঁক্‌তে।"

একটু বিস্মিত হ'য়ে কমলা বল্‌লে, "কেন?"

"ও কাজটা শেষ ক'রে ফেলাই ভাল। বোধহয় তিনচার দিনের বেশি লাগ্‌বে না।"

একটু চিন্তা ক'রে কমলা বল্‌লে, "বাবাকে ব'লে যান না কেন?"

"আপনিই ব'লে দেবেন মিস্ মিত্র।"

মৃদুস্বরে কমলা বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই হবে।"

(ক্রমশঃ)
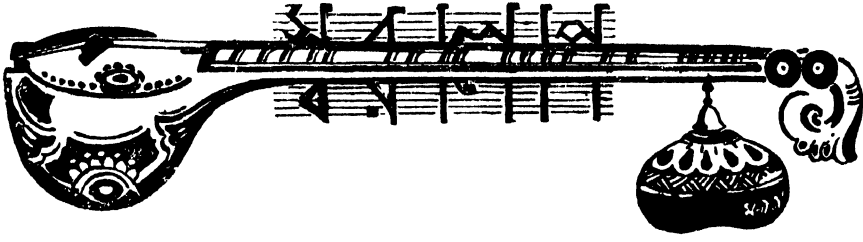
নটরাজ

প্রার্থনা

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি।
বিদায়-লগনে ধরিয়া দুয়ার
তবু যে তোমায় বলি বার বার
"ফিরে এসো, এসো, বন্ধু আমার"
বাষ্প-বিভল বাণী ॥

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বন পথে যবে যাবে, সে ক্ষণের
হয়তো বা কিছু র'বে স্মরণের,
তুলি ল'ব সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি ॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সজ্ঞা জ্ঞা রা । জ্ঞা রা জ্ঞা I রা জ্ঞা রা । জ্ঞা -া রা I
জা নি তু মি ফি রে আ সি বে আ ০ ০

I মজ্ঞা -া -া । -া -া রা I সরা -জ্ঞাঃ -রঃ । সন্‌্া -া -া I
বা ০ ০ ০ ০ র জা ০ ০ নি ০ ০

I সপা -মাঃ -পঃ । মজ্ঞা মা মা I মা পা -া । পা পা -া I
জা ০ ০ নি ত বু ম নে ০ ম নে ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I পা পা ধা । পধা -ণা ণধা I পা -া -া । -া -া -ধা I
প্র বো ধ না ০ হি যে ০ ০ ০ ০ ০

I ধমা -পধপা -মপা । মজ্ঞা -া -রা I সরা -জ্ঞাঃ -রঃ । সন্া -া -া I
মা ০০০ ০০ নি ০ ০ জা ০ ০ নি ০ ০

-া -া II মা পা -া । পা -া পা I পা -া -া । -া -া -ণা I
০ ০ বি দা য় ল ০ গ নে ০ ০ ০ ০ ০

I ণধা ণা ধা । ণা -া -ধা I র্সণা -া -া । -া -া -ধা I
ধ রি য়া ডু ০ ০ য়া ০ ০ ০ ০ র্

I ধপা -ণা ণা । ণধা -া -পা I পা -ধা -া । -মা -গা -া I
তা ই ত তো ০ ০ মা ০ ০ ০ ০ য়

সগা গা -া । মা -পা ধপা I পমা -া মা । মপা পমা -পা I
ব লি ০ বা ০ র বা র্ ফি রে এ ০

I মজ্ঞা -া জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা -রা I জ্ঞা -া -া । -রা জ্ঞা -রা I
স ০ ফি রে এ ০ স ০ ০ ০ এ ০

I রা -মা মজ্ঞা । -া -া -রা I রসা -রজ্ঞা জ্ঞরা । রসা -রা ন্া I
স ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ ০ ন্ ধু ০ আ

I সা -া -া । -া -া -া I সা -গা গা । গা মা পা I
মার্ ০ ০ ০ ০ ০ বা ষ্ প বি ০ ভ ল

I পমা -পা মা । -জ্ঞা জ্ঞা -রা I মজ্ঞা -া -া । -া -রসা -ন্া I
বা ০ ণী ০ জা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০

-া -া II ন্‌া ন্‌া -প্‌া । ন্‌া -া -সা I সা -া -া । -া -া -া I
০ ০ যা বা র্‌ বে ০ ০ লা ০ ০ ০ ০ য়্‌

I সা সপা পা । পা পমা -পা I মজ্ঞা -া -া । মপা -ধপা -মপা I
কি ছু মো রে দি ০ ও ০ ০ দি ০ ০ ০ ০

I মজ্ঞা -া -া । জ্ঞমা মজ্ঞা রা I সা -রা ন্‌া । সা -া -া I
ও ০ ০ গা নে র্‌ সু ০ রে তে ০ ০

I সা গা গা । -া মা পধা I ধমাঃ -ধধপাঃ -মপা । মজ্ঞা -া -া I
ত ব আ ০ শ্বা স প্রি ০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞমা মজ্ঞা রা । সা -রা ন্‌া I সা -া -া । -া -া -া I
গা নে র সু ০ রে তে ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা পা । পা পা পা I সপা পা -ধা । ধপাঃ ধণঃ ণধা I
ব ন প থে য বে যা রে ০ সে ০ ০ ক্ষ

I পা -া -া । -া -া -া I পা -ণা ণা । ণধা পা ধপা I
ণে ০ ০ ০ ০ র্‌ হ য়্‌ ত বা কি ছু

I পমা গরা -গা । মা -পা ধপা I মা -া -া । -া -া -া I
র বে ০ স্ম ০ র ণে ০ ০ ০ ০ র্‌

I মপা পমা মা । জ্ঞা রা -জ্ঞা I জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞা । রা মজ্ঞা -রা I
তু লে ল ব সে হ্‌ ত ব চ র ণে র্‌

I সা রা জ্ঞা । রা সা রসা I সন্‌া -া সা । -া সপা মপা I
দ লি ত কু সু ম থা ০ নি ০ জা ০ ০

I মজ্ঞা -া -া । -া রসা -ন্‌া II
নি ০ ০ ০ ০ ০

কবীর

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

অমূল্য এই প্রাণ—
একটা কানাকড়ির তরে
রাখলি বাজির দান!

* * *

জীবন্ত সেই ব্রহ্ম—তাঁরে
পূজবেনাকো কেউ,
মিথ্যা যত দেবতা পিছে
ধ'রছে এরা ফেউ!

* * *

পথের শেষের লক্ষ্য যে এক
সদ্‌গুরুকে পাওয়া,
মিল্‌বে তাঁরে ভাব-রূপেতে
যাহার যেমন চাওয়া।

* * *

ফাঁকির খেলা সেথায় নাহি
মন্ত্র জাগে যেথা,
অসীম রহে জ্ঞানের সাথে
সীমার মধ্যে সেথা।

হংস, ওরে হংস রে, তোর
সচল ছিল দেহ,
তুই হাল্‌কা ছিলি চালে;
কুরঙ্গেরি রঙ্গে মেতে
পড়লি নিজে ধরা
তোর আপন রচা জালে।

* * *

সতীরে সে কেই বা শিখায়
পতির চিতায়
হ'তে আপন হারা;
ভোগের মাঝে কেই বা দেখায়
প্রেম-দেবতায়
ত্যাগের স্বপ্ন ধারা!

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যবর্গ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আমরা পূর্ব্বে বিচিত্রার পৃষ্ঠায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রাথের শিল্পকলার বিষয় এবং তাঁর জীবনীর উল্লেখ করেচি। এখন আমাদের ইচ্ছা তাঁর শিল্প-শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে দেশের যে সকল শিল্পী বেরিয়েচেন তাঁদের কয়েকজনের ছবি ও কিছু পরিচয় দেবার।

দেখা গেছে শিল্পকলার ইতিহাসে পৃথিবীতে এইরূপ এক একটি বড় শিল্পীকেই অবলম্বন ক'রে শিল্পকলা জীবন পেয়েচে। ইউরোপে মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, ভ্যানডাইক প্রভৃতি বড় বড় শিল্পীরা তাঁদের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যের মধ্যেই পূর্ণ বিকাশ লাভ করেচেন। জাপানে ও চীন দেশে ঠিক এই ভাবে এক একটি শিল্পকেন্দ্র এক একটি মাথাওয়ালা শিল্পীকে অবলম্বন ক'রে মধুচক্রের মত গ'ড়ে উঠেছিল। এই সম্পূর্ণ মধুচক্রটি পূর্ণতা পেয়েছিল, সেটিকে যিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং অন্যান্য সকলের চেষ্টায় ও উৎসাহে।

যে সময় শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেশের চিত্রকলার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তখন দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বিলাতী আর্টেরই তত্ত্ব অবগত ছিলেন; অজন্তা, বরবুদোর, কাম্বোজ ও শ্যাম দেশের সব দেশী কীর্ত্তির কথা কেবল মুষ্টিমেয় প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকটেই প্রচারিত ছিল। এখন যেমন বিলাত ও ফরাসী দেশ থেকে ভারত-প্রত্ন-তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে এসে দেশের পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বৃহত্তর-ভারত-শিল্পকথা সকলের কাছে নিবেদন করচেন, তখন এক মাত্র অবনীন্দ্রেরই তার দিকে চোখ পড়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন দেশের আর্ট জানতে হ'লে শুধু দেশের নয়, দেশ বিদেশে ছড়ানো দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি গুলির ঐতিহ্যের পরিচয়লাভ শিল্পীদের আগে করতে হবে। তাই তিনি সেই প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির পরিচয় তাঁর ছাত্রদের নিকট দিয়েছিলেন। অজন্তায় ছাত্রদের পাঠানো ছাড়াও তিনি শ্যাম কাম্বোজ ও যবদ্বীপে বালী প্রভৃতির প্রাচীন কীর্ত্তির কাহিনী যে সকল ডচ্ ফরাসী ও ইংরাজী বইয়ে সে সময় বেরিয়েছিল সেগুলি বহু অর্থ ব্যয়ে কিনেছিলেন। সেগুলির দ্বারা তাঁর শিষ্যদের দেশের শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে জানাবার সমূহ সুবিধা হয়েছিল। এখনকার অতি-আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিলাত ও ফরাসী দেশে গিয়ে দেশের শিল্পের পরিচয় লাভ করতে হচ্চে, আর অবনীন্দ্রনাথ এই দেশে থেকেই দেশের ও বিদেশের আর্টের সব খোঁজই রেখে থাকেন। তাঁর এই দূরদৃষ্টির কাছে শিক্ষাভিমানীর অতি-আধুনিকতার ভড়ঙ্ একেবারে ঝাড়বাতির কাছে জোনাক-পোকার মত মনে হয়!

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ দেশী শিল্পকলাকে বরণ করেছিলেন একলাই—কোনো স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় নয়, স্বেচ্ছায়। তখন তাঁর হয়ত ধারণাই ছিল না যে, এর শাখাপ্রশাখা কাণ্ডটাকে ছাড়িয়ে উঠে এত বড় একটা কাণ্ডকারখানা ক'রে তুলবে। কিন্তু এক সুদূরের নিয়ন্তা তাঁর সেই খেলার ছলে দেশী ধরণের ছবি আঁকার চেষ্টার ভিতর যে কতটা সত্য আছে তা' জানতেন এবং সেই সত্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অবনীন্দ্র-নাথ উপযুক্ত শিষ্যবর্গও তাঁরই ইচ্ছায় বিনা চেষ্টায় পেয়ে গেলেন।

পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলেচি কলিকাতা গভর্মেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব তাঁর সহকারী রূপে অবনীন্দ্রনাথকে বরণ ক'রে নেন এবং তারই ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেশী ধরণের শিল্পকলার প্রচার হয়। অবনীন্দ্র-নাথের কাছে দেশী পদ্ধতিতে ছবি আঁকার হাতেখড়ি সব প্রথমে নেন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। তারপর এলেন স্বর্গীয়

লেখকের ফটো ভিন্ন প্রবন্ধের অপর ছবিগুলি লেখক কর্ত্তৃক পেন্‌সিলে আঁকা—সম্পাদক

পদ্মকলি

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

শিল্পী—শ্রীনরেশচন্দ্র দাস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারপর এই লেখক এবং ক্রমে হাকিম মহম্মদ, ভেঙ্কটাপ্পা, বীরেশ্বর সেন, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি। ঠিক এই প্রথম দলের তালিকা Vincent. A. Smith-এর A History of Fine Art in India and Ceylon-এ পাওয়া যায়; আর তারও গোড়ার দলের খবর The Selected Examples of Indian Art নামক কুমারস্বামী লিখিত পুস্তকে উল্লেখ আছে। কুমারস্বামীর এই পুস্তকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের "বিরহী যক্ষ", নন্দ বাবুর "সতী" ও এই লেখকের "নৃত্যরতা অপ্সরা" ছবির প্রতিলিপি আছে।

শিষ্য

এখন এই লেখকের পক্ষে তাঁর ঠিক সমসাময়িক শিল্পীদের কথা বলতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত হবে তা' জানি না। নিজেদের গোষ্ঠীর ঠিকুজি কোষ্ঠীর মত হ'তে পারে ভেবে তাঁদের বিষয় সংক্ষেপে ব'লে তাঁদের পরবর্ত্তী কালের কয়েকজনের সচিত্র পরিচয় প্রদানের যথাসম্ভব সংযত ভাবে চেষ্টা করা হবে।

শ্রীনন্দলাল বসু

বাণীপুর শাঁখরাইল হাওড়া বিভাগে এঁর বাড়ী। ইনি ১৯০৫ সালে প্রথমে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কাছে আসেন শিল্পকলা শিক্ষা করতে। এঁর পিতা দার্ভাঙ্গাধিপতির Superintending Engineer ছিলেন। নন্দলাল বাবুকে তাঁর পিতা শিবপুরে Engineering শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু নন্দবাবু শ্রদ্ধেয় শিল্পগুরুর চিত্রকলার প্রতিলিপি প্রবাসী পত্রিকায় দেখে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর নিকট দেশী ধরণের ছবি আঁকা শিক্ষা করতে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে আসেন। তখন অবনীন্দ্রনাথ সবে মাত্র আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষরূপে কাজে নিযুক্ত হয়েচেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব তখনও পর্য্যন্ত কেউই গ্রহণ করেননি। অধ্যক্ষ হ্যাভেলের ইউরোপীয় শিল্পে বিতৃষ্ণা এবং অবনীন্দ্রনাথকে দেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে আর্ট স্কুলে আনায় দেশের লোকেরা সবিশেষ বিরক্ত হন এবং সে সময় কাগজপত্রে এই দেশী শিল্পের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনেক মহামহারথীরা তাঁদের কলম ও ভাসা শানিয়েছিলেন। কাজে কাজেই অবনীন্দ্রের দেশী শিল্পকলার প্রতি কাহারও সহানুভূতি না থাকায় তিনি একলাই একনিষ্ঠ হ'য়ে ছবি এঁকে চলেছিলেন। নন্দবাবুর তখন বয়স মাত্র ২২।২৩ বৎসর যখন প্রথম অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দেশী ধরণের ছবি আঁকা—একেবারে মানসকল্পনাপ্রসূত ছবি আঁকা, এতে তাই বিলাতি রীতি হিসাবে মডেলের

শ্রীনন্দলাল বসু

কোনো বালাই নেই। নন্দবাবুর কল্পনাশক্তির পরীক্ষা প্রথমেই শিল্পগুরু ক'রে নিলেন তাঁকে মন থেকে একটি সিদ্ধিদাতা গণপতিজীর ছবি আঁকতে দিয়ে। প্রথমেই সিদ্ধিদাতা গণপতি আঁকার সার্থকতা হয়েছিল তাঁর পরবর্ত্তী "হরপার্ব্বতী", "সতী", "তাণ্ডব" প্রভৃতি চিত্রে। অবনীন্দ্রের কখনই এ ইচ্ছা ছিল না যে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে

নকল করেন, তিনি তাই নন্দ বাবুকে এবং অন্যান্য সকলকেই নিজের নিজের কলাকৌশলে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে বলতেন এবং কারু কেউ নকল করতে গেলে তীব্র সমালোচনার শাসনে তাকে বিরত করতেন। খবরের কাগজের জয়পতাকার মূল্য তাঁর কাছে কিছুই নেই। তাই খবরের কাগজের সার্টিফিকেটলাভে গর্ব্ব করা তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। এই লেখক একবার তাঁকে খবরের কাগজে প্রকাশিত কোনো শিল্প বিষয়ের খবরের কথা তাঁকে লেখায় তিনি যে পত্র দেন তা থেকে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট জানা যায়।

"প্রিয় অসিত,

তোমার পত্রে কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম।

খবরের কাগজ হইতে সাবধান থাকিও। আমি কখন খবরের কাগজ পড়ি না সুতরাং সেটার certificateএর মূল্য আমার কাছে নাই। তা ছাড়া এত দেখিবার সময় কোথা।

'মন মনীকা মটুকী শিরপর
না হক্ বোঝা মরোরি।
মটকী পটক মিলো পীতমসে
সাহেব কবীর কহোরী॥'

* * * * *

স—র মত যদি নাম ও টাকা খুঁজিয়া বেড়াও তবে তোমার দশা কিরূপ হইবে জান :—

'গৃহী ত্যজিকে ভয়ে উদাসী
বনখণ্ড তপকো যায়।
চোলী থাকি মারিয়া
বেরই চুনি চুনি খায়॥'

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হইল উদাসীন, তপস্যার জন্য গেল বনখণ্ডে, দেহকে মারিল ক্লান্ত করিয়া—এত করিয়া শেষে বাছিয়া বাছিয়া খাইতে লাগিল জঙ্গলী কুল !!

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅবনীন্দ্র"

অবনীন্দ্রনাথ নন্দবাবুকে চিত্রকলা শিক্ষাও দিতেন এবং নিজে তাঁর ছবি কিনে তাঁকে উৎসাহিত করতেন। ক্রমে ক্রমে নন্দ বাবু তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হ'য়ে ওঠেন। নন্দবাবুকে না হ'লে তাঁর একদণ্ড চলত না। নন্দবাবুও গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবার পরও ছবি আঁকা হ'লে তাঁকে একবার না দেখালে নিশ্চিন্ত হতেন না। নন্দবাবুর পৌরাণিক ছবির উপর বেশী ঝোঁক দেখে তিনি তাঁকে অজন্তাগুহায় এই লেখকের সঙ্গে ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালের শীতকালে পাঠান। লেখক কর্ত্তৃক লিখিত "অজন্তা" পুস্তকে এবং The India Soceity, London প্রকাশিত অজন্তার পুস্তকে তার সবিশেষ বিবরণ আছে। ১৯১৭ সালে এই লেখক গোয়ালিয়ার রাজ্য অন্তর্গত প্রাচীন বাগগুহার চিত্রাবলী দেখে আসার পর নন্দবাবু তাঁর সঙ্গে ১৯২১ সালে বাগগুহায় ছবির নকল করতে যান। অজন্তা যাবার পর থেকেই নন্দবাবু অজন্তার ধরণের দেশী ছবি আঁকতে প্রথমে আরম্ভ করেন; সেই থেকে তাঁর এই এক ছবি আঁকার বিশেষত্ব হ'য়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথের মোগল ধরণের উপর আশ্চর্য্য কবিত্বপূর্ণ বর্ণবিন্যাস এবং নন্দবাবুর অজন্তার অনুরূপ দেশী ছবির উপর বর্ণের চমৎকারিত্ব দেশী শিল্পকলায় এক বিশেষত্ব এনে ফেললে। নন্দবাবু ১৯১৯ সালে কবিবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কলাভবনে এক বৎসর অধ্যক্ষের কাজ করেন এবং তারপর তিনি কলিকাতায় The Indian Society of Oriental Artএর শিল্প বিদ্যালয়ের পরিচালক হ'য়ে যান। তারপর ১৯২০ থেকে ১৯২৩ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতন কলাভবনে এই লেখক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে অধ্যক্ষতা করেন। তারপর তিনি শান্তিনিকেতন থেকে ছুটি নিয়ে বিলাত যাত্রা করায় নন্দবাবু পুনরায় কলকাতার কাজ ছেড়ে আশ্রমের কাজে ফিরে আসেন এবং সেই থেকে এখনও সেখানে সেই কাজেই নিযুক্ত আছেন। মাঝে কবির সঙ্গে তিনি চীন জাপানের শিল্পকলার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করতে গিয়েছিলেন। নন্দবাবুর "শিব সতী" "তাণ্ডব" "সতী" তাঁকে চিরদিন অমর ক'রে রাখবে।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ইনি যশোহরের এক গরীব ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নন্দবাবুর অল্পদিন পরেই ইনি অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষা লাভ করতে আসেন। প্রথমে দরিদ্রতার জন্যে
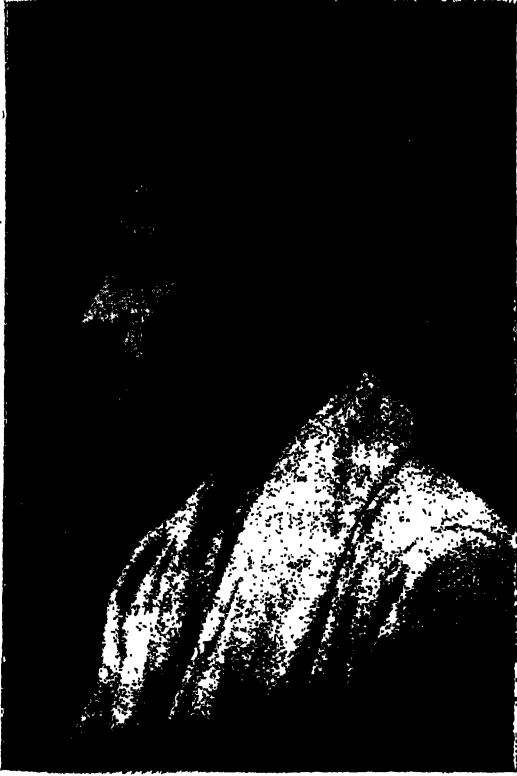
শ্রীঅসিতকুমার হালদার

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

শিল্পকলার চর্চ্চা করার অনেক ব্যাঘাত হয়। পরে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়দ্বয়ের আনুকূল্যে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ৺সুরেন্দ্রনাথের গুরুভক্তি ও দেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ দৃষ্টান্তস্বরূপ। আর্টস্কুলের তদানীন্তন শিক্ষকদের নিকট এবং দেশের সাধারণের কাছে এই দেশী শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা পরে পণ্ড হ'য়ে যেতে পারে শুনেও নিজে গরীব হ'লেও কখনও বিচলিত হতেন না। তাঁর শিক্ষা শেষ হওয়ায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অর্থকষ্ট নিবারণের জন্যে যাদুঘরের পোকামাকড় বিভাগে একটি দেড়শত টাকা বেতনের চিত্রকরের চাকুরী ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর গুরুর প্রদর্শিত শিল্পশিক্ষার পথ ছেড়ে পোকামাকড় আঁকা ছাড়া অর্থ অর্জ্জন করার চিন্তা অনায়াসে বর্জ্জন করলেন। দীন কিন্তু তেজী এই শিল্পী মৃত্যুকালে তাঁর সতীর্থ সুহৃদকে বলেছিলেন, "ভাই এ-বৎসর রোগে ভুগে ছবি আঁকতে পারিনি, এবার সেরে উঠেই চিত্ররচনায় মন দেবো।" তাঁর অন্তরাত্মা যে রসের আস্বাদ পেয়েছিল তা' থেকে তাকে বঞ্চিত করলে মৃত্যু, যদিও তাঁর রচিত চিত্রকলার ভিতর সেই রস চিরসঞ্চিত হ'য়ে রইল যুগে যুগে মানুষকে সেই রসেরই আস্বাদ দেবার জন্যে।

তাঁর আঁকা "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন" "শ্রীরামের সাগরশাসন" "নারদ" "নহুষ" প্রভৃতি চিত্র দেশের শিল্পকলার অমূল্য রত্ন। বড়ই দুঃখের বিষয় এত বড় প্রতিভার অকালেই কাল হ'ল।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

এই লেখকের বিষয় ১৩৩৩ সালে প্রবাসী আশ্বিন সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বিশদ-ভাবে লিখেছেন; অতএব তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

ইনি একজন পরম বৈষ্ণব ও ধর্ম্মপ্রাণ শিল্পী। ইনি শ্রীচৈতন্য দেবের লীলার নানান সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেচেন। অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে ইনি এখন The Indian Society of Oriental Artএ শিক্ষকতা করচেন। এঁর বিষয় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত The Modern Indian Artist Vol. 1. গ্রন্থে সবিশেষ উল্লেখ আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

ইনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। ইনি মেঘদূতের কতকগুলি সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন। কিছুদিন কাশীর শিল্পরসিক রায় শ্রীযুক্ত রায়কৃষ্ণদাস বাবুর নিকট তাঁর প্রতিষ্ঠিত চিত্রকলা সমিতিতে নিযুক্ত ছিলেন। এখন ইনি জয়পুর শিল্প-বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

শ্রীবীরেশ্বর সেন

ইনি কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন মহাশয় ভাগলপুর কলেজের অধ্যক্ষ। ইনি অবনীন্দ্রের একজন কৃতী ছাত্র। ইনি ইংরাজি সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেন। এঁর চিত্রকলার উপর অনুরাগ ছেলেবেলা থেকেই ছিল। যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন তখনই এঁর চিত্র বাঙলার মাসিক পত্রিকায় প্রচার হয়। এঁর চিত্র-কলার সূক্ষ্ম চুলচেরা কাজ দেখে অবনীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন,"তোমার হাতখানা ইচ্ছে করে আমার হাতে কেটে বসিয়ে দি।" ইনি কিছুদিন The Indian Society of Oriental Arts এর শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন, এখন তিনি লক্ষ্ণৌ গভমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

নাতি-শিষ্য

লেখক যখন ১৯১৩ সালে পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে উপদেশ দিয়ে নিম্নলিখিত পত্রটি পাঠিয়েছিলেন :–

সোমবার

কলিকাতা

"প্রিয় অসিত,

বোলপুরে যদি ছোট খাট একটি gallery ক'রে তুলতে পার তো মন্দ হয় না। আমি এখন চিত্রের ষড়ঙ্গ লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোনো বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়েচে, বোলপুরে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নাই, এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরুমশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না। মনে রেখো যে পাখী পড়াতে হ'লে পাখীর সঙ্গে নিজেও পাখী হ'তে হয়। ইতি।

শ্রীঅবনীন্দ্র"

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাধারণত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা ভয় আছে তাকে বড় ভয় করেন। তাই তিনি লেখককে সে বিষয় সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, লেখকও তাই সেখানে শিষ্যদের ছোট ভায়েদের মত শিক্ষা দিতেন এবং ফলে তিনি শান্তিনিকেতনে সব ছাত্রদের দাদারূপেই সুপরিচিত।

শ্রীমান মুকুল চন্দ্র দে

পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে এঁর শৈশবে শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখানে তদানীন্তন শিল্পশিক্ষক ব্রহ্মচারী ওঙ্কারানন্দের কাছে প্রথমে চিত্রকলায় হাতে খড়ি নেন। তাঁর কাছে চিত্রকলায় কিছু দূর অগ্রসর হওয়ায় এবং পড়াশুনায় তত তাঁর মন না থাকায় কবি তাঁকে অবনীন্দ্রের নিকট ১৯১২ সালে পাঠান। অবনীন্দ্রনাথ তখন এই লেখকের নিকট তাঁর শিল্পশিক্ষার ভার দিয়ে তাঁকে রাঁচিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আজ্ঞা লেখকের প্রতি এই পত্রে তিনি পাঠিয়েছিলেন :—

"প্রিয় অসিত,

মুকুলকে রাঁচি ফিরে পাঠালুম, কেননা সে সেখানে থাকিয়া লেখাপড়াও করিতে পারিবে এবং তোমার কাছে যতটা পারে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবে।

মুকুলের বেশ হাত আছে, তুমি ইহাকে একটু বেশ যত্ন করিয়া শিখাইবে এবং নিজের ছাত্রের মত দেখিবে। তোমরা এক একটা কাযের ভার না লইলে আমি একলা কত পারিয়া উঠিব। আশা করি তোমরা ভাল আছ।

শুঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

শ্রীমান মুকুলচন্দ্র ঢাকার পুলিসের দারোগা স্বর্গীয় কবি কুলচন্দ্র দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮ বৎসরবয়সে এই লেখকের নিকট শিল্পশিক্ষা আরম্ভ করেন। লেখকের কাছে কিছুকাল শিক্ষালাভ ক'রে পুনরায় শিল্পগুরুর তত্ত্বাবধানে নন্দলাল বাবুর নিকট ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষা করেন। ১৯১৬ সালে কবি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ নিজব্যয়ে তাঁকে জাপান ও আমেরিকায় নিয়ে যান। মুকুল জাপানে বা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে থেকে শিল্পশিক্ষা না ক'রেই কবির সঙ্গেই দেশে ফিরে আসেন। মুকুলের কিছুদিন পরে পুনরায় বিলাত যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং নিজ অধ্যবসায়গুণে ছবি এঁকে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই লেখক ও নন্দবাবুর নিকট অজন্তা ও বাগগুহার যাবার পথ ঘাটের সন্ধান জেনে নিয়ে সেখানে যান এবং সেখান থেকে প্রাচীন ভিত্তিচিত্রের নকল ক'রে সেগুলি বম্বেতে বিক্রি ক'রে

শ্রীমান মুকুলচন্দ্র দে

বিলাত যাবার পাথেয় সংগ্রহ করেন। বিলাতে পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু Royal College of Artsএর প্রিন্সিপ্যাল Prof. Rothenstien তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রকে পেয়ে খুবই খুসী হন এবং মুকুলকে আড়াই শত পাউণ্ড বৃত্তি দেন। Royal College of Arts থেকে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে এতদিন তিনি বিলাতেই বসবাস

করছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে অর্থাভাবে বড়ই কষ্টে পড়েছিলেন। সে সময় স্বর্গীয় বন্ধু W. W. Pearson তাঁর বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মুকুলের পরিচয় করিয়ে দিয়ে এমন কি কখন কখন অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। এখন মুকুল কলিকাতা গভর্মেণ্টে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েচেন। ইনি লণ্ডনে ৭।৮ বৎসর অবস্থানকালে basementএ নীচে বাস ক'রে দরিদ্রতায় প্রপীড়িত হ'য়ে বিদেশে অশেষ দুর্গতি ভোগ ক'রে মানুষ হয়েচেন।

মুকুল দে রচিত My Pilgrimage to Bagh and Ajanta বইখানি খুব ভ্রমাত্মক হ'লেওখুবই কৌতূহলোদ্দীপক, তাই সকলেরই খুব ভাল লাগে। তাঁর "চন্দ্রগ্রহণ" ও "শকুন্তলা" এই দুইখানি ছবি উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান মুকুল এতকাল ধ'রে নিজেই শিক্ষানবিশি ও নিজেরই উন্নতি চিন্তা ক'রে এসেচেন। এখন এই ৩৪।৩৫ বৎসর বয়সে তাঁর হাতে গুরুভার পড়েচে দেশের শিল্পশিক্ষাপ্রচারের। আশা করা যায় তাঁর দ্বারা তাঁর গুরুর ও অধ্যাপকদের গৌরব বৃদ্ধিই হ'বে।

পূজনীয় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের নাতি-শিষ্যদের মধ্যে মুকুল অগ্রণী এবং তাঁর পরবর্ত্তী নামজাদা নাতি-শিষ্যদেব মধ্যে এই লেখকের নিকট কলিকাতা গভর্মেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা করতেন এবং লেখকের নিকট শান্তি-নিকেতনে যাঁরা শিক্ষা করতেন, তাঁদেরই পরিচয় সংক্ষেপে দেব।

শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৮ সালে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে লেখকের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে আসেন এবং পরে লেখক সেখানকার কাজ ছেড়ে যখন শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন তখন ইনিও তাঁর সঙ্গে কলিকাতার আর্টস্কুল ছেড়ে এসে যোগ দেন। ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত লেখকের কাছে শিক্ষালাভ ক'রে ইনি কলাভবনে নন্দবাবুর নিকটেও ১৯২৪ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এখন কলিকাতায় স্বাধীনভাবে ছবি এঁকে জীবিকা উপার্জ্জন করচেন।

শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ইনি ত্রিপুরা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র। শীতল বাবু বাঙলার

শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅসিতকুমার হালদার
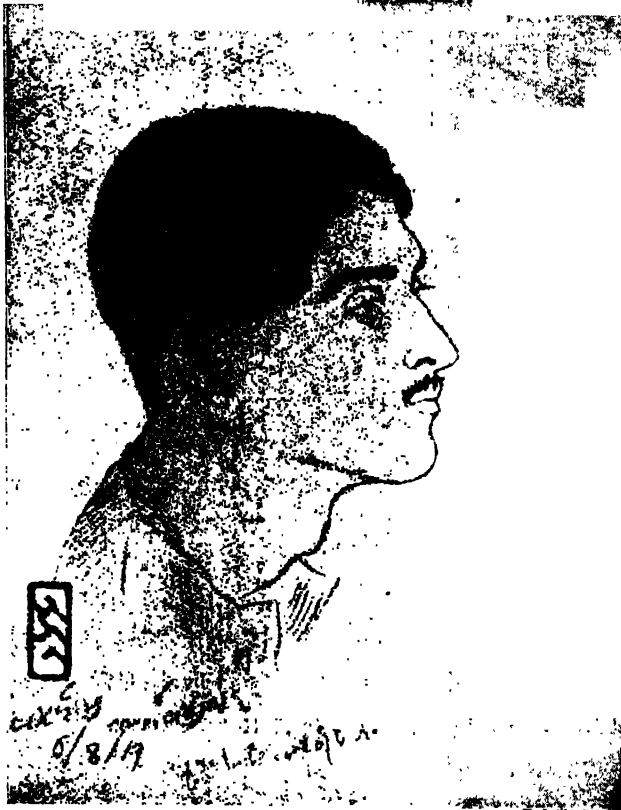
একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্যিক। রমেন্দ্রনাথ কলিকাতা গভমের্ণ্ট আর্টস্কুল থেকে লেখকের নিকট শান্তিনিকেতনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে যান এবং ১৯২৩ সাল থেকে নন্দবাবুর নিকটেও কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। দুই বৎসর অন্ধ্রজাতীয় কলাশালায় চিত্রকলাবিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় সে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এখন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বাবুর সহকারীরূপে কাজ করচেন। রমেন্দ্রনাথের "শিবের বিবাহ" বুদ্ধদেবের জীবনীর চিত্র প্রভৃতি শিল্পজগতে বেশ নাম অর্জ্জন করেচে। ইনি কাঠে খোদাই ব্লক ও লিথো ছাপার কাজও খুব ভাল জানেন।

শ্রীমান হীরাচাঁদ দুগাড়

শ্রীমান হীরাচাঁদ দুগাড়

ইনি একজন জৈন মাড়োয়াড়ী। জীয়াগঞ্জের শেঠ পরিবারভুক্ত। ইনিও শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদের সহিত কলিকাতা আর্টস্কুলে লেখকের কাছে শিল্পশিক্ষালাভ ক'রে তাঁরই সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যান। এঁর আঁকা মাতৃমূর্ত্তির ছবিখানির খুব প্রশংসা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর জাতব্যবসার তলব তাঁর পক্ষে খুব প্রবল হওয়ায় শিল্পকলা ছেড়ে দিয়েচেন।

শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ইনি ঢাকা বিক্রমপুরবাসী। ইনি ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনে লেখকের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। তারপর আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে ঢাকায় বি, এ, পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ১৯১৯ সালে Non-cooperation এর হাঙ্গামায় কলেজ ছেড়ে পুনরায় এই লেখকের নিকট ১৯২০ সালে কলাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯২৩ পর্য্যন্ত লেখকের কাছে এবং ১৯২৫ পর্য্যন্ত নন্দলালবাবুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রায় ২।৩ বৎসর লঙ্কাদ্বীপে মাহেন্দ কলেজে শিল্প-শিক্ষকের কাজ করেন। সম্প্রতি ইনি আহেমেদাবাদে

শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত আম্বালাল সারাবাইয়ের কন্যাদের শিল্প-শিক্ষা দিচ্ছেন।

শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

ইনি ত্রিপুরার রাজপরিবারভুক্ত। শৈশব থেকেই শান্তিনিকেতনে লেখকের নিকট চিত্রবিদ্যা শেখেন। পরে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত নন্দবাবুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এঁর ছবি নানান দেশের প্রদর্শনীতে উচ্চস্থান অধিকার করেচে। ইনি সম্প্রতি শান্তিনিকেতনেই বসবাস করচেন।

শ্রীমান অন্নদা মজুমদার

ইনিও ধীরেন্দ্র ও মণীন্দ্রের মত শৈশব থেকেই লেখকের নিকট এবং পরে অল্পদিন নন্দবাবুর নিকট শান্তিনিকেতনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দুর্ভাগ্যবশত এঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় শিল্পশিক্ষা একপ্রকার ছেড়ে দিতে হয়েচে।

শ্রীমান বিনায়ক মাসোজী

ইনি নাগপুরবাসী মহারাষ্ট্রীয়। বম্বে Sir J. J. School of Artsএ তিন বৎসর শিক্ষালাভ ক'রে এই লেখকের নিকট দেশী চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করবার জন্যে শান্তিনিকেতনে আসেন। পরে ১৯২৫ পর্য্যন্ত সেখানে নন্দবাবুর নিকট

শ্রীমান অন্নদা মজুমদার

শ্রীঅসিতকুমার হাল্দার

শ্রীমান বিনায়ক মাসোজী

শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে লেখকের কাছে লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে ভিত্তিচিত্রকলা শিক্ষা করতে এসেছিলেন। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন কৃষিবিভাগে কাজ করচেন।

শ্রীমান চিত্রবীর ভদ্ররাও

ইনি মান্দ্রাজ ওয়ালটেয়ারবাসী। শান্তিনিকেতনে লেখকের নিকট চিত্রবিদ্যা শেখেন। পরে কিছুদিন সেখানে Madam Karpeles এর নিকট কেতাব বাঁধাই এবং বাত্তিক ছাপ কাপড়ের উপর করা শেখেন। নন্দবাবুর নিকটেও পরে কিছুদিন শিক্ষালাভ ক'রে লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ে কেতাব বাঁধাইয়ের অধ্যাপকের কাজ করেন। সম্প্রতি সে-কাজে ইস্তাফা দিয়ে দেশে বাস করচেন।

শ্রীমান হরিপদ রায়

ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে লেখকের নিকট শান্তিনিকেতনে শিল্পকলা শিক্ষা করতে আসেন। পরে নন্দবাবুর নিকট কিছুদিন শিক্ষা ক'রে এখন কলিকাতায় স্বাধীনভাবে চিত্রকলার চর্চ্চার দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করচেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মজুমদার

ইনি শ্রীহট্টের বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ঢাকায় এঁর নিবাস। এঁর শিল্পে অনুরাগ অগাধ। ইনি দ্রোণাচার্য্যের একলব্য

শ্রীমান চিত্রবীর ভদ্ররাও

শ্রীমান হরিপদ রায়

শিষ্যের মত এই লেখক ও নন্দবাবুর নিকট পত্রব্যবহার দ্বারা এবং প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে শান্তিনিকেতনে এসে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করতেন। এঁর রুগ্ন পরিবারবর্গ এবং সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যেও কলাদেবীর অর্চ্চনা তিনি ছাড়েননি। তাঁর চিত্র এখন নানা দেশের প্রদর্শনীতে উচ্চস্থান অধিকার করেচে। তিনি এখনও শ্রীহট্টে বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

উল্লিখিত শিষ্য ও নাতি-শিষ্য ছাড়াও শ্রীমান বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক কৃতী ছাত্র আছেন। শ্রীমান সত্যেন্দ্র এখন বৃন্দাবনে প্রেমমহাবিদ্যালয়ে চিত্রকলার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত আছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে লেখকের ও নন্দবাবুর নিকট চিত্রকলা শিক্ষা করেন। এখন শিল্পগুরুর প্রদর্শিত দেশী পদ্ধতিতে চিত্র আঁকচেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় দুই শতেরও অধিক, অতএব তাঁদের প্রত্যেকের বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যরা ভারতের নানান প্রদেশে শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে দেশের শিল্পকলায় নানান দিক অধিকার করচেন। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষরূপে পাঞ্জাবে, একজন অন্ধ্র দেশে, একজন বরোদায়, একজন জয়পুরে, লক্ষ্ণৌএ, এই ভাবে ভারতবর্ষের নানান কেন্দ্রে নবশিল্পের নবীন সাধনা

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মজুমদার

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করচেন। এঁদের মধ্যে পরস্পরের মিল এবং সত্যিকারের যোগ বড়ই মধুর। নন্দলাল বাবু একবার ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই লেখককে লিখেছিলেন—

"ভাই অসিত,

...তোকে যে আমি ভালবাসি তার ঢের কারণ, প্রথমে তুই আমায় ভালবাসিস ব'লে ভালবাসি। দ্বিতীয় দুজনার উদ্দেশ্য এক, তৃতীয় একগুরুর ছাত্র; চতুর্থ এক সঙ্গে অনেকদিন থাকার দরুণ।...নন্দ"—

এই কথাগুলি অবনীন্দ্রের সব শিষ্য ও নাতি-শিষ্যের মধ্যেই খাটে। পরস্পর ভালবাসা এমন প্রগাঢ় অন্য কোনো দলবদ্ধ অনুষ্ঠানে আমাদের দেশে এরূপ আছে ব'লে আমাদের জানা নেই। শিল্পগুরুর প্রভাব যে শুধু শিল্পীদের শিল্পকলায় আবদ্ধ তা নয়, তাদের জীবনকেও মধুর ক'রে তুলেচে। শিল্পের ছন্দ জীবনের দ্বন্দ্বকে মিটিয়েচে। এখন যে সব শিল্পী অবনীন্দ্রের কাছে সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে দেশী শিল্পের চর্চ্চা নানান দেশে করচেন, আশা করা যায় তাঁদের এই একমন একপ্রাণ, এক সত্যনিষ্ঠা এক সত্যসাধনা এককালে পূর্ণতা লাভ ক'রে জগৎকে চমৎকৃত ক'রে তুলবে। স্বর্গীয় কবি আবাল্যসুহৃদ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর "স্বাগত" কবিতায় যে ভবিষ্যৎবাণী ব্যক্ত ক'রে গেছেন তাই উদ্ধৃত ক'রে আমাদের বক্তব্য শেষ করি :—

শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

"সাধনার পীঠ সাধের আসন
শিল্পের নব-জীবন-ধারা,
এ মহানগরী ভারত আকাশে
সাতাশ তারার নয়নতারা।

একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান্
সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে,
পঞ্চপ্রদীপ—অবনী—গগন—
অসিত—মুকুল—নন্দলালে।"

১৫

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ায় নানা-স্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখে যাই, খুড়ীমার সঙ্গেও দেখাটা হবে এখন—

অন্নদা রায়ের বাড়ী ঢুকিতেই একটা হৈ চৈ চীৎকার ও কান্নাকাটির কলরব তাহার কানে গেল। বাড়ীর মধ্যে না ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী সখী ঠাক্‌রুণ চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছেন :—

তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঢের ঢের জাঁহাবাজ মেয়ে মানুষ দেখিচি, এমন আর কক্ষনো দেখি নি রে বাপু, পায়ে গড় করি—বলে ঐ যমের মত সোয়ামী, রাগ্‌লে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু একটু সমঝে চলি? সত্যই তো আজ তিনদিন ধ'রে বল্‌চে ধানগুলো একটু রোদে দাও, ওগো ধানগুলো একটু রোদে দাও—কথা কি গেরাহ্যি হয় না কি? না কানে যায়? কার কথা কে শোনে? গেরস্ত ঘরের বৌ ধান ভান্‌বে, কাজ করবে এই জানি—তা না রাদ্দিন পটের বিবি সেজে ব'সে আছে—(পটের বিবি জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্য উক্তরূপ সাজিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত বলিয়া সখী ঠাক্‌রুণের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেন) এতো বাপু কখনো কোথাও বাপের জন্মে দেখিনি, শুনিও নি—

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাকিসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পটের বিবি হ'য়ে সেজে ব'সে থাকি নাকি? কাল যে দশ সের মুগের ডাল ভাজ্‌লাম সারা বিকেল ধ'রে?...দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর যখন ৫ টার গাড়ী যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই ব'সে আছি, দুধামা ডাল ভাজা রে, ভাঙা রে—ক'রে অন্ধকার হ'য়ে গিয়েচে তখন উঠিচি—সে কি অমনি হয়? গা গতর ব্যথা হ'য়ে গেচে, রাত্তিরে বলি বুঝি জ্বর হোল এম্‌নি গায়ে হাতে ব্যথা—তা কি কেউ দ্যাখে?...তার ওপর সকাল বেলা বিনি দোষে এই মার—কেন সংসারে কি ব'সে ব'সে খাই?—

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল একহাতে এক খান কাঁচা বাঁশের পাতাশুদ্ধ ডগা ও আর হাতে দা লইয়া বাড়ী ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া গর্জ্জন করিয়া কহিল—এখনও তোমার হয়নি—এখনও তোমার অদেষ্টে বেস্তর দুক্‌খু আছে দেখ্‌চি—আমার রাগ বাড়িও না মেলা সক্কাল বেলা—আজ তিনদিন ধ'রে ধান গুলো রদ্দুরে দেওয়ার জন্যে ব'লে ব'লে হয়রাণ; এই মেঘলা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘলা যাচ্ছে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন্ বাবা এসে সাম্লাবে?···সারা বছরের পিণ্ডি জুটবে কোথা থেকে?

পুত্রবধূ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি কোরো না ব'লে দিচ্চি—আমার বাবা কি করেচে তোমার কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বল্‌বে?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন—তোমার বাপের বাড়ীর আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ—

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ীর কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—(সেও চেঁচামেচি শুনিয়া এইমাত্র বাহির বাটী হইতে আসিতেছে) কি করেন দা ঠাকুর—কি করেন থামুন থামুন—পরে সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিল। দুর্গাও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাকরুণও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন—খুব একটা হৈ চৈ হইল; দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উদ্যত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্য দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস্ দিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তার ভয়ের দৃষ্টি—কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা খানা কাড়িয়া লইল; পরে তাহাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন, দা ঠাকুর, থামুন—আঃ—আসুন নেমে—

গোকুলের বয়স ৩৫।৩৬ এর কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্ব্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্ব্বলতাটাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল—ছ্যাখো না—একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায় ও কি আর রোয়া হবে? আজ তিনদিন ধ'রে বল্‌চি—আবার তেজড়া দেখ্‌লে তো?···তোমার তেজ আমি—

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এসময় খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তার সময় নহে বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর পাছে জামতলায় একজন লোক ঘটি বাটী সারাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লায় হাপরে গন্‌গনে আগুন, পাড়ার লোকের অনেক ভাঙা ঘটি বাটী জড় করা। বেঁটে ধরণের লোকটা, পাক্‌সিটে গড়নের চেহারা, বয়স কত বুঝিবার উপায় নাই, ত্রিশ হইতেও পারে, পঞ্চাশ হইতেও পারে, গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটার দাগ—হাতের কব্জিতে দড়ির মত শির বাহির হইয়া আছে; পরনে আধময়লা ধুতি পাড়ায় অনেক ছেলে মেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটি বাটী সারানো দেখিতেছি। দুর্গাও গেল। লোকটা বলিল—কি চাই খুকী?

সে বলিল—কিছু না, দেখ্‌বো।

বাড়ী ফিরিয়া মার কাছে বলিল—আজ মা গোকুল কাকা খুড়ীমাকে যা মেরেচে সে কি বল্‌বো—পরে সে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

সর্ব্বজয়া বলিল—গোঁয়ার গোবিন্দ চাষা একটা বৈ তো নয়!...আহা, ভালো মানুষ বৌটা এমন হাতে আর এমন বাড়ীতে পড়েচে—ঠেঙা খেতে খেতেই জীবনটা গেল—

—আমাকে তো বড্ড ভাল বাসে—যখন যা বাড়ীতে হবে, আমার জন্যে তুলে রেখে দেবে। খুড়ীমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হোল মা! সখী ঠাক্‌মা আবার এখন উল্টে খুড়ীমাকেই বকে—

সে তিন চার দিন জামতলায় ঘটি বাটী সারানো দেখিতে গেল। লোকটি তাহার বাড়ী, বাপের নাম সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে। বলিল—তোমাদের বাড়ীর জিনিসপত্তর সারবে না? নিয়ে এসো না খুকী?

দুর্গা বাড়ী আসিয়া মাকে বলে—আমাদের ভাঙা ঘটি গাড়ুগুলো দেবে মা, একজন বেশ ভাল মানুষ লোক এসেচে—ওপাড়ার পথে জামতলায় ব'সে সারাচ্ছে—

লোকটি তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাঁসারী। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে এক একবার সোজা হইয়া

বসিয়া বলে—জয় রাধে!—রাধে গোবিন্দ! সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ায় অনেকে আসিয়া জোটে। সে চিম্‌টা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভদ্রলোকদের হাতে দিতেছে—দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কাঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাৎ করিয়া বলে—হেঁ হেঁ তামাক ইচ্ছে করুন বাবা ঠাকুর—রাধারাণী পদ ভরসা!... নারকেলের কথা আর বল্‌বেন না বাবা ঠাকুর, আর বছর জষ্ঠিমাসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে?...আধকাঠা খানেক জমিতে ছগণ্ডা চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম—তা ব্যাঙের উপদ্রতে—একেবারে মূলশেকড় টুলশেকড় সব শুদ্দু—কটা টাকাই মাটী!

মুখুয্যে মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বিনা মূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কাণ্ড বাপু—তা—এবারও তো ভেবেছিলাম কুড়িখানেক চারা বাড়ীর পেছনে—তা এমন ম্যালেরিয়া ধর্‌ল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন।)

—পরিপুন্নু—আজ্ঞে পরিপুন্ন—ম্যালেরিয়ার কথা বল্‌বেন না বাবা ঠাকুর—হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘটিটা, ছটা পয়সা দেবেন—

মুখুয্যে মশায় ঘটিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হাঁ, এর জন্যে আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিস ব্রাহ্মণকে সারিয়ে, অমনি কার্ত্তিক মাসের দিনটা—তার আবার—

পিতম তাড়াতাড়ি মুখুয্যে মশায়ের হাতের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবা ঠাকুর, এম্‌নি সারিয়ে দিতে পারবো না—এখনো সকাল বেলা বউনি হয়নি আজ্ঞে না—তা পার্‌বো না—ঘড়াটা রেখে যান্—বাড়ী গিয়ে পয়সা কটা পাঠিয়ে দেবেন—

দুর্গার মা বলে—দেখিস্ দিকি ভাঙা বাসন কোসন বদলে নতুন বাসন কোসন অনেক সময় ওরা দেয়—জিজ্ঞেস্ করিস্ তো?

পিতম খুব রাজী। দুর্গা বাড়ী হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশ পুরানো গাড়ু, ঘটি, বাটী, ঘড়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে। অর্দ্ধেক দিনটা সে জামতলাতেই কাটায়—হাপর জ্বালানো, রাং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে। পিতম বলিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটী গড়াইয়া দিবে—ইহাও বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না। সর্ব্বজয়া শুনিয়া বলে—আহা বড্ড ভাল লোকটা তো? আস্‌চে বুধবার অপুর জন্ম বারটা, বলিস্ তাকে আস্‌তে—আমাদের এখানে দু'টো ডাল ভাত পের্‌সাদ পেয়ে যাবে এখন—

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর কোন্ সময় সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে—হাপরের গর্ত্ত ও পোড়া কয়লার রাশি ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল—একে ওকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না সে কোথায় গিয়াছে। ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল—মা শুনিলে কি বলিবে! সংসারের অর্দ্ধেক বাসন তাহার কাছে যে! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল ঝিকরহাটির বাজারে তাহার কাঁসারির দোকান আছে—সেখানে সে খবর পাঠাইয়াছে—তাহার ভাই দুই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া—আসিলেই ভাঙা চোরা বাসনগুলা সব বদ্‌লাইয়া দিবে। কোথায়ই বা সে—আর কোথায়ই বা তাহার ভাই!... কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। কেবলমাত্র তাহাদেরই জিনিস গিয়াছে—অন্য হুঁসিয়ার লোকের এক টুক্‌রা পিতলও খোয়া যায় নাই।

সারাদিন পরে সন্ধ্যার সময় দুর্গা কাঁদো কাঁদো মুখে মাকে সব বলিল। হরিহর বিদেশে—কেই বা খোঁজ করে, কেই বা দেখে। সর্ব্বজয়া অবাক হইয়া যায়। বলে—একবার তোর রায় জেঠা মশায়কে গিয়ে বল্‌তো? ওমা এমন কথা তো কক্ষনো শুনিনি?...হরিহর বাড়ী আসিলে ঝিকরহাটির বাজারে খোঁজ করা হইয়াছিল—পিতম নামক কোনো লোকের সেখানে কাঁসারির দোকান নাই—উক্ত চেহারার কোনো লোকও সেখানে নাই।

পথের পাঁচালী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু দুপুরের পর বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, তাহার দিদি আসিয়া বলিল—তুই বুঝি বাড়ীতে ব'সে আছিস্ অপু?···মা বুঝি বেরুতে দ্যায়নি?...পরে সে ভাইএর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিল--আয় ব'সে জোড় বিজোড় খেলি, তুই তোর কড়িগুলো নিয়ে আয় দিকি? দশ পঁচিশ হ'লে নাটাফলে খেলতাম—জোড় বিজোড় তো তাতে হবে না? আমার বাক্সে এই এতগুলো নাটাফল জমেচে—এই এতগুলা দুই হাত ফাঁক করিয়া অত্যন্ত খুসির সহিত সে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ দেখাইল।

খেলিতে খেলিতে বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনটা বড় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল—উঃ, আজ সমস্ত দিন বাড়ী হইতে বাহির হওয়াই হয় নাই। এতক্ষণ নীলুদের জামতলায় চোর চোর খেলার ধূম লাগিয়া গিয়াছে! নূতন ঘাস নিড়াইয়া বেগুন ক্ষেতের জায়গা পরিষ্কার করা হইয়াছে, সেখানে তাজা মাটীর গন্ধ বাহির হইতেছে—এখন কি আর ব'সে ব'সে জোড় বিজোড় খেলা ভাল লাগে? সে বলিল—তুই একলা ব'সে ব'সে খেল্ দিদি—আমি নীলু-দাদাদের বাড়ী খেলিগে—আমার কড়িগুলো খেলা হ'য়ে গেলে তুই তুলে রাখিস্—কেমন তো? সে বাহির হইতে যাইতেছে এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস্ রে অপু?...চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজ্‌চি—বেরিও না যেন?...এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্যে ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে? সে যখন বাইরে দরজায় পা দিয়াছে, মার ডাক আবার তাহার কানে গেল—বেরুলি বুঝি?...ও অপু, বারে দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজ্‌তে লাগ্‌লাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট্‌ দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখ্‌তে যাবি? অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটী পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল—বাড়ী চল নীলুদা, আমার মা বক্‌বে, সন্দে হ'য়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে গিয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আম বাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুইএ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কিরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল যে ঝুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে—উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল - আতুরী ডাইনির বাড়ী!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল...আতুরী ডাইনির বাড়ী!... সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতি আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়? কে না জানে সেইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছু জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী

গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না ? কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনির গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্‌ দিকি ?...

ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কিনা...এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল...বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয় একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনিই তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া !...

যাহার জন্য এত ভয় তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সাম্‌নে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না !

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচকাইয়া, তোব্‌ড়ানো গালটা যেন আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সাম্‌নের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল ! অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক্‌ ডাইনির রাগটা তাহার উপরেই —এখনি তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে !

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে—তাহার ফল এই ফলিতে চলিল ! সে অসহায় ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমার ছেড়ে দাও—আমি ইদিকে আর কক্ষনো আস্‌বো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলুতো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল—যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে ও বাবারা ? মোরে ভয় কি ?...পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধ'রে নেবো খোকারা ?—এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দোবানি এস—

আমচুর !...ডাইনি বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি ?...ডাইনিরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে—এ-রকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে !

এখন সে কি করে !...উপায় ?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি ও মোর বাবা ? মুই কিছু বল্‌বো না, ভয় কি মোরে ?

আর কি, সব শেষ ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরী নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু—রিল ! প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি এ বুড়ী হাসি মুখ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত ! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্যদিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটীর কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি যেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ় নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদ্‌বে আমায় আজ আর কিচ্ছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনোদিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদ্‌বে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে...বাড়ী, ঘর দোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনো-দিকে নাই...কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনির ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ...আর অনেকদূরে কোথায় যেন মা···আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক !...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্ত্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যে দিকে দুই চোখ যায় ছুটিল...নীলুও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।...

পথের পাঁচালী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহাদের এত ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাস্তিও যাইনি, ধস্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ী আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে···ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল্ দিকি? সেই বেরিওচো বিকেলবেলা কিছুই তো আজ খাবার খেলি নে—খিদেতেষ্টা পায় না?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তূপাকার হইয়া সকলেই এক সঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে পরস্পরের ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিল, সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়বো মা? আমার এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল, যে মা তাহাকে চালভাজা দিবার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল—দু চার খানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোষের নীচেটায় চালের গুঁড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আসিস্ এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্চি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল ছোলা ভাজা কৈ?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কৈ? এতবার ডাক্‌লাম, তুই বেরিয়ে চ'লে গেলি—ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা তুই চাল ভাজা খেয়ে তো বড়া আর খেতে পার্‌তিস্ নে? খিদে ম'রে যেতো, এক সে সময় খেতে তো এতক্ষণ আবার খিদে হোত, এই বড়া তো হ'য়ে গেল ব'লে। ভাজবো আর দোবো—দুর্গা গামলাখানা সরা দিকি?

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিল এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভাল বাসে! সে বৈকালবেলা বাটীর বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে— মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত ক'রে ঘাট থেকে এসে ভাজা ভাজলাম, আহা দুটো খেলে না!—হাঁ দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই—মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে দিয়া খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—সেই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল!

দুর্গা বলিল,—মা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ ক'রে আস্‌চে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না,—ঘরে যে জল পড়ে?···সেদিনকার মত হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনিয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই,—এ সময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতি বারই, পৃথিবী কোনোবারেই ভাসায় না তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না। দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্ব্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল,—এই বাটীটা ক'রে ওকে দেতো দুগ্‌গা। ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি! এই শেষ কথাই কাল হইল—এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়াশুদ্ধ বাটীটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—আমি খাবো না তো বড়া, কথ্‌খনো খাবো না—যাও—

সর্ব্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। গরীবের ঘরকন্না; কত কষ্টে যে কি যোগাড় করিতে হয় সেই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা দু-দুবার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল! ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি! তোমার অদেষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেও এখন তাই গরম গরম—

এবার অপুর পালা। এ রকম কথা মার মুখে সে কথনো শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে মা দুটা আদরের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা! সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আচ্ছা মা, আমি চাল ভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবচিনে বুঝি? আমি—আমি কথ্খনো তোমার বাড়ী আর আসচিনে—আমি ছাই খাবো. কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভাল জিনিস খাবে? আমি আস্বো না তো তোমার বাড়ী, কথ্খনো আস্বো না—

পরে সে আতুরী বুড়ীর বাড়ী হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল, এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেরূপ মরিয়ার মত ছুটিল। ভাইএর অভিমান-ভরা দৃষ্টি, ফুলা ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরণ দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল, যে সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি হি অপুটা—একেবারে পাগ্লা মা, কেমন বল্লে—পরে ভাইএর কথা বলিবার উক্তির নকল করিয়া বলিল—আমি চাল ভাজা খাইনি—হি হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বোকা একেবারে যা—ও অপু, শুনে যা ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশ বাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থম্কিয়া আছে; বাঁশবনের তলটা ঝোপে ঝাড়ে নির্জ্জন বর্ষাসন্ধ্যায় ঘুট্ঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময় একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনোদিনও। কিন্তু বর্ত্তমানে চারিধারের নির্জ্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়মড় শব্দ, অদূরের সল্‌তে-খাগী আম গাছে ভূতের প্রবাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিত লাগিল—আমি কথ্খনো বাড়ী যাবো না তো?—এ জন্মে আর বাড়ী যাবো না—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবার দূরের সল্‌তে-খাগী আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একেবারে মগ্ডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে—ভাবে কেন সন্দেবেলা ছাই খাও বল্লাম, তাই তো খোকা আমার রাগ ক'রে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চ'লে গেল আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মার কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয় ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রানুদের বাড়ীর দিকে ডাকিতেছে—ও অপু-উ-উ! বাঁশঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল—সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে তাহাকে খোসামোদ না করিলে সে নিজেই এত রাগের মাথায় বাড়ী গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি রানুদের বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া গিয়া দরজার সাম্নে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—ওই দাঁড়িয়ে রয়েচে মা!...এই ত্যাখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইএর হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না)—ওরে দুষ্টু, এখানে চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই ত্যাখো মা, ছেলের কাণ্ড ত্যাখো।—

দুজনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সার্‌বে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চাল্‌তেতলা, নদীর ধার বড় জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্য্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাব্‌লা গাছে গাছে হলুদ রংএর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কত কালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলে-ডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রূর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব কথা সে প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি-দিদি দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ ঐদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পেছনে? কেমন অনেকদূর না? দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেকদূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্ব্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে! তাহার বাবা বলিল—সাম্‌নেই পড়্‌বে এখন, চলো না! আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষমাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাইফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সাম্‌নে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরু গাড়ীর সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরের ঝাপ্‌সা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ কর্‌বি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি? অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা—সে যে অনেক দূর! সেখানে কি ক'রে যাবি!

তার দিদি বলিল—বেশী দূর বুঝি? কে বলেচে তোকে—ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল—নিকটে হ'লে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল্ দিকি দিদি, গিয়ে দেখি?

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না?—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আস্‌বো কি ক'রে?—তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়ার ভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়ত রেলের গাড়ী যাবে এখন—মাকে বল্‌বো বাছুর খুঁজতে দেরী হ'য়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে দুই ভাই মাঠ বিল জলা ভাঙ্গিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়,—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূরে পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্র তলা, ঠাকুর ঝি পুকুর বাম ধারে, ডান ধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সাম্‌নে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরিয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়; জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সাম্‌নে—হোগ্‌লা আর শোলা গাছে ভরা, তাদের উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সাম্‌নে কেবল ধান ক্ষেত, জলা, আর বেত ঝোপ। ঘন বেত বনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল তাহার নিজের পায়ে দু তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেল রাস্তা দূরের কথা, বাড়ী ফেরাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙ্গিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল। সেই রেলের রাস্তা আজ এম্‌নি সহজ ভাবেই সাম্‌নে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত একটা উঁচুমত রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল—ঐ দ্যাখো খোকা রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুই দিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেল গাড়ী যায়? কেন? মাটীর উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর যায় কেন? পছ্‌লাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলাকে তার বলে? মারের মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ?...তারে খবর চাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? এ-সব কাহারা তৈয়ারী করিয়াছে? ওদিকে কি ইষ্টিশান? এদিকে কি ইষ্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আস্‌বে? আমি রেলগাড়ী দেখ্‌বো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক'রে দেখবে?...সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ী আস্‌বে, এখনও দুঘণ্টা দেরী এখন চলো—

—তা হোক্ বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্‌খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তো কোথাও আন্‌তে চাইনে—এখন কি ক'রে দেখ্‌বে? সেই দুপুর একটা অব্‌ধি ব'সে থাকতে হবে তা হোলে এই ঠায় রদ্দুরে, চল্ আস্‌বার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ...তুমি কিছুই জানো না পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে প্রত্যেক মানুষই এক একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যে খানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্ব্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট্ট চাষাদের গাঁ খানা—কেমন নামটি!...মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ... বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে...উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে...নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না। ধুলা উড়াইয়া গরু-চালানের দল রাস্তা বাহিয়া যাইতেছে, হাটে হাটে গরু কিনিয়া অনেক দূরে চালান দেয়, বিচালির তড়্পায় তামাক খাইতে খাইতে পথ চলে। কত দেশে দেশে বেড়ায়, কত হাটে হাটে ঘোরে। তাহাদের কাপড় চোপড় পথের ধূলায় ধূসর।

থল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টি-ধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার, সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্য্যাস্তের অপরূপ বর্ণছটা, বিচিত্র রংএর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—মেঘরাজ্যের এই মায়ারূপ তাহাকে মুগ্ধ করিল। খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরী হইল। তাহার বাবা বলিল তুমি বড্ড হাঁ করা ছেলে, যা দেখো তাতেই হাঁ ক'রে থাকো কেন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে তাহার মহা আদরে থাকিবার স্থান করিয়া দিল। হাত পা ধুইয়া অপু দাওয়ার সতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল। সমস্তদিন হাঁটিয়া তাহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। তাহার বাবা বলিল—এখন শুয়ো না বাবা, ঘুমিয়ে পড়্‌লে রাত্রে আর খাওয়া হবে না। খানিক রাত্রে এক বাটী ঘন দুধ, সরু চিড়া, এক বাটী কাঁটালের রস দিয়া বাপের সহিত ফলার খাইল। খাইবার সময়ই ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল—কোথায় যে তাহার বাবা তাহাকে শোয়াইয়া দিল তাহা তাহার খেয়ালই রহিল না।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পারে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুর পাড়ের কলা বাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলা বাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মত আপন মনে বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেচ, খোকা?

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—

বধূটি বলিল—বট্‌ঠাকুরদের বাড়ী?...কোত্থেকে এসেচ?

অপু বলিল—আমার বাবার সঙ্গে এসেচি—আমাদের বাড়ী নিশ্চিন্দিপুর—

—বট্‌ঠাকুরের গুরু মশায়ের ছেলে? ও! কাল রাত্রে তোমরা বুঝি এসেচ? পরে সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কঞ্চি হাতে নিয়ে কি খেলা করছিলে খোকা?...

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে। দাওয়ার ধারে গরুকে খাওয়াইবার জন্য কাঁচা কসাড় ঘাস বড় আঁটি বাঁধা। কসাড় ঘাসের সরস, জোলো, মিষ্ট গন্ধ বাহির হইতেছিল।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিষপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কি জিনিস!... তাহাদের বাড়ীতে এরকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়

লোক তো! কড়ির আল্‌না, রং বিরংয়ের ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, মাটীর পুতুল, সোলার গাছ—আরও কত কি!···দু একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে এ এখনও ভারী ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচবছরের ছেলের মত কচি। এমন সুন্দর, অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্য্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন মুখের ভাব, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ—অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটীতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়! অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক্‌ হইয়া গেল—এমন অপূর্ব্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো!···মোহনভোগে কিস্‌মিস্‌ দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিস্‌মিস্‌ থাকে না? বাড়ীতে সে মার কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ ক'রে দিতে হবে? তাহার মা হাসিমুখে বল্লে—আচ্ছা ওবেলা তোকে ক'রে দেবো—পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুল্‌টিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুসির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর তাহার মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ পাতাল তফাৎ!...সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে এরকমের মোহনভোগ হয়!...সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া দাওয়া হয় না।

কিন্তু তাহাকে মা কত ভাল বাসে?···

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাটী অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুর বেলা সে বাড়ীর একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। সে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টক্‌টকে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো। অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারী চন্দ্রপুলী পাতে দিলেন। অমলা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—ডিম ভাজা আর নেবে খোকা?...মা, আর একখানা ডিম ভাজা খোকাকে দাও—খাওয়ার পর অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্‌কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির করিল। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার কাছে বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা বাটীতে ফিরিয়া কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শুইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেল রাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।—অমলার হাসিভরা চোখমুখ সে ঘুমের ঘোরে সারারাত নিজের অত্যন্ত কাছে কাছে অনুভব করিল। ভোরে উঠিয়া সে শুধু খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকালে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈয়ারী করিয়া তাহাকে খাওয়াইত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে বধুকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে কি অমলা দিদি এসেছিল? না সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা? অভিমানে তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল? অমলার সহিত তাহার জন্মের মত আড়ি—আর যদি সে কখনো তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, আর সকলেই আসিল—অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলে মেয়ে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না। উৎসাহহীন ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই। সন্ধ্যা হইলে তাহার বাবা তাহাকে ডাকাইয়া হাত পা ধোয়াইয়া দাওয়ায় সতরঞ্চিতে বসাইয়া রাখিল।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পর যখন সে বুঝিল যে কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয় তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা, কথা বলচো না কেন?...কি হয়েচে?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েচে বৈকি? তা কিছু কি আর হয়েচে? কাল আসনি কেন?

অমলা অবাক্ হইয়া বলিল—আসিনি তাই কি?—সেইজন্যে রাগ কোরেচ? অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল ঠিক তাই। অমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ীর ভিতর। সেখানে বধূ সব শুনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—তা হোলে অমলা, তোমার আর এখন বাড়ী যাওয়ার যো নেই তো দেখ্‌চি—কি আর করবে, খোকা যখন তোমাকে ছাড়্‌তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও—আর না হয়—

বধূ কথায় ভঙ্গিতে অমলা কি জানি কি এক ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা যাও বৌদি—ও-রকম করলে কিন্তু কক্ষনো আর তোমাদের বাড়ী—

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল। অমলা তাহাদের আলমারী খুলিয়া কাচের বড় মেম পুতুল, মোমের পাখী, গাছ আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নান যাত্রার মেলা থেকে সে সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীরোগীর মত হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া; রানুর কাকা তাহাদের বাড়ীর দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐ রকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্‌খড়্ করিয়া মেজের উপর চলিতে থাকে—অনেকদূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

অমলা বলিল—তাহার বাবা কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন, দাম বারো আনা। অপু মনে মনে নিরাশ হইল,—বারো আনা! সে কোন্ দূর সমুদ্র পারের নাগাল না-পাওয়া অজানা দ্বীপ! তাহার পুঁজি আছে চারিটি পয়সা মোটে। রথের সময় যদি বাবার কাছে দু'টা ও মায়ের কাছে একটা পয়সাও পাওয়া যায়--তাহা হইলেও হয় না। তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রংএর একখানা ছোট রাংতার মত কি। অপু বলিল—ওটা কি রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন?—সোনার পাত দেখোনি? অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা? তাহার মার কানে আগে আগে মাকড়ী ছিল—এখন আর তাহা নাই, রানুর জেঠাইমার কাছে বন্ধক আছে—সে মাকড়ীর রং তো অত রাঙা ছিল না? অপু আগ্রহের সহিত

সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার এ সব খেল্‌না কিছুই নেই—মরে কেবল শুক্‌নো নাটাফল আর রড়ার বীচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি ক'রে মার খায়!...তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেল্‌নার ঐশ্বর্য্য যে কত বেশী, তাহা সে এ পর্য্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত—আর একটা রবারের বাঁদর...তুমি যেদিকে চাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট করে...

বধূর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল, ঠিক একজোড়া বলা চলে না; সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড় করা আছে মাত্র—সে সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে...তাস তাহার কাছে রহস্যময় জিনিষ...রানুদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসে, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখে। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা, দিদি কেহই জানে না। এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ওকিছু খেলা জানে না; এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যে সে খুব পাকা খেলোয়াড়...খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধরা পড়ে। কেউ বলে ও বৌ, একি? এখানে টেক্কা মেরে বস্‌লে যে? দেখ্‌লেনা ওহাতে রংএর গোলাম কাট্‌লে?—তোমার চোখের সাম্‌নে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়...হাসিয়া বলে, তাই তো! বড্ড তো ভুল হ'য়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি মোটেই তো মনে নেই। পর মুহূর্ত্তেই এমন একটা কিছু করিয়া বসে যে তাহার খেলুড়ে বলে—ওকি, ওমা দেখ্‌চো ছক্কার খেলা ও কি ক'রে বস্‌লে?—তাহার মা নির্ব্বোধের মত হাসিয়া বলে—দেখেচো? আবার কি ভুল ক'রে বসলাম ছাই—মনেও থাকে না।--পরে সে আবার খেলিতে থাকে—মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওর দিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না—কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠে—একি বৌমা দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে এমন বিন্তি ছিল, দেখাও নি?—তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে—আছে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে?—ইচ্ছে ক'রেই দেখাই নি—(সে আসলে বিন্তি কিসে কিসে হয় সব জানে না) তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে—ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট কর্লে? দাও তুমি তাস সেজবৌকে দাও তোমায় আর খেল্‌তে হবে না—ঢের হয়েচে। তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে...যেন কিছুই হয় নাই, সবই ঠাট্টা, উহারা ঠাট্টা করিয়াই বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।...

সে যদি এক জোড়া তাস পায়, তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা তাদের বাড়ীর বনের ধারের দিকের সেই জানালাটা—যেটার কবাটগুলার মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মত গুঁড়া করিয়া দিয়াছে—নাড়া দিলে ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধ-ভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে... রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে—আবার ওড়ে আবার বসে—তখন সেই নির্জ্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জান্‌লাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিন্তি হয় তাদের নাই বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিন্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে—সেজন্য কেহ কাহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোনো কথা বলিবে না, কোনো হাসি ঠাট্টা করিবে না; যে যেরূপ পারে সেরূপেই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা—নাই বা হইল বিন্তি দেখানো?

সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাক্ হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবীতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়।...প্রত্যেক তরকারীর জন্যে আবার আলাদা আলাদা বাটী!—তরকারীই বা কত! অত বড় গল্‌দা চিংড়ীর মাথাটা কি তাহার একার জন্য? সে চিংড়ী মাছের মাথার ঘিলু খাইতে ভালবাসে...একটুখানি বড় চিংড়ী হইলেই সে মাকে বলে—মা আমাকে চিংড়ীমাছ ভেজে দিতে হবে কিন্তু! তাহার মা হাসিয়া বলে—দূর পাগলা সব চিংড়ীর মাথাতে কি ঘি থাকে—সে হোল আলাদা চিংড়ী, তাকে বলে গল্‌দাচিংড়ী—আজকার মত এত বড় মাছের মাথা সে কোনোদিন চোখেও দেখে নাই।

কি জানি এ সব সুখের দিনে মায়ের কথাই বেশী করিয়া মনে পড়িয়া মন কেমন করে। আর কত দিন মাকে না দেখিয়া সে থাকিবে?

লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল বেলা আবছায়া আবছায়া দেখা যায়...কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটা-চচ্চড়ী ও লাউ-ছেঁচকী দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ, উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনী বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য-তৈয়ারী বড় উনুনের উপর বড় লোহার কড়াইএ ঘি চাপানো থাকে...লুচি ভাজার অপূর্ব্ব সুধারুচিঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভাল কাপড়জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলী বাড়ীর বড় নাট-মন্দির ও জলপাই-তলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই বৈশাখ মাসের রামনবমী দোলের দিনটি—তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ও পাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ী। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া! খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এ রকম খাইতে পায় নাই কখনো।

পরদিন সকালে আবার খেলা আরম্ভ হইল। অমলা আসিতেই অপু ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—আমি আর অমলাদি একদিকে, আর তোমরা সব একদিকে—

খানিক খেলা হইবার পর অপুর মনে হইল অমলা তাহাকে দলে পাওয়ার অপেক্ষা বিশুকে দলে নিতে বেশী ইচ্ছুক। ইহার প্রকৃত কারণ অপু জানিত না—অপু একেবারে কাঁচা খেলুড়ে, তাহাকে দলে লওয়ার মানেই পরাজয়—বিশু ডান্‌পিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয়। একবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সে-বার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বড় বিস্বাদ মনে হইল—অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়াই সব কথা বলিতেছে, হাসি খুসি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ী যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বার বার বলিল যে সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা হইল, সারা সকালটা একেবার ফাঁকা হইয়া গেল। পরে সে মনে মনে ভাবিল—বিশু খেলা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—গেলে খেলার খেলুড়ে ক'মে যাবে, তাই অমলাদি ঐ রকম বল্‌চে, আমি গেলে আমাকেও বল্‌বে, ওর চেয়ে বেশী বল্‌বে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভাণ করিয়া বলিল—বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো। অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেলে নাড়ুগোপাল বলিল—আবার ওবেলা এসো ভাই!

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে। অমলা মহা উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ী দাঁড়াইয়াছে—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না!

অপু আহত অভিমানে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলিল না, মাঝে মাঝে কি ভাবিল। পরে সে বাবার সঙ্গে স্নান করিতে গেল।

ভারী তো অমলাদি! না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি?...

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিল।

এই তো মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্ব্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলাও কয়দিন হইতে ভাল রকম জমে নাই, অপুর বিদেশযাত্রার দিন কতক আগে দেশী-কুমড়ার শুকনা খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছেমিছে এ নিয়ে ঝগড়া ক'রে তার কান ম'লে দিলাম? চাচ্ছিল, দিলেই হোত—ছেলেমানুষ, আহা, আমার সঙ্গে জোরে পারে না, কেবল মারই খায়! আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক্।

বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য্য জিনিস যে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকার রেলগাড়ী যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অ-বিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগী রোগীর মত হাত পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে সুরু করে? অমলা-দি? কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জ্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন্ গাঁয়ে পথের ধারের কামার দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে তাহারা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল?—কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে?

রেল রাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়া গুনো দেখ্‌লি অপু? রেলগাড়ী দেখ্‌লি? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। ঐটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার পাঁচ রেল রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ী দেখা যাইত—সন্ধ্যার সময় যেখানার শব্দ পাওয়া যায় সেখানা—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

(ক্রমশঃ)

অবোধ্য

—গল্প—

—শ্রীবিমলকৃষ্ণ ঘোষ—

দুনিয়াটাকে কে প্রথমে গোলকধাঁধাঁ বলেছিলেন জানিনে, তবে তিনি যে কিছু সার তথ্য বুঝতে পেরেছিলেন এটুকু আজকে বুঝতে পারছি। বাস্তবিক, জগতে যতদিন নারীজাতি রয়েছেন ততদিন পর্য্যন্ত যে এটা ধাঁধাঁই থেকে যাবে এটা এই যুগেও যাঁরা বোঝেননি না বুঝবার ক্ষমতাটা যে তাঁদের অসাধারণ এই বাহাদুরীটে তাঁদেরকে দিতেই হবে।

আমাকে অনেকে নারী-বিদ্বেষী ব'লে প্রচার ক'রে থাকেন, তাঁরা সম্ভবতঃ স্ত্রী-পক্ষীয় লোক। আমাকে নারী-বিদ্বেষী বল্লেও নারীদের গৌরব বাড়ে, কেননা বিদ্বেষ লোকে তাকেই করে যার মধ্যে কোন পদার্থ আছে, সুতরাং নারীদিগকে আমি আর যাই করি না কেন বিদ্বেষ যে করতে পারিনে এটা ঠিক, বরং ভালবাসতেই চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দেখলাম সেটা বোঝবার যোগ্যতাও তাদের নেই। ঘটনাটা খুলেই বলি, তবু যদি নারী-পক্ষীয় পুরুষদের চোখ ফোটে।

আমার বয়স তখন ষোল; কুড়িটাকা জলপানি পেয়ে কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়চি। গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার দাদামশাই ছিলেন সেকেলে লোক এবং তাঁর গ্রামের দশক্রোশের বাইরে যে সব দেশ তা সবি বিলেতের কাছাকাছি ব'লেই ধ'রে রেখেছিলেন! তাঁর কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা ছিল এবং তার মধ্যে একটা এই যে যারা বেশী ইংরিজি পড়ে তারা কিছুদিন পরেই মদও ধরে। আমি কুড়িটাকা জলপানি পেয়ে কলেজে পড়চি এই দুর্ঘটনার কথা তাঁর শুনতে বাকী ছিলনা। তাই তিনি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হাঁরে, খুব ক'সে ইংরিজী পড়চিস বুঝি?"

এর পরে অনেকদিন তামাকের নেশা করতে করতে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিয়েছেন—"দেখিস, কোন নেশা টেশা করিসনে যেন।"

তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু রক্ষা করতে পারিনি। কারণ, কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আমার এম্নি পড়ার নেশাতে ধরল যে আজো তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

অতি ছেলেবেলা থেকেই তিনটে জিনিষকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতাম,—জোঁক, মশা ও ছারপোকা। পড়ার নেশার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চতুর্থ পরিত্যাজ্য এসে দাঁড়াল—নারী।

প্রথম তিনটিকে ত্যাগ করা সম্বন্ধে যেমন কোন গবেষণার দরকার হয়না, চতুর্থটি সম্বন্ধেও তেমনি হয়নি,—ওটা আপনা আপনিই হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু মামাবাড়ীতে এই ব্যাপারটা শিগ্‌গিরই সকলে লক্ষ্য ক'রে ফেল্লে, এমন কি অল্পদিনের মধ্যে মামাতো বোন এবং বৌদিরাও। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে ঠিক সুবিধের হ'ল বলতে পারিনে। যাদের জীবনের কোন অর্থ নেই ব'লে স্বভাবতই নানা অনর্থ নিয়ে যারা নিজেদিগকে ব্যাপৃত রাখে তাদেরই নাম নারী,—আমার নারীর সংজ্ঞার এটা খানিকটে। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত নারী সম্বন্ধে কোনদিন কিছুমাত্র ভেবে দেখিনি, সংজ্ঞা প্রস্তততো মাত্র এদানীং করেছি। কাজেই যখন দেখলাম বৌদির দল, এমন কি বোনগুলো পর্য্যন্ত যখন তখন অপরিচিত মেয়ে ধ'রে এনে আমার সামনে হাজির করতে লাগল—তখন শুধু অস্বস্তি বোধ নয়, আশ্চর্য্য হ'তে লাগলাম তাদের এই অহেতুকী পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বহর দেখে। কিন্তু এই নিয়ে তর্ক বা গবেষণার চাইতে পুঁথি-পত্রকেই বেশী প্রিয় জ্ঞান করাতে, ইচ্ছে ক'রেই রণে ভঙ্গ

দিলাম ; এবং বাড়ীশুদ্ধ লোকের চোখ এড়িয়ে কোথায় গিয়ে যে বইএর ভেতর ডুবে থাকতাম সেটা কিছুকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গোপনই রাখতে পেরেছিলাম, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবগুলো আড্ডাই ওরা আবিষ্কার ক'রে ফেল্লে।

একদিনের কথা বলি। এর আগে ওরা কয়েকটা 'ঘাঁটি' বের ক'রে ফেলেছে, তাই আরেকটা নূতন স্থান খুঁজে নিয়েছি। বাড়ীর পেছনে প্রকাণ্ড একটা ফলের বাগান, তারপর একটা পুকুর, তার অপর পারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নানাজাতীয় গাছে মিলে সূর্য্যিঠাকুরের আগমন পথে "প্রবেশ-নিষেধ" ঝুলিয়ে দিয়েছে, ফলে দুপুর বেলায়ই সেখানে সন্ধ্যে ব'লে ভুল হয়। কয়েকটা খুব প্রাচীন বটগাছ ছিল, কিছুকাল হ'তে তারই একটার নীচে ব'সে বই নিয়ে ডুবে থাকি। ওরূপ অগম্যস্থানেও কেউ যেতে পারে এতটা তারা আশঙ্কা করেনি তাই কয়টা দিন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই ছিলাম। কিন্তু মানুষের একটা মজ্জাগত ঝোঁক আছে অসাধ্য সাধন করবার, নতুবা যে-স্থান পুরুষেরও পক্ষে দুর্গম ব'লে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সে-স্থান অচিরেই নারীর পদাঙ্কে লাঞ্ছিত হ'ত না। আমাকে নানা গুপ্তস্থান হ'তে বের করতে করতে আমাকে বের করাই যাদের একটা নেশা হ'য়ে গিয়েছিল তার মধ্যে অগ্রগণ্যা ছিলেন দুজন, ছোট বৌদি ও বোন মালতী। তবে সঙ্গে অবশ্যি এমন একজন মেয়েকে রাখতেন যার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও পরিচয় নেই।

সেদিন হিন্দুদর্শনের মায়াবাদের ভেতর ডুব দিয়ে যখন ভাবছি দুনিয়ার সব কিছু মিথ্যে, ঠিক সেই সময়ে মূর্ত্তিমতী—উপদ্রববাহিনী পৌঁছে এক মুহূর্ত্তে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে অন্তত একটা জিনিষ সত্যি—সেটা "নারীর অত্যাচার"।

কিন্তু এক দিন বিদ্রোহ আসেই, আমার সেদিনই প্রথম তা এল। কতকটা অসাধ্যসাধনের ভাব আমারো মনে সেদিন এসে গিয়েছিল এবং সেটা এই যে, যত অপরিচিত মেয়েই আসুক, আমি তবু স্থির হ'য়ে ব'সে থাকব এবং পালাব না।

অসাধ্যসাধনই ক'রে ফেল্লাম বটে। অন্যান্য দিন ছুটে পালাতাম সেদিন নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলাম। যেন কে বা কারা এসেছে না এসেছে সে দিকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য নেই অনেকটা এই ভাব দেখাতে চেষ্টা ক'রে মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে চাইলাম, কিন্তু বৌদির দিকে চোখ পড়বামাত্র হেসে ফেল্লাম ;—পরক্ষণেই চোখ পড়ল এক ঝলক আগুনের ওপর—সে আগুন অপরিচিতার রূপের! চিরাভ্যাসমত মুহূর্ত্তমধ্যে চোখ পুঁথিতে ফিরে এল কিন্তু কেন জানিনা সে-দিন সে-জন্যে সুখী হতে পারলামনা, এবং নিজের চোখের ওপর নিজের রাগ হ'তে লাগল। উল্টে মেয়েরাই আমাকে দেখে হাসতে লাগল। তাদের সশব্দ হাসি আমাকে নিঃশব্দে দহন করতে থাকল। আমি পুঁথিতে ঘোরতর ভাবে ডুব দিতে চেষ্টা করলাম। অনেক পাতা উল্টিয়ে গেলাম কিন্তু পুঁথির এক বর্ণও মস্তিষ্কে প্রবেশের পথ পেল না। মায়াবাদের সকল তথ্য কার মায়ায় কোথায় যে উড়ে গেল বোঝাই গেল না। অগত্যা বই হ'তে মুখ না তুলেই বল্লাম—"বৌদি, দোহাই তোমাদের আমাকে একটু পড়তে দাও।"

বৌদি বল্লে—"পড় না তুমি, আমরা কি আর তোমার চোখ বেঁধে রেখেছি ?"

ব'লেই সঙ্গে সঙ্গে সকলকে নিয়ে ওখানেই ঘাসের উপর নির্ব্বিকারচিত্তে ব'সে পড়ল। আমি এবার দুই হাত জোড় ক'রে হেসে বল্লাম—"লক্ষ্মীটি"—চেয়ে দেখি সবাই আমার লোহিতাভ, ঘর্ম্মাক্ত মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌চে। সেই অপরিচিতাটি পর্য্যন্ত। কি ধৃষ্টতা! কিন্তু তবু কি সুন্দর সেই হাসি! বৌদি বল্লে,—"শুধু আমাকে বল্লে কি হবে ?—"আমি এবার বল্লাম—"কি রে মালতী,তোর কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে নাকি ?" সে উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে সেই অপরিচিতা হাসির সঙ্গে ব'লে উঠল—"আর আমি একটা মানুষই নই বুঝি ?"

আমি তার দিকে চেয়ে হেসে ফেল্লাম, চারচোখ মিলতেই দুজনেই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম কি আশ্চর্য্য,—এক দিনের জন্যে পরিচয়টা পর্য্যন্ত নেই, তবু ?—অথচ সে মেয়ে ?—কিন্তু এবার আর ধৃষ্টতা মনে হ'লনা তো ? কথাগুলো কি মিষ্টি, কথা বলবার ভঙ্গীটিও কি সুন্দর!—

প্রোগ্রাম বদলে গেল। আমার পালিয়ে বেড়ান বন্ধ হ'ল।—সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিষও পালালো সেটা আমার পড়ার ঝোঁক। কিন্তু সে নেশার স্থলে আরেকটা নেশা দেখা দিল, সেটা পড়াবার নেশা। এর পর থেকে ওরা তিনজন রোজ এসে গাছতলায় ব'সে পাঠ গ্রহণ করত। ওই বয়সেই হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে সুরু ক'রে দিলাম, কারণ মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলাম ওরা কিছুই বুঝবেনা।

এটা অবশ্যি ঠিকই যে মেয়েমানুষ মানে যাদের বুদ্ধি নেই বা অতি অল্পই আছে কিন্তু সেই না থাকার মাত্রাটা যে কতদূর হ'তে পারে সেটা সেই প্রথম বুঝলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে বৌদি চক্ষু বুজে পরম ব্রহ্মের ধ্যানে লীন হ'লেন। মালতীকে দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল যে গাছের পাখীর দিকে তার যতটা খেয়াল ততটা হিন্দুদর্শনের জন্য নয়! শুধু অনিমেষনেত্রে শুনে যাচ্ছিল একটি ব্যক্তি,—সে কমলা।

অজ্ঞানতা বা বুদ্ধিহীনতা স্বীকার করবার সৎসাহস সকলের থাকে না, বিশেষ ক'রে বৌদি ওরা যে জাতীয় তাঁদের—কিন্তু ব্যতিক্রমই নাকি সংজ্ঞা প্রমাণ করে। দ্বিতীয় দিন বৌদি সেই ব্যতিক্রম দেখালেন এবং সৎসাহস দেখিয়ে ব'লেই ফেল্লেন, ও ছাই দর্শন-ফর্শন ভাল লাগে না। তাঁদের কি কাশী গয়া করবার সময় হয়েছে নাকি—ইত্যাদি। জিজ্ঞেস করলাম, "কিসের সময় হয়েছে?" বৌদি হেসে উত্তর করলে—"কেন, কবিতার?" আমি কমলার দিকে চাইলাম। সে শুধু নিঃশব্দে হাসতে লাগল। বৌদি বল্লে—"ওরে বাবা, এরি মধ্যে এতটা? আমার ফরমাসটা যেন কিছু নয়,—যাই বাপু আমি—"

যায়ই আর কি চ'লে, খপ ক'রে আঁচলটা ধ'রে ফেলে বল্লাম,—"সে কি? তোমার কথাতেই তো সব হচ্চে, তোমাকেই জিজ্ঞেস করলাম তো।" বৌদি মুচকি হেসে বল্লে—"হুঁ, তা আর বুঝতে বাকী?"

* * * *

তারপর চল্ল কবিতার সভা। নেহাৎ শুদ্ধ সাত্ত্বিক ছিলাম, পানটুকু পর্য্যন্ত খেতামনা কিন্তু পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল। যে যাই মনে ক'রে থাকুন, আমি জানি সেটা সাময়িক খেয়াল মাত্র। তা ছাড়া তার জন্য আমি নিজেও দায়ী ছিলাম না।

পান খেলে কমলার ঠোঁট দুটি এমন চমৎকার লাল হ'ত যে সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল। একদিন কেমন অলক্ষিতে ব'লে ফেল্লাম,—"ঈস্, কি সুন্দর লাল!" ব'লেই অপ্রস্তুত! যার শুধু ঠোঁট লাল ছিল তার মুখখানাও সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব লাল হ'য়ে উঠল এবং চক্ষু নত হ'ল। বৌদি বল্লে—"ব-টে?" আমি বল্লাম—"হাঁ, বাস্তবিকই তোমার পান খাওয়াটাকেও যে আর্টের সীমাতে নিয়ে তুলেছ দেখচি!" বৌদি বল্লে—"হুঁ, তা আমাকেই তো বলেছ বটে!" তারপর অনেক হাসির বাদবিতণ্ডা হ'ল। আমি শেষে বল্লাম—"আচ্ছা, আমি এমন পরিশ্রম ক'রে তোমাদের সব শোনাচ্ছি, কই, তোমরা গুরুদক্ষিণা দেবার কি বন্দোবস্ত করেছ বল তো?" বৌদি বল্লে—"নেবে কি? তা এমন দক্ষিণা দিতে পারি যে তোমার গুরুগিরির চাইতে দামে ঢের বেশী হবে।" কমলা হেসে বল্লে—"আমার কিছু দেবার নেই কিন্তু।"—আমি বল্লাম—"এক আধটুকু পান মনে করুন?"

সে হেসে বল্লে—"কিচ্ছুনা।"

মনে মনে বল্লাম—"অকৃতজ্ঞ।"

* * * *

সেদিনই রাত্তিরে শুতে গিয়ে দেখি আমার টেবিলের ওপরে কয়েক খিলি পান। বুঝলাম, বৌদির কাণ্ড, দুপুর বেলার ঠাট্টার ফল।

পরদিন বৌদিকে যাই বলেছি—"রাত্তিরে— পানটা আর—" বৌদি অম্নি বাধা দিয়ে বল্লে—"ও-ই যাঃ। আচ্ছা আজ দুপুর থেকে।"

রাত্তিরে পান দিতে মানা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বৌদি যে কি মনে ক'রে কি বল্লে ঠিক বোঝা গেল না।

* * * *

পরদিন কবিতার সভা বসেছে। অত্যন্ত একটা করুণ দৃশ্য উপস্থিত, হতাশপ্রেমিকা, জলে ঝাঁপ দিতে যায় যায়, আমাদের সবার চোখ ছলছল হ'য়ে উঠেছে এমন সময় কমলা হঠাৎ উঠে এক ছুটে তাদের বাড়ী চ'লে গেল; কি

নাকি একটা জরুরী কাজ ভুলে এসেছে। ওর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে ছিটকে পড়ল কতগুলো পানের খিলি—অতি পরিপাটি ক'রে তৈরী। সঙ্গে সঙ্গেই সে ব'লে উঠ্‌ল—"এই যাঃ—" আর চঞ্চলপদে যেতে যেতে বল্লে—"বৌদি, মালতী, খেয়ো ভাই, আমার কুড়িয়ে দিয়ে যাবার সময় নেই।"

মালতী ও বৌদি মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে হাস্‌লে—আর আমি মনে মনে ভাবলাম, কি ছোট বাস্তবিক? সামান্য ক'টা পা-ন, তা-ও আবার নিজে লুকিয়ে খাবার জন্যে আঁচলে পুরে রেখেছিল?

বৌদি এর পরে এসে পান খেতে অনেক সাধাসাধি করেছিল,—খাইনি, এবং সারাটা রাত এ-জন্য অনুশোচনা করেছি, মানে, বৌদিকে দুঃখিত করেছিলাম কিনা।

* * * *

কমলাকে বুঝলাম না। বুঝতে কে-ই বা চায়? কিন্তু একটা কথা মাঝে মাঝে ভাবি, সে যে মূর্তিমতী আনন্দ ও হাস্য-কৌতুকের ঝর্ণা তা তো দেখতে পাই যখন আমার অসাক্ষাতে মালতী ও বৌদিদির সাথে গল্পে মাতে! কিন্তু আমাদের সভাতে এসেই কেন যে সে এত গম্ভীর হ'য়ে থাকে বুঝতেই পারিনে। ঘৃণা করে হয়ত?—তবে না এলেই হয়? মূর্খ নারী তো বটে, কি বুঝ্‌বে সে জ্ঞান-পিপাসু নরের মূল্য?—

অথচ যখন খেয়াল হয় তখন আবার নিজে হ'তেই আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা কয়—ওটা কি কৃপা?

* * * *

কিছুদিন হ'তে আমাদের আসরে কমলার দেখা নেই। আবার দর্শনারণ্যে ডুব দেব কিনা ভাবছি এমন সময় ধীর প্রশান্ত পাদবিক্ষেপে সে এসে উপস্থিত। হঠাৎ কি রকম আনন্দোৎসাহে ব'লে উঠলাম—"আপনি এদ্দিন—"

বাধা দিয়ে হাসির সঙ্গে কমলা বল্লে—"আজো 'আপনি'?"

বল্লাম—"তা কোথায় ছিলেন এতদিন—আ···তুমি? আমি ভাবলাম. শ্বশুর বাড়ী বুঝি—" ব'লে নিজেই অবাক হলাম! আমার মুখে এ কি কথা? হঠাৎ মাথায় আজ এ কি ভূত চাপল?

কমলা মুখ নীচু ক'রে খানিক ব'সে রইল;—দেখলাম মুখ তার লাল হ'য়ে উঠল, এবং পরক্ষণেই কি একটা কাজের উপলক্ষ্য ক'রে নতশিরে, ধীর পাদবিক্ষেপে ফিরে গেল। অপ্রস্তুত হলাম। স্পষ্টই বোধ হ'ল যেন কোথায় একটু অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

বৌদি বল্লে—"জান না?"

বল্লাম—"কি?"

"কমলার যে আজো বিয়ে হয়নি?"

"সে কি? বয়স কত?"

"তা আঠারোর কম হবেনা;—বাপ শুধু গরীব নয়, অদ্ভুত প্রকৃতির, বলে, বিয়ে দেবে না।"

"কারণ?"

"কারণ আর কি, নেশা ক'রে তাস পাশা মেরে দিন যায়, ওদিকে ঘরে চাল আছে কিনা খোঁজ নেই। ঘরে তৃতীয় পক্ষের একটি স্ত্রী ও তার গুটিকয়েক ছেলে মেয়ে, আর দ্বিতীয় পক্ষের এই কমলা।"

বল্লাম—"কি সাংঘাতিক! আহা, এমন মেয়ে কি লোকেরও চোখে পড়েনা?"

বৌদি বল্লে—"পড়্‌ল আর কই? তোমাদের পুরুষগুলোর কি আর চোখ আছে?"

আমি বল্লাম—"আচ্ছা, আমি এর বিয়ে ঠিক ক'রে দেব, কিন্তু ওর সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে সব জান্‌তে হয় যে।"

বৌদি বল্লে—"বেশ তো, আজই আমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি, দেখ যদি এমন একটি মেয়ের উপকার কর্‌তে পার।"

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় বৌদির কারসাজিতে নিভৃতে কমলার সঙ্গে আলাপ করলাম! বল্লাম—"তোমার পিতা কি নিষ্ঠুর রকম উদাসীন!"

বিনীতভাবে কিন্তু ওর মধ্যেই কেমন একটা দৃঢ়তার সঙ্গে কমলা বল্লে—"আপনার এ বিষয়ে বোধহয় কিছু না বলাই ভাল?"

অবোধ্য

শ্রীবিমলকৃষ্ণ ঘোষ

ভয়ানক রাগ হ'ল, বল্লাম—"কি রকম? দেশের, সমাজের এই সব অন্যায় দূর করবার কি আমার কোন অধিকার নেই বলতে চাও?"

কমলা বল্লে—"অন্যায় কোথায় দেখ্‌লেন জান্‌তে পাই কি?"

আমি বল্লাম—"এই ধর তোমার সম্বন্ধে আজো কোন ব্যবস্থা না করাটা।"

কমলা উত্তর কর্‌লে—"কোন ব্যবস্থা না করলে আমি বেঁচে আছি কি ক'রে? ভাত কাপড়ের তো আমার অভাব নেই।—"

স্পষ্টই বুঝলাম কথাটা সে চাপা দিতে চায়, তাই ইচ্ছে ক'রেই সে আমার কথাটার অন্যপ্রকার অর্থ করলে।

কিন্তু কেন? আমার উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধেও কি সন্দেহ? আমার সেই আগের সন্দেহটা জেগে উঠল আমার মনে।—ঘৃণা করে?

আজ ব'লেই ফেল্লাম—"তোমার ভাল করতেও আমাকে দিতে প্রস্তুত নও, তুমি কি আমাকে এতই ঘৃণা কর?"

এক মুহূর্ত্তে কমলা হেঁট হ'য়ে আমার পায়ে ধ'রে বল্ল—"ছি ছি, ও রকম বলবেন না, ব্যথা পাই।" তার চোখ থেকে দু' ফোঁটা জল আমার পায়ে পড়ল।

কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু সারারাত আমার ঘুম হ'ল না। বুকের মধ্যে কেমন একটা অসহ্য ব্যথা বোধ হ'তে লাগল।

* * * *

পরদিন বৌদিকে বল্লাম—"আচ্ছা ধর আমি যদি কমলাকে—"

আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বৌদি বল্ল—"সে তো চমৎকার হয়, কিন্তু সে যে হবার নয়, আমরা অনেক ভেবে দেখেছি।"

কি আশ্চর্য্য! এরাও আমার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ধারণা পোষণ করে নাকি? জিজ্ঞেস করলুম, "কেন নয়? আমি কি এমনি—"

বাধা দিয়ে বৌদি বল্লে—"না, এমন কিছু ছোট আর তুমি নও, বিয়ের বয়েস যে তোমার না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু ওর বয়েস তোমার চাইতে বেশী তো?—এ রকম বিয়ে কোথাও তো হয় না, তোমাদের বাড়ীর কেউই যে রাজী হবেন না।"

সব কিছুই যে এক দিন এক জনকে প্রথম করতে হয় এ সম্বন্ধে এমন চমৎকার বক্তৃতা দিলাম যে বৌদি ভারী উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। সেক্সপীয়র, নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহাপুরুষদের উদাহরণ দিতে ত্রুটি করিনি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কমলাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা কমলা, আমি যদি বিয়ে করি?"

কমলা হেসে উত্তর করলে—"খুব ভালো হয়, আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন তো?"

বল্লাম—"সে কি, তোমাকেই তো!" মুখ চোখ তার লাল হ'য়ে উঠল—মাথা নীচু ক'রে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—"আমার বিয়ে হবেনা তো।"

ভাবলাম, আহা, বেচারী! একেবারে নিরাশ হ'য়ে পড়েছে! সাহস দিয়ে বল্লাম—"হবে না কি, তোমার বাবা একটু চেষ্টা কর্‌লে ক-বে হ'য়ে যেত। আমি নিজেই এবার রাজী হয়েছি, তবু হবেনা?"

তেম্‌নি নতশিরে মৃদু অথচ কেমন একটা জোরের সঙ্গে বল্ল—"কিন্তু আমি যে রাজী নই।"

উঃ, সবটা শরীর জ্বলতে লাগল! কোথাকার এক দরিদ্রের কন্যা, তা-র এই হিমালয়-প্রমাণ ধৃষ্টতা? মুখের ওপরে এভাবে অপমান কর্‌লে?

কেন, কি জন্যে এত তাচ্ছিল্য? কি আমার ছিল না? ধন, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, রূপ—কোনটাই উপেক্ষার ছিল কি?

বুঝলাম প্রেমের ন্যাকামো করবার যে হীন প্রবৃত্তি থাকলে মেয়েদের মন পাওয়া যায় আমি তার অনেক ওপরে। গ্রাম্য, অশিক্ষিত কমলা,—সে আমার মূল্য কি বুঝবে?—

সেদিন মাঠে মাঠে বনে বনে কোথায় যে ঘুরে ঘুরে মরলাম তার ঠিক নেই। বাড়ী ফিরতে রাত ন'টা হ'ল। পরদিনই মামাবাড়ী ত্যাগ করলাম।

* * *

বাড়ী ফিরে আসতেই শরীরটা যেন ঝরঝরে বোধ হ'তে লাগল,—নবজীবন পেলাম। যেন এক দুঃস্বপ্ন কেটে

গেছে। ভাবলাম, এ কি রোগে আমায় ধরেছিল? পড়াশুনোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিচ্ছু নেই, কি নিয়ে মেতেছিলাম আমি? আমাকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকী পরীক্ষাগুলোতেও আমার পূর্ব্ব সম্মান বজায় রাখতে হবে? 'রোমান্সে' ধরবারইতো উপক্রম প্রায় হয়েছিল,—সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি! ভাবলাম মন্দেরও ফল কেবলমাত্র মন্দেই নয়।

* • * *

কমলার কল্যাণ হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকী কোন পরীক্ষাতেই আর দ্বিতীয় হ'তে হয়নি।

মা বল্লেন, "এবার নিজে দেখে ভাল একটি বৌ খুঁজে আন্‌তো রে অনু..."

বল্লাম—"পাগল হয়েছ?"

মা আমার কথাটাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না ক'রে বল্লেন—"যা, আর দুষ্টুমো করতে হবে না। এই আস্‌চে বোশেখেই কিন্তু আমি একটি টুকটুকে বৌ চাই।"

বল্লাম—'কি যে বল মা, তার ঠিক নেই। এখনো রোজগারই আরম্ভ করিনি, এখন তো বিয়ের নামও করা চলে না।"

মা চিন্তিত হ'য়ে বল্লেন—"এতগুলো পাশ দিয়ে বুঝি এই বিদ্যে পেটে নিয়ে বাড়ী ফিরেছিস, কেমন? রোজগার আরম্ভ না ক'রে বুঝি কেউই বিয়ে করতে পারবে না? কেন, তোমার বৌর ভাত কাপড়টাও কি আমরা দিতে পারব না?...তোমার ভাবনা নেই বাছা, তোমার বৌকে তুমি যেমন ক'রে রাখতে চাও আমরা তেম্‌নি ক'রেই রাখ্‌ব...।"

দেখলাম বৃথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তাই শেষ কথাটাই ব'লে ফেল্লাম, বল্লাম—"আমি সে বিয়েই করবনা মা?"

* * *

আমার বিয়ে সম্বন্ধে সকলেই হাল ছেড়েচেন! এজন্যে পিতামাতার চোখের অনেক জলই ফেলিয়েছি। এখনো সে সব দৃশ্য অন্তরে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আজ বাবা বেঁচে নেই কিন্তু মনে আছে পুত্রের বিয়ের জন্য তাঁর ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার, অথচ সে বিষয়ে তাঁর অক্ষমতাসূচক মুখের চেহারাখানার কথা। কেউ বিয়ের প্রস্তাব করলে তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠত, সজলকণ্ঠে বলতেন—"এ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই।"

কত দিন আড়ালে থেকে দেখেছি, ওই কথা ব'লে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ মুছেচেন।

কতদিন ভেবেছি, যাক্‌গে সব, বাবাকে বলি, "আপনার ইচ্ছে মত সম্বন্ধ করুন"—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহস পেয়ে উঠিনি, বিয়ে সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মে গিয়েছিল। সারা জীবনের সঙ্গিনী হবে কিনা একজন না-রী?—কী ভয়ানক!

* * *

দেশ থেকে কিছু দূরে একটা সহরের প্রান্তে এক আশ্রম খুলেছি। মানুষ গ'ড়ে তুল্‌ব। যে অসংখ্য মিথ্যার স্তূপ বাঙালীর ইতিহাসে, চলনে-বলনে, পত্রে-পত্রিকায় ছড়িয়েছে, অহরহ ছড়াচ্চে, সেইগুলো সম্বন্ধে সকলকে সচেতন রাখচি। কেউ কেউ বলেন শুধু মেকলেই বাঙালীকে ভীরু ব'লে গেছেন; আমি আমাদের ছেলেদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রতিদিনকার বাঙালীচালিত প্রায় প্রত্যেক ইংরিজি ও বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকগুলিই মূর্খের ন্যায় এই কাজ ক'রে আস্‌চে। গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নাট্যে, টিকা-টিপ্পনীতে শুধু ওই কথা। এর পরেও যে এই জাতটা ভেড়া ব'নে যায়নি সে শুধু এটা সিংহের জাত ব'লেই।

স্বাধীন দেশের শিশুদের মনে মিথ্যে ক'রে ব'লেও একথা শেকড় শুদ্ধ বসাবার চেষ্টা হয় যে ওরা বীরের জাত,—তাইতেই ওরা বীর হ'য়ে ওঠে, আর বাঙালীরা করচে ঠিক উল্টো। অথচ আমি ওদের সকলকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে, ভাল হোক, মন্দ হোক, স্বদেশীওলারা যে-ভাবে হেসে খেলে মরণকে বরণ করেছে পৃথিবীতে তার তুলনা বিরল অথচ তাদের সংখ্যা একটা দু'টো দশটা নয়,—অসংখ্য। যুদ্ধে গিয়ে মরা সোজা, দুন্দুভিদামামানিনাদে উৎসাহিত না হ'য়ে, দলের সকলের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ না ক'রে এরূপ নিঃশব্দে, নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে মৃত্যুবরণ এক

গতি

শিল্পী—শ্রীমনীষী দে

অভিনব ব্যাপার এবং একমাত্র বাঙালীই তা পারে। হোক একটু বেশী ক'রে বলা,—একটা জাতি গ'ড়ে তুল্‌তে ও-টুকুর প্রয়োজন আছে।

আর শেখাচ্ছি নিষ্কাম কর্ত্তব্য। অন্যের দিকে না চেয়ে থেকে, ফলের কথা না ভেবে যার যার আপন কর্ত্তব্য ক'রে যাওয়া।

আরো অনেক কিছু। এরকম প্রতিষ্ঠান দেশে এই নূতন, তাই অনেকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। প্রায়ই উৎসাহপূর্ণ চিঠিও পাচ্ছি অনেক পুরুষ ও নারীর কাছ থেকে।

*   *   *

সেদিন একটা চিঠি পেলাম, সেটা এই :—

প্রিয় অনুপম বাবু,

জানিনে চিনবেন কিনা, কিন্তু আগের কথা মনে না থাকলেও নূতন সম্পর্কেও চেনা উচিত, আমি যে আপনার বৌদি হয়েছি। একদিন এসে দেখা করলে বিশেষ সুখী হতুম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই আশ্রমের উত্তরোত্তর উন্নতি হোক! ইতি।

বৌদি—কমলা

পুনশ্চঃ—আমার সকল দোষ ত্রুটি ক্ষমা ক'রে নিশ্চয়ই একবার আসবেন।

আপনারই কমলা

কে এই নারী? সেই মামা বাড়ীর প্রতিবেশিনী নয়তো? কিন্তু তার তো বিয়ে হবার কথা ছিল না, তবে?—ধীরে ধীরে সেই সুদূর অতীতে চ'লে গেলাম, প্রত্যেকটি দৃশ্য মনে হ'তে লাগল,—আবার সেই দুর্জ্জয় ক্রোধ উপস্থিত হ'ল।

কিন্তু রহস্যটা জানবার কৌতূহলও হ'ল অসাধারণ, তা ছাড়া মনের আর সেই ধার ছিল না তো।

পরদিন সকালে বাগানে পায়চারি করছিলাম। দখিনা বাতাসে যখন শরীর মন জুড়িয়ে দিচ্ছিল তখন ধীরে ধীরে কমলার কথা মনে হ'ল। আর জানিনা কেন, মনে সেই বিরুদ্ধ ভাবটা এল না। কাল যা ভাল ক'রে চোখেও পড়েনি, পড়লেও মনে কোন ছাপই রাখতে পারেনি, আজ সেটাই বেশী মূল্যবান মনে হ'তে লাগল,—সে, তার "পুনশ্চ"টা। কৌতূহল তো ছিলই।

বিকেলেই গেলাম। দেখি অতি দূর সম্পর্কের আমার এক দাদা—সহরের প্রবীণ উকিল, বয়স পঞ্চাশের কিছু ওপরে, কোন সন্তানাদি নেই,—দ্বিতীয় পক্ষ।

দাদার সঙ্গে আলাপ শেষ ক'রে বৌদির সন্ধানে চল্লাম; ভাবছি কে এই কমলা? সে-ই নয়তো?

ঘরে প্রবেশ ক'রেই চমকে উঠলাম, সে-ই তো বটে! সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ফেল্লাম, "তুমি?"

প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, আমার হাত দুটো টেনে দিয়ে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে বহুক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে রইল। আমি দুই হাত ধ'রে তুলতে তুলতে বল্লাম—"ছি, আমাকে তুমি প্রণাম করছ কোন্ হিসেবে? প্রণাম যে তোমারি প্রাপ্য হয়েছে এখন।"—

সে বল্লে, "না, তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে বড় জোর বৌদি বলতে পার যদিও কমলা ডাকলেই বেশী খুশী হব—কিন্তু প্রণাম? না, সেটা তোমারি চিরকালের প্রাপ্য হ'য়ে রয়েছে।" মেয়েদের সব কথা বুঝবার চেষ্টা অনেকদিন ত্যাগ করেছি। কারণ জানি তা বোঝা যায় না। ওই মানুষগুলোও হেঁয়ালী, তাদের কথাও তা'ই।

কমলার কথাও বুঝলাম না। এজন্য কিছুমাত্র মাথাও ঘামাইনি। আমার আসল কথার অবতারণা করলাম, বল্লাম—"আচ্ছা কমলা, তবে যে বলেছিলে তোমার বিয়ের মত নেই, সে হ'তে পারবে না?"

কমলা করুণ হাসির সঙ্গে উত্তর করলে—"তুমি বোধ হয় জানতে যে বাবা আমার অভিভাবক ছিলেন?"

বল্লাম—"হাঁ।"

সে বল্লে—"আমার মত তো তাঁর মতের বাইরে হ'তে পারত না, তাঁকে অপমান করবার জন্যে?—"

বল্লাম—"তবে বিয়ে হ'ল কি ক'রে?" সে বল্লে—"সে-ও তাঁর অবাধ্য হ'তে পারিনি ব'লেই।"

*   *   *

সুদূর পশ্চিমে চলে গিয়েছিলাম। নর্ম্মদার তীরে আশ্রমের একটি শাখা খুলেছি। সেই উপলক্ষ্যে একাদিক্রমে

দীর্ঘকাল সেখানেই থাকতে হয়। বাংলার আশ্রমের ভার অতি যোগ্য ব্যক্তির ওপর অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলাম। একদিন চিঠি পেলাম শিগ্‌গির বাংলা দেশে ফিরে আসতে। কে একজন নাকি আশ্রম উপলক্ষ্যে আমাকে এক লাখ টাকা দান করেছেন। অনেকদিন থেকে প্রাণায়াম করছিলাম, হার্ট ফেল্ হয়নি। পরের মেলেই বাংলায় ফিরে এলাম।

* * *

দাদা মারা যাবার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কমলাকে লিখে দিয়ে যান। কমলা আবার সে সবই আমাকে লিখে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে কেউ জানেনা। একখানা চিঠি ও রেখে গেছে গালা দিয়ে মজবুত ক'রে বন্ধ ক'রে। খুলে পড়লাম। তাতে লেখা রয়েছে—

" তোমাকে কি সম্বোধন করব জানিনে, যা ই করি তবু কিছু বলা হবে না। চিরকাল আমাকে ভুল বুঝেই তো এলে, আজও বুঝতে পারবে কিনা কে জানে! কিন্তু যখন বোঝা উচিত ছিল তখনি যখন বোঝনি তখন আজকে বুঝলেই বা কি আর না বুঝলেই বা কি? হায় পুরুষ! তোমরা কি এত অন্ধ?—

আমার যা দিতে পারলে আমার সব চেয়ে সৌভাগ্য মনে করতাম সংসার তা আমাকে দিতে দিলে কই? অতি তুচ্ছ যা তবু তা-ই আজ তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, আমার মাথা খাও, গ্রহণ কোরো,—নারীর দান ব'লে ঘৃণা ক'রে প্রত্যাখ্যান কোরো না।

নারীর সত্যিকার রূপ তুমি বুঝি একটি দিনের জন্যেও দেখতে পাওনি, সত্যিকার মূল্য বুঝি বা একটি দিনের জন্যেও বুঝিতে পারনি—পেলে তোমার এই 'নারী-বিদ্বেষ' একদিনেই কোথায় উড়ে যেত।

আমার শত কোটি প্রনাম জেনো। বৃথা আমার খোঁজ কোরো না। ইতি।

প্রণতা —কমলা

* * *

কমলা একটা জিনিষ ঠিক বুঝেছে, সেটা এই যে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। পারিওনি। তবে নারী সম্বন্ধে একটা জিনিষ বুঝেছি, সেটা এই যে তাদের কিছুই বোঝা যায় না।

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

বারভূঞার আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ

দায়ুদের শেষ

কটকের সন্ধির ফলে দায়ুদ যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু সমগ্র আফগান জাতির সহিত মোগলের যুদ্ধ এই সন্ধিতে থামিল না। বাঙ্গালা ও বিহারে, নানা দলে বিভক্ত হইয়া, বিভিন্ন নায়কের অধীনে আফগানগণ অবিশ্রান্ত খণ্ডযুদ্ধ চালাইতে লাগিল; তাহাদের রাজা যে মোগলের সহিত সন্ধি করিয়াছেন, তাহা যেন তাহারা আমলেই আনিল না!

ঘোড়াঘাট শাসনে যে কাকশাল জাতীয় মোগলগণ প্রেরিত হইয়াছিল, কালাপাহাড় ও বাবুই মঙ্কলি তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইল, তাহারা গঙ্গা পার হইয়া তাঁড়ায় আসিয়া বাঁচিল। কালাপাহাড় সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া গৌড় নগর পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিল। এমন সময় মুনিম খাঁ দায়ুদ বিজয় সমাপ্ত করিয়া তাঁড়ায় আসিয়া পৌছিয়া কাণ্ড দেখিয়া তো তাঁহার চক্ষু স্থির! আবার ছুটিতে হইল সৈন্য লইয়া আফগানদমনে! তাঁড়ার সম্মুখে বিদ্রোহীদের প্রতিবন্ধকতায় গঙ্গা পার হওয়া অসম্ভব দেখিয়া গঙ্গার উজানে পারে পারে গিয়া উপযুক্ত স্থান বুঝিয়া ঐ স্থানের দিশাখা গঙ্গার এক শাখা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময় খবর আসিল, বিদ্রোহীদল গৌড় ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ফিরিয়া তাঁড়া পর্য্যন্ত আসিয়া মুনিম খাঁ এক সেনাপতিকে বিদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবনে পাঠাইয়া তাঁড়ায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। ঘোড়াঘাটে আফগান উপদ্রব কমিল বটে কিন্তু একেবারে গেল না!

এদিকে জুনৈদ ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে স্বাধীন সিংহের মত বিচরণ করিতে লাগিলেন। রোটাসগড় তখন পর্য্যন্ত আফগান অধিকারে ছিল। আকবর পাটনা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় মুজঃফর খাঁ নামক একজন মোগল সেনাপতির উপর রোটাস অধিকার করিবার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। মুজঃফর চাউন্দ ও সসারাম দখল করিয়া রোটাস বিজয়ের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় (সম্ভবতঃ জুনৈদ প্রেরিত) দুইজন আফগান সেনাপতি যুদ্ধ-সাজে বিহারের নিকট আবির্ভূত হইল। মুজঃফর এবং অন্যান্য মুঘল সেনাপতি রোটাস অবরোধ ফেলিয়া অমনি ছুটিলেন তাহাদিগকে বাধা দিতে। আফগানগণ পরাজিত হইয়া ঝাড়খণ্ডে যাইয়া আত্মগোপন করিল। মুজঃফর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—রোটাস হইতে অবরুদ্ধ আফগানসেনা বাহির হইয়া চাউন্দ ও সসারাম পুনরধিকার করিয়াছে। আফগানগণকে তাড়াইয়া আবার চাউন্দ ও সসারাম উদ্ধার করিয়া মুজঃফর একটু স্থির হইয়াছেন, এমন সময় আবার সংবাদ আসিল দক্ষিণ বিহারস্থ একটি মোগল দুর্গ আফগান-গণ দখল করিয়া নিয়াছে, দুর্গস্থ সমস্ত সৈন্য মারা পড়িয়াছে, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে আফগান অবস্থান খুঁজিতে যাইয়া ৩০০ শত রাজপুত সৈন্য এককালে নিহত হইয়াছে। এদিকে জুনৈদও সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আবার মুজঃফরের ডাক পড়িল। দুইটি বেশ বড় রকমের যুদ্ধের পর আফগানগণ হটিয়া গিয়া ঝাড়খণ্ডে আত্মগোপন করিল এবং জুনৈদও অগ্রসর হইতে বিরত হইল। এমন সময় আবার খবর আসিল যে গঙ্গার উত্তর পারে আফগানগণ বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে। হাজিপুরে মুজঃফরের যে প্রতিনিধি ছিল তাহাকে তাহারা মারিয়া ফেলিয়াছে। মুজঃফর আবার ধাইলেন গঙ্গার উত্তর পারে আফগান দমন করিতে এবং অবিশ্রাম যুদ্ধ করিয়া, একবার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, গঙ্গার উত্তর পারের আফগান-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। আকবর খুসী হইয়া মুজঃফরকে চৌখাঁ হইতে তেলিয়াগরী পর্য্যন্ত স্থানের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এমন সময় সারা বাঙ্গালা দেশেই আবার আগুন লাগিয়া গেল। উপরে দেখাইয়াছি যে বিহারে গঙ্গার উভয় পারে, সমগ্র ঝাড়খণ্ডে, পূর্ব্বপ্রান্তে ঘোড়াঘাটে আফগানগণ কটকের সন্ধিকে বিন্দুমাত্রও মান্য করে নাই—আফগান-বহ্নি ঐ সকল স্থানে অবিশ্রাম জ্বলিতেছিল। এমন সময় সহসা মুনিম খাঁ মারা পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে আবার সারা বঙ্গে আফগানগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় মুনিমখাঁর বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর। মেজাজ হইয়াছিল একেবারে রুক্ষ। তাহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কথা বলিতে কেহ সাহস করিত না। ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে কটকের সন্ধি হয়। অক্টোবরের ২৩ তারিখে মুনিম খাঁ মারা পড়েন। এই বর্ষার প্রায় ছয়টা মাস, যখন লোকে ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করে, সেই সময় আফগানগণ অবিশ্রাম মোগলগণকে বাঙ্গালা ও বিহারের সর্ব্বত্র ঘোড়দৌড় করাইয়া একটু অসতর্ক হইলেই শিকারী চিলের মত যখন তখন ছোঁ মারিয়াছে। ঘোড়াঘাটের আফগানগণ তাড়া পাইয়া সরিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু অবিরতই উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল। বৃদ্ধ মুনিম খাঁ ঠিক করিলেন, তাঁড়া ছাড়িয়া গঙ্গার উত্তরে পরিত্যক্ত গৌড়ে যাইয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিবেন, ঘোড়াঘাটের আফগানগণদমন সহজ হইবে, সুলেমান কররাণীর আমলে গৌড় পরিত্যক্ত হয়, কারণ গঙ্গা সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়নগর ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। ভাদ্র মাসের শেষে বৃষ্টি কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় তাঁড়া পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে যাইবার আদেশ প্রচারিত হয়। কেহ মুনিমখাঁকে সাহস করিয়া জানাইতে পারিল না যে বর্ষার শেষে সহসা এত লোক গৌড়ে যাইয়া বাস আরম্ভ করিলে তাহার ফল কি হইবে! গৌড়ে যাইয়া বসিয়া মোগল সৈন্যগণ উড়িষ্যালুণ্ঠনলব্ধ অর্থে বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। ফলে **গৌড়ে ভীষণ মহামারী** আরম্ভ হইয়া গেল!

মুনিমখাঁর বঙ্গাভিযানের সঙ্গী বায়াজিদ বিয়াৎ তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে এই মহামারীর এক বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। এই পুঁথির এক অনুলিপি বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে—Erskineকৃত এক অনুবাদও অমুদ্রিত অবস্থায় ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। (Ms. Add. 26610.) তখন বর্ষার শেষ, ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়। মোগল সৈন্যের বিলাসজর্জ্জর দেহ সেই অস্বাস্থ্যকর নগরের ঋতুপরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিল না। প্রত্যহ অসংখ্য লোক মরিতে লাগিল। গোর দেওয়া বা সৎকার করা অসম্ভব দেখিয়া মৃত দেহ সকল নদীতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্বল্পতোয়া নদীতে মৃত দেহ পচিয়া দুর্গন্ধে সহরে তিষ্ঠান ভার হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তবু একগুঁয়ে বৃদ্ধ মুনিমখাঁর চৈতন্য হয় না, কেহ তাহাকে জোর করিয়া গৌড় ছাড়িয়া যাইতেও বলিতে সাহস পায় না! একে একে যখন ১২ জন পর্য্যন্ত মোগল নায়ক মহামারীতে মহাযাত্রা করিল তখন অবশেষে জুনৈদ-দমন অছিলায় মুনিমখাঁ সসৈন্যে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া তাঁড়ায় আসিলেন এবং ১০ দিন রোগভোগের পর তাঁড়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন—(২৩শে অক্টোবর, ১৫৭৫)।

মুনিমখাঁর মৃত্যুর সঙ্গে ধূমায়িত আফগান-বহ্নি দপ্ করিয়া সারা দেশময় জ্বলিয়া উঠিল। মোগল নায়কগণ শাহনাম খাঁকে নায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া যখন দশ জন দশ রকম পরামর্শে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল এমন সময় সংবাদ আসিল, দায়ুদ ঠিক বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য রাজনৈতিকগণের মতই মুনিমখাঁর সহিত সন্ধি-পত্রকে বাজে পুরাণা কাগজের সামিল করিয়া ভদরকে অবস্থিত মোগল নায়ক নজর বাহাদুরকে আক্রমণ করিয়া বধ করিয়াছে। শুনিয়া জলেশ্বরে অবস্থিত মোগল নায়ক মুরাদ খাঁ এক দৌড়ে তাঁড়ায় পলাইয়া আসিলেন এবং মুরাদ খাঁর দৌড়ের বহর দেখিয়া তাঁড়ার মোগল নায়কগণ "ডিডি ঢরলে" বলিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গা পার হইয়া গৌড়ের নিকট আসিয়া হাঁপ ছাড়িলেন। সম্মুখে মহামারী, পিছনে দায়ুদ, সঙ্গে বঙ্গলুণ্ঠনলব্ধ অজস্র ধনদৌলত,—মোগল নায়কগণ মহা ফাঁপরে পড়িল! এদিকে আফগানগণ দ্রুত অগ্রসর হইয়া তেলিয়াগরীর পথ আটকাইয়া ফেলিয়াছে, ঝাড়খণ্ডে জুনৈদের রাজত্ব! মোগল নায়কগণের যেন পিঞ্জরে অবরুদ্ধ জন্তুর অবস্থা হইয়া পড়িল। পূর্ব্ব

দেশে মোগল নৌবহরের নায়ক ছিলেন শাহ বর্দ্দি। জমীদার ঈশা খাঁ দায়ূদের উত্থানের খবর পাওয়া মাত্র তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। আবুল ফজল বলেন, শাহ বর্দ্দি হারিলেন না বটে, কিন্তু 'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জন' নীতি অবলম্বনই শ্রেয় মনে করিয়া গৌড়ের নিকটে আসিয়া পলায়মান মোগল নায়কগণের সহিত যোগ দিলেন। ঘোড়াঘাট হইতে কাকশালগণ আসিয়া যোগ দিলে দায়ূদের সহিত লড়িবেন, কাহারও কাহারও এমত অভিপ্রায়ও ছিল। দিল্লীযাত্রার পথে এই বিঘ্ন দেখিয়া একজন মোগল নায়ক বুদ্ধিপূর্ব্বক এমন এক পত্র বাহির করিয়া সহচরগণকে দেখাইলেন যাহাতে সম্ভবতঃ এমন কথা ছিল যে আকবর হয় গুরুতর পীড়িত, নচেৎ আর ইহজগতে নাই। দেখিয়া মোগল নায়কগণের চক্ষু স্থির হইয়া গেল এবং সকলে হুড়া হুড়া করিয়া ত্রিহুতের পথে দিল্লী রওনা হইলেন।

এই স্থানে বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য এই যে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগেই বার ভূঞার প্রধান ভূঞা ঈশা খাঁ এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে বাদশাহী নৌবহর আক্রমণ করিতে তিনি দ্বিধা করেন না। ঈশাখাঁর উত্থানকাহিনী প্রসঙ্গান্তরে আলোচ্য।

এদিকে মুনিমখাঁর মৃত্যুর পর বাঙ্গালায় মোগলবাহিনীর অবস্থা যখন পুরুষসিংহ আকবরের কর্ণগোচর হইল, তখন তাহার প্রতিবিধান করিতে তিনি একদিনও দেরী করিলেন না।— মুনিমখাঁর মৃত্যুর মাত্র ২২ দিন পরে খাঁ জাহান বাদশাহী নিয়োগে সৈন্যসামন্ত লইয়া বঙ্গাভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। (১৫ই নভেম্বর, ১৫৭৫)। রাজা তোড়লমল্লও সঙ্গে চলিলেন। ভাগলপুরে বঙ্গ হইতে পলায়মান দলের সহিত খাঁ জাহানের সাক্ষাৎ হইল। দিল্লী পৌঁছিয়া বঙ্গলুণ্ঠনলব্ধ অর্থে আরামে দিন কাটাইবেন বলিয়া যাঁহারা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা খাঁ জাহানকে কত বুঝাইলেন যে বাঙ্গলায় যাওয়া মানে মহামারীতে প্রাণ দেওয়া, এবং ঐ দেশের লোকগুলা বেজায় বেয়াড়া! কোন কোন ধার্ম্মিক আবার গিয়া খাঁ জাহানের নেতৃত্বে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তোড়লমল্ল মিষ্ট মধুর বাক্যে আবার সকলকে বুঝাইয়া সুজাইয়া, আকবরের ভয় দেখাইয়া শায়েস্তা করিয়া আনিলেন, মোগলবাহিনী অগ্রসর হইয়া তেলিয়াগরীর উদ্ধারসাধন করিল। খাঁ জাহান আগমহল (পরবর্ত্তী নাম রাজমহল) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখেন, সম্মুখে দায়ুদ ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছে, আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। * কেমন করিয়া খাঁ জাহান এখানে বাধা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বুঝিতে হইলে রাজমহলের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক। বুকানন প্রদত্ত প্রায় সওয়া শত বৎসরের প্রাচীন বিবরণ হইতে রাজমহলের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম। (Martin's Eastern India, Vol. II, P. 10, 13, 67.)

গঙ্গার পশ্চিম পারে রাজমহল প্রদেশ উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪০ মাইল লম্বা। রাজমহল সহরটি মালদহ জেলার গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের প্রায় সোজা ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। আমরা যেই সময়ের কথা বলিতেছি তাহার পরে সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গার পার হইতে অল্প দূরেই যেন ঢেউ খেলিতে খেলিতে মাটি ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র

---

* "At this time, messengers brought word that after the Khan Jahan had left Garhi, Daud had advanced from Tanda to a place called Ag-mahal, on one side of which is the river Ganges and on the other side it joins the mountains. And that there he had taken up his position and strengthened it with a trench and fort and was every day making sallies thence. And that Khwajah Abdulla... had fallen after making repeated and vigorous attacks on the trench." Al-Badaoni, Tr. Lowe. Vol. II, P. 235.

আকবরনামাতে ও রাজমহলে দায়ূদ কর্ত্তৃক মোগল সৈন্যের গতিরোধের কথাই ছিল, বেভারিজ সাহেব বিরামচিহ্নের গোলযোগে উহার অন্য রকম অনুবাদ করিয়াছেন। "The text is wrongly punctuated, and makes it appear as if it was Daud who encamped at Ak-Mahal." III, P, 230, footnote. প্রতাপাদিত্যচরিতেও দায়ূদের রাজমহল পর্ব্বতে আশ্রয় নেওয়ার কথা আছে,— তবে অন্য ভাবে। প্রতাপাদিত্যচরিত, নিখিলবাবুর সংস্করণ ২২২ পাতা। দায়ূদ রাজমহলে গতিরোধ না করিলে প্রায় সাত মাস কাল সময় খাঁ জাহান এখানে ঠেকিয়া রহিলেন কেন তাহার কোন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না।

পাহাড়রূপে উচ্ছ্রিত হইয়া শেষে রাজমহল পর্ব্বতমালায় পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে গঙ্গার সমকোণাকৃতি বাঁকের কোণে মানসিংহ কর্ত্তৃক নগর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজমহল বা আকবরনগর নামে অভিহিত হয়। তাহার পূর্ব্বে এই স্থান আগ্‌মহল নামে বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালা-বিহারের সুলতানগণ বিহারযাত্রা কালে অগ্রসর হইয়া প্রথম দিন এই স্থানেই বিশ্রাম করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম দাঁড়াইয়াছিল আগ্‌মহল। *

রাজমহল যেই সমতল প্রান্তরে অবস্থিত, গঙ্গা ও রাজমহল পাহাড়ের মধ্যে তাহা প্রায় ৮ মাইল প্রশস্ত। উত্তর দিকে অলাবুর ঘাড়ার মত ক্রমশঃ চাপিয়া প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে তাহা শিকরিগলির বিখ্যাত সঙ্কটে পরিণত হইয়াছে। রাজমহল সহরের প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণে, আবার পাহাড় ঝুঁকিয়া আসিয়া গঙ্গার উপর পড়িয়াছে, এখানে পাহাড়ের শেষ প্রান্ত এবং গঙ্গার পারের মধ্যে ব্যবধান দুই মাইলের বেশী হইবে না। এই দুই মাইলের ঠিক মধ্যস্থানে আবার একটি একক পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং মূল পাহাড় ও গঙ্গার পারের মধ্যের ব্যবধানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। একক পাহাড় ও গঙ্গার পারের মধ্যে ব্যবধান মাইল খানিকের বেশী হইবে না। ইহার উপর দিয়াই বঙ্গবিহারের সদর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, এই রাজমহল সঙ্কটের মাইল খানিক উত্তরেই আবার উধুয়া নালা নামে বিখ্যাত পার্ব্বত্য নদী। সৈয়র-উল-মুতাক্ষরিণে দেখা যায়, নদীটি গভীর, মুখের দিকটা জঙ্গলা ও কাঁটা গাছে ভরা। ইহার পার খাড়া ও উঁচু এবং ইহা উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। (Seir Mutaqherin, Cambray's Edition, Vol II. P. 491.)
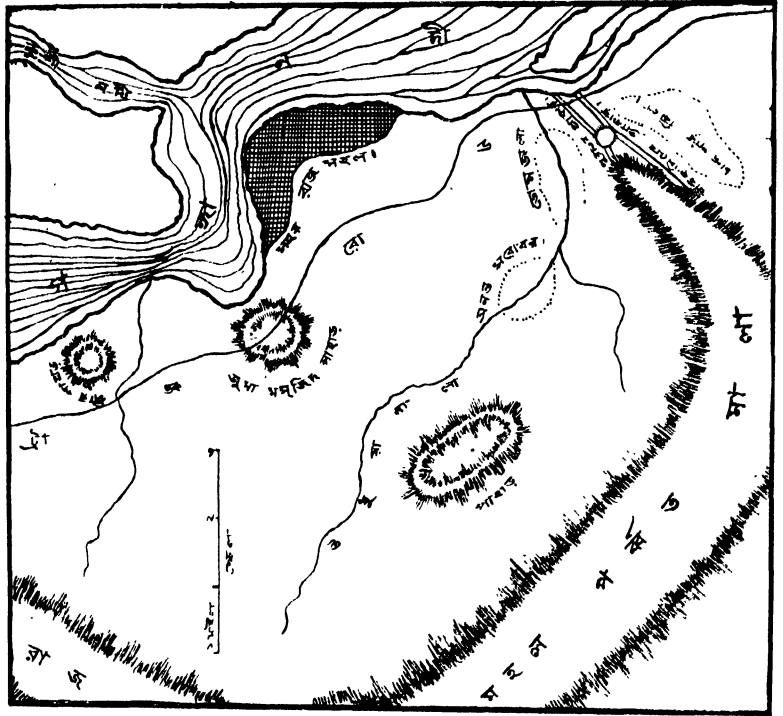
রেনেলের পঞ্চাদশ সংখ্যক মানচিত্র হইতে রাজমহলের নক্সা

পূর্ব্বোল্লিখিত একক পাহাড় ও মূল পাহাড়ের ঠোঁটার মধ্যে যে অবকাশ আছে তাহা দিয়া যাতায়াত দুঃসাধ্য, কারণ উহার অব্যবহিত উত্তরেই ডোমজালা নামক বিখ্যাত জলাভূমি। বুকানন বলেন, বর্ষাকালে এই ডোমজালা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় সাত মাইল বিস্তৃত হইত, উত্তরে দক্ষিণেও ৩।৪ মাইল বিস্তৃত হইত। শীতের দিনে উহা পূর্ব্ব পশ্চিমে চারি মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে দেড় মাইল বিস্তৃত থাকিত। ডোমজালা এবং রাজমহলের মধ্যে আবার আর

* Abdul Latif's "Travels in Bihar" in 1608. By Prof. Jadunath Sarkar. Journal of the Bihar and Orissa Research Society. Vol. V. 1919, Page 601. বেভারিজ সাহেব নামটি আক্‌মহল পড়িতে চাহেন।, আক্ তুরকী শব্দ, মানে ধবল প্রাসাদ। আবদুল লতিফ রাজমহলপ্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িক, কাজেই তাঁহার ব্যাখ্যাই প্রামাণ্য। আবদুল লতিফ বলেন, ভাটি ও উড়িষ্যার দিকে যাইতে বাঙ্গালার সুলতানগণের প্রথম দিনের বিশ্রামস্থান এইরূপে 'পাহমহল' আখ্যা পাইয়াছিল। আব্‌দুল লতিফ আরও বলেন যে রাজমহলের বাড়ীগুলি প্রায়ই খড় ও হোগলা পাতায় ছাওয়া হইত, এবং ঘনঘন আগুন লাগিত বলিয়া সাধারণ লোকে শ্লেষ করিয়াও ইহার নাম রাখিয়াছিল আগ্‌মহল, আগুনের পুরী।

একটি জলাভূমি ছিল, উহার নাম অনন্তসরোবর। গ্রীষ্মকালে উহা প্রায় শুকাইয়া যাইত, কিন্তু বর্ষায় উহাও বৃহদায়তন জলাভূমিতে পরিণত হইত। ঐ অবকাশের অব্যবহিত দক্ষিণে আবার আর একটি উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমে লম্বা বৃহদায়তন জলাভূমি, নাম চান্দশা'র ঝিল। (মানচিত্র দ্রষ্টব্য *) রেনেলের মানচিত্রেই উহার আয়তন দুই মাইলের অধিক লম্বা, এবং ইহা একক পাহাড়টিকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া পূর্ব্বদিকের অবকাশটিও মাইলের চতুর্থাংশ পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া ঢাকিয়াছে, দেখা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত উঁধুয়ানালা নদীটি আবার পাহাড় হইতে নামিয়া অনন্ত সরোবর ও ডোমজালার মধ্য দিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। কাজেই পরিষ্কারই বুঝা যায়, সঙ্কটের পশ্চিম ভাগ দিয়া যাতায়াত প্রায় অসম্ভব ছিল, উত্তর দক্ষিণে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা সঙ্কটের মাইল খানিক প্রশস্ত পূর্ব্বভাগ।

সঙ্কটস্থিত একক পাহাড়টি ভিন্ন রাজমহল প্রান্তরে অনুরূপ আরও তিনটি একক পাহাড় রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়। একটি বেশ বড় রকমের পাহাড়, ডোমজালা ও অনন্তসরোবরের মাইল দেড়েক পশ্চিম উত্তরে,—মানচিত্রে কোন নাম নাই। আর একটি রাজমহল সহরের মাইল খানিক পশ্চিম উত্তরে, উহার উপর জুমামসজিদ থাকায় পাহাড়টিও ঐ নামেই অভিহিত। এই পাহাড়ের দুই মাইল উত্তরে আর একটি পাহাড়, নাম পীর পাহাড়। জুমামসজিদের পাহাড় ও পীর পাহাড়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে।

মানচিত্র দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকিবে না যে উত্তর হইতে আগত বা দক্ষিণ হইতে আগত বিজিগীষুর পথরোধ করিবার একমাত্র স্থান রাজমহল সঙ্কটের পূর্ব্বভাগ। রাজমহল যুদ্ধের ১৮৭ বৎসর পরে কাটোয়া ও ঘিরিয়ার যুদ্ধে হারিয়া এই স্থানেই মীর কাসিম ইংরেজবাহিনীর গতিরোধ করিয়াছিলেন। রাজমহল যুদ্ধের বিশদ বিবরণ আকবরনামাতে তবকত্-ই-আকবরীতে বাদায়ুনীর ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজমহলের ঠিক কোন্ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কোন বিবরণেই স্পষ্ট নাই। তবকত্ (Elliot. V. 397-98.) ও বাদায়ুনী প্রদত্ত যে বিবরণ পূর্ব্বে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে এই আভাস পাওয়া যায় যে পাহাড় ও গঙ্গার মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণস্থানে দাউদ ঘাটি আগলাইয়াছিল, এবং প্রাকারপরীক্ষা ও দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। আকবরনামার বর্ণনা হইতেও গঙ্গা ও পাহাড়ের মধ্যের সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে দায়ুদের অবস্থানের কথা জানা যায়। (III. P. 230-31) ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বরের দিকে খাঁজাহান বঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং রাজমহল পৌঁছিতে একমাস লাগিয়া থাকিলেও ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তিনি রাজমহল পৌঁছেন। তখন পুরা শীতকাল, যুদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট সময়। কিন্তু রাজমহলের যুদ্ধ হইল ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই, বর্ষার প্রারম্ভে! এই যে সাতমাস কাল খাঁজাহান রাজমহলে শত্রু সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে দায়ুদ কেমন শক্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়া ছিল! দায়ুদের অবস্থান যে বিশেষ দুর্ভেদ্য ছিল তাহা আবুল ফজল ও লিখিয়া গিয়াছেন।* বলা বাহুল্য, রাজমহল সঙ্কটের পুর্ব্বভাগ ভিন্ন রাজমহল প্রান্তরে এই রকম আর দ্বিতীয় দুর্ভেদ্য স্থান নাই।

মীরকাশিম ও ইংরেজের এই যুদ্ধ উঁধুয়া নালার যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। সৈয়র-উল-মুতাক্ষরিণে এবং Malleson প্রণীত Fifteen Decisive Battles নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে এই উঁধুয়া নালা যুদ্ধের বিশদ বিবরণ আছে। এই যুদ্ধও বর্ষা কালেই (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩) হইয়াছিল। মানচিত্র হইতে দেখা যাইবে দক্ষিণ হইতে আগত ইংরেজ বাহিনীর পথরোধ করিবার জন্য মীরকাশিম ৬০ ফুট উচ্চ এক প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই প্রাকার গঙ্গাতীর

* রেনেলের মানচিত্রে জলা ভূমিগুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্ত নাম দেওয়া নাই, বুকাননের বর্ণনা দেখিয়া আমি নাম বসাইলাম, ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। যদি রাজমহলবাসী কোন বাঙ্গালীর চোখে এই প্রবন্ধ পড়ে তবে দয়া করিয়া ভ্রম সংশোধন করিলে, চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ঠিকানা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

* "The army of fortune was for a long time stationary in front of the enemy." Akbarnama, III. P. 240.

"They did not like the prospect of fighting on account of the strength of the enemy's position." III. 251.

হইতে আরব্ধ হইয়া একক পাহাড়ের দক্ষিণ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং আবার একক পাহাড়ের অপর প্রান্তে আরব্ধ হইয়া মূল পাহাড়ের ঠোঁটায় চলিয়া গিয়াছিল। Malleson লিখিয়াছেন এই প্রাকার ও উঁধুয়া নালা নদীর মধ্যে আর একটি পুরাতন প্রাকার অবস্থিত ছিল।* এই পুরাতন প্রাকার কাহার নির্ম্মিত, Malleson তাহার উল্লেখ করেন নাই। দক্ষিণ হইতে আগত বাহিনীর গতিরোধ করিতে এই প্রাকার কোন কাজে লাগিবে না বলিয়াই মীরকাশিম একক পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর পূর্ব্ব পশ্চিমে নূতন প্রাকার নির্ম্মিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার বোধ হইতেছে, এই নূতন প্রাকার ও উঁধুয়া নালা নদীর মধ্যস্থিত সম্ভবতঃ একক পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত বরাবর পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা,—পুরাতন প্রাকার উত্তর হইতে আগত মোগলবাহিনীর গতিরোধ করিতে দায়ুদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। একক পাহাড়ের উপর সম্ভবতঃ তাহার দুর্গাদি অবস্থিত ছিল।

ডিসেম্বর হইতে ঝড় বৃষ্টির আরম্ভকাল, বোধ হয় এপ্রিল পর্য্যন্ত খাঁজাহান রাজমহলে বসিয়া রহিলেন, যুদ্ধ করিতে সাহস করিলেন না। দুইপক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে মধ্যে মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ মাত্র হইতে লাগিল। বর্ষা আসিয়া পড়িলে খাঁজাহানের ছাউনীতে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, কারণ চারিদিকেই আফগান-বহ্নি জ্বলিতেছিল এবং রাজমহলের আশপাশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। খাদ্য ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া খাঁজাহান আকবরের নিকট দূত পাঠাইলেন। আকবর আগ্রা হইতে বড় বড় নৌকা বোঝাই করিয়া খাদ্য ও অর্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং বিহারের শাসনকর্ত্তা মুজঃফর খাঁর উপর খাঁজাহানের সাহায্যে রাজমহলে অগ্রসর হইতে পরোয়ানা জারি করিলেন।

আবদুল্লা নামক এক অসমসাহসী মোগল নায়ক আফগানপ্রাকার আক্রমণ করিতে যাইয়া হত হইলেন। এদিকে আফগানপক্ষেরও ইসমাইল খাঁ নামক একজন নায়ক কাকশালদের প্রাকার আক্রমণ করিতে যাইয়া হত হইলেন। প্রকৃত যুদ্ধে রত হইতে কিন্তু কোন পক্ষই সাহস পাইতেছিল না। মোগলগণ আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই কেন, আবুল ফজল তাহার নিম্নলিখিত কারণগুলি দিয়াছেন।

১। জমি বড়ই অসমতল, কাজেই অশ্বারোহী সেনার চলাচলের পক্ষে অসুবিধাজনক।

২। মোগলপক্ষের নায়কগণ অধিকাংশই চাঘাটী জাতীয়, খাঁজাহান ভিন্নজাতীয় (কিজিলবাস) ছিলেন এবং সিয়া মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তাহার নায়কত্বে যুদ্ধ করিতে চাঘাটী নায়কগণের মন উঠিতেছিল না।

৩। মহামারীভীত মোগল সৈন্যগণ অনিচ্ছায় আবার বঙ্গাভিমুখী হইয়াছিল, কতক্ষণে সকলে দিল্লী আগ্রা পৌঁছিতে পারিবে, সারাক্ষণ সেই চিন্তাই করিত, যুদ্ধে কাহারও মন ছিল না।

৪। দিন দিন আফগানপক্ষের বলবৃদ্ধি হইতেছিল।

৫। আফগানগণ এমন দুর্ভেদ্যস্থানে ঘাটি আলগাইয়াছিল যে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইতেছিল।

৬। বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছিল, বৃষ্টির প্রকোপে চলা ফেরা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল—পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদীগুলি স্ফীত হইয়া বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল।

৭। ছাউনীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সৈন্যগণ উপবাসখিন্ন ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

Akbarnama. III. P. 250-51.

আফগানপক্ষীয় ইতিহাসগুলিতে রাজমহলযুদ্ধের কোন বিশদ বিবরণ নাই, কাজেই মোগল ছাউনীর এ অবস্থায়ও যে আফগানগণ কেন চুপ করিয়া বসিয়াছিল,

* "Some distance to the rear of this intrenchment, was the old line of works—which it had in a measure superseded--and the Undwah-nalah, the steep banks and the swollen waters of which formed a natural defence."

Fifteen Decisive Battles. Malleson. Ed. 1885. P. 155.

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

তাহার কারণ জানা যায় না। বীরবর জুনৈদ দায়ুদের সহিত এবার যোগ দিয়াছিল। অনুকূল বায়ুর সুযোগে রাত্রির অন্ধকারে ৩।৪ শত যুদ্ধনৌকায় সৈন্য পার করিয়া খাঁজাহানকে একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আক্রমণ করিতে পারিলে তাহার যে এ-যাত্রা নিস্তার ছিলনা সহজ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়। পার্ব্বত্য যুদ্ধে অভ্যস্ত জুনৈদ পাহাড়ের উপর দিয়াও একদল সৈন্য লইয়া খাঁজাহানকে উত্তর হইতে আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু কোনটাই হইয়া উঠে নাই, আফগানগণ যেন এই সারাটা সময় ভাবিতেছিল, যে বিষম জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছি, মোগলের সাধ্য নাই ইহার নিকটে আসে; কই আসুক দেখি একবার! এই রকম মনোভাব হইতেই যেন আফগানগণ সাতটা মাস মোগল আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিল!

এদিকে আকবরের তাড়ায় মুজঃফর খাঁ পাটনা পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গের পার হইয়া ভাগলপুর পর্য্যন্ত আসিলেন। এইখানে আসিয়া তিনি কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে এই বর্ষা সম্মুখে লইয়া বাঙ্গালা দেশে অগ্রসর হওয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হওয়ারই সামিল। খাঁজাহান তাহার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দল লইয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আসুক। শীতের প্রারম্ভে যাইয়া দায়ুদের সহিত যুদ্ধ করা যাইবে। এইরূপে তিনি ভাগলপুরে বিলম্ব করিতেছিলেন, এমন সময় আকবরের কড়া তাড়া লইয়া দূত আসিয়া হাজির হইল।

এই সময় পাটনা হাজিপুরের জমীদার গজপতি দায়ুদের পক্ষে যোগ দিয়া বাদসাহী দূতের যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিল। এই গজপতি এক সময়ে মোগলপক্ষে মোগলের আশ্রিত ছিল। তাহাকে দায়ুদের পক্ষে যোগ দিতে দেখিয়া মনে হয় খাঁজাহানের দীর্ঘকাল রাজমহলে ঠেকিয়া থাকায় সর্ব্বসাধারণের মনে ধারণা ক্রমেই প্রবল হইতেছিল যে মোগলপক্ষের অবস্থা ভাল নহে। এই গজপতির মোগলপক্ষ-ত্যাগ যদি দায়ুদের পক্ষের রাজনৈতিক চালের ফল হয় তবে এই বিষয়ে মোগলপক্ষও যে নিশ্চিন্ত ছিল না, তাহা অনুমান করা যায়। মখজানে-আফগানা নামক বিখ্যাত আফগানপক্ষীয় ইতিহাসের মতে আফগান সেনানায়ক কত্‌লু খাঁ, খাঁজাহানের সহিত গোপনে বন্দোবস্ত করিয়াছিল এই যে, দায়ুদের পতনের পর তাহাকে উড়িষ্যার কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে, সে যুদ্ধের দিন এমন কার্য্য করিবে যাহাতে দায়ুদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠে।* আকবর-নামায় বা মোগলপক্ষীয় অন্য কোন ইতিহাসে এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাঙ্গালার ইতিহাসে আবার যখন কত্‌লুর সহিত দেখা হয় তখন সে উড়িষ্যায় দিব্য সুপ্রতিষ্ঠিত! ঘুষ দিয়া যেখানে শত্রুজয় করিতে হইয়াছে, সেখানে ঘুষের ব্যাপার সম্বন্ধে আবুল ফজল নির্ব্বিকারচিত্তে চুপ করিয়া গিয়াছেন। আসিরগড় অধিকারের আবুল ফজল প্রদত্ত বিবরণে প্রকৃত ঘটনা চাপিয়া যাওয়ার কথা সর্ব্বজনবিদিত; ঐতিহাসিক স্মিথ তাঁহার আকবরসম্বন্ধীয় গ্রন্থে আবুল ফজলের এই সত্য-গোপন নিয়া কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আবুল ফজলের ইতিহাসে শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যের শেষ উল্লেখ পাইয়াছি তুকারুইর যুদ্ধের আগে, যখন সে দ্রুত যশোর অভিমুখে পলাইয়া যাইতেছিল এবং মোগলসেনা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না। (বিচিত্রা, শ্রাবণ, ২১০ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ, ২১১ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ)। ইহার পর আকবরনামাতে আর শ্রীহরির উল্লেখ নাই। দায়ুদের এই অন্যতম প্রধান মন্ত্রী শ্রীহরি, পাটনা পরিত্যাগের সময় যাহাকে দায়ুদ নিজের সমস্ত ধনরত্ন দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার কি হইল, জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মে। কিন্তু মুসলমানরচিত আর কোন ইতিহাসে অতঃপর শ্রীহরির আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। পাই রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিতে। উহার বিবরণ সর্ব্বস্থানে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বসু মহাশয়

* Katlu Lohoni Daud's commander-in-chief forming a treasonable connection with Khan Jahan, promised to take such a posture on the day of battle as to render Daud's defeat unavoidable on condition that some Perganas should be settled on him." Dorn's History of the Afghans. Vol 1. Page 183. Elliot and Dowson সঙ্কলিত History of India by its own Historians, Vol. IV. Page 513, footnote 2, 3 দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার মোটমুটি সত্য বিবরণ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশশুদ্ধ সকলেই বলে, মানসিংহের হস্তে প্রতাপাদিত্যের পতন হইয়াছিল; কিন্তু বাহার-ই-স্তান হইতে আমরা নিঃসন্দেহ জানিতে পারি যে জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ইসলাম খাঁর সুবাদারী সময়ে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী লেখক হইয়াও বসু মহাশয় মানসিংহের হস্তে প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটান নাই, ইসলাম খাঁর হস্তে ঘটাইয়া ঐতিহাসিক সত্য অবিকৃত রাখিয়াছেন। শ্রীহরি সম্বন্ধে বসু মহাশয়ের কাহিনী মূলতঃ সত্য বলিয়াই মনে হয়।

বসু মহাশয়ের বিবরণে দেখা যায় দায়ুদ রাজমহলে থানা নিলে শ্রীহরি ও তাহার ভ্রাতা সন্ন্যাসীবেশে বরেন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন। এদিকে তোড়লমল্ল ও খাঁজাহান (বসু মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন ওমরাও সিংহ) রাজমহলে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন। ক্রমে তাঁহারা গৌড় লুণ্ঠন করিলেন এবং তথায় কিছু না পাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে যাহারা রাজ্যসংক্রান্ত কোন খবর দিতে পারিবে তাহারা ক্ষমা পাইবে ও তাহাদের পূর্ব্ব চাকরী বজায় থাকিবে। তখন শ্রীহরি ও তাহার ভ্রাতা গোপনে রাজমহলে গিয়া "অস্পষ্ট উকীল" পাঠাইলেন, এবং আশ্বাস পাইয়া তোড়লমল্ল ও খাঁজাহানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, ইহার অভ্যন্তরস্থ যশোহর রাজ্যে তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে এই সর্ত্তে তাঁহারা বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সংবাদ তোলড়মল্লকে প্রদান করিলেন। দায়ুদকে তাহার চাকর যাইয়া শ্রীহরির মোগলপক্ষে যোগ দিবার খবর জানাইল। "দাউদ কহিলেন, এমত নহে, তাহা হইলে অবশ্য বিক্রমাদিত্য আমাকে খবর দিত। চাকর বলে, সে প্রমাণ এমতেই উচিত বটে, কিন্তু এক্ষণ সটের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দুলোক, অতি নষ্টস্বভাব, নিজে কতৃত্ব ভার পাইলে এক্ষণকার সহিত আর বিষয় কি।"

বসু মহাশয় লিখিত দায়ুদের পতন সম্বন্ধে বিবিধ গাল গল্পের মধ্যে উপরের লিখিত বিবরণ হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে দায়ুদের পতনের পূর্ব্বেই শ্রীহরি যাইয়া মোগলপক্ষে যোগ দিয়াছিল। আবুল ফজল পূর্ব্বে একাধিক বার শ্রীহরির উল্লেখ করিয়া এই সময়ে শ্রীহরির নামমাত্র করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সমস্ত ধন সম্পত্তি গ্রাস করিয়া, গৌড় তাণ্ডার যশ হরণ করিয়া যে নবীন যশোহরের অভ্যুদয় হইয়াছিল, দায়ুদের পতনের পর মোগলের লোলুপ দৃষ্টি হইতে কি করিয়া সে অব্যাহতি পাইল, ইহার কারণ যদি বুঝিতে চাই, তবে সন্দেহমাত্র থাকেনা যে বসু মহাশয়ের কথা মোটামুটি সত্য এবং কতলু যেভাবে উড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠিত * হইয়াছিল, শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যের নব অভ্যুদয়শালী যশোহর রাজ্যও সেই প্রথায়ই রক্ষা পাইয়াছিল।

ভাগলপুরে বিহারের শাসনকর্ত্তা মুজঃফর খাঁর উপস্থিতি এবং বর্ষার জন্য বিলম্বীকরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জুলাই মাসের প্রথম ভাগে, অবশেষে আকবরের কড়া তাড়ায় অস্থির হইয়া, মুজঃফর খাঁ রাজমহলে খাঁ জাহানের কাছে দূত পাঠাইলেন যে তিনি রাজমহলে আসিতে স্বীকৃত আছেন কিন্তু আসিলে বিলম্ব করিলে চলিবে না, বা বাদশাহের আগমন অপেক্ষা করিলে চলিবে না, অবিলম্বে যুদ্ধ করিতে হইবে। খাঁ জাহান তাহাতেই স্বীকৃত হইলে মুজঃফর খাঁ অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং ১০ই জুলাই, ১৫৭৬, বিহার ও বাঙ্গালার ফৌজ মিলিত হইল। তখন আষাঢ়ের শেষ, বর্ষা মোটে আরম্ভ হইয়াছে, পথঘাট তখনও বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় নাই। ডোমজালা, অনন্তসরোবর, চান্দশা'র ঝিল, ইত্যাদি জলা অতিবিস্তৃত হইয়া রাজমহলের প্রান্তর একেবারে ঢাকিয়া ফেলে নাই। মোগলপক্ষ

* কতলু বহুদিন হইতেই, সম্ভবতঃ সুলেমান কররানীর আমল হইতেই উড়িষ্যা ভোগ করিতেছিল। পাটনা যুদ্ধের প্রাক্কালে তব্‌কত-ই-আকবরীর মন্তব্য—"Katlu Khan, who had for a long time held the country of Jagannath." Elliot V. 373. কাজেই কটকের সন্ধিতে প্রকৃতপক্ষে দায়ুদ তাহার সম্পত্তিতে ভাগ বসাইয়াছিল। দায়ুদকে মোগলের হাতে তুলিয়া দিয়া উড়িষ্যা একা ভোগ করিবার প্রলোভন কতলুকে এমন ঘৃণ্য স্বজাতিদ্রোহপাপে লিপ্ত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

আক্রমণের উদ্যোগ করিলে আফগানপক্ষও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। দুই পক্ষে নিম্নলিখিতরূপ সৈন্য-সংস্থান হইল। মোগলপক্ষে,—কেন্দ্রে খাঁ জাহান, দক্ষিণ পক্ষে মুজঃফর খাঁ ও বিহারনায়কগণ। বাম পক্ষে রাজা তোড়লমল্ল ও অন্যান্য। শিরে শাহম খাঁ, মুরাদ খাঁ ও অন্যান্য। স্কন্ধে ইসমাইল কুলি খাঁ, কুইয়া খাঁ ও অনান্য। আফগান-পক্ষে কেন্দ্রে দায়ুদ স্বয়ং, দক্ষিণ পক্ষে কালাপাহাড়, বামপক্ষে জুনৈদ। শিরে খাঁ জাহান এবং উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা কত্লু।*

১১ই জুলাই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মানচিত্রে পুরাতন প্রাকারের সম্মুখে বাদশাহী রাস্তা যেখানে উঁধুয়া নালা পার হইয়াছে দেখা যায়, তাহারই দুইধারে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা

আফগানপক্ষ

কালাপাহাড় | দায়ুদ | জুনৈদ

কতলু
খাঁ জাহান

শাহম খাঁ

ইসমাইল
কুইয়া

তোড়লমল্ল | খাঁ জাহান | মুজঃফর

মোগল পক্ষ

বেশ বুঝা যায়। বর্ণনায় বুঝা যায় একক পাহাড়ের দিকে শির দিয়া মোগলব্যূহ রচিত হইয়াছিল।

বাদায়ুনী লিখিয়াছেন—"দাউদ দুঃসাহস ও অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইল এবং এইরূপে লুকাইবার স্থান ছাড়িয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। প্রতাপাদিত্যচরিতেও আছে, রাজমহল পাহাড় ছাড়িয়া নামিয়া আসিলে মোগলগণ তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাতেই দাউদ নিহত হয়। দুর্গরক্ষিত পর্ব্বতশীর্ষ এবং সুরক্ষিত প্রাকার পরিত্যাগ করিয়া মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হওয়া যে দাউদের পক্ষে হঠকারিতার কাজ হইয়াছে, সেই বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যে সুবিধাজনক স্থান সে অধিকার করিয়াছিল তাহাতে নিজের বল বিন্দুমাত্র ক্ষয় না করিয়া গোলা গুলি ও তীরবৃষ্টিতে শত্রুক্ষয় করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইত।

এদিকে আবার আফগানগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধের আগের রাত্রে জুনৈদ গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। গরমের দিন, নিজ শিবিরের বাহিরে একটি চারপায়াতে তিনি শুইয়াছিলেন, এমন সময় একটি কামানের গোলা পড়িয়া তাহার জানুদেশ চূর্ণ হইয়া যায়। আবুলফজলের মতে জুনৈদ ছিলেন আফগানগণের খড়্গ, এবং তাঁহার সমর-কুশলতাও ছিল। এ হেন বীর এমন গুরুতররূপে আহত হইয়া পড়ায় আফগান পক্ষের বিশেষ নিরুৎসাহের কারণ ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। মহাবীর জুনৈদ এই ভয়ঙ্কর আঘাত লইয়াই কিন্তু বামপক্ষের নায়করূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাঁদিকে গঙ্গার পার দিয়া বাদশাহী সড়কের ধারে ধারে জমি সর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক ছিল, কাজেই স্বভাবতঃই মোগল বামপক্ষে ও আফগানদক্ষিণপক্ষে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মোগল পক্ষে বাবা খাঁ কাকশাল প্রথমে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে উঁধুয়ানালা দেখিয়া মোগলগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পারের রাস্তা খুঁজিয়া পার হইবামাত্র কালাপাহাড় তাহাদের আক্রমণ করিল এবং কালাপাহাড়ের হস্তে পরাজিত হইয়া বাবা খাঁ পিছনে হটিলেন, এমন সময় মোগলপক্ষের জব্বরি অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিলেন এবং কালাপাহাড়ের হস্তে তাহারও বাবা খাঁর অবস্থাই ঘটিল। মোগল বামপক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল এমন সময় বীরবর তোড়লমল্ল অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিলেন। সহসা কালাপাহাড় গুরুতর আঘাত পাইলেন ও পশ্চাতে হটিলেন। অমনি আফগানদক্ষিণপক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল ও পলাইল।

* বেভারিজের আকবরনামার অনুবাদে "উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা" এই বিশেষণটি খাঁ জাহানের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু উহা কত্লুর প্রাপ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

সম্মুখে জলাভূমি বলিয়া মোগলগণ বেশীদূর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই আফগান বামপক্ষে আহত জুনৈদ মারা পড়িয়াছিল। কাজেই মোগল দক্ষিণ পক্ষে ও আফগান বামপক্ষে কোন যুদ্ধই হইল না। আফগান দক্ষিণপক্ষও পলাইল।

আফগানপক্ষে বাকী রহিল শির ও কেন্দ্র। মোগল-শিরের মুরাদ খাঁ উঁধুয়ানালা পার হইয়া আক্রমণ করিলেন এবং খাঁ জাহানের হস্তে পরাজিত হইয়া ফিরিলেন। এমন সময় মোগলস্কন্ধ ও শির একত্র হইয়া আফগানশিরের খাঁ জাহানকে আক্রমণ করিল। বীরবর খাঁ জাহান নিজের দলের পুরোভাগে যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। আফগানগণের বিজয়লক্ষ্মী চিরদিনের মত ঢলিয়া পড়িলেন। আকবরনামায় এই যুদ্ধের বিবরণে কতলুর যুদ্ধ করিবার কোন কথাই পাই না। সম্ভবতঃ চুক্তি মত সে আগেই পলাইয়াছিল। মোগল কেন্দ্রে খাঁ জাহানের কোন যুদ্ধই করিতে হয় নাই।

দক্ষিণপক্ষ, বামপক্ষ ও শিরের পরাজয় দেখিয়া দায়ুদ প্রাণরক্ষার্থে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহার অশ্ব জলাভূমিতে আটকাইয়া গেল। সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া খাঁ জাহানের কাছে লইয়া যাওয়া হইল।

খাঁ জাহান বলিলেন, তুমি না মুসলমান? তুমি না কোরাণ হাতে শপথ করিয়াছিলে? তুমি সন্ধি ভাঙ্গিলে কেন?

দায়ুদ বলিল, সে সন্ধি তো তোমার সহিত হয় নাই, খাঁ সাহেব! সে সন্ধি হইয়াছিল খাঁ খানান্ মুনিম খাঁর সহিত। তোমার সহিত মিতালি করিবার, সন্ধি করিবার সময় এইবার উপস্থিত হইয়াছে!

এমন সময় দায়ুদের পিপাসা পাইল, দায়ুদ পানের জন্য জল চাহিল। কোন এক দুর্বৃত্ত দায়ুদের পা হইতে জুতা খুলিয়া লইয়া তাহা ভরিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিল। পিপাসার্ত্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত বঙ্গসুলতান ঘৃণাভরে সে জল প্রত্যাখ্যান করিলে সদাশয় খাঁ জাহান নিজের পানপাত্র ভরিয়া দায়ুদকে জল দিলেন। দায়ুদ অতিশয় সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, আর্ত্ত, রৌদ্রদগ্ধ সুকুমার মুখখানা দেখিয়া খাঁ জাহানের স্বভাব-ভদ্র হৃদয় গলিয়া গেল। দায়ুদকে রক্ষা করিবার তাহার প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আত্মীয়গণের পরামর্শে অবশেষে তাহার বধদণ্ডাজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন।

ঘাতক আসিল। বিসমোল্লা বলিয়া দায়ুদের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিল, 'আল্লা' বলিয়া দায়ুদ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আরও এক কোপ, আরও এক কোপ, অবশেষে তিন কোপে দায়ুদের শির স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আকবর খাঁ জাহানের অনুরোধে পাটনা অবরোধের বারের ন্যায় ফতেপুর ছাড়িয়া বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং একদিনের পথ আসিয়া শিবির ফেলিয়াছিলেন। এমন সময় খাঁ জাহান প্রেরিত দূত যাইয়া দায়ুদের সুগন্ধিলিপ্ত শির আকবরের সমক্ষে নিক্ষেপ করিল এবং রাজমহল যুদ্ধের বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দায়ুদের শিরোহীন দেহ তাঁড়ায় আনিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। বঙ্গীয় আফগানসুলতানগণের স্বাধীনতাসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তে গমন করিল। কতলু খাঁ ও শ্রীহরি বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ নিজ নিজ রাজ্যে যাইয়া বিশ্বাসঘাতকতার আপাত-মধুর বিষাক্ত ফল-উপভোগে মন দিল।

রাজমহল যুদ্ধের মাত্র ২৫ দিন আগে রাণা প্রতাপ-সিংহ হলদিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। চারিদিকেই আকবরের সৌভাগ্যসূর্য্য পূর্ণগৌরবে সমুদিত হইতেছিল। কিন্তু মোগলমারীর যুদ্ধে দায়ুদের পরাজয়ে যেমন বাঙ্গালার নায়কগণ পরাজয় মানেন নাই, রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদের পতনেও বাঙ্গালার নায়কগণ পরাজয় মানিলেন না। দায়ুদের পতনের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বার ভূঞার আমলের আরম্ভ হইল, আমরাও ভূমিকাংশ শেষ করিয়া আমাদের মূল বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। *

---

* খাঁ জাহান ও দায়ুদের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ইতিহাস ছাড়িয়া শেষাংশে উপন্যাস রচনা করিয়াছি। উহার প্রায় সমস্তগুলি কথাই আকবরনামাতে ও বাদায়ুনীর ইতিহাসে আছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া যতগুলি পুস্তক পরিচিত, তাহাদের গ্রন্থকারগণ এক জনও রাজমহলের যুদ্ধ বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, দুই কথায় সমস্ত সারিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই রাজমহল যুদ্ধ ভাগ করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম এবং যথাসম্ভব বিশদ বিবরণ দিতে চেষ্টা করিলাম।

—গল্প—

—শ্রী অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রথম

বদনগঞ্জের মদন ডাক্তারের নিকট দুই বৎসর এগার মাস কাল কম্পাউণ্ডারি শিখিয়া, হাট বাজার করিয়া, ফাই-ফরমাস্ খাটিয়া, বরদা মণ্ডল ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছিল এবং কয় বৎসর হইতে নিজ গ্রাম সাধুহাটিতে প্রকাণ্ড এক সাইন-বোর্ড টাঙ্গাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় সুরু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এমনই তাহার ভাগ্যদোষ যে কিছুতেই তাহার পশার জমিয়া উঠিল না, এবং এই কারণে তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না, উৎসাহ ছিল না। তাহার আলমারির মধ্যে বহুদিনকার সঞ্চিত ঔষধগুলি ক্রমেই পচিয়া উঠিতেছিল এবং প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডের—'ডাক্তার বি, পি, মণ্ডল' লেখাটুকু বছরের পর বছর, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া ক্রমেই অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যার পর বরদা মাঠ হইতে ফিরিবার পথে তেলি-পাড়ার কাছাকাছি আসিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল এবং কি ভাবিয়া, পাড়া ঘুরিয়া বিপিন মণ্ডলের বাড়ী যাইবার পথ ধরিল।

বিপিন মণ্ডল অনেক দিন ধরিয়া ব্যারামে ভুগিতেছিল। আজ তাহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থা, কখন কি হয়!

পথেই বরদার সহিত বিপিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচরণের সহিত দেখা হইল। বলাই বিশেষ কাতর হইয়া কহিল, "কাকা, একবার গিয়ে নাড়ীটা দেখবেন? আর বুঝি রক্ষে হয় না, কাকা!"

বরদা মনে মনে কহিল,—"আজ শেষ সময়ে নাড়ী দেখবার জন্যে —কাকা!—নইলে এই ছ'মাস ধ'রে ভুগ্‌চে, একটা দিনও আমায় ডেকে এক দাগ ওষুধ পর্য্যন্ত আমার খাওয়ান হয় নি! কত দিন ইচ্ছে ক'রে ঘুরে বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করেছি, তবুও তাচ্ছিল্য ক'রে আমায় ডাকা হয় নি! রক্ষে ও হবেই না।" প্রকাশ্যে কহিল—"চল, একবার দেখে আসি।"

বরদা আসিয়া দেখিল, বিপিনের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, কহিল—"আর দেখে কি করবো, বাপু? দিন থাকতে যদি দেখাতে, তা' হ'লে কি আর এ রকমটা হোত? এখন ত শেষ অবস্থা!" তবুও বরদা একবার ডা'ন হাতে, একবার বাঁ-হাতে বিপিনের নাড়ী ধরিয়া দেখিল, চোখ টানিয়া তারা দেখিল,হাত পায়ের চেটো হাত দিয়া পরীক্ষা করিল, তারপর মুখখানা বিকৃত করিয়া চলিয়া আসিল।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চারি বৎসর বয়সের শিশুকন্যা ছুটিয়া

আসিয়া তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া কহিল, —" বাবা, আদ্ আল্ লান্না হবে না।"

বরদা তাহাকে কোলে তুলিয়া হইয়া কহিল,—" কেন মা ?"

—" মায়েল্ দে অথুক কলেচে!"

বরদা তাহাকে কোলে করিয়া শুইবার ঘরে আসিয়া দেখিল, স্ত্রী হৈমবতী বিছানায় শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে গা ?"

"হবে আবার কি ?...সেই অম্বলের ব্যথা!"

হৈমবতী কহিল,—"হবে আবার কি ? যা' হয় আমার! সেই অম্বলের ব্যথা!"

বরদা কন্যাকে, কোল হইতে নামাইয়া দিয়া কহিল,—'ধরবে না ত কি! নিজে এক জন ডাক্তার রয়িচি বাড়িতে, তা—ওষুধ ত আর খাবে না। বলে—আমি দিলুম কত লোকের অম্বল সারিয়ে, আর আমার বাড়িতে কিনা—"

"তোমার ওষুধে ছাই হয়। খেয়ে পেটে চড়া প'ড়ে গেল,—আর বোল্‌চো কি যে খাই না ?"

"আমার ওষুধে কিছু হয় না ?"

"হয় না ত।"

"থা'ক,—তা' হ'লে আর খেয়ে কাজ নেই। লোকের আর দোষ দোব কি ? ঘরের লোকেই যখন বল্‌চে, তখন বাইরের লোক ত—"

"কি মুস্কিল!— উব্‌গার না হ'লেও বলতে হবে যে—"

"আচ্ছা--আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা। থাক্‌,—আমার ওষুধ আর খেয়ে দরকার নেই। আর কখনো বোলবোও না।—আমি কি আবার এক জন ডাক্তার, না, আমি জানি কিছু ?" বলিতে বলিতে খড়ম পায়ে দিয়া বরদা শুধু শুধুই একবার খট্‌খট্‌ করিয়া উঠানের মধ্যে নামিয়া গেল। আবার পরক্ষণেই দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিয়া বলিল,—"হা রে ভগবান্‌!—এই সে দিন কুঞ্জ বোষ্টুমের ভাদ্‌রবৌটা অম্বলের ব্যথায় ম'রে যাচ্ছিল। ঐ গন্‌শাটার কাছ থেকে বুঝি কি ওষুধ এনে খাইয়েছিল,—তা তা'তে ছাই হ'ল। শেষে, ছুটে আসতে হ'ল এই শম্মার কাছে। এক দাগ ওষুধ আমার খেয়ে তবে বৌটা উঠে ব'সে কথা কইতে পারে!—ও রে অ পঞ্চা, অ দেসো! ছেলেগুলো সব গেল কোথা ? ও মা লক্ষ্মী, দে ত মা গোয়াল থেকে চারটি নারকোল পাতা এনে,—চায়ের জলটা ফুটিয়ে নি। ঘুরে ঘুরে দেহটা আক্রান্ত হ'য়ে পড়েচে!"

হৈম উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"আমি ত আর মরিনি,—দিচ্চি চা ক'রে।"

হৈম উঠিয়া চা তৈয়ারি করিতে গেল।

পঞ্চু বাহির হইতে আসিয়া কহিল,—"বাবা, বিপিন মোড়ল আর টেঁকে না,—আজ রাত্তিরেই বোধ হয়—"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

"আচ্ছা—আচ্ছা,—তোর আর ফাজলামি কত্তে হবে না, তুই যা। কোথায় ছিলি? পড়াশুনো নেই তোর?"

"না বাবা, কাল আমাদের ছুটী।"

"ছুটী ব'লে আর পড়তে শুনতে হবে না? আর রোজ রোজই এত ছুটী কিসের হয়?"

"সেক্রেটারীর মায়ের কাল বাবা গাছ-প্রতিষ্ঠে—তাই।"

চা আনিয়া হৈম বরদার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, ও পাড়ার বিপিন ঠাকুরপোর অবস্থা বুঝি খুব খারাপ? শুনচি, আজ রাত্তির না কি টি"কবে না!"

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া বরদা কহিল,—"বলি, টি"কবে না যে, তা'তে আর আশ্চর্য্য হবার আছে কি? গোড়া থেকে ত আর আমায় দিয়ে একটিবার দেখালে না! কেমন যে সব লোক, কিছুই বুঝতে পারি না। বরদা ডাক্তার যে কিসে সকলের চেয়ে কম—" মুখের কথা বরদার মুখে রহিয়া গেল। তাহার হাত হইতে চায়ের বাটি ঝন্ ঝন্ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল, চক্ষু কপালে উঠিয়া স্থির হইল, সর্ব্ব দেহ ফ্যাকাসে হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দেহ মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল।

হৈম স্বামীর প্রাণহীন শীতল দেহে হাত দিয়া দেখিয়াই একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দ্বিতীয়

যমরাজের পুরী-সংলগ্ন বিস্তৃত কার্য্যালয়। বৃহৎ দপ্তর সম্মুখে করিয়া চিত্রগুপ্ত তাঁহার দৈনিক হিসাব মিলাইয়া দেখিতেছিলেন। যে প্রধান অনুচরটি সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কা'কে আনা হ'ল?"

অনুচর উত্তর করিল,—"সাধুহাটির বিপিন মণ্ডল।" বলিয়া বাহির হইতে বরদা ডাক্তারের হাত ধরিয়া আনিয়া সম্মুখে হাজির করিল।

চিত্রগুপ্ত চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এ কি! এ করেচ কি? এ কা'কে এনে ফেলেছ?"

অনুচর কহিল,—"কেন, হুজুর? বিপিন মণ্ডল। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল।"

বরদা ডাক্তার অগ্রসর হইয়া জোড়হস্তে কহিল,—"না, হুজুর, আমি বিপিন মণ্ডল নই,—কিছুতেই নই। বিশ্বাস না হয়, তাঁবা-তুলসী গঙ্গাজল হাতে দিন;—আমি বরদা মণ্ডল। সাইনবোর্ডে আমার বিপিন মণ্ডল লেখা নেই, হুজুর,—আছে বি, পি, মণ্ডল। আমি বরদা,—গাঁয়ের সকলেই সাক্ষী দেবে, হুজুর।"

তখন চিত্রগুপ্ত অনুচরকে বিশেষরূপে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। গোলযোগ শুনিয়া স্বয়ং যমরাজ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া বরদাকে তদ্দণ্ডেই তাহার স্ব-গৃহে রাখিয়া আসিতে অনুচরের প্রতি আদেশ করিলেন।

বরদা জোড়হাত করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, কহিল,—"হুজুর, মিছিমিছি এই কষ্ট দিয়ে যখন এত দূর আনালেন, তখন একবার আপনার পুরীটা ভাল ক'রে বেড়িয়ে দেখে যাবার হুকুমটা দিয়ে দিন হুজুর। কি কাণ্ডটাই আপনার লোকের ভুলে হ'য়ে গেল, সেটা একবার ভেবে দেখুন, হুজুর। হৈম ওদিকে আছাড়-পিছাড় খেয়ে চীৎকার সুরু করেচে! ছেলে মেয়েগুলো সবই একধার থেকে কাঁদতে লেগেছে! অথচ হুজুর, সত্যিই ত আর মরিনি।"

"আচ্ছা—আচ্ছা।" বলিয়া যমরাজ বরদাকে সমস্ত যমপুরী দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুচরকে আদেশ করিলেন।

আদেশানুযায়ী অনুচর বরদাকে সঙ্গে করিয়া যমপুরীর সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া আনিয়া সর্ব্বশেষে একটি তালাবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ হলঘরের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"এইটি 'প্রাণ-পুরী'।" বলিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহার সুবৃহৎ তালা খুলিয়া বরদাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বরদা দেখিল, প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে সারি সারি অগণ্য মোমবাতি জ্বলিতেছে। সব বাতিগুলিরই আকার এক, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত বাতিগুলির আলোকের তারতম্য আছে। কোনটি খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, কোনটির আলো হয় ত ততটা উজ্জ্বল নহে; কোনটি বা নিবু-নিবু হইয়াছে, কোনটি বা একেবারেই নিভিয়া

গিয়াছে, কোনটি বা সবেমাত্র নিভিয়াছে, তাহার নির্ব্বাপিত সলিতা হইতে তখনো ধোঁয়া উঠিতেছে।

অনুচর কহিল,—"বিপিন, এই বাতিগুলো—"

বাধা দিয়া বরদা কহিল,—"কর কি স্যাঙ্গাত! আবার বিপিন? আমি যে বরদা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নামটা খালিই ভুল হ'য়ে যাচ্চে!—দেখ বরদা, এই যে বাতিগুলো দেখচো, এইগুলোই ভিন্ন ভিন্ন মানবের প্রাণ! মৃত্যু সময় হ'লেই, যা'র যে বাতি—অর্থাৎ প্রাণ—নিভে যাবে।"

"আচ্ছা, আমার বাতিও তা'হলে আছে এখানে?"

"আচ্ছা, আমার বাতিও তা'হলে আছে এখানে?"

"নিশ্চয়ই। তোমার বাতি দেখবে?" বলিয়া অনুচর একেবারে হলের প্রান্তদেশে যাইয়া উত্তরের কোণে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"ওই, একেবারে ঠিক কোণের বাতিটা হচ্চে তোমার। দেখতে পাচ্চ না? ওই যে—ঠিক একেবারে কোণে জ্বলচে।"

সেইদিকে চাহিয়া বরদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা স্যাঙ্গাত, আমাদের ওখানকার আফিস-আদালতের হিসেব রাখার মত এ সব কি 'য়্যালফাবেটিক্যালি' সাজান?—আচ্ছা ঐ একেবারে ঠিক কোণেরটাই ত আমার?"

"হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছ ত?"

"তা' ত পেয়েছি স্যাঙ্গাত, কিন্তু—"

"কিন্তু, কি?"

"বলচি যে অমন মিট্-মিট ক'রে জ্বলচে কেন? তেমন দপ্ দপ্ ক'রে ত জ্বলচে না!"

"না। নিভে আসচে আর কি! বড় জোর আর বছর চার-পাঁচ।"

বরদার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। যা একটু হাসি এতক্ষণে তাহার মুখে ফুটিয়াছিল, তাহা মিলাইয়া গেল। অন্তঃস্থল হইতে অতি ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

অনুচব কহিল—"আর নয়—চল। বেশীক্ষণ এখানে থাকবার হুকুম নেই।"

প্রাণপুরী হইতে বাহির হইয়া, বরদা, যেখানে যমরাজ সিংহাসনের উপর বসিয়া, পার্শ্বে দণ্ডায়মান চিত্রগুপ্তের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

যমরাজ অনুচরকে কহিলেন,—"এইবার একে এর বাড়ীতে রেখে এস।"

বরদা তাহার যুক্তকর বুকে ঠেকাইয়া কহিল,—"না হুজুর, আর অধীনকে কষ্ট দেবেন না

যমরাজ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কী বলচো তুমি?"

তেমনি জোড়করে কাতরকণ্ঠে বরদা কহিল,—"বছর চার-পাঁচ পরেই ত আবার আসতে হবে হুজুর? এই ক'টা বছরের জন্যে আর ফিরে গিয়েই বা কি হ'বে? গেলেই ত হুজুর সেই দুঃখ-কষ্ট, নেই-নেই, হা-হা, তা'র চেয়ে, কিছু আগে থাকতেই না হয় থাকলুম, হুজুর। দয়া ক'রে আর পাঠাবেন না,—দোহাই ধর্ম্মরাজ!"

ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—"না—না, তা' কি হ'বার যো আছে? তোমার কি খুবই কষ্ট বাড়ীতে?"

"দয়া ক'রে আর পাঠাবেন না—দোহাই ধর্ম্মরাজ।"

"কষ্টের কথা আর কি বোলবো আপনাকে! আপনি দেবতা,—কিছুই ত আপনার অগোচর নেই। খেতে পাই না হুজুর, ছেলেপুলে নিয়ে খেতে পাই না।"

"কি কর তুমি?"

"হুজুর, আমি ডাক্তার। এত ক'রে বিদ্যেটা শিখলুম, প্রয়োগ কত্তেই পাল্লুম না। কী যে লোকের দুর্ব্বুদ্ধি! টাকা—চার টাকা—আট টাকা দিয়ে গো-বদ্যিদের ডাকবে, কিন্তু হুজুর, একটা টাকা হ'লেই আমি যাই, তা আমাকে ছুঁতেই ডাকবে না। অন্যলোকের কথা ছেড়ে দি, এই দেখুন না হুজুর,—এই হুজুর নিজের ঘরেরই লোক যা'রা, তা'দেরই আমার ওপর বিন্দুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই!"

"বুঝিছি, আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। আচ্ছা তুমি যাও; তোমার দুঃখ-কষ্ট আর কিছু থাকবে না। ঐ ডাক্তারিতেই তোমার যশ দেশ জোড়া হ'য়ে যাবে, তা'র ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি।"

"দিন, হুজুর, দিন। গরীবের ওপর যখন আপনার দৃষ্টি পড়েচে, তখন আমার মঙ্গল হবেই।"

উন্মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া, ধর্ম্মরাজ বাহিরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া যেন কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার পর বরদার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"দেখ, ডাক্তার, যেখানেই তুমি যাবে, রুগীর ঘরে আমাকে দেখতে পাবে। যদি আমাকে রুগীর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ, তা'হলে জানবে যে তা'র মৃত্যু নেই। আর যদি তা'র পায়ের দিকে আমাকে দেখ, তা' হ'লে বুঝবে যে তা'র মৃত্যু একেবারে অবধারিত। এই দেখে কাজ কল্লেই তোমাকে আর কেউ হারাতে পার্ব্বে না,—সর্ব্বস্থলেই তোমার জয় সুনিশ্চিত। তা' হ'লেই তোমার সাংসারিক কোন কষ্টই আর থাকবে না।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অন্তঃপুরে যাইবার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"এইবার চল, তোমায় রেখে আসি।" বলিয়া অনুচর বরদার হাত ধরিয়া যমপুরী হইতে বাহির হইয়া চলিল।

সাধুহাটি বরদার গৃহদ্বারে যখন তাহারা উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও সূর্য্যোদয়ের বহু বিলম্ব ছিল। রাত্রির অন্ধকার তখনো চারিদিক ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। সমস্ত গ্রামখানি তখনো গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন।

বরদার হাত ছাড়িয়া দিয়া অনুচর কহিল,—'তা' হ'লে বিপিন, চল্লুম আমি।"

"আবার বিপিন? আমি বরদা।"

"ঠিক ঠিক,—ঐ ভুলটাই কেবলি হ'চ্চে! আচ্ছা,—বরদা, চল্লুম তা' হ'লে।"

"এস, স্যাঙ্গাত"। বলিয়া অনুচরের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই বরদা দেখিল যে স্যাঙ্গাৎ তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয়

গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে বরদা ডাক্তারের 'হার্ট-ফেল' হইয়া মৃত্যু হয় নাই,—হইয়াছিল সর্পাঘাতে এবং দংশনের দাগটি এখনো তাহার দক্ষিণ পায়ে, হাঁটুর উপর সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—"একেই বলে,—'রাখে হরি ত মারে কে?'—নইলে লাস জ্বালিয়ে দিলেই ত সব ফুরিয়ে যেত। ভাগ্যে সেরাত্রে তখন ঝড় জল এসে পড়্‌লো আর চেষ্টা ক'রেও কোনখানে শুকনো কাঠের যোগাড় হ'ল না, তাইত নদীর ধারে ফেলে আসা হয়েছিল;—নইলে পরে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন চৈত্রমাসের অপরাহ্ণে শুইবার ঘরের দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া, বরদা চা-পানান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে তামাক খাইতে-ছিল। হৈম কাছে আসিয়া কহিল,—হ্যাঁ গা, দুপুর থেকে অম্বলের ব্যথায় সারা হ'য়ে যাচ্চি, দাও না একটু ওষুধ তৈরী ক'রে।"

নীরবে হুঁকায় গোটা দুই টান্ দিবার পর বরদা হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঃ! আমার আবার ওষুধ, তা'তে আবার উবগার হ'বে! খেয়ে খেয়ে শুধু পেটে চড়া পড়ান!"

"দেখ—জ্বালিও না। বুঝতে পারিনি ব'লে, কবে একবার বলেছিলুম, তা রোজ রোজই সেই খোঁটা। উবগার না পেলে লোকেই বা এখন এত ডাকবে কেন? হরির ইচ্ছায় এখন ত দিন দিনই—"

"হরির ইচ্ছেয় কি?—এই দেখবে,—ছ'মাসের মধ্যে কী কাণ্ড ক'রে ফেলি! এ তল্লাটের মধ্যে কোন ব্যাটাকে আর 'গুঁড়ি গুলতে' দোবো না!"

"তা—না দাও—নাই দেবে, এখন ওষুধ একটু আমাকে দাও। কেন না, ব্যথাটা যখন ধরে, একেবারে অস্থির ক'রে ফেলে! তা'ই নিয়ে রাঁধা-বাড়া, কাজ-কর্ম্ম, পারা যায় কি?"

"আর বেশীদিন পাত্তে হ'বে না, হৈম। রাঁধবার জন্যে একজন বামুন আর গোটা দুই ঝি, আর আমার নিজের ফাইফরমাসের জন্যে একটা চাকর, এ আমি শিগ্‌গিরই ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি। কাজ-কর্ম্ম আর তোমার কত্তে হবে না হৈম, তুমি খালি ব'সে থাকবে।"

হাসিতে হাসিতে হৈম কহিল,—"তা' হ'লেই খাসা হবে! একে অম্বলের ব্যথায় ম'রে যাচ্চি, তা'র ওপর, ব'সে থেকে থেকে বাতের ব্যথা যদি ধরে, তা' হ'লেই সুখের আর আমার সীমে-পরিসীমে থাকবে না।"

"তাই থাকবে না হৈম; সত্যই সুখের আর সীমে থাকবে না।" বলিয়াই বরদা সহসা বিশেষরূপ যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভাবান্তর ঘটিল। কি-যেন-একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নিমেষে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ যমালয়ের 'প্রাণ-পুরীস্থ' তাহার নিজের জীবন-বাতির কথা বরদার স্মরণে আসিয়া পড়িয়াছিল। স্মরণ হইল, তাহার স্যাঙ্গাতের মুখে তাহার জীবনের ওয়াদার কথা—"বড় জোর আর বছর চার-পাঁচ।" মনে হইবামাত্র তাহার সমস্ত সুখের কল্পনা, বিষাদের গভীর অতলে ডুবিয়া গেল; হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। বরদা ভাবিতে লাগিল,—"পাঁচ বছর। পাঁচই বা বলি কেন? চারই ধ'রে রাখি। চারের ত দেখতে দেখতে ছ'মাস গেল কেটে। ক'টা দিনই আর ভোগ কত্তে পাব? হা ভগবান!" একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল। হৈম জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ কি হোল বল দেখি? কি ভাবচো?"

চমকিয়া উঠিয়া বরদা কহিল,—"অ্যাঁ!—ও কিছু নয়।"

"তবু?"

"না;—ভাবচি, যে বাড়ীখানাও ত পাকা ক'রে ফেলতে হবে? ডিস্‌পেন্‌সারিটাও। কি রকম 'প্ল্যানে'

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

হবে, একবার চাটুয্যে মশা'য়ের সঙ্গে আগে থাকতে পরামর্শটা ক'রে রাখতে হবে। তিনি কাল বাড়ী এসেছেন শুনলুম। কাজের ঝঞ্ঝাটে একবার গিয়ে দেখা ক'রে আসতেও পারিনি। যাই, একবার দেখাটা ক'রে আসি।" বলিয়া বরদা হুঁকাটি দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া, আলনা হইতে উড়ানিখানি ও ঘরের কোণ্ হইতে লাঠিগাছটি লইয়া বাহির হইয়া গেল। হৈমর ঔষধের কথা আর মনে হইল না এবং স্বামার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া হৈমও সে কথা আর উত্থাপন করিল না।

রমাপতি চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটির একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। কলিকাতার বেলেঘাটায় তাঁহাদের তিনপুরুষের শাল কাঠের বৃহৎ কারবার। দেশে প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান, পুকুর,—কলিকাতাতেও বাড়ী, গাড়ী। সপরিবারে কলিকাতাতেই প্রায় বারমাস থাকেন। চাটুয্যে মশায় স্বয়ং মধ্যে মধ্যে—অর্থাৎ প্রতিমাসেই একবার করিয়া সাধুহাটিতে আসিয়া থাকেন ও দু'একদিন থাকিয়া বাড়ী-ঘর, বাগান-বাগিচা, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদির তদারক করিয়া যান।

এবার তাঁহার সঙ্গে এক গৈরিক-ধারী সন্ন্যাসী-বাবা আসিয়াছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর চির কালই চাটুয্যে মশায়ের অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। হাওড়া ষ্টেসনের প্লাট্-ফরমে ইঁহার দর্শন পাইয়াই তিনি ইঁহাকে আটক করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সঙ্গে করিয়া সাধুহাটিতে আনিয়াছেন। সন্ন্যাসী-বাবা বলিয়াছেন—তাঁহার বয়স আড়াইশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বেশীদিন আর তিনি বাঁচিবেন না। বড় জোর আর দেড় শত বৎসর তিনি জগতে থাকিবেন, যেহেতু চারি শত বৎসরই তাঁহার আয়ুষ্কাল। ভারতবর্ষের কাজ তাঁহার একরূপ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেবল একটি-মাত্র কাজ বাকী। চট্টগ্রামের অন্দরকিল্লার সমীপবর্ত্তী গভীর এক বনমধ্যে একটি কালী-মন্দির নির্ম্মাণ করার জন্য প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। এই বন-কালীর মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই তাঁহার ভারতের কাজ শেষ হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই অর্থ-সংগ্রহের জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন। দৈবাদেশ-প্রাপ্ত এই কাজটি শেষ করিতে পারিলেই তিনি আর ভারতবর্ষে থাকিবেন না। ভারত ত্যাগ করিয়া কিছু-দিন "হনলুলু" এবং তাহার পর 'যুগো-শ্লোভিয়া'তে থাকিয়া ধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রচারকার্য্যে বাকী জীবন কাটাইয়া দিবেন।

মুগ্ধ চাটুয্যে মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার বন-কালীর মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

চাটুয্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বরদা যখন বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সন্ন্যাসীবাবা দ্বিপ্রাহরিক গুরু আহারের পর, তক্তপোষে পাটির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষমধ্য হইতে গুরু গম্ভীর নাদ উত্থিত হইয়া নাসিকা-রন্ধ্র-পথে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে ঘন-ঘন বাহির হইতেছিল। কিছু দূরে, সতরঞ্চির উপর বসিয়া, চাটুয্যে মহাশয়, গোমস্তা শিশুপালের নিকট হইতে এ বৎসরের 'বাড়ি-ধান্যে'র হিসাব বুঝিয়া লইতেছিলেন।

বরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চাটুয্যে মহাশয়কে জোড় হস্তে নুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই,—তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন,—"ভাল আছ ত মোড়লের পো?"

চাটুয্যে মশায়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বরদা একদৃষ্টে নিদ্রিত সন্ন্যাসীবাবার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে?"

চাটুয্যে মহাশয় কহিলেন,—"ওঁর কথা আর কি বলবো,—উনি নরাকারে দেবতা—একজন মহাপুরুষ। চার শ বছর ওঁর পরমায়ু। আড়াই শ বছর কেটে গেছে, এখনো দেড় শ বছর উনি ধরায় থাকবেন। চট্টগ্রা—"

"কিন্তু, আজই যে ওঁর লীলা শেষ দেখচি!"

হো হো করিয়া চাটুয্যে মহাশয় হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"কি বোলচো হে মোড়লের পো? তোমার কি মাথা খারাপ হোয়ে গেল না কি? শুনতে পাই, তোমার খুব হাত-যশ হ'য়েচে, কিন্তু—"

বরদা কোন কথা না বলিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত সন্ন্যাসীবাবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আসিয়া কহিল,—"যাই বলুন আপনি, আজই এঁর ইহলীলার শেষ। একটু আগে এসে পড়লেও, হয়ত ওষুধ-পত্তর দিয়ে বাঁচাতে পাত্তুম,—কিন্তু আর হয় না,—এঁকে আজ যেতেই হবে।"

সন্ধ্যার পর ডিস্‌পেনসারি ঘ'রের বারান্দায় বসিয়া যখন বরদা জনকয়েক প্রতিবাসীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল, তখন সংবাদ আসিল যে সন্ন্যাসীবাবা হঠাৎ দুইবার দাস্ত ও একবার

"কিন্তু আজই যে ওঁর লীলা শেষ দেখ্‌ছি।"

বমি করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। বরদা কহিল,—"বরদা ডাক্তার যা'কে দেখে বোলবে—মরবে, সে মরবে; আর যা'কে বলবে বাঁচবে, সে বাঁচবে। আরে, ডাক্তারি ত সকলেই শেখে আর করে, কিন্তু এর ভেতর অনেক বায়নাক্কা আছে রে ভাই,—অনেক বায়নাক্কা আছে। আসল বিদ্যা ক'টা লোকের ভেতর আছে?"

এমন সময় স্বয়ং চাটুয্যে মহাশয় তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তিনি আসিয়াই কহিলেন,—"বরদা, সার্থক বিদ্যে তোমার! এরকম কলিতে বড় একটা দেখা যায় না! ভেতরে ভেতরে যে তোমার এতখানি ক্ষমতা দিল তা এর আগে কৈ একদিনই ত জানতে পারি নি। যা' হে'াক, তোমার আর সাধুহাটিতে প'ড়ে থাকলে চলবে না, কোলকাতায় যেতে হবে। বরদা, দু'হাত দিয়ে তোমার উপায় হবে। এ কি সাধারণ ক্ষমতা! ছ'মাসে তুমি লাল হ'য়ে যাবে বরদা। এত পয়সা উপায় কর্‌বে যে রাখবার তোমার জায়গা হবে না।"

চতুর্থ

আজ দুই বৎসর হইল বরদা সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। এই দুই বৎসর বাস্তবিকই বরদা দুই হাত দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছে। চাটুয্যে মহাশয় বলিয়াছিলেন যে এত পয়সা উপায় হইবে যে রাখিবার আর জায়গা হইবে না,—তা হইতেছেও তাহাই। তাহার সাধুহাটির সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরের জায়গায় এখন সুবৃহৎ পাকা ইমারত, বাগান, পুকুর জমিজমা। কলিকাতাতেও বরদা বাটী কিনিয়াছে—গাড়ী করিয়াছে। তাহার বাটীর প্রবেশ দ্বারে সুদৃশ্য প্রস্তরফলকে লেখা ছিল ডাক্তার, বি, পি, মণ্ডল—ডেথ্‌-স্পেশালিষ্ট্।

সন্ধ্যার পর বরদা মোটরে করিয়া বেড়াইয়া আসিয়া উপরে যাইয়া হৈমকে কহিল,—"লাখ টাকা দিতে হবে হাসপাতালের জন্যে, তবে সাধুহাটিতে হাসপাতাল হবে। আজ খবর দিয়েচে। এখানকার বাড়ী বিক্রী ক'রে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নগদ একলাখ ত হবে না। তাই ভাবচি কি কর্ব।"

হৈম কহিল—"সব বেচে কিনে দিয়ে আবার সন্ন্যেসী সাজ। কী যে বুদ্ধি তোমার! হাসপাতাল টাসপাতাল করবার মতলব ছেড়ে দাও। ওই ত শরীর! ভগবান না করুন, একটু ভাল মন্দ হ'লে তখন ছেলেপিলেগুলোর কি দুর্দ্দশা হবে, বল দেখি। আমরা দু'জন আর ক'দিন বল—আমাদের ত সময় হ'য়ে এসেছে। ছেলেগুলোর ত একটু হিল্লে—"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বিশেষ বিরক্তির স্বরে বরদা কহিল—"সময় হ'য়ে এসেছে, সময় হ'য়ে এসেছে, আর বোল না, হৈম। তোমার মুখে খালি ঐ কথাটাই শুনি। কেন, সময় হবে কেন? কিসে তুমি বুঝলে যে মাঝে মাঝে এই কথাটাই তুমি—

হঠাৎ বরদার এই অপ্রত্যাশিত বিরক্তিতে চমকিত হইয়া বিস্ময়ের স্বরে হৈম কহিল—"ওগো, একি? আমি কি সত্যিই বলি—একটা কথার কথা বললুম, তা—"

"না-আ-আ,—কথার কথা তুমি ও-রকম বোলো না। যাক, হাসপাতাল আমি কর্ব্বই। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে এ না ক'রে আমি ছাড়বো না। এতে আমার সন্ন্যেসী সাজতে হয় সেও ভাল। তবে ঐ একটা সর্ত্ত থাকবে আমার যে পাশকরা নামকরা ডাক্তার কেউ যেন না আমায় হাস-পাতালে চাকরী পায়। ওই পাশকরা নামকরাদের জ্বালায় যারা কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে না, তাদেরই উপর থাকবে হাসপাতালের ভার।"

হৈম আর কোন কথা কহিবে না মনে করিয়াছিল, কিন্তু থাকিতেও পারিল না,—কহিল,—"তা' হ'লেই হাসপাতাল গড় গড় ক'রে চলবে!"

"না চলে, না চলবে। আমার টাকা, আমার হাসপাতাল, আমি যা ভাল বুঝবো তাই কর্ব্বো, আমি ত 'হরে নরে পঞ্চা'র কথামত কাজ কর্ব্ব না! এই বরদা মোড়ল অনেক ভুগেছে! ঐ সব পাজি, নচ্ছার—"

এমন সময় মতি চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে নন্দীপুরের রাজবাড়ীর লোক এসেছেন, নীচে রুগী দেখবার ঘরে ব'সে অপেক্ষা কচ্ছেন।

কাপড় আর ছাড়া হইল না। বরদা তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া দেখিল স্বয়ং ম্যানেজার তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বিষাদমলিন মুখে ব্যগ্রতার চিহ্ন দেখিয়া বরদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কি—"

"আপনিই কি ডাক্তার মণ্ডল?"

"আজ্ঞে হাঁ, বসুন, আপনার—"

"আপনাকে এখনই একবার যেতে হবে। নন্দীপুরের রাজা কোলকেতায় এসে আছেন। কুমার বাহাদুরের বড় শক্কট অবস্থা। দয়া ক'রে এখনই—"

"কে দেখছিলেন?"

"দেখার আর কারো বাকী নেই। কবিরাজী থেকে আরম্ভ ক'রে, আপনার গিয়ে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, ইউনিপ্যাথি, হকিমি, সব রকমই হ'য়ে গেছে। শেষে একজন জারমেন ডাক্তার দেখ্‌ছিলেন। তিনি আজ 'হোপলেস্' ব'লে চ'লে গেলেন। দয়া ক'রে একবার চলুন—আমার মোটর তৈরী। গাড়ীতে ব'সে ব'সে সব আপনাকে বলবো।"
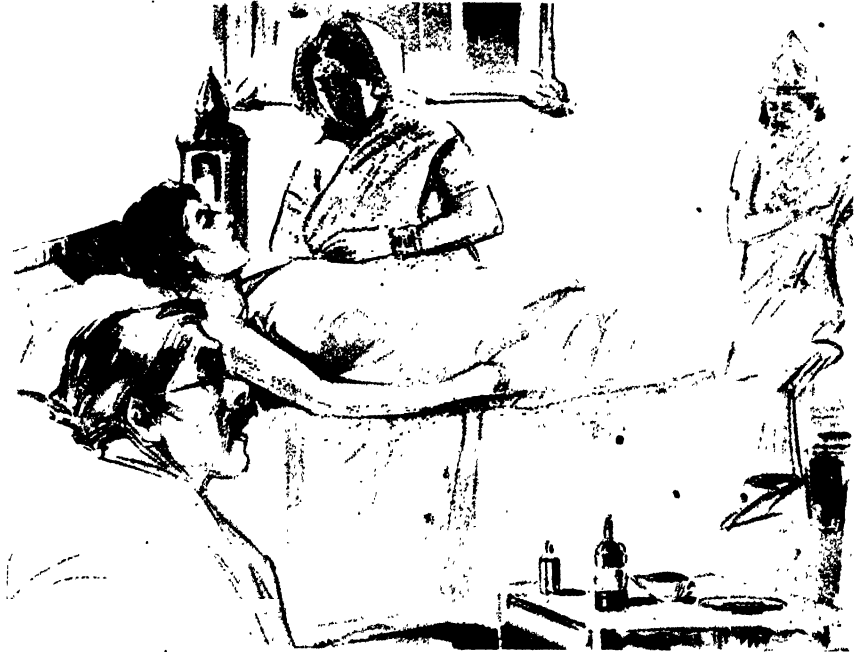
যমরাজ তাহার পায়ের দিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

মোটরে বসিয়া ম্যানেজার বাবু বরদাকে কুমারের অসুখের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানাইয়া শেষে কহিল,—“রাজার ঐ একটি মাত্রই ছেলে। সুতরাং কুমার যদি না রক্ষা পায়, তা হ'লে রাজা রাণীরও বেঁচে থাকা দুষ্কর হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকে অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে আর বাঁচবার কিছুই নেই। তবে যদি—”ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজবাড়ী পৌঁছাইয়া কুমারের ঘরে ঢুকিতেই বরদা দেখিল যে কুমারের তখন উর্দ্ধ-নেত্র, শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে এবং যমরাজ তাহার পায়ের দিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বরদা কুমারের নাড়ীটি একবার হাতে লইয়া বলিল,—“এখন আর বৃথা চেষ্টা—কোন উপায়ই এখন আর নেই। দু' এক দিন আগে হ'লে কি কত্তে পাত্তুম বল্‌তে পারি না—তবে এখন একেবারেই—”

বরদাকে কথা শেষ করিতে দিল না। রাণী একেবারে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল—“বাবা, তুমি মরাকে বাঁচাতে পার, বাবা। শুনিচি—তুমি এরকম বাঁচিয়েচ। বাঁচিয়ে দাও, বাবা—নইলে—”

একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বরদা কহিল,—“কিন্তু পরমায়ু না থাকলে কি মা—”

“ও সব কিছু শুনতে চাই না, বাবা। বল—ছেলে আমার বাঁচবে। তুমি মুখের কথা বল একবার—তা' হ'লে ঠিকই ও বাঁচবে। তোমার কথা সব যে আমরা শুনিচি, বাবা।”

বরদা যে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। রাণীর অসহ্য কাতরতা দেখিয়া বরদার মুখে আর কথা সরিল না।

তেমনি আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে খাইতে রাণী আকুল ক্রন্দনে কহিল,—“ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দাও, বাবা—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমায় দোবো; দিয়ে—আমরা ভিকিরী সেজে চ'লে যাব। ধনদৌলত বিষয় আশয় কিছু চাই না বাবা—শুধু ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দাও।”

বরদা দেখিল, কাল ঠিক তেমনি একভাবেই স্থির নিশ্চল হইয়া কুমারের পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া আছেন।

বরদা রাণীর দিকে ফিরিয়া কহিল,—“মা, কোন আশা থাকলে, নিশ্চয়ই আমি আশা দিতুম। তবে দেখি একটু চেষ্টা ক'রে,—কিন্তু খানিকক্ষণের জন্য আপনারা কেউ এ ঘরে থাকতে পাবেন না।” বলিয়া পকেট হইতে তাহার ঔষধের পকেট-কেস্‌টি বাহির করিল।

সকলে গৃহের বাহিরে যাইলে বরদা হাত যোড় করিয়া যমরাজকে কহিল,—“অনেক দয়া করেচেন—এবারেও একটু দয়া কত্তে হয়েছে, হুজুর।”

যমরাজ কহিলেন,—“তুমি যা মনে ক'রে বলচো বরদা, তা কিছুতেই হবার যো নেই—হ'তে পারে না।”

সেইখানে ধর্ম্মরাজের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বরদা কহিল,—“আপনি মনে কল্লে সবই হ'তে পারে, হুজুর। আর আপনাকে কোন অনুরোধ কর্ব্বনা—এই আমার শেষ ভিক্ষে, এ দিতেই হবে।”

“তা হয় না, বরদা।”

“হয় ধর্ম্মরাজ; আপনিই ইচ্ছে কল্লে সবই হয়। সান্দীপুনি মুনির ছেলেকে, বহুকাল পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ এসে আপনার কাছ থেকে চাইলেন, তখন ত তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে দিলেন, মনে ক'রে দেখুন হুজুর, তারপর মার্কণ্ডেয়র কথা ভেবে দেখুন, সত্যবানের কথা ভাবুন। আপনার ইচ্ছেয় কি না হয়? একবার দয়া ক'রে কুমারের শিওরের দিকে গিয়ে দাঁড়ান, হুজুর। আমি আশ্রিত—আশ্রিতের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।”

বৈবস্বত কিন্তু কিছুতেই নড়িলেন না। বরদার এত কাকুতি মিনতি সকলই বৃথা হইল।

যমরাজ কহিলেন,—“বৃথা অনুরোধ। বরদা, বাড়ী যাও।”

“দয়া ক'রে মাথার দিকে দাঁড়াবেন না, দয়াময়?”

“উপায় নেই, বরদা।”

তখন বরদা মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া, তাহার পর উঠিয়া মালকোঁচা বাঁধিল এবং কুমারের ভূতলস্থ শয্যা দুই হাতে ধরিয়া সড় সড় করিয়া টানিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কুমারের মস্তক একেবারে যমরাজের পায়ের তলাতে আনিয়া ফেলিল।

ধর্ম্মরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"এ কী করলে, বরদা ?"

জোড় হাতে বরদা কহিল,—"এ ছাড়া আর যে কোন উপায় পেলুম না, হুজুর।"

রোষ-কষায়িত-নেত্রে বরদার দিকে চাহিয়া কাল কহিলেন,—"এবার থেকে রুগীর ঘরে আর তুমি আমায় দেখ্‌তে পাবে না।"

অপরাধীর মত অবনত মস্তকে বরদা দাঁড়াইয়াছিল। মাথা তুলিয়া দেখিল—যমরাজ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন এবং কুমার স্বভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মনিবন্ধে হাত দিয়া বরদা দেখিল—কুমারের নাড়ীর গতি ফিরিয়া আসিয়াছে।

পঞ্চম

নন্দীপুরের রাজার ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। বরদা প্রভূত অর্থ পুরস্কার পাইল। তাহার হাসপাতালের জন্য একলক্ষ টাকার আর অভাব হইল না। হাসপাতালের জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বরদা মনে ভাবিল,—আর বৎসর দুই আড়াই ত তাহার জীবনের মিয়াদ। এইবার একবার মাস কতকের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সাধুহাটিতে গিয়া বাস করাই ভাল।

মনের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বরদা বিলম্বও করিল না। অগ্রহায়ণের এক শুভ-দিনে বরদা একাকী, একটি মাত্র ভৃত্যসঙ্গে লইয়া তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় দুইমাস কাল ধরিয়া নানা তীর্থ ঘুরিয়া মোগলসরাই ষ্টেসনের 'ওয়েটিংরুমে' বরদা একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া কলিকাতার গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিল। ভৃত্য জগন্নাথ চায়ের জন্য 'ষ্টোভ্' জ্বালাইতেছিল। বরদা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"জগ, আসছে বছরে আমি উইল কর্ব্ব। তোর মাসোহারার একটা ব্যাবস্থা উইলে আমি ক'রে যাব।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার গাড়ী আসিতে তখনো ঘণ্টা দুই বিলম্ব ছিল। জগন্নাথ চা প্রস্তুত করিয়া প্রভুর হাতে দিল। বরদা চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া সহসা যেন একবার চমকাইয়া উঠিল। এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেকার একদিন এমনি সন্ধ্যার মত তাহার হাত হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া চায়ের বাটি খসিয়া পড়িল। সেদিনকার মতই চক্ষু তাহার কপালে উঠিয়া স্থির হইল এবং সমস্ত দেহ তুষারশীতল ও কঠিন হইয়া ইজি চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল। সেদিন

হাত হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া চায়ের বাটি খসিয়া পড়িল।

স্ত্রী হৈম গায়ে হাত দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আজ এই বিদেশে, প্রবাসের সাথী ভৃত্য জগন্নাথ আঁৎকাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া ষ্টেশনের বাবুদের খবর দিল।

হিন্দুস্থানীর দেশে বাঙ্গালীর শব। বিশেষতঃ রেল ষ্টেশনের 'ওয়েটিং রুমের' মধ্যে। সুতরাং সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর তাহার সদগতি হইল না। পূর্ব্বজন্মের বন্ধু—ভৃত্য জগন্নাথ প্রভুর মৃত দেহ সম্মুখে করিয়া সারারাত বসিয়া কাটাইল।

* * * *

"স্যাঙ্গাত ?"

"কি স্যাঙ্গাত।"

"বলি, দু'বছর ত এখনো আমার সময় রয়েচে। তুমিই ত স্যাঙ্গাত বলেছিলে যে—"

যমালয়ের পথে আসিতে আসিতে বরদা ও অনুচরের কথা হইতেছিল। বরদা অনুচরের মুখের দিকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কহিল,—"তুমিই ত স্যাঙ্গাত বলেছিলে যে, 'এখনো বছর চার পাঁচ ?' "

অনুচর কহিল,—"আমি একটা মোটামুটি আন্দাজ মতন বলেছিলুম বৈ ত নয়। নিখুঁৎ হিসেব গুপ্ত মশায়ের খাতায়।"

"না,—আমার ওপর রাগ ক'রে ধর্ম্মরাজ সময় কমিয়ে দিলেন ?"

"তা কি হবার যো আছে, স্যাঙ্গাত ? আয়ু থাকতে কি কমিয়ে দেবার সাধ্য আছে মহারাজের ? ধর্ম্মরাজের বিচার —বড় সূক্ষ্ম বিচার জানবে !"

"তবে ভুলও ত হ'তে পারে সেবারের মত।"

"বার বার কি আর ভুল হয়, ভাই ? সে, হঠাৎ একবার হ'য়ে গিয়েছিল, আর সে ভুল ত আমার, ভাই।"

বরদা অনুচরের মত দ্রুত চলিতে পারিতেছিল না। তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—"একটু আস্তে চল, স্যাঙ্গাত। আচ্ছা, ঠিক কিনা—একবার সন্দেহটা ভঞ্জন ক'রে নোয়া যাক্, চল না। দেখাই যাক্ না কেন—বাতি জ্বলচে কি—নিভেছে।"

"তা হ'লেই যদি তোমার সন্দেহ যায়, তাই হবে'খন স্যাঙ্গাত।"

তখন উভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিল। যথাসময়ে প্রাণপুরীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল প্রাণপুরী তখন খোলাই রহিয়াছে। গুপ্ত মহাশয় কিছু তদারকের জন্য আসিয়াছেন। অনুচর বরদাকে লইয়া হলের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"ঐ দেখ, স্যাঙ্গাত; এ কি আর ভুল হবার যো আছে ? ঐ দেখ তোমার বাতি নিভে গিয়েছে—এখনো পলতে থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে দেখ্‌তে পাচ্ছ ত ?"

"তা ত পাচ্ছি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"কিন্তু—" বলিয়াই বরদা কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে নিজের নির্ব্বাপিত বাতিটাকে তুলিয়া লইয়া পার্শ্বের একটি জ্বলন্ত বাতি হইতে জ্বালাইয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কহিল,—"কিন্তু এই যে জ্বলচে, স্যাঙ্গাত !"

হাঁ হাঁ করিয়া অনুচর ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"এ করলে কি, বরদা ?"

দুই পা পিছাইয়া আসিয়া বরদা কহিল,—"কিছু নয় স্যাঙ্গাত, কিছু নয়। বলি এত মাথামাথি ভাব—এ সব ছোট ব্যাপারে কি নজর দিতে আছে, স্যাঙ্গাত ? এখন চল, আবার একবার কষ্ট কর। চা'টা খেয়ে আসতেও সময় দাওনি, স্যাঙ্গাত। চল, দুজনে গিয়ে জুত্ ক'রে চা'টা খাওয়া যাবে এখন।"

* * * *

তখনো রাত্রি শেষ হইবার অনেক বিলম্ব ছিল। বিদেশে অপরিচিত ষ্টেশনের 'ওয়েটিং রুমের' মধ্যে প্রভুর মৃত দেহ সম্মুখে করিয়া তখনো জগন্নাথ নীরবে বসিয়া রহিয়াছিল। তাহার সারা-রাতের অনিদ্রার চক্ষু দুইটি ক্লান্তিতে বুজিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ বরদার প্রাণহীন দেহ নড়িয়া উঠিল! বিস্ময়ে জগন্নাথ চাহিয়া দেখিতেই বরদা উঠিয়া বসিয়া কহিল— "জগ, টপ্ ক'রে ষ্টোভ্ জ্বালিয়ে একটু চা তৈরী ক'রে ফেল বাবা! দু'কাপের জল নিস্।" জগন্নাথের ভীত চকিত মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল—"আমি মরিনি রে কোন ভয় নেই।" বলিয়া বরদা মুক্ত দুয়ারের দিকে চাহিয়া ডাকিল—"স্যাঙ্গাত !"

জার্ম্মান্ গল্পের ছায়াবলম্বনে

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

শিক্ষানন্দ বোধিরুচি

হুয়েনসাঙ্‌ যে শিষ্যমণ্ডলী রাখিয়া যান তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বহুগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার সহকর্মী ও শিষ্য Kwei Chi বহু গ্রন্থের, বিশেষভাবে ন্যায় গ্রন্থগুলির টীকা লিখিয়া যান। বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করিতে যাইলে তাঁহার টীকার সাহায্য ভিন্ন চলে না। সেই যুগে আরও কতকগুলি ভারতীয় ও চীনা অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেকের আলোচনা করিতে যাইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। দুইজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের আলোচনা আমরা করিব। আনুমানিক ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে খোটান হইতে শিক্ষানন্দ নামক এক ব্যক্তি চীনে আসেন। তিনি ১৯টী গ্রন্থের অনুবাদ করেন; তাহার মধ্যে পাঁচটী হারাইয়া যায়। যাহা হউক, তাঁহার কতকগুলি অনুবাদ চীন-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। চীন, কোরিয়া ও জাপানের হাজার হাজার ভক্ত সেইগুলি পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করেন। অবতংসকসূত্রের সম্পূর্ণ অনুবাদ তিনি করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধভদ্র প্রথম ইহার চীনা অনুবাদ করেন। কিন্তু বুদ্ধভদ্রের সময় সম্পূর্ণ পুঁথিখানি চীনে ছিল না। সম্রাজ্ঞী Wh Tso Tien দূত পাঠাইয়া খোটান হইতে মূল অবতংসক গ্রন্থখানি আনান। শিক্ষানন্দ এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বুদ্ধভদ্রের অনুবাদের অপেক্ষা ইঁহার অনুবাদ অনেকাংশে বড়। গয়ায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব এই অবতংসকসূত্র বিবৃত করেন এইরূপ প্রবাদ। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন "হায় হায়, সাধারণ মানব অজ্ঞতার বশে জানে না যে তথাগতগণ যে জ্ঞান ও পুণ্যের অধিকারী, তাহারও সেই জ্ঞান ও পুণ্যলাভের অধিকার আছে। আমি তাহাকে সেই মুক্তির পথ দেখাইব যাহা দ্বারা সে মিথ্যা ধারণা ও আসক্তি কাটাইয়া উঠিতে পারে এবং অসীম বোধিজ্ঞান লাভ করিতে পারে।"

মহাযানের মূল মতগুলি ইহাতে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিশেষ একটী দর্শন ইহাতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সমগ্র সূত্রটীর মধ্যে বুদ্ধই হইতেছেন বক্তা; কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহা বলিতেছেন না, তাঁহার অনুচর বোধিসত্ত্বদিগকে দিয়া তাঁহারই বাণী তিনি বলাইয়া লইতেছেন। অবতংসক দর্শনের বুদ্ধ ঐতিহাসিক বুদ্ধ নহেন; এই বুদ্ধ সাগরমুদ্রা সমাধিতে লীন। মনটিকে তিনি সাগরের ন্যায় শান্ত ও স্বচ্ছ করিয়া রাখেন—এই শান্ত স্বচ্ছ মনে সকল বস্তু তাহাদের প্রকৃতি স্বরূপে প্রতিভাত হয়। তাঁহার নিকট জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; ইহা তেজোময় ও প্রাণবান্। জগৎ হইল ধর্ম্মধাতু; স্থূল পদার্থের দ্বারা গঠিত হয়। সমাধিমগ্ন বুদ্ধের নিকট জগৎ আলোকময়, কারণ তাঁহার দেহের প্রত্যেক রন্ধ্র হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া দশদিকে প্রতিফলিত হয়; এই আলোক ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকল কালেই ছড়াইয়া পড়ে। বুদ্ধের এই আলোকময় দৃষ্টি সকল দেশের, সকল কালের বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও তাহাদের অনুচরবর্গের উপর নিপতিত হইয়া অঘটন ঘটায়। প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে বুদ্ধের দৃষ্টি রহিয়াছে; তাহা হইতেই অপূর্ব্ব এক জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে। একটি ভাবের দ্বারা সকল স্থান পরিপূর্ণ, একটি ভাবের দ্বারা সকল কাল অনুপ্রাণিত। সকল মানবের মধ্যে এই বুদ্ধদেশ ও বুদ্ধভাব নিহিত রহিয়াছে; অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

প্রত্যেক বস্তু একই ভাবের দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত—এই মতটী অবতংসকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কোনও বস্তু একাকী সম্পূর্ণ নয়; সুতরাং একটীর ক্ষতিতে কিয়ৎপরিমাণে অপর সকলের ক্ষতি; একটীর বিনাশে সমগ্র জগৎ ন্যূনাধিক অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। সমগ্র জগৎ এই একটী অবিচ্ছিন্ন যোগ সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ; অবতংসক ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছে। মহাযানের গভীরতম ভাবটী ইহাতে নিহিত।

যে পর্য্যন্ত না এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়, ততদিনই জগৎ স্থূল—এই ভ্রমাত্মক ধারণায় মানব দুঃখভোগ করে। মানবের এই দুঃখে বুদ্ধের মন অপার করুণায় অভিভূত। তিনি সমগ্র জগতের পরিত্রাণার্থে আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। জগতের কল্যাণার্থে তাঁহার এই যে প্রচেষ্টা তাহাকে বলা হয় 'সামন্ত ভদ্রের কার্য্য'। যতদিন না প্রত্যেকটী মানব মুক্তিলাভ করে, ততদিন তাঁহার এই কার্য্যের বিরাম নাই। পাপার্ত্ত আত্মাকে নরক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি নরকেও যাইতে প্রস্তুত। বুদ্ধের এই আদর্শে বোধিসত্ত্বগণ অনুপ্রাণিত। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁহারা যুগযুগান্ত ধরিয়া ছয়টী পারমিতা নিষ্ঠাসহকারে প্রতিপালন করেন। এই ছয়টী চর্য্যার দ্বারা অবশেষে তাঁহারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্বের জীবনের দশটী স্তর নির্দেশ করা হইয়াছে। এই দশ ভূমিকার ধারণা মহাযানের সকল শাখার ভিতরই পাওয়া যায়।

শিক্ষানন্দের বৃহত্তর অনুবাদটী বাহির হইবার পর উত্তর চীনে অবতংসককে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া একটী নূতন শাখার অভ্যুদয় হয়। এই শাখা মহাযানের বিজ্ঞানবাদ-যোগাচার হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। হুয়েনসাঙের প্রভাবে বিজ্ঞানবাদ উত্তর চীনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় দক্ষিণ চীনের Tien Tai শাখা মাধ্যমিকদর্শন হইতে অভ্যুত্থিত এইরূপ ধারণা।

অবতংসক মতবাদটীর প্রবর্ত্তক অশ্বঘোষ এইরূপ অনুমান। শিক্ষানন্দ সম্ভবত শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের দ্বিতীয়বার অনুবাদ করেন এই কারণে। অশ্বঘোষ ইহার রচয়িতা বলিয়া প্রবাদ। পরমার্থ শ্রদ্ধোৎপাদের প্রথম অনুবাদ করেন। শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রে সংক্ষেপে তিনটী বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রথম হইল ভূততথাতার ধারণা, দ্বিতীয় ত্রয়ীশক্তির প্রভাব ও তৃতীয় বিশ্বাসে মুক্তির ধারণা বা সুখাবতীবাদ।

ভূততথাতাবাদের মধ্যে মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যতাবাদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ভূততথাতা বা পরমার্থ সত্যকে কোনও বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় না। মন, বস্তু, অন্তর, বাহির—এই সকল শব্দ আপেক্ষিক, একটীকে স্বীকার করিয়া লইলে তাহার বিপরীত অবস্থাকেও পরোক্ষভাবে মানিয়া লইতে হয়। নিরপেক্ষ সত্য হইল এ সকলের অতীত। নেতি নেতি বলিতে বলিতে সকল বস্তু অতিক্রম করিয়া ভূততথাতা বা পরমার্থের ধারণা শূন্যতায় গিয়া পৌছায়। যোগাচারের আলয়বিজ্ঞানের ধারণা ভূততথাতাবাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বস্তুত অশ্বঘোষ মাধ্যমিক ও যোগাচার—এই দুই দার্শনিক মতেরই আভাস দিয়াছেন। শ্রদ্ধোৎপাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ত্রয়ীশক্তির প্রভাব। মহাযানমতের এই একটি বিশেষ দিক অশ্বঘোষ দেখাইয়াছেন। তিনটি শক্তি হইল করুণা, জ্ঞান ও কর্ম। ভূততথাতা বা পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি দ্বারা যে আধ্যাত্মিক জীবনলাভ করা যায়, তাহাতে অনন্ত প্রেমের (করুণা) আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে অনন্ত প্রেমের আভাস না আসিয়াই পারে না। প্রেম আবির্ভূত হয় অনন্ত জ্ঞানেরই ফলে। এই জ্ঞান ও প্রেমের প্রভাবে নৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয়; কর্মফলের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়ায় তাহা অতিক্রম করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই তিনটি শক্তির প্রভাবই একত্রে অশ্বঘোষের মনকে নাড়া দেওয়ায় এই ত্রয়ীশক্তি সম্বন্ধে তিনি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

সুখাবতীবাদ ও বিশ্বাসেই মুক্তি এই মতটি প্রথম শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। শিক্ষানন্দ শ্রদ্ধোৎপাদ ও অবতংসকের নূতন করিয়া অনুবাদ করাতে অবতংসক-মতবাদটির প্রভাব অধিকতর ভাবে বিস্তৃত হইল। উত্তর-চীনে এই শাখাটির আবির্ভাব 'চান' (Chan) রাজত্বকালেই হয়। শিক্ষানন্দ ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলেন। ক্রমশ এই শাখার একটি বৃহৎ সাহিত্য চীনে গড়িয়া উঠে।

শিক্ষানন্দের লঙ্কাবতারসূত্রের অনুবাদ তাঁহার অবতংসকসূত্রের ন্যায়ই মনোহর। লঙ্কাবতারের বিবরণ আমরা পূর্বে কিছু দিয়াছি। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মহামতির সহিত কথোপকথনচ্ছলে সূত্রটি বিবৃত। ইহাতে অলৌকিক কোনও বিষয়ের অবতারণা নাই, কেবল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অলৌকিক

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

গুণসম্পন্ন কোনও ধারণী বা মন্ত্রও ইহাতে নাই। গুণভদ্র ৪৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইহার অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদের মধ্যে অবশ্য কোনও ধারণী নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে তিনটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত দেখা যায়। সর্বপ্রথমেই একটি অধ্যায়ে সমগ্র গ্রন্থটিতে প্রতিপাদিত বিষয়গুলির একটি সাধারণ ধারণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকী দুইটি অধ্যায় গ্রন্থের শেষে যোগ করা হইয়াছে। তাহার একটিতে কতকগুলি ধারণীর সঙ্কলন, অন্যটিতে উপসংহারমূলক একটি গাথা রহিয়াছে।

লঙ্কাবতারসূত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল মহাযানের পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের অধ্যাত্মদর্শন—প্রত্যাত্মগতি। অনেকে ইহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া বলেন যে সূত্রখানির প্রতিপাদ্য বিষয় হইল পাঁচটি ধর্ম, তিনটি স্বভাব (বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ), আটটি বিজ্ঞান ও নৈরাত্মোর দুইটি স্বরূপ। প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃত বিষয়টী বুঝাইবার জন্য এগুলির অবতারণা করা হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত বিষয়টি হইতেছে বস্তুত বুদ্ধের প্রত্যাত্মার্য্য-জ্ঞান।

শিক্ষানন্দের সমসাময়িক আরও যে কয়জন হিন্দুশ্রমণ চীনে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সকলের নাম তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বোধিরুচি নামক এক ব্যক্তি চীনে আসেন। এই বোধিরুচির প্রকৃত নাম ধর্মরুচি। সম্রাজ্ঞী Wu Tso Tien তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া বোধিরুচি রাখেন। ইনি ছিলেন কাশ্যপবংশীয় ব্রাহ্মণ। ৫৩টি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে ৪১টি পাওয়া যায়। ৭২৭ খৃষ্টাব্দে ১৫৬ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান এইরূপ প্রবাদ।

মহাযানসূত্রের রত্নকূটবর্গের সঙ্কলন হইল বোধিরুচির সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। ৪৯টি সূত্র রত্নকূটবর্গে আছে। বোধিরুচি প্রথম সেগুলির চীনা অনুবাদ একত্র করিয়া সঙ্কলন করেন। তিনি নিজে ২৫টি সূত্র অনুবাদ করেন। কয়েকটি পূর্বেই অনূদিত ছিল। অবশিষ্ট কয়েকটি বোধিরুচির সমসাময়িক কয়েকজন অনুবাদ করেন। সমগ্র গ্রন্থখানি ১২০ খণ্ডে বিভক্ত; ৭১৩ খৃষ্টাব্দে এই সঙ্কলনকার্য্য সম্পূর্ণ হয়। তিব্বতী কাঞ্জুরে এই সমগ্র রত্নকূট চীনা হইতে অনূদিত হইয়াছে। কাঞ্জুরে রত্নকূটে ৪৫টি সূত্র রহিয়াছে; ইহার কারণ চীনায় কয়েকটি সূত্রের দুইবার অনুবাদ হইয়াছে।

রত্নকূটবর্গের সূত্রগুলির পরস্পরের সহিত বিশেষ কোনও যোগ নাই। প্রত্যেকটি বিভিন্ন একটি গ্রন্থ। সূত্রগুলির কয়েকটির আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি. কয়েকটির নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। কয়েকখানির আলোচনা এখানে বিস্তারিতভাবে করিতে চাই। একটি হইল অমিতাভসূত্র বা সুখাবতীব্যূহ। সুখাবতীব্যূহের দুইটি গ্রন্থ আছে। জাপানে একটি বৌদ্ধ ধর্মের শাখাকে বলে Jodo (বা পবিত্র দেশ)। এই শাখার প্রামাণ্য গ্রন্থ হইল তিনটি—বৃহৎসুখাবতী ব্যূহ, ক্ষুদ্রসুখাবতীব্যূহ ও অমিতায়ুধ্যান-সূত্র। বৃহৎসুখাবতীব্যূহের বারো বার অনুবাদ হয়। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের চীনা তালিকাগুলিতে এই বারোটি অনুবাদের উল্লেখ রহিয়াছে। বোধিরুচির অনুবাদ হইল একাদশতম,—তাঁহার অনুবাদই রত্নকূটবর্গের অন্তর্গত।

বারোটি অনুবাদের মধ্যে পাঁচটি এখন পাওয়া যায়। এই পাঁচটি অনুবাদ তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থ অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির অনুলিখিত গ্রন্থ হইতে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ এগুলির মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট।

বৃহৎসুখাবতীব্যূহে শাক্যমুনির সহিত তাঁহার শিষ্য আনন্দের কথোপকথনচ্ছলে বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে। আনন্দ তাঁহার গুরুর তন্ময়ভাব লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন?" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন যে, এক সময় ৮১ জন তথাগতের পরে পরে আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন দীপঙ্কর; সর্বশেষ হইলেন লোকেশ্বররাজ। তথাগত লোকেশ্বররাজের নিকট ধর্মাকর নামক এক ভিক্ষু আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি বুদ্ধত্বলাভ করিতে চান। কয়েকটি শ্লোকে লোকেশ্বর-রাজের বন্দনা-গান করিয়া ধর্মাকর বিনীতভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পর বহু সাধনা ও ধ্যানের

বলে ধর্মাকর তাঁহার সুখাবতী স্বর্গের আভাস পান। তখন লোকেশ্বররাজকে তিনি সুদীর্ঘ একটি প্রার্থনা দ্বারা জানান কিরূপ বুদ্ধক্ষেত্র লাভ করিতে তিনি ব্যগ্র। ছেচল্লিশটি শ্লোকসমন্বিত এই প্রার্থনায় সুখাবতীর ভাবটি (conception) প্রথম ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্মাকর ইহাতে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার নাম যে কেহ স্মরণ করিবে তাহার সম্পূর্ণ ভার তিনি গ্রহণ করিবেন, সে ব্যক্তি তাঁহার যত দূরেই থাক্ না কেন, তাঁহার অন্তর হইতে বিকীর্ণ আলোকরশ্মির দ্বারা তাহার হৃদয় তিনি উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন। যদি কোন মুমূর্ষু ব্যক্তি—তা সে যত বড় পাপীই হউক না কেন—অনুতপ্ত হৃদয়ে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে যে মরণের পরে যেন তাহার সুখাবতীলাভ হয়, তবে মরণের সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহা নিশ্চিত লাভ করিবে। সেইখানে ধীরে ধীরে সকল ত্রুটিস্খালন করিয়া সে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে।

ক্রমশ ধর্মাকর বুদ্ধত্বলাভ করেন; তিনি হইলেন অমিতায়ূ বা অমিতাভ বুদ্ধ। যাহা তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা তিনি লাভ করিলেন। অমিতাভের পূতধাম সুখাবতী মর্ত্তাধামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত; ইহা অপরাপর বুদ্ধদিগের নিকটতর সকল দেশের প্রান্তবর্ত্তী। এখানে চির-বসন্ত বিরাজ করে; এখানকার নিবাসী যাহারা, তাহাদের বয়সের তারতম্য নাই। দেহ তাহাদের স্থূল পদার্থে গঠিত নয়, তাহা ছায়ার ন্যায় সূক্ষ্ম। তাহাদের সকল অভাব ইচ্ছামাত্রেই পূরণ হইতেছে। কিন্তু অমিতায়ুর আবাস চিরদিন থাকিবার জন্য নয়; অন্তরটি শুদ্ধ, জ্ঞানালোকিত করিয়া মুক্তিপথের যাত্রী হইতে যে কয়দিনের প্রয়োজন, সেই কয়দিনই এখানে থাকা যায়। অমিতায়ুর পরেই এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ হইলেন অবলোকিতেশ্বর। তিনি এখানকার সকল ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া অন্ধকার হইতে আলোকের পথে, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের পথে লইয়া যান।

এই সুখাবতীবাদটি তিনটি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বৃহৎসুখাবতীব্যূহ, ক্ষুদ্রসুখাবতীব্যূহ ও অমিতায়ূর্ধ্যানসূত্র। বৃহৎসুখাবতীব্যূহের বিবরণ আমরা দিলাম। ক্ষুদ্রসুখাবতী-ব্যূহের প্রথম চীনা অনুবাদ করেন কুমারজীব। ক্ষুদ্র-সুখাবতীব্যূহে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কেহ দুই দিন, তিন দিন, চার, পাঁচ, ছয় বা ততোধিক দিন অমিতাভের নাম জপ করে, সেই সুখাবতীতে প্রবেশাধিকার পায়। ইহার মতে কর্মফলে নয়, বিশ্বাস ও প্রার্থনার বলে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। বৃহৎসুখাবতীর সহিত এইস্থানে ইহার প্রভেদ। বৃহৎসুখাবতীতে অমিতাভের নাম জপের মাহাত্ম্য যথেষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু মুক্তিলাভের পক্ষে সুকৃতির পুণ্য যে একান্ত আবশ্যক তাহা ইহাতে বারম্বার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

চীনে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগেই এই সুখাবতীবাদ বা অমিতায়ুবাদ প্রচলিত হয়। কুমারজীবের ক্ষুদ্রসুখাবতী ব্যূহের অনুবাদে ইহার প্রভাব অধিকতর বিস্তৃত হয়। এইরূপ প্রবাদ যে হুইউআন্ নামক এক চীনা পণ্ডিত তাওআন্ নামক এক বৌদ্ধ শ্রমণের সংস্পর্শে আসিয়া বুদ্ধের বাণীর গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া যান। তখন তিনি সংসার-ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অনুভব করিলেন যে 'ধর্ম' একাকী সাধন করিবার বস্তু নয়। তৎপরে ১২৩ জন শিষ্য লইয়া তিনি চীনে এই অমিতবাদ শাখার প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের লক্ষ্য ছিল সুখাবতীতে প্রবেশাধিকার লাভ। ৪১৬ খৃষ্টাব্দে হুই উআন মারা যান। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'সুই' রাজত্বের সময় তান্ লুয়ান নামক এক গোঁড়া তাও মতাবলম্বী ব্যক্তি বোধিরুচির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এই বোধিরুচি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। ৫০৮ হইতে ৫৩৮ পর্য্যন্ত তিনি কার্য্য করেন। বোধিরুচি বসুবন্ধুর অপরিমিতায়ূসূত্র অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া অবলোকিতেশ্বর-বাদ তিনি চীনে প্রচার করেন। বোধিরুচির এই শিষ্য তান্ লুয়ান পরম নিষ্ঠাসহকারে ও উৎসাহের সহিত অমিত বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। ৬০০ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁহার পর তান্ চাও এই শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সুখাবতীর অপর এক নাম দিলেন অমিতাভকানন; পঙ্কিল মর্ত্ত্যের সহিত ইহার যে কতখানি প্রভেদ তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইহাকে বলিলেন

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

'কানন'। দেখিতে দেখিতে এই মতবাদটির প্রভাব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে তান্ চাওএর মৃত্যু হয়। তান্ চাওএর শিষ্য শান্‌তাও সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে মারা যান। এইরূপ কথিত আছে যে ইনি চাঙ্‌আনের সমগ্র লোককে এই মতে দীক্ষিত করেন; এমনকি সম্রাট কাওৎসাংও অমিতবাদ গ্রহণ করেন। ক্রমশ অমিতবাদের একটি বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্ট হইতে থাকে। চীনে অন্যান্য শাখার সাহিত্য হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহা সরল আন্তরিকতায় পূর্ণ, উদার একটি নিষ্ঠা মনকে স্পর্শ করে। ইহার গ্রন্থগুলির কোন কোনটি সরল নীতিবাক্যে পূর্ণ; কোনটিতে ব্যাকুল প্রার্থনা, কোনটিতে জনসাধারণের প্রতি আবেগপূর্ণ আহ্বান, কোন কোনটিতে মহাপুরুষদিগের জীবনকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তান্‌লুয়ান্ এর **Liao-lun-an-lo-ching-tu-i** এবং তান্ চাওএর **An-lo-chi** এই দুইটি হইতেছে উৎকৃষ্ট উপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ। তান্‌লুয়ানএর **Tsan A-mi-to fo-chih**তে অমিত-বুদ্ধের নিকট অতি সুন্দর প্রার্থনা রহিয়াছে। প্রত্যেক প্রার্থনার প্রথমে বুদ্ধকে এইরূপে আহ্বান করা হইয়াছে, "হে অমিতাভ, পরিপূর্ণ নির্ভরের সহিত পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি।" প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে রহিয়াছে, "আমরা ও সমগ্র মানব যেন তোমার সুখশান্তির আলয়ে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারি।"

সুখাবতীব্যূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত সকল গ্রন্থের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এই ভক্তির ভাবটি জাপানকেও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেখানে সুখাবতীশাখার বৃহৎ একটি সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

রত্নকূটবর্গের সুখাবতীব্যূহটির সর্বাপেক্ষা সমাদর অধিক। এই বর্গের কয়েকটি সূত্রের আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি—যেমন উগ্রপরিপৃচ্ছা, রাষ্ট্রপাল-পরিপৃচ্ছা, পিতাপুত্রসমাগম ইত্যাদি। উহার আর একটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করিতে চাই, গ্রন্থটির নাম কাশ্যপপরিবর্ত্ত। সম্প্রতি মূল গ্রন্থখানি, তিব্বতী অনুবাদ ও চারিটি চীনা অনুবাদের সহিত পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রুশীয় অধ্যাপক Stael-Holstein প্রকাশ করিয়াছেন। কাশ্যপপরিবর্ত্ত হইল রত্নকূটবর্গের ত্রিচত্বারিংশতম গ্রন্থ। ইহার প্রথম চীনা অনুবাদ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোকক্ষেম করেন। দ্বিতীয় অনুবাদ হয় সীন (Tsin) রাজত্বের সময়; অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। জার্মাণ পণ্ডিত Forke প্রমাণ দ্বারা দেখান যে দ্বিতীয় অনুবাদ হয় Chin রাজত্বের সময় (৩৫০-৪৩১)। তৃতীয় অনুবাদ করেন বোধিরুচি; তৎপরে ইহাকে রত্নকূটবর্গের অন্তর্গত করিয়া লন। বোধিরুচির অনুবাদটিকেই বস্তুত দ্বিতীয় অনুবাদ বলা যায়; কারণ দ্বিতীয় অনুবাদের সাহায্যেই বোধিরুচি তাঁহার অনুবাদ করেন। চতুর্থ অনুবাদ হয় Sung রাজত্বের সময় (৯৬০-১১২৭)। ধর্ম্মপাল এই অনুবাদ করেন। অন্যান্য বৌদ্ধ সূত্রগুলির ন্যায় কাশ্যপপরিবর্ত্ত হইতেছে প্রধানত নীতিপূর্ণ দার্শনিকগ্রন্থ। মনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে ইহার অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে সত্যকে চাপিয়া রাখবার অপেক্ষা বোধিসত্ত্ব বরং রাজ্য, ধন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবেন। কতকগুলি নৈতিক নিয়ম পালনের জন্য ইহার কোন কোনস্থলে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পরিবর্ত্তের দার্শনিক অংশের কোন কোনস্থানের সহিত নাগার্জুন ও আর্য্যদেবের দর্শনের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কাশ্যপপরিবর্ত্ত নাগার্জুনের বহু পূর্বেকার গ্রন্থ; সুতরাং এই গ্রন্থ হইতে নাগার্জুন প্রভৃতি দার্শনিকগণের কিছু কিছু সাহায্য লওয়া সম্ভব। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে শ্রাবক-দিগের নিন্দাবাদ রহিয়াছে। স্বার্থপর শ্রাবকগণ যে স্বার্থলেশ-হীন বোধিসত্ত্বদিগের অপেক্ষা সর্বাংশে হীন, এখানে তাহা বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে শ্রাবকগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দুর্গতির মূল নির্দ্ধারণ করিতে ভুলপথে যাইতেছেন। দুর্গতির মূলকারণ বাহ্য নয়, আভ্যন্তরিক সুতরাং অন্তরের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। কুকুরকে যেমন কেহ মাটীর ঢেলা ছুঁড়িয়া মারিলে সে ঢেলাটিকেই মারিতে উদ্যত হয়, তেমনি শ্রাবক-গণ দুঃখ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা না জানিয়া দুঃখের মূলচ্ছেদ করিতে ব্যগ্র।

আমার কবিতাগুলি

মহম্মদ হোসেন

আমার কবিতাগুলো
যদি বল নিতান্ত অ-চোলো,
তা'রা তাই—তবে তাই তা'রা,
ছন্দ-হারা সুর-ছাড়া
তাই যে তাহারা।
যদি বল ম্লান পথধূলি
আমার কবিতাগুলি,
তাই তা'রা—তবে তা'রা তাই,
এতে মোর কোন লজ্জা নাই,
হো'ক না তাহাই।
কবি-রাজেন্দ্রানী!
জানি আমি জানি,
নিত্য যবে এই পথ দিয়ে
অভিসারে চ'লে যাবে প্রিয়ে,
কজ্জল-উজ্জ্বল তব নয়নের পল্লবপ্রচ্ছায়ে
পুলকের কম্পন জাগায়ে,
পথের দু'ধারে
রূপ-রস-ভারে
প্রস্ফুটিত পুষ্প রাশি রাশি—
উঠিবে যে হাসি',
দু'ধারের কানন-কুন্তলা
নেহারিবে হে স্বপ্ন-অঞ্চলা!
আকুল পুলকে,
আলুলিত নিবিড় অলকে
পরিধে মঞ্জরী
হে সুন্দরী!
এই কাব্যকলা-পথপাশে
যে কুসুম ফুটে রাশে রাশে
বিলায় সুরভি,
সুনিপুণ তুলিকার ছবি—
তাহারা যে কৃতী কবিদের;
দু'পাশের নব শ্যামলের
স্নিগ্ধ শান্ত শোভা
প্রাণ-মন-লোভা
বসন্তের স্বপন-অলকা
চেয়ে রবে ওগো নিষ্পলকা,
নির্ব্বাক বিস্ময়ে!
নিঙাড়ি সে সুষমানিচয়ে
অঙ্গরাগ অধিক রাঙাবে,
আলস্য-জড়িমা-লাগা কুঁড়িদের
জড়তা ভাঙাবে,
তব কাছে প্রিয় যাহা সে গুলি সবি তা,
তাদের কবিতা,
লতা গুল্ম কিসলয় বিচিত্রিত তৃণ ফল ফুলই
তাদের কবিতাগুলি;
মোর শুধু হায়, পথেতে লুটায়—
তপ্ত দগ্ধ ম্লান মরুধূলি,
আমার কবিতাগুলি।
কল্পদূতী! হে কবি-প্রেয়সী!
মানসী! উর্ব্বশী!
এই পথে চলিতে চলিতে
ধূলো তব হবে যে দলিতে,
লঘুভার তব পদক্ষেপে
চারিদিক ব্যেপে'
উড়িবে এ ধূলি,
আমার কবিতাগুলি;
অলক্ষিতে মলয়ের সাথে
এ ধূলি যে তোমার পশ্চাতে

মহমুদ হোসেন

উড়ে যাবে কৌতূহলভরে
তব অঙ্গ 'পরে
লইবে আশ্রয়,
না করিয়া কোনো দ্বিধা ভয়
ঠাঁই নেবে রক্তিম কপোলে,
সুরভি-শিহরা তব ঘনকালো কুঞ্চিত কুন্তলে
নয়ন পল্লবে
ধুলো লেগে রবে,
তপ্তদুগ্ধফেনাসম মৃদু কম্পমান
আন্দোলিত তবু বুকখান
ধরিবে আঁকড়ি',
আহা মরি মরি!
তব রাঙা অঙ্গরাগ চুমি'
রাঙা হবে আবীর-কুঙ্কুমী
এই ম্লান ধূলি,
আমার কবিতাগুলি ;
স্নিগ্ধ শান্ত পরশে উষার
ঘন কালো যেমন আঁধার
রাঙা হ'য়ে যায়
নীলিমার পূর্ব্ব-সীমানায়।

অকস্মাৎ তুমি পাবে টের
অঙ্গে তব লাগিয়াছে ঢের
শুষ্ক ম্লান ধূলি,
আমার কবিতাগুলি।
বীতরাগ বিরক্তির রেখা
সলজ্জ নিবীত মুখে, নয়নেতে দেবে তব দেখা
ক্রোধে ক্ষোভে রহিয়া রহিয়া
হিল্লোল-বিলোল তনু মুহু তব উঠিবে কাঁপিয়া
সে কম্পনছন্দে হেলি' দুলি'
নাচিবে এ শুষ্ক পথধূলি,
আমার কবিতাগুলি।
যত তুমি চাহিবে মুছিতে
অয়ি শুচিস্মিতে,
তত বেশী এরা উড়ে এসে
রিক্ত নিঃস্ব ভিখারীর বেশে
লুটাবে চরণে,
ওগো স্মিতাননে !
তখন তুমি ত আর পারিবে না
মুছিতে এ ধূলি,
আমার কবিতাগুলি।

সহযোগী-সাহিত্য

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

২

ক্লাসিক আদর্শের সহিত সংঘর্ষ

১৮২০ সালে ফরাসী সাহিত্যাকাশে লামার্তিনের কবিতার আবির্ভাব হইল,—যেন একটা বিজলীর চমকের মত। সে যেন একটা নূতন জাগরণ। মানুষের নয়নে সহসা যেন একটা নূতন জগৎ প্রতিভাত হইল,—প্রাণের আবেগরাজির সমস্ত উৎসগুলি যেন একাধারে খুলিয়া গিয়া কাব্যরস ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। এমন অকৃত্রিম, প্রাণস্পর্শী অনুভূতির কাঁপন ফরাসী বক্ষে-ইতিপূর্ব্বে কখনো লাগে নাই; এমন হৃদয়-ভরা হৃদয়-ঢালা প্রেমের আস্বাদও, পেত্রার্কের ছাঁদে-ঢালা ফরাসী কবিতায় ইতিপূর্ব্বে কখনো পাওয়া যায় নাই; এমন ঘনীভূত বিষাদ, এমন নিবিড় বেদনা ফরাসী ছন্দে ইতিপূর্ব্বে কখনো গুমরিয়া উঠে নাই। অথচ সে কবিতায় না-ছিল এতটুকু অবসাদ, না-ছিল এতটুকু গ্লানি, না-ছিল এতটুকু নীরসতার ক্লান্তি। রসে ভরাট, সুরে মুখরিত, বেদনায় গভীর, ভাবে নবীন সে কবিতা কবির ব্যথিত অন্তঃকরণ হইতে নিঃসারিত হইয়াছিল, এমন বিশুদ্ধ ছন্দে, এমন অনির্ব্বচনীয় রুচিতে যে, কবির প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে এক অতুলনীয় আকার দান করিয়া সে কবিতা অমর হইয়া রহিয়াছে। একটুখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"Non, tu n'as pas quitté mes yeux ;
Et quand mon regard solitaire
Cessa de te voir sur la terre.
Soudain je te vis dans les cieux."

—"না,—তুমি ত আমার নয়নের আড়াল হও-নি; যখন আমার নিরালা দৃষ্টি তোমায় মাটীর পরে আর দেখ্‌তে পেল না, তখন সহসা তোমায় দেখ্‌লাম আকাশের মাঝখানে।"

এই নূতন কাব্যরস বিভিন্ন কবির লেখনী হইতে 'la muse Francaise নামক পত্রিকার পাতায় পাতায় খরস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে যে নবীনতার উৎসাহ, তারুণ্যের চঞ্চলতা, প্রাণের অদমনীয় বেগ ছিল,—তাহা কোনো বাধাই মানিল না,—কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিল না, অপ্রতিহততেজে, অনাবিল আনন্দে তাহা আপনার পথ কাটিয়া চলিল। লামার্তিনের প্রথম কবিতা 'méditations'এর প্রকাশের পর ভিক্টর হিউগো তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশ করিলেন;—তখন তাঁহার বয়স বড় জোর বিশ বৎসর। তারপর এক অবিশ্রান্ত ধারায় প্রকাশিত হইতে লাগিল,—লামার্তিন, ভিক্টর হিউগো, আল্‌ফ্রেড ভিঞ্‌নি (Alfred de Vigny), আল্‌ফ্রেড্ মুস্‌সে (Alfred de musset), এমিল দেস্‌শঁ (Emile Deschamyso) প্রভৃতির কবিতারাজি,—যাহাদের বিভিন্ন অনুপ্রেরণার মধ্যেও আমরা সেই একই সুরটির আভাস পাই সেটি সত্যের মধ্যে প্রধাণ, ব্যক্তিগত জীবনের সমগ্রসুন্দর প্রকাশ। শুধু কাব্যে নয়, উপন্যাসে, নাটকে,—এমন কি ইতিহাসেও এই সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অতীতের প্রতি একটা দরদ লইয়া—প্রাণের চঞ্চলতায় ও রঙে অতীতকে ফুটাইয়া তুলিয়া দেখানো—ইহাই হইল রোমাণ্টিক ঐতিহাসিকের আকাঙ্ক্ষা। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও যাহা ফুটিয়া

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

উঠিল,—তাহা একটি মৃত অতীতের নিশ্চল ছবি নয়,—তাহা প্রাণের একটি জীবন্ত আন্দোলন ও ঝঞ্ঝা।

কিন্তু নবীনের এই অভিযান বড় নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইল না। ক্লাসিক আদর্শের প্রাণহীন মূর্ত্তিটি তখনো প্রতিষ্ঠিত ছিল দেশের একাডেমিগুলিতে, তাই সেই মূর্ত্তিটি পুনঃসঞ্জীবিত করিবার দায়িত্বভার মাথায় গ্রহণ করিয়া একাডেমিওয়ালারা নিশ্চিন্তমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের চোখে নবীনতার এই অভিযান বড়ই উদ্ধত ঠেকিল। তাঁহারা বিষম চটিয়া গেলেন। এত বড় স্পর্দ্ধা, এত বড় ঔদ্ধত্য এই নবীনপন্থীদের;—যে এমন-কি কর্ণেই কিংবা রেসিনেরও সম্মান রাখে না! আপনাদের যত কিছু দোষ,—কি ভাবের দারিদ্র্য, কি কল্পনার অভাব, কি রচনার জড়তা—সমস্তই তাঁহারা অস্বীকার করিলেন—এই কর্ণেই, রেসিন প্রভৃতি বড় বড় নামের দোহাই দিয়া। এই সব বড় বড় নামের আওতায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—কেন,—প্রতিভার সঙ্গে স্থির যুক্তির মিলন কি একেবারেই অসম্ভব? সাহসের চর্চ্চা করিতে গেলেই কি রুচি একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে হইবে? নিয়ম মানিয়া চলিলে কি আর মৌলিকতার পরিচয় দেওয়া যায় না? এমনি করিয়া রেষারেষি বাড়িয়া চলিল,—দুই পক্ষই শোভনতার সীমা অতিক্রম করিলেন;—এমন-কি অসংবৃত ভাষায় একাডেমিওয়ালারা রোমান্টিকদের আঘাত করিলেন।

রোমান্টিক-বিরোধীদের যে মুখপত্র,—তাহার নাম ছিল Le Constitutionnel। সেই পত্রে প্রশ্ন উঠিল—আচ্ছা, আজকালকার নাটক-রচয়িতাদের মধ্যে এমন কি কেহ নাই,—এমন একজন মলেয়ার,—যিনি একটি পঞ্চাঙ্ক প্রহসনে রোমান্টিকদের পরিহাস করিয়া বেশ লোক হাসাইতে পারেন? একজন উত্তর দিল,—না, রোমান্টিজম্ ত পরিহাসের বিষয় নয়,—রোমান্টিজম্ একটা রোগ,—এক রকমের উন্মত্ততা। উহার চিকিৎসা প্রয়োজন, ইত্যাদি। এই সব বাতুলতার উত্তরেই ভিক্টর হিউগো প্রকাশ করিলেন,—তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণা-পত্র—ক্রম্ওয়েল নাটকের ভূমিকার ভিতর দিয়া। অপরিসীম সাহসের সহিতই তিনি ঘোষণা করিলেন,—'লেখার একমাত্র নিয়ম,—সে ত লেখকেরই কল্পনা বা খেয়াল, লেখকের একমাত্র কাজ,—অন্তঃকরণের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান। সমস্ত জিনিসই আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টি-কেন্দ্র হইতে দেখিবার অধিকার লেখকের আছে। এমন কি ইচ্ছা করিলে তিনি যাহা মহান্, যাহা গরীয়ান্,—তাহার সঙ্গেও যাহা হাস্যাস্পদ, যাহা কিম্ভূতকিমাকার তাহার সংযোজনা করিতে পারেন।' ইত্যাদি।

এই সংগ্রাম একটা তুমুল আকার ধারণ করিল,—নাট্যমঞ্চে। কারণ বিশেষ করিয়া নাট্যমঞ্চেই এই নূতন ধরণের লেখার প্রয়োজন সকলের প্রাণে প্রাণে জাগিয়া উঠিল। বিখ্যাত অভিনেতা টাল্‌মা একবার বলিয়াছিলেন যে,—'যে-চরিত্র অভিনয় করিতে হইবে,—তাহার মধ্যেই ত অভিনেতার সমস্ত কৃতিত্ব;—দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত আমি এমন কোনো চরিত্র পাইলাম না, যাহা অভিনয়ের যথার্থ উপযুক্ত। যে সকল নাটক বিয়োগান্ত—তাহা সুন্দর, উদার, মহান্, এ কথা স্বীকার করি,—কিন্তু ঠিক এতখানি মহিমার সঙ্গে থাকা চাই আরো বেশী সত্য, আমি অভিনয় করিতে চাই এমন চরিত্র, যাহার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে যতখানি, ঠিক ততখানি আছে প্রাণের আন্দোলন,—আমি চাই এমন একজন রাজা, যিনি রাজা হইয়াও মানুষ। অর্থাৎ আমি যাহা চাই,—এক কথায় তাহার নাম সত্য।' এই নূতন প্রয়োজনে ভিক্টর হিউগো, আল্‌ফ্রেড দ' ভিঞ্যেনি, আলেক্‌জান্দার ডুমা প্রভৃতি অনেক নাটক-রচয়িতাই সাড়া দিলেন। নাট্যমঞ্চে তুমুল কলহ আরম্ভ হইল। শেষ পর্য্যন্ত একাডেমিওয়ালারা রাজার নিকট আবেদন করিলেন যে, এই বিদ্রোহী নাট্যমঞ্চের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

থিয়েটারের দুয়ার অবশ্য বন্ধ হইল না,—কিন্তু সহসা ক্লাসিক আদর্শের একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার ঢেউ উঠিল। ফ্রাঁসোয়া পঁসার নামক এক তরুণ লেখকের একখানি নাটক,—ক্লাসিক আদর্শে পরিষ্কার শাদাশিদে ধরণে লেখা নাটকখানি, এমন একটা অভ্যর্থনা পাইল, যে ভিক্টর হিউগো তাঁহার জয়যাত্রায় প্রথম বাধা পাইলেন। এই ফ্রাঁসোয়া

পসার অবশ্য এমন কিছু শক্তিশালী লেখক ছিলেন না,—যে একটা দল গঠন করিয়া তুলিবেন, কিন্তু তাঁহার এই নাটকখানি রোমান্টিক আন্দোলনে যে প্রথম বাধা উপস্থিত করিল, সৌভাগ্যবশতঃ সেই বাধার জেরটুকু রহিয়া গেল; রোমান্টিক স্রোতের জোয়ার ধীরে ধীরে থামিয়া গিয়া ভাটা পড়িতে আরম্ভ করিল।

ইহার কারণ,—রোমান্টিক্ সাহিত্যে ছিল যে একটা ব্যক্তিতন্ত্রতা, স্বাধীনতা ও ভাব-দ্যোতনার সুর, অনেকেই নবীন উৎসাহে ও বিপুল উত্তেজনায়,—এবং সর্ব্বোপরি একাডেমিয়ালাদের কঠিন আঘাতের একটা প্রতিঘাতের বাসনায় তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন। ভিক্টর হিউগোর কয়েকটি কথার মধ্যে সাহিত্যে এই ব্যক্তিতন্ত্রতার একটা চরম প্রকাশ ও সমর্থন আমরা দেখিতে পাই; তিনি বলেন,—"আমাদের মধ্যে কাহারো এমন সৌভাগ্য নাই যে বলিতে পারেন,—তাঁহার জীবনখানি শুধু তাঁহারই। আমার যে প্রাণ তাহা তোমার,—তোমার যে প্রাণ তাহা আমার; যে প্রাণ আমি ধারণ করি,—তুমিও ধারণ কর ঠিক সেই প্রাণখানি; নিয়তি যে এক, অদ্বিতীয়। অতএব গ্রহণ কর আমার এই আয়না-খানি (les Contemplations-এর কবিতা-রাজি),—ইহারই মধ্যে আপনাকে দেখ। অনেকে অভিযোগ করে যে, আজকালকার লেখকেরা কেবলই 'আমি', 'আমি' করে। এই সব লেখকদের তাহারা বলে—'বল, আমাদের,—আমাদের সকলেরই কথা।' হায় রে,—যখন আমি তোমাদের বলি আমার কথা, তখন আমি তোমাদের যা' বলি,—সে ত তোমাদেরই কথা। কেমন ক'রে এইটুকু তোমরা অনুভব কর না? হায় উন্মাদ! তুমি মনে কর,—যে আমি আর তুমি বুঝি ভিন্ন লোক!" *

এই যে ব্যক্তিতন্ত্রতা,—ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ভিক্টর হিউগো যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একই অনাদি অনন্ত প্রাণ যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের দেহে দেহে প্রবাহিত হইতেছে; সৃষ্টির অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যেও আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের চিত্তে চিত্তে দীপ্ত হইতে দীপ্ততর হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে সেই একই জ্ঞানের আলো; মানুষের দেহযন্ত্রটাকে বিতাড়িত করিয়া মারিতেছে,—নানাবিধ বিচিত্র বাসনার সেই একই বিক্ষোভ; মানুষের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতেছে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সেই একই আনন্দ। তাই কবি যাহা বলেন,—তাহা শুধু যে তাঁহার একারই প্রাণের কথা তাহা নয়,—তাহা সকলেরই প্রাণের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথাও ত বলা যায় না যে, এই অন্তহীন বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে রহিয়াছে যে বিশ্বব্যাপী অখণ্ডতা,—তাহার মধ্যে কোথাও একটু বিশেষত্বের স্থান নাই। বিশেষত্ব আছেই,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং অখণ্ডতায় প্রকৃত মূল্য ও সার্থকতা তাহার বিভিন্ন অংশের এই বিশেষত্বেরই মধ্যে। সুলেখকের লেখায় তাঁহার বিশেষত্বটুকু ফুটিয়া উঠিবেই; না উঠিলে সেটি তাঁহার লেখার দোষ,—কেন-না পাঠকের নিকট তাঁহার এই বিশেষত্বের একটা আবেদন আছে; পাঠক তাহার মূল্য দিতেও রাজি। কিন্তু যখন লেখকের এই বিশেষত্ব তাহার আবেদনটুকুর সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখনই পাঠকের যে বিশেষত্ব তাহার সহিত সংঘর্ষ বাধে, তখনই পাঠক পিছাইয়া যায়;—চোখ রাঙাইয়া বলে,—তোমার আব্দার ত কম নয়,—আমাকে কেবল তোমার কথাই শুনিয়া যাইতে হইবে? আমার কি কোনো কাজ নাই? তুমি কি একাই পৃথিবীতে ভালবাসিয়াছ, হাসিয়াছ, কাঁদিয়াছ? আমারও হাসি-কান্না-ভালবাসা আছে।'

ফরাসী রোমান্টিজ্‌মের ব্যক্তিতন্ত্রতার বিরুদ্ধে এই ধরণের একটা প্রতিক্রিয়া উঠিতেছিল,—এমন সময় বিজ্ঞান উড়াইল তাহার জয়-ধ্বজা। চক্ষের নিমেষে বিজ্ঞান মানুষের জীবন-যাত্রার প্রণালী ও ধারণা সমস্ত ওলট্ পালট্ করিয়া দিল; প্রাণে জাগাইয়া দিল—একটা নূতন আশা। কানে কানে

---

* Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah! insensé, qui crois que je ne suis pas toi!"

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র.

বলিল—একটা নূতন বাণী। এই বাণী মানুষের অন্তরে উদ্দীপিত করিল যেন একটা ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা ;—জীবনের সমস্ত সমস্যায় মানুষ মুখ তুলিয়া চাহিল বিজ্ঞানের দিকে। বার্থ্‌লো ঘোষণা করিলেন,—'বিজ্ঞান মানুষকে যে মন্ত্র দিতেছে,—সেই মন্ত্রের মধ্যেই আছে মানুষের দেহ-মনের মুক্তি। বিজ্ঞান মানুষের নিকট শীঘ্রই আনিয়া দিবে সেই কল্যাণের যুগ,—যখন কর্ম্মের মধ্যে বিশ্বমানব একতা-সূত্রে ভ্রাতৃ-বন্ধনে মিলিত হইবে। অতএব এখন হইতেই যাহা কিছু বিশ্বের নিয়মে বিধৃত নয়, সমস্তই বাদ দিতে হইবে,—জগতে মানুষের ব্যক্তিগত বাসনার কোনো স্থান নাই।'

দেখিতে দেখিতে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, প্রাণের উচ্ছ্বাসের ছড়াছড়ির দিন ফুরাইয়া আসিল, কাব্যে ব্যক্তিতন্ত্রতার সুর থামিয়া গেল। হৃদয়-বৃত্তিকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া আবার আপনার আসনখানি দখল করিয়া বসিল মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি। এক কথায় বিজ্ঞান-তন্ত্রতার আবির্ভাবে মানুষের আবেগ ও কল্পনায় অনুপ্রাণিত রোমান্টিজ্‌মের অবসান হইল।

কিন্তু মানুষের নিভৃত অন্তঃকরণের মধ্যে আবহমান কাল ধরিয়া নিহিত রহিয়াছে যে গভীর সত্য,—তাহারই স্বর্ণরথে চড়িয়া আসিয়াছিল এই রোমান্টিজ্‌ম; ইহা কখনই একেবারে মুছিয়া যাইতে পারে না। বিজ্ঞান যে নূতন মন্ত্র আনিল, তাহারও গোপন অনুপ্রেরণা নিহিত ছিল এই রোমান্টিজ্‌মের মধ্যে। মধ্য-যুগের গ্রীক-লাতিন সভ্যতার মাঝখানে রোমান প্রতিভা ছড়াইয়া দিয়াছিল যে আলোক রশ্মি,—সেই আলোকেরই নাম দেওয়া হইয়াছিল রোমান্টিজ্‌ম। সেই রোমান্টিজ্‌মের উপর আবার যখন উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলো আসিয়া পড়িল,—তখন স্বভাবতঃই মানুষের জাগরণ হইয়া উঠিল আরও সুস্পষ্ট, তাহার অনুভূতি হইল আরও তীক্ষ্ণ, সত্যের সহিত তাহার সংস্পর্শ হইল আরও নিবিড়। এই স্পষ্টতর জাগরণে, সত্যের সহিত এই নিবিড়-তর সংস্পর্শে, রোমান্টিজ্‌মের মধ্যে যেটুকু ছিল খাদ,—সেইটুকু খসিয়া গেল,—যেটুকু ছিল খাঁটি, সেইটুকু একটা গভীরতর উপলব্ধির ভিতর দিয়া এমন একটা নবীনতর আর্টের সৃষ্টি করিল, যাহা স্বচ্ছ সরলতায় ও সহজ স্বাভাবিকতায় আরও বেশী হৃদয়গ্রাহী। তাই এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে রোমান্টিজ্‌ম্ কথাটির একটা বাংলা প্রতিশব্দ অনুসন্ধান করা বৃথা, করিতে গেলে হয়ত রোমান্টিজ্‌মের একটি বিশেষ রূপ আমরা পাইব, সমস্তটির সন্ধান মিলিবে না।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ-ভাষা প্রচলন

শ্রীনির্ম্মলাবালা দেবী

অতি প্রকাণ্ড আমাদের এই দেশ। বিস্তারে ইহা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পনের গুণ। পুরাতন জার্ম্মান সাম্রাজ্যের সাত গুণ, জাপান সাম্রাজ্যের এগার গুণ, এবং সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের পঁইত্রিশ ভাগের এক ভাগ। জগতের মোট লোক সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসী।

স্বভাবত এই বিপুল জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সংখ্যাও অনেক—দুই শতেরও কিছু উপর হইবে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একান্তই নগণ্য এবং খুব অল্প লোকেই তাহাদের ব্যবহার করে; কিন্তু কয়েকটি ভাষা আবার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও ব্যবহারকারিদের সংখ্যা হিসাবে পৃথিবীর প্রধানতম ভাষাগুলির সমকক্ষ।

ধর্ম্ম, সমাজ, প্রকৃতি প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ যত পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের সকলের চেয়ে দুরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে, এই ভাষার ভিন্নতার দ্বারা। সাগর পাড়ি দিয়া, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দূরদূরান্ত অতিক্রম করিয়া লোক দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে পারে, কিন্তু নানা ভিন্নভাষী জাতির ভাষা শিখিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতির সহিত পরিচিত হওয়া, তাহাদের চিন্তা ও বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যের সহিত সংযোগ স্থাপন করা কোনও মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ভাষার সাহায্যেই জগৎবাসীদের ভিতর সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্ম ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যাপার সমূহে সংযোগসূত্র রক্ষিত হয়।

সাধারণত দেখা যায় এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, অনেক স্থলেই তাহারা জাতিতে এবং ধর্ম্মে এক, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই এরূপ ক্ষেত্রে এক ভাষার অধিকার। পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির ভিতর যদি একাধিক ভাষার প্রচলন থাকিত তবে হয়ত এত শক্তিশালী হইয়া ওঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। কারণ, শক্তির মূল কথা সংহতি, ভাষায় এক না হইলে তাহার ভিত্তি কখনও সুদৃঢ় ও অকৃত্রিম হয় না।

কিন্তু, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভগবানের বিধান অন্যরূপ। ইহার ভৌগলিক সংস্থান এবং সভ্যতা ও ইতিহাসের ধারায় সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড ঐক্য রহিয়াছে। সেখানে পৃথক ও খণ্ডিত হইবার উপায় নাই, হইলে যাহা ফল হয় বিগত নয় শত বৎসরের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অথচ, নানা ভাষা ইহাকে বহুধা খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ইহার বিচ্ছিন্নাংশগুলির মধ্যে যোগাযোগ এবং একত্ববোধকে অনেকাংশে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে ইংরেজের অধীনে সমগ্র দেশ একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দেশের সকল অংশের অধিবাসীকেই দায়ে পড়িয়া ইংরাজী শিখিতে হয়। কাজেই সকল প্রদেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কিছু কিছু চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান হইতেছে। এবং সুপ্ত একত্ববোধ কিয়ৎপরিমাণে জাগ্রত হইয়া নিখিল ভারতীয় নানা প্রতিষ্ঠানে ও সভাসমিতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আমাদের ভাষাসমূহের সহিত সম্পর্ক-মাত্র-শূন্য ইংরেজীর মত বিদেশী ভাষা শিখিয়া দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের লোকদের পক্ষে পরস্পরের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া আমরা যখন স্বরাজের স্বপ্ন দেখিতেছি, স্বরাট ভারতের কল্পনা করিতেছি, তখন দেশের অধিকতম লোকের পক্ষে দেশীয় যে ভাষা লেখা সহজ এবং সুবিধা তাহাই সাধারণ ভাষা বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়া কাজ আরম্ভ করা ভাল বলিয়া মনে হয়। নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যাদি এখন হইতেই সেই ভাষায় চালাইবার চেষ্টা করা উচিত এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেই ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, প্রাদেশিক কার্য্য প্রাদেশিক ভাষায় চালাইয়া ভারতশাসনব্যাপারে সেই ভাষাকেই সরকারী

শ্রীনির্ম্মলাবালা দেবী

ভাষা হিসাবে চালাইবার ব্যবস্থা করা ভারত সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। বিলাতের ও বাহিরের সহিত সম্পর্ক রাখিবার জন্য সে সকল স্থলে ইংরাজী অপরিহার্য্য, শুধু সেই সকল স্থলে লোক নিয়োগের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেই চলিতে পারে। আমাদের দেশ প্রধানত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দ্বারা শাসিত হয় বলিয়া ইহাতে শাসনকার্য্যের কিছু কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব কিন্তু ভারত সরকারের সংশ্রবে যাঁহারা যাঁহারা থাকিবেন তাহাদের পক্ষে ভারতের সাধারণ ভাষা এবং যাঁহারা যে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে চাকুরী করিবেন তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রদেশের ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি চাকুরী লাভের অন্যতম যোগ্যতার নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইলে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের অসুবিধার পরিবর্ত্তে সমগ্র জাতি এই মানসিক পেষণের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পায়।

অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা সাধারণভাবে দেশ হইতে তুলিয়া দিবার কথা আমি বলিতেছি না। জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য ইংরাজী আমাদের শিখিতেই হইবে। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র-সেবা প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা পারদর্শী হইবেন, ইংরাজী শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত তাঁহাদের জন্য অবশ্যই রাখিতে হইবে। আর শুধু ইংরাজী নয়, বিজ্ঞানের নানা বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য ইউরোপের আরও দুই একটি ভাষা শিখিবার প্রয়োজন হইবে। আমার কথা হইতেছে সাধারণ লোকের পক্ষে ইংরাজীর অবশ্য-শিক্ষণীয়তার বিরুদ্ধে।

এখন দেখিতে হইবে ভারতীয় ভাষাগুলির ভিতর সাধারণ ভাষা হইবার দাবী কাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য আমাদের সাধারণ ভাষা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে দেশের নেতা বা জনসাধারণের ভিতর বিশেষ মতভেদ নাই। স্বরাজ লাভের যাত্রাপথে যখন আমরা নানাদিকে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম তখন আমাদের জনমতের পরিচালকবর্গের দৃষ্টি যে এদিকে পতিত না হইয়াছিল এমন নয়। হিন্দুরা একবাক্যে হিন্দীকেই এই গৌরব লাভের উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন আর মুসলমানেরা অঙ্গুলি তুলিয়াছিলেন উর্দ্দুর দিকে।

প্রথমে উর্দ্দুর কথা দেখা যাক্। মুসলমান সমাজের সংহতির গুণেই হউক বা দেশের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত মুসলমানদিগের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যবন্ধনের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য প্রায় প্রতি মুসলমানের মধ্যেই যে একটা আগ্রহ দেখা যায় তাহার জন্যই হউক, অথবা ভারতে মুসলমান সভ্যতা ও শাস্ত্রের বাহন বলিয়াই হউক, ভারতের সর্ব্বস্থানের মুসলমানদের মধ্যেই যে উর্দ্দুপ্রীতি আছে এবং ইহা শিখিবার জন্যও যে প্রবল চেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিচয় নানা ব্যাপারেই পাওয়া যায়। তাই হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাংলা হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন বাংলা করিবার কথা উঠিতেই মুসলমানদের মধ্য হইতে আপত্তির সুর শোনা গিয়াছিল। মুসলমানদের এই উর্দ্দু প্রীতির পরিমাণ বাংলা দেশে এতই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে এখানে বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য মক্তাব খুলিতে হইয়াছে— যদিও সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানুষের শিক্ষা তাহার মাতৃভাষাতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট উর্দ্দু শুধু ভারতের বা ভারতবাসী মুসলমানের সাধারণ ভাষা বলিয়াই আদর লাভ করে নাই—সে যে উর্দ্দুকে তার মাতৃভাষার স্থান দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে। এই প্রসঙ্গে ১৩৩৩ সালের বৈশাখের "প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলা দেশের কয়েকজন মুসলমান, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভাইএর প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলা দেশের শতকরা ৯৯এর অধিক সংখ্যা মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠাসা করিয়া তাদের উপর যদি উর্দ্দু চাপান হয়, তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দিবার মত হইবে না কি? চীন দেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে এ পর্য্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীন ভাষা ত্যাগ না করিলে মুসলমানীর খর্ব্বতা ঘটিবে। সাহিত্যে বাংলা দেশে যে একটি মিলন-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে...

সেখানেও হিন্দু মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন।" শুধু বাংলা দেশে নহে, যেখানেই মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দ্দু ব্যতীত অন্য কিছু, সেখানেই ভাষা লইয়া এইরূপ অসুবিধার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফল অবশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, মাতৃভাষায় পরিবর্ত্তন দু'চার জন লোকের পক্ষে অসুবিধার না হইলেও একটা জাতির পক্ষে এরূপ প্রয়াস শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ অসঙ্গত জেদ শুধু তাহাকে বাধাপ্রদানই করিবে। কিন্তু ভারতবাসী সকল মুসলমানের মাতৃভাষার আসন অধিকার করিবার অত্যন্ত ক্ষীণ সম্ভাবনাও যদিও উর্দ্দুর নাই, তথাপি মুসলমানদিগের এইরূপ মনোভাব তাঁহাদের নিজসম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাকে সাধারণ ভাষা হিসাবে গড়িয়া উঠিতে কার্য্যত সাহায্য করিতেছে। এক একটি সম্প্রদায়ের এক একটি সাধারণ ভাষা এবং সমগ্র জাতির জন্য অন্য একটি সাধারণ ভাষা—এরূপ করিতে গেলে সাধারণ ভাষাগুলি অসাধারণ হইয়া পড়ে। উর্দ্দু যদি মুসলমানদিগের সাধারণ ভাষা হয় এবং সমগ্র জাতির জন্য আর একটি ভাষা নির্দ্দিষ্ট হয় তবে উর্দ্দু যাঁহাদের মাতৃভাষা নয় এরূপ মুসলমানদের রাজসরকারে চাকুরী করিবার জন্য বহিঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যাদি চালাইবার জন্য এবং শিক্ষিত ও ভদ্র আখ্যা লাভ করিবার জন্য তিনটি পৃথক ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে তাহা যে কতজন লোকের পক্ষে সম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এখন, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীই উর্দ্দুকে সাধারণ ভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন কিনা তাহাই দেখিতে হইবে।

দিল্লী মিরাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে হিন্দুস্থানী বলা হয়। ইহা পশ্চিমী হিন্দীর একটি প্রধান বিভাষা। মোগলদিগের সময়েই ইহার সমধিক উন্নতি ও প্রসার হয় এবং লিখিবার জন্য পার্সী অক্ষর ব্যবহৃত হইতে থাকে। ক্রমে বহু আরবী ও পার্সী শব্দ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে এই সব শব্দের মাত্রা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে শিক্ষিত মুসলমান বা মুসলমানী প্রথায় শিক্ষিত হিন্দু ব্যতীত কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। দক্ষিণাত্যের মুসলমানদিগের মধ্যেও এ ভাষার প্রচলন কিছু কিছু থাকিলেও এবং দিল্লী লক্ষ্ণৌ ইহার প্রধান স্থান হইলেও মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে হিন্দীভাষী প্রদেশগুলির মুসলমানদের মধ্যেই উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত। কিন্তু ঠিক এই সব প্রদেশগুলি-তেই হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। কাজেই সমগ্র ভারতের ও অন্যান্য ভাষার কথা বাদ দিয়া নিজের জন্মভূমিতেই প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট উর্দ্দুকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার যোগ্যতা উর্দ্দুর নাই—আর তাহা যদি না থাকে তবে এদিকে এতখানি শক্তি ও উৎসাহব্যয় মুসলমানের পক্ষে বিজ্ঞতা ও মিতব্যয়িতার পরিচয় হইবে না। তবুও যদি তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য ইহাকেই প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন তবে এজন্য সমগ্র ভারতবাসীর কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যগ্রহণ বা দাবী করা তাঁহাদের উচিত নয়।

এইবার হিন্দীর কথা দেখা যাক। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সমস্ত নেতাগণ এবং এমন কি অত্যন্ত সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস এবং নির্দ্দেশ যে হিন্দীরই ভারতের সাধারণ ভাষা হওয়া উচিত। কংগ্রেসের সহিত আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে একটা করিয়া নিখিল ভারতীয় হিন্দী সম্মিলন হইতেছে। হিন্দীর প্রতি লোকের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ, সরকারী বিবরণে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতে হিন্দীভাষীর সংখ্যা প্রায় ১০ দশ কোটি (৯, ৮১, ১৫, ০০০)। এ হিসাবমতে ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই ভাষায় কথা বলে। সরকারী হিসাব অনুসারে হিন্দীভাষীর নীচেই বাংলাভাষীদের স্থান। যত লোকে বংলা ব্যবহার করে হিন্দী ব্যবহার করে তাহার দ্বিগুণসংখ্যা লোক। কাজেই হিন্দীকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু, এই যে প্রায় দশ কোটি লোকের মাতৃভাষা হিন্দী বলিয়া ধরা হয়, ইহাদের মধ্যে নানা উপভাষা এবং হিন্দী অপেক্ষা অন্য ভাষার সহিত সাদৃশ্য অধিক এমন ভাষাও প্রচলিত আছে।

শ্রীনির্ম্মলাবালা দেবী

দিল্লীপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার পর্য্যন্ত ভূভাগকে মোটামুটি হিন্দীপ্রদেশ বলিয়া ধরা হয় এবং বিহারী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদিগকেও হিন্দীভাষী বলিয়া গণ্য করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই বিহারী হিন্দী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা। ইহাকে হিন্দীর একটী বিভাষা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। এই বিহারী ভাষাই আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত। ইহারা মগধি, মৈথিলি এবং ভোজপুরী নামে পরিচিত। ইহা এত নগণ্য ও তুচ্ছ নয় যে পরের নামে ইহাদের আত্মপরিচয় দিতে হইবে। সাড়ে তিন কোটির উপর লোকে এই ভাষায় কথা বলে। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের উত্তরাংশে, যুক্ত প্রদেশের পূর্ব্বাংশে এবং ছোটনাগপুরে ইহা প্রচলিত। এইখানে সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল এবং বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিহারীর তিনটি শাখা আছে। ত্রিহুতের উত্তরাংশে মৈথিলি, দক্ষিণ বিহারে মগধি, এবং যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বে ও বিহারের পশ্চিমে ভোজপুরী প্রচলিত।

রাজপুত-আক্রমণের পূর্ব্বে নেপালেও মৈথিলি ব্যবহৃত হইত। ইহার ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু ইহাতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে। বাংলার প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতির পদাবলী মৈথিলিতে লিখিত।

ইহার দ্বিতীয় শাখা মগধিতে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। যাহারা ইহা ব্যবহার করে তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত বলিয়া ইহাতে কোন ভাল সাহিত্যও সৃষ্ট হয় নাই। পূরবী মগধি বাংলা অক্ষরে লেখা হয়।

তৃতীয় ভোজপুরী। ইহা ছোটনাগপুরেও চলিত আছে। ইহার ব্যাকরণের নিয়মাদি অত্যন্ত সহজ বলিয়া বিদেশীর পক্ষে ইহা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহাই বিহারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আসামীকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া ধরা হয়। অথচ, যে ভাষা এত লোকে ব্যবহার করে, যাহার বিভিন্ন অংশগুলির ভিতর এত পার্থক্য বিদ্যমান তাহাকে অন্যের অঞ্চলসংলগ্ন করিয়া রাখিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। তবে ইহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া না ধরিয়া যদি অন্য ভাষার অন্তর্গত করিতেই হয় তবে হিন্দী অপেক্ষা বাঙলার সহিতই সংযুক্ত করা অধিক যুক্তিসঙ্গত হইবে। বাংলার সহিতই যে ইহার সাদৃশ্য অধিক সে সম্বন্ধে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"বিহারের কথিত ভাষার সহিত হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সাদৃশ্য বেশী। কিন্তু বিহারের লোকেরা হিন্দীকে নিজেদের কেতাবী বা সাধু ভাষা করিয়াছেন; আদালতের ভাষাও হিন্দী। বিহারে হিন্দী ব্যবহৃত না হইয়া বাংলা ব্যবহৃত হইতে পারিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক কোন কোন কারণে তাহা হয় নাই।" (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৪)

এখন হিন্দীভাষা হইতে বিহারীকে বাদ দিলে হিন্দী-ভাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র সাড়ে ছয় কোটি।

এই হিন্দীকেও আবার এক বলিয়া ধরা যায় না। গঙ্গা যমুনা দোয়াব ও ইহার কতক উত্তরে যে ভাষা প্রচলিত তাহাকে পশ্চিমী হিন্দী নামে অভিহিত করা হয়। দিল্লী মিরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার যে বিভাষা কথিত হয় তাহাকে হিন্দুস্থানী বলে। ইহারই একাংশ উর্দ্দু। বঙ্গরূ, ব্রজভাষা, কনৌজী ও বুন্দেলী ইহার অপর বিভাষা। পাঞ্জাবের পূর্ব্বদক্ষিণ অংশের ভাষা বঙ্গরূ, মথুরা ও গঙ্গাযমুনারচিত দ্বীপের মধ্যভাগে ব্রজভাষা কথিত হইয়া থাকে। পশ্চিমী হিন্দীর বিভিন্ন শাখাগুলির ভিতর ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা শুনিতে অত্যন্ত মিষ্ট এবং ইহার সাহিত্যও খুব উৎকৃষ্ট। কিঞ্চিদধিক চারি কোটি লোক এই ভাষা ব্যবহার করে।

আর অযোধ্যা, বাঘেলখন্দ ও ছত্রিশগড়ে প্রচলিত হিন্দীকে পূর্ব্বী হিন্দী বলা হয়। দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকে এই ভাষায় কথা বলে এবং ইহাতে বেশ সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে। তুলসীদাসের গ্রন্থাবলী এই ভাষায় লিখিত।

এই পূর্ব্বী হিন্দীরও কথ্য ভাষা তিনটি। অযোধ্যার লোকে যে ভাষা বলে তাহাকে আউধি এবং বাঘেলখন্দের ভাষাকে ছত্রিশগড়ী বলে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে হিন্দী বলিতে যদি পশ্চিমী হিন্দীকে বুঝায় তবে কেবল চারি কোটি লোকে এই ভাষা ব্যবহার করে এবং পূর্ব্বী হিন্দী বুঝাইলে মাত্র আড়াই কোটি লোক। আর এই উভয়কে এক ভাষা বলিয়া একত্র ধরিলেও এই সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটির উপরে উঠে না। অবশ্য ইহাদের এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। পূর্ব্বী হিন্দীর পৃথক সমৃদ্ধ সাহিত্য ত আছেই, এমন কি পশ্চিমী হিন্দীর দুই প্রধান শাখা ব্রজভাষা ও বুন্দেলীরও পৃথক পৃথক ভাল সাহিত্য আছে।

ইহার মধ্যে আরও কথা আছে। হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া ধরা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান আছেন। হিন্দী-ভাষীর সংখ্যা হইতে তাঁহাদের বাদ দিতে হইবে। কারণ, ইঁহারা হিন্দীকে মানিয়া লইতে রাজী হইবেন না। না হইবারও সঙ্গত কারণ আছে। মুসলমান যখন এদেশে আসেন, তখন বিজেতারূপেই আসিয়াছিলেন, কাজেই বিজিতের ভাষা গ্রহণ করিবার মত উদার মনোবৃত্তি তাঁহাদের না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদেশী ভাষা লইয়া বিদেশ হইতে মুসলমানেরা আসিলেও এদেশে যখন তাঁহারা রাজ্য-জয় করিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের নিজেদের ও মাতৃভাষার মাতৃভূমির সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকে না। এবং এ দেশেরও বহুলোক তাঁহাদের দলে মিশিয়া মুসলমান হয়। ফলে, এদেশের ভাষার সহিত তাঁহাদের একটা আপোষ করিয়া লইতে হয়। এই আপোষ হইতেছে উর্দ্দু ভাষা। অবশ্য কোন সভাসমিতি বা লেখাপড়া করিয়া ইহা স্থির হয় নাই। এ আপোষ ঘটাইয়াছিলেন প্রকৃতি এবং তখনকার দিনের মিলন-ক্ষেত্র সমর-শিবিরেই ইহা ঘটিয়াছিল। উর্দ্দু কথার নামার্থও সেনানিবাস।

জন্মলাভের পর হইতেই এ ভাষা যথেষ্ট উচ্চাসন লাভ করিয়া আদৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাও প্রশংসনীয়।

মুসলমানেরা বরাবর এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, একমাত্র ইহারই চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। সে সময় মুসলমানেরা রাজার জাতি বলিয়া আভিজাত্যের আদর্শ হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য ও শিক্ষায় আভিজাত্য লাভ করিবার জন্য হিন্দুরাও ইহা শিক্ষা করিতেন। অন্যদিকে হিন্দীর সহিত বিশেষ কোন সংশ্রব মুসলমানের অতীতেও ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই।

একই দেশে হিন্দুরা হিন্দী ও মুসলমানেরা উর্দ্দু ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। উর্দ্দুর সহিত হিন্দীর সামান্য কিছু সম্পর্ক আছে, কিন্তু হিন্দীর সহিত মুসলমানের প্রায় কিছু নাই বলিলেই হয়। এই অবস্থায় যদি মুসলমানকে উর্দ্দু ছাড়িয়া হিন্দী গ্রহণ করিতে বলা হয়, তবে তাঁহাদের জাত্যাভিমান যে কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে এবং নিজের ভাষা উর্দ্দুকে চালাইবার জন্য যে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইবেন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠিক যাহা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুদিন হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, সেই ব্যাপারটি সম্বন্ধেই এক পক্ষকে অপর পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলিলে সে যদি তাহা না শুনিতে পারে ত তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। উর্দ্দুরও ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার পক্ষে যে সমস্ত বাধার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা বাদে শুধু মুসলমানের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে হিন্দুরও অনুরূপ আপত্তি হওয়া কতকটা স্বাভাবিক। হিন্দু দেখিতেছেন তিনি যেখানে হিন্দী ব্যবহার করেন সেখানে তাঁহারই পাশে মুসলমান ব্যবহার করেন উর্দ্দু। সেই উর্দ্দু যদি এই রাজসম্মান প্রাপ্ত হয়, তবে হিন্দীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও তিনি উপেক্ষিত মনে না করিয়া পারেন না।

এ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে এমন ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে যাহা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা এবং যাহা ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। একটু সঙ্কোচের সহিত এখানে বাংলার দাবী উপস্থিত করিতে চাই। সঙ্কোচ এই জন্য যে, যখনি ভারতের সাধারণ ভাষার প্রশ্ন উঠুক না কেন, বাঙালী অ-বাঙালী কাহারও বাংলার কথা স্মরণ হয় নাই। অথচ বাংলাই ভারতের একমাত্র ভাষা যাহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সম্পত্তি।

ভারতবর্ষে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমানের বাস। তাহার মধ্যে আড়াই কোটির উপর মুসলমানের মাতৃভাষা

শ্রীনির্ম্মলাবালা দেবী

বাংলা। প্রতি পাঁচজন ভারতবাসী মুসলমানের মধ্যে দুই জন বাংলা-ভাষী। কাজেই বাংলাকে যদি সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে তাহাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া মুসলমানেরা নিজেদের জন্য আর একটি ভাষা খাড়া করিতে পারিবেন না।

কথা উঠিতে পারে, মুসলমানেরা যদি বাংলাকে নিজস্ব বলিয়া মনে করিবেন, তবে বাংলা দেশেই মুসলমানদের মধ্যে বাংলা বর্জ্জন করিয়া উর্দ্দু গ্রহণ করিবার কথা শুনা যায় কেন। এ কথার উত্তরে এই বলা চলে যে মুসলমানেরা যখন দেখিলেন যে তাহাদের সহিত সম্পর্কমাত্রশূন্য হিন্দীকেই ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে তখন তাহারাও হিন্দুসম্পর্কশূন্য উর্দ্দু চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বাংলা দেশে উর্দ্দু চালানর কথা তাহারই ঢেউ বলিয়া মনে হয়। জাতীয় সম্মান যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে সম্মানরক্ষার জন্য লোকে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে। সমগ্র ভারতীয় মুসলমানের সম্মানরক্ষার জন্য এটাকে বাঙালী মুসলমানের আত্মত্যাগ বলা চলে। অবশ্য মুসলমান রাজত্বকালে উর্দ্দু রাজমর্য্যাদা পাইয়া আসিয়াছে বলিয়াও উর্দ্দুর পরে মুসলমানের একটা মোহ থাকিতেও পারে এবং তাহাও উর্দ্দুপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হওয়া সম্ভব।

সরকারী হিসাব অনুসারে বাংলা-ভাষীর সংখ্যা চার কোটি তিরানব্বই লক্ষ। বাংলার বাহিরেও কিছু লোকে বাংলা বলে। তাহাদের সকলের মাতৃভাষা বাংলা বলিয়া গণনা করা হয় নাই। ইহাদের ধরিলে এই সংখ্যা মোটামুটি ৫ পাঁচ কোটি হইবে। আসামী বাংলা-অক্ষরে লেখা হয় এবং বাংলার সহিত তাহার মিল এত বেশী যে তাহাকে বাংলার একটি বিভাষা বলিয়া ধরা যায়।

উর্দ্দুকে পৃথক ভাষা বলিয়া না ধরিলে হিন্দী ভাষার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়; অর্থাৎ বাংলা দ্বিতীয় স্থান পায়। আর হিন্দী হইতে উর্দ্দুকে বাদ দিলে নিঃসংশয়িতরূপে বাংলার স্থানই প্রথম হয়। সংখ্যা হিসাবে বাংলাকে দ্বিতীয় স্থান দিলেও ইহার পক্ষে আরও দু' একটি কথা বলা চলে। সাধারণ ভাষা বাছাই করিবার সময় যেমন দেখিতে হইবে যে কোন ভাষা অধিকতম লোকের মাতৃভাষা তেমনি আবার অন্য ভাষায় যাহারা কথা বলে তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে কোন ভাষা শিক্ষা করা সহজ তাহাও দেখিতে হইবে। হিন্দী যদি ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হয় তবে গুজরাটের, রাজস্থানের ও পাঞ্জাবের কিছু লোকের ইহা শিক্ষা করা সহজ হইবে। ইহাদের সংখ্যা আড়াই কোটি ধরা চলিতে পারে এবং তাহা হইলে নয় কোটী লোকের পক্ষে হিন্দী শিক্ষা সুবিধার হইবে। বিহারী আসামী এবং উড়িয়া যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদের সংখ্যা বাংলার সহিত যুক্ত হইলে দশ কোটি হইবে। এদিক দিয়া দেখিলেও বাংলার দাবীই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ হিন্দীর সহিত যে সমান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সাধারণ ভাষার আরও একটি দেখিবার জিনিস আছে। এই ভাষার যদি সাহিত্যিক সমৃদ্ধি থাকে, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি-বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি ইহাতে থাকে তবে যাঁহারা ইহা শিক্ষা করিবেন তাঁহারা অন্যদিকেও লাভবান হইবেন। ভারতবর্ষীয় সমস্ত ভাষার ভিতর বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয় এখানে অবিসম্বাদী।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও বাঙ্গালীর পক্ষে গভীর লজ্জার কথা এই যে, এ পর্য্যন্ত বাংলাকে ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার প্রস্তাব কখনও কোথায়ও হয় নাই। অ-বাঙালীর নিকট হইতে এ ন্যায় বিচার আশা করা যায় না। কিন্তু বাঙালীরাই যখন হিন্দীকে এই সম্মান দিবার প্রস্তাব করেন বা তাহার সমর্থন করেন তখন সন্তানের এই বিমাতৃ-ভক্তি দেখিয়া মাতৃভাষা লজ্জায় অধোবদন হ'ন।

কোন সভাসমিতিতে যদি দু' একজন অ-বাঙালী উপস্থিত থাকেন, তবে সেখানে হিন্দী চলিতে পারে কিন্তু বাংলা অচল হইয়া পড়ে। অন্য প্রদেশবাসীর নিকট হইতে অবশ্য বাংলা এ সম্মান পান না—ইহাতে আমাদের ক্ষোভ হয় না। নিখিল ভারতীয় দুই একটি প্রতিষ্ঠানেও হিন্দী চলে—যেমন হিন্দু মহাসভা। হিন্দুস্থানী দুই একজন নেতা বাংলাদেশে আসিয়া লোকের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বক্তৃতাদি হিন্দীতেই করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক

বাঙালী কংগ্রেস কর্ম্মীর পক্ষে হিন্দী পড়াটা একটা পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে দেখিয়াছি অথচ এই সব বাঙালীদের নিজেদের মাতৃভাষার কথা কাহারও স্মরণ নাই। আশা করি সকলে একথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

বৈকালী

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

রং লেগেছে আবার আমার
সাঁঝ-আকাশে হায়,
যে-ফুলবাস হারিয়ে গেছে
প্রভাত-বেলার বায়
সেই সুবাসের আভাস এসে
বেড়ায় আমার ঘ্রাণে ভেসে';
শুকন বোঁটায় ফুল ঝরে' যায়—
পরাণ কেঁদে' চায়!

হায় রে আমার সাঁঝের মায়া,
হায় রে স্মৃতি-বাসী,
দিন চলে' যায়—ওষ্ঠে মাখা
ব্যর্থ ব্যথার হাসি।
ফুরিয়ে গেছে মাল্য-গাঁথা,
জড়িয়ে আসে আঁখির পাতা;
ক্লান্ত পাখীর কণ্ঠে বাজে
বিসর্জ্জনের বাঁশী!

কাশ্মীর

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ। শস্য-শ্যামলা, স্নেহাঞ্চলা, সিন্ধু-সেবিতা অশেষসৌন্দর্য্যশালিনী ভারত-মাতার গঙ্গা ও সিন্ধু দুই বাহু; সুলেমানী ও হিমালয়ের কৃষ্ণ গিরিশ্রেণী কৃষ্ণ কুন্তলরাশির মত তাঁহার উভয় স্কন্ধ বাহিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দক্ষিণ কক্ষে পঞ্চনদের মঙ্গল-ঘট, বামে, অঞ্চলান্তরালে বঙ্গদেশের নয়নস্নিগ্ধকর হরিৎ ধান্যশীর্ষগুচ্ছে যেন সন্তানদের ক্ষুধার জন্য সুধা-সঞ্চয়; কটিতে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার মেখলা; স্বর্ণ-লঙ্কার স্বর্ণ-কমলে জননী আমাদের কমলার মত ন্যস্ত-চরণা! এই মাতৃমূর্ত্তির শীর্ষে কিরীট-রূপী কাশ্মীর!

এখানে আকাশে গ্রহ তারাগণ গান করে; বাতাসে হাসি-আনন্দ খেলিয়া বেড়ায়; এখানকার সূর্য্য, শৈত্য-স্নিগ্ধ কিরণ-মালায় প্রাণিগণের তৃপ্তি উৎপাদন করে, শ্যামল শষ্প, তরুলতা, পুষ্প এখানে তুহিনতলে বসন্ত-শোভা ঢাকিয়া চির-যৌবনে ধন্য হয়; এখানকার বসন্ত চিরবিরাজমান, দুই দিনের হাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতে জানে না। বসন্তে, তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গমধ্যে একটি সবুজ উপত্যকা, রজত-পাত্রস্থ একখণ্ড বৃহৎ মরকত-মণির ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। শরতে, হেমন্তে, পত্র-পুষ্পরাজি বর্ণ-সম্পদে নয়ন-রঞ্জন করে। আর সকল ঋতু ধরিয়া বিতস্তার শান্ত স্বচ্ছ সলিল, স্বীয় বক্ষে তটতরুরাজির কৃষ্ণছায়া ধারণ করিয়া, নিবিড় লতাগুল্মান্তরাল, অদ্ভুত দীর্ঘ দারু-গৃহশ্রেণী ও পর্ব্বত-মালার মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এখানে এমন ঋতু নাই, এমন স্থান নাই যখন অথবা যেখানে প্রকৃতি দেবী নব নব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছেন না। কাশ্মীরের শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া সকলেই নাকি অতিরঞ্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন কল্পনা বা কোন অতিরঞ্জনই কাশ্মীরের বাস্তব সুষমাকে বেশীমাত্রায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না।

ভৌগোলিক ঃ—পঞ্জাব প্রদেশের উত্তরে সমুদ্রবক্ষ হইতে প্রায় ৬০০ ফিট ঊর্দ্ধে, ক্রোড়স্থিত ইহা একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকা-ভূমি। উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে এই উপত্যকা প্রায় ১২০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৭৫ মাইল। কিন্তু পর্ব্বতগাত্র বাদ দিলে কেবল সমতল উপত্যকাখণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ৮৪ মাইল এবং প্রস্থে ২০ হইতে ২৪ মাইল। এই উপত্যকা চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত-বেষ্টিত, কেবল পশ্চিমে বিতস্তা যেখানে নির্গত হইয়া পঞ্জাবের সমতলভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেইখানেই একটা পথ খোলা আছে। এই বেষ্টনকারী তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গ-সমূহ অপূর্ব্ব শোভাময়;—তাহাদের কয়েকটির নাম বেশ প্রসিদ্ধ—নাঙ্গা পর্ব্বত, হরমুখ, অমরনাথ।

উত্তর সীমানার পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে দুইটি গিরি-বর্ত্ম আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে বার্জিল ও কামরী। শ্রীনগর ও ইস্কারডো নগরদ্বয়কে যে পথটি যুক্ত করিতেছে তাহা বার্জিল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে পঞ্জাল গিরিশ্রেণীর মধ্যে পাঞ্জাল গিরিবর্ত্ম ও রতনপীরের গিরিবর্ত্মের মধ্যে পথিকদের বিশ্রামশালা প্রসিদ্ধ বারামগলি'র দুর্গটি একটি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা ছাড়া আরো অনেক গিরিপথ বাহিয়া অনেকগুলি রাস্তা কাশ্মীরের বাহিরে, গুজরাট,

শিয়ালকোট, মজাফ্‌ফরবাদ, রওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতির দিকে চলিয়া গিয়াছে।*

কাশ্মীরের জলবায়ু মনোরম। পঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিম মৈসুমবায়ু হইতে কাশ্মীরের উপত্যকা সুরক্ষিত বলিয়া ভারতের সাময়িক বর্ষাধারা কাশ্মীরের পার্ব্বত্যভূমিকে সিক্ত করে না। কাশ্মীরের বারিপাত হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে তুষারপাত হইয়া থাকে। কিন্তু উপত্যকার মধ্যে প্রথম তুহিনপাত সাধারণত ডিসেম্বর মাসের শেষেই হয়। সে তুষারপাত কখনো অত্যধিক হয় না। মে হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ তাপ ৮৯° (ডিগ্রি) উঠিয়া থাকে। শৈত্যের পরিমাণ-নির্দ্দেশক কোন রূপ হিসাব নাই তবে কাশ্মীরের উপত্যকাভূমির শৈত্য
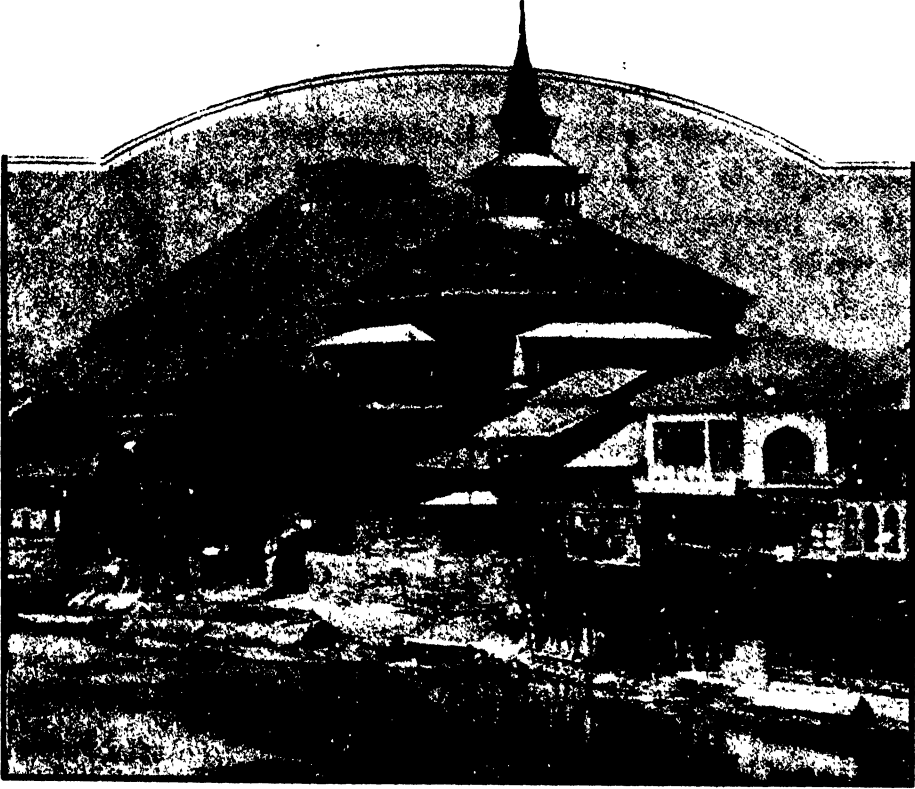
শ্রীনগরের মন্দির ও দুর্গ (পটভূমিতে, পর্ব্বতশিখরে)

অনিয়মিত; বসন্তেই বৃষ্টি বেশী হয়। কখনো কখনো পঞ্জাল গিরিশ্রেণীর শীর্ষ অতিক্রম করিয়া দুই এক ঝাপটা মৈসুমবায়ু কাশ্মীরের সমতলভূমিতে ঝড়-বৃষ্টি বহাইয়া দেয়। আবার কখনো কখনো দুই এক খণ্ড জলভরা মেঘ উপত্যকার উপর দিয়া ভাসিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকের উচ্চতর পর্ব্বতমালার সংস্পর্শে আসে ও বৃষ্টিরূপে গলিয়া পড়ে। কাশ্মীরের উপত্যকা-বেষ্টনকারী পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহে অক্টোবর কখনও খুব বেশী হয় না।

জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জ :—ধান্যের চাষের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে, নতুবা অন্যবিধ শস্যাদির জন্য প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতই যথেষ্ট। যব ও গম সাধারণত জুন জুলাই মাসে পাকিয়া উঠে। ধান্যরোপণের সময় মে অথবা জুন মাস ও অক্টোবর মাসে উহা কাটিবার উপযুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত ভুট্টা,

শ্রীরামেন্দু দত্ত

গাজর, মটর, সরিষা প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমতল উপত্যকায় কোনরূপ বন জঙ্গল নাই বলিলেই চলে। "চিনার" নামক এক প্রকার বৃক্ষ সযত্নে পালিত, বর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত হইয়া থাকে। উহা খুব বড় ও অতিশয় সুদৃশ্য হয়। উহা ব্যতীত আপেল, পিয়ার, আখরোট, তুঁত, চেরী, কুইন্স্‌ প্রভৃতি ফলের গাছ; পপ্‌লার, উইলো, সাইপ্রেস্‌ প্রভৃতি বিলাতী বৃক্ষসমূহ, ও পপ্‌লারের গাত্রবাহী প্রচুর আঙুর-লতার চাষ এখানে হইয়া থাকে। পর্ব্বত-গাত্রে দেওদার, পাইন, ঝাউ, হ্যাজেল, বার্চ্চ প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। ছোট ছোট সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রে শরৎকালে জাফরাণের ফিকে বেগুনী রংগুর ফুলগুলি কী সুন্দর দেখায়! পূর্ব্বকালে মোগল সম্রাটদিগকে কাশ্মীরের মহারাজা যে সমস্ত দ্রব্য কর দিতেন তন্মধ্যে এই জাফরাণ ছিল অন্যতম। কাশ্মীরে প্রকৃতিদেবীর দানের উপর মানব তাহার সামান্য ক্ষমতানুযায়ী একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে! তাহার কথা এইখানে উল্লেখ না করিলে কাশ্মীরের উদ্ভিজ্জ-সৌন্দর্য্য-সম্পদের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। উহা শ্রীনগরস্থ ডাল হ্রদের ভাসমান উদ্যানাবলী! জলের উপর নল বিস্তার করিয়া তদুপরি শৈবাল ও মৃত্তিকা দিয়া উদ্যান রচিত হইয়াছে। এই ডাল হ্রদে বহুবিধ জলজ উদ্ভিদ, পদ্ম প্রভৃতি দেখা যায়। কাশ্মীর সম্বন্ধে স্যার ওয়াল্টার লরেন্স যথার্থই বলিয়াছেন, 'জীবন যাহাতে সুখকর হয়, সে সব উপাদানই কাশ্মীরে সুলভ। ফলের প্রাচুর্য্য, ফুলের অন্ত নাই, জলের শোভা!'

প্রতিবৎসর শিকারের লোভে বহু শিকারী এখানে সমবেত হইয়া থাকেন; ফলে শিকার এখন আর অনায়াস-লভ্য নহে। দুর্গম গিরি-উপত্যকা, গহন পার্ব্বত্য কান্তার, সুদূর বনান্তরালে পশুকুল আত্মগোপন করিয়াছে। নানাবিধ হরিণ, বন্য-ছাগ, কস্তুরীমৃগ, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক, এবং চিতাবাঘই মৃগয়াকারীদের সন্ধানের বস্তু। কাশ্মীরের নানাস্থানে শৃগাল, খরগোস, বন-বিড়াল, পার্ব্বত্য-মূষিক, লাঙ্গুর, বানর, বন্য-কুক্কুট, পার্ব্বত্য পেচক, বন্য-হংস, ঈগল প্রভৃতি পাওয়া যায়।

স্থাপত্য :—স্থপতি-শিল্পে কাশ্মীরের আভিজাত্য গৌরব নিতান্ত কম নহে। অতি প্রাচীন হিন্দু-স্থাপত্যের নিদর্শন কাশ্মীরের বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে বর্ত্তমান। গ্রীক্‌ শিল্প ইহাদের কোনো কোনোটির মধ্যে স্বীয় ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার বহু পূর্ব্বে, এখন হইতে দুই হাজার দুই শত বৎসরেরও আগে, যে সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজ তাহাদের ধ্বংসস্তূপের কাছে দাঁড়াইলে বিস্ময়ে মন স্তম্ভিত হইয়া উঠে!

কাশ্মীরের একটি রম্য উৎস-শোভা

হিন্দু স্থাপত্যের সহিত গ্রীক স্থাপত্যের সংমিশ্রণ, কাশ্মীরের স্থাপত্যের বিশেষত্ব, শিল্প-চাতুর্য্য ও বিরাটত্বই এখানকার মন্দিরগুলিকে দর্শনীয় করিয়াছে। ইহাদের বর্ত্তমান ধ্বংসাবস্থার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ ভারতের বহু হিন্দু-কীর্ত্তিরই ধ্বংস-কারণ—মুসলমান আক্রমণকারীদের অত্যাচার। দ্বিতীয়, ভূমিকম্প; কাশ্মীরে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীনটির নাম শঙ্করাচার্য্যের মন্দির। ইহা শ্রীনগরের অন্তর্গত তক্ত্‌-ই-সুলেমান (মুসলমানদের সিংহাসন) নামধেয় একটি

পর্ব্বতাকার শিখরে অবস্থিত। ইহা অনুমিত খৃঃ পূঃ ২২০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহা অবশ্য বিজাতীয় ঐতিহাসিকের উক্তি। ইঁহারা বলেন যে অপর মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত। ত্রিফলা বর্শার মত থিলান, পিরামিডের মত খাড়া উঁচু ছাদ, কারুকার্য্য-বিশিষ্ট স্তম্ভ, কাশ্মীরের মন্দিরগুলিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দুমন্দির হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

ইসলামাবাদ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে, একটি উচ্চ অধিত্যকা ভূমির উপর মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দির। এখান হইতে ঝিলমের আঁকা বাঁকা স্রোত ও উপত্যকাভূমির সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে এইখানে বসিয়াই ঝিলমের দিকে চাহিয়া কি কবি লিখিয়াছেন,—

"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'লো,—যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এলো তার ভেসে-আসা তারা-ফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতট-তলে
দেওদার স্তব্ধ সারে সারে;
মনে হ'লো সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।"
—বলাকা

অন্যসব মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রীনগরের পনর মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবন্তীপুরের চারিটি মন্দিরের দুইটির ভগ্নাবশেষ দর্শনযোগ্য। তন্মধ্যে একটি গুহার অভ্যন্তরে নির্ম্মিত ও অপরটি, ছয়খানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তৈয়ারী। ইহা ব্যতীত শ্রীনগরের তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি মন্দির আছে, উহাকে একটি দ্বীপ বলিলেই ভাল হয়, কারণ উহার কুট্টিম সলিলগর্ভে নিমজ্জিত। বারামুলার নিকটবর্ত্তী উস্কারা গ্রামে একটি বৌদ্ধ স্তূপ আছে; কাশ্মীরের জনৈক তাতার রাজার (হুষ্ক) নামানুসারে স্থানটির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

শ্রীনগর :—কথিত আছে, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রবর সেন শ্রীনগর স্থাপন করেন। ইহা ভূস্বর্গের কেন্দ্রস্থলে ও বিতস্তার উভয় কূলে অবস্থিত। এই নগরটির নামকরণকে সার্থক করিবার জন্য মানুষ যতটা না সফল হইয়াছে, প্রকৃতি দেবী যে তদপেক্ষা অধিক যত্ন লইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ এখানকার ঘর বাড়ীগুলি সুবিন্যস্ত ভাবে নির্ম্মিত নহে। মানব-সমাগম হইতে বহুদূরে, প্রান্তরমধ্যে যেরূপ লতা-গুল্মের অযত্ন-বর্দ্ধিত ছোট ছোট ঝোঁপ-ঝাড় একত্র হইয়া স্থানটিকে আর যাহাই করুক উদ্যানে পরিণত করে না, তেমনই কাশ্মীরের কাষ্ঠনির্ম্মিত অথবা খোঁটার উপর তৈয়ারী-করা অদ্ভুত বাড়ীগুলি যে শ্রীনগরের শ্রী বর্দ্ধন করে নাই সে কথা তেমনই স্পষ্ট। ভিনিসের মত অথবা "বর্ষাপ্লাবিত কলিকাতার" (আশ্বিন সংখ্যার বিচিত্রা দ্রষ্টব্য) মত, শ্রীনগরেও কতকগুলি রাস্তা আছে যাহা অতিক্রম করিতে হইলে জল-যানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই নগরের মধ্যে, নদীর উপর সাতটি সেতু আছে; সেগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। প্রস্তর ও কাঠের গুঁড়ি দিয়া তৈয়ারী স্তম্ভের উপর কাঠের তক্তা পাতিয়া এগুলি সাধারণত তৈয়ার করা হয়। আমরা ইহার একটির ছবি দিলাম। (নদীর ঝিলমের) দক্ষিণ তীরে দুর্গমধ্যে শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদ। সহরের ভিতর অনেকগুলি হিন্দু মন্দির আছে, 'জামী' ও 'সাহা হামাদানের' মসজিদ দুইটিই এখানকার মসজিদগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শেষোক্তটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রস্তর ও কাষ্ঠে ইহার দেওয়াল নির্ম্মিত; ইহার ছাদ নীচু, ঢালু ও দারুময়; এবং চূড়াটিও কাঠের। ডাল হ্রদের তীরে মোগলদের সুপ্রাচীন প্রমোদোদ্যানগুলি আজিও বর্ত্তমান আছে।

বর্ত্তমান কাশ্মীরের অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান। ইহাদের শারীরিক গঠন ভাল হইলেও নগরবাসীরা প্রায়ই তাহাদের দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকর গৃহে অলস-জীবন-যাপন-হেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনগরের শালবয়নকারীদের সংখ্যা গণনা করায় তাহারা সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে সংখ্যায় শতকরা বাইশ জন হইয়াছিল। আজকাল হাতে অথবা তাঁতে তৈয়ারী

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কাশ্মীর-শালের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের সংখ্যাও বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। হাতের তৈয়ারী অথবা তাঁতের তৈয়ারী শাল আলোয়ান যে দুর্ম্মূল্য হইত তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু ফ্রান্স ও জার্ম্মানী হইতে যখন অবিকল কাশ্মীরী শালের নকল তৈয়ারী হইয়া অল্পমূল্যে বাজার ছাইয়া ফেলিল ও এই কলে-তৈয়ারী শালে ও তাঁতে তৈয়ারী জিনিষে যখন বিশেষ পার্থক্য ধরা শক্ত হইয়া উঠিল, তখন কাশ্মীরের শিল্পীদের যে দুর্দ্দশার দিন আসিল তাহা সহজেই

ঝিলম নদীর উভয় কূল-চুম্বী শ্রীনগর

অনুমান করা যায়। রেশম-শিল্পের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়া কাশ্মীরের মহারাজ তাঁহার প্রজাদের এই দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। রেশমের কাজ ও রেশম রং করা এখন বেশ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। ইস্‌লামাবাদেও বহু লোক শাল ও কম্বল-বয়নের কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। কাঠের উপর শিল্পকার্য্যের জন্য শ্রীনগর বিখ্যাত। তামার ও রূপার কাজেও এখানে অনেকে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কাশ্মীরে একপ্রকার সুন্দর কাগজও তৈয়ারী হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীনগরে কাশ্মীরজাত দ্রব্যাদির একটি যাদুগৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের পল্লীবাসীরা অস্বাস্থ্যকর নগর-সমূহের অধিবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ও কর্ম্মঠ। কাশ্মীরের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একপ্রকার ঢিলা-হাতা লম্বা গাউনের মত পোষাক পরিয়া থাকে, ইহাকে পিরাণ বলে; পিরাণ শব্দটি পার্শী "পৈরাহ্‌ আন্‌" (=পরিচ্ছদ) হইতে উদ্ভূত। এই ঢিলা পোষাকের নীচে তাহারা শীতকালে কাঠ-কয়লার আগুন-ভরা একটি পাত্র বহন করে; এই পাত্রটি নামাইয়া শীতের সন্ধ্যায় বন্ধুগণ একত্র হয় ও খোস্‌গল্প হাসি-তামাসা চলে। এই অগ্নি-পাত্রকে "হসন্তিকা" বলে। নৌকাচালক ও পল্লীবাসীরা আঁট-সাঁট পোষাক পরিয়া থাকে। যাহারা পর্ব্বত-সন্নিহিত স্থানে বাস করে তাহারা চলিবার সময় পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত পট্টি বাঁধিয়া থাকে। কাশ্মীরের আদিম ব্রাহ্মণেরা 'পণ্ডিত' নামধেয়। অত্রস্থ ব্রাহ্মণদের আচার অদ্ভুত। ইঁহারা মাংস

ভক্ষণ করেন, মুসলমানের হস্তে পানীয় জল গ্রহণ করেন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া আহারে বসেন, নৌকায় রন্ধন ও আহার করিয়া থাকেন।

কাশ্মীরের ভাষা আর্য্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত; হিন্দী, সিন্ধীয়, পাঞ্জাবী ও চলিত উর্দ্দু ভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পাঞ্জাবের দেবনাগরী অক্ষরের সহিত কাশ্মীরী ভাষার অক্ষরের মিল আছে। কাশ্মীর যদিচ বহু সাহিত্যিকের জন্মস্থান, তথাপি কাশ্মীরী ভাষার কোন নিজস্ব সাহিত্য নাই। বর্ত্তমান-কাশ্মীরে উর্দ্দু ভাষার বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় ও সেই সময় বহুলোক মারা যায় অথবা কাশ্মীর ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই দুর্ভিক্ষের সময় ইসলামাবাদ ও সোপুর নগরদ্বয়ের $\frac{2}{3}$ অংশ লোক কমিয়া যায়।

কাশ্মীরের মহারাজা নিজ ব্যয়ে শ্রীনগরের একটি সুবৃহৎ চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজ আগন্তুক সম্বন্ধে কাশ্মীরে একটু ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে। প্রতিবার ভারতের প্রধান সেনাপতি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক গোরা সৈন্যকে কাশ্মীরে আসিবার অনুমতি দিয়া থাকেন। আরব ঐতিহাসিক আল্ বিরুনী লিখিয়া গিয়াছেন যে আট শতাব্দী পূর্ব্বে বিদেশীদিগকে কাশ্মীরে আসিবার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইত না এবং ইহার গিরিসঙ্কট-সমূহে সতর্ক প্রহরীর বন্দোবস্ত ছিল। তাঁরই গ্রন্থে তিনি সংবাদ দিয়াছেন যে কাশ্মীরবাসীরা তৎকালে পাল্কীর মত একপ্রকার বাহনে

শ্রীনগরের গড় দুর্গ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

চড়িয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিত। সেই বাহন আজিও কাশ্মীরে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক ঃ—কাশ্মীরের ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচিত "রাজতরঙ্গিনী" নামক গ্রন্থে ছন্দোবদ্ধ হইয়া আছে। অধ্যাপক এইচ্, এইচ্, উইলসনের মতে ইহাই একমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ যাহাকে প্রকৃত 'ইতিহাস' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আকবর ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন কাশ্মীর আক্রমণ করেন তখন তাঁহাকে একখণ্ড রাজতরঙ্গিনী উপহার দেওয়া হয় ও সেই সময়ই মুসলমানেরা এই পুস্তকের অস্তিত্ব প্রথম জানিতে পারেন। আকবরের আদেশ-ক্রমে ইহা পারস্য ভাষায় অনূদিত হয় এবং আবুল ফজল কৃত "আইন্-ই-আক্‌বরী" গ্রন্থে ইহার একটি চুম্বক পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিনী চারিখানি ইতিহাসের সমষ্টি। অনুমিত দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার প্রথম খণ্ডটি পণ্ডিত 'কহ্লন্' রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থটি আবার ছয়খানি পুস্তকে বিভক্ত ও তিনি যে সকল পুরাতন পাণ্ডুলিপি ও পুঁথি-পুস্তকাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। কাশ্মীরের আদিমকালের ইতিহাস হইতে ইহাতে সংগ্রাম দেবের (১০০৬ খৃঃ অঃ) রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বিবৃত আছে এবং ঐ গ্রন্থকারেরই রচিত অন্য দুই পুস্তক হইতে সিংহদেবের (আবুল ফজলের গ্রন্থান্তর্গত চুম্বকে ইঁহার নাম 'জয় সিংহ' বলা হইয়াছে) রাজত্বকাল অবধি সময়ের (১১৫৬ খৃঃ অঃ) ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'রাজাবলী' ও ইহার রচয়িতা 'যোন রাজা'। এই খণ্ডে পণ্ডিত কহ্লনের বর্ণিত সময়ের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান-রাজত্বকালে জৈনুল আবাদ্দীনের (১৪১২ খৃঃ অঃ) সময় পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে। তাহার পর তৃতীয় খণ্ড ;—ইহার নাম "শ্রীজৈন রাজতরঙ্গিনী" ও ইহাতে গ্রন্থকার, পণ্ডিত শ্রীবর, ফতে সাহের রাজত্ব-গ্রহণ অবধি (১৪৭৭ খৃঃ অঃ) ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ড "রাজাবলী পাতক" প্রাজ্ঞ ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত। তিনি ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে, কাশ্মীর মোগলাধীন আসার সময় পর্য্যন্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের অপর কোন দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

রাজতরঙ্গিনীর প্রথম খণ্ডে কথিত আছে যে কাশ্মীর-উপত্যকা পূর্ব্বে একটি হ্রদ ছিল ; ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ঔরস-জাত কশ্যপ মুনি জল নিকাশ করিয়া স্থানটিকে মনুষ্য বাসোপযোগী করেন এবং অপর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সেখানে বসান। "কাশ্মীর" নামটি অনেকের মতে "কশ্যপ-পুরের" অপভ্রংশ। অপর কেহ কেহ বলেন যে গান্ধারী, খাশ ও দরদী জাতিসমূহ নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিত ; সেই খাশ জাতি হইতে খাশ্মীর বা কাশ্মীর নামের উৎপত্তি। কাশ্মীরা ও দরদী জাতি উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়-জাতি বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে।

কামরী গিরিসঙ্কট—কাশ্মীর

হুয়েন্ সাং বলিয়াছেন যে সপ্তম শতাব্দীতে কাবুল, পঞ্জাব, গান্ধার, কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর মোগলদের অধীনে কাশ্মীর আসিবার পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য অনেকখানি আফগানিস্থান কাশ্মীরের অন্তর্গত হইল। পরে উহা সম্পূর্ণভাবেই কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এক সময়ে কাবুল ও অপর এক সময়ে গজনী, কাশ্মীরের রাজধানী হইয়াছিল।

রাজতরঙ্গিনীর মতে কাশ্মীরের আদিম অধিবাসী, "নাগ" (সর্প) বংশীয়েরা। প্রস্তরে ক্ষোদিত সর্পমূর্ত্তি হইতে ও

কাশ্মীর হ্রদে ধীবরগণের মৎস্যাহরণ

ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতে পূর্ব্বে সর্প ও বৃক্ষ পূজার প্রচলন ছিল। ইসলামাবাদের প্রাচীন নাম 'অনন্ত নাগ'। বিতস্তার উৎসমুখ 'বীর নাগ' নামে অভিহিত। কাশ্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি হিন্দু-বিদ্বেষের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার নাম মূর্ত্তিধ্বংসকারী "সেকন্দর"! তাঁহার সময়ে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন ও তিনি তৈমুরকে কর দিয়া ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর মোগলদের অধীনস্থ হয়। আলমগীরের রাজত্বকালে ইহা আহ্‌মদ্ সা আব্‌দালীর হস্তে পতিত হয় (১৭৫৬ খৃঃ অঃ); সেই সময় হইতে ইহা আফগানদের অধিকারে থাকে। তৎপরে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ ইহা আফগানদের হস্ত হইতে কাড়িয়া ল'ন। ইঁহার অধীনে গুলাব সিংহ নামক জনৈক ডোগ্‌রা রাজপুত কার্য্য করিতেন; তিনি প্রভুকে কর্ম্মে সন্তুষ্ট করিয়া পারিতোষিকস্বরূপ জম্মু সহরটি লাভ করেন। সোব্রাওন যুদ্ধে (১৮৪৬) শিখদের পরাজয়ের পর গুলাব সিংকে ইংরাজদের সহিত শিখদের সন্ধি স্থাপনের কথাবার্ত্তা স্থির করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। লাহোরে স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে শিখগণ ইংরাজকে দেড় ক্রোর টাকা দিতে অপারক হইয়া এক ক্রোর টাকার পরিবর্ত্তে সিন্ধু ও বিয়াস নদীর মধ্যস্থিত দেশগুলি প্রদান করে। কাশ্মীর ও হাজারা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল স্যর হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ্, গুলাব সিংকে কাশ্মীর দেশটি দান করিয়া তাঁহাকে স্বাধীন শাসন-শক্তি দিতে স্বীকার করেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে গুলাব সিংহের দেহাবসান ঘটিলে, তৎপুত্র রণবীর সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৮৫ অব্দে তাঁহার দেহান্তর ঘটিলে, তৎপুত্র প্রতাপসিংহ কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

উপসংহার ঃ—কাশ্মীর শিল্পীর স্বপ্ন। এই সৌন্দর্য্য-পুরীতে শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কাশ্মীরের শাল, কাশ্মীরের স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাঠের কাজ,—এ সকলের তুলনা নাই। এক কালে কি ধনে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, কাশ্মীর সত্যই ভূস্বর্গ ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি প্রিয়তমার
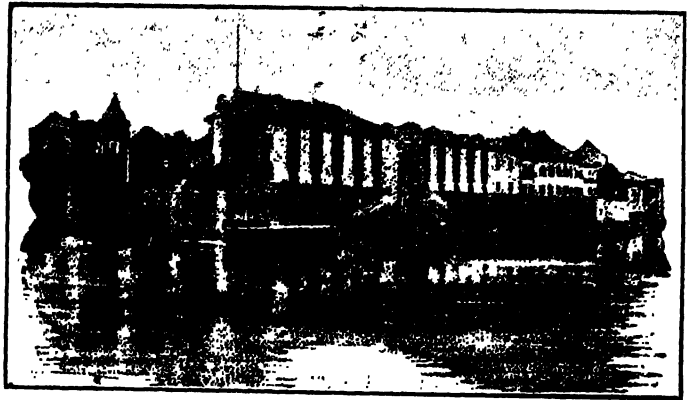
ঝিলম নদীর তীরস্থ শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদ

জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন; উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমস্তই ত্যাগ করিতে পারেন, "বেগর তক্ত্ জফ্‌রাণ্",—অর্থাৎ সিংহাসন ও কাশ্মীর ব্যতীত।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

বিজন শহর

খারাখোটো

এই স্থানে জগত-বিখ্যাত জেতা জেঙ্গিস খাঁর সমাধি আছে। আচার্য্য কোস্‌লফ্ (Professor Kosloff) বিখ্যাত খাঁর সমাধি আবিষ্কারের জন্য মঙ্গোলিয়ার বিলুপ্ত নগরী খারাখোটোর খনন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁহার তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে একখানি গ্রন্থ লিখেছেন।

এই অভিযানের প্রধান কার্য্য গোবি (Gobi) মরুভূমির অন্তর্গত বিলুপ্ত-নগরী খারাখোটোর আবিষ্কার। বহুকাল এই নগরী জগতের মধ্যে রহস্যপূর্ণ নগরী বলিয়া পরিচিত। ভৌগোলিকরা এই নগরীর বিষয় অবগত ছিলেন। মার্কো পোলো (Marco Polo) তাঁহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এযাবৎ কেহ ইহা আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি। ১৯০০ খ্রীঃ অঃ কোন একজন অন্বেষ্টা (explorer) ইহা আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু এই দেশীয় লোকের নিকটে এই স্থানের অবস্থান জান্‌তে চাওয়ায় তারা তার কথা উড়িয়ে দিয়েছিল। আর একজন অন্বেষ্টা এই স্থানে যেতে চেষ্টা করায় তাহাকে এমন পথ ব'লে দেয় যে তিনি নগরীর অবস্থান থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলেন।

আচার্য্য কোস্‌লফ্ যে রাজ্যে এই শহর অবস্থিত তার শাসনকর্ত্তা মঙ্গোলীয় রাজাকে এই স্থানে যাবার সুগম পথ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এই স্থানের নানাবিধ বিবরণ শুনে উহা দেখ্‌তে ইচ্ছুক তাহাও বলেন। সেই রাজা উত্তরে বলেন যে তিনি খারাখোটো সম্বন্ধে শুনেছেন। এই নগরী চারি ধারে প্রাচীর-বেষ্টিত; ইহা ক্রমশঃ বালুকায় প্রোথিত হ'য়ে যাচ্ছে। সেখানে তোরগুত (Torgut) নামে এক জাতি বাস করে, তারা গুপ্তধন পাবার আশায় মাটি খুঁড়ে সন্ধান করে—এ কথা তিনি অনেকের মুখে শুনেছেন। রাজা তাকে পথ ব'লে দিলেন ও কাহারও কাছে তাহার নাম উল্লেখ করতে বারণ করলেন।

খারাখোটোর দুর্নাম আছে—এর নামেরই অর্থ—কাল-নগরী (Black City)। লোকের বিশ্বাস যে এই স্থান প্রেতাশ্রিত ও যারা এই স্থানে যেতে ইচ্ছুক হয়, তারা যাদুতে মুগ্ধ হয়। শেষ যে দু'ব্যক্তি ধনের সন্ধানে গেছ্‌ল, তারা উভয়ই অদ্ভুত সাপের হাতে পড়েছিল—একটা সাপ উজ্জ্বল লাল, আর একটা—উজ্জ্বল সবুজ।

এ বিজন শহরে লুকানো ধনরত্ন আছে—এ কথার ভিত্তি লৌকিক প্রবাদ। কোন একজন খাঁ (Khan—শাসনকর্ত্তা) বিজয়ী সেনা নিয়ে চীনের সিংহাসন অধিকার করতে মনস্থ করেন। কিন্তু অবশেষে শত্রু-পক্ষের অগণিত সৈন্য দেখে খারাখোটোর দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। চীনেরা তার জল-সরবরাহ বন্ধ করবার জন্য বড় বড় থলে বালি ভ'রে নদীর খাতে রেখে দিল। ফলে নদীর স্রোতের গতি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌ল। এই কার্য্যে নগরের ভিতর জলের অভাব হওয়াতে তিনি কুয়া কাটাতে হুকুম দিলেন; কিন্তু জল বেরল না। নিজেকে এইরূপ নিরুপায় দেখে তিনি শেষে যুদ্ধের আয়োজন করেন। সমুদয় ধনরত্ন ও বহু মূল্য দ্রব্যাদি পুঁতে ফেলেন ও পত্নীদ্বয় ও পুত্রদের নিহত করেন এই ভয়ে পাছে তারা শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হয়। তিনি তারপর দুর্গ থেকে বেরিয়ে শত্রু সহ যুদ্ধ ক'রে পরাজিত ও নিহত হন। এই অগণিত ধনরত্ন পাবার আশায় চীন ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী রাজ্যের লোকেরা চেষ্টা ক'রে থাকে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ ইহা খুঁজে পায় নি।

আচার্য্য কোস্‌লফ্ আর একটি গল্প শোনেন। এই ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। কোন এক বৃদ্ধার ঘোড়া হারিয়ে যাওয়ায় সে তার পুত্রদের নিয়ে খুঁজতে বেরোয়। পথে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় কোথায় যাচ্ছে বুঝ্‌তে না পেরে তারা এই নগরীর প্রাচীরের নীচে আশ্রয় লয়। পরদিন এই বিজন শহরে ঘুরতে ঘুরতে সেই বৃদ্ধা তিনটি মুক্তার মালা কুড়িয়ে পায়। ঘটনাক্রমে একদল চীন-দেশীয় ব্যবসায়ী সেই স্থানে আসে। তারা মুক্তার মালার বেশী মূল্য অস্বীকার করায় সে দিতে রাজী হ'ল না, তখন তারা সঙ্গের সমুদয় বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়ে উহা ক্রয় করে। আচার্য্য কোস্‌লফ্ তাঁর দলবল নিয়ে অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত সেই শহরে যেতে লাগ্‌লেন। পথে তাঁদের মরুপার হ'তে হ'ল; ভয়ঙ্কর বালুকাবৃষ্টি ও আঁধির হাতে তাঁরা পড়েছিলেন।

আচার্য্যের মতে মঙ্গোলিয়ায় জীবন-যাপন স্বপ্নময় উপকথার মত। দিনের সময় আকাশ-মণ্ডল ঈষৎ হরিৎ-আভা-বিশিষ্ট নীল রঙের (Turquoise blue)। রাত্রিকালে চন্দ্র রামধনুর বর্ণের মণ্ডলে বেষ্টিত। সর্ব্বদা উট, ঘোড়া, হরিণ ও ভেড়ার বড় বড় দল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অন্বেষ্টার (explorer) মতে জীবজন্তুর এত বড় দল আর কোথাও দেখা যায় না। এ সব জন্তুর আকার সাধারণ জন্তুর মত নয়। কখন কখন খরগোসকে ছোঁ মার্‌তে ঈগল পাখীকে দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেক বারই খরগোস তার ওপর লাফিয়ে প'ড়ে তাকে নিয়ে যায়। এই জাতীয় খরগোস বিড়ালের মত পোষ মেনে থাকে।

সহরের চারধার প্রাচীরে ঘেরা; মাঝে মাঝে বুরুজের শ্রেণী চলে গেছে—এগুলো উঁচু—চূড়া ক্রমে ক্রমে সরু হয়েছে। সহরের ভগ্নাবশেষ বালু-রাশির নীচু সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। চারিদিকে একঘেয়ে হলদে রঙের মরু-ভূমি—কেবল এই স্থান উঁচু ও অন্ধকারে পূর্ণ। প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিম দিকে একটা ছোট গৃহ আছে—তার গম্বুজ বেশ চওড়া। এটা—একটা মসজিদের ভগ্নাবশেষ।

অন্বেষ্টার দল তোরণ-দ্বার পার হ'য়ে প্রথমে বড় একটি চতুষ্ক'র (Square) মধ্যে প্রবেশ করল। মাঝে মাঝে ধ্বংসাবশেষ গৃহসমূহে যাবার পথ; রাশি রাশি আবর্জ্জনার ভিতর থেকে এই সব পথ বেরিয়ে এসেছে। এই যে স্থান নক্সা মত নির্ম্মিত হয়েছিল ও অতিশয় পবিত্র স্থান ব'লে বিবেচিত হ'ত,—ইহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অসংখ্য মন্দির ও দেউলের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সমস্ত গৃহ মাটির তৈরী; চাল ছাওয়া (thatched)—সব প'ড়ে গেছে—কেবল দেয়াল গুলি হাঁ ক'রে আছে। অকস্মাৎ পাখীর মধুর গানে সেই স্থানের অনন্ত নিস্তব্ধতা দূর ক'রে দিলে। জলের বিশেষ অভাব এখানে—তথাপি পাখীর দল বাসা বেঁধেছে। এই কলকণ্ঠ পক্ষী-দলের প্রধান হচ্ছে—মরুদেশের বিখ্যাত পাখী—Hermit Bird।

আবার এই বিজন শহরের রাস্তা মানুষের কাজে জীবন্ত হ'য়ে উঠল। প্রতিদিনের জীবন-ধারণের উপযোগী বস্তু পাওয়া গেল—কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত বুরুজে মাথার খুলি ছাড়া এ জীবনের আর কোন প্রমাণ

বিজন প্রদেশ, শ্মশানতুল্য মঙ্গোলিয়া

বিবিধ সংগ্রহ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

পাওয়া গেল না। মরুর মাঝে বিজন শহরে এই সব প্রতিদিনকার ব্যবহারের বস্তু দেখ্‌তে পাওয়া- অথচ যারা এই সব ব্যবহার করত, তারা কবে এই জগৎ থেকে চলে গেছে—এইরূপ অভিজ্ঞতা মনে বিশেষ ছাপ এনে দেয়। এই সব বস্তু রাস্তায় জড় করা রয়েছে। দামী শিল্প-বস্তু সব বুরুজের ভিতর লুকানো। এইসব বুরুজ শহরের স্থাপত্যের পরিচায়ক।

একটা বুরুজে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো অনেক বৌদ্ধ চিত্র—সম্মুখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে অদ্ভুত মূর্ত্তি রয়েছে। মাটির তৈরী কতকগুলি দেবতার মূর্ত্তি—তাদের চোখ সব খ'সে পড়েছে—এর মধ্যে একটা চোখ স্ফটিকের, আর একটা পোখরাজের (Topaz) তৈরী—দুটিই নিখুঁতভাবে কাটা (exquisitely cut)।

আচার্য্য কোস্‌লফ্‌ প্রমাণ করেছেন যে জেঙ্গিস খাঁ কর্ত্তৃক বিজিত হবার আগে এই শহর তানগুত (Tangut) সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান—কেবল গ্রামবাসী ও প্রধান ব্যক্তিরা বৌদ্ধ ছিল। খারাখোটোর গৌরবের সময়ে এই শহর সৌভাগ্যশালী রাজ্যের কেন্দ্র ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জলের কোন অভাব ছিল না। শহর একটা উপনদীর তীরে অবস্থিত—খাতের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। নিকটবর্ত্তী চারিদিকের ভূমি উর্ব্বরা ও জলসেচনের বন্দোবস্ত ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শস্য মাড়ার জন্য যাঁতার পাথর (mill-stone) খুঁড়ে পাওয়া গেছে। এই বিজন শহরের নিকটে যে জাতি এখন বাস করে তারা তোরগুত (Torgut) নামে অভিহিত। আচার্য্য কোস্‌লফের মতে প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে এই জাতি বাস করতে আসে। বর্ত্তমান কালে অন্যান্য মঙ্গোলীয় জাতি ইহাদের অসভ্য ও পরগাছা স্বরূপ মনে করে। কোন্‌ জাতি এই সহরে পূর্ব্বে বাস করত এদের ইহা জিজ্ঞাসা করায় তারা উত্তরে বল্লে, "চীন জাতি।" কিন্তু এখানে অনেক বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক বস্তু পাওয়া গেছে—শুনে তারা হতভম্ব হ'য়ে গেল।

আচার্য্য কোসলফ্‌ কুয়ায় লুকানো ধনরত্নের খোঁজ সন্ধান পান নি; কিন্তু আবিষ্কৃত বস্তুর তালিকা বিশেষ দীর্ঘ। আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সকলের চেয়ে দরকারী হচ্ছে ২০০০ স্ক্রল (scroll), পুস্তক ও পুঁথি এবং ৩০০০ বৌদ্ধ-চিত্র (Buddhist Painting) একটা বুরুজে পাওয়া গেছে। এই সব পাঠে ও অভিযানে প্রাপ্ত আরো বস্তুর সাহায্যে অনেক বিষয় জানা গেছে। এক সময়ে যে মঙ্গোলীয় জাতি সভ্যতামণ্ডিত ছিল ও মঙ্গোলিয়া জগতের [illegible] ছিল—তারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ভারতীয়, চৈনিক, তিব্বতীয় ও তান্‌গুত দেশীয় চিত্র খারাখোটায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ-চিত্র-সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত চিত্রই বেশ সুন্দর ভাবে রক্ষিত—মনে হয় যেন কাল [illegible] করা হয়েছে—সোনালী রঙের উজ্জ্বলতা প্রথম দিনের মত এখনও রয়েছে,—এমন কি কোমল ছায়া (Tender [illegible]) আদপেও নষ্ট হয় নি। তান্‌গুত ও তিব্বতীয় চিত্র [illegible] কাঠের ফ্রেমে আঁটা—লাল, নীল ও পীত—[illegible] নিদর্শন-স্বরূপ। এই সব চিত্র প্রথম যুগের খ্রীষ্টীয় [illegible] কথা মনে ক'রে দেয়। এই সব চিত্রে বুদ্ধদেব [illegible] ঢাকা; কখনও বা এক ধারে কোন এক সন্ন্যাসীর [illegible] এক কোণে কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি, হাতে গন্ধপাত্র।

খারাখোটোয় প্রাপ্ত পুঁথি ও পুস্তকাদি অতিশয় মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়। মঙ্গোলীয়জাতি সম্বন্ধে যে সব অত্যল্প প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে—এই সব আবিষ্কারে সেইসব প্রমাণের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। একখানি পুঁথি ১৪ লাইনের, [illegible] পাওয়া গেছে। ইহাতে জেঙ্গিস খাঁর উপদেশ লিপিবদ্ধ—তাহা বেশ বোঝা যায়। পুঁথির উপর জেঙ্গিস খাঁর লেখা ছিল—কিন্তু সব বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে—কেবল জেন্‌ [illegible] এই কথাটি পাওয়া গেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নানা কথা

াতা লালা লাজপত রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে মুক্তিকামী নিরাশ্রয় হইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা-ব্রতোদ্‌যাপনকল্পে াহার প্রাণোৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু তাঁহার অনন্ত অমূল্য পুরস্কার। দুঃখ যাঁহার ললাটের জ্যোতি, উৎপীড়নে দণ্ড বক হয় নাই, অন্যায় ও অসত্যকে যিনি চিরকাল করিয়াছেন—সেই দৃপ্ততেজ অমিতসাহসী লালাজীর বিগত দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাশ্রুঅঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

*　　*　　*

সিদ্ধ আইনব্যবসায়ী সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের মৃত্যুতে এক সতী সন্তান হারাইয়াছে। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত প্রতিষ্ঠা ও বিত্তের অধিকারী ছিলেন এবং বদান্যতায় তাঁহার ন্যু হইয়া আছে। প্রাত্যহিক জীবনযাপনে ও ব্যক্তিগত তাঁহার চরিত্রের সুষমা সকলকেই মুগ্ধ করিত। তাঁহার অমায়িকতা ও দানশীলতা দেশবাসীর পক্ষে দৃষ্টান্তস্থল।

*　　*　　*

বাজার পত্রিকার সুযোগ্য পরিচালক পীযূষকান্তি ঘোষ র মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি দেশের সকল তকর আন্দোলনে ও কর্ম্মে উদ্যোগী ছিলেন। দেশীয় যুবকদের তিকল্পে তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলাদেশে তিনিই র প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। পত্রিকা-পরিচালনে তাঁহার সবিশেষ ছিল।

*　　*　　*

র। ফরাসী দার্শনিক ম'সিয়ে হাঁরি বার্গস' ১৯২৭ সালের পুরস্কার পাইয়াছেন। ১৯২৮ সালের পুরস্কার পাইয়াছেন লেখিকা সাইগ্রিদ্ অণ্ড্সেট্—তাঁহার "মাটির জন্ম" বইটির এই লেখিকা গত ১৯২৫ সালেও একবার পুরস্কার পাইয়া- ইহার আগে কথনও একজনকে দুইবার পুরস্কার দেওয়া

*

অশোককুমার গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'বয়েজ নার্সারি হোম' প্রণালীতে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেছে। এই বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ শিক্ষকগণের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত ও ত হইয়া উঠিতেছে এই বিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও খেলাধূলার এবং াড়িতে বাস করিবার সুচারু বন্দোবস্ত আছে। এই বিদ্যালয় বশেষ বিবরণ জানিতে হইলে ৬নং নলিন সরকার ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত মহাশয়কে পত্র লিখিতে হইবে।

*　　*　　*

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৮ বাংলা ৮ই পৌষ ১৩৩৫ রবিবার, কলিকাতায় গীতা-জয়ন্তী-উৎসব প্রচারের আয়োজনকল্পে গীতাপ্রদর্শনীর অধিবেশনের উদ্যোগ চলিতেছে। সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্লা, গুজরাতি, মারাঠি, কানাড়ি, সিন্ধি, উড়িয়া, ইংরেজি, জার্ম্মেনি ইত্যাদি ভাষায় অনেক গীতা আসিয়াছে—আরো অন্য প্রকারের গীতার সংগ্রহের বিশেষ উদ্যোগ চলিতেছে। উপরোক্ত কার্য্যের সাফল্যোদ্দেশ্যে গীতা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় উদ্ধৃত হইল—(১) গীতার ভাষা, টীকা, টিপ্পনি, ব্যাখ্যা, অনুবাদ, পদ্যানুবাদ যে কোনো প্রকারের এবং যে কোনো ভাষায় লিখিত। (২) গীতাসম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান, সমালোচনা, প্রবন্ধ ও অন্য কোনো সংগ্রহ। (৩) হস্তলিখিত তালপত্রে, ভোজপত্রে কিম্বা অন্য কোনো প্রাচীন বা নূতন গীতা বা তৎসম্বন্ধীয় কোন চিত্র। (৪) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ব্যতীত অন্যান্য গীতা। (৫) কোন্ কোন সর্ত্তে দিতে পারেন সেই সর্ত্তের উল্লেখ। (৬) গীতার নাম, টীকাকার, মূল্য, ভাষা ও প্রকাশের সনের উল্লেখ। কেহ বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহার চেষ্টা হইতে পারে। গোবিন্দভবন কার্য্যালয়, ৩০নং বাঁশতলা গলিতে গীতা-প্রদর্শনী বিভাগের সম্পাদকের নিকট পত্র লেখা আবশ্যক।

*　　*　　*

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন আগামী ১১,১২ ও ১৩ই পৌষ (২৬-২৮ ডিসেম্বর) ইন্দোরে হইবে।

দূর প্রবাসে বাণীপূজার এই আয়োজন যাহাতে সার্থক হয়, সে জন্য বাংলার সাহিত্যিকগণের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিনিধিগণের চাঁদা ৫৲ এবং ছাত্রপ্রতিনিধিগণের চাঁদা ২॥০ ধার্য্য হইয়াছে। তাঁহাদের বাসস্থান ও আহারাদির যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত অভ্যর্থনাসমিতি করিবেন।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অঙ্গরূপে প্রবাসী মহিলাসম্মিলনের অধিবেশনও কয়েক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথা অনুসারে ঐ মহিলাসম্মিলনের আগামী অধিবেশন ইন্দোরে হইবে।

*　　*　　*

কোনো কারণে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাটিকা 'আপদ-বিদায়' এ মাসে ছাপা হইল না; পরে প্রকাশিত হইবে।

*　　*　　*

'বরদা-ডাক্তার' গল্পটিতে যে কয়খানি ছবি আছে তাহা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা।